সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭২

সূচীপত্র – বৈশাখ, ১৩৭২

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭২

প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ যাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ যাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা ঃ অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা
„ ½ বা ১ কলম	৬০৲ „
„ ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ „
„ ⅛ „	২০৲ „
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲
„ নীচে ½ „	৭৫৲ „
„ „ ¼ „	৪৫৲ „
„ „ ⅛ „	৩০৲ „

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
„ শেষ „	১৪০৲ „

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৮০ টাকা
½ „	৯৫৲ „
¼ „	৫০৲ „
¼ কলম	৩০৲ „

(পত্রিকার শেষের তুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১″×৬″)		১০০৲ টাকা
২য় „		২০০৲ „
৩য় „		১৭৫৲ „
৪র্থ „	এক রঙ্গে	২২৫৲ „
„ „	তুই রঙ্গে	২৭৫৲ „
„ „	তিন রঙ্গে	৩৫০৲ „

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ „ (২ „)	২৫০৲ „
২ „ (১ „)	১৫০৲ „

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং
অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

THE MODERN REVIEW

—Advertisement Rates—

ORDINARY POSITION

	Rs. P.
Full Page	150.00
Half-page or one column	80.00
Quarter page or half-column	50.00
One-eighth page	30.00
One-eighth column	20.00
Page next to and or opposite contents	180.00
Ditto half-page	100.00
Ditto quarter-page	60.00
Ditto one-eighth page	40.00
Ditto one-eighth cloumn	30.00

SPECIAL POSITIONS

Full Page facing second page of the cover	200.00
„ Page facing third page of the cover	190.00
„ Page facing last page of the reading matter	195.00
Page facing back of the Frontispiece	210.00
Ditto half-page	110.00

POSITION WITHIN READING MATTER

Full Page	220.00
Half-page	120.00
Quarter page	70.00
col.	50.00

Space within reading matter available only at the end pages of the Magazine

COVER PAGES

Second page of the cover

Third page of the cover

Fourth page of the (*One-colour*)

(*Bi-colour*)

(*Tri-colour*)

SUPPLEMENT size $8\frac{1}{2}'' \times 6''$ (to be supplied by the advertiser

8 pages (or 4 slips)

4 pages (or 2 slips)

2 pages (or 1 slip)

MECHANICAL DETAILS, F

Type area of a full page	8
„ „ „ half page	4
Number of columns to a page	2
Length of a column	8
Breadth of a column	3
Type area of half-column	4
„ „ „ quarter-column	2

Only Mounted Stereos & coarse screen screen) are accepted.

Subscription Rates 1 year Rs. 15.00. Half yearly Rs. 8.00

Single copy Rs. 1.25P. including postage.

Prabasi Press Private Limited

77/2/1 DHARAMTALA STREET,

CALCUTTA-13.

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী ‑ বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা ঃ অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ ‑ আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠা ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়.। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌছিলে ১৫ তারিখের ভিতর ‑ ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁ‑ সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছা‑ পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ কর‑ চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা
" ½ বা ১ কলম	৬০৲ "
" ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ "
" ⅛ "	২০৲ "
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲
" নীচে ½ "	৭৫৲ "
" " ¼ "	৪৫৲ "
" " ⅛ "	৩০৲ "

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
" শেষ "	১৪০৲ "

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৮০ টাক
½ "	৯৫৲ "
¼ "	৫০৲ "
¼ কলম	৩০৲ "

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১"×৬")		১০০৲ টা
২য় "		২০০৲ "
৩য় "		১৭৫৲ "
৪র্থ "	এক রঙে	২২৫৲ "
" "	দুই রঙে	২৭৫৲
" "	তিন রঙে	৩৫০৲

সাপ্লিমেন্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ " (২ ")	২৫০৲ "
২ " (১ ")	১৫০৲ "

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং
অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

পৃষ্ঠা

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭২

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭২

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭২

—রঙ্গীন ছবি—

বর্ষামঙ্গল

শিল্পী: অমর দাশগুপ্ত

লিলি
বিস্কুট
সকলেই
পছন্দ করেন
কয়েকটি
নামকরা বিস্কুট
থিন এরারুট
বোষ্টন ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মল্টো
লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭২

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭২

পরিকল্পনার জন্যই স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শুধু একমাত্র রাজনীতির লক্ষ্যই নয়, এর মানে আমরা যেভাবে বাঁচতে চাই তার জন্য স্বাধীনতা, আমাদের দারিদ্রের উন্নতি সাধন করা এবং নিশ্চলতাকে সচল করা।

দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্রে বহুমূল্য আদর্শ আছে। এরই অনুধাবন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লোকের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান প্রয়োগ করা ও সঞ্চয় করতে সক্ষম করায় সাহায্য করেছে।

শেষের তিনটি পরিকল্পনা আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে— খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে টাটকা সব্জীর ফলন বাড়িয়েছে, শিল্পের উৎপাদন তিন গুণ বর্দ্ধিত করেছে; পাঁচ দফায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত পর্য্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি বর্দ্ধিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে (৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে) ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত তাদের হার ছিল শতকরা ৪০% এখন তা শতকরা ৮০% তে পৌঁছেছে। উন্নততর চিকিৎসা বিধান এবং রোগের বিরুদ্ধে আক্রমনের ফলে দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ কমেছে এবং মানুষের আয়ু ৩২ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি বেড়েছে।

পরিকল্পনা মানেই অগ্রগতি

এর জন্য কাজ করুন ও সঞ্চয় করুন

DA 65/219 Bengali

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭২

—রঙ্গীন ছবি—

কৃষ্ণ-সুদামা

শিল্পী : নন্দলাল বসু

অভিসারীকা

শ্রীমুকুন্দদেব ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ — প্রথম সংখ্যা
১ম খণ্ড — বৈশাখ, ১৩৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ

শুভ নববর্ষ

আমাদের মধ্যে নববর্ষ, অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ নানাজনে নানাভাবে প্রতিপালন করেন। ব্যাবসা-বাণিজ্যে ও সাধারণ বেচাকেনার দোকানে হালখাতা বা নূতনখাতা মহরৎ, উৎসবের ন্যায় পালিত হয়। ছোটদের মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ ঐ দিনে উন্মুক্ত প্রান্তরে বা পার্কে সম্মিলিত ভাবে কুচকাওয়াজ ও জিমনাষ্টিক বা সুইডিস ড্রিল ইত্যাদি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থের পরিবারে আগেকার দিনে গুরুজনকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশিস গ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠেরা বছরের প্রথম দিন শুভেচ্ছামণ্ডিত করিতেন। অবস্থাপন্ন পরিবারে নতুন কাপড়-জামা পরা এবং ঝি চাকরদের কাপড় গামছা দেওয়া রীতি ছিল এবং ঐ দিনে ভিক্ষার্থী বা সাহায্যপ্রার্থীকে শুধু হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত না। অবশ্য এ সকলই ছিল বাঙালীর গৃহে ও কারবারে, কেননা পয়লা বৈশাখ শুধু বাঙালীরই উৎসব। শিখেদের বৈশাখীও উৎসব তবে তাহার সঙ্গে অন্য স্মৃতি বিজড়িত।

দিন-কালের বদল হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির – বিশেষে নীতির। আগে দোকানদার ও খরিদ্দারের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহার মধ্যে সামাজিকতার একটা আভাস পাওয়া যাইত। মাস-কাবারের বাজার যে বণিকের দোকান হইতে লওয়া হইত সে দোকানীও ক্রমে বাড়ীর সকলের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিত, বাড়ীর লোকেও তাহার খবর রাখিত। পাড়ার মণিহারি দোকানে সন্ধ্যায়, ছুটির দিনে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সাধারণের অনেকে গল্পগুজব ও খবরাখবর করিতে আসিতেন।

আজ সে সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। যে সামান্য সংখ্যক কারবারী ও দোকানী টাকার লোভে ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দিয়া খরিদ্দারের সঙ্গে পূর্ব্বেকার মত সৎব্যবহার করেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বা সুনাম যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হয় না, কেননা আজিকার দিনে যুগধর্ম্মই দাঁড়াইয়াছে "যেন-তেন-প্রকারেণ" অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। এবং যে সে-কাজে পটু নয় তাহার সব কিছুই নগণ্য ও অগ্রাহ্য। সুতরাং খরিদ্দারকে ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জনই প্রতিষ্ঠা লাভের প্রধান উপায়, কেননা স্বয়ং চাণক্যই বলিয়া গিয়াছেন "ধনাৎ ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ!"

অবশ্য এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে যথেষ্ট, কেননা সীমাহীন লোভ-লালসা শেষ পর্য্যন্ত নিজের বিষেই নিজে জ্বলিতে বাধ্য যদি সেই বিষ যাহার উপর প্রয়োগ করা হইতেছে সে নিতান্ত নির্জ্জীব, ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত মূক-বধির না হয়। কিন্তু আর যাহাই হউক, বাঙালীর সংসারে ক্রেতা-

বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক আগেকার মত হালখাতার মিষ্টান্নে সরস ও মধুর কদাচিৎ হয়।

আজ সময় এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ষ-শেষের দিনে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে শুভেচ্ছার মধ্যেই অভয় দান করিতে হইয়াছে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত সাধারণকে সমাজবিরোধী শক্তি দমন করার প্রতিশ্রুতি দিয়া। কেননা সেই আশ্বাস না দিলে সকল শুভেচ্ছাই বৃথা। এবং সেই সঙ্গে তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য। তাঁহার বাণীতে আছে "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আমাদের আদর্শ। এই আদর্শের পরিপন্থী সমাজবিরোধী সমস্ত শক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করব, এই আশ্বাস আমি শুভ নববর্ষে আমার দেশবাসীকে দিচ্ছি। জনসাধারণ এই সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।"

"আমি এই শুভদিনে সমস্ত দেশবাসীকে আবার আমার শুভেচ্ছা জানাই"— ইহার উত্তরে আমরাও মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা এ সবকিছুই সফলকাম হউক এই কামনাই জানাই।

কিন্তু আজ বাঙালী এরূপ রিক্ত, দুর্ব্বল ও উদ্যমহীন হইল কেন? ২৫০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে গুরু গোবিন্দ সিং তাঁহাদের পঞ্জিকা অনুযায়ী এক পহেলা বৈশাখে তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়কে অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শিখ খালসা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই দিনে (এবারে আমাদের ৩০শে চৈত্রে) শিখ সমাজ ঐ "গুরু পরব বৈশাখী" উৎসবে সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়। অন্য দিকে এই বাঙ্গলা দেশে, এই বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভকালে যে উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বান দেশের সন্তানগণ পাইয়াছিল দেশত্রাণকামী স্বামী বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপ্লবী নিরালম্ব স্বামী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যুগনেতৃবৃন্দের কণ্ঠ হইতে এবং সে আহ্বানে বাংলায় জাগে জ্বালাময়ী চেতনা এবং বাংলার সন্তানের হৃদয়ে আসে উদ্যম, আত্মনিবেদন ও মরণজয়ী স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীল স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা, সেই আহ্বানের ধ্বনি কি আজ—ঐ ত্রয়োদশ শতকেরই তৃতীয় পাদের শেষ দিকে—আছে শুধু মহাপুরুষগণের শতবার্ষিকীর ক্ষণস্থায়ী প্রতিধ্বনি প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে? সে উদাত্ত বাণী, সে উদ্যম, অজেয় সঙ্কল্প, অদম্য পুরুষকার, সে সবই কি ঐ মহামানবদের মর্ত্ত দেহেরই মত পঞ্চভূতে লীন হইয়া গিয়াছে? নহিলে বাঙ্গালী আজ এভাবে সম্বিৎহারা, আশ্রয়হীন ও সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইতে চলিয়াছে কেন?

তখনকার দিনে বাঙ্গালী সন্তান উদ্বুদ্ধ হইত এবং নূতন ভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ করিত নববর্ষের পুণ্যাহে ঐ সকল মহামানবের বাণীর প্রেরণায়। আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি সে-সকল ভয়হারী অভয় বার্ত্তার মর্ম্মার্থ, হারাইতে বসিয়াছি, তাঁহাদের অমৃতময়ী বাণী-নিহিত নবজীবনের প্রেরণা।

এই নবাগত ১৩৭২ সালের ১লা বৈশাখেরই মত আর এক ১লা বৈশাখের প্রত্যূষে, ১৩১৮ সালে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে বাণী দিয়াছিলেন তাহাতে ছিল পুরুষকারের প্রেরণা, সাধনার ও জয়যাত্রার আহ্বান। তাহার মধ্যে ছিল অমৃতের সন্তানগণের নববর্ষ পালনের প্রেরণা এই বার্ত্তার রূপে এবং তাঁহার সঙ্কল্প গ্রহণের আহ্বান ছিল তাঁহার বাণীর শেষভাগে। আজ এই নববর্ষ প্রসঙ্গ শেষ করি সেই ভাষণের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়া ও সেই যুগগুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া:—

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখীর গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে—আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মনুষ্যকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন, দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন—তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেই জন্যই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হোতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে

নববর্ষ পাঠি'য় থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে ত সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি, তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি তোমার এ ভার বহন করতে পারিনে প্রভু, মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর!

* * *

মানুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে—তখনি বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর! তখনি তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর ত সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত ক'রে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও! একটি দরজার পর আরেকটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ কর,—তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক!

* * *

না, না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্ন ভিন্ন বর্ম্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

—শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯
বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৪২।

বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার অভাব নিদারুণ একথা সর্ব্বজনবিদিত। সেই কারণে অর্থাগমের চেষ্টাও অর্থমন্ত্রীর দপ্তরে ক্রমাগত চলে এবং তাহার প্রত্যেকটি বিভাগ নানা নতুন পথে ফিরিয়া দেখে অর্থলাভের নূতন উৎস আবিষ্কার হয় কি না সেই চেষ্টায়। প্রায় প্রতি বৎসরেই পুরাতন আকর ও উৎস হইতে আরও আয়-নিষ্কাশন ছাড়াও নূতন একটা কিছু ধরা হয় যাহা হইতে অর্থাগম সম্ভব। কিন্তু দেশের লোক সে বিষয়ে প্রথম খবর সাধারণত পাইয়া থাকে অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে এবং সংসদে সেই সংক্রান্ত সকল তথ্যের ও সকল যুক্তি-তর্কের পূর্ণরূপে আলোচন হইবার পর তাহা গৃহীত, প্রত্যাখ্যাত বা সংশোধিতরূপে গৃহীত হয়। এই কারণেই সরকারী আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কিত নূতন প্রস্তাব লোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করে। কেননা সংসদে তাহার পুরা যাচাই হইবার কালে সে প্রস্তাবের প্রত্যেকটি দিক, তাহার প্রত্যেকটি কথার বা শব্দের ওজন তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয় এবং ঐভাবে টাকা আদায় করিলে জনসাধারণের কষ্টবৃদ্ধি যাহা হইবে, তাহার বদলে রাষ্ট্র-চালনার বা উন্নয়নের পথ কতটা সুগম হইবে সেটাও খতাইয়া লাভ-লোকসানের অঙ্কফল সাধারণের সম্মুখে রাখা হয়। যদি দেখা যায় যে, নূতন পথে টাকা তোলায় জনসাধারণের, ব্যবসা-বাণিজ্যের বা কোনও শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ক্ষতি হইবে বা যে টাকা উসুল হইবে তাহার পরিমাণ এমন কিছু নয় যে, অন্যদিকের ক্ষতি বা জনসাধারণের উপর নূতন অসুবিধা বা ভারবৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত মনে হইতে পারে তবে সে পথ ছাড়িয়া দেওয়া হয় বা সে পথে আদায়-উশুলের পরিমাণ অনেকখানি কমাইয়া একদিকের কষ্ট বা ক্ষতির সঙ্গে অন্যদিকের সুবিধার সামঞ্জস্য করা হয়।

বিগত ৮ই মার্চ্চ ভারত সরকারের গেজেটে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষকর বিভাগ আয়কর-সম্পর্কিত আইনের সঙ্গে বিজ্ঞাপন-সম্পর্কিত একটি নূতন বিধি-নিষেধের ধারা নিয়মাবলীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত সেই বিধি-নিষেধ এরূপ মারাত্মক যে, উহার লক্ষ্যবস্তু তাহার চাপে নষ্ট ত হইবেই, উপরন্তু সেই সঙ্গে বহু কর্ম্মী-সাধারণের, অনেক শিল্পী ও কৌশলী লেখকের অন্নসংস্থান ধ্বংস হইবেই। অথচ যে উদ্দেশ্যে ঐ কর-বিধির প্রবর্ত্তন সে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও এতই কম, এবং উহা সম্ভব হইলেও উহার পরিমাণও এত অল্প যে, মনে হয় প্রত্যক্ষ আয়কর বিভাগ কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই উহা সরাসরি চালিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। এবং পরে যখন উহার প্রতিবাদে নয়াদিল্লীর কংগ্রেস ও সংসদীয় মণ্ডলগুলি মুখরিত হইয়া

উঠিল তখন শোনা গেল যে, ঐ বিধিগুলি অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে রচিত হয় নাই, এমন কি তাঁহার অনুমোদন লাভও করে নাই। প্রত্যক্ষকর বিভাগেব স্বেচ্ছাচারী কর্তারা তাহার রচনা ও চালনার পূর্ণ অধিকার নিজহস্তে লইয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য প্রতিবাদ অতি তীব্র ও ব্যাপক হওয়ায় নয়াদিল্লীর সরকারী মহলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারিকেও নানা বিরূপ সমালোচনা শুনিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষকর পরিষদ ৩০শে মার্চ্চ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দেন যে, বহু-বিতর্কিত এই কর-বিধি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিধিগুলি সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিই শেষ কথা নয়!

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঐ বিজ্ঞপ্তির পরে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন তাহার সহজ অর্থ এই যে, যে-বিধিগুলি সম্পর্কে এরূপ তীব্র আপত্তি উঠিয়াছিল সেগুলি বাতিল করা হইয়াছে কিন্তু বিজ্ঞাপন হইতে সরকারী অর্থাগমের চেষ্টা ছাড়া হয় নাই। সে কারণে ঐ বিষয়ের সহিত যাঁহাদের বা যে সকল সংস্থার ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিজড়িত তাঁহাদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া সে সম্বন্ধেই নূতন নিয়মাবলী শীঘ্রই রচনা করা হইবে। এবং সেই কারণেই ৩০শে মার্চ্চ অর্থমন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে রাজস্ব দপ্তর জানাইয়াছেন যে সাধারণ নাগরিক ও অন্য যাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ স্পৃহা বা উহার সঙ্গে স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাঁহারা যেন ২৪শে এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষকর পরিষদের সচিবকে, নয়াদিল্লীর ঠিকানায় নিজেদের মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি পাঠাইয়া দেন। ঐ সকল মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি সরকার যথাযথভাবে বিবেচনা করিবেন, সে কথাও ঐ প্রেসনোটে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের মতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দপ্তর ঐ পথে চলার কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেই মঙ্গল। যদি অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারির এই পথে অর্থাগমের আশা কিছু থাকে তবে আমরা বলিব ঐ পথে আশা বিশেষ কিছুই নাই, আছে শুধু আলেয়া। কেননা প্রত্যক্ষভাবে হয়ত অল্প কয়েক বৎসরে দুই-এক কোটি টাকা আসিবে। সেই টাকার আদায় খরচ দিতে হইবে পরোক্ষভাবে সরকারকে নানাদিকে এত বেশী যে, হিসাব খতাইলে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী দাঁড়াইবে ক্রমে ক্রমে। প্রথমতঃ ঐ বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়ায় ছোটখাটো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি বিষমভাবে ঘায়েল হইবে ও তাহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বড় সংবাদপত্রদেরও সমূহ ক্ষতি হওয়া সম্ভব, কেননা বিজ্ঞাপন খরচের সঙ্গে তাহার দরুন আংশিকভাবে আয়কর দিতে হইলে বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন কমাইতে বাধ্য হইবেন এবং সেই বিজ্ঞাপন সংকোচের প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বড় বড় সংবাদপত্রের আয় ও আয়করের মধ্যে। তারপর বিশেষ দুরূহ পরিস্থিতিতে পড়িবে কতকগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প, যথা ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতকারী ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি, পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয় ব্যবসায় ইত্যাদি। ইহাদের আয় এত বেশী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল যে, বিজ্ঞাপন খরচ যদি আয়করের আওতায় আসে তবে সেই আয় বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। এবং তাহারও প্রতিচ্ছায়া পড়িবে তাঁহাদের আয়করের উপর। আরও অনেক বৃহৎ সংস্থাকে বাধ্য হইয়া বিজ্ঞাপন সংকোচ করিতে হইবে, যাহার ফলে তাহাদেরও আয় কমিতে বাধ্য। কেননা আজিকাব জগতে কোনও ব্যবসা বা বাণিজ্য নাই যাহা অল্প-বিস্তর বিজ্ঞাপন-নির্ভর একেবারেই নয়।

স্বয়ং সরকার বাহাদুর নিজেরাই কতটা বিজ্ঞাপন-নির্ভর তাহা যদি তাঁহারা এতদিনেও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে উপনির্ব্বাচনে ও সাধারণ নির্ব্বাচনে তাহা বুঝিবেন—অন্তঃস্থলে আঘাত খাইয়া। বিদেশে ত আমাদের, জাতিসঙ্ঘের আসরেও নানা দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক আদান-প্রদানে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত আজও হইতে হইতেছে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের প্রচার, বিজ্ঞাপন—বিশেষে কুৎসা খণ্ডনে প্রচার—ইত্যাদি বিষয়ে কোনও হুঁস নাই বলিয়া। দেশে প্রবল প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে অবশ্য সে-বিষয়ে হুঁস হয় এবং প্রেস নোট ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। এবং প্রকাশ ও প্রচার সম্ভব হয় সেই সংবাদপত্র ইত্যাদিরই সাহায্যে যাহাদের ঘায়েল করার জন্যই যেন অর্থমন্ত্রী পরিষদ বদ্ধপরিকর।

সভ্য জগতের কোনও দেশে বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার-খরচের উপর কর বা নিয়ন্ত্রণ বিধি আছে বলিয়া

আমরা জ্ঞাত নই। ইয়োরোপে, উত্তর আমেরিকায় বা জাপানে ঐরূপ কোন উদ্ভট ব্যবস্থার কথা কোনও রাজ্য সরকার বা রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ কখনও ভাবেনও নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কেননা গাছ কাটিয়া ফল আহরণ বা হংসীকে কাটিয়া স্বর্ণ ডিম্ব অন্বেষণ করার মত উদ্যোগশালী আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রীসভা আমাদের দেশেই সম্ভব দেখিতেছি!

শ্রীকৃষ্ণমাচারিকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন যে, এরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক করবিধিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-জগৎ মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন হইবেই। এইরূপ হানিকারক বিধি নিয়ন্ত্রণ করার ফলে আয় যাহা হইবে তাহা ক্ষতির তুলনায় সামান্যই দাঁড়াইবে। সুতরাং এই কর বিধির প্রত্যাহার সম্পূর্ণ ভাবেই হওয়া প্রয়োজন।

অন্য দিকে একথাও উঠিয়াছে যে রাজস্ব বিভাগের যে কর্তার দল এই অপরূপ কর-বিধির জন্মদাতা, তাঁহাদের মুখরক্ষার জন্যই এই কর-বিধি একেবারে প্রত্যাহৃত হইতেছে না। ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যেভাবে ঐ করবিধি চালিত করার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঐরূপ স্বেচ্ছাচার যাঁহারা করেন তাঁহাদের মুখরক্ষার প্রশ্ন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশে উঠিতে পারে না।

পাকিস্তানের ব্যাপক হামলাবাজী

পাকিস্তান ত এখন খোলাখুলি ভাবে ভারতবিরোধী অভিযান চালাইতেছে। স্বয়ং আয়ুব খাঁ, তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর পাকিস্তানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টোকে লইয়া ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে বন্ধু-বিচ্ছেদ করাইবার চেষ্টায় মস্কো গিয়াছিলেন। সেখানের সফর শেষ হইয়াছে—এবং বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়াই ভারতীয় সংবাদপত্রে রিপোর্ট আসিয়াছে। সেখানে আয়ুবের মন্ত্রণা চলে নাই কেননা সোভিয়েটের কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের প্রধান মুরুব্বি মার্কিন দশকে এখনও বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন না। উপরন্তু কিছু-দিন যাবৎ লালচীনের সহিত সোভিয়েটের মিতালিতে বিষম খঁচ ধরিয়া রহিয়াছে। এবং পাকিস্তান এখন লালচীনের মহাবন্ধু এবং পাকা খেলোয়াড়ের মত একদিকে মার্কিন-খুঁটি ও অন্যদিকে চীন-খোঁটা এই দুইয়ের মাঝে পাকিস্তানী দোস্তির রশি খাটাইয়া তাহার উপর নাচ দেখাইতেছে।

মস্কোয়ের পালা শেষ করিয়া আয়ুব খাঁ বিদেশী সফরের অন্য গন্তব্যস্থলে যাইতেছেন। এদিকে তাঁহার নির্দ্দেশ মত পাকিস্তান সমানে ভারতীয় এলাকা ও সীমান্তবাসী ভারতীয় নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর হামলা চালাইয়া যাইতেছে। কখনও বা পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তাহাদেরই চালিত দুর্ব্বৃত্ত দল সীমান্ত অঞ্চলের ভারতীয় গ্রামে ডাকাইতি, লুটতরাজ, খুন জখম, ধর্ষণ চালাইয়া ফিরিয়া আসে। আবার কখনও দিনের পর দিন সীমান্তের ওপার হইতে দিনের পর দিন গুলীগোলা চালাইয়া এ-দিকের নিরীহ গ্রামবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করিয়া রাখে—যেমন বিগত মার্চ্চ মাসে ১৭ দিন ধরিয়া চালাইয়াছিল এবং সম্প্রতি আসামের করিমগঞ্জ সীমান্তে চালাইতেছিল। এই সবের সঙ্গে আবার দুই-এক ক্ষেত্রে গুলিবর্ষণের আড়ালে একদল হানাদার অল্প কিছু ছিট জমি দখল করিয়া বসে এবং তাহা লইয়া নয়া দিল্লী ও করাচীর মধ্যে লেখালেখি চলিতে থাকে। সম্প্রতি করিমগঞ্জ সীমান্তের গোবিন্দপুর গ্রামের ভারতীয় অংশ ঐ ভাবে পাকিস্তানী হানাদারেরা দখল করিয়া রাখে এবং তাই লইয়া অনেক কথাবার্ত্তাও এই প্রসঙ্গ লেখার সময় চলিতেছিল।

পশ্চিম বাংলার সীমান্তে এইরূপ উৎপাতের কোনও ব্যবস্থা হয় কি না দেখিবার জন্য, নয়াদিল্লী ও রাওয়ালপিণ্ডির নির্দ্দেশ মত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী তিনজন সহযোগী সঙ্গে লইয়া ঢাকায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী ও তাঁহার সহযোগীদের সহিত ব্যাপক আলোচনা চালাইয়া আসেন। পাকিস্তানী দল তাঁহাদের বাধা দস্তুর মত আরম্ভে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন যে "ভারত দহগ্রাম আক্রমণকারী"। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা, চীফ সেক্রেটারী শ্রী আর গুপ্ত এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া, পাকিস্তানের এই শান্তি চুক্তির আড়ালে যাহা চলিতেছে সেই চক্রান্তের রূপ প্রকাশ করিয়া দেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্য ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীকে দহগ্রামের সীমান্ত হইতে সরাইতে পাকিস্তান অস্বীকার করায় সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।

সিদ্ধান্ত যাহা হইয়াছে, ঐ দু'দিনের আলোচনায়, তাহা এইরূপ: (১) উভয় দেশের ছিটমহলগুলিতে—অর্থাৎ যে-সকল মহল অন্য রাষ্ট্রের এলাকা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবৃত সেই সকল অঞ্চলে—যাতায়াতের জন্য ১৯৫৩ সনের পাশপোর্ট আইন অনুসারে "এ" শ্রেণীর ভিসা প্রদান; (২) কেবলমাত্র দহগ্রামে আগামী ইদুজ্জোহার সময় পাকিস্তানী মুসলমানগণের বিনা পারমিটে যাতায়াত; (৩) বর্ত্তমানে পাকিস্তানী অফিসারদিগের দহগ্রাম প্রবেশের যে নিয়ম আছে তাহা চালু রাখা ইত্যাদি।

এদিকে পূর্ব্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে যে উৎপাত চলিতেছে তাহার একটা ফয়সালা করার চেষ্টা চলিতেছে—যেখানে শেষ নিষ্পত্তির আশা খুবই কম। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও কচ্ছ সীমান্তের কাঞ্জারকোট এলাকায় পাকিস্তান সৈন্যদলের এক ব্রিগেড বিগত ৯ই এপ্রিল, ভারতীয় এলাকার প্রায় ছয় হাজার গজ ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। ঐ সীমান্ত ঘাঁটির নাম সর্দ্দারকাট এবং উহার উপর পাকিস্তানী সৈন্য কামান ও মর্টারের গোলা চালায়। ভারতীয় সীমান্ত পুলিশের হাতে ৩৪ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয় ও ৪ জন ধরা পড়ে। তারপর পুলিশ বাহিনী অগ্রবর্তী ঘাঁটি হইতে সরিয়া আসে এবং ভারতীয় সেনাদল সেই ঘাঁটি দখল করিয়া আছে। ভারতীয় পুলিশের দুইজন নিহত ও ৪ জন নিখোঁজ ও তিনজন আহত হয়। পাকিস্তানী ব্রিগেডে তিন ব্যাটালিয়ানের ৩৫০০সৈন্য ছিল। সুতরাং আক্রমণ বেশ বৃহৎ অনুপাতেই হয় এবং পরের খবরে জানা গিয়াছে কয়দিন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে পাকিস্তানী দল যে দুইটি ঘাঁটি ভারতীয় এলাকার প্রায় দুই হাজার গজ ভিতরে বে-আইনীভাবে স্থাপন করে সে বিষয়ে একটা স্থানীয় পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব পাকিস্তান হইতে আসে। সেই প্রস্তাবটি যে সময় পাঠানো হয় সেই সময়েই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ঐ ব্রিগেডকে ভারতীয় ঘাঁটি আক্রমণের আদেশ দেন এবং সে সময়েই ঐ ব্রিগেড ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পাকিস্তানীদের এই স্বভাব-সুলভ "দুইমুখো" চালের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল ভারতের হুঁসিয়ারী নষ্ট করিয়া অতর্কিতে কার্য্যসিদ্ধি করা। সেই কারণে ১৮ নম্বর পাঞ্জাব সেনাদলের ৮ নং সীমান্ত বাহিনীর ও ৬ নং বালুচ রেজিমেণ্টের এক এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য লইয়া ঐ ব্রিগেড তৈয়ারী হয়। এ প্রসঙ্গ লিখিবার সময় সেই ব্রিগেড আমাদের সীমান্ত বরাবরই রহিয়াছে জানা যায়। কলিকাতায় ১০ই এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীনন্দ যে বিবৃতি দেন তাহার এইরূপ বিবরণ আনন্দবাজার দিয়াছেন—

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ শনিবার কলিকাতায় কচ্ছের সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান যে, উহা এখন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তিনি আরও বলেন, এই এলাকায় আমাদের সামরিক বাহিনী হামলার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। "আমরা সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করব।"

শ্রীনন্দ বলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানী হামলার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাকে তিনি গুরুতর বলে মনে করেন। কারণ ভারতীয় পুলিস বাহিনীর ওপর পাকিস্তানী মিলিটারী আক্রমণ চালিয়েছে। দু'পক্ষেই অনেক হতাহত হয়েছে বলে তিনি জানান।

সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত সংবাদটিও দৈনিক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

করাচী, ১০ই এপ্রিল—পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, সিন্ধু-কচ্ছ এলাকায় পাকিস্তান অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য পাক্-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উভয়পক্ষের উর্দ্ধতন অফিসার পর্য্যায়ে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করেছেন।

গতকাল এখানে যুদ্ধের খবর পাবার পর ভারতীয় হাই-কমিশনারকে পাক্-পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে এনে তাঁকে এইসব প্রস্তাব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এতদিন এ-জাতীয় উপদ্রব কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা অঞ্চলেই চলিত। সেখানে এখনও হানা-হামলা ও গুলী-গোলা বর্ষণ সমানে চলিতেছে এবং প্রতিটি ঘটনা জাতিসঙ্ঘ

নিযুক্ত পরিদর্শকদের নিকট জ্ঞাপন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য ঐরূপ জ্ঞাপন বা অভিযোগে কোনও ফল হইতেছে না এবং হইবেও না। পাকিস্তান চীনেরই মত নিজেদের কুকাজ ও প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত এইরূপ শত্রুতার "সাফাই" হিসাবে সেই প্রতিবেশীরই বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ চালাইয়া যাইতেছে এবং বিদেশে পাক-রাষ্ট্রদূত সেই অভিযোগগুলিই ফলাও করিয়া প্রচার সমানে করিতেছে। এখন এই হানা-হামলা আরও ব্যাপকভাবে চালু করার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব খাঁ বিদেশে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতি চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য করা হইতেছে না, কেননা চীনের পক্ষে ভারত আক্রমণ নাকি অসম্ভব। যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রধান উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে আক্রমণ এবং সেই কারণে যে-সকল বিদেশী শক্তি ভারতকে অস্ত্রসম্ভার দিতেছেন তাঁহাদের জানানো হইতেছে যে, তাঁহারা ভারতের এই অপকর্ম্মে সহায়তাই করিতেছেন। অবশ্য এই সকল ভারতবিরোধী অপপ্রচার ভারতের বন্ধু যে-সকল রাষ্ট্র সে-সকল দেশে খুব সফল হয় নাই। কিন্তু ভারতের এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কেননা জগতের বহুদেশে ভারত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নাই এবং সেকারণে এ জাতীয় মিথ্যা প্রচার যদি দ্রুত খণ্ডিত না হয় তবে ভারত সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা ঐরূপ দেশে থাকিয়া যাইবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে এতদিন অবহেলা করিয়াই আসিতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত "সত্যমেব জয়তে" ঘরে আওড়ালেই কাজ হয় না। সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু যেখানে শুধু মিথ্যাই প্রচারিত, সত্যের ঘোষণা-মাত্রও নাই, সেখানে অনুপস্থিত ও অদৃশ্য সত্য কি ভাবে সক্রিয় ও চতুর্দ্দিকে ঘোষিত ও মিথ্যাকে জয় করিতে পারে তাহা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিশ্বাসের অতীত। যে মিথ্যা বিনা প্রতিবাদে জাহির হইতে থাকে তাহা সাধারণজন সত্য বলিয়াই গ্রহণ করে।

কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

ভারতের বাহিরে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংবাদিক-মহলে ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছুমাত্র চেতনা, টান বা প্রীতি-বন্ধুত্ব আছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই একটা ধারণা হইয়াছে যে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আসন টলায়মান। এই ধারণার প্রধান উৎস অবশ্য এদেশেরই রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংবাদিক মহলের সমালোচকবৃন্দের মন্তব্যের ধারা। ঐ সকল মন্তব্যে বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবর্গের ও কংগ্রেস সরকারের উচ্চতম অধিকারীবর্গের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনাই করা হইতেছে। সেই সকল কারণে ও দেশের প্রশাসন সম্পর্কিত কিছু ব্যবস্থা শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়ায় এদেশে বিদেশী রিপোর্টার ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিদর্শক যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মনে এক ধারণা জন্মায় যে এতদিনে কংগ্রেস বুঝি অস্তাচলের দিকে চলিল। এবং সেই ধারণা ঠিক কি ভুল তাহার পরীক্ষা স্বরূপে তাঁহারা স্থির করেন যে, ভারতের বৃহত্তম মহানগরের পৌরনির্ব্বাচনের ফলাফল তাঁহারা সমীক্ষণ করিবেন। তাঁহাদের কৌতুহল এবং এ বিষয়ে চর্চ্চার পিছনে একথাও ছিল যে এই কলিকাতা মহানগর ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গতি নির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। কেন না ভারতের সকল জাতি উপজাতি এবং সামাজিক স্তর ত এই মহানগরে রহিয়াছে, উপরন্তু প্রায় সকল রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদও এখানে অল্পবিস্তর প্রচার লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন মতবাদ কতটা জনসাধারণের সমর্থন পাইতেছে তাহার নির্দ্দেশ এখানের সাধারণ নির্ব্বাচন গুলিতে বুঝা যায়। সেইজন্য কলিকাতার পৌর নির্ব্বাচনে কংগ্রেস কোথায় দাঁড়ায় সে বিষয়ে তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে সমীক্ষণ করিতেছিলেন।

কার্য্যত দেখা গেল এই মহানগরের নাগরিকগণ এই পৌরনির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ কোনও তাপ উত্তাপ দেখাইলেন না এবং ফলাফলে দেখা গেল কংগ্রেসের আধিপত্য প্রায় সমান ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিল। কেননা নির্ব্বাচনের পরে নির্দ্দলীয় ও অন্য সভ্য কয়জন কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ায় দল সংখ্যাগুরুত্ব পাইয়াই গেল।

বর্ত্তমান য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন

বর্ত্তমানে "য়্যাড মিনিষ্ট্রেসন'-এর কোন বালাই নাই। অথচ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই 'য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন'ই ছিল দেশ-শাসনের প্রধান অংশ। বিশেষ করিয়া পোষ্ট-অফিস ও রেলওয়ে য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন-এর প্রশংসার কথা তখন সকলের মুখে মুখেই ঘুরিত। আজ এই দুটি য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসনই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ডাকের চিঠি ত্রিশবছর পরে প্রাপকের

ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়াছি। রেলওয়ে বাজেটে দেখা যাইত প্রতি বৎসরই লাভ হইতেছে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি ঘাট্‌তি পড়িতেছে। ইহার কারণও রেল-কর্তৃপক্ষ যে না জানেন এমন নয়। আগে বিনা টিকিটে যাত্রীরা কোথাও যাইত না, যাইতে সাহসও করিত না। যত্রতত্র চেক্ করিবার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেখা যাইতেছে, যাত্রীরাও অতিমাত্রায় সাহসী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ টিকিট চাহিবার লোক কেহই নাই। ফাষ্ট ক্লাসের যাত্রী যাহারা—তাঁহারা কিছুটা আরামে যাইতে পারিবেন বলিয়াই তিনগুণ টাকা খরচ করিয়া টিকিট কাটেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বিনা-টিকিটের যাত্রীদের অত্যাচারে আরাম তো দূরের কথা, গাড়ীতে উঠা-নামা করিতেই তাঁহাদের গলদ-ঘর্ম্ম হইতে হয়। বসিবার কথা তো কল্পনাই করা যায় না—দাঁড়ানোও অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া ষ্ট্রেচারে করিয়া রোগীদের লইবার ঐ একমাত্রই গাড়ী। পূর্ব্বে এ-ব্যবস্থা কোনোদিনই দেখা যায় নাই। কেহ দেখিবারও নাই—প্রতিকার তো দূরের কথা। 'চেকার' পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এখন তাহাদের কাজ অন্যত্র। তাহাদের লক্ষ্য 'ভেণ্ডারদের' গাড়ীর দিকে। তাহারা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র চেকারের দল তাহাদের ঘিরিয়া ধরে। অর্থাৎ তাহাদের হয়রান করিয়া বেশ দু'পয়সা পকেটে আসে। এ রোজগার যাত্রীদের ধরিয়া নাই। যাত্রীরা ইহা ভাল করিয়া জানে বলিয়াই টিকিট কাটিবার প্রয়োজন বোধ করে না। উঁহাদেরই হিসাব দেখিয়া বলিতেছি, তিন চতুর্থাংশ যাত্রী প্রত্যহ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে। জানিয়া শুনিয়াও বেশ আরামে উঁহারা চোখ বুজিয়া আছেন। আজকের দিনে অভিযোগেরও কোন মূল্য নাই। কে ইহার বিচার করিবে? সরিষার মধ্যেই যে ভূত! স্বীকার করি, বর্ত্তমানে অতিমাত্রায় দুর্নীতি বাড়িয়াছে। কিন্তু কেন বাড়িল? যাহারা শাসন করিবেন তাঁহাদেরই যে নীতি বলিয়া কিছু নাই। আজকের এই "ফাইল-চাপা"র যুগে অভিযোগের যেমন কোন মূল্য নাই, তেমনি মূল্য নাই 'লোক-দেখান' অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন-এর। ইহার পর আরও কত কি দেখিতে হইবে—কে জানে!

রেলওয়ে বিজ্ঞাপনে দেখি, 'আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি, আপনারাই রক্ষা করিবেন।' যাত্রীরা এই জাতীয় সম্পত্তির অর্থে বোধ হয় নিজের সম্পত্তি বুঝিয়া থাকিবে, তাই প্রত্যহই দেখা যায় ফার্ষ্ট ক্লাসের গদি চুরি, পাখা চুরি, আলো চুরি বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহারা যে সবসময় লইয়া যাইবার জন্যই করে এমন নয়। বিনা স্বার্থেই গদি কাটিয়া তছ্‌নছ্ করে। ইহা কোন্ দেশী আমোদ বুঝা কঠিন! ইহারা জানেও না, কাহার ক্ষতি করিতেছে। নানা উপায়ে তোমাদের নিকট হইতেই টাকা লইয়া সেই ক্ষতি তাহারা পূরণ করিবে। কোম্পানীর নিজের তহবিল বলিয়া কিছু নাই। এই বোধ তাহাদের কে দিবে?

বন্দর-সমস্যা

কলিকাতা বন্দরে মাল খালাসের সমস্যা প্রায়ই শুনা যাইতেছে। কর্তৃপক্ষ বন্দর-শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সমস্যা এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে বন্দরে জাহাজের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে, ভারী ও বড় জাহাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মাল-খালাস ও বোঝাইয়ের জন্য বন্দরে 'বার্থে'র সংখ্যা বাড়ানো হয় নাই। খাদ্য জাহাজের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও বন্দরে সেই হারে খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার জন্য ভূগর্ভস্থ শস্য-ভাণ্ডার আজও নির্ম্মাণ করা হয় নাই। হুগলী নদীর জল-প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় নদীমুখ হইতে বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে আজকাল জোয়ারের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় নয় কোটি ঘন ফুট পলিমাটি নদীগর্ভে জমা পড়ে। এজন্য নদীর নাব্যতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত খরচ বাড়িতেছে, অথচ জাহাজগুলিও নদীমুখে আটক পড়িতেছে। কলিকাতা বন্দরের ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া হুগলীর জল প্রবাহ বাড়াইবার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাব কার্য্যকর হইলে বন্দরে ভিড়িবার জন্য জাহাজগুলিকে আর জোয়ারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু কলিকাতা বন্দরের স্বার্থে ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার পরও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় যদিও বা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, নক্‌সা ও বাঁধের স্থান বদলের ফলে ১৯৭০ সনেও সেই কাজ শেষ হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় কলিকাতা বন্দরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই খরচ করেন নাই। যে সময়ে কাণ্ডলা, কোচিন, ভিজাগাপত্তম, পারাদীপ, ম্যাঙ্গালোর, বেরাওয়াল প্রভৃতি বন্দরের জন্য টাকা খরচ করা হইয়াছে, সে-সময়ে কলিকাতা বন্দরকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা সত্যই রহস্যজনক।

ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার উইলিয়ম ভিসেণ্ট বলিয়াছেন যে, আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গবর্ণমেণ্টের মত হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট শ্রীহট্ট জেলা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের ইচ্ছাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য; তাহাদের অধিকাংশ যাহা চাহিবেন, তাহাই করা উচিত। আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গবর্ণমেণ্ট নিজেদের এলাকা, লোকসংখ্যা ও আয়ের হ্রাসে সম্মত না হইতেও পারেন।

যাহারা এক ভাষা বলে, তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড এক দেশ বা এক প্রদেশভুক্ত এবং এক শাসক বা শাসক পরিষদের অধীন হওয়াই স্বাভাবিক ও ন্যায্য। কিন্তু অন্য দিকেও কিছু বলিবার ও বিবেচনা করিবার আছে। এক একটি দেশ বা প্রদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য কিছু অবশ্যম্ভাবী খরচ আছে। কোন ভাষাভাষীদের সংখ্যা দেশ বিশেষে এত কম হইতে পারে, যে, তাহারা নিজে এই সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইতে পারে। বেলজিয়মের ৩২ লক্ষ লোক ফ্লেমিষ্ ভাষা বলে, ২৮ লক্ষ লোক ফরাস্ ভাষা বলে, পৌনে নয় লক্ষ ফ্লেমিষ্ ও ফরাস দুই বলে। কিন্তু বেলজিয়মকে দুটি দেশে ভাগ করা সুবিধাজনক নহে। সুইজারল্যাণ্ডের ১৫টি জেলার ভাষা জার্মান, ৬টির ফরাস, ১টির রুমান্স্, এবং ২টির ইতালীয়। কিন্তু তা বলিয়া ৩৯ লক্ষ লোকের বাসভূমি এই ক্ষুদ্র দেশটিকে ৪টি দেশে ভাগ করা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা একই দেশে বা প্রদেশে বাস করিলে তাহার বহু অসুবিধা আছে, কিন্তু সুবিধাও কিছু আছে। কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা কম হইলে, যে শাসন ব্যয় তাহাদের পক্ষে একা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য, তাহা অন্য ভাষাভাষীদের সহিত মিলিয়া তাহারা অনায়াসে বহন করিতে পারে। কোন ভাষাভাষী একাই একটি প্রদেশে বাস করিলে একপ্রকার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা জন্মে, যাহা একাধিক ভাষাভাষীরা একত্রে বাস করিলে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু কোন ভাষাভাষী লোকেরা যদি সংখ্যায় অধিকতর অন্য ভাষাভাষীদের সহিত এক প্রদেশভুক্ত হইয়া থাকিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের প্রতি অবিচার হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। ওড়িয়ারা বিহার, মাদ্রাজ, ও বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া আছে, কোথাও তাহাদের প্রাধান্য নাই, এবং তাহাদের শিক্ষা, রাজকার্য্য প্রাপ্তির সুবিধা, প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি সুবিচার হয় না। এই জন্য একটি স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হওয়া ভাল। তাহাদের মোট সংখ্যা এক কোটির উপর। তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের আয়তন লোকসংখ্যার অনুপাতে বৃহৎ, সুতরাং অধিবাসী আরও বাড়িতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও তাহারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

অন্ধ্র দেশের লোকদিগেরও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সুবিধা দেওয়া উচিত। ইহাদের ভাষা তেলুগু। মাদ্রাজ প্রদেশভুক্ত অন্ধ্রদের সংখ্যা দেড় কোটির উপর।

যে যে স্থলে নূতন প্রদেশ ও গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে না, তথায় ত এক ভাষাভাষীদিগকে একই প্রদেশভুক্ত করা নিশ্চয়ই উচিত। বাঙালীর জন্য নূতন করিয়া প্রদেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে না। পুরুষানুক্রমে বঙ্গভাষীর অধ্যুষিত যে সব ভূখণ্ড পূর্ব্বে শাসনকার্য্যের জন্যও বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিছু কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে বাংলার সহিত আবার জুড়িয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ৩২ লক্ষ বাঙালীকে আসামের এবং প্রায় ২২ লক্ষ বাঙালীকে বিহারের এলাকার অধীন করিয়া রাখা উচিত নয়, তাহাদের বাসভূমিকে আবার বাংলা দেশের সামিল করিলে নূতন করিয়া কোন একটা গবর্ণমেণ্ট গড়িতে হইবে না।

(প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৮, পৃঃ ১৩৩)

বাধ্যতা ও স্বাধীন চিন্তা

অবাধ্যতা ভাল নয়, বাধ্যতা ভাল; আজ্ঞানুবর্ত্তীদিগকে (তাহারা বয়সে বালক, যুবক বা প্রৌঢ়ই হউক) শাসনে রাখা উচিত, প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়; এইরূপ নীতি-বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলে হউক বুড়ো হউক, মানুষকে যদি সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, বিশেষ কোন আদেশ পালন করিতে হয়, তাহা হইলে সে নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া নিজে দায় ঝুঁকি লইয়া কাজ করিতে শিখিবে কখন? বিদেশীরা আমাদের চরিত্রে একটা প্রধান খুঁৎ এই ধরে যে আমরা বেশ ভাল অনুচর, কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আমাদের নাই। অর্থাৎ নিজে পথ আবিষ্কার ও উপায় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা আমাদের নাই; আপনার পথে আপনি চলিবার এবং অপরকে চালাইবার সাহস ও শক্তি আমাদের নাই; নেতৃত্বের দায় ঝুঁকি লইবার মত নির্ভীকতা ও মনের বল আমাদের নাই। ইহা যে কতকটা সত্য তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার জন্য কি আমরাই দোষী? আমাদের পারিবারিক প্রথা, আমাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী যদি আমাদিগকে শৈশব হইতে কেবল নিয়মানুগত্য, আদেশ পালন, গতানুগতিকতা, আইনমানা, ইহাই শিখায়, নিজের স্বাতন্ত্র্যবিকাশের এবং নেতৃজনোচিত যোগ্যতা অর্জ্জন ও বর্দ্ধনের কোন সুযোগ না দেয়, তাহা হইলে আমরা এক এক জন (readymade) তৈরী নেতা হইয়া আকাশ হইতে পড়িব, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। "তবে কি তুমি চাও যে মানুষ শৈশবে মা বাপ গুরুজনকে মানিবে না, বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষক অধ্যাপকের কথা শুনিবে না, সামাজিক সব বিধিব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবে, আইনকানুন কিছুই মানিবে না?" না। আমি বলি, বিধিব্যবস্থার, আদেশের, হুকুমের এবং নিয়মের সংখ্যা ও প্রয়োগক্ষেত্র কমাও, আইনের সংখ্যা ও মানবজীবনের উপর প্রভুত্ব কমাও। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষকে অনুভব করিতে দাও, যে, বিধিনিষেধের, হুকুম-নিয়মের এবং আইনকানুনের বাহিরে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের জন্য বৃহৎ সীমাহীন ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে সে নিজে প্রভু, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইচ্ছাই নিয়ম। তাহা হইলে বলিষ্ঠ, দৃঢ়, সাহসী, নেতৃত্বের যোগ্য মানুষ পাওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব বাড়াইবার অন্য উপায় নাই। এই উপায়ে, অনেকে বিপথে যাইবে, এরূপ আশঙ্কা আছে; কিন্তু তথাপি ইহাই উপায়; দ্বিতীয় উপায় কোন দেশে কখনো ছিল না, এখনও নাই। ভুল না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। খুঁটি-নাটি প্রত্যেক বিষয়ে পরের গড়া-বিধিব্যবস্থার আনুগত্য "গো-বেচারী" বা "ভালমানুষ" গড়িবার পক্ষে ভাল; কিন্তু মনুষ্যের গণনায় আসে, এমন মানুষ ওরূপ উপায়ে তৈরী হয় না।

বিদেশীরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও একটা কথা বলেন যে আমরা নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্কার করিতে পারি না। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহারও কারণ উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, সকল বিষয়েই আমাদের জন্য "দাগা বুলাইবার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষা-প্রণালীতে ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে দাগা-বুলান ছাড়িয়া কিছু গবেষণার সুযোগ দিবা-মাত্রই সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এরূপ যে এখানে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" এরণ্ডকে অতিক্রম করিয়া আমাদের শালগাছ হইবার যো বেশী আছে কি? শুনিয়াছি অশ্বিনী-কুমার দত্তের নির্ব্বাসনের অন্যতম কারণ এই ছিল যে বরিশালে তাঁহার প্রভাব ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ে বেশী হইয়াছিল।

(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১, পৃঃ ৬)

॥ উপন্যাস ॥

আলোর প্রহর

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অফিসের চৌকাঠে পা দিয়েই বাসবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঠিক ঢোকবার মুখেই গোল মসৃণ একটা টেবিল। সেটা ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। অন্য দিন চেয়ারগুলো খালিই থাকে। অন্তত সকালের দিকে। আজ প্রতিটি চেয়ারে একটি ক'রে লোক ব'সে।

পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েই বাসবী বাধা পেল।

একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'টি হাতজোড় করে।

নমস্কার।

প্রতি-নমস্কার ক'রে বাসবী এগিয়ে গেল নিজের চেয়ারের দিকে।

কালকের দেখা মানুষটি আজ সংস্কৃত, পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। দু'চোখে হতাশার আভার পরিবর্তে আশার দ্যুতি। নুয়ে-পড়া মেরুদণ্ড অনেকটা সোজা হয়েছে, কথাবার্তায় অনেক সপ্রতিভ।

নিজের চেয়ারে ব'সে পড়ে বাসবী ভাবতে সুরু করল। গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা। গত রাত্রে দেখা স্বপ্নের টুকরোর মত সব কিছু যেন অস্পষ্ট, ম্লান, দুর্বোধ্য।

অফিস থেকে বের হবার মুখেই লোকটি এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে দরখাস্ত। সেই দরখাস্তটা সবল হাতে আঁকড়ে ধরে বলেছিল, একটা চাকরি দেবেন। সমস্ত সংসার আমার ওপর হেলান দিয়ে আছে। চাকরির আমার অত্যন্ত দরকার।

বাসবী চমকে উঠেছিল।

তার চমকে ওঠবারই কথা।

সে নিজে এ অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী। এখনও তার চাকরির খুঁটি নরম কাদার মধ্যে। পায়ের তলায় শক্ত মাটির আভাস জাগে নি। তার কাছে কেউ চাকরির আবেদন নিয়ে আসতে পারে, এটা বিশ্বাসের অযোগ্য।

অবশ্য লোকটি কেন তার সামনে এসে নিবেদনের হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল, সেটা বুঝতে বাসবীর অসুবিধা হয় নি। কয়েকদিন ধরে সে নিশ্চয় বাসবীকে মোটর থেকে নামতে দেখেছে। ম্যানেজার অনিমেষ রায়ের মোটর। ভেবেছে বাসবী এ অফিসের হোমরা চোমরা কেউ।

এত দুঃখেও বাসবীর হাসি পেল। মানুষ কত সহজেই না ভুল করে। বিশেষ করে পুরুষ মানুষ। বাইরের চাকচিক্য, আচার-আচরণে এত দ্রুত বোধ হয় মেয়েদের ভোলানো যায় না। তারা সব কিছুর তলিয়ে বিচার করে।

কিন্তু তবু বাসবী ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করেছে। লোকটির আবেদন-পত্রটি নিজে হাতে করে এনে ম্যানেজারের হাতে তুলে দিয়েছে।

একটা অজ্ঞাত, অপরিচিত লোকের জন্য বাসবী এত মেহনত কেন করেছে?

তার উত্তরও বাসবী খুঁজেছে। নিজের মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে তন্ন তন্ন করে।

একদিন বাসবীও ঠিক এমনই ভাবে ম্যানেজারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আবেদনপত্র হাতে নিয়ে। এমনি সুরেই বলেছিল, চাকরির তার প্রয়োজন। চাকরি না পেলে একটা সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অনেকগুলো প্রাণের দীপ্তি নিভে ছাই হয়ে যাবে।

দীপক গুপ্তর কথার মধ্যে বাসবী বুঝি নিজের কথার প্রতিধ্বনিই শুনতে পেয়েছিল। রিক্ত আবেদন নয়, বলিষ্ঠ প্রার্থনা।

এভাবে একটা মানুষ, একটা সংসার তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সামান্য একটু দাক্ষিণ্য, কয়েকটা মুদ্রার অভাবে, এ বিধাতার কেমন বিধান। যাদের সঙ্গতি আছে তারা দৃষ্টিপাত করবে না এদিকে।

বসে বসেই বাসবী দেখল, দীপক কয়েকবার এদিকে চোখ ফেরাল। হয়ত তার আশাভঙ্গ হ'ল। ভেবেছিল বাসবী নিশ্চয় কাঁচঘেরা কোন কামরার মধ্যে বসে, বিরাট্ টেবিল সামনে নিয়ে। তার সান্নিধ্যে যেতে হ'লে বেয়ারার মারফৎ স্লিপ পাঠাতে হয়। মিনিটের পর মিনিট সাগ্রহ প্রতীক্ষা করতে হয়।

তা নয়, এমন বারোয়ারি ব্যবস্থা!

সকলের সঙ্গে প্রায় অঙ্গে অঙ্গ লাগিয়ে এমন বে-আব্রু

অবস্থায় বসে বাসবী সেন। এক মাপের টেবিল মানেই প্রায় এক মাপের চাকরি।

বাসবীর সুপারিশের ওজনটাও বোধ হয় দীপক মনে মনে যাচাই করছে। ভাবছে, কাজ হবে কি না ঈশ্বর জানেন।

ব্যস্ত আছেন নাকি মিস সেন?

বাসবী একটু অন্যমনস্ক ছিল। একেবারে পাশে গম্ভীর গলার শব্দে একটু চমকে উঠল।

বাসববাবু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ব্যাপার, ম্যানেজারের দরজায় অত বালখিল্যের ভিড় যে?

বাসববাবুর কথার ধরনই এই রকম। নাটকীয় ভঙ্গি। পৃথিবীটা যে একটা বিরাট্ রঙ্গমঞ্চ, এটা ভদ্রলোক মনেপ্রাণে ঠিক করে নিয়েছে। সারা পৃথিবী রঙ্গমঞ্চ, তবে নায়ক ওই একজন। বাসববাবু। এটা তার সুচিন্তিত ধারণা।

আজকে ইণ্টারভ্যু আছে। জন-দুয়েক লোক নেওয়া হবে।

অফিসে?

না, বাইরের জন্য। যেখানে যেখানে অফিসের কাজ হয়, সেই সব তদারক করবার জন্য লোকের প্রয়োজন।

আমি ত কিছুই জানি না। আগে জানতে পারলে ভাইটাকে ভিড়িয়ে দিতাম। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছে। আপনি ত রয়েইছেন, ম্যানেজারকে একটু না হয় বলে দিতেন।

আশ্চর্য, সারা অফিসের লোকের ধারণা বাসবী সেনের সঙ্গে অনিমেষ রায়ের সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ যে, বাসবীর কোন কথা অনিমেষ ঠেলতে পারে না। দু'জনের মধ্যে বুঝি অলিখিত এক চুক্তি আছে, পরস্পর পরস্পরের কথা রাখবে।

প্রথম প্রথম এ ধরনের কথা শুনলে বাসবী বিচলিত হ'ত। ভাবত, তীব্র প্রতিবাদ করবে। একি অন্যায় কথা! আজকাল চুপচাপ থাকে। জানে এ জাতীয় কথায় উত্তেজিত হওয়া অর্থহীন। বরং পরোক্ষে এসব কথাবার্তা উপকারই করে। অফিসে স্বতন্ত্র এক মর্যাদা দেয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে, এসব কথা, এত সব কথা বাসবী ভাবছে না। আর একটা কথা তার মনে পড়েছে। নিজের সংসারের ভয়াবহ এক ছবি।

ছোট সংসার। মা, বোন রুবি আর ভাই খোকন রোজগার করার হাত শুধু একটি। সে হাত বাসবীর।

মুখে রক্তওঠা মরণাপন্ন এক মানুষের অন্তিম কাকুতি। যেমন করে হোক এ সংসার বাঁচাতে হবে। মৃত্যুপথযাত্রীর নিস্তেজ হাতে ক্ষণেকের জন্য যেন অমিত শক্তি এসেছিল। বাসবীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে স্খলিত, দুর্বল কণ্ঠ থেকে সে স্বর যেন দৈববাণীর প্রতীক।

কথা দে বাসী, এদের তুই দেখবি। আমি পারলাম না, মা, তুই এদের বাঁচাস।

কি করে, কোন শক্তিবলে, এ কথা বাসবী জিজ্ঞাসা করে নি। সে প্রশ্ন নিরর্থক। শুধু সেই স্পন্দমান হাতের ওপর লুটিয়ে পড়ে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলেছিল, তুমি নিশ্চিন্ত হও বাবা। আমি এদের দেখব। যেমন করে পারি দেখব। আমার যদি একমুঠো জোটে, এদেরও জুটবে।

বাসবীর বাবা হয়ত নিশ্চিন্ত হয়েই চোখ বুজেছিলেন। চারপাশে ঘিরে বসে-থাকা মানুষদের দেখবার জন্য আর চোখ খোলেন নি।

সব শেষ হ'তে বাসবীর খেয়াল হয়েছিল।

সংসারের অবস্থা সঙ্কটকালে কর্ণের রথের চেয়েও নিদারুণ।

মেদিনী রথচক্র অর্ধেক গ্রাস করেছে। নিদানকালে রথী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের নাম সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

তারপর বাসবীর অভিযান সুরু হয়েছিল। দরখাস্ত টাইপ করিয়ে, সার্টিফিকেটের নকল নিয়ে অফিসে অফিসে ধর্ণা।

এখনও সংসারের টলমল অবস্থা। মাসান্তে যে ক'টি রজতমুদ্রা বাসবীর হাতে আসে, দুঃখমোচনের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। তবু অর্ধাশন অনশনের চেয়ে অনেক ভাল। মনকে বাসবী এইটুকুই বুঝিয়েছে।

'কিন্তু এমন অবস্থা কি কোনদিন হবে?'

খোকন বড় হয়ে, লেখাপড়া শিখে এদেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াবে। দিনের পর দিন অকৃতকার্য হয়ে গৃহের বিবরে মুখ লুকাবে! আর বাসবী তাকে একদিন অন্নের খোঁটা দেবে, যেমন বাসববাবু তার ভাইকে দিচ্ছে। বলবে, বসে বসে কেবল অন্ন ধ্বংস করছ।

একটা মানুষের ওপর নির্ভর করে কতদিন চালাবে বলতে পার!

কিছু বলা যায় না। স্মরণমাত্র আজ শিউরে উঠলেও বাসবী হয়ত একদিন এমনই রুক্ষ কর্কশ এক নারীতে রূপান্তরিত হবে। ভবিষ্যত তাকে চেঁচে ছুলে, কালের বাটালী দিয়ে কুঁদে কুঁদে কি মূর্তিতে পরিণত করবে, তা কেউ বলতে পারে না।

বাসবী ত নয়ই।

স্কুল-কলেজে পড়বার সময় বাসবী কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল এভাবে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রামে-বাসে দৌড়ঝাঁপ করে জীবিকা অর্জন করতে হবে। লেখাপড়া শিখেছিল নিশ্চিন্ত গৃহস্থালীর আশায়। পরিপাটি গৃহ আর পরিচ্ছন্ন মানুষ। কুমারী জীবনের দিগন্ত কোণে যে কামনার স্বর্ণাভাটুকু ছিল, সে কামনা এত দ্রুততালের জীবনকে ঘিরে নয়।

সামনে মাসের পনেরোই তারিখে ফ্রি থাকবার চেষ্টা করবেন।

সামনের মাসের পনেরোই। কেন, কি হবে সেদিন?

থামে আটকানো ক্যালেণ্ডারের দিকে মুখ তুলে দেখতে গিয়েই চোখাচোখি হ'ল।

দীপক একদৃষ্টে এদিকেই চেয়ে রয়েছে।

আশপাশের চেয়ার খালি। দীপক একলা। তার মানে আর সকলের ইন্টারভ্যু হয়ে গেছে। শুধু দীপক বাকি।

দীপকের চোখের দৃষ্টিতে অসহায় অবসাদ, ক্লান্তি আর হতাশা। অপেক্ষা করে করে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

দীপককে নেবে বলেই বোধ হয় অনিমেষ শেষকালে ডাকবে। অন্য সকলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে দীপকের সঙ্গেই পাকা কথা বলবে।

নিজের দৃষ্টিতে বাসবী অভয়বাণী ফোটাল। ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। সে দৃষ্টির অর্থ দীপক বুঝল কি না কে জানে। সে চোখ নামাল।

ওই তারিখে বোর্ডে আমাদের প্লে। ঠিক সময়ে আপনাকে কার্ড দিয়ে যাব।

বাসববাবুর কথাগুলো খুব অস্পষ্ট, খুব দূরাগত বলে যেন মনে হ'ল। সবটুকু যেন বাসবীর কানেও গেল না।

বাসববাবু সরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

প্রায় এগারটা বাজে, অথচ বাসবী এখনও কাজই আরম্ভ করে নি। একটি ফাইলের পাতাও খোলে নি। আবোল-তাবোল চিন্তায় এতটা সময় নষ্ট করেছে।

নিশিবাবু চেয়ারে নেই। নিশিকান্ত সরকার। এ সেকশনের বড়বাবু। বোধ হয় সে ম্যানেজারের কামরায় রয়েছে। দরকারী কাগজপত্র এগিয়ে দিচ্ছে অনিমেষ রায়কে। আবেদনকারীদের দরখাস্তগুলো একটার পর একটা সামনে ধরছে। যে অপছন্দ হচ্ছে, তার দরখাস্তের ওপর ঢেঁড়া দিয়ে সরিয়ে রাখছে। কাজটা যেন চিত্রগুপ্তর সমগোত্রীয়।

বাসবী মনে মনে ভাবল, এ কাজের জন্য অনিমেষ তাকে ডাকলেই পারত। সে বসে স্পন্দিত হৃদয়ের দ্রুত উত্তেজনা নিরীক্ষণ করত, বিশেষ করে দীপক গুপ্তর।

সামনে রাখা ফাইলটা টেনে নিয়ে বাসবী কাজে মন দিল। এখনও একটাও চিঠি তার টেবিলে এসে পৌছায় নি। চিঠিপত্র সব স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে ম্যানেজারের টেবিলে। চিঠি খুলে, ছাপ দিয়ে তবে সেগুলো বাসবীর কাছে আসবে। বাসবী একটা একটা করে পড়ে নিয়ে বড় খাতায় সংক্ষিপ্তসার লিখবে।

আজ সে অন্য কাজ আরম্ভ করল। ফাইল খুলে কোটেশনগুলো আলাদা কাগজে লিখল। চুক্তির মর্মার্থ লিপিবদ্ধ করল। একটা ফার্মকে একটা চিঠির খসড়াও লিখে ফেলল।

কিন্তু মন বসল না। ঘুরে ঘুরে চোখ আবার ম্যানেজারের ঘরের সামনে গেল।

দীপক গুপ্ত নেই। চেয়ার খালি। খুব সম্ভব সে ম্যানেজারের কামরার মধ্যে।

বাসবীর খুব ইচ্ছা হ'ল কোন একটা কাজের ছুতো করে সে অনিমেষের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হ'লে ম্যানেজারের কামরার দরজায় গিয়ে কান পাতবে। ভিতরে কি কথা হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করবে। শুনবে অনিমেষ রায় তার প্রতিশ্রুতি পালন করে কি না।

চিন্তায় ছেদ পড়ল। ম্যানেজারের দরজা খুলে গেল। বেয়ারা এক রাশ চিঠিপত্র নিয়ে বাসবীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

সায়েব বললেন, দেরি হয়ে গেছে, এই চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি ফেরত দেবেন।

চিঠির স্তূপ। বাসবী আর মাথা তুলতে পারল না। কাজের সমুদ্রে ডুবে গেল।

এরপর যখন মাথা তুলল তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। চিঠিপত্রগুলো বেয়ারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। মর্মার্থ লেখা মোটা খাতাটাও।

গোটা তিনেক ফাইলের কাজ শেষ করে বাসবী নিশিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ইন্টারভ্যু হয়ে গেল ?

নিশিবাবু অনেকগুলো ফাইল নিয়ে কসরত করছিল। মুখ তুলে বলল, শেষ হয় নি। লাঞ্চের পর আবার নেওয়া হবে।

কি মনে হচ্ছে আপনার ? কার বরাত খুলবে ?

দুটো হাত উল্টে নিশিবাবু মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করল. আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের বিষয়ে আমাদের কি প্রয়োজন বলুন। যাকে যাকে নেবার কর্তারা ঠিক করেই রাখেন, মিছামিছি কতকগুলো ভদ্র সন্তানদের নাজেহাল করা।

বাসবী দ্বিধায় পড়ল। কি জানি নিশিবাবু অফিসের পুরোণো লোক। ম্যানেজারের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তবে কি অনিমেষ রায় তাকে স্তোকবাক্যই দিল ?

তা যদি দিয়ে থাকে, তা হ'লে কি অবস্থা হবে দীপকের ? দীপক যদি বাসবীর সামনে এসে দাঁড়ায়, ছল ছল অসহায় দৃষ্টি মেলে, তা হলে তাকে কি বলবে বাসবী ?

শুধু দীপককেই নয়, একটা গোটা সংসারের সঙ্গে ছলনার অভিনয় করার জন্য বাসবী দায়ী হবে।

প্রতাপগড়ের ফাইলটা দিন ত।

নিশিবাবুর গলা।

বাসবী নিজের চেয়ারে ফিরে এল। খুঁজে খুঁজে প্রতাপগড়ের ফাইলটা বের করে সামনে দাঁড়ানো বেয়ারার হাতে দিল। নিশিবাবুর টেবিলে পৌছে দেবার জন্য।

টিফিনের এখনও দেরি আছে। তবু বাসবী উঠে পড়ল।

প্রথম প্রথম অফিসের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে বাসবীর অস্বস্তি লাগত। মনে হ'ত গোটা অফিস যেন ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দু-একজন চেয়ে থাকলেও কিছু মনে হয় না।

একেবারে কোণের দিকে কৃষ্ণা পালিতের ঘর। পার্টিশন ঘেরা।

বাসবী বাইরে থেকে উঁকি দিল।

কৃষ্ণা চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছে।

বেশ আছ, বসে বসে নভেল পড়া হচ্ছে আর আমরা খেটে খেটে মলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে বাসবী ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বইটা মুড়ে কৃষ্ণা হাসল।

খুব সময়ে এসে পড়েছ বাসবী। নায়ক আর নায়িকাতে ভীষণ ঝগড়া সুরু হয়েছে। একটু পরেই বোধ হয় দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত, তুমি এসে পড়ে সেই বিচ্ছেদটা বাঁচালে।

বাসবীও হাসল, মা ভৈঃ, বাংলা দেশের লেখকরা কঠোর কিছু করতে সাহস করবে না। মোলায়েম একটা ঝগড়ার পরে ঠিক ভাব করিয়ে দেবে দু'জনে। শেষ দিকে নায়ক-নায়িকায় ছাড়াছাড়ি হওয়াটা যে পাঠক সাধারণ বিশেষ করে পাঠিকা সমাজের পছন্দ নয়, তা বুদ্ধিমান বাঙালী লেখক ভাল করেই জানে। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক, শেষ লাইনে আছে, অতঃপর দু'জনে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

দু'জনেই হেসে উঠল। অবশ্য উচ্চরোলে'নয়। পার্টিশনের পরিধি পার হয়ে হাসির শব্দ বাইরে যাক, এটা দু'জনের কারও কাম্য নয়।

কৃষ্ণাই কথা বলল।

আজ ম্যানেজার সায়েব ইণ্টারভ্যু নিয়ে খুব ব্যস্ত, কাজেই টেলিফোন লাইন বিশেষ দিতে হয় নি। বাইরে থেকেও আজ বেশী কল আসে নি, তাই বসে বসে সাহিত্য-চর্চা করছিলাম।

বাসবী উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। বোর্ডে আলো জলে উঠল। কৃষ্ণা হাতের বই সরিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিনিট পাঁচেক। বাসবী বুঝতে পারল কৃষ্ণা ট্যাপ করে কথাগুলো শুনছে। শুনতে শুনতেই তার দুটো ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল ঠোঁটের দু'টি পাশ। চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক।

উঠতে গিয়েও বাসবী উঠতে পারল না।

ফোন শেষ হ'তে কৃষ্ণা ফিরে বসল। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট রুমাল বের করে গাল, কপাল মুছে নিল। কথা-গুলো শুনতে শুনতেও যেন সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বাসবীর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, বেলাদেবী।

এ নাম বাসবীর কাছে নতুন নয়। মানুষটাও অপরিচিত নয়। নামটা কানে গেলেই তিক্ত আস্বাদে সারা মন বিষাক্ত হয়ে যায়।

ম্যানেজার অনিমেষ রায়ের ভূতপূর্ব স্ত্রী কথাটা মনে হ'তেই বাসবীর হাসি এল। স্ত্রী বলতেই চোখের সামনে চন্দনচর্চিত, ব্রীড়াবনতা এক রূপ ভেসে ওঠে। পূত হোমাগ্নির পটভূমিকায়। বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি হৃদয়ের কাছে আসার লগ্ন।

কিন্তু বেলাদেবী সব কিছু বন্ধন অস্বীকার করে, ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। শুধু বেরিয়ে আসাই নয়, পবিত্র সম্বন্ধকে কলুষিত করে তুলেছে। অনিমেষ রায়ের জীবন অতিষ্ঠ।

অনিমেষ রায়কে মহিলা সাত দিন সময় দিয়েছেন।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলল।

কিসের সময়?

বাকি টাকা দেবার।

টাকা।

আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, মুস্কিলে পড়ব। তারের মাধ্যমে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেটুকু তোমাকে জানালাম।

ম্যানেজার কি বললেন? বাসবী প্রশ্ন করল।

বললেন, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ক'রো না। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে এক্সচেঞ্জের লম্বা টেবিলের এককোণে বসেছিল!

ক্রমেই স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে। প্রেম, দয়া, মমতা সব মিথ্যা, সব সাময়িক। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সব কিছু অনুভূতির দাম যাচাই হয় অর্থের মাপকাঠিতে। কে বলতে পারে একদিন প্রেমের প্রত্যুষে অনিমেষ আর বেলা চিরদিন পাশাপাশি চলার প্রতিশ্রুতিই হয়ত গ্রহণ করেছিল। হৃদয়ের উত্তাপে সব কিছু কবোষ্ণ রাখার প্রতিজ্ঞা। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি সে স্বপ্ন, সে উত্তাপ দিগন্তে ধূসর হ'য়ে গেল।

নিজের চেয়ারের কাছাকাছি এসেই বাসবী গতি মৃদু করল।

তার টেবিলের কাছে দীপক দাঁড়িয়ে।

বাসবীর ইচ্ছা হ'ল আবার ফিরে যাবে কৃষ্ণার কাছে। তার নিভৃত কোটরে। তা হ'লে আর দীপকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

হয়ত বাসবীর কথার ওপর নির্ভর করে দীপকের মুমূর্ষু সংসার জেগে উঠেছিল। নতুন আশ্বাসে, নতুন মন্ত্রে সঞ্জীবিত হবার স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু বাসবীর কি দোষ! অনিমেষ রায়ের অনৃত ভাষণকে বিশ্বাস না করে তার আর কি উপায় ছিল।

এক জায়গায় স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এক সময়ে বাসবী দীপকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

দীপক এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে দেহভার ছেড়ে দিল।

নোটিশ বোর্ডে নাম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'জনের নাম। আমার আর, আর একটি ভদ্রলোকের। মিহির ঘোষাল।

কিছুক্ষণ বাসবীর কানে কোন কথা গেল না। একটানা ভ্রমরগুঞ্জন। সব শব্দ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তা হ'লে, অনিমেষ রায় কথা রেখেছে। এতক্ষণ তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করেছিল। স্তোকবাক্য দিয়ে অনিমেষ বাসবীকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে নি।

আমি শুনে খুব খুশী হ'লাম।

বাসবী আস্তে আস্তে বলল।

আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না মিস সেন।

বাসবীর পদবীটাও দীপক জেনেছে। সম্ভবত অফিসে কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে।

এ উচ্ছ্বাসের বাসবী কোন উত্তর দিল না। অন্য কথা পাড়ল।

আপনাকে কবে থেকে জয়েন করতে হবে?

সামনের মাসের পয়লা। মানে আর দিন পনেরো আছে। আমাকে মাসখানেক এ অফিসে থাকতে হবে, তারপর প্রতাপগড় চলে যাব।

দীপক যেন খুশীতে ঝলমল করে উঠল।

এরপর কি বলা যেতে পারে বাসবী বসে বসে ভাবতে লাগল। ইতিমধ্যে অফিসের অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিকে দেখছে। দীপকের চাকরি হবার মূলে যে বাসবী এ-কথা অফিসের আর কারও অজানা রইল না। হয়ত এর জন্য অনেক চাপা হাসি, বাঁকা কথা বাসবীকে সহ্য করতে হবে।

বাসবীর নিজের চাকরির বয়স এ অফিসে মাস ছয়েকের কিছু বেশী, এর মধ্যেই সে আর একজনকে চাকরি দেবার ক্ষমতা কি করে অর্জন করল সেটাই বিবেচনার বিষয়।

ম্যানেজারের সঙ্গে কতখানি অন্তরঙ্গতা থাকলে তবে এই প্রায়-অবিশ্বাস্য ঘটনা সম্ভব সেটাও আলোচনা করতে সহকর্মীরা ভুলবে না।

দীপকই এ অবস্থা থেকে বাসবীকে উদ্ধার করল। অন্তত সাময়িক।

আজ আমি উঠি। বাড়ীতে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।

দীপক উঠে দাঁড়াল। বোধ হয় আশা করেছিল বাসবী কিছু বলবে। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাসবী কিছু বলল না দেখে, আস্তে আস্তে সরে গেল।

ভাগ্য ভাল বাসবীর। দেড়টা বাজে। অফিসের সবাই যে যার চেয়ার ছেড়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। টিফিন করতে। এই মুহূর্তে তাকে কোন কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে না।

অফিসের মধ্যে শুধু নিশিবাবু বসে দ্রুত-হাতে কি লিখছে। বোধ হয় জরুরী কোন কাজের ভার পড়েছে। কাজটা শেষ করে তবে উঠবে।

পার্টিশনের পিছনে কৃষ্ণা। সে অফিসেই টিফিন করে। বাইরে বেরোয় না।

নিজের টিফিনের প্যাকেটটা নিয়ে কৃষ্ণার কাছে যাবার মুখেই বাধা।

বেয়ারা এসে দাড়িয়েছে।

দিদিমণি, ম্যানেজার সায়েব সেলাম দিয়েছেন।

বাসবী অনিমেষের ঘরের দিকে চোখ ফেরাল। পুরোদমে পাখা ঘুরছে। তার মানে ম্যানেজার বেরোয় নি।

বাসবী গিয়ে দাঁড়াতেই অনিমেষ হাসল।

আপনার আত্মার আত্মীয়টিকেই নিলাম।

প্রথমে বাসবী কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারে নানা ভাবনায় একটু অন্যমনস্ক ছিল।

আমার—

বাসবী কথা শেষ করার আগেই অনিমেষ সশব্দে হে উঠল।

বা, আপনিই ত বলেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বাসবীর মনে পড়ে গেল।

দীপকের দরখাস্তটা দেবার সময় অনিমেষ জিজ্ঞা করেছিল আবেদনকারীর সঙ্গে বাসবীর কোন সম্পর্ক আ কি না? বাসবী হেসে বলেছিল, আত্মার আত্মীয়।

ঠিকই বলেছিল। অফিস এলাকায় এ ভাবে ভিক্ষা ঝুলি হাতে নিয়ে যে-সব শিক্ষিত বেকারের দল ঘুরে বেড়া তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একটা আছে বৈ কি। কিছুদি আগে বাসবী ত এদের দলেরই একজন ছিল। দু' চোখে প্রত্যাশার বহ্নি, অন্তরে বুভুক্ষা, সারা শরীরে ক্লান্তি আ অবসাদ নিয়ে এক অফিস থেকে আর এক অফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। দয়ার মুষ্টিভিক্ষার আশায়। কোন একটা অফিসে একটা আসন আর মাসান্তে একটা আর্থিক প্রতিশ্রুতি। এই দু'টির মধ্যে জীবনের মাকু সীমিত।

ঠিক এই প্রত্যাশার ছাপ বাসবী দীপকের মধ্যেও দেখেছিল। তাই হাত পেতে দরখাস্ত নিয়েছিল তার কাছ থেকে। তার জন্য ম্যানেজারের কাছে সুপারিশ করেছিল।

চেয়ারের দিকে হাতটা প্রসারিত করে অনিমেষ বলল, বসুন।

বাসবী বসল।

বসবার আগে একবার ভেবেছিল বলবে যে এখনও তার টিফিন করা হয় নি। সাত-সকালে দু'টি মুখে দিয়ে ছুটে এসেছে, এতক্ষণে পেটের মধ্যে মোচড় দিতে সুরু করেছে। দাবানলের জ্বালা। কিছু আহুতি না দিলে সুস্থির হ'তে পারবে না।

কিন্তু বাসবী কিছু বলল না। বলা যায় না, এখনই

হয়ত অনিমেষ বলে বসবে, আমারও লাঞ্চ হয় নি, চলুন বাইরে কোথাও লাঞ্চ করে আসি।

দীপক গুপ্তর এ্যাকাডেমিক কেরিয়ার খুব ভাল। বরাবরই ভাল রেজাল্ট করেছে। এম. এ-তেও হাই সেকেণ্ড ক্লাশ। তা ছাড়া ছেলেটি বেশ চটপটে। এই রকম ছেলেরই আমাদের দরকার ছিল। আমার মনে হচ্ছে, আপনি রেকমেণ্ড না করলেও দলের মধ্যে থেকে একেই আমি বেছে নিতাম। যাক, কনগ্র্যাচুলেশনস্।

এইবার বাসবী চমকে উঠল। তাকে অভিনন্দন জানানোর অর্থ? অনিমেষ রায় কি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করছেন। কল্পনার রং বুলিয়ে বুলিয়ে অনেক কিছু ভেবে নিচ্ছেন।

মিষ্টার রায়, আপনি ঠিক কি ভাবছেন, খুলে বলুন ত?

অনিমেষ ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, দুই আর দুই যোগ করলে সর্বদেশে সর্বকালে চারই হয় মিস সেন।

সংখ্যাতত্ত্বের কথা মানি। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে হৃদয়তত্ত্ব মিশিয়ে ফেলবেন না।

কথাগুলো হঠাৎই বাসবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। ম্যানেজারের সামনে ঠিক এ ধরনের প্রগলভতা করার তার ইচ্ছা ছিল না।

আপনার সঙ্গে দীপকের কতদিনের আলাপ?

যদি বলি দিন তিনেকের। বাসবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

তা হ'লে বুঝব সত্য কথাটা আপনি চেপে যাচ্ছেন।

বিশ্বাস করুন স্যর, দীপক গুপ্তকে আমি মাত্র তিনদিন দেখেছি।

এবার আর মিষ্টার রায় নয়, বাসবী অনিমেষকে তার পদমর্যাদানুযায়ী সম্বোধনই করল।

তিন দিন? Rather quick work।

অনিমেষ এবার ইংরাজীর শরণ নিল।

বাসবী বুঝতে পারল পরিষ্কার করে সব কিছু না বোঝাতে পারলে ভুলের কাঁটা ফুটে থাকবে। সারাটা দিন খচ খচ করবে। হয়ত সারাটা জীবন।

আপনি বিশ্বাস করুন, প্রথম দিন দেখি অফিসের সামনে। দরখাস্ত হাতে। আমাকে আপনার গাড়ি থেকে ক'দিন নামতে দেখে জাঁদরেল অফিসর ভেবে বসেছেন ভদ্রলোক। সেই জন্যই বহু আশা করে দরখাস্তটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি দরখাস্তটা তার হাত থেকে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম তাঁকে কার্জন পার্কে অপেক্ষা করতে, যদি কিছু করতে পারি তাঁকে জানাব। আপনার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় দীপক গুপ্তর সঙ্গে কার্জন পার্কে দেখা করে খবরটা জানিয়েছিলাম। আর তৃতীয় দিন দেখা আজ। এই অফিসে।

অনিমেষ কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল। বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। টিফিন শেষ করে কেরাণীবাবুরা ফিরছে।

অনিমেষ একটু থেমে বলল, আজ আর আমার লাঞ্চে যাওয়া হ'ল না।

কথা শেষ করে অনিমেষ হাসল। বাসবী কিন্তু হাসতে পারল না। এ কামরায় আসবার সময় টিফিনের প্যাকেটটা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে এসেছে। কৃষ্ণা পালিত হয়ত অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে নিজে খেয়ে নিয়েছে। বাকি সময়টা এভাবে অভুক্ত অবস্থায় কি করে বাসবী কাটাবে!

একবার ভাবল অনিমেষের কাছে ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসবে কিন্তু কি ভেবে কিছুই করল না। আস্তে আস্তে উঠে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল।

নিশিবাবুও ওঠে নি। বোধ হয় নিজের টেবিলে বসেই টিফিন সেরেছে।

বাসবী ফিরে আসতেই ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল, টিফিনের সময় মিস পালিত আপনার খোঁজ করতে এসেছিলেন।

নিশিবাবু একটু থামল। বোধহয় আড়চোখে চেয়ে চেয়ে বাসবীর মুখচোখের অবস্থা নিরীক্ষণ করল তারপর বলল, আমি তাঁকে বলে দিয়েছি।

কি বলে দিয়েছেন?

বলে দিয়েছি আপনি ম্যানেজার সায়েবের সঙ্গে লাঞ্চে গিয়েছেন।

ঠিক বুকের মাঝখানে কালনাগিনী দংশন করলেও বোধ হয় বাসবী এতটা বিচলিত হ'ত না। সে প্রায় শিউরে উঠে বলল, সেকি? আমি ত ম্যানেজারের কামরায় ছিলাম। আপনি ও কথা বলতে গেলেন কেন?

নিশিবাবু একটু দমল না। অমায়িক হেসে বলল, তা ত জানি না। ম্যানেজার সায়েবের বেয়ারার ডাকে আপনি উঠে গেলেন, অনেকক্ষণ ফিরলেন না, আমি ভাবলাম বুঝি যেমন মাঝে মাঝে যান, তেমনই লাঞ্চে গেছেন।

বাসবী একটি কথাও বলল না। কথা বলবার তার ইচ্ছাও হ'ল না। বুঝতে পারল এখন কথা বলতে গেলে নিজের গলার স্বরকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারবে না। চাৎকার করে একটা নাটকীয় ব্যাপার করে তুলবে।

এই নীচাশয় ইতর লোকটার তাতে সুবিধাই হবে। যা সে প্রতিপন্ন করতে চাইছে, বাসবী নিজের মেজাজের মাত্রা চড়িয়ে সেটাই প্রমাণিত করবে।

বাসবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল। এখনই একবার কৃষ্ণার কাছে যাওয়া দরকার। সে যাতে ভুল কিছু না বোঝে।

বাসবী কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ফাইল হাতে মহীতোষবাবু পথরোধ করেছে।

মা, এই দুটো ফাইল তোমার কাছে আছে?

অফিসের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ, নিবিরোধ মানুষ। বাসবীকে মা বলে সম্বোধন করে। ঘোরালো অফিস-রাজনীতির ধারে-কাছে ঘেঁষে না।

বাসবী দেখল।

একটা রায়গঞ্জের ডাকবাংলো তৈরীর ফাইল আর একটা আদমপুরের কলেজ।

রায়গঞ্জের ফাইলটা আমার কাছে আছে।

আর একটা আবার কোথায় গেল। যাক, যেটা আছে সেটা কাল সকালে আমার দরকার মা। আমার যদি মনে নাও থাকে, তুমি একটু মনে করিয়ে দিও।

বাসবী ঘাড় নাড়ল, আপনার নিজেরই ঠিক মনে থাকবে। ফাইলটা আজ বিকেলেই আমি আপনার টেবিলে পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও মা। কাল সকালে একবার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতে হবে, ফাইলটা নিয়ে। পি. ডবল্যু ডিপার্টমেণ্টে।

বাসবী এগিয়ে গেল।

কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে নেই। এমন অবশ্য বিশেষ হয় না। কৃষ্ণা সব সময়ই এক্সচেঞ্জ বক্সের সামনে হাজির থাকে।

একটু দাঁড়াতেই কৃষ্ণা ফিরে এল।

কোথায় গিয়েছিলে? বাসবী জিজ্ঞাসা করল।

বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ চাইতে পারছি না বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে এলাম।

হঠাৎ?

কি জানি, এই টিফিনের সময় থেকে।

ছোট ছোট অক্ষরে লেখা বইগুলো পড়ে পড়ে বোধহয় এ রকম হয়েছে। দাঁড়াও তোমাকে একটা অ্যানাসিনের বড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোমার কাছে আছে বড়ি?

হ্যাঁ, এক সময়ে এ বড়ি আমার নিত্যসঙ্গী ছিল যখন চাকরির চেষ্টায় অফিস-অঞ্চল মন্থন করে বেড়াতাম কড়া রোদে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিবারণের ওগুলোই ছ মহৌষধ।

তা হ'লে দাও ভাই একটা পাঠিয়ে। ওসব বড়ি খেলে শুনেছি হার্টের কমপ্লেন হয়।

বাসবী হাসল, অফিসের চাকুরে মেয়েদের হার্টের বালাই আছে নাকি? কথাটা বলেই কৃষ্ণার কাছে কেন এসেছে সে কথাটা তার মনে পড়ে গেল।

তুমি আমার সীটে একবার গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ, তুমি টিফিনে এলে না দেখে তোমায় ডাকতে গিয়েছিলাম।

নিশিবাবু কি বলেছেন তোমাকে? অনেক চেষ্টা করেও বাসবী নিজের কণ্ঠস্বর মোলায়েম করতে পারল না।

নিশিবাবু যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।

কারণ?

কারণ, বেয়ারা আমাকে বলেছে ম্যানেজার সায়ে কামরার মধ্যেই আছেন, কোথাও বের হন নি।

বাসবী ফিরে এসে বেয়ারার হাত দিয়ে কৃষ্ণার জ একটা বড়ি পাঠিয়ে দিল। তার হাতেই মহীতোষবাবু ফাইলও।

মনে মনে ঠিক করে নিল দীপক গুপ্তকে স্পষ্ট বলে দে চাকরি চেয়েছিল, চাকরি করে দিয়েছে। একমাস সে অফিসে বসবে। তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বার বা

বাসবীর কাছে আসবার কোন প্রয়োজন নেই। অফিসের লোকেরা এই সৌহার্দের অন্য অর্থ করবে। কদর্য ব্যাখ্যা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। ছাত্রী পড়িয়ে পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে টেনে বাসবী বাড়ী ফিরছিল। অনেকবার ভেবেছে বাসে উঠবে। বাস-ষ্টপে কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করেছে। কিন্তু বাসে ওঠে নি। মাসের প্রায় শেষ। বাসবীদের সংসারে একটা পয়সা এখন একটা মোহরের সামিল। মনকে বুঝিয়েছে, কতটুকু আর পথ। এটুকু হেঁটেই চলে যাবে।

চলতে আরম্ভ করে বুঝতে পারল বেশ কষ্ট হচ্ছে। অফিসে খাটুনিও খুব বেশী ছিল। সকালে দু'মুঠো ভাত খেয়ে বের হয়েছে। আজ টিফিন নিয়ে যেতেও ভুলে গেছে। অন্যদিন মা টিফিনটা কাগজে মুড়ে হাতে তুলে দেয়। আজ দিতে ভুলে গেছে। বাসবীরও টিফিনের কথা মনে ছিল না।

গলির মোড়ে ঢুকতে গিয়েই বাসবী একটু দাঁড়াল।

আগে আগে যে লোকটি চলেছে, তার চলার ছন্দটা পরিচিত মনে হচ্ছে। পিছন থেকে হ'লেও, চেহারাটা চেনা-চেনা।

বাসবী একটু জোরে পা চালাল। যাতে লোকটির পাশাপাশি যেতে পারে। তখন ঘাড় ঘুরিয়ে মুখটা দেখে নিলেই হবে। অবশ্য যে লোকটি বলে সন্দেহ হচ্ছে, তাকে এ গলিতে দেখতে পাবার কথা নয়।

তাই করল বাসবী। একটু জোরে হেঁটে লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার আগেই, লোকটির গলা শোনা গেল।

মিস সেন।

আপনি? বাসবী রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ী যাচ্ছি।

আমাদের বাড়ী। বাসবী রাস্তার মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবা বলে দিলেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে। অফিসে দেখা করার অনেক অসুবিধা। তা ছাড়া আপনার মাকেও একবার প্রণাম করব।

এতক্ষণে দীপকের হাতের দিকে বাসবীর নজর পড়ল। একটা কাগজের প্যাকেট হাতে রয়েছে। ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। বাসবীর চেষ্টায় দীপকের চাকরি হয়েছে, সেই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে দীপক। আর একেবারে খালি হাতে আসে নি।

মাঝপথ থেকে দীপককে ফেরানো সম্ভব নয়। সেটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। কিন্তু নিজের ছত্রখান সংসারের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে কাউকে তুলতে বাসবীর মন চায় না। স্বল্প প্রসাধনে সজ্জিতা, পরিষ্কার বেশে-বাসে বাসবীর যে রূপ সেটাই সবাই দেখুক। সংসারটা তার অন্ধকার দিক। তার জীবনের কৃষ্ণপক্ষ। এই অন্ধকার, এই লজ্জাটুকু ঢাকবার জন্যই বাসবী প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই যে উদয়াস্ত পরিশ্রম, একটা চাকরির ঘাম না শুকোতে আর একটা চাকরি সুরু করা, এ ত শুধু সংসারকে স্বচ্ছল রূপ দেবার জন্য।

আপনার এত দেরি হ'ল? দীপক প্রশ্ন করল।

অফিসের পর আমি আর একটা কাজ করি। একটা টিউশনি। আজকাল একটা দাঁড়ে সংসারের পানসি চালানো দুষ্কর, জানেন ত?

জানি বৈকি, খুব জানি। এতদিন সমস্ত জীবনটাই ত টিউশনি-নির্ভর ছিল। রাই কুড়িয়ে বেল করার মতন টিউশনির রাংতা কুড়িয়ে সোনার স্বপ্ন দেখতাম। ছাত্রদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়ানো ছিল। ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে অভিভাবকরা মনে করতেন আমাদের দোষ। বকুনি হজম করতে হ'ত। চাকরিও যেত। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের মাষ্টার নই, কাজেই বড় জাতের টিউশনি হাতের নাগালের বাইরেই থেকে যেত।

আপনি তো এম. এ., বি. টি.-টা পাস করে নিলেই পারতেন?

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে বাসবীর মনে পড়ে গেল।

প্রথম যেদিন বাসবী দরজা ঠেলে ম্যানেজার অনিমেষ রায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, অনিমেষও ঠিক এই উপদেশই দিয়েছিল। বি.টি-টা পাস করে নেবার পরামর্শ। যেন বি.টি. পাস করলেই সুখের স্বর্গ আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে। দুঃখ, যন্ত্রণা সব নিশ্চিহ্ন।

সেই এক ভুল বুঝি বাসবীও করল।

কিছুক্ষণ দীপক কোন কথা বলল না। দু'জনে এগিয়ে গেল। একবার বাসবীর মনে হ'ল দীপক বুঝি তার কথার উত্তরই দেবে না।

কিন্তু দীপক কথা বলল। বাসবীর সঙ্গে নয়, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে, এমনই ভাবে।

প্রথম যখন জীবন সুরু করি তখন শিক্ষার প্রতি একটা মোহ ছিল। পড়াশোনার কোনদিন ফাঁকি দিই নি। স্কুলে-কলেজে ওপরতলার ছাত্রই ছিলাম। বছর বছর ছোটখাট পুরস্কারও বাড়ী এনেছি। যতই ওপর দিকে উঠতে লাগলাম, ততই মোহভঙ্গ হ'তে লাগল। দেখলাম এদেশে শুধু লেখাপড়ায় কৃতিত্ব দেখানোটাই শেষ কথা নয়, সেই সঙ্গে অভিজাত পরিবারে জন্মাতে হবে, বিত্তশালী অভিভাবক থাকা চাই, সোজা বাংলায় যাকে বলে খুঁটির জোর। এম. এ. তকমা বগলে করে অফিসের দরজায় ঘুরতে ঘুরতেই দেখলাম পাশের তালিকায় যাদের নাম অনেক নীচে ছিল, তারা এক একজন বেশ লোভনীয় চাকরি জুটিয়ে বসে আছে। বিশ্বাস করুন, শিক্ষার ওপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেল। দু'-একজন বন্ধুবান্ধব, আপনার মতন, বি. টি. কিংবা বি.এ.ও পড়বার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু মন থেকে কোন সাড়া পেলাম না। তা ছাড়া, ততদিনে সংসারের অবস্থাও আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বাবা প্রায় অসমর্থ, মা মাসের মধ্যে অর্ধেক দিনই বাতে শয্যাশায়ী। ভদ্রাসনটুকু বিক্রি করে ছোট বোনটার বিয়ে দিয়েছিলাম, সেও বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যে ফিরে এল শাখা-সিঁদুর ঘুচিয়ে।

গুমোট গরম। বিকেল থেকে এক কণা বাতাস বইছে না। এই অল্প পরিসর গলিতে বাতাস এমনিতেই কদাচিৎ ঢোকে, কিন্তু দীপকের এই কথায় আবহাওয়া যেন ভারি, মন্থর হয়ে উঠল।

বাসবী খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, এই যে, বাঁদিকে।

বাঁদিকের গলিটা আরও সঙ্কীর্ণ। দু'জনে পাশাপাশিও যাওয়া যায় না। বাসবী আগে আগে চলল। দীপক পিছন পিছন।

অন্যদিন বাসবীর কিছু মনেও হয় না, কিন্তু আজ যেন গলিটা আরও কুশ্রী, আরও অসংস্কৃত মনে হ'ল। দু'-এক জায়গায় উৎসব বাড়ীর কলাপাতার স্তূপ, উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। জায়গায়, জায়গায় নোংরা জড়ো করা। অনেক গুলো বাড়ীর দেওয়ালে বট-অশথের চারা।

কিছুটা এগিয়ে বাসবী দাঁড়াল।

দরজা ভেজানো। এ দরজাটা অবশ্য বাসবীদের নিজস্ব নয়, বারোয়ারি। গোটা ছয়েক বাসিন্দা এখান দিয়েই যাতায়াত করে। তা হ'লেও দরজায় বড় বড় করে খড়ি দিয়ে লেখা। বাসবী সেন।

এটা খোকনের কীর্তি। দিদির চাকরি হয়ে যাবার পর কেমন তার ধারণা হয়েছে যে, তার দিদি ঠিক সাধারণ নয়। যে-সব মেয়ে রান্নাঘরের পরিধির মধ্যে জীবন কাটায় তাদের সমগোত্র ত নয়ই। স্কুলের পথে যেতে-আসতে অনেক বাড়ীতে লোকের নাম লেখা দেখে। তাই স্কুল থেকে খড়ি নিয়ে এসে দরজায় দিদির নামটা লিখে রেখেছে।

ভাবটা যেন, এ পরিবারে কারও নাম যদি লেখার যোগ্য হয় ত দিদির।

এই দরজা। বাসবী বলল।

নেমপ্লেট দেখেই ত বুঝতে পারছি। দীপক হাসল।

আমার একটি ছোট ভাই আছে, ওটা তারই দিদিকে অমর করে রাখার প্রয়াস।

দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল।

অপ্রশস্ত সিঁড়ি। রেলিং ধরে বাসবী উঠতে লাগল। পায়ের শব্দে বুঝতে পারল দীপকও পিছন পিছন উঠছে।

বারান্দা খালি। বারান্দায় কেউ নেই। অন্যদি খোকন এখানে বসে পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে রু আর মা-ও থাকে। বদ্ধ দু'টি ঘরে আলোবাতাসের সংস্প কম। এই বারান্দায় একটু হাওয়া পাওয়া যায়। [illegible] সামনে একটু পড়ো জমি। কোণের দিকে একটা খাট অবশ্য আছে কিন্তু তার দুর্গন্ধটায় এ বাড়ীর সবাই অভ হয়ে গেছে।

এখানে বসলে আকাশ দেখা যায়। দিনে সূর্য, রা চাঁদ-নক্ষত্র। তা ছাড়া বাতাসও আসে। সেই [illegible] রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে মাও এখানে এসে বসে। [illegible] একেবারে খালি হাতে নয়। সেলাই ফোঁড়াই-এর ব[illegible] থাকে। গোটা সংসারটাকেই যেন মা এখানে [illegible] বসে রিপু করে।

কিন্তু আজ তিন জনের কেউ নেই।

বারান্দা পার হয়ে বাসবী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তার ঘরটাও খালি। অন্যদিন মাঝে মাঝে বারান্দায় না বসে খোকন বাসবীর ঘরের তক্তপোষে বসেও পড়াশোনা করে। সবাই গেল কোথায়!

পাশের ঘরের চৌকাঠ-বরাবর গিয়েই বাসবী থেমে গেল।

বাবার ফটোটা দেয়াল থেকে নামিয়ে একটা উঁচু পিঁড়ির ওপর রাখা হয়েছে। ফটোর কাঁচের ওপর চন্দনের ফোঁটা। একটা বেলফুলের মালা। দু'পাশে কয়েকটা রজনীগন্ধার গোছা।

ঠিক তার সামনে মা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। প্রণাম করার ভঙ্গিতে।

একেবারে কোণের দিকে খোকন আর রুবি। ভাই-বোনে জড়াজড়ি করে বসে আছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে।

বাসবীর মনে পড়ে গেল।

আজ সেই দিন। ঠিক এক বছর আগে এমন দিনে এ বাড়ীর চরম সর্বনাশ হয়েছিল। কত দ্রুত পার হয়ে যায় কালের প্রহর। সময়ের বালি কত শীঘ্র হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ে।

ক্রমশঃ

॥ প্রবন্ধ ॥

চিত্রা কাব্যের ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ভক্তি-তত্ত্ব

বেলা দাশগুপ্তা

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত চিত্রা কাব্যান্তর্গত ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে কিছু সঙ্কোচ অনুভব করছি। কাব্য-তত্ত্ব নয়, সৌন্দর্য-তত্ত্ব নয়—চিত্রা কাব্যের ধর্ম-তত্ত্বালোচনা সাহিত্য-রসিকদের নিকট অবাঞ্ছিত মনে হ'তে পারে—প্রথমত আমার সেইজন্যই সঙ্কোচ। তবে ভরসার কথা এই যে, রবীন্দ্রকাব্যের প্রমাণানুযায়ী ধর্মতত্ত্বালোচনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই অনুমোদিত। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কাব্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য রচনার সঙ্গে তাঁর ধর্ম-তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ এবং তাঁর ধর্মবোধের স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর রচনায়। রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে উদ্ধৃতাংশ থেকে—"ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চলতি পথিকের নোট বই-এর টোকা কথার মতো। ···সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ।" বস্তুতঃ স্ব-ধর্ম পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি 'আত্মপরিচয়ে' কাব্যের পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব রবীন্দ্র-কাব্যে ধর্মতত্ত্বানুসন্ধান অবাঞ্ছিত মনে হ'লেও অসঙ্গত নয়।

কিন্তু এহ বাহ্য। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনায় আমার সঙ্কোচের কারণ আরও গূঢ়। দু'জন খ্যাতনামা রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞ প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রাক্-নৈবেদ্য যুগের কাব্যাদির অন্তর্গত ভক্তি-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অভিমত এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-চল্লিশের অর্থাৎ 'নৈবেদ্য'-পূর্ববর্তী যুগের কাব্যে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মীয় চেতনার পরিচয় নেই (দ্রষ্টব্য—অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠা), অন্যজনের মতে মানসী থেকে নৈবেদ্য-পূর্ব যুগ পর্যন্ত কাব্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর ভগবদ্ভক্তির নিদর্শনের অভাব (দ্রষ্টব্য—১৩৬৫ সালের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' নামক প্রবন্ধ); একজন আলোচ্য যুগের ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-চল্লিশের যুগে প্রচলিত ধর্মমতের অনুসরণে যে সব ধর্ম-সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও তাঁহার উপলব্ধ অসীমকে একটা স্পষ্ট ঈশ্বর ভগবান বা ব্রহ্মের সীমায় আনিয়া ফেলিতে চাহেন নাই (দ্রষ্টব্য—পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ১৯৪-৯৫), অন্যজন বলেছেন যে, স্পেন্সর-ভক্ত রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-তত্ত্ব 'অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত' (দ্রষ্টব্য—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। 'চিত্রা' কাব্যের বর্তমান আলোচনাটি এই সমালোচকদের মতানুগ নয় বলেই আমার বিশেষ সঙ্কোচ।

এরূপ সঙ্কোচ সত্ত্বেও এই প্রবন্ধ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য মহান্ স্রষ্টার সৃষ্ট কাব্যাদির উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকেই পূজা-নিবেদন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হ'লেও রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যকে পৃথক্ ভাবে বিচার করা সম্ভব নয় এইজন্য যে, প্রত্যেকটি কাব্যান্তর্গত ভাবধারাই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-যুক্ত। সেই কারণেই 'চিত্রা'র তত্ত্বালোচনার পূর্বে এর পূর্ববর্তী কাব্যাদিতে ব্যক্ত ঈশ্বর ও ভক্তি-চিন্তার স্বরূপ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, চিন্তার প্রথম প্রকাশ সৃষ্টির রহস্য ও তাৎপর্যের অনুসন্ধানে। 'সন্ধ্যা-সংগীতের' যুগে অসীম শক্তিশালী এক ঐশ্বরিক সত্তাকেই তিনি সৃষ্টি-কর্তারূপে স্বীকার করেছেন। 'প্রভাত সংগীতে'র 'মহাস্বপ্ন' কবিতায় সৃষ্টি-রহস্যের উদ্ঘাটন করে তিনি বলেছেন—যিনি পূর্ণ এবং অদ্বিতীয় সেই মহান্ দেবতার স্বপ্ন-সৃষ্ট এই জগৎ, এ মিথ্যা নয়—অর্দ্ধসত্য, মানুষ—চৈতন্যময়, অপূর্ণ; জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রলয়ের দিনে অর্থাৎ পূর্ণ একের জাগরণের দিনে জগতের সত্যে প্রতিষ্ঠা, মানবের পূর্ণতালাভ; অপূর্ণ মানবের তাই প্রচেষ্টা জাগ্রত পূর্ণ দেবতাকে লাভ করা।

সৃষ্টির তাৎপর্য বিষয়ে কবির কৌতুহলের পরিচয় পাওয়া যায় কড়ি ও কোমলের 'চিরদিন' কবিতায়। বিশ্ব-প্রকাশের মূলে রয়েছে কোন্ প্রেরণা, জগৎ পরিচালনায় কোন্ মহিমার প্রকাশ—কবি-মনের এই অনুসন্ধিৎসা ও তাঁর সিদ্ধান্তের নিদর্শন রয়েছে কবিতাটিতে।

জগৎ ব্যাপারের মূলে এক কালতত্ত্বকে যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা একমাত্র কালের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুরই সত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মানুষ যদি ছায়াতুল্য মিথ্যা হয় তবে মানুষের প্রেম, ভক্তির কোন

থাকে না, মানুষের হাসি-কান্নাও কোন দেবতার র স্পর্শ করতে পারে না। এই কাল-তত্ত্ব ব্যক্ত করেই তিনি লিখেছেন—

এত ভাঙ্গা এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু কোথা ঊর্মি কোথা তার বেলা
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন,
আকাশ মণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

হাসি কাঁদি ভালবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া।

এ ধরনের শূন্য-তত্ত্বে কবির প্রত্যয় নেই, কারণ তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে জগতের মধ্যে এক আদান-প্রদানের রীতি—

যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে ওঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।

শুধু প্রকৃতিতে নয়, জীবের বেলাতেও এই তত্ত্বেরই প্রকাশ—'প্রেমে টেনে আনে প্রেম।'

একদিকে ব্যক্ত জগৎ, অন্যদিকে অসীম অব্যক্ত—পরস্পরের মধ্যে এই যে আদান-প্রদান-এর রীতি, এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-ব্যাপারের মূলে রয়েছেন যিনি, তিনি—'প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারময়' শূন্যতত্ত্ব নন, তিনি প্রাণৈশ্বর্য পূর্ণ ও প্রেমের আধার এবং তাঁর প্রেমের মহিমাতেই জগৎ পরিচালিত।

বিশ্বস্রষ্টা যখন প্রেমময়রূপে প্রতীত হ'লেন তখনই শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাঁর নিকট কবির আত্মনিবেদন। কড়ি ও কোমলে'র 'সত্য', 'ক্ষুদ্র আমি' ও 'প্রার্থনা' কবিতায় এই আত্মনিবেদনের ভাব ব্যক্ত। আমিত্বের অহংকার 'তুমি'-কে আড়াল করে দাঁড়ায়, তাই ভক্তি-বিনম্র চিত্তে কবির প্রার্থনা—

তুমি কাছে নাই বলে হেরো, সখা তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' করিছে সবাই
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে এ জগতে আর কিছু নাই।

(প্রার্থনা)

কিন্তু ঈশ্বর যদি একবার প্রকাশিত হন তবে আমিত্বের এই অহংকার লজ্জায় মুখ লুকাবে। ঈশ্বরের প্রতি কবির এই বিশ্বাসেই পরমনির্ভরশীলতায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের অভিলাষ।—

কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন
কোথায় তোমার নাথ বিশ্বঘেরা হাসি,
আমারে কাড়িয়া লও করগো গোপন
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।

(ক্ষুদ্র আমি)

এইভাবেই 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে কবির অন্তরে ভক্তির নির্ঝর-ধারা উৎসারিত হয়েছে দেখতে পাই।

ভক্তির নির্ঝরধারা একবার উৎসারিত হ'লে ভগবৎ-চরণ স্পর্শলাভ না হওয়া পর্যন্ত তার গতির বিরাম থাকে না। তাই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্যই ভক্তের উপাসনা। কড়ি ও কোমলের পরের কাব্যে কবির ভগবৎ-উপাসনারই নিদর্শন পাওয়া যাবে। মহর্ষিদেবের ধর্মীয় পরিবেশে আবাল্য বর্দ্ধিত হয়ে কবি বাহ্যিক পূজানুষ্ঠানে পক্ষ-পাতিত্ব দেখাবেন—এরূপ আশা অবশ্যই সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই বাহ্যিক পূজানুষ্ঠানের বিরোধী মন্তব্যই সোচ্চার। অতএব রবীন্দ্রনাথের উপাসনা অন্তরেরই উপাসনা।

'কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য —সে কাব্য মরে না জীর্ণ হয়না'—এই ভাবেই বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে উপলব্ধির নির্দেশ দিয়েছেন প্রাচীন ঋষি। গায়ত্রী মন্ত্রেরও সেই নির্দেশ, সেই অনুসারেই কবি বলেছেন—'তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকেই উপলব্ধি করি।' এই উপলব্ধিকেই কবি পূজারূপে স্বীকার করেছেন—"বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হ'তে পারে না। সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয় তার মন্ত্র নিজেই রচনা করেছি।" বিশ্বদেবতাকে উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের উপাসনা—তাঁর পূজা।

বিশ্বস্রষ্টা প্রেম-স্বরূপ বলেই আনন্দরূপে জগতে প্রকাশিত হয়েছেন। বিশ্ব-সৌন্দর্য ও মানব প্রেমাস্বাদনের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যায় সেই আনন্দ-স্বরূপ দেবতাকে। যিনি প্রেম-স্বরূপ তিনিই শান্ত, তিনিই শিব, তিনিই কল্যাণময়। 'মানসী' কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমাস্বাদনের মাধ্যমে বিশ্বস্রষ্টার এই স্বরূপ উপলব্ধির নিদর্শনই দেখতে পাওয়া যায়।

এই কাব্যের "জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবির উক্তি এই যে, যখন জীবনভার লঘু ছিল তখন এই বিশ্ব-ভুবনে বিশ্বদেবতার যে অগাধ শান্তি, অপার রহস্য

অতুলন সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে তা শুদ্ধভাবে, মুগ্ধনেত্রে, নিবিড় বিস্ময়ে উপলব্ধি করা হয় নি ; এখন এই জীবন-মধ্যাহ্নে যখন জীবনের ভার গিয়েছে বেড়ে, জীবনের জটিলতা হয়েছে বৃদ্ধি—তখনই কবি এসেছেন সৌন্দর্য-সুধাপানে শান্তিলাভের আশায় প্রকৃতির আশ্রয়ে—

—প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা—
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ।

অপ্রকাশ যেখানে প্রকাশিত, অব্যক্ত যেখানে ব্যক্ত, সেই বিশ্ব-জগতের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধিতে ক্রমে ক্রমে—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ ধরা।

আত্ম সমাহিত অবস্থায় এই অনুভূতিই বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি, এইভাবেই অদ্বৈততত্ত্বেরও উপলব্ধি। বিশ্বজগৎ যাঁর আনন্দরূপের প্রকাশ, তিনিই শান্তং, শিবম্, অদ্বৈতম্ মানসী কাব্যে বিশ্বদেবতাকে এইভাবেই উপলব্ধির নিদর্শন 'মরণ-স্বপ্ন' ও 'জীবন মধ্যাহ্ন' কবিতায়।

ঈশ্বরকে এই ভাবের উপলব্ধিতে স্বার্থবুদ্ধির সঙ্কোচন ও মঙ্গলেচ্ছার প্রসার লাভ ঘটে, এইখানেই ঈশ্বর-পূজার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের পূজাও সার্থক হয়েছে, তাই তিনি প্রণোদিত হয়েছেন বিশ্বের মঙ্গল সাধনে। জীবন-মধ্যাহ্ন কবিতার শেষাংশে এই মঙ্গল-ইচ্ছার প্রকাশ—

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্র শান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

'মানসী'র পরবর্তী 'সোনার তরী' কাব্যে বিশ্বস্রষ্টার অন্য স্বরূপোপলব্ধির প্রকাশ। 'আবিঃ' অর্থাৎ প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, তিনিই আবার সন্নিবিষ্ট রয়েছেন মানবের চিত্ত-গুহায়। ধীর ব্যক্তি আত্মাতেই তাঁর দর্শনলাভ করেন। প্রকাশ-স্বরূপের উপলব্ধি যেমন বিশ্বসৌন্দর্যের মাধ্যমে, আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি তেমনি মানবাত্মায়। শাস্ত্রে তাই নির্দেশ—'আত্মানং বিদ্ধি।" 'সোনার-তরী' কাব্যে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' 'বিম্ববতী', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', ''দুই পাখী'' ইত্যাদি কবিতায় রূপকের মাধ্যমে ক'বর আত্ম-তত্ত্বোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিষদের—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'—জীব ও আত্মার প্রতীক। মানুষের 'অহং' সত্তা যখন স্বার্থ-সীমায় আবদ্ধ থাকে তখনই তার সংজ্ঞা 'জীব', যখন ঈর্ষাদ্বেষাদি স্বার্থবুদ্ধির মলিনতা থেকে মুক্ত হয়, তখনই আত্মারূপে তার পরিচয়। 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতার রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' বলা যেতে পারে। 'বিম্ববতী' কবিতার বাণী স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসা দ্বারা মলিন 'অহং' সত্তার ও বিম্ববতী অমর মুক্তাত্মার প্রতীক।

মানুষের 'অহং' যখন স্বার্থের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে সহজে তার থেকে তার নিস্ক্রমণ সম্ভব হয় না। 'দুইপাখি' কবিতার খাঁচার পাখির তাই আক্ষেপ— 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব।' বিশ্বনৃত্য কবিতায় কবির ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাকুল বাসনা ব্যক্ত হয়েছে—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহারাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

'সোনার তরী'র দু'টি বিখ্যাত কবিতায় বিশ্বদেবতার অন্য এক স্বরূপ উপলব্ধির নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। ইনি মানবের ধী-বুদ্ধির নিয়ন্তা ব্রহ্মের এক শক্তিরূপী সত্তা। এই স্বরূপকেই তিনি তাঁর কাব্য-লীলা ও জীবন-লীলার কর্ণধাররূপিণী—অন্তরস্থিত এক দেবী রূপে উপলব্ধি করেছেন 'মানস সুন্দরী' কবিতায়। এই দেবীকেই উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন—

আজ কোন কাজ নয় সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ গ্রন্থগীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা লতা, আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে ;

এই কবিতা-কল্পনা-লতাই কবির কাব্য-লীলার কর্ণধাররূপিণী, আবার তাঁকেই কবির উপলব্ধি 'মর্মের গেহিনী'—'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী' রূপে। এই জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা জীবন দেবতাই চিরদিনের জন্য কবির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—'যে গুপ্ত আলয়ে অন্তর্যামী জেগে আছে সুখ দুঃখ লয়ে।'

মানুষের অন্তরে থেকে যে সত্তা মানুষের ধী-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই অন্তর্যামী। অন্তর প্রদেশের যে 'গুপ্ত আলযে' তাঁর অধিষ্ঠান সেখানেই স্থান জীবন দেবতার। এই উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হবে যে, জীবন দেবতা ও অন্তর্যামীকে কবি অভিন্ন তত্ত্বরূপেই স্বীকার করেছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও কাব্যলক্ষ্মী এবং অন্তর্যামী যে অভিন্ন—এই তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হয়েছে চিত্রা কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতায়।

সোনার তরীর যুগেই ভক্ত কবির উপলব্ধির উপাসনা সমাপ্ত। প্রচলিত সংস্কার বা শাস্ত্রানুযায়ী কবির ঈশ্বর-পূজা অনুষ্ঠিত হয় নি কিন্তু তাঁর ঈশ্বর-পূজা নিষ্পন্ন হয়েছে মহর্ষির নির্দেশানুসারে—একথা বলা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। কারণ মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে সাধকদের এইরূপ উপাসনার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়—'সাধকদিকের এই তিনস্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।" কবির উপাসনার ক্ষেত্রে পিত'র এই নির্দেশবাক্যই অনুসৃত হয়েছে অনুমান করা যেতে পারে।

এবারে 'চিত্রা' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক্। ধর্ম-তত্ত্ব আলোচকদের নিকট এই কাব্যের এক বিশিষ্ট মর্যাদা। কারণ, সাধক-কবি ক্রমে যে তাঁর সাধনার সার্থক সীমায় উপনীত হয়েছেন—তার নিদর্শন এই কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। পরমারাধ্য দেবতার দর্শনলাভ ভক্তের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। প্রগাঢ় ভক্তিতে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেম সঞ্জাত হয়, সেই প্রেম পূর্ণ নির্মল চিত্ত-ভূমিতে ঈশ্বর প্রকাশিত হ'লেই তাঁর দর্শনলাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষার—পরম সাধনার ধন লাভ করে শাস্ত্রমতে 'মুক্ত' আখ্যালাভের যোগ্য হয়েছিলেন (ভক্ত অবশ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না), তারই পরিচয় পাওয়া যাবে চিত্রা কাব্য থেকে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যের মধ্যে এইটিকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রূপে অভিহিত করা যায়।

চিত্রার যুগে রবীন্দ্রনাথ যে সাধনার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি থেকেও। অতএব এই কবিতাটি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের আলো জ্বালায় তাঁর আত্মা, তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। তখন জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তির দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা।"

অহং-মুক্ত ও জ্ঞানে-প্রেমে-ভাবে জন-জীবনের সঙ্গে যুক্ত যাঁদের আত্মা, তাঁরাই মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছেন মহামানব। এই মহামানব শুনতে পান এক বিচিত্র বাজনার সুর, সেই সুরেই তাঁদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সুর শুনবার জন্যই সোনার তরীর যুগে কবিকে প্রতিক্ষারত দেখতে পাই—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হব আপনা। (বিশ্ব-নৃত্য)

চিত্রা কাব্যের যুগে কবি এই সুর শুনতে পেয়েছেন, শুনতে পেয়েছেন অসীমের আহ্বান বাণী—'কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ জনে।' মহামানব এই আহ্বান শুনেই বেড়িয়ে পড়েন অভিসারের পথে। কবিও তাঁর কর্তব্য বিষয়ে সচেতন. তিনি জানেন তাঁকেও এবার বেড়িয়ে পড়তে হবে—

মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে ? জানি না কে। চিনি নাই তারে।

কবি এখনও জানেন না—কার জন্য এই অভিসার, তিনি শুধু জানেন—

তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তের পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

এই মানবযাত্রীই মহামানব। অসীমের সর্বনাশা

আহ্বান শুনে তাঁরা তাঁদের সর্বপ্রিয় বস্তু বিসর্জন দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথে বেড়িয়ে পড়েছেন শ্রেয়র জন্য—মানবের মঙ্গল সাধনের জন্য। কিন্তু কবি-মনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সংশয়—কার এই সর্বনাশা আহ্বান—এ আহ্বান ত প্রেমময়ের মধুর বাঁশীর সুর নয়!

অসীম বিশ্বস্রষ্টা শুধু শান্তিময়, প্রেমময় নন—তিনি রুদ্র-স্বরূপও। কবি চিত্রার পূর্বযুগ পর্যন্ত বিশ্ব-সবিতার শান্তিময় প্রেমময় রূপটিই উপলব্ধি করে এসেছেন। মানসীর যুগেও প্রথম দিকে মাঝে মাঝে তাই তাঁর সংশয় প্রকাশ পেয়েছে—প্রকৃতি ও বিধাতার নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কোথায় তার উৎস? —

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই—
বিষম সংশয়।

জড়দৈত্য শক্তি হানে মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
একি দুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার
ভাঙ্গা গড়াময়? (সিন্ধু তরঙ্গ)

কিন্তু যেমন আনন্দ ও প্রেমের মধ্যে, তেমনি দুঃখ-বেদনার মধ্যেও 'একমেবাদ্বিতীয়মেরই' ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের প্রকাশ—একথা কবি কিছু পরেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কল্পনা, উৎসর্গ ও খেয়া কাব্যে কবির উপলব্ধির সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। 'খেয়ার' দুঃখমূর্তি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি;
মরণরূপে আসিলে প্রভু,
চরণ ধরি মরিব হে—
যেমন করে দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

যাঁর সর্বনাশা ডাক শুনে মহামানব বেরিয়ে পড়েন অভিসার যাত্রায় তাঁর স্বরূপও কবির শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল না। আত্মপরিচয়ে (১৩২৪) তাঁকেই তিনি রুদ্রদেবতা রূপে অভিহিত করেছেন। চিত্রাকাব্য রচনা-কালে (১৩০০-২) তাঁর জীবনে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল সে কথা স্মরণ করে এই কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে মাধুর্য আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।" এই উক্তি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, চিত্রা কাব্যের পরবর্তী সময়ে কবি দুঃখ-বেদনা, বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে রুদ্রদেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন সুতরাং 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যাঁর আহ্বানে কবি সাড়া দিয়েছেন তিনি যে রুদ্রদেবতা, সে বিষয়েও কবির মনে কোন সংশয় ছিল না। অতএব এ কথা বলাই বাহুল্য যে—'কে সে? চিনি নাই তারে' —এই উক্তিতে কবি-মনের সাময়িক সংশয় প্রকাশ পেয়েছে মাত্র—এর দ্বারা ঈশ্বরের 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' তত্ত্ব স্বীকৃত প্রমাণিত হয় না। ভক্ত-সাধক যতই সাধনার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন, ঈশ্বর-বিরহ ততই তাঁর পক্ষে অসহ্য অনুভূত হ'তে থাকে। এই অবস্থায় সাধকের প্রার্থনা—হে স্বপ্রকাশ, আমার অন্তরে তুমি প্রকাশিত হও—'প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো।' চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রি' কবিতায় তাই প্রকাশ-স্বরূপকেই পরম ব্যাকুলতায় কবির অন্তরে আবাহন—

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে, অসীম সুন্দর,
ত্রিলোক নন্দন মূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চির রাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙ্গে নাহি তার সীমা।

যে বিশ্বদেবতা সৌন্দর্যময়ী নিশিথিনী রূপে জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁকেই 'অন্তর্যামী'রূপে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতাটিতে। বহির্জগতে যিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশিত, অন্তরে তিনিই একাকী, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই চিত্রা কাব্যের ঈশ্বর-তত্ত্ব।

অন্তর মন্দিরের যে দেবতা এখনও অপ্রকাশিত সে দেবতার জন্য কবি-চিত্ত কাতর, তৃষিত, উৎকণ্ঠিত, যে-দেবতাকে তিনি বহু দিন থেকেই অর্ঘ্যভার নিবেদন করে এসেছেন—তাঁরই অনুভূতি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে কবির অন্তরে। এই সময়ে কবির উপলব্ধি এই যে, কে যেন কবির অন্তরে থেকে প্রতিনিয়ত তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করে চলেছেন। তিনি যেন কৌতুকময়ী, তিনি রহস্যময়ী। কবির অজ্ঞাতেই তিনি

তাঁর কর্মধারা পরিচালনা করে চলেছেন। তিনি যেন যন্ত্রী, কবি যন্ত্র। কবির এই অনুভূতির কথা 'অন্তর্যামী' কবিতায় ব্যক্ত—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুর।

কবির আরও উপলব্ধি এই যে, অন্তরের অন্তঃপুরে থেকে তিনি কবির জীবনে এক নতুন পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। তাই কবির শক্তি—

একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়—
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নতুন দেশে। (অন্তর্যামী)

যে কৌতুকময়ী, যে রহস্যময়ী অন্তরে থেকে কবির কল্পনাধারা তাঁর জীবনধারা পরিচালনা করছেন—কাব্যলীলার ও জীবনলীলার সেই কর্ণধাররূপিণী সেই 'জীবন দেবতা' কবি-চিত্তে পূর্ণ প্রকাশিত হন নি, তাই এখনও তাঁকে কবির ব্যাকুল অন্বেষণ—'কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে আমি যে তোমারে খুঁজি।'

তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন জীবন দেববার অস্তিত্ব কিন্তু কবির জানা নেই কবে হবে তাঁর সান্নিধ্যলাভ, কবে তিনি হৃদয়ের প্রেম-শতদলে ভাস্বর হয়ে উঠবেন, শুধু এই বিশ্বাস তাঁর অটুট—অন্তর্যামী দেবতার প্রেমে নিঃশেষে জীবন উৎসর্গ করা হ'লেই সম্ভব হবে তাঁর দর্শনলাভ, দূর হয়ে যাবে 'চিরদিবসের মর্মের ব্যথা'—তখনই হবে তাঁর সঙ্গে মিলন, তখন মনে হবে—

হাসিমাখা তব আনতদৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত বৃষ্টি
বরষি করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহু বন্ধনে করেছে বন্ধ
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প ভরে। (অন্তর্যামী)

এ হ'ল কবি, মানসে প্রতিফলিত ঈশ্বর-মিলনের একটি মধুর বর্ণনা। ঈশ্বর-ভক্তির প্রগাঢ় অবস্থায় সঞ্জাত হয় যে প্রেম, তার গভীরাবস্থাতেই এরূপ মাধুর্যময় ঈশ্বর-মিলন সম্ভবপর।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে যে ভক্তির উন্মেষ হয়েছিল কবি-চিত্তে কড়ি ও কোমলের যুগে, চিত্রা কাব্যের যুগে সেই ভক্তি ঘনীভূত হয়ে পরিণত হয়েছে প্রেমে। 'জ্যোৎস্না রাত্রি' ও অন্তর্যামী কবিতায় কবির সেই ঈশ্বর-প্রেমেরই প্রকাশ।

অন্তর্যামীর প্রতি প্রেম অন্তরে রেখে কবির সাধনা সফলতার স্তরে পৌঁছেছে, সার্থক হয়েছে তাঁর অনুসন্ধান—এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় 'দিন শেষ' কবিতায়—

আর বেয়ে কাজ নাই তরণী

যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী।

জীবন দেবতার অন্বেষণ সার্থক হয়েছে—এবার আরও গভীর নিষ্ঠায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাপূর্ণ হৃদয়খানি নিবেদন করে দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তমকে। কবির গভীর বিশ্বাস যাঁকে তিনি সব উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে তাঁর দুঃখে মিলবে গভীর সান্ত্বনা, কারণ—তিনি যে করুণাময়ী স্বামী। 'সান্ত্বনা' কবিতায় রয়েছে এই বিশ্বাসেরই নিদর্শন। কবি তাঁর দরদী অন্তর্যামিণীরই কাছ থেকে গভীর মমতার বাণী শুনতে পেয়েছেন—

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এল জল
হে প্রিয় আমার।
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বলো আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার।

শূন্য গৃহে অন্যমনে
একাকিনা বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে
বাসরের রাণী—
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখি।
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা
কোথা তোরে রাখি।

ঈশ্বরও গভীর আগ্রহে ভক্তের সঙ্গে নিভৃত মিলনের প্রতীক্ষা করেন, পুষ্পাসনে অধিষ্ঠিতা বাসরের রাণী অন্তর্যামিনী ভক্ত-কবির অপেক্ষায় রয়েছেন বরমাল্য নিয়ে —কবির এই আন্তরিক বিশ্বাসের নিদর্শনও রয়েছে ঐ কবিতায়—

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গল প্রদীপ ধরে
লইব বরণ করে
পুষ্প সিংহাসন পরে
বসাব তোমায়—
তাই গাঁথিয়াছি হার,
আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার
কনক বীণায়।

ঈশ্বর-প্রেমিক কবি নিঃশেষেই তাঁর সবকিছু ঈশ্বর-চরণে নিবেদন করে দিয়েছেন—'যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে ডালাখানি ভরে।' ফল-স্বরূপ প্রস্ফুটিত হৃদয়-শতদলে অন্তর্যামীর অধিষ্ঠান যে তিনি উপলব্ধি করেছেন পূর্ব-আলোচিত সান্ত্বনা কবিতাটিই তার প্রমাণ। এবার কবির প্রার্থনা নূতন বরমাল্য লাভ—

দিইনি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি?
দিইনি কি কোন ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া।

সেই কথা মনে করে দিবে নাকি নব
বরমাল্য তব—
ফেলিবে না আঁখি হতে এক বিন্দু জল
করুণাকোমল। (শেষ উপহার)

অবশেষে ভক্ত যে শুধু নব-বরমাল্য লাভে ধন্য হয়েছেন—তাই নয়, তাঁর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন হয়েছেন, 'উৎসব' কবিতায় সেই মিলনেরই ইঙ্গিত—

ওগো, যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন,
তুমি কি বসেছ আজি
নব-বরবেশে সাজি,
কুন্তলে কুসুম রাজি
অঙ্কে লয়ে বীণ
ভরিয়া আরতি থালা
জ্বালায়েছ দীপমালা,
সাজায়েছ পুষ্পডালা
নূতন নবীন—
আজি বসন্তের দিন।

এ আনন্দ তুমি ছাড়া
কেহ নাহি জানে—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

ভক্তের সঙ্গে মিলনের জন্য ভগবানেরও আগ্রহ, আর ভক্তের আগ্রহ তাঁর প্রীতি-সম্পাদন। 'জীবন দেবতা' কবিতায় এই ভাবই ব্যক্ত—

আপনি বরিয়া লয়েছিল মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবন নাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।

মিলনেই অখণ্ড যোগ উপলব্ধি, এ উপলব্ধিই ঐক্য বা অদ্বৈতের উপলব্ধি। কিন্তু ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকা ভক্তের অভিপ্রেত নয়। তাই ভক্ত-কবির প্রার্থনা—'নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ চিত্তে জাগাও প্রিয়ে'—তাঁর প্রার্থনা—

নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে। (জীবন দেবতা)

শুধু এই জীবনেই নয়, নব-নব জীবনে, অন্য অজানা-পুরেও জীবন দেবতা তাঁকে নূতন প্রেম-ডোরে আবদ্ধ করবেন—এই বিশ্বাস কবিমনে বদ্ধমূল। 'সিন্ধুপারে' কবিতায় রয়েছে এই বিশ্বাসের নিদর্শন—

"অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।
সেই মধুমুখ সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।"

উৎসব, জীবন দেবতা, সিন্ধুপারে ইত্যাদি কবিতায় জীবন-দেবতার সঙ্গে বিবাহের সঙ্কেতে ঈশ্বরের সঙ্গে কবির মিলনই সূচিত হয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভে ভক্তের হয়েছে 'সামীপ্য

মুক্তি' (সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য)। প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রীতিতেই ঈশ্বরের সঙ্গে হয় মধুর মিলন—এই মিলনেই অমৃতত্ব লাভ—এই মিলনেই মুক্তি। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবদ্বাক্য স্মরণ করা যেতে পারে—'ময়ি ভক্তির্হি ভক্তানামমৃতত্বায় কল্পতে।' কিন্তু ভক্তমাত্রই মুক্তিবিষয়ে নিস্পৃহ, তাঁদের কামনা ভগবৎ-সেবা। তাই ত ভক্ত-কবির প্রার্থনা শুনতে পাই—'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।'

প্রাক্-চল্লিশেই যে কবির ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বরানুভূতি লাভ হয়েছিল 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'অন্তরতম' ও 'সমাপ্তি' কবিতাতেও তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। 'অন্তরতম' কবিতায় কবির স্বীকৃতি—

> আমি যে তোমায় জানি, সেতো কেউ জানে না
> তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানে না।
> মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
> কতজনে কত করে পরিহাস,
> পাছে সে না পারি সহিতে
> নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়
> কেহ কিছু নারে কহিতে।
> তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
> সে কথা বলিনে কাহারে।
> সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
> একা আসি তব দুয়ারে।

'সমাপ্তি' কবিতাতেও রয়েছে ঈশ্বর-মিলনের ইঙ্গিত—

> পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা।
> সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি
> একা॥

ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত এই মিলন অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ বা একাত্মতার অনুভূতিকেই কবি বলেছেন আত্মবিলয়ের অনুভূতি শাস্ত্রে একেই বলা হয় মুক্তি। প্রেম-লক্ষণা ভক্তিযোগেই যে এই মুক্তি তারই নিদর্শন রয়েছে চিত্রা কাব্যে। সকলের সঙ্গে সমস্তকে জড়িয়ে যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ—যে যোগের কথাতেই কবি বলেছেন—'বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'—সে যোগ আরও পরে।

—

॥ উপন্যাস ॥

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিতে-না-জ্বলিতে ঝি-রা রঙ্গ করিয়া উলু দিয়া জিগীর দিল "ও দিদি, আইচিস, আয় আয়। তোর নেগে মাঠান হেদিয়া খুন খুন হইচে। তুই বাঁচিবি লো অনেক দিন, তর কতা কইতে কইতেই আসি হাজির হইলি?"

"হ, যা কইচিস, দুঃখি কাঙ্গালগরে যমে চোকে ত্থাখে না।" কহিতে কহিতে কামিনীর মা অগ্রসর হইয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করিল। ঠাকুমা বিনুর গৃহের সোপানে বসিয়া ছিলেন।

সিঁড়ির একধাপ নীচে কামিনীর মাকে ঈঙ্গিতে বসিতে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "আয় রাজেশ্বরী, বোস এইখানে। এতটা পথ হেঁটে এসেছিস, জিরিয়ে নে। ওবেলা তোকে না দেখে ভাবনা হয়েছিল, কাকা কেমন আছে?"

"একটু ভাল মাঠান, বৌমার ঠাকুর্দা ওষুধ দিয়া চাঙ্গা করি তুলিছে। কবরাজ নয়ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। বিহানে মেলা দিব, এমুনি সময় হইল একডা কাণ্ড। কাকী গেইছেল মাঠাইলে (ডোবায়) মুখ ধুইতি, কাদার মধ্যে কাকীর পায়ের তলে পড়িল এই বড় একটা শোল মাছ। দুই হাতে সাপটি আঁচলে বাঁধি নয়া কাকী আইল। কাকা কয় ম্যায়া বাড়ীতে আইলে খাওন-দাওন না কর্য্যা যাওন চলে না। মাচায় নাউ ফলিচে, নাউ দিইয়া শোল মাছের ঝোল রাঁধি দেও। কাঁটা-ছাল দিইয়া পেঁইজের চচ্চরি করি ম্যায়াডারে খাইতে দেও। বাবুগো ঘরে রাজু কত খায় কত পরে, তবু সেডা পরের ঘর। আপন জনার কাছে কবে বা রইল, কবে বা খাইল?" আমি কইলাম, "বাস্তু পুজ্যা হইবে আজ, আমি এহনি যাই?" কাকা কইল "তোর এত ধুম কিসের বিটি, তুই কি মনিব বাড়ীর পুজ্যার পরমান্নি রাঁধিবি? না নবিদ্যি বানাইবি? এ বেলা থাকি খাওন-দাওন কর। ও বেলায় ছুটি পাইবি। তাই রইয়া আইলাম মাঠান, কিন্তুক মনডা আমার ভাল নাই।"

বিনু দরজার পাশে আলোর সামনে বুনিতে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে তরু।

তরু জিজ্ঞাসা করিল, "লাউ দিয়া অতবড় শোল মাছ খেয়ে তোমার মন খারাপ হ'ল কেন? তোমার খাবার মা ঢাকা দিয়ে রেখেছেন, এখন খেয়ে মন ভাল করোগে।"

"আর মন ভালো, হাজু কলু মইর্য্যা মনডা মন্দ করি দিইচে।"

বিনু সচমকে দ্বারে মুখ বাড়াইয়া বলে, "কোন্ হাজু কলু মরেছে?"

"নাঙ্গল বন্দরে হাজু কলু আবার কয়ডা আছে বৌমা? আমাগো ডাকাত হাজু কলু মরি গিইচে। আপন হাতের নোয়ার হাতকড়ি বুকে মারি পরাণ দিইচে।"

ঠাকুমা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, "আহা, হাজু নাই। ডাকাত হ'লে কি হবে, লোকটা ছিল গরীব কাঙ্গালের বন্ধু। ধনীর ধন লুট করে গরীবকে বিলিয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল মেয়েমানুষকে মা কালীর অংশ জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করেছে। শেষকালে সেও আত্ম-ঘাতী হ'ল?"

বিনুর হাত হইতে বোনা খসিয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। হাজু কলুকে সে কতবার দেখিয়াছে, তাহার বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। সেই অজর অমর হাজু নাই। শুনিয়া বিশ্বাস হয় না।

তরু হাজুর আমুল ইতিহাস জানে না। তাহার ভীষণ অত্যাচার ও পরোপকারের বৃত্তান্ত ভাসা ভাসা শুনিয়াছে মাত্র। বিনু বিশদভাবে শুনিয়াছে ঠাকুমায়ের কাছে।

সাধারণ কলুর গৃহে তাহার জন্ম। বাপের জীবিকা ছিল প্রতিবেশীদের শস্য তিল ভাঙ্গাইয়া নিজের ও মাতৃ-হারা একমাত্র সন্তান হাজুর উদর পূরণ।

পুত্রকে সংসারী করিয়া পিতা মহাপ্রস্থান করিলে হাজু পিতার বৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু তাহাতে সংসার প্রায় অচল হইয়া আসে। পূর্ব্বে সংসারে পিতা-পুত্র মাত্র দুইজনা ছিল। এখন চারিজনায় দাঁড়াইয়াছে। হাজুর দুই পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছে, নিজেরা দুই স্বামী স্ত্রী। দুঃখে-কষ্টে দিন কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় হাজুর ভাগ্যবিধাতা তাহার চিরন্তন জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

সেবার পল্লীগ্রামে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করায় এক দিনেই হাজুর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা বিনা চিকিৎসায়

াড়ি ধরিল পরপারে। তখন হাজুর এমন একটা পয়সা ল না, যাহা দিয়া চিকিৎসক ডাকে, ঔষধ কেনে।

স্ত্রী পুত্র কন্যার মৃত্যুর পরেও হাজুকে হাত পাতিতে হইয়াছিল অন্ত্যেষ্টি ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কাছে।

এই সূত্র ধরিয়াই অল্পদিনের মধ্যে হাজু হইয়া উঠিল ডাকাত। হাজু দলপতি হইয়া ডাকাতের দল গঠন করিল। তাহাদের ধর্ম্ম হইল ধনীর অর্থ অপহরণ করিয়া দরিদ্রকে বিতরণ করা। মা কালী হাজুর আরাধ্য দেবী, সুতরাং মাতৃজাতির কেশাগ্রও হাজু-সম্প্রদায়ের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

সেবার নরহত্যার দায়ে হাজুর দল ধরা পড়ে। তাহাদিগকে পাবনার জেলে রাখা হইয়াছিল। জেলে থাকার সময় হাজু একটা দেয়ালের একটি স্থানে প্রত্যহ রাতে দুইবার লাথি মারিত। তাহার সঙ্গীদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল একই স্থানে দুইটি করিয়া লাথি মারা।

কয়েক মাস পরে সেই দেয়াল ভাঙ্গিয়া হাজুর দল পলায়ন করে জেলখানা হইতে। তখন বর্ষাকাল, কারারক্ষকরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, সকলের লক্ষ্য হাজুর প্রতি। দলের অন্য লোকেরা অন্ধকার গভীর রাত্রে এদিকে-সেদিকে বনপথে আত্মগোপন করিবার সুযোগ পাইলেও হাজু তাহা পাইল না।

আত্মরক্ষার জন্য বর্ষার ভরা পদ্মায় তাহাকে ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল।

তাহার পরে বছরখানেক পুলিশ হাজুর সন্ধান পায় নাই। পুলিশের বিশ্বাস হাজু কুমীরের খাদ্য হইয়াছে। কিন্তু মরিয়াও হাজু মরিল না। বছরখানেক পরে হাজুর কীর্ত্তি ঘোষিত হইতে লাগিল দেশ-দেশান্তরে।

ফের পুলিশের চলিল হাজু অভিযান। এবারের অভিযান ব্যর্থ হয় নাই। হাজু ধরা পড়িয়াছিল।

কামিনীর মা শুনিয়া আসিয়াছে বিচারের জন্যে হাজুকে হাতে মোটা হাতকড়ি লাগাইয়া বাহিরে আনা হইয়াছিল। হাজু বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়ে—বলে, পুলিশের কর্ত্তা আমার কাছে আসিয়া হুকুম না দিলে আমি এখানে শুইয়া থাকিব। তাহার হুকুম পাইলে যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব।"

জেলখানা যেন তাহার "মামার বাড়ী", আবদারের সীমা নাই। লালমুখো পুলিসকর্ত্তা কৌতুহলের বশীভূত হইয়া উপস্থিত হইলে হাজু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সালাম শূয়ার বাচ্চা, চোরের জাত, নিজেরা চুরি করিয়া, ডাকাতি করিয়া আমার বিচার-কর্ত্তা সাজিতে আসিয়াছে। আমার বিচার খোদাতাল্লা করিবে। আমি আরও কিছুকাল দুনিয়ায় থাকিতে পারিলে ধলামানুষের লাল রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়া যাইতে পারিতাম। এখন ইহাই দিয়া যাইতেছি—" বলিতে বলিতে হাজু চোখের নিমেষে সজোরে পুলিশ সাহেবকে পদাঘাত করিয়া নিজের বুকে হাতকড়ির আঘাত হানিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাই হইল হাজু কলুর শেষ ইতিহাস।

বিনুর চক্ষু অশ্রুসজল হইল, মনে পড়িতে লাগিল হাজুকে। খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন, সদা-প্রফুল্ল প্রৌঢ় হাজুকে। পথে-ঘাটে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইলে সেই সস্নেহ সম্বোধন, "ছোটমা, কনে যাইচো, ক্যামন আছো?" তাহাকে আর কখনও দেখা যাইবে না। পথের ধুলায় তাহার পদচিহ্ন চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। দরিদ্রের পর্ণকুটিরে কেহ সঙ্গোপনে রাখিয়া আসিবেনা অজস্র দান। পল্লীর পথে-ঘাটে-মাঠে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে না স্ত্রীলোক, দস্যু হাজু কলুর প্রবল প্রতাপে। হাজুর যুগ অবসান।

ঝম ঝম ঝর ঝর টিপ টিপ। রক্তসন্ধ্যা কোদালে-কোটালে মেঘের নিরসন করিয়া রাত-শেষ হইতে ঝিরি ঝিরি বাদল ঝরিতেছে। মাঘের প্রথমে বারিবর্ষণে ঠাকুমা অত্যন্ত ব্যাজার। মাঘের শেষ দিক হইতে বলিতে পারিতেন—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ"। তাহা নয় আসন্ন রটন্তী পূজায় হাড়-কাঁপানো শীতের এটা পূর্ব্বাভাষ। ঝুরু ঝুরু বাদল ধারাকে পল্লীবাসিনীরা বলে ফুলবৃষ্টি। দেবতারা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পুষ্প বরিষণ করেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল হয়। শস্যসম্ভারে বসুন্ধরা ভরিয়া যায়।

সেকালে পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ছত্রধারণ ছিল হাস্যকর। মেয়েদের জন্য বেদিনীরা তালপাতার টেকো বা মাথাইল তৈরি করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করিত। শুধু স্ত্রীজাতি নয়, গরীব কৃষকদের বর্ষা কাটিত মাথাইল মাথায় দিয়া। একটা মাথাইলের দাম চার পয়সা, ছয় পয়সার বেশী ছিল না।

তরু মাথাইল মাথায় দিয়া মেনীর সহিত সখীসম্মিলন সারিয়া গৃহে ফিরিল।

বর্ত্তমানে ঠাকুমার দুইটি বসিবার প্রধান স্থান। এক হাতী সিংহাসন, নয় বিনুর ঘরের সোপান।

বিনু গিয়াছে নিয়মের বারান্দায়। ঠাকুমা একাকিনী অকাল জলোৎসবের উদ্দেশ্যে গজরাইতেছেন। তরু তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "তুমি আপনার মনে

বিড় বিড় করছো কেন ঠাকুমা? বৃষ্টি কি কারোর হুকুমে নামে? আবার মাঘের শেষে নেমে তোমার ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' করবে। ভারী ত তোমার এক রাতের রটন্তী পুজো, তার আবার সাটর। তোমাদের ভোগের চাল তৈরি, মশলার গুঁড়ো কোটা শেষ, আরও কত কি হয়ে রয়েছে, তবু বৃষ্টি দেখে তোমার ভাবনা?"

"ভাবনা কি সাধে করি লো তন্যি, বৃষ্টির পরে শীত পড়বে নতুন করে, সকলকে জমিয়ে দেবে এক রাতেই। মাঘের শীতে বনের বাঘ যে সেও কাঁপে।"

"মাঘের শীত ত দাঁতভাঙ্গা ঠাকুমা, সরস্বতী পুজোর সময় সার চিহ্নও থাকবে না, সেই শীতের তোমার ভয়। রটন্তী পুজোর রাতে আমাদের সারা বাড়ীতে কাঠের গুঁড়ির আগুন জ্বালিয়ে গরম করে রাখা হয়।"

"হ্যাঁ, আমার মহেশের বিলি-ব্যবস্থার কমতি নেই। সকল দিকে তার কড়া নজর। তোদের শরীরে নতুন রক্ত, তাই শীতকে গেরাহ্যি করিস নে। শুনিস নি, এক গরীব বামুন গোটা শীত কাটিয়ে চত্তির মাসের শীত সইতে না পেরে হালের গরু বেচে গায়ের গরম কাপড় কিনেছিল।"

তরু হাসে খিল খিল করিয়া, "কি যে বাজে কথা তুমি বলো ঠাকুমা, চত্তির মাসের শীতে কেউ নাকি শীতের কাপড় কেনে?"

"ঠ্যালার নাম কোষ্টা-কাটা। ঠ্যালায় পড়লে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়। ঠ্যালায় পড়েই বামুন শীতের বস্তর কিনেছিল।"

ঠাকুমা ক্ষণেক মৌন থাকিয়া এবার কাজের কথায় অগ্রসর হইলেন।

তরু রায়বাড়ীর বার্তাবহ। ঠাকুমা তরুর নিকট হইতে কিছুর ইঙ্গিত পাইলে তাহাতে রং প্রলেপ করিয়া থাকেন।

ঠাকুমা বারেক চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁলো তন্যি, রটন্তীতে তোর দিদিরা আসবে না? চিরকাল ত রটন্তীতে এসে দোল করে যায়। এবার কাত্তিকে গেছে অঘ্রান পোষ দুই মাস হল, শ্বশুর বাড়ীর ভাত হজম করছে কি করে?"

তরু ঠাকুমার প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সরলভাবেই উত্তর করিল, "দুই দিদিকেই বাবা আসতে লিখেছিলেন, বড়দির ছোট ননদের বিয়ে ফাগুন মাসে, সে আসতে পারবে না লিখেছে। মেজদি আসবে শিগ্‌গীর, ওর নাকি শরীর খারাপ। আচ্ছা ঠাকুমা, তোমার মেয়ের আসার কথা ত একবারও জিজ্ঞেস কর না? একটা মাঠের এপার-ওপারে পিসীমা থাকেন, বাবা কতবার আনতে চান তবু আসেন না কেন? 'তুমি পিসেমশায়কে খবর পাঠালেই পার'?

"তুই আর হদ্দ করিস না লো তন্যি; 'যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।' যে মেয়ের মা'র 'পরে দরদ নাই, পরের ছেলে জামাই, সে করবে শাশুড়ীর দরদ। আমার হয়েছে—

"আপন ধন পরকে দিয়ে হইছি আমি পাগলপারা,
পরাণ খালি খুঁজে মরে, কোথায় আমার নয়নতারা'।"

"বাবা, শুনে বাঁচি না, পিসীমা তোমার নয়নতারা? আমি ভেবেছিলাম দাদাকেই তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস, এখন বুঝলাম নিজের মেয়ের ওপরে কেউ নয়।" বলিতে বলিতে অভিমানে তরুর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল।

ঠাকুমা আড়চোখে নাতনীর মুখের প্রতি তাকাইয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "তোর দাদা যে আমার কি, তা তুই জানবি কি করে তন্যি। তার কাছে তোর পিসী! এ বিশ্বভুবনে তার মতন আমার আর কে আছে? সে

'শীতের উঢ়নী পিয়া, গিরিষের বা,
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না'।"

ঠাকুমার বৈষ্ণব কবিতা বেশীদূর গড়াইতে পারিল না। ঝুরুঝুরু বৃষ্টির ভিতরে বিনু আসিয়া উপস্থিত হইল সেইখানে।

তরু বিরক্তির সহিত কহিল, "তুমি ভিজে এলে বৌদি কোন আক্কেলে, দেয়ালের গায়ে ছাতা রয়েছে, বারান্দায় মাথাল রয়েছে, তার একটা মাথায় দিয়ে আসতে পারলে না?"

বিনু বলিল, "ভারী ত বৃষ্টি, তার আবার ছাতা, মাথাল, মাথায় কাপড় রয়েছে। এখন আমি নাইতে যাব।"

ঠাকুমা বলিলেন, "এত সকালে বর্ষাবাদলে নাইবি কি লো মণিমালা, তোর সর্দি লাগবে, মাথা ধরবে। আজ নেয়ে-ধুয়ে কাজ নেই। কাপড় ছেড়ে লেপ গায়ে দিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাক বিছানায়, শরীর গরম হোক।"

বিনু হাসে, "বেলা দশটার সময় শুয়ে থাকব কি ঠাকুমা? শরীর আমার ঠাণ্ডা হয় নি। আপনিই বসে শীতে জমে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকে শুইয়ে দিয়ে আসি। ভোগ হ'লে ডেকে দেব। নিজের ঘরে যদি না যেতে

চান, তা হ'লে আমার বিছানায় শোবেন চলুন, আমি লেপ গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। আজ না আপনার রটন্তী পূজোর মোয়া-মুড়কি করতে হবে, আমাকে শুইয়ে রাখলে তার পর"—

ঠাকুমা সচকিত হইলেন। বাদলের সমারোহে এতক্ষণ তাঁহার মনে উদয় হয় নি পূজোর আয়োজনের কথা। একটা উপলক্ষ্য লইয়া রায়বাড়ীর 'তোড়-পাড়' ব্যাপার তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুমা ইষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আজ তোদের মোয়া-মুড়কির দিন, সেটা আমার খেয়াল ছিল না লো মণিমালা। আমি কোন্ দুঃখে ঠিক দুপুরে শুয়ে রইব? লোকে কইবে, 'রোগ-ভোগ নাই, বুড়ীটা বিছানায় গড়াচ্ছে। আজ মোয়া-মুড়কি-তিলের নাড়ু করবি কবে? তার পরে নারকেলের কাজ আছে, চাকররা কয় কুড়ি নারকেল ছাড়াতে নিয়েছে, শুনেছিস তা?"

"না ঠাকুমা, আমি তা জানি না। বাস্তু পূজোর সময় তিলের নাড়ু করে এক হাঁড়ি সরিয়ে রাখা হয়েছিল রটন্তীর জন্যে। এবার বোধ হয় তিলের নাড়ু হবে না।"

তরু তাতিয়া ওঠে, "হবে না কেন, খুব হোক, রাত-দিন তোমরা খটর খটর করতে থাকগে ঐ ঘরের ভেতর। ফণিরাম ঠাকুর চিঠি দিয়েছে, সেও আসছে। বাবা মাকে বলেছেন রুচিরামকে দিয়েই তোমরা নিয়মের কাজ, দুধের সেবা করিয়ে নিও। ও জগন্নাথদেবের ভোগ-রাঁধুনী ছিল, ভাল বামুন। মা তাতে রাজী হয়েছেন। ঐ করুক গে সব, তোমার তাড়াহুড়ো করে নাইবার কি দরকার? আমিও তোমার সঙ্গে নাইতে যাচ্ছি। একবার খবর নিয়ে আমি বাদশা বেগম সাহেব বিবি জলে ভিজচে কোথায় বসে।"

তরু মাথাল মাথায় দিয়া উঠিয়া গেল তাহার পোষ্যদের সন্ধানে। বিনু দাঁড়াইল পেছনের বাতায়নে।

বিনুর গৃহের পশ্চাতে ছোট-খাট এক ফলের বাগান, ফল-বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে ফুলের গাছও আছে, কত ফুল ফোটে। বাছা বাছা কয়েকটা কলমের আমগাছ মনোরমা লাগাইয়াছেন অন্দরের সীমায়। দূরে-নিকটে কত ফলের বাগান রহিয়াছে রায়বাড়ীর। কিন্তু সেদিকে ঘেঁষিতে পারে না অন্তঃপুরীকারা। অথচ ঝড়ের সময় আম কুড়াইবার গুপ্ত বাসনা সকলের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া থাকে।

বিনু ধারাস্নাত ফলবতী বৃক্ষগুলির দিকে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল। শীতে ক্লিষ্ট ধূলায় ধূসরিত তরুশ্রেণী বারিধৌত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। আমের মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে আম্রশাখা। প্রতি ফুলগাছে কলিকার সমাবেশ হইয়াছে। বসন্ত যে জাগ্রত দ্বারে এ বারতা কাননে কুঞ্জে ঘোষিত হইয়াছে। ডালিম গাছের ফাঁকে ও আবার কাহাকে দেখা যাইতেছে? বসন্তের দূত পিকরাজ কখন আসিয়া উপস্থিত? এখনও শীত বিদায় লয় নাই, মাঘ মাস নিঃশেষ হয় নাই, কিন্তু দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ঋতুরাজের আসন্ন আগমন-গীতি। গীত কোথায়, কোকিল ত নীরব, উহার প্রিয় সঙ্গীটি নিকটে না আসিলে কোকিল কণ্ঠের সুধার উৎস খুলিয়া যাইবে না। সে এখনও আসিতেছে না কেন? বুলবুলি ঘুঘু শালিক টুনি পাখীরা বাদলধারা উপেক্ষা করিয়া সকলে সমবেত হইয়া জটলা করিতেছে। একজনা যখন আসিয়াছে তখন তাহার সঙ্গী-সাথীদের আসিবার আর বিলম্ব নাই।

বিনুর এত কাছে থাকিয়া কোকিল ডাকিবে কুহু কুহু তানে, ভাবিতে পুলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। উদাস মন উধাও হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাত-সারে কানন-ঘেরা এক পল্লী কুটিরে। ঠাকুরদার স্নেহ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, ঠাকুমার মমতা-মাখা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, মা'র প্রফুল্ল পঙ্কজ-তুল্য করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তটিনীর কলকল্লোলিত তটভূমি। বাদল ঝরিয়া পড়িতেছে হীরাসাগরের জলে টুপ টুপ করিয়া। বিনু কোমর-জলে দাঁড়াইয়া ঝাঁপরি খেলিতেছে সখী-পরিবেষ্টিতা হইয়া।

চঞ্চল চিত্ত এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। তাহার গতি বিভিন্ন দিকে।

কোলাহলে মুখরিত নগর, সেজ ঠাকুরদা তানপুরা-সংযোগে মেঘমল্লার গাহিতেছেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু চন্দ্র দাদু (উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়) সস্নেহে ডাকিতেছেন, "বিনু দিদিমণি, এই দিকে একটু এসো না ভাই, তোমাকে সেতার বাজনা শিখিয়ে দেই?"

বিনু পলায়ন করিয়া আসিল বাবার কাছে।

জ্ঞানে মহিমায় উজ্জ্বল নেত্র আনত করিয়া বাবা পুস্তকের রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। বিনুর পদশব্দে চোখ তুলিয়া বাবা বলেন, "কি বিনু, আর কিছু বলবি?"

"না বাবা।" উত্তর দিয়া বিনু ছোটে দিদিদের

মহলে। সেখানে আলাপ-আলোচনার খরস্রোত প্রবাহিত। দিদিরা বিনুদের লইয়া আজ যাইবেন থিয়েটারে। জনার টিকিট কেনা হইয়াছে। জনা তারাসুন্দরী, গিরিশ ঘোষ প্রবীর।

বিনুর চিরপরিচিত স্বজনদের মধ্যে ও আবার কে উঁকি-ঝুঁকি দেয়—যাহার কোঁকড়া চুল পদ্মদলের মতন আঁখি-পল্লব, বলিষ্ঠ গঠন।

"বৌমা, আইজ্ঞ তোমাগো হইচে কি? বাগিচায় তাকাইয়া সাপ দেখিচো, না ব্যাঙ দেখিচো? নাওন-ধোওন নাই? ব্যালা না ডুকুর হইয়া গেইচে? নিয়মের কাজ নাই?"

বিনু সচমকে আকাশ হইতে যেন মাটিতে ধপ করিয়া পড়িল। সত্যি ত সে এখানে দাঁড়াইয়া দিবা-স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে কেন? তাহার এ স্বভাব যাইয়াও যায় না। কল্পনার নীলাকাশে মেঘের তরণী বাহিয়া কত বছর কাটিয়া গেল তাহার আকাশ কুসুম চয়নে। না হইল লেখাপড়া শিক্ষা, না হইল গৃহকর্মের নিপুণতা।

বিনু ত্রস্তে ঘাড় ফিরাইয়া অপরাধীর মত বিনয়ে বলিল, "তরু নাইতে যাবে বলেছিল, আমি তরুর জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা ছাড়া কচিরাম ঠাকুর গুড় জ্বাল দিয়ে দেবে শুনেছিলাম, তাই দেরি করছি।"

"হ, রায়বাড়ীর ঠাকরোনরা 'যত পায় তত চায়', পাঁচডা কচিরামকে জড়ো করিলেও তোমাগো 'সরগে যাইয়া ধান ভানিতে' হইবে। আইস বৌমা, আমাগো সনে বইসো, তোমারে ত্যাল মাখায়ে দিইচি। তরুর আশা ছাড়ি দাও। একডা বিলাই ছায়ের গলার ঘুমুর ছিড্যা গেইছে তাই গাঁথিতে নাগিছে।"

বিনু নিঃশব্দে তেলের বাটি লইয়া বসিল কামিনীর মা'র কোলের কাছে। আজকাল অধিকাংশ দিন কামিনীর মা বিনুর স্নানের পূর্ব্বে মাথায় তেল দিয়া দেয়, বৈকালে চুল বাঁধিয়া দেয়। তরুও সখ করিয়া এক এক-দিন বিনুর চুল বাঁধে। পাড়ার কাহারও নূতন ঢংএর খোঁপা বাঁধা দেখিয়া আসিলে তাহার প্রচেষ্টা করে বিনুর কবরী রচনায়। ফলে বিনুর উলু খড়ের অরণ্যে আর জট পাকাইবার অবকাশ পায় না।

গত সন্ধ্যায় তরুর বহু যত্নে বহু আয়াসে রচিত সাত-গুছির বিনুনি খুলিতে খুলিতে কামিনীর মা বলে, "বৌমা, আইজ এতক্ষণেও তুমি পুঁথি নইয়া বইস নাই যে? সারা দিন এত পুঁথি পড়ি তোমাগো কোন্ সুখ হয়? ওয়ার মধ্যে কি রসের সমুদ্দুর তুমি পাইয়াছ? উয়া তোমাগো রাবায়ণ-মহাভারত নয়, তা আমি চিনি, সে হইলগে মোটা মোটা। রাবায়ণ-মহাভারত কত শুনিচি, কিন্তুক তোমাগো এত পুঁথি-পত্তর একদিনও শুনি নাই। পইড়া আমারে শুনাইবা বৌমা? কত রাম-সীতা রাধাকেষ্ট রইচে তোমাগো পুঁথির মধ্যি। ফুলদা কর্ত্তার ঘর থাকি এই বই আনিচে, এই লইছে। কি রইচে ওয়াতে, তোমাগো নেশা ধরাইয়া দিইচে। এবার আমারে একটু শুনাইয়া দিবা?"

কামিনীর মা মিছা বলে নাই, সত্যই বিনুর বই পড়িবার নিদারুণ নেশা ধরিয়াছে। ভাল হোক মন্দ হোক যে পুস্তকের মধ্যে বিনু গল্পাংশের গন্ধ পায় সেই বই গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষিতি পিতার গ্রন্থাগার হইতে নিত্য নূতন পুস্তকের যোগান দিতেছে।

বিনু সংসারের কাজের ফাঁকে বই পড়ে, উল বোনে। হাতের লেখার নম্বরী খাতাগুলো হিজিবিজি লেখায় ভরিয়া গিয়াছে। বোনাও অগ্রসর হইয়াছে অনেকটা। স্বামীর জন্য বিনু মোজা শেষ করিয়া মাফলার ধরিয়াছে। ইহার পরে সোয়েটার। কিন্তু সোয়েটার শেষ হইয়া গেলে তখন কি করিবে? যাহার চিত্তবিনোদনের আশায় এত আয়োজন, তখনও কি সে আসিবে না? বসন্তের কি অবসান হইয়া যাইবে? ফুল ফোটা ও পাখী ডাকার মধুরতা কি আর মিশিয়া থাকিবে না ভুবনে? থাকিবে বইকি—সে যখনই ফিরিবে তখনই বসন্ত জাগিবে বিনুর হৃদয়ে। বিশ্বের বিহগকুল একত্রিত হইয়া অবিরাম সুরের ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া দিবে। কানন কুন্তলা বনশ্রী ভরিয়া যাইবে কুসুম ভূষণে। পুষ্পপরিমল গায়ে মাখিয়া বিনুর চিত্তের জ্বালা জুড়াইয়া দিবে দক্ষিণা সমীরণ।

বিনুর তেল মাখা হইয়া গিয়াছিল, অনেকক্ষণ পর আনমনা বিনু মুখ তুলিয়া কহিল, "আমি যে বই পড়ি, তা শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে মাসী? তাতে তোমার ঠাকুর-দেবতার নাম-গন্ধও নেই। তবু যদি শুনতে চাও, আমি শোনাব তোমাকে।"

কচিরাম মোয়া-মুড়কির গুড় জ্বাল দিতেছিল, গুড়ের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল চারিদিক। কর্ত্তব্যপরায়ণা কামিনীর মা ফুটন্ত গুড়ের ঘ্রাণে সচকিত হইয়া তাড়া দিল, "পুঁথি-পত্তরের কতা পরে কইবা বৌমা, ওদিকে গুড় হওনের গন্ধ পাইচি। চলো, তোমারে চট করি পুকুর থেইক্যা চুবায়ে আনি ঢুকাইয়া দেই গুড়ের কাছে।

দেরি হইলে ফের পাঁচকতা শুনিতে হইবে। ছুতা পাইলে তোমাগো মাজান ননদ ছাড়ি কতা কইবে না।"

বিন্নু স্নান করিতে গেল, বাদলধারা তখন মন্দীভূত।

ঠাকুমার অনুমান মিথ্যা নয়। দুই দিন ধারাবর্ষণ করিয়া আকাশ রৌদ্রকিরণে হাসিতে লাগিল। কিন্তু শেষ বিদায় লইবার সময় শীত মরণ কামড় দিতে ভুল করিল না, কি প্রচণ্ড শীত। উত্তরে বাতাসের সহিত আসন্ন বসন্তের উতলা বাতাস মিতালি করিয়া বন-বনান্তরে গুঞ্জন তুলিল, ঝরঝর খরখর ফিসফাস। ধূলি-বিদূরিত তরুপল্লব শ্যামল চিকন শোভায় মণ্ডিত হইয়া ঘন ঘন শির সঞ্চালন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ তুলিতেছিল। কোকিল ডালিম বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রয় লইয়াছে রায়বাড়ীর পুকুর-পাড়ের বিশাল বকুল শাখায়। তাহার সঙ্গী-সাথীরা আসিয়া জুটিয়াছে, তাই পঞ্চম স্বরের লহরী বহিতেছে ভুবনে কুহু কুহু কুউ কুউ।

ধীর মন্থর গতিতে রায়বাড়ীর রটন্তী চতুর্দ্দশী আগত। দেউরিরা কালী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বরাভয়-দায়িনী দক্ষিণা কালী আসনে স্থাপিত হইয়া বিশ্বে অভয় বিতরণ করিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিতেছেন।

এক রাতের কালীপূজা, তাহা লইয়া ঠাকুমাকে তেমন মাথা ঘামাইতে হইতেছে না। কারণ কয়েকমাস পূর্ব্বেই দীপান্বিতা হইয়া গিয়াছে। এ তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সেই ননদ-ভাজের গ্রাম্য রহস্যালাপ যেন "সবই তোর দাদার মত, ঘণ্টা বাজান বেশীর ভাগ।"

তবু কিছু প্রভেদ আছে, দীপান্বিতা পূজা হয় ঘরে ঘরে। এ গ্রামে রটন্তী এই একখানি মাত্র। গাঁয়ের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রন করা হয়। তাহা ভিন্ন যাহাদের বরাদ্দ তাহারা ত আছেই। রটন্তীতে জোড়া পাঁঠা বলি, পাঁঠার লোভে গ্রাম ঝাঁটাইয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যরাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। জোড়া পাঁঠার অতিরিক্ত আর একজোড়া বলি দিবার প্রথা থাকিলে রায়কর্ত্তা তাহাতে বিরত থাকিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নিয়মভঙ্গ করিতে কে সাহসী হইবে। সেইজন্য রটন্তীর পাঁঠা আনা হয় বৃহৎ, বড় বড় শিংওয়ালা চাপ দাড়ি-সম্বলিত।

পাঁঠার দিকে চাহিয়া ঠাকুমার গায়ে কাঁটা দেয়। এ কি পাঁঠা, না মহিষের বাচ্চা। প্রৌঢ় বয়স্ক ঠাকুমার পুত্রকে কুলপ্রথা বজায় রাখিয়া, বলি দিতে হইবে। তাঁহার আদরের নাতির ওপরে তিনি না রাগিয়া থাকিতে পারেন না। রায় বংশের ঐতিহ্য কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উনি হইয়াছেন বড় পুতুয়া। এক রাতের জন্যও বাড়ী আসিয়া বলির খাঁড়া হাতে লইতে পারিলেন না। লোক দেখাইয়া ডন বৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে, 'কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা' যত সব কলির ছেলে। মুখে মধুর বুলি "ঠাকুমা, ঠাকুমা।" কথায় "চিড়া ভিজানর ওস্তাদ।"

ঠাকুমা শুধু পাঁঠার প্রতি তাকাইয়া অপ্রসন্ন হন না। আকাশ যেন তাঁহার সহিত বাদ সাধিতেছে। ফুটফুটে রোদের মধ্যে হালকা মেঘ সময় সময় ভাসিয়া বেড়ায়। আবার যদি বাদল নামে তাহা হইলে ঘুটঘুটে অন্ধকার চতুর্দ্দশীর গভীর নিশীথে তাঁহার মহেশ জোড়া পাঁঠার শিরচ্ছেদন করিবে কিরূপে? বৃষ্টির জলে মণ্ডপের আঙ্গিনায় পোঁতা হাড়িকাঠের গোড়া আলগা হইতে পারে। এ যে ছোটখাটো পাঁঠা নয় মোষের বাচ্চা।

ঠাকুমা ছেলেমানুষের মত উর্দ্ধে চাহিয়া আপন মনে বিড় বিড় করেন, "কচুর পাতা করমজা এই মেঘখান উড়ে যা"।

মেঘ উড়িয়া যায়, নীল নভোনীলে দিবাকর প্রখর কিরণ বিকীরণ করিয়া বৃদ্ধার চিন্তাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

রটন্তী পূজার দিন মধ্যাহ্নে মধুমতী আসিল শ্বশুরালয় হইতে। সে সর্ব্বসিদ্ধ ত্রয়োদশীতে শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিল।

নাতনীদের পছন্দ না করিলেও ঠাকুমা মধুমতীর প্রতি সদয় ছিলেন। তাঁহার নাতনীদের মধ্যে এইটিই মধুর-ভাষিণী।

ঠাকুমা বারেক মধুমতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "একেই ধলির ধলা গা, তাতে ধলি পুতের মা।" তোর শরীর ভাল না, শুনেই আমার বোঝা হয়েছিল মাগ্যি, তোর ঠেঁজে সোনার চাঁদ এসেছে। বেশি লাফ-ঝাঁপ ধিঙ্গিপনা করিস নে, কাঁচা পোয়াতিকে সাবধানে চলা-ফেরা করতে হয়। তোর এত লজ্জার কি হয়েছে মাগ্যি? মেয়েমানুষের মা হওয়া গরবের কথা। ভাগ্যি আমার মাথা কুটে মরচে, তবু মা-ষষ্ঠী তার দিকে মুখ তুলে চাইছেন না।"

ঠাকুমার বিশদ আলোচনার মধ্য হইতে মধুমতী লজ্জায় সরিয়া গেল।

আবার রায়বাড়ী কর্ম্মের নাগরদোলায় দুলিতেছে। "একে মনসা তায় ধোঁয়ার গন্ধ"। মনোরমা উপবাসী থাকিয়া ভোগ চড়াইয়া দিয়াছেন। বিন্নু জল না খাইয়া শাশুড়ীকে রান্নার সাহায্য করিতেছে। বিন্নু রাশিকৃত

কচুর শাক সেদ্ধ করিয়া নামাইয়াছে। দুই বৃহৎ ডেকচিতে দুই জাতের ডাল তুলিয়া দিয়াছে। পিতলের প্রকাণ্ড কড়াতে পায়েসের দুধ বসাইয়া দিয়া ঘন ঘন হাতা চালাইতেছে।

মনোরমা সস্নেহে তাড়া দিতেছেন, "তুমি এখন বেরিয়ে যাও বৌমা, জল খাওগে। তুমি আমার ঢের রান্না এগিয়ে দিয়েছ, গোকুল পিঠে, কলার বড়া করেছ। আটভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন ধীরে-সুস্থে রান্না করি। ভোগ সরবে রাত দুপুরে, শীতের দিনের ভোগ আগে-ভাগে রেঁধে রাখা যাবে। তুমি এবার বেরিয়ে যাও, আগে জল খেয়ে নিয়ে ওদিকের খবর নাওগে। আজ মাধু এল, আমি এদিকে আটকা। তার জল খাওয়া, নাওয়া হ'ল কিনা খবর নাওগে। মাধুর সন্তান সম্ভাবনা, এবার তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়ো বৌমা। কখন ওর কি খেতে ইচ্ছে লজ্জায় আমাকে বলবে না, তোমাকে বলবে।"

বিনু গলা-সমান ঘোমটা দিয়া পায়েস নাড়িতেছিল, পায়েস প্রায় হইয়া আসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা এটা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যায়। জল মুখে দিলে আর ত ভোগ স্পর্শ করিতে পারিবে না। একথা সে কেমন করিয়া শাশুড়ীকে জানাইবে, কথা বলা যে বারণ।

এমন সময় মুস্কিলে আসান করিল তরু আসিয়া।

তরু বলে "ওমা, তোমার বৌকে কি আজ মেরে ফেলবে রটন্তী পুজোর ভোগ রাঁধিয়ে? তোমাদের পুজোর ভোগ রান্নার খুরে খুরে দণ্ডবৎ?" জল না খেয়ে গলা শুকিয়ে মানুষ মরে যাবে নাকি? তুমি যখন বুড়ো হবে তখন তোমাদের নিত্যি নিত্যি উপোসী ভোগ রাঁধবে কে?"

মা মাছের কাঁটা দিয়া লাউঘণ্ট রাঁধিতেছিলেন। বিরাট কড়ায় খুন্তি চালাইয়া বলিলেন, "তোর ভাবনা কেন রে তরু? আমি যখন অশক্ত হব, তখন বৌমা ভোগ রান্না করবে।"

"তোমার বৌমা, অশক্ত হ'লে তখন কি হবে মা?"

"ক্ষিতির বৌ ভার নেবে, ক্ষিতির পরে স্নুমু বড় হ'লে তারও বৌ আসবে। পূর্ব্বপুরুষের নিয়ম-নিষ্ঠা ওরাই বজায় রাখবে।"

"হ্যাঁ, কত রাখবে তাদের দায় পড়েছে। তারা ঠাকুর দিয়ে ভোগ রাঁধিয়ে দেবে প্রতিমার সামনে। যাদের হাতে তোমরা খাচ্ছ তাদের হাতে তোমাদের দেবতা খাবে না কেন? তোমরা মানুষ, মণিরাম ফণিরাম রুচিরাম কি মানুষ নয়? জগন্নাথ অতবড় দেবতা, তবে তিনি কেন খান ওদের হাতে?"

মা উত্তর দিতে মুখ তুলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উত্তর দেওয়া হইল না। পায়েস প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, মা তাহাতে ঘৃত মধু কর্পূর দিয়া নামাইলেন।

পাথরের কানাতোলা থালা খানাও খোরায় খোরায় ভাগে ভাগে পায়েস তোলা হইল হাতায় করিয়া।

কলার বড়া ও পিঠের থালার পাশে পায়েস সাজাইয়া রাখিয়া মনোরমা বলিলেন, "এবার তুমি জল খেতে যাও বৌমা, আর নয়, অনেক করেছ। দেখ তরু, আমি এদিকে, ওঁরা খেতে বসলে খাবার কাছে তুই কিন্তু থাকিস? মাধু কোথায়, কি করছে? ঠাকুর-ভোগ কি এখনও সরে নি?"

"ভোগ সরাতে গেছে মা, রান্নাঘরেও খাবার জায়গা করা হচ্ছে। মেজদিদির সঙ্গে রুচিরাম ওদিকের কাজ গুছিয়ে রাখছে। সেজদি নেয়ে জলখাবার খেয়ে পান গালে দিয়ে গল্প করছে বন্ধুর সাথে। আমি তোমার সব খবর নিয়ে এসেছি মা।"

"তুই লক্ষ্মী মেয়ে তরু; মাধু কার সঙ্গে গল্প করছে? কে তার বন্ধু?"

"ওবাড়ীর লবঙ্গ পিসী গো, সেজদির খেলার সাথী, প্রাণের বন্ধু। চল বৌদি, তোমাকে খেতে দেইগে।"

বিনু এঁটো হাত ধুইয়া তরুর সহিত বাহির হইয়া আসিল।

আবার ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া 'নাকৃতা পাতার নাকৃতা পাতার'। পাড়া প্রকম্পিত করিয়া "উলু উলু উলু।" ঠাকুমার মনমরা ঝিমান ভাব ঢাকের বাজনায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি মণ্ডপের পেছনের সোপানে আশ্রয় লইয়াছেন। পূজা আরতি বলি ভোগ ও বিসর্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। যতবার ঘণ্টাধ্বনি ততবার উলু। মাঘের শীতল সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি কে এ ভার বহন করিবে, কাহার দায়?

পুরোহিত পূজায় বসিলে বিনুকে লইয়া মধুমতী মাকালীকে প্রণাম করিতে আসিল।

ঠাকুমা ভীত শশঙ্কিত হইলেন "একি মাধ্যি, তুই প্রতিমার সামনে? তোকে না পই পই ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছি, সন্ধ্যের পরে ঘরের বার হবি না? খোঁপায় একটা কাঠি গুঁজে দিয়েছিস ত? কোল-আঁচলে গেরো দেওয়া হয়েছে? আবার হাসি হচ্ছে, এসব

করতে হয় লো। এটা তোর মেম-সাহেবের যুগ নয়। ইলিশ মাছের ডিমের ওপর যেমন তোদের লোভ থাকে, তেমনি লোভ থাকে মায়ের অনুচর ভূত প্রেতের মানুষের পেটের ডিমে। ছুতো পেলেই তারা হাত বাড়ায়। ঐ সময় সবাই সাবধানে থাকে, ধেই ধেই করে না। এসেছিস, মাকে দর্শন করলি, প্রণাম করলি এখন যা, বিছানায় শুয়ে থাক গে। ভোগ হ'লে মণিরামরা তোর শোবার ঘরে খাবার দিয়ে আসবে। ঘরের সাথে তোদের নাবার ঘর, জল স্থল সকল রয়েছে, তুই কোন দুঃখে বের-হবি? মণিমালা, তুই টহল দেওয়া রেখে মাধ্যির কাছে থাকিস।"

লোকজনের ভিতরে ঠাকুমার হিতোপদেশে মধুমতী লজ্জায় লাল হইয়া তখনই বিনুর সহিত মণ্ডপ পরিত্যাগ করিল।

বিছানায় বসিয়া মধুমতী বিনুর হাত মুঠায় চাপিয়া কহিল, "বৌ, এতদিন তুমি আনকোড়া নতুন ছিলে, আমার সঙ্গে কথা বল নি, এখনও নতুনই আছ, কিন্তু তোমার গায়ে পুরোনোর গন্ধ লেগেছে। এবার তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। আমি পান খেতে কত ভাল-বাসতাম, এখন পানও যেন কেমন বিস্বাদ লাগে। ওখানে থাকতে খালি মনে হ'ত তোমার হাতের সাজা পান খেলেই বুঝি ভাল লাগবে।"

বিনু দ্বিধা-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আমি এক্ষুনি আপনাকে পান সেজে দিচ্ছি ঠাকুরঝি।"

"দাও এক খিলি সেজে, খেয়ে দেখি। শোন বৌ, তোমাকে আর একটা কথা ব'লে রাখি,—আমাকে পান দিতে সুপারির বুকো বাদ দিয়ে সুপারি দিও পানে। সুপারির বুকোয় আমার মাথা ঘোরে।"

বিনু হতবাক্—সে তাহার বয়েসে সুপারির বুকোর নাম শোনে নাই। পাকা লাউ-কুমড়ার বুকা বাদ দিয়া কাটিতে হয়, কিন্তু সুপারির—

বধূর হতভম্ব ভাব মধুমতী হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিল, "তুমি বুঝতে পারলে না, সুপারির মাঝখানটাকে আমি বুকো বলছি। আমাকে পান দিতে মাঝ বাদ দিয়ে চারদিক থেকে চাকা চাকা কেটে নিও।"

মধুমতীর নির্দ্দেশে বিনু সুপারির গা কাটিয়া কয়েকটা পান সাজিয়া আনিল।

চারিদিকে পূজাবাড়ীর ব্যস্ত আনাগোনা। রহিয়া রহিয়া ঢাক ঢোল কাঁসী ঝাজ বাজিতেছে। তাহার সহিত উলুধ্বনি। ভিতরে বাহিরে স্থানে স্থানে শীত নিবারণের জন্যে গাছের গুঁড়ির আগুন জ্বলিতেছে দাউ দাউ।

সহসা শাশুড়ীর প্রতি বিনুর মমত্ববোধ জাগিল, অগ্নির উত্তাপে না জানি তাঁহার কত পিপাসা লাগিতেছে। কিন্তু একফোঁটা জল মুখে দিবার উপায় নাই। কতক্ষণে ভোগ সরিবে তবে তিনি জল মুখে ঢালিতে পারিবেন।

বিনু বলে, "ঠাকুরঝি আমি এখন মা'র কাছে যাই, ভোগের কত বাকী দেখে আসি?"

"আমি একটু আগেই দেখে এসেছি বৌ, মা'র সব রান্না হয়ে গেছে, বলি হ'লে মাংস বসবে দুই ডেকচিতে; ভোগের ভাত তখন হবে, আর লুচি। মা'র এখন বয়েস হয়ে যাচ্ছে, এত তাড়ন শরীরে সয় না। দিদি থাকলে এইসব কাজে মা'র অনেকটা সুবিধা হয়। এ বাড়ীতে ঢুকেই যে মা সেই সুরু করে দিয়েছেন তার বিরতি হ'ল না। মা'র বৌ, কালে এখানে ছিলেন বাবার দুই মাসী, পিসী, ছোট ঠাকুমা। তাঁদের কাছেই মা'র হাতেখড়ি, মাসী-পিসীরা মরে গেছে, থাকবার ভেতরে বুড়ী ছোট ঠাকুমা রয়েছেন। তা তিনি এ সংসারে এক দণ্ডও বসে থাকেন না। আমাদের বচন-বাগীশ ঠাকুমা চিরকাল ঐ এক ধরনের। এর পরে মা'র ভার তোমাকেই যে বইতে হবে বৌ, এখন থেকেই তোমাকে তালিম হ'তে হবে।"

"সেই জন্যেই ত আমি আজ মা'র সঙ্গে ভোগ রাঁধতে গিয়েছিলাম, মা আমাকে বের ক'রে দিলেন। আমি যাই দেখি তিনি কি করছেন? ওদিকটায় কেউ নেই।" বলিয়া বিনু গমনোদ্যত হইল।

মধুমতীর একাকী থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। সে বলিল, "পুজোর সাজ নৈবিদ্য জলপানি সমস্তই ত মণ্ডপে চলে গেছে। সেজদি ঘর আগলে করছে কি?"

"মার ধরে বয়েও ত মালা জপ চলত। উনি হয়েছেন ভিন্ন জগতের লোক, 'একটাঁসুরে গাই, পালে না পায় ঠাঁই।' ধরন, ধারন স্বাভাবিক নয়।"

নিমন্ত্রিতদের জন্য বাহির মহলে পান সাজা হইতেছিল। কামিনীর মা আসিল কর্ত্তা-গৃহিণীর পান সাজিতে, তাহাকে মধুমতীর কাছে রাখিয়া বিনু বাহির হইল।

যথাসময় বলি হইল, এক জোড়া লম্বা দাড়িওয়ালা রামছাগলের বিনাশে ঠাকুমার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া কারণে-অকারণে উলু দিতে লাগিলেন।

গভীর রজনীতে মহামায়ার মহা-প্রসাদের লোভে গ্রাম ঝাঁটাইয়া ব্রাহ্মণরা আসিলেন ভোজনে। ব্রাহ্মণদের পরে মণ্ডপের আঙ্গিনা ভরিয়া বসিয়া গেল সাধারণ ইতর শ্রেণীর দল। তাহাদের পরে বাড়ীর সকলে যখন আহারে বসিল তখন পূব আকাশ ফরসা হইয়া গিয়াছে, কাক ভূমে নামে নাই, তরুশাখে ডাকিতেছে কা কা। এক বছরের মতন ইতি হইল রটন্তী চতুর্দ্দশী পূজা।

আম্রশাখা অজস্র মুকুলের ভারে নমিত হইয়া পড়িয়াছে। সকলে আশা করিতেছে এবার আম হইবে প্রচুর। গত বছর আম ভাল ফলে নাই। আগের বছর কম হইলে পরের বছর ফলন হয় বেশি। বিশেষত: বৃষ্টির জল পাইয়া মুকুলের বোঁটা শক্ত হইয়াছে, সতেজ হইয়াছে। আমের মুকুলে মৌমাছিদের আনাগোনা বিরাম-বিহীন। সারাদিন গুনগুন গুনগুন।

কটু-কষায় শাক বর্ণের থোকা থোকা কুল পাতার আড়াল হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তরুর উৎসাহের অন্ত নাই। খাদ্যের প্রতি তাহার প্রচণ্ড লোভ, বিশেষ টকদ্রব্যে। ইহারই মধ্যে সে কাঁচা কুলের সহিত আমের মুকুল ছেঁচিয়া মুখরোচক চাটনি প্রস্তুত করিয়াছিল।

মধুমতীর বর্ত্তমানে টকের উপরে আসক্তি মন্দ হয় নাই। তরুর অখাদ্যের সঙ্গিনী এতকাল একমাত্র বিনুই ছিল, এখন মধুমতী হইয়াছে। বাড়তি লবঙ্গও মধ্যে মধ্যে আসিয়া যোগ দিয়া থাকে। মধুমতীর সহিত লবঙ্গর অখণ্ড বন্ধুত্ব। তাহার বিবাহের দিন ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে, লবঙ্গ সেই কারণে সখী-সম্মিলনে অবহেলা করে না। হাতে তাহার একটা-না-একটা সেলাই লাগিয়া থাকে। বিবাহের বালিসের ওয়াড়ে লবঙ্গ সূচী-শিল্পের নিদর্শন রাখিতেছে। মেয়েটা সেলাই ভাল জানে।

সেদিন মাঘের পড়ন্ত বেলায় মাদুর পাতিয়া সকলে বসিয়াছে। বিনু বুনিতেছে সোয়েটার, লবঙ্গ বিছানার চাদরের চারপাশে পাড় বুনিতেছে। মধুমতী নিষ্কর্ম্মা, শরীর জুত লাগে না। শুধু ঘুম পায়, আলস্য বোধ হয়।

পাথরের এক বাটি কুলমাখা আঁচলের তলায় লুকাইয়া তরু আসিয়া উপস্থিত।

লবঙ্গ আতঙ্কিত, "তরু একি করেছিস? সরস্বতী পুজোর আগে কুল যে খেতে নেই। আর ক'টা দিনই বা সরস্বতী পুজোর বাকী আছে, তোর যে তর সইল না?"

মধুমতী ক্লান্তির হাই তুলিয়া সায় দিল, "তাই ত, কোন্ আক্কেলে তুই সরস্বতী পুজোর আগে কুল মেখে এনেছিস? এমনি ত পাঁচ কলমের বিদ্যা হচ্ছে, তাতে আবার কুল খাওয়া।"

তরু বিনুর সামনে কুলের বাটি সরাইয়া দিয়া খর খর করিয়া ওঠে, "হ্যাঁ, সকলের বিদ্যাই আমার জানা আছে। তোমরা এতদিনে যা শিখেছ আমি এখনই তা শিখেছি। দেখ না ক'দিনেই আমি তোমাদের ছাড়িয়ে যাব। সরস্বতী পুজোয় পাকা কুল দিয়ে তবে কুল খেতে হয়। কাঁচা ফলের আবার বিচার। কাঁচা কুল বাদুরেও খায় না, পাখীতেও ঠোকরায় না, তা খাওয়াতে দোষ কি? "কত শত হদ্দ হ'ল জোনাকী জ্বালায় বাতি"। নাও বৌদি, হাত গুটিয়ে রইলে কেন, খাও? তোমার ত আগেই কুল খাওয়া হয়েছে। দুই-বারে দোষ নাই।"

বিনু বোনা রাখিয়া হাত বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর দুইখানা হস্তও প্রসারিত হইল কুলের বাটিতে।

এমন সময় ঠাকুমা আসিলেন রণে ডঙ্কা দিতে দিতে, "ওলো তন্বি, একি ব্যাভার তোর? তুই জুড়ানকে দিয়ে কাঁচাকুল পাড়িয়ে এনে খাচ্ছিস সরস্বতী পুজোর আগে? রায়বাড়ীর নিয়ম-কাউন রসাতলে গেল। ক'টা দিনই বা মধ্যে, তাই তোর সবুর সইল না। যা হবার নয়, হওয়া উচিত নয়, তোরা তাই করবি নাকি?"

তরু বলিল, "পাকা কুল ত খাচ্ছি না, কাঁচা কুলে দোষ নেই ঠাকুমা, তুমি কর্ত্রী থাকতে তোমার 'রায়বাড়ী' রসাতলে যাবার ভয় নেই।"

'তুমি কর্ত্রী' বড়ই সুমধুর কথা। ঠাকুমা মনে মনে খুসী হইয়া বসিলেন সেইখানে।

মধুমতী এক-থাবলা মাখা কুল মুখে দিয়া চুষিতে চুষিতে বলিল, "আমরা এঁটো করে ফেলেছি, নইলে তোমাকে দিতাম চাখতে। তরু কি সুন্দর মেখেছে। ছেলেমানুষ করে ফেলেছে, তা নিয়ে তুমি মন খারাপ ক'রো না। তুমি থাকতে কিছুই রসাতলে যাবে না। "নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছ তুমি, বাঁশী কেন ডাকে রাধা রাধা।"

লবঙ্গ খিল খিল শব্দে হাসে "আপনিই না সারাদিন বলেন "আঁতুড়ে নিয়ম নাস্তি" মধুর আঁতুড়ের অবস্থা, এখন সকলের সঙ্গে কুল খাওয়া আপনাকে মেনে নিতে হবে।"

ঠাকুমা লবঙ্গকে কোন কালেই পছন্দ করিতেন না, উহার সবজান্তা ভাব ও খলখল হাসির জন্য। "যে মেয়ের

শৃঙ্খল হাসি সে হয় সর্বনাশী” কিন্তু আজ তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন 'আপনাকে মেনে নিতে হবে' শব্দটা মন্দ নয় শুনতে।

ঠাকুমা একগাল হাসি হাসিলেন, “আমার মানা কি তোরা আর মানবি লো লঙ্গ? তোরা যে সকলি ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করে দিলি। কলি কাল ঘোর কলি, কলি না হ'লে তুই রায়গোষ্ঠীর মেয়ে হয়ে ইংরাজি বই পড়িস। নিজের বিয়ের সেলাই-ফোঁড়াই নিজে করিস, ভগবান কলির কল্কি অবতার হয়ে ক'য়ে গেছেন 'কলিকালের মেয়ে মন্দ, পুরুষ হবে মেয়ের দ্বন্দ।' তার বাকী আর কয় দিন?”

লবঙ্গ লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ঠাকুমার মুখে কিছুই বাধে না, এক্ষুনি হয়ত লবঙ্গকে কি বলিতে কি বলিয়া বসিবেন। সেই আশঙ্কায় মধুমতী এ প্রসঙ্গ এড়াইতে কহিল, “ঠাকুমা, তুমি কি শোন নি, তোমার ছোট নাতির যে সরস্বতী পুজোয় হাতেখড়ি হবে। কই, তার যোগাড়-যন্তরের কথা ত বলছ না?”

ঠাকুমা সহসা সচকিত হইলেন, সত্যই তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এত বড় কাণ্ডের অবতারণা হইতেছে। কিন্তু এখানে অরণ্যে রোদন করিয়া কোন লাভ হইবে না। যাহারা প্রকৃত কর্মকর্ত্রী—মা ও মেজ মেয়ে রহিয়াছে যজ্ঞশালায়। কর্তার হুকুমে তাহাদের লেজুর হইয়াছে কচিরাম।

ঘনায়মান সন্ধ্যা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুমা একটা ছুতা ধরিলেন, “মাস্তি, ভরা সন্ধ্যায় তুই এখানে খোলা জায়গায় থাকিস নে, যা উঠে যা, বড় ঘরে। সেখানে লঙ্গকে নিয়ে গল্পগাছা করগে। মণিমালা, আজ বুঝি তোর ছানা-ক্ষীরের পাট নাই? বসে রয়েছিস নিশ্চিন্ত-মনে মধুর বাণী শোনবার আশায়? তরু-তোর মাষ্টার আসে না এখন? আমি যাই, ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করিগে,—

'আমার—দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল যেতে হবে পর পারে
নৌকা বেয়ে এস নেয়ে, ডাকি তোমায় বারে বারে।

ঠাকুমা উঠিয়া গেলেন সদরে হাতীর সিঙ্গাসনে। সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

শীতের প্রচণ্ড প্রতাপ চলিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহা যাত্রাদলের ভাঙ্গা আসরে ডুগডুগি বাজনার মতন। ঠাকুমার চিরন্তন আসন অধিকার করিতে এখন কেহ বাধা দেয় না।

ঠাকুমা উপবেশন করিয়াছেন যথাস্থানে। তাঁহার অদূরে ছোট একটা বেতের ডালায় সুপারি লইয়া কামিনীর মা কাটিতেছে কচ কচ। নিকটে কাহাকে পাইলেই ঠাকুমা উৎফুল্ল, তাহার ওপরে রাজেশ্বরী যে, 'সোনায় সোহাগা'।

ঠাকুমা মাথার ঘোমটা কমাইয়া সুরু করিলেন, “হ্যাঁলো রাজেশ্বরী, তোদের শ্রীপঞ্চমী যে আসা-আসা হ'ল, এখনও তার তোড়-জোড় দেখছি না কেন? রায়বাড়ীতে শ্রীপঞ্চমী হয় ঘটে-পটে, প্রতিমে নেই। সরস্বতী পুজোর সঙ্গে আবার লক্ষ্মীজনার্দ্দনের বসন্তযাত্রা আছে। আবীর দিতে হবে ঘটে-পটে, নারায়ণের গায়ে। খাগের কলম-দোয়াত, দোয়াতে কাঁচা দুধ দিতে হবে। পুজোর আসনে কুল দিতে হবে, পুজো হয়ে গেলে সকলে কুল খাবে। আগে খেলে মা সরস্বতী রাগ করেন, বিদ্যা হয় না।”

কামিনীর মা বলে, “এহন কেবা মানিচে ঐসব মাঠান, ঘোলে-অম্বলে এক হইয়া গিইচে। ছিপঞ্চমীর কাজে ত হইচে কাজের ঘরে। যেঁনাদের পূজা তেঁনাদের তাল আছে সেদিকে।”

“শুনছি সেদিন নাকি সুমুর হাতেখড়ি। শ্রীপঞ্চমীতে ওর দাদাদের হাতেখড়ি হয়েছে। হাতেখড়িতে মাটির এক জোড়া নতুন সরা খড়িমাটি লাগবে। নতুন শ্লেট-পেন্সিল, নতুন কাপড়-জামা। পুরোহিত মন্তর পড়িয়ে পুজোর জায়গায় বসে হাতেখড়ি দেবেন। সরস্বতী পুজোয় যত ধুমধাম ইস্কুলে ইস্কুলে। ছেলেরা আগে থেকেই নাচতে লেগেছে তাধিন তাধিন করে। ওরা কারুর গাছে ফল ফুল রাখতে দেবে না। নিজেদের বাড়ীর পুজোয় মন নেই, যত হল্লোড় ইস্কুলে। দেবদারু গাছে, আমগাছে কি পাতা রাখতে দেবে হতচ্ছাড়ারা। পাতাবাহারের একটা গাছ আস্ত রাখবে না। ভক্তির নামে লবডঙ্কা, খালি হৈ চৈ।”

“বছরকার দিনে ছাওয়ালরা আমোদ-আহ্লাদ করিবে না ত করিবে কেডা? বছর ভরি পুঁথি-পত্তরের বোঝা মাথায় নয়া কাবু হইয়া রইবে। আহা রে, করুক সোরগোল।” বলিতে বলিতে কামিনীর মা কাটা সুপারি লইয়া রাত্রের পান সাজিতে চলিয়া গেল।

ঠাকুমা একাকী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কাহারও কাছে আসিয়া বসিবার নাম গন্ধ নাই। না থাকিলেও তাঁহার বক্তব্য যে এখনও শেষ হয় নাই। তিনি নিয়মের গৃহের দিকে মুখ তুলিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিলেন—“শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী নারায়ণ সরস্বতী তিনজনারই পুজো হয়, জলপানি নৈবিদ্য ভোগ সব তিন ভাগে লাগে। নিরামিষ ভোগ-খিচুড়ি ভাজা

তরকারি লুচি পায়েস দই সন্দেশ যত খুসী দাও। কিন্তু অন্নভোগ দিতে নাই। দিনমানে নিজেদেরও ভাত-মাছ খেতে নাই। সরস্বতীর আসনে বই দিতে হয়, আর বাদ্যযন্ত্র। উনি লিখন-পড়ন গান-বাজনা খুব ভালবাসেন কি না। ভাল না বেসেই বা করেন কি? যাঁকে স্বামী করেছিলেন তিনি গেলেন লক্ষ্মীঠাকরুণের মুঠোয়। সেই দুঃখে উনি বই নিয়ে গানে বাজনায় মত্ত হ'লেন। সেই জন্যে ত লক্ষ্মীসরস্বতী এক জায়গায় বসতি করতে পারেন না। "লক্ষ্মী যারে কৃপা করেন সরস্বতী হন তার ওপরে বিমুখ। তবু লোকে তিনজনাকে একসঙ্গে আরাধনা করে।"

রান্নাঘরে রান্না হইয়াছে খাইবার আয়োজন হইতেছিল। নিয়মের ঘরে আলো নির্ব্বাপিত, দ্বারে তালা দেওয়া হইয়াছে।

মধুমতী খাইতে যাইবার সময় বলিল, "একলা বসে আপন মনে বকবক করছ ঠাকুমা, তোমার মাথা যে গরম হয়ে গেল। যাও, শুয়ে পড়, শীত এখনও যায় নি। এখনও ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে তোমার সরস্বতী পুজোয় করতাল বাজাবে কে?"

ঠাকুমা উঠিলেন, সত্যিই ত বুড়া হাড়ে ঠাণ্ডা সহিতে চায় না। তাঁহার সর্দ্দি-কাশি হইয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীপঞ্চমীতে পাড়া কাঁপাইয়া উলু দিবে কে?

সুমুকে খুব সুন্দর দেখাইতেছে। তাহার নূতন কস্তাপাড় ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী বিনু ও তরু শিউলি ফুলের বোঁটার রংএ ছোপাইয়া দিয়াছে। নিজেদেরও জামা-কাপড় ছোপিয়া লইয়াছে।

শরতের শিউলি ফুলের বোঁটা তরু রৌদ্রে শুখাইয়া সঞ্চিত করিয়া বড় বড় মোটা বোতল ভরিয়া তুলিয়া রাখে বাসন্তী পঞ্চমীর জন্য। বাজারের বাসন্তী রংএ কাপড় ছোপাইলে এমন স্নিগ্ধ কোমল মিষ্টি গন্ধ হয় না কাপড়-জামায়।

সুমুকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া দিয়াছে বিনু। চোখের কোলে কাজল টানা-ললাটে সাদা চন্দনের টিপ। শিউলি বোঁটা রংএর জামা-কাপড়।

পূজান্তে পুরোহিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সুমুর হাতেখড়ি দিলেন। ঠাকুমা আনন্দে গদগদ স্বরে উলু দিতে লাগিলেন। সুমু গর্ব্বিত মুখে গুরুজনদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বাড়ীর সকলে ভক্তিভরে দেবী বাণীর উদ্দেশে ঘটেপটে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিল, "জয় জয় দেবী চরাচর সারে—" মধুমতী অঞ্জলি দিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া একপাশে সরিয়া রহিল। তাহার এই পঞ্চম মাস। সন্তান-সম্ভাবনা পঞ্চম মাস হইলে দেবার্চ্চনার অধিকার থাকে না।

সরস্বতী পূজার পরে রায়বাড়ীর জোড়া ইলিশ মাছ ঘরে লইবার প্রথা আছে। এক গাদা ইলিশ মাছের মধ্য হইতে কামিনীরমা দুইটি নিটোল ইলিশ মাছ বহিয়া আনিয়া রাখিল বিনুর নিকটে।

এ অনুষ্ঠান দাসীরা পালন করিতে পারে না। বাড়ীর লোকদেরই করিতে হয়।

কুলার উপরে দুইটি মাছ পাশাপাশি রাখিয়া বিনু তাহাদের মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা ও ধান-দূর্ব্বা দিয়া লইয়া গেল রন্ধনশালায়। ঠাকুমা উলু দিলেন।

হারাণী আনিয়া রাখিয়া দিল মাছকোটা বঁটি, এক গামলা জল। বিনু রান্নাঘরের বারান্দায় বসিল মাছ কুটিতে। যে মাছ ঘরে নেয় মাছ কুটিয়া লাউডগা দিয়া তাহাকেই মাছ রান্না করিতে হয়। পরিবেষনে কোন বাধা নাই। সকলেই করিতে পারে।

আহারের পরে মধুমতী বিনুকে বলে, "বৌ, কি চমৎকার মাছের ঝোল তুমি রান্না করেছিলে, বাবা খেয়ে মহাসুখী। আমি জানতাম তুমি ভাল রান্না শিখবে, যার হাতের সাজা পান মিঠে হয়, তার রান্না ভাল না হ'য়ে যায় না।"

বিনু পুলকিত, একদিন মধুমতীর দাদাও ভাল বলিয়াছিলেন।

গাছে গাছে পাকাকুল ঝম ঝম করিতেছে। ছোট নটর কড়াইয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট আমগুলি দিনে দিনে বড় হইতেছে। বসন্তের চঞ্চল বাতাস সস্নেহে দোলা দিয়া যায় অপরিণত ফুলের থোকায়, নব-কিশলয়ে সজ্জিত তরু-পল্লবে, ফুটন্ত ফুলে ফুলে।

ফাল্গুন আসিয়াছে 'ফাল্গুনে গোবিন্দ দোল ফাগ ছড়াছড়ি।' বাংলা দেশে দুইটি প্রধান সমারোহ শরতে শক্তির উপাসনা। বসন্তে বোষ্টবের ভক্তি মহিমা। শরতে যেমন আকাশে-বাতাসে আশা-উদ্দীপনার সীমা থাকে না, বসন্তে তাহারই শিহরণ জাগে কানন-কান্তারে, পুষ্প-পরিমলে, মানব-হৃদয়ে।

তরু মহাব্যস্ত, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে ধরিবে। এদিকে পাকা কুল ওদিকে কুদে কুদে আম। দুইটি বস্তুই অতিশয় লোভনীয়।

তরু প্রভাতের দিকে কুলের সেবা সারিয়া অপরাহ্ণের

জন্তে রাখিয়া দেয় আম্র সাধনা। তাহার প্রিয় বস্তুর অংশীদার মন্দ হয় নাই। বিনু, মধুমতী, লবঙ্গ, মেনী।

বসন্তে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়—কবির প্রবাদ-বাণী। শুষ্ক কাষ্ঠ ঠাকুমাও এখন মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছেন। নাতনীদের রসনাতৃপ্তিকর মুখরোচক খাদ্যের সামনে উপবিষ্ট হইয়া সময় সময় হাত বাড়াইয়া দেন। মানুষ বৃদ্ধ হইলে নাকি শিশুর পর্য্যায়ে যায়, ঠাকুমাও তাহার ব্যতিক্রম নন। তরু নানাবিধ চাটুনি তৈরি করিয়া এখন হইতে একটু সরাইয়া রাখে ঠাকুমার জন্যে। হাজার হইলেও তিনি সকলের বড় রায়বাড়ীর আদি জননী। তাঁহাকে এঁটো খাইতে দিয়া কে পাতকীর ভাগী হইবে।

ফাল্গুন মাস পড়ায় তরুর সকল কর্ম্মের বড় কর্ম্ম হইয়াছে ইটাকুমুড় পূজা। বিনুর পুবের বারান্দার নীচে শিউলি গাছের ছায়ায় ইটাকুমুড় ও কুমড়ী স্থাপন করিয়াছে। দোল-বেদীর মতন তিন থাকে ছোট একটি মাটির বেদী, বড়টির বামভাগে অপেক্ষাকৃত আরও একটি বেদী, বড় বেদী ইটকুমড়, ছোট ইটাকুমড়ী। তাহাদের মাথায় পোতা হইয়াছে কুলের ডাল। ইঁহারা বন দেব-দেবী। প্রভাতে তরু, বেদী নিজের হাতে লেপিয়া তকতকে করে, সাঁজে পূজা।

এ-পূজায় সরস্বতীর সাহায্য লইতে হয় না। ধূপ দীপ জ্বালাইয়া সামান্য জল মিষ্টিউপকরণ লইয়া তরু পূজা করিতে বসে। এ দেবতার প্রিয় বনফুল, তাই দিন-ভোরে সংগ্রহ হইতে থাকে টকটকে লাল মাদার (শিমুল) ফুল, বাবলা, ভাঁটি পালটা মাদার ঘাসের ফুল।

শিমুলের পত্রবিরল গাছ রাঙ্গা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সারাদিন ঝরিয়া পড়িতেছে টুপ টুপ করিয়া।

তরুর পূজার স্থানে ঠাকুমা উপস্থিত থাকেন পূজান্তে উলু দিতে। মধুমতী ও বিনু পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত সরিয়া যায় না। তরু ভক্তিভরে পূজার মন্ত্র বলে—

ইটাকুমুড়ের মালো, ভিটা বাঁধি দে
তোমার ছায়াল করবে বিয়া বাজনা আনি দে।
বাজনা আনিতে আনিতে পথে পড়ে খ্যায়া,
সেই খ্যায়া তুলি নিল হরেমপুরের দ্যায়া।
হারেমপুরের ব্যাটাগরে লম্বা লম্বা কোঁচা
দুই গালে দুই ঠোকনা দিয়া বৌ করিল বোঁচা।

রাশি রাশি ফুলে পূজা হইয়া গেল? এক রেকাবি বাতাসা ও এক ঘটি জল নিবেদন হইল। এবার প্রণাম—

"এবার যাওরে ঠাকুর খাজ পাচড়া নিয়ে
আরবার আইস ঠাকুর শঙ্খ সিন্দুর নিয়া
এবার যাওরে ঠাকুর আথাল পাথাল নিয়া
আরবার আইস ঠাকুর ধান চাল নিয়া।"

ঠাকুমা উলু দিলেন। সকলে প্রসাদ পাইল। গোটা ফাল্গুন মাস সন্ধ্যায় এই পূজা প্রচলিত। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে দ্বিপ্রহরে পায়েস পিঠা দিয়া ভোগ পূজা সমাধানের পরে দেবতার বিসর্জ্জন।

মধুমতী সোপানে হেলিয়া এক মুঠো বাতাসা মুখে পুরিয়া মুরমুর করিয়া চিবাইতেছিল। ঠাকুমা তাহাকে ধমক দিলেন, "ছাঁচতলায় বসেছিস, কেন মাগি, এ-সময় ছাঁচতলায় বসতে নেই, সরে বোস।

'হাদে গো, নন্দরাণি, তোর শ্যামকে কোলে দে,
শ্যামের অঙ্গ পরশ করি জ্বালা জুড়াই রে।"

"কি কথার চোট রে বাবা।" বলিতে বলিতে মধুমতী সেখান হইতে উঠিয়া বিনুকে আড়ালে ডাকিয়া কহিল "দেখ বৌ, তোমাদের সুপারির হাঁড়ি থেকে আমাকে পাঁচটা খাড়া সুপারি বেছে এনে দিতে পার? চ্যাপটা নয়, খাড়া খাড়া হ'বে।"

বিনু কহিল, "খাড়া সুপুরি দিয়ে কি করবেন ঠাকুরঝি, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

"যা করি কাল সকালে দেখ, আমার কাল লাগবে ধীরে সুস্থে দিলেই চলবে।"

বিনু চলিয়া গেল, এই অবকাশে প্রসাদকে চিঠি লিখিতে। আজ তাহার চিঠি আসিয়াছে। মধুমতীও বঞ্চিত হয় নাই। তাহাকে ও তাহার স্বামী চিঠি দিয়াছে।

পরের দিন মধুমতীর খাড়া সুপারির রহস্য বিনু বুঝিতে পারিল।

একটি পাত্রে সিঁদুরের কৌটা, কয়েকটা পান-সুপারি লইয়া মধুমতী মা'র হাতে দু'টি পান ও একটি সুপারি দিয়া কপালে সিঁদুর পরাইয়া প্রণাম করিল। পরে বিনুকে দিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বিনু বয়েসে তাহার ছোট, কিন্তু সম্বন্ধে বড় ভ্রাতৃ-বধূ, মাননীয়া।

বাড়ীর দুই সধবাকে পান-গুয়া দিয়া মধুমতী আর তিনটি সধবাকে পান-গুয়া দিতে চলিয়া গেল লবঙ্গদের বাড়ীতে।

বিনু চুপে চুপে কামিনীর মাকে প্রশ্ন করে, "মাসী এ পান-সুপারি হাতে দেবার মানে কি?"

"এত বড় ম্যায়া, তাও কি জান না বৌমা? ওয়ারে কয় মা মঙ্গল চণ্ডীর নামে খাড়া গুয়া দেওন।

ভঁনার নামে মানত করি, কাজ সিদ্ধি হইলে কেউ দেয় পাঁচ এঁয়োর হাতে, কেউ দেয় সাত জনারে। স্বোয়ামির পত্তর আইতে দেরি হওনেও নাগি ঠাকুজ্জি মানত করিছেল খাড়া গুয়া। কাল পত্তর আইল তোমাগো পত্তরের সাথে, তাই দিইচে খাড়া গুয়া।"

বিনুর সহসা মনে পড়ল সুবর্ণ দিদিকে। সেইবার, সেই ভূত ছাড়ানো। স্বামীর চিঠির জন্য কত ব্যাকুলতা। ইহারা সকলে এমন করে কেন? সামান্য চিঠির মধ্যে থাকে কি?

শীতের পরে হঠাৎ গরম পড়িয়াছে, প্রভাত ও সন্ধ্যায় শীতল শিরশিরে ভাব থাকিলেও দ্বিপ্রহরে প্রখর তাপ। আহারাদির পরে মধ্যাহ্নে যে যাহার নিজের গৃহে খানিকটা গড়াইয়া লইতেছে।

বিনু শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিজস্ব একখানা নির্জন ঘরের অধিকারিণী হইয়াছে, ইহা তাহার কম সুবিধা নহে। মেঝেয় শীতল পাটি পাতিয়া বিনু অনেক দিন পরে হাতের লেখা লিখিতে বসিয়াছে। তাহার বুনিবার সরঞ্জাম বোনার বাক্সে উঠিয়াছে। স্বামীর জন্য মোজা মাফলার ও সোয়েটার যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে তাহার বেনারসী শাড়ীর বাক্সে কর্পূরের মালা দিয়া। তাহার দূর-সম্পর্কের এক মাসী পুরী হইতে তাহাকে আনিয়া দিয়াছিলেন দু'টি কর্পূরের মালা।

বিনু খাতায় লিখিতেছে যাহা মনে আসিতেছে। লিখিতে বসিয়াছে বটে, কিন্তু মন তাহার ছুটিয়া যাইতেছে পেছনের বাগানের ভিতরে। সেখানে ছোট ছোট আম ঝুলিতেছে শাখায় শাখায়। নিঝুম বনপ্রান্তে ঝরাপাতা মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়াছে। বিহগ-স্বর বিরত। নিভৃত নীড়ে তাহারা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। এমন সময় ক্ষিতি আসিয়া ডাকিল "বৌঠান, আমাকে দুটো টাকা দিতে পারেন? বড্ড দরকার। আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

ক্ষিতির আজ ছুটির দিন।

বিনু খাতা হইতে মুখ তুলিল, "কি দরকার তোমার? কি কিনবে?"

"সে এক দুর্লভ জিনিষ বৌঠান, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। গোক্ষুরো সাপের মাথার আটালি। ছোট সাদা পাথরের কুচির মতন সাপের মাথায় থাকে।"

"তা দিয়ে কি হয়?"

"তাও জানেন না? সাপের আটালি কাছে থাকলে সে লোকের কোথায়ও হার হয় না। সে মামলায় জিতে যায়, পরীক্ষা দিলে সকলের ওপরে হয়ে পাশ করে।"

বিনু ভাবে তাহার এ হেলা-ফেলার দিন চিরকাল থাকিবে না। সময় আসিলে তাহাকে ফের পড়ার বই পড়িতে হইবে, একজনার নিকটে পরীক্ষা দিতে হইবে। এমন অমূল্য রতন সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিয়া দিতে পারিলে আর পরীক্ষার ভয় থাকিবে না।

সামান্য দুই টাকার বিনিময়ে এমন অসামান্য বস্তু পাইলে কে ছাড়িতে চাহে?

বিনু ক্ষিতিকে টাকা দিয়া কহিল, "তুমি দুটো সাপের আঠালু পাবে, আমাকে কিন্তু একটা দিতে হবে। কোথায় সাপ ধরা হয়েছে, কত বড় সাপ?"

"প্রকাণ্ড গোক্ষুরো সাপ বৌঠান, আচার্য্যদেব ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ থেকে দুই সাপুড়ে ধরেছে। এখন নিয়ে যাবে কবরেজ বাড়ীতে বিক্রি করতে। দুই সাপের মাথার আঠালু আমি দু'টাকায় নিতে যাচ্ছি। আমার যেটা থাকবে দরকারের সময় আপনি সেটা আপনার কাছে রাখবেন। এটাতেই দুজনার চলে যাবে। আর একটা আমার বন্ধু হারাণকে দেব বলেছি। ওরা বড় গরীব, টাকা দিয়ে কিনতে পারে না। ও এবার ক্লাশে উঠতে পারে নি। এই জিনিস পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিলে ফাষ্ট হ'বে আপনি দেখে নেবেন।"

বিনু হাসিল, "শুধু হারাণ কেন, তুমিও ফাষ্ট হবে পরীক্ষায়?" ক্ষিতি প্রসন্ন হইয়া মহাউৎসাহে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

অলস দ্বিপ্রহরে বিনুর আর লেখার আগ্রহ রহিল না। উদাস হৃদয় উধাও হইল হীরাসাগরের তটবর্ত্তী শ্যামল-সুন্দর এক শান্তির নীড়ে।

সাপুড়েরা দুইটি নূতন মাটির হাঁড়িতে মুখে নূতন সরা চাপা দিয়া দুই বিশালকায় গোক্ষুরো সাপ ধরিয়া আনিয়াছে। বিষ-বড়ি তৈরির জন্য ঠাকুরদা উপযুক্ত মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন। ভেষজখানার পাশে বিরাট কাঠের চুল্লীতে কত শেকড়-বাকড় গাছ-গাছরা সিদ্ধ হইয়া ঔষধ তৈরি হয়।

চুল্লীর উপরে মাজা-ঘষা ঝকঝকে প্রকাণ্ড তামার ডেকচি বসানো হইল। ডেকচির মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইল বালতি বালতি দুগ্ধ। সাপুড়েরা আজ এখানে থাকিয়া যাইবে। শ্রীধরের প্রসাদ পাইবে পেট পুরিয়া। বিষ-বড়ি না হওয়া অবধি তাহাদের ছুটি নাই।

তামার ডেকচির মুখে লোহার মোটা তারের জালি ঢাকনা দেওয়া হইল।

ঢাকনার ফাঁক দিয়া সাপুড়েরা বিরাট্ দুই সাপকে নিক্ষেপ করিল দুধের ভিতরে। তাহার পরে লোহার সরু শিকলে ডেকচির মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

সাপ প্রথমে ভীষণ গর্জ্জন করিল, পরে শান্ত ও প্রফুল্ল, দুগ্ধে অনবরত ডুব দিতে লাগিল, হাঁ করিয়া দুধ খাইতে লাগিল। কিন্তু তাদাদের ভাগ্যে দুগ্ধে স্নান দুগ্ধপান বেশিক্ষণ চলিল না। চুল্লীতে কাঠের আগুন জ্বলিতে লাগিল দাউ দাউ।

বিষধরদের সে কি আস্ফালন সে কি গর্জ্জন! জালের উপরে সে কি ছোবল, দাপাদাপি।

বিনু আর দেখিতে পারে নাই, সভয়ে পলায়ন করিয়াছিল মায়ের কাছে। কাঁদিয়া মা'র কোল ভাসাইয়া দিয়াছিল।

মা মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, "যারা জীবের অনিষ্টকারী তাদের জন্যে তোর কান্না কেন বিনু? তুই গেলি কেন ওই সব দেখতে? ওদের মরণে জগতের কত উপকার হবে। ওই বিস-বড়িতে কত মুমূর্ষু রোগী জীবন ফিরে পাবে।"

বিনু তখনকার মত শান্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার অদৃষ্টে ছিল আরও এক বিপর্য্যয়।

দুধ নূতন বস্ত্রে ছাঁকিয়া চাঁছি করা হইয়াছে। ঘন কালি বর্ণ তাহার রং। সরিষার দানার আকৃতি অসংখ্য বড়ি তৈরি হইয়াছে পাথরের পরাতে। তামার ডেকচি ও কাঠের বৃহৎ খুন্তি জলে ভিজানো হইয়াছে। পুকুরে কিংবা নদীতে এ' পাত্র ডুবাইয়া রাখিবার উপায় নাই। জল বিষাক্ত হইবে, জলচর মরিয়া যাইবে। সাপুড়েরা আগুনে পোড়াইয়া পাত্র পরিষ্কার করিবে।

বিনুদের বাড়ীতে একটি আদরের বিড়াল ছিল, নাম বুধি। বেলা-শেষে বুধি আসিয়া ঢলিয়া পড়িল বিনুর পদতলে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, সকলে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বুধিকে বাঁচানো গেল না। বুধি দুধের গন্ধে লোভাতুর হইয়া কাঠের খুন্তি চাটিয়াছিল। সেই বিনুর প্রথম শোক, হৃদয়ের তীব্র জ্বালা। ইহার পরে ঠাকুরদা আরও সতর্ক, সাবধান হইয়াছিলেন।

ক্ষিতির বর্ণিত সর্প সাপুড়েরা কোথায় লইয়া যাইবে? তাহার ঠাকুরদার কাছে কি?

যেখানেই লইয়া যাক বিনু আর সে-দৃশ্য দেখিতে চায় না। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়, বারে বারে যায় না।

দোলযাত্রার পূর্ব্বে শিব চতুর্দ্দশী ব্রত। পৃথিবীতে শিবের অগণিত ভক্ত। শিবরাত্রি সমাগমে "হর হর মহাদেব, বম বম," জিগিরে কানে তালা লাগিয়া যায়।

দুই ঠাকুমা শিবরাত্রির উপবাস হইতে বিরত হইয়াছেন। শক্তিতে আর কুলায় না বলিয়া ব্রতভঙ্গ করিয়াছেন। মনোরমা ও সরস্বতী ত আসল ব্রতী আছেনই, নকল ব্রতী মধুমতী এবার দলভ্রষ্ট হইয়াছে। এ সময় তাহার ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান পালন অবিধি। তরু ও বিনু মাকে ধরিয়াছে তাহারা শিবরাত্রির উপবাস করিবে।

মা তরুকে বলেন, "এক দণ্ড কাল যার খাবার বিরাম নাই, সেই ক'রবে দিনরাত উপবাস। এবার বাদ দে, আর একটু বড় হ'লে তখন করিস। বৌমা, তুমিও পারবে না বাপু, উপোস অভ্যাসের দরকার, এমনি হয় না।"

বিনু চুপে চুপে তরুকে বলে, এর আগে সে শিব-রাত্রি করিযাছে, উপোস করিতে সে পারিবে।

সরস্বতী কাছে ছিল, সে ঠোঁট বাঁকাইয়া মন্তব্য পাশ করে—"শিবরাত্রি না করলে কি এমন ভাগ্যি কারোর হয়।" মধুমতী সায় দেয় "যা বলেছ মেজদি, আমাদের বৌয়ের ভাগ্য ভাল, দাদার মতন মহাদেব পেয়েছে।"

সরস্বতী ভ্রাতার প্রতি সদয় নয়, মহাদেবের উপমায় সে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "মহাদেব না নন্দী-ভৃঙ্গি। যেমন দেবা তার তেমনি দেবী।"

কি কথায় কি কথা, মধুমতী ব্যথিত হৃদয়ে বিনু-তরুকে লইয়া সরিয়া আসিয়া বলে, "মেজদির কথায় মনে কিছু ক'রো না বৌ, ওর ধরনই অমনি। দাদাকে দেখতে পারে না, যা-তা বলে দেয়। আমি ভাল করেই জানি, দাদা তোমার শিবপুজোর ফল, সাধনার ধন। মা যখন বারণ করলেন তখন শিবরাত্রি করা এবার ছেড়ে দাও। আসছে বছরে তরু তুমি আমি—তিন জনা মিলে করা যাবে। আর তুমি দিন-রাত উপোস করে পেরে উঠবে না। ওঁরা সারা রাত জাগবেন, পুরোহিত এসে সারা রাত জেগে চার প্রহরে ওঁদের চারবার শিবপুজো করাবেন। কাঁচা দুধ দই মধু ঘি চিনি দিয়ে শিবকে স্নান করিয়ে পুজো। দুইজনার মাটির শিব আটটা গড়ে দিতে হবে। পুজোর সোজা নট-ঘট নাকি? সাজ নৈবিদ্য জলপানি সাজানো, ন্যাদয় চাল বানানো। উপোস করে তুমি অত পারবে না।"

তরু জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা সেজদি, শিবরাতের ন্যাদর চাল কি দিয়ে তৈরি হয়?"

"সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পরে একজনা যেমন জিজ্ঞেস করছিল 'সীতা কার বৌ?' তোরও দেখছি সেই দশা। জন্মকাল থেকে শিবরাতের ন্যাদর চাল খেয়ে বলছিস, 'কি দিয়ে তৈরি হয়?'' কি আবার, আতপ চাল ভিজিয়ে আধা-কোটা করে তার ভেতরে দিতে হয় সাদা তিলভাজা আদা, সমস্ত জিনিস আধাকোটা করে তা মাখতে হয় গুড় দিয়ে, এক-রত্তি কর্পূর ছিটিয়ে। শিবের প্রিয় খাদ্য, তাই শিব-রাতে জলপানিতে দিয়ে তাঁর ভক্তেরা প্রসাদ পায়।"

শিবরাত্রি সম্বন্ধে গৌরচন্দ্রিকার দুই দিন পরে শিবরাত্রি সমাধা হইল। সংযম পূজা পারণ ব্রত কথা শ্রবণ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইল।

শিব চতুর্দ্দশীর পর হইতে ধীর মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল দোল যাত্রার আয়োজন।

দুর্গোৎসবের মত দোলযাত্রা অত সমারোহ না হইলেও ছোট নয়। রায়বাড়ীর দোলে বহু লোক নারায়ণের প্রসাদ পাইয়া থাকে। হোলির উৎসবে অনেকে যোগ দিয়া থাকে।

ইহাদের দেব দোলের পরে গোঁসাইদের শ্যাম-রায়ের পঞ্চম দোল।

কালো কষ্টি পাথরের গঠিত শ্যামরায়ের বৃহৎ মনোহর মূর্ত্তি। দ্বিভুজে মুরলী বাদন করিতেছেন। চূড়ায় শিখিপাখা। গলায় সোনার কণ্ঠমালা দুই-বাহুমূলে বলয়। গায়ে রূপার নূপুর। রূপার আঁখি-যুগল ঝকঝক করিতেছে, তাহার মধ্যস্থলে নীল প্রস্তরের দুইটি নয়নতারা। এ সম্পদ্ শ্যাম রায়ের ভক্তদের দান।

গোঁসাইদের ব্যবসা গুরুগিরি যজন-যাজন। শ্যাম রায়ের কৃপায় এবং মহিমার খ্যাতিতে গোঁসাইবাড়ী একদা সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হওয়াতে অধুনা শ্যাম রায়ের পসার প্রতি-পত্তি অনেকটা খর্ব্ব হইলেও এখনও দোলযাত্রার মহোৎসব হয়। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য লইয়া দোকানীরা শ্যাম রায়ের প্রাঙ্গণে মেলা বসাইতে আসে। নাগরদোলা আসে। যাত্রা কীর্ত্তন কবি আউল-বাউলের আসর বসিয়া যায়। দেব দোলের সময় হইতেই মেলার সূচনা। মেলা জমিয়া ওঠে শ্যাম রায়ের পঞ্চম দোল কেন্দ্র করিয়া। মেলা দেখিতে আসে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের অধিবাসীরা।

বাল্যকালে শ্যামরায়ের মেলায় বিনুরা কতবার আসিয়াছে। গরুর গাড়ী পথের বাঁকে রাখিয়া রায়-বাড়ীর নীচের গলিপথে পদব্রজে মেলায় গিয়াছে।

নববধূ বেশে রায়বাড়ীতে প্রথম পদক্ষেপ করিয়া বিনুর মনে হইয়াছিল এগৃহ যেন তাহার দেখা, চেনা। তখন রায়-ভবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রকাণ্ড সিংহ, দরজার দুই পাশে দুইটি ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছ। সিংহ দরজার গায়ে দোলায়মান পিতলের দুইটি বড় বড় পাখীর পিঞ্জর। একটা শুভ্রবর্ণের এক কাকাতুয়া, অন্যটায় নীলকান্তমণি এক ময়না। তাহারা কথা শিখিয়াছিল। পথিককে দেখামাত্র ডাকিত, "আয়রে আয়, আয়রে আয়।"

মেলায় যাওয়া-আসার সময় বিনুর কতবার দৃষ্টি-পথে পড়িয়াছে গোল বারান্দার আঙ্গিনায় একটি কিশোরকে সাইকেল-চালনা শিক্ষা করিতে। তখন কে জানিত যে এই প্রসাদ।

তখন কে জানিত যে বালিকা গলিপথের ধুলায় পদচিহ্ন আঁকিয়া মেলায় চলিয়াছে তাহারই ভাগ্য-সূত্রের সহিত রায়-পরিবারের ভাগ্যসূত্র একত্রে গাঁথা হইয়া যাইবে। সেই বুদ্ধিহীনা শিক্ষাহীনা ছোট মেয়েটি এক-দিন তাহার অক্ষম দুর্ব্বল লেখনীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইবে রায়-বংশের অকথিত কাহিনী। কাল অসম্ভবকে সম্ভব করে, যুগ-যুগান্তের কল্পকল্পান্তরের পার হইতে অব্যক্ত বারতা টানিয়া আনিয়া ব্যক্ত করে।

ক্রমশঃ

ভারতীয় স্থাপত্য ও তার প্রয়োগ

শ্রীগোবিন্দ মোদক

কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত সব বিষয়ে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা লেখালিখি করছি, বোঝাচ্ছি, বুঝে নিচ্ছি। কিন্তু শিল্প, এর ঐতিহ্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। শিল্পের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের স্থাপত্য, এরও যে ঐতিহ্য আছে, এরও যে একটা ভবিষ্যত আছে, এটাও যে একটা ভাববার কথা তা বলতে গেলে আমরা ভুলেই গিয়েছি। দেড় হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় স্থাপত্য তার সে শ্রীমণ্ডিতরূপ যাদুঘরের চৌদেওয়ালের ঘেরাটোপ পরে আর গহন অরণ্যের মধ্যে আর্কিওলজি-ক্যাল সার্ভের তকমা এঁটে বিদেশীদের বিস্মিত করছে মাত্র।

বিদেশী ভাস্কর্য্যের অপসারণ নিয়ে বিধান সভা থেকে লোকসভা পর্য্যন্ত আলোচনা চলছে। ভাষার ক্ষেত্রেও দেখছি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দিতে অনেকে আগ্রহান্বিত। আলেকজাণ্ডার টেলার, লর্ড আউটরামের মূর্ত্তি অপসারণ আর ইংরেজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দিলেই কি আমাদের গ্লানিময় অধ্যায়টি আগতদিনের ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যাবে? ইংরেজ শাসকবর্গের উদ্ধতমূর্ত্তি যেমন স্বাধীন ভারতের কলঙ্ক, তেমনি বর্ত্তমানের বিদেশী স্থাপত্য আমাদের গ্লানি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠছে বিদেশী স্থাপত্য—গ্লানিময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ইংরেজ-আমেরিকানদের আলমারি ও দেশলাই নক্সায় গৃহপরিকল্পনা করছি। কিন্তু আমাদের আগ্রা, জৌনপুর, খজুরাহ, ইল্লোরা, এমনকি কম্বোডিয়া, জাভা, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় স্থাপত্য যে অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করছে সে সংস্কৃতি আজ কোথায়! রামমোহন যুগে আমাদের যে অনুকরণ স্পৃহা জেগেছিল, আজ ইউরোপীয়
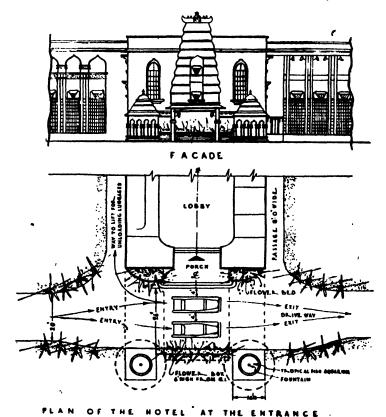
দক্ষিণ ভারতে নির্ম্মীয়মান প্যাণ্ডেয়ান হোটেলের প্রবেশ-পথের প্রস্তাবিত প্ল্যান ও সম্মুখভাগের অংশ
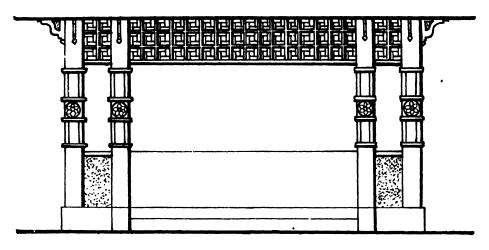
ভারতীয় স্থাপত্য অনুসারী স্বল্পমূল্যের পার্ক-আশ্রয়স্থল

স্থাপত্যের অন্ধ অনুকরণ তারই ভিন্নরূপ মাত্র। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে দেখি কি সাহিত্য, কি শিল্প তার পিছন পানের ইতিহাস দেখেছে, তার থেকে কিছু নিয়েছে, বর্ত্তমানের অন্য দেশ থেকেও কিছু নিয়ে মিশিয়েছে। এগিয়ে চলেছে রাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তিতে নবসংস্কৃত হয়ে একই ঐতিহ্য নিয়ে। কিন্তু যেখানেই দৃষ্টি পিছনে প'ড়ে শুধু এগিয়েই গিয়েছে অন্ধ অনুকরণ ক'রে সেখানেই দেখি তা শেষে পঙ্গু হয়ে ভেঙে পড়েছে শতাব্দীর মধ্যে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সেই ঐতিহ্যের সাহায্য নেওয়া দরকার। মূল কাঠামো যেন এক থাকের তারপর বর্ত্তমানের স্পর্শ ত পড়বেই। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনে, টাইম ও স্পেসে স্থাপত্য তার রূপ বদলাতে বাধ্য। আমাদের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাতে তাই দেখি অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কত পার্থক্য, কিন্তু তার মূল কাঠামো এখনও অপরিবর্ত্তিত। হিন্দু পারিবারিক সম্পর্ক সেই শাশ্বত ঐতিহ্যকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সেই পুরোণ কাঠামোর প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে মেক্সিকোর পয়লা-নম্বর শিল্পী আলফেরো সিকির কলকাতায় এসে বলেছিলেন.ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য মহান। সেই ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় বর্ত্তমান কালের সঙ্গে থাপ খাইয়ে ভারতীয় সমকালীন শিল্পীরা যদি শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, তবেই হবে সার্থক সৃষ্টি। পুরোণ কাঠামোর প্রয়োজন বললে অনেকে মনে করেন যেন অতীতকে রোমন্থন করতে বলা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। এটাও অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা যে, হিন্দু বা মুঘল বা বৌদ্ধ স্থাপত্যকে কোনক্রমে বর্ত্তমানের ছাঁচে ঢালতে পারলেই ভারতীয় স্থাপত্য পুনর্জীবন লাভ করবে। প্রাচীন শিল্পের নকল-নবিশীর দ্বারা কোন শিল্পকলারই উন্নতি হয় না—তার পরিকল্পনার অনুশীলনই আসল কাজ।

ভারতীয় স্থাপত্য বলতে অনেকেই অজন্তা, পুরী বা কোণারক ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। তাঁদের ধারণা ঐসব মন্দিরে যে সব নক্সা হয়ে গেছে তাছাড়া আর নতুন কিছু করার নেই। অর্থাৎ বর্ত্তমানে ভারতীয় স্থাপত্য প্রয়োগ করতে হ'লে সেই এক একটা নক্সা, এক একটা স্তম্ভ যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এবং তা অত্যন্ত অর্থসাপেক্ষ। এ অভিযোগ ছাড়াও ভারতীয় স্থাপত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে অভিযোগ আছে তা হচ্ছে—

১। ধর্ম্ম মন্দির ছাড়া প্রয়োগ করা যায় না।
২। ট্রাডিসন বহুপূর্ব্বে নষ্ট হয়ে গেছে।
৩। বর্ত্তমানে উপযুক্ত স্থপতি ও কারিগরের অভাব।
৪। বহু অর্থসাপেক্ষ।

ব্রিটিশ রাজত্বকালেও অনুরূপ প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল যখন হ্যাভেল, জোসেফ কিং প্রমুখ মনীষীরা ভারতীয় স্থাপত্যের প্রয়োগের অনুকূলে মত প্রকাশ করছিলেন তখন গর্ডন স্যাণ্ডারসন, জেবগ প্রভৃতি শিল্পজ্ঞদের নিয়ে এক কমিশন গঠিত হয়। তাঁদের সেই ১৯১৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ধর্ম্মমন্দির ছাড়া ষ্টেশন, সরাইখানা, অফিস-বাড়ী এমন কি বাসগৃহেও ভারতীয়
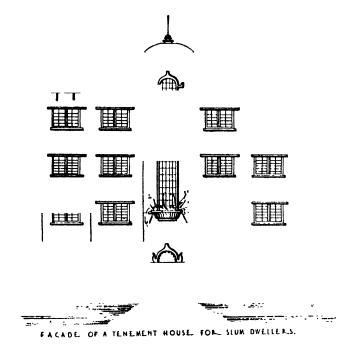
বস্তীবাসীদের জন্য প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটবাড়ীর স্বদেশী স্থাপত্য প্রভাবিত সম্মুখ দৃশ্য

স্থাপত্য নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা নিঃসন্দেহে এই কথাই জানিয়েছেন যে, ধর্ম্মমন্দির ছাড়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক রুচি, প্রগতি ও সহজপ্রাপ্য দ্রব্য অনুযায়ী ভারতীয় স্থাপত্য প্রয়োগ করা সম্ভব, সুলভ ও সহজ। এই কমিশন* ছাড়াও বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলি ভারতীয় স্থাপত্য প্রয়োগ করা যে সম্ভব, সুলভ ও সুন্দর এ মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় স্থাপত্যের যে ট্রাডিশন নষ্ট হয় নি সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে ভারত সরকারের তদানীন্তন কনসাল্টিং স্থপতি জন বেগ লিখেছেন:

"These photographs should amply prove to any who might have doubt on the point—the fact of the survival to the present day of a living tradition.

এমন কি গোঁড়া ইংরাজী সাপ্তাহিক মর্নিং পোষ্ট ২২শে জানুয়ারী ১৯১৩ সালে লিখেছে:

"That the imposition upon a country of a foreign style of building is bound to have a paralysing effect on its creative output and labour generally is a proposition which must not only seem inevitably true to every thinking mind, but the truth of which we have proved upto the hilt by our melancholy experience. Yet this is the action we mediate in regard to India."

অন্য আর একজন ইংরেজ স্থপতি এফ. ও. ওরটেল—যিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন এবং যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলেছেন:

"I have now completely come round to the view that salvation for India lies in the adoption of some form of oriental architecture which has grown up in the country and is most suited to its climatic and other conditions.—Indian architecture is undoubtedly the most suited to the needs of India and it is my firm conviction that Indian Architecture is bound to prevail in the end over all
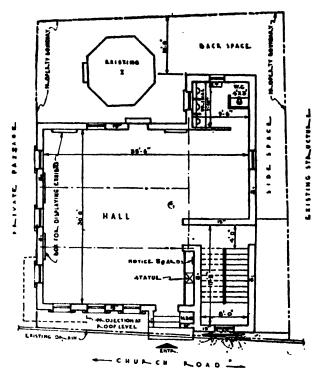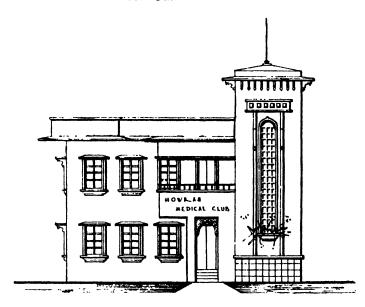
হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাবের নবনির্মিত ভবনের ব্যয়বাহুল্যহীন ভারতীয় স্থাপত্যরূপ
(প্ল্যান ও সম্মুখ দৃশ্য)

imported styles, whether we like it or not and whether we help on the process or not."

এঁদের. এই সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত আজকের দিনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ভারতীয় স্থাপত্যের বিরুদ্ধে
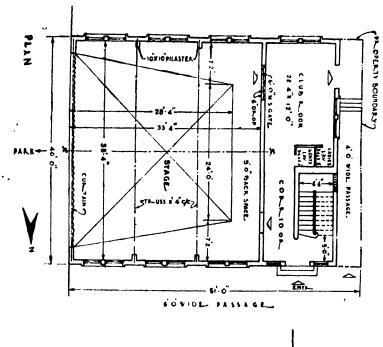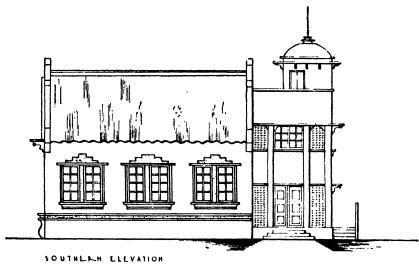
রাণাঘাট শিশু-উদ্যান সংলগ্ন ক্লাবঘরের (মঞ্চসমেত) ভারতীয় স্থাপত্য প্রভাবিত রূপ
(প্ল্যান ও সম্মুখ দৃশ্য)

যে অভিযোগ আনা হয়, তা যে নিতান্তই অলীক ও বাস্তব-সম্পর্কশূন্য তা ইদানীংকার কতকগুলি অট্টালিকাও প্রমাণ করতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশন (গোলপার্ক), বসু বিজ্ঞান মন্দির, পার্কসার্কাসে ফজলুল হকের বসতবাড়ী, বিড়লা প্ল্যানিটারিয়াম, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, কন্নেমারা বিল্ডিং, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র প্রভৃতি ভারতীয় স্থাপত্যকলার আধুনিক প্রয়োগের সার্থক রূপায়ণ।

প্রয়োজনীয়তাই হচ্ছে স্থাপত্যের প্রধান কথা। কি বিদেশী, কি ভারতীয় সকল স্থাপত্যেই আগে প্রয়োজনীয়তার কথাই স্মরণ করতে হবে। তার পরই দেখতে হবে সৌন্দর্য্য। এখনকার অন্ধঅনুকৃত বিদেশী স্থাপত্যে আমরা

না প্রয়োজনীয়তা, না সৌন্দর্য্য কোনদিকেই লক্ষ্য রাখি না। বর্ত্তমানে দেখা যায় সূর্য্যালোককে বাড়ীর ভেতর না ঢুকতে দেবার জন্য অকারণ কংক্রীটের পাতলা স্ল্যাব চতুর্দ্দিক দেওয়াল ঘিরে রয়েছে। বিশেষ কয়েক ক্ষেত্র ছাড়া সূর্য্যালোককে বাধা দেবার কোন কারণ দেখি না। টি-বোর্ডের বাড়ীর, নতুন টেলিফোন ভবন প্রভৃতিতে অনুরূপ ব্যবস্থা হাস্যাস্পদ। এই কংক্রীটের খোপ সাধারণ বায়ু-চলাচলে কতটা যে বিঘ্ন করে তা চিন্তা করি না। বিশেষ করে অকারণ এই অলঙ্করণে খরচও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল। বর্ত্তমানে এও একটা ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, অট্টালিকার সম্মুখভাগে যে কোন প্রকারে হোক খাড়া ও সমান্তরালভাবে সিমেণ্টের স্ল্যাব দিতে পারলেই বিদেশী স্থাপত্যের চূড়ান্ত ও সুন্দর প্রয়োগ হবে। কিন্তু এই অযৌক্তিক fins ও apron ইত্যাদি প্রয়োগে সুন্দরের প্রশ্ন বাদ দিলেও, মোট খরচের দিকে যে অকারণ অঙ্কবৃদ্ধি হচ্ছে তা চিন্তার কথা। ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক, নূতন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, টেলিফোন ভবন প্রভৃতিতে এইরকম স্থাপত্যকলা প্রয়োগ হয়েছে এবং মুক্ত বায়ুচলাচল যা আমাদের মত দেশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাকে বাধা দিয়েছে। বাসন্তী দেবী কলেজ, এল-আই-সি অফিস, নিউ সেক্রেটেরিয়েট, হাওড়ার হেড পোষ্ট অফিস প্রভৃতি ইমারতে যে স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে আর কিছু থাকলেও সৌন্দর্য্য বলে কিছু নেই। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও সেটা ফেলনার নয়। যখন কল্পনার দৈন্য আসে তখনই এইভাবে অপরের পিঠে ভর দিয়ে না দাঁড়ালে স্থপতিদের উপায় থাকে না। জাতির হৃদয় অনুধাবন করতে গেলে জাতির স্থাপত্যকলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক স্থান অধিকার করে দেখতে পাওয়া যায়। "ভারতের স্থাপত্যের প্রাচীন আদর্শ এখনও অনির্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় আহিত আছে, এখনও পুরাতন হ'লেও তা জাগ্রত, জীবন্ত ও নূতন।" বাইরের সঙ্গে প্রাণের, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যেখানে হবে মিতালী, সেখানেই আসবে পূর্ণতা। তাজের মধ্যে প্রকৃতির যে লালিত্য প্রকাশ পেয়েছে, আবুপাহাড়ের দিলওয়ারা, খাজুরাহর মহাদেবের মন্দিরের হিল্লোলিত রেখাপুঞ্জ, বিষ্ণুপুরের মন্দিরের বৈচিত্র্যে যে সৌকুমার্য্য প্রকাশ পেয়েছে তা যুগযুগান্তর ধরে মানবকে মুগ্ধ করবে। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে যা নিতান্তই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেই বিদেশী স্থাপত্যকে জোর করে প্রয়োগ করলে তা পঙ্গু হয়ে পড়বেই। যা অলীক, এবং নিতান্তই অসম্বদ্ধ উপায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, যে-স্থাপত্যের কোন সংহত আদর্শ নেই তা কোন যুক্তিবলে অনুকৃত হচ্ছে তা বিস্ময়ের কথা। স্থাপত্যকে কৃত্রিমতার মুখোস ছেড়ে সহজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। "অনুকরণ মাত্রই দুষ্য নয়, তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ আত্মঘাতী।" আমরা সেই অন্ধ অনুকরণেই বিদেশী স্থাপত্য প্রয়োগ করে যাচ্ছি। যা-কিছু পশ্চিম থেকে অনুকৃত তাই আধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট—এই আমাদের মনোভাব। জাতির হৃদয় অনুধাবন করতে গেলে জাতির স্থাপত্যকলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক স্থান অধিকার করে, তা আমাদের ভুললে চলবে না। "একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য।" সেই জন্য স্থপতিরা যখন স্থাপত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করতে বসেন, তখন তাঁরা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন তা বলা যায় না। ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে অকারণে বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ আম গাছে আপেল ফলানর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ, কলাকৌশল, সৌকুমার্য্য আমাদের নিজেদের চর্চ্চা করে জানতে হবে—আমাদের শিল্পে আমাদের অধিকার পেতে হবে। স্থাপত্য শিল্পে আমরা যেদিন অধিকার পাব সেইদিন সবকিছুই সুন্দর করে জানব—জানব কি করে সুলভে ভারতীয় স্থাপত্য আধুনিক রুচি ও প্রগতি অনুযায়ী আরও নূতনরূপে প্রয়োগ করা যায়, প্রয়োজনের সঙ্গে কেমন করে সৌন্দর্য্যকে এক করা যায়। "স্থাপত্য শীর্ষস্থান অধিকার করে অগ্রদূত না হ'লে সমস্ত শিল্পই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়ে পড়বে। এটা সম্ভব কি অসম্ভব সে প্রশ্ন ওঠে না। সম্ভব না হ'লে সমস্ত রূপবিদ্যা ছেড়ে দেওয়া ভাল। শুধু তাতে সময় ও অর্থ নষ্ট হবে এবং যদি শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা হয়, তাতে অগণিত অর্থব্যয় হয় তবুও তাতে খাঁটি কিছু হবে না।" আলেকজাণ্ডার টেলারদের মূর্ত্তি অপসারণে বা কোন ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দিলেই আমাদের অতীত ইতিহাসের কলঙ্কের পাতাটি ছেঁড়া যাবে না, যদি না সভ্যতার গোড়ার কথা সেই স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা করি দেশীয় সভ্যতার মঙ্গল বেদীতে।

॥ গল্প ॥

পথের ধারে

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজে, আপ প্যাসেঞ্জার আসবার সময় হয়েছে। অতি ছোট স্টেশন, সারা দিনে তিন-চারখানা প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর কোন গাড়ি দাঁড়ায় না। স্টেশনের গায় বটগাছের নীচে টিনের চালায় চা-এর দোকান, জীর্ণ তক্তপোশের উপর কেৎলী কাপ সাজান, দুটো বয়ামে কিছু বিস্কুট রাখা, পাশে একটা উনুনে ঢাকা-দেওয়া ডেকচি চাপান। তক্তপোশের এক প্রান্তে কাত হয়ে শুয়েছিল ফটিক, গাড়ির ঘণ্টা শুনে উঠে বসে, এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর থেকে ঠেলে দেয়, একখানা পাখা নিয়ে নিভন্ত উনুনটায় হাওয়া করে।

একটু পরে মাথায় ছোট একটি ঝুড়ি নিয়ে বটতলায় আসে কুসুম। চা-এর দোকানের পাশে বসে সে পান বেচে। গাঁয়ের মেয়ে কুসুম, ছোটবেলায় কবে তার বিয়ে হয়েছিল ও বছর না ঘুরতে বিধবা হয়েছিল তা তার মনেই পড়ে না। পোষাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে বৈধব্যের কোন লক্ষণই নাই। পরনে চওড়া পাড় শাড়ী, হাতে বেলোয়ারী চুড়ি, নাকে নাকছাবি। কুসুম দেখতে বেশ, বয়স তিরিশের কাছাকাছি হ'লেও বিশ-বাইশ বলে মনে হয়।

তক্তপোশের উপর কুসুম ঝুড়িটি নামিয়ে রাখে। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার কাপড় ফেলে দেয়, ফটিক তার মুখের দিকে চাইতেই সে হেসে ওঠে। ফটিক বলে, "এখানে তোর ঝুড়ি রাখলি কেন, যা, তোর জায়গায় বোস গে যা।"

কুসুম সে কথা কানে তোলে না, ফটিকের পাশে ব'সে বলে, "দে পাখাখানা আমি হাওয়া করি।"

ফটিক ভুরু কুঁচকে বলে, "কেন? আমার কাজ তুই করবি কেন?"

কুসুম ঘাড় বেঁকিয়ে ফটিকের মুখের দিকে চেয়ে হাসে, বলে, "তোর কাজ করতে ভাল লাগে।"

কুসুমকে ঠেলে দিয়ে ফটিক খেঁকিয়ে ওঠে, "স'রে বোস, রোজ রোজ কাজের সময় এসে বিরক্ত করিস কেন?"

একটু স'রে বসে কুসুম।

উনুন ধরে উঠতেই খালি বালতিটা নিয়ে ফটিক স্টেশনের কলে জল আনতে যায়। কুসুম সেই ফাঁকে দোকানের সামনেটা ঝাঁট দেয়, তক্তপোশখানা আঁচল দিয়ে ঝাড়ে, সিগারেটের প্যাকেট, বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই, টুকটাক সব গুছিয়ে রাখে। তারপর ফটিকের ভাঙা আয়নাখানা তুলে নিয়ে চট্ ক'রে একবার মুখ দেখে নেয়। জল নিয়ে ফিরে এসে ফটিক বলে, "এ সব কি হয়েছে?"

কুসুম বলে, "কি আর হয়েছে, একটু গোছগাছ ক'রে রাখলাম।"

কেৎলিতে জল ভ'রে সেটা উনুনের উপর চাপিয়ে দিয়ে ফটিক আবার তক্তপোশের উপর উঠে বসে। কুসুমও এসে বসে, খপ ক'রে ফটিকের ডান হাতখানা বলে, "দেখি হাতখানা।"

ফটিক বিরক্ত হয়ে বলে, "কেন, হাতের আবার কি দেখবি?"

কুসুম জবাব দেয় না, নিজের আঙুল থেকে একটা রূপোর আংটি খুলে নিয়ে ফটিকের আঙুলে পরাতে পরাতে বলে, "পরশু শ্রীপুরের বাজারে গিয়েছিলাম, তোর জন্যে এইটে কিনে এনেছি।"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আংটিটা খুলে ফেলে দেয় ফটিক, বলে, "আমার আংটি পরবার সখ নাই।"

কুসুম মুখ কালো ক'রে বলে, "তুই কেমন গো?"

রুখে উঠে ফটিক বলে, "কেন, কি হয়েছে! কি করেছি তোর?"

কুসুম আবার হাসে, বলে, "না গো, কিছু করিস নি, রাগ করছিস কেন! অমনি বললুম।"

ফটিক বলে "যা, তোর জায়গায় যা।"

"যাচ্ছি গো, যাচ্ছি" বলে কুসুম ঝুড়ির ঢাকনা খুলে একটা সাজা পান তুলে নিয়ে ফটিকের মুখের কাছে ধ'রে বলে, "পান খা।"

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফটিক বলে, "আবার!"

কুসুম বলে, "তোর জন্যে যত্ন ক'রে মশলা দিয়ে সেজে এনেছি—খা।"

মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকে ফটিক, বলে, "না, আমি খাব না খাব না।"

পানটা ঝুড়িতে রেখে দিয়ে তার থুতনি ধ'রে মুখখানা ঘুরিয়ে কুসুম বলে, "দরকার নেই পান খেয়ে, এইবার একটু হেসে কথা ক।"

কুসুমের দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকিয়ে ফটিক বলে, "যা, যা, তোর জায়গায় গিয়ে বোসগে যা, আমার খদ্দের আসছে।"

কুসুম তাকিয়ে দেখে নীল রঙের জামাটা কাঁধে ফেলে স্টেশনের কুলী গণেশ আসছে। গণেশ ফটিকের রোজকার খদ্দের, কুসুমের পানেরও সে রসিক। ফটিকের

হাতে একটা চিমটি কেটে কুসুম উঠে পড়ে, আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝুড়ি তুলে বটতলায় এসে বসে।

গণেশ বলে, "দে, চা দে এক পেয়ালা।"

পেয়ালায় চা ঢেলে এগিয়ে দেয় ফটিক। এক চুমুক চা খেয়ে গণেশ মুখ বেঁকিয়ে বলে "চিনি দিস নি?"

"ফটিক বলে, "দিয়েছি ত।"

গণেশ বলে, "দিস নি, নিজেই সব চিনি খেয়ে ব'সে আছিস্, দিবি কোত্থেকে!"

ফটিক গণেশের পেয়ালায় আবার এক চামচ চিনি ঢেলে দেয়। আরও দু'-চারজন খরিদ্দার এসে ফটিকের দোকানে জমা হয়। কাউকে গেলাসে, কাউকে মাটির খুরিতে চা ঢেলে দেয় ফটিক। আসর জমে ওঠে। কুসুমও পান বেচে, আসর জমে সেইখানেই বেশী। চা শেষ করে এক ফাঁকে গণেশ কুসুমের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে, "সাজ ত একটা পান।"

পান সাজতে সাজতে কুসুম বলে, "বোস্ না গো।"

গণেশ শুকনো গলায় বলে, "বসে আর কি হবে, তাড়াতাড়ি সেজে ফেল, খেয়ে চলে যাই।"

গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে কুসুম বলে, "কেন, কি হ'ল, বোসোই না।"

গণেশ বসে। পান সাজতে সাজতে কুসুম বলে, "আজ মন-মেজাজ অমন কেন?"

গণেশ কোন জবাব দেয় না।

পান এগিয়ে দিয়ে কুসুম বলে, "কি হয়েছে বলবে না?"

গণেশ চারিদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, "বেশ ত জমেছে তোমাদের?"

হাতের কাজ বন্ধ করে কুসুম প্রশ্ন করে, "কি জমেছে?"

"নাও, আর ন্যাকামি ক'রো না—ফট্‌কের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?" বলে গণেশ।

মাথা নীচু ক'রে একটু হেসে কুসুম বলে, "না গো, কোন কথাই ত হচ্ছিল না।"

ভগবান চোখ দিয়েছেন সেই চোখ দিয়ে দেখলুম, তা বেশ ত।" বলে গণেশ।

মুখ টিপে টিপে হাসে কুসুম।

একটু শ্লেষের সঙ্গে বলে গণেশ, "কত দিন!"

ফোঁস ক'রে ওঠে কুসুম, বলে, "কেন? জান, ও আমাকে খুব ভালবাসে।"

হেসে গণেশ বলে "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ গো তাই, আমার পথ চেয়ে ব'সে থাকে। একদিন পান সেজে নিজের হাতে মুখে তুলে না দিলে, হেসে কথা না কইলে বলে যেদিকে দুচোখ যায় সে দিকে চলে যাব।"

গণেশ বলে "সত্যি?"

কুসুম বলে "সত্যি। এই দেখ।" হাত উঁচু ক'রে আঙুলের আংটিটা দেখায় কুসুম।

গণেশ বলে, "বাঃ বেশ আংটি ত, কিনেছ বুঝি!"

কুসুম মুচকে হেসে বলে, "দিয়েছে।"

অবাক্ হয়ে গণেশ বলে, "কে দিয়েছে, ফট্‌কে?"

কুসুম মাথা নেড়ে বলে, "হুঁ, শ্রীপুরের বাজার থেকে আমার জন্যে কিনে এনেছে।"

গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, গণেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বলে, "ঐ প্যাসেঞ্জার এসে পড়ল, চলি।"

দেখতে দেখতে ফটিকের দোকানও খালি হয়ে যায়। চা-এর পেয়ালাগুলো জড় করে ফটিক। পানের ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে কুসুম এসে দাঁড়ায়, বলে, "তুই সরে বোস, আমি ধুয়ে-মুছে রাখি।"

জবাব দেয় না ফটিক। ঝুড়িটা রেখে কুসুম কাছে গিয়ে বসে, বলে, "দে, আমাকে দে।"

রুখে ওঠে ফটিক, চড় উঁচু করে বলে, "আবার এলি বিরক্ত করতে! এই বার আমি মারব তোকে।"

মুখখানা এগিয়ে দিয়ে হেসে কুসুম বলে, "তাই মার।"

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

বিশেষ অধিবেশন, বোম্বাই ১৯১৮

গত বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে গরম ও নরম দলের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে আপোষের ফলে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। দেখা গেল যে, সেটা চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক মীমাংসা মাত্র। এ বৎসর শ্রীমতিলাল ঘোষ, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গরম দলের করতলগত হয়। ফলে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডক্টর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ নরম দলের নেতারা কেহই অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতে পারলেন না।

ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। গভর্ণমেণ্ট লোকমান্য তিলক, ও শ্রীবিপিনচন্দ্র পালকে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করার জন্য দিল্লী প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এই অধিবেশনে স্বায়ত্ত-শাসনের পরিকল্পনা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাতে ডেপুটেশন প্রেরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর এলাহাবাদ অথবা লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হয়।

যে সময়ে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব দেশের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করতে লাগলেন সেই সময়েই গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য বিলাতের বিচারপতি রৌলেট সাহেবের সভাপতিত্বে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বেসিল স্কট, স্যর ভারনী লভেট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুমারস্বামী ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি রৌলেট কমিটি নামে পরিচিত হয় এবং প্রভাসবাবু "রৌলেট মিত্র" নামে কুখ্যাত হন।

এ বৎসরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর স্থান নির্বাচিত হয় চুঁচুড়া। সভাপতিপদে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নির্বাচিত হন। খুব সম্ভব রাজনৈতিক হট্টগোল থেকে দূরে থাকার ইচ্ছায় কবি উক্ত পদ গ্রহণ করলেন না। তাঁর স্থলে কুমিল্লার বিখ্যাত উকিল ও নেতা শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতি পদে বৃত হন। এই সম্মিলনীতে পুনরায় উভয় দলের মধ্যকার বিরোধ প্রবল ভাবে দেখা দেয়। বিষয় নির্বাচনী সভায় সুরেন্দ্রনাথ বিনা পরিবর্তনে কংগ্রেস লীগ স্কীম গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতাগণ প্রধান প্রধান প্রদেশগুলিতে পূর্ণ স্বাধীনতার (autonomy) দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভোটে সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অন্তরীণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে সুরেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন সমর্থন করেন কিন্তু অপর পক্ষের বিরোধিতায় এবারও সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এর ফলে সুরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে (in a half) সভাগৃহ ত্যাগ করেন এবং বলেন যে, তিনি পরদিনের সম্মিলনীতে উপস্থিত হবেন না বা বক্তৃতা দিবেন না। যা হোক্ শ্রীমতিলাল ঘোষ ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়।

এদিকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা চলতে লাগল। মে মাসে কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক একটি সার্কুলার দ্বারা জানালেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনের পরিকল্পনা শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা সুতরাং জুন মাসের মাঝামাঝি লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হবে। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হ'তে লাগল। স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার শ্রীযুক্ত তিলকের সভাপতিত্বে এলাহাবাদ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহম্মদাবাদের রাজা সাহেবের সভাপতিত্বে, বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে মত দেন। শ্রীমতিলাল ঘোষ লোকমান্য তিলকের সভাপতিত্বে এলাহাবাদ অথবা কলিকাতায় কংগ্রেসের

অধিবেশনের প্রস্তাব করেন এবং শ্রীমতিলাল নেহরু কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে মত দেন।

১৩ই জুন তারিখে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব জানালেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আগষ্ট মাসের ঘোষণা অনুসারে তাঁর ও ভারতের বড়লাটের রচিত পরিকল্পনা একটি রিপোর্টে সন্নিবেশিত করে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করেছেন। ঐ রিপোর্ট পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হবে এবং এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জনমত প্রকাশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার সময় ঐ সকল মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

ঘটনাস্রোত দ্রুত বেগে চলতে লাগল। অমৃতবাজার পত্রিকা দিনের পর দিন সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করতে লাগল এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় স্থানে স্থানে জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের নরমনীতি সমালোচনা করে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন।

এই সকল কারণে জুন মাসে শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক), শ্রী জে. এন্. রায় (ব্যারিষ্টার), শ্রীসত্যানন্দ বসু প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারা "ন্যাশনাল লিবারেল লীগ" নামে মডারেটদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল। সত্যানন্দ বাবু সংবাদপত্রে একটি পত্র প্রকাশ করে জানালেন যে, দেশ এখনও স্বায়ত্ত-শাসনের অভিজ্ঞতা বা সংগঠন ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করতে পারে নি সুতরাং বর্তমানে প্রাদেশিক পূর্ণ শাসনের জন্য দাবি করা সমীচীন হবে না। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এই লীগে যোগদান করতে সম্মত হন নি কিন্তু চেলা চামুণ্ডার প্রভাব অতিক্রম করতে না পেরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন, সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন কাশিমবাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) এবং সম্পাদক হন শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়।

সুরেন্দ্রনাথের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আরম্ভ হয় এবং শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ স্কোয়ারের জনসভায় সুরেন্দ্রনাথকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। তখনকার দিনে কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘিই ছিল সভা-সমিতির অধিবেশনের প্রধান স্থান। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে টাউন হলে সভা আহ্বান করা হ'ত। তা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সভার কার্যই গোলদীঘির পূর্ব-উত্তর কোণে সঞ্জীবনী অফিসের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হ'ত। ঐখানেই আমি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি।

গণতান্ত্রিক মতে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব গরম দল অনুভব করল। তাঁরা প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক লোকের নাম প্রস্তাব করলেন কিন্তু এসোসিয়েশনের সভ্যগণের অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল। উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা জুলাই মাসের প্রথম দিকে "বঙ্গীয় জনসভা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে একটি কমিটি গঠন করলেন। তার সভাপতি হ'লেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ, সদস্য হ'লেন সর্বশ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বসন্তকুমার বসু, ফজলুল হক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "সাহিত্যে"র সম্পাদক) এবং সম্পাদক হ'লেন সর্বশ্রী ইন্দুভূষণ সেন ও বিপিনচন্দ্র পাল।

এই সময়েই ভারত-সচিব ও বড়লাটের ভারতীয় শাসন প্রণালী সংস্কারের সুপারিশ (recommendation of Indian Constitutional reform) প্রকাশিত হ'ল।

উক্ত সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর তা আলোচনার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনীর বিশেষ অধিবেশন হ'তে লাগল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর বিশেষ অধিবেশন শ্রীকামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ১৪ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় যোগ দেন নি কিন্তু অন্যান্য প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমান নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ নরম দল সর্বান্তকরণে ভারত সচিব ও বড়লাটের শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা সমর্থন করেন কিন্তু অধিকাংশের মতে শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক উত্থাপিত ও শ্রীআবুল কাসেম কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, সভার মতে বড়লাট ও ভারত-সচিবের পরিকল্পনা নৈরাশ্যজনক,

অসন্তোষজনক এবং এতে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য কোন খাঁটি পন্থা প্রদর্শন করা হয় নি। (১)

বড়লাট ও ভারত-সচিবের পরিকল্পনা প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রৌলেট কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হ'ল। গভর্ণমেণ্ট যেন এক হস্তে বরাভয় ও অন্য হস্তে মারণাস্ত্র নিয়ে দেখা দিল। পুনঃ পুনঃ দেখা গেছে যখনই গভর্ণমেণ্ট একটু ভাল কাজ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তার চণ্ডনীতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

পরিকল্পনা উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক উভয় দলের মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র-ভাব ধারণ করল। এমনকি "ক্যাপিটাল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস ত্যাগের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তিনিও "বেঙ্গলী"তে লিখলেন যে, কংগ্রেস পূর্বে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু বর্তমানে তার আর সে গৌরব নাই।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের স্থান বোম্বাই স্থিরীকৃত হয় এবং স্যর দিনসা পেটিট অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা চালাতে বিলাতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব জজ এবং তৎকালীন পাটনা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার স্যর হাসান ইমাম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মডারেটদিগকে, বিশেষ ভাবে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রনাথকে, কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আবেদন জানালেন।

মাদ্রাজের মডারেট নেতারা কংগ্রেসে যোগদান দিতে সম্মত হ'লেন।

বাংলা দেশের মডারেটগণ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে আহূত সভায় তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা এক প্রস্তাবে বললেন যে, শাসন সংস্কার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাব তাঁদের বিবৃতিতে (manifests) প্রকাশ পাওয়ায় এবং তাঁরাই কংগ্রেসের আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করবেন বিধায় দেশের কল্যাণের জন্য তাঁরা (বাংলার মডারেটগণ) আগামী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করতে অক্ষম এবং তাঁরা আবেদন জানালেন যে, যাঁরা দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্রমশঃ প্রবর্তনে ইচ্ছুক তাঁরা যেন এই কংগ্রেসে যোগদান না করেন।

ওদিকে বোম্বাই থেকে স্যর দিনশা ওয়াচা একটি সার্কুলারে মডারেটদিগকে কংগ্রেসে যোগদান দিতে নিষেধ করেন এবং তাঁদিগকে পৃথক সভা আহ্বান করতে বলেন।

উক্ত সার্কুলার প্রকাশিত হওয়ার পর স্যর দিনশা পেটিট অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলে বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রী ভি. জে. প্যাটেল নির্বাচিত হন।

মডারেট নেতাদের এই আশঙ্কা হ'ল যে, যদি মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড পরিকল্পনাকে অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যজনক বলা হয় তা হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসন প্রণালীর কোন সংস্কারই করবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট বিশিষ্ট মডারেট নেতাগণের নিকট টেলিগ্রাম দ্বারা কংগ্রেসে যোগদান করতে নিষেধ করেন। বিহারের নেতা শ্রীসচ্চিদানন্দ সিং টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন যে, বর্তমান সন্ধিক্ষণে নেতাদের কংগ্রেসে অনুপস্থিতি অপরাধ বলে গণ্য হবে। গান্ধীজী জানালেন যে, পরিকল্পনা মোটা-মুটি ভাল তবে তার সংশোধন আবশ্যক। দেশের এই সঙ্কটকালে তথাকথিত একষ্ট্রিমিষ্ট ও মডারেট দলের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়া আপোষে তিনি বিশ্বাস করেন না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উভয় দলের মধ্যে আপোষের জন্য আবেদন করলেন এবং মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, উভয় দলের পৃথক্ হওয়ার প্রশ্ন এখন ওঠে না, যদি ওঠে ত তা কংগ্রেস অধিবেশনের পর উঠবে।

এদিকে স্যর রাসবিহারী ঘোষ, সর্বশ্রী মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতাগণ বহু সংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে পাঠাতে দেশবাসীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, স্যর রাসবিহারীর মত মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথের মত সমর্থন করেন নি।

---

(1) "That this conference is of opinion that the Scheme of the Viceroy and the Secretary of State of India is disappointing unsatisfactory and does not present any real steps towards responsible Government."

অপর পক্ষে ডঃ তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যর গণেশচন্দ্র বয়েকর, সর্বশ্রী বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর), এম. ডি. যোশী, মনোহর লাল, রাও বাহাদুর আর এন্ মুধলকর, প্রিন্সিপাল পরাঞ্জপে, সর্বশ্রী অম্বিকাচরণ মজুমদার (ফরিদপুর), আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা), নলিনাক্ষ বসু (বর্ধমান), কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজসাহী) প্রভৃতি নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদানের বিরুদ্ধে মত দিলেন।

এই পটভূমিকায় বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়।

[দুই]

রাজসাহী থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন আমি ছাড়া মাননীয় শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী, রাজা রমণীকান্ত রায়, সর্বশ্রী রুক্মকমল মৈত্র, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিজেশচন্দ্র সান্যাল, প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, কেদারনাথ মজুমদার ও শশীকিশোর চংদার। এঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই কংগ্রেসে যোগদান করি।

কংগ্রেস অধিবেশনের দিন স্থির হয় ২৮শে আগষ্ট। ২৩শে আগষ্ট ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বোম্বাই রওনা হয়েছেন। প্রতিনিধিদের কেহ কেহ ২৪শে ২৫শে আগষ্ট চলে গেছেন।

সাধারণ প্রতিনিধিদের জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর নূতন রং-করা বড় কামরা ২৬শে আগষ্ট বোম্বে মেলের সহিত যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীগুণদাচরণ সেনের উপর প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। রাজসাহী থেকে একদিন পূর্বে কলিকাতায় পৌঁছে গুণদাবাবুর নিকট ট্রেণ ভাড়া জমা দিলাম।

২৬শে তারিখে যথাসময়ে স্পেশাল কমপার্টমেন্টের যাত্রীরা বোম্বে মেলে রওনা হলাম। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহের উকিল শ্রীমনোমোহন নিয়োগী (স্বরাজ পার্টির পক্ষ হ'তে ইনি বঙ্গীয় বিধান সভায় সভ্য নির্বাচিত হন), চাঁদপুরের উকিল ও প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীহরদয়াল নাগ, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার (প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), ঢাকার উকিল ও প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভারত বিভাগের পর ইনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বিধান সভার সভ্য হন এবং পাকিস্তানের পক্ষ থেকে লণ্ডনে এক ডেপুটেশনে ইনি মেম্বার হন—সম্প্রতি এঁর বয়স ৯১ বৎসর। এখনও বেশ চলে-ফিরে বেড়ান), ঢাকার উকিল শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (স যুক্ত বঙ্গের বিধান সভার সভ্য ছিলেন। ঐ সভার এক অধিবেশনে যোগ দিতে আসার সময় ঢাকা মেল সংঘর্ষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।), পাটনার উকিল আমার সহপাঠী শ্রীউমাপ্রসন্ন মৈত্র, বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক শ্রীদুর্গামোহন সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় (ইনি পরে হিন্দু মিউচিয়েল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সহিত যুক্ত হন। এঁর পত্নী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও কন্যা শ্রীমতী বাণী রায় সাহিত্য-জগতে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুরেশচন্দ্র রায় বর্তমানে ব্যবসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত). বগুড়ার উকিল ও সুবক্তা শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (দেশ বিভাগের পর ইনি পূর্ব পাকিস্তানের বিধান সভার সদস্য হন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন), শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (এককালে "ভোট রঙ্গের" সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমানে একটি আবগারি দোকানের মালিক), মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার শ্রী আর. মাইতি, যশোহরের উকিল শ্রীসৈয়দ মজিদ বক্স (অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং স্বরাজ পার্টির প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গীয় বিধান সভা ও দিল্লীর বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন), খুলনার প্রসিদ্ধ উকিল ও নেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন (সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের শ্বশুর) এবং আরও অনেক।

ট্রেণে উঠে বন্ধুবর উমাপ্রসন্নের নিকট শুনলাম যে, অধিকাংশ প্রতিনিধিই নিজ খরচে বোম্বাই যাচ্ছে না। বঙ্গীয় জনসভার তহবিল থেকে তাঁদের পাথেয় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। গুণদাবাবুর উপর এই তহবিলের ভার ছিল।

হাওড়া ষ্টেশন থেকে বোম্বে মেল যথাসময়ে ছাড়ল। এর পূর্বে বি. এন্. আর. রেলপথে দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় গিয়েছিলাম। খড়্গপুর হ'তে পশ্চিম দিকে বেঁকে যে রেলপথ বোম্বের দিকে গিয়েছে সে-পথে পূর্বে কখনও যাই নি। সুতরাং নূতন দেশ দেখার প্রবল আগ্রহে পথের দু'দিকে কৌতূহলী

দৃষ্টি প্রেরণ করতে লাগলাম। ধাবমান ট্রেণের কামরা থেকে যা দেখি তাতেই চমক লাগে। ট্রেণ যখন মেদিনীপুরের লাল কঙ্করময় ভূমি ত্যাগ করে ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল তখন উভয় পার্শ্বের বনরাজি শোভা দর্শনে মুগ্ধ হলাম। এইভাবে আমরা নৈসর্গিক শোভা দেখতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনাও চলতে থাকল। সুরেন্দ্রনাথ যে আমাদের চিত্তে কি পরিমাণ স্থান অধিকার করেছিলেন তা প্রতিনিধিবর্গের আলোচনায় বেশ বোঝা গেল। মনে হ'তে লাগল যে, সুরেন্দ্রনাথবিহীন কংগ্রেস যেন শিবহীন যজ্ঞের মত। আমরা আশা করলাম যে, শেষ মুহূর্তে, কোন আপোষ নিষ্পত্তির ফলে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করবেন।

পরদিন ট্রেণ মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে ছুটছিল। পথের দু'পাশের দৃশ্যাবলী আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করল। পথে যেতে যেতে কখন কোথাও সারস-দম্পতি দেখা গেল। কোথাও বা দ্রুত ধাবমান এক পাল হরিণ দেখতে পাওয়া গেল। এই সকল দৃশ্য আমার নিকট একেবারে অভিনব। আলিপুরের চিড়িয়াখানা ছাড়া সারস পাখী বা হরিণ কখনও দেখি নি। চলতে চলতে এক স্থানে দেখা গেল যে, একটি বিশীর্ণা নদীর মধ্যবর্তী প্রস্তরস্তূপের উপর একটি সুন্দর ছোট মন্দির।

আমাদের সঙ্গে বস্তা-বোঝাই চিঁড়া ও গুড় ছিল। তা দিয়ে আমরা প্রাতরাশ করলাম। পরিপূরক হিসাবে ষ্টেশন হ'তে কিছু খাবারও কেনা হয়েছিল কিন্তু এতে তৃপ্তি হচ্ছিল না। একজন প্রস্তাব করলেন যে, নাগপুরে শ্রীবিপিনকৃষ্ণ বসুর নিকট আমাদের খাবার বন্দোবস্তের জন্য টেলিগ্রাম করা হউক। প্রস্তাবটি সকলেরই মনঃপূত হ'ল। পরবর্তী কোন এক ষ্টেশন থেকে বিপিনবাবুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠান হ'ল।

ট্রেণ যখন নাগপুরের নিকটবর্তী হয়েছে তখন দক্ষিণে রামটেক পাহাড়ের মন্দির-শোভিত চূড়া দেখা গেল। ইহাই কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ রামগিরি। এই রামগিরিতেই বিরহী যক্ষ নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। এ দেখে বগুড়ার সুরেশবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এবং মেঘদূত হ'তে কালিদাসের অমর শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন।

দ্বিপ্রহরের কিছু পরে নাগপুর ষ্টেশনে ট্রেণ আসবার পূর্বে একটি বাঁক হ'তে প্রসিদ্ধ সীতাবন্দী দুর্গ দৃষ্টিগোচর হ'ল। তা দেখে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কত কথাই না মনে জাগরিত হ'ল। নাগপুরে ট্রেণ থামলে দেখা গেল বিপিন বাবু যথেষ্ট পরিমাণে লুচি-তরকারি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য লোক মারফৎ পাঠিয়েছেন। বিপিন বাবু একজন মডারেট নেতা এবং তিনি কংগ্রেসে যোগদানের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন তথাপি তিনি অপরিচিত বাঙ্গালীর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হন নি। এতে তাঁর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। বিপিন বাবু তখন নাগপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য (ভাইস চ্যানসেলার) নিযুক্ত হয়ে স্যর উপাধি-ভূষিত হন। প্রসিদ্ধ জজ শ্রীভিভিয়ান বসু তাঁর পৌত্র।

নাগপুরে প্রায় এক ঘন্টা বিশ্রামের পর ট্রেণ পুনরায় বোম্বাই অভিমুখে ধাবিত হ'ল। পরদিন প্রত্যূষে ভুশোয়াল ষ্টেশনে পৌছলাম। এখান থেকে বোম্বাইয়ের পথে অনেকগুলি টানেল পার হলাম। এ পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব। প্রাতঃকালে বোম্বে মেল "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস" ষ্টেশনে এসে থামল। স্বেচ্ছাসেবকগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। তারা আমাদিগকে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি বৃহৎ অট্টালিকার তেতলার একটি প্রকাণ্ড হলে নিয়ে গেল। সেখানে আরও কয়েকজন বাংলার প্রতিনিধিকে দেখলাম।

আমরা ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃকালে বোম্বাই পৌছলাম। সেই দিনই কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মডারেট নেতাদের সঙ্গে আপোষের শেষ চেষ্টার জন্য অধিবেশন একদিন মুলতুবি রাখা হয়। সুরেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত। শ্রীমতী বেশান্ত টেলিগ্রাম করে সুরেন্দ্রনাথকে জানান যে, এখন কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখা অসম্ভব তবে তিনি ২৯শে আগষ্ট তারিখে মডারেট নেতাদের সহিত একটি গোল টেবিলে বসে আপোষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে রাজি আছেন। প্রত্যুত্তরে সুরেন্দ্রনাথ জানালেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত না রাখলে কোন আলোচনাই হ'তে পারে না এবং আপোষ হ'তে পারে

একমাত্র তারই রচিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে যাতে স্বীকার করা হয়েছে যে, শাসন সংস্কার পরিকল্পনা দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার একটি যথার্থ পদক্ষেপ। ফলে আপোষের আশা নির্মূল হ'ল।

এতেও হতোদ্যম না হয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ২৮শে তারিখে বোম্বাইয়ের মডারেট নেতাগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হলেন। স্যর দিনশা ওয়াচা, সর্বশ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সমর্থ ঐ সভায় যোগদান করেন নি। স্যর দিনশা পেটিট, সর্বশ্রী লালুভাই সামলদাস ও চুণিলাল মেহতা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আপোষের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল।

[তিন]

কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সুদৃশ্য বৃহৎ প্যাণ্ডেল রচিত হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের চতুর্দিকে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবিমূলক নানাপ্রকার ইনসক্রিপসন টাঙ্গানো ছিল। একটি লেখায় "ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন" (God save the King) দেখা গেল। অধিবেশন আরম্ভ হবার কথা ২৯শে আগষ্ট বেলা ১টার সময়। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে বাংলার জন্য নির্দিষ্ট "ব্লকে" রক্ষিত চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম।

ঠিক বেলা ১টার সময় নির্বাচিত সভাপতি শ্রীসৈয়দ হাসান ইমাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সহকারী সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সমভিব্যাহারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হয়ে বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

পূর্বেই বলেছি যে, স্যর দিনশা পেটিটের স্থলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন শ্রী ভি. জে. প্যাটেল, যদিও তিনি তখন বোম্বাই বিধান সভার সদস্য এবং বোম্বাই হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার তথাপি তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানতাম না। নাম দেখে মনে করেছিলাম যে তিনি পার্শী। এখন প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে দেখে বুঝলাম যে, তিনি পার্শী নন, মুসলমান, কারণ তিনি চোগা-চাপকান পরে মাথায় ফেজ-যুক্ত লাল টার্কিস ক্যাপ লাগিয়ে সভায় উপস্থিত হলেন। পরে জানলাম আমার উভয় ধারণাই ভুল। তিনি হিন্দু, তাঁর পুরা নাম বিঠলভাই ঝাবরভাই প্যাটেল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীবল্লভভাই ঝাবরভাই প্যাটেল ভারতবিখ্যাত হন। বিঠলভাই মশায় দিল্লীর বিধান সভায় (ইম্পিরিয়াল কাউনসিলে) স্পীকার নিযুক্ত হন। স্পীকার হিসাবে তিনি যে নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা নাই। তাঁর মত যোগ্য স্পীকার আর হয় নি।

অধিকাংশ মডারেট নেতা কংগ্রেসের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট কয়েকজন মডারেট নেতা—মাননীয় স্যর দিনশা পেটিট, মাননীয় শ্রীলালুভাই সামলদাস, মাননীয় শ্রীচুনীলাল মেহতা, শ্রীঅম্বালাল সারাভাই প্রভৃতি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এঁরা সকলেই ধনকুবের শিল্পপতি।

সভার প্রারম্ভে কতিপয় মহিলা কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" গীত হল। 'বন্দেমাতরম' গানের সময় প্যাণ্ডেলস্থ সকলেই দণ্ডায়মান ছিলেন। এরপর গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের তরুণী ছাত্রীবৃন্দ দেশভক্তি মূলক কয়েকটি গান গাইলেন।

সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করলেন।

শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দ্বারা শ্রীযুক্ত সৈয়দ হাসান ইমামকে সভাপতি পদ বরণ করার প্রস্তাব করলেন। মাননীয় মহম্মদাবাদের রাজা সাহেব, মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মাননীয় মহম্মদ আলি জিন্না, মাননীয় শ্রীচুনীচাঁদ, মাননীয় শ্রীহরচন্দ্রাই বিষ্ণিদাস, মাননীয় শ্রীখপর্দে, দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দ রাঘব আয়ার ও শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসৈয়দ হাসান ইমাম সাহেবকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সভাপতি মহাশয় মুহুর্মুহু 'বন্দে মারতম্' ধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সাথে নানা স্থান হ'তে প্রেরিত পত্র ও টেলিগ্রামের মধ্যে কতকগুলি পড়ে শুনালেন। বিশেষ করে ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি

স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও ডঃ স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ারের পত্র পড়লেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ দিতে মঞ্চোপরি দাঁড়াতেই তাঁকে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক-মণ্ডলী বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দ্বারা বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করল। তিনি তাঁর অভিভাষণে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্বায়ত্ত শাসন সংস্কার ও বড়লাট ও ভারত-সচিবের সুপারিশ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, যদিও ভারতের দাবি মূলতঃ মেনে নেওয়া হয়েছে তথাপি কার্যতঃ সে দাবি পূরণ না করায় উক্ত সুপারিশ হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে।

অভিভাষণের পর সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন এবং জানালেন যে, অপরাহ্ন ৫॥টার সময় প্যাণ্ডালের বহির্দেশে নির্দিষ্ট হলে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হবে। এর পর সেদিনের মত প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হ'ল।

ক্রমশ

—•—

॥ উপন্যাস ॥

ফেরার

A PRICE ON HIS HEAD

শ্রীমতী আনা সেঘার্স

অনুবাদিকা—শ্রীগীতা মুখোপাধ্যায়

মাঠ থেকে সবার শেষে বাড়ী ফিরল বাস্টিয়ান। বেড়ার দরজাটা বন্ধ করল, কাস্তের ফলা থেকে ধুলোকাদা মুছে চালার মধ্যে যথাস্থানে রাখল, তারপর পাম্পের কলতলায় হাত-মুখ ধুলো। অনেকক্ষণ ধরে নুয়ে থাকার ফলে পিঠে ব্যথা ধরেছিল তাই তার মাথা আর কাঁধটা ঝুলেই রইল। বাড়ীর দরজায় এসে সে শেষবারের মত থামল। ঝুড়ি থেকে দুটো আলু ফেলে গিয়েছিল ডোরা, সে দুটো তুলে নেবার চেষ্টাতেই মাথাটা তার ঘুরে উঠল। উল্টে যাতে না পড়ে তার জন্য মাটিতে হাত রেখে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে সে মুহূর্তের জন্য সেখানে থেমে পড়ল। একটা অসহ্য বোঝা যেন কাঁধজোড়াকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলতে চাইল। মৃত্যু যেন স্বয়ং পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—হাত দুটো ওপরে তোলা, আরও একটা বোঝা কাঁধে চাপাতে উদ্যত। এবার তা হ'লে সব শেষ!

একেবারে যেন শেষ মুহূর্তে মাটি থেকে এক ধাক্কায় উঠে দাঁড়িয়ে সে কাতরাতে লাগল। আলু দুটো বা হাতে, ডান হাত বাড়িয়ে সে বাড়ির দরজার নাগাল পেল।

দরজার সামনে বিছানো টেবিলটার পেছনে বসে ছিল তার স্ত্রী। তার পাশেই বেঞ্চের ওপরে পর পর বসেছিল বড় থেকে ছোট চার ছেলেমেয়ে। পঞ্চমটি তার কোলে। টেবিলে রাখা পাত্র থেকে উঠে ধোঁয়ার কোমল মেঘ ওদের অনড় মুখ ক'টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। গন্ধে যেন আবার বাস্টিয়ানের মাথাটা ঘুরে উঠল, তবে এবারকার ধাক্কাটা প্রথমবারের মত অত জোরাল নয়। লোভে যেন নাড়িভুঁড়ি সিঁটিয়ে উঠছিল। শুধু একটিই বাসনা হচ্ছিল তার—ভরা পাত্রটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, খাবারের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে দিতে। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। টেবিলের চওড়া দিকটায় ঐ একটিই মাত্র চেয়ার। ধোঁয়ার মধ্যে মাথাটা আরও গভীরে ঝুঁকে পড়ায় তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হ'ল। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল—যেমন করে সামলে নিয়েছিল একটুখানি আগে। সে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর মধ্যে গোঁফ জোড়াকে পাকাতে লাগল। বাচ্চাগুলো তার দিকে উৎসুক ভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। তাদের নাকগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দু'হাত দিয়ে প্লেটগুলোকে ছাদের মত করে ঢেকে রইল ওরা। পাত্রগুলোর চারপাশে যে নীরবতার প্রাচীর ছিল প্রার্থনার প্রথম কথাগুলোয় তা খানখান হয়ে গেল।

সকল পাপ ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা পর্যন্ত যেই পৌঁছেছে বাস্টিয়ান বেড়ার দরজাটা খড়খড়িয়ে উঠল। দুয়ার-পথে যেন কার ঢোকার শব্দ শোনা গেল। গলার স্বর চড়িয়ে দিয়ে পায়ের শব্দকে প্রাণপণে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল বাস্টিয়ান। বাচ্চাদেরও কেউ চোখ তুলে চাইল না। কিন্তু আধো-অন্ধকার ঘরটিতে একটি ঘনছায়া এসে পড়ল। সকলেই বুঝল কে একজন চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত দ্বারপথটা জুড়ে রয়েছে তার উপস্থিতি।

॥ ২ ॥

প্রার্থনা শেষ করে মুখ ফিরাল বাস্টিয়ান। দরজায় দাঁড়ান যুবকটি তার অপরিচিত, গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যে ছেলেরা প্রায়ই যাতায়াত করে তাদেরই একজন। পরণে খাটো প্যান্ট, চামড়ার বেল্ট, নীল লিনেনের একটা সার্ট, কাঁধের ওপর একটা ঝোলা ঝুলছে, তারই দড়ির ভেতর দিয়ে টানা রয়েছে একটা জ্যাকেট। ধুলো আর ঘামে চাপড়ান মুখখানা লাজুক-লাজুক, কিন্তু চোখ দু'টি তা নয়। ছেলেটি বলে: "আমি জোহান সুলৎস্; গেয়র্গ সুলৎসের ছেলে।"

হঠাৎ বাস্টিয়ানের স্ত্রী কোল থেকে বাচ্চাটাকে তুলে বেঞ্চির ওপর রাখল এবং নিজে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল: "আমার মৃত স্বামীর এক বোন ছিল বটৎসেনবাখ্-এ। তার

বিয়ে হয়েছিল এক স্থলৎসের সঙ্গে। অল্প দিনের মধ্যেই তারা ওখান থেকে উঠে গিয়েছিল বহুদূরে—স্যাক্সনীতে। শুনেছিলাম তাদের বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে। এ হয় ত সেই স্থল্ৎসেরই ছেলে। তোমাকে কখনও আমি তাদের কথা বলি নি, কারণ তারা ত আর কাছাকাছি ছিল না, তা ছাড়া তারা আসলে আত্মীয়ও নয়।"

দ্বিধাভরে অপরিচিতের মুখের দিকে চায় বাস্টিয়ান, তার পর মুখ থেকে চোখ নাবায় জুতোর দিকে। দেখেই বোঝা যায় যে, পায়ে এখন যে জুতো জোড়া রয়েছে, সেগুলো তার জন্য কেনা হয় নি, কারণ গোড়ালির কাছে বদখত্ ভাবে সেলাই করা যে গোল তালিটি দেখা যাচ্ছে সেটি ছেলেটির গোড়ালির জায়গায় পড়ে নি।

দরজার ওপর হাতখানি রেখে সর্বাঙ্গে এই দৃষ্টিপাত সহ্য করে ছেলেটি। খাবারের গন্ধে তার মাথাটাও ঘুরতে থাকে। মাথার পেছনটা দরজার পাল্লায় ঘষতে থাকে সে: "ওরা আমায় দূর করে দেবে—ওরা আমায় দূর করবে না—ভগবান, হা ভগবান, হা ভগবান।"

জুতো থেকে চোখ তুলে আবার তার মুখের দিকে চায় বাস্টিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় ওর মুখের পাণ্ডুরতা কেবল ধুলোর থেকে হয় নি। আরও নিবিড় ভাবে সে যখন চায় চোখের কোণের কালিটা যেন নীল-ধূসর রূপ নেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস্টিয়ান বলে, "বস তুমি, যদি তোমার সময় থাকে।"

বাচ্চারা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে অতিথির দিকে। স্ত্রীলোকটি টেবিলের সরু দিকটাতে একখানা প্লেট দেয় এবং তার পাশে এক টুকরো রুটি রাখে।

অন্যান্যদের প্লেটে কিছু পড়বার আগেই গোটা হাতের মুঠোটা দিয়ে রুটির টুকরোটা খপ করে ধরে ফেলে অতিথিটি। রীতিমত এক কামড় যদিও ইতিমধ্যেই তার মুখের ভেতর ঢুকেছিল তা সত্ত্বেও যেন এখনও না খেয়ে মারা যেতে পারে এমনিতর ভয়ানক একটা উদ্বেগ নিয়ে বাসি রুটির টুকরোটায় সে দাঁত বসিয়ে দেয়! ভয় পেয়ে যায় বাচ্চাগুলো। ওদের মনে হয় ওর দাঁতগুলো যেন বিষদাঁতের মত ঝলকে উঠল।

মুখ না ফিরিয়ে বাস্টিয়ান কটাক্ষে লক্ষ্য করে এই ক্ষুধাকে! এ তার ক্ষুধার থেকে স্বতন্ত্র, আরও সর্বগ্রাসী, আরও উলঙ্গ। রুটি শেষ হয়ে যাবার পর অতিথি বিহ্বলভাবে নিজের খালি হাতখানার দিকে চায়, তারপর চামচটা পাকড়ে ধরে।

টেবিলের অপর প্রান্তে কি ঘটছে সে বিষয়ে নজর না দিয়ে বাস্টিয়ানের স্ত্রী তার বড়োসড়ো গড়নের বাচ্চাটাকে বুকের দিকে টানতে থাকে, বাচ্চাটা তার কোলের ওপর ছট্‌ফটিয়ে উঠে বাধা দেয়।

রাত্রির আহার শেষ হবার পর বাস্টিয়ান বলে, "জোহান, —তাই ত তোমার নাম, তাই না? রাত্রির আগেই ত তুমি বটৎসেনবাখ-এর দিকে রওনা দেবে?

স্থলৎস্ জবাব দেয়, "হাঁ, আমাকে ত তা হ'লে যেতে হবে।"

তারা পরস্পরের দিকে চায়। হঠাৎ ছেলেটির মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে। সে মাথাটা খাড়া করে কিন্তু আবার তা ভেঙে পড়ে, আবার সে খাড়া করে।

বাস্টিয়ান অবাক হয়ে যায়, কারণ তার ধারণা ছিল কেবল বুড়োরাই ক্লান্ত হয়। আজ যে রকম ক্লান্তি সে দেখল এ রকম ক্লান্তি তার যৌবনে সে কখনও অনুভব করেছে বলে মনে পড়ে না। এ যেন উদ্যত কোন বজ্রমুষ্টি তার শরীর থেকে সমস্ত প্রাণ নিংড়ে নিচ্ছে, অথবা দু'হাতে তাকে দলে মুচড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না ওর মত একটা যুবক কেন এত ক্লান্ত হবে। সে বলে, "যদি তোমার তেমন তাড়া না থাকে তুমি রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

টেবিলের ওদিকে যা ঘটছে সে বিষয়ে তার স্ত্রী এই প্রথম কান দিল। ওর শান্ত অবিচল মুখে কোনও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা দিল না, বরং গভীর আগ্রহ প্রকাশ পেল। সে পোশাকটা গুছিয়ে নিল, বাচ্চাটাকে নাবিয়ে রেখে টেবিল থেকে উঠে পড়ল। প্রস্তাবটা করার পরমুহূর্ত থেকেই বাস্টিয়ান মনে মনে অনুতাপ করছে। তার এই বিহ্বলতা অতিথিকে প্রায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানানোর সামিল। কিন্তু ছেলেটি টেবিলের একটা পায়ায় এক হাতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ওঠে, চেয়ারখানাকে বেঞ্চির দিকে ঠেলে দেয়, মুক্ত হাতখানা দিয়ে সবচেয়ে কাছের বাচ্চাটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। ঠেলা খেয়ে পর পর দাঁড়িয়ে-থাকা বাচ্চাগুলো একে অপরের ঘাড়ে পড়ে উল্টে যাওয়া থেকে

নিজেরাই সামলে নেয়! ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাত-পা সম্পূর্ণ ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। মাথা নেড়ে উঠে পড়ে বার্স্টিয়ান।

কিছুক্ষণ ধরে স্বামী স্ত্রী বাসনপত্র এবং পশু খাদ্যের পাত্র নিয়ে রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরের মধ্যে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে থাকে। নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা লঘুপায়ে চলে। মৃদু স্বরে তারা বাচ্চাদের জামাকাপড় ছাড়তে বলে শুতে যাবার জন্য। কিন্তু বাচ্চারা তখনও বেঞ্চের পাশে দাড়িয়ে থাকে নিদ্রিত মানুষটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

এক ঘন্টা পরে গোয়াল থেকে ফিরে আসে বার্স্টিয়ানের স্ত্রী। লঘু ও গুরু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে ঘর ভর্তি। ঘরের ভিতরকার প্রত্যেকটি জিনিসই সে নজর করলে দেখতে পায়, কারণ গ্রীষ্মের রজনী শুধু দু'টি প্রভাতের মধ্যে কম্পমান এক নীরবতা। স্ত্রীলোকটি আবার বেঞ্চটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত দুটো গুটিয়ে নিয়ে নিদ্রিত ছেলেটির দিকে তাকায় সে। আবার তার মুখে কোনও বিস্ময় দেখা যায় না—শুধু সেই নিবিড় আগ্রহ। ছেলেটি নিশ্চয়ই একবার জেগে উঠেছিল, কারণ এক পাটি জুতো সে খুলে রেখেছে, আর এক পাটিরও ফিতে খোলা। ফিতে খোলা পাটিটা পায়ে ঝুলন্ত অবস্থাতে রেখেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। বার্স্টিয়ানের স্ত্রী হাই তোলে তারপর রান্নাঘরে চলে যায়। শোবার ঘর এবং রান্নাঘরের মাঝখানে একটা বোর্ডের পার্টিসান দিয়ে আড়াল করা।

একটু পরে বার্স্টিয়ান ঘরে আসে। তার স্ত্রী একটু আগে যেখানটায় দাড়িয়ে ছিল সেইখানেই সে দাঁড়ায়। নিদ্রিত ছেলেটার খোলা মুখখানা তাকে বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করে। গ্রামের ভিতর দিয়ে অনেকেই যাতায়াত করেছে, অনেক অমঙ্গল পিছনে থেকেছে তাদের, সামনে আরও অনেক বিপদ। যুবকটির কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকি দিয়ে তাকে জাগিয়ে বিদায় দিতে পারলেই তার সবচেয়ে ভাল লাগত। কিন্তু তার বদলে করল অন্য কিছু, নীচু হ'ল, ফিতে খোলা জুতোর পাটি তার পা থেকে খুলে নিল, আর এক পাটির পাশে গুছিয়ে রাখল, তার পর ঝুলন্ত পাখানা বেঞ্চির ওপর তুলে দিল। তার ধারণা সে ভগবানকে বিশ্বাস করে বলেই এ রকম করল।

॥ ৩ ॥

বার্স্টিয়ানকে দেখলে মনে হয় না যে সে দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, কিন্তু বয়সকালে সে দূরদূরান্তে গিয়েছে। বার্স্টিয়ানের বাবা কঠিন পরিশ্রম এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মারফৎ দাঁড়িয়েছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কেনা ঘোড়ার লাথির ফলেই তিনি মারা যান, সে ঘোড়া কেনবার জন্যে মৃত্যুশয্যায়ও তাঁর গর্ব ছিল। দুটো ঘোড়ার মালিক মেরৎস্‌রা অবশ্য এই দুর্ঘটনাকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করত। তারা বলত, যে সব লোকেরা কল্পনা করে যে ঘোড়া বাগ মানাতে তারা শিখে ফেলেছে—বার্স্টিয়ানের বাবা ছিল তাদের মধ্যেই একজন।

জেলা সহর বিল্লিঙ্গেন্‌-এ একটা শিক্ষানবিশী জুটিয়ে দিয়ে ছোট ভাই আন্দ্রিয়াজ্‌কে ঘাড় থেকে নাবিয়েছিল বড় ভাই কন্‌রাড্‌। তখনও পর্যন্ত আশা ছিল যে গ্রামে থেকেই ভরণপোষণের মত ব্যবসা চলবে একজন মুচির, উপরন্তু যদি তার এক চিলতে জমিও থাকে। তখনও পর্যন্ত শুধু কৃষকের কুটির এবং মাঠের বিস্তারের মধ্যেই সীমিত ছিল আন্দ্রিয়াজের জ্ঞান। এখন ছোট্ট শহরের পরিসরের ছন্দে ছন্দে সঙ্কুচিত বিকশিত হ'তে থাকল তার হৃদয়। এই সহর তাকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিল, কিন্তু আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে তাকে বঞ্চিত রাখল। আন্দ্রিয়াজ অশান্ত এবং স্বস্তিহীন হয়ে উঠল। যখনই কোনও ছেঁড়া জুতোর পাটিতে হাত পড়ত তার মনে হ'ত সে হয় ত আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারত। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত সে মাইন নদীর ধার দিয়ে, তারপর ব্ল্যাক ফরেষ্টের অভ্যন্তরে। লতিয়ে ওঠা এক বিশেষ ধরনের চারার চাষ করতে আসত যে চাষীরা তাদের সঙ্গে দেখা হ'ত ওর পাহাড়ের ঢালে, দেখা হ'ত জঙ্গলরক্ষাকারীদের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় চঞ্চল পার্বত্য সমতলভূমিতে। শীতকাল ছিল অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। কাঠ এবং চামড়ার জন্য নানা ধরনের স্নেহপদার্থ এবং তেল তৈরী করতে শিখল সে। মালিক যখন বধির, বাতায়ন যখন কুহেলী-আচ্ছন্ন, সে যখন সঙ্গীবিহীন তখন কেমন করে ভগবানের সঙ্গে বিহ্বল আলাপ করতে হয় তাও সে শিখে ফেলল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লম্বা পাড়ি জমাল সে, আপন হাতের

রিগরির তারিফ করতে শিখল তার নিজের পা। গ্রীষ্মের সমুদ্রের দৃশ্য তাকে ভয়-মশান শ্রদ্ধায় অভিভূত করল, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে তার কল্পনাকে রঞ্জিত করল। জুন, জুলাই, আগষ্ট। বিশ্বযুদ্ধ ধরে ফেলল তাকে, জাহাজে করে পাঠিয়ে দিল তার নিজের অভীষ্ট সীমানার অতীতে। সে গেল পশ্চিম রণাঙ্গনে, পূর্ব রণাঙ্গনে, তারপর রুমানিয়ায়। কখনই সে গুরুতর ভাবে আহত হ'ল না। প্রাজ্ঞ ভগবান বোধহয় বুঝেছিলেন যে, এ লোকটা আরোগ্য হবার ছুটি নিয়ে কি করে কাটাবে নিজেই জানে না, তাই তিনি তা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন ওকে। দগ্ধ গ্রামাঞ্চল এবং ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড গোপন এক বিধান সম্বন্ধে তার বিশ্বাসকে নষ্ট করল না। কারণ আগের মত এখনও তার প্রয়োজন দেখা গেল রণাঙ্গনের পেছনে সৈন্যবাহিনীর কর্মশালায় সপ্তাহে একদিন করে এবং প্রত্যহ যখনই যেখানে জুতো সারাবার দরকার পড়ে। কারণ মৃত্যুরও প্রয়োজন হয় পাদুকার।

যখন দক্ষিণ রণাঙ্গনের পতন ঘটল এবং সৈন্যবাহিনীর পর সৈন্যবাহিনী এসে পৌঁছতে লাগল তখন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে স্বদেশের দিকে এগোল বার্স্টিয়ান। সেই মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে নানা-রকম বাসনা ইতিমধ্যে রূপ পরিগ্রহ করতে সুরু করেছে। কিন্তু সে সবের সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই, অন্ততঃ ওর ধারণা ছিল তাই। কারণ তার নিজের অধীরতা এখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। হয় ত বহির্লোক থেকে সে অন্তর্লোকে আশ্রয় নিয়েছে। দেশের জন্য মন কেমন করে উঠল তার—ঘর অথবা মানুষের জন্য নয়—তাদের সম্বন্ধে এখনও তার গভীর বিরাগ। কিন্তু তার ভয় হ'ল মাটি বোধ হয় তার ভাইকে যতটা অনুগ্রহ করেছে তাকে ততটা করবে না, কারণ মাটিকে সে ততখানি যত্ন করে নি। অফুরন্ত মোটরযাত্রার সময়ে তার দৃষ্টি খুঁজতে লাগল মাঠের বিস্তারকে, হেমন্তের ভিজে মাটিকে।

ঘরে তার আবাহন হ'ল নিতান্ত নিরানন্দ। দুই মুচি আগে থেকে গ্রামে আছে, তারাই ভরণপোষণের মত রোজগার জোটাতে পারছে না। কনরাড বার্স্টিয়ান অভিযোগ করল তার সম্পত্তির অবস্থা কাহিল, খামারটাকে কোনও মতে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য তাকে যে নতুন সাজসরঞ্জাম কিনতে হয়েছে তার ফলে বিস্তর দেনা হয়েছে তার। আন্দ্রিয়াজ বার্স্টিয়ানের জন্য শিক্ষানবিশীর দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে, তার পোশাকআশাক কিনে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তার পাওনা পুরোপুরি শোধ হয়ে গিয়েছে। স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে যাবার মধ্যে দিয়ে সে আরও দাবি-দাওয়ার অধিকার হারিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নদীর ধারের এক টুকরো বেলে গোছের জমি তাকে দিতে কনরাড্ বার্স্টিয়ান রাজী হওয়ার ফলে এর নিষ্পত্তি হ'ল। সামান্য এক চিলতে বাগানসহ যে ছোট্ট ইঁটের চালাটা ছিল সেটাও আন্দ্রিয়াজকে দিতে গররাজি হওয়াটা সম্ভব হ'ল না কনরাডের পক্ষে। যাবার আগেই ওটা আন্দ্রিয়াজের ভাগের বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয়েছিল। মাঠ থেকে চালাটা প্রায় আধঘণ্টার পথ।

আন্দ্রিয়াজ বার্স্টিয়ান সেখানে বাস করতে ঢুকল, সঙ্গে কেবল গোটা কতক তক্তা আর একটা খড়ের গদি। ভাইয়ের সঙ্গে অবশ্য সত্যিকারের মিল আর তার হ'ল না, তা হ'লেও মাঝে মাঝে সে দু'-একটা যন্ত্রপাতি ধার নিত এবং ফেরবার পর তার যে ভাইপো জন্মাল তার সে ধর্মবাপ হয়েছিল।

মার্গারেট আলট্মাইয়ারের স্বামী যদি ফ্লুতে না মারা যেত আন্দ্রিয়াজ বার্স্টিয়ান বিয়ে করার কথা ভাবতই না। বিধবাটি ছিল ছোট্টখাট্ট, মুখখানা একটা হাতের পাতার মত ছোট, পাণ্ডুর এবং হাসিবিহীন। ওকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঝামেলা পোহাতে হবে না। বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগের বাসনা তাকে এ কাজে উৎসাহিত করে নি, বরং করেছিল অবহেলিত কবরে একলা পড়ে থাকার ভয়। কারণ সে জানত যে, এর দ্বারা তার জীবনের মোড় কোনও বাঁক ঘুরবে না—এ কেবল জীবনধারা স্বাভাবিক গতিপথে প্রবাহিত হওয়া।

স্ত্রীলোকটি তার সঙ্গে আনল দু'টি গাই, আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয় পর্দাচাদর ইত্যাদি। সারাজীবন ধরে মহিলাটি তার লম্বা ছিপছিপে স্বামীর আলস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছে। এবার কঠোর পরিশ্রমী একটি স্বামী পাওয়া কি স্বস্তির কথা। মনে হয়েছিল বাকী জীবনটা এবার দু'জনে মিলে সুশৃঙ্খল সন্তোষের মধ্যে কাটাতে পারবে। কিন্তু তারপর এমন কিছু ঘটল যা সবই বদলে দিল। চমৎকার নড়বড়ে আলট্মাইয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে কখনও সন্তানসম্ভবা হয় নি।

এখন তার একটি সন্তান হ'ল, তারপর স্বল্পকালের ব্যবধানে পর পর চারটি ছেলেমেয়ে এল। মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করতে তাকে ইতিমধ্যেই শিখিয়েছিল বার্স্টিয়ান। জীবনের শেষ তলানিটুকু ভাল করে উপভোগ করবার কথা এখন ওঠেই না, কিন্তু এতদিন যা কিছু বাদ গেছে, এখন তার শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে হবে।

প্রথম বছরগুলো এমনি গেল যা মানুষ কঠোর চেষ্টা করলে তবেই সইতে পারে। তারপর আবার আরও অসহ্য হ'ল।

প্রতিবেশীদের অবিশ্রাম অভাব-অভিযোগের নালিশে বিশ্বাস করত না বার্স্টিয়ান। তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বলির টিকা বিশেষ করে তার কপালেই পড়েছে। ওপরে কোথাও শুধু তার জন্যই একটা পরিকল্পনা হয়েছে—সে হ'ল তার বিচারের।

॥ ৪ ॥

থেকে থেকে গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রাক চলাচল করছে —কিছু লাল পতাকা উড়িয়ে, কিছু স্বস্তিকা নিয়ে। চোঙার ভেতর দিয়ে উচ্চরবে প্রচারিত হচ্ছে বক্তৃতা, পথে পথে প্রচারপত্র ঝরছে তুষারের মত। একবার সে এমন কি কতকগুলো তুলেও নিয়েছিল। লোকে যখন তাকে এটা বা ওটা করার জন্য সমঝাতে যেত সে চটে উঠত। তার ব্যাপারের মধ্যে অপরিচিত লোকের নাক গলানো সে পছন্দ করত না। মাসখানেক আগে তরুণ কুস্কেল ভ্রাতৃদ্বয় সহর থেকে এসেছিল। তারা দুটো স্বস্তিকামার্কা পতাকা তুলেছিল, একটা তাদের দরজার সামনে, আর একটা তাদের গরমি-ঘরের ছাদে। তাদের পরণে ছিল নতুন জ্যাকেট—অবশ্য খয়েরী রঙের নয়—সেগুলো পরা নিষিদ্ধ ছিল—সবজেটে-ধূসর গোছের একটা রঙের। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা মুখ উঁচিয়ে, লোকে যাতে তারিফ্ করতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের পরিপাটি বায়ুরোধী কোট, চামড়ার বেল্ট, উঁচু বুট দেখে গাঁয়ের ছেলেদের চোখ ঠিকরে যাচ্ছিল। বিশ-ত্রিশটা ছেলে নিয়ে ট্রাক যাতায়াত করছিল, কুস্কেলদের তুলে নিচ্ছিল, কুস্কেলদের বাড়ীতে অন্যদের নাবিয়ে দিচ্ছিল।

অনেক চাষীই মাথা নাড়ছিল। কেউ বলছিল, "আর আহাম্মকী!" কেউ বলছিল, "কে জানে—হয়ত···"একজন বলল, "তবুও লাল ছোটলোকগুলোর চেয়ে ভাল। এরা অন্ততঃ কিছু দিতে চায়, অন্যরা ত শুধু নিতে চায়।" আরও আর একজন বলল, "হাঁ, দাও—মস্ত হাঁ করে আছে।" বার্স্টিয়ান বলল, "আরও আহাম্মকী।" সমস্ত উত্তেজনা থেকে দূরে থাকত সে। কুস্কেলদের দেখলে এই ভেবে দুঃখ হ'ত তার যে, ওদের মত ঝকঝকে বাড়ন্ত ছেলে তার নেই, আছে কেবল ওই পা পর্যন্ত পৌঁছান ছোট ছোট আগাছাগুলো।

একবার রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল তার। পাম্পের দরুন দেনার কিস্তির চিন্তা স্বপ্নেও তাকে উৎপীড়িত করতে থাকে। গেল বছর সে পাম্প বসাতে বলেছিল, কারণ বৌটার জন্য দুঃখ লাগত তার। বালতির ভারে সে নুয়ে পড়ত, কেনন মানুষটা ছোট্টখাট্ট এবং দুর্বল। আর তার মেয়েটাও এখনও বড্ড ছোট। এখন কিস্তিগুলো ঠিক মত দিয়ে উঠতে পারছে না সে। নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে শুয়ে সে গুণছিল আর হিসাব করছিল। হঠাৎ বিল্লিঞ্জেনের দিক থেকে আসা দুটো গুলীর শব্দ তার চিন্তাজাল বিদীর্ণ করল। কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে গেল, কাঁপতে কাঁপতে শুনতে লাগল। তারপর আরও স্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল সব, কারণ এখন তার ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে। সে লোকবে বলতে শুনেছে যে, ডোরার মত পাণ্ডুর ছেলেপিলেদের হাড় নাকি নরম হয়। অতিরিক্ত ভারবহনে তাদের পিঠ বেঁকে যেতে পারে। কিন্তু সেসব হ'ল যুদ্ধের আগে তার বিদেশ ভ্রমণকালে শোনা কথার রেশ। এখন সে যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে ও সব আর কোনও কাজে লাগবে না তার।

তবু কিছু কিছু উজ্জ্বল মুহূর্তও ছিল। শয্যার ওপর নিজেকে একটু উঁচু করে ধরল সে, আস্তে আস্তে পিঠের বিষম ব্যথাটা কমে এল, গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে চারদিকে চাইল। মাটির ক্ষেত এবং তার পরাক্রান্ত প্রতি-বেশীর নিঃসীম নীল ক্ষেতের মধ্যে দিগন্ত রেখা যেন শুধু একটি সরু আল।

॥ ৫ ॥

জোহান যখন সকালে জেগে উঠল তখন আন্দ্রিয়াজ্ বাস্টিয়ানের ছেলেমেয়েরা আগের রাত্রের সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, বেঞ্চির পায়ের দিকের প্রান্ত থেকে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে। তার সবচাইতে কাছে হ'ল ডোরা বাস্টিয়ান, দশ বছরের রোগা মেয়ে, ভাইবোনদের অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে মাথায়। মুখখানা তার রোগা ও সরু, গলা থেকে উঠে পড়েছে কোনও তির্যক রেখা ছাড়াই। দেখতে পাণ্ডুর ও ক্ষীয়মাণ, ভুরু জোড়া হাল্কা রঙের – চোখে পড়ে কি না পড়ে, কাঁধে এবং বাহুতেই যা একটু রঙের আমেজ, আর মায়ের মত সে কদাচিৎ হাসে। ক্বচিৎ কখনও চোখে একটা ম্লান দ্যুতি দেখা দেয় কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকে নিভে যাওয়ার জন্য। জোহানের দিকে চেয়ে সে তার সরু চুলে বেণী পাকাতে থাকে ধীরে ধীরে এবং নিস্তব্ধভাবে। জোহানের মনে পড়ে গেল তার বোনের কথা, সেদিন সকালে যেমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল সে অন্তর্বাস পরে হাই তুলতে তুলতে, ছোট্ট সুরু হাত দু'খানি দিয়ে বেণী পাকাতে পাকাতে। লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। সব ক'টা বাচ্চা ঘুরে গিয়ে চৌকাঠ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল। যেখানে তারা দাঁড়াল সেখান থেকে তারা দেখতে লাগল ওকে মাথা গলিয়ে সার্টটা খুলে ফেলতে এবং পাম্প থেকে জল নিয়ে সারা গায়ে ছিটাতে। আন্দ্রিয়াজ্ বাস্টিয়ান আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল, জোহানের জল গড়িয়ে-পড়া পিঠখানার দিকে হতভম্ব ভাবে চাইল। গা মুছবার কিছু একটার জন্য জোহান ইতস্ততঃ তাকাল। ওর দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই ডোরা নিজের পোশাকের ওপর ঝোলানো কাপড়ের টুকরোটা খুলে ওর হাতে এগিয়ে দিল।

সার্টটা গায়ে গলিয়ে দিল জোহান। তখন ভোর পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে হবে। ঠাণ্ডা, সোনালী বাষ্পরাশি তার শরীরটাকে ঘিরে ফেলল, তাকে যেন কর্মোদ্যোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাল। আবেগের বশে সে দু'টি হাত বাড়িয়ে দিল, তারপরই আবার নামিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ। কাঁধ দুটো ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা নীচু করে ফেলল সে।

বাচ্চাদের পিছনে পিছনে সে ঘরে ঢুকল। কফির সুঘ্রাণ, টেবিলের ওপর বাসিরুটির টুকরোয় ভর্তি মস্ত একখানা প্লেট, কয়েকটি কাপ। মহিলাটি কফি ঢেলে দিল, কাগজের ঠোঙা থেকে এক চামচ করে চিনি প্রত্যেককে দিয়ে আবার ঠোঙাটা টানায় রেখে দিল। অল্প কয়েক ফোঁটা করে দুধ কাপে কাপে পরিবেশন করল। বাড়ীর সামনে বিক্রির জন্য রাখা গরুর বাঁট থেকে সদ্য দোওয়া ঈষদুষ্ণ দুধভরা বালতিগুলোর কথা ভাবল জোহান। নীরবে সে রুটির টুকরো কফিতে ডোবাল। মার্গারেট বাস্টিয়ান ছোট ছেলেটাকে কোলে নিল। সে জামার বোতাম খুলতেই সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা বেজায় কেঁদে উঠল। এবার সে চটপট জামার বোতাম আটকে নিয়ে এক টুকরো রুটি কফিতে ভেজাল, বাচ্চাটা লোভীর মত গবগবিয়ে সেটা খেয়ে নিল। টেবিলের এপার-ওপার থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সলজ্জ সমঝের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল, যার অর্থ জোহান বুঝতে পারল না। আস্তে আস্তে ঊষার অবসানে প্রখর দিনটা তাদের ওপর চেপে বসল যেন সকলকে অভ্যস্ত করতে চাইল সঙ্গে নিয়ে আসা কঠিন কাজের সাথে। বাস্টিয়ান বলল, "মার্গারেট, এবার আমাদের ক্লোভারের ক্ষেতের দিকে রওনা হ'তে হবে।" জোহানের দিকে ফিরে সে বলল, "তুমি বরং খানিকটা পথ আমাদের সঙ্গে এস, আমাদের ক্লোভার ক্ষেতের পাশ দিয়ে একটা পথ গেছে সেটা তোমায় সিধে বটৎসেন্‌বাখ্-এ পৌঁছে দেবে।"

জোহান জবাব দিল না, মাথাটা চুলকোতে লাগল। চোখ বন্ধ করে বলল, "এক পেট খেয়ে এখান থেকে চলে যাব? বাইরে কাঠের বোঝা রয়েছে দেখছি।"

বাস্টিয়ান দ্বিধাভরে স্ত্রীর দিকে চাইল। স্ত্রী ঘাড় নাড়ল। বাস্টিয়ান বলল, "তোমরা সহরের লোক, তুমি কি ও ধরনের কাজ জান?"

জোহানের দৃষ্টি বদলে গেল, আর একটু প্রীতিময় হ'ল। "নয় কেন?"

ওরা বাইরে গেল। বাস্টিয়ান চালা থেকে কাট কাঠবার গুঁড়িটা আর কুড়োলখানা নিয়ে এল। কয়েকখানা কাঠ সে চিরে দেখিয়ে দিল কিভাবে করতে হয়। জোহান বলল, "রেখে দাও, রেখে দাও না।" নিজেই কুড়োলখানা তুলে নিল সে। বাস্টিয়ান কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করল।

গোড়াতে জবড়জঙ্গ দেখাতে লাগল, তারপর একটু আনাড়ির মত, তারপর ঠিক হয়ে গেল।

ওকে একা রেখে তারা বেরিয়ে পড়ল। বাস্টিয়ানের কাঁধে সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা, পিঠে একটা ঝুড়ি। স্ত্রীলোকটিরও পিঠে একটা ঝুড়ি এবং হাতে এর আগের বাচ্চাটার হাত ধরা। বাস্টিয়ানের কোমরবন্ধে ঝোলান ঝকঝকে ছোট কাস্তেখানা প্রভাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে পিছনে আলোর একটা সরু রেখা রেখে যাচ্ছিল। যেখানে বড় রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটা বটৎসেনবাখ্-এর দিকে চলে গেছে সেখানে এসে পড়ল ওরা। এখান থেকে একটা চকচকে নীলাভ ঘোড়ার খুরের মত নদীর বাঁকটা মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ে। রোজ সকালের মত স্ত্রীলোকটি বাচ্চাটাকে শূন্যে একবার ছুঁড়ে দেয়, নদী দেখে রোজ সকালের মত বাচ্চাটা চেঁচিয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ, খুশিমাখা পাখির কাকলীর মত।

ক্ষেতে পৌঁছতে ওদের আধ ঘণ্টা লাগে। বাঁ-কাঁধের ওপর বাচ্চাটার ভার অনুভব করতে থাকে বাস্টিয়ান। সে বলে: "এই মার্গারেট, তুমি বললে ও আর বুকের দুধ খেতে চাইছে না, অ্যাঁ?" স্ত্রী জবাব দেয় "না"। যত বেশী দিন সম্ভব বাচ্চাটাকে ও বুকের দুধ খাওয়ানর চেষ্টা করেছে আর একবার সন্তানসম্ভাবনা এড়াবার জন্য। মাথাগুলো এবার নুয়ে পড়ে, আর কথা না বলে ওরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়। বছরের পর বছর, দিনের পর দিন ধ'রে একটার পর একটা দরজা, একটার পর একটা ফোকর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদের সামনে, শেষ পর্যন্ত ওদের সম্পূর্ণ নিরানন্দ অন্ধকারে নিক্ষেপ করে।

ওরা ক্ষেতে পৌঁছে যায়, লাঙলের ফলায় কাটা একটা গভীর রেখার মধ্যে বাচ্চাগুলোকে নাবায়।

বাড়ীর বাগানে বড় বাচ্চা দুটো দুধের বালতির হাতলের মধ্যে দিয়ে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে দেয়। উঁচুতে তুলে ফেলে বালতি, ভুরু দুটো কুঁচকে যায় ওদের, ছোট ছোট পা ফেলে চলতে সুরু করে, বালতির মৃদু দোলায় নিয়ন্ত্রিত হয় ওদের পদক্ষেপ। প্রায় সেই একই সময়ে গ্রামের প্রান্ত থেকে দুধ কেনার কেন্দ্রের ছোট্ট ঘণ্টার অস্পষ্ট রিনটিন শোনা যায়।

জোহান তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, দেখতে থাকে ডোরার কালো মোজা-পরা দীর্ঘ সুদৃশ্য পা দু'খানা তারপরই সে একা। বেড়ার পরপারে গ্রামটা তা; অপরিচিত। ভয় এবং একঘেয়েমির একটা তরঙ্গ নেমে আসে জোহানের ওপর। নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সে। তুলে নেয় কুড়োলখানা। একা ফেলে রাখা মাঝের বাচ্চাটার গায়ে সে হোঁচট খায়। দুর্বল ও ক্ষীয়মান বাচ্চাটা মাটিতে একা খেলে বেড়াচ্ছিল। জোহান একটা কটূক্তি করে, বাচ্চাটাকে শক্ত করে পাকড়ে তাকে দরজার সামনে বসিয়ে দেয়।

সে একটার পর একটা কাঠ সোজায় আর কুড়োল চালাতে থাকে। কুড়োলের ছটা-সাতটা ঘায়ের পর সে তাল খুঁজে পায়। তার কষ্ট রাগে পরিণত হয়, রাগ চড়ে ক্রোধোন্মত্ততায়। চোখে লাল দেখতে সুরু করে সে। কাঠের রেখাগুলো তার চোখের সামনে কাঁপতে থাকে। কিন্তু হাতদুটো ইতিমধ্যে ঠিক জায়গায় আঘাত করতে শিখে ফেলেছে। দৃঢ়বলে সে আঘাত হানতে থাকে সকালের ওপর, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন ভাবে আঘাত হানে যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল জীবনের কুহকে সে পড়েছে তার ওপর। তার জীবনের এই ধারার জন্য যাকে যাকে তার দায়ী মনে হয় তাদের সকলের ওপরেই অন্ধভাবে আঘাত করতে থাকে সে। কোনও অনুতাপের চিহ্ন না নিয়ে নিষ্করুণভাবে সে আঘাত করতে থাকে যারা যারা তার পথে দাঁড়িয়েছে তাদের সকলের ওপরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে তার। বাচ্চাগুলো তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, তারা এসেছিল দ্বিতীয় বালতিটা নিতে। এ দফায় তারা এমনকি আরও সতর্কভাবে রওনা দেয়, খালিহাতে রয়েছে তাদের স্কুলের বই। জোহান হাত দুটো ওপরে তোলে। তার ক্রোধোন্মত্ততা আসে আর চলে যায়। সে তার তরুণ নিষ্ফল জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কাঠের চিলতেতে, বিচূর্ণ করে অসতর্ক ভাবে লালিত তার সকল আশাকে, কারও কাছে গুরুত্ব না পাওয়া সব প্রতিজ্ঞাকে।

মাঝখানের বাচ্চাটা অনেকক্ষণ হ'ল চৌকাঠ থেকে নেবে ফের বাগানে এসে পড়েছে। পাম্পের তলাকার ভিজে মাটিতে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, ওকে গ্রাহ্য করে না। কখনও কোনও স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়ে আসে, বেড়ার পিছনে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ায়, ফিরে চলে যায়, আবার

একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসে। দুধের খালি বালতি হাতে একদল স্ত্রীলোক ও বালিকা মুহূর্তের জন্যে বেড়ার পিছনে দাঁড়ায়, ওকে লক্ষ্য করে কানাকানি করে, আবার চলে যায়।

ইতিমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে, আবছা ঘোমটার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। বাস্টিয়ানদের ক্লোভারের ফসল তুলতে হবে। মাঠে নিয়ে যাবার জন্য দুপুরের খাবার তৈরী করে ডোরা। তাকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেতে হয়। জানলার বাইরের কপাটের নীচে সে জোহানের জন্য আধখানা পাঁউরুটি, নুন এবং গরম আলু রেখে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যায় তাকে যতটুকু রুটি দেওয়া হয়েছিল ততটুকুই সে নেয়। একটুক্ষণের জন্য তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, নিজেও সে শান্ত হয়ে যায়। ঘষঘষানি, প্যাকপ্যাকানি, পাম্পের তলায় জলের কলকলানির মৃদু শব্দ, মধ্যাহ্ন ভোজ তৈরীর সময়ের স্বাভাবিক চর্বির গন্ধ—সব মিলিয়ে তাকে প্রবৃত্ত করে তার ওই শুকনো রুটি খেতে। এ বিষয়ে না ভেবে সে চেলা কাঠগুলোকে গুছিয়ে চালার মধ্যে একটি সুবিন্যস্ত গোছায় সাজিয়ে রাখল। বাচ্চাগুলো হয়ত এখন ফিরবে না। তারা ক্ষেতের কাজে সাহায্য করছে, কিন্তু বৃষ্টি বোধ হয় রাতের আগে নামবে না। বর্ষা-রাতের চিন্তা তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

কাঠ কাটবার গুঁড়িটার ওপর আরও কাঠ সাজিয়ে সে কুড়োল মারল। আঘাত করল সে ঘুমন্ত মধ্যদিনকে, গাঁয়ের আপাত নিস্তব্ধতাকে। এ বাড়ীর প্রশান্তির ওপর সে তিক্ত নিষ্করুণ আঘাত হেনে চলল। আর কয়েকখানামাত্র কাঠ পড়ে আছে। আস্তে আস্তে তার শক্তিও কমে আসছিল, তার ক্রোধোন্মত্ততাও শান্ত হয়ে আসছিল। জোরে নিঃশ্বাস নিল সে, হঠাৎ বার্স্টিয়ানকে এবং ছেলেমেয়েদের তার পেছনে দাঁড়ান দেখল। কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলল সে। তার গরম লাগছিল, কিন্তু চারপাশের হাওয়া ছিল শীতল। গাঁয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল আর একরকম নিস্তব্ধতা নিয়ে। এ নীরবতা পীড়াদায়ক নয়, বরং এ যেন পীড়া থেকে মুক্ত করছে, অবশেষে স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

বার্স্টিয়ান একটা পরিহাসের দৃষ্টি নিয়ে জোহানকে দেখছিল, তার আধো-বোজা দৃষ্টি বেদনায় কালো হয়ে এল, সে ভাবছিল, যদি বড় বেশী দেরি হয়ে যাওয়ার আগে—যথাসময়ে আমার এ রকম একটি ছেলে হ'ত।

জোহান যে আবার তাদের সঙ্গে খাবে এ নিয়ে বেশী কথাবার্তার দরকার ছিল না—খাদ্য টকদুধ, আর তাতে ফেলা রুটির টুকরো। তার পর আবার সে বাইরে গেল পড়ে-থাকা কাঠখানার ব্যবস্থা করতে। তার চারপাশে মুরগীদের খাওয়ান চলছিল, চলছিল কল থেকে জল তোলা, বালতিগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া। শেষ কাঠ ক'খানাকে সে গুঁড়ির ওপর ফেলল। শেষবারের মত সে আঘাত করল দিনটাকে—একমাত্র জিনিস যা নিশ্চিত ভাবে পরিসমাপ্ত হ'তে চলেছে।

হয়ত আর একবার তাকে নিমন্ত্রণ করা হবে না এ ভয় তার মনে উঠবার আগেই বার্স্টিয়ান তার পাশে এসে দাঁড়াল।

"তুমি বরং আবার এখানে ঘুমাও। কাল এমনিতেও রবিবার।"

বার্স্টিয়ান হাতের পাতাটা বাড়িয়ে দেখল ও বলল, "আর বৃষ্টিও পড়তে সুরু করেছে।"

॥ ৬ ॥

এদিকে জোহানের থাকার দ্বিতীয় রাত্রে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যার সঙ্গে আসলে তার কোনও সম্বন্ধই ছিল না, কিন্তু বার্স্টিয়ান এবং তার ছেলেমেয়েরা যাকে চিরটা কাল ধ'রে ওর আগমনের সঙ্গেই যুক্ত করে রাখল। রাত্রি তখন প্রায় দুটো, বুড়ো বার্স্টিয়ান চমকে বিছানায় উঠে বসল—হাঁস-মুরগীর ঘর থেকে বিপদের সঙ্কেত—ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ কোঁকর কোঁ আওয়াজ। একটা চাপড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল তার স্ত্রী। একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্য সে যেন স্থাণু হয়ে কান পাতল। তার পর তারা দু'জনেই বাইরে দৌড়ে গেল।

জোহানও চমকে জেগে উঠেছিল। বার্স্টিয়ান সজোরে ফিসফিসিয়ে উঠল, "শেয়াল!" ছেলেটা তৎক্ষণাৎ তার পিছনে পিছনে বেরোল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, ওদের অনাবৃত বুড়ো আঙুলগুলো ভিজে পিছল কাদায় বসে যেতে লাগল। মুহূর্তের দ্বিধা তাদের অধিকার করেছিল। বার্স্টিয়ান একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়েছিল, মুখখানা তার হাঁ করা। দুটো ইঙ্গিত

করে জোহান একটা বন্দুক চাইল—কোনও বন্দুক নেই। বার্স্টিয়ানের হাত থেকে সে ডাণ্ডাটা নিল। এক মুহূর্ত পরে সে চালার ছাদের ওপর লম্বা হয়ে লেপটে শুয়ে পড়ল। বার্স্টিয়ান শুধু তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে ডাণ্ডাটা দেখতে পেল। কাঁপুনি ধরেছিল তাদের, সার্টগুলো টেনে গায়ে জড়িয়ে নিল।

জোহান হাত নাড়ল, দরজা খোল!

সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, জোহানের পরই ডোরা যতক্ষণে জাগল ততক্ষণে আসলে সব শেষ হয়ে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক এবং ডানা ঝটপটানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল—নৈশ বাগানের পক্ষে রীতিমত অস্বাভাবিক। মা ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতর ফিরে এসেছে। এবার সে অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করে উঠল, "কতগুলো ধরল?" দূর থেকে বাবার গলা ভেসে এল, "শুধু এই একটা।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা ফিরে এল। শেয়ালটা পালিয়ে গেছে কিন্তু শিকার ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে। বার্স্টিয়ান হাঁসটাকে একটু দূরে ক'রে ধ'রে আছে, তার সার্টে রক্তের দাগ লেগেছে।

স্ত্রী বলে, "এটার পালক বেছে ফেলা উচিত, এক্ষুণিই এটা তৈরি ক'রে ফেলা উচিত।" বাচ্চাগুলো এখন সবাই জাগ্রত;. জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ চোখে সব দেখছে। অন্ধকারে টেবিলের ওপর তুষার-শুভ্র বিশাল পাখিটা পড়ে আছে। শীগগির ওরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে ভিড় করে, বুকগুলো তাদের গরম আর পিঠগুলো তাদের বরফের মত ঠাণ্ডা। বুড়ো বার্স্টিয়ান আহত জায়গাটা খুঁজে কাটাটা আরও বড় ক'রে দেয় রক্ত বার ক'রে দেবার জন্য। রক্তটা ধরার উদ্দেশ্যে আড়ষ্টভাবে এবং ভীত চোখে পাত্রটা ধরে থাকে ডোরা। তার রাত্রিবাসেও রক্তের দাগ লেগে যায়। তারপর বার্স্টিয়ান গলা, ডানা এবং পা কেটে ফেলে। সে বলে, "ভাগ্য যে এই একটার ওপর দিয়ে গেছে, হ'তে পারত সবগুলোই।"

অনেকখানি হাত ঢুকিয়ে একটানে হাঁসটাকে বার ক'রে আনে স্ত্রীলোকটি। "নাফটেল্ সবগুলোই আগাম অর্ডার দিয়ে রেখেছিল।" তার ছোট্ট তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে সে সাবধানে নাড়িভুঁড়িগুলো ছাড়িয়ে ফেলে। পুরুষেরা পালক ছাড়াতে সুরু করে।

বার্স্টিয়ান বলে, "নাফ্‌টেল্ ওগুলোকে বিল্লিঞ্জেনে কে বিক্রি করে।" হঠাৎ সে জোহানের দিকে বিহ্বল ভাবে চায়। এখনও পর্যন্ত জোহানের মুখে উত্তেজনার একটা রেশ রয়ে গিয়েছে - যেন ভয়ঙ্কর, অদমিত একটা কিছু। বার্স্টিয়ান চমকে যায়। সে জানে না যে ওই একই উত্তেজনা তার মুখ থেকে এই সবে মিলিয়ে গিয়েছে। ছোট বাচ্চাগুলো রান্নাঘরে পালকগুলো জড়ো করে এবং ডোরা যে লিনেনের থলিটা খুলে ধরে তার মধ্যে সেগুলো ভর্তি করে।

পোড়া পালকের শুঁটকো গন্ধের সঙ্গে ফুটন্ত চর্বির গন্ধ মিশে এবার স্ত্রীলোকটির জিভও আলগা করে দেয়।

"ও একটা নিজের জন্যে রেখে দেবে। নাফ্‌টেল তা দেবেই। তার পয়সা সে অন্যগুলোর ওপর দিয়ে খুব তুলে নেবে।"

বার্স্টিয়ান যোগ দেয়, "আমাদের মত লোককেই শেয়াল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।" গলার এক লম্বা টানে চর্বিটা বার ক'রে নেয় স্ত্রী। বার্স্টিয়ান বলতে থাকে, "আমরা ভুষিটুকু পর্যন্ত নিজের জন্য রেখে উঠতে পারি নে। কেবল আর এক মার্ক, আবার আর এক মার্ক। সে কি তিন তারিখে দিতে হবে, না কি পাঁচ তারিখে—সেই কাস্ট্রি-সিউজ-এর কিস্তি?"

স্ত্রী জবাব দেয়, "তুমি কেবল জিজ্ঞাসা কর, আর বরাবরই তিন তারিখে দিতে হয়।"

বার্স্টিয়ান বলে, "আমি কেবলই জিজ্ঞাসা করি আর বরাবরই তিন তারিখ, এদিকে আমি ভেবে পাইনে কেমন ক'রে দেব।"

ডোরা পালকশুদ্ধ থলিটার মুখ সেলাই করছিল, সে বাবার দিকে ভীত দৃষ্টিতে চায়। যখনই পাম্পের দেনা-শোধের কিস্তির বিষয়ে আলোচনা সুরু হয় ডোরা কেবল ভয় পায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার। দাঁতে দাঁত দিয়ে হাঁসের ঘাড়ের চামড়া ছাড়ায় বার্স্টিয়ান। স্ত্রীলোকটি বলে, "হাঁস দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়।" তার চিন্তাগুলো একে অপরের ঘাড়ে এসে পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে, "তোমার মনে আছে বিয়ের দিন আমাদের রাতের খাওয়া কি দিয়ে হয়েছিল? মুলোর সসের সঙ্গে ঝলসানো মাংস।"

জোহানের কিছু করার থাকে না। আগের রাত্রে সে লম্বা ঘুম দিতে পেরেছিল। কিন্তু আর একটা লম্বা ঘুমের বেজায় দরকার ছিল তার। তার এখন একটু তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না হাসবে কি কাঁদবে। স্ত্রীলোকটি ব'লে দেয় যে চুল্লী দেখাশোনা সে একলাই করবে, আজ যেহেতু রবিবার অন্যরা আরও এক ঘণ্টা শুয়ে নিক।

জোহান তৎক্ষণাৎ তার বেঞ্চের ওপর টান টান হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্টিয়ান আবার তার কাছ পর্যন্ত গিয়ে বলে, "জোহান, তুমিও বরং তা হ'লে আমাদের সঙ্গে জুটে যাও। আজ এমনিতেও রবিবার। তোমার বটৎসেনরাথ্‌এ পৌঁছনর এমন কিছু তাড়া নেই।"

"মনে হচ্ছে হাঁস যেন সত্যিই তোমার কপালে আছে। কি বল, তা হ'লে ঠিক হয়ে গেল সব, তোমার নেমন্তন্ন রইল।"

ক্রমশঃ

—o—

॥ প্রবন্ধ

কবি রামেন্দু দত্ত

শ্রীহারাধন দত্ত

রামেন্দু দত্ত রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন কবি। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে এক বিরাট্ কবি-সমাজের আবির্ভাব হয়। ঊনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে এই কবিগোষ্ঠীর অনেকেই জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও সাহিত্যাদর্শ এই কবি-সমাজকে কেবলমাত্র অনুপ্রেরণা দান করেই ক্ষান্ত থাকে নি। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যে জীবনের ধ্যান-ধারণা হয়ে পড়ে। তাঁদের সকলের নাম আজ একপ্রকার অজ্ঞাত। তবু সেই রবীন্দ্রভাবে ভাবিত হয়ে এবং রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও যাঁরা কিছু নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন—কবি রামেন্দু দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কবি রামেন্দু দত্ত—মাতুলালয় খণ্ডঘোষ বর্দ্ধমানে ১৯০৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ২৮শে মাঘ, ১৩১১) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন—রামেন্দু দত্তের জন্মকাল ১৯০০ সাল। সেন মহাশয়ের এই অনুমান সত্য নয়। রামেন্দু দত্তের পিতার নাম আশুতোষ দত্ত। আশুতোষ দত্ত বিহার এডুকেশনাল সার্ভিসে সুনাম অর্জন করেন। চিত্রশিল্পে পিতার দক্ষতা ছিল। অপরদিকে খণ্ডঘোষের প্রসিদ্ধ মাধবচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র তিনি। পুরুলিয়া স্কুল এবং বাঁকুড়া কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। রামেন্দু দত্ত ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পাস করেন। সাহিত্যগতপ্রাণ পিতৃদেবের কাছে অতি অল্পবয়সেই তিনি কাব্য পাঠের দীক্ষা নেন। যদু-গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যপাঠের' কবিতাগুলি তাঁর পিতৃদেব মনোহর ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শোনাতেন এবং মুগ্ধ শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিতেন কবিতার মধ্যে কত মাধুর্য্য থাকতে পারে। বাল্যেই চিত্রকর পিতৃদেবের কাছে রঙ-তুলির ব্যবহার-প্রণালী আয়ত্ত করেন। আর সেই রঙ-তুলিকে কেন্দ্র করেই তরুণ মনের কাব্যপ্রেরণা এইভাবে প্রকাশিত হয়।—

বহু রঙ আছে কিন্তু মূল রঙ তিন।
বেশী জল দিলে হয় সব রঙ ক্ষীণ॥
হরিত লোহিত আর নীলের বরণ।
এই তিন মূল রঙ করিবে স্মরণ॥
আর সব রঙ ফলে অন্য মিশাইলে।
সবুজ জরদ আর সাদা পাটকিলে॥
নীল-লাল মিশাইলে বেগুনে রঙ ফলে!
থাকে চিত্রিত যে রঙ বেগুনের গলে॥ ইত্যাদি

এর পরেই প্রভাত, সন্ধ্যা, মিষ্টান্ন বিক্রেতা প্রভৃতি আরও

কয়েকটি কবিতা লেখেন। কবিতা রচনার এটাই সূচনা। এই কালে আর একজন শিক্ষাগুরুর কথা মনে পড়ে। ইনি রামেন্দুর গুরু পুরুলিয়া স্কুলের হেড পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন। কবি রামেন্দু দেবেন্দ্রনাথের প্রতি ঋণ-স্বীকার করে এক স্থলে লিখেছেন: এই পণ্ডিত মহাশয়ের নিজের কবিতা গ্রন্থ ছিল এবং ইনি ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় সেকালে লিখতেন। ব্যাকরণ কৌমুদির খরধারায় অবসন্ন-মতি কিশোরকে পণ্ডিত মহাশয় কিছুক্ষণ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সেই সময়েই কবি সংস্কৃত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্ত প্রভৃতি বাংলা ছন্দের সংগে পরিচিত হন। ১৩২৮ সালে কবির বয়স যখন ১৭ বৎসর, সেই কালেই 'সম্মিলনী' নামক পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়। এই সূত্রেই সাহিত্যাগ্রজ কবিশেখর কালিদাস রায়ের সংগে তাঁর সংস্রব ঘটে। তিনিই তৎকালীন সাহিত্য-সমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন। পরে বাসন্তী, মহিমা, প্রভৃতি ছোট ছোট পত্রিকায় তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হ'তে লাগল। মহিলা-সম্পাদক হেমেন্দ্রলাল রায় তাঁকে কাব্যচর্চায় প্রবুদ্ধ করলেন; ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন সাগ্রহে তাঁর কবিতা ও গল্প প্রকাশ করলেন। ক্রমে, প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী উপাসনা ও বিচিত্রা প্রভৃতি সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে তাঁর কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হ'তে লাগল। সতের বৎসর বয়সেই তিনি কবিগুরুর আশীর্বাদ লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেন—"কবিগুরুর প্রথম চরণস্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় সতের বৎসর বয়সে। তখন বাঁকুড়া কলেজে পড়ি। ই. আই আর. এ ছত্রিশ দিন ধর্মঘট। চৈত্র মাস, প্রয়োজন মত ১৪ মাইল, ১৬ মাইল হাঁটিয়া ও ট্রেনে অধিক ভাড়া দিয়া কোন মতে শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম। সে কাহিনী বিবৃত করিবার স্থান ইহা নয়। পরদিন প্রাতঃকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম চরণস্পর্শ করিয়া আবাল্যের একটি সাধ পূর্ণ হইল। মনে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় প্রায় অর্ধঘণ্টা-কাল একাকী কবিগুরুর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি আমার একটি খাতায় লিখিয়া-আনা কয়েকটি কবিতা ভাল করিয়া পড়িলেন। আমার ছন্দজ্ঞান সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া আমায় বারংবার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় কবি হবে, বড় কবি হবে," সে কথা তখন আশীর্বাদরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বড় কবি না হইতে পারিলেও মহতের সেই আশীর্বাদ আমার মহা সৌভাগ্য হইয়া থাকিবে।" রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর যোগাযোগের কথা কিছুকাল পূর্বে যুগান্তরে তিনি সবিস্তার লেখেন। তাঁর প্রথম কাব্য মঞ্জুলা (১৩৪০) গ্রন্থখানিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণেই উৎসর্গ করেন। দীর্ঘ উৎসর্গ কবিতায় রবীন্দ্রানুগত্য স্বীকার করে তিনি মন্দমধুর ছন্দে লেখেন—

আমরা মানব, তোমাপানে চাই ঊর্দ্ধে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি—
অন্তরে ধরি সুরধারা তব, সারা গায়ে তব কিরণ মাখি।
আমাদের ঘরে জনমিয়া তুমি বিশ্বের তরে গাহিছ গান
পূর্ব-তোরণে উঠে রবি, করে সর্বভুবনে আলোক দান।
জগতের বুকে কল্যাণে সুখে চিরকাল তুমি দীপ্ত রহ
কোটিগুণীজন শিষ্যের সাথে এ অভাজনেরও প্রণাম লহ।

ছন্দ-ভাব-ভাষা-সৌন্দর্যানুভূতি সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসারী। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে মঞ্জুলা, রূপসী, মঞ্জরী ও নবমঞ্জরী বিখ্যাত। শেষোক্ত গ্রন্থ দু'খানি সুখ্যাত সঙ্গীত সংগ্রহ। এই গ্রন্থ দু'খানিতে সঙ্গীতের সংগে স্বর লিপিও আছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ মঞ্জুলা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর গল্প ও গানের বই প্রকাশিত হয়। মঞ্জরী ও নবমঞ্জরীতে সংকলিত অধিকাংশ সঙ্গীতই H. M. V. Gramophone Co. কর্তৃক রেকর্ড হয়। স্বরলিপি ও সুরদান করেন যথাক্রমে দীনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জগৎ ঘটক, কে. মল্লিক, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা প্রভৃতি খ্যাতিমান সঙ্গীত-শিল্পীরা। কবি রামেন্দু গল্প-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে ফুলের ডালি, দুলারী, রসায়ন, ভুলের ফুল, প্রভৃতি উল্লেখ্য। ফুলের ডালির গল্পগুলি ছোটদের জন্য লিখিত। এই গ্রন্থখানি সেকালে প্রভূত সুনাম অর্জন করে। রসায়ন ব্যঙ্গ গল্পের সমষ্টি—; দুলারী গল্পগ্রন্থখানি জলধর সেনের প্রশংসামূলক ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ভুলের ফুল প্রবাসী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। কবি রামেন্দু দত্তের সাহিত্যক প্রতিভা মুখ্যত এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তাঁর অন্যান্য কবিতা ও রচনা এখনও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তিনি সেকালের প্রায় অধিকাংশ

সাহিত্য পত্রিকায় লিখতেন। ইংরেজী রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। Statesman প্রভৃতি কাগজে তাঁর ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হত। বি. এ. পাশ করার পর তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Ramtanu Lahiri Research Scholar হিসাবে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে সুনামের সংগে কাজ করেন। পরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা'র সংগে তাঁর গভীরতর সংশ্রব ঘটে এবং অচিরে এই পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এরপর কলকাতার একটি বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চ মাহিনাতে চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানে দীর্ঘকাল দক্ষতার সংগে কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তবু তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন।

গত কয়েক বৎসর থেকে তাঁর অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। পত্নী-বিয়োগের পর কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিনি অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি একখানি পত্রে লেখেন—'I am ill sore need of money' বাস্তবিকই শেষ জীবনে তিনি অতীব দারিদ্রময় জীবন যাপন করেছেন। বাংলা দেশের কবি-জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডির কথা তিনি বহু পূর্বেই একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন—এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।

কবি তোমাদের আসেনি চড়িয়া হেম পুষ্পক রথ,
এসেছে রুধিরে রাঙিয়া, দলিয়া কন্টক বনপথ।
বহেনি মলয়, গাহেনি কোকিল।
চাহেনি আননে হেলায় নিখিল
প্রতি পদে পদে গতিরোধ করি দাঁড়ায়েছে পর্বত।
ধরণীর লোভ ধরণীর ধন জোটে না ভাগ্যে তার—
পৌর্ণমাসীতে তাহার কুটির আঙিনা অন্ধকার
লোকে ভাবে কবি আছে বেশ সুখে
কখনও ফোটেনি দুখ-লেশ মুখে,
মুখে দুখ-লেশ ফোটে না, কিন্তু বুকে বাজে হা-হা-কার।
(কবি)

রামেন্দু দত্ত সুখ্যাত কবি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রভৃতি বিদগ্ধ সাহিত্যিকেরা তাঁর কবি-প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেন। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের এই তিন ধারাতেই তিনি অবগাহন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান বা সৃজনী-প্রতিভার বৈচিত্র ও নূতনত্ব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার অবকাশ এখানে কম। কবি মোহিতলাল তাঁর 'কাব্যমঞ্জুষা' গ্রন্থে তাঁর একটি কবিতা চয়ন করেন। এবং তাঁর কবি-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন—"পরিপক্ক রচনা, ভাষা ও ছন্দের দৃঢ়তা এবং ভাবের সরলতা লক্ষণীয়",। কবিতাটি নাম ছিল—'মজঃফরপুরের ভূমিকম্প'। কবিতা-পাঠকালে মোহিতলাল লেখেন—"এই কবিতাটির বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি এমন যে, ইহা পড়িয়া তোমরাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে—কবিতা কত রকমের হইতে পারে। এখানে কবি একটি অতিশয় বাস্তব এবং ভীষণ আকস্মিক ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন। বর্ণনাটি এমন যে, আমরা যেন সেই স্থানে সেই সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এবং প্রত্যক্ষ করার ফলে আমাদের প্রাণে ঠিক সেই ভাব জাগিতেছে। এজন্য এই কবিতাটি এই শ্রেণীর রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।" রামেন্দু দত্তের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে মোহিতলালের এই প্রশংসামূলক রচনাটি প্রণিধানযোগ্য। যোগ্যব্যক্তি তাঁর সৃজনী-প্রতিভার আলোচনা করবেন। আমরা এখানে কবি-জীবনের অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিলাম মাত্র। তাঁর বহু কবিতার সুর ও ছন্দের ইন্দ্রজাল আজও কানে বাজে—মনে পড়ে 'আমন্ত্রণী' কবিতার কয়েকটি লাইন—

মধু ফাল্গুনে রূপজাল বুনে, ধরণী হয়েছে সুন্দরী,
কাননে কাননে বন উপবনে কলিকা উঠেছে মঞ্জরী,
দখিনা পবন মঞ্জু লীলায়
কুঞ্জ কুসুমগন্ধ বিলায়,
দোলে বল্লরী, দোলে কিশলয়, শিখিমুখ ফেরে গুঞ্জরী'
মধুর লগন, মধুর গগন, মধুরা ধরণী সুন্দরী'

কবি রামেন্দু দত্ত দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গভারতীর অঙ্গনে এই ছন্দ ও সুরের সাধনা করেছেন। তাঁর সেবায় বাংলা সাহিত্য নিশ্চয়ই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কবির এই সুর-সাধনা একেবারে বিস্মৃত হবার নয়।

জ্যোতির কনক পদ্মাসনে

(শেষ রচনা)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"জ্যোতির কনক পদ্মাসনে"
ধ্যানমগ্ন হে কবি, তোমার
বহ্নি-বীণা ঝঙ্কারিল জীবনের প্রথম প্রত্যুষে,
অপরূপ সুর-মূর্ছনায়
মহাকাশে পরিব্যাপ্ত "মহাবাণী পুণ্য মহূর্তের"।

প্রতিদিবসের গ্লানি
নিষ্ফলতা বিষণ্ণ সন্ধ্যার
তন্দ্রাহীন রজনীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
অন্তরের দাবদাহ অহরহ আত্মবঞ্চনার,
অন্ধকারে নিপীড়িত আত্মার ক্রন্দন
নিঃশেষে ঘুচিয়া গেল
উৎসারিত আলোর প্রবাহে।

জীবনের পরম তৃষ্ণায়
সে আলোক অমৃত সমান
সে আলোক তোমার আত্মার ;
সে আত্মার সহস্র বন্ধন
বিচূর্ণ করিয়া তুমি মুক্ত বিহঙ্গম
পক্ষ মেলি অনন্ত আকাশে
হেরিলে নূতন আলো ;
দিগন্তের সীমানা ছাড়ায়ে
অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকে সন্ধান তোমার
শেষ হল পরমাগতিতে।

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সাথে
চলে তব তীর্থ পরিক্রমা ;
অনন্ত কালের পথে
'আকাশের ছায়াপথ' হ'তে
'ধরণীর শ্যামল ললাটে'
অনুক্ষণ দীপ্যমান তোমার আলোর আশীর্বাদ,
তাই ত বিশ্বাস জাগে হৃদয়ের অতন্দ্র প্রহরী।
অন্তরের যত ব্যথা, যত তার গভীর যন্ত্রণা
ক্ষয় ক্ষতি উদ্বেগ আবেগ

যতই দুঃসহ হোক তুমি-হারা পঁচিশে বৈশাখে,
আ দিগন্ত মেঘে মেঘে
যত থাক বিদ্যুতের রোষ-আস্ফালন,
শেষ শ্রাবণের রাত্রে অবিরাম প্রবল বর্ষণে
যতই দুর্গম হোক দূর-দুরান্তের যাত্রাপথ—
তবু জানি, তোমার করুণ আঁখিপাতে
দেখা দিবে প্রসন্ন প্রভাত,
আসিবে নির্মলতম প্রশান্তির পরম প্রসাদ।

বনস্পতির মৃত্যু

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ঠক্-ঠকাঠক্ কাঠুরিয়া কাটে গাছটাকে,
তীক্ষ্ণ কুঠার ওঠে আর পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
শুষ্ক কঠিন পাতাহারা শাখা পড়ে ভেঙ্গে,
একদিন তা'রো মহীরুহ-রূপ ছিল বনে!

কত নিদাঘের কালবৈশাখী এল তেড়ে,
ধুলায় ধুলায় পথঘাট সব হ'ল কালো,
খসে পড়ে পাতা ভেঙ্গে যায় ডাল তবু তরু
সে-ঝড়ের সাথে করি প্রাণপণ যোঝে ভালো!

বরষা যখন ভরে নীলাকাশ কালো মেঘে
বজ্র গরজে বিদ্যুৎ কাঁপে দিকে দিকে
আকাশের কাছে ধরার বিরহ- লিপিখানি
পাতা নেড়ে তরু বাতাসের বুকে যায় লিখে!

লঘু মেঘ যবে সাদা পাল তুলে যায় উড়ে,
শান্ত তটিনী মৃদু তরঙ্গে চলে ছুটে,
শরৎ-বাতাসে দোলে কাশফুল পথ-পাশে
আলো-ঝল্‌মল্ রূপটি তরুর ওঠে ফুটে!

যবে হেমন্তে পাকাধানে যায় মাঠ ছেয়ে,
ভোরের কুহেলি খেজুর রসের বাসে ভরে,
সারি সারি বক ডানা মেলে কোথা যায় উড়ে,
তরুর বক্ষে তা'রি চলন্ত ছায়া পড়ে!

উত্তুরে হাওয়া শির্ শির্ ক'রে আসে ছুটে,
তরু-শাখা হতে পাকা পাতাগুলো যায় খ'সে,
ঘন কুয়াসায় ঘাসের গন্ধে পথ ভরে,
নীড়ে পাখীগুলো ঘেঁসাঘেঁসি করে রয় বসে!

বাতাবি ফুলের গন্ধে বাতাস দিশাহারা
ভীরু পায়ে এসে আমের মুকুলে নিশা যাপে,
কামনা-জড়ানো তৃষা-যে ছড়ানো সারাবনে,
বন-লতাটির বাহু-বন্ধনে তরু কাঁপে।

সেই স্মৃতিগুলি	রুক্ষ পাঁজরে	ওঠে কেঁদে,
শুষ্ক নীরস	জীর্ণ শরীর	যায় টুটে !
হায়, মহীরুহ	তোমারে ধরণী	চায় ফিরে,
তোমারি বিরহ	বনমর্ম্মরে	ওঠে ফুটে !
মনে হয় তরু,	তোমার আমার	ভাগ্য এক,
কবিতা আমার	হারায়ে গিয়াছে	আঁখি-জলে,
সারা জীবনের	সঞ্চয় আজি	বিফলে যায়,
অনাদৃতের	বেদনার শিখা	বুকে জ্বলে !

—0—

অবশেষে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আর নহো তুমি 'জুলিয়েট' মোর,—
নহি আর আমি 'রোমিয়ো' ;—
রয়েছি পড়িয়া পশারবিহীন
ডাক্তার যেন 'হোমিয়ো' !
নন্দন নহে—রন্ধনশালে
রেঁধে ব্যঞ্জন ঢালো আজ থালে !—
প্রেম নহে,—খুঁজি ক্ষুধার অন্ন
তাহার জন্য ক্ষমিয়ো !
অথচ একদা তোমাকেই প্রাণ
সঁপেছিনু,—সেটা জানো কি ?
মানবীকে দিনু দেবীর আসন
ভুল ক'রে,—সেটা মানো কি ?
সাপের বিবরে, বাঘের বাসায়
গেছি একদিন তোমারি আশায় ;—
তবু মোর দোষ ?—তুমিও তেমনি
কাছে আর মোরে টানো কি ?

তোমার বিরহ নহে দুঃসহ,—
সে কথা ছিলাম ভুলে গো—
জীবন-তরণী ছুটেছিল যবে
কল্পনা-পাল তুলে গো।
আজ তুমি নাই আমার ভুবনে,
তবু আছি খাসা আপনার মনে ;
বৃথা অভিমানে ভাঙা এ পাঁজর
উঠে নাকো আর দুলে গো !
রাবিশের স্তূপে ঢেকে দাও তবে
ক্ষণিক মোহের কাহিনী ;—
মিছে কেন ক্ষোভ করি তার তরে—
মনে প্রাণে যাহা চাহিনি ?
চোখের এ নেশা, এই মেকি প্রেম,—
কে বলিবে বলো "নিকষিত হেম" !
ভাঁটা পড়িয়াছে নদীটির বুকে,—
নহে সে উজানবাহিনী !

॥ উপন্যাস ॥

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

ষোল

দপ্তর-বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সোজা নিজের খাস কামরায় গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। পদ্মাদেবীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর মনে উষ্মা ও বেদনা একসঙ্গে ঘনিয়ে উঠেছিল। রেগেছিলেন এজন্যে যে আজ এই গুরুতর সঙ্কটকালে, মুহূর্তের বিরাম-বিহীন সংগ্রামের মধ্যে পদ্মাদেবী তাঁকে সবকিছু ছেড়ে বনবাসী হ'তে উপদেশ দিলেন। আরও এজন্যে যে, যে-তামস শক্তি তাঁর মধ্যে আজ প্রচণ্ড বেগে ধাবমান, যা তাঁর বিজয়-পণ সংগ্রামের প্রধান উৎস, যে ভয়ঙ্কর বিষ তিনি সঙ্গোপনে বহন করছিলেন, পদ্মাদেবী শুধু তার খবরই রাখেন নি, তাকে চোখের সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল। পদ্মাদেবীকে কোনও দিন তিনি জীবনে বড় একটা স্থান দেন নি; কিন্তু আজ এই সঙ্কটের দিনে, তাঁর বিজয় অনিবার্য দেখে, তিনি যে প্রতিবাদ জানাতে কাশীবাসিনী হবেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। পদ্মাদেবীকে ধ'রে রাখতে হ'লে যে মূল্য দিতে হয় তার জন্যে তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। কিন্তু এ সময়ে পদ্মাদেবী যে সবকিছু ছেড়ে কাশী চলে যাবেন, এর জন্যও তিনি নিজেকে তৈরি করতে পারছিলেন না। তখন, খেতে বসে, উত্তেজিত মনে পত্নীর কাশী-গমন ইচ্ছায় তিনি অনুমতি দিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু দেবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের কোন্ অজ্ঞাত কোণে ব্যথা লেগেছিল। তাই পদ্মাদেবী যখন দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী কমলাকে গহনা ও টাকা দেবার জন্য অনুমতি চাইলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হ'ল। এ দুর্বলতার জন্যেই পত্নীর দানের সঙ্গে নিজেও কিছু যোগ ক'রে দিলেন: নাতনির জন্যে একছড়া হার।

মনের মধ্যে ব্যথাটা কিন্তু জমে বসল। রাগের সঙ্গে মিলে-মিশে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে পদ্মাদেবীর অভিযোগ স্বীকার করলেন। মানলেন, পদ্মাদেবীর ভয় অমূলক নয়। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ধ'রে রাখবার দুর্দম্য জিদ তাঁকে চেপে ধরেছে; সত্যিই এ জন্যে যে-দাম তাঁকে দিতে হচ্ছে ছ' বছর আগে তিনি তা ভাবতেও পারতেন না। আজ যাদের সাহায্যে তিনি জয়ের রাস্তা তৈরি করছেন, সত্যিই, তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে কাল তিনি প্রায় নিঃস্ব হবেন। আজ এখন, পার্টি-সভার চব্বিশ ঘণ্টা আগে, তিনি জানেন জয় তাঁর একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এও জানেন যে, নতুন মন্ত্রীত্ব গঠনে তাঁর স্বাধীনতা খুব একটা থাকবে না; এমন কি, দুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাইর কাছেও তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

টেলিফোন বাজল। অপর প্রান্তে দুর্গাভাই।

"নমস্তে, দুর্গাভাইজি। আপনার দেহ সুস্থ আছে ত? অনেক কাজ আপনার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। মনে মনে বড় অস্বস্তি লাগছে।"

"দেহ, কোশলজি, তার কাজ যতখানি পারে তার চেয়ে বেশি ক'রে যাচ্ছে। তার কোনও কসুর নেই। কসুর আমাদের।"

"অর্থাৎ, এ বয়সে দেহের পক্ষে যা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝা আমরা তাকে দিয়ে বহাচ্ছি।"

"দেখুন, কোশলজি, প্রাচীনেরা যখন চার ধর্মে জীবনটাকে ভাগ করেছিলেন তখন তাঁরা কদাচ ভাবেন নি যে, মানুষকে একদিন মন্ত্রী হতে হবে। রাজাদের সচিব ছিল—কিন্তু সে অন্য জিনিষ। যে-বয়সে আমাদের বানপ্রস্থ গ্রহণ ক'রে সব গোলমাল থেকে দূরে স'রে যাওয়া উচিত, সে বয়সে আমরা পুরোপুরি ভোগী হয়ে সব গোলমালের কেন্দ্রস্থল হয়ে বসেছি।"

"ঠিক বলেছেন, দুর্গাভাইজি।"

"আশ্চর্য, কোশলজি, আমরা বলি অনেক সময়ই ঠিক। করি অনেক সময়ই বেঠিক।"

"মানলাম, দুর্গাভাইজি। আজ আপনার মনটা ভালো নেই বুঝতে পারছি।"

"একটা কথা বলি, কোশলজি। কিছু মনে করবেন না।"

"বলুন।"

"আমার ও আপনার, দু'জনের গৃহেই অশান্তি। আমার গৃহে উচ্চাশার আগুন, আপনার গৃহে বৈরাগ্যের ভস্ম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ নীরব হ'লেন। একটু পরে বললেন, "জীবনে সবার সবকিছু হয় না, দুর্গাভাইজি। জীবন-নদী বইতে বইতে এক ঘাটে পূর্ণ হয়, অন্য ঘাটে একেবারে শূন্য। বিধাতা বড় রসিক। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন; শেষ পর্যন্ত জমা-খরচের হিসেব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনি চাবি, জীবনের সবকিছুকে রসরহস্য ক'রে নেবার ক্ষমতা আছে আপনার। এবার কাজের কথা বলি। হরিশঙ্করজি আমায় টেলিফোন করেছিলেন।"

"বহাল তবিয়তে আছেন তিনি আশা করি।"

"হিন্দুস্থান অটমোবাইলের নতুন কারখানা তৈরির জন্যে ঋণটা আমি আপাতত স্থগিত রাখছি। নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লে টাকা দেওয়া বেশি সমীচীন হবে মনে করি।"

"বেশ ত।"

"ত্রিপাঠিজির ইচ্ছে ছিল টাকাটা এখনি দিয়ে দেওয়া হোক।"

"খুব স্বাভাবিক ইচ্ছে। কিন্তু আপনি উচিত কাজ করেছেন।"

"আচ্ছা, কোশলজি, সরোজিনী সহায়কে আপনি চেনেন?"

"নামে চিনি, কাজের দ্বারাও চিনি। চোখে দেখি নি।

"উদয়াচলের রাজনীতিতে তিনি ক'দিন আছেন?"

"কয়েক বছর। ন্যাশনাল ট্রেড য়ুনিয়নের কর্মী। বর্তমানে নেতাদের একজন। কিছুদিন ত উত্তর প্রদেশে কাজকর্ম করেছেন। বর্তমানে আবার বিলাসপুরে উদিত হয়েছেন। কিন্তু আমাকে কেন প্রশ্ন করছেন? আপনি ত ওঁকে চেনেন।"

"আমি চোখে একবার দেখেছি মাত্র। বাক্যালাপ হয় নি।"

আপনি যে সরোজিনী সহায়কে চেনেন বা চোখে দেখেছেন তা আমি কি ক'রে জানলাম জিজ্ঞেস করলেন না ত!"

"কোশলজি, আমাকে যতটা বোকা আপনি ভাবেন ততটা আমি নই। বর্তমান অবস্থায় কোনও রাজনৈতিক ঘটনাই যে আপনার দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচর নয় তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, পরশু রাত্রির সভায় আপনার উপস্থিতির খবর আমি অনেক দেরিতে পাই। আমি ভাবতে পারি নি যে, আপনি ঐ আলোচনায় যোগ দেবেন।'

"যোগ দি নি, কোশলজি। কেবল শুনেছি।"

"আপনার ওপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস। আজও আবার বলছি, আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হ'তে রাজী হন তা হ'লে আমি আপনার অধীনে কাজ করতে তৈরি। অন্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে সরাবার প্রয়োজন আপনার নেই। আপনি খোলাখুলি একবার বললেই পথ তৈরি।"

"আমার মনোভাবও আপনি পরিষ্কার জানেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার লোভ আমার নেই। যোগ্যতাও নেই। আমার উচিত মন্ত্রীত্ব ত্যাগ ক'রে জনসেবায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে সৎসাহসও আমার নেই। কিন্তু আগামী কালের নির্বাচনে আপনাকে সরাসরি সমর্থন করাও আমার সাধ্যের বাইরে। সুতরাং নির্বাচনে আমাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। অবশ্য সবাই জানে যে, হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীর সঙ্গে আপনার তুলনা আমি কদাচ করি নে। যারা আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ভোট দিতে ইচ্ছুক, তাদের আমি একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছি। আরও বলেছি যে, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হ'লে আমার পক্ষে মন্ত্রীত্ব করা সম্ভব হবে। আমার অবস্থা বুঝে আশা করি আপনি মানবেন, কোশলজি, যে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, দুর্গাভাইজি। আপনি যা করেছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত।"

"অবস্থা কেমন বুঝছেন?"

"খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না, দুর্গাভাইজি।"

"আমার ধারণা, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে—"

"তবে কি—"

"তবে, আসল কথা হ'ল, এবার মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে কতটুকু রাজনৈতিক মূল্য আপনাকে দিতে হয়েছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না।

দুর্গাভাই বললেন, "কিছু আপনাকে দিতে হবে জানি। বুঝতেও পারি। দলগত রাজনীতির নোংরা আমি ঘাঁটি নে, কিন্তু এ নোংরা যে কি ভীষণ তা আন্দাজ করতে পারি।

তবে আশা করি খুব বড় কোনও রাজনৈতিক মূল্য আপনি দিতে রাজী হন নি, বা হবেন না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কিছু দাম দিতেই হবে—আমি তা মানছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে থাকতেন, কোনও দামই দিতাম না। তবে, আমিও আপনার মত আশা করছি, চেষ্টা করছি যাতে বেশি কিছু না ছাড়তে হয়।"

"ভগবান আপনার সহায় হোন, কোশলজি। এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেখতে পেলেন তিওয়ারী এসে এক কোণে বসেছে। তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার ?"

তিওয়ারী একখানা সীল-করা লেফাফা তাঁর হাতে দিল।

লেফাফা খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একটা রিপোর্ট পেলেন। পড়তে পড়তে তাঁর ললাট কুঞ্চিত হ'ল, নাসিকা উগ্র হয়ে উঠল, ক্রূর হাসিতে গালে ভাঁজ পড়ল।

দু'বার তিনি রিপোর্ট পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর টেলিফোনে ডায়াল করলেন।

ওপার হ'তে আওয়াজ এলে, বললেন, "রাত্রি ন'টায় আসুন। তার আগে এক মুহূর্তের সময় নেই।"

টেলিফোন নামিয়ে বললেন, "গুড ওয়ার্ক।"

তিওয়ারী নতমস্তকে বলল, "আমার কিছু কথা ছিল।"

"জানি। তোমার অনেক কথা আছে। তুমি না বললেও জানি।"

"আজ রাত্রে বলব ?"

"বলার দরকার নেই। পাবে, যা চাইছ, তার অনেক কিছু পাবে। আজ আমার সময় নেই।"

"এখানেই শোবেন ত ?"

"হুঁ।"

"আজ একটু আরাম চাই আপনার। বড় ধকল যাচ্ছে ক'দিন থেকে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার তিওয়ারীর চোখে তাকালেন। বললেন, "দুর্গাপ্রসাদ এসেছে ?"

"নীচে বসে আছে।"

"তাকে নিয়ে এস।"

তিন বছর পর প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতকারের জন্য তৈরী হ'লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিওয়ারী গাত্রোত্থান করবার সঙ্গে সঙ্গে এক অত্যন্ত জরুরী ফাইল খুলে বসলেন। প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে দুর্গাভাইকে ফোন করলেন।

"আপনাকে তকলিফ দিচ্ছি, দুর্গাভাইজি। সময় একেবারে নেই, নইলে আপনার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।"

"এমন কি জরুরী ব্যাপার, বলুন ত ?"

"আমার ছেলে দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুটো কেস আছে, না ?"

"আছে।"

"বিলাসপুরের কেসটা বোধকরি কাল সুরু।"

"তা হবে।"

"হঠাৎ জানতে পারলাম, পুলিশ এ কেসটায় বেশ ঢিলে দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশন খুব ভাল হয় নি, এবং পাবলিক প্রসিকিউটর নিজে কেস না নিয়ে এমন একজন সহকারীকে দিচ্ছেন যাঁর জেতবার ক্ষমতা খুব কম।"

"আমি এসব কিছু জানি না ত।"

"না জানাই সম্ভব। যা হোক, আপনি যদি এ বিষয়ে একটু নজর দেন ত বাধিত হই। দুর্গাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাজনৈতিক অপরাধে। বর্তমানে সে জামিনে মুক্ত। তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ আমিই দিয়েছিলাম। প্রসিকিউশন যথাসম্ভব জবরদস্ত হওয়া চাই। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বলে তাকে রেহাই দিলে চলবে না।"

"বেশ ত। আমি হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এ ব্যাপারে ত আপনার আমার কাছে চলে আসবার কারণ দেখছি না, কোশলজি।"

"ঠিক ধরেছেন", মৃদু-উচ্চারিত হাস্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "অন্য কারণ আছে। বলছি। হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলে দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আর একটা খবর পাবেন। ওটা আমার আদেশ। না দিয়ে উপায় ছিল না, দুর্গাভাইজি। এবার অন্য কথাটা বলি। এক্ষুণি একটা চমকপ্রদ রিপোর্ট পেলাম।"

"রিপোর্ট ?"

"খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে।"

"হুঁ হুঁ।"

"সুদর্শন দুবে আমার সঙ্গে মিটমাট করতে প্রস্তুত।"

"তাই নাকি ?"

"একটিমাত্র সর্ত।"

"যথা ?"

"সে, আপনি এবং আমি একমত হয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করব।"

"জোরটা নিশ্চয় একমতের ওপর !"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"আপনি রাজী হ'লে ?"

"কালকার সভায় সুদর্শন দুবে নিজেই দলপতির জন্য

আমার নাম প্রস্তাব করবেন। তাঁর ইচ্ছে, সমর্থন করেন আপনি।"

"রাজী না হ'লে?"

"কনটেষ্ট হবে। সুদর্শন দুবে প্রস্তাব করবেন হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির নাম। মহেন্দ্র বাজপাঈ সম্ভবত সমর্থন করবেন।"

"এখন আপনার কি অভিপ্রায়?"

"এই ত রিপোর্টটা পেলাম। এখনও ভেবে দেখি নি। আপনাকে জানালাম। পরামর্শ দিন।"

"মিলে-মিশে কাজ করতে পারা ত সবচেয়ে ভাল, কোশলজি।"

"নিশ্চয়। তবে রাজনীতিতে অনেক কিছু আছে যা মিশতে যদি-বা পারে, মেলে না কখনও।"

"তা ছাড়া, সুদর্শন দুবের আসল অভিসন্ধিটাও ভেবে দেখা দরকার।"

"এর পেছনে একটা চাল আছে, দুর্গাভাইজি। সুদর্শন দুবের চাল শুধু নয়, হরিশঙ্কর ত্রিপাঠিরও।"

"কি চাল?"

"সেটা ভাল করে জানতে হবে। আপনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন। যদি কিছু পরামর্শ দেবার থাকে, কৃপয়া টেলিফোন করবেন।"

"নিশ্চয়।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন দুর্গাপ্রসাদ ঘরে ঢুকেছে। তিওয়ারী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকে দুর্গাপ্রসাদ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে দেখল পিতৃদেবকে। চেহারায় খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। মুখের হাড়গুলি প্রকটতর হয়েছে, চোখের নীচে ক্লান্তি। লক্ষ্য ক'রে দেখল, পিতাজির গায়ের রং একটু ময়লা হয়েছে। চামড়া কিছুটা শিথিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নও ছেলেকে দেখলেন। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন দুর্গাপ্রসাদ। আধময়লা পায়জামা ও আজানুলম্বিত খদ্দরের কুর্তা পরেছে গেরুয়া রংএর। বুকে বোতাম নেই। কাঁচাপাকা চুল দেখা যাচ্ছে কয়েকটি। দুর্গাপ্রসাদের গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে; কানের দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল পেকে সাদা। এক সময় সূক্ষ্ম সৌখিন গোঁফ রাখত। এখন পরিষ্কার কামান।

দুর্গাপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলতে গেলেন, "প্রণামে প্রয়োজন নেই।" বললেন, "বস। ভাল আছ ত?"

"আপনার কৃপায় কেটে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে বললেন, "তুমি এবার যাও। গোপালকৃষ্ণণ ত চারটেয় আসবে। একটু বসিও। সীতাচরণকেও খবর দিও।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে, পুত্রকে, "তোমার স্ত্রীকন্যা সব ভাল?"

"জি হাঁ। আপনার শরীর একটু কাহিল মনে হচ্ছে।"

"তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ", হেসে বললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "চুলে পাক ধরেছে। আমি তোমার বাপ —কত বুড়ো হয়েছি জান?"

"বুড়ো আপনি হন নি।"

"হয় নি? এখনও বেঁচে আছি তা হ'লে? কি বল?"

দুর্গাপ্রসাদ হেসে ফেলল।

"খুবই বেচে আছেন, পিতাজি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "শুধু বেঁচে থাকা নয়। এখনও আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। কি বল, দুর্গাপ্রসাদ?"

"একশ' বার, পিতাজি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবৃত্তি করলেন, "দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ। যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥"

পিতার কণ্ঠে বহুবার দুর্গাপ্রসাদ মহাভারতের এই শ্লোক শুনেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হ'তে দৈববাণী শুনছেন: পুণ্যকর্মের প্রশংসা স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে। যতকাল এই প্রশংসা থাকে, ততকালই মানুষ পুরুষরূপে গণ্য হয়।

মনটা ব্যথা করে উঠল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। না ডাকলে তুমি ত আসবে না।"

"মাঝে-মধ্যে আমি আসি, পিতাজি। মা'র কাছে আসি।"

"তা জানি। আমার সামনে এসে দাড়াবার সাহস হয় না।"

"সাহসের অভাব নেই, পিতাজি।"

"তবে আসো নি কেন?"

"মৌকা হয় নি। আপনি আপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমি আমার কাজে লেগে আছি। আমাদের পথ আলাদা হ'য়ে গেছে, পিতাজি। লক্ষ্যও আলাদা। তা ছাড়া, আপনি আপনার মুখদর্শন করতে বারণ করেছিলেন।"

"তা করেছিলাম।"

"কিছু প্রয়োজন আছে আমাকে, পিতাজি?"

"আছে। একটু স্থির হয়ে বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। কাজ আছে।"

"দুর্গাপ্রসাদ তাকিয়া নিয়ে বসল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রইলেন।

পরে বললেন, "উদয়াচলের রাজনৈতিক খবর নিশ্চয় রাখ।"

"মোটা মোটা খবরগুলি রাখি বৈ কি।"

"কাল আমাদের পার্টির নতুন দলপতি নির্বাচন, জান নিশ্চয়।"

"জানি।"

"তোমার কি মনে হয়? আমি জিতব?"

"আমি ত এ নিয়ে ভাবি নি, পিতাজি! আপনি জিতবেন, ধরে নিয়েছি।"

"কারণ?"

"আপনি সাধারণত হারেন না।"

"এটা সাধারণ ব্যাপার নয়।"

"সুদর্শন দুবে আর হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি আপনার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নয়।"

"ঠিক বলছ?"

"আমার তাই ধারণা। কংগ্রেস রাজনীতি এমন নীচে নেমে গেছে, পিতাজি, যে আজ বোধ করি সবকিছু সম্ভব। কিন্তু আপনি দুবেজি ও ত্রিপাঠিজির কাছে হেরে গেলে অবাক হব।"

"তোমাকেই প্রথম বলছি, শোন। আমি হারব না। জিতব।"

দুর্গাপ্রসাদ চুপ করে রইল।

"শুনে খুশি হ'লে না?"

"অলবৎ, পিতাজি।"

"আমি জিতব। আর, তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

"আপনার এ জয়ের সঙ্গে ত আমার কোনও সম্পর্ক নেই, পিতাজি।"

এত একরোখা কথা বোলো না। এ-সব আলোচনার আগে তোমাকে দুটো অন্য কথা বলতে চাই।"

"বলুন।"

"আমি উইল করেছি।"

"শুনেছি।"

"তোমার গর্ভধারিণীর কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমার সম্পত্তির অংশ থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ।".

"সম্পত্তিতে আমার লোভ নেই, পিতাজি।"

"অবশ্য একটা সর্ত আছে। তুমি তোমার অংশ পাবে যদি কোনও দিন কংগ্রেসে ফিরে আস।"

"তখন নিশ্চয় সম্পত্তির প্রয়োজন হবে।"

"দ্বিতীয় কথা হ'ল, চন্দ্রপ্রসাদকে নিয়ে।"

"বলুন।"

"তার কিছু খবর রাখ?"

"সে ত প্রায়ই আসে আমাদের বাসায়। কমলা— মানে, আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে তার খুব ভাব।"

"তাই বুঝি! চন্দ্রপ্রসাদ এয়ারফোর্সে কমিশন পেয়েছে।"

"জানি।"

"শুনে সুখী হয়েছি। নিজের যোগ্যতায়, আমার সাহায্য ছাড়াই, সে কিছু করতে পেরেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব সুখের বিষয়।"

"এবার তার বিবাহ দিতে হবে।'

"সে ত বসন্তকে বিবাহ করবে ভাবছে।"

"ও, তুমি তাও জান।"

"বসন্তকে নিয়ে সে দিনচারেক আগে আমাদের বাসায় এসেছিল।"

"তাই বুঝি? তা হ'লে তুমি ত সবই জান।"

"অন্তত এ ব্যাপারটা এক-আধটু জানি।"

"বিয়ে হ'লে ভালই হয়, কি বল? বসন্ত মেয়েটি ভাল।"

"জি হ্যাঁ।"

"কিন্তু দুর্গাভাই আমার কাছে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না। তিনি অত্যন্ত অহংকারী। প্রস্তাব নিয়ে আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে।"

"তার বোধ হয় প্রয়োজন হবে না।"

"কেন? দুর্গাভাই রাজী হবেন না?"

"মাতাজি সব ব্যবস্থা করেছেন, মনে হচ্ছে। দুর্গাভাইজিকে পত্র লিখে অনুরোধ করেছেন, চন্দ্রপ্রসাদ যদি কিছু প্রার্থনা করে তিনি যেন মঞ্জুর করেন। চন্দ্রপ্রসাদকে মাতাজি বলেছেন সে নিজেই যেন দুর্গাভাইজির সম্মতি চায়, আপনাকে পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কন্যার পিতার কাছে যেন যেতে না হয়। চন্দ্রপ্রসাদ বোধ করি কালকের পার্টি মিটিংএর অপেক্ষায় আছে। আপনার জয়লাভের পর নিজেই সে বসন্তকে নিয়ে দুর্গাভাই-এর অনুমতি চাইবে।"

"হুঁম্। প্ল্যানটা মন্দ নয়। যদি আমার জয় না হয়?"

"তা হ'লে সপ্তাহ খানেক পরে সম্মতি চাইবে।"

"শুনছি মনোরমা দেবী এ বিবাহে সম্মতি দেবেন না।"

"না দেওয়াই সম্ভব।"

"তাতে আটকে যাবে না ত?"

"চন্দ্রপ্রসাদ বলে, আটকাবে না।"

"তুমি জান নিশ্চয়, মনোরমা দেবী চান দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হোন।"

"যেমন আমাদের মা চান, আপনি রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বানপ্রস্থ নিন।"

"তোমার জননী অবশ্য মনোরমা দেবীর চেয়ে অনেক রগচটা। দুর্গাভাই অর্থমন্ত্রী থাকলেও মনোরমা দেবী দিব্যি তাঁর গৃহ অলঙ্কৃত করবেন। আর, আমি বনবাস না নেবার অপরাধে তোমার মা কাশীবাসী হচ্ছেন।"

"হ্যাঁ। মা কাল ভোরে কাশী যাচ্ছেন।"

"কাল ভোরেই?"

"জি হ্যাঁ।"

"কে নিয়ে যাচ্ছে?"

"চন্দ্রপ্রসাদ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরব হ'লেন।

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "আপনাকে দেখে অবাক্ লাগছে, পিতাজি। কাল আপনার এত বড় একটা কন্টেষ্ট, আর আজ আমার সঙ্গে বসে পারিবারিক ব্যাপার আলোচনা করছেন!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হেসে বললেন, "রিল্যাক্স করছি। তোমাকে বহুদিন পরে দেখে বেশ ভাল লাগছে। সাংসারিক কথা বলবার মত একটা লোকও আর বাড়ীতে নেই। তোমার মা ত আমাকে দেখলেই নীতিকথা শোনান—তাঁর মতে আবার মত গর্হিত মানুষ দ্বিতীয় নেই। তোমার ভাইগুলো সব মূর্খ, দাম্ভিক, পিতৃ-নির্ভর। এক চন্দ্রপ্রসাদ। মাঝে-মধ্যে তারই সঙ্গে দু'-একটা কথা বলি।"

দুর্গাপ্রসাদ কিছু ব লল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "বনবাসের কথা হচ্ছিল না একটু আগে? আমি যে কথাটা ভাবি নি তা নয়। কেন এদেশে আমরা বৃদ্ধেরা ক্ষমতা আঁকড়ে আছি, কেন নতুনদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি না? তার অনেক কারণ আছে। ঐতিহাসিক কারণটাই ধর। গান্ধীজির আন্দোলন সুরু হ'ল উনিশ একুশে, ভারত স্বাধীনতা পেল সাতচল্লিশে। এই ছাব্বিশ বছরে আমরা সবাই বুড়ো হয়ে গেলাম। তরুণ নেহেরুও পঞ্চাশোর্ধ! আমাদের বৃদ্ধদের ডাক পড়ল কেন্দ্রে ও প্রদেশে রাজত্বভার গ্রহণ করতে। উনিশ ত্রিশ থেকে নতুন যুবকেরা কংগ্রেসে আসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, তারা গঠন করেছিল যত সব সন্ত্রাসবাদী দল। এমনকি বিয়াল্লিশে যে শেষ আন্দোলন হ'ল তার আগুনে যারা পুড়ল তারা বেশির ভাগই সমাজতন্ত্রী দলের লোক। আমরা ত সব জেলে। অতএব, দেখতে পাচ্ছ, আজ ছেড়ে দেব এমন উপযুক্ত লোকও আশেপাশে দেখতে পাই নে।"

"তা ঠিক, পিতাজি।"

"তা ছাড়া, ছেড়ে দিয়ে কি করব, কোথা যাব? ভারতবর্ষে রাজনীতি নতুন পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একান্ত মধ্যবিত্ত ও ধনীর রাজনীতি। আমরা যারা এর মধ্যে এসে গেছি, আমাদের আর কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভিত্তি নেই। আরও বহুবছর দেখবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা অবসর নেবেন না। প্রত্যেকে চাইবেন রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে। অবসর নিয়ে যাবেন কোথায়? ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় অন্য অবস্থা। আজ যিনি সেক্রেটারী অব ষ্টেট কাল তিনি ফোর্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর। আজ যিনি মন্ত্রী, কাল তিনি ফিরে যেতে পারেন তাঁর ট্রেড-য়ুনিয়নে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানায় বা কোম্পানীতে। আমরা সে সব খুইয়ে রাজনীতিতে এসেছি। আমাদের অন্য কোনও 'বেস' নেই।"

"তা ছাড়া, ক্ষমতার মাদকতাও আছে, পিতাজি।"

"নিশ্চয় আছে। পাওয়ার কেউ ত্যাগ করতে চায় না। যে চায় বা পারে সে ত ঋষি। আরও অনেক কারণ রয়েছে। এ সামান্য ক' বছরেই আমাদের মূল্যবোধ একেবারে বদলে গেছে। দুর্গাভাই দেশাই-র মত অমন নীতিবাগীশ লোকও মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেন না। তার কারণ, যে ধরনের দেশসেবা সারাজীবন তিনি করে এসেছেন, আজ আর তাতে সম্মান নেই, আকর্ষণ নেই। আজ গ্রামে সংগঠন করে, চরকা কেটে, গান্ধীবাদ ছড়িয়ে, গ্রামবাসীকে আত্মনির্ভর করার চেষ্টায় কোনও তৃপ্তি বা সার্থকতা নেই।"

"শুনেছি, দুর্গাভাইছি নিজেও তাই বলেন।"

"আমার কথা আলাদা। এ বয়সে আমি নিশ্চয় কুষাণপুর গিয়ে ওকালতি করব না। আমার কাব্যচর্চা আছে। মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নিলে আমার নিশ্চয় একটি রাজ্যপালত্ব মিলবে। শুনেছি মস্কোয় আমাদের এক রাষ্ট্রদূত দু' বছর ধরে কেবল ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। আমিও কোনও প্রাদেশিক রাজধানীর রাজভবনে কয়েকবছর—হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত—বিরাট্ আরামে কাব্যচর্চা করে যেতে পারি। কিন্তু আমার রক্তে এখনও সংগ্রামের নেশা। উদয়াচলের নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে এখনও রক্ত আমার যৌবনের উদ্দামতায় নেচে ওঠে। একটা নতুন কারখানা দেখলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই; নতুন কোনও কৃষি-উন্নয়ন দেখলে চোখে জল আসে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে এখনও

আমার উৎসাহের শেষ নেই। এই যে সুদর্শন দুবের সঙ্গে কিছুদিন পাঞ্জা লড়তে হ'ল, আমাকে যেন কিসের নেশায় পেয়ে বসল; সুদর্শনকে পরাস্ত করা যে কত সহজ তা সে জানে না। আমার একমাত্র আফশোস লড়াইটা বড় সহজে শেষ হয়ে এল।"

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "যা বলছেন, জিতবার জন্যে আপনি এবার অনেক মূল্য দিয়েছেন।"

"দিয়েছি হয়ত", কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "দিয়েছি কিনা পরিণামে বোঝা যাবে। রাজনীতির খেলায় রমণীর ন্যায়-বুদ্ধি দিয়ে জয়লাভ অসম্ভব। সুদর্শন দুবেকে তারই অস্ত্রে পরাজিত করতে হয়েছে; তাতে কোনও অন্যায় নেই। শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাজিত করা প্রাচীন নীতি। চেয়েছিলাম বর্তমান মন্ত্রীসভার কয়েকজনকে বাদ দেব নতুন মন্ত্রীত্ব গঠনের সময়। হয়ত তা সম্ভব হবে না। হয়ত এমন দু'-একজনকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হবে যা, অন্য অবস্থায়, আমি করতাম না। কিন্তু রাজনীতির খেলাই এই। এ খেলা খেলতে যার অরুচি, এ পথে তার পা দিতে নেই।

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "আপনি এসব কথা আমাকে কেন বলছেন বুঝতে পারছি না। আমি আপনাকে মা'র মত ন্যায়-নীতির মাপকাঠিতে বিচার করি না।"

"তুমি ত দিনরাত আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বেড়াও।"

"আপনার রাজনীতির বিরুদ্ধে, আপনার দল, গভর্ণ-মেণ্ট, মত, পথ ও পাথেয়ের বিরুদ্ধে।"

"এতে তোমার কি লাভ হচ্ছে, ভেবে দেখেছ? দু'বার জেল খেটেছ। আর একবার খাটবে শীগগিরই। চেহারা কি হয়েছে বোধ করি তাকিয়েও দেখ না।"

"পিতাজি, আমি আপনার পুত্র। সহজে ভাঙ্গি না। নরমও হই না।"

"তুমি এই ভুল পথে কেন চলছ?"

"ভুল পথ নয়, পিতাজি। আপনি ও আমি দুই বিপরীত প্রবাহ। আপনি রাজনীতিতে নেমেছিলেন ব্যক্তিগত সার্থকতার তাগিদে। আমি এসেছি আদর্শের তাড়নায়। আপনি চিরজীবন শুধু একটি মাত্র প্রেমে মজে রয়েছেন। তার নাম আত্মপ্রেম। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া আর কাউকে আপনি সত্যিকারের ভালবাসেন নি, শ্রদ্ধা করেন নি, স্বীকারও করেন নি। আমার মধ্যে আরও দু'-একটা প্রেম আছে, পিতাজি। আমি এ দেশটাকে সত্যিকার ভালবাসি। এ দেশের মজদুরদের—যাদের নিয়ে আমার কাজ—আমি ভালবাসি।"

"তোমরা সব ধার-করা বিদেশী বুলির উদ্গারে নিজেকে ও দশজনকে বিভ্রান্ত করছ। ভারতবর্ষকে তোমরা না জান, না চেন। এই প্রাগৈতিহাসিক মাটিতে আমদানী রাজনীতির বা সমাজনীতির বীজ কোনওদিন ভাল ফসল দেবে না।"

"আপনারাও ত বিদেশী রাজনীতির বীজ বপন করে তার অঙ্কুরকে নারায়ণের আসনে বসিয়ে দেশশাসনের পুজা চালিয়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণা যৎসামান্য হ'লেও, যা কিছু দেওয়া হচ্ছে তার প্রায় সবটাই 'ব্রাহ্মণায় অহং দদামি'।"

"কথাটা মন্দ বল নি", কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাঁকা হাসলেন। "সত্যি আমরাও বিদেশী বীজ বপন করেছি। এই গণতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী। টিঁকবে কি না একমাত্র ভগবান জানেন। আমার মনে গভীর সন্দেহ। যে শাসনপ্রণালীর শিকড় জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত নয়, তা সাধারণত টিঁকতে চায় না। আসল কথা কি জান? এ দেশে দীর্ঘকাল কোনও রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠিত হয় নি।" ১৮৮৫ সালে যাঁরা কংগ্রেস স্থাপন করেছিলেন তাঁদের কাম্য ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যে আর একটু সম্মানের সঙ্গে বাস করার সুযোগ। তারপর একদিকে জেগে উঠল আমাদের জাতীয়তাবোধ, অন্যদিকে আমরা ইংরাজের রাজত্ব-তন্ত্রের মোহে জড়িয়ে পড়লাম। ভারতীয় জাতীয়তা ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য ভারতের উপযোগী কোনও শাসন-প্রণালী সৃষ্টি করল না। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা যতই না স্বদেশী হন, আসলে শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে তাঁরা ইংরেজদের দোসর। এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। প্রথম ব্যতিক্রম ছিলেন তিলক; কিন্তু গান্ধীজির তাঁকে পছন্দ ছিল না; গান্ধীযুগেই তিলকের প্রভাব শেষ হয়ে এসেছিল। সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধীজি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ তার নিজের ঐতিহ্য থেকে স্বকীয় শাসনব্যবস্থা তৈরী করে নিক। কিন্তু গান্ধীজি ত রাজত্বের ভার নেন নি, তা ছাড়া তিনি বেঁচেও রইলেন না। সুতরাং আমরা বিপুল উৎসাহে এক বিদেশী ব্যবস্থাকে কার্যকরী করবার দুঃসাহসে লিপ্ত হ'লাম। এ ব্যবস্থা টিঁকবে কি না তা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহের শেষ নেই। কিন্তু প্রকাশ্যে আমরা তা স্বীকার করতেও অনিচ্ছুক।"

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "শাসন-প্রণালী টিকুক আর নাই টিকুক, আসল ব্যবস্থা আপনারা পাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন। সমাজতন্ত্রের নামে এক বলশালী ধনিক-জমিদার-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।"

"এটাও বিদেশী বুলি। আমরা পার্লামেণ্টারী

ডেমোক্রেসীর ডাক তুলে যেমন লোকেদের ধোকা দি, তোমরাও সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের পতাকা তুলে তাই কর। আমরা যদি শিব গড়তে বাঁদর গড়ে থাকি, তোমরা হয়ত গড়ে তুলবে এক ভয়ানক অজগর! ইতিহাস বিচিত্র পন্থায় মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেয়। এটা মনে রেখ।"

"তা নেয়। তবু সংগ্রাম চলে। মানুষ চিরদিন আদর্শের জন্য লড়ে এসেছে। চিরদিন লড়বে।"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি হ'ল, মিথ্যা আদর্শের জন্য লড়াইএ। আদর্শ ভুল হ'লে অত ক্ষতি নেই। ভুল করা মানুষের স্বাধিকার। ভুল শোধরাবার সুযোগ আসে। কিন্তু এমন আদর্শ আছে যা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা : মরীচিকার মত সে কেবল টানে, কখনও ধরা দেয় না।"

"মাপ করবেন, পিতাজি। অমন কোনও আদর্শের প্রতি আমার আনুগত্য নেই।"

"ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠিত হবার সুযোগ ছিল, কিন্তু তার ব্যবহার করা হয় নি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হ'ল একমাত্র রাজনৈতিক গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের শেষের দিকে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজকার্য পরিচালনায় যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, আমার মনে হয় তাই হ'ল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ঐতিহ্য। মহাভারতের সে অংশটা ইচ্ছে হ'লে একবার পড়ে দেখ।"

"সেই যেখানে ভীষ্ম বলছেন, রাজকার্যে কাউকে কদাচ পূর্ণ বিশ্বাস করবে না, এমনকি নিজের পুত্রকেও না?"

"খুব সত্যি কথা। খুব সত্যি কথা। আরও বলেছেন, 'সব কাজ সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্র-গোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না।"

"মেকিয়াভ্যালিও একই কথা বলেছেন।"

"তামাসা করো না। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন, কোথায় কোথায় দুর্গ স্থাপন করতে হবে। ভীষ্ম ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ ক'রে বললেন, সবচেয়ে দুর্জেয় হ'ল মনুষ্যদুর্গ। অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। এবং রাজাকে তাই করতে হবে। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন, রাজা কোন্ কোন্ প্রকারের লোককে বিশ্বাস করবেন। ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চার প্রকার। সমার্থ, যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান; ভজমান, যাঁরা তাঁর অনুগত; সহজ, অর্থাৎ আত্মীয়; এবং কৃত্রিম, যাঁরা অর্থদ্বারা বশীভূত। এ ছাড়া এক পঞ্চম মিত্র আছেন—তিনি ধর্মাত্মা। তিনি যে-পক্ষে ধর্ম দেখেন সে পক্ষের সহায় হন; সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে কৌতুক-হাসি দেখে দুর্গাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ভীষ্মের এই বিবৃতি কতখানি প্রয়োগ করা যায়, পিতাজি?"

"অনেকখানি। আমার 'সহজ' মিত্র ছাড়া আর তিন রকম মিত্রই আছে। 'কৃত্রিম'দের সংখ্যা বর্তমানে কিছু বেড়েছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এঁরা অনেকেই 'ভজমান' অথবা 'সমার্থ' হবেন।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমাকে ডেকে পাঠাবার জরুরী কোনও কারণ ছিল না। কিছুদিন হল তোমার কথা মনে হচ্ছিল। নতুন ক'রে আর একবার উদয়াচলের যাবতীয় কংগ্রেস নেতাদের ঘেঁটে দেখতে হ'ল। জিলা কংগ্রেস থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস পর্যন্ত যাদের কিছুটা নেতৃত্ব আছে বর্তমান সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে তারা সবাই তৎপর। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তোমার কথা মনে হ'ত। তুমি আমার পুত্র বলে নয়। উদয়াচলের কংগ্রেসে তুমি একদিন সবার ওপরে স্থান পেতে পারতে। তোমার যোগ্যতা ছিল। তোমার নেতৃত্বে এ প্রদেশের উন্নতি হ'ত, বহু মানুষের কল্যাণ হ'তে পারত। তাই ভেবেছিলাম তোমাকে ডেকে আর একবার বলব। পিতা হিসাবে নয়, উদয়াচলের নেতা হিসাবে।"

"পিতাজি, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।"

"তুমি আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে এবার কাঠিন্য।

"উদয়াচলের সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর বিরুদ্ধে।"

"এতে তোমার লাভ?"

"কিছু আছে, পিতাজি।"

"আমি খবর পেয়েছি, সুদর্শন দুবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল।"

"জি হাঁ।"

"আমার বিরুদ্ধে তোমার সাহায্য চেয়েছিল।"

"তাই ত স্বাভাবিক।"

"তোমার ভাইদের জন্য আমি কি কি করেছি জানতে চেয়েছিল?"

"জি। ক'খানা বাড়ী আপনি তৈরী করেছেন, কতখানি জমি কিনেছেন, এমনি আরও অনেক কিছু।"

"তুমি দিয়েছ?"

"এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না পিতাজি।"

"যদি না দিয়ে থাক, তা হ'লে জেনে রাখ, তুমি দিলেও আমার হার হবে না।"

"আপনার হার আমি চাই নে, পিতাজি।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"লোক বসে আছে আমার জন্য। তুমি আজ এস।

দুর্গাপ্রসাদ হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মুখের দিকে আর একবার তাকালেন।

"কাছে এস।"

মাথায় হাত রেখে বললেন, "নিজের পথে চলতে ভয় পেও না। আমার কোনও কাজের অর্থ যদি না বুঝতে পার, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা ক'রো।"

দুর্গাপ্রসাদ নীচে নেমে সোজা ফাটকের দিকে অগ্রসর হ'ল। ফাটকের সামনে একখানি পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

সে ফাটক অতিক্রম করতেই একজন পুলিশ অফিসর এগিয়ে এল।

বিস্মিত দুর্গাপ্রসাদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল, "আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"গ্রেপ্তার?"

"অপরাধ নেবেন না। আমি আদেশ মানছি মাত্র।"

"ওয়ারেণ্ট আছে?"

"তৈরি ক'রে দেব থানায়।"

"অপরাধ?"

"প্রিভেনটিভ্ ডিটেনশন।"

"বাড়ী যেতে দেবেন ত?"

"নিশ্চয়।"

"চলুন।"

ক্রমশঃ

—

॥ প্রবন্ধ ॥

কাংড়া—বৈজনাথ মন্দির

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ঠিক করেছিলাম কাংড়া মন্দির স্টেশনে এসে ট্রেণে উঠে বৈজনাথ যাব। আমাদের ধর্ম্মশালা থেকে স্টেশনের দূরত্ব দেড় মাইল। পদযান ছাড়া এই পথে অন্য যানের ভরসা নাই। মাল-পত্রাদি বইবার জন্য একজন মজুর পেয়ে গেলে এই পথটুকু অনায়াসে যাওয়া যাবে। পায়ে হেঁটে যাওয়ার আর একটি সুবিধা দেশটাকে ভাল করে চিনে নেওয়া চলে। সকাল সাতটায় ট্রেণ, অতএব সওয়া ঘণ্টা সময় হাতে রেখে ধর্ম্মশালা থেকে বার হয়ে পড়ব।

ধর্ম্মশালার কর্ত্রীর ছেলেকে বলেছিলাম একটা মজুর ঠিক করে দিতে।

ও বলেছিল—চেষ্টা করব। ঠিক কথা দিতে পারছি না, কারণ মেলা দেখতে গেছে বহুলোক—তারা ফিরে না এলে কিছু ঠিক করতে পারা যাবে না।

ওবেলা পাওনা-গণ্ডা নিয়ে ছেলেটি খুঁতখুঁত করেছিল। ভাবলাম—এ বিষয়ে ও হয়ত তেমন মনোযোগ দেবে না। কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গে গেল—ভোরবেলাতে মজুরের ডাক শুনে। ছেলেটির সততায় মুগ্ধ হ'লাম। বিদায় নেবার আগে ওকে খুঁজলাম—দেখা পেলাম না। আরও ভোরে উঠে ও নিত্যকার কাজে বেরিয়ে গেছে। ছেলেটি পলিটেক্‌নিকের ছাত্র। দূরের স্কুল—ভোরবেলাতে না বা'র হ'লে ক্লাসে যোগ দিতে পারে না।

আমরাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সেই মেলার পথ ধরেই চলেছি স্টেশনের দিকে। ক্রমে মেলার মাঠে এসে পড়লাম। উৎসব-ক্লান্ত মানুষের মতই মাঠটা'র অবস্থা। নাগরদোলা দুটো এক পাশে কাত হয়ে পড়েছে, হাড়ি-কলসীর স্তূপ অন্তর্হিত—শুধু কয়েকটি ভাঙ্গা-ফুটো ভাঁড়-মুচি এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে। দোকানগুলোর বাঁশ-বাখারি খোলা হচ্ছে—খাবারের বড় বড় পরাত, গামলা ও কড়াইগুলো এক পাশে জড়ো করা। একটা জলভর্তি বালতিতে পাত্রগুলো ভাসছে। তার চারধারে ভাঙ্গা উনুনের ইট মাটি আর পোড়া কয়লা ছড়ানো। নির্ব্বাপিত দীপ নাট্যশালার শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে···উদাস মাঠ।

মাঠ পার হয়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় পড়লাম। এ পথে বসতি চিহ্ন নাই—দু'ধারে পেয়ারা বাগান। পেয়ারা বাগান শেষ হ'ল ত চাষের জমি। ধুলো-ওঠা সমতল পথ—একবারও মনে হচ্ছে না কয়েক শ ফুট উঁচু একটি উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলেছি। বিপরীত দিকে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ আসছে দু'হাতে দুধের ভাঁড় ঝুলিয়ে। এই রকম চিত্র-বিচিত্র ভাঁড়ই কাল দেখেছিলাম মেলার পথে—প্রায় সকলের হাতেই দু'একটি করে ছিল। এই ভাঁড় কেনার অর্থ এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। ওরা গাঁ থেকে দুধ আনছে—শহরের দোকানগুলিতে যোগান দিতে। দুই-একজনকে শুধোলাম—দুধ বেচবে কি-না। মাথা নেড়ে জানালে—না। এ-হ'ল যোগানের দুধ—খাউকো খদ্দেরের জন্য নয়।

দোকানেও দেখেছি কড়াই-ভর্ত্তি দুধ। কিন্তু শুধু দুধ বিক্রীর চলন তেমন নেই—যেমন পশ্চিমের শহরগুলিতে দেখেছি। এখানে দুধে চায়ে মিশিয়ে পানীয়—আহার ঔষধ একাধারে দুই-ই।

আমাদের বাংলা দেশে যেমন অজস্র খাবারের দোকান, এদেশে তেমনটি দেখছি না। শুধু যেখানে যাত্রীর আসা-যাওয়া বেশী—মন্দির বা মেলার জায়গায় কিংবা আপিস পাড়ায়,—ইস্কুল-কলেজের গা ঘেঁষে,—রেল আর বাস স্টেশনের কাছ-বরাবর—বেশ কিছু কিছু দোকান দেখা যায়। ট্রেণে দেখেছি,—পথ চলতেও দেখেছি,—বিশ্রাম নেবার জায়গাটুকু বেছে নিয়ে কাপড়ে বাঁধা পুঁটুলিটি ওরা খুলছে। পুঁটুলি থেকে বার করছে দু' তিনখানা বড় বড় রুটি—যার এক একটির ওজন আধ পোয়ার কম নয়—তার সঙ্গে তিনটি আঙ্গুলে চিমটি কেটে তুলে নিচ্ছে সামান্য আচার। ব্যস্, পরম আরামে তাই গলাধঃকরণ করে পুঁটুলিটা আবার বেঁধে রাখছে। পুঁটুলিটা শেষ হ'তে চার-পাঁচদিন ত লাগবেই। ক্ষুধা শান্তির এমন উৎকৃষ্ট উপকরণ থাকতে খাবারের দোকানের দিকে কেনই বা যাবে। তবে সৌখিন যারা, তাদের ঝোঁকটা দোকানের দিকেই। আবার মেলায় এসেও মানুষের সখ-সৌখিনতার ত হিসাব থাকে না।

খাবারের রকমফের কিন্তু বেশি নাই। এই ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট হ'ল জিলাবি। দইবড়াকে মন্ত্রী হিসাবে ধরলে—পাত্রমিত্র অমাত্যদের পর্য্যায়ে পড়বে প্যাঁড়া বরফি গজা শোনপাপড়ি ডালমুট ত্রিকোণ পুরী ইত্যাদি। মালাই রাবড়ি উত্তম খাদ্য সন্দেহ নাই—কিন্তু এরা নিতান্তই অন্তঃপুরচারিণী- সাধারণ প্রজার দৃষ্টিলভ্য নয়।

প্রোটিন ভিটামিন ক্যালরির পরিমাণ নিয়ে এরা নিশ্চয় মাথা ঘামায় না—কিন্তু এদের চেহারা দেখলে স্বাস্থ্য পুস্তক পড়ে খাদ্যবস্তু নির্ব্বাচন করার পরিশ্রমকে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না। এমনিতেই প্রকৃতি এখানে দাক্ষিণ্য-ময়ী—জল-হাওয়ার মাধ্যমে দেহ পোষণের উপাদানগুলিকে যুগিয়ে যাচ্ছে অক্লান্ত ভাবে। সারা পাঞ্জাব ত স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত, কাংড়া কুলু আবার তারই মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

চলতে চলতে এতক্ষণে সমতলভূমি শেষ হল। পথটা ক্রমশঃ অসমতল হয়ে উঠছে। অনবরত মোড় ঘুরছে ডাইনে-বাঁয়ে। পথের শেষপ্রান্তে এসে মনে হ'ল পাহাড়ের উপরেই ত রয়েছি। শ'কয়েক ফুট নীচেয় ওই ত গভীর খাদ। ওধারে আর একটা পাহাড়, মাঝখানে নদী। দু'পারকে এক করেছে একটা ছোট পুল। পুলের পারে এসে পথ হয়েছে আরও সঙ্কীর্ণ—সে পথ আবার হারিয়ে গেছে পাহাড়ের জটলায়। সেই হারানো পথের খেই ধরে বহুবার উঠানামা করে, বহু বাঁক পার হয়ে ক্রমাগত নামতে নামতে আমরা ষ্টেশনে পৌঁছলাম।

গাড়ি আসতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল—একটা চালা-ঘরে বসে নিমকি আর চা খেয়ে নিলাম। ভাবছেন দেহাতি ঘিয়ের নিমকি? মোটেই নয়। আসল ঘি এই ভারতবর্ষে—কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় শীর্ষ পর্য্যন্ত এখন দুর্লভ দর্শন। গো-মহিষ অবশ্যই আছে—দুধ-ঘি এ সবও অমিল নয়; কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার চাপে এগুলি অবিকৃত থাকার উপায় নাই।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এল। আকণ্ঠ যাত্রী-বোঝাই গাড়ি। মোটঘাট নিয়ে কোন রকমে ত উঠতে পারলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই কামরাতে এক বাঙ্গালী পরিবার ছিলেন। ওঁরা কাশ্মীর বেড়িয়ে ফিরছিলেন বৈজনাথ পাপরোলায়। ওইখানেই রয়েছেন দু'তিন বছর ধরে। দিন পনেরো আগে গিয়েছিলেন কুলুর দিকে, উপত্যকার শেষ সীমানা মানালি পর্য্যন্ত। আমরা ওদিকে চলেছি শুনে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য জানালেন—যা পরে আমাদের উপকারে এসেছিল।

বললাম, কাশ্মীর কেমন লাগল?

বললেন, কাশ্মীরের চেয়ে কুলু আমাদের বেশি ভাল লেগেছে।

আমরা কলকাতার বাসিন্দা—শহর দেখতে এত কষ্ট করে আসার কোন অর্থই পাই না। আসলে শ্রীনগর হ'ল একটি শহর—তিরিশ-চল্লিশ সত্তর-আশি মাইলের পাল্লায় রয়েছে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি। পাহাড় বাগান গ্লেসিয়ার ঝর্ণা সবই মোটরে চড়ে গিয়ে দেখতে হয়—আর কুলুতে সর্ব্বক্ষণই সেই সবের মধ্যে বাস। কাশ্মীরে সব কেমন সাজানো-গোছানো—মানুষের হাতে সাজানো। পথঘাট বাগবাগিচা ......ঝরণা পর্য্যন্ত সারা উপত্যকাটাই যেন টুরিষ্টদের অভ্যর্থনার জন্য সাজগোজ করে রয়েছে। কুলুতে মানুষের হাত পড়েছে কম—প্রকৃতিই সর্ব্বময়ী। মোটরে করে এক পাও যাবার দরকার নাই। নিজের পা যদি না চলে—তাতেও ক্ষতি নাই। ছবিটা সর্ব্বক্ষণই চারধারে সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে। আর পা যদি চলল—আহা, তেমন আনন্দ···কিসের সঙ্গে তুলনা করব! ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে গেলেন।

এইবার অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ভদ্রলোকটি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপাততঃ কোথায় নামবেন?

বৈজনাথে। বললাম।

যুবকটি তাড়াতাড়ি বললেন, কোন্ বৈজনাথ?

অবাক্ হয়ে বললাম, বৈজনাথ কি অনেকগুলো আছে?

না—বৈজনাথ মানে দেবতা একটিই, কিন্তু রেল ষ্টেশন আছে দুটো। বৈজনাথ পাপরোলা আর বৈজনাথ মন্দির। পাপরোলা খুব বড় ষ্টেশন। রেলের লোকো অফিস আছে—এই সব ছোট ছোট গাড়ি মেরামতের আড্ডা ওটা। ওখানে ট্রেণ থামেও প্রায় এক ঘন্টা। এরপর যোগিন্দর নগর পর্য্যন্ত দুরূহ চড়াই পথ। এই যে এতগুলো বগি নিয়ে ট্রেণটা চলেছে এর তিনভাগের দুভাগ পড়ে থাকবে পাপ-রোলায়, মাত্র দু'তিনখানা বগি নিয়ে পিছনে আর একটা ইঞ্জিন জুড়ে—গাড়িটা যাবে যোগিন্দর নগর। খাড়া পাহাড়ী পথ—মাত্র তেইশ কিলোমিটার। এইটুকু পথ যেতে সময় নেবে সওয়া দু'ঘণ্টা।

বললাম, তা পাপরোলা যখন বড় শহর—ওইখানেই নামব না হয়।

না—না, তা করবেন না। আপনারা যখন কুলুর দিকেই চলেছেন—ওখানে নামবেন কেন? ওখান থেকে বৈজনাথ মন্দির প্রায় দু'মাইল—খাড়া চড়াই ভাঙ্গতে হবে। আপনারা নামবেন মন্দির-ষ্টেশনে, মাত্র দু'ফার্লং পথ গেলেই আশ্রয় পেয়ে যাবেন। পথটা সমতল। আবার ওখান থেকেই কুলুর বাস পেয়ে যাবেন।

বললাম, ওখান থেকে কুলুর বাস ধরব না আমরা। ট্রেণে করে যোগিন্দর নগর গিয়ে বাস ধরব।

ভদ্রলোক একটুকাল চিন্তা করে বললেন, তাতে অসুবিধা আছে। যোগিন্দর নগর থেকে বাসে জায়গা না-ও পেতে পারেন।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কেন—যোগিন্দর নগরে ত রেল লাইনের শেষ, বাস সার্ভিস আরম্ভ ওখান থেকে। একেবারে ষ্টার্টিং পয়েণ্ট থেকে—

ভদ্রলোক হেসে বললেন, সেখানে রেল লাইনের শেষ ও বাস সার্ভিস আরম্ভ, সেখান থেকে ভাল ভাবেই যে যাওয়া যায় এই ধারণাতেও একটু গলদ রয়েছে যে। আসলে যোগিন্দর নগর ত বাসের টার্মিনাস ষ্টেশন নয়—পথের মাঝখানে একটা বড়মত ষ্টেশন। যে-সব বাস কুলুর দিকে যায় তার একটি ছাড়া সব ক'টিই ছাড়ে বৈজনাথ থেকে। পাপরোলা থেকে নয়—মন্দির থেকে। এগুলি কাংড়া-কুলু-ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস—আপিসটা ওই বৈজনাথেই। থ্রু সার্ভিসের একখানা বাস শুধু পাঠানকোট থেকে সকাল-বেলায় ছাড়ে—মানালি পৌঁছায় বৈকালে। আর আর বাসগুলি বৈজনাথ থেকে ছেড়ে মণ্ডি পর্য্যন্ত যায়। মণ্ডিতে আর একবার বাস বদল করে তবে কুলু বা মানালি। বৈজ-নাথই হ'ল ডাউন বাসের টার্মিনাস ষ্টেশন। আর একটা সুবিধা পাবেন বৈজনাথ থেকে। যাত্রার আগের দিন বিকেলে সিট রিজার্ভ করিয়ে রাখবেন তা হ'লে জায়গা পেতে অসুবিধা হবে না।

বাসে ভিড় হয় খুব?

হবে না! ত্রিশ চল্লিশ একশ' মাইলের পাড়ি জমানোর একমাত্র সম্বল ত ওই বাস। প্রচুর লোক হয়। আগের দিন সিট রিজার্ভ করিয়ে রাখবেন, না হ'লে জায়গা পাবেন না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বৈজনাথে দেখবার কিছু আছে?

উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, ছোট্ট শহর—এমন কিছু দেখবার নাই। অনেক দিনকার পুরাণো মন্দির আছে একটি—বৈজনাথ শিবের মন্দির। ওঁরই নামে শহর। জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর। চার হাজার ফুট পাহাড়ের উপর অনেকখানি সমতল জমি—ইলেকট্রিক লাইট, জলের কল, দোকান-পসার, একটা স্কুল এই সব নিয়ে জায়গাটা কম জমকালো নয়। একদিকে পথ নেমে গেছে পাহাড়কে পাক দিয়ে আর একদিকে পাহাড়কে প্যাঁচ দিয়ে পথ উঠেছে উপরে। এই মন্দিরের কাছে দাঁড়ালে উঠা-নামার দু'টি মুখই একসঙ্গে দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন একটা গভীর খাদ—তার মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী। নদীর ওপার থেকে উঠেছে—খাড়া পাহাড়। তারপর দশ বিশ পঞ্চাশ মাইল জুড়ে খালি পাহাড়—ঢেউএর পর শুধু ঢেউ। ওই ঢেউএর মধ্যেই আবার রয়েছে ধবলাধার গিরিশ্রেণী। বরফ জমা সাদা মাথা ওই যে পাহাড়গুলো এখন দেখছেন ছবির মত মিলিয়ে আছে আকাশের গায়ে ওইগুলিকে বৈজনাথে গেলে কত কাছে দেখতে পাবেন।

ট্রেণের কামরায় ঝুঁকে পড়লাম যেদিকে পাহাড়ের প্রাচীর আমাদের পাশাপাশি চলেছে। ওদের মাথায় সাদা বরফের রাশি সকালের রোদে চকচক্ করছে। আর এখন ইউ পি-তে পাঞ্জাবে নিদারুণ রৌদ্র আকাশ-মাটি জুড়ে বহ্ন্যুৎসব লাগিয়েছে—জীবকুল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। এত কাছে রৌদ্র আর জমাট্ বাঁধা তুষার।

আমাকে ওইদিকে অবাক্ হয়ে চাইতে দেখে ভদ্রলোক যেন আমার চিন্তাসূত্রকে স্পর্শ করেই উত্তর দিলেন। ভাবছেন পাহাড়গুলো খুব কাছে—আর নীচুতে? মোটেই তা নয়। ওগুলো অন্তত আশী-নব্বই মাইলের দূরত্বে রয়েছে। আর উঁচু? ষোল-সতর হাজার ফুটের কম নয় কোনটাই।

বুঝেছি, তাই ওগুলির বরফ গলে না!

কে বললে গলে না। ভদ্রলোক এবার শব্দ করে হাসলেন। বরফ যদি না গলবে ত নদীতে এত জল আসছে

কোথা থেকে! পনের দিন আগে আমরা যখন কুলুতে গিয়েছিলাম তখন ওগুলির চেহারা ছিল নীরেট সাদা। এখন থছেন ত—মাঝে মাঝে কালো পাথরের ফাটল দেখা াচ্ছে—যেন মনে হচ্ছে সাদার গায়ে চিড় ধরেছে। বরফ অনেক গলে গেছে!

গলা বরফ পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে এ দৃশ্য মানালির াগে দেখেছিলাম পরে। বহুশত রূপোর পাতের মত ধারা—াহাড়ে গা বেয়ে নেমে আসছে বিপাশায়। সলিল স্ফীতিতে···বিপাশা ওদিকে পূর্ণ যৌবনা। শিলায় শিলায় আঘাত হেনে রুদ্রাণী বিপাশা প্রমত্ত গর্জ্জনে ধেয়ে চলেছে সমতল লক্ষ্য করে। তুষার যদি দ্রব না হবে—নদী যৌবন-বতী হবে কোন্ রসায়ন পান করে?

কুলু যাত্রার তালিকায় কয়েকটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সং-যোজন করে দলটি নেমে গেল বৈজনাথ পাপরোলায়। আরও ঘণ্টাখানিক পরে আমরা নামলাম বৈজনাথ মন্দিরে।

ষ্টেশনটি খুবই ছোট, বসতি-বিরল একটি প্রান্তরের মাঝ-খানে। চারিদিকে জঙ্গলে ভর্তি উঁচু-নীচু জমি—ষ্টেশন থেকে জনপদে যাবার কোন সোজা পাকা পথ দেখলাম না। রেলের কোয়ার্টার্স ছাড়া আরও দু' তিনখানা শ্লেট পাথর ছাওয়া ঘর দেখা যাচ্ছিল। পায়ে-চলা দু'তিনটি সরু পথ এক-গলা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সেই কুটিরগুলির প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। তার পিছনের জমিটা বেশ উঁচু—আর বাঁধারে বাঁশবনের জঙ্গল। এই বন-ঝোপ পার হয়ে কোন্ দিকে শহর কে সন্ধান দেবে!

সামান্য যাত্রী এখানে নেমেছিল। তারা ত তাড়াতাড়ি া ফেলে বন-ঝোপের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! আমাদের সঙ্গে একরাশ মালপত্র, আমরা ত অমন করে এগুতে পারব না।

ষ্টেশনের পোর্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে মজুর মিলবে না?

ও দিব্য মাথা নেড়ে বলল, না।

তোমাকে বকশিস করব, একটা ব্যবস্থা করে দাও না।

ও আর একবার মাথা নেড়ে সিগন্যাল-বরাবর চলে গেল।

ছোট ষ্টেশনে এসে আচ্ছা বিপদেই পড়লাম ত! এমন উকে দেখছিও না—যিনি পরিত্রাণের উপায় বলে দেবেন। মাত্র দু' ফার্লঙের ব্যবধান যে এমন দুস্তর নদী হবে কে ভাবতে পারে!

ধরলাম ষ্টেশন-মাষ্টারকে। উনি তখন ষ্টেশন-ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে কোয়ার্টারে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। এখন সবে এগারটা—পরের গাড়ি আসবে বিকাল চারটায়। সুদীর্ঘ অবসর-স্নান আহার সেরে একটি লম্বামত দিবা-নিদ্রার উপযোগী সময় ওঁর হাতে এসেছে।

ষ্টেশন মাষ্টার যা বললেন, তার ভাবার্থ এই: এই ছোট ষ্টেশনে মজুর পাওয়া যায় না—গাড়ির কথা ত এখানে স্বপ্নবৎ। ভাল রাস্তা কোথায় ষ্টেশনে আসবার। যারা এখানে নামে তারা দু'এক মণ বোঝা বইবার ক্ষমতা রাখে। সেগুলো পিঠে-কাঁধে ঝুলিয়ে শহরে চলে যায়। এই ত কাছেই শহর। বাঁশবনের ধারে ধারে নালা পেরিয়ে পায়ে-চলা পথ—বড় জোর দু' ফার্লং। পায়ে পায়ে চলে যাও শহরে। বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে অনেক মজুর পাবে—তাদের কাউকে ধরে আন গে।

প্রাঞ্জল উপদেশ দিয়ে উনি সোজা চলে গেলেন। আমরা মালপত্রগুলো হাতাহাতি করে বয়ে নিয়ে এসে বসলাম ছাউনির তলায়। নাতি শহরের দিকে চলে গেল মজুরের সন্ধানে। সেই এক-গলা বনের মাঝে মিলিয়ে গেল সে।

টিনের শেডের পাশেই প্রকাণ্ড একটা আমগাছ বহু শাখা মেলে জায়গাটাকে তপোবনের আকার দিয়েছিল। বেশ ছায়া-ছায়া স্নিগ্ধ পরিবেশ, ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল গাছের ডালে বসে একটা ঘুঘু পাখী মাঝে মাঝে ডাকছিল মিষ্টি গলায় দুপুরের রোদটা চড়েছিল বলেই—নিস্তব্ধ নির্জন ছায়াময় কচিৎ সুরঝঙ্কৃত পরিবেশটা চমৎকার লাগছিল। একটু দুশ্চিন্তা লেগেছিল মনে—তবু কি ভালই যে লাগছিল। একটি শান্তরসাস্পদ তপোবনের মধ্যে বসে রয়েছি—মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ কাটল—ঘণ্টাখানিক ত বটেই। দু' ফার্লং পথ কি এতটাই দীর্ঘ! নাতি পথটা শেষ পর্য্যন্ত চিনতে পারল ত? না মজুর পায় নি? মনে নানান চিন্তা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন একটা মানুষকে দেখলাম না—যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু আশ্বস্ত হ'তে পারি। উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌছেছি যখন, তখন বনের মধ্যে মানুষের

কণ্ঠস্বর শুনলাম। নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। সামনের ঝোপটা নড়ে উঠল নাতি বেরিয়ে এল, পিছনে মজুর।

এবার ওদের পিছু পিছু চলেছি আমরা। সেই বনঝোপ ঠেলে কুঁড়েঘরের পিছন দিয়ে একটা নালা টপ্‌কে বাঁশ-বাগানটা বাঁয়ে রেখে শহরের দিকে চলেছি। নালাটা ছোট নয়, নোংরা জলে ভর্তি নর্দ্দমা নয়, ওটা খালেরই একটি ক্ষুদ্র প্রশাখা। এই শহরের মাঝখান দিয়ে যে সেচখাল গেছে—তার থেকে আরও অনেকগুলি কেকৃড়ি বার করেছে মানুষ। সেই ধারাগুলিকে কখনও নিজেদের জমির মাঝখান দিয়ে, কখনও বা ঘরের আঙ্গিনায় টেনে এনে নানা কাজে ব্যবহার করছে। সেই জল ক্ষেতে সেচের কাজে লাগছে, তাতে স্নান চলছে, বাসন মাজা, কাপড়-কাচা, ঘরদুয়োর ধোয়া প্রভৃতি ঘর গৃহস্থালীর নিত্য-প্রয়োজনে লাগানো হচ্ছে। আবার কোথাও বা পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে—যদিও কলের জলের অভাব নাই। নদী-নালার দেশ বাংলার ছবিটা কিন্তু এই নিদাঘে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

বনের পথটা শেষ হ'ল—বৈজনাথ মন্দিরের সামনে ধর্ম্মশালায় এসে উঠলাম। ধর্ম্মশালা না বলে এটিকে পান্থশালা বলাই ঠিক। যাত্রীদলের অবিরাম আসাযাওয়ার স্রোতে একটি দ্বীপের মত লাগছে বাড়ীটাকে। যে একরাত্রি বাস করবে, সে ত থাকবেই—যে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিতে চায়, তারও প্রয়োজন এখানে। সুতরাং কারও অনুমতি নিয়ে কোন একটি ঘরে বা বারান্দায় মালপত্র গুছিয়ে বসার ব্যাপারটা চোখে পড়ল না।

মজুর বলল, ম্যানেজারকে কিছু বলতে হবে না—খালি ঘর দেখলেই সেটা নিয়ে নাও, পরে ওঁকে জানিও।

তাই হ'ল।

দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দোর উঠোন। উঠোনে বেলা, চামেলি, গোলাপ আর কলাফুলের আসর বসেছে—পিছনের উঠোনে কয়েকটি পাহাড়ী ফুলের চারা টবে বসানো। খাল থেকে টেনে আনা জলধারা পাঁচীল বেয়ে ঝরণার মত নামছে উঠোনে, কলকল শব্দ উঠছে অবিরাম। সেই জলে স্নান আর কাপড়কাচার ধুম লাগিয়েছে মেয়ে-পুরুষে। ধর্ম্মশালার প্রবেশ-পথেই ম্যানেজারের গদি। ঢালা বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর পাতা। গোটা দুই তাকিয়া, ফুলদান, দোয়াত-কলম আর খাতাপত্র সেই ফরাসের একধারে গুছিয়ে রাখা। কোন সৌখীন মানুষের বৈঠকখানার মতই লাগছে দলিজটা। ম্যানেজারের বয়স হয়েছে, কশ্যা-গোছের মানুষ—পোষাক-পরিচ্ছদ জমকালো নয়, পরিচ্ছন্ন। সৌম্যদর্শন, সদালাপী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ওঁর ফুলদানির ফুলগুলি নির্গন্ধ হ'লেও রংটি ভারি মোলায়েম। আমাদের দেশের ঘাসফুল যেমন দেখতে, তেমনি। আকারে তার চেয়েও বড়, রঙে আরও কিছু উজ্জ্বল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কি ফুল?

বলেছিলেন, জংলী নার্গাস।

জঙ্গলের আরও দু'একটি ফুল চিনিয়ে দিয়েছিলেন। লাল নীল, হলদে রঙের ছিটছিট ছোট ফুলগুলি—অনেকটা মেয়েদের নানা রঙের পাথর-বসানো কর্ণভূষণের মত। পাথুরে রাস্তার ধারে অজস্র ফুটে থাকে—নাম বললেন, নীলকণ্ঠ। ওগুলি নাকি বিষাক্ত ফুল। আর ঝরণার ধারে পাথরের গায়ে লাল আর সাদা একপাটি ফুলগুলো হ'ল বুনো গোলাপ। লতানে গাছগুলি যখন ধূসর পাথরের গা ঢেকে দিয়ে অজস্র ফুলের বাসর রচনা করে, সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা বুঝি কৃষ্ণপক্ষের আকাশে নক্ষত্রদ্যুতির সঙ্গেই দেওয়া চলে। তফাৎ এইটুকু, মর্ত্ত্যের এই সৌন্দর্য্য সৌরভসিক্ত—কামনাময় মনেতে প্রিয়সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতাকে বাড়িয়ে তোলে। বৈজনাথে এই সৌন্দর্য্যের আভাস পেলাম, এর পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল, মানালির আপেল বনের সামনে ও পিছনের পাহাড়ের পটভূমিকায়—পায়ে-চলা পথটির দু'ধারে।

নানা জাতের ফুল দেখলাম, দেখলাম উপত্যকার মানুষ-গুলিকে—তাদের আসল রূপ। এমন একটি পান্থশালায় না এলে বুঝি ওদের প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। সারা দুপুর-বিকেল আর রাতেও ওরা দলে দলে আসা-যাওয়া করছিল। এক একটি দলে পনেরো, বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ জন। সেদিন রাত্রিতে যে দলটি এল, তাতে শ' দুয়ের মত লোক ছিল। ওরা কলরব করতে করতে ঢুকল ধর্ম্মশালায়। দুপদাপ শব্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে একতলার ছাদে উঠে গেল—ধুপধাপ শব্দে বিছানাগুলো ফেললে ছাদের উপরে। প্রশস্ত ছাদে হুটোপুটি হৈ চৈ হট্টগোলের স্রোত বইতে লাগল। অনেকখানি রাত পর্য্যন্ত বাঁশী বাজাল, গান গাইল, কথা

কাটাকাটি হাসি-ঠাট্টার তুফান তুলল। ধর্মশালার পিছনে খালের শাখা থেকে টেনে-আনা জলস্রোত যেমন অবিরাম কল্লোলমুখর ছিল—তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওরাও তেমনি ছাদের আসর জমিয়ে তুলেছিল। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল, অবিশ্রান্ত ধুপধাপ শব্দে। ওরা উঠছে-নামছে, শিষ দিচ্ছে, গানের কলিতে সুর চড়াচ্ছে আর হাসি-স্ফূর্তির হল্লোড় বয়ে যাচ্ছে দমকা হাওয়ার মত। সকালে উঠে দেখি নিঃঝুম পুরী—কাকস্য পরিবেদনা। মনে হ'ল সারারাত ধরে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম!

পণ্ডিতজী বললেন, ওরা মজুরের দল—পাহাড়ের গায়ে পথ তৈরী করছে। ট্রাক বোঝাই হয়ে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে, সব সময়েই এখানে ওঠে।

কোথায় পথ তৈরী হচ্ছে?

হিমালয়ের সব জায়গাতেই। মানালি থেকে আরও উত্তরে—লাডাকে। কেন তোমরা কি জান না চীন হামলা বাধাবার চেষ্টা করছে! নওজোয়ানরা যে লড়াই করবে, তার জন্য ভাল পথ চাই ত।

বললাম, লাডাক ত এখান থেকে অনেক দূর।

জঙ্গী মানুষের কাছে কতটুকু দূর। পণ্ডিতজী হাসলেন। একশো-দু'শো মাইলের ফারাক আবার ফারাক নাকি। হাওয়াই জাহাজ একটা চক্কর দিলেই ত দশ-বিশ মাইল!

দুপুরেও দেখলাম, কত দল এল আর চলে গেল। আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় এসে ধুপধাপ করে মোট ফেলে বসল। পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজালে কেউ, কোন দল মোট ঠেস দিয়ে বসে তাস খেলতে লাগল, কেউ বা গড়গড়াটায় ছিলিম চাপিয়ে ধূমপানে মনোনিবেশ করল। যাদের পিঠে মোটঘাট আর হাতে গড়গড়া তারা বয়সে কিছু প্রবীণ, কিন্তু কম নয় তাদের সংখ্যা। পথ চলতে চলতে, চলন্ত বাসের মধ্যে, ধর্মশালার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কিংবা ঘরের মেঝেতে বসে এদের তামাক টানতে দেখেছি। বাসে অবশ্য 'ধূমপান নিষেধ' একটি নোটিশও লটকানো থাকে, কিন্তু আইনের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় নি বলে অনুশাসনটা বলবৎ নয়।

আমরা বিদেশী বলে ওরা বেশ খাতির করছে মনে হ'ল। যেমন, ঝরণার জলধারায় মাথা পেতে কেউ স্নান করছে। আমরা তেল মেখে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই জায়গাটা ছেড়ে দিলে। পাথরে কাপড়-জামা রেখে সাবান ঘষছে। আমাদের হাতে ময়লা জামা আর সাবান দেখে খানিকটা সরে বসল। এমনি কলে খাবার জল নিতে গিয়েও দেখলাম।

সন্ধ্যাবেলায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। কথায় কথায় কুলুর কথা উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে থাকবার জায়গা পাব ত?

নিশ্চয় পাবে। ওখানে গুরুদ্বার আছে, সেইখানে থাকবে।

গুরুদ্বার ত শিখদের জন্য।

মাথা নাড়লেন পণ্ডিতজী, না, না, সকলকার জন্য। তা ছাড়া আর্য্যমন্দির আছে—হোটেল আছে—ভাবনা কি?

আশ্বস্ত হ'লাম। এর পর জাতি-ধর্মের কথা উঠল—পূজা-অর্চনার কথা উঠল। পণ্ডিতজী বললেন, যিনি যে ধর্ম-মতেই ভগবানকে ভজনা করুন—সেটা যদি ঠিক ঠিক হয় তা হ'লে ভাবনা কি। এই দেখুন না কেন—আপনি ত বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ, (গেঞ্জির ফাঁকে এক সময়ে আমার উপবীত হয় ত লক্ষ্য করেছেন।) ঈশ্বরকে যে মন্ত্রে পূজা করেন—যে বিধি আচার পালন করেন—আমরা এদেশের লোক তা হয় তো করি না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক, এ ত আমাদের গোত্র, পরিচয়ে জানা যায়। মন্ত্রগুলো একটু এদিক-ওদিক—বিধি-আচারে তফাৎ, তা বলে ঈশ্বর তো আলাদা নন। পূজা-পাঠ করলে তিনি সাড়া দেনই।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম,…গোত্র প্রবর এ সব আপনারা মানেন?

বললেন, মানি বইকি—যেমন আমরা ভরদ্বাজ ঋষি থেকে এসেছি—

আমরাও। আমাদের এক একটা উপাধি ধরে এক এক ঋষির গোত্র—

উনি বললেন, আমাদেরও। তুমি বাংলার লোক, আমি পাঞ্জাবের—কিন্তু একই বংশের সন্তান আমরা।

উনিশ শ' সাতান্ন সালে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে কুম্ভকোণমের এক সুরশিল্পীও এই কথা বলেছিলেন। আমি ভরদ্বাজ গোত্র শুনে ছুটে এসে আমাকে বুকে চেপে

ধরে বলেছিলেন, তুমি আমার আত্মীয়—আমিও ভরদ্বাজ।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—বিশাল বিস্তৃত ভারতবর্ষ, নদ নদী অরণ্য পর্ব্বত—আবার প্রথা ভাষা পরিচ্ছদ—এমন কি আকৃতি প্রকৃতি প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও একই গোত্র বন্ধনে বাঁধা। শোণিত ও সংস্কৃতি বন্ধনের উপরে জল মাটির প্রভাব, দেশাচার, লোকাচার, জাতি-ধর্ম্ম পারিবারিক প্রথা নিয়মের পলিমাটি জমা হয়েছে স্তরে স্তরে। বহু দিনের বিস্মৃতির কুয়াশা নেমেছে তার উপরে। সে আবরণ কোন কোন শুভক্ষণে মাঝে মাঝে সরে যায়, আমরা অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকি একটি সূর্য্যমণ্ডলের দিকে। সেই সূর্য্যের আলোয় আমাদের আদি কালের ইতিহাস অনাবৃত হয়ে ওঠে, আমরা তখন একটি ভূমণ্ডলে একই ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াই। কিন্তু সে কতটুকু কাল—নিমেষপাত মাত্র! পরমুহূর্তেই ভূগোলের নদনদী পর্ব্বত অরণ্য সমুদ্র মরুভূমি দুস্তর ব্যবধান রচনা করে। ভূগোল সুচিহ্নিত করে ইতিহাসের ঘটনা আর কালকে; কিন্তু ইতিহাস যে-পথে কাছে টানতে চায় মানুষকে—ভূগোল সে-পথে চলতে দেয় না। দেশের সীমান্তে সঙ্গীন উঁচিয়ে সে সর্ব্বদাই হাঁকছে, হটো, তফাৎ যাও?

বিকেলে শহরের এ মুড়ো ও মুড়োয় একবার চক্কর দিয়ে এলাম। একটাই পথ, উপরে উঠেছে পাক খেয়ে—হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে চলে গেছে—তারই অন্য প্রান্ত পাকে পাকে নেমে গেছে উপত্যকা কাংড়ার দিকে। বৈজনাথ মন্দিরের কাছে পথের বাঁকটিতে এসে দাঁড়ালে দুটি প্রান্ত একই সঙ্গে দেখা যায়। মন্দির থেকে দৃশ্যটি আরও অপরূপ,—কারণ হাজার-দেড় হাজার ফুট নীচেয় একটা ভয়াল খাদ—খাদ-পথে নিম্নগামিনী একটি তরঙ্গ উচ্ছলা নদী, আর সামনে ঝুঁকে পড়ছে পাহাড়—একটি দু'টি নয়, একেবারে অজস্র-অফুরন্ত ঢেউ তুলে দিগন্তলীন-ধবলাধার গিরিশ্রেণীর এমন মনোহর ছবি আর কোন পথের বাঁকে সাজানো আছে জানি না। এখানে এই মন্দিরের ধারে দাঁড়িয়ে জীবন আর মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখা যায়। আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ ঘটে।

মন্দির এমন কিছু নয়,—গঠন-নৈপুণ্য বা শিল্প-কর্ম্ম কোনটাই অপরূপ নয়। তবু এই মন্দিরের মহিমার কথা মন কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভাঙ্গা পাঁচিল—ফাটা মেঝে, অপরিস্কৃত অঙ্গন—পূজার্থীবিরল গর্ভমন্দির—তবু শূন্য নয় অসুন্দর নয়—অসম্পূর্ণ নয়—নদীর ওপারে তুষার-মৌলি গিরি শ্রেণীদল এক সুগম্ভীর সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকা রচনা করে রেখেছে—এ পারে পাহাড়ের সঙ্কটময় ভৃগুস্থানে দাঁড়িয়ে মহাকালের দেউল যেন একটি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করছে অদৃশ্য লোকের দিকে। সে-লোকে জীবনের উদয় আর অস্ত-গমনের রহস্য বিধৃত। খাদের মধ্যে নদী-স্রোতটি চৈতন্য-প্রবাহ।

সেইদিন প্রাদোষ-অন্ধকারে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অকারণেই মনে হ'ল:

> বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
> যাত্রা আমার চলার পাকে
> এই পথেরই ফাঁকে ফাঁকে
> নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

সমগ্র কাংড়া উপত্যকার মধ্যে বৈজনাথ আমাদের মনোহরণ করেছিল একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। এর মায়ায় জড়িয়ে একটি দিন বেশীই রইলাম এখানে।

জায়গাটা ভাল লেগেছিল আরও একটি কারণে। এ যেন কারও গন্তব্যস্থল নয়—বাসগৃহও নয়। সারা জায়গাটাই যেন পান্থনিবাস। কাংড়া-কুলুর সন্ধিস্থলে এই জায়গাটা শুধু আসা-যাওয়ার পদধ্বনিতে শব্দ মুখরিত। একে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে যার ঘরের পানে চলে যাচ্ছে—যে যার কর্ম্মভূমিতে ফিরছে। প্রমোদসূচী-ভ্রমণ-স্বাস্থ্যসঞ্চয়, ব্যবসা-বাণিজ্য—যে যার লক্ষ্যে ছুটেছে অবিরত। কেউ এখানে বাস করতে আসে না—থাকে না সখ করে, আসে না দেবতাকে দর্শন করবে বলে। যেটুকু থাকে পরিবহনের অসুবিধা কাটাবার জন্য—ধর্ম্মশালার চলমান জনস্রোত দেখে এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে। সুতরাং নিঃসম্পৃক্ত এই শহরটার গোত্রই আলাদা। ওই উদাসীন সর্ব্বরিক্ত মহাকালের গোত্র এর কুল পরিচয়। যেমন খাদের মুখে কল্লোলিত স্রোতস্বিনী বিহুয়া নদী জনপদের সংসর্গে এসেও সঙ্গীহারা, যেমন খাদের ওপারে ধবলাধার গিরিমালা দলবদ্ধ হয়েও একাকী, এরা বুঝি নিয়ত নিঃসঙ্গ, মহাকালেরই বিচিত্র ভঙ্গির এক একটি প্রকাশ।

এই ক্রমোর্দ্ধ পথের একধারে ধর্ম্মশালা অন্য ধারে মন্দির। জনস্রোতে চঞ্চল কল্লোলধ্বনি-মুখরিত ধর্ম্মশালা—এপারে জীবনের প্রতীক; ওপারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ···ধ্বনি-গতিহীন বৈজনাথ—মৃত্যু মন্দিরের দেবতা। এক-পাশে অখণ্ড চৈতন্য-সত্তাময় মহাকাল—অন্য ধারে তাঁর মানস আনন্দজাত লীলা কুসুমগুলি। মন্দির আর ধর্ম্মশালা 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জীয়ন্তে'র মর্ম্মকথাটি ব্যক্ত করছে কি আশ্চর্য্যভাবে!

> বস্তু ছিল ক্রিয়াহীন অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ভরা
> তারই মাঝে একদিন সৃষ্টির আনন্দ দিল ধরা।

সৃষ্টির আনন্দ···যেমন করে ধরা দিয়েছিল অকস্মাৎ সেই রহস্যের গ্রন্থি মোচন করছেন বৈজনাথ।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(ছাব্বিশ)

তিন বছর পরে।

কিন্তু এই তিনটে বছর মালতীর কি করে কাটল, সে আর বলবার নয়। মা-বিড়াল যেমন করে তার বাচ্চাকে পুরুষ-বিড়ালের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্যে সকল সময় ব্যতিব্যস্ত থাকে, তেমনি অবস্থা তার। খোকাবাবুকে সকল সময় সে বৃন্দাবনচন্দ্রের চোখের আড়ালে রাখে।

কেন ?

তার জবাব সে কাউকে দেয় না।

বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর আদর্শ, ঔদাসীন্য এবং নেশা-ভাঙ নিয়েই মশগুল থাকেন। সব সময় সব কথা তাঁর খেয়াল থাকে না। কিন্তু তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে খোকাকে মনে পড়ে। তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

তখন জিগ্যেস করেন, খোকা কোথায় ?

উত্তর মালতীর মুখস্থ : ঘুমুচ্ছে।

—সব সময়ই কি সে ঘুমোয় ?

—জমিদার বাড়ীর ছেলে। এখন থেকেই রিহার্সাল দিচ্ছে।

কথা মিথ্যা নয়। বৃন্দাবনচন্দ্র নিজে তাই করেন। দিন-রাত্রির মধ্যে খুব কম সময়ই সচেতন থাকেন। বেশীর ভাগ সময়ই হয় নেশায়, নয় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকেন। জন্ম থেকেই খোকাবাবু সেই জমিদারী অভ্যেসটা পেয়েছে।

বৃন্দাবনচন্দ্র হাসেন। বোধ হয় একটু খুসীও হন। জমিদারের ছেলে, জমিদারী অভ্যেস না পেলে মানায় না। এ বিষয়ে তাঁর মত এবং মেজাজ পিতামহের অনুবর্তী।

কিন্তু মাঝে মাঝে বৃন্দাবনচন্দ্রের মনটা খোকার জন্যে বোধ হয় খুব ছটফট করে ওঠে। তখন হুঙ্কার ছাড়েন : খোকাবাবুকে নে আও।

মালতী সে হুঙ্কারে ভয় পায় না। হেসে বলে, ঘুমুচ্ছে য়।

বৃন্দাবনচন্দ্র বিরক্ত হন। বিড়বিড় করে বলেন, খোকাকে নিয়ে তুমি এ ঘরে শোও না কেন ?

মালতী বলে, তা হ'লে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

—কেন ?

খোকাবাবু রাত্রে মাঝে মাঝে ওঠে। কাঁদে। তোমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ওকে নিয়ে তাই ও ঘরে শুই।

ঘুমের ব্যাঘাত বৃন্দাবনচন্দ্র সহ্য করতে পারেন না। খুশী হয়ে বললেন, বেশ কর। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কাছে নিয়ে আস না কেন ?

মালতী হেসে জবাব দেয়, কখন আনব ? তুমি কখন সুস্থ থাক ?

—যা বলেছ ? আগে সন্ধ্যের পরেই খেতাম, এখন সকল সময়ই চলছে !

মালতী বললে, এর চেয়ে আগেরটাই ভাল ছিল। কেন যে বন্ধুদের ছাড়লে ?

বৃন্দাবনচন্দ্র কি যেন ভাবলেন। বললেন, তুমি কি আগের অভ্যেসেই ফিরে যেতে বল ?

মালতীর ইচ্ছে, বৃন্দাবনচন্দ্র আগের অভ্যেসেই ফিরে যাক। এই যে চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বসে আছেন আর উৎপাত করছেন, এটা সে সহ্য করতে পারে না। যত উৎপাত ত তারই ওপর।

বললে, সে আমি কি জানি ? তোমার যা মন চাইবে, করবে।

বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, মাঝে মাঝে বন্ধুদের জন্যে মনটা কেমন করে। একা একা হাঁপিয়ে উঠি। আবার ভাবি, কাপ্তেনির ঝামেলাও অনেক। টাকার শ্রাদ্ধ হয়।

—কিন্তু জমিদারেরা চিরকালইত কাপ্তেনি করে এসেছে।

—তা এসেছে। আবার তাইতেই পথেও বসেছে।

বৃন্দাবনচন্দ্র হাসতে লাগলেন। বললেন, সেইটেকে ভয় করি।

মালতী বললে, সে ভয় যদি সত্যি কর, তা হলে নেশার খরচাটা কমাচ্ছো না কেন ?

—খরচ কি খুব বেশী হচ্ছে ?

—বেশী হওয়াই ত সম্ভব।

আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, তা হ'লে থাকব কি নিয়ে?

—যারা নেশা করে না, তারা কি নিয়ে থাকে?

—তাদের কাজকর্ম আছে, ঘর-সংসার আছে, তাই নিয়েই থাকে।

—কাজকর্ম তোমারও ত আছে।

বিস্মিত ভাবে বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, আমার আবার কাজ-কর্ম কি?

—তোমার জমিদারী আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। নিজে দেখাশুনা করলে, সেই ত অনেক কাজ।

—ও আমার ভাল লাগে না।

মালতী হেসে বললে, তবে আর কি করবে? যা করছ, তাই করে যাও।

বৃন্দাবনচন্দ্র চুপ করে বসে রইলেন।

রাত্রে হ'লে চুপ করে বসে থাকতেন না। রাত্রে মালতীও এত কথা বলতে সাহস করত না। একটু বেশী রাত্রি হ'লে ত নয়ই। বৃন্দাবনচন্দ্র সন্ধ্যের পর বাগানবাড়ী যাওয়া ছেড়েছেন, কিন্তু কাপ্তেনি একেবারে ছাড়েন নি। বাড়ীতে বসেই করেন। মালতীকে সমস্তক্ষণ সামনে বসে থাকতে হয়। রাত যত বাড়ে, মেজাজ তত চড়ে। স্বামীর কাপ্তেনি মেজাজের পরিচয় রয়ে যায় তার পিঠে।

খোকাবাবুর অন্নপ্রাশনের কয়েকদিন আগের কথা।

বৃন্দাবনচন্দ্রের শোবার ঘরের মেঝেয় নিত্যদিনের মত কার্পেট বিছানো। সেইখানে নেশার বিবিধ উপকরণের মধ্যে তিনি বসে। সামনে মালতী।

মালতী বললে, সোমবারে খোকাবাবুর অন্নপ্রাশন।

বৃন্দাবনচন্দ্র চমকে উঠলেন: তাই নাকি? আমি ত কিছুই জানি না।

—জানবে কি করে? আজ সকালেই ত মোটে ঠিক হ'ল।

—কে ঠিক করলে?

—এ বাড়ীতে যিনি সব ঠিক করেন, তিনি।

—মা?

—হ্যাঁ।

—আমাকে তিনি ত কিছুই বলেন নি।

—সময় মত বলবেন হয়ত।

বৃন্দাবনচন্দ্র গুম হয়ে বসে রইলেন। বললেন, দেখ, মায়ের সব ভাল। কিন্তু এইটে আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

—কোনটা?

—আমাকে তিনি মানুষের মধ্যেই ধরেন না। অথচ সত্যিকারের মালিক আমিই।

—সে পরিচয় তুমি ত কোনদিন দাও নি।

—তার সময় পেলাম কই? ধর, আমার ছেলের অন্ন-প্রাশন, তিনি পুরোহিত ডাকালেন, পাঁজিপুথি দেখলেন, ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করলেন। আমি কিছুই জানলাম না।

—তুমি তখনও ত ঘুম থেকে ওঠ নি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে, পুরোহিতকে পাওয়া যেত না। অনুযোগ করতে পারি বরং আমি।

—কি করে?

—আমি জেগেই ছিলাম, বাড়ীতেই ছিলাম। অথচ কিছুই জানতে পারি নি। জানতে পারলাম সারদার কাছে, সন্ধ্যেবেলায়। মা আমাকে ডাকবার প্রয়োজনই মনে করেন নি।

মা ও স্ত্রীর মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের টান মায়ের উপরই। বিরক্ত ভাবে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, বাড়ীর বৌ, তোমাকে আবার কি ডাকবেন? কিন্তু আমি বাড়ীর কর্তা, ছেলেমানুষও নই, আমাকে জানান উচিত ছিল। সোমবার কবে?

কথাটা মালতীর ভাল লাগল না। চুপ করে রইল।

বৃন্দাবনচন্দ্র আবার জিগ্যেস করলেন, সোমবার কবে গো?

মালতী সংক্ষেপে উত্তর দিলে, রবিবারের পরদিন।

—তার কি দেরি আছে?

না।

মালতী অন্য কথা ভাবছিল। এই বাড়ীর কর্তা যে বৃন্দাবনচন্দ্র, এ কথা বোধহয় এই প্রথম তার মনে হ'ল। এর আগে কোনদিন এমন কথা তাঁর মুখ থেকে মালতী শোনে নি। অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসী পুত্র চিরদিন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী শক্তিমতী মায়ের নাবালক সন্তান হয়ে থাকাই পছন্দ

করে এসেছেন। আজ প্রথম তাঁর মুখে বিপরীত কথা শোনা গেল।

মালতী সেই কথা ভাবছিল।

বৃন্দাবনচন্দ্র কি ভাবছিলেন? মায়ের সর্বগ্রাসী প্রভুত্বের কথা? না কি খোকাবাবুর কথা? উপর্যুপরি কয়েক পাত্র মদ্যপানের পর ভদ্রলোক একটা হুঙ্কার দিলেন। রাত্রে একটুতেই তাঁর মেজাজ গরম হয়।

হুঙ্কার দিলেন মায়ের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নয়। কারও বিরুদ্ধেই নয়। হুঙ্কার দিলেন খোকাবাবুকে আনবার জন্যে।

মালতী যেন আকাশ থেকে পড়ল: এই রাত্রে? এখানে?

—হ্যাঁ, এখানে। এখুনি। যাও।

মালতীর সমস্ত দেহ মুহূর্তমধ্যে যেন বজ্রের মত শক্ত হয়ে উঠল। দুই চোখে বিদ্যুতের দীপ্তি।

বললে, না।

—যাবে না?

—না।

—তবে আমিই যাচ্ছি।

বৃন্দাবনচন্দ্র উঠে দরজার কাছে যাবার আগে মালতী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

তার মুখে একটি মাত্র বাক্য' বারবার আবর্তিত হতে লাগল: না। না। না।

মালতীর এই মূর্তি বৃন্দাবনচন্দ্র কখনও দেখে নি। অন্যদিন হ'লে কি হ'ত বলা যায় না। হয়ত চাবুকের পর চাবুকে মালতীর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত। আজ ভদ্রলোক কি রকম থমকে গেলেন। চাবুকটা কাছেই ছিল, কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াতে ভুলে গেলেন। দু'টি হাত একবার মুষ্টিবদ্ধ হল বটে, কিন্তু তা মালতীর মুখের ওপর সজোরে গিয়ে পড়ল না।

মুহূর্ত কয়েক স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে শুধু বললেন, তাকে আনতে দেবে না?

কিন্তু কণ্ঠে যেন জোর নেই।

মালতী বললে, না।

—বেশ, তাকে আনব না। শুধু ওঘরে গিয়ে একবার দেখে আসব।

—না।

—তাও না?

—না।

পানারক্ত দুই চোখের তারায় কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে এল: তোমার মতলবটা কি, শুনি? আমার ছেলেকে আমার কাছে আসতে দেবে না?

নিষ্কম্পকণ্ঠে মালতী বললে, তুমি যদি তাই মনে কর তো, তাই।

—তাই মনে করি তো, তাই?

বৃন্দাবনচন্দ্র চাবুকের দিকে হাত বাড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারার মত চাবুক পড়তে লাগল মালতীর সর্বাঙ্গে।

শব্দ ওঠে শুধু চাবুকের। মালতী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মার খায়। হঠাৎ তার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। তার পরেই তার অচৈতন্য দেহ কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

বৃন্দাবনচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করলেন। তারপরে হাতের চাবুকটা ফেলে দিয়ে মালতীর অচৈতন্য দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে লাগলেন।

যেদিনই মারেন, সেদিনই এই রকম করেন। এইটেই বাঁধা রীতি। কিছুক্ষণ পরে মালতীর জ্ঞান ফিরে আসে। ধীরে ধীরে সে চোখ মেলে চায়। বৃন্দাবনচন্দ্র তাকে আদর করেন।

সেই রুটিনের আদরের ব্যতিক্রম হ'ল না।

বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও। খোকাবাবুর ঘরে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে দিচ্ছ না কেন?

মালতী উত্তর দিলে না।

মালতীর ভয় ছিল। পাশের ঘরে খোকবাবুকে নিয়ে সারদা দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার ওপর হুকুম আছে বৃন্দাবনচন্দ্র দরজায় ধাক্কা দিলেও যেন খুলে না দেয়। কিন্তু সে দাসীমাত্র। মনিব দরজায় ধাক্কা দিলে খুলে না দিয়ে সে কতক্ষণ থাকতে পারে? সুতরাং সতর্ক ব্যবস্থার পরেও তার মনে ভয় ছিল।

বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, চল, তোমাকে ধরে ধরে ও-ঘরে দিয়ে আসি।

দুর্বল কণ্ঠে মালতী বললে, না। আর একটুক্ষণ থাকি।

—উঠতে পারবে না?

মালতী জবাব দিলে না।

বৃন্দাবনচন্দ্র বললেন, রাগের মাথায়, নেশার ঝোঁকে মারি। তুমি বাধা দাও না কেন?

মালতী শুধু একটু হাসলে। জবাব দিলে না।

মালতীর রক্তহীন শ্রান্ত মুখের এই হাসি বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাল লাগল না। মুগ্ধনেত্রে সেই মুখের দিকে তিনি চেয়ে রইলেন।

তিনটে বছর মালতীর এইভাবে কেটেছে।

একদিকে পশুর মত হিংস্র মাতাল স্বামী, অন্যদিকে কূটবুদ্ধি শাশুড়ী। কি করে এই দুইয়ের হাত থেকে ছেলেকে সে আড়াল করে রেখেছিল, রাখতে পেরেছিল, সে একটা বিস্ময়ের বিষয়।

খোকাবাবু যতদিন হাঁটতে শেখে নি, ঝামেলা ততদিন বেশী ছিল না। ঘুমুচ্ছে। ওঁরাও বুঝতেন, ঘুমুচ্ছে। কিন্তু যখন হাঁটতে শিখলে, তখন আর ঘুমুচ্ছে বলে তাকে ঢেকে রাখা গেল না।

বৃন্দাবনচন্দ্রকে নিয়ে ততটা অসুবিধা হ'ল না। মালতীরই পরোক্ষ উৎসাহে বৃন্দাবনচন্দ্র আবার বাগান-বাড়ীর কাপ্তেনিতে ঝুঁকে পড়েছেন। এবার আর রাত্রে ফিরতেন না। সমস্ত রাত্রি বাগান-বাড়ীতে কাটিয়ে পরদিন একটু বেলা হ'লে ফিরতেন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতেন, নিদ্রাতেই কেটে যেত। সুতরাং খোকাবাবুর সঙ্গে বড় একটা দেখা হ'ত না। চিন্তা হ'ত, গিন্নীমাকে নিয়ে। তিনি জেদ করতেন না। খোকাবাবুকে ডাকতেন না। কিন্তু ঠাকুমাদের মুখে একটা কিছু আছে, যাতে নাতিরা সহজেই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সকালটা গিন্নীমার মন্দিরেই কাটত ঠাকুরের পরিচর্যায়। কি যে হ'ত মালতী বুঝতে পারত না, কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই খোকাবাবু মন্দিরে গিয়ে হাজির হ'ত। গিন্নীমা ব্যস্ত হ'তেন পাছে অপরিচ্ছন্ন হাতে খোকাবাবু পুজোর জিনিষ-পত্র নষ্ট করে দেয়। সারদা ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। কখনও কখনও দেবতার পরিচর্যায় কাজ শেষ হ'লে গিন্নীমা চুপিচুপি খোকাকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে আসতেন। দূর থেকে দেখে মালতী ছটফট করত। সারদাকে পাঠিয়ে দিত গিন্নীমার কাছে। গিন্নীমার কাছ থেকে খোকাকে নিয়ে আসবার জন্যে।

কেন? না দুধ খাওয়াতে হবে।

মালতীর চালাকি গিন্নীমার বুঝতে বাকি থাকত না।

প্রকাশ্যে হেসে বলতেন, এত বেলা পর্যন্ত কিছু খাওয়াস নি ওকে?

সারদাও চালাক মেয়ে। হেসে উত্তর দিত, ওকে দুধ খাওয়ানো কি সোজা কথা! দু'ঝিনুক দুধ খাওয়াতে আমরা দু'জনে হিমসিম খেয়ে যাই।

গিন্নীমার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ছিল, সারদা সেদিকে চাইতে সাহস করত না। খোকাকে কোলে করে ছুটে এ মহলে চলে আসত।

মালতীকে এসে বলত, গিন্নীমা কিন্তু সব বুঝতে পারছেন, বৌরাণী।

মালতী সভয়ে জিগ্যেস করত, কেন, কিছু বলছিলেন নাকি?

—তিনি কি মুখে বলবার লোক? তাঁর মনের কথা মনেই থাকে।

ইদানীং মালতীও কি রকম যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল। গিন্নীমা বুঝতে পারলেন ত পারলেন। কি আর করা যাবে? জীবনে তার একটিই কর্তব্য। সে হচ্ছে, মাতা-পুত্রের ছোঁয়াচ থেকে খোকাবাবুকে দূরে রাখা। সে যেন জীবনে সহজ হ'তে পারে, সুন্দর হ'তে পারে।

খোকাবাবুকে নিজের মহলে আটকে রাখবার জন্যে যত রকম কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব, মালতী তার ত্রুটি রাখল না। কত রকমের খেলনা এল, কত রকমের গাড়ি, কত রকমের ছবির বই। সকালে-বিকালে সারদা তাকে নিয়ে বাগানে ঘুরত। দুপুরে খোকাবাবু ঘুম থেকে উঠলে, ছবির বই নিয়ে খেলা। নানা রকমের খেলা নিয়ে মালতী ও সারদা নিজেরাও ব্যস্ত থাকত, খোকাবাবুকেও ব্যস্ত রাখত।

কিন্তু তারও ফাঁকে খোকাবাবু সুযোগ পেলেই ঠাকুমার কাছে পালিয়ে যেত। ঠাকুমাকে তার ভাল লাগত।

বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছে সে বড় একটা ভিড়ত না। প্রথমতঃ নিদ্রিত মানুষের কাছে ছোট ছেলেমেয়েরা সহজে বড় একটা ভেড়ে না। তার ওপর বৃন্দাবনচন্দ্রের মুখে

বোধ হয় একটা কিছু ছাপ ছিল, যা দেখে খোকাবাবু ভয়ে পালিয়ে যেত। মাঝে মাঝে সুস্থ অবস্থায় বৃন্দাবনচন্দ্র অনুযোগ করতেন, খোকা আমাকে দেখলেই ভয় পায়।

মালতী হেসে বলত, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছ, দেখছি।

সর্বনাশ! বৃন্দাবনচন্দ্রও দেখছেন! চব্বিশ ঘণ্টা মদের সমুদ্রে ডুবে থেকেও দেখার সময় পাচ্ছেন তিনি!

মালতী হেসে জবাব দিলে, এ বাড়ীতে পুরুষ মানুষের একটিই ত যাবার পথ। আর যাবে কোন্ পথে?

—কি সে পথ?

—যে পথে তুমি চলেছ।

বৃন্দাবনচন্দ্র গুম হয়ে গেলেন। বললেন, আমার বাবা এ পথের পথিক ছিলেন না।

—তুমি এলে কেন?

—ঘটনাচক্রে।

বৃন্দাবনচন্দ্র কি যেন ভাবতে লাগলেন।

মালতী বললে, একটা কথা ভাবতে আমার খুব অবাক্ লাগে।

—কি কথা?

—যার মা এত শক্ত, সে বেগড়ায় কি করে?

বৃন্দাবনচন্দ্র হাসলেন: অবাক্ হবারই কথা। মা কখনও আমাকে বাধা দেন নি।

মালতী অবাক্: কখনও বাধা দেন নি!

—না।

—কেন বল ত?

বৃন্দাবনচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন: মায়ের 'কেন'র জবাব তুমি আমার কাছে চাইছ? তাঁর মনের কথা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানে?

মালতী ভাল করে বসল। বললে, তার মানে তিনি চয়েছিলেন, তুমি নষ্ট হও?

—তা আমি কি করে বলব, তিনি কি চেয়েছিলেন?

মালতী আপন মনেই বললে, তাঁর বিনা অনুমতিতে বাড়ীতে একটা ঘাস গজায় না।

—তা বলতে পার।

—আর তুমি এই পথে এলে?

—আমার দাদু এই পথের পথিক ছিলেন। খানদানী পথিক বলতে পার।

বৃন্দাবনচন্দ্র সগৌরবে হাসলেন।

— কিন্তু তোমার বাবা ছিলেন না?

—না। তিনি বৈশ্য ছিলেন। দাদু এজন্যে তাঁকে একেবারে পছন্দ করতেন না। আমি আমার দাদুর মত হয়েছি। পায়ের নোখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জমিদার।

মালতী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাবা তোমাকে কখনও বাধা দেন নি?

—তাঁর সময় ছিল কোথায়? জমিদারী আর ব্যবসার খাতা-পত্র দেখতেই তাঁর সকাল থেকে রাত বারোটা কেটে যেত। সুতরাং আমি মানুষ হয়েছিলাম দাদুর কাছে। ততদূরে আমার দশভুজা মায়ের হাতও পৌঁছুত না। তাঁর কৃপায় চোদ্দ বছর বয়েসেই গাঁজা খেতে শিখেছিলাম।

মালতী লাফিয়ে উঠল: বল কি!

—হ্যাঁ। দাদুর একবার অসুখ হয়েছিল। তাঁর খাস চাকর হরি সে সময়ে দেশে। আমাকে তাঁর গাঁজা তৈরী করে দিতে হ'ত। দাদু খেতেন, আর আমার নাকে ধোঁয়া যেত। গাঁজা তৈরী করার উৎসাহ আমার বেড়ে গেল। মৌতাতের সময় হ'লেই আমি নিজেই এসে গাঁজা তৈরী করতে বসে যেতাম। আমার উৎসাহ দেখে, দাদু ওস্তাদ লোক, তাঁর ভয় হ'ল। আমাকে আর গাঁজা তৈরী করতে দিতেন না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মালতী জিগ্যেস করলে, দাদু গাঁজা খেতেন?

বৃন্দাবনচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন: দাদু কি খেতেন না? পৃথিবীতে যত রকমের নেশা আছে, সবই তাঁর করতলগত ছিল। তিনি ছিলেন নেশার বাদশা, আর, মনে রেখ, আমি তাঁর সুযোগ্য পৌত্র।

গুরু-গৌরবে বৃন্দাবনচন্দ্র দমকে দমকে হাসতে লাগলেন।

(সাতাশ)

এই তিনটে বছর রামকিঙ্করের না-সুখে না-দুঃখে কাটল। মাথার ওপর হরেকৃষ্ণ আছে। মাসে মাসে আল-পিনের খোঁচাও দেয়। কিন্তু রামকিঙ্কর বুঝতে পারে,

খোঁচাটা খুব সন্তর্পণে দিচ্ছে। নিজের শক্তির ওপর আস্থা থাকলে কেউ এমন করে খোঁচা দেয় না।

সারদা বলে, ওসব আপনি গ্রাহ্য করবেন না। ও সব হচ্ছে, ভোরবেলাকার কুয়াশা। ভোরবেলাকার কুয়াশা দেখেছেন ত? অন্ধকার করে দেয়। কিন্তু সকাল হ'লে আর থাকে না। আপনারও তাই হবে।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, কি হবে?

—আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—কি করে বুঝলে?

সারদা হেসে বললে, তা বলতে পারি না। আমার যা মনে হয়, তাই বলছি।

রামকিঙ্কর জানে, সারদা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বৌরাণীর কাছে কাছে থেকে সে অনেক কথা জানে এবং আরও অনেক কথা অনুমান করে। সব কথা সে রামকিঙ্করকে বলতে চায় না। সেই কারণে তার উক্তির মধ্যে একটা প্রত্যয় প্রচ্ছন্ন থাকে। রামকিঙ্করও খানিকটা সাহস পায়।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, বড়বাবুর নতুন খবর কি?

সারদা বললে, খবর আমার খুব ভাল বোধ হয় না, রামবাবু।

—কি রকম?

—ঈশান কোণে মেঘ জমছে। হঠাৎ একদিন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

ভিতরের ঘটনা রামকিঙ্কর খুব বেশি জানে না। সারদা সব কথা বলে না। কিছু কিছু আভাস দেয়। তাইতেই তারও মনে সন্দেহ জেগেছে যে, বৌরাণীও সহজ মানুষ নন। সময় এবং সুযোগমত একটা বিপর্যয় কাণ্ড সে বাধিয়ে দিতে পারে। যে মেয়ে চাবুক খেয়ে কাঁদে না, নিঃশব্দে হজম করে, সে সামান্যা মেয়ে নয়।

জিগ্যেস করলে, বৌরাণী কেমন আছেন?

—কি রকম বলব? আছেন একরকম।

—তার মানে ভাল নয়?

—কি জানেন, যেখানে তিনি আর খোকাবাবু, সেখানে তিনি ভালই আছেন। তার বাইরেই যত গণ্ডগোল। গণ্ডগোল ত তিনি এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশিদিন পারবেন বলে মনে হয় না।

—কেন?

—তা জানি না। আমার যা মনে হয়, তাই বলছি।

—গিন্নীমার খবর কি?

—ভালই।

—এখনও সবই ত তাঁর হাতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু এখন আর তেমন আগের মত জোর পান না।

—কেন, বৌরাণী কি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেন?

—মোটেই না। তবু গিন্নীমা কি রকম বুঝেছেন। একটু যেন সাবধানে চলেন।

—বাবু?

সারদা বললে, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। দিনে বাড়ীতে ঘুমুচ্ছেন, রাত্রে বাগানবাড়ীতে হুল্লোড় করছেন।

—আর চাবুক চালান না?

—যেদিন বাগানে যান না, রাত্রে বাড়ী থাকেন, সেদিন চালান বৈকি। তবে রাত্রে বাড়ি খুব কমই থাকেন।

যে বৌরাণীকে গিন্নীমাও এখন মনে মনে ভয় করেন, বাবু এখন তাকে চাবুক মারতে সাহস করেন, এটা রামকিঙ্করের কি রকম লাগল।

জিগ্যেস করলে, বৌরাণী বাধা দেন না?

সারদা বললে, মোটেই না। ঠায় দাঁড়িয়ে মার খান। এক এক দিন মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যান। অথচ বৌরাণী চোখ-রাঙালে বাবু কেঁচো হয়ে যেতে পথ পেতেন না।

—কি ব্যাপার বল ত?

—তা জানি না।

—তোমার কি মনে হয়?

—মনে হয়, পৃথিবীতে কত আশ্চর্য জিনিষই না আছে। খোকাবাবুকে নিয়ে প্রায়ই দু'জনের ঝগড়া বাধে। আমার নিজের চোখে দেখা, দিনের বেলায় এই নিয়ে বাবু একটা বেচাল কথা বলতে গিন্নীমা এক ধমক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবু কেঁচো হয়ে গেলেন। মুখের রা বন্ধ হয়ে গেল। সেই বৌরাণী রাত্রে কেন যে চাবুকের মার বোবার মত সহ্য করেন, ভাবতে অবাক লাগে।

রামকিঙ্করেরও অবাক লাগে। বৌরাণী যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। সেই বৌরাণী পড়ে পড়ে কি করে যে মার খান, সে ভাবতে

পারে না। সারদা ঠিকই বলেছে, পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই না আছে। বৌরাণীর ব্যাপারটাও সেই আশ্চর্যের একটি।

হঠাৎ রামকিঙ্করের ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ল।

জিগ্যেস করলে, ভাল কথা সারদা, সেই ডাক্তারবাবুর খবর কি?

—ভালই।

—বৌরাণীর সঙ্গে দেখা হয়?

—মাঝে মাঝে হয়।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, লোকটি কেমন বল ত?

সারদা হেসে ফেললে। বললে, তা আমি কি করে বলব বলুন?

—একটা মানুষকে কতদিন ধরে কতবার দেখলে। ভাল-মন্দ বলতে পার না?

—না। আপনাকে এতদিন এত কাছাকাছি দেখছি, তাই বলতে পারব না আপনি কেমন লোক।

—পার না? আমার ধারণা ছিল, তুমি খুব লোক চেন।

সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে: খুব ভুল ধারণা। আমি একেবারেই লোক চিনি না। পুরুষ মানুষদের ত আরই চিনি না।

রামকিঙ্কর বুঝলে, সারদা ডাক্তারবাবুর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়।

এই ডাক্তারবাবুটিকে রামকিঙ্করের খুব আশ্চর্য লাগে। তাকে বেশিবার সে দেখে নি। যা দেখেছে, তাতেই তার মনে যথেষ্ট কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।

মালতীর বাপ-মা'র মালতীর সঙ্গে মনোহর ডাক্তারের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছাটা ওদের দুজনের মনেও ছিল। কিন্তু তার বাবার অর্থলিপ্সার জন্যে, সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। মনের দুঃখে ডাক্তার আর বিবাহ করলে না।

একথা শুনে রামকিঙ্করের তরুণ হৃদয় তার ওপর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তার চেহারা এবং আচার-ব্যবহার অন্য রকম। মনটা কেমন যেন আড়ষ্ট। তার মধ্যে যেন কোমলতার চিহ্ন নেই। বিশেষ, কথা বলতে বলতে মনোহর যখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তখন অন্য লোকের কি হয় জানি না, কিন্তু রামকিঙ্কর তার দিকে চাইতে ভয় পায়। তার মনে হয়, মানুষটি যত ভালই হোক, মনোহর ডাক্তারের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

মনোহর ডাক্তার হাসে না। যদি-বা হাসে, বিদ্যুৎ চমকের মত একটুখানি হাসে। হাসিটা রামকিঙ্কর পছন্দ করে না।

মালতীর ব্যাপারে মনোহর আছে কি না, থাকলে কতখানি আছে, জানার আগ্রহ রামকিঙ্করের মনের মধ্যে প্রবল। সাধারণতঃ সারদার সঙ্গে আলোচনায় এই আগ্রহকে সে প্রশ্রয় দেয় না।

একদিন সে পরিষ্কার জিগ্যেসই করে বসল।

সারদা বললে, বৌরাণী ডাক্তারের ডিস্পেনসারীতে বড় একটা যান না। অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারকেই ডেকে পাঠান।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, ডাক কি খুব ঘন ঘন হয়?

সারদা হেসে ফেললে। বললে, এসব জানতে চাইছেন কেন?

থতমত খেয়ে রামকিঙ্কর বললে, বুঝি, জানতে চাওয়া অন্যায়। কিন্তু কি জান, লোকটিকে আমার কেমন ভাল লাগে না।

—কাকে? মনোহর ডাক্তারকে?

—হ্যাঁ।

—কেন বলুন ত?

—কারণ বলতে পারব না। আমার কেমন মনে হয়, মনোহর ডাক্তার বড় বাড়ীর ব্যাপারের মধ্যে এলে, কারোই ভাল হবে না।

সারদা চুপ করে রইল।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, লোকটিকে তোমার ভাল লাগে?

সারদা বললে, ওঁর সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবি নি। যাকগে, ওঁদের কথা ওঁরা ভাববেন, আমাদের কি মাথা ব্যথা বলুন? ভাল হ'লে ওঁদের ভাল—মন্দ হ'লে ওঁদের মন্দ।

তারপর বললে, বৌরাণী সেদিন আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।

—আমার কথা? কি জিগ্যেস করছিলেন?

—আপনার খবর কি, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় কি না, এইসব কথা।

সারদা হাসলে।

রামকিঙ্করও হেসেই জিগ্যেস করলে, তুমি কি বললে?

—বললাম, আপনার সঙ্গে আর কি করে দেখা হবে?

—বৌরাণী কি বললেন?

—কিছু বলল না। শুধু একটু হাসলেন?

—তার মানে কথাটা তিনি বিশ্বাস করলেন না, না?

সারদা হেসে বললে বোধ হয়। শয়তানীতে বৌরাণীও গিন্নীমার চেয়ে কম যাবেন না, দেখে নেবেন।

বললে, আপনার কথা এখনও তিনি ভোলেন নি।

—তার থেকে তোমার কি মনে হয়?

—মনে হয়, আপনাকে তাঁর দরকার হ'তে পারে।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে ত আমার দেখা হয় না।

—.সটা কি তিনি বিশ্বাস করলেন, ভেবেছেন?

রামকিঙ্কর বললে,আমাকে তাঁর কি দরকার হ'তে পারে, ভেবে পাই না।

সারদা হেসে বললে, ভাববার দরকার কি? যদি তাঁর প্রয়োজন হয়, তখনই জানতে পারবেন।

সারদা হাসতে লাগল।

দোকানে ফিরে রামকিঙ্কর দেখলে সবারই মুখে একটা ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাব।

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে গেল। আবার অঘটন কিছু ঘটল নাকি?

সুবলকে চুপি চুপি জিগ্যেস করলে, তোমরা অমন করে আছ কেন? কি ব্যাপার?

সুবল বললে, জান না? কোথায় ছিলে তুমি?

—একটু বেরিয়েছিলাম। কি হয়েছে?

খুব চুপি চুপি সুবল বললে, সর্বনাশ হয়েছে!

রামকিঙ্করের বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। এখানে সর্বনাশ হ'লে তারই হবে।

বললে, কি সর্বনাশ?

—হরেকেষ্টর ওপর মায়ের দয়া হয়েছে।

মনের অবস্থাটা তখন রামকিঙ্করের এমনই যে, কথাটার মানে বুঝতে পারছে না।

জিগ্যেস করলে, কোন্ মা? কার মা?

সুবল বললে, কোন্ মা আবার কি? মায়ের দয়া জান না?

এতক্ষণে রামকিঙ্কর ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। কাল রাত্রে হরেকৃষ্ণর জর হয়েছিল। সকালেও ছিল। বিকেলে যখন সে বেরোয়, জরটা তখন প্রায় ছেড়েই গিয়েছিল। তারপরে বোধ হয় বসন্তের গুটি বেরিয়েছে।

সুবল বললে, একেবারে আসল জিনিষ। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গ ভরে গেছে। কি করা যায় বল ত?

—বাবুদের বাড়ীতে খবর দিয়েছ?

—দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বললেন, হাসপাতালে পাঠাতে।

—বেশ ত।

—তুমি ত 'বেশ ত' বলে খালাস। কিন্তু যে যাবে, সে ত কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে।

—হাসপাতালে যাবে না?

—মরে গেলেও না। বলছে, আমাকে তোমরা বাড়ী নিয়ে চল। যা হবার, সেইখানেই হবে।

রামকিঙ্কর চিন্তিতভাবে বললে, ট্রেণে কি নিয়ে যাওয়া যাবে?'

—কঠিন। তুমি একবার দেখ না চেষ্টা করে। যদি হাসপাতালে যেতে রাজি হয়।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আমি চেষ্টা করব! আমাকে দেখলেই ত যন্ত্রণা আরও বেড়ে যাবে।

সুবল বললে, কি জানি। কিন্তু তোমাকেই বারে বারে খুঁজছে।

রামকিঙ্কর বিস্মিতভাবে বললে, আমাকে! কি আশ্চর্য! চল, দেখি গে।

উপরে দুখানি ঘর। একখানিতে হরেকৃষ্ণ একা থাকে, অন্যখানিতে এরা সবাই। সেদিক দিয়ে এরা অনেকটা নিরাপদে আছে। সংক্রমণের আশঙ্কা কম।

হরেকৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল। এখনও যথেষ্ট গুটি বেরোয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে মুখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

রামকিঙ্করকে দেখে হরেকৃষ্ণ হাউমাউ করে উঠল। বললে, বাবা, আমাকে বাঁচাও।

রামকিঙ্কর বললে, ভয়ের কিছু নেই। মায়ের দয়া ত

হামেশা হচ্ছে, সেরেও যাচ্ছে। আপনি হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেন না কেন?

ব্যাকুলভাবে হরেকৃষ্ণ বললে, না বাবা, ওখানে নয়। আমাকে তোমরা বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রামকিঙ্কর বললে, আপনার মুখে যে রকম বেরিয়েছে, তাতে ট্রেণে কি যেতে দেবে?

হরেকৃষ্ণ অম্লানবদনে বললে, দেবে। গোটা পাঁচেক টাকা দিলেই দেবে। এমন আকছার যাচ্ছে। তবে ওদের দিয়ে হবে না, তুমি যদি বাবা দয়া করে নিয়ে যাও।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, ওরাও পারবে।

—না বাবা। ওদের ওপরে আমার ভরসা নেই। বেগতিক বুঝলে আমাকে একা ট্রেণে ফেলে রেখে পালাবে। তোমার ওপর আমার ভরসা আছে।

সবাই অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণর কথা শুনছিল। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে তার শত্রুতা নেই, তবু তাদের ওপর সে ভরসা করতে পারছে না। তার ভরসা রামকিঙ্করের ওপর, যাকে সে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে! পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে!

রামকিঙ্কর বললে, বাবুদের ত একবার জানাতে হবে?

হরেকৃষ্ণ বললে, কিচ্ছু করতে হবে না, বাবা। আর কি আমি ফিরব ভেবেছ? এখন ক'টা?

একজন ঘড়ি দেখে বললে, সাড়ে সাতটা।

হরেকৃষ্ণ বললে, তবে আর কি, বাবা? রাত ন'টায় একটা ট্রেণ আছে। আমাদের লাইনে রাত্রের এই গাড়িটাতে ভীড়ও তেমন হয় না। নিরিবিলি ঢাকা ঢুকি দিয়ে দিব্যি যাওয়া যাবে।

—কিন্তু খবর ত দেওয়া নেই। ষ্টেশন থেকে বাড়ি যাবেন কি করে?

—হেঁটে, হেঁটে। গাঁয়ের ষ্টেশনে নামলে, দেখবে আমি অর্দ্ধেক ভাল হয়ে গেছি। গাঁয়ের মাটির এমনি গুণ।

উৎসাহে হরেকৃষ্ণ বিছানায় উঠে বসে পড়েছে।

সবাই রামকিঙ্করকে বললে, তাই নিয়ে যাও। এখানে থাকলে ভয়ে আর দুশ্চিন্তাতেই ও মারা যাবে।

রামকিঙ্কর রাজি হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বিশ্ব-সাহিত্য

গায়োভান্নি বোক্কাসিও

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[ইটালীয় কথাসাহিত্যের জনক রূপে পরিচিত গায়োভান্নি বোক্কাসিও ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "দি ডেকামেরন" ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়। এই গ্রন্থটি উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। গল্পগুলিতে যে-সকল প্রণয়লীলা বর্ণিত আছে তাহার মধ্যে কতকগুলি অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হ'লেও, মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি প্রদর্শনে ও স্থানকাল-পাত্রের নিখুঁত বর্ণনায় বোক্কাসিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ সেই সময়ের ইউরোপব্যাপী মহামারী প্লেগের যে-সকল জীবন্ত চিত্র তিনি লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্যও অসামান্য। তাঁর "দি ডেকামেরন" থেকে পরবর্তী যুগে বহু শ্রেষ্ঠ লেখক রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। 'ডেকামেরন' শব্দটির অর্থ "দশ দিনের প্রমোদ-উৎসব।" সুতরাং গ্রন্থখানি স্ত্রী-পুরুষের প্রমোদলীলায় ভরপুর। তৎকালীন নর-নারীর প্রণয়-রুচি যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ ধ'রে চলত তাতে ধর্মাধর্মবোধের বিশেষ কোন বালাই ছিল না। সুতরাং তরুণ-মহলে এই গ্রন্থটির আদর ছিল সর্বাধিক। গল্পগুলির মধ্যে যে দুই-চারিটিতে সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে 'গ্রাজেলডার' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। 'দি ডেকামেরনে'র সূচনাটি অতি চমৎকার। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্লেগের তাড়নায় ফ্লোরেন্স সহর বিপর্যস্ত, প্রত্যহ হাজার হাজার লোক মৃত্যুর করাল কবলে নিক্ষিপ্ত, সেই সময়ে সাতটি সুন্দরী তরুণী রোগের ভয়ে এক পরিত্যক্ত গির্জায় এসে আশ্রয় লয়। গির্জা ছেড়ে তখন পাদরীর দলও পালিয়েছে, অন্য কোন লোক সেখানে নেই। তরুণীরা প্রথমে সেই প্রকাণ্ড নির্জন পরিত্যক্ত গির্জায় এসে খুবই ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু তারা যাবেই বা কোথায়? শহরে তখন প্লেগের দারুণ প্রকোপ। এই সব ভেবে তাদের যেন কান্না এল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তারা দেখতে পেলে তিনজন সুন্দর তরুণ একই কারণে প্লেগের ভয়ে সেই গির্জায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এবার তারা একটু সাহস পেল। সব নিয়ে তাদের সংখ্যা হ'ল দশ জন। তার পর সকলে মিলে পরামর্শ করল যে, সে-গির্জায় কতদিন আর তারা থাকতে পারে? ফ্লোরেন্স ছেড়ে অন্যত্র পালানই ভাল। তখন তারা তাড়াতাড়ি শহর থেকে দূরে এক নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় এক পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীতে গিয়ে থাকবার সঙ্কল্প করল।

পাহাড়ের বাগানবাড়ীতে গিয়ে তারা প্লেগের ভয় থেকে অনেকটা মুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু সেখানে কতদিন থাকতে হবে কে জানে? তাই তাদের মধ্যে স্থির হ'ল, সময় কাটানোর জন্য পালা ক'রে তারা প্রত্যেকে এক একটি চমৎকার প্রণয়লীলার গল্প বলবে। গল্প যেন সরস ও তরুণ মনের উপযোগী হয়। যেমন কথা, তেমনি কাজ—গল্প আরম্ভ হ'ল। সারাদিনের হৈ-হুল্লোড়, নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের পটভূমিতে তরুণ-তরুণীদের গল্পগুলি জমে উঠল ভাল।

এই গল্পগুলি নিয়েই "দি ডেকামেরনে"র সৃষ্টি। তারই একটি সুন্দর গল্প "গ্রীজেলডা"।]

গ্রীজেলডা

মার্কুইস্ অব্ সালুজ্জো বেরিয়েছিলেন শিকারে।

বনে-জঙ্গলে নানা পশুপাখী শিকার করে ফেরবার সময়ে তিনি বিশ্রাম করছিলেন মাঠের মধ্যে এক কুয়ার পাশে।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটি যুবতী মেয়ে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এসেছে।

মেয়েটি যে নিকটবর্তী চাষীদের বাড়ীর মেয়ে, সেটা তার সাদাসিদে সাজপোষাকে বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু রূপ?

মার্কুইসের মনে হ'ল, এমন রূপ তিনি আর কোথাও দেখেন নি। তা ছাড়া তার সারা দেহে যৌবন যেন উথলে পড়ছে।

মুগ্ধ হ'লেন মার্কুইস। মেয়েটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এই গাঁয়ের মেয়ে? কি নাম তোমার?"

"গ্রীজেল্ডা"—মেয়েটি সলজ্জ স্বরে উত্তর দিলে।

"তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?"

মেয়েটি আর কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চল্ল। মার্কুইসও তার পিছনে পিছনে চললেন।

গ্রীজেল্ডার বাপ-মাকে বিয়ের কথা বলতেই তারা সহজেই রাজী হয়ে গেল। মেয়েটার যে এমন ভাগ্য হবে কে জানত? আর গ্রীজেলডারও মনে আনন্দ আর ধরে না।

বিয়ের ঠিক আগে খেয়ালী মার্কুইস গ্রীজেল্ডাকে বললেন—"দেখ গ্রীজেলডা, তোমাকে আমার কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

"কি প্রতিজ্ঞা প্রিয়তম?"

"তুমি প্রতিজ্ঞা কর,—আমি যখন যা বলব, তুমি বিনা প্রতিবাদে তা করবে।"

"বেশ, আমি এই প্রতিজ্ঞাই করছি।"

এবার মার্কুইস্ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রীজেলডাকে বিয়ে করলেন। তার পর নিজের জমিদারীতে মহা সমারোহে তাকে নিয়ে গেলেন।

মার্কুইসের প্রাসাদ ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে গ্রীজেলডার বিস্ময় খুবই বেড়ে উঠল। সামান্য এক পল্লীর চাষার মেয়ে সে। ভাল খেতে-পরতে পেত না, এখন সে এই প্রাসাদের কর্ত্রী হয়েছে। এ রকম সৌভাগ্য যে কখনও তার হ'তে পারে, এ কথা স্বপ্নেও সে ভাবে নি। এখন এত গয়নাগাটি, কাপড়-চোপড়, দাসদাসী দেখে সে অবাক হয়ে মার্কুইসের দিকে চেয়ে রইল। মার্কুইসও সর্বপ্রকারে তার মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমনি ক'রে বছর ঘুরে গেল।

কিছুদিন পরে গ্রীজেলডার একটি মেয়ে হ'ল। মেয়ে নয়ত যেন ছোট্ট পরী। সবাই খুসী মেয়েটিকে দেখে। প্রজাদের মধ্যে উৎসব চলল কয়েক দিন ধ'রে। গ্রীজেলডা এক মুহূর্তও মেয়েটিকে চোখের আড়াল করে না। কত সুখী হয়েছে সে এবার।

এবার মার্কুইস গ্রীজেলডার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন—"তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে ত গ্রীজেলডা?"

গ্রীজেলডাও হাসিমুখে উত্তর দিলে,—"হ্যাঁ প্রিয়তম, বিয়ের আগে আমার সে প্রতিজ্ঞার কথা আমি ভুলি নি।"

মার্কুইস আর কোন কথা না ব'লে চ'লে গেলেন। একটু পরে তিনি পাঠিয়ে দিলেন গ্রীজেলডার কাছে এক অনুচরকে। অনুচর এসে গ্রীজেলডার সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াল।

"কি চাই তোমার?" আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল গ্রীজেলডা।"

অনুচর বললে—"আমাদের মহামহিম প্রভু মার্কুইস আদেশ দিয়েছেন, আপনার কোল থেকে আপনার ঐ শিশুকন্যাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে। আপনি আমাকে আপনার ঐ কন্যাটিকে দিন।"

মুহূর্তমাত্র গ্রীজেলডা যেন শিউরে উঠল। তার পর কন্যাকে বুকে চেপে ধরে শেষবার তার মুখচুম্বন করে নীরবে বিনা প্রতিবাদে তাকে সমর্পণ করলে অনুচরের হাতে।

তার পর মার্কুইসের সঙ্গে দেখা হ'ল গ্রীজেলডার। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপন করল না। নিত্যকারের কাজকর্ম আগে যেমন চলছিল, এখনও তেমনি চলতে লাগল। অশ্রুহীন চোখে গ্রীজেলডা আগের মতই স্বামীসেবা করতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্যেও মেয়ের কথা উত্থাপন করলেন না।

এমনি আরও এক বছর কেটে গেল। এবার

গ্রীজেলডার হ'ল একটি ছেলে। ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে গ্রীজেলডা মেয়ের শোক ভুলতে চাইল। কিন্তু এবারও মার্কুইস অনুচরকে পাঠালেন গ্রীজেলডার কাছে।

অনুচর এসে তার সামনে দাঁড়াতেই গ্রীজেলডার বুক কেঁপে উঠল। অনুচর বললে—"আমাদের মহামহিম প্রভু মার্কুইস আদেশ করেছেন আপনার এই ছেলেটিকে আপনার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে। আপনি আপনার ছেলেকে আমার হাতে দিন।

গ্রীজেলডা স্তম্ভিত হ'য়ে অনুচরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তাকে রাখতেই হবে। তাই, নীরবে অশ্রুসিক্ত নয়নে সে তার ছেলেটিকে তুলে দিলে অনুচরের হাতে।

আবার সেই শুষ্ক দাম্পত্যজীবন। কেউ ও-বিষয়ে কোন কথা তোলে না, কোন অভিযোগ করে না, শুধু গতানুগতিক ভাবেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করে।

এবার হঠাৎ একদিন মার্কুইস এসে গ্রীজেলডাকে বল্লেন—"দেখ গ্রীজেলডা, তোমাকে আমার আর ভাল লাগছে না, আমি ভাবছি আর একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করব।"

গ্রীজেলডা মার্কুইসের এ কথা শুনে অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইল। এত দিন দাম্পত্য জীবন যাপন ক'রে, এখন এ কি কথা স্বামীর মুখে। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞামত গ্রীজেলডা মার্কুইসের কথার কোন প্রতিবাদ বা আলোচনা করল না।

মার্কুইস বললেন "একটা কথা মনে রেখ গ্রীজেলডা, তুমি চাষার মেয়ে। তোমার বংশ নিয়ে প্রজারা অনেকে অনেক কথা বলে। তাদের সে সব কথা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তাই তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি এবার একটি সদ্‌বংশজাতা ভাল রূপসী মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। পাত্রী আমার ঠিক করাই আছে। তবে তুমি আজই তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও। আর আসবার দরকার নেই। আমি আমার নূতন স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দেই থাকব। এতকাল আমি তোমাকে যে ভালবাসা দেখিয়েছি সেটা আমার মুখের ভালবাসা, অন্তরের ভালবাসা নয়। এবার আমার অন্তরের ভালবাসা দোব আমার নূতন স্ত্রীকে।"

গ্রীজেলডা চুপ ক'রে স্বামীর সব কথা শুনলে। তার পর ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরে গেল। সেখানে তার শরীরের সমস্ত অলঙ্কার খুলে রেখে দিয়ে সামান্য পোষাক প'রে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

যথাসময়ে মার্কুইসের গাড়ি তাকে তার বাপের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এল।

গ্রীজেলডা বাপের বাড়ী থেকেই শুনলে যে মার্কুইসের প্রকাণ্ড প্রাসাদ নূতন ক'রে সাজান হচ্ছে। কত লোক-জন দিন-রাত্তির খাটছে আসন্ন বিবাহোৎসবের আয়োজনে। এ সব কথা শুনে গ্রীজেলডার চোখে জল এল। কিন্তু স্বামীর আদেশের কথা ভেবে কোন রকমে মনকে শান্ত ক'রে রাখলে।

এদিকে অনেক কথাই কানে আসতে লাগল গ্রীজেলডার। বিয়ের আর ক' দিনই বা বাকি! হঠাৎ মার্কুইসের কাছ থেকে লোক এসে তাকে জানাল যে, বিবাহের সময় প্রাসাদে গ্রীজেলডার থাকা চাই,—এই আদেশ মার্কুইস পাঠিয়েছেন।

স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য করা যায় না। মনের গভীর বেদনা চেপে রেখে গ্রীজেলডা আবার ফিরে গেল মার্কুইসের প্রাসাদে। সজ্জায় আলোকে প্রাসাদ যেন ঝলমল করছে। গ্রীজেলডা সব দেখে শুধু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। লোকজনের ভিড়ে সে যেন উপেক্ষিত হয়ে রয়ে গেল।

এবার মার্কুইস এসে গ্রীজেলডার সামনে দাঁড়ালেন। উপেক্ষার ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি যে এসে গেছ, সে খবর একটু আগে পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে সব কথা বলা হয় নি। আমার নূতন কি আদেশ জান?"

গ্রীজেলডা শুধু ঘাড় নেড়ে বললে—"কি আদেশ বলুন?"

মার্কুইস বললেন—"আমার আদেশ, তুমি সর্বদা আমার আদরের নূতন স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে। এমন কি রাত্রিকালে আমাদের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমাদের আদেশের প্রতীক্ষা করবে। আমার নূতন স্ত্রীকে সাজিয়ে দেবে, তার জন্যে আপন হাতে খাদ্য রন্ধন ক'রে দেবে আর তাকে গান শোনাবে।"

গ্রীজেলডা ঘাড় নেড়ে বিনীতভাবে বললে—"আপনার আদেশ আমার মনে থাকবে।"

মার্কুইস আনন্দের হাসি হেসে গ্রীজেলডার কাছ থেকে সরে গেলেন।

বিয়ের নির্দিষ্ট দিন এল। সকাল থেকে প্রাসাদে খুব আনন্দের হট্টগোল উঠল। নানা স্থান থেকে নিমন্ত্রিতের দল আসতে লাগল। গ্রীজেলডার ওপর

ভার পড়ল সেই সব অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার। সে হাসি মুখে সব কাজ ক'রে যেতে লাগল। স্বামীর আদেশ, তাই মনের দুঃখ চেপে রেখে সে সব কিছু তদারক ক'রে উৎসবের কোন ত্রুটী যাতে না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে লাগল। প্রাসাদের অনেকেই কিন্তু গ্রীজেলডার দুঃখ অনুভব করে সহানুভূতি দেখাতে গেল। কিন্তু সেসব কথায় কান না দিয়ে হাসিমুখে বললে—"আমার স্বামী যাতে সুখী হন, আমার ত সেইটাই আগে ভেবে দেখা উচিত। শুধু আমার নিজের সুখ নিয়ে থাকলে ত চলবে না।"

গ্রীজেলডা কিন্তু নিজে কোন রকম সাজ-সজ্জা করে নি। সাদাসিদে পোষাক পরে নিরাভরণা হয়ে সে খুব পরিশ্রম করতে লাগল। এদিকে মার্কুইস তাঁর দলবল নিয়ে নববধূকে আনতে গেলেন।

ভোজসভা সাজান হয়েছে। মধুর বাদ্যধ্বনি উঠছে। প্রাসাদের সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে, কখন মার্কুইস নববধূকে নিয়ে আসবেন। গ্রীজেলডার ওপর ভার পড়েছে মধুচন্দ্রিকা-যাপনের ঘরটি সাজানোর। সে লতাপাতা-ফুল দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখল ঘরটি।

একটু পরেই চারদিকে আনন্দ কোলাহল উঠল। মার্কুইস নববধূ নিয়ে ফিরে আসছেন। তোরণে বাদ্য-ধ্বনি সজোরে বেজে উঠল। চমৎকার সাজানো গাড়ি থেকে মার্কুইস নামলেন নববধূর হাত ধ'রে। নববধূর সঙ্গে তার ভাইও এসেছে। গ্রীজেলডা নববধূকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বয়সের এত পার্থক্য ত বড় একটা দেখা যায় না। নববধূর বয়স পনেরো-ষোলর বেশি হবে না। তার ভাইটিরও বয়স কম। মার্কুইসের বয়স অনুসারে এ বিয়ে যে অসম্ভব রকমের বেমানান হয়েছে। কিন্তু মার্কুইসের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার সাধ্য কারুর নেই। তাই সকলে মুখ বুজে নব-বধূকে সাদর সম্ভাষণ জানালে।

মার্কুইস এবার গ্রীজেলডাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"কেমন দেখলে বল?"

গ্রীজেলডা বললে—"আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনদিন প্রতিবাদ করব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। তবে, আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে, আপনি এই অল্পবয়সী নববধূর প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহার করবেন। ও যাতে সুখী হয় সেই চেষ্টা করবেন, আমার মত দুঃখের সাগরে ওকে ফেলবেন না।"

মার্কুইস বললেন—"তুমি আর আমি—আমরা দু'জনে মিলে ও যাতে সুখী হয় সে চেষ্টা চিরদিনই করব। বেশ, আমি এখানেই নববধূকে ডেকে আনছি। সে যাতে তোমাকে ভাল চোখে দেখে সে কথা তাকে স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।"—এই ব'লে মার্কুইস সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, গ্রীজেলডা একাকিনী সেই ঘরে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবতে লাগল।

একটু পরেই মার্কুইস নববধূকে নিয়ে ফিরে এলেন। নববধূ কিন্তু একা আসে নি। সঙ্গে তার সেই ভাইটিও এল। অন্য সকলকে দূরে থাকতে আদেশ করলেন মার্কুইস।

ঘরের মধ্যে গ্রীজেলডা তখনও দাঁড়িয়ে। নববধূ নূতন সজ্জা নূতন অলঙ্কারে যেন ঝলমল করছে। মুখখানি তার ফোটা ফুলের মত সুন্দর। মুখের মৃদু হাসিটি কত মধুর। গ্রীজেলডার চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

মার্কুইস এবার নববধূর দিকে তাকিয়ে মৃদুহাস্যে বললেন—"বাছা, তুমি এবার এর কোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।"

বাছা!—কথাটা শুনে ভয়ানক চমকে উঠল গ্রীজেলডা।

মার্কুইস এবার নববধূর ভাইটির দিকে ফিরে বললেন—"তুমিও যাও এঁর কোলের কাছে।"

মেয়েটি আর ছেলেটি এগিয়ে এল গ্রীজেলডার কোলের কাছে। গ্রীজেলডা ত অবাক্। তার চোখ বেয়ে তখন অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে।

এবার মার্কুইস গ্রীজেলডার কাছে এসে তার হাত দু'টি ধ'রে পরম আদরে তাকে শয্যায় বসিয়ে বললেন—"তুমিই জিতে গেলে গ্রীজেলডা, তুমিই জিতে গেলে। তোমার কাছে আমারই হার হয়েছে। এ মেয়েটি তোমারই সেই হারানো মেয়ে, এ ছেলেটি তোমারই সেই হারানো ছেলে। আমি কি এতই নিষ্ঠুর যে নিজের ছেলে-মেয়েকে হত্যা করব? আমি শুধু এতদিন তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। হ্যাঁ, কঠোরতম পরীক্ষা। আমার ধারণা ছিল নারীজাতির পতিভক্তি শুধু একটা আপোষের ব্যাপার, একটা কাজ আদায়ের ছলনা মাত্র। স্বার্থের সঙ্গে শুধু তাদের সম্পর্ক। যতক্ষণ না স্বার্থে আঘাত লাগে ততক্ষণ তারা সহিষ্ণুতার ভান করে। কিন্তু তুমি দেখিয়েছ প্রকৃত পতিভক্তি কাকে বলে। তোমার সহিষ্ণুতা জগতের আদর্শ। তাই তুমি আপন হাতে তোমার ছেলে-মেয়েকে মৃত্যুর কোলে এগিয়ে দিতে

পেরেছিলে আমার আদেশে। তুমি আমার পতিব্রতা স্ত্রী,—তোমার প্রাণে কি আমি কষ্ট দিতে পারি ?"

গ্রীজেলডার চোখে তখন অশ্রুর ধারা নেমেছে। কোন কথা সে বলতে পারছে না। ছেলেমেয়ে দু'টিও অবাক্ হয়ে মায়ের মুখের পানে চেয়ে আছে।

মার্কুইস গ্রীজেলডার হাত দু'টি ধ'রে কম্পিত স্বরে বললেন—"তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার না গ্রীজেলডা ? আমি ধন্য তোমার মত স্ত্রী পেয়ে। এক-বার বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করলে ?"

গ্রীজেলডা তখন আনন্দের আবেগে মার্কুইসের পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ছেলেমেয়ে দু'টি ব্যাপারটা তখন অনেকটা বুঝেতে পেরেছে, তারা "মা" "মা" ব'লে গ্রীজেলডাকে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুপাত করতে লাগল।

ব্যাপার শুনে প্রাসাদের সকলে ছুটে এল সেখানে। মার্কুইস গ্রীজেলডার শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে সকলের সামনে সব কথা খুলে বললেন।

গ্রীজেলডার জ্ঞান হবার পর আবার প্রাসাদে আনন্দোৎসব আরম্ভ হ'ল। বিবাহের উৎসব নয়, গ্রীজেলডার অপূর্ব পতিভক্তিতে বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ-প্রবাহ।

মার্কুইস গ্রীজেলডার বাপ-মাকে সমাদর ক'রে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। শুধু তাই নয়,—চাষী পরিবারে সকলকেই প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

এত দিন মার্কুইস তাঁর ছেলেমেয়েকে বোলোন শহরে রেখেছিলেন। সেখানে তারা লেখাপড়া শিখছিল গ্রীজেলডার অনুমতি নিয়ে মার্কুইস উৎসবশেষে তাদের আবার পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। প্রতি মাসে তারা বাপ-মা'র কাছে এসে ক'দিন কাটিয়ে যেত। গ্রীজেলডার সংসার আবার আনন্দ কলরবে ভরে উঠল।

গ্রীজেলডার এই গল্পটি নিয়ে কত লেখক একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত উপন্যাস, নাটক, কাব্য লিখেছেন। মঞ্চে ও পর্দায় গ্রীজেলডার কাহিনী সকলের হৃদয় মুগ্ধ করেছে। এখনও লোকের মুখে মুখে গ্রীজেলডার পতিভক্তির কথা লোককাহিনী রূপ নিয়েছে।

'দি ডেকামেরন' আশ্চর্য গল্পের খনি। অশ্লীলতার অংশগুলি বাদ দিলে সুন্দর আদর্শময় গল্প হিসাবে কথা-সাহিত্যে 'দি ডেকামেরনের' স্থান অতি উচ্চে। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালীয় কথাসাহিত্যে অশ্লীলতা সৃষ্টিকে লোকরঞ্জনের একটা পন্থা ব'লে ধরে লওয়া হ'ত। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এ ধরনের গল্প চলত। আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলিতেও এর পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কথাসাহিত্যে সে যুগের ইটালী যে কতটা উচ্চস্থান অধিকার করেছিল, বোক্কাসিও তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

॥ গল্প ॥

মিঠে ও লোনা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রেল স্টেশন থেকে নেমে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটা-পথে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে কেকুয়া নদীর তীর-ঘেঁষে বাঁ-দিকে আরও বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়ে প্রথমেই যে টিলাটি চোখে পড়ে তারই পাদদেশে সুন্দর একখানি বাংলো তৈরী করেছিলেন নীলাদ্রি রায়। প্রচুর তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। ব'সে থেকেও দু'চার পুরুষে শেষ হবে না। এমনি জনশ্রুতি।

শহরেই এক সময় ছিল। কলকাতায়।

চলনে, বলনে, পোষাকে-পরিচ্ছদে মার্জিত রুচির ছাপ থাকলেও পয়সার বিজ্ঞাপন ছিল না। অথচ সকলেই জানত যে, সে মস্ত বড় ধনীর একমাত্র সন্তান।

কলেজে ফাংসন হ'চ্ছে···নীলাদ্রি। খেলা-ধূলায়, পিকনিকে, দেশ-ভ্রমণে সর্বত্রই নীলাদ্রি। নীলাদ্রি ছাড়া যে যজ্ঞ তা শিবহীন যজ্ঞ।

এত হৈ-চৈ-এর মধ্যে যুক্ত থেকেও সে খানিকটা আলাদা। বিশেষ ক'রে মেয়ে-বন্ধুদের কাছে নীলাদ্রি রীতিমত দুর্জ্ঞেয়। যার জন্য নিন্দা আর সুখ্যাতি দুটোই তার সম্বন্ধে শোনা যেত। কেউ সেদিকে ইঙ্গিত করলে নীলাদ্রি হেসে বলত, একটা লোকের পক্ষে এক-সঙ্গে সকলকে খুসী করা সম্ভব নয়। সুতরাং নিন্দেটাও আমার প্রাপ্য।

আসলে কে যে নীলাদ্রির অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বান্ধবী এ কথা একটা গবেষণার বিষয়। যখন যার সঙ্গেই দেখা গেল মনে হবে আর খোঁজার দরকার নেই। আবার পরমুহূর্তেই সে ভুল ভেঙ্গে যায়।

এইটুই হ'ল নীলাদ্রির বাইরের মোটামুটি রূপ। ভিতরের চেহারাটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এই রূপের সাক্ষাৎ যে পেয়েছে তার কাছে সে একেবারে উন্মুক্ত। আর সেই জন্যই শঙ্করকে নীলাদ্রি অমন অকরুণ ভাষায় তিরস্কার করতে পেরেছিল।

আমার পয়সায় চিকিৎসা করাতে চাও না সে কথা সোজা বললেই পারতে শঙ্কর? তার জন্য এমন চোরের মত পালিয়ে আসার দরকার ছিল না। তুমি যখন চাও না তখন আর আসব না কিন্তু যাবার আগে একটা কথা ব'লে যাচ্ছি। তুমি শুধু নিজেই আত্মহত্যা করতে চাইছ না আর একজনকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ।

শঙ্কর ম্লান হেসে বলে, কি যে বোকার মত কথা বলছ নীলু। আত্মহত্যা করব কোন্ দুঃখে। আর হত্যা করবই বা কাকে?

নীলাদ্রি অন্য প্রসঙ্গে এল, কেয়া কোথায়?

বোধ হয় ডাক্তারের কাছে। শঙ্কর জবাব দিল, ক'দিন শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছে। তোমাকে খবর পাঠাতে বলেছিলাম। কেয়া রাজী নয়। বলে, খবরই যদি দেব তা হ'লে এ প্রান্তে চ'লে আসবার দরকার ছিল কি?

নীলাদ্রি একটু রাগ ক'রে বলে, মনে হচ্ছে কথাগুলো একা বোনের নয়, তার দাদারও আন্তরিক সায় র'য়েছে।

শঙ্কর কোন জবাব দেবার আগেই কেয়া এসে ঘরে প্রবেশ ক'রল। মৃদু কণ্ঠে বলল, এ কথা আরও বহুবার আপনি ব'লেছেন তবু যে কেন খুঁজে খুঁজে আমাদের উপকার করতে আসেন আমি বুঝি না।

সব কথাই কি তুমি বোঝ কেয়া? আর দশটার সঙ্গে এটাকেও না হয় যোগ ক'রে নাও।

খানিক চুপ ক'রে থেকে কেয়া বলে, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

নীলাদ্রি মুখ তুলে বলল, জিজ্ঞেস করতে পার।

তা হ'লে আমার সঙ্গে একবার ও ঘরে যেতে হবে।

শঙ্কর ভীত কণ্ঠে ডাকল, কেয়া...

কেয়া একটুখানি হেসে বলল, তুমি বুঝি ভয় পেলে দাদা? নীলাদ্রিবাবু আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, এ কথা সব সময় আমার মনে থাকবে।

এ কথার পরে শঙ্করের হয়ত বলবার কিছু ছিল না। সে চুপ ক'রে রইল।

কেয়ার সঙ্গে নীলাদ্রি পাশের ঘরে এসে উপস্থিত হতেই সে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বলল, আপনি আজ না এলে—কথাটা শেষ না করেই সে অন্য

কথায় এল। এ সব কথা পরে হবে। তার আগে একটা কথার জবাব দিন আমাকে।...

কেয়ার ব্যবহারের এই অসঙ্গতি নীলাদ্রিকে বিস্মিত করলেও সে সহজ ভাবেই বলল, জিজ্ঞেস কর।

কেয়া বলল, আমরা গরীব বলেই কি আমাদের আপনি সাহায্য করতে চান?

শঙ্কর আমার বন্ধু কেয়া।

আপনার ত বন্ধুর অভাব নেই নীলাদ্রিবাবু।

ওটা তোমার ভুল কেয়া। তুমি যাদের বন্ধু ভাবছ তারা শুধু আমার পয়সার সুযোগ নেয়। তোমাদের মত সাহায্য নেবার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় না।

খানিক চুপ ক'রে থেকে কিছু ভেবে নিয়ে কেয়া বলল, জানেন, দাদার অসুখটা কি?

না—তবে অনেক আগেই কতকটা আন্দাজ করেছি।

একটা লাঙ্‌স্ একেবারে গেছে। আজই জানতে পেরেছি। অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে তার দু'টি চোখ। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, গত কাল প্লেট নেওয়া হয়েছে। আজ রিপোর্ট পেয়েছি। আপনি দাদার ভার নিন। আমাদের কোথাও আর কিছু নেই।

থাকলে হয়ত আজও আমাকে দোর গোড়া থেকেই বিদায় ক'রে দিতে?

বোধ হয় তাই। এত দিন শুধু ঐ আত্মসম্মানবোধ-টুকুই অবশিষ্ট ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আর ছ'মাস আগেও যদি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতাম তা হ'লে হয় ত দাদার এ অবস্থা হ'ত না।

সেদিনে আর কথা বাড়াতে দেয় নি নীলাদ্রি। এক সপ্তাহের মধ্যেই টি. বি. হসপিটালে পাঠান হ'ল শঙ্করকে। সব ব্যবস্থাই নীলাদ্রি করল। তার পরেই প্রশ্ন দেখা ছিল কেয়াকে নিয়ে। ঋণের বোঝা সে বাড়াতে রাজী নয়। নীলাদ্রির বন্ধু হিসেবে শঙ্কর যদিইবা সাহায্য নিতে পারে সে নেবে কোন্ অধিকারে?

নীলাদ্রি চমকে উঠল। কিন্তু কেয়ার ওপর রাগ করতে পারল না। বরং কিছুটা যেন খুশীই হ'ল। তবে ব্যবহারে সে ভাব প্রকাশ পেল না। আস্তে আস্তে বলল, তুমি শঙ্করের বোন, এটা কি যথেষ্ট নয় কেয়া!

কেয়া অনেকক্ষণ অধোমুখে ব'সে থেকে এক সময় মুখ তুলে খুব আস্তে আস্তে বলল, আপনি মেয়ে হ'লে আমার কথা বুঝতেন।

আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল কেয়া।

আমি স্পষ্ট করেই বলছি নীলাদ্রিবাবু। আপনি যে কিছুতেই বোঝেন না যে আপনার এই অনুগ্রহ—

বাধা দিল নীলাদ্রি, অনুগ্রহ!

তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে...কেয়া তেমনি আস্তে আস্তে বলতে থাকে, আপনার অনেক পয়সা, আমাদের অনেক অভাব। দাদা আপনার বন্ধু, তার অসহায় অবস্থা দেখে আপনি দয়া ক'রে এগিয়ে এসেছেন বলেই কি আপনার ওপর আবার নতুন করে সুযোগ নেব?

নীলাদ্রি একটু হেসে বলে, তুমি বারে বারে দয়া, অনুগ্রহ আর সুযোগ নেওয়ার কথা তুলছ কেন আমি বুঝি না কেয়া।

কেয়া এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জবাব দেয়, দাদা পুরুষ ব'লে যা নিতে পারেন আমি মেয়ে বলেই তা নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে অধিকারের প্রশ্নটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। যে আমার অথবা আপনার কারুর কাছেই সম্মানজনক হবে না।

নীলাদ্রির মুখ-চোখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাসি মুখে বলল, তোমার কথা হয়ত এতক্ষণে বুঝেছি। কিন্তু সে প্রশ্নের সমাধান ত আমরা ইচ্ছে করলেই করতে পারি, কেয়া।

কেয়া ম্লান কণ্ঠে বলে, এখানেও কি সেই অনুকম্পা আর দয়া দেখাতে চাইছেন না আপনি?

গভীর কণ্ঠে জবাব দেয় নীলাদ্রি, তুমি অঙ্ক কষতে খুব ভালবাস কেয়া। জীবনটাকে সব সময় অঙ্কের ছকে ফেলে বিচার করতে গেলে অনেক সময় ঠকতে হয় কিন্তু।

কেয়া একবার মুখ তুলে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে ফেলে। বলে, আপনার মত ক'রে আমি ভাবতে পারি না ব'লেই হয়ত এত কষ্ট পাই।

নীলাদ্রি একটু হেসে বলল, তোমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কের আর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্য ধন্যবাদ কেয়া। তাই আরও সহজ ক'রে বলছি যে, অনুকম্পা অথবা দয়া দেখাবার জন্যই তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াই নি। আমার নিজেরও কিছু স্বার্থ আছে বৈ কি।

নীলাদ্রিবাবু...

তোমায় এক বিন্দু মিথ্যে বলি নি কেয়া। তবে এর পরে তুমি কি বলবে তা আমি জানি।

কি বলব?

বলবে যে, ইচ্ছে করলেই যে লোক অনায়াসে আরও

অনেক সুন্দর আর অনেক বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে সে কেমন ক'রে তোমাকে ভালবাসতে পারে?

না, বলব না। আমি বিশ্বাস করেছি।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, কেয়া। নীলাদ্রি তোমাকে এই জন্যেই ভালবাসে। আদর ক'রে সে ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। বলে, বিশ্বাস করলে কম ঠকতে হয় না কেয়া।

সত্য কথাই সেদিনে নীলাদ্রি বলেছিল। যারা তাকে ঘিরে অনেক কলরব করেছে, অনেক উত্তেজনা, অনেক প্রলোভনের ফাঁদ পেতেছে তারা কেউ ওর মনের কাছটিতে এগোতে পারে নি। বরং আরও দূরে সরে গেছে। নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যে কাছে পেয়েও সম্ভ্রম খোয়ায় নি—ব্যক্তিত্ব আর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটা সম্মানজনক ব্যবধানে চলাফেরা করেছে সেই মেয়েই নীলাদ্রিকে কাছে টেনেছে। নিজে বিশ্বাস করে কেয়াকেও বিশ্বাস করতে আহ্বান জানিয়েছে।

সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে কেয়া। নীলাদ্রির প্রসারিত হাত গ্রহণ ক'রে সুরু করল তাদের চলা।

চতুর্দিকে খুশীর সোনালী রোদ ঝলমল করছে। আকাশের গা থেকে সরে গেছে কাল মেঘের ঢাকনা। অনেক সমস্যার চড়াই উৎরাই পার হয়ে তবেই না সমতলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাদার জন্য খানিকটা দুশ্চিন্তার ধোঁয়া মাঝে মাঝে তার মনটাকে বিষণ্ণ আর ভয়াতুর ক'রে তুলত। সে ভাবনার কুয়াশাও অনেকটা কেটে গেছে। দাদা ভাল হয়ে যাবেন ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন। নীলাদ্রি বলেছে, এর পরে সে শঙ্করকে সুইজারল্যাণ্ড পাঠাবে। কেয়া কান পেতে শুনেছে। বুক ভরেছে, মন ভরেছে। নীলাদ্রিকে খুশী করতে সে পাগল হয়ে উঠেছে। কানে কানে বলেছে, এত কোলাহল আমার ভাল লাগে না। চারিদিকে অনেক চোখ…অনেক কান। সবাই আমাদের দেখবে—আমাদের কথা শুনবে যে। তার চেয়ে চল আমরা অনেক দূরে চলে যাই।

কথা শুনে খুব হেসেছে নীলাদ্রি। খুশী হয়ে বলেছে, আমার মনের কথা তোমার মুখে শুনলাম। এবার আমার মনের কথাটা আমার মুখে শোন।

কেয়াকে নিয়ে নীলাদ্রি অনেক দূরে চলে যাবে। তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে যাবে নদী। এখানে সেখানে থাকবে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়, চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে অনন্ত নীলাকাশ, চোখে পড়বে নদীর জল, সবুজ গাছ…কেমন, ঠিক কি না?

পায় পায় এগিয়ে এসে কেয়া একেবারে নীলাদ্রির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফিস ফিস ক'রে বলল, আশ্চর্য! হুবহু মিলে গেছে। তুমি জানলে কেমন ক'রে? আমি ত কোনদিন তোমাকে বলি নি!

নীলাদ্রি টিপে টিপে হাসতে থাকে। বলে, কেমন ক'রে জানলাম বল দেখি?

কেয়া আরও নিবিড় হয়ে গভীর কণ্ঠে বলল, আমাদের মন যে আর আলাদা নেই—

ওর চোখে-মুখে খুশী আর পরিপূর্ণতার জোয়ার।

নীলাদ্রি বলে, সহরের এই কৃত্রিম জীবন থেকে আমার আত্মাও পরিবর্তন খুঁজছে কেয়া। জীবনটাকে আমি সহজ করে উপলব্ধি করতে চাই। তোমার মত একটি মেয়ে পাছে বিলাসিতার আবর্জনার তলায় চাপা পড়ে যায় এই ভয়ে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তুমি আজ আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ।

কেয়া আস্তে আস্তে বলে, চাপা পড়ব কেন?

কেন তা ত জানি না কেয়া। কিন্তু পড়েছে। নীলাদ্রি বলতে থাকে, এ দেশের অনেক বস্তুই অন্ধ অনুকরণের মোহে হারিয়ে যাচ্ছে। ওরা যে বস্তুকে বর্জন করবার জন্য পথ খুঁজছে আমরা নতুন ক'রে সেইটেকেই আঁকড়ে ধরছি।

তুমি বুঝি ডিভোর্সের কথাটা ভাবছ? আইন কি মন পাল্টাতে পারে?

কিন্তু মনের উপর প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। আদালতের নথিপত্র তার প্রমাণ দেবে।

কেয়া শক্ত ক'রে নীলাদ্রির একখানা হাত চেপে ধরে বলে, এ সব কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তার চেয়ে তোমার নদী-নালা আর ঝোপ-ঝাড়ের গল্প অনেক ভাল।

নীলাদ্রি একটুখানি হেসে বলে, তা হ'লে আর গল্পও নয়। গল্পে অনেক মিথ্যার রং আছে। এবারে তোমায় সহর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাব।

সত্যি সত্যিই নীলাদ্রি তাকে শহরের জীবন থেকে নিয়ে এল এমন এক নিরালা পরিবেশে যেখান থেকে চোখ চাইলেই চোখে পড়ে নদী, চোখে পড়ে শাল-মহুয়ার ঘন জঙ্গল—উন্মুক্ত আকাশ। কোলাহলমুখর শহর থেকে একেবারে নির্ভেজাল প্রকৃতির কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে ওরা।

নীলাদ্রি বলে, খুশী ?

কেয়া চঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেয়, খুব খুশী।

বড্ড একলা-একলা লাগে ত ?

একলা লাগবে কেন ? তুমি রয়েছ যে—

ঠিক কথা। কেয়ার আছে নীলাদ্রি আর নীলাদ্রির আছে কেয়া। একলা লাগবে কেন—বরং নতুন করে ওদের জীবনযাত্রা সুরু হয়। দু'জনার মিলিত চেষ্টায় ওর কল্পনা একটু একটু ক'র দেহ নিচ্ছে। এ জীবনের রূপ আলাদা, স্বাদ আলাদা। নেশা ধরায়। নেশার বস্তু না থাকলে এভাবে মগ্ন থাকা সম্ভব হ'ত না তাদের পক্ষে। ওদের তন্ময়তা দু'দিনেই টুটে যেত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শাল-মহুয়ার বন, নদীর শীর্ণ জলধারা আর বাংলো সংলগ্ন ফুলের বাগান তাদের মনের খোরাক যোগাতে পারত না। ক্লান্তি দেখা দিত, পরিবর্তন খুঁজত। কিন্তু নীলাদ্রি কিংবা কেয়ার জীবনযাত্রায় কিছুমাত্র ছায়াপাত ঘটে নি।

কেয়া যখন বাগানে ফুলের পরিচর্য্যা করে নীলাদ্রি তখন একটা ডেক-চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বই পড়ায় মন দেয়। বাগান একান্তই কেয়ার, সেখানে নীলাদ্রির সাহায্য সে চায় না। প্রথম প্রথম হাত লাগাতে গিয়ে বাধা পেয়েছে। ফুলের মর্ম নাকি পুরুষ জাতটা বোঝে না। ফুটলেই ছিঁড়তে চায়। ব্যবহার করতেই তাদের আনন্দ। কেয়ার গাছের ফুল সে ছিঁড়তে দেবে না। আপনি ফুটে আপনি ঝরবে। কথাটা বাগানের মালীকেও সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। এর অন্যথা হ'লে অনর্থ ঘটাবে কেয়া।

নীলাদ্রি হেসে বলে, তুমি পাগল কেয়া—

এ অনুযোগের মধ্যে স্নেহের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠে। পুলকিত হয় কেয়া। বলে, আর কিছু না ? শুধুই পাগল ?

নীলাদ্রি বলে, আর সুন্দর, আর মিষ্টি।

কাছে এগিয়ে আসে কেয়া। বলে, শুনতে খুব ভাল লাগে। ভাবতে আরও ভাল লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান ?

নীলাদ্রি মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

কেয়া আবার বলে, নিজের স্বার্থের জন্য তোমাকে আমি ঠকিয়েছি।

নীলাদ্রি হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। কেয়ার চোখে চোখ রেখে বলল, হঠাৎ একথা ভাবতে আরম্ভ করলে কেন, কেয়া ?

হঠাৎ হবে কেন ? কেয়া বলল, তোমার আগের জীবনের কথা আমি কিছু জানি না বুঝি ? নিজেও দেখেছি দাদার মুখেও শুনেছি। সেই তুমি আজ একেবারে বন্দী হয়ে আছ। তোমার বাইরের জীবনটা মরে যেতে বসেছে।

নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, বসেছে কি— একেবারে মরে গেছে। কিন্তু তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই কেয়া বরং এই বন্দী জীবনের মিঠে স্বাদটুকু ভালই লাগছে।

সত্যি বলছ ?

নীলাদ্রি আস্তে আস্তে কেয়াকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। বলল, মিথ্যে বলব কেন ?

জান···কেয়া মিষ্টি হেসে নরম গলায় বলল, ছেলেবেলায় সকলে বলতেন আমি খুব ভাগ্যবতী হব—

বাধা দিয়ে নীলাদ্রি বলল, হুবহু মিলে যাচ্ছে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি মিলে যাচ্ছে ?

তোমার মত আমাকেও সকলে একই কথা বলতেন। আমার স্ত্রী-ভাগ্যের কথা। তাঁরা কিন্তু মিথ্যে বলতেন না।

ছিটকে সরে গেল কেয়া। ঠাট্টা করা হচ্ছে তোমার।

মিটি মিটি হাসতে থাকে নীলাদ্রি।

হাসতে লজ্জা করা উচিত।

তোমারও উচিত। এতক্ষণ ধরে তুমিও তা হলে পতি-দেবতার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলে ?

তোমাকে যত ভাল মানুষ মনে করতাম তুমি তা নও।

নিছক সত্যি কথা—বলেই চোখের পলকে উঠে গিয়ে সে কেয়াকে ধরে ফেলল।

অসভ্যতা ক'রো না···ছাড়···

কিন্তু ছাড়া পায় না শেষ পর্যন্ত।

এমনি ভাবেই একটি একটি ক'রে মাস, তারপর বছরও শেষ হয়ে গেল এক অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে। শুধু কিছুদিন ধরে কেয়ার আনন্দের রূপ আরও অপরূপ হয়ে উঠেছে। নীলাদ্রি বুঝতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তুমি কি অসুস্থ, কেয়া ?

প্রশ্নটা এক কথায় উড়িয়ে দিল কেয়া। আরও দিন কয়েক পরে পুনরায় একই কথা জিজ্ঞেস করে নীলাদ্রি, তোমার চোখ-মুখ বসে গেছে। আগের মত খেতে পার না। মনে হচ্ছে ডাক্তার দেখান দরকার।

দরকার সত্যিই হবে। সময়-মত তোমাকে বলব।

তার মানে?

ব্যস্ত হয়ো না। এমন সকলেরই হয়। আমি জানি। আমি দেখেছি।

নীলাদ্রি জানতে পেরে কিন্তু কেয়ার জানা আর দেখার উপর নির্ভর না ক'রে কলকাতায় চলে এল। তারপর যথাসময় স্বাভাবিক ভাবেই কেয়া একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেছিল কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তার সন্তানটিকে হারাল। ওদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

কেয়া নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিল। এমন ক'রে গুটিয়ে নিল যে নীলাদ্রিও আর তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কেমন একটা সঙ্কোচ, কুণ্ঠা আর ভয় তাকেও থামিয়ে রেখেছে। তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে নিয়ে যত কথা, যত উচ্ছ্বাস কেয়া প্রকাশ করেছে তার একের পর এক তার মনে পড়ছে। তাইতেই এক পা এগিয়ে নীলাদ্রি তিন পা পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ সে মনে-প্রাণে অনুভব করছে যে, কিছু বলা দরকার—কিছু করা দরকার।

কিন্তু নীলাদ্রি মুখ খুলবার আগেই কেয়া বলল, এখানে আমার আর ভাল লাগছে না।

নীলাদ্রিও হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই মুখের কথা খসতে না খসতেই তারা আবার তাদের বাংলো বাড়ীতে ফিরে এল। কিন্তু বিগত দিনের কেয়াকে ফিরে পেল না। তার দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন একটু একটু ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেল নীলাদ্রি। বলল, এখানে এসে তোমার শরীর দেখছি আরও খারাপ হচ্ছে।

আমি ভালই আছি।

তোমার চেহারা সে কথা বলছে না।

ও কিছু না। আবার ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি ভেব না।

নদীর তীরে বেড়াতে যাবে?

তুমি একলাই ঘুরে এস।

নীলাদ্রি নদীর দিকে না গিয়ে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হ'ল। কিছু জিনিষ-পত্র কিনতে হবে।

বাংলোর বাইরে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য, শকুন্তলা, তুমি এখানে?

তোমার খোঁজে নীলাদ্রি। কথা নেই, বার্তা নেই একবার জানালে না পর্যন্ত—

বাধা দিল নীলাদ্রি, কি জানাব আর কাকে জানাব বুঝলাম না।

ভ্রুভঙ্গি করে শকুন্তলা বলল, তুমি দুষ্মন্ত হ'তে চাইলেও আমি কলিকালের শকুন্তলা। তোমাকে অত সহজে ভুলতে দেব না। বাঃ বেশ আশ্রমটি করেছ ত? আজ, কাল সাধন-ভজন করো নাকি?

সাধন-ভজনও বলতে পার। তবে আমরা সাধারণরা সংসারধর্ম বলে থাকি। ঐ বাংলোতেই আমি আর আমার স্ত্রী বাস করি।

স্ত্রী! চমকে উঠল শকুন্তলা।

হ্যাঁ, স্ত্রী। শঙ্করের বোন কেয়াকে আমি বিয়ে করেছি।

খানিক চুপ ক'রে থেকে শকুন্তলা বলল, অনিন্দ্য তা হ'লে ঠিকই বলেছিল। আমি বিশ্বাস করি নি। ভাবতে পারি নি কেয়ার মত একটা আনকালচার্ড গ্রাম্য মেয়েকে···ওঃ মাই গড্‌, তোমাদের এদিকটায় অত্যন্ত ধুলো। শকুন্তলা চোখে রুমাল চাপা দিল।

ধুলো! ধুলো কোথায়?

ককিয়ে উঠল শকুন্তলা, তোমার চোখ থাকলে ত দেখবে।

হঠাৎ পিছন ফিরে উল্টো পথে চলতে সুরু করল শকুন্তলা।

কেয়া খুবই অসুস্থ। অন্যান্য অনেক উপসর্গর সঙ্গে হার্টের রোগ দেখা দিয়েছে। এখানকার সেরা ডাক্তার ভয় যত দেখিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন উপদেশ আর পেটেন্ট। শুয়ে থাকতে হবে অন্তত দু'টি মাস। হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। রোগটা নাকি আজকের নয়। অনেক দিনের পুরানো। সুযোগ পেয়ে চেপে ধরেছে।

কেয়াকে সব কথা বলা হয় নি। যতটুকু বলা হয়েছে তাতেই সে রাগ ক'রে বলল, তোমার ডাক্তার কিছু বোঝেন না।

নীলাদ্রি সায় দিয়ে বলে, সেই জন্যেই একবার কলকাতার কথা বলেছিলাম।

এতেও কেয়া রাজী নয়। আর একটু সুস্থ না হয়ে সে যাবে না।

আবার এল শকুন্তলা। মালী বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত। শকুন্তলা তাকে নীলাদ্রির কথা জিজ্ঞেস করে। ডেকে দিতে বলে। কিন্তু ডাকবার আগেই নীলাদ্রি বাংলো থেকে বার হয়ে এল। কেয়া তখন ঘুমোচ্ছে।

আবার এলাম নীল।

এখানকার ধুলোর দেখছি আকর্ষণ আছে।

তোমার বৌ-র সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। ধুলোর আকর্ষণে নয়।

কেয়ার শয়ন-কক্ষের জানলাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কেয়া এসে দাঁড়িয়েছে। দেখল শকুন্তলা। নীলাদ্রি কিন্তু জানল না। সে তখন শকুন্তলাকে বলছে, একটা গেঁও আনকালচার্ড মেয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে তুমি আনন্দ পাবে না।

তা হ'লে থাক নীল। শকুন্তলা কথা ক'টি বেশ জোরে ছুঁড়ে মারল। কিন্তু চমৎকার তোমার ফুল বাগানটি। খাসা ফুল ধরেছে। দেবে নাকি দুটো আমার খোঁপায় গুঁজে। শেষের দিকে কথা ক'টি সে যেন কানে কানে বললে। কাল আমি চলে যাচ্ছি নীল, আর কোন দিন তোমায় বিরক্ত করতে আসব না।

তোমাকে ধন্যবাদ।

তুমি মানুষ নও নীল। কসাই। কিন্তু যত অপমানই আজ আমাকে তুমি কর না কেন—

শকুন্তলা—

আস্তে নীল। তোমার বউ হয়ত শুনতে পাবে। ঐ যে বলছিলে না তুমি আনকালচার্ড···গেঁয়ো। ভুল বুঝবে। তোমার অনুকম্পার মর্যাদা পাবে না।

তোমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি শকুন্তলা?

শকুন্তলার কণ্ঠস্বর আরও খাদে নেমে এল। এত খাদে যে, নীলাদ্রিকেও কষ্ট করে শুনতে হ'ল। শেষ বিদায়ের দিনে তোমার নিজের হাতে দেওয়া শুধু দু'টি ফুল। মাত্র দু'টি গোলাপ। দেবে না তুমি নীল। এই প্রথম, এই শেষ।

ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল কেয়া। আনকালচার্ড ·· গেঁয়ো। কিন্তু সে কি কোন দিন ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল নীলাদ্রির কাছে। আর···কেয়ার বসে যাওয়া চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরতে লাগল। তার-গাছের রক্ত গোলাপ ঐ মেয়েটার খোঁপায়। আর নীলাদ্রি নিজে হাতে গুঁজে দিল। একবারও তার কথা মনে হ'ল না। কেয়ার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন দু'হাতে চেপে ধরল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে তার। এখুনি হয়ত পড়ে যাবে। টলতে টলতে আবার সে ফিরে এল তার ঘরে। শুয়ে পড়ল কেয়া। এই মেয়েটাই হয়ত সেদিনেও এসেছিল। মালীবৌ বলেছিল বটে। সে বিশ্বাস করে নি, ধমকে বিদায় করেছিল তাকে। কিন্তু আজ···যতটুকু সে দেখেছে আর শুনেছে···আবার উঠে বসেছে কেয়া। সারা দেহে মনে ছটফট করছে সে। মাত্র ক'টি মাস সে শয্যাশায়ী, এরই মধ্যে কি সে নীলাদ্রির কাছে ফুরিয়ে গেল?

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াল কেয়া। নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে উঠল সে। নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে যেন। কেয়া জোর ক'রে ভাবতে চেষ্টা করছে—অনেক কথা, অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা একই সঙ্গেই তার মনের দর্পণে ফুটে উঠল। এক-দিনের সত্য কি আর এক দিন এমনি ভাবে মিথ্যে হ'য়ে যেতে পারে?

নীলাদ্রি তখনও আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে সম্মুখের রাস্তা দিয়ে মেয়েটার সঙ্গে। ওর খোঁপায় তার বড় আদরের দুটি রক্ত গোলাপ। যে গোলাপ সে কোনদিন প্রাণে ধরে ছিঁড়তে পারে নি—ছিঁড়তে দেয় নি। নীলাদ্রি কত দিন ঐ ফুল তার খোপায় পরাতে চেয়েছে। কেয়া বাধা দিয়েছে। ফুল গাছে থাকলে তার মন ভরে, ছিঁড়ে এনে নয়। এ কথা বহুদিন সে নীলাদ্রিকে বলেছে।

আয়নায় নিজের চেহারা আবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেখান থেকে সোজা শকুন্তলার প্রতি। কেয়ার চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। একটা কিছু সে করতে চায়। ঘর থেকে আস্তে আস্তে বার হয়ে বাগানে চলে এল কেয়া। একবার হয়ত বা সে সস্নেহে গাছগুলির পানে তাকাল। হয়ত একবার ইতস্ততঃ করল, তারপরে কতকটা পাগলের মত উপড়ে ফেলল গাছটি, তারপর আর একটি · তারপর আর একটি।

দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল মালী, ওকি করছেন মাইজি—

কিন্তু জবাব দেবার শক্তি ততক্ষণে হারিয়ে ফেলেছে কেয়া। নিজের হাতে উপড়ে-ফেলা গাছগুলির পাশে নিজেও জ্ঞান হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ভয়ে, বিস্ময়ে আর আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল মালী। ছুটে এল মালীবৌ। ফিরে এল নীলাদ্রি। কিন্তু ফিরল না শুধু কেয়া।

চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে। নিঃশব্দে—গভীর একাগ্রতায়। প্রশ্ন করবার কিছু নেই। জবাব ছড়িয়ে আছে কেয়ার পাশেই। দুঃখ এই যে কেয়া ভুলটাকেই সঙ্গে নিয়ে গেল। তার ফিরে আসা পর্য্যন্তও অপেক্ষা করতে পারল না।

এরাও মানুষ ছিল

পথচারা

'মানুষ'-এর আভিধানিক অর্থ যাই থাক, 'মানুষ' বলতে আমরা যে শ্রেণীর জীবকে বুঝি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পৃথক পরিচয় নিয়ে যারা আমাদেরই আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা পড়ে আছে ফুটপাথের ধারে—যাদের আমরা ফিরেও চেয়ে দেখি না, যাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া আর কোন আচ্ছাদন নেই, যাদের মাথার ওপরে বৈশাখের খর-রৌদ্র, বর্ষার প্রবল জল-ধারা, যারা সকল অনুভূতি থেকে মুক্ত, যারা জীবন-ধারণকেই একমাত্র ধর্ম বলে জানে, তারা কারা? কোন্ পাপে তারা আজ মানুষের সমাজ থেকে লাঞ্ছিত? এ পাপ কার?

এ পাপ আমার, এ পাপ তোমার, এ পাপ সকলের।

রাজপথের সর্বত্র পড়ে আছে এই সব অ-মানুষের দল। ওদের দুঃখ নেই, লজ্জা নেই—বোধ হয় আনন্দও নেই। ওরা হাসতে ভুলে গিয়েছে—ওদের কণ্ঠে এক-মাত্র স্বর, যাকে ওরা প্রয়োজনে আজও রেখেছে বাঁচিয়ে—সে স্বর নয়, সে আওয়াজ—বিকৃত খন্‌খনে আওয়াজ, অন্ধকারে আঁৎকে-ওঠা-আওয়াজ—ভাষা নয়, শুধু আওয়াজ!

চেয়ে দখ, মানুষ নয় কংকাল। রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের চামড়া গিয়েছে শুষ্ক প্রলেপের মত হাড়ের ওপর লেপ্‌টে।

তাদের আসল রং গিয়েছে ঝলসে।

হয়ত ওদের পিছনেও আছে ইতিহাস—

যে ইতিহাস ওদেরই অজ্ঞাতসারে ওরাই হারিয়ে এসেছে জনতার অরণ্যে,

হায় ইতিহাস!

ফুটপাথে পড়ে থাকে দগ্‌দগে ঘা-ওয়ালা একটা লোক। রোজই থাকে, একই জায়গায় একইভাবে গলিত পা-টাকে মেলে দিয়ে।

চীৎকার করে…

তারস্বরে চীৎকার করে আর বুক চাপড়ায়। অগণিত মানুষের চলার পথ—ফুটপাথ, তারই মাঝে কখন সে জায়গা ক'রে নেয়।

দগ্‌দগে পচা ঘা…

তেল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে, বোধ হয় মাছি বসবে ব'লে। ঘায়ের পাশের বীভৎস চামড়া আরও কুৎসিত—দেখলেই গা-বমি করে। চীৎকার নয় আর্তনাদ—

অভ্যস্ত কান, তবু যাওয়ার পথে মানুষ থমকে দাঁড়ায়।

*   *   *   *

দেখা হ'ল বর্ষণমুখর রাত্রে,

একেবারে মুখোমুখি দেখা…ইতিহাসের প্রত্যক্ষ পাঠ!

বর্ষা-স্নাত গ্যাসের স্তিমিত আলোয় ফুটে ওঠে কবেকার কোন্ ভুলে-যাওয়া কাহিনীর পাতা,

সেই দগ্‌দগে ঘা-ওয়ালা লোকটা—

দেনা-পাওনার হিসেব নিয়ে ওদেরই সর্দারের সঙ্গে করছে ঝগড়া।

সব কথা শোনা যাচ্ছে না, বোঝাও যাচ্ছে না—অস্পষ্ট অসংলগ্ন।

তবু তার মধ্যে থেকেই পাঠ উদ্ধার ক'রে শিউরে উঠি!

দগ্‌দগে পচা ঘা'টার দিকে একবার চাই,

ও তার ব্যাধি নয়,

লাল চিতের আঠা দিয়ে তৈরী-করা ঘা ওর।

এমনি ক'রে ওদের দল ঘা তৈরী করে,

তৈরী করে ঠুঁটো হাত, খোঁড়া পা—

লোহার শিক পুড়িয়ে চোখ দুটোকে ক'রে দেয় অন্ধ, নইলে ভিখ্ মেলে না!

সেই অন্ধ-তামসী রাত্রে মনে হ'ল, ওদের বোবা ইতিহাস আমাকেই সাক্ষী রেখে এইমাত্র কথা ক'য়ে উঠল!

* * * *

আর একদিনের কথা—

গল্প কথা নয়। পথ চলতে এ আমরা নিত্য দেখি,

সেদিন হন্ হন্ ক'রে পথ চলছি…হঠাৎ আওয়াজ এল,

"যদি বাঙ্গালী ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে চান—"

থমকে দাঁড়ালাম।

বক্তার কণ্ঠ তখন সপ্তমে উঠেছে—

"দেশকে বাঁচান, জাতিকে বাঁচান,—আপনারই সততার উপর নির্ভর করছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। বিদেশীদের দোষ দিলে চলবে কেন, আমরাই মারছি আমাদের প্রতিবেশীকে। কিন্তু যাদের কাছ থেকে নিয়েছি আমরা এই বিজ্ঞানের ফাঁকি, তারা কিন্তু করে না জাতিকে প্রতারণা…চোখ বুজে যে-কোন খাবার তাদের হাত থেকে খেতে পারা যায়। পারি না আমারই প্রতিবেশীকে আমরা বিশ্বাস করতে, আমারই ভায়ের ওপর নির্ভর করতে। আমি গলাবাজী ক'রে নিজেকে প্রচার করতে আসি নি। এই প্রচারের যুগে যে কথা আজ বিশ্বাস করা যায় না, সেই কথা আমি অকপটে আপনাদের কাছে ব'লে যাব। সহস্র মিথ্যার মধ্যে সত্যকে চেনা কঠিন, কিন্তু সত্য, সত্যই।

"জাতি দেশের মেরুদণ্ড। জাত বাঁচলে তবে ত দেশ। এই লুটে-পুটে-খাবার যুগে ক'জন আমরা সেকথা ভাবি! তাই দুধের বদলে রং-করা জল দিতে আমাদের বিবেকে বাধে না, তাই জাতির ভবিষ্যৎকে পকেটস্থ ক'রে ঘৃ'নামক বস্তুকে দেশান্তরে পাঠিয়ে 'দালদা'র বিচিত্র সংস্করণ আমরা বাজারে চালু রেখেছি।

"দেশের জন্যে, জাতির জন্যে আজ প্রত্যেককেই কিছু ক'রে যেতে হবে। এই কিছু-করাটাই হ'ল আজকের দিনের কাজ।

"আমি পল্লীগ্রামের গৃহস্থ চাষী। দু'পয়সা লাভের জন্যেই এসেছি একথাও মিথ্যে নয়, কিন্তু ফাঁকি দিতে আসি নি। গোরুর দুধ থেকে মাখন-তোলা সত্যিকার গাওয়া-ঘি আজও আমাদের দেশে পাওয়া যায়, সৎ-বুদ্ধি এবং সৎ-চেষ্টা থাকলে যে-কোন পল্লী এই-ভাবে খাঁটি গব্যঘৃত পরিবেশন করতে পারে। কিন্তু সে সৎ-বুদ্ধি কোথায়?"

এইবারে বোঝা গেল বক্তৃতার সারকথা।

টিনের চালার একটা শেড্। অর্থাৎ একটি দোকান ঘর। ছোট্ট এক টুক্‌রো সাইনবোর্ড, তাতে লেখা, "পল্লী-প্রতিষ্ঠানের বিশুদ্ধ গব্যঘৃত…বেশি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না, কারণ দিতে পারিব না -নয় টাকা সের।"

দেখলাম, অনেকেই ছোট ছোট মাটির ভাঁড় নিয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘিয়ে-মাখা চক্‌চকে ভাঁড়। অনেক-খানি জায়গা নিয়ে গাওয়া ঘি-এর গন্ধ লোকগুলোকে লোভাতুর ক'রে রেখেছে।

গন্ধটা সত্যিই ভাল। লোকটার সততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইল না।

ভিড় প্রতিদিনই হয়। লোকজন বলাবলি করে, খাঁটি জিনিস হ'লে কেন নেবে না মশায়!

দেখলাম, পয়সার অভাবে লোকে খাঁটি জিনিস খেতে চায় না—একথা সত্যি নয়, সত্যি হ'ল ভাল জিনিসের অভাব। তারা ভাল জিনিস দিতে ভুলে গিয়েছে শুধু নয়, দেবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত হারিয়েছে। লোভের মাত্রা বেড়েছে, তাই লাভের অংক কষে তারা ফাঁকির রাস্তা বের করে। এ ফাঁকি শিখিয়েছে বিজ্ঞান। এবং সেই সব ফাঁকির উপকরণ জোগান দেয় বিদেশী বণিক। তাই তেলের এসেন্সে, ঘি-এর এসেন্সে আমাদের বাজার ছেয়ে গেল!

* * * *

অনেক দিন পরের কথা। সেই দোকান…সেই টিনের শেড্…সেই সাইনবোর্ড।

কিন্তু আজ আর বক্তৃতা হচ্ছে না, তবে ভিড় সমানই আছে। ভাবলাম কারবার চালু হয়েছে, আর বক্তৃতা দেবার দরকার হয় না।

কিন্তু কাছে আসতেই সভয়ে পিছিয়ে এলাম।—পুলিশ! লোকটাকে 'য়্যারেষ্ট' করা হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে যে যেভাবে পারছে, দোকানদারটাকে গাল দিচ্ছে।

ব্যাপারটা জানবার জন্যেই আবার এগিয়ে গেলাম। দেখি, দোকান-ঘরের পিছনে—যে অংশটিতে ঐ ব্যক্তি বাস করত, তারই উঠানে পাহাড়-প্রমাণ "দালদা"র টিন। লোকটা বোধ হয় ওগুলো সরাবার অবসর পায় নি।

উঠোন জুড়ে রয়েছে দালদার টিন, ঘৃত-ভাণ্ড, আর দুটো বড় বড় উনুন।

খাঁটি গব্য-ঘৃতের তিনটি প্রধান উপকরণ!

অভিধান খুঁজে মানুষের যথার্থ অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনোমত কোন অর্থই আবিষ্কার করতে পারলাম না। এ কোন্ মানুষ, যারা নিজের পায়ে কুড়ুল মারে!

—

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

শক্তিহীন ও সহায়হীন হয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হবে, এই রকম একটা সাংঘাতিক ভুল ধারণা নিয়ে মার্কিন জঙ্গী বিমানবহর উত্তর ভিয়েৎনামে হামলা সুরু করেছে। কিন্তু ভিয়েৎ-কঙ বাহিনী গত বিশ বছরের চেষ্টায় এখন এত শক্তিশালী যে উত্তর ভিয়েৎনামের নিয়মিত সহায়তা ছাড়াই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পঙ্গু সরকার ও ততোধিক পঙ্গু সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তারা সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং উত্তর ভিয়েৎনাম বা চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারের সঙ্গে ভিয়েৎকঙ গেরিলা বাহিনীর সংযোগ ছিন্ন করা সম্ভব হ'লেই ভিয়েৎকঙ গেরিলাদের পরাস্ত করা যাবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তা ছাড়া পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তর ভিয়েৎনামের বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণের পর

জনসনের প্রস্তাব

ভারত সহ সতরটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আহ্বানে প্রেসিডেন্ট জনসন সাড়া দিয়েছেন। গত ৭ই এপ্রিল এক ঘোষণায় তিনি জানিয়েছেন, ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে সংস্পৃষ্ট সকল দেশের সঙ্গে পূর্বসর্ত ব্যতিরেকে আলোচনা সুরু করতে সম্মত আছে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণাটি ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং বিভিন্ন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মহলে অভিনন্দিত হয়েছে এবং অপর পক্ষ থেকে যদি উল্লেখ-যোগ্য সাড়া পাওয়া যায় তবে হয়ত ভিয়েৎনামের দুঃখের অবসান হ'তে খুব বেশী বিলম্ব হবে না। ভিয়েৎনাম সমস্যা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তার সমাধানের জন্য যদি কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়, কোন শান্তিকামী দেশের পক্ষেই তা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে না।

উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর নিরবচ্ছিন্ন বোমা বর্ষণ ক'রে গেলেই হানয় সরকার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট বাহিনী ভিয়েৎকঙের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে বাধ্য হবেন এবং তাতেই ভিয়েৎকঙ

যুক্তরাষ্ট্রের এতদিনে এটা উপলব্ধি হওয়া উচিত যে, ভয়ে নতিস্বীকার করার পাত্র উত্তর ভিয়েৎনাম নয়। তারা ভাঙবে তবু মচকাবে না, এবং বহু সংগ্রাম ও ক্ষয়ক্ষতির পর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট সাফল্য এখন এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে নতিস্বীকারের আশা শুধু দুরাশা নয়, নির্বুদ্ধিতাও। ভিয়েৎকঙ বাহিনী এখন প্রবল পরাক্রম ও দুর্নিবার। তারা সুশিক্ষিত, সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত। সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিভিন্ন ঘাঁটিতে অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার নিয়মিত সৈন্য লক্ষাধিক সহযোগী অনিয়মিত গেরিলা সৈন্য আছে ভিয়েৎকং বাহিনীর এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অর্ধেকেরও বেশী স্থান এখন তাদের দখলে। যেভাবে তারা আক্রমণ রচনা করেছে তাতে হয়ত শীঘ্রই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অর্ধাংশ সম্পূর্ণরূপে বর্তমান সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের সৈন্যবাহিনী আবার একদিন ঐসব জায়গা পুনর্দখল করবে এইরকম অসম্ভব আশা ত্যাগ ক'রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবিলম্বে একটা নিষ্পত্তিতে আসার জন্য তৎপর হওয়া উচিত। যে কারণে চীনের মূল ভূখণ্ডে চিয়াং কাইশেক সরকারকে টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, সেই কারণেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান জোড়াতালি দেওয়া অকর্মণ্য সরকারকে [illegible] কঙ বাহিনীর দুর্নিবার আক্রমণের বিরুদ্ধে বেশী দিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এবং মার্কিন যুবক অকারণে প্রাণবলি দিচ্ছে ভিয়েৎনামের জলাজঙ্গলায়, অজ্ঞাত প্রান্তরে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি [illegible] নীতি পরিবর্তন না করেন তবে [illegible] নষ্ট বৃথা [illegible] অপচয়ের জন্য সমগ্র মার্কিন মুলুককে অনুশোচনা করতে হবে। একদিন চ[illegible] ও [illegible] ফ্রান্স ইন্দোচীন ত্যাগে বাধ্য হয় এবং তখনই ফ্রান্স বুঝতে পারে যে, আরও অনেক আগে তার চলে আসা উচিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সেই 'দিয়েন বিয়েন ফু' ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে বুঝতে হবে যে ইতিহাসের কোন শিক্ষা তারা গ্রহণ করে নি।

সিংহলের নির্বাচন

কম্যুনিষ্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। আফ্রিকার সম্প্রতি স্বাধীন মালম্বিতে ঐ রাষ্ট্রের জনপ্রিয় নায়ক ডাঃ হেষ্টিংস বান্দার বিরুদ্ধে চীনা চররা যে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে তা শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে এবং ডাঃ বান্দা ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর হাতে দমন করে দেশবাসীর সোচ্চার অভিনন্দন লাভ করেন। আফ্রিকার অপর ক্ষুদ্ররাজ্য বুরুন্দিতেও চীনা দূতাবাসের জঘন্য ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ বুরুন্দি সরকার চীনা দূতাবাস বন্ধের নির্দেশ দেন ও চীনের সঙ্গে বুরুন্দির কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। চীনের সঙ্গে বড় বেশী মাখামাখির অভিযোগে সম্প্রতি সিংহলের জনগণও তাঁদের সিরিমাভো-মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুত করেছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়েক অবশ্য বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় বারবার জোরগলায় ঘোষণা করেন যে, চীনের সঙ্গে তাঁর সরকারের অবাঞ্ছিত মৈত্রীর সংবাদ সত্য নয়, কিন্তু সিংহলবাসীদের মনে সে ঘোষণা খুব বেশী দাগ কাটতে পারে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে দু'জন চীনাপন্থী কম্যুনিষ্ট সিংহলের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা জামানতের টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে পারেন নি এবং সিংহলের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাডলী সেনানায়েক মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বেই ঘোষণা করেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে সিংহল সম্পূর্ণরূপে ভারতের দাবির সমর্থক।

সিংহল পার্লামেণ্টের নিম্নসভা 'হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভস'-এর মোট ১৫১টি আসনের ৬৬টি আসন লাভ করেন শ্রীডাডলী সেনানায়েকের দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি, আর তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি ও ট্রটস্কীপন্থী লঙ্কা সম-সমাজ দল মিলিতভাবে জয়ী হন ৫১টিতে। শ্রীসেনানায়েকের দল অবশ্য একক শক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'তে পারেন নি, এবং সে কারণে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁকে প্রধানত তামিলভাষী সিংহলীদের দলগুলির সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়েছে এবং তামিলভাষীরা এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেনানায়েক মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন যে তাঁদের দাবিগুলির প্রতি সুবিচার করা হবে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, শ্রীসেনানায়েকের মন্ত্রিত্বকালে সিংহলবাসী দশলক্ষ তামিলের বহু অভিযোগের প্রতিকার হবে এবং ভারত ও সিংহলের সৌহার্দ্য-বন্ধন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ় হবে। তবে নীতিজ্ঞানবর্জিত চীনা চররা এত সহজে হার মানবে বলে মনে হয় না। নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির আশায় তারা হয়ত ঐ দ্বীপরাষ্ট্রটিতে এবার

সিংহলী-তামিল বিরোধ জাগিয়ে অনর্থ ঘটাতে চেষ্টা করবে। সিংহলের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধু এইটুকুই আশঙ্কার বিষয়।

ক্রুশ্চেভের আবির্ভাব

কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে হেভীওয়েট বক্সারদের তুলনা করা যায়। অনেককে ধরাশায়ী ক'রে তাঁরা বিজয়মঞ্চে আরোহণ করেন, কিন্তু আরোহণের মুহূর্ত থেকেই তাঁদের আরও জোরালো মুষ্টিকের অতর্কিত আঘাতে নক-আউট হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক থাকতে হয়, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অতি সতর্কতাও তাঁদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। আর যে-সব রাষ্ট্রনায়ক একবার ধরাশায়ী হন, বক্সিং-এর ভাষায় 'দে নেভার কাম ব্যাক'। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বশেষ উৎখাত রাষ্ট্রনায়ক মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই লজ্জাকর অবস্থার অবসান ঘটাতে তৎপর হয়েছিলেন এবং এক সময় বিশ্ববাসীর মনে এরকম একটা ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন এবং মুহুর্মুহু নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র শেষ হবে সে-দেশে। কিন্তু গত অক্টোবর মাসে ক্রুশ্চেভের অকস্মাৎ পতনে সে আশা ধূলিসাৎ হয়।

কিন্তু সোভিয়েট ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য ও আশা-ব্যঞ্জক ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক্রুশ্চেভ প্রায় ছয় মাস অজ্ঞাত-বাসের পর আবার জনসমক্ষে আবির্ভূত হচ্ছেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয়েও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় মার্চ মাসের মাঝামাঝি মস্কো সিটি কাউন্সিল ও সুপ্রীম সোভিয়েট অফ দি রাশিয়ান রিপাবলিকের নির্বাচনে ভোটদাতা হিসাবে। তার কয়েকদিন পরে আবার তিনি আবির্ভূত হন এক প্রদর্শনীতে এবং দ্বিতীয়বার এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁর সুপরিচিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, শুধু শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের দ্বারাই জগৎ রক্ষা পেতে পারে, যুদ্ধের দ্বারা নয়। যুদ্ধ জগতকে ধ্বংস করবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্যা সমাধানের দিন শেষ হয়েছে। ভিয়েৎনাম প্রভৃতি যাবতীয় বিরোধেরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

পূর্বেই যেকথা বলা হয়েছে, সোভিয়েট রাজনীতিতে কোন ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রনেতার প্রকাশ্যে পুনরাবির্ভাব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ সম্পূর্ণ অভিনব ঘটনা। একারণে বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে যে, ক্রুশ্চেভ আবার হয়ত প্রবীণ রাষ্ট্রনেতারূপে সোভিয়েট রাজনীতির পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হবেন। এ ধরনের অনুমানের যথেষ্ট সঙ্গত কারণও আছে। ক্রুশ্চেভ অপসারিত হ'লে সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার কয়েকটি জটিল সমস্যার সমাধান হবে বলে যাঁরা আশা করেছিলেন, ক্রুশ্চেভের ছয় মাস অনুপস্থিতি তাঁদের সে আশা নির্মূল করেছে। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন নেতারা আপোষে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। নতুন সোভিয়েট নেতৃত্বকে চীনা নেতারা আরও জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে সুরু করেছেন, এবং চীন-সোভিয়েট বিরোধ এখন আর দলীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, তা রাষ্ট্রীয় ও কূটনৈতিক স্তরে বিস্তৃতিলাভ করেছে। ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে এবং প্রধানত কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য ও ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিষ্প্রতিকার নীরবতা পালন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সঙ্গেও ক্রুশ্চেভোত্তরকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের বন্ধন শিথিলতর হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সঙ্কটেরও বিশেষ কোন প্রতিকার হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ, সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কম্যুনিজমের মূলকথা সমবায় ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করছেন। সুতরাং সোভিয়েট সরকার ক্রুশ্চেভকে বাদ দিয়ে ক্রুশ্চেভবাদ অনুসরণ করা অপেক্ষা ক্রুশ্চেভকে পুনরায় পুরোভাগে আনাটাকে নানা কারণে সুবিধাজনক ভাবতে পারেন। এ ব্যাপারে অন্য দিক থেকেও খুব বেশী অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কারণ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের মতবিরোধের কথা কখনও প্রকাশ্যে প্রচারিত হয় নি। বার্ধক্য ও অসুস্থতাই তাঁর অবসর গ্রহণের কারণ বলে জানানো হয়েছে।

ব্যর্থসফর ঃ

পাক্-প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অনুকূলে সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধার

প্রত্যাশায় সোভিয়েট সফরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে প্রায় শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে। ভারতকে অস্ত্র-সাহায্য বন্ধের জন্য পাক্-প্রেসিডেণ্ট সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে সোভিয়েট সরকারের কাছে একটা যাহোক কিছু প্রতিশ্রুতি পাবেন বলে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব আশা করেছিলেন, কিন্তু সফর-আন্তিক যুক্ত বিবৃতিতে কাশ্মীর কথাটি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। সোভিয়েট ইউনিয়নে বসে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের জন্য আয়ুবের সফরসঙ্গী পাক্-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন, তাতে একজনও সোভিয়েট সাংবাদিক উপস্থিত হন নি। আবার পাক্ প্রেসিডেণ্টের সফরকালেই ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের দীর্ঘমেয়াদী সাহায্যচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারত-সোভিয়েট অকৃত্রিম মৈত্রীই পাক প্রেসিডেণ্টের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের প্রধান কারণ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯৩৩)—বিচিত্রিতা—র র ১৯

ঐ—ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—Behold the Rains come with all splendour and youthful freshness

বাকি আমি রাখব না কিছুই (বসন্ত)—I shall not keep back my possessions but will scatter them along your Path

তাপের তাপের বাঁধন কাটুক—Let my arid penance find its fulfilment in His merciful showers

নমো নমো নম করুণা ঘন নম হে—We bow to thee, O Serene—Thy immortal touch has made our vision pure and has sanctified our lives

(১৯৪৩)—শ্রাবণ গাথা * র র ১৯

এসো নীপ বনে ছায়া বীথিতলে—O Sravan, the Lady of the Rains, we welcome you

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর বিরহ কাতর শর্বরী—It rains incessantly—The night is disconsolate

ধরণী গগনের মিলনের ছন্দে—In harmony, with the union of the Earth and the Sky

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু—The rumble of the drum stirs my heart

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার, আজি রইলে আড়ালে—O full moon of Sravan, why remain veiled to-day (আষাঢ়ের)

ওরে ঝড় নেমে আয়—The rains have come—Let storm descend on my being, my emptiness

ভেবেছিলাম আসবে ফিরে—I bade farewell to you in tears, at the end of Spring, hoping you would come back to me

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে—The flock of wild ducks migrate through yonder clouds

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি (চিত্রাঙ্গদা)—O Beautiful, O Serene, thou comest to quench the thirst and allay the misery of the creatures of the universe

মমচিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে (অরূপরতন)—In my heart, He ever dances

দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা—O Spirit of Lightning, half-hidden, half revealed

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে—The roving clouds have gathered in the courtyard of Sravan Sky

ওরা অকারণে চঞ্চল—Wherefore are the cluster of young leaves is agitated in the bough ?

হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে (অচলায়তন)—Free me as free are the birds of the wilds

---

* গীতবিতান সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ১৯৬০ সনে ৩১এ জুলাই সমাবর্ত্তন উৎসবে অনুষ্ঠিত 'শ্রাবণ গাথা'র গানগুলি পুস্তিকাকারে সংকলিত ও অনূদিত হয়। ২২টী গানের ২১টী অনুবাদ করেন প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত। ১৭তম গানটি (হারে রে রে রে) কবির অনূদিত। Crossing No. 42তে আছে।

মম মন উপবনে চলে অভিসারে—In my mind's grove, the forlorn maiden ventures out

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি—Thy flute call is sounded through thunder

দেখো দেখো শুক তারা আঁখি মেলি চায়—Behold, the Morning Star rises at the edge of the dawn

খেলার সাথি, বিদায় দ্বার খোলো—Open the door, play mate. Let me bid adien

বাদল ধারা হোলো সারা, বাজে বিদায় সুর—The Rains have ended. Leave-taking song is in the air

(১৯৩৫)—শেষসপ্তক– র র ১৮

স্থির জেনেছিলাম পেয়েছি তোমাকে নং ১ কবিতা—Poems 99—I neglected to appraise your work

কেউ চেনা নয় সব মানুষই অজানা নং ১২ „ —V.B.Q. Feb.-April, 1954—The Unknown—Tr. by S. Moitra

যখন দেখা হল তার সঙ্গে চোখে চোখে „ ৩০ „ —*Hind. Std.* Ann. 1954—The Meeting—Tr. by S. Moitra

পাড়ায় আছে ক্লাব, আমার একতলার ঘরখানি দিয়েছি এদের ছেড়ে ৩১ নং ,
—V.B.Q. May, 1938—Visitation Tr. by K. Ray

বাদ্‌শাহের হুকুম—সৈন্যদল নিয়ে এল ৩৩ নং „ —*Hind. Std.* Ann. 1954—The Sikh—Tr. by S. Moitra

পথিক আমি পথ চলতে চলতে দেখেছি ৩৪ নং „ —V.B.Q. Feb.-Apr. 1954—Impermanence—Tr. by S. Moitra

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে, চিল মিলিয়ে গেল ৪ নং ৪র্থ স্তবক
—Later poems of Tagore p. 45—On the tamarind tree can be heard

মনে হয়ে ছিল আজ সবকটা দুর্গ্রহ ১০ নং ১ম স্তবক—Later poems p. 55—To-day it seemed as though all the hostile planets had sat in evil counsel

দেখতে পেলেম কত কালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি ১০নং শেষ স্তবক
—Later poems p. 55—The misery, shame and humiliation of past ages

সুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে ২২ নং ১ম স্তবক
—Later poems p. 56—From the very beginning of time he has joined my company

আমি দেখব ওকে জানলায় বসে, ঐ দূর পথের পথিককে ২২নং ৪র্থ স্তবকের শেষে
—Later Poems 56—Sitting on the window I shall watch him'

বিদ্বেষে, অনুরাগে, ঈর্ষায়, মৈত্রীতে ৪৩নং শেষের দিকে
—Later Poems p. 57—Through hatred and affection, jealousy and friendship

যাকে বলতে পারি আমার সবটা ৯নং ২য় স্তবকে—Later Poems p. 58—That which can be called, the 'whole I'

---

* 'পুনশ্চ'র পাদটীকায় Later Poems of Tagore এ—কবিতাগুলির আংশিক অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংসারটা আকারের মহাযাত্রা ১৫নং (২) তৃতীয় স্তবকের শেষে
—Later Poems p. 63—This world is a great journey of forms

এই নিত্য বহমান অনিত্যের স্রোতে ৮নং ৫ম স্তবক—Later Poems p. 64—In this evermoving stream of the transient

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি ৮নং শেষ ৪ লাইন—Later Poems p. 64—I contemplate the Darkness

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি ৭নং ৫ম স্তবক—Later Poems p.64—O thou ascetic Lord of time

সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি অযুত নিযুক্ত কোটি কোটি বৎসরের মাপে

…অব্যক্ত তারা ছিল প্রচ্ছন্ন, ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল মরণের ওড়া উড়তে ১১নং প্রথম দিকে
—Later Poems p. 65—The largest of the fields is measured in terms of billions of years
—From their hiding place in the unmanifest, all things rushed into the manifest to dance a death-dance

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কালের পরিমণ্ডল ২১নং মাঝের দিকে
—Later Poems p. 65—Within the larger boundary, smaller circles of time are being diawn and erasea

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের নিমেষ হীন নীচে আমার লতাবিতানে বসে ২১নং শেষের দিকে
—Later Poems p. 66—To night, sitting in my grove, beneath the steady light of the Stars

তাই ওগো বনস্পতি, তোমার সম্মুখে এসে বসি ২৬ নং ৪র্থ স্তবক—Later Poems p. 66—That, O tree, is why I come and sit in front of you

(১৯৩৫) বীথিকা র র ১৯

দুজন—সূর্য্যাস্ত দিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছাসি—V.B.Q. November, 46—January, '47—The Two
—*Hindusthan Standard*, Ann. 1946—The Two—Tr. by K. Ray

সাঁওতাল মেয়ে—যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে—V.B.Q. May-July, 1935—The Santal woman hurries up and down
Poems 100

ঋতু অবসান—একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে—V.B.Q. February-April. 1936—In the Spring Time of wistful hours

বাণী—[বীথিকা ১৯৬১ সংস্করণে]—V.B.Q. October, 1929—We are borne in the arms of ageless light
—Reprinteed in Religion of Man—Introductory

(১৯৩৬) পত্রপুট র র ২০

ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত ১৫ নং—V.B.Q. November, '38—The Outcast—Tr. by K. Ray
—Mankind, Hyderabad, August, '57—The Casteless—By J. Sen

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে ১৬ নং (আফ্রিকা)—Poems 102—In that early dusk (To Africa)

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে ১৭ নং—Poems 108—The War drums are sounded
Reprinted from V.B.Q. May, 1938—Worshippers of Buddha

প্রবাসীর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা

১৩৭২ সাল 'প্রবাসী'র পক্ষে একটি স্মরণীয় সাল। স্মরণীয় এই কারণে, আজ থেকে একশ' বছর আগে দেশ-প্রেমিক রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তির দিন। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দকে স্মরণ করিয়া "প্রবাসী"র একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করিবার আয়োজন করা হইতেছে। এই সংখ্যাটিতে কেবল রামানন্দেরই রচনা থাকিবে। সাংবাদিক হিসাবেই শুধু নয়, দেশ-প্রেমিক রামানন্দ বিবিধ কাজের মধ্য দিয়া কিভাবে দেশের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষাব্রতী রামানন্দ কোন্ কোন্ বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানব-দরদী রামানন্দ মানুষের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, তাহার সকল পরিচয় তাঁহারই রচনার মধ্যে বিধৃত আছে। সেইসব রচনাগুলি দ্বারা অলংকৃত এই বিশেষ সংখ্যাটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি। এবং এ বিশ্বাসও রাখি, যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন, যাঁহারা আজও ছাত্র, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানির মূল্য হবে অপরিমেয়।

রামানন্দকে জানিবার ও চিনিবার পক্ষে যেসব তথ্যাদির প্রয়োজন তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংগ্রহশালায় রাখিবার মতো বই, পাঁচজনকে দেখাইবার মতো বই।

অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দূরের যাত্রী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

যুদ্ধে আত্মরক্ষা

যুদ্ধকালে শত্রুনিপাত অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য ব্যবস্থা আত্মরক্ষার। নিজেকে বাঁচাইয়া শত্রুকে আঘাত করাই যোদ্ধার উদ্দেশ্য। শত্রু যদি অবাধে যোদ্ধাকে আঘাত করিতে পারে তাহা হইলে যোদ্ধার যুদ্ধশিক্ষা উচিত প্রকার হয় নাই বলিয়া ধরিতে হইবে। এই কারণে সমর-শিক্ষার মধ্যে আত্মরক্ষার কথা সর্ব্বকালে বিশেষ করিয়া শেখান হয়। যুদ্ধে যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিয়া থাকা এবং শত্রুর গোলাগুলী যাহাতে নিজেদের উপরে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কারণে শত্রু লক্ষ লক্ষ গোলা-গুলী-বোমা নিক্ষেপ করিলেও হতাহতের সংখ্যা সচরাচর অল্পই হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষের উপর গুলী চালান পাকিস্তানের সৈন্যদের একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা এতাবধি সম্ভবত দুই-চার কোটি বার ভারত লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের লক্ষ্যভেদে অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক অথবা আমাদের গা-ঢাকা দিবার ক্ষমতা অধিক থাকাতে পাকিস্তানী গুলীতে অল্পই ভারতীয়েরা খুন-জখম হইয়াছে। ইহা দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, আমরা যুদ্ধকার্য্যে অপারগ ও অক্ষম। পাকিস্তানিগণ পিছন হইতে ছুরি চালাইয়াই "স্বাধীনতা" অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গুপ্তহত্যাপ্রীতি তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। সম্মুখ সমর ও অপরাপর ধর্ম্মযুদ্ধের যে-সকল চিরপ্রচলিত বিধান আছে পাকিস্তানীরা তাহা মানেন না। যেনতেন প্রকারে পর-ধন আহরণ অথবা পরদেশ দখল তাঁহারা ন্যায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; ইসলামে এ সম্বন্ধে কি নির্দ্দেশ আছে তাহা যাচাই করিবার প্রয়োজন ইসলামী-রাজ্যে কেহ স্বীকার করেন না। এইরূপ অবস্থায় ভারতের সামরিক কর্ত্তব্য কি তাহা বলা কঠিন। একটা মত এই যে, পাকিস্তানকে তাহার নিজের ভাষায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ অংশত পাকিস্তান দখল করিয়া বলা যে, দখল করা অংশ ভারত সীমানার অন্তর্গত। কিংবা বলা যে পাকিস্তান যত হিন্দু ও অমুসলমানকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন মাথাপিছু দশ একর অনুপাতে তত জনের জমি বলিয়া ভারত ঐ-প্রমাণ জমি দখল করিবে। এই হিসাবে পাকিস্তানের দুই-চারিটি জেলা আমাদের অধিকারে আসা উচিত। অপর মতে, পাকিস্তানকে ভারতের বলা উচিত যে, তাহারা যদি যেখানে যেখানে ভারতে প্রবেশ করিয়া দেশ দখল করিয়া বসিয়া আছে সেই সকল স্থান ছাড়িয়া না চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত ভারতের শান্তির ও সখ্যের সম্বন্ধ একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের পরে আর থাকিবে না। এবং সেই নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হইলে পর সবলে পাকিস্তানকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা। তৃতীয় মত হইল জগৎ-সভায় আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনা-নালিশ প্রভৃতি করিয়া উক্ত সভার গুরুজন-দিগের সাহায্যে পাকিস্তানের কান মলাইয়া তাহাদের সৎপথে চলিতে বাধ্য করা।

প্রথম দুইটি মত বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কার্য্যকরী

নহে। ইহার কারণ ভারত সরকারের স্বভাবমূলভ শান্তি-প্রিয়তার আতিশয্য। বহু মহামানবের উক্তি শ্রবণ করিয়া ভারত সরকারের কংগ্রেসদলের নেতারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, শত্রুকে আঘাত করা মহাপাপ। অপরাপর যে সকল মহাপাপ আছে সেগুলি সহ্য করিয়া চলিতে হয়, কেননা ভারতের বাজারের ব্যবসায়ীগণ সেই সকল পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং তাহাদিগকে টানিয়া তুলিতে গিয়া সেই পাপপঙ্কে ভারতীয় পুলিশ ও অপরাপর রাজ কর্মচারী প্রভৃতিরাও আকণ্ঠ না হউক আবক্ষ নিমজ্জমান। নিরামিষ-ভোজী ব্যবসাদার ও তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজনগণ কিন্তু মারামারি কাটাকাটির বিপক্ষে এবং এই কারণে ভারতবর্ষ যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে "মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে" পশ্চাতে সরিয়া যাইতে হয়।

কারণটা যাহাই হউক একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে যে, ভারত-পাকিস্তান-চীন ঘটিত কোন যুদ্ধ হইলে ভারতবর্ষ সর্বাগ্রে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ দ্বারা তাহার ঘাঁটিতে পৌছাইয়া দিবে, অর্থাৎ "আক্রমণই আত্মরক্ষার" শ্রেষ্ঠ পন্থা এই নেপোলিয়নী সত্যের অনুসরণ করিবে; ইহা কষ্ট-কল্পনার কথা মাত্র। যুদ্ধ ঘটিলে ভারতই প্রথমে আক্রান্ত হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। বস্তুত **যুদ্ধ ঘটে নাই** কিন্তু **ভারত আক্রান্তই হইয়া রহিয়াছে।** কাশ্মীর, বাংলা, আসাম, কচ্ছ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান ভারতের সহস্র সহস্র বর্গমাইল দখল করিয়া শুধু বসিয়া নাই; সেই জবরদখলের জমি চীনকে দানও কিছুটা করিয়াছে। চীনও ভারতের বহু সহস্র বর্গমাইল জমি কাড়িয়া লইয়া তাহার তিব্বতের চোরাই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছে। ভারত সুতরাং শত্রুর আক্রমণ-বিধ্বস্ত অবস্থাতেই রহিয়াছে এবং যুদ্ধভয় তাঁহার একটা মহাভুলের ভয়। সাপ যাহাকে দেহের নানান স্থানে দংশন করিয়াছে তাহার সাপের কামড়ের ভয় থাকা উচিত নহে—কামড়ের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করাই তাহার অবশ্য ও অবিলম্বে কর্তব্য। আমাদের উচিত শত্রু নিপাতের ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক আদালতের মুনসুফমণ্ডলীর দ্বারা কিছু হইবে না। জগত জাতি সভার বড়মামা, মেজমামা, সেজমামা ও ছোটমামা, সকলেই গোপনে বা খোলাখুলি ভাবে শত্রুপক্ষের সহিত লিপ্ত। সুতরাং নিজবলে যদি আমরা আত্মরক্ষা না করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের চিরদিনই পরদাসখতে নাম লিখাইয়া চলিতে হইবে। পাকিস্তানের সৃষ্টি আমাদের স্বাধীনতার যুগের নূতন দাসখতের প্রথম পৃষ্ঠা। কাশ্মীর ধর্ষণ হজম করিয়া যাওয়া তার পরের পৃষ্ঠা। চীনের তিব্বত দখল মানিয়া লওয়া ও চীনের ভারতের উপর হামলা ও হুমকি তত:পর। এখন কচ্ছ, কুচবিহার, আসাম ইত্যাদি সম্মুখে। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া আহত অবস্থায় আমরা মৃত আদর্শের অহিফেন সেবন করিয়া হৃতবীর্য্য ও হতবুদ্ধি অবস্থায় শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছি। সামরিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিবার পর আমাদের দেখা কর্তব্য যে অসামরিক জনসাধারণের এখন কি ভাবে চলিতে হইবে। তাহারা যে যুদ্ধের "ঘুমন্ত অংশীদার" ও যে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের নির্বাচন নিযুক্ত ঘাটোয়ালবৃন্দ অদ্যাবধি মান-সম্মান রক্ষার কোন সাক্ষাৎ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই—সেই যুদ্ধ আরও অগ্রসর হইয়া যখন তাহাদিগের একেবারে ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে, তখন তাহারা কি করিবে? সেই কথার আলোচনা করিয়া এখনকার মত এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যান স্থগিত রাখিব।

অসামরিক সাধারণের আত্মরক্ষার জন্য যে-সকল ব্যবস্থার পূর্ব্বাভিনয় চলিতেছে তাহার মূল পরিকল্পনা হইল বিমান আক্রমণ হইলে বা হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে সহরগুলি আলো নিবাইয়া কেমন করিয়া রাত্রে অদৃশ্য করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তৎপরে, যদি আক্রমণ হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া আহতদিগকে উদ্ধার করা হইবে, কোথায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করা যাইবে ও আগুন নিভান কিভাবে সম্ভব হইবে। বাড়ীঘর বোমায় ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই সকল স্থান হইতে লোকেদের কেমন করিয়া বাহির করা হইবে ও তাহাদিগের তৈজসপত্রাদি কি ভাবে সংরক্ষিত হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কলিকাতার মত বৃহৎ শহরকে অন্ধকার করিলেই শহর বিমান আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া যাইবে ইহা ভুল ধারণা। আধুনিক প্রথায় "রকেট" বা হাউই-বোমা দিয়া আক্রমণ করিলে কলিকাতা অত্যন্তই সহজ আক্রমণীয়। রকেটের পাল্লা বহুশত মাইল এবং তাহা হিসাব করিয়া ছাড়িলে কয়েক শত মাইল দূরেও দুই-চার হাজার গজ ব্যাসের কোন লক্ষ্যে আঘাত করিতে পারে। সুতরাং অন্ধকার করা-না-করার কোন বিশেষ মূল্য নাই বর্তমান রকেটের যুগে। দিনের বেলাও অবলীলাক্রমে আক্রমণ চলিতে পারে এবং চলিবে বলিয়াই মনে হয়। রকেটের বিস্ফোরণ ক্ষমতা বিমান নিক্ষিপ্ত বোমা অপেক্ষা অনেক অধিক এবং রকেট চলিলে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতরে বসিয়া থাকিলে প্রাণ বাচান সম্ভব হয় না। আণবিক রকেটের কথা আমরা বলিতেছি না। আণবিক যুদ্ধ হইবে না বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। যদিও ইহার কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই এবং ভারতের উচিত আণবিক যুদ্ধের জন্য

কিছুটা প্রস্তুত থাকা। অন্তত রকেট যুদ্ধে রকেট দিয়া রকেট প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপান কলিকাতার উপর বোমা নিক্ষেপ করে তখন কলিকাতাবাসী বহুলক্ষ লোক রাস্তা দিয়া শহরত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় ও সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হয়। রেলপথে অল্প লোকেই পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। বর্ত্তমান কোন যুদ্ধে ঐরূপ বোমা অথবা রকেট পড়িলে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নের ধাক্কা প্রবলতর হইবে। কারণ এখন কলিকাতায় অপর দেশবাসীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। তাহারা অনেকেই নিরাপত্তার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। যাহারা এই শহরের বাসিন্দা, তাহারা যদি অল্প আক্রমণ হয় তাহা হইলে হয়ত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বৃহৎ রকেট আক্রমণ হইলে তাহারা পলায়নপর হইবে এবং আমাদের কর্ত্তব্য হইবে তাহাদিগকে শহর হইতে সরাইয়া দেওয়া। অন্তত স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা ও শিশুদিগকে শহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন হইবে। কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইবার যে কয়টি পথ আছে তাহার মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নিশ্চয়ই পলাতকদের ভিড়ে নিষ্ক্রমণযোগ্য থাকিবে না। রেলপথে চেষ্টা করিলে একদিনে কত লোক যাইতে পারে হিসাব করা প্রয়োজন। একটি পুরা রেল ট্রেণে বোধ হয় দুই হাজারের অধিক লোক কোনমতেই যাইতে পারে না। দেড় হাজার হইলেই ভাল। একদিনে একশত ট্রেণ বাহির হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রেলপথে শহর ছাড়িয়া দিনে এক লক্ষ লোকও বাহির হইতে পারিবে না। বাহির হইলেই তাহারা যাইবে কোথায়? কিছু লোকের বাহিরে গ্রামে ঘরবাড়ী আছে তাহারা সেখানে যাইতে পারে। বাকি লোক কোথায় যাইবে?

সকল বাসিন্দার মধ্যে যদি অর্দ্ধেকও চলিয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে তিন সপ্তাহের কম সময় লাগিবে না। এই তিন সপ্তাহকাল শহরের লোকের অবস্থা কি হইবে? পঞ্চমবাহিনী ব্যতীত সাধারণ লুঠেরার অভাব নাই কলিকাতায়। এই সকল লোক লুঠ করিতে সুরু করিলে খালি ঘরবাড়ী কে রক্ষা করিবে? মাছ, তরকারি, মাংস, ডিম, তেল, ঘি প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও চাল, ডাল, আটা, নুন প্রভৃতির সংস্থান কয়দিনের মত থাকে এই শহরে? ঔষধ, ডাক্তার, আলো, যানবাহন ইত্যাদির কি হইবে? দুধ কি আসিতে থাকিবে না বন্ধ হইয়া যাইবে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিবে অসামরিক জনসাধারণ, পুলিশ, সেনাবাহিনী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগের উপর। সাধারণ যদি দলবদ্ধ ভাবে সংযত, সংহত হইয়া চলিতে সময় থাকিতে শিখেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের কোন ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে না। সরকারী কর্ম্মচারীগণও যদি ব্যবস্থার অভিনয় ও কাগজে-কলমে মাত্র কাজ ছাড়িয়া বাস্তবের সহিত সংযুক্ত হইয়া চলিতে শিখেন তাহা হইলেই তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য করিতে সক্ষম হইবেন।

আয়ুব খান যে টোটাল ওয়ার বা সমগ্র জাতিগতভাবে মহাযুদ্ধের কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থ সকলেই যুদ্ধলিপ্ত হইয়া যাইবে অর্থাৎ আক্রমণ সকলের উপরেই হইবে। তাহা হইলে এই মহাজাতির জন্য অস্ত্রধারণ করিতে হইবে বহু কোটি সৈন্যকে। অস্ত্র ও অপরাপর মালমশলা সরবরাহ করিবে আরও কয়েক কোটি লোক। বাকি জনসাধারণ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবে, যানবাহন চালনা কার্য্য করিবে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা ও শিশুদিগের পরিচর্য্যা ও লালন-পালন কার্য্য করিবে। সামরিকভাবে দলবদ্ধ করিতে হইবে অন্তত চার-পাঁচ কোটি নরনারীকে। এই সকল লোক বোমা, রকেট, গোলা, গুলী, গ্যাস, বীজাণু, আণবিক বিস্ফোরণ—কোনও কিছুর ভয়ে হটিবে না। এই পাঁচ কোটি যোদ্ধা কোথায়? বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যসংখ্যা একত্র করিলে কি এক কোটি হয়? হয় না বলিয়াই আমরা জানি। ভারতের যে মহামানব তাহার চুলচেরা বিচারলব্ধ কোনও রাষ্ট্রমত নাই। আছে শুধু স্বাধীনভাব আকাঙ্ক্ষা, উন্নতির দাবি, বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ ও প্রেরণা এবং মানবতার ঐশ্বর্য্যে অধিকার। কুতর্ক, কুচক্র, কুমন্ত্রণা ও মিথ্যার আশ্রয়ে সাধারণকে বঞ্চনা করিয়া ক্রমশঃ এই মহাজাতিকে যাহাতে কেহ সর্ব্বনাশের পথে না লইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা শুধু জাতি নিজেই করিতে পারে। পরনির্ভরশীল হইয়া বসিয়া থাকিলে ও প্রবঞ্চনা পরায়ণ নিষ্কর্ম্মা বাক্যবিশারদদিগকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

অ.

বিদেশ ভ্রমণ

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যখন পাকিস্তান ও ভারতে পরিণত হইল এবং ব্রিটিশ যখন ভারতবাসী জনসাধারণের কোনও অনুমতি বা অনুমোদন না লইয়া নিজ ইচ্ছায় কংগ্রেস দলের হস্তে ভারত শাসনকার্য্য ন্যস্ত করিল, তখন হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় দলের সভ্য বা বন্ধুজন ব্যতীত অপর লোকের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস অনুমোদিত স্বদল

বা "বিপক্ষ" দলের ব্যক্তিগণ প্রায়ই অকারণে বা "নামকা-ওয়াস্তে" কারণে বিদেশ পর্য্যটন করিয়া আসেন। এই কমিটি বা সেই কমিটি অথবা কোন ডেলিগেশন, মিশন বা আর কিছু বলিয়া বহু অকর্ম্মণ্য, অজ্ঞ ও সস্তার চাতুর্য্যে বাহাদুর লোক দেশের বহুকষ্টলব্ধ অর্থ উড়াইয়া দেশভ্রমণ করিয়া আসেন। আর বিদেশ ভ্রমণ করেন ব্যবসাদারগণ। তাঁহারা বিনা পয়সায় দেশভ্রমণ করিয়া আসিবার জন্য বিখ্যাত। তাঁহাদিগকে ব্যবসার কারণে সর্ব্বদাই অপর দেশের ব্যবসাদারগণ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন ও বহুশত কোটি টাকার স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, রেডিও, ঘড়ি, টেপরেকর্ডার-যন্ত্র ইত্যাদিও বিদেশীগণ বিনামূল্যে এদেশে চোরাইভাবে রপ্তানি করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। এই অলৌকিক ও ক্রমবর্দ্ধনশীল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য যে গুপ্ত বিলিব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাহার সহিত ভারতীয় ব্যবসাদারদিগের সহিত বিদেশীয় ব্যবসাদারেরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করেন। রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণের বিদেশ ভ্রমণের ফলেও দেশের কোন লাভ হয় বলিয়া কোন বুদ্ধিমান লোক মনে করেন না। ছাত্র, খেলোয়াড়, সামরিক শিক্ষার্থী প্রভৃতি বিদেশ গমন করিলে দেশের নাম ও লাভ হয়। এবং যে সকল লোক ব্যবহার, জ্ঞান ও গুণের দ্বারা অপর দেশের নিকট ভারতীয় কৃষ্টির প্রকৃত পরিচয় দিতে পারেন তাঁহাদিগের বিদেশ গমন দেশের সুনাম ও খ্যাতির কারণ হয়। অশিক্ষিত, অৰ্দ্ধশিক্ষিত, বিকৃতরুচি ও অদ্ভুত চরিত্র অনেক লোক আজকাল বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন, যাহারা নিজ ব্যবহারের দ্বারা ভারতকে জগতের চক্ষে হেয় ও হাস্যাস্পদ করিয়া আসেন। এই সকল ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠাইয়া কংগ্রেসী সরকার নিজ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। যে-সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও কর্ণধারগণ বিদেশে না যাইলে চলে না তাঁহাদিগের কথা বিভিন্ন; কিন্তু অযথা ও বিশেষ কারণ না থাকিলেও বহু জ্ঞানবুদ্ধি ও ভব্যতাহীন ব্যক্তি দেশের পয়সা নষ্ট করিয়া বিদেশে গিয়া লোক হাসাইয়া ফিরিয়া আসেন; তাঁহাদিগকে কে বিদেশে যাইতে দেয়? এবং উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞান-গুণ-বিশিষ্ট সুসভ্য ভারতীয়দিগকেই বা কেন বিদেশ ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না? সকল ভারতবাসীরই ইচ্ছা হইলে অন্তত দশ-বৎসরে একবার বিদেশ ভ্রমণের অধিকার থাকা উচিত। কোন গুণ না থাকিলে; যথা শিক্ষার অভাব কিংবা জগৎ সভ্যতার আদর্শরক্ষা করিয়া চলিবার অক্ষমতা ইত্যাদি; সেই কারণে ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট না দেওয়া যাইতে পারে। উচ্চ হুঙ্কারে মুখ প্রক্ষালন, অধমাঙ্গ উপযুক্ত-রূপে আবৃত না রাখা অথবা প্রাতঃকালে লোটা হস্তে "লর্ডস" ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে অবতরণ ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকিলে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করিয়া কিছুলোকের দেশ-ভ্রমণ প্রতিরোধ অথবা সংযমন প্রয়োজন হইতে পারে। অর্থাৎ একদিকে বিদেশ ভ্রমণের অধিকার সকল স্বাধীন ভারতীয়ের সমানে থাকা উচিত। অপরদিকে কোন ভারতীয়েরই বিদেশীদিগের নিকট দেশের মুখ নীচু করিবার সুবিধা না থাকা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত বিদেশে গিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া যাঁহারা "নূতন নূতন" আবিষ্কার ও নবলব্ধজ্ঞানের বন্যা বহাইয়া দিয়া দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি "নূতন" দিকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের বিলম্বলব্ধ সাবালকতার হস্ত হইতে আমাদিগের সমবেতভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, যিনি দেখিতে জানেন তিনিই শুধু দেখাইতে পারেন ও যিনি শিখিতে পারেন শিখাইবার অধিকার শুধু তাঁহারই আছে। অ.

শেখ আবদুল্লা

ভারতরক্ষা অথবা "ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া" কার্য্যটি কংগ্রেসী সরকার কথঞ্চিৎ কিংবা বেশ কিছুটা লঘুচিত্ত বা "ফ্রিভোলাস" ভাবে করিয়া থাকেন। গভীর ভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া কাজ করার ক্ষমতা কংগ্রেসী সরকারের নাই বলিয়াই ভারতের বুদ্ধিমান সাধারণের বিশ্বাস। ইহার কারণ যে-সকল ব্যক্তি কংগ্রেসে নেতার পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞান বিচার শক্তি অভিজ্ঞতা প্রভৃতি কার্য্যকরী গুণের আপেক্ষিক অভাব। তাঁহারা কোনও বিষয়ের গুরুত্ব বিচারে সক্ষম নহেন ও সেই কারণে তাঁহারা সকল কার্য্যই উপর উপর দেখিয়া যথেচ্ছা কিছু একটা করিয়া ফেলেন ও পরে পুরাতন আই. সি. এস. পদ্ধতিতে অক্ষমতার সাফাই গাহিয়া দিন গুজরান করেন। ফলে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অথবা ভারতরক্ষার কার্য্য ক্রমশঃ অচল হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভারত সাধারণের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে। সামরিক শক্তি সামরিক ব্যয় তিন-চার গুণ বাড়াইয়া দিয়াও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাইলেও কংগ্রেসী দীর্ঘসূত্রতা, স্থিরবীর্য্যের অভাব ও পরমুখাপেক্ষার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার হয় না। সুতরাং যেমন সমরে তেমনি শাসনে ভারত নিজ শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে বিশেষ সক্ষম নহে। কিন্তু ভারতের ঢাল-তলোয়ারহীন মহারথি-বৃন্দের কোনও লজ্জা নাই। তাঁহারা সমানে নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা অস্বীকার করিয়া ও যথেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিয়া ভারতকে ক্রমশঃ অধোগতির চরমে পৌঁছাইয়া দিবার

ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহার প্রতিকার ভারতের জনসাধারণের হস্তেই আছে। তাঁহাদিগের এখন হইতে বুঝা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রীয় দলগুলি ভারতের উন্নতির পথে মহাবিঘ্নের কারণ। সাধারণের রাজই স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারের অধিকার দিয়া বাড়ীতে বসিয়া পাকিস্তানের আক্রমণ অথবা দুর্ভিক্ষের আতঙ্কে অসাড় অচল হইয়া থাকিলে, সে অবস্থাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই দেশরক্ষা ও দেশের উন্নতির একমাত্র পথ।

শেখ আবদুল্লার সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব কংগ্রেসী দলের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য্যে অক্ষমতার একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহাকে কখনও জেলে বন্ধ করিয়া, কখনও বা ৩০'৪০ হাজার টাকার বিদেশী অর্থ হাতে তুলিয়া বিদেশে ভারতবিরুদ্ধ প্রচার চালাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া ভারত সরকার দেশের বহু অপকার করিয়াছেন। ইহার জন্য যিনি বা যাহারা দায়ী তাঁহার বা তাঁহাদের কোনও শাস্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অতি অল্প অপরাধেই অনেক গরীব রাজকর্ম্মচারীর চাকুরি যায় বা অপর প্রকার সাজার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীনকালে একটা কথা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিতে প্রচলিত ছিল, তাহার অর্থ, রাজা কখনও কোনও দোষ করিতে পারেন না। The King can do no wrong। এখন রাষ্ট্রীয় দলতন্ত্র বলিতেছে The Party can do no wrong অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় দল, বিশেষত পালের গোদা যাঁহারা তাঁহারা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে। শেখ আবদুল্লাকে উটাকামণ্ডে এমনই আরামে ও স্বাধীন আবহাওয়ায় রাখা হইয়াছে যে তাঁহার নিকটে অবাধে একজন শ্বেতকায় সাংবাদিক গিয়া কথাবার্ত্তা চালাইয়া ধরা পড়িয়াছে। উক্ত শ্বেতকায়কে ভারত সরকার কোন সাজা দিতে সাহস করেন নাই। শুধু দেশ হইতে নিজ দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন। শেখ আবদুল্লাকে দেখিয়া মনে হয় তিনি একটা ভারতীয় অপরাধী নহেন, তিনি বিদেশী দুত, চর অথবা সামরিক বন্দী। ডি. আই আইনে অবরুদ্ধ সকল ব্যক্তিকে দার্জ্জিলিং, সিমলা ও অপরাপর গ্রীষ্মাবকাশ যাপনকেন্দ্রে কেন পাঠাইয়া দেওয়া হয় না? ডি. আই. পি নীতির এইটি কি আর একটি অভিব্যক্তি?

অ.

জাতীয় নিরপেক্ষতা

ভারত, জাতি জগতে নিরপেক্ষতার পথে চলিয়া থাকেন বলিয়া প্রচার। অর্থাৎ ভারত বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে যে পারস্পরিক সামরিক সন্ধিসর্ত্তাদি আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। কাহারও সহিত কাহারও যুদ্ধ হইলে ভারত কোন দিকেই সাহায্য করিতে বাধ্য নহেন। ভারত জাতিসভার কোনও দল বা গণ্ডির অন্তর্গত নহেন। ইহা উত্তম কথা। এবং এই স্বাতন্ত্র্য ভারতের পক্ষে রক্ষা করা সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ বর্ত্তমান জগতের জাতিমণ্ডলীর মধ্যে যে-সকল রকমারি মত, রাষ্ট্রদর্শন ও অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার প্রায় সবগুলিই ভারত কোনও না কোন ভাবে মানিয়া চলেন। আমেরিকা-ইংলণ্ড প্রভৃতির রক্ষণশীল সাধারণতন্ত্রের ধনবাদ (ইংলণ্ডের রাজারাণী থাকিলেও এবং শ্রমিক সরকার হইলেও মূলত ইংলণ্ড রক্ষণশীল সাধারণতন্ত্রী ধনবাদ মানিয়া চলে), ফ্রান্স, ওয়েষ্ট জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জাপান, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশেও চালু রহিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট মুলুক যে দুই-চারিটি সেগুলিতে ক্ষুদ্র গণ্ডির রাজত্ব হইলেও ব্যক্তির দিক দিয়া স্বাধীনতা খর্ব্ব হইলেও ধনবাদ বর্ত্তমান। রুশ ও রুশের নিকটবন্ধু অপরাপর জাতিগুলি আজকাল জগতের সকল জাতিকে যুদ্ধে জয় করিয়া "মুক্তি-দান" করিবার পরিকল্পনা আর করেন না। ইহাতে এই "নিজে বাঁচিয়া থাক ও অপরকেও বাঁচিয়া থাকিতে দাও" মতাবলম্বী কম্যুনিষ্ট জাতিমণ্ডলী, চীনের বিশ্বগ্রাসী হিংস্র অপরের হাত-পা কাটিয়া দাসত্বশৃঙ্খল খুলিয়া দিবার ব্যবস্থাতে বর্ত্তমানে আর বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদিগের মধ্যেও মাঝামাঝি ও চরমপন্থী দুইটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল দল ব্যতীতও কতকগুলি সুবিধাবাদ অনুসরণে গঠিত দল গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন পাকিস্তান ও চীন। ভারত এই সকল জাতির সহিত কোন সামরিক সম্বন্ধ রাখেন না। এই সকল জাতিদিগেরও ভারতকে সামরিক সাহায্য করিবার কোন বাধ্যতা নাই। কমনওয়েলথ বা যে জাতি-সমূহ পূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল, ভারতকে সাহায্য করিতে বাধ্য যদি বাহিরের কোন দেশ ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু পাকিস্তানও কমনওয়েলথ দলের অন্তর্গত। সুতরাং পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিলে কমনওয়েলথ কি করিবে তাহা বলা যায় না। ব্রিটেন মোড়লি করিবেন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার অধিক কিছু সম্ভবত করিবেন না। সামরিক দিক দিয়া ভারতের নিরপেক্ষতা লাভজনক নহে। ক্ষতিকরও সম্ভবত নহে, যদি না ভারত আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হইলে ভারতের নিঃসহায় অবস্থা ঘটিবে এবং বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে মুস্কিল হইবে। নিরপেক্ষতা আর্থিক ভাবে সুবিধাজনক বলিয়া ভারত সরকার অর্থাৎ কংগ্রেসী নেতাগণ মনে করেন; কারণ

কোনও দলে না থাকিলে সকল জাতির নিকটই ভিক্ষাপাত্র লইয়া হাজির হওয়া যায়। ভারত ভিক্ষা ও ঋণ গ্রহণে অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বদেশে ভারতের ঋণের আবেদন একটা প্রাত্যহিক ঘটনা। এই সামরিক নিরপেক্ষতার জন্যই ঋণ গ্রহণ সহজ হয়; অথবা ঋণ গ্রহণ সকলের নিকটেই করাতে কোন সামরিক গণ্ডিতে সংযুক্ত হওয়া কঠিন হয় এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে। অধমর্ণের পক্ষে কোন উত্তমর্ণকেই চটান চলে না। সেই কারণে বিশ্বের প্রায় সকল জাতিই যে-ক্ষেত্রে ভারতের উত্তমর্ণ সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে সামরিক নিরপেক্ষতা ও সকল গণ্ডি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা বাধ্যতা-মূলক। অথচ ভারতের নিরপেক্ষতা ও ঋণ লইবার বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা; এই দুই প্রবৃত্তিই অস্বাস্থ্যকর ও লাভজনক নহে। নিরপেক্ষ থাকিলে সকল জাতিই ভারত সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন বলিয়া মনে হয় এবং কেহ ভারত আক্রমণ করিলে কাহারও মাথাব্যথা করিবে না। অপর ক্ষেত্রে, অধমর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের মনোভাব অধমর্ণকে বাচাইয়া রাখিয়া ধার শোধ ও সুদ দেওয়ার সুবিধা করিয়া দিবার মতই হইয়া থাকে। ইহা একটি অপমানজনক পরিস্থিতি বলিয়া মনে হয়। এবং পাচ হাজার কোটি ঋণের টাকা আদায়ের জন্য দশ হাজার কোটি ব্যয় করিয়া উত্তমর্ণ জাতিরা ভারতকে সামরিক সাহায্য করিবেন না বলিয়াই মনে হয়। সাহায্য ওজন করিয়া দেওয়া হইবে।

অ.

শিক্ষা ও স্বাধীনতা

অজ্ঞ লোকের পক্ষে স্বাধীনতা সর্ব্বদাই নামমাত্র হয়। কারণ অজ্ঞ লোকেরা পরের পরামর্শে চলিতে বাধ্য হয়। এবং অজ্ঞ জনগণের সাধারণতন্ত্র সততই অল্প সংখ্যক লোকের হুকুমে চালিত হইতে থাকে। এই কারণে ভারতের সাধারণতন্ত্র সাধারণের প্রাধান্যে গৌরবান্বিত নহে, কংগ্রেসী দলের মুষ্টিমেয় "ভিতরের লোকেদের" চালিত শাসিত রাষ্ট্রমাত্র। শ্রীপ্রফুল্ল সেন শুনিলাম জাপানে গিয়া সকল বালক-বালিকারা বিনা বেতনে ১৫ বৎসর বয়স অবধি শিক্ষালাভ করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দলের রাজত্বে গত ১৮ বৎসরেও সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই ইহা শুধু তাঁহার বিস্ময়ের কারণ নহে, সর্ব্বসাধারণেরই ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবার কথা। জাপান ঐশ্বর্য্যশালী কর্ম্মী দেশ। তাহাদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, গরীব দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু বহু গরীব দেশেই শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত হইতে অধিক ও উৎকৃষ্টতর। যথা গরীব চীন দেশে দেখা যায় ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে প্রায় ৯ কোটি বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছিল। ১ কোটি শিক্ষার্থী ছিল মধ্যম স্তরে ও ১৫ লক্ষ ছিল কার্য্যকরী শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে। ৬৬০০০০ বিদ্যার্থী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে-ছিল। ভারতে ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ে মোট চার কোটি আটাত্তর লক্ষ শিক্ষার্থী ছিল। চীনে ধরা যাইতে পারে তিন বৎসরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অন্তত ১২ কোটি ছাত্রছাত্রী ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী ছিল। ভারতের জনসংখ্যা চীনের তুলনায় শতকরা ৬৬ হইলেও সেই অনুপাতে ভারতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে অন্তত আট কোটি ছাত্র-ছাত্রী থাকা উচিত ছিল। ছিল মাত্র চার কোটি আটাত্তর লক্ষ। অপর কয়েকটি দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা নিম্নে দেখান হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব বড়ই লজ্জাকর।

১। সিংহলে ৫ হইতে ১১ বৎসর অবধি সকলে বিনাবেতনে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে সিংহলের এক কোটি মাত্র জনসংখ্যা। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সিংহলে পাঠচর্চ্চা করিত। অর্থাৎ শতকরা ২০ জন। ভারতে এই হিসাবে ৯ কোটি ছাত্রছাত্রী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ছিল মাত্র তাহার অর্দ্ধেক।

২। মালয়ের লোকসংখ্যা ছিল ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ লক্ষ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ঐ বৎসরে ১৪ লক্ষ।

৩। নাইজিরিয়ার শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় কিছুটা ভালই। কারণ শিক্ষা বিনা বেতনেই হয় এবং সমগ্র শিক্ষাযোগ্য বালক-বালিকার মধ্যে শতকরা ৬০ জনের অধিক পাঠ করিতেছে।

৪। আরজেনটাইন দেশে শিক্ষা বিনা বেতনে হয় এবং বাধ্যতামূলক (৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত)। আরজেনটাইনের ভোটের অধিকারী লোকেদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত। ভারতের অবস্থা কি প্রকার?

৫। বলিভিয়াতে শিক্ষা বিনা পয়সায় দেওয়া হয় এবং ৬ ও ১৪ বৎসরের মধ্যে সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বয়স্ক অশিক্ষিতদের ১৫—৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।

৬। কিউবার ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে বিনা বেতনে ১২।১৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিদ্যাচর্চ্চা করে।

৭। গ্রীসে শিক্ষা বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলক ভাবে দেওয়া হয়।

৮। হাইটিতে শিক্ষা বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলক ভাবে দেওয়া হয়।

৯। ইন্দোনেসিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮২ জন

শিক্ষিত। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দেশে প্রায় এক কোটি ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বিদেশী ভাষার মধ্যে এই দেশে ইংরেজী শেখান হয়।

১০। ইরাকে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা বেতনে দেওয়া হয়।

১১। ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুই কোটি জন-সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী। শিক্ষা পাইবার জন্য শিক্ষার্থীর কোনও খরচ দিতে হয় না।

কাজাকিস্থান সোভিয়েত রিপাবলিকের এক কোটি তের লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ২৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পাঠ-চর্চা করে। প্রাপ্তবয়স্ক সকল ব্যক্তিই শিক্ষিত।

১৩। আর্মেনিয়ার ২০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আছে।

১৪। তুর্কী দেশে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা বেতনে (সরকারী স্কুলে) দেওয়া হয়। জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৮ লক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ।

১৫। পর্তুগাল দেশে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। দেশের শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক শিক্ষিত।

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবার কারণ ভারতে নেতৃত্বের অধিকার বিদ্যালয়ে না যাইয়া জেলে যাইলেই হয় বলিয়া। যাঁহারা জেলে গিয়া নেতৃত্বের অধিকার আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া আসিতে পারেন নাই। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিপ্লবী ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত লোক ছিল; কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে কংগ্রেসী দলে অর্দ্ধ ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাধিক্য ঘটে। এই কারণে অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিতদিগকে চাকুরি দিবার জন্য শিক্ষার গৌরব ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতে উচ্চ-শিক্ষিত লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাহারা অধিকাংশ কংগ্রেসী দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন এবং মোসাহেবি করিয়া দলে যোগ দিতে অপারগ। দেশের কর্ম্মশক্তি ও উন্নতি র্গ সংহত ভাবে একদিকে লইয়া যাইতে হইলে সকল দেশবাসীর বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রেরণার ব্যবহার প্রয়োজন।

রুশ-আমেরিকা-ব্রিটেন-ভারত

রুশ ভারতকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক নহেন কিন্তু ভারতের সাহায্যহেতু যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিবেন কি না বলা যায় না। তবে সত্য কথা বলিতে রুশের আপত্তি নাই বলিয়াই মনে হয়। এবং যতটা সাহায্য করিলে গুপ্তভাবে যুদ্ধ করা হইতেছে বলিয়া কেহ দোষ দিবে না—ততটা সাহায্য করিতেও রুশ আপত্তি করিবেন না। আমেরিকা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও সত্যের অপলাপ বা সর্ত্তভাঙ্গা বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের উপযুক্ত কারণ বলিয়া মানেন না। নিজদলের লোক যাহাই করুক তাহা দোষ নহে বলিয়া আমেরিকা মনে করেন। সুতরাং আমেরিকা পাকিস্তানকে তাহার কড়ারভাঙ্গার জন্য কোন প্রকার সাহায্য বন্ধ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় শ্রীলালবাহাদুর রুশের নিকট গিয়া হাত পাতিয়াছেন, এই অপরাধে পাকিস্তানকে আমেরিকা আরও অধিক সামরিক সাহায্য করিবেন। ব্রিটেন দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাকিস্তান ব্রিটেনের নিজের সৃষ্টি সুতরাং পাকিস্তানের সহিত ব্রিটেনের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। ভারত শুধু ব্রিটেনের কমনওয়েলথ সূত্রে ভ্রাতৃস্থানীয়। ভাই বড় না ছেলে বড় এই প্রশ্নের উত্তর সকলেই জানে। এই কারণে ব্রিটেন ভারতকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রদান করিলে তাহা অল্পই হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্কটে ও এই বন্ধুত্ব-শত্রুতার সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে ভারতের কর্ত্তব্য কি তাহা বিচার করিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের উপর দেশবাসীর আস্থা কতটা আছে তাহা বোঝা সম্ভব নহে। এক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে দেশবাসীর বলা উচিত যে তাঁহারা যেন নিজেদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার গ্রহণ না করেন। বিষয়টা সুকঠিন হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের উচিত হইবে সমগ্র জাতীয় শাসকমণ্ডলী গঠন করা। রাষ্ট্রীয় দলগুলি নিজেদের মতামত চাপা দিয়া রাখিয়া দেশরক্ষার কার্য্যে পূর্ণরূপে ও জাতির সকল লোকের সহযোগিতায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন আশা করা যায়। অ.

চীনের আণবিক বিস্ফোরণ

চীন পুনর্ব্বার একটি আণবিক বিস্ফোরণ করিয়া জগতকে জানাইয়াছে যে তাহার আণবিক যুদ্ধক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধমান এবং সে অপরাপর আণবিক শক্তিমান জাতির অন্যতম। এই প্রচেষ্টা চীনের প্রধানত আমেরিকা ও রুশকে নিজশক্তি সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিবার জন্য। ভারতকে ভয় দেখাইবার জন্য সম্ভবত নহে। অপর উদ্দেশ্য, অন্যান্য চীনভক্ত জাতি-দিগের মধ্যে চীনভক্তি জোরালো করিয়া তোলা। পাকিস্তান, সিংহল ও আরও অনেক পরশক্তিতে শক্তিমান

জাতি সর্ব্বদাই "শক্তের ভক্ত" নীতিতে বিশ্বাসী। চীন এই সকল জাতির নেতৃত্ব করিতে ইচ্ছুক এবং নিজশক্তি কাহারও অপেক্ষা কম নহে দেখাইবার জন্য আণবিক বিস্ফোরণ করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। একথা অবশ্য সকলেই জানেন যে, একটি বিমান বা দশটি থাকিলেও সামরিক ভাবে বিমানশক্তি আছে প্রমাণ হয় না। একটি বা দশটি তোপ, যন্ত্রবন্দুক, যুদ্ধজাহাজ থাকিলেও সামরিক শক্তি হাতিয়ারের ও সৈন্যের সংখ্যা অনুপাতেই বিচার করা হয়। সুতরাং একটি বা পাঁচটি আণবিক বিস্ফোরণ করিলে আণবিক যুদ্ধশক্তি যথেষ্ট আছে কি না প্রমাণ হয় না। রুশ বা আমেরিকা যেরূপ আণবিক অস্ত্র পুঞ্জীভূত করিয়া পরস্পরকে ভয় দেখাইয়া থাকেন, কিংবা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যতটা আণবিক বোমার ব্যবস্থা ও তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, সেইরূপ আণবিক শক্তি চীনের থাকিতে পারে না। কারণ মূলতঃ অর্থাভাব। চীনের সাধারণ সামরিক ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল। চীন সৈন্য ও সেনাদের মালমশলা সরবরাহ করিবার জন্য সম্ভবত চার-পাঁচ কোটি কর্ম্মী সর্ব্বদা মোতায়েন রাখিতে বাধ্য হয় বলিয়া মনে হয়। ইহাদের বেতন দিতে না হইলেও যুদ্ধ ও শ্রমশক্তি পূর্ণরূপে সংরক্ষিত করিয়া জীবন্ত রাখিতে হইলে, বৎসরে মাথাপিছু অন্তত ২.০০০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ২।৩ হাজার বিমান, তোপ, যন্ত্রবন্দুক, গুলী বারুদ, যানবাহন, রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ, ঘরবাড়ীর সংস্থান প্রভৃতিও ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ধরা যাইতে পারে চীনের বাৎসরিক সামরিক ব্যয় ৪০০০।৫০০০ হাজার কোটি টাকার কম নহে। চীনের জাতিগত আয় যদি ১৫০০০। ১৬০০০ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে সামরিক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত পাঁচ কোটি লোককে বাদ দিলে চীনের ৫৫ কোটি লোক বাকি থাকে। ইহাদিগের যদি মাথাপিছু ২০০৲ শত টাকাও বৎসরে খাওয়া-পরাতে খরচ হয় তাহা হইলে তাহাতে মোট ১১০০০০০০০০০০ এগার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। চীনের সকল সরকারী, বেসরকারী ও বাণিজ্য কারখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত লোক বাৎসরিক ২০০ শত টাকা মাত্র লইয়া কাজ করে বলিয়া কল্পনা করিলে হিসাব মিলিতে পারে। আমাদের মতে চীনের যেরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাহাতে অন্তত পাঁচ কোটি লোকের বাৎসরিক ২০০ শতের অধিক বেতন বা অপরভাবে রোজগার হয়। সম্ভবত ১ কোটি লোকের বাৎসরিক ২০০০ টাকার অধিক রোজগার। এক কোটি ১০০০ কোটি আন্দাজ ও তিন কোটির অন্তত ৬০০ টাকা। তাহা হইলে এই সকল অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য-ভূষিত লোকগুলির জন্য চীনের ৪৮০০ কোটি টাকা বৎসরে প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সমগ্র খরচের বা রোজগারের মোট পরিমাণ খরচ : সামরিক ৫০০০ কোটি টাকা, জাতীয় ভরণ-পোষণের জন্য ১১,০০০ কোটি, বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য ৪৮০০ কোটি—মোট খরচ ২০৮০০ কোটি। আয় আন্দাজ ১৬০০০ বা তদূর্দ্ধ কিছু। সম্ভবত রুশের নিকট চীন সাহায্য পাইয়া সামরিক খরচ চালাইত। এখন কি করে আমাদিগের জানা নাই। তিব্বত লুণ্ঠন করিয়া কয়েক সহস্র কোটি টাকা স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তা-জেড-জহরত চীন পাইয়াছিল। তাহাও এতদিনে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আণবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ চীনে সম্ভব নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আরও বিশ্বাস, ভারতের আণবিক বিস্ফোরণ একটা-দুইটা অবিলম্বে করা উচিত। অ.

পরলোকে মাখনলাল সেন

ভারতের অন্যতম প্রবীণ সাংবাদিক—যিনি ছিলেন সংবাদপত্র-জগতের কর্ণধার, সেই মাখনলাল সেন গত ১১ই মে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

মাখনলাল বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গুরুনাথ সেন ছিলেন চট্টগ্রামের এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জেন। হুগলীর উত্তরপাড়া ও কলিকাতার সিটি স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। বি. এ পাস করার পর তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১০ সনে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইংরেজ সরকার তাঁহাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করেন। ১৯২০ সনে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সনে আনন্দ-বাজার পত্রিকা নবপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইলে মাখনলাল ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন।

মাখনলালের কর্ম্মময় জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আনন্দবাজারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এই পত্রিকার শৈশবে যে কর্ণধারগণ পত্রিকাটিকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া সাহস ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালনা করিয়াছেন মাখনলাল ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

১৯৩৯ সনে তিনি স্বাধীন ভাবে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। পত্রিকাখানির নাম 'ভারত'। এই পত্রিকাটির রাজরোষে পড়িয়া অকাল মৃত্যু হয়। 'ভারত' বন্ধ হওয়ার পর হইতেই তিনি একরূপ অবসর গ্রহণ করেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন।

প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি ও রাষ্ট্রভাষা

নিজের ভাষার ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং সম্ভব হইলে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন সকলেরই করা উচিত, এ ধারণা আমার বরাবরই আছে। মজঃফরপুরে আসিয়া শুনিলাম, কে একজন পাঞ্জাবী নাকি বলিয়াছেন, "আমরা রবীন্দ্র-নাথের মত লোক চাই না; সেরূপ লোকে নিজের নিজের প্রাদেশিক ভাষাকে খুব সমৃদ্ধ ও উন্নত করিলে সমগ্র ভারতের একটা রাষ্ট্রভাষা গড়িয়া উঠিবার ব্যাঘাত ঘটিবে।" এরকম একটা বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে করিতে চাই না। এ বিষয়ে মজঃফরপুরের বাঙালী মহিলাদের ও ভদ্রলোকদের সভায় (বালক-বালিকারাও অবশ্য ছিলেন) কিছু বলিয়াছিলাম। এখানে অন্য দু' একটা কথার সহিত তাহা সংক্ষেপে বলিতে চাই।

পাঞ্জাবে ভাষাসঙ্কট উপস্থিত; পাঞ্জাবী (তাহাও একবিধ নহে), উর্দু, হিন্দী—কোন্ ভাষা সকলের ভাষা হইবে, বলা যায় না। কোনটিরই যথেষ্ট উন্নতির একাগ্র চেষ্টা হইতেছে না। এ অবস্থায় বাঙালীদের নিজের ভাষার প্রতি টান ও তাহার উন্নতির চেষ্টা এক ধাঁচের পাঞ্জাবীর ভাল না লাগিত পারে।

হিন্দীকে বা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছে—কংগ্রেস ত তাহার পক্ষে রায় দিয়াছেন। উহা যদি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, দুঃখও নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে উহা এখনও প্রাদেশিক ভাষা, সমগ্র ভারতবাসীর ভাষা নহে। অবশ্য বাংলা যত বড় ভূখণ্ডের ভাষা, হিন্দী তার চেয়ে বড় ভূখণ্ডের ভাষা। কিন্তু উহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে উহারও উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টা বা হিন্দুস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের দ্বারাই ভাল করিয়া হইতে পারে। চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাক্ষাৎ চেষ্টাই সাহিত্য ক্ষেত্রে সব কিছু নয়। তোমার যদি বড় কিছু ভাব ও চিন্তা থাকে, তাহার সাহিত্যিক প্রকাশ তোমার মাতৃ-ভাষাতে স্বভাবত হইবে।

একদল লোক, যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তাঁহারা তাহাতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকুন। বাকী সব ভারতীয়েরা, বাঙালীরা, মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদেরও ত সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ চাই। তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক ক্ষমতাবিশিষ্ট লোকেরা চুপ করিয়া থাকিলে, কিংবা ভাঙা বাজারে হিন্দীতে কথা বলিলে, তাহাদের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ হইবে না, তাহাতে তাহাদের নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা জন্মিবে। তাহারা সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ না করিলে তাহাদের সমভাষাভাষী এবং কতকটা জগতের অন্য লোকেরা ও সাহিত্যিক যে-সব রত্ন পাইতে পারিত, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়া তাহাতে ব্যাকরণের ভুল না করিয়া এবং কতকটা অন্যবিধ উৎকর্ষের সহিতও, অনেক বহি লেখা যাইতে পারে। কিন্তু কোন দেশের সাহিত্যেই সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ বিদেশীর লেখা বেশী বই নাই। কোন দেশের সাহিত্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বিদেশী নহেন। তাহার কারণ এই যে, মাতৃভাষাতেই সমগ্র মানুষটি অন্তরাত্মার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর।

কোন ভাষা চিরকাল টি঳কিবে কি টি঳কিবে না, রাষ্ট্রভাষা হইবে কি হইবে না, তাহা সকলের চেয়ে ভাবনার বিষয় নহে। সেই ভাষা মানুষকে চিরন্তন কিছু দিতে পারিয়াছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। এমন যে সংস্কৃত ভাষা, তাহাও সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা, কথিত রাষ্ট্রভাষা, হয়ত কোন কালেই ছিল না; এবং উহা এখন ছোট বড় কোন ভূখণ্ডেরই কথিত ভাষা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি যাঁহারা উহাতে মানুষের শ্রেষ্ঠ আন্তরিক সম্পদ নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহারা পণ্ডশ্রম করিয়াছিলেন? পালি ভাষাও কখন রাষ্ট্রভাষা ছিল না; যখন ভারতে চলিত ছিল, তখন ভারতের অংশ বিশেষেরই উহা কথিত ভাষা ছিল; কিন্তু এখন উহা ভারতবর্ষে অপ্রচলিত। কিন্তু উহা তাঁহাদের মাতৃভাষা ব'লিয়া উহাতে যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় জগৎ অনেক অমূল্য জিনিষ পাইয়াছে। এইরূপ বাংলা কখন রাষ্ট্রভাষা না হইতে পারে; এমন কি উহা বাংলা দেশে কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি বাঙালীরা উহাতে মানবমনের ও হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ কিছু সাহিত্যরূপে নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা মানুষের আনন্দ ও কল্যাণেরই কারণ হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যে এখনই এইরূপ জিনিষ রহিয়াছে। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনপ্রকার জবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ দ্বারা কোন ভাষাকে বা কোন জাতির সাহিত্যিক শক্তিকে বিকশিত করা যায় না, বিনষ্ট করাও যায় না। পোল্যাণ্ডের কোন কোন অংশ যখন রুশিয়ার ও জার্মেনীর অধীন ছিল, তখন সেই সেই অংশে স্কুলে পোলিশভাষায় শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, রুশীয় ও জার্মান চালাইবার চেষ্টা রুশীয় ও জার্মান গবর্ণমেন্ট করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। পোলিশ ভাষা যখন টি঳কিয়া আছে এবং উহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যও আছে।

বাঙালীরা যেখানেই থাকুন, সাংসারিক প্রয়োজনেও বাঙালী ছেলে-মেয়েদিগকে বাংলা জানিতে হইবে। তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে হইবে, এবং সাধারণতঃ তাহাদের বিবাহ বাঙালী পরিবারেই হইবে। স্বর্গীয় স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন, যৌবন-কালে তাঁহার এক প্রবাসী বাঙালী বন্ধু ছিলেন যি'নি বাংলা লিখিতে পড়িতে পারিতেন না কিন্তু বিবাহ করিয়াছিলেন এক বাংলা দেশবাসিনী বাঙালী বালিকাকে। এই নববধূ যখন স্বামী মহাশয়কে বাংলায় চিঠি লিখিতেন, তখন স্বামী মহাশয় নববধূর চিঠি বন্ধু প্রমদাচরণের দ্বারা পড়াইয়া লইতেন এবং জবাবটাও তাঁহার দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। এরূপ অবস্থা আজকাল কোন প্রবাসী বাঙালী বরের ঘটে কিনা জানি না—না ঘটাই উচিত—

(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৯০৫)

॥ উপন্যাস ॥

অথচ বাসবীর কিছু মনে নেই। ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে চেয়ে চেয়ে কাজ করেছে। ফাইলের পাতায় পাতায় কতবার এই সর্বনেশে তারিখটা লিখেছে, কিন্তু তবু মনে হয় নি। অন্য সব তারিখগুলোর মধ্যে আজকের তারিখটাও নির্বিবাদে মিশে গেছে। তার আলাদা কোন রূপ প্রকাশ পায় নি। অন্তত বাসবীর কাছে ত নয়ই।

এমনি করেই মানুষ হারিয়ে যায়। নির্মম মহাকাল শুধু তার বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শই মুছে নেয় তা নয়, স্মৃতিটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়।

কতক্ষণ মা এ ভাবে থাকবে বলা যায় না। মা ত শুধু প্রণাম জানাচ্ছে না, সারাজীবনের স্মৃতি মন্থন করে চলেছে। একটা মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবনের স্মৃতি।

মা।

প্রথমে আস্তে, তারপর একটু জোরে বাসবী ডাকল।

এই পরিবেশে গলার স্বর তুলতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে এই থমথমে আবহাওয়ায় যেন একটা মানুষের অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। চীৎকার করলে লোকটার ছায়া সরে যাবে।

মা'র কানে গেল না। রুবি আর খোকন ফিরে দেখল। খোকন চুপচাপ বসে রইল কিন্তু রুবি ছুটে গেল মা'র কাছে।

দিদি এসেছে মা।

মা'র সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল তারপর গায়ে-মাথার কাপড় ঠিক করে ত্রস্ত পায়ে উঠে দাঁড়াল।

বাসবী একলা নয়, তার পিছনে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কেঁদে কেঁদে মা'র দুটো চোখ লাল। জল নেই, কিন্তু গালে জলের দাগ রয়েছে।

সেই জন্যই মা সকাল থেকে অন্যমনস্ক। টিফিন দিতে ভুলে গেছে। খেতে দেবার সময় পরিবেষণ করতে করতেও মা'র কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছিল।

বাসবী তখন ভেবেছিল বোধ হয় মা'র শরীরটা খারাপ। মাঝে মাঝে বুকের একটু যন্ত্রণা হয়। আগে এ ব্যাধি ছিল না। বাবা যাবার মাস দুয়েক পর থেকেই সুরু হয়েছে।

বাসবী এও ভেবেছিল, টিউশনি সেরে ফেরার সময় মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে দুটো বড়ি কিনে আনবে, কিন্তু কাজের আবর্তের মধ্যে পড়ে কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

মা একটু এগিয়ে আসতেই দীপক মিষ্টির বাক্সটা মা'র পায়ের কাছে রেখে নীচু হয়ে তার পায়ের ধুলো নিল।

দীপক যে বাসবীর পিছন পিছন এ ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছে এটা বাসবী খেয়াল করে নি। অবশ্য বাসবীরই দোষ। বাসবী তাকে কোথাও বসতেও বলে নি।

বাইরে কাউকে না দেখতে পেয়ে বাসবী একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। এ সব সাধারণ ভদ্রতার বিধিগুলো স্মরণ ছিল না।

মা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে বাসবীর দিকে দেখল।

অর্থাৎ, কে লোকটি?

বাসবী বলল, ইনি দীপক গুপ্ত। আমাদের অফিসে জয়েন করবেন।

ভাল কথা। অফিসে ঢুকবে সে জন্য বাসবীর সঙ্গে বাসবীর বাড়ীতে আসার কি দরকার?

এ সব কথা মা বলল না। বাইরের অপরিচিত লোকের সামনে এ সব কথা বলাও যায় না। কিন্তু তার দু'চোখের তারায় এই প্রশ্নটাই মূর্ত হয়ে উঠল।

দীপকই কথা বলল, আজকে যে চাকরিটা পেয়েছি সেটা মিস সেনের দয়াতেই মা। তিনি সাহায্য না করলে এ চাকরি আমার কিছুতেই হ'ত না। আজ বছর তিন-চার অফিস-অঞ্চল চষে ফেলেছি, কোথাও সুবিধা করতে পারি নি। চাকরি ত দূরের কথা, কেউ একটু আশাও দেয় নি।

সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক একই রকম দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

বাসবীর চাকরির বয়স এখনও মাস ছয়েকের বেশী হয় নি। সে যে অফিসে এমন কিছু বড় কাজ করে না, সেটা তার মাসান্তে নিয়ে আসা মাইনের অঙ্ক দেখেই বোঝা যায়। সংসারের অভাবের বিবর বোজাবার জন্য তাকে আর একটা টিউশনির ওপর নির্ভর করতে হয়।

সেই বাসবী পথ থেকে কুড়িয়ে আর একজনকে অফিসের চেয়ারে বসিয়ে দিল, এ কি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী।

তা ছাড়া ছেলেটি নিশ্চয় বাসবীর অচেনা নয়। কত-দিনের চেনা। পরিচয় হ'লই বা কি করে? এর কথা ত বাসবী কোনদিন মাকে বলে নি।

মনে মনে মা আবার শঙ্কিত হয়ে উঠল।

কেমন একটা গুমোট আবহাওয়া।

মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সামনে দীপক। বেশ আড়ষ্ট ভাব। একটু দূরে বাসবী। রুবি আর খোকন মা'র পিছন থেকে নবাগত আগন্তুককে পর্যবেক্ষণ করছে।

কারও একটা কিছু বলা প্রয়োজন।

বাসবীই কথা বলল, আপনি আবার মিষ্টি নিয়ে এসেছেন কেন? সংসারে অভাব, দারিদ্র্যের ছায়া দুলছে সেখানে, আপনার কাছ থেকেই ত শুনলাম। এ লৌকিকতাটুকু না করলেই পারতেন। আমাদের এ সব সাজে না।

বাসবীর কথাগুলো বোধ হয় একটু চড়া সুরেই হয়ে গিয়েছিল, কিংবা আবহাওয়াটা থমথমে থাকায় নীচু পর্দার স্বরও চড়া বলে মনে হ'ল।

দীপক আরক্তিম হয়ে উঠল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, ও মিষ্টি ত আপনার জন্য নয় মিস সেন, ওটা আমি এ বাড়ীর ছোট ভাইবোনদের জন্য এনেছি।

দীপক হাত দিয়ে রুবি আর খোকনকে দেখিয়ে দিল।

মা ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছে। কি ভাবে আলাপ, আলাপের মাত্রা কতটা সেটা বাসবীকে পরে জিজ্ঞাসা করলেই চলবে। ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, তাকে এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না।

বাসবী, তুমি এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি যাচ্ছি।

বাসবী লক্ষ্য করল মা তার ডাক নাম ধরে নয়, ভাল নাম ধরেই ডাকল। অফিসের সহকর্মীর সামনে মর্যাদা রাখার চেষ্টা।

আসুন এ ঘরে।

বাসবী দীপককে নিজের ঘরে নিয়ে এল।

আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরছেন, আজ আমি বরং যাই। চাকরি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হ'ত।

বসুন। বাড়ীতে এসে না বসেই যদি চলে যান সেটাও ত গৃহস্থের পক্ষে খুব শোভন হয় না।

দীপক তক্তপোষের একপ্রান্তে বসল। অতি সন্তর্পণে।

আপনি বাড়ীতে এসে ভালই করেছেন।

কেন?

অফিসে আমি কি দরের চাকরি করি দেখেছেন। বাড়ীর অবস্থাটাও স্বচক্ষে দেখে গেলেন। এরপর আমার সম্বন্ধে অন্তত ভুল ধারণা হবার আপনার কোন অবকাশ হবে না।

আপনার সম্বন্ধে ভুল ধারণা?

হ্যাঁ, ক'দিন ম্যানেজারের মোটর থেকে নামতে দেখে আপনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন আমি অফিসের সম্ভ্রান্ত কেরাণীদের একজন। লোককে চাকরি দেবার ক্ষমতা রাখি। সেই জন্যই দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই না?

এ প্রশ্নের দীপক জবাব দিল না। শুধু বলল, কিন্তু আপনার অনুগ্রহেই ত চাকরি হয়েছে।

মোটেই না, বাসবী ঘাড় নাড়ল, চাকরি পেয়েছেন

আপনি আপনার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে। ম্যানেজার আমায় সেই কথাই বলেছেন।

দীপক হাসল। মুখ নীচু করে বলল, বিদ্যাবুদ্ধি যদি কিছু থেকেই থাকে ত এই তিন-চার বছরও ত ছিল। কিছু হবার হ'লে সে সময়ই হয়ে যেত।

বাসবী কিছু বলার আগেই মা এসে ঢুকল।

বাসবী ভেবেছিল মা হয়ত দীপকের আনা গোটা দুয়েক মিষ্টি থালায় সাজিয়ে নিয়ে আসবে। বড় জোর বাড়তি এক কাপ চা।

কিন্তু মা তা করে নি। প্লেটে একটা ডিম-ভাজা। এক কাপ চাও অবশ্য আছে।

যেদিন বাসবীর উঠতে দেরি হয়ে যায় সেদিন আর বাসবী বাজার যেতে পারে না। সেই জন্যই কয়েকটা ডিম কিনে রেখেছে। ভাত, ডাল আর ডিম-ভাজা। সকালের খাবার সমস্যার সমাধান।

সেই ডিমই বুদ্ধি করে মা একটা ভেজে এনেছে।

দীপক দাঁড়িয়ে উঠল, না, না, আপনি এত রাত্রে আবার এসব করতে গেলেন কেন মা?

কি আর করেছি বলুন। আমাদের মতন লোকের বাড়ীতে এর চেয়ে আর কি করতে পারি। ওই একটি মেয়ের রোজগারের ওপর সমস্ত সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে।

মা'র কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

বাসবী মা'র হাত থেকে চায়ের কাপ আর প্লেটটা টেনে নিয়ে দীপকের সামনে রাখল।

নিন, খেয়ে নিন।

দীপক আর আপত্তি করল না। ডিমের প্লেটটা তুলে নিতে নিতে বলল, বাসবীর মা'র দিকে চেয়ে, আমায় আপনি আপনি করছেন কেন বলুন ত? আমি আপনার ছেলের সমান।

মা একটু বিব্রত হ'ল। এমন কিছু জানাশোনা নেই ছেলেটির সঙ্গে। অনেকবার আসা-যাওয়া করছে এ বাড়ীতে এমনও নয়। হঠাৎ কি করে একজনকে তুমি বলবে, সে ছেলের বয়সী হ'লেও। নাকি, এখন থেকে এ বাড়ীতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করবে এমন একটা ইঙ্গিতই ছেলেটি দিতে চাইছে।

মা কোন কথা বলল না। চুপচাপ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রুবি আর খোকন এ ঘরে আসে নি। বোধ হয় তারা দু'জনে রান্নাঘরে খেতে বসেছে। অন্যদিন দিদির সঙ্গেই খায়। আজ দিদির দেরী হবে জেনে মা তাদের খেতে দিয়েছে।

দীপক ডিম আর চা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বাসবীর মা ঘরের মধ্যে নেই। নিঃশব্দে কখন বেরিয়ে গেছে।

মা কোথায়? দীপক বাসবীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল।

মা কোথায় বাসবী জানে। তবু একবার দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে এসে বলল, মা স্নানের ঘরে। রোজ রাত্রে এই সময় মা স্নান করে।

ওঃ, দীপক দাঁড়াল। কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, আচ্ছা আমি যাই। পয়লা তারিখে অফিসে দেখা হবে।

দীপকের সঙ্গে বাসবী দরজা অবধি এল। একবার ভাবল, নীচে পর্যন্ত যাবে। সেটাই হয়ত উচিত। কিন্তু ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে সব কর্তব্য করতে মন চাইল না।

সেই সাত-সকালে দু' মুঠো মুখে দিয়ে বেরিয়েছে। তারপর শরীরের ওপর একটানা অত্যাচার চলেছে। বিরাম নেই।

ক্ষুধায় ততটা নয়, যতটা নিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে।

দীপক নেমে যেতে বাসবী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শুধু এ বাড়ীতে এখান থেকেই এক ফালি আকাশ দেখা যায়। নক্ষত্রখচিত অপূর্ব আকাশ। মাথার ওপর এই সুন্দর আকাশটুকু আছে বলেই বুঝি পৃথিবীর মানুষগুলো এখনও সব পশু হয়ে যায় নি। আহার বিহার নিদ্রা এই পরিধির মধ্যে অবসিত হয় নি। অপচিত হয় নি।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে, বাসবী মাটির দিকে দেখল। পথের দিকে।

দীপক চলতে চলতে থেমে পিছন ফিরে দেখল। মুখ তুলে।

দীপকের মুখে নক্ষত্রের আলো এসে পড়েছে। ম্লান, নিষ্প্রভ মুখ বলে আর মনে হচ্ছে না। ভাস্বর, জ্যোতির্ময়।

বাসবী বারান্দা থেকে সরে এল। ফিরেই চমকে উঠল

ঠিক পিছনে মা দাঁড়িয়ে।

দরজাটা বন্ধ করে থাবি আয়।

নিস্তেজ, অসহায় কণ্ঠস্বর।

দরজা বন্ধ করে, কাপড় বদলে মুখে-চোখে জল দিয়ে বাসবী যখন রান্নাঘরে গিয়ে বসল, দেখল, পাশাপাশি দুটো থালা। মা আর মেয়ের।

রোজই এইভাবে বাসবী আর তার মা পাশাপাশি খেতে বসে। সকালে হয় না। বাসবী সবচেয়ে আগে খেয়ে বেরিয়ে যায়। রাত্রে দু'জনে পাশাপাশি বসে সংসারের কথা, সুখ-দুঃখের কথা, কোন বাড়তি খরচের কথা আলোচনা করে।

বাসবী থালাটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

কয়েক গ্রাস মুখে তোলবার সঙ্গেই তার কানে এল।

এর কথা ত তুই কোনদিন আমায় বলিস নি।

বুঝেও বাসবী না বোঝার ভান করল।

কার কথা?

যে ছেলেটিকে আজ নিয়ে এলি?

বাসবী ভ্রূ কুঁচকে মা'র দিকে দেখল। যেটুকু ঘটেছে, মা বোধ হয় তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী ভেবে বসে আছে। দু'জনে একসঙ্গে এসেছে, তাই মা'র ধারণা, বাসবীই দীপককে নিয়ে এসেছে।

ব্যাপারটার এখনই একটা সমাধান হওয়া দরকার, না হ'লে এই ভুল বোঝাবুঝিটা থেকেই যাবে।

দীপকবাবুকে আমি সঙ্গে আনি নি মা, টিউশনি সেরে গলিতে ঢোকবার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হ'ল।

তুই বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলি নিশ্চয়?

বাড়ীর ঠিকানা? এবার বাসবী চিন্তায় পড়ল।

সত্যই ত বাসবীর বাড়ীর ঠিকানা দীপক জানল কি করে? এ কথাটা ত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। বাসবীর মনেই ছিল না। সম্ভবত অফিসের কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে।

আড়চোখে বাসবী চেয়ে দেখল মা খাওয়া বন্ধ ক'রে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। কিছু একটা উত্তর তাকে দিতেই হবে, নইলে সব জিনিসটা ঘোলাটে হয়ে থাকবে।

আমি দিই নি। বোধ হয় অফিসে কারও কাছ থেকে যোগাড় করেছে। সকলের বাড়ীর ঠিকানা অফিসে লেখা থাকে কিনা।

বাসবী বাকি ভাত ক'টা তাড়াতাড়ি শেষ করায় চেষ্টা করল। কোনরকমে খাওয়া সেরে উঠতে পারলে যেন বাঁচে।

মা আজকাল কেমন সন্দিগ্ধচরিত্রের হয়ে গেছে। সব কিছুতে অন্যায়ের গন্ধ পায়। বিশেষ করে বাসবীকে বাইরে ছেড়ে দেবার পর থেকে মনে যেন স্বস্তি নেই। অথচ তাকে বাইরে না পাঠিয়েও উপায় নেই। যন্ত্রণাটাও এইখানেই।

পরের দিন অফিসে গিয়েই হদিশ মিলল।

পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। মাঝপথে ট্রাক বিকল হ'ল। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। তাও এমন সময়ে যখন অফিস-যাত্রীদের পক্ষে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করাই মুশকিল। আর মিনিট পনেরো সময় আছে। ফল হট্টগোল। সবাই নেমে ছুটোছুটি সুরু করল। কেউ কেউ হাঁটতে আরম্ভ করল। কয়েকজন মিলে ট্যাক্সির খোঁজ। বেশীর ভাগই বাসের অপেক্ষা করতে লাগল।

বাসবী এই শেষের দলে। মাঝপথ থেকে বাসে ওঠা প্রায় অসম্ভব। গোটা চারেক ছেড়ে দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে বাসবী একটায় উঠে পড়ল। তাও অফিসে পৌঁছতে মিনিট কুড়ি দেরি।

নিজের চেয়ারে বসে অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতেই বাসবী বলল।

ট্রামের কারেন্ট থেমে গেল ময়দানের কাছে। এমন এক জায়গায় যে, হেঁটেও আসা যায় না, আবার বাসে ওঠাও মুশকিল। যা ক'রে আজ এসেছি!

বাসবী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিশিবাবু ফাইলের পাতায় কি একটা লিখছিল, মুখ না তুলেই বলল, আজকাল মোটরে আসেন না?

বাসবী মুখ তুলল। নিশিবাবু একমনে কাজ করে যাচ্ছে। তার ধরন দেখে মনেও হয় না একটু আগে তার মুখ থেকে কোন কথা বের হয়েছিল।

'পর পর কয়েকটা দিন ম্যানেজার আসার সময় বাসবীকে তুলে নিয়েছিল।

দু'জনের আসার পথ একই। অনিমেষ বলেও ছিল

বাসবীকে রোজ অপেক্ষা করতে। আসার সময় তুলে নিয়ে আসবে।

আসার সময় যদি মোটরে আসতে পায়, তবে শুধু যে সময় বাঁচে, ভীড়ের হাত থেকেই অব্যাহতি তাই নয়, দেহের ক্লান্তিও কম হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে আসতে হয় না। কতকগুলো সুবিধাবাদী, ভদ্রবেশী ইতর পুরুষদের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্ম সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় না। নিজেকে যেন অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক শুচি মনে হয়।

কিন্তু তবু দিনের পর দিন অনিমেষের গাড়ীতে আসা যায় না।

পথে যে অনিমেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে এমন নয়। জনতার মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আনতে অনিমেষ এত ব্যস্ত থাকে যে, পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তার নজর দেবার অবকাশই থাকে না। ক্বচিৎ দু'-একটা কথা হয়।

ভয় বাসবীর অনিমেষকে ততটা নয়, যতটা সহকর্মীদের।

অফিসের ম্যানেজারের পাশে বসে কনিষ্ঠ কেরাণী রোজ যাওয়া-আসা করছে এ দৃশ্য যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। এ সান্নিধ্যের সহজ-সরল অর্থটাই সবাই গ্রহণ করবে। ঠিক নিশিবাবু যেমন ভাবে নিয়েছে। সময়ে-অসময়ে হুল ফোটাতে ছাড়বে না।

এটাই বাসবীর কাছে অসহ্য।

বাসবী একবার ভাবল চুপচাপ থাকবে। বোবার শত্রু নেই। কিন্তু আবার মনে করল মৌন হয়ে থাকলে এরা সবাই সুযোগ পাবে। অন্যায়, অসত্য দিকটাই স্থির করে নেবে।

আপনিও যেমন। দু'-একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে হয়ত তুলে মোটর থামিয়েছিলাম, তাই ম্যানেজার মোটরে তুলে নিয়েছিলেন। উপায় ছিল না। আজকাল পাছে চোখা-চোখি হয়, তাই ম্যানেজার বোধ হয় ও রাস্তা দিয়েই যাওয়া-আসা করেন না। পথ বদলেছেন।

কথাগুলো বলতে বলতে বাসবী নিশিবাবুর দিকে চেয়েই থেমে গেল।

নিশিবাবু কাজ থামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে অদ্ভুতভাবে বাসবীর দিকে চেয়ে রয়েছে। যেন অবিশ্বাস্য এক কাহিনী শুনছে।

বাসবী আর কিছু বলল না। সামনের চিঠিপত্রে মন দিল।

এদের কিছু বলে লাভ নেই। এরা বিশ্বাস করবে না। এরা পুরুষ আর নারীর একটা সম্পর্কের কথাই জানে। সে সম্পর্ক যত অবৈধ, ততই এদের উল্লাস। মুখরোচক কিছু পেলেই এদের শান্তি।

সে ছেলেটি কাল আপনাদের বাড়ী গিয়েছিল?

নিশিবাবুর গলা।

কোন্ ছেলেটি?

এই যে কাল আপনি যার চাকরি করে দিলেন।

বাসবী মুখে-চোখে অপ্রত্যয়ের রেখা ফোটাল।

আমিই এখনও অফিসের কাঁচা গুটি, আমি লোকের চাকরি করে দেব?

নিশিবাবু হাসল। হাঁচি না হাসি ঠিক বোঝা গেল না। একটু থেমে বলল, আপনি যে সেই রকম কথা বললেন।

কি রকম কথা?

ওই যে গানের লাইন আছে। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাসবী কাজ ক'রে গেল বটে, কিন্তু কান রইল নিশিবাবুর দিকে।

কাল টিফিনের সময় বের হচ্ছি, ছেলেটার সঙ্গে দেখা। বাইরে ফুটপাতে অপেক্ষা করছিল। আমি ভাবলাম, ইন্টারভ্যুর সময় আমি ভিতরে ছিলাম, ছেলেটির চাকরি হয়েছে, তাই বুঝি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। তারপরই আসল কথাটা জানতে পারলাম।

এর পর আর নির্বিঘ্নে বাসবীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সে কলমটা হাতে করে নিশিবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

আমাকে বলল, যে মহিলাটি আপনার পাশে বসে কাজ করেন তাঁর নামটা কি? ছোকরা কে কার পাশে বসে সেটা দেখে নিয়েছে। বললাম, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন? তখনই ছেলেটি আসল কথা ভাঙল। বলল, আজ্ঞে তাঁর দয়াতেই ত চাকরি পেয়েছি। তিনিই ম্যানেজারকে আমার কথা বলে রেখেছিলেন।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি আপনার জন্য এতটা করেছেন, তাঁর নামটাই জানেন না? তা ছোকরা

ঘাড় নাড়ল, না। তাকে ত মোটে দিন দুই-তিন দেখেছি। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা আমায় দিতে পারেন। বললাম, সকলের ঠিকানা কি আমি পকেটে করে নিয়ে বেড়াই। আপনি টিফিনের পর আমার কাছে যাবেন, ঠিকানা দিয়ে দেব। টিফিন শেষ হবার আগেই আমি ফিরেছি। ফিরে দেখলাম, বসে আছে আমার টেবিলের সামনে। আপনি তখনও মিস পালিতের কাছে। একবার ভাবলাম, আপনার জন্য অপেক্ষা করি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তবে ঠিকানা দেব, তারপর ভাবলাম, আপনি তার জন্য এত করেছেন। আজকালকার বাজারে চাকরি একটা দেওয়া মুখের কথা? ঠিকানা দিলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। দিয়ে দিলাম ঠিকানাটা! অন্যায় করেছি?

না, না, অন্যায় কি? আপনি ঠিকানা না দিলে এ বাজারে টাকা দশেকের মিষ্টি থেকে বঞ্চিত হ'তাম। যা মাইনে পাই, অত টাকার মিষ্টি একবারে কেনার সামর্থ্য নেই তা ত জানেনই।

নিশিবাবুর দু'টি ভ্রূ ধনুকের মতন কুঁচকে গেল। দু' চোখে জোনাকির দীপ্তি। ঠোঁটের দু' কোণে আশাভঙ্গের রেখা।

ভাবটা যেন শুধু মিষ্টি, আর কিছু নয়। পর্বতের মূষিক প্রসবের সামিল। এত প্রচেষ্টা, এত সুপারিশ সব পর্যবসিত হ'ল ওই মিষ্টান্ন বিতরণে।

নিশিবাবু সামলে নিল। বাসবী আর দীপক যে সত্যি কথা বলছে তারই বা স্থিরতা কি। শুধু দু'-একদিনের আলাপে কেউ কারও জন্য এতটা করে না। আলাপ নিশ্চয় বহুদিনের। পূর্বরাগের পালা চলছে, এ বিষয়ে নিশিবাবুর কোন সন্দেহ নেই। বাসবী নিজে এ অফিসে ঢুকেছে। তারপর ম্যানেজারের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে দীপককে ঢোকাল। এবার দু'জনের ঘর বাঁধার কোন অসুবিধা হবে না। একজনের রোজগারে আজকাল সুদৃঢ় নীড় বাঁধা কঠিন ব্যাপার। দু'জনের মিলিত উপার্জনে অনেক সুবিধা।

খোলা ফাইলের দিকে চোখ রেখে বাসবীও ভাবছিল।

এ এক রকম ভালই হ'ল। অনিমেষ রায়ের নাম নিয়ে এতদিন যে জল্পনা-কল্পনাটুকু চলছিল, এবার সেটার কেন্দ্র হ'ল দীপক গুপ্ত। এবার ব্যাপারটা যেন অনেক সহজ হ'ল, অনেক সাধারণ। ম্যানেজারের নাম নিয়ে কল্পনায় ছবি আঁকার পক্ষে অসুবিধা ছিল। খোলাখুলিভাবে আলাপ করা চলত না। চাকরি নিয়ে টানাটানির ভয় ছিল, এবার কথার স্রোত আরও উদ্দাম, আরও বল্গাহীন হ'তে পারবে।

তা হোক, দীপক একমাস পর বাইরে চলে যাবে। দু'জনকে কথা বলার বা একসঙ্গে দেখার সুযোগ অফিসের লোক পাবে না। ধীরে ধীরে সব উচ্ছ্বাস, সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসবে। এক সময়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে যাবে সব কিছু।

নির্বিকার চিত্তে বাসবী কাজে মন দিল।

কাজ সুরু করল বটে, কিন্তু একটানা মন বসাতে পারল না।

রাত্রে মা'র চোখে যে দৃষ্টি ছিল ঠিক তারই প্রতিচ্ছায়া নিশিবাবুর দু'টি চোখে।

বাসবী একনিষ্ঠ নয়। প্রয়োজন হ'লে অনিমেষ রায়ের মোটরে ঘেঁষাঘেসি বসে আসতে পারে আবার।

দরকারের সময় অনিমেষের কাছে আর এক পুরুষের জন্য সুপারিশ করতেও পিছ-পা হয় না। সব দিক বজায় রাখে বাসবী।

সহকর্মীদের কথা ভেবে নয়, মা'র কথা মনে করে বাসবীর দু'চোখ ভরে জল আসে। নিজের আত্মজাকে মাও এমনই ভুল বুঝবে। নিজের সন্তানের ওপর সামান্য বিশ্বাসটুকুও থাকবে না!

টিফিন হ'তেই বাসবী উঠে পড়ল।

কৃষ্ণার পার্টিশনের কাছ-বরাবর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দু'টো হাতের ওপর মুখ ঢেকে কৃষ্ণা টেবিলে উপুড় হয়ে রয়েছে।

কি হ'ল কৃষ্ণার! কালকের মাথা ধরার জেরটা কি এখনও রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে বাসবী কৃষ্ণার পিঠের ওপর একটা হাত রাখল।

চমকে কৃষ্ণা মুখ তুলল।

দু'টি চোখ লাল। চোখের জলে গালের প্রসাধন নিশ্চিহ্ন। আবেগে ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে থর থর করে কেঁপে উঠছে।

পাশের চেয়ারে বাসবী বসে পড়ল।

কি হয়েছে?

বাবাকে কাল থানায় ধরে নিয়ে গেছে।

তার বাপের সম্বন্ধে বাসবী কৃষ্ণার কাছেই শুনেছিল। মদ্যপ, উপার্জ্জনের বেশীর ভাগ টাকা রেসের মাঠে উপঢৌকন দিয়ে আসেন, তার পর সারাটা মাস কৃষ্ণা যে কি ভাবে সংসার চালায় তার বিবরণ কৃষ্ণা অনেক বার দিয়েছে। কিন্তু থানায় নিয়ে যাবার মতন নতুন অপরাধ আবার কি করলেন?

কিন্তু থানায় কেন? বাসবী জিজ্ঞাসা করল।

কাল রাত্রে মদ খেয়ে কোন্ বারে বুঝি হল্লা করছিল, দোকানের মালিক ফোন করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

তার জন্য সারা রাত আটক?

হ্যাঁ, দোকানের কতকগুলো জিনিসও বুঝি নষ্ট করেছে, দোকানের মালিক নালিশ করেছে। আমি রাত্রে থানায় গিয়েছিলাম, পাঁচশো টাকা দিতে পারে এমন লোক পেলে জামিনে খালাস করে দিতে পারে। আমি ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাউকেই খুঁজে পেলাম না। সারা রাত মা কান্নাকাটি করেছে। আমি কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। এক রাতেই বাবার যা চেহারা হয়েছে, ভয়ের কথা। আমাকে দেখে কেবল বলছে, কৃষ্ণা মা, তুই এই নরক থেকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যা। আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে বিশ্বাস কর, এবার থেকে আমি ভাল হব। ভাল হবে কি না জানি না, কিন্তু বাবার কষ্ট আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।

কথা বলতে বলতে কৃষ্ণার দু'চোখ বেয়ে আবার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

বুকের মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। অব্যক্ত একটা ব্যথা। বাসবীর মনে হ'ল তার দু'চোখ ফেটেও জল গড়িয়ে পড়বে।

এক বছর আগে হারানো বাপের ছবিটা চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। জীবনে একটি কপর্দক নষ্ট করেন নি, বরং সংসারের জন্য, সকলের সুখের জন্য নিজেকে তিল তিল করে অপচয় করেছেন। নিজের শেষ রক্তবিন্দু নিংড়ে সংসারে ঢেলেছেন।

কি করি বল ত? আমি ত ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না।

বাসবীও ভাবতে বসল। ভাবা অর্থহীন। তার জানা-শোনা আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে জামিন হবার জন্য এগিয়ে আসবে। বিশেষ করে পরের জন্য।

হঠাৎ একটা কথা বাসবীর মনে হ'ল।

আচ্ছা, তোমার বাবা যে দোকানের জিনিসপত্র নষ্ট করেছেন তার নামটা জান?

জানি। বাবাই বলেছে। বম্বে হোটেল। চৌরঙ্গী এলাকায়।

আমরা যদি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি।

তাতে কি হবে?

দেখা করে তুমি যদি বল, মাসে মাসে তুমি ক্ষতিপূরণ করবে। তুমি যে এ অফিসে কাজ কর আমি তার সাক্ষ্য দেব।

আমি কিন্তু আর একটা কথা ভাবছিলাম। খুব আস্তে কৃষ্ণা বলল।

কি?

তুমি যদি ম্যানেজারকে বল, তিনি কি জামিন হ'তে রাজী হবেন?

বাসবীর মনে হ'ল বিষাক্ত এক নাগিনী ফণা প্রসারিত করে বুকের সামনে দুলছে। যে-কোন মুহূর্তে ছোবল দিতে পারে। স্পর্শ-মাত্রেই মৃত্যু।

তাঁকে, তাঁকে আমি কি করে বলব?

কেউ যদি বলতে পারে ত তুমিই পারবে। এর জন্য আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

পলকের মধ্যে বাসবীর মুখটা কঠিন হয়ে গেল। যে চোখ একটু আগে বাষ্পাচ্ছন্ন ছিল, সে চোখ অগ্নিময় হয়ে উঠল।

এরা সকলেই কি বাসবীকে ভুল বুঝবে। মিথ্যা একটা কলঙ্কের রেখা টেনে টেনে সম্পর্কটা আবিল করে তুলবে। পুরুষরা ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু নারী হয়েও কৃষ্ণা এই একই অন্যায় করবে!

বাসবী দাঁড়িয়ে উঠল। দৃঢ় নিষ্করুণ কণ্ঠে বলল, ম্যানেজারকে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না কৃষ্ণা। অন্য কাউকে দিয়ে বলাতে পার, বলিও। ভেবে দেখ,

যদি দোকানের মালিকের কাছে যেতে চাও, আমাকে জানিও, আমি সঙ্গে যাব। কাজ হবে কি না জানি না, তবে একবার বলে দেখতে আর ক্ষতি কি।

বাসবী দ্রুত পায়ে নিজের সীটে ফিরে এল।

ছুটির পরেও মিনিট পনেরো বাসবী অপেক্ষা করল। কৃষ্ণা এল না।

তার মানে কৃষ্ণার অভিমান হয়েছে। বাসবী যে অনিমেষ রায়কে কিছু বলতে পারবে না, সেজন্য বাসবীর ওপর কৃষ্ণা সম্ভবত অসন্তুষ্টই হয়েছে।

হোক। কেউ যদি অযথা কিছু ভেবে বসে তার জন্য বাসবীর কি দায় আছে। অফিসের সবাই অনিমেষ আর তার মধ্যে একটা অন্যায় সম্পর্কের সেতুর কল্পনা করে বসে আছে। অন্তরঙ্গতার অলীক সম্বন্ধ।

শুধু কি অফিসের লোক। বাড়ীতে বাসবীর মা'র মনেও সন্দেহের কণা রয়েছে। তার ধারণা অফিসে ঢুকে বাসবী উড়তে শিখেছে। ম্যানেজারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ত রয়েইছে, সেটা অবশ্য কিছুটা ক্ষমার্হ। নিজের উন্নতির জন্য মেলামেশা একটু করতে হয়। অবশ্য নিজের সর্বনাশ বাঁচিয়ে। আবার দীপককে জুটিয়েছে নতুন করে। কোথায় বাড়ী, কি ক'রে আলাপ হ'ল, কিছুই মা'র জানা নেই। কিন্তু পরিচয়টা যে রীতিমত ঘনিষ্ঠ সেটা বুঝতে মা'র কোন ভুলই হয় নি। অন্তরঙ্গতা না হ'লে এ বাজারে কেউ কাউকে চাকরি দেবার কষ্ট স্বীকার করে! ম্যানেজার বাসবীর হাতের পুতুল, তাই বোধ হয় পেরেছে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এত দুঃখেও বাসবীর হাসি এল। কত সহজে একটা মানুষের সম্বন্ধে এরা মত গঠন করে নেয়। তলিয়ে কিছু দেখে না, বিচার করতে চায় না। কাদা ছোড়বার একটু অবকাশ পেলেই তৎপর হয়ে ওঠে।

এক সময়ে বাসবী উঠে পড়ল। ড্রয়ার খুলে ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করে হাতে নিল। অফিস প্রায় খালি। শুধু নিশিবাবু বসে আছে। ডেসপাচারও রয়েছে। সে দেরিতে আসে, দেরিতে যায়। দু'-একটা বেয়ারাও ঘোরাঘুরি করছে।

বাসবী নিশিবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

আজ চলি।

নিশিবাবু খস খস করে একটা চিঠি লিখছিল, বাসবীর কথায় মুখ তুলে বলল।

এতক্ষণ ছিলেন আপনি? কোনদিন ত থাকেন না?

বাসবী হাসল, বা, আগে চলে যাওয়াটাই দেখেন, দেরি করে কাজ করাটা আর নজরে পড়ে না।

নিশিবাবু উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল।

ঝড়ের বেগে অনিমেষ রায় নিজের রুম থেকে নিশিবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

নিশিবাবু।

অপাঙ্গে একবার বাসবীর দিকে চেয়ে অনিমেষ বলল।

নিশিবাবু দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে।

বলুন স্যর।

রাঙামাটির রাস্তার যে কণ্ট্রাক্টটা আমরা পেয়েছি সেটা আছে আপনার কাছে? কাল সকালে আমি রাঙামাটি যাব, কাজ কতটা এগিয়েছে দেখবার জন্য। ফাইলটা আমার দরকার।

নীচু হয়ে গোটা তিনেক ফাইল ঘেঁটে নিশিবাবু একটা ফাইল এগিয়ে দিল।

এই যে ফাইলটা স্যর। একটা জিষ্ট (Gist) করা আছে কাজের। একবার চোখ বোলালেই বুঝতে পারবেন।

ফাইল হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই অনিমেষ থেমে গেল। তার পর এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। বাসবীর দিকে চেয়ে বলল, বাড়ী যাবেন ত? আসুন আমার সঙ্গে।

কঠিন সিমেন্টের মেঝে, তবু বাসবী একমনে কামনা করল ধরণী ফেটে চৌচির হোক, সেই বিদীর্ণ মাটির গর্ভে বাসবীর অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে যাক।

আড়চোখে বাসবী একবার নিশিবাবুর দিকে দেখল। নিশিবাবু নিজের মনে ফাইলের পাতায় লিখে চলেছে। সামনে এই নাটকের কোন সংলাপ যেন তার কানেই ঢোকে নি। নিশ্চল, নির্বিকার।

কিন্তু বাসবী ভালই জানে, এটা নিশিবাবুর ছদ্মবেশ। প্রয়োজনের সময় তার তূণীর থেকে সবচেয়ে বিষাক্ত তীর

ঠিক বেরিয়ে আসবে। দয়া, মায়া, মমতা, এ সবের ধারও ধারবে না।

বাসবী মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে অনিমেষের অনুগমন করল।

যেতে যেতেই ভাবল, নিশিবাবু নিশ্চয় অনুমান করবে অনিমেষের সঙ্গে যাবার তার আগে থেকেই ঠিক ছিল। নিশিবাবুর কাছে দাঁড়ানটুকু শুধু ছলনা। স্ত্রীজনোচিত চাতুরী।

বেয়ারা কামরার দরজা খুলে ধরেছে।

অনিমেষের পিছন পিছন বাসবীও ঢুকল।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে অনিমেষ বলল, বসুন। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই উঠছি। কয়েকটা চেক সই করতে হবে। কাল পরশু দু'দিন থাকব না।

বাসবী বসল।

অনিমেষ চেক সই করতে করতে বাঁ হাতটা টেলিফোনের ওপর রাখল তারপর নিজের মনেই বলল, ও, টেলিফোন অপারেটর ত পাঁচটায় বেরিয়ে গেছে। বেচারীর ভারী বিপদ। শুনেছেন নিশ্চয়?

বাসবী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, শুনেছে।

পৃথিবীতে কত রকমের লোকই থাকে। অবশ্য ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই ছাড়া পেয়ে গেছেন।

ছাড়া পেয়েছেন?

হ্যাঁ। শ্যামপুকুর থানার ও.সি. আমার খুব পরিচিত। মিস পালিত চলে যাবার পর থানায় একবার ফোন করে দেখলাম। ও.সি. বলল, দোকানের মালিক কেস উঠিয়ে নিয়েছে। হাজার হোক তার দোকানের পুরোণো খদ্দের। খদ্দেরকে জেলে পুরলে অন্য খদ্দের চটবে যে!

বাসবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ভালই হয়েছে। কৃষ্ণা যে রকম উৎকণ্ঠিত হয়েছিল তাতে বাসবী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণার বাপের হাজত বাস মানে, একজনের রোজগারের ইতি। সংসারের হাল আর দাঁড় দুই-ই কৃষ্ণাকে ধরতে হবে।

নিন, চলুন।

কোটটা হাতের ওপর নিয়ে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

বাসবীও উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাসবী বলল।

আমার কিন্তু একটা টিউশনি আছে।

ছাত্র না ছাত্রী?

ছাত্রী।

কোথায়?

বালিগঞ্জে। যতীনদাস রোড।

ঠিক আছে। আমার পথেই পড়বে। আপনাকে নামিয়ে দেব।

দু'জনে মোটরে উঠল।

রাজপথে তিলধারণের স্থান নেই। উত্তাল জনসমুদ্র। গর্জনও সাগর-সদৃশ। খুব সাবধানে মৃদু গতিতে মোটর এগোতে লাগল।

মোটরে বসে বাসবীর ভালই লাগল। এ জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাকেও চলতে হ'ত। লেডিজ ট্রাম ছেড়ে গেছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে করে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেত, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তার পরিবর্তে নরম গদীতে হেলান দিয়ে বায়ুবেগে পথ পরিক্রমা। মাঝে মাঝে পথিকদের সচকিত করে হর্ণের শব্দ। ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে এই অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতি, এ সবের মধ্যে কোথায় একটা আভিজাত্যের ইঙ্গিত আছে। মধ্যবিত্ত মেয়ে বাসবীকে নিজের অবস্থা ভুলিয়ে দেয়।

পার্ক ষ্ট্রীটের এক রেস্তঁরার সামনে অনিমেষ মোটর থামাল।

বাসবীর দিকে চেয়ে হেসে বলল।

আপনি একদিন না গেলে কি আপনার ছাত্রী অকুল-পাথারে পড়বে বলে আপনার মনে হয়?

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটা বাসবী যে একেবারে বুঝল না, এমন নয়। তবু জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

মানে, বাড়ী গিয়ে ভৃত্য-প্রবরের হাতের রান্না আস্বাদন করতে ইচ্ছা করছে না। তাই ভাবছি, এখানেই বেশী করে কিছু খেয়ে নেব। একেবারে রাতের মতন নিশ্চিন্ত।

এমন সুরে অনিমেষ কথাগুলো বলল যে অনেকক্ষণ তার দিকে না চেয়ে বাসবী পারল না। কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিষাদের সুর। অসুখী এক আত্মার দীর্ঘশ্বাস।

অথচ এমন ত হবার কথা নয়।

এ যুগে যা-কিছু কাম্য সবই অনিমেষের আছে। রূপ,

যৌবন, স্বাস্থ্য, অর্থ। শুধু গৃহ নেই, সুখ নেই। গৃহ নেই কারণ গৃহিণী নেই। মাথা গোঁজবার যে আস্তানাটুকু আছে, সেখানে বিলাসের হাজার উপকরণ ছড়ানো থাকলেও গৃহের নিভৃতি নেই। নীড়ের কবোষ্ণতা।

সবচেয়ে বড় কথা সুখ নেই।

বেলাদেবীকে বাসবী অফিসে দেখেছে। তার সম্বন্ধে কৃষ্ণার কাছে অনেক কথা শুনেছে। কার দোষ বাসবী জানে না। চুলচেরা হিসাব করার অবকাশ কিংবা স্পৃহা কোনটাই তার হয় নি। শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছে অনিমেষের দাম্পত্য-জীবন অভিশাপের কৃষ্ণছায়ায় অন্ধকার।

কি, উত্তর দিন।

হাতল ঘুরিয়ে জানলার কাঁচ তুলতে তুলতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

বাসবী জানে সে যদি সম্মত না হয়, তা হ'লে অনিমেষ জোর করবে না। এখনই গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরবে। যতীনদাস রোডে বাসবীকে নামিয়ে দিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরবে।

সে আস্তানার রূপ বাসবীর জানা নেই। ভৃত্যতন্ত্রের ব্যবস্থায় যা হওয়া সম্ভব, তাই হবে। কোথায় যেন বাসবী পড়েছিল, কোন্ আধুনিক লেখকের উপন্যাসেই বোধ হয়; খাদ্যটা বড় নয়, বড় যত্ন। এই যত্ন আর মমতারই অভাব সে গৃহস্থালীতে।

অভাবের সুরটুকুই অনিমেষের স্বরে ধরা পড়ছে।

ছাত্রীর পরীক্ষা হয়ে গেছে, আজ না গেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।

অশেষ ধন্যবাদ।

দরজা খুলে দিতে দিতে অনিমেষ হাসল। নিজে নেমে বাসবীকে বলল, নামুন।

বাসবী নামল।

কনসার্টের আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘুমপাড়ানী সুর। বাইরে থেকে মধ্যে ঢুকেই বাসবী থমকে দাঁড়াল।

স্তিমিত আলো। অন্ধকারের একটা আবরণ রয়েছে। মেঝেতে দামী কার্পেট। টেবিল চেয়ার সব কিছু সবুজ।

একেবারে কোণের দিকে কাপড়ের পার্টিশন্। পার্টিশনের গায়ে জাপানী পদ্ধতিতে আঁকা অনেকগুলো উড়ন্ত পাখীর ছবি। এদিকে-ওদিকে প্রায় সব টেবিলই ভর্তি।

অনিমেষ পর্দার আড়ালে চলে গেল। বাসবীকেও যেতে হ'ল পিছন পিছন।

সামনাসামনি বসল দু'জনে। বেয়ারা এসে কাছে দাঁড়াল।

মেনুর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে অনিমেষ বলল, আপনার জন্য কি অর্ডার দেব মিস সেন?

এক গ্লাশ সরবৎ ছাড়া আর কিছু নয়।

সে কি?

হ্যাঁ, দুপুরের টিফিন এখনও হজম হয় নি। বাড়ী ফিরেই আবার খেতে হবে।

কথাটা বলেই বাসবীর মনে পড়ল, দুপুরে তার টিফিন খাওয়াই হয় নি। টিফিনের প্যাকেটটাই কৃষ্ণার টেবিলে ফেলে এসেছে। কিন্তু তবু এখানে বসে তার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

যতই অনিমেষ নিজের মোটরে তুলে নিক, কাছে ডাকুক, তবু একথাটা বাসবী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হবে না যে অনিমেষ আর বাসবী এক সমাজের নয়, অন্তত সমাজের এক স্তরের নয়। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব অসম্ভব, সে আকাশ-চুম্বী আশা বাসবী করেও না। সে অনিমেষের কৃপার প্রার্থী। অনিমেষ অবহেলায় যে দাক্ষিণ্যটুকু ছুঁড়ে ফেলে দেবে সেটুকুই সে আঁচল পেতে নেবে। তার বেশী নয়।

সেজন্য অনিমেষের সঙ্গে এভাবে হোটেলে রেস্তঁরায় ঘুরে বেড়ানো যে অনুচিত, সে বোধটুকু বাসবীর আছে।

বাসবীর শুধু এক লক্ষ্য। চাকরির উন্নতি। উন্নতি মানেই অর্থের সুরাহা। বুভুক্ষু অনেকগুলো মুখে বাড়তি অন্ন, জীর্ণ, ছিন্নবাস পরিহিত দেহে আনকোরা বস্ত্র। বাসবীর টলমলে সংসার নিরাপত্তার কূলে এসে ভিড়তে পারবে।

অনেক সাধাসাধির পর এক প্লেট আইসক্রীমে রফা হ'ল।

বাসবী চামচ ডুবিয়ে আস্তে আস্তে মুখে দিতে লাগল। অনিমেষের সঙ্গে তাল রেখে।

জানেন. একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা করে।

অনিমেষ খেতে খেতে বলল।

বাসবী মুখে কিছু বলল না। শুধু দু' চোখে জিজ্ঞাসার দীপ জালিয়ে চেয়ে দেখল।

বিধাতা পুরুষের সঙ্গে, অনিমেষ হাসল, দেখা করে বলব আমার জীবনের ছকটা গুটিয়ে নাও। নতুন ধরনের জীবন আরম্ভ করতে দাও আমাকে।

বাসবী বলল, ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।

একটা পার পেলেই আমি খুশী হ'তাম। অন্য পারের কামনা করতাম না। কিন্তু এভাবে ঢেউয়ের বুকে সংসার সাজিয়ে দেওয়াটাতেই আমার আপত্তি। ভেসে বেড়ানোর অন্য নাম নিশ্চয় জীবন নয়।

অনিমেষের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বাসবী জানে, অনিমেষ সুখী নয়। যে-কোন কারণে, যার দোষেই হোক, দাম্পত্য জীবনের পবিত্র বন্ধনটুকু ছিঁড়ে গেছে। হয়ত সে বন্ধন কোনদিন জোড়া লাগবে এমন সম্ভাবনাও আর নেই। কিন্তু এ যুগে এটা ত সভ্যতার অভিশাপ। এর জন্য সমস্ত জীবন ব্যর্থ এমন একটা নাটকীয়তা অর্থহীন।

অনিমেষ কৃতী। এক সংসার গেছে, আর এক সংসার গড়ে তোলবার সম্পদ তার আছে। তার কিসের ভয়!

বাসবীর মতন সমস্ত ভবিষ্যৎ ত অনিমেষের সামনে মুখব্যাদান করে দাঁড়ায় না। প্রতি পদে চিন্তা, প্রতি পদে ভয় তার যাত্রাপথকে বিঘ্নিত করে না।

ভাগ্য নিয়ে পুরুষের এই হতাশা বাসবী সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু অনিমেষ তার অন্নদাতা, মালিক। তার কাছে এসব কথা বলাও চলে না।

বাসবী একেবারে অন্য কথা পাড়ল।

আপনাকে অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, তাই না?

অনিমেষ কিছুক্ষণ বাসবীর দিকে দেখল। বুঝল, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করা বাসবীর অভিপ্রায় নয়। এ প্রসঙ্গ সে এড়াতে চায়।

অনিমেষ বলল, কাজ পড়লেই যেতে হয়। এবার যখন যাব আপনাকে নিয়ে যাব সঙ্গে।

বাসবী আরক্তিম হয়ে উঠল। যেখানে দ্বিধা, যেখানে সংশয় বার বার অনিমেষ কথার স্রোতকে সেই খাতেই বহাতে চেষ্টা করে।

এতে কি লাভ অনিমেষের! বোধ হয় যাচাই করে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত মন এমন প্রস্তাবে কতটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। একটা স্তিমিত, অবসন্ন মুখের রেখা কিভাবে পুলকে, লোভে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

আপনি ম্যানেজার, আপনি আদেশ করলে যেতে হবে বৈ কি।

খুব মৃদু কণ্ঠে বাসবী বলল।

অনিমেষ হাসল, আপনার চাকরিতে উন্নতি অবধারিত।

কফি-পটটা নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে অনিমেষ বলল, কফি খাবেন এক কাপ?

না, বাসবী ঘাড় নাড়ল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার উঠব।

বেশ, নাই যদি খান ত, এক কাপ কফি তৈরী করে দিন আমাকে।

বাসবী একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু অনিমেষের পরের কথায় তার সব দ্বিধা কেটে গেল।

মা কবে গেছে মনেও নেই। কাকিমার কাছে মানুষ। তাও নারীত্বের কোমল দিকটা অজানাই রয়ে গেল। কেবল ভর্ৎসনা আর তাড়না। তার পরের জীবন কাটল হোস্টেলে। লেখাপড়া শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বহু পূর্বরাগের পর যে নারীরত্নটিকে আহরণ করলাম, ক'দিন যেতেই দেখলাম, সেটি রত্ন বটে, একেবারে খাঁটি রক্তমুখী নীলা। সহ্য করতে পারলাম না, তাই জীবন বিষময় হয়ে উঠল। নারী যে কল্যাণময়ী এটা শুধু কবিতাতেই পড়েছি।

অনিমেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দু'জনে যখন উঠল তখন বাইরে বেশ অন্ধকার। রেস্তঁরার বাতিগুলো ইচ্ছা করেই নিষ্প্রভ করে দেওয়া হয়েছে। মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য।

অনিমেষ আর বাসবী পাশাপাশি এগিয়ে চলল।

ঠিক দরজার মুখেই ব্যাপারটা ঘটল। কার্পেটটা একটু

গুটিয়ে গিয়েছিল, আধ-অন্ধকারে বাসবী লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ হোঁচট খেল। অনিমেষ পাশেই ছিল, ক্ষিপ্র-হাতে বাসবীর বাহুমূলটা আঁকড়ে ধরল।

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ। শিরায় শিরায় আগ্নেয় প্রবাহ। অনেক কষ্টে বাসবী মুখ তুলল। মুখ তুলেই চমকে উঠল।

চৌকাঠের ওপারে বেলা দেবী। প্রসাধন-করা ঠোঁটে বিচিত্র হাসির ঝিলিক।

(ক্রমশঃ)

॥ প্রবন্ধ ॥

চিত্তবিশ্রাম ঃ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

যৌবনে রবীন্দ্রনাথের বাস ছিল পদ্মাবক্ষে। ১২৯৫ থেকে ১৩০৮ সাল সেখানে তাঁর স্থায়ী বসবাসের কাল বলে ধরা যায়। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের তীব্রতায়, ভাষার আশ্চর্য শিল্পকারুকার্যে, সর্বোপরি যৌবনশক্তির প্রাচুর্য ও উচ্ছলতায় এই পর্ব তাঁর জীবনের সবচেয়ে ফলবান পর্ব। সেই সময় তাঁর চেতনা কোন কোন দিক দিয়ে লাভবান ও বেগবান হয়েছিল সে বিষয়ে স্বয়ং তিনি এবং তাঁর সমালোচকবর্গ সবাই সচেতন। মুক্ত প্রকৃতির প্রাণদ বিস্তার, মানবজীবনের প্রথম সংস্পর্শ, গ্রামজীবনের প্রথম পরিচয়, অনুভূতির নূতন ইন্দ্রিয়লাভ প্রভৃতি তাঁর এই লাভের তালিকাভুক্ত।

চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হ'তে না হ'তে তাঁকে শিলাইদহের বাস উঠিয়ে দিতে হ'ল। তখন থেকে তিনি মূলতঃ শান্তিনিকেতনবাসী। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয় নি। জমিদারী বিষয়কর্মের সূত্রে, এবং অকাজে শুধুমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও তিনি বহুবার সেখানে গেছেন। রবীন্দ্ররচনাবলীর পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে পরবর্তী পর্বের রচনার নীচে তারিখ ও স্থানোল্লেখগুলির মধ্যে অজস্রবার শিলাইদহ, পদ্মা, পতিসর, সাজাদপুর, গোরাই নদী, প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য এতে উল্লেখ্য কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত অদ্ভুত-কর্মা নিরলস কবি বিশ্বসাহিত্যে বিরল। সারাজীবনে, বিশেষতঃ উত্তরজীবনে তিনি বহুবার ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এবং দূরতম বিদেশে অতিব্যস্ত অবস্থায়ও লেখনীকে একেবারে নিষ্ক্রিয় রাখেন নি। স্বদেশেও নানা রকম দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, এবং যে-সব আঘাতে মানুষ জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলে সেখান থেকেও তিনি সৃষ্টির প্রেরণা আহরণ করেছেন, এবং লেখনী স্তব্ধ করেন নি। কাজেই সাময়িকভাবে শিলাইদহে গিয়েও তিনি অজস্র লিখবেন এটা বড় কথা নয়, আশ্চর্য হ'ল সেই সব রচনায় মনোভঙ্গির একটা বিশেষ ঝোঁক, যার নাম দিতে পারি প্রশান্তি। শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর নিয়ে গঠিত ভূখণ্ড 'তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম চিত্তবিশ্রাম।

এ বিষয়ে মূল তথ্যগুলি সংক্ষেপে উদ্ধার করে নেওয়া যাক।

১৩০৮ সালে শিলাইদহ ত্যাগের পর থেকে ১৩২৮ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছরের ঘটনা স্মরণ করলে দেখি কবি এর মধ্যে কমপক্ষে কুড়িবার শিলাইদহ গেছেন। (১৩২৮-এর পরেও গেছেন তবে তার পৌনঃপুনিকতা অনেক কম।) কয়েকবার কর্মোপলক্ষ্যে, কয়েকবার শুধু বেড়াবার জন্যই, কয়েকবার কাজের অনুরোধে গিয়ে মানসিক বিশ্রামসুখ ভোগ করবার জন্য কাজ শেষ করেও কিছুদিন থেকে গিয়েছেন। অবস্থিতিকাল চার-পাঁচদিন থেকে চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পদিন। এর ভিতর রচনার দিক থেকে একেবারে বন্ধ্যা পর্ব—মাত্র ছটি। তার মধ্যে তিনবার কবি অত্যন্ত আহত ও বিভ্রান্তচিত্তে শুধুমাত্র বিশ্রাম লাভের জন্যই পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করেছিলেন। প্রথমবার ১৩১০ সালের অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। তার আগের একটি বৎসর কবির সাংসারিক জীবনে চরম সংকটের কাল গিয়েছে। পত্নী ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু, গঠমান বিদ্যালয়ের অসংখ্য সমস্যা ও আর্থিক অস্বাচ্ছল্য, অন্তর্জীবনের নিত্য কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের গুরুভার দাবির আঘাত ও আন্দোলন তাঁকে ভিতরে ভিতরে ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। দ্বিতীয়টি ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে। তখন কবির বয়স পঞ্চাশ। মধ্যবয়সের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনজিজ্ঞাসা ও উদ্‌ভ্রান্তি তখন তাঁকে অধিকার করে ছিল। অত্যন্ত বেগবান একটি অদৃশ্য শক্তি সে পর্বে তাঁকে ক্রমাগত বলেছে 'চল, বাইরে চল', তাঁর চৈতন্য আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করেছে। তখন প্রকৃতির শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়বার যান ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসে। প্রায় একপক্ষ কাল ছিলেন, উল্লেখ্য রচনা কিছুই লেখেন নি।

বিষয়কর্ম উপলক্ষ্যে গিয়ে শুধু বিষয়কর্মই করেছেন মাত্র দু'বার—১৩০৯ সালের গোড়ার দিকে, এবং ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে। দু'টি ভ্রমণই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আর একবার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর ছাত্রসহ শিলাইদহে মাসাধিক কাল বসবাস করেছিলেন। রচনার অবকাশ তার মধ্যে ছিল না।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য পর্বগুলি বিচিত্রভাবে ফলবান। আলোচনার সুবিধার জন্য সেই রচনাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা গেল,—কতকগুলিতে আছে

পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমসাময়িক রচনার পাশে স্পষ্ট স্বরস্বাতন্ত্র্য, কতকগুলি ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ মনকে সতেজ করা ও জুড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস, এবং কতকগুলি শুষ্ক ঋতুর পর নূতন উৎসার।

শিলাইদহ পরিত্যাগের অল্পদিন পরে ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে আপন জমিদারীতে ফিরলেন। এতকাল যেখানে সপরিবারে বাস করেছেন এখন সেখানে একলা এসে প্রথমটা ফাঁকা বোধ করেছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সে শূন্যতা আর অসহ্য বোধ হচ্ছে না, এমন কি ভালই লাগছে। শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে তাঁর নতুন লেখা 'নববর্ষা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। এর আগে কিছুকাল লেখার স্রোত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ছিল। গত বছরের শেষ থেকে এ বছরের প্রথম পর্যন্ত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছে, সাংসারিক দায়িত্বও যথেষ্ট ছিল। আবার শ্রাবণের শেষে ফিরে এসে তিনি কর্মকোলাহলে আবৃত হয়েছেন। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ, বঙ্গদর্শনে সাহিত্যিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক নানাবিধ রচনা, সাংসারিক সমস্যা ইত্যাদি সব দিকেই তাঁকে মন দিতে হয়েছে। পূর্বাপরের এই মানসপ্রতিবেশের মাঝখানে 'নববর্ষা' একটি দ্বীপ। 'কল্পনা'র মম-অনুভূতিবলে এ-কালের দৃষ্টিতে একবার প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের যুগ পুনরুত্থিত হয়েছিল। চার বছর পরে 'নববর্ষা'য় আবার সেই ভাবনার স্ফুরণ দেখি। বহুবারের মত এবারও কালিদাসের কথাতেই কালিদাসের স্মরণ, দীর্ঘসমাসবদ্ধ ঘনপুঞ্জিত ধ্বনিময় শব্দাবলীতে মেঘদূতের বর্ষার আভাস। নববর্ষা সেখানে, 'সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ', 'অলকাপুরী', 'অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান', 'চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত' দ্বারপ্রান্তে 'চৈত্যবট' শুককাকলীতে মুখর, এবং পৃথিবী 'নদীকলধ্বনিত, সানুমৎ-পর্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিত ও যূথীসুগন্ধি' এক আশ্চর্য দেশ। তারই সঙ্গে সেই লুপ্ত রোমাণ্টিক দেশের উপর বাংলা দেশের অতিপ্রত্যক্ষ বর্ষা আর একটি ঘোরতর ছায়া প্রক্ষেপ করতে চাইছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে কবির একটি চিঠি অংশতঃ উদ্ধৃত করেছেন—

"চারিদিকের সবুজক্ষেতের উপর স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগছে। প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষাদিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখতে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিষ করে রাখতে পারতুম তাহলে কেমন হত।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ডঃ পৃ ২৫)

এই চিঠিটির সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে অনুরূপ আর একটি চিঠির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। শিলাই হে প্রথম আগমনের কালে সেটি লেখা হয়েছিল। —"জলের শব্দ, দুপুরবেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউ ঝোপ থেকে ছুটো একটা পাখির চিক্‌চিক্ শব্দ, সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে।"

(ছিন্নপত্র)

এই জাতীয় প্রক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ পাই 'খেয়া'র মধ্যে। খেয়া কবিজীবনের সন্ধি-লগ্নের কাব্য। প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাগুলি তাঁর অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার বিবিধ রূপবৈচিত্র্য প্রকাশ করছে। সমস্ত চিত্রকল্প ও ভাবকল্প পরিব্যাপ্ত করে এক জাতীয় বিষণ্ণ মন্থরতা বিরাজমান। দিনের শেষে নদীর পরপার ঝাপসা হয়ে গেছে, কোন সঙ্গী নেই, কোনও যাত্রী নেই, নদী পার হবার কোনও পথ নেই, অথচ পার হওয়া যেন একান্তই প্রয়োজন। আচ্ছন্ন বিষাদের পটভূমিকায় বিগত জীবনের লীলা নানা রঙে আঁকা হয়ে যাচ্ছে, কখনও তা বেণুবনচ্ছায়াঘন পথ দিয়ে জল নিয়ে আসা, কখনও তা পরম আদর্শের জন্য পথের মাঝখানে বক্ষের মণি অকারণে ফেলে দেওয়া, কখনও বালিকা বধূর মত পূর্ণের বাহুপাশে অচেতনে দিন যাপন করা, কখনও হৃদ্‌বিদারণ দুঃখের মধ্যে জীবনের আরাধ্যকে চকিতে অনুভব। সব মিলিয়ে ক্লান্তি ও সন্ধানের ভাব। স্বর্ণবর্ণ গোধূলি ধূসর হ'ল, অনালোকিত অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলুক। খেয়া কাব্যের প্রথম থেকেই এই জাতীয় কবিতা এবং তার পাশাপাশি স্বদেশী সংগীত ও স্বদেশী আন্দোলনের ধারা চলেছে। কখনও প্রথমটি প্রবল, কখনও দ্বিতীয়টি। এই সময়ে ১৩১২ সালের মাঘের শেষে কবি শিলাইদহে গেলেন। তার অব্যবহিত পূর্বকালে কাব্যস্রোত ঈষৎ ক্ষীণ ছিল। কিন্তু এখন তেইশে থেকে ছাব্বিশে মাঘ চারিদিনের মধ্যে ছটি কবিতা লিখলেন। প্রথম কবিতাতেই সন্ধান ও জিজ্ঞাসার পীড়ন ডুবিয়ে প্রাপ্তির সুর ধ্বনিত হ'ল—

"আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।"

মিলন, বিচ্ছেদ, বিকাশ, সীমা, ভার ও টিকা সবগুলি কবিতাতেই এই একটি সহজ আবেগ অনুস্যূত হয়ে আছে, যার সঙ্গে স্পষ্ট প্রতিতুলনা চলে 'সোনার তরী'র মুখ কবিতার। কবিতাগুলির পটভূমিতে সন্ধ্যার চিত্রকল্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।' পদ্মাবক্ষের অবারিত উজ্জ্বল শীত-প্রভাতের রশ্মিতন্তুতে তাদের বয়ন—

১। কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যে দিকেই আঁখি তাকালো।
২। এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।
৩। যেমন সহজ পাতায় শিশির
মেঘের মুখে সোনা।
৪। বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
৫। সোনার আলো
৬। কমলবরণ শিখা
৭। অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা।

পাঠকের এর সঙ্গে সঙ্গেই বলাকার অনুরূপ কবিতাগুলির কথা মনে হবে। খেয়ার পরে ততদিনে একটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গীতাঞ্জলি পর্বের অধ্যাত্মচিন্তার পরে পরিণতসুন্দর নিরাসক্তির সাহায্যে প্রৌঢ় কবি জীবনযৌবনের নিত্য চলমানতা ও নিত্য সজীবতার তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন। তারই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের আসন্ন মহাযুদ্ধের খবর তাঁর কাছে তারহীন টেলিগ্রাফে এসে পৌঁছেছে। তিনি অনুভব করছেন মৃত্যু, দুঃখ, বেদনার মধ্য দিয়ে নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। এইভাবে মানব-ইতিহাস ও জগৎ-ইতিহাসের দুই বৃহৎ তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে থাকতে তাঁর একবার পদ্মাতীরে যাবার প্রয়োজন হ'ল। সেখানে গিয়ে ১৩২১ সালের ২০শে মাঘ থেকে ২৭শে মাঘের মধ্যে তিনি বারটি কবিতা লিখলেন।

সংসারের কাছে প্রত্যেক মানুষের যেন একটা সহজাত অব্যক্ত প্রত্যাশা আছে যে, সংসার তার চিন্তা ও কাজের মূল্য বুঝবে। সেইজন্য সে নিজেকে বহির্জগতের মনোমত করে গঠন করে চলে। আঘাতে আঘাতে তার ভুল ভাঙলে সে আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরে পায়। তখন সে নির্ভীক। প্রথম কবিতা 'মুক্তির' উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড : পৃ ৩১৪) তৎকালীন রবীন্দ্রচিত্ত সম্বন্ধে একটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন মনে কোন আঘাতই স্থায়ী হয় না, তাঁহার মন অল্পকালের মধ্যেই বস্তুজগৎ হইতে ভাবলোকে যাত্রা করিয়া চলিল। তাই বলিতেছেন—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম হোয়ে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।"

আকাশ-পাতালে শুদ্ধ আবেগসম্বল ভাব-যাত্রার নিদর্শন পরবর্তী কবিতাগুলি। সেখানে কবি অনুভব করছেন যে ঠিকানাহীন দুরাশার স্বর্গে ঘুরে কোন ফল নেই, মানুষের স্নেহে, প্রেমে দুঃখে সুখে,জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গে নিত্য নবীন বর্ণচ্ছটায় স্বর্গ দোলায়মান, এবং কবির গানে সেই স্বর্গের প্রকাশ। এ কবিতার অন্তরস্রোতে 'পুরস্কার' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার অনুরণন শোনা যায়। কবির আরও মনে হচ্ছে যে গানের মৃদুগুঞ্জনে দিন অতিবাহনই তাঁর জীবনের ধ্রুব, এবং এ জীবন মহামূল্যবান, কারণ, মানুষের অনুভূতির মধ্য দিয়েই স্রষ্টার সৃজনশিল্পের সার্থকতা।

১। দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
২। আমার দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।
৩। আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।
৪। আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে।

এই জাতীয় মনোভাব রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর ব্যবহৃত মৌলিক অনুভূতিগুলি একটি, এবং যে চিত্রকল্পরাশির মধ্য দিয়ে এ ভাব শরীরী হয়েছে সেখানেও প্রধান স্থান অধিকার করেছে অনন্ত বিস্তার বিজন পদ্মা এবং অবারিত আকাশ। জন্ম-মৃত্যুর উপমা তরঙ্গ, আনন্দ আকাশভরা, প্রেম সোনার বরণ ফুল, আলো আনন্দ-কুসুম, দেহটির ভেলা, দুদিনের তরী, আনন্দিত প্রাণ হিরণ্ময়, চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীর, তারার ছায়াতরী, জগৎ আলোর মঞ্জরী, এবং যৌবনাবসান সেই দিগন্তের মতো 'শ্যামশ্রী-মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।'

এ জাতীয় উদাহরণ আর বেশী দেবার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ কবিচিত্তের সান্ত্বনা-

সন্ধান মুখ্য সেখানে তার নিদর্শনও পাই একাধিক ক্ষেত্রে। ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গভীর শোকে পদ্মার স্নেহহস্তস্পর্শ তিনি লাভ করলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ মুঙ্গেরে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর কবির অন্তর্জীবনে একটা ওলটপালট ঘটে যায়, তিনি কর্মপুঞ্জের স্তূপ এড়িয়ে কিছুকালের জন্য শিলাইদহের নিভৃতে প্রস্থান করলেন। সেখানে তাঁর দীর্ঘতম বসবাসকাল এই সময়েই, প্রায় পাঁচ মাস। মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে বা কলকাতায় এসেছেন বটে, কিন্তু অবিলম্বে ফিরেও গেছেন। খুব বেশী রচনা নেই। কিন্তু অল্প যে ক'টি আছে তার থেকেই অনুমান হয় কবি আপনাকে শান্ত ও স্বচ্ছ করতে এবং জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। 'গোরা' মন্থর গতিতে এগোচ্ছে, গীতাঞ্জলির প্রথম দিকের দুই-একটি প্রার্থনাসঙ্গীতে কবি-মনের নতুন ঝোঁকটির আভাস পাই, এবং অনতিবিলম্বে, 'দুঃখ' নামক যে প্রবন্ধ তিনি রচনা করলেন সেখানে দেখলাম অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাঁর শোকদগ্ধ হৃদয় থেকে নতুন জ্যোতিষ্মান অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিরকালের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে একান্ত করে না দেখে পথে চলতে চলতে ফেলে ফেলে যাওয়া, অথচ তারই অভিজ্ঞতার সে অন্তরকে সমৃদ্ধতর ক'রে নেওয়া তারই প্রমাণ এখানে পাই। এইভাবে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে আবার তিনি বহিঃসংসারের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, —পল্লীসমাজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন, সুরাট কংগ্রেসে আত্মকলহের মূর্তি দেখে বিচলিত হয়ে প্রবাসীতে যজ্ঞভঙ্গ নামে প্রবন্ধ লিখছেন, অবশেষে পাবনার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে রাজনৈতিক বাদ-বিসংবাদের আসরেও অবতীর্ণ হ'লেন। এমন নিশ্চয়ই হ'তে পারে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শোক আপনি জুড়িয়ে আসায় তিনি আঘাত-সংঘাতের মধ্যে ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এটাও সমভাবে সত্য যে, শোকের দিনে সান্ত্বনা পেতে তিনি আর কোথাও যান নি, অন্য কোনও কাজে নিজেকে ঢাকেন নি, গিয়েছিলেন পদ্মাতীরের বিবিক্তির মাঝখানে।

গীতাঞ্জলির মধ্যে কবিমনের আর এক জাতীয় প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি। ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাসে গীতাঞ্জলির গানের প্রথম ধারা নামল। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে। নতুন অনুভূতির মধ্যে একান্তরূপে মগ্ন হয়ে তাকে অন্তরে ফলবান ক'রে তোলবার অবকাশ প্রয়োজন হয়েছিল নিশ্চয়ই। তার প্রমাণ দেখি তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপে। শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

"এমন সময় কাজের ছল করিয়া পদ্মাধারে নির্জনতার মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য কবি শিলাইদহে চলিলেন। শ্রাবণ মাসটা সেখানেই বোটে কাটিল'।"

(রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০)

ভাদ্র মাসের গোড়ায় কলকাতায় ফিরলেন, সেখান থেকে শান্তিনিকেতন ঘুরে এসে আবার কলকাতা। বাইরের জগতে নানা রকম কর্তব্য অব্যাহতভাবে চলছে, কিন্তু অন্তরে তাঁর গানের ধারাও অব্যাহত। সেখানে এক পূর্ণতার মধ্যে ডুবে থাকায় কর্মকোলাহলের স্পর্শাতীত হয়ে বাস করতে পারছেন। এইভাবে প্রায় মাস দুই কাটিয়ে আবার তিনি শিলাইদহে চললেন। সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ। নানারকম বিষয়-কর্মের মাঝখানে সময় ক'রে নিয়ে তাঁকে লিখতে হচ্ছে। এইভাবে আশ্বিন মাসের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গীতাঞ্জলির ধারায় কিছুকালের জন্য বিরতি এল।

এর পরের কয়েক মাস অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ইতিহাস। অগ্রহায়ণের শেষ ও পৌষের সুরুতে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একগুচ্ছ গান আছে। তাতে মনে হয় বাইরের কর্মপ্রবাহে অন্তরের ভাবপ্রবাহটি মাঝে মাঝে চাপা পড়লেও অন্তঃশীলে তা শুষ্ক নয়। এর পর মাঘ থেকে ১৩১৭-র জৈষ্ঠ্যের সুরু পর্যন্ত গানের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ, মাত্র দশটি। জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি দার্জিলিংএর কাছে তিনধরিয়ায় উপস্থিত হ'লেন। গানের ধারায় গতিবেগ সঞ্চারিত হ'ল। সেখানকার কুড়ি দিন বসবাসের মধ্যে বারোটি গান লিখে সমভূমিতে যখন নামলেন তখন তাঁর চিত্ত গীতধারায় পরিপূর্ণ। তখন আবার তাঁর প্রয়োজন হ'ল পদ্মাতীরে যাবার। বৈষয়িক প্রয়োজন, মানসিকও। শিলাইদহে গিয়ে রথীন্দ্রনাথকে তিনি তখন জমিদারী চেনাচ্ছেন, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এত ঘোরাঘুরির মধ্যেও মন নির্লিপ্ত। কমপক্ষে দৈনিক একটি করে গান লিখছেন। আষাঢ়ের শেষে কলকাতায় ফিরলেন। গানের ধারা বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে ভাবনার একটি পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে শ্রাবণ-সমাপ্তির সঙ্গে সাময়িকভাবে সমাপ্ত হ'ল।

এর থেকে গীতাঞ্জলির কবিমানসে পদ্মার প্রভাব সম্বন্ধে অবশ্যই কোনও স্পষ্ট প্রমাণ হয় না; প্রামাণ্য বিষয়ও এটি নয়। কেবল দেখি আবেগধারায় মাঝে মাঝে যখন জোয়ার এসেছে, চিত্ততটভূমিকে জলরাশি-

ধারণের উপযুক্ত করে গঠন করবার জন্য তিনি পদ্মার আতিথ্য নিয়েছেন।

গীতাঞ্জলির শেষ এবং গীতিমাল্যের সূচনাকালের মধ্যে দেড় বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মাঝখানে তিনি তিনটি নাটক লেখেন। ১৩১৭ সালের আশ্বিনের শেষে তিনি শিলাইদহে গেলেন। গীতাঞ্জলি সমাপ্তির পর এ পর্যন্ত একটিও গান লেখা হয় নি। এখন কুঠিবাড়ীতে রথীন্দ্রনাথের সংসারে তাঁর পুরণো দিন ফিরে এল; তার সঙ্গে ফিরল ক্ষণলুপ্ত গীতধারা। হেমন্তের পদ্মাতীরে বসন্তের ভাবাবহে পরিপূর্ণ করে তিনি পঁচিশটি গান সমেত 'রাজা' নাটক রচনা করলেন। প্রত্যক্ষত: 'রাজা'র সঙ্গে তাঁর তৎকালীন বাসস্থানের যোগ কিছু নেই। সংশয় ও সন্ধানের পর অস্তি-প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনারই উপজীব্য বিষয়, এমন কি বহু সমালোচনারও। কিন্তু তারই সঙ্গে আর একটি যে ধারণা নাট্যদেহে ওতপ্রোত রয়েছে সেটি স্মরণীয়। পরম যিনি, বা যিনি রাজা, তাঁকে সংসারের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ কুশ্রীতার মধ্যেই চকিতে অনুভব করা যায়, মানুষের কাছে তিনি স্পষ্ট প্রকাশিত নন; জোর করে আলাদা করে বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরতে ছুঁতে চাইলে অন্তর্জীবনে মহাবিপ্লব এসে উপস্থিত হয়। অনেক দুঃখের পর অন্তর-নিবাসী রাণী সুদর্শনার ভুল অবশ্য কখনও কখনও ভাঙে বটে, তখন আলো-অন্ধকার, বুদ্ধি-অবুদ্ধির ভেদরেখা মুছে রাজা সম্বন্ধে তার সত্যকার প্রতীতি জন্মেছে। 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ, জ্ঞানোজ্জ্বলিত, বিশুদ্ধ হৃদয়'কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে বর্ণনা করেছিলেন, সেই বিশুদ্ধির অপর নাম যে সত্যনিষ্ঠ সরলতা তা রাজা নাটকের ভাবাবহের মধ্যে সমীম্বিত হচ্ছে। এই নির্দ্বন্দ্ব প্রশান্তি কবি অন্যত্রও পেয়েছেন, তবে এটা পদ্মাতীরসম্ভূত সমস্ত রচনার অব্যতিক্রমী সাধারণ লক্ষণও বটে। আর গীতগুলি গান! বেশ কয়েক মাস নীরবতার পর পদ্মাসহবাস এবং গীতোৎসার একই সময়ে ঘটল।

১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে আবার এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি। ওভারটুন হলে 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর কবির বিলাত যাত্রার ঠিক ছিল। ৩রা চৈত্র বক্তৃতা দিলেন। তারপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সমুদ্রযাত্রা করা হ'ল না। দেহ-মনের ভগ্নোদ্যম অবস্থায় বিশ্রাম নিতে তিনি পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করলেন, এবং শান্তি পেলেন। তার প্রমাণ ১৫ই থেকে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে লেখা আঠারটি কবিতা। এইভাবে গীতিমাল্যের সূচনা হ'ল। এর আগে বেশ কিছুকাল তিনি গান লেখেন নি,—হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, মনের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন তীব্রপিপাসু অবস্থায় 'ডাকঘর' রচনা করেছেন, সহজ সঙ্গীতের উৎসারে তিনি এবার অন্য এক-রকম মুক্তিলাভ করলেন—

"স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।"

সেখানে অভাবিতের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বোঝা গেল জীবনের বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে বলে তাঁর যে মোহ জন্মেছিল তা ভুল।

গীতিমাল্যের এই প্রাথমিক কবিতাগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ আছে। কবির ভাব-রূপ-কারুকার্য যে মৌলিক চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে তা হ'ল একটি পথ। সে পথ জীবন। কখনও তা অচিনদেশগামী একটি নির্জন রেখা, যার ওপর রৌদ্র-ছায়া বর্ষা বসন্ত খেলা করে যায়, মাঝে মাঝে দূর দেশ থেকে সুগন্ধ ভেসে আসে, নামহারা নদীর পারে, বনের ধারে, স্নিগ্ধশ্যামল ঘন ছায়াতলে কখনও কখনও পরাণবঁধুর ক্ষণিক আভাস মেলে, কখনও সেই পথ লৌকিক জগৎ পরিত্যাগ করে গ্রহ-তারায় বেঁকে বেঁকে লোকলোকান্তরের অরণ্য পর্বত ভেদ করে চলে যায় (৫, ৭, ৯, ১৪, ২১ নং কবিতা)। মাঝে মাঝে সেই পথ রাজপথে পরিণত হয়; তখন তার ওপরে জনস্রোত চলে, বেচাকেনার হাঁক ওঠে, চেনা লোকের শোভাযাত্রায় 'অচেনা সেই উঁকি মারে' (৮, ১২নং কবিতা)। আবার কখনও বা রাজপথ পরিণত হয় একটি নদীরূপী জলপথ রেখায়। সেখানকার নেয়ের প্রতি কবির অসীম নির্ভর, যাত্রার আবেগে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। পথের শেষ সম্বন্ধে তিনি নিরাগ্রহ, এবং পথ ভুলবার সম্ভাবনাতেও তাঁর উদ্বেগ নেই (৬, ১১, ১৬ নং কবিতা), কারণ—

"শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো;
সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁঝে গো।"

সে-সব রচনা অনুল্লিখিত রইল খুঁজলে সেখানেও

এই একই প্রশান্তি ও প্রতীতির ছাপ দেখা যাবে। কাজেই আর উদাহরণবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উদাহরণগুলির শ্রেণীনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হ'লে কবিমনের আর একটি অনালোকিত অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

১৩০৮ থেকে ১৩২৮-এর ভিতর পদ্মাতীরে লেখা রচনার মধ্যে বিতর্কমূলক প্রবন্ধের সংখ্যা সবচেয়ে কম। ১৩০৯ সালের গোড়ার দিকে বঙ্গদর্শনের জন্য কিছু লেখা আছে, তার পর আর নেই। অনুভূতি-মূলক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ সংখ্যায় তিনটি। কিন্তু তিনটি হ'লেও নববর্ষা, দুঃখ ও নববর্ষ তিনটিই রবীন্দ্রমানসের এক একটি বড় দিগ্‌দর্শন। উপন্যাসের মধ্যে মাত্র গোরা অংশতঃ এইখানে বসে লেখা। কিন্তু নাটক লেখা হয়েছে তিনটি—রাজা, অচলায়তন ও পথ বা মুক্তধারা। যদিও মুক্তধারা ঠিক পদ্মাতীরে লেখা হয় নি, কিন্তু পদ্মাবক্ষ-সমাহৃত ভাবধারায় মনকে পরিপূর্ণ করে শান্তিনিকেতনে ফিরেই লেখা। তিনটি নাটকই সংগীতপ্রাচুর্যধন্য। বিবিধ সময়ে কবিতার সংখ্যা বাইশ, ও নাটকের গানগুলি সমেত গানের সংখ্যা শতাধিক। অধিকাংশ সময়েই গান ও কবিতাগুলি একটা তীব্র রসাবেশমুহূর্তে লেখা, কারণ অচ্ছেদে প্রতিদিন একটি ত আছেই, কখনও কখনও একদিনে তিন-চারটি রচনাও দুর্লভ নয়। গানের এই আনুপাতিক প্রাধান্য আমাদের কৌতুহল উদ্রিক্ত করছে।

রবীন্দ্রঅনুভূতি কালানুক্রমিক বিকাশের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাববীচিবিক্ষেপ ছিল তার ইতিহাস তেমন স্পষ্ট নয়, বোধকরি স্পষ্ট হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ বিষয়টির পিছনে পাঠকের অনুভূতিসাক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন রকম সাক্ষ্য নেই। বিবর্তনের অভিমুখে রবীন্দ্রচেতনা এক এক ধরনের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং সে জিজ্ঞাসার এক এক রকম উত্তর অনুভব করে পরবর্তী জিজ্ঞাসার দিকে ধাবিত হয়েছে। এইভাবে তাঁর মন একটি করে জাল রচনা করেছে, আবার তা ছেদন করেছে। খেয়া, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, প্রান্তিক, তারই এক একটি সোপান। দেখা গেছে সন্ধান শেষে প্রাপ্তির মুহূর্তে তাঁর অন্তরাত্মার সুখ প্রকাশ পেয়েছে গানে, এবং বিশ্রাম ঈষৎ লঘু রচনায়। খেয়ার পর গীতাঞ্জলি, বলাকার পর পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ, পুনশ্চ শেষসপ্তকের ভাবে ছন্দে মাটির কাছাকাছি আসবার প্রয়াসের পর বীথিকার চিরাভ্যস্ত ছন্দবিশ্রাম। প্রান্তিকের অবচেতন অভিজ্ঞতার পর সেঁজুতির তত্ত্বনির্মুক্ত সহজ কবিতার স্তর পার হয়ে সানাই গ্রন্থে একটি পর্যায়সমাপ্তি, যার অর্ধেক কবিতাই গান, এ সব অতিস্পষ্ট উদাহরণের অভ্যন্তরে অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গেরও অভাব নেই। তার থেকে দু'টি নিদর্শন দেওয়া গেল।

'খেয়া'র দ্বিতীয় কবিতা 'ঘাটের পথে'র ভাবাবহ বিষণ্ণ। অন্যেরা যে পথে নতুন আশায় জল আনতে চলেছে সেই বহুব্যবহৃত পথ ছেড়ে এসে কবি ঘরের মধ্যে বসেছেন, কারণ, 'আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।' জীবন সম্ভাবনাশূন্য। তার পরের কবিতাটির নাম 'ঘাটে'। কবি নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং সান্ত্বনার ভাষায় লাগল বাউলের সুর—

"আমার নেই যদি বা জমল পাড়ি
ঘাট আছে তো বসতে পারি
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখব তোদের তরী বাওয়া।"

বলাকার ১৯ নং কবিতায় জগতে সবকিছু ছেড়ে যাওয়াই যে ঐকান্তিক সত্য একথা কবি অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করছেন। তার আগে ৬, ৭, ৮, ৯, ১৪, ১৬, ও ১৮ নং কবিতায় তিনি গতির তত্ত্ব কবি-অনুভূতির সাহায্যে রসান্বিত করেছেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে মানুষের চাওয়া ও হারানো—এই দুই সত্যের মাঝখানে জীবনের কোন একটা অর্থ অবশ্যই আছে, নয়ত জগৎ প্রবঞ্চনামাত্রে পর্যবসিত হ'ত। অন্তরে এ সমস্যার সমাধান তিনি কিভাবে করলেন তার উত্তর পাই সেইদিনেই লেখা ২০ নং কবিতায়। অসামঞ্জস্যের ওপর সামঞ্জস্যবোধের আনন্দে তাঁর বক্তব্য সুরে বেজে উঠল—

"আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।"

কারণ—"বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে।"

এ-জাতীয় উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে অসংখ্য। এর দ্বারা কবিমনের একটি সুগভীর আনন্দসূত্রের মূল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর কবিকে যে তৃপ্তি দিয়েছে অংশতঃ পদ্মাও তাঁকে সেই তৃপ্তি দিয়েছে, কিছুকালের জন্য মনোহীন বিশাল প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে তিনি সুখী হয়েছেন।

ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে কুসুম দেখছিল। ছুটো গাড়িতে অন্তত জনা দশেক হবে। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে। মেয়েই বেশী। কুসুম গুণল, ছজনকে। বাকীরা পুরুষ,—এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণি এগিয়ে এল। বাংলোর মালী,—কাঁধে গামছা ফেলে সেই অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যায়। এক হিসাবে এ বাংলোবাড়ীর চিন্তামণিই সব। কেয়ার-টেকার বলতে সেই, অভ্যর্থনাকারী বলতেও চিন্তামণি। একক এবং অদ্বিতীয়—

সমস্ত দলটিকে কুসুম দেখছিল। শুধু দেখছিল না। কান পেতে শুনছিল। কলকল করে কথা বলছিল ওরা। কুসুম উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

বয়স বেশী নয় কারও। কি মেয়ে, কি পুরুষ। বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। কুসুম তাই আন্দাজ করল। ছেলেদের পরণে প্যাণ্ট, কোট, গলায় দেখনসই টাই। মেয়েদের অঙ্গে রংবাহার শাড়ী। গায়ে জড়ানো কালো রঙের শাল। তাতে ফুলকাটা,—নানা লতা-পাতা আঁকা।

মেয়েরা প্রায় সব ফর্সা। ময়লা কাকেও বলা যায় না। গৌরবর্ণ না হ'লেও রং উজ্জ্বল। আর মুখচোখের গড়ন সুশ্রী। চোখ ভাসা-ভাসা,—আকর্ণ টানা। নাক পরিষ্কার,—আর হাসলে কি সুন্দর দেখায় ওদের শাদা শাদা দন্তপংক্তি। আয়নায় দেখা নিজের পান-খাওয়া ছোপধরা দাঁতগুলির ছবি কুসুমের মনে ভেসে এল।

মেয়েদের মধ্যে একজনের নাম বুঝি অতসী। তার সিঁথিতে সিঁদুরের মত লাল রং সরু একটুকু স্থানে চোখে পড়ে। দলের মধ্যে কয়েকজনেরই বোধহয় বিয়ে হয়েছে। ভালো করে সিঁথি দেখে মনে হয় তাই। অন্য মেয়েরা আইবুড়ো। তবে কারোরই মধ্যে এয়োস্ত্রীর সব কিছু চিহ্ন খুঁজে পেলে না কুসুম। হাতে শাঁখার বালাই নেই। নোয়া-টোয়া আছে কি না কে জানে।

বাঁ-গালে সুন্দর একটি তিল। মাথার চুলগুলি ঈষৎ কোঁকড়া। সেই মেয়েটি বলল—'এই অতসী, আচ্ছা জায়গায় কিন্তু জামাইবাবু এনেছে ভাই। একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। কলকাতা থেকে কতদূর হবে বল দিকি?'

অতসীর মাথায় ঘোমটা নেই। কপালের কাছের চুলগুলি শীতের স্বল্প বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে। সে ঠোঁট উল্টিয়ে কেমন একটা ভঙ্গি করে বলল—'তোর জামাইবাবুকেই জিজ্ঞেস কর না।'

জামাইবাবু লোকটি অন্য গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে আর ছু'টি মেয়ের সঙ্গে কি সব কথা বলছিল। কোঁকড়া চুলের মেয়েটি সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে অতসীকে ইঙ্গিত করল,—'জামাইবাবুকে লীনা আর মীনা ছাড়ছে না। কাল সন্ধ্যে থেকে কেমন ছিনে জোঁকের মত সঙ্গে লেগে আছে দেখেছিস।' পরে চোখের কোণে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল, 'একটু সাবধানে থাকিস। দিল্লীর মেয়ে সব—শেষে তোর না—'

অতসী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল—'নে নে, ঐ নিয়ে আর মাথার ব্যামো করতে পারি না। তুই বরং একটু দেখেশুনে চল অমিতা। সমরবাবু যেমন সুতপার সঙ্গে ভাব জমাচ্ছেন।'

অতসী খুক খুক করে হাসল।

সাকুল্যে দশজন ওরা। ছু'টি দল মিলে-মিশে এসেছে। প্রথম দলটিতে অতসী, ওর স্বামী। স্বামীর বন্ধু সমরবাবু। সমরবাবুর স্ত্রী অমিতা, দূর সম্পর্কে অতসীর বোন। অন্য মেয়েটি অতসীর এক বান্ধবী সুতপা—অন্য দলটিতেও পাঁচজন। সমরবাবুর বন্ধু বিমান বোস, তার স্ত্রী প্রীতিধারা। প্রীতিধারার বাপের বাড়ী দিল্লী। দিল্লী থেকে ভাই সুশান্ত আর দুই বোন মীনা আর লীনা বেড়াতে এসেছে।

পৌষের শেষ। মাঠে ধান কাটা পুরোদমে চলেছে। বুক-সমান উঁচু উঁচু ধানগাছগুলি ফলভারে প্রায় শুয়ে পড়েছে। মাঠের আলপথ বেয়ে আঁটিবাধা খড়ের বোঝা মাথায় কিষাণ চলেছে। দূরে কোথায় বসে কোন এক রাখাল ছেলে মেঠো গ্রাম্যসুরে কি একটা গান ধরেছে।

সমস্ত পথটিতে দারুণ উত্তেজনা বোধ করেছে সবাই। বিশেষ করে লীনা আর মীনা। দু'জনেই ড্রাইভিং শিখেছে। বিমান বোসের গাড়িটা একরকম ওরাই চালিয়ে এনেছে। ড্রাইভিং অতসীও জানে। কিন্তু ওর স্বামী চালাতে দেয় নি। নিজেই সমস্ত পথটা ড্রাইভ করেছে। অতসীর দিকে চেয়ে হেসে বলেছে—'শুধু নিজের প্রাণটা হ'লে হেলায় ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এতগুলো প্রাণ, বিশেষ করে অমিতার জন্য। ধর, ওর যদি কিছু হয় আর সমরবাবু একা বেঁচে যান তা হ'লে বেচারীর বাকী জীবনটা বিহনে কেমন করে কাটাবে বল ত?'

অমিতা পিছনের সীটে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। চোখ না খুলেই সে বলল,—'আহা বিহনে থাকবেন কেন উনি? আবার পূরণ করে নেবেন। মাগ্‌গী গণ্ডার জিনিস ত আর নয়, সহজ সুলভ।'

সমরবাবুর হেসে বললেন 'অমিতার জন্য খুব দরদ কিন্তু তোমার হে।'

অতসী মুখ তুলে বলল, 'হবে না? একে সুন্দরী শ্যালিকা। তায় পরস্ত্রী, একটু সাবধানে থাকবেন সমরবাবু। কিছু যেন না খোয়া যায়।'

রান্নাঘরটায় আর কোন জানালা নেই। শুধু ওই ঘুলঘুলিটা। সকালে ডাল বসিয়েছে কুসুম। কিন্তু ডালের কি বাহার! সেদ্ধ হবার নাম-গন্ধ নেই। একবার খুন্তি দিয়ে অল্প একটুকু তুলে আঙুলের সাহায্যে পরীক্ষা করল কুসুম। না, উপায় নেই। আরও একটুকু সেদ্ধ হবে। ঘটি তুলে খানিকটা জল ঢেলে দিল কড়ায়। তারপর ঘুলঘুলির ফাঁকে আবার চোখ দুটো পাতল কুসুম।

গাড়ির পেটটা বুঝি পেছনে। ঢাকাটা খোলাতে এখন সব কিছু বের করা যায়। চিন্তামণি আর একটা লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মালপত্র নামাচ্ছে। কম জিনিষপত্র ত নয়। হাঁড়ি-কুড়ি, তৈজসপত্র, সব কিছু। রান্না-বান্নায় যা-কিছু লাগে। মস্ত একটা গামলায় তরিতরকারি। দু'-তিনটে বোতলে যেন কি রকম ছাপ মারা। খান তিন-চার ছোট-বড় স্যুটকেস। আর গোটা চার মুরগী।

জিনিষ-পত্র সব ডাকবাংলোয় ঢুকল। দু'খানা ঘর। খাট বিছানা পাতা। বসবার জন্য চেয়ার রয়েছে। বেতের চেয়ার, বেশ ফ্যাশানদুরস্ত। ঘরের সামনে চওড়া বারান্দা। নীচে ফুলের বাগান। এই শীতে নানা-জাতের মরশুমী ফুল ফুটেছে সেখানে।

তিন-চারটে মেয়ে আর পুরুষে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসল। ওদের মধ্যে মীনা আর লীনাকে কুসুম দেখল। কি বাহারের সাজ-পোষাক মেয়ে দু'টোর। বাইশ-চব্বিশ বয়স হবে। এখনও বে'থা হয় নি। সাজে-পোষাকে ঠমকে গমকে মেয়ে দুটোকে রংবাহার দুই প্রজাপতি বলে মনে হচ্ছে কুসুমের।

পৌষের বেলা দ্রুতগামী। এখনও রোদ উত্তাপহীন ম্লান ছায়া-ছায়া স্পর্শ। সকালেই শির শিরে বাতাসের কাঁপন ছুঁয়ে যায় দেহে। মনকে নাড়া দেয়। ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে শান্ত নীল আকাশকে দেখল কুসুম। একটা বড় গোছের ইলেক্‌ট্রিক বাতির মত সূর্যটা জলছে। বেলা ন'টা হবে। নিমগাছের গায়ে ছায়া দেখে কুসুম অনুমান করল।

হন্তদন্ত হয়ে চিন্তামণি এল। —'কুসুম বৌ, অ কুসুম বৌ।'

মাথায় কাপড় টেনে কুসুম এসে দাঁড়াল বাইরে। —'হ'ল কি? এত খোঁজ কেন?'

চিন্তামণি বলল, 'এক ঘর লোক এসেছে বাংলোতে। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে অনেক। দশ জনা, কি সব সাজ-গোজের বাহার দেখবি চল।'

—'সাজ-গোজ? তুমি বুঝি তাই দেখছিলে।'

—'হুই? দেখব কেনে? দেখিয়েই ত বেড়াচ্ছে সকলকে।' চিন্তামণি গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'রাত্তিরে থাকবেক! গান-বাজনা নিয়ে এসেছে সঙ্গে। আর খাবার কত সব। মুরগীই চার-পাঁচটা—'

—'মেয়েগুলোর ঢং দেখে বাঁচি নে। বিয়ে হ'লে কবে সব ছেলেপুলের মা হ'ত। তা নয়, সাজ-গোজ দেখ। যেন পটের বিবি।' কুসুম মুখভঙ্গি করল।

চিন্তামণি বলল, 'ওরা বড়লোক। বুঝলি নে—সুখের ঘরে রূপের বাসা। তাই বলে তুইও কম সোন্দর ন'স।'

বৌয়ের গাল দুটো টিপে আদর করল চিন্তামণি। কুসুম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল,—'রঙ্গ রাখ, ছাড় দিকি।'

দু'বছর বিয়ে হয়েছে কুসুমের। মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানায় দু'জনেরই গ্রাম। দীঘার কাছাকাছি। পাশের গাঁয়ের মেয়ে কুসুমকে ছোটবেলা থেকেই দেখেছে চিন্তামণি। প্রথম যখন কুসুম পাঠশালায় যেত,—তারপর হাইস্কুলের ফাইভ-সিক্স অবধি। চিন্তামণির তখন চাকরি হয় নি। তেরী কেটে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। হাতে থাকত বাঁশের বাঁশী। পুকুরের ধারে

গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্নের শান্ত দিনে চিন্তামণি বাঁশী বাজাত। কুসুম বিয়ের পর বলেছে যে একদিন চিন্তামণিকে বাঁশী হাতে তাদের গাঁয়ের পথে সে দেখেছিল।

—'কি মনে হয়েছিল তোর?' চিন্তামণি হেসে জানতে চাইল।

—'কি আবার মনে হবে?'

—'মনে হয় নি, এই লোকটা আমার বর হ'লে কিন্তু বেশ হ'ত।'

টেঁড়সের মত লম্বা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে চিন্তামণির মুখখানা চেপে ধরল কুসুম। চোখে ছদ্ম হাসি এনে বলল, 'ছাই বুঝেছ। মনে হ'ল কি বিশ্রী লোকটা, কাজকর্ম ছেড়ে বাঁশী নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

বাংলোর বারান্দায় কলের গান বাজছে। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কুসুম দেখল। গান নয় কোন, কি রকম একটা উত্তাল বাজনা। সেই মেয়ে দুটো, মীনা আর লীনা পা দুটো ঠিক রেখে উর্ধাংশ দোলাচ্ছে। অন্য পুরুষরা, অতসীর বর, সমরবাবু, বিমান বোস হাতে তাল দিচ্ছেন।

বিমান বোস বলল, 'খাসা টুইষ্ট শিখেছ কিন্তু শ্যালিকারা। তোমার দিদিকে একটু নাচাও দিকি—

প্রীতিধারা মোটাসোটা। দেহের বাঁধুনি ঢিলেঢালা। সভয়ে সে বলল, ঐ নাচ আমি নাচব? তা হ'লে তোমাকেও নাকে দড়ি দিয়ে নাচতে হবে।'

সমস্ত দলটি হো হো করে হেসে উঠল।

অতসী হেসে বলল, বিমানবাবু এটা কিন্তু ঠিক বলা হ'ল না। মীনা আর লীনার ফ্রি মুভমেণ্ট ত হবেই। ওরা ত স্বাধীন। কিন্তু আপনার স্ত্রীর পায়ে যে শেকল বাঁধা।'

—'শেকল বাঁধা? ওর পায়ে? আপনি ঠিক বলছেন?' বিমান হেসে প্রশ্ন করল।

মীনা নাচ থামিয়ে ছুটে এল। বিমান বোসের গায়ের ওপর প্রায় ঢলে পড়ে হেসে বলল, 'দিদির পায়ে শেকল হবে কেন? শেকল ত এইখানে।' অতসীকে দেখিয়ে সে বলল, 'দেখছেন না, জামাইবাবুর গলায় শেকলের দাগ।'

আবার উতরোল হাসি।

ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে অন্য দিকে চোখ রাখল কুসুম। ডাকবাংলোর একটি বনঝোপের কাছে সুশান্ত আর সুতপা দাঁড়িয়ে।

সুশান্ত বলছে—'এদিকে চলে এসে ভালই করেছি, কি বলুন। অত হৈ চৈ আপনার ভালো লাগে?'

—'মাঝে মাঝে লাগে। মাঝে মাঝে লাগে না।' সুতপা ঠোঁট টিপে হাসল।

—'চলুন না, রাস্তা ধরে দু'জনা বেড়িয়ে আসি—

—'কোথায়?' একটু সুর টেনে কথা ছাড়ল সুতপা।

—'খানিকটা হাঁটলেই নাকি দামোদর। এখন মজে-হেজে গেছে! তবু নদী ত, যাবেন?'

—'আপনার সঙ্গে?'

চোখ নামিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল সুশান্ত।

—'চলুন তাই।'

'হাত বাড়িয়ে সুতপার বাঁ-হাতের আঙুলগুলি মুঠোতে নিল সুশান্ত।

সুতপার মনে হ'ল যেন একটু চাপ পড়ল হাতে।

বলল, 'ওদের বলে আসবেন না?'

—'কেন?'

—'যদি খোঁজ করে?'

—'করুক না'।

—'খুঁজে না পেলে কি ভাববে।'

—'কি ভাববে? আমরা দু'জনে পালিয়েছি।'

খিলখিল করে সুতপা হাসল।

বলল, 'বেশ, কিন্তু। আপনি ত অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে রাখেন।'

একদিকে রান্না হচ্ছে। মাছ কোটা শেষ। ভাজা হচ্ছে সেগুলি। মাংসে হলুদ মাখাচ্ছে চিন্তামণি। ঠাকুরটা একটা থালায় ভাজা মাছগুলো সাজাচ্ছে।

একছুটে মীনা এসে হাজির।

—'খানকুড়ি মাছ দাও দিকি।' সে আদেশ করল।

চিন্তামণি এগিয়ে দিল মাছগুলো। ভাজা মাছের থালা হাতে ছুটল মীনা।

সিল্কের শাড়ী প্রায়ই দেহ থেকে সরে যাচ্ছে। মেয়ের সেদিকে হুঁশ নেই।

বারান্দায় মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বিমান বোস আর অমিতার মধ্যে ছদ্ম বচসার সুরু হয়েছে। একটা পেটির মাছ মুঠোয় তুলেছে অমিতা। বিমানবাবুর সেটি চাই। ওর কর্শা আঙুলগুলি নিজের মোটা মোটা কালো আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন বিমান বোস।

—'হাত ছাড়ুন। ও মাছ আপনি পাবেন না।'

—'কেন নয়? আমি দেখেছি যে।'

—'দেখেছেন বললেই হ'ল?'

লীনার সঙ্গে অমিতার স্বামী সমর খুব ভাব জমিয়েছে। টুইষ্ট নাচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সমর। সন্ধ্যা বেলায় কি করে একটা ছোটখাটো ফাংশন করা যায়, সেই আলোচনাই চলছে।

লীনা বলল—'টুইষ্টের চেয়ে হুলাহুপ আরও ভাল। রিং থাকলে আপনাকে নেচে দেখাতাম। কলকাতায় ফিরে চলুন,—মার্কেট (নিউ মার্কেট!) থেকে একটা সুন্দর রিং কিনে নেব। একটা পুরো সন্ধ্যে আপনার জন্যে খরচ করতে রাজী।' কটাক্ষ করে বলল—'কি খুশী ত?'

অতসী খুঁজছিল সুতপাকে। স্বামীকে ডেকে লাভ নেই কোন। মীনার সঙ্গে মাছভাজা খেতে খেতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প শুনছেন ভদ্রলোক। বিশ্ববিদ্যালয় মানে পড়াশোনা নয়। ওখানের প্রেম-কাহিনী। কালচারের নামে যথেচ্ছ মেলামেশার রসালো কাহিনী।

আষাঢ়ের ফজলী আমের পাশে বড় নীল মাছির মত লুব্ধ মনে হ'ল ওর স্বামীকে। আর কি বেহায়া মেয়েটা। অতসী ভাবছিল। কেমন গা ঘেঁষে বসেছে। যেন জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

ডাকবাংলোটা বসতি থেকে দূরে। নদীর কাছাকাছি। এখন আর জল নেই। নদীতে শুধু রাশি রাশি বালি। চড়ার ওপর বহু পুরাতন একখানা নৌকো রয়েছে। বর্ষার জলে নদী ফুলে-ফেঁপে উঠলে সচল হয় সেটা। না হ'লে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমনি।

নৌকোর ওপর বসল দু'জনে। সুশান্ত আর সুতপা। এদিকটায় বড় একটা কেউ আসে না। চেয়ে চেয়ে দেখলে মাঝে মাঝে পথের ওপর হাটুরে কিংবা চাষা-ভুষো লোক চোখে পড়ে।

সুতপা বলল, 'ক'দিন থাকছেন কলকাতায়?'

—'তার মানে?'

—'বারে! দিল্লী ফিরবেন না?'

—'সে মাসখানেক পরে। আসুন না দু'জনে মিলে এই মাসখানেকের একটা প্রোগ্রাম ক'রে ফেলি।'

—'প্রোগ্রাম?' সুতপা মিষ্টি ক'রে হাসল।

—'বা! আপনি আমায় কলকাতা দেখাবেন না?'

সুতপা উত্তর দিল না।

মুখে মুখে প্রোগ্রামের একটা ছক বলে গেল সুশান্ত। হাবভাবে বোঝা গেল সেটা মেনে নিতে সুতপার আপত্তি নেই কোন।···

হন্তদন্ত হয়ে চিন্তামণি এল।

—'কুসুম বৌ, অ কুসুম বৌ!'

রান্নাঘর থেকে কুসুম সাড়া দিল—'কি বলছ?'

—'তুই কি আজ সারাদিন ঘুলঘুলিতেই থাকবি?'

'চিন্তামণির কাছে এসে মাথায় কাপড় দিল কুসুম।

—'তোমার বাবুদের রঙ্গ-রসিকতা দেখছি। কি বেহায়া সব মেয়েগুলো গো।'

চিন্তামণি বলল,—'ওরা অমনিই। সব ফূর্তি করতে এসেছে দেখছিস না। রাতে আরও কত দেখবি। রাঁধুনীটা বলছিল যে ঐ মেয়েটা ফিলিমে নামবে।'

—'ফিলিমে? সে কি?'

—'সিনেমা। বায়স্কোপ আর কি'—চিন্তামণি স্ত্রীকে বোঝাল।

সূর্য্য মাথার ওপর থেকে সরে গেছে। এবার হেলতে সুরু করবে। রান্নাবান্না সব রেডী। খাবার জন্য ওরাও তৈরী। লম্বা শতরঞ্চি পেতে জায়গা করা হয়েছে। মেয়ে-পুরুষ পাশাপাশি।

সুতপার পাশে সমরবাবু জায়গা ক'রে নিয়েছেন। অমিতাকে দেখিয়ে অতসী তার পিঠে ছোট্ট চিমটি কাটল। কিন্তু অমিতাকে নিজের পাশে রাখতে পারল না অতসী। বিমান বোস একরকম তাকে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল নিজের কাছে। নিজের স্বামীটি মীনা আর লীনার মাঝখানে আসন পেয়েছে। মুখ ভার করে অতসী বিমান বোসের মোটাসোটা বৌ প্রীতিধারাকে কাছে ডাকল।

খেতে খেতে সুশান্ত বলল—'আপনারা ত সব বাংলোর মধ্যেই বসে রইলেন। বাইরে কি সুন্দর যে বেড়াবার জায়গা। বিশেষ ক'রে ঐ নদীর ধারটা—কি সুন্দর যে চোখে লাগল।'

মীনা খেতে বসেছিল সুশান্তর কাছ থেকে খানিকটা দূরে। সে মুখ নামিয়ে বলল, 'মনোমত সঙ্গী পাশে থাকলে অনেক কিছুই ভাল লাগে দাদা।'

অতসী আর অমিতা খুক খুক ক'রে হাসল।

সুশান্ত যেন গায়ে মাখল না কথাটা। বলল, নদীটা মজে-হেজে গেছে। অথচ একসময় এই দামোদরই কি সর্বনাশা ছিল।' সে একটা মাংসের হাড়ে মজ্জাটুকু পাবার জন্য চুক ক'রে শব্দ করল।

* * *

বিকেলে কুসুম যত্ন ক'রে চুল বাঁধল। গা ধুতে পুকুরে যায়। বাংলোর পাশ দিয়েই পথ। ইচ্ছে করেই আধময়লা কাপড়টা ছেড়ে ফর্সা কাপড় একখানা জড়িয়ে নিল। অন্তদিন গায়ে জামা দেয় না। আজ সায়া-

ব্লাউজ দুইই পরল। আদুড় গায়ে বেরুতে মন চাইল না। পুকুরঘাটে যেতে যেতে কুসুম ভাল ক'রে দেখল। মেয়েগুলো বারান্দার ওপর বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ওকে দেখে কি যেন বলাবলি করল দুটো মেয়ে। কুসুম ঠিক শুনতে পেল না।

সন্ধ্যে হ'তেই মস্ত হ্যাসাক বাতি ঝুলিয়ে দিল চিন্তামণি। সমস্ত বারান্দাটা ফুটফুটে আলোয় ভরে গেল। একটা মস্ত আসর পাতা হয়েছে। বড় বড় দুটো শতরঞ্চি বিছানো। এদিকে শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। ওদেরও গায়ে শীতবস্ত্রের অভাব নেই। মাঝখানে পাঁপড়ভাজা, চানাচুর ইত্যাদি। আর গোটা দুই-তিন বোতল। কি একটা তরল পানীয় গ্লাসে ঢেলে ঢেলে সবাই একটু একটু ক'রে খাচ্ছে। অতসীর বর, সমরবাবু, বিমান বোস, সুশান্ত সকলেই। মেয়েদের মধ্যে মীনা আর লীনাই বেশী অগ্রসর। কিছুতেই মুখে তুলবে না প্রীতিধারা। অতসীও তার দলে। কিছুটা সাধাসাধির পর অমিতা ঠোঁটে গ্লাস ছুঁইয়েছে। কিন্তু পানীয়ের স্বাদ যে খুব ভাল লাগছে একথা তার মুখ দেখে মনে হ'ল না। একটা গ্লাসে সামান্য তরল পদার্থটি ঢেলে সুতপাকে বারবার অনুরোধ করছে সুশান্ত 'প্লীজ্ খান না একটু। খুব ফ্রেস লাগবে।'

ইতিমধ্যে মীনা আর লীনা গান সুরু ক'রে দিয়েছে। বাংলা ভাষার গান। বিলিতী সুরে গাওয়া। নাচের ভঙ্গিতে পায়ে তাল ঠুকছে—গানও গাইছে।

চিন্তামণি বাড়ীতে এসে বলল, 'মেয়েগুলো কেমন গিলছে, দেখছিস বৌ।'

কুসুম বলল, 'বোতলের ওটা মদ নাকি?'

—'মদ নয় ত কি আবার? বিলিতী মদ—কি ভুরভুর গন্ধ দেখছিস না।'

মস্ত আসর একসময় ভাঙল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে আলো নিভল ডাকবাংলোর বারান্দায়। শীতের জ্যোৎস্নায় চারপাশ পরিষ্কার—দৃশ্যমান।

স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কুসুম বলল, হ্যাঁগো, 'আমাদের একদিন পিকনিক করবে।'

—'পিকনিক? আমাদের অত লোক কই? মোটে তুই আর আমি।'

—'কেন? পাড়ার দু'পাঁচজনকে নিয়ে।'

—'কোথায় করবি? বাংলোবাড়ীতে, তা হ'লে আর চাকরি থাকবে না আমার।'

কুসুম চুপ ক'রে রইল। খানিক পরে বলল,—'ওরা য করে।'

চিন্তামণি এ কথার জবাব খুঁজে পেল না। বলতে গেলে অনেক কিছু মুখে আসে। কিন্তু সে-সব শুনে বৌয়ের দুঃখ বাড়বে। তা'র চেয়ে কিছু না বলে ওকে একটু আদর করলে অনেক বেশী শান্তি পাবে। চিন্তামণি তাই করল।

* * *

পরদিন সকালে চিন্তামণি বাংলো-বাড়ীর ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। সমস্ত দলটি সকাল হ'তেই রওনা দিয়েছে। এখন ভাঙ্গা মেলা। ঘরের মধ্যে এটা-সেটা পড়ে। কুসুম ঘুরে'ফিরে দেখছিল।

খাটের উপর লম্বা বিছানা পাতা। চাদর থেকে কি সুন্দর একটা গন্ধ উঠে আসছে। বালিশে নাক দিয়ে কুসুম সেটি অনুভব করল। কি ভেবে বিছানায় বসল কুসুম। সমস্ত খাটটা একটু নড়ে উঠল। কুসুম শুয়ে পড়ল বিছানায়।

হাই তুলল, বাহু মেলে আড়মোড়া ভাঙল।

বাধা দিয়ে চিন্তামণি বলল, 'করিস কি, অ কুসুম বৌ—বিছানায় শুলি যে।'

—'বেশ আরাম গো। কি নরম বিছানা। কেমন গন্ধ ছাড়ছে দেখ বালিশ থেকে। সেন্ট দিয়েছিল, না?'

চিন্তামণি নাক দিয়ে পরীক্ষা করল একটু।

কুসুম বলল—'বস না বিছানায়। একদিন না হয় দু'জনে একটু বসলামই এখানে।'

চিন্তামণি বসল। ওর কোলে মুখ গুঁজে কুসুম নির্জীবের মত পড়ে রইল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল চিন্তামণি। অনেকক্ষণ ধরে' অলতোভাবে।

ট্যাক্সির হর্ণের তীক্ষ্ণ চীৎকারে ওদের আলস্য ভাঙল। বাইরে এসে চিন্তামণি দেখল, গাড়ি থেকে একটি মেয়ে আর পুরুষ নামছে। কোট প্যান্ট আর টাই পরিহিত লোকটি মেয়েটিকে বাংলোটা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েটি যেন খুব খুশী, হাসিতে উজ্জ্বল।

চিন্তামণি ছুটে এসে বলল, 'কুসুম, নতুনবাবু এসে গিইছেন। পিছনের দরজা দিয়ে পালা শীগ্‌গির। পালা।'

কাঁধে গামছা ফেলে ওর পরিচিত ভঙ্গিতে চিন্তামণি নতুন আগান্তকদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল।

তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত পালিয়ে কুসুম হাঁপাচ্ছিল। অভ্যাসবশতই ঘুলঘুলিতে চোখ পাতল কুসুম।

এই ডাকবাংলো বাড়ী, হাসি, সুখ, উল্লাস আর আনন্দ সব ঐ মানুষগুলির জন্য। কুসুম ভাঙ্গা ঘরে বন্দিনী। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ওদের দেখবে চিরদিন। দেখবে উল্লাস, আনন্দ, উচ্ছলতা আর উত্তেজনা। কোনদিন ভোগ করতে পারবে না।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় ট্রাম—রাজ্য-সরকার বড়ই অসন্তুষ্ট !!

কিছুকাল পূর্ব্বে এক সংবাদে প্রকাশ পায় যে, বর্ত্তমানে ট্রাম কোম্পানী যে ভাবে ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে সরকার একেবারেই সন্তুষ্ট নহেন। বিধান সভার এক অধিবেশনে পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় একথাও বলেন যে চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালে ট্রাম কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণ হইবার কথা, ঐ সময়ের পূর্ব্বেই উহা রাষ্ট্রীয়করণ করা সম্ভব কি না তাহা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

পরিবহন মন্ত্রী আরও জানান, কলিকাতায় ৪৩টি নূতন ট্রাম চালু ও একটি সাব-ষ্টেশন নির্ম্মাণের জন্য ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি বে-সরকারী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনুমোদন চাহিয়াছেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১৯ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন।

ট্রাম-চলাচলের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ব্যবস্থায় রাজ্য-সরকার যে খুশী নহেন এ-সংবাদে ট্রাম-যাত্রীদের সুখী হইবার কোন কারণ আছে কি না জানি না। এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—

বর্ত্তমানে ট্রাম-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে কে—ট্রাম কোম্পানী, না, ট্রাম-কর্ম্মচারীরা (ড্রাইভার, কন্ডাকটার, স্টার্টার, টাইমকিপার প্রভৃতি)? মন্ত্রী মহাশয়গণ তথা রাজ্য সরকারের অফিসারগণ কেহই বোধ হয় ট্রামে আসা-যাওয়া করেন না। সেই কারণেই ট্রামের ব্যাপারে তাঁহারা কেবলমাত্র অসন্তুষ্টই হইতে পারেন। বিগত কিছুকাল হইতে ট্রামের ড্রাইভার-কন্ডাকটারদের ব্যবহার কি পরিমাণ ভদ্র এবং সঙ্গত হইয়াছে—তাহা মাত্র দিন-চারেক ট্রামে ভ্রমণ করিলেই মন্ত্রী মহাশয়গণ কিছু পরিমাণে হয়ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাদের কথা-বার্ত্তা, ব্যবহারে মনে হয় ট্রামযাত্রী কৃপা-প্রার্থী ভিখারীরও অধম! ট্রাম-ড্রাইভার কন্ডাকটার যেন একান্ত দয়াপরবশ হইয়াই যাত্রী-সাধারণকে বৈতরণী পার করিয়া দিতেছে! গাঁটের পয়সা দিয়া হাজার হাজার নিরুপায় ট্রাম-যাত্রীকে প্রতিনিয়ত ট্রাম-কর্ম্মীদের নিকট হইতে অপমান-অপব্যবহার ক্রয় করিতে হইতেছে। এই অসহ্য এবং অবমাননাকর অবস্থার কোন প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। সব কিছু দেখিয়া যে-কেহ মনে করিতে পারে যে কলিকাতার ট্রাম যেন ট্রাম-কর্ম্মীদের আরামে খাওয়া দাওয়া, সুখে বসবাস এবং যাত্রীদের উপর নির্য্যাতন চালাইবার জন্যই হইয়াছে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এবং ন্যায্য দাবির সকল প্রশ্নই ট্রামের কর্ম্মীদের (অর্থাৎ ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তাদের) কাছে বেকার।

আমাদের মনে হয়—বর্ত্তমানে কলিকাতার ট্রামের মালিক—ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, এবং ইহাদেরই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কলিকাতার ট্রামের সবকিছুই চলিতেছে! কোন কর্ম্মচারী অপরাধ করিলে, তাহার বিচার এবং দণ্ডদান ক্ষমতা ট্রাম কোম্পানীর নাই এবং এ-দিক দিয়া কিছু করিতে গেলেই ইউনিয়নের মালিক বাদশারা হঠাৎ-ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া লক্ষ লক্ষ ট্রামযাত্রীকে পথে বসাইয়া দিতে কোন দ্বিধা, লজ্জা এবং অনুশোচনা বোধ করে না। অকারণে, সামান্য কারণে, এবং বাজে কারণে রাস্তার যাত্রীবোঝাই ট্রামকে অচল করিবার সময় নির্দ্ধারণও শ্রমিক-কর্ত্তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লোকের আপিস, কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রকার কর্ম্মশালায় যাওয়ার এবং ফিরিবার সময়—(অর্থাৎ বেলা ৯। ৯৷ এবং বৈকালে ৪। ৪৷ নাগাদ) করিয়া থাকে! রাগটা হইল—তাহা যে-কোন কারণেই হউক—কোম্পানী কিংবা পুলিসের উপর—কিন্তু তাহার চোটটা পড়িবে অসহায় যাত্রীদের উপর! গত কিছু-কাল হইতে বৈকালের দিকে অর্থাৎ আপিস ফিরতির সময় ট্রামযাত্রীদের কি অসম্ভব কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে—বর্ণনা দিয়া তাহা বুঝানো যায় না। ট্রামের কোন টাইম টেবুল্ নাই, একই রুটে হয়ত

চার পাঁচটা ট্রাম পর পর চলিয়া গেল এবং তাহার পরেই ঘণ্টাখানেক সেই রুটে আর ট্রামের দেখাই নাই! ভীড়ের সময় যাত্রীদের ওঠানামার প্রতি কোন দৃষ্টি ট্রাম-কর্ম্মীদের থাকে না, থাকিলেও তাহা নির্ব্বিকার। ইচ্ছামত ড্রাইভার ট্রাম থামাইবে, খুশীমত কন্‌ডাকটার ট্রাম ছাড়িবার ঘণ্টা বাজাইবে—ফলে যাত্রীদের, বিশেষ করিয়া মহিলা যাত্রীদের (সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান) কমবেশী আহত হইবার ঘটনা ঘটিতেছে প্রচুর! প্রতিবাদ করিতে গেলে কন্‌ডাকটার মহোদয় মারমুখী হইবেন। ডিপোর নিকটে হইলে ত তাঁহার বিক্রম বিক্রমাদিত্যকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে! ডিপোর মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া যাত্রীকে 'ধোলাই' দিবার ঘটনাও বিরল নহে!

রাজ্য সরকার ট্রাম-সমস্যার সমাধান কি করিবেন—বলা যায় না। তবে এখন অবস্থা যে-রকম দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যাত্রী-সাধারণকে অবশ্যই "উপর-হস্ত" (upper hand) লইতে হইবে, ট্রাম-কর্ম্মীদের "সৎপথে" আনিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য, সে-রোগের যে-ঔষধ অমোঘ তাহারই প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। ইহা সম্ভব না হইলে ট্রাম-চড়া একেবারে বন্ধ করিয়া কলিকাতার ট্রামগাড়িগুলিকে কর্ম্মীদের ভোগের জন্য দীর্ঘকালের মত পরিত্যাগ করাই ভাল। ইহা করিতে পারিলে, অল্পকালের মধ্যেই দেখা যাইবে ট্রাম কর্ম্মী এবং ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়নের ফড়ে-মালিকদের জমিদারী কি ভাবে কতকাল চলে। কলিকাতায় একটি ট্রাম-যাত্রী সঙ্ঘ স্থাপন করা কি অসম্ভব?

সিনেমা ও চাষী—কে ইহাদের বাঁচাইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে মেদিনীপুরের এক গ্রাম হইতে একজন পত্র লেখক খেদোক্তি করিয়াছেন:—

গ্রামাঞ্চলে সিনেমা মরশুম

মাঠ থেকে ধান উঠার পর কৃষক চাষীর ট্যাঁকে ও পকেটে পয়সা, মাচায় ধান, এই সময়ে সিনেমাওয়ালারা দু'পয়সা কামাই করার সুযোগ পায়। মাঠের মাঝে মেলা পাটা ঘিরে আবরণ দেয়, তাতে আবার কাদা মাখায়, কেউ যেন বিনে পয়সায় দেখতে না পায়, খড়ের অভাব নেই, খড় বিছিয়ে চালাও আসন তৈয়ার হয়, প্রাইমারী স্কুলের যত ভাঙ্গা বেঞ্চগুলি দিয়ে বেশী দামের আসন তৈয়ার হয়, বৃষ্টি-বাদলার ভয় নেই। বরুণ দেবতা বরাবরই এই সময়ে কৃপণ, শ্রাবণের আগে তাঁর কৃপা সহজে হয় না। সকালে-বিকালে গ্রামের লোকাল বোর্ডের সরু গলি-রাস্তায় রিক্সা ঠেলে-ঠুলে মাইকে সিনেমার গান শুনিয়ে প্রতিদিনের শো ও অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব চিত্র-তারকাদের সুর সংযোজনার গুণ-কীর্ত্তন পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা ফ্যান সৃষ্টি করছে। প্রাইমারী স্কুলের যাওয়ার বয়সী ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ভীড় জমায়; এদের উপরের স্তরের ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যা-সকাল তারকাদের হাসি-কান্না ও প্রেমের অঙ্গ-ভঙ্গ তরুণ তরল ভঙ্গিমায় রিহারসাল দেয়। স্কুল যাওয়া ২রা জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধই ছিল, যদিও স্কুল সবে খুলেছে—তারা কিন্তু সিনেমা জগতেই আছে। এদের উপর যারা, তাদের কাঁধে অড়গলি থাকলেও সিনেমার রসে তারাও মাতোয়ারা। এস. এফ. যারা, তারা আরও সাতদিন হাতে পেল; এইচ্. এস. যারা, তারা অনেকটা হতাশ হ'ল। কি জানি ১৫ তারিখে যদি তাদের চোখে শ্বেত পর্দ্দা না ভেসে উঠে। একজন বি. ডি. ও-কে ধরেছেন সিনেমার পারমিট যাতে অতি সত্বর পান—তার মানে গ্রামের হাট-বাজারের সংখ্যাকেও যেন সিনেমা পিছনে রাখতে পারে। মাঠের ধান সবে মাচায় উঠেছে। মাত্র দুই মাস মাচায় থাকবে কি না সন্দেহ, ধান বেচে সিনেমা দেখে বৈশাখ মাসের প্রথম থেকেই দেড় গুণ হিসাবে ধান বাহির ক'রবে। এ চাষের ধান আর আগামী চাষের ধান একটা সিনেমার মাধ্যমে অন্যটা সুদের মাধ্যমে ঐ সিনেমা-ওয়ালাদের পকেটেই যাবে। এদিকে সরষে তেল কেজি প্রতি চার টাকা, আলুর সের নয় আনা, উচ্ছে দশ আনা. পিঁয়াজ সাত আনা, মুগ-মশুর এক টাকা, আশি পয়সা প্রতি কেজি, বিউলি সাত সিকা প্রতি সের তাও বাজার থেকে উধাও, কই মাছ সাড়ে তিন টাকা প্রতি সের, মাগুর মাছ প্রতি সের পাঁচ টাকা, এই হ'ল কলাবেড়িয়া বাজারের দর। আশেপাশের বাজারেও এই দর। তবু সিনেমায় বেজায় ভীড়। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রাম ঝেঁটিয়ে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে কি যে ছুটে! একে বলে' কালের কুটিল প্রবাহ, কে ঠেকাবে'।

সিনেমার বিরুদ্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে কোন অভিযোগ নাই, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ছবি। কিন্তু এই সিনেমা যখন মানুষের নেশা হইয়া দাঁড়ায়, যাহার ফলে সকল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিনেমা ছবি দেখিবার জন্য বেহিসাবী অর্থ ব্যয় করে, চিন্তার কথা হয় তখনই। সাধ-আহ্লাদ অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু সাধ-আহ্লাদের কারণে মানুষ যখন সর্ব্বনাশের পথে ছোটে, সেই সময় তাহাদের বাঁচাইবে

কে? সিনেমা ছবি, বিশেষ করিয়া কুৎসিত, প্রায়-অশ্লীল হিন্দী ছবি আজ বাঙ্গালার বালক-বালিকা যুবক-যুবতীদের যে ভাবে রসাতলের পথে টানিতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার সময় হইয়াছে। প্রজাবৎসল কল্যাণ-রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এ-দিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই। তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতগঠন চিন্তায় মগ্ন—কিন্তু সমাজ-হিতৈষী যাঁহারা, তাঁহারাও কি নিদ্রিত? ভবিষ্যৎ যদি ক্রমশ অন্ধকারে বিলীন হয়, তবে কাহার জন্য ভবিষ্যত ভারত গঠন!?

বিপদের সঙ্কেত ?

পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান হইতে বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত এবং সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে:

মফস্বল অঞ্চলে চালের দাম যে-ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। চালের দাম সাধারণত বর্ষাকালে বাড়ে; এবারে বর্ষা আসিবার আগেই তাহা হঠাৎ উর্দ্ধগতি হইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির খবর আসিতেছে রাজ্যের নানা অঞ্চল হইতে; তবে বৃদ্ধির হার উত্তরবঙ্গেই বেশী ব্যাপক। অনেক স্থানেই পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার নীচে এক মণ চাল পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের দুর্ভোগ যে কোথায় পৌঁছিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, বর্ষা আসিবার আগেই এবারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল কেন, অবিলম্বে সে-বিষয়ে খোঁজ লইয়া এই সমস্যার একটা বিহিত করা দরকার। গত কয়েক মাসে উত্তরবঙ্গ হইতে প্রচুর ধান ও চাল তিব্বতে ও চীনে পাচার হইয়াছে, এই সংবাদটিই সব চাইতে উদ্বাজনক। ইহার ফলেই যদি চালে টান পড়িয়া থাকে ও দাম বাড়িয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিস্মিত হইতে হয় বরং প্রহরা-ব্যবস্থার ক্রটির কথা ভাবিয়া। দেশকে অভুক্ত রাখিয়া যাহারা শত্রু-শিবিরে চাল পাচার করে, তাহাদের দুষ্টচক্র ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় না কেন? চোরাই-চালানের মূলে যেমন অর্থলোভ তেমনিই রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। প্রহরার ব্যবস্থাটাকে তাই নিখুঁত করিয়া তোলা দরকার। স্থানীয় পুলিশ যদি চক্রান্তের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হইয়া থাকে, তবে কলিকাতা হইতে পুলিশ পাঠাইতে দ্বিধা করা উচিত নয়। দেশের স্বার্থেই এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে কে? সরিষার মধ্যেই যদি ভূত প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? কলিকাতার কতকগুলি কাছাকাছি অঞ্চল হইতে কি ভাবে চালের বে-আইনী কারবার চলিতেছে তাহা কি এ-দেশী অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশের জানা নাই?

সামান্য দু-চার কেজি চালের জন্য দরিদ্র-বিধবাদের পুলিশ কি ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের দণ্ডবিধান কি তৎপরতার সঙ্গে করিতেছে তাহার নমুনা কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলের বাস-যাত্রীরা ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ি, লরি প্রভৃতিতে কি ভাবে পাঁচ-দশ হইতে তিরিশ-চল্লিশ কুইন্টল চাল পাচার হইতেছে—তাহার খবর কি পুলিশের জানা নাই? এই চোরা-কারবারের জন্য অবশ্যই সরকারের বড়কর্ত্তাদের দায়ী করিব না, কিন্তু তাঁহারা যদি আর একটু সতর্ক এবং কঠোর হইতে পারেন, বিশেষ করিয়া কলিকাতার বর্ডার অঞ্চলের থানা এবং পুলিশের উপর—তাহা হইলে হয়ত এ-অনাচার কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

মোট কথা এই যে, অবিলম্বে যদি কর্ত্তৃপক্ষ যথাযোগ্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে আগামী এবং অদূর-বর্ষাকালে চাউলের যে-বিষম অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ-রাজ্যের র‍্যাশন-ব্যবস্থা—(যাহা অদ্যাবধি একরকম ভাল ভাবেই চলিতেছে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়)—বিষম বিঘ্নিত হইতে পারে। চাউলের অপচয়, অপব্যবহার এবং বে-আইনী কারবার অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে যমন করিয়াই হউক। কবে পালে বাঘ পড়িবে, তাহার জন্য অপেক্ষা না করাই ভাল!

শক্ত-মানুষ লালবাহাদুর!

হিন্দী লইয়া এত যে গোলমাল হইল, দক্ষিণ ভারতে এত লোক যে নিজেদের ভাষা রক্ষার জন্য হিন্দীর প্রতি-রোধে প্রাণ দিল—লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহাতে প্রথমটা একটু বিচলিত হইলেও আমাদের লৌহমানব লালবাবু আবার ক্রমে ক্রমে তাঁহার এবং তাঁহার হিন্দী অনুচরদের দাবিরূপী আবদার রক্ষার জন্য—পুরানো বুলি ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে এলাহাবাদে লালুবাবু ঘোষণা করেন যে—হিন্দীই দেশের সরকারী ভাষা, কেউ এ-ব্যবস্থার রদবদল-করতে পারে না।" অর্থাৎ কি না "হে অহিন্দী-ভাষী মুর্খের দল, তোমরা চাও বা না চাও, হিন্দী

তোমাদের ঘাড়ে চাপবেই—কাজেই এখুনই হিন্দী অ আ ক খ গ শিখতে আরম্ভ কর—ছেলেমেয়েদেরও শেখাতে আরম্ভ কর, যদি ভাল চাও, ভাল সরকারী চাকরি ছেলেমেয়েদের জন্তে যোগাড় করতে চাও!" ইহার উপর আর কথা নাই।

লালবাহাদুর ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার নিজেকে চালাক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—কারণ কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে বোকা ভাবিয়া থাকে। নিজেকে তিনি 'শক্ত মানুষ' বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কারণ অনেকে তাঁহাকে ক্ষীণকায় বলিয়া হীনবল ভাবে! কিন্তু হিন্দী লইয়া যে চালাকির চাল তিনি চালিতেছেন তাহা ধোপে টিঁকিবে কি? লালুবাবু হয়ত চালাক—তাঁহার হিন্দীভাষী অনুচররাও হয়ত চতুর—কিন্তু দেশের বাকী সবাই কি নিরেট গর্দ্দভের দল? এই গর্দ্দভের দলও কিন্তু লৌহমানব লালুবাবু চাণক্য-চতুরতার চাল সহজেই বুঝিয়া ফেলিয়াছে!

দেশ যখন নানাদিক হইতে বিষম বিপদগ্রস্ত এবং হঠাৎ যে কোন সময় দেশ দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইতে পারে, ঠিক সেই সময় দেশে হিন্দী চালাইবার, চাপাইবার —এমন কি প্রয়োজন ঘটিল সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিবে না। ভাষা লইয়া দেশের রাজ্যে রাজ্যে যদি বিদ্রোহ এবং রক্তস্রোত বহানোই চতুর লৌহমানব লাল-বাহাদুরের কাম্য হয়, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই।

চীনা চড় এবং পাকিস্তানী লাথি-ঝাঁটার পাল্টা দিবার ব্যবস্থাতেই বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা যে কত বড় শাসক এবং কি ভীষণ বীর তাহা দেশের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। বিগত সতের বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী কর্ত্তারা দেশকে বিশুদ্ধ বাণী দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রে বোধ হয় এমন এমন বাক্য-সর্ব্বস্ব অকর্ম্মার ঢেঁকি শাসকবর্গ নাই। অন্য কোথাও হইলে ইহাদের শাসকের আরাম গদি হইতে পথের কাদ-ধূলাতে টানিয়া ফেলিতে সময় লাগিত মাত্র কয়েক দিন—কিন্তু পরম অহিংস ধর্ম্মে দীক্ষিত এই দেশের লোক জানে কেবল ক্রন্দন এবং মহাপ্রভুদের লীলা-খেলা অবলোকন করিতে! অহিংসার দাপটে 'সক্রিয়' এই বাক্যটিও আজ পরম নিষ্ক্রিয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

পাক চীনের লাথি ঝাঁটার ঝালটা কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা অহিন্দীভাষীর দেশবাসীর উপর হিন্দীর ডাণ্ডার দ্বারা মিটাইতে চাহিতেছেন!

আকাশবাণীতে হিন্দী-শিক্ষার ব্যবস্থা আবার আসন্ন:

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে—অর্থাৎ হিন্দী-হাঙ্গামার সময়:— —তথ্য ও বেতার-দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আকাশবাণীতে তাড়াতাড়ি আবার হিন্দীশিক্ষার আসর খোলা ঠিক হইবে না। হঠাৎ শুনিলে কথাটা ভরসার মত ঠেকে বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে সান্ত্বনাটুকু উবিয়া যায়। যেন গুরুমহাশয় আজ রেহাই দিলেন, কিন্তু কাল মারিবেন বলিয়া বেতখানি তুলিয়া রাখিলেন। ভাষা লইয়া অশান্তির সূত্রপাতেই শ্রীমতী গান্ধী বলিয়াছিলেন, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে নূতন করিয়া ভাবনার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, সেই বিবৃতিতে যে সাহস ছিল, নূতন ঘোষণাটিতে তাহা নাই। বার বার নানাভাবে ঠেকিয়াও কর্ত্তৃস্থানীয়েরা শিখিতে চাহেন না কেন বোঝা দায়। কিছুতেই এই জিদটা যাইতে চাহে না যে হিন্দীকে তার হকের উপরে আরও কিছু ফাউ দেওয়াই চাই। আদৌ দিতে হইবে কেন এই সহজ প্রশ্নটা কেহ কানে তুলিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং হিন্দীশিক্ষার আসর আজ না হয় কাল ফের চালু হইবে। দক্ষিণের গলার জোর বেশী, অতএব দক্ষিণী ভাষাও একটুখানি দাক্ষিণ্য পাইতে পারে—কেবল পূর্ব্ব কিংবা পশ্চিমাঞ্চলের বেলাতেই গাওয়া হইবে "নাই, নাই, নাই-যে বাকী সময় আমার"? আকাশবাণীর ট্যাক্সো জোগায় সারা দেশ, অথচ বিশেষ সুবিধা পাইবে একটিমাত্র আঞ্চলিক ভাষা, এই নীতির উপর সংহতির ভূমিকা রচিত হইতে পারে না। সকলের টাকা দিয়া জন কয়েকের খেয়াল মিটানোর নৈতিক অধিকার সরকারকে কেহ দেয় নাই। কোটি কোটি টাকা ঢালা হইবে হিন্দী প্রচারিণী উদ্যোগে: একটি ভাষা সতেজ লাউডগার মত তরতর করিয়া বাড়িয়া উঠুক বাকীগুলি মুষড়াইয়া পড়ুক, মনের আসল কথা যদি ইহাই হয়, তবে বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া ইত্যাদির কেবল ভূতই রহিবে, ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকিবে না। যদি থাকেও তবে সেই ভবিষ্যতে লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি গবেষণার খোরাক হইয়া জনকতক পণ্ডিতকে ডক্টরেট যোগান দিতে পারে মাত্র, তার বেশী নয়।—

ইহা কিছুদিন পূর্ব্বের মন্তব্য হইলেও বর্ত্তমানে আবার তাজা হইয়া উঠিয়াছে।

দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দী লইয়া আবার যে-রকম বাড়াবাড়ি করিতেছেন—তাহাতে আশঙ্কা হয় অচিরে

আবার দেশে একটি লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবে। দক্ষিণের কথা জোর করিয়া বলা যায়। এবার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা 'নিরামিষ' যাইবে না। যে-সময় দেশে শান্তি এবং সংহতির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিকেই কর্ত্তারা দেশের শান্তি এবং সংহতি নষ্ট করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিলেন!

প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা দরকার যে, আকাশবাণীতে হিন্দীর অত্যাচার অহিন্দীভাষীদের সহ্যসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বেতারেও রেহাই নাই। এক-দিকে হিন্দীর প্রাধান্য, অন্যদিকে পল্লীমঙ্গল, মজদুর-মণ্ডলী প্রভৃতি আসরে সরকারী কর্ত্তাদের নাম ও গুণ-কীর্ত্তন অহরহ চলিতেছে। এক কথায়—আজ বেতার শ্রবণ আনন্দ না হইয়া হইয়াছে নির্যাতন—অবশ্য ইহা শ্রোতারা সাধ করিয়া ভোগ করিতেছেন।

এক সময় বিদেশী পণ্য, বিশেষ করিয়া বস্ত্র, বয়কট করার প্রয়োজন দেখা দেয় আজ ভারতের অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে দেশীয় বেতার বয়কট করার তেমনি প্রয়োজন দেখা দিয়াছে! বয়কট চালু করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি দাবি (যেমন কলিকাতা বেতার ভবনে কর্ত্তাদের দরজায় হিন্দীর বদলে বাঙ্গলা নেমপ্লেট এবং অন্যান্য সর্ব্বত্র হিন্দী সাইনবোর্ডের বদলে বাঙ্গলা সাইন-বোর্ড) পেশ করিতে হইবে—নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হইলে—বর্ত্তমান চালু লাইসেন্স-পিরিয়ড শেষ হইলে তাহা আর রিনিউ না করিবার ব্রত লইতে হইবে। একমাত্র এইভাবে বেতারে পরিবর্ত্তন ঘটান যাইতে পারে।

পাক্-ভারত সীমানাস্থিত গ্রামাঞ্চল ঃ

—আমাদের রাষ্ট্রনায়ক মহারথীবৃন্দ মহানগরী রাজ-ধানীর নিরাপদ হর্ম্ম্যপ্রাসাদে বাস করেন—জীবন, ধন, মান, প্রতিপত্তি তাঁহাদের সুরক্ষিত। রাষ্ট্র-নায়কগণের মধ্যে যদি কেহ একজন কোন একদিন ভারত-পাক্ সীমান্তের গ্রামে বাস করিতেন তবে বুঝিতে পারিতেন জীবন, ধনসম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন লইয়া কিরূপ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়। স্বাধীনতার সতের বছরে পাকিস্তানের সহিত হাজারো তোষণ আলোচনা করিয়াও পাকিস্তানীদের যখন-তখন গুলী নিক্ষেপ বন্ধ করিতে পারা গেল না। সদাশয় ভারত সরকার পাকিস্তানে নোট পাঠাইতে টন টন কাগজ খরচ করিয়াছেন এবং উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্য্যায় হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিস্তর আলোচনা বৈঠক বসাইয়াও পাকিস্তানীদের দৌরাত্ম্য ঠেকাইতে পারেন নাই। আবার শোনা যাইতেছে ভারতের উপর পাকিস্তানীদের গোলাগুলী নিক্ষেপ বন্ধ করিতে উভয় রাষ্ট্রের চীপ সেক্রেটারী পর্য্যায় আলোচনা বৈঠক বসাইতে ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। শান্তিপূর্ণ আপোষ-আলোচনার ভিতর দিয়া পাকিস্তানীদের সুবুদ্ধির উদয় যে কস্মিনকালে ঘটিবে না ইহা একজন নির্ব্বোধ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেও ভারত সরকার পারিবেন না। ভারতের মজ্জায় মজ্জায় তোষণ-নীতি মিশিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পার্শ্বে মুসলীম লীগের পায়ে জাতীয় কংগ্রেসের তৈল মর্দ্দন তোষণনীতির শ্রেষ্ঠ উপহার হইতেছে অখণ্ড ভারতের অঙ্গ কাটিয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু কথা হইতেছে ভারতের বুকে ভারতীয় নাগরিকগণ নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে না? কেন? পাক সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসীদের জীবন, ধনসম্পত্তি সম্পূর্ণ অরক্ষিত রহিয়াছে। পাকিস্তানী সৈন্য ও দস্যু-দের যখন-তখন আক্রমণে শিয়াল-কুকুরের মত ভারতীয় নাগরিক বাড়ীঘর ফেলিয়া পালাইতেছে। পাকিস্তান সীমান্তের পার্শ্ববর্ত্তী ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসী-মাত্রই নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর রহিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রীজী বা নন্দজী যদি এইরূপ কোন একটি গ্রামের অধিবাসী হইতেন তবে বুঝিতে পারিতেন এহেন উৎকণ্ঠার ভিতর জীবনধারণ কিরূপ দুঃসহ। পাকিস্তানী-দের দৌরাত্ম্য, উৎপাত বন্ধ করার প্রধান উপায় হইতেছে অবিলম্বে গোটা পূর্ব্ব পাকিস্তান ভারতভুক্ত করা। পাকিস্তান যদি সার্ব্বভৌম ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য কাশ্মীরের একটা অংশ দখল করিয়া রাখিতে পারে তবে ভারতবর্ষ কেন পূর্ব্ব পাকিস্তান দখল করিতে পারিবে না? আমাদের দার্শনিক রাষ্ট্রনায়ক মহারথীবৃন্দের নিকট এই উক্তি বিষতুল্য। কেননা তাঁহারা গোটা বিশ্বের শান্তি যেন যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিতেছেন। কথায় কথায় বিশ্বশান্তির দোহাই ভারতের এক ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। লাল চীন ভারতের জমি দখল করিয়া রাখিয়াছে, যুদ্ধ করিয়া উহা উদ্ধার করিব না, কেননা তাহা হইলে বিশ্বশান্তির বিপদ ঘটিবে, কাশ্মীর হইতে পাকিস্তানীদের হঠাইব না, কেননা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। একমাত্র ভরসা রাষ্ট্রসঙ্ঘ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবস্থা তথৈবচ। 'ভারতের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া একাধিক-বার ভিটো প্রয়োগ না করিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের

বারটা প্রায় বাজিয়া যাইত। কাজেই দুর্ব্বল ভারত সরকার কোনদিন যে পাকিস্তানী দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে পারিবেন তাহা আর বিশ্বাস হয় না। পাকিস্তান সীমান্তের ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসী ভারত সন্তানেরা আজ ভারত রাষ্ট্রের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে—বিদেশীদের উৎপীড়ন অত্যাচার হইতে কেন তাহাদের জীবন, পরিবার ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করা হয় নাই। পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের এহেন নিরাপত্তার অভাব দেখা যায় নাই। গণতন্ত্রের ছিদ্রপথে দুর্ব্বল মানুষের হাতে কোন দেশই আমাদের মত রাষ্ট্রদায়িত্ব তুলিয়া দেয় নাই। আমাদের দেশের যখন দেশপ্রেম একচেটিয়া অধিকার পোলিটিশিয়ানদের, কাজেই স্বদেশের উপর বিদেশীদের উৎপাত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে। ২৪ পরগণা জেলার সীমানার পরে পাকিস্তানীরা সৈন্য গোলাবারুদ মজুত করিতেছে। আমরা অন্তই সীমান্তের অধিবাসীদের নিরাপত্তার দাবি করিতেছি।—

বারাসত বার্ত্তার এই বার্ত্তা দিল্লীর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিবে কি? প্রভুরা বর্ত্তমানে বহু গুরুতর সমস্যার সমাধান চিন্তায় ব্যাপৃত—কাজেই 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক কলোনীর সামান্য সুখ দুঃখ, দু চারটা গুলী-খাওয়া লোকের মৃত্যু, একদল লোকের কুঁড়েঘর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন—কর্ত্তাদের অযথা বিব্রত করিবার রাষ্ট্রবিরোধী প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নহে!

এখন ভারতকর্ত্তাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য—'হিন্দীকে' ভারতের রাজভাষা করিয়া ভারতে হিন্দীরাজ কায়েম করা—ইণ্ডিয়াকে "হিণ্ডিয়া" করিয়া।

॥ উপন্যাস ॥

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

রায়বাড়ীতে দোলযাত্রার যোগাড় চলিতেছে। সেই ধান ভানা, মোয়া মুড়কি, চিড়া-কোটা, মুড়ি-ভাজা। তিলের নাড়ু ঝাঁকাখানেক নারিকেল।

ঠাকুমা চারিদিকে তদারক করিয়া সকলের বিরক্তি-ভাজন হইয়া নিজেও বিরক্ত হইতেছেন।

কামিনীর মা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মুখপাত্র, তাহার উপরে আক্রমণটা বেশি।

ভোগের আতপ চাল সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, ঠাকুমার বিশ্বাস সে চাল প্রচুর নহে। একটা বড় ডোলের এক ডোল চাল দিয়া ইহারা দোল নির্ব্বাহ দিবে, ইহা কি সম্ভব? আসলে প্রকৃত ব্যাপার হইল তিনদিনের, দোলের অধিবাসের রাতে কুঁড়ে পুড়িবে। বাদ্যকরেরা আসিবে, পুরোহিত খাবেনই। যাহারা কাজের ব্যাগার খাটিতেছে, তাহারা সকলে বসিয়া যাইবে পাতা পাতিয়া।

দোলের দিন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বোষ্টম নিমন্ত্রিত হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীরাও বাদ যাইবে না। তাহার পরে সাধারণ কামার-কুমারের দল ত আছেই। মধ্যাহ্ন হইতে রাত অবধি সমানতালে চলিতে থাকিবে পাতা পাতা, পাতা ফেলা। পরের দিন ভাঙ্গা দোল, তাহাতেও খাবার লোক কম হয় না। বিশেষত: শোনা যাইতেছে বৃন্দাবনের বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়িকা তাহার দলবল লইয়া আসিবে দোলের পরের দিন ভাঙ্গাদোলে কীর্ত্তন গাহিতে। তাহার ইচ্ছা ছিল দোলের রাতে সবাইকে হরিনাম শোনাইতে কিন্তু মধুমতীরা ব্যবস্থা দিয়াছে দোলের পরের দিন। দোলের রাতে বাড়ীর মেয়েরা ভাল শুনিবার সুযোগ পাইবে না। ভোগ পরিবেশন, ভোগ বণ্টনে রাত দুপ্রহর উত্তীর্ণ হইবে।

প্রভাত হইতে বকিয়া-ঝকিয়া ঠাকুমা ক্লান্ত হইয়া বসিলেন পূবের বারান্দায়। বেলা মন্দ হয় নাই। ধান-ভানুনীরা পুরাদমে সিদ্ধধানের চাল করিতেছে। পসারী পাড়ে বসিয়া ধান উল্টাইয়া দিতেছে। কামিনীর মা এক পাশে বসিয়াছে ভোগের ধামাখানেক মটরের ডাল বাছিতে। তাহার অনতিদূরে বিনু মধুমতীর মাথায় তেল বসাইয়া দিতেছে। মধুমতীর মাথা নাকি গরম বোধ হইতেছে।

একাস্তে ইহাদের সমাবেশে ঠাকুমার হৃদয়ের বিরক্তির মেঘরেখা নিমিষে মিলাইয়া গেল।

ঠাকুমা তোয়াজের স্বরে কহিলেন, "শোন লো রাজেশ্বরী, তোরে এক ডোল আলো চালের কথা কইতে গেলাম, তাতে তুই ব্যাজার হ'লি। নরণাকে কইলাম, 'বাসনগুলো কতক আজ বের করে দে, ওরা ধীরে-সুস্থে মেজে রাখুক।' সে খেঁকিয়ে ওঠে, "আজ মাজলে ফের দাগ পড়ে যাবে, আবার মাজন-ঘষণ করতে হবে। পরশু দিন বেবাক বাসন বার করে দেব। কচিরামকে কইলাম, ঝাঁকা ভরা ছোলা নারকেল যে ঘরে এনে তুলে রাখলে, একেবারে পুকুরের জলে চুবিয়ে আনলে একটা কাজ হয়ে থাকত?' আমার কথায় উড়ে মাড়া ইড়িমিড়ি করে কি যে কইল বুঝতে পারলাম না। আমার হয়েছে 'যার জন্যে করি চুরি সেই কয় চোর।' কার কথা কাকে কই—আমার হ'য়েছে রাক্ষস বামুনের মানুষ বৌয়ের বিত্তান্ত!"

কামিনীর মা ডাল বাছিতে বাছিতে অপ্রতিভ হইয়া জবাব দিল, "আমি তোমাগো কি কইছি মাঠান, যাতে তোমাগো গোঁসা হইল? তোমাগো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আলা চাল ক্যামনে কমতি হইবে? এক ডোল লয়, দুই ডোল ভরা চাল রইচে। সগল লোক ত ভোগের পরসাদের পরে মাছের সনে সিদ্ধ চালের ভাত চাইয়া খায়। মাছের সনে আলো চালের ভাত নাকি তাগরে জলা জলা লাগে।"

কামিনীর মা'র মাছের উল্লেখে ঠাকুমা ভিন্ন পথ ধরিলেন, "দোলে অনেকে মাছ করে না। আমার মহেশ পরাণ ভরে সকলকে খাওয়াতে ভালবাসে। কয়, 'আমরা ত বোষ্টম নই। শক্তির উপাসক। নিরামিষ খেতে কেউ ভালবাসে না, সকলে মাছের ভক্ত। ভোগের পেসাদের পরে যারা মাছ খাবে তাদের তৃপ্তির জন্যে মাছের ব্যবস্থা।"

বিনুর তেল বসানোতে মধুমতীর ভারি আরাম বোধ হইতেছিল। তখনই উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে ঘুম ঘুম চোখে বলিল, "বামুনীর রাক্ষস স্বামীর

কথাও বললে না ঠাকুমা? রাক্ষসের মানুষ বৌ, সখ দেখে বাঁচিনা?"

ঠাকুমা সুরু করিলেন, "রাক্ষস দিনমানে গরীব বামুন সেজে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তার তিনটে মেয়ে ছিল। বড় দুটো বাপের সঙ্গে রাতে বেরিয়ে যে-সব বাড়ীতে ভিক্ষায় যেয়ে দেখে আসত তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। রাতে তিন বাপ বিটি মিলে ধরে এনে খেয়ে ফেলত। বামুনী দেখে-শুনে ভয়ে বুকফেটে মারা যায়। কারোকে বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। তার মনে মনে বিশ্বাস হয়েছিল, ছোটমেয়ে তারই মতন মানুষ। মানুষ না হ'লে সে নর মাংস খায় না কেন? একদিন ছোট-মেয়েকে ডেকে বামুনী বলে, 'দেখ মা, তোর বাপ দিদিরা রাক্ষস, মানুষ ধরে খায়। তুই আর আমি মানুষ, আয় আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

মায়ের কথা শুনে মেয়ে খল খল করে হেসে ডাকে, 'ছোড়দিদিলো, বড়দিদিলো মা নাকি মানুষ, আয় আমরা মাকে ধরে খাই।"

তিনমেয়ে মিলে তখুনি বামুনীকে খেয়ে ফেললে।"

ঠাকুমার গল্প শুনিয়া বিনু হিহি শব্দে হাসিতে লাগিল। মধুমতী নিদ্রাবিজড়িত চোখে মৃদুমন্দ হাসিল।

তরু যেন কোথা হইতে ঝড়ের বেগে আসিয়া বিনুকে তাড়া দিল, "বৌদি, উঠে এস জলদি, জলদি, দেরি ক'রো না।"

মধুমতী বিরক্ত. "কোথা হ'তে আসা হ'ল ধেয়ে প্যায়দার মত। কি দরকার তোর বৌকে দিয়ে?"

"দরকার আছে বলেই না ডাকছি। 'তেলে মাথায়' আর তেল দিতে হবে না। আমি ছিলাম মণ্ডপে। ফুলদা হারাণ দা' জিতু সখা মেনী আমরা সকলে মিলে রঙীন কাগজের শিকলি করছি। ফুলঝালর বানাচ্ছি। মণ্ডপ থেকে সিং দরজা অবধি কাগজের ফুলে মালায় ফুলদা সাজিয়ে দেবে বলেছে। দোলের অধিবাসের দিন দেবদারু আর আমের পাতায় মণ্ডপের থাম সাজানো হবে।"

কামিনীর মা প্রশ্ন করে, "বৌমারে নয়া যাইবে নাকি মণ্ডপে কাগজের নক্সা কাটিতে?"

"না বাপু না, আমার সে আক্কেল আছে। আমার অন্য দরকার আছে।" বলিতে বলিতে তরু বিনুর বাহুধারণ করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল।

তরু বিনুকে লইয়া বেশিদূর গেল না। গেল অন্তঃপুরের বাগানে।

একটু আগেই দমকা বাতাস বহিয়াছে। এখনও তরু-পল্লবের কম্পন থামে নাই। পদতলে ঝরাপাতা সর-সর-সর-সর করিতেছে।

তরু বিনুকে আনিয়াছে আম কুড়াইতে। মণ্ডপ সুসজ্জিত করিবার উৎসাহে আজ তাহার আম কুড়াইবার কথা মনে ছিল না। তাহার ভুল ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে বসন্তের দমকা হাওয়া অলক উড়াইয়া।

ফাগুন মাসের মাঝামাঝি, আমগুলি নিতান্ত ছোট নাই। গাছতলায় শুষ্ক পাতার স্তূপে ঝরিয়া পড়িয়াছে অসংখ্য কাঁচা আম।

তরু চটের থলি আনিতেও ভুল করে নাই, দুইজনা আম কুড়াইতে মত্ত হইয়া উঠিল।

বিনু বলে, "দেখ তরু, ওই মানকচুর ঝোপে যাস্‌নে, গরম পড়েছে, এখন সাপ বেরোয়। সেদিন আচার্য্যদের ভাঙ্গা ইঁটের পাঁজায় থেকে সাপুড়েরা দুটো মস্ত সাপ ধরেছিল, শুনিস নি?"

তরু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টায়, "আমাদের প্রাচীর ঘেরা পরিষ্কার বাগানে সাপ থাকে না বৌদি। থাকলেও সাপের মন্তর ত জানি? আস্তিকার মুনি তিনবার বললেই সাপের দফা রফা। আস্তিকার মুনি সোনা-মান্তর সাপেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। দেখ বৌদি, এবার কালবৈশাখী সুরু হবে। ঝড়ে দালান কাঁপবে, টিনের চালে ঝম ঝম শব্দ হবে। গাছেরা মাথা কোটাকুটি করে সারা হবে, তখন কিন্তু আম কুড়াবার ভারি মজা। কম রাতে কালবৈশাখী হ'লে আলো নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আম কুড়াব। বেশিরাতে হ'লে কে দাঁড়াবে আমাদের সঙ্গে?"

বিনু কথা বলে না। আম কুড়ানো শেষ হইলে বিহ্বল নেত্র মেলিয়া দেয় কুরচি গাছের দিকে। বৃহৎ কুরচির একখানা মোটা ডাল হেলিয়া রহিয়াছে বিনুর শয়ন-গৃহের বাতায়নে। শুভ্র-সুরভিত ফুলে গাছ ভরিয়া গিয়াছে।

বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় কর্ত্তা পাহাড় দেশ হইতে দুইটি চারা সখ করিয়া রায়বাড়ীতে আনাইয়াছিলেন। একটা রোপিত হইয়াছিল সদরে, এ'টা অন্দরে।

ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই সদরের চারাটা মরিয়া যায়, অন্দরের চারা শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রাচীনত্ব লাভ করিয়াছে। বীচি হইতে ইহার অনেক চারার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেগুলি গ্রামের অনেক বাগানে কর্ত্তার পুষ্পপ্রীতির নিদর্শন হইয়া কুরচির পরিবর্ত্তে 'কুটরাজ' নাম ধারণ করিয়াছে।

বিন্থ সরিয়া দাঁড়াইল গাছের তলায়, তাহার মস্তকে ঝুরঝুর করিবা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ফুলের রাশি। অধরে কুঞ্চন হাসির রেখা খেলিয়া গেল। মনে পড়িল তাহার কুরচি প্রশস্তি লেখা—

"ছোট ছোট কুরচিফুল সারা গায়ে আতর মাখা
ঝুরঝুর পড়ে ঝরে, বক যেনরে মেলছে পাখা ?"

ছিঃ, কি ছিরির উপমা, ইহাকে আবার লেখা বলে কে? অকপট মূর্খ বুদ্ধিহীনা যেমন বিন্থ তেমনি তাহার রচনা।

তখনও মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থের সহিত তাহার পরিচয় বাকী ছিল, কড়ি কোমলের পাতা আঁখির আগে পাতা মেলে নাই। কামিনী, প্রিয়ম্বদা মানকুমারী গিরীন্দ্র মোহিনী নবীন সেনরা অন্তরালে সঙ্গোপনে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে বিন্থর বকেরা পাখা মেলিয়াছিল।

"একি বৌদি, তুমি ফুলের দিকে চেয়ে আপন মনে হাসছ কেন? কষ্ট করে আম কুড়ালে, এখানে বসে খাবেনা দুটো?"

বিন্থ সচকিত হইল, "এত ফুল দেখে আমার ভাল লাগছে তাই—এত কষা আম জলে না ধুয়ে খেলে মুখে ঘা-হয়ে যায়। একটু বড় হলে তখন অত কষ্ট থাকে না। কুড়িয়ে নিয়েই খাওয়া চলে। এগুলো এখন বোঁটা কেটে খানিক জলে ভিজিয়ে রেখে দে, তার পরে খোসা ছাড়িয়ে দিলে ছেঁচে মাখলে সুন্দর হবে খেতে।

"তা হ'লে আম ভিজিয়ে রাখিগে। নেয়ে এসে ছেঁচা কোটা করব। আর ক'দিন পরে আমও বড় হবে, কালবৈশাখীও সুরু হবে। দাদা তখন বাড়ী আসবেন, তুমি আলো নিয়ে দাদার সঙ্গে রাতে আম কুড়িয়ো বৌদি?"

"হ্যাঁ, সে কি ক্ষিতি না সুধু, বুড়োমদ্দ আবার আম কুড়োবে আমার সঙ্গে। তার কোন সখ নেই, খালি পড়া আর বই।"

বিন্থর কণ্ঠ হইতে আক্ষেপের সুর ঝরিয়া পড়ে।

তরু বলে, "না কুড়োয় না কুড়াবে, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলোটা ধরবে ত? বেশি রাতে ঝড় হ'লে আমি যে বেরোতে পারব না শক্রপুরী থেকে। আগ রাতে ঝড় হ'লে ভাবনা নেই, আমরা দুইজনা মিলে সাজি-ভরে আম কুড়িয়ে নেব।"

তরুর আশ্বাসে বিন্থ আশ্বস্ত হইল।

দোল আসিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় অধিবাস। খড় ও বাঁশের কঞ্চি দিয়া একটা কুঁড়েঘর প্রস্তুত হইয়াছে মণ্ডপের পাশে। ময়দার ভেড়া পুড়িবে ওইখানে। ক্ষিতি তাহার দলবল লইয়া মণ্ডপ মণ্ডপের বারান্দা আঙ্গিনা সজ্জিত করিয়াছে মনোরম বেশে। মণ্ডপের আঙ্গিনা বেড়িয়া পদ্ম-আঁকা সামিয়ানা টাঙ্গানো হইয়াছে। মাঝখানে এক অনুচ্চ মঞ্চ। মঞ্চ বেষ্টন করা হইয়াছে তুলসীকুঞ্জে। মঞ্চের চারদিকে চারখানা সুবৃহৎ চিত্র সংরক্ষিত। গোষ্ঠলীলা, কালীয়দমন, পার্থসারথী, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। দোলের পরের দিন সুদূর বৃন্দাবন-বাসিনী সুপ্রসিদ্ধা শ্যামদাসীর কীর্ত্তন হইবে এইখানে।

শ্যামদাসী নাকি বাংলার দুহিতা। সম্ভ্রান্ত গৃহে জন্মিয়া সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূ হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একদা একজনার প্রলোভনে কিশোরী বয়সে সে গৃহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পথে বাহির হয়। তাহার পরে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে শ্যামদাসীর ভাগ্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অনেক পথে ঘুরিয়া, অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে শ্যামদাসী আশ্রয় পায় বৃন্দাবনের এক বৃদ্ধ বোষ্টমের আশ্রমে। শ্যামদাসীর আশ্রয় দাতা বৃদ্ধ ছিলেন গোবিন্দজীর প্রকৃত ভক্ত ও ওস্তাদ। তিনিই কন্যাতুল্যস্নেহে নিজের অধীত বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন শ্যামদাসীকে। কয়েকটি অনাথ বালিকাকে লইয়া শ্যামদাসী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার গুরুদেবের আশ্রমে।

বৎসরান্তে শ্যামদাসীর আগমন হয় বাংলায়। রাসের সময় নবদ্বীপ হরিনাম গানে প্লাবিত করিয়া শ্যামদাসী ফিরিবার সময় বন্দরে মেলায় দোলের কয়-দিন সকলকে নাম শুনাইয়া চলিয়া যায় বৃন্দাবনে। সেই শ্যামদাসীকে কেন্দ্র করিয়া এবার রায়বাড়ীর হোলির আনন্দ অপার।

শুধু তেমন আনন্দ নাই মধুমতীর মনে। ঘুম ভাঙ্গার পরেই মধুমতী বিন্থকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "বৌ, আমায় একটু আবীর এনে দিতে পার?"

গোলাঘরে ধামাধামা আবীর আনিয়া রাখা হইয়াছে। চিনির সাঁচ-বাতাসা ফেনী-বাতাসা ঝাঁকাভরা আসিয়াছে।

বিন্থ কাগজে একটু আবীর আনিয়া দেয় মধুমতীকে। পাতলা ছোট এক চিলতে কাগজে একরত্তি আবীর মুড়িয়া মধুমতীকে চিঠিতে ভরিতে দেখিয়া বোকা বিন্থ চালাক হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের গৃহে

ফিরিয়া এতটুকু আবীর চিলুতে কাগজে মুড়িয়া লিখিল, "তোমাকে দোলের আবীর দিলাম।" দুইজনার দুই চিঠিই চলিয়া গেল সেই দিনের ডাকে।

শ্যামরায়ের মন্দিরের আশেপাশে দোলের মেলা জমিতেছে, ধীরে ধীরে। নাগরদোলা আসিয়াছে।

রায়বাড়ীতে সকলে নাগরদোলায় দুলিতেছে। বিগ্রহ লক্ষ্মীজনার্দ্দন মণ্ডপে রূপার চতুর্দ্দোলে বিরাজিত হইয়া আজ হইতেই দোল খাইতেছেন।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে দুই ঢোল এক কাঁসী এক বাঁশী আসিয়া চারদিক সরগরম করিয়া তুলিল। দোলে ঢাক বাজাইতে নাই। শক্তি পূজায় ঢাক সমাদৃত। ঠাকুমা প্রাণ খুলিয়া উলু দিতে লাগিলেন।

দোলের ঢোল কাঁসী বাঁশী বোল ধরিল—"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন, মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন।" সত্যই আজ পল্লীভূমি ব্রজভূমিতে পরিণত হইয়াছে। না হইলে কি ব্রজগোপাল বনমালী মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হন শ্রীচরণের রেণু বিতরণ করিতে।

প্রকৃত পক্ষে অধিবাসের অভিষেকে দোলযাত্রার সূচনা। খড়ের কুটিরের সামনের আসনে পুরোহিত বিগ্রহ লইয়া পূজায় বসিলেন। ফুলমালা নৈবেদ্য জলপানি থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হইল। আরও যেখানে স্থাপিত হইল রূপার গাগরী থালায় অভ্র-মিশ্রিত সুবাসিত কুঙ্কুম।

পুরোহিত কুশে করিয়া গঙ্গাজলের ছিটা ও মন্ত্র প'ড়িয়া আবীর শোধন করিয়া লইলেন। অশোধিত আবীর বিগ্রহকে দিতে নাই।

অভিষেক হইয়া গেল, লক্ষ্মীজনার্দ্দন আবীর গ্রহণ করিয়া নির্মাল্য করিয়া দিলেন। রায়-পরিবারের সকলকে এই প্রসাদী ফাগ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আজ হোলি খেলা নাই, সে হইবে আগামীকাল প্রভাত হইতে।

বিগ্রহ রূপার সিংহাসনে মণ্ডপে ফিরিয়া আসিলে কুটীরে অগ্নি নিক্ষেপ করা হইল। ময়দার ভেড়া পুড়িতে লাগিল, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিল।

পাড়ার ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়াইয়া আসিল ঢিল হস্তে। ঢিল ছুঁড়িয়া আগুন নিবাইয়া তাহারা কুঁড়ের কঞ্চি লইতে মহাব্যস্ত। এই কঞ্চি গৃহে রাখিলে ছারপোকা মশার উৎপাত হয় না।

বাহিরের পর্ব্ব সমাধা হইলে ঠাকুমা হাতীর মাথায় আসন লইলেন। শুধু কি আসন লওয়া, মুখে তুবড়ি ছুটিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে রায়বাড়ীতে বিরাট্ মহোৎসব। তাঁহার হইয়াছে ছেলে-ছোকরার সংসার, তিনি নীরব থাকিলে ক্রটি-বিচ্যুতি যে অনিবার্য্য।

"ও মরি, ঠাকুরমশায়ের খাবার যোগাড় কতদূর? যত্ন করে ব্রাহ্মণকে খেতে দে। আজ গেল ওঁর এক উপোস, কাল হবে আর এক উপোস। সন্ধ্যায় সন্ধি দোল সেরে তবে না উনি জল খেতে পারবেন।"

কর্ম্মশালায় চলিতেছে বিরাট সমারোহ। ছোট ঠাকুমা গঙ্গাজলে বাটি ভরিয়া চন্দন ঘষিয়া রাখিতেছেন। সরস্বতী চূণ খয়ের বর্জ্জিত একটুকরা সুপারি সংযোগে পূজার রাশি রাশি পানের খিলি বানাইতেছে। মনোরমার অধিবাসের প্রসাদ বিতরণ এখনও শেষ হয় নাই। তরু দলভ্রষ্ট হইয়া কাটিয়া পড়িয়াছে ক্ষিতিদের দলে। তাহাদের পূজা মণ্ডপের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আমের পাতার মালা আরও গাঁথিতে হইবে। মধুমতী ও বিনু বসিয়া গিয়াছে তরকারির ঝাঁকা লইয়া—কচিরাম এখন পুরলক্ষ্মীদেরই দলভুক্ত। সে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে উঠানে মানকচুর ডালনা কুটিতেছে। মানকচু কোটা হইলে তাহাকে কচুর শাক কুটিতে হইবে। দাসীরা জবাব দিয়াছে তাহাদের সময় নাই।

বড় ভোগের ঘরে কাল নারায়ণের ভোগ রান্না হইবে। কামিনীর মা ভোগের হাঁড়ি-কড়া কাঠ-কুটো সমস্ত সুচারুরূপে গোছ-গাছ করিয়া দুর্ব্বার আঁটি লইয়া বসিয়াছে কচিরামের অনতিদূরে।

সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেহ ঠাকুমার কথায় দেওয়া দরকার বোধ করিল না। ইহাতে তাঁহার কিছুই আসে-যায় না। তিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন "আমি কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো।" তাঁহার ভাণ্ডারে তুবড়ির অভাব নেই, অফুরন্ত ভাণ্ডার। তিনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ফের ধরিলেন, 'ও মাধ্যি ঠাকুরমশায়কে খেতে দিবি কখন? আহা, সারাদিনের উপোসী ব্রাহ্মণ!"

মধুমতী পটল ভাজা কুটিতেছিল, মুখ তুলিয়া উত্তর করিল, "তাঁর খাওয়া হয়ে গেছে ঠাকুমা, তিনি খেয়ে-দেয়ে বাইরে চলে গেছেন। তোমাকে এবার প্রসাদ দেই? খেয়ে বিশ্রাম কর গে। এখন থেকে বিশ্রাম না করলে কালকে গলা ফাটাতে কষ্ট হবে কিন্তু?"

ঠাকুমা মধুমতীর কথা না শুনিবার ভান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে পূজোয় বসতে হবে। পূর্ণিমা লেগে গেছে, পূর্ণিমার মধ্যে পুজো-আর্চ্চা সারা তাড়া করতে হবে। দ্বাদশ গোপালের জলপানিতে ছানা মাখন মিছরি লাগবে। ছানা মাখন তোরা ক'রে রেখেছিস ত মাধ্যি?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, ছানা মাখন ক'রে রাখা হয়েছে। কাল তোমার দ্বাদশ গোপালের প্রসাদে দেখতে পাবে।"

"পেসাদ আমার মাখন মিছরি খেতে বড় ভালবাসে, তার ঘরে মাখন মিছরির ছড়াছড়ি, সে কলের জলে পেট ভরায়। এ দুঃখ আমি কারে কই?"

"তোমার এত দুঃখের কি হয়েছে ঠাকুমা? তোমার প্রসাদ যেমন আসে নি, তেমনি তার প্রতিনিধি তোমার আদরের মণিমালা কাছে রয়েছে। কাল ওর সঙ্গে দোল খেলে ওকে আচ্ছা ক'রে মাখন মিছরি খেতে দিয়ে মনের আক্ষেপ মিটিও।"

ঠাকুমা আবার চুপ করিয়া রহিলেন। রজনী বাড়িতে লাগিল।

দুর্গাপূজার মতন দোলেও বাজনাদাররা ভোর বাজাইল। বাজনা শোনামাত্র রায়বাড়ী সজীব হইয়া কোলাহলে মুখর হইল। আগে পূজার আয়োজন, পরে দোলখেলা। স্নান না করিলে পূজার কাজে হাত দিবার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে সকলে ডুবাইয়া আসিল পুকুরের শীতল জলে।

মনোরমা শুদ্ধাচারে ভোগশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে ছেলে-মেয়ে বধূকে নারায়ণের প্রসাদী আবীর ললাটে পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে তাঁহার পদে আবীর দিয়া প্রণাম করিল। ভোগ চড়াইয়া দিলে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবেন না; আবীরও ভোগশালায় ঢুকিতে পারিবে না। প্রথমেই তিনি শুভ অনুষ্ঠানটুকু সারিয়া রাখিলেন।

তরু-ক্ষিতিরা মিলিয়া বালতি বালতি রং গোলাইতেছে। সারি সারি পিতলের ও টিনের পিচকারি একত্রিত করিয়াছে। তাহাদের সকলের কোমরে ঝুলিতেছে এক একটা আবীরের থলে। এক ধামা-ভরা আবীর তাহারা কাছাকাছি রাখিয়া দিয়াছে। পুরোহিত পূজায় বসিলে পূজার উপকরণ মণ্ডপে পৌঁছিলেই তাহারা সম্মুখসমরে নামিবার অপেক্ষা করিতেছে।

বধূ ও ছেলে-মেয়েরা পিতার পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম সারিয়া আসিয়াছে। দুই ঠাকুমার সহিত ইহাদের অল্পবিস্তর আবীর বিনিময় হইয়াছে। তাহাকে হোলিখেলা বলে না, ঠাকুরমাদের সহিত আসল হোলি-খেলা বাকী আছে সকলের।

একটু বেলা হইতে পুরোহিত পূজায় বসিলেন। ঢোল কাঁসী বাঁশী তুমুল শব্দে বাজিতে লাগিল। ঠাকুমার উলুর বিরতি হইল না।

ওদিকে পূজা হইতে লাগিল, এদিকে সুরু হইল মাতামাতি। লবঙ্গ মেনীরা আবিরের থলে ঝুলাইয়া আসিয়াছে।

মুমু বালতির রং পিচকারিতে ভরিয়া যাহাকে সামনে পাইতেছে তাহাকেই পিচকারি ছুঁড়িতেছে। সে মানুষই হোক, বা কুকুর-বিড়াল হোক তাহার বাচ-বিচার নাই।

দাসী-মহলেও আরম্ভ হইয়াছে হোলিখেলা। আবীরে অনুরঞ্জিত হইয়া কাহারও মুখ চেনা যায় না।

বাহির মহলে ভৃত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে খণ্ডযুদ্ধ। সরকাররা বাগ্নকররা হিন্দু মুসলমানরা একত্রে হোলি খেলিতেছে। কুঙ্কুম উড়িতেছে ধূলি হইয়া ধূলির মত। গলি পথে পথিকদের মধ্যেও হাস্য-কোলাহলের অবধি নাই। পথ-ঘাট লালে লাল হইয়া যাইতেছে।

ঠাকুমা মধুমতীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই হোলি খেলিস না। গুঁতো লাগতে পারে। বসে থাকিস এক জায়গায় স্থির হয়ে; যার যত খুসী তোকে যেন আবীর মাখায়। তুই কারোকে মাখাতে যাস না।"

মধুমতী ঠাকুমার কথা রাখিয়াছে। সে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। যে আলস্য না করিতেছে সেই রং মাখাইতেছে মধুমতীকে।

চতুর্দ্দিক হইতে হাসির কলগুঞ্জন হোলিয়া হোলিয়া জিগীর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

স্ত্রীলোকের শালগ্রাম শিলা স্পর্শ নিষিদ্ধ। বছরে মাত্র দোলের একটি দিন অধমা স্ত্রীজাতের হস্তের কুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া স্পর্শদানে ধন্য করিয়াছেন। দোল-যাত্রার ষোড়শোপচারে পূজা নির্ব্বাহের পরে সেই মাহেন্দ্রলগ্ন উপস্থিত হয়।

মেয়েরা হোলিখেলার মধ্যে সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে স্পর্শ করিয়া আবীর মাখাইবে।

সকলে রংএ রঞ্জিত হইয়াছে, শুধু বাকী রহিয়াছে শুভ্রবসনা সরস্বতী। সে কাহাকেও আবীর দেয় না, কাহারও নিকট হইতে লয়ও না।

আজকাল কচিরাম হইয়াছে তাহার হাতের লাঠি। নিয়মের কাজে কচিরামের জুড়ি নাই। সেই কারণে বিন্নু একটু গা-ঝাড়া দিয়া বাঁচিতেছে।

ঢোল কাঁসী বাঁশী অনবরত বাজিয়া চলিয়াছে। ঠাকুমার উলুধ্বনিরও বিরাম নাই। তিনি আসন লইয়াছেন মণ্ডপের অন্দরের সিঁড়িতে। এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে রং মাখিয়া তরু আসে নাচিতে নাচিতে, "মেজদি, মেজদি, বৌদি, ছোটঠাকুমা, তোমরা সবাই এস নারায়ণকে আবীর দিতে। ঠাকুরমশায় ডাকছেন। মাকে ডেকেছি, সেখানে ফণি ঠাকুরকে রান্নার পাহারায় রেখে মা গেছেন পুকুরে হাত-পা ধুতে।"

তরুর আহ্বানে সকলের হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইবার কথা স্মরণ হইল। সকলে স্নান সারিয়াছে ভোরে, কিন্তু রংএ আবীরে কি মুর্ত্তি হইয়াছে এক এক জনার। যেমন পরিচ্ছদ তেমনি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত এক অভিনব বেশ।

বিহু মধুমতীকে বলিল, "ঠাকুরঝি, এমনি মুর্ত্তিতে আমরা মণ্ডপে যাব কেমন ক'রে? মাথায় গায়ে সাবান দিতে হবে, কাপড়-জামা ছাড়তে হবে।"

মধুমতী বলে, "এখন তার সময় নেই বৌ, পরিষ্কার হ'লেই কি কেউ পরিষ্কার থাকতে পারবে? ভোগ না সরা পর্য্যন্ত চলবে এই তাণ্ডব। যে-দিনের যে বেশ, তাতে লজ্জা কি? নারায়ণকে আবীর দিয়ে এসে পরিষ্কার হ'লেই হবে?"

ছোটঠাকুমার সহিত সরস্বতী ঘরের বাহির হইয়া মধুমতীকে বিরস মুখে তাড়া দিতে লাগিল "যাবি নাকি আবীর দিতে, চল, কাজের বাড়ীতে এমন হোলি নিয়ে মত্ত হয়ে থাকা আমি জন্মে দেখি নি। র'য়ে-স'য়ে সব করতে হয়। কেবা বাড়ীর বৌ, কেবা মেয়ে, কাণ্ডকারখানা দেখে ঘেন্না করে। মা ওদিকে একঘর রান্না নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেদিকে কারোর নজর নেই। এদিকে আমি চোখে সরষে ফুল দেখছি। এঁরা হোলিখেলা খেলছেন।"

মধুমতী হাসে, "বছরকার একটা দিন রাগ ক'রো না মেজদি, তোমার ঘরে ত কচিরাম মোতায়েন, তবু সরষে ফুল? ছোটঠাকুমা ত সমানে মা'র সঙ্গে রয়েছেন। নারায়ণকে আবীর দেওয়া হলে আমরা নেয়েধুয়ে দিচ্ছি কাজে হাত। আনন্দে নিয়ম নাস্তি, আজকের দিনে কারোকে কিছু বলতে নাই।"

সরস্বতী উত্তর না দিয়া থরথর করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিল।

সিঁড়ির সামনে উপনীত হইয়া সকলে হাসিয়া অস্থির, ঠাকুমার একি বেশ! সাদা চুল আবীরে রাঙা হইয়াছে, লাল মুখের এক গালে বেগুনী রংএর ছোপ। আর একগালে মেজেণ্টা রং মাখা।

ঠাকুমা সানন্দে প্রচার করিলেন, "ক্ষিতি তরু সুমু তাঁহাকে সাজিয়ে দিয়েছে। ভালবেসে নাতনী-নাতিরা দিয়েছে, ধুলেই চলে যাবে রং-চং। মণিমালা, তুই আমার দিকে তাকিয়ে ঘোমটার ভেতরে ফিক ফিক করে হাসছিস কেন লো? আমি—'রাইয়ের অঙ্গের ছটা দেখে কালো হ'লাম গোরা।"

দুপুর গড়াতে দ্বাদশ গোপাল ও গোবিন্দের ভোগ সরিল। বিরাট ভোগ নিরামিষ যতরকম হইতে পারে তাহার কিছুই বাদ যায় নাই। যিনি দিবার মালিক, তিনি অযাচিতভাবে অজস্র ঢালিয়া দিয়াছেন মনোরমাকে, তাই তিনিও তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছেন ভারে ভারে।

ভোগের বাজনা শুনিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আসিতে লাগিল। সাধারণ লোক ও অনুগত অভ্যাগতে ভিড় হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিতের দল 'বোষ্টমকুল তাঁতীকুল' দুই দিকেই বজায় রাখিতে ভোজনে বসিয়া গেল। প্রথমে নারায়ণের ভোগ খিচুড়ি ভাজা নানাপ্রকার তরকারি দিয়া আরম্ভ হইয়া গেল ভোজন পর্ব্ব। তাহার পরে চলিল মাছের সমারোহ। মৎস্যপ্রধান দেশ, মাছ না হইলে কাহারও খাওয়া তৃপ্তিকর হয় না। সেই-জন্য মহেশবাবু দোলে মাছের ব্যবস্থা রাখেন।

আহারান্তে এক দল উঠিয়া যায়, আর এক দল আসিয়া আসন লয়। দল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধিদোলের সময় উপস্থিত। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিল ভিতরে-বাহিরে। স্থানে স্থানে স্থাপিত হইল ডেলাইট। কাগজের ফুলমালার সহিত কাননের ফুলমালা দেবদারু ও আম্রপত্রের মিশ্রণে মণ্ডপের আঙ্গিনাকে ভ্রম হইতেছিল ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া। আবীর উড়িতে লাগিল ধুলির আকারে।

সন্ধিদোলের ঢোল কাঁসী বাঁশী তান ধরিল, ঠাকুমা উলু দিলেন। রূপার পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের সলতে জ্বালানো হইল। ধূপে দীপে কর্পূরে জলশঙ্খে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতি হইল। মখমলের ঝালরযুক্ত পাখায় ও রূপার চামরে বিগ্রহকে সুশীতল করিয়া সন্ধিদোল সমাধা হইল।

সারাদিনের অভুক্ত পুরোহিতের আহারের পরে

দুই ঠাকুমা সরস্বতী আহারে বসিল। আজ বিধবারা পূর্ণিমার উপবাস করিয়াছেন। মনোরমা খাইতে বসিলেন বধূ ও মেয়েদের লইয়া। থালায় থালায় প্রসাদ বাটিতে লাগিল পাচকরা। ইহাদের যেমন খাওয়া তেমনি গৃহে লইয়া যাওয়া। অপরিযাপ্ত আয়োজন, অপরিযাপ্ত বিতরণ। সকলে পরিতৃপ্ত, পুলকিত।

মধুমতীর প্ররোচনায় এত রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ সাবানে মার্জ্জিত করিয়া বাসন্তী রংএর শাড়ী পরিয়া বিনু শয়নগৃহে ঢুকিল তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। পূজাপ্রাঙ্গণে খোল-করতালের সহিত ভজন গান থামিয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে বিশ্ব-চরাচর।

ছোট ঠাকুমা তাঁহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আলো আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে আলমারির পিছনে। গৃহের সবগুলো জানালা উন্মুক্ত। গবাক্ষ-পথে অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নাধারা প্রবেশ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে মেঝেয়, বিছানায়। উতলা বাতাসে রহিয়া রহিয়া ঝাড়লণ্ঠন দুলিতেছে ঠুং ঠুং শব্দে, কুরচি ফুল অঞ্জলি দিতেছে বাতায়ন-তলে। সুবাসে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

বিনু শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল তাহার আবাল্যের দোলের স্মৃতি। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত হইবার পরে যাঁহাকে সে এই দিনে আবীর মাখাইয়া পরশ করিয়াছে এবার শ্রীধরের পরিবর্ত্তে তাহার আবীর লইলেন লক্ষ্মীজনার্দ্দন। তিনি ইনি ত ভিন্ন নন, এক; কিন্তু তবু সেখানকার দোলযাত্রা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া ভাসিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে কেন? শ্বশুরালয়ে বিনুর এই প্রথম দোল। দোলে এখনও সে স্বামীকে পায় নাই। সেই কারণে তাহার অভাব বোধ বিনু অনুভব করিতে পারিতেছে না। সে অভাব বোধ করিতেছে তাহার স্বজনদের পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম না করিবার। আর শ্রীধর, তাঁহাকে এবার মালা-চন্দন আবীর দেওয়া হইল না। ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সে যে মনে মনে তাঁহারই শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন কি? না জানিলে কি তাঁহার চলে? তিনি যে অখণ্ড অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, একমাত্র সত্য ধ্রুব। মানব জীবনের ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বিরহ-মিলন জন্ম মৃত্যু তাঁহাতেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মোহে ভ্রান্তিতে কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তবু তিনি বিরাজ করিতেছেন সর্ব্বজীবে।

ধীরে ধীরে বিনুর আঁখিপাতে নামিয়া আসিল শান্তিদায়িনী নিদ্রা। বিনু উদাস হৃদয়ে স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিল—

বসন্ত বিদায় লয় নাই, তরুমূল ছাইয়া গিয়াছে ঝরাফুলে। পাখীরা মেলা বসাইয়াছে শাখে শাখে। ফুল ফোটার অবসান হয় নাই। বসন্তের সহিত খেলা করিতে আসিয়াছে চপল-চঞ্চল কালবৈশাখী মেঘ। ক্ষেপা দুষ্ট ছেলেটা বড় বড় গাছের মাথা নোয়াইয়া মড় মড় শব্দে ডাল ভাঙ্গিয়া রাজ্যের ঝরাপাতা ধূলা-বালি উড়াইয়া নাচিতেছে তাধিন-তাধিন। টিনের চাল ঝন ঝন টিন কাঁপাইয়া চিলেকোঠার আস্তর খসাইয়া পাগলটা হাসিতেছে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ।

কতদিনের পরে বিনুর ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঝড়ের তাড়নায় বেলোয়ারী ঝাড় দুলিয়া দুলিয়া বাজনা বাজাইতেছে ঝুন ঝুন। মোমবাতির শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একবার নিবু নিবু হইতেছে আবার প্রজ্জ্বলিত হইতেছে উজ্জ্বলতর হইয়া। ঘরের মেঝেয় শয্যায় আসবাবের গায়ে প্রদীপের রশ্মি ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, দেয়ালে কাল কাল ছায়া কাঁপিতেছে থরথর করিয়া। প্রসাদ তাহার বিছানায় শুইয়া মেঘদূত পড়িতেছে। বিরহী যক্ষ উত্তর মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইতেছে প্রিয়ার সন্নিধানে। প্রসাদের কি উদাত্ত ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর, সেই স্বরের প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উত্তর মেঘ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল রিম রিম ঝিম ঝিম। রিম রিম ঝিম ঝিমের সঙ্গে শিলাবর্ষণ। টুপ টুপ শব্দ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল পড়িতেছে টিনের ঘরের চালে।

কুরচি গাছের গা-ঘেঁষা বেলে-আমের গাছ। বেলের গন্ধে ভরপুর। এবার আম ফলিয়াছে প্রচুর। আমের জাত বৃহৎ ইহারই মধ্যে আমগুলি ছোট ছোট বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। কালবৈশাখীর দাপটে আম পড়িতেছে ধুপ ধুপ করিয়া।

বিনুর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নাই বিরহিণী যক্ষ বধূর প্রতি, সে স্বামীর নিকটে মিনতি করিতে লাগিল, "তুমি আলোটা একটু ধরো না আমার সঙ্গে, আমি আম কুড়িয়ে আনি।"

"ঝড়-বৃষ্টিতে আম কুড়োবে কি বিনু? শোন বিরহী-যক্ষের কথা—।"

"ঝড়-বৃষ্টি যে থেমে গেল, কালবৈশাখীর আসতেও সময় লাগে না, যেতেও সময় লাগে না। আমি বেশি-দূর যাব না। ঐ বেলে-আমতলা থেকে আম কুড়িয়ে

আনব। ঝড়ের রাতে আম কুড়োতে আমি বড় ভালবাসি। উঠে চল, আলোটা একটুখানি ধর।”

“বৌ, উঠে পড় এখন, সকাল হয়ে গেছে। আজকেও তোমাদের কম কাজ নেই। সেই পুজো ভোগ, লোকজনও কম খাবে না, তবে কালকের মতন নয়।”

বিনু দুই হাতে চোখ মুছিয়া ছোট ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করে—“ঝড় জল কি থেমে গেছে ছোট ঠাকুমা?”

“ঝড় জল সে কি বৌ, তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখছিলে? আজও বায়নরা ভোর বাজাচ্ছিল, তাদের কাঁসি বাঁশীর রব তোমার ঘুমের ভেতরে বাদলঝরা মনে হয়েছিল। এখন ঝড় জলে কাজ নাই বাপু, ছেলেরা কত আশা ক'রে গানের আসর সাজিয়েছে, তাদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তোমাদের আজ হয়ে গেলেই চুকে-বুকে যাবে, কিন্তু শ্যামরায়ের পঞ্চম দোলের বাকী রয়েছে তিন দিন। মেলা বসেছে মাঠে, কত লোকজনের আনাগোনা। কত আহ্লাদ-আমোদ। কালবৈশাখী সুরু হ'লে নষ্ট হবে সব। আমি ইন্দ্র দেবতাকে দই-খই মানত করেছি। ভালভাবে দোল মিটে গেলে পুজো দেব।”

ছোট ঠাকুমা কথা শেষ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিনু।

পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন। আজও পূজা ভোগে আড়ম্বর কম নয়। তবে নেমন্তন্নের সংখ্যা বেশি না। মনোরমা ও ছোট ঠাকুমা ভোগ চড়াইয়া দিয়াছেন। এই ভোগেই বিধবাদের চলিবে। সেই জন্য বিনু রান্না ছুঁইতে পারিতেছে না, কাঁচা জিনিসের যোগাড় করিতেছে।

পূজায় বসিবার সময় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঝাজর বাজনা বাজিয়াছিল, ঠাকুমা উলু দেওয়া সাঙ্গ করিয়া ঘাটের সোপানে বসিয়া মাথা চুলকাইতেছেন।

গতকাল যে আলস্য না করিয়াছে সেই ঠাকুমার শুভ্র কেশদাম অনুরঞ্জিত করিয়াছে মুঠো মুঠো আবীরে। তাতে প্রতিদিনের ন্যায় প্রাতঃস্নান হইয়াছে তাঁহার, তবু মাথা ঘষিয়া আবীর ধুইবার শক্তি হয় নাই।

মধুমতী নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, ঠাকুমাকে মাথা চুলকাইতে দেখিয়া বলিল, “মাথা-ভরতি আবীর নিয়ে চুলকিয়ে খুন হচ্ছ ঠাকুমা, একে পাকাচুল, তায় আবীর জল লেগে চিরবির করছে। চল আমার সঙ্গে ঘাটে, তোমার মাথা আমি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দেইগে। ছত্রিশ-কোটি দেবতার পুজো শেষ হ'তে সময় লাগবে, তার আগে তোমার ঘণ্টা বাজবে না। চল।”

ঠাকুমা জবাব না দিয়া নিজের মনে বলিতে লাগিলেন,

“সাধুপাপী তার গড়া, তাদের বোঝা সেই বয়,
ভাল মন্দ যাই কই, জানি সে যে দয়াময়।”

“বাবাঃ কি ভক্তি-বিশ্বাস, বাইরে—”

মধুমতীর কথা শেষ হইল না। তরু দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, “সেজদি শীগ্‌গির চল পুকুরপাড়ে। বৌদিকে ডেকে এসেছি, গাছের আড়াল থেকে দেখ গে, রাস্তায় মেটেহোলির রাজা বেরিয়েছে। ঠাকুমা, তুমিও চল, দেখবে কি কাণ্ড!”

তরুর ‘কাণ্ড’ সোঝা নয়। রাস্তা সাধারণ শ্রেণীর ছেলের দলে ভরিয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশের বাড়ী হইতে ঝি-বৌরা হোলির রাজা দেখিতে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে।

হোলির রাজা সাজান হইয়াছে একটি আঠার-উনিশ বয়সের গৌরবর্ণের ছেলেকে। তাহার এক গালে চুন আর এক গালে কালি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। মস্তকে মুকুট হইয়াছে ভাঙ্গা মাছের খালুই (চুব্‌ড়ি), গলায় ছেঁড়া জুতার মালা। রাজাকে বসান হইয়াছে গাধার ওপরে পিছনে মুখ করিয়া। মাটি ও গোবর-গোলা জলে পিচকারি চলিতেছে পরস্পরের গায়ে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে হোলির গান হইতেছিল।

“যায়রে যায় হোলির রাজা, উল্টা গাধায় যায়,
দেখিস যদি হোলির রাজা, আয়রে তোরা আয়।
হোলিয়া হোলিয়া, হা রে রে হোলিয়া।
লাল হইল তরুলতা, লাল যমুনার জল
লাল হইল অষ্টসখী, অষ্টসখার দল।
হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।
লাল হইল গৌরীবাই, লাল বৎস ধেনু
লাল হইল কালাচাঁদ নন্দের ব্যাটা কানু।
হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।”

দুষ্ট ছেলের দল হোলির রাজার মুখে বিড়ি ধরাইয়া দিয়াছে। বিড়ি টানিতে টানিতে রাজা গ্রাম পরিভ্রমণে চলিয়াছেন। মুখে গর্ব্বিত হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে বিকটস্বরে গান গাহিতে গাহিতে রাজা-প্রজারা অগ্রসর হইয়া গেল।

মধুমতীরা পথের পাশের ঘন বন হইতে বাহির

হইয়া বসিল পুকুরের চাতালের ছোট ছোট বসিবার ধাপে। ছায়াঘন চাতালে ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। শরীর যেন জুড়াইয়া দেয়।

ঠাকুমা একঝলক হোলির রাজা দর্শনান্তে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তখনই ছুটিয়া গিয়াছেন মণ্ডপের সোপানে। কি জানি কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে রিণ রিণ রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে।

মধুমতী বিনু ও তরুকে লইয়া ধাপে বসিয়া জিরাইতে লাগিল। তাহার স্বভাব আয়েসী, এখন আয়েসের ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দাসীরা চারিদিকে জটলা করিতেছিল।

মধুমতী বলিল, "হোলির রাজা যাকে সাজিয়েছে, ও কি এ গাঁয়ের ছেলে? কেমন যেন নতুন নতুন লাগল?"

পসারী বলে, "ঠাকুর্ঝি ঠিক ধরিলা, ও ছায়ালডা এ গেরামের লয়। আচার্য্যি বাড়ীর গুরুপুত্তুর, দোলের পার্ব্বণ নইতে আইছে শিষ্যবাড়ী। পাড়ার পোড়ার মথুরা ওয়ারে করিছে হোলির রাজা।"

কামিনীর মা আতঙ্কে সাড়া, "কয় কিলো, বাছি বাছি গুরুপুতরে হোলির রাজা সাজায়। ওয়ারা হইল কি? সাপের কি ছোট বড় আছে? গুরুকুলের পিতি এত বড় অপমান ইয়ার সাজা পাইবে না কেউ?"

তরু বলে, "যেই না আমার গুরুপুত্র, তার আবার সাজা। আমি আচার্য্যিদের চুলির কাছে শুনেছি ছোঁড়াটার বাপ নাই, মা পাঠিয়ে দেয় শিষ্য বাড়ী পাল-পার্ব্বণে টাকা আদায় করতে। কেউ কেউ আবার ঐ আকাটটার কাছ থেকে গুরুবংশ বলে মন্ত্র নেয়। ও লেখাপড়া কিছু জানে না, তার ওপর নেশাখোর। আহা, কি গুরুপুত্র, হোলির রাজা সাজিয়ে বেশ করেছে।"

গুরুপুত্রের প্রতি তরুর অবজ্ঞামিশ্রিত উক্তিতে কেহ সায় দিতে পারিল না। গুরুপুত্র যেমন, তেমন হোক না কেন, গুরুবংশের সে বংশধর। বিষধর সাপের ছোট-বড় নাই।

ইহা লইয়া আর কাহারও মাথা ঘামাইবার অবকাশ হইল না।

প্রকৃতপক্ষে আজ হইতেই দোলের মেলার আরম্ভ। এ মেলা শ্যামরায়ের পঞ্চম দোলের পরেও কয়েক দিন থাকিবে। ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য লইয়া দোকানীরা যাইতেছে শ্যামরায়ের মন্দিরের মাঠে। কেহ কেহ গরুর বা মহিষের গাড়িতে নানাবিধ সামগ্রী লইয়া চলিয়াছে মেলায়। সেই দিকে সকলের উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত হইল। ঝাঁকা ভরিয়া যাইতেছে শোলার কাকাতুয়া টিয়া পাখীর শোলার খাঁচা। চিনির হাতী-ঘোড়া পশু পাখী ও বড় বড় ইলিশ মাছ। কাঠের বাসন-কোশন খেলনা। কাঁচের চুড়ি, টিনের বাঁশী। লোহার তৈজসপত্র। বেত ও বাঁশের ধামা ফুলকাটা তাঁতের শাড়ী, ছিটের জামা। ঝুড়িভাজা, তেলেভাজা, জিবেগজা ও জিলেপি ইত্যাদি লইয়া দোকানী পসারীরা মেলায় চলিতেছে। প্রভাত হইতে মেলা জমাইতে ঢোলক বাজিতেছে।

বিনু মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেজ ঠাকুরঝি আপনারা শ্যামরায়ের মেলা দেখতে যাবেন না?"

মধুমতী ঘাড় নাড়ে, "না বৌ, বড়দের মেলায় যাবার রেয়াজ নেই এ গাঁয়ে। ছেলেবেলায় গিয়েছি। এখন তরু যাবে কামিনীর মা'দের সঙ্গে।"

কামিনীর মা হাসিল, "হ, ছোটঠাকুর্ঝি কারোর সাথে যাওনের তোয়াক্কা রাখে নাকি? এইদণ্ডে না মেলা থাকি ঘুরে আইল।"

তরু ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া জবাব দিল, "আমি কি মেলা দেখতে গিয়েছি? গিয়েছিলাম শ্যামদাসীর দল বন্দর থেকে এসেছে কি না তাই দেখতে?

মধুমতী প্রশ্ন করে, "এসেছে নাকি? কি দেখে এলি?"

"দেখলাম তার বাজনাদাররা বাজনা নিয়ে এসে গেছে। ওদের নামিয়ে দিয়ে ফের পাঁচখানা গরুর গাড়ি গেছে তাদের আনতে। শ্যামরায়ের মেলায় শ্যামদাসী তিন দিন গান গাইবে। আচার্য্যদের গোলা-বাড়ীতে ওরা বাসা নিয়েছে। দেখলাম শ্যামদাসীর দরোয়ানটা বাড়ী বাড়ী থেকে ফুল চেয়ে আনছে সাজি ভরে ভরে। ওরা নাকি অন্য সাজ না করে ফুলের সাজ করে। শ্যামদাসীর কীর্ত্তন এর আগে ত আমাদের বাড়ীতে হয় নি, তাই দেখি নি।"

মধুমতী বলে, "দেখবি কি? ও ত মোটে দু'ই বছর হ'ল এ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করছে। কেউ কেউ বলে ওর শ্বশুরকুলের গুরু নাকি গোঁসাইদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সেই জন্যেই নাকি শ্যামরায়কে গান শোনাতে ওর এত আগ্রহ। কে জানে কোথায় ছিল ওর শ্বশুরবাড়ী, কোথায় ছিল বাপের ঘর। সে খবর কেউ জানে না, এখন বৃন্দাবনের শ্যামদাসী তাই জানে সবাই।"

হঠাৎ পুকুরে সরস্বতীর আগমনে সকলের আলাপ-আলোচনা থামিয়া গেল। সকলে ত্রস্তেব্যস্তে বাড়ীর পথ ধরিল।

সরস্বতী রাগতস্বরে কহিল, "কাজের বাড়ীতে ঘাটে বসে সকলে দরবার করছে। ভোগ রান্না হয়ে এল, আমি ভোগের ঘরে ভোগের জায়গা করতে যাচ্ছিলাম কুকুরের বাচ্চা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। ঐ ভয়েই ঘরের বার হতে চাই না। এখন আবার নাইতে হবে আমাকে।"

সরস্বতী আপনার মনে গজর গজর করিতে করিতে জলে নামিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে নারায়ণের ভোগ সরিল বাজনা বাজাইয়া। আজ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম, কিন্তু অপর লোকের তেমনি ভিড়। উহারা দোলে দুই-তিন দিন ভূরিভোজন করিয়া থাকে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ধার ধারে না।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসিবে, সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব সকলে তাড়াতাড়ি আহার-পর্ব্ব মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গ্রামস্থ সকলকেই কীর্ত্তন শুনিবার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইল মণ্ডপের চওড়া বারান্দার দুই দিকে চিক টাঙ্গাইয়া। তাহার নীচে ভদ্রমহোদয়দের বসিবার প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। তাহার পরেই আঙ্গিনা ঢাকিয়া সতরঞ্চি প্রসারিত।

বিগ্রহের সম্মুখভাগ খোলা, যাহাতে তাঁহার কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত রূপার চৌদলে দোলায়মান মূর্ত্তিটি প্রত্যেকের দৃষ্টিপথে পড়িতে পারে।

কীর্ত্তনের পরে হরিরলুট দেওয়া হইবে, ধামা ধামা বাতাসা আনা হইয়াছে। প্রকাণ্ড দুই পরাতে আবীর রক্ষিত হইয়াছে। চাকররা পান সাজিতেছে ঝুড়ি ভরিয়া।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে মণ্ডপের অঙ্গন আলোয় আলোময় হইয়া গেল।

বাদকের দল সভাসৌষ্ঠব করিয়া বসিল। সারি সারি খোল করতাল খঞ্জনী বোলা হারমোনিয়ম ঢোলক বাঁশী বাজিতে লাগিল মধুর নিক্কণে। দলে দলে লোক আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। ক্ষিতি পুরুষ-মহলে, তরু মেয়ে মহলে প্রসাদী আবীরে প্রত্যেকের ললাটে তিলক পরাইয়া হস্তে জোড়া পানের খিলি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

মধুমতী গানের পরম ভক্ত, সে সকলের আগে বিনুকে লইয়া জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে। দুই ঠাকুমা সামনের দিকে পা ছড়াইয়া আসন লইয়াছেন। সরস্বতীও আজ অনুপস্থিত নাই। মনোরমাই কেবল স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। সকলকে সমাদর করিয়া আসন দিতে হইতেছে।

বাঁশবনের মাথায় চাঁদ দেখা যাইতেছে রূপার থালার মত। বসন্তের বাতাস বহিতেছে মন্দমধুর।

বাজনা যখন গভীরভাবে জমিয়া উঠিয়াছে তখন আসরে অবতীর্ণ হইল শ্যামদাসী তাহার দল লইয়া। দলের দশ বারটি মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে কয়েকটির ব্রজ-রাখালের বেশ। রসকলি মস্তকে বোষ্টম চূড়া, তাতে ফুলের মালা, নাকে রসকাটি ললাটে তিলক। ফুলের আভরণ। বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী ও উত্তরীয়। পায়ে নূপুর।

শ্যামদাসীকে দেখিয়া বয়েস অনুমান করা কঠিন। টানা টানা চোখে-মুখে একটা কোমল অপার্থিব ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাদের অনুরূপ তাহারও বেশভূষা সেই বোষ্টম চূড়া মাল্যভূষিত। সেই তিলক কণ্ঠে তুলসীর মালার সহিত ফুলের মালা দোলায়মান। বৃন্দাবনী ছাপা সরু লালপাড় ধুতি পরিধানে। গায়ে উত্তরীয়।

শ্যামদাসী প্রথমে বিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মঞ্চের প্রতি চিত্রে ও তুলসী মূলে প্রণত হইয়া হাত তুলিয়া বিপুল জনতাকে নমস্কার করিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া। ক্ষিতিরা কয়েকজনা মিলিয়া মুঠা মুঠা আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল চারিদিকে।

শ্যামদাসীর কীর্ত্তনের পদ্ধতি অনেকটা গ্রাম্য ভাসান যাত্রার মতন, বালক শ্রীকৃষ্ণ-বালিকা রাধিকা। মঞ্চের পাশে তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া শ্যামদাসী শত বীণা বেণু রবে তান ধরিল—

"উজ্জ্বল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হিলন্ কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
জয় যদুকুল উজ্জ্বল নিধি চন্দ।
ব্রজকুল আকুল আনন্দ কন্দ॥
ভুরত মদন মধুভাঙ বিভঙ্গ।
বিসম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
শুধু সুধাময় মধুরিম হাস।
জগজন মোহন মুরলি বিলাস॥
চূড়হি উড়ত রুচির শিখণ্ড।
টলবল কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥
অবনি বিলম্বিত বাণী বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহিরমাল॥

তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ॥"

জনতা মন্ত্রমুগ্ধ। এ কি সঙ্গীত, না সুধা বর্ষণ?

ব্রজবালক-বালিকারা সুদূরে তাল দিয়া হেলিয়া দুলিয়া থমকি থমকি নাচিতেছে মঞ্চ ঘেরিয়া। আবীর উড়িয়া যাইতেছে ঊর্দ্ধে। চন্দ্র কিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে নিম্নে। নভোমণ্ডল ও ধরণীতল আজ যেন এক হইয়া গিয়াছে। আর দুই-এর দূরত্ব নাই, ব্যবধান নাই। দুঃখ-বেদনা বিরহ-বিচ্ছেদ ভুবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। হৃদয় হইয়াছে মধুর বৃন্দাবন। সেইখানে শাশ্বত অনন্ত অসীম হইয়া বিরাজ করিতেছেন বিশ্বের অধিপতি বিশ্বদেব।

গৃহের নিবিড় বন্ধন হইতে একদিন যিনি সে মেয়েটিকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন সে আজ সার্থক হইয়াছে তাঁহারই নাম গান গাহিয়া। তাহার দেহমন ধৌত হইয়া গিয়াছে নামের মহিমায়। সে আজ শ্যামদাসী নহে শ্যাম-সোহাগিনী।

মৃদঙ্গের সংযোগে খঞ্জনি মধুর বোল তুলিয়াছে ব্রজবালক-বালিকার সহিত শ্যামদাসী গাহিতেছে—

হো হো হোরি তুমুল উতরোল।
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল যভে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥

ছোট ঠাকুমা সঙ্গীতে বিভোর হইয়া মালা জপিতে-ছিলেন। বিহ্বল ঠাকুমার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সরস্বতী তন্ময়। জনতা নীরব স্তব্ধ।

ধীরে ধীরে মত্ত মধুর দোল পূর্ণিমার উৎসব-মণ্ডিত রজনী গভীর হইতে গভীরতম হইতে লাগিল। পূর্ণিমার উজ্জ্বলতর পূর্ণচন্দ্র বাঁশবনের মাথার উপর হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল দেবদাস তরুর সুউচ্চ শিরে। পবন তেমনি উতলা পুষ্পগন্ধী। আবীর তখনও তেমনি উড়িতেছে ধূলিকণা হইয়া। কল্পনার স্বর্গ মর্ত্ত্যের সহিত নিবিড় হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। মধু বৃন্দাবন আর দূরে নাই। সকলের অন্তরের অন্তস্থলে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে বিরাজ করিতেছেন চিদ্‌ঘনশ্যামসুন্দর।

ভাবে মুগ্ধ বিমুর চৈতন্য যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, জীবনের সমস্ত সত্তা ধাবিত হইয়াছে ঐ শ্যামল চির সুন্দরের চরণ-প্রান্তে।

গান সমাপ্তির দিকে হরির লুটের বাতাসা প্রস্তুত। তখনও শ্যামদাসী থামে নাই। বিশ্বে অমৃত প্রবাহ বহাইয়া দিতেছে—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলতে বড় ভালবাসি তাইতে সদা খেলতে আসি,
মনের মতন খেলার সাথী আর কোথায় পাব॥"

সমাপ্ত

হাস্যরসিক লিঙ্কন

জুলফিকার

মহাত্মাজীর নামে আমাদের দেশের অনেকেই যেমন ভক্তিতে মাথা নোয়ায়, মার্কিনীরা তাদের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের নাম শুনলেও তেমনি শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন শুধু আমেরিকার নন, সমগ্র বিশ্বের একজন মহামানব। ...মহাত্মা গান্ধী ও আব্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল ছিল। দু'জনের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পান নি। গান্ধিজী তবুও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং বিলাতে আইনের শিক্ষাও পেয়েছিলেন, কিন্তু এব লিঙ্কনের ক্ষেত-খামারের কাজ করে রীতিমত স্কুলে যাবার সুযোগ ঘটে ওঠে নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করার ভাগ্যও তাঁর হয় নি। নিজের চেষ্টায় যতটুকু লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেইটুকু মাত্র সম্বল করেই, তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন খ্যাতনামা বক্তা, একজন সুদক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সর্ব্বোপরি একজন মহান্ রাষ্ট্রনেতা হ'তে পেরেছিলেন। গান্ধীজী ও লিঙ্কন দুইজনেই ছিলেন নিরাড়ম্বর, সরল, দৈহিক লাবণ্য-বর্জ্জিত। উভয়েই আমরণ অসত্যের সঙ্গে আপোষবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছিল আততায়ীর নিক্ষিপ্ত গুলীতে।

আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে উত্তরাঞ্চলের লোকদের সঙ্গে দক্ষিণীদের দীর্ঘদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধে (Civil War) নিহত স্বদেশবাসীদের সমাধি-ক্ষেত্র উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে লিঙ্কন তাঁর সহজ ও সতেজ ভাষণে (Gettysburg Speech) গণতন্ত্রের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন,—the government of the people, by the people, for the people shall not perish from the Earth'—বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এত অল্প কথায়, এত সহজ ভাষায় এত গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর। লিঙ্কন যে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তা তাঁর লেখা বা ভাষণ পড়লেই বেশ বুঝতে পারা যায়।

লিঙ্কনের চেহারা ছিল শ্রীহীন, ইংরাজীতে যাকে বলে gawky। বেঢপ গড়ন, এলোমেলো চুল, গালভাঙ্গা মুখ, গুম্ফহীন উপরোষ্ঠ, চিবুক ও চোয়াল ঘিরে একগাদা দাড়ি। তাঁর ছবি যারা আগে না দেখেছে, তারা অনেকেই ভাববে, লোকটা হয় মেটেবুরুজের কসাই, না হয় কড়েয়া অঞ্চলের হেকিমী দাওয়াইয়ের দোকানী। বাইরের অচেনা মানুষেরা প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে ক্লাউন ভেবে বসলেও আশ্চর্য্যের কিছু ছিল না, কারণ পোষাকগুলো তাঁর গায়ে ঠিকমত ফিট্ করত না, ঢল্ঢল্ করত; কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনলে লোকেরা ভুলে যেত তাঁর কুশ্রীতা—এমন সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি। সুদর্শন না হ'লেও লিঙ্কনের মধ্যে ছিল একটা প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ, যা অনেক সময় তাঁর আপাত-কুৎসিততাকে ঢেকে দিত। তাঁর চেহারায় ব্যক্তিত্বের এই আভাস সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর উক্তি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। মিসেস লিঙ্কন বলেছিলেন,—

'...He is to be the President of the United States someday; if I had not thought so, I would never have married him, for you can see heis not pretty. But doesn't he look as if he could make a manificent President?'

নিজের সৌন্দর্য্যহীনতা বিষয়ে লিঙ্কন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আর তাঁর রসিকতা-জ্ঞানও ছিল প্রখর। একবার এক সভায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডগ্‌লাস তাঁকে দুমুখো লোক (double faced) বলে গাল দেওয়ায়, তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেছিলেন,—

'Well. I leave it to my audience . . . . If I had another face. do you think I would wear (নিজের মুখে হাত বুলিয়ে) this one?'

দেখা যায় অনেক গম্ভীর ও ভারিক্কি গোছের লোকের মধ্যেও দিব্যি রসিক-মন বাসা বেঁধে আছে। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখুজ্যে, আশুতোষ (তাঁর নাগরা জুতোর খোঁজে রেলের কামরায় ইংরেজ সহযাত্রীর কোট বাইরে ফেলা দেওয়ার গল্পটা অনেকেই শুনে থাকবেন) সবাই খুব সুরসিক ছিলেন। লিঙ্কনের চেহারা রসকষ-হীন কাঠখোট্টা গোছের হ'লেও তাঁর অন্তরে ছিল রসের অফুরন্ত ফল্গুধারা।

তাঁর রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন দেশের অবস্থা আদৌ শান্ত ছিল না। তাঁকে সর্ব্বদাই দুর্ভাবনা ও অশান্তির মাঝে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর রসিকতা জ্ঞান তাঁকে অনেক সঙ্কটের মধ্যেও বিভ্রান্ত বা দিশেহারা হ'তে দেয় নাই। গভীর কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেই, তিনি হাস্য

রসের বই নিয়ে বসতেন এবং হাসি-তামাসার আমেজে মনটাকে হাল্কা করে তুলতেন। আপিসেও সময়ে-অসময়ে হঠাৎ রসিকতা করে বসতেন। তাঁর ভাণ্ডারে অনেক মজার মজার গল্প ছিল, জায়গা বুঝে তাদেরই দু' একটা ছাড়তেন, শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলতে।

অনেক সময় তিনি রীতিমত চটুল হয়ে উঠতেন। বিলাতের SATURDAY REVIEW একবার তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল, 'He was not only the First Magistrate but Chief Joker of the land." লিঙ্কন যখন হাসতেন, তখন দিলখোলা অট্টহাস্যে চারিদিক মুখরিত করে তুলতেন,—ঘর-ফাটানো হাসি যাকে বলে! তাঁর এই হাসির কথা বলতে গিয়ে সমসাময়িক একজন বলেছিলেন,—

'The neigh of a wild horse in his native prairie was not more hearty than Lincon's laugh.'

আব্রাহামের রঙ্গপ্রিয়তা সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু আছে।

আমেরিকায় তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। উত্তরাঞ্চলের, অর্থাৎ ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদকামী দলের নেতা হচ্ছেন লিঙ্কন, আর দাসত্ব প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের যে চারিটি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল, তাদের নেতৃত্বে করছিলেন জেফারসন ডেভিড।

দুইজন শান্তিকামী (Quaker) মহিলা যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, 'আমার মনে হয় জেফারসনের দলই জিতবে। জেফারসনের ঈশ্বরে অচলা ভক্তি। নিয়মিত প্রার্থনা করে থাকেন তিনি।'

অপর মহিলা—তা' আব্রাহামও ভগবদ্ভক্ত। তিনিও যে প্রার্থনা না করেন, এমন নয়।'

প্রথমা—'করেন বটে, তবে ভগবান ত ভাবতেও পারেন ওটা আব্রাহামের রসিকতা।'

আব্রাহাম যখন ওকালতি করতেন, রসিকতা ও চুটকী গল্পে আদালতের সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। যখনই কোন মোকদ্দমায় কোর্টের আবহাওয়া একঘেয়ে হয়ে উঠত, তখন যদি আব্রাহাম সেখানে উপস্থিত থাকতেন,জজ সাহেবেরা ইচ্ছে করেই তাঁকে একটু খুঁচিয়ে দিতেন। আব্রাহামের মুখ থেকে দু' একটা এমনই মজার কথা বেরুত তখন, যে, মুহূর্তে কোর্টের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে হাসির হররা জেগে উঠত।

কিশোর লিঙ্কন যখন মেণ্টর গ্রেহাম নামক গ্রাম্য শিক্ষকের কাছে পড়তেন, তখনই তাঁর রসিক-মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। মেণ্টর তাঁকে তখন Verb-এর Mood পড়াচ্ছেন। Imperative Mood-এর উদাহরণ দিতে বলায়, লিঙ্কন বলে উঠলেন, 'Go to hell!' মেণ্টর বললেন, 'এটা কি একটা ভদ্ররকমের উদাহরণ হ'ল?' তখন লিঙ্কন বললেন, 'ভাল উদাহরণ চান ত, বাইবেলের ভাষায় বলতে হয়, 'Amen (So be it!)

একবার নির্ব্বাচনের আগে বন্ধু জস্থুয়া স্পীডের সঙ্গে এব লিঙ্কনের কথা হচ্ছিল। জস্থুয়া লোকটিও সুরসিক।

এব—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভুল করে যদি ওরা আমাকেই মনোনীত করে, তবে নির্ব্বাচনে কি আমার জয়ের কোন আশা আছে বলে মনে কর?

জস্থুয়া—আমার মনে হয় তোমার চমৎকার সুযোগ আছে। নির্ব্বাচনে চারজন প্রার্থী যখন ঠেলাঠেলি করবে, সেই ফাঁকে অজানা ঘোড়াটা হঠাৎ বাজী জিতে যাবে।

এব—অজানা ঘোড়াটা ভুল পথেও ত যেতে পারে।

জস্থুয়া—পারে বই কি, তোমার পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। তোমার ওপর আমি কানাকড়িও বাজী রাখতে রাজী নই।

এব—আমার মত একটা বুড়ো ঘোড়াকে রেসের তেজী ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করাটাও স্রেফ পরিহাস বলেই মনে হবে। ...হ্যাঁ, তবে আমি অনেকগুলো ভাল সওয়ার পেয়েছি—মেণ্টর গ্রেহাম, বাওলিং গ্রীণ, বিল হার্ণডন, তুমি জস্থুয়া স্পীড, আর আছে মেরী (মিসেস লিঙ্কন)—অবিশ্যি এদের মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত সওয়ার হচ্ছে মেরী।

একবার তাঁর একজন রাজনৈতিক সহকর্মী তাঁকে একখানা বই পড়তে দেন, গ্রীক ইতিহাসের উপর। ওটা পড়তে গিয়ে লিঙ্কনের খুবই নীরস ঠেকল। বন্ধুকে সে কথা জানাতে ভদ্রলোকটি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি মিঃ প্রেসিডেণ্ট! এই লেখকের মত গ্রীক ইতিহাসে এতবড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত খুব কমই আছেন। তাঁর মত এত গভীর ভাবে জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিতে আর কেউ পেরেছেন কি না সন্দেহ!"

"সে কথা ত অস্বীকার করছি নে, তবে সমুদ্রে ডুব দিয়ে এমন শুকনো ভাবে আর কেউ উঠতে পারতেন কিনা, সেটাও সন্দেহ!'

লিঙ্কন যখন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হলেন, তখন তাঁর একজন বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা এব, প্রেসিডেণ্ট হয়ে তোমার কেমন লাগছে?'

লিঙ্কন উত্তর দেন, 'একজন ডাকসাইটে বদমাইসের

গায়ে আলকাতরা লেপে, তার উপর তুলো লাগিয়ে তাকে গাড়িতে চাপিয়ে দেশান্তরে চালান দেওয়া হচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করল লোকটাকে,—'কেমন বোধ করছ হে?'

লোকটা বলল 'ভালই, তোমাদের সবার চোখের সামনে দিব্যি আরামে গাড়ি চড়ে যাচ্ছি। সারা রাস্তাটা যে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে না, সেটাই কি কম কথা!'

সেবার নির্বাচনে লিঙ্কনের প্রতিপক্ষ ছিলেন যাজক পিটার কার্টরাইট। কার্টরাইটের আয়োজিত সভায় লিঙ্কন উপস্থিত। কার্টরাইট শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যাঁরা সৎভাবে জীবন-যাপন করতে চান, যাঁরা একজন সৎ ব্যক্তিকে কংগ্রেসে পাঠাতে চান আর সৎ কাজ করে স্বর্গে যাবার বাসনা রাখেন, তাঁরা উঠে দাঁড়ন ত।'

সবাই উঠে দাঁড়াল, এক লিঙ্কন ছাড়া।

'আচ্ছা, এবার তাঁরাই দাঁড়ান, যাঁরা সৎকর্ম-বিরোধী, যাঁরা অসৎ ও নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত লোককে কংগ্রেসে পাঠানোর পক্ষপাতী এবং নরকবাস যাঁদের অবধারিত।'

লিঙ্কন এবারও গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন।

সকলের চোখই তাঁর উপর নিবদ্ধ।

কার্টরাইট জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, মিঃ লিঙ্কন, আপনি স্বর্গেও যাচ্ছেন না, নরকে যেতেও নারাজ। কোথায় যাচ্ছেন তা হ'লে, বলুন ত?'

'কেন, কংগ্রেসে'

বলেই লম্বা লম্বা পা চালিয়ে সভা ত্যাগ করলেন লিঙ্কন।

প্রতিপক্ষ ষ্টিফেন ডগ্‌লাসের সঙ্গে বিতর্কের সময় লিঙ্কনের বেশ কথা চালাচালি হ'ত, অনেকটা কবির লড়াইয়ের মত আমাদের দেশের।

ডগ্‌লাস জজ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পৈতৃক ব্যবসা ছিল পিপে তৈরীর। ছেলেবেলায় ডগলাস বাপের কাছে পিপে তৈরীর কাজও শিক্ষা করেছিলেন।

তিনি নিজেই সভায় এ কথা প্রকাশ করেছিলেন একদিন। ব্যস্, এই সূত্র ধরে আব্রাহাম মোক্ষম একটা কোপ লাগালেন।

'আমি জানতাম না যে ডগ্‌লাস সাহেবের বাবা পিপে বানাতেন। সত্যিই তিনি একজন সুদক্ষ পিপে নির্মাতা ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁর তৈরী (এইবার ডগলাসকে দেখিয়ে) এই পিপেটির মত এক চমৎকার হুইস্কীর পিপে আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ল না।'

বলাবাহুল্য জজ ডগ্‌লাস অত্যধিক মদ্যপায়ী ছিলেন। এককালে লিঙ্কন মুদিখানায় হুইস্কী বিক্রয় করতেন। ডগলাস সেই কথাটা উল্লেখ করে একটা পাল্টা রসিকতা ছাড়লেন। লিঙ্কন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—

'তা মিঃ ডগলাস ঠিকই বলেছেন, যখন হুইস্কী বেচতাম, তখন আমাদের দোকানের সবচেয়ে সেরা খদ্দের ছিলেন এই ডগ্‌লাস সাহেব। তবে কাউণ্টারের যে দিকটায় আমি ছিলাম, সে-দিকটা আজ শূন্য কিন্তু অন্য ধারটা ডগ্‌লাস কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছেন না।'

(অর্থাৎ, লিঙ্কন বহুকাল মদ বেচা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু ডগ্‌লাস আজও মদ খাওয়া ছাড়তে পারেন নি।)

একবার ইলীনয়ে নাগরিকদের আহূত জন-সভায় ডগ্‌লাস ও লিঙ্কন একে অন্যকে কি ভাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, নীচে ওদের বক্তৃতার উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে।

ডগ্‌লাস—আমার প্রিয় নাগরিকগণ। আপনারা বন্ধুবর মিঃ লিঙ্কনের সুন্দর, সরলতা ও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাপূর্ণ ভাষণ শুনলেন। রাজনীতিতে না হ'লেও, মানুষ হিসাবে আমার সদ্‌গুণাবলীর ওপর সহৃদয় মন্তব্য করে তিনি তাঁর বক্তৃতার খানিক অংশ ব্যয় করেছেন—এ জন্যে তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আপনারা মনে ভাববেন না যে এই এত চমৎকার শুভেচ্ছা জ্ঞাপনই ওঁর প্রকৃত মনোভাব। সেক্সপীয়ারের ব্রুটাসের মত লিঙ্কনও একজন মাননীয় ব্যক্তি এবং ব্রুটাসের মত তিনিও, মানুষ যখন বিপদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, তখন তাকে মারাত্মক আঘাত হানবার জন্য ছোরা চালাতে সিদ্ধহস্ত। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, ভদ্রমহোদয়গণ। বন্ধু লিঙ্কনের ছুরিকাঘাতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু তবুও আমি পায়ের উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ সত্যের দৃঢ় বুনিয়াদের 'পরে দাঁড়িয়ে আছি।

মিঃ লিঙ্কন রসিকতা দিয়ে আপনাদের হাসান, পরক্ষণেই আবার দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রো ক্রীতদাস শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়ে আপনাদের চোখে জল আনেন। তিনি সব সময়েই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আপনাদের সত্যের দরজা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে আসেন, কিন্তু যেই আপনারা ভিতরে ঢুকতে যাবেন, অমনি কৌশলে সেখান থেকে আপনাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান।'

লিঙ্কন—বিচারপতি ডগ্‌লাস আমার ছুরি চালানোর

প্রশংসা করেছেন—এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, ঐ অস্ত্রটি দিয়ে আমি যা পারি, আমার বন্ধু ডগ্‌লাস সাহেব তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু করতে পারেন। উনি একসাথে দশখানা ছুরি শূন্যে ছুঁড়ে খেলা দেখাতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমনি ওস্তাদ খেলোয়াড় যে তাঁর কোন ছুরি মাটিতে পড়বার সময় কারো গায়ে আঁচড় লাগায় না। ···জজ সাহেব দক্ষিণী দেশগুলিতে ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের দুরবস্থা স্মরণ করে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উপর আনুগত্যও জানাচ্ছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলির স্বাধিকারকেও সমর্থন করছেন। ওঁর ব্যাপার দেখে কেণ্টাকীর এক ভদ্রমহিলার গল্প মনে পড়ে গেল।

ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে গভীর জঙ্গলের ধারে একটা কাঠের বাড়ীতে বাস করতেন। একদিন ঘর থেকে বাইরে এসে মহিলাটি দেখতে পেলেন, একটা ভালুকের সঙ্গে তাঁর স্বামীর ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলেছে। ভালুকটা ভদ্রলোককে চেপে মারে আর কি? ভদ্রলোকের গায়েও যথেষ্ট বল ছিল। দু'জনে জাপ্টাজাপ্টি করে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এমন সময় ভদ্রলোকটি স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন, 'মার্থা, দোহাই তোমার, আমাকে একটু সাহায্য কর।' মহিলাটি বললেন 'কি ভাবে সাহায্য করব?' তখন স্বামী বললেন, 'আর কিছু না পার, অন্ততঃ উৎসাহ পাই, এমন কিছু বল।'

স্ত্রী কিন্তু স্বামীর বিপদ সম্বন্ধে উদাসীন। নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'সাবাস্ জন্ 'হঠো' মৎ। ···লড়ে যাও ভালুক, চিয়ার আপ!"

মারা যাবার আগে নিজের মৃত্যুর সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেন লিঙ্কন।···হোয়াইট হাউস থেকে শোকসূচক ধ্বনি শুনতে পেয়ে, তিনি যেন সোপান পেরিয়ে, পূবের ঘরটায় এসে ঢুকলেন, কারণ জানবার জন্যে। দেখেন, সৈন্যেরা একটা পতাকায় ঢাকা শবাধার পাহারা দিচ্ছে।

'কে মারা গেছেন?' জিজ্ঞাসা করেন।

'প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন, তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।'

আব্রাহামের বন্ধু ল্যামন ও মিসেস লিঙ্কন তাঁর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে অবধি ভয়ে আর বাঁচেন না।

লিঙ্কন কিন্তু মোটেই বিচলিত হন নি।

বললেন, 'তোমরা মিছে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? মৃত লোকটা মোটেই আমি নই, নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। কেননা, ধর যদি আমি সত্যিই মারা গিয়ে থাকি তবে এসব দেখব কি করে?'

তার পর একটা চুটকী গল্প ছাড়লেন।

এক চাষী পরিবারে জেক বলে একটা হাবাগোবা ছেলে ছিল। একবার কি একটা সব্জি খেয়ে, বাড়ীর সবাই বাহ্যে বমি করে মরে আর কি! এর পর বাড়ীতে নতুন কোন সব্জী এলেই, সেটা খাবার আগে কর্ত্তা বলতেন, 'Let's try, 'em on Jake. If he stands 'em we're all right.'

আমার হয়েছে জেকের অবস্থা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্বপ্নলোকের ঘাতক তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে, ততক্ষণ তার ছুরির সামনে বুক পেতে দিয়ে আমি প্রস্তুত।

যুদ্ধের জন্য ক্যাবিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে, সমর-সচিব ষ্ট্যানটন এসে ঢুকলেন সভায়। দেখেন সবাই বসে আছেন, আর প্রেসিডেণ্ট একখানা বই খুলে তন্ময় হয়ে পড়ছেন। ষ্ট্যানটনের ঘরে ঢোকা মোটেই লক্ষ্য করলেন না এবং তার পর সমবেত সদস্যদের উদ্দেশ করে বললেন—

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কি আর্টিমাস ওয়ার্ডের বই পড়েছেন?···আচ্ছা, আমি ওর বইয়ের একটা জায়গা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের। ভারী মজার মজার কথা বলেছেন আর্টিমাস।' বলেই তিনি High Handed Outrage in Utica থেকে পড়তে সুরু করে দিলেন।

ষ্ট্যানটন বজ্রাহত। এমনি একটা সঙ্কট পরিস্থিতিতে এধরনের চটুলতা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। প্রেসিডেণ্টের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন কিনা ভাবছেন, ওদিকে লিঙ্কন পড়েই চলেছেন।

পড়া শেষ করে লিঙ্কন উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েন।···

'ভদ্রমহোদয়গণ' আপনারা হাসছেন না কেন?··· দিবারাত্র আমার ওপর চিন্তার যে গুরুভার চেপে আছে, তাতে যদি হাসতে না পেতাম, নির্ঘাৎ মারা যেতাম। হাসির এ ওষুধটা আপনাদেরও দরকার।'

তার পর টেবিলের ওপর থেকে লম্বা টুপিটা সরিয়ে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে, পড়তে সুরু করলেন।

এটা হচ্ছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নিগ্রো দাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্রের খসড়া। ষ্ট্যানটন সত্যিই বিমুগ্ধ হয়ে যান।···উঠে দাঁড়িয়ে লিঙ্কনের হাত ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন তিনি—

"Mr. President, if reading a chapter of Artemus Ward is a prelude to such a deed as this, the book should be filed among the archives of the nation and the author Coronized!"

—*—

॥ প্রবন্ধ ॥

নূতন বক্তা নারলিকার

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

"নূতন একটা তত্ত্বমত তৈরি হতে যাচ্ছে। যদি তা কোন দিন সার্থক হয়, মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস আশ্চর্য্য এক জোর খুঁজে পাবে।"—লেখক।

"এই নতুন মত সত্যই বস্তুস্বরূপ ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছে বা এটি গণিতজ্ঞের স্বপ্নাবেশ মাত্র, এ-বিষয়ে এত শীঘ্র কিছুই বলা যায় না।"—অধ্যাপক সত্যেন বসু।

বক্তৃতা অবশ্য দিয়েছিলেন হয়েল। কেমব্রিজের অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল। তবু বক্তা তাঁরা দু'জন। হয়েল এবং তাঁর ছাত্র-সহযোগী নারলিকার। ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার।

আমাদের শাস্ত্র-ধারণায় বলে, কোন তত্ত্ব যখন সত্যসন্ধি তখন তার স্রষ্টা বা রচয়িতা বলে কেউ নেই। কিংবদন্তী যেমন, মানুষের বহু অভিজ্ঞতায় আবহমানকাল থেকে প্রচলিত। সত্যও তেমনি চির সনাতন, তবে বিশেষ কারও সাধনায় প্রকাশ পায় এই মাত্র। সাংখ্যদর্শনের আগেও এই দর্শনের তত্ত্ব ছিল, তবে কপিল মুনি তা প্রথম ব্যক্ত করলেন, প্রকাশ করলেন—মানুষের ধারণা ও যুক্তির সীমায় নিয়ে এলেন। যা ছিল, অথচ মানুষের অজ্ঞাত ছিল, তাই আবার আমাদের কাছে ধরা দিল। এ হিসাবে তিনি নূতন কোন তত্ত্বমতের স্রষ্টা বা প্রণেতা নন, তিনি বক্তা। মানুষের অজ্ঞাত এক দর্শনচিন্তার প্রথম প্রকাশকর্তা।

গত বছর ১১ই জুন রয়েল সোসাইটির সভায় হয়েল যে বক্তৃতা দেন তার বিষয়বস্তু শাস্ত্রের সেই সত্য ধারণাকে স্পর্শ করেছিল। এক নূতন তত্ত্বমতের সেদিন প্রকাশ হ'ল। এর বক্তা হিসাবে অধ্যাপক হয়েলের সঙ্গে আর একজন তরুণ গবেষকের সাধনা এসে মিলিত হয়েছিল, মাত্র ২৬ বৎসর বয়সের এই ভারতীয় কেমব্রিজের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে এখন পোষ্ট-ডক্টরেট শিক্ষা-গবেষণায় নিরত। সম্প্রতি তিনি ভারতে এলেন। হয়েল এবং নারলিকারের মিলিত সাধনায় বিজ্ঞানের বহু পুরাতন ভিত্তিমূল নড়ে উঠল।

বিজ্ঞানের যে আধুনিক ধারাটি তার প্রবর্তন হ'ল তিন থেকে চারশ বছর আগে গ্যালিলিও-নিউটনের আমল থেকে। নিউটন মহাকর্ষের ধারণা নিয়ে এলেন। আপেল কেন মাটিতে পড়ে থেকে সুরু করে সূর্যের চারপাশে নবগ্রহের আবর্তন—প্রদক্ষিণ ও ঘূর্ণন সবই তাঁর অঙ্কের সূত্রে মিলে গেল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দু'শ বছর ধরে তাই নিউটনের জয়জয়কার। নিউটনের চিন্তায় শক্তি এক বিশেষ কথা, মহাকর্ষও এক

ধরনের শক্তি। এই শক্তি বলতে নিউটন ঠিক কি বোঝাতে চান তা বলতে গেলে বস্তু সম্বন্ধে দু চার কথা বলে নিতে হয়। বস্তু কোন রকম নড়াচড়া করা পছন্দ করে না, অথবা যদি গতিশীল থাকে তবে সেই গতি বদল করতে চায় না, এক কথায় স্বাভাবিকভাবে বস্তু তার অবস্থা পরিবর্তন করে না। বস্তুর এই ধর্মের নাম জাড্য, এর গুণেই রকেটবাহী স্পুৎনিক বায়ুরোধহীন ঊর্দ্ধাকাশে উঠে পৃথিবীকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। শক্তির প্রয়োগে বস্তুর অবস্থা পরিবর্তন ঘটে, এর ফলেই মাঠের ফুটবল গোলপোষ্টের দিকে ছুটে যায়, আবার ঘাসে (এবং কিছুটা বাতাসে) বাধা পেয়ে কিছুদূর গিয়ে থেমেও পড়ে। এক শক্তি এখানে আর এক শক্তির বিপরীতে কাজ করছে। নিউটন বলেন, মহাকর্ষণ শক্তি দূরত্ব ডিঙ্গিয়ে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে সরাসরি কাজ করতে পারে। সূর্যকে বেষ্টন ক'রে পৃথিবীর যে পরিক্রমণ তা এই দূরত্ব-ডিঙ্গানো শক্তির আকর্ষণেই সম্ভব হচ্ছে। নিউটনের এই শক্তি ধারণায় মাথার উপরে দেদীপ্যমান সূর্য এবং তার গ্রহ-উপগ্রহ-মণ্ডলী নিয়ে যে বিরাট্‌ সৌরজগত তার ছবিটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং এরই অন্তর্গত আমাদের এই পৃথিবীতে প্রকৃতির নানা শক্তির বশে এক যন্ত্রময় জগৎ গড়ে উঠল।

কিন্তু নিউটনের এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের অন্য বিভাগে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিল, তড়িৎ চুম্বকের ধর্ম এতে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা গেল না। এর সমাধানকল্পে ফ্যারাডে ও ম্যাকস্‌ওয়েল নূতন এক ধারণার প্রবর্তন করলেন। এই ধারণাকালে বিজ্ঞানের জগতে এক নবযুগ খুলে দিল। আলোর স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং রেডিও তরঙ্গের অস্তিত্ব পূর্বাভাষে জানিয়ে দিয়ে ম্যাকস্‌ওয়েল-এর ফিল্ড থিওরী অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। বিজ্ঞানের তত্ত্বচিন্তা নিউটনীয় মতাশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ নূতন দিকে মোড় নিল। আইনষ্টাইন তাঁর সর্বিক আপেক্ষিকতার জন্য ফিল্ড জাতীয় তত্ত্বই গ্রহণ ক'রে নিলেন।

ফিল্ড তত্ত্বের যা মূল বিশেষত্ব তা হ'ল তার স্থানীয়ত্ব, এ হিসাবে যে তার প্রভাব পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র বা দেশে পরিবর্তন আনে। চুম্বকের বেলায় এই পরিবর্তন লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে সহজেই প্রতিভাত। বস্তুতে বস্তুতে যে আকর্ষণ, নিউটনের মতে তা সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ, নূতন ধারণায় দু'টি আধান বা চার্জের মধ্যে শক্তির বিনিময় শুধু ফিল্ডের মাধ্যমেই কার্যকরী। শক্তির এই বিনিময় অপ্রত্যক্ষ কিন্তু ক্রমাগত, ফিল্ডের বৈশিষ্ট্যই হ'ল তাই। তুলনামূলক চিত্রে তীরে জলের বিক্ষোভ যেমন ঢেউয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

দেশ ও কালের বুননে আইনষ্টাইনের যে আপেক্ষিকতার ধারণা তাতে মহাকর্ষ দেশ-কালেরই বিশেষ এক গুণ। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যেমন পজেটিভ-নিগেটিভ চার্জে কাটাকাটি হয়, মহাকর্ষের শক্তি কিন্তু সর্বদাই আছে—আছে—আছে। মহাকর্ষের প্রভাবে দেশ-কালের পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবী সূর্যকে উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করে না বলে তখন বলতে হয় তা "সোজা পথেই" যাচ্ছে। এই "সরলরেখার" ধারণা পুরাণো জ্যামিতির সঙ্গে মিলবে না। আসল কথা, ইউক্লিডের জ্যামিতিই এখানে আর খাটছে না। আইনষ্টাইন তার সমীকরণে দেখিয়েছেন, বস্তুর প্রভাবে কিভাবে জ্যামিতির চিত্র বদল হচ্ছে।

ম্যাকস্‌ওয়েলের থিওরীর সঙ্গে আইনষ্টাইনের ধারণার মূল এক জায়গায় বেশ মিল রয়েছে। ম্যাকস্‌ওয়েলের চিন্তায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের বিস্তার আছে, আইনষ্টাইনের তত্ত্বে সেখানে সাধারণ দেশ-কাল নন্‌-ইউক্লিডীয় রূপে প্রতিভাত। মহাকর্ষণ-জাত ফিল্ড যেখানে দুর্বল অর্থাৎ বস্তু যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট, সেখানে আইনষ্টাইনের সমীকরণের মান নিউটনীয় হিসাবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

ঠিক এভাবেই বলা চলে যে হয়েল নারলিকারের নূতন মত আইনষ্টাইনের ধারণার ঠিক পরিপন্থী নয়, বরং আপেক্ষিকতাবাদের আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক সূত্র হিসাবে তাঁদের তত্ত্বমতটি গ্রহণ করা চলে। এ কথা হঠাৎ একটু গোলমেলে মনে হতে পারে। আসল কথা এই যে—পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে, বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পুরাণো তত্ত্বের খোলসটা ছেড়ে নূতন তত্ত্ব জন্ম নেয়। এই নূতন তত্ত্ব আরও ব্যাপক আরও সাবেক হওয়ায় পুরাণো অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয়গুলিরও সঠিক ব্যাখ্যা করে। এই নূতন অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যাই তার বিশেষত্ব। তবে পুরাণো অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে নূতন-পুরাণো দুটো মতই কার্য্যকরী। গণনার হিসাব এখানে দু'মতেই সমান, অন্তত তার কাছাকাছি। এই সমান সংখ্যার দিক দিয়ে, পরিমাণের দিক দিয়ে, প্রকৃতিগত ভাবে যে হবে তার কোন কথা নেই। নিউটন এবং আইনষ্টাইনের তত্ত্বমত সম্পূর্ণ আলাদা পথ অতিক্রম করে আমাদের সাধারণ জগতের কার্য-

কারণ ব্যাখ্যায় সমানভাবে সফল হয়েছে। তাঁদের নিজস্ব পার্থক্য অবশ্য সবসময়েই রয়েছে, তবে সাধারণ গণ্ডি ছাড়িয়ে অতিকায় বস্তুর জগতে তা সহজে ধরা পড়ে। পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যে দু'টি পৃথক্ তত্ত্বপ্রকৃতি নিউটন ও ফ্যারাডে ম্যাকস্ওয়েলের ধারণায় পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে তড়িৎ চুম্বকের ধর্মগুলি ফিল্ড থিওরীর সাহায্য না নিয়েও আজকাল ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, গত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে তা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

হয়েল-নারলিকারের অভিনব তত্ত্ব নিউটনের ধারণার কাছাকাছি থেকে অগ্রসর হয়েছে। বিকিরণ ও তড়িৎ-চুম্বকত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউটনীয় তত্ত্বমত নিষ্প্রভ ও প্রায় বিশেষত্ব-হীন হয়ে পড়ছিল। এ সময় এ. ডি. ফোক'র আলোর গতিসম্পন্ন বেগে দু'টি বিদ্যুৎ আধান (চার্জ) কিভাবে শক্তি বিনিময় করে তার এক বিস্তারিত চিত্র উপস্থিত করলেন। কিন্তু পরে তাতেও গুরুতর ত্রুটি দেখা গেল। মনে করুন ক ও খ দুটি চার্জ এক আলোক ঘণ্টা দূরে অবস্থিত—অর্থাৎ ক থেকে আলো খ-তে যেতে এক ঘণ্টা সময় দেয়। ধরা যাক, বিকেল পাঁচটায় দুটো আধানের মধ্যে শক্তি বিনিময় সুরু হ'ল, এই বিনিময় একই সঙ্গে কার্যকরী হবে। ফলে, ক-এর ক্রিয়া এক ঘণ্টা পরে ছ'টায় খ-তে গিয়ে পৌঁছবে। আর খ-এর প্রতিক্রিয়া, যেহেতু শক্তি বিনিময় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই, ছ'টায় রওনা হয়ে পাঁচটায় ক-তে যাবে। এ অসম্ভব ব্যাপার কি করে সম্ভব হবে। এর সমাধান দিলেন জে. এ. হুইলার এবং আর. পি. ফেম্যান। তাঁরা বলছেন, বিশ্বচরাচরে ত দুটোমাত্র শক্তিকণা নেই, ক খ-এর পরে গ ঘ ঙ অজস্র অনন্ত রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই ক বা খ-এর উপর কাজ করছে। এ সমস্তই একসঙ্গে যোগ করে নেওয়া চাই। অবশ্য এই যোগ দু'য়ে দু'য়ে চার হওয়ার মত সাধারণ হবে না। সে যা হোক, মোট কথা যোগ করা হ'ল। এ থেকে একটা সন্তোষজনক সমাধানও পাওয়া গেল, কিন্তু হুইলার ও ফেম্যান বিশ্বের যে চিত্র গ্রহণ করেছিলেন তা স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা বিস্তারশীল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত নীহারিকা ও তারাজগৎ যে একে অপর থেকে দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে—বেলুন বা বুদ্বুদের মত ক্রমশ ফেঁপে উঠছে, এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সম্প্রসারণশীল বিশ্বের পটভূমিকায় হুইলার-ফেম্যানের অঙ্কটা আবার কষে নিতে হবে। বিজ্ঞানী হগার্ট তার প্রয়োজনীয় মীমাংসাও করেছেন।

অতি সম্প্রতি হয়েল এবং নারলিকার সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরে এর যে সমাধান প্রস্তুত করেছেন তত্ত্ব-চিন্তার দিক থেকে তা যেমন অভিনব তেমনি সুদূর-প্রসারী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন রূপটি গ্রহণ করা হ'ল তার উপর এই জটিল অঙ্কের ফল নির্ভর করছে। বলাবাহুল্য, হয়েল-নারলিকার সম্প্রসারণশীল বিশ্বের চিত্রটিই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বলে গামো লভেল মার্টিন রাইল সমর্থিত 'বিগ্ ব্যাং' থিওরী যে মেনে নিলেন তা নয়। বিগ্ ব্যাং-এর তত্ত্ব-পরিকল্পনায় বলছে, বিশ্বের সম্প্রসারণের আগে, সেই আদিম সময়ে, এখন থেকে এক হাজার কি দেড় হাজার কোটি বছর আগে বিশ্বের বস্তুসমষ্টি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট জমাট অবস্থায় ছিল। যে কোন কারণেই হোক, হঠাৎ বিস্ফোরণে এই বিপুল বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়ে, এবং পরে মহাকর্ষের ফলে পুনরায় দানা বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে নক্ষত্র নীহারিকা ইত্যাদি গঠন করে। কিন্তু প্রথমের সেই অকল্পনীয় বিস্ফোরণের তেজে আজও তারা তুবড়ির স্ফুলিঙ্গের মত একে অপরের থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিবর্তনশীল মহাবিশ্ব অপরিমাণ শক্তি বিকিরণ করতে করতে এক নিশ্চিত পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এত আলো, এত উত্তাপ—দূর ভবিষ্যতে একদিন তার সমস্তই নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মহাবিশ্ব মৃত হবে।

হয়েল এবং নারলিকার বিগ্ ব্যাং থিওরীর এই অবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ মেনে নিতে চান নি। বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, তার ক্রমপ্রসারী শূন্যতার মধ্যে নূতন নূতন বস্তু নাকি সৃষ্টি হয়ে চলছে। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা সি-ফিল্ড বা ক্রিয়েশন ফিল্ড নামে নূতন বস্তু-সৃষ্টিকারী এক অভিনব ধারণার প্রবর্তন করলেন। হয়েল-নারলিকার দাবি করেন, তাঁদের এই ধারণা গণিতের জটিল আঁকজোকের মধ্যে সমর্থন পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা তা পরীক্ষা করে দেখছেন। ইতিমধ্যে এই নূতন তত্ত্ব মহাকর্ষ শক্তি কেন সর্বদা আকর্ষণ করে, বিকর্ষণ করে না, তার ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সফল হয়েছে। মহাকর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা আইনষ্টাইনের ধারণায় নন্-ইউক্লিডীয় দেশ-কালের বিচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মত-বিভেদ ঘটেছে বস্তুর বস্তুত্ব অর্থাৎ ভরের স্বরূপ ব্যাখ্যায়। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে জলের সিক্ততা বা আগুনের দাহগুণের মত ভর বস্তুকণারই নিজস্ব গুণ। কিন্তু হয়েল এবং নারলিকার তা অস্বীকার করে এক নূতন দিকে পদক্ষেপ

করলেন। তাঁরা বলছেন, "কোন বস্তুর ভর সারা জগতের বস্তুত্বের সঙ্গে গ্রথিত—তার অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব গুণ নয়। জগৎ যদি ভিন্নভাবে গঠিত হ'ত, বস্তুকণার ভরও ভিন্ন সংখ্যা দিয়ে ব্যক্ত করা হ'ত।"

কঠোপনিষদে আছে—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥

বহু শাখাপ্রশাখায় সমাচ্ছন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্র এই সংসার-রূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মত। তাঁর মূল মানুষের আবহমান তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও উৎসুক মনের গহনে। সম্প্রতি সেখানে আঘাত লেগেছে। নূতন এক চারাগাছ জন্মলাভ করেই ভারতীয় ভোজবিদ্যার মত হঠাৎ ফলবান হয়ে উঠছে। হয়েল-নারলিকারের ধারণায় বস্তুর যে স্বরূপ প্রকাশ, তাতে আমাদের প্রতীয়মান এই জগৎ এবং আমরা সবাই জগতের সামগ্রিক গঠনের উপর নির্ভর করে আছি।

নূতন এক তত্ত্বমত তৈরি হ'তে যাচ্ছে। তাকে যাচাই করে নেওয়ার মত কোন পরীক্ষা-নির্ভর উপায় এখনও পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয় নি। নারলিকার অবশ্য "মনসা মথুরা" ভ্রমণের মত এক "মানসিক নিরীক্ষা'র কথা বলেছেন। কল্পনা করা যাক, মহাবিশ্বের অর্ধাংশ থেকে সমস্ত বস্তু বিলীন হয়েছে। পুরাণো মতে, নবগ্রহমণ্ডিত সৌরজগতে এর কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে না। পৃথিবী সূর্য থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে-ই ঘুরপাক খাবে। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও বিকিরণ পূর্ববৎ অপরিবর্তিত থাকবে। হয়েল ও নারলিকারের মতে কিন্তু তখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে দ্বিগুণ হবে, পৃথিবী সূর্যের অনেক কাছে চলে আসবে। সূর্য্য নিজেও সঙ্কুচিত হবে অনেক গুণ, এবং তার ঔজ্জ্বল্য অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

বলাবহুল্য এ সবের কিছুই পরখ করে দেখার উপায় নেই। তবে এর মধ্যেও বিগ্ ব্যাং থিওরীর ধারণায় যেখানে বিশ্ব সম্প্রসারণশীলতার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে, সেখানে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ষ্টেডি ষ্টেট বিশ্বের এই চিত্রে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস আশ্চর্য এক জোর খুঁজে পাচ্ছে। যেখানে সৃষ্টির সুরু নেই, সমাপ্তি নেই, জন্ম মৃত্যু কিছু নেই, সেখানে এই নূতন তত্ত্ব পা বাড়িয়েছে, সেখানে শুধু আছে—আছে—আছে।

গীতায় অর্জুন বলছেন—

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট আপনার অনন্ত রূপ দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি না।

সেই আদিহীন অন্তহীন মধ্যহীন ধারণার জগতে নূতন এই তত্ত্বের ধারণা যেন আমাদের নিয়ে চলছে। মানুষ বুঝি আবার তার পুরাণো বিশ্বাসকে ফিরে পাবে।

—•—

অবাঞ্ছিত ?

শ্রীসমর বসু

অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে, তবুও রোদ ওঠে নি। মেঘলা আকাশ থম থম করছে। এখনই হয়ত বৃষ্টি নামবে। সেই আশায় বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত শরীর যেন আলস্যে জড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে উঠলেই পর পর কয়েকটি কাজ অবশ্যই করতে হবে। ঘুমোবার ভান ক'রে পড়ে থাকলে চলবে না। কেননা সে-কাজগুলো বাড়ীর আর কারোর করণীয় নয়। বাড়ীতে অবশ্য স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। সুতরাং রমানাথকে উঠে পড়তে হ'ল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে রমানাথ দেখল—উনুন ধরে গন্‌গন্ করছে অথচ স্ত্রীর পাত্তা নেই।

সাত সকালে আবার কোথায় আড্ডা দিতে গেল, এমন ত কোনও দিন করে না। নিশ্চয়ই আমিনাদের বাড়ী গেছে!

চায়ের কেৎলিটা উনুনে বসিয়ে দেবে কি না রমানাথ ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হ'ল সদর দরজার কাছে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে কাঁদছে বোধ হয়। রমানাথ একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল—আমিনার মা স্ত্রীকে চুপি চুপি কি বলছে আর কাঁদছে।

রমানাথকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে আমিনার মা পিছন ফিরে দাঁড়াল।

ইলা বলল, ওমা, তুমি উঠে পড়েছ। আমি ভাবলাম বুঝি আর একটু ঘুমুবে।

রমানাথ বলল, উনুন কিন্তু কামাই যাচ্ছে।

—ওঃ, তাই নাকি! তুমি চায়ের জলটা বসিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

—ছেঁড়া কাপড়টা পিঠের ওপর বিছিয়ে দিয়ে আমিনার মা বলল, এখন আসি দিদি।

তখনও তার গলাটা কান্না-ভেজা।

রান্নাঘরে এসে রমানাথ ইলাকে জিজ্ঞেস করল, ও কাঁদছিল কেন! কি বলছিল তোমাকে! রাত্তিরে হামিদ বুঝি মারধোর করেছে!

—না! কাঁদছিল অন্য কারণে। বলেই ইলা গম্ভীর হ'য়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রমানাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইলার দিকে তাকাল।

ইলা রাগত ভাবে বলল, সব কথাই তোমায় শুনতে হবে বুঝি।

রমানাথ বুঝতে পারল এখন ইলা কিছু বলবে না। এ-বিষয়ে কোনও কৌতূহল না দেখালে একসময় ও নিজের থেকেই সব বলবে। সুতরাং খবরের কাগজটা নিয়ে রমানাথ বারান্দায় গিয়ে বসল।

কাগজ পড়তে পড়তে একসময় রমানাথ দেখল, হামিদ গজগজ করতে করতে কাজে বেরুচ্ছে। হাতে একটা থলে। থলের ভেতর, কর্ণিক, বাওলি, উশো, আরও কত যন্ত্রপাতি।

আমিনার মা কিন্তু আর কাঁদছে না। এখন ওকে দেখলে কারোর সন্দেহই হবে না যে ওর মনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট। এখন ওর হাসি-হাসি মুখ। পান-দোক্তায় ঠোঁট দুটো রাঙা। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বকর বকর করছে। এইটাই আমিনার মায়ের আসল রূপ। কান্নাটা নিতান্ত ব্যতিক্রম। তাই রমানাথ আবার চিন্তিত হ'ল, আমিনার মা কাঁদছিল কেন!

অভাবের সংসারে কান্নাই সঙ্গী; কাঁদতে কাঁদতে ঘর-দোরের কাজ। কাজের শেষে আবার কান্না। কিন্তু আমিনার মা তার আশ্চর্য শক্তি দিয়ে, ঝগড়া-ঝাঁটি, মার-পিট, সব সহ্য ক'রেও ঠোঁটের প্রান্তে হাসিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং তা রাখতে পেরেছে বলেই ঝড়-ঝাপটায় সংসারটা একেবারে ভেঙে পড়ে নি।

কিন্তু আজ এই সকাল বেলায় এমন কি হ'ল, যার জন্যে এতক্ষণ ধরে ওকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হ'ল!

আমিনার বাবা হামিদ রাজমিস্ত্রী। মাসের মধ্যে প্রতি-দিনই যে কাজ জোটে, তা নয়; কাজ জুটলেই যে পুরো-পুরি মজুরী আদায় হয়,—তাও নয়। হপ্তা-শেষে হয়ত খানিকটা উসুল হয়, বাকী থাকে তার চেয়েও বেশী। কখনও মনিবের কাছে, কখনও বা ঠিকাদারের কাছে। এক কাজ ফেলে অন্য কাজ ধরবার উপায় নেই। বেশী মজুরী পেলেও না।

হামিদের ছেলে রেজাক। সেও বেশ বড়সড়ো হয়েছে। কর্ণিক ধরতে শিখেছে। এখন আর সে

জাগাড়ে নয়, সেও 'রাজ'। বাপের চেয়ে ছেলের রোজগার অনেক বেশী। চার টাকা রোজ। হামিদেরও অবশ্য তাই। কিন্তু হামিদকে মাঝে মাঝে বসে যেতে হয়। কাজ পায় না।

জোয়ান বলে রেজাক খুব খাটতে পারে। এবং সেই জন্যেই কাজ ঠিক জুটে যায়। বাপের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চলে। কাজও বোধ হয় ভাল।

কিন্তু হামিদ তা মানতে চায় না। বলে, এসব মাপ-জোপের কাজ, তাড়াহুড়ো করলে চলবে কেন। যারা ভাল কাজ চায়, তারা এই বুড়ো মিস্ত্রীদেরই ডাকে। তারা ভাল করেই জানে, এসব ছেলে-ছোকরা-দের কম্ম নয়।

রেজাক চুপ করে থাকতে পারে না। বাপের মুখের ওপর দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। আর তাইতেই চেঁচামেচি লেগে যায়, গালাগালি, মারপিট। তার পর আবার একসময় সব চুপচাপ। হামিদ তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে উঠোনে, আর রেজাক দাওয়ায় বসে গুনগুন্ করে সিনেমার গান গায়।

হামিদের রাগটা কিন্তু অন্য কারণে। রেজাক এত রোজগার করে অথচ বাপের হাতে নিজের খরচা বলেও কিছু দেয় না। যখন খেয়াল চাপে, মন ভাল থাকে, তখন এটা-ওটা কিনে আনে। এত বড় সংসারটা একা হামিদকেই চালাতে হয়। টাকা চাইতে গেলেই ছেলের মেজাজ গরম হয়ে যায়। মায়ের কাছে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বলে, টাকাকড়ি চাইলে, আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি। তোমাদের সংসারে আর থাকব না। ইশ্‌টিশানের কাছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব। হোটেলে খাব।

রেজাকের মা দু'জনকেই শান্ত করে। হামিদকে ডেকে চুপি চুপি বলে, ও বোধ হয় শাদির লেগে ট্যাকা জমাচ্ছে। নইলে অত চ্যাঁচামিচি করবে ক্যানে! তুমি চুপ মেরে থাক, কিছু বলতে যেওনি। আমি বুঝিয়ে-সুজিয়ে যা পারি আদায় করব।

ওদিকে রেজাককে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে কত টাকা জমিয়েছিস?

রেজাক খেঁকে ওঠে, সে খোঁজে তোর কি দরকার।

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি!

—টাকার হিসেব আমি কাউকে দব না!

—হিসেব দিতে হবে নি। তোর টাকা তোরই থাকবে।

—তবে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—সে পরে বলব। এখন যা তোর মেজাজ, কথা বলতে ভয় করে।

মুহূর্ত রেজাক শান্ত হয়ে যায়। মায়ের হাত ধরে দাওয়ায় এসে বসে। চুপি চুপি বলে, বল না। ওরা ত কেউ শুনতে আসছে না।

রেজাকের মা তবুও কিছু বলে না। মুচকে মুচকে হাসে।

কিন্তু এইভাবে আর কত দিন চলবে। কোন্ দিন হয়ত খুনখারাপী হবে; পুলিস এসে হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তখন কোন্ দিক সামলাবে রেজাকের মা। 'পুলিস ত আর ভাতারপুত লয়। বোঝালেও ওরা বুঝবে নি।'—ভয়ে-ভাবনায় কাঠ হয়ে যায় রেজাকের মা। কিন্তু কাউকে কিছু জানতে দেয় না।

রেজাক যখন ঘরে থাকে না, হামিদ চুপি চুপি স্ত্রীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে। বিড়ি খেতে খেতে বলে, তুই ঠিকই বলিছিস, বিয়ে দিলেই হারামজাদা ঘর-মুখো হবে। মন মেজাজ ভাল হবে। নইলে নেশাভান করে হয়ত বাইরে বাইরেই রাত কাটাবে।

দাওয়া থেকে মুরগীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে রেজাকের মা বলে, আমি ত ঠায় ঐ কথাই বলছি। তা তুমি কানে লিচ্ছ কই। কালই চলে য'ও। ভায়ের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে এস। শাকিলা বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে। এর পর কবে এসে কে লিয়ে যাবে, তখন আর মেয়ে পাবে নি।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হামিদ উঠে পড়ে। ঠিক বলেছিস, আর দেরি করা নয়। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

শাকিলার সঙ্গে একদিন বিয়ে হয়ে গেল রেজাকের। শাকিলা ওর মামাতো বোন। ছোট্ট নোলক-পরা চটপটে একটা মেয়ে, বৌ হয়ে এসে ঢুকল এদের ঘরে। বাপ-ব্যাটার মাঝখানে একটা বোঝাপড়ার সেতু।

হাসিখুশী-ভরা চপল মেয়েটির খেয়ালই থাকে না যে সে এদের বৌ, ঝিউড়ী নয়। সকলকার সামনেই রেজাকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। হাতাহাতিও করে মাঝে মাঝে।

হামিদ বসে বসে হাসে। আর রেজাকের মা সে-

সব দেখেও যেন দেখে না। ছেলেটার মতিগতি একটু ভাল হ'লে হয়। মনে মনে শুধু এই কথাই ভাবে।

সত্যিই একদিন রেজাকের মতিগতি ভাল হয়ে গেল। রেজাক সংসারী হ'তে চাইল। ঘোর সংসারী। মাকে গিয়ে বলল, একসঙ্গে থাকতে গেলেই চেঁচামিচি ঝগড়াঝাঁটি। আমি তাই ঠিক করেছি আলাদা থাকব।

—তা থাকবি বৈকি! সাদি করেছিস, বৌ চিনেছিস—এখন আলাদা না থাকলে চলবে ক্যানে!

হামিদ কিন্তু কিছু বলল না। গুম হয়ে রইল।

বাপের থেকে আলাদা হয়ে শাকিলাকে নিয়ে রেজাক নতুন সংসার পাতল। বাপের সংসারে বৌকে খাটতেও দেয় না।

সব দেখেশুনে রেজাকের মাও চুপ করে গেল। আলাদা থেকে যদি সুখ পায়, সে ত ভাল কথা। আমাদেরও আর ঝক্কি, ঝামেলা পোয়াতে হবে নি।

মুখে এই সব কথা বললেও, রেজাকের মা স্বামী-ছেলের আড়ালে বৌকে আদর-যত্ন করে, এটা-ওটা রেঁধে খাওয়ায়। শাকিলা ত শুধু ওর ছেলের বৌ নয়, ভায়েরও মেয়ে।

শাকিলাও এমনি এমনি খায় না। শাশুড়ীর অনেক কাজকর্ম করে দেয়। ফাই-ফরমাশ খাটে।

রেজাক যদি জানতে পারে যে তার বৌ মায়ের সংসারে গিয়ে কাজকর্ম করেছে, তা হ'লে সে আর কাউকে আস্ত রাখবে না। তাই কাজ থেকে ফেরার আগেই শাকিলা নিজের ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে থাকে। বসে বসে আমিনার সঙ্গে গল্প করে।

কিন্তু লুকোচাপা কি রোজ চলে। এক একদিন ধরা পড়ে যায়। কথায় কথায় আমিনাই হয়ত বলে দেয়। সেদিন বৌটা বেদম মার খায়। মা বাধা দিতে এলে, মাকেও কাটারি দিয়ে কাটতে যায় রেজাক।

মা কিন্তু রাগ করে না, কাঁদে না। কপালও চাপড়ায় না। রাত ভোর হ'লেই দেখা যায় পান-দোক্তায় ঠোঁট রাঙা করে রেজাকের মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। গত রাত্রের ঝড়-ঝাপটার চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই।

হামিদ মিস্ত্রীর আরও চারটে ছেলে আছে। সবাই তারা নাবালক। ওরই মধ্যে গফুর যা একটু বড়। বাপের সঙ্গে সেও আজকাল কাজে বেরোয়। বাকী সব ঘুরে বেড়ায়, কোনও কাজকর্ম করে না। অথচ খাওয়া-দাওয়া সব বড়দের মতই। র‍্যাশনে যা পাওয়া যায় তাতে তিন দিন কাটে না। আধপেটা পান্তা খেয়ে হামিদ কাজে বেরিয়ে গেলেই আমিনার মা ছুটে আসে। ইলার কাছে হাত পাতে।

—দুটো ট্যাকা দাও দিদি। নইলে সব উপোস দিতে হবে। আজ কাজে বেইরেছে ঘরে এলেই শুধে দব।

—কাজে বেরোলেই কি টাকা পাওয়া যায়?—রমানাথ জিজ্ঞেস করে।

এক-গলা ঘোমটা টেনে আমিনার মা মুচকে হাসে। নিচু গলায় ইলাকে বলে, ট্যাকা যে পাওনা আছে ওদের কাছে। এ্যাদ্দিন যায় নি বলে ওরা এটকে রেখেছিল। আজ লিচ্চয় দিয়ে দেবে। কিন্তু আসতে ত সেই সন্ধ্যে। এখন ছেলেপুলে খাবে কি!

সংসারের জীর্ণ চাকায় এই ভাবে তেল দেয় আমিনার মা। গড়িয়ে-সড়িয়ে কোনওক্রমে সেটা চলতে থাকে। একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। টাকা হাতে এলেই কিছুটা শোধ দেয়। কিছুটা শোধে গতরে খেটে। তার পরও যা বাকী থাকে, তা শোধ করে ঘুঁটে দিয়ে।

গরুটা বিয়োলেই ওদের কাছ থেকে দুধ নেবে ইলা। সুতরাং টাকা মারা যাবার ভয় নেই। ওদের থেকে দুধ নিলে, অন্ততঃ খাঁটি দুধটা পাওয়া যাবে। জল ওরা খাওয়াবে না।

ইলা রমানাথকে টাকার সিকিউরিটি সম্বন্ধে আরও আশ্বস্ত করে।

মৃদু হেসে রমানাথ বলে, তা ত বুঝলাম; কিন্তু এইভাবে কি ওদের দুঃখ ঘুচবে। রোজই এসে ত হাত পাতবে। তুমি ত 'না' বলতে পারবে না।

—হাতে না থাকলে বলতে হবে বৈকি। আমরা ত আর দানছত্তর খুলে বসি নি।—বলতে বলতে ইলা চলে যায়।

রমানাথ কিন্তু তখনও ওদের কথা ভাবে। বাপের সংসারে খেয়েদেয়ে ছেলেগুলো সব বড় হবে। প্রথম প্রথম মজুরের কাজ; তার পর একদিন কর্ণিক ধরতে শিখবে। 'রাজ' হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ডানা গজাবে। বাপের সংসারে আর থাকতে চাইবে না। বাপকে টাকাও দেবে না। বুড়ো বাপকে খেতে-

পরতে দেওয়া ওদের ধাতে সয় না। রোগে পড়লেও বাপকে ওরা দেখে না। বাপ যেন শত্রু।

ওদের রোগ হলেই মুশকিল। তখন কাজে বেরোন যায় না। আর কাজে না বেরোলে, আগাম মজুরী কেই বা ওদের দিচ্ছে—বাকী-বকেয়াই আদায় হয় না। সুতরাং ওষুধ ত দূরের কথা, দুটো পথ্যিও ওদের জোটে না। রান্না-বান্না সব বন্ধ। কালো ভুষো-মাখা মাটির হাঁড়িগুলো উঠোনে উপুড় করা থাকে। বাড়ীশুদ্ধ সব উপোস।

রোগ সারলেও বিশ্রাম নেবার অবকাশ নেই ওদের। ধুঁকতে ধুঁকতে জলে ভিজে, রোদে পুড়েও ওদের কাজ করতে হয়। কাজ করতে করতে আবার রোগে পড়ে। কিছুতেই সারতে চায় না। ধার-দেনায় পাগল হয়ে যেতে হয়।

বাপের এই অবস্থা দেখেও ছেলেরা দাওয়ায় বসে বসে বিড়ি ফোঁকে। হ্যা হ্যা করে হাসে। সিনেমার গান গায়। কিংবা বোয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে।

এই ত মাস কয়েক আগে হামিদ মিস্ত্রীর নিউমোনিয়া হয়েছিল। এখনও সে ভারি দুর্বল। হাতে তার কর্ণিক বাওলী ঠিক থাকে না। তাই মাঝে মাঝে কাজ জোটে না হামিদের। জুটলেও ভাল কাজ আর সে করতেই পারে না।

ক'দিন আগে হামিদকে দিয়ে বাড়ীর কিছু খুচরো করিয়েছিল রমানাথ। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে রমানাথ ওর কাজ দেখত। শুধু কাজ দেখত না, ওকেও দেখত। ওর ভাবনা-চিন্তা, ধ্যানধারণার সঙ্গে রমানাথ কখন একাত্ম হয়ে যেত।

'ওলন' দিয়ে গাঁথুনি মাপতে মাপতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত হামিদ। চুপচাপ বসে থাকত। জোগাড়েকে পাঠিয়ে দিত 'মশলা' আনতে। কানের পাশ থেকে আধপোড়া বিড়িটাকে বার ক'রে ধরিয়ে নিত। বিড়ি খেতে খেতে এক সময় উঠে পড়ত। ওপাশের দেওয়ালে টাঙ্গান হাতথলে থেকে 'লেভেল' যন্ত্রটা নিয়ে এসে আবার কাজে বসত।

ছোট্ট কাঠের বাক্সের ভেতর একটা ছোট্ট কাঁচের নল। নলের মধ্যে জল টলটল করছে। কর্ণিকের ডগায় কিছু 'মশলা' তুলে নিয়ে একটা ইটের তলায় দিয়ে যন্ত্রটা আবার ইটের ওপর বসিয়ে দিত হামিদ। দেখত—নলের জল স্থির হয়ে গেছে। আর টলমল করছে না।

রমানাথকেও ডেকে দেখাত। বলত—দেখুন, কি রকম ব্যবস্থা! বলেই কেমন যেন উদাস হয়ে নিজেদের কুঁড়েঘরের দিকে তাকিয়ে থাকত। একটু মশলা পেলে সংসারটাকে আমিও উঁচু করতে পারতাম দাদাবাবু। তা হ'লে মনের মধ্যে এই সব ভাবনা-চিন্তাগুলো আর টলমল করতে পারত না। সব স্থির হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু তা বুঝি এ হাড়ে হবার নয়। পরের কোঠা গেঁথে গেঁথে হাড়মাস কালি হ'ল দাদাবাবু, নিজের কোঠা আর গাঁথতে পারলাম কই! মরবার পর দু'কোদাল মাটি পাব কিনা কে জানে।

রমানাথ চুপ করে শুনত। কিছু মন্তব্য করত না।

হামিদ নিজের মনেই বলে যেত, ছেলেগুলো কেউ মানুষ হ'ল না। ভেবেছিলাম ওদের মাদ্রাসায় দেব। কিন্তু বউটা আপত্তি করল। বলল, পড়েশুনে তোমার ছেলেরা মৌলুভী হবে! তখন আর বাওলী ধরতে চাইবে নি। কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে লক্কা-পায়রার মত পেখম মেলে নাচবে। ঐ ছৈয়দকে দেখ না; বাপ মরছে করাত টেনে আর ছেলে ওড়াচ্ছে ঘুড়ি। দু'পাতা ইংজিরী শিখেছে, আর কি মজুর হতে পারে।

নেহাৎ নিন্দের কথা বলে নি রেজাকের মা। আমাদের ঘরে আবার লেখাপড়া কেন! মিস্তিরীর ছেলে মিস্তিরী হবে। গতর খাটিয়ে যখন রুজি-রোজগার করতে হবে, তখন ছোটবেলা থেকেই লেগে যাওয়া ভাল। মাদ্রাসায় গিয়ে থামোকা বয়স বাড়িয়ে লাভ কি!

কিন্তুক ছেলেপিলেগুলো ভারি বেয়াড়া, বুঝলেন দাদাবাবু, কেউ কথা শোনে না। বৌটার আর দোষ কি। খেটে খেটে তারও শরীরে কিছু নেই। দড়ির মত চেহারা হয়েছে। যেন পোড়া কাঠ। কত বারণ করি, কি হবে ছাগল-গরু পুষে, তা কেবা শোনে কার কথা। বলে, ছাগল-গরু তবু দুটো ট্যাকা দেবে। মাঠে মাঠে বেঁধে রাখলেই ওদের খাবার জোটে, আর তোমার ছেলেরা, দু'বেলা দেড়েমুষে খেয়ে বুনো মোষের মত গতর করছে, অথচ কাজে বেরোতে হ'লেই মাথা গরম। যেন সব লবাবের বাচ্চা।

কথাগুলো বলেই হামিদ হাসতে লাগল।

রমানাথ জিজ্ঞেস করল, হাসছ কেন হামিদ?

একটু লজ্জিত হয়ে হামিদ বলল, রাগারাগির মাথায় বৌ তবু লবাব বলেছে।

—নবাব-বাদশার নাম শুনেছ নাকি?

—শুনি নি আবার! সিরাজুদ্দলা, সাজাহান।

গেল বছর বারোয়ারী মাঠে থিয়েটার হয়েছিল। তিন রাত ধরে সে কি কাণ্ড! সেই সময় ত ওদের স্বচক্ষে দেখলাম। কি চেহারা! সাজ-পোষাকের কি জৌলুষ!

বলতে বলতে হাতের কাজ ফেলে, হামিদ সোজা হয়ে দাঁড়াল। বুকটা চিতিয়ে দিয়ে, মুখের বিড়িটাকে থুঃ ক'রে ফেলে দিল। কোমরে গোঁজা খাটো লুঙ্গীটাকে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দিয়ে, চার-পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

রমানাথ বুঝতে পারল, হামিদ এখন আর রাজ-মিস্ত্রী নয়, নবাবের বংশধর। তাই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে খুশী খুশী মনে হামিদ যখন বাড়ী চলে গেল, তখন রমানাথ কিছু বলল না। হাজার হোক পাড়া পড়শী অভাবের সংসার, কি আর বলা যায়।

ওদের সংসারের হালচাল সবই রমানাথের জানা। কিছুটা নিজের চোখে দেখা, কিছুটা ইলার মুখ থেকে শোনা। তবুও রমানাথ স্থির করতে পারল না, রেজাকের মা আজ কাঁদছিল কেন।

সারাদিন অফিসের কাজের মধ্যে থেকে ওদের কথা এক রকম ভুলেই গেছল। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢোকবার আগেই রমানাথ থমকে দাঁড়াল। ভীষণ চেঁচামিচি হচ্ছে আমিনাদের বাড়ী। দরজায় শিকল তোলা দেখে বুঝতে পারল, ইলাও ঘরে নেই। বোধ হয় ওদের বাড়িই গেছে। জামা কাপড় না বদলেই রমানাথও ছুটল।

উঠোনে পা দিয়েই সে চমকে উঠল। দাওয়ায় পড়ে আছে রেজাকের বৌ। কপালের কাছে কেটে গেছে খানিকটা। কাপড়-চোপড় রক্তে ভেসে গেছে। আমিনা ব'সে মাথায় জল দিচ্ছে আর ইলা পাখার বাতাস করছে।

ঠিক সেই সময় হামিদও ফিরল কাজ থেকে। সব দেখে-শুনে, মুহূর্তে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। উশো-পাটা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল। আমিনা ভয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, বড়ভাই মেরে পাইলেছে।

শ্বশুরের গলা পেয়েই বোধ হয় শাকিলা উঠে বসল। ভিজে কাপড়টা গা-গতরে জড়িয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেও কাঁদতে লাগল।

বাতায় গোঁজা কলাগাছ-কাটা পাতলা কাটারিখানা বার ক'রে নিয়ে, হামিদ আবার চীৎকার ক'রে উঠল, কোথায় গেল হারামজাদা! শুয়োরের বাচ্চাকে আজ শেষ করে ফেলব।

রমানাথ ওর হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গি.য় বলল, মাথা গরম ক'রো না হামিদ। চুপ ক'রে বস।

সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে হামিদ ঐখানেই বসে পড়ল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চাপ চাপ অন্ধকার জমে উঠছে, ওদের ঘরের মধ্যে, চালার নীচে, গোয়ালে। উঠোনটায় এখনও একটু দিনের আলো রয়েছে। সেখানে মুরগী-গুলো খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে।

পরিবেশটা একটু স্তব্ধ হতেই রমানাথ শুনতে পেল ঘরের ভেতর থেকেও একটা চাপা কান্নার সুর ভেসে আসছে।

রমানাথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে আবার কে কাঁদছে ?

ইলা বলল, আমিনার মা।

—কেন ? তার আবার কি হ'ল!

ইশারায় কাছে ডেকে ইলা ফিস ফিস ক'রে বলল, বাচ্চা হবে। তুমি বরং নার্সকে ডেকে নিয়ে এস। নইলে বেচারা বোধ হয় বাঁচবে না।

নার্স কি এখন বাড়ী আছে! বোধ হয় হাসপাতালে চলে গেছে।

—দেখেই এস না। এ-সপ্তাহ ওর নাইট ডিউটি। রাত্রি দশটার পর বেরুবে।

রমানাথ একটু ইতস্তত করে বলল, ওদের ছেলে-পুলে ত এমনি হয়। নার্স নিয়ে আসতে হবে কেন!

—দেখ নি, চেহারা কি রকম হয়েছিল। আজ সকালেই ত আমার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করছিল। বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকেই ভাবনায় ভাবনায় ও কাঠ হয়ে গেছে। ছেলেপুলেতে ওর ঘেন্না ধরে গেছে। আমার কাছে গিয়ে প্রায়ই কাঁদত। বলত, যে-কটা হয়েছে, তাদেরই দু'বেলা দুটো খেতে দিতে পারি না দিদি আবার একটা এলে কি করে চলবে। আমরা যে ওষুধ-কোষুধ খেয়ে নষ্ট করতে পারি না। আমাদের যে অনেক জ্বালা। পেটের মধ্যে মরে গিয়ে শত্তুরটা যদি আমাকেও ল্যায় ত হাড় জুড়োয়।

রমানাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা সত্যি! কিন্তু রেজাক ওর বৌকে মারল কেন।

—শাশুড়ীর ঐ অবস্থা, মেয়েছেলে হয়ে কি সহ্য

করতে পারে। তাই বৌটা গেছল সেবা করতে। রেজাক এসেই চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে হিড় হিড় করে টেনে বার করল। তার পর লাথি মেরে ফেলে দিল উঠোনে। হাঁড়ির কানা লেগে কপাল কেটে গেল।··· এই ত ছেলের সুখ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই নার্সকে সঙ্গে নিয়ে রমানাথ ফিরল। কিন্ত তার আগেই অতিথি এসে গেছে। দূর থেকেই কচি গলার কান্না রমানাথ শুনতে পেয়েছে।

ওদের দেখতে পেয়ে হামিদ তাড়াতাড়ি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একমুখ দাড়ি, একটাও দাঁত নেই,—অথচ হাসিটা কত সুন্দর, কত সহজ!

হাসতে হাসতে রমানাথের পাশে এসে দাঁড়াল হামিদ। আনন্দ যেন সে আর ধরে রাখতে পারছে না। মাথা নেড়ে বলল, খোকা হয়েছে দাদাবাবু।—বলতে বলতে উঠোন থেকে কাটারিটা কুড়িয়ে নিয়ে বাতায় গুঁজে রাখল।

—•—

আশুতোষ স্মরণে*

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তব জন্ম-মহোৎসবে আজি মোরা মিলেছি সকলে
তব পদরেণুপূত জিরাটের এ প্রাঙ্গণতলে
ভুলিতে পারি না তব প্রজ্ঞাদীপ্ত সহাস্য আনন,
যুগসূর্য আশুতোষ করি মোরা তোমারে স্মরণ।

দুর্বার সে কর্মশক্তি একনিষ্ঠ সাধনা তোমার
অন্যায়ের প্রতি রোষে অগ্নিগিরিসম সে হুঙ্কার,
লাঞ্ছিত জাতির প্রাণে এনেছিল নব জাগরণ,
যুগসূর্য আশুতোষ করি মোরা তোমারে স্মরণ।

তুমি কভু ভোল নাই, তব বঙ্গভাষাজননীরে,
মহিমা-মুকুটখানি পরাইয়া দিলে তার শিরে,
তোমার কীর্তির রশ্মি এ ভারতে রবে চিরন্তন,
যুগসূর্য আশুতোষ করি মোরা তোমারে স্মরণ।

প্রতিভার বরপুত্র, ছাত্রবন্ধু, শিক্ষাগুরু তুমি,
তোমার সাধনাস্পর্শে বরেণ্যা হয়েছে বঙ্গভূমি,
যেখানে দেখেছ গুণী, করেছিলে তারে আমন্ত্রণ,
যুগসূর্য আশুতোষ করি মোরা তোমারে স্মরণ।

শাসকের রোষবজ্র নেমেছিল দিতে অপমান,
তুমি তুচ্ছ করি তারে বাড়াইলে দেশের সম্মান,
হে বঙ্গশার্দুল, তুমি উড়াইলে গৌরবকেতন
যুগসূর্য আশুতোষ করি মোরা তোমারে স্মরণ।

ধ্যানে জ্ঞানে কর্মে তব নিত্যকার আচারে বিহারে
যে জাগ্রত দেশপ্রেম করেছিল নির্ভীক তোমারে,
দেশের কল্যাণ লাগি' ছিলে তুমি সদা সচেতন,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

অলক্ষ্যে রচনা করে মহাকাল যেই ইতিহাস,
যুগ হতে যুগান্তরে আসে বহি' অমৃতআশ্বাস,
সেই ইতিহাসবুকে পেয়েছ যে অমর আসন,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

হে জ্ঞান-তপস্বী, তুমি মুক্ত করি জ্ঞানের ভাণ্ডার,
নিখিলের জ্ঞানক্ষুধা মিটাতে চেয়েছ বারবার,
দেশ-দেশান্তরে তাই করেছিলে সুধী-অন্বেষণ,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

আপনার কর্মশক্তি নিঃশেষে করেছ তুমি দান,
সর্ব ক্লেশ সহি তুমি সাধিয়াছ দেশের কল্যাণ,
চিরপরহিতব্রতী উৎসর্গিত পরার্থে জীবন,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

তোমার পরশে ধন্য বাংলার সর্বপ্রতিষ্ঠান
যুগরথ চালায়েছ সুনিপুণ চালক মহান্,
একদিকে জনশিক্ষা, অন্যদিকে ধর্মাধিকরণ,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

ঋষির তপস্যা আর লোকোত্তর মনীষা মিশ্রণে
অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালায়েছ শিক্ষানিকেতনে,
দিকে দিকে উড়ায়েছ মাতৃভূমি গৌরব-কেতন,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

জিরাটের ধূলিকণা তব পুণ্যস্মৃতিসমুজ্জ্বল
জিরাটের সমীরণ তব কীর্তিমহিমাচঞ্চল
এ জিরাট মহাতীর্থে আমাদের সার্থক মিলন,
যুগসূর্য আশুতোষ, করি মোরা তোমারে স্মরণ।

* গত ৫ই বৈশাখ রবিবার স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার জিরাট গ্রামে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'রবিবাসর' সাহিত্য-সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

ঠিক দুপুরের তারা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ঠিক দুপুরের তারা আমি তাকে বলি
নাম তার হয়তো অঞ্জলি
কিংবা রেণু, রেবা,
খোঁজ রাখে কেবা !
ধীরে ধীরে সে কেবল আসে
ও বাড়ীর জানালার পাশে,
এলোচুল কাঁধ বেয়ে ঝরে
বুকের উপরে
তরল রাত্রির মত,
আঁচলটি নয়কো সংযত,
সঙ্কোচের মানে না শাসন ;
নিত্য তার যেখানে আসন
সেখানে আমার ঘর থেকে
হয়তো একটু এঁকে-বেঁকে
দৃষ্টি পড়ে
নির্জন প্রহরে
যখন সবাই গেছে কাজে
বাহিরের মাঝে।
আমি শুধু বসে থাকি বিজ্ঞানের পুঁথিখানি খুলে
আঁখি দু'টি তুলে।

মন চলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
একগুঁয়ে
প্রশ্নের পাহাড়ে
কোথায় নিঃসাড়ে
চলে যায় তারা
যাহারা
রাত্রিকে করে দিন
পরিচয়হীন।

অন্ধকার আলোকের মাঝে
অবিরাম বাজে
যে নিঃশব্দ সুর
কাছে তবু দূর,
সেই অপরূপ
কোলাহল মর্মে বসি চুপ !

অকস্মাৎ আমার দুপুর উর্বশীর স্খলিত নূপুর
বেতাল সংসারে।

খোলা জানালার ধারে
ও ত মৌন সাধারণ নয়,
অনিঃশেষ পুঞ্জিত বিস্ময়।

ও যে পথহারা
দুপুরের তারা
মোর মুগ্ধ চোখে,
কালো তারে বলুক না লোকে।
সে আমার হৃদয় আকাশে
নতুন পৃথিবী হয়ে ভাসে।

ডি. কারভানটেস্

[বিশ্বসাহিত্যে যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখক লোক-রঞ্জক সাহিত্য রচনা করে চিরন্তন খ্যাতি অর্জন করেছেন, ডি. কারভানটেস্ তাঁদের অন্যতম। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডন্ কুইক্সোট্' পড়েন নি এমন শিক্ষিত লোক বিরল। তাঁর জীবনও নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। জন্ম তাঁর ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং সে যুগের মতবাদ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, কুসংস্কার ও ধর্মমত তাঁর রচনার মধ্যে পরিস্ফুট। তরুণ বয়সে কিছুদিনের জন্য তিনি সৈন্য-দলে যোগ দেন, কিন্তু নিয়মের কঠোরতা তাঁর ধাতে সইল না। জলপথে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন একদল জলদস্যুর হাতে। সে যুগে সমুদ্রপথে জলদস্যুর প্রভাব ছিল খুব বেশি। তারা কারভানটেসকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে সুদূর আলজিয়ার্স-এ একজন ধনীলোকের কাছে ক্রীতদাসরূপে বেচে দেয়। চার বছর তিনি নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দাস-জীবন অতিবাহিত করেন। তার পর কোন রকমে মুক্তি পেয়ে তাঁর নিজের দেশ মাদ্রিদ সহরে এসে উপস্থিত হ'লেন। সকলে তখন তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে নাটক রচনা করতে তাঁকে অনুরোধ করলে। সে-যুগে নাটক ছিল বেশি জনপ্রিয় সাহিত্য, যেমন আমাদের বাংলা দেশে যাত্রা গান ছিল একদিন লোকশিক্ষার সাহিত্য-পথ। কিন্তু কারভানটেসের নাটক কোন বিশেষ কারণে ভাল জমল না। তখন মাদ্রিদের এক্সচেকারের প্রতিষ্ঠানে একটা সামান্য চাকুরি নিয়ে তিনি কোন রকমে জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন। তাঁর স্বভাব ছিল একটু বে-হিসাবী, তাই হিসাবে গোলমাল হওয়াতে তাঁকে যেতে হ'ল জেলে। আবার চাকরি, আবার জেল। এইভাবে বার তিনেক জেল খেটে চাকরির উপর তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেল। তখন তিনি স্থির করলেন লোকরঞ্জক সাহিত্য রচনা করেই জীবিকা অর্জন করতে হবে। অনেক প্লটই মাথায় এল, কিন্তু কোনটাই তাঁর মনঃপূত হ'ল না। শেষে স্থির করলেন সে-যুগের বীরত্বকে ব্যঙ্গ করে একখানা হাসির বই লিখলে মন্দ হয় না। তাই তিনি আরম্ভ করলেন 'ডন্ কুইকসোট' লিখতে।

বইখানার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল বটে, কিন্তু এতে তাঁর মোটা রকমের কিছু অর্থলাভ হ'ল না। তবুও আশায় আশায় তিনি ডন্ কুইকসোটের দ্বিতীয় খণ্ড বার করলেন ও পাছে আর কেউ তাঁর নায়ককে নিয়ে আবার কোন বই লিখে ফেলে, তাই নায়কের মৃত্যু ঘটিয়ে বই শেষ করলেন। এতেও তাঁর সাংসারিক অভাব ঘুচল না। নানা রকমে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে শেষে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ডি. কারভানটেসের রচনার প্রধান গুণ তাঁর নিখুঁত বর্ণনাশক্তি ও সাবলীল ভঙ্গি। সরল ও সহজভাবে তিনি যা লিখতেন, তাতে লোকরঞ্জন ত হ'তই, তা ছাড়া চিন্তার খোরাকও ছিল অনেক। তাই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি শেষ জীবন কাটিয়ে গেলেও, তাঁর উত্তরাধিকারীরা শেষে একদিন ডন্ কুইকসোটের কল্যাণে অনেক টাকার মালিক হয়ে বসেছিলেন। আর একটি গুণ আছে কারভেনটেসের রচনায়। একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্রোত ফল্গুধারার মত প্রত্যেক ঘটনার আড়ালে বয়ে চলেছে। এ শক্তি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই। অনেকের মতে যে-গুণে কারভেনটেস আজ অমর সাহিত্যিক রূপে বিশ্ববিখ্যাত, সেটি হচ্ছে এই ব্যঙ্গ করবার আশ্চর্য নৈপুণ্য। পাঠকেরা সে-সব ব্যঙ্গ উপভোগ করছেন, কিন্তু মন তাঁদের ভাগ্যবিড়ম্বিত

নায়কের প্রতি সদাসমবেদনশীল। এইখানেই কারভেনটেস বাজিমাৎ করেছেন, তাই আজও তাঁর 'ডন্ কুইক্সোট' অম্লান গৌরবে সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্য হয়ে রয়েছে]

ডন্ কুইক্সোট

গ্রামটির নাম লা মাঞ্চা, আকারেও ছোট।

তারই একটি ক্ষুদ্র গৃহে থাকতেন কুইক্সোডা নামে এক ভদ্রলোক।

বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেছে, সংসারে আপন বলতে শুধু এক ভাইঝি। একজন দাসী সংসারের কাজকর্মের দেখাশুনা করে। আয়ও যে বেশি, তা নয়,—কোন রকমে চলে যাচ্ছে এই রকম আর-কি।

আস্তাবলে ছিল তাঁর একটা বুড়ো ঘোড়া আর দরজা আগলে থাকত একটা বুড়ো কুকুর। ওদের ছাড়া ভদ্রলোকের চলত না একদণ্ডও।

কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না ভদ্রলোকের। তবুও গ্রামের মধ্যে সামান্য কিছু কাজে কোন রকমে জীবিকা তিনি যোগাড় করে নিতেন। অবসর ছিল যথেষ্ট, তাই বাড়ীতে বসে বই পড়তেন।

কি বই পড়া যায়, এই চিন্তা তখন তাঁকে পেয়ে বসল। সেটা ছিল বীরত্বের যুগ, তাই বীরত্বের কথা-কাহিনী পড়তে তাঁর ভাল লাগত। নাইট বলে যে-সব যোদ্ধা তখনকার যুগে বীরত্ব দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিল, তাদের জীবনী তাঁর ভাল লাগত খুব। এই সব নাইট যোদ্ধা বর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা নিয়ে আর কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দুর্বলের পক্ষে বীরত্ব দেখাতেন। এই সব নাইট তখন ছিল লোকের উপাস্য বীর। এদের কীর্তিকাহিনী তখন ফিরত লোকের মুখে মুখে। তাই কুইক্সোডা মশাই স্থির করলেন এই সব নাইটদের আদর্শের অনুসরণ করে তাঁর পক্ষেও ত নাইট হওয়া চলে! ভেবে-চিন্তে তিনি তখন খুঁজে বার করলেন পুরানো মর্চেপড়া এক বর্ম আর একটা বর্শা। তার পর ঘোড়ায় চড়তে গেলে তাঁর সেই বুড়ো ঘোড়াটি ত ছিলই।

এই সব বিষয় ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হ'ল তিনিও একজন নাইট, ভাগ্যবিড়ম্বনায় গরীবের ঘরে জন্মেছেন। তাই এখন থেকে তাঁকে নাইটের সাজসজ্জা করে পূর্বগৌরব উদ্ধার করতে হবে। কত যে দিগ্‌বিজয় অপেক্ষা করে আছে তাঁরই জন্যে! তাই তিনি সেই মর্চেপড়া বর্মটিকে ঘষে-মেজে সাফ করে পরে', বুড়ো ঘোড়াটির পিঠে চড়ে' বর্শা হাতে নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বার হ'লেন একদিন।

গ্রামের লোক ত অবাক। মাথাখারাপ হ'ল না কি ভদ্রলোকের! কিন্তু মুখ ফুটে বলবেই বা কে? কুইকসোডা ত ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন মাঠের মধ্যে। তাঁর সেই ঢিলে বর্ম আর হাতে বর্শা দেখে ভয়ে লোকজন সরে যেতে লাগল। তিনি তাঁর নামটাও বদলে ফেললেন —হ'লেন ডন্ কুইকসোট্।

মাঠ পেরিয়ে তিনি পড়লেন এসে একটা বড় সড়কে। সেই সড়কের ধারে ছিল একটা সরাইখানা। দূর থেকে সরাইখানাটাকে দেখে তাঁর মাথায় এক উদ্ভট কল্পনা এল। তিনি ভাবলেন সেটা একটা সামন্ত জমিদারের দুর্গ। সেই সরাইখানার সামনে দু'টি তরুণী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দেখে তিনি মনে করলেন, অত সুন্দরী মেয়ে দুর্গাধিপতির কন্যা না হয়ে আর যায় না। তিনি তখন নাইটদের পদ্ধতি ধরলেন। সেই মেয়ে দু'টির সামনে এসে দাঁড়িয়ে কেতাবীভাষায় তাদের নারীস্তুতি আরম্ভ করলেন। মেয়ে দু'টি বর্মাবৃত এক অদ্ভুত চেহারার লোককে ঘোড়া থেকে বর্শা হাতে নামতে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে সরাইখানার মধ্যে গেল ও সকলকে খবর দিলে।

সকলে এসে তখন কুইক্সোটের সেই বেশ ও ভাবভঙ্গি দেখে ত হাসতে আরম্ভ করে দিল! কুইকসোট ভীষণ চটে উঠে বললেন—"আরে, তোমরা হাসছ কেন? জান, আমি একজন নাইট্।"

সরাইখানার মালিক তখন এগিয়ে এসে তাঁকে লোক-দেখান সম্মান দেখিয়ে বললে—"তা জানি বৈ কি হুজুর! আপনি যে একজন নাইট্, তাতে আর সন্দেহ কি?

তখন আশ্বস্ত হয়ে কুইকসোট্ সেই সরাইখানায় ঢুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে খাবারদাবারের হুকুম দিলেন। সরাইখানার মালিক ভাবলেন, লোকটার মাথায় ছিট থাকলেও ট্যাঁকে পয়সা আছে নিশ্চয়ই। তাই তাঁর আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটী হ'ল না। শেষে কিন্তু দাম চাইবার সময়ে দেখা গেল নাইট্ মহাশয়ের কাছে একটিও পয়সা নেই। তখন আর কোন উপায় না দেখে সরাইখানার মালিক তাঁকে বার করে দিলেন ঘর থেকে।

কুইকসোট্ চললেন এবার। পথে দেখলেন, একজন লোক একটা ছেলেকে খুব ঠ্যাঙাচ্ছে। তিনি তখনি

তার কাছে গিয়ে বললেন—"কি এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার, আমার সামনে ছেলে ঠ্যাঙাও?"

লোকটা কুইকসোটের বেশভূষা ও চোখরাঙানী দেখে প্রথমটা খুব ভড়কে গেল। তার পর ঠ্যাঙানি বন্ধ রেখে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কুইকসোট বললেন—"জান, আমি কে? আমি হ'লাম ডন কুইক্সোট্—একজন মহাবীর নাইট্,—আমি দিগ বিজয় করতে বেরিয়েছি। খুব সাবধান, আমার সামনে কারুর উপর কোন অত্যাচার করা চলবে না।"

লোকটা তখন বুঝতে পারলে যে কুইকসোটের মাথার কিছু ছিট আছে। কুইকসোট চলে যেতেই সে আবার ছেলে ঠ্যাঙান আরম্ভ করলে।

কুইকসোট চলেছেন ঢিলে বর্ম আর বুড়ো ঘোড়ায় চেপে দিগ্‌বিজয়ে। পথে দেখা হ'ল একদল বণিকের সঙ্গে। তাঁর উদ্ভট কল্পনায় মনে হ'ল, এরা একদল দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য। এদের আক্রমণ করলে তবেই তাঁর নাইট্-খ্যাতি আরও বেড়ে যাবে। তিনি তখন বর্শা উঁচু করে বুড়ো ঘোড়াটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের উপরে।

বণিকদল হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে ত একেবারে হতভম্ব! তারা প্রথমটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তার পরেই তারা তাদের হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে পিটুতে লাগল ডন্ কুইকসোটকে। কুইকসোট তখন ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেছেন। তাঁর বর্শাও গেছে ভেঙ্গে। বণিকের দল তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে যে যার পথে চলে গেল। ঘোড়াটাও তখন খোঁড়া হয়ে গেছে।

বেলা বাড়ছে, বর্মের ভেতরে থেকে গরমে কুইক-সোটের প্রাণ যায়-যায়। সর্বাঙ্গে দারুণ যন্ত্রণা। পথের একজন লোক তাকে দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক গাধার পিঠে চাপিয়ে তাঁর বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তাঁর ভাইঝি ত কাকার সেই অবস্থা দেখে কেঁদেই অস্থির।

কিছুদিন থাকার পর কুইকসোটের মনে হ'ল, জগতের সব মহৎ কাজেই অনেক বাধা আছে, ঘাবড়ালে চলবে না। তবে পথে এবার একজন চাকরের দরকার। তা না হলে মহামান্য নাইট হওয়ার সম্মান ও গৌরব যেন কিছুটা কমে যায়। তাই তিনি একজন উপযুক্ত চাকরের সন্ধান করতে লাগলেন।

সাঙ্কোপাঞ্জা নামে ঐ গ্রামেই একজন সরল প্রকৃতির বোকা লোক থাকত। কুইকসোট এবার তার কাছে গেলেন।

"—মাইনে কি দেবেন বলুন?"—সাঙ্কোপাঞ্জা যেন বেশ চালাক হয়েই প্রশ্নটা করল।

"মাইনে?"—কুইকসোট বললেন—"মাইনে ত কিছু দিতে পারব না, তবে আমি দিগ্‌বিজয়ে বার হয়ে যেসব রাজ্য জয় করব, সেগুলি তোমাকেই দিয়ে দোব।"

"আমাকে রাজ্য দেবেন?"—অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে সাঙ্কোপাঞ্জা। মনে তার রাজা হবার বড় সাধ।

"যত চাও, তত দোব।"—বেশ মুরুব্বিচালে বললেন কুইকসোট।

"বেশ, আপনার সঙ্গে চাকর হয়ে যেতে আমি রাজী।"

পরদিনই কুইকসোট বার হয়ে পড়লেন আবার সেই রকম বর্মাবৃত বেশে বুড়ো ঘোড়ায় চড়ে। তবে এবার তাঁর পিছনে পিছনে চলল একটা গাধার পিঠে চড়ে সাঙ্কোপাঞ্জা।

কিছুদূর গিয়ে মাঠের একপাশে কুইকসোটের নজরে পড়ল একটা মস্ত বড় হাওয়া-কল। সেকালের হাওয়া-কল ঘুরত বাতাসে, চারটে বড় বড় পাখা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে। কুইকসোট ভাবলেন, সেই হাওয়াকলটা নিশ্চয়ই একটা দৈত্য, জাদু দেখিয়ে হাওয়াকল হয়ে তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বধ না করলে তাঁর নাইট-খ্যাতি কমে যাবে। তাই কোন কিছু আর চিন্তা না করেই কুইকসোট বর্শা বাগিয়ে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন হাওয়াকলের দিকে।

সাঙ্কোপাঞ্জা যত বলে,—"ও কি করতে যাচ্ছেন হুজুর! এখনি যে আপনারই প্রাণ যাবে।" ততই জোরে ছোটেন কুইকসোট।

দৈত্যনিধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কুইকসোট ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাওয়াকলের উপরে। কিন্তু দৈত্যনিধন ত হ'লই না, উল্টে তাঁর ঘোড়াশুদ্ধ তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন ঘুরন্ত পাখার আঘাত পেয়ে। চারদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ। সাঙ্কোপাঞ্জা ছুটে এল প্রভুকে মাটি থেকে তুলতে।

কিছুদিন বাড়ীতে থেকে, শরীর একটু সুস্থ করে ডন্ কুইকসোট সাঙ্কোপাঞ্জাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বার হ'লেন দিগ্‌বিজয়ে।

রাস্তার লোক কেউ ভয়ে সরে যাচ্ছে, কেউ উপহাস করছে, কিন্তু কুইকসোটের লক্ষ্য দিগ্‌বিজয়ে। কিছু-দূর যাবার পর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল যেন সামনের রাস্তায় ধুলো উড়ছে। ও ধুলো কেন? তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই একদল সৈন্য মার্চ করে তাঁরই দিকে এগিয়ে

আসছে। ওরা কি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়? বেশ, তিনি প্রস্তুত। এই কথা ভেবেই কুইকসোট বর্শা উঁচু করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সেদিকে।

এখন হয়েছে কি, একপাল ভেড়া নিয়ে কতকগুলি লোক শহরে যাচ্ছিল। ভেড়ার পালই ধুলো উড়িয়ে পথে আসছিল। কুইকসোট প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই ভেড়ার পালে, আর ডাইনে-বাঁয়ে ভেড়ার উপর বর্শা চালাতে লাগলেন তিনি তাদের শত্রুসৈন্য ভেবে। ভেড়াগুলো প্রাণের ভয়ে যে যে-দিকে পারে ছুটতে লাগল।

লোকগুলি দেখে, তাদের ভেড়া যে সব হাতছাড়া হয়ে যায় এই অদ্ভুত পোষাকপরা লোকটার আক্রমণে! তখন তারা সকলে মিলে হাতের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে লাগল ডন্ কুইকসোটকে। সাঙ্কোপাঞ্জাও বাদ গেল না। ভেড়াওয়ালাদের মার খেয়ে কুইকসোটের অবস্থা তখন কাহিল!

আবার কিছুদিন বাড়ীতে থেকে একটু সুস্থ হয়ে কুইকসোট বেরিয়ে পড়লেন নূতন দিগ্‌বিজয়ে। এবার চললেন অন্যদিকে। কিছুদূর যাবার পর তাঁর নজরে পড়ল, একদল পুলিস কতগুলি চোরকে বেঁধে নিয়ে থানায় যাচ্ছে।

দুর্বলকে রক্ষা করাই নাইটের ধর্ম। তাই এ দৃশ্য দেখে কুইকসোট আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি হঠাৎ বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পুলিসের দলকে আক্রমণ করলেন। পুলিসের দল এই অবাক্ কাণ্ড দেখে চোরগুলোকে ছেড়েই ছুটে পালাল থানার দিকে।

এই আক্রমণে চোরদের মধ্যেও দু'চারজন আহত হয়েছিল। তারা তখন রেগে গিয়ে সকলে মিলে বেদম পিটুতে লাগল কুইকসোট আর সাঙ্কোপাঞ্জাকে। তারপর তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সকলে একসঙ্গে সরে পড়ল।

সাঙ্কোপাঞ্জা তখন কুইকসোটের কানে কানে বলল —"প্রভু, এবার সরে পড়াই ভাল, কেননা পুলিসের দল থানা থেকে আরো পুলিস আনতে গেছে। তারা আপনার মত মহামান্য নাইটের সম্মান হয়ত রাখবে না।"

মার খেয়ে অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডন্-কুইকসোট সাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে আবার বাড়ী ফিরলেন।

কিছুদিন বাড়ীতে থাকবার পর আবার জেগে উঠল তাঁর দিগ্‌বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা। তিনি পূর্বের মতই বার হলেন ঘোড়ায় চড়ে।

এদিকে বার বার একই রকমের ঘটনা ঘটাতে, চারদিকে কুইকসোটের খ্যাতি রটে গিয়েছিল। এবার যখন তিনি মাঠ পেরিয়ে অন্য এক জমিদারের দেশে উপস্থিত হ'লেন, তখন সেই জমিদার একটু রগড় করবার জন্যে তাঁর অভ্যর্থনা করতে ভাল সাজপোষাক পরে দলবল নিয়ে এগিয়ে এলেন কুইকসোটের কাছে। বললেন—"হে মহামান্য নাইট্ বাহাদুর, আমার এ প্রাসাদ ধন্য হবে, যদি আপনি এখানে পদার্পণ করেন। আমরা সকলে আপনার আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

কুইকসোট তখন ঘোড়া থেকে নেমে জমিদারকে বললেন—"হে অমিতপ্রতাপ রাজাধিরাজ, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করে আমি এবং আমার অনুচর এই বীরশ্রেষ্ঠ সাঙ্কোপাঞ্জা ধন্য হব।"

তারপর সাঙ্কোপাঞ্জাকে কানে কানে বললেন—"দেখছ ত সাঙ্কো, অভিনন্দনের ঘটা খানা! আমি যে একজন দুর্দ্ধর্ষ নাইট, এটা এরা বেশ জানে।"

সাঙ্কো তখন ভাবলে, "একবার বলেই দেখি না, এই রাজাকে আমার মনের কথা।" তাই জমিদারের সামনে গিয়ে সাঙ্কো বললে—"হে মহানুভব মহারাজ, আমার একটি প্রার্থনা, আপনি যদি আমাকে কোন রাজ্যের রাজা করে দেন তবেই আমার আশা পূর্ণ হয়।"

জমিদার তখন হেসে বললেন—"এই কথা তোমার! বেশ, আমি এখনই তোমাকে রাজা করে পাঠাচ্ছি আমার অধীন একটি প্রদেশে।" এই কথা বলে তিনি গোপনে কর্মচারীদের সব মজার উপদেশ দিয়ে সাঙ্কোকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক দূরস্থ কাছারিতে।

সাঙ্কো সেই কাছারিবাড়িতে যেতেই সকলে তাকে "আমাদের রাজা এসেছেন, আমাদের রাজা এসেছেন" বলে খুব অভ্যর্থনা জানাতে লাগল, আর বেশ জমকালো একটা পোষাক পরিয়ে তাকে একটা ভাল চেয়ারে বসিয়ে সকলে হাতযোড় করে তার সামনে তার আদেশের প্রতীক্ষায় বসে রইল।

সাঙ্কো ত মহাখুশী। কিন্তু তার খিদেও পেয়েছে খুব। একজন লোককে সে কথা মুখফুটে বলতেই সে বললে—"সে কি কথা রাজন্, রাজাদের কি যখন-তখন খেতে আছে? আপনি নতুন এসেছেন কি না, তাই জানেন না। আমরা যখন আপনাকে খেতে দোব তখনই আপনি খাবেন। এই হ'ল রাজ-নিয়ম।"

সাঙ্কো মহা মুস্কিলে পড়ল। কিন্তু রাজা হ'তে গেলে

সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতেই হবে। তাই খিদের তাড়না কোন রকমে সহ্য করে রইল অনেকক্ষণ।

কেউ আর খেতে ডাকে না তাকে, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। এ কি রাজনিয়ম রে বাবা! সাঙ্কো তখন খিদেয় পাগলের মত হয়ে পাচকের ঘরে ঢুকে যেই কিছু মুখে দিতে যাবে অমনি রাজচিকিৎসকবেশী একজন অনুচর এসে বললে—"আহা-হা করছেন কি! আমি হ'লাম রাজ-চিকিৎসক। আমার অনুমতি ছাড়া কিছুতে মুখ দেবেন না আপনি। আপনার রাজ-শরীরের কোন ক্ষতি হ'লে, আমারই যে শির যাবে! এখন খিদেটাকে সংযত করে রাখুন। একটু পরেই আমি অনুমতি দিচ্ছি।"

বেচারা সাঙ্কো কি আর করে, ধীরে ধীরে পাচকের ঘর থেকে ফিরে এল। তারপর কাউকে কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে এসে একছুটে একেবারে চম্পট। রাজা হওয়ার চেয়ে রাস্তার ভিখারী হওয়াও যে এর চেয়ে ভাল।

একজন অনুচর সাঙ্কোকে পালাতে দেখে সকলকে খবর দিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। সকলে মিলে এবার তাকে কিছু খেতে দিয়ে বললে—"দেখুন মহারাজ, আজ এখনি আমাদের সকলকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে, আপনি হবেন আমাদের সেনাপতি।

সরলপ্রকৃতির মানুষ সাঙ্কোপাঞ্জা বললে—"সেনাপতি হ'তে গেলে কি করতে হয়?"

—"সর্বাঙ্গে বড় বড় ঢাল বেঁধে যুদ্ধে যেতে হয়।"

তখন সাঙ্কোকে চেপে ধরে সকলে তার সর্বাঙ্গে বড় বড় ঢাল বেঁধে দিলে। সেই ঢালের চাপে ও ভারে সে আর নড়তে পারে না। তখন আর একদল অনুচর শত্রু সেজে এসে খুব হৈ চৈ করে সাঙ্কোকে চারপাশ থেকে পিটুতে লাগল। বেচারা সাঙ্কো তখন মারের চোটে প্রায় অজ্ঞান।

অবশেষে সাঙ্কোকে মুক্তি দিয়ে তারা পাঠিয়ে দিলে তাকে কুইকসোটের কাছে।

এদিকে কুইকসোটের অবস্থাও শোচনীয়। জমিদারের বাড়ীতে সকলে মিলে তাঁকে এমন ক্ষেপাতে লাগল যে তিনি সেই অদ্ভুত আদরের ঠেলায় পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগলেন। শেষে একদিন তাদের বিনীত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন জমিদারের বাড়ী থেকে। এই সময়ে দেখা হয়ে গেল তাঁর সাঙ্কোর সঙ্গে। সাঙ্কোও পালিয়ে এসেছিল জমিদারের কাছারি থেকে।

দু'জনে এবার ঠিক করলেন, সে দেশ ছেড়ে অন্য-দেশে যেতে হবে। আবার তাঁরা বার হ'লেন নূতন পথে।

এদিকে জমিদারও তাঁদের সঙ্গে আরও একটু মজা করবার জন্যে তাঁর একজন দরোয়ানকে বর্ম পরিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে হাতে বর্শা দিয়ে নাইট সাজিয়ে ডন্‌-কুইকসোটের অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন।

একটা বনের ধারে দু' নাইটে দেখা হ'ল। ডন্‌ কুইকসোটকে সেই দরোয়ান-নাইট বললে—"এ বন আর এ পথ আমার দখলে। আমি একজন নাইট। তুমি এ পথ দিয়ে যেতে পাবে না। যদি যেতে চাও তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

নাইট্‌-ধর্মের নিয়ম এই যে, কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে "না" বলতে নেই। সুতরাং ডন্‌ কুইকসোট আর দরোয়ান-নাইটে যুদ্ধ বেধে গেল। সাঙ্কোপাঞ্জা যতই বারণ করে, ডন্‌ কুইকসোট সে কথা শোনেন না। শেষে রীতিমত মার খেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগলেন। সাঙ্কো যতটা পারে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল।

একটু সুস্থ হ'তেই লোকজনের সাহায্যে ধরাধরি করে ডন্‌ কুইকসোটকে আবার তাঁর বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হ'ল। এবার কিন্তু তিনি মার খেয়েছিলেন বেশি, তাই কাতর হয়ে শয্যা নিলেন।

অসুখ বেড়ে চলল। ডাক্তারবদ্যি এল। কিন্তু রোগের কোন উপশম হ'ল না। সকলে তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ল। সাঙ্কো কিন্তু প্রভুর শয্যার পাশে সর্বদা থাকত।

এক সময়ে ডন্‌ কুইকসোট সাঙ্কোকে হাতের ইঙ্গিতে খুব কাছে ডেকে বললেন—"দেখ সাঙ্কো, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার এ রোগ ভাল হবার নয়। শুধু মরবার আগে তোমাকে দু'চারটে কথা বলে যাই।"

সাঙ্কো দুঃখে কেঁদে ফেললে। তারপর প্রভুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—"কেন আপনি এ সব খেয়াল করেছিলেন? এর জন্যেই ত আজ আপনাকে হারাতে হ'ল।"

ডন্‌ কুইকসোট ম্লান হাসি হেসে বললেন—"এতদিনে বুঝেছি আমি কি ভুলটাই করেছি। কিন্তু এখন ত আর সে ভুল শোধরাবার কোনই উপায় নেই সাঙ্কো। আমি এখন পরলোকযাত্রী। আমি তোমার প্রতি কত অন্যায়ই-না করেছি। কিন্তু তোমার

মত ভৃত্য পাওয়া এ জগতে দুর্লভ। তাই আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক তোমাকে আর অপর অর্ধেক আমার ভাইঝিকে উইল করে দিতে চাই।

উকীল ডাকা হ'ল, উইলও প্রস্তুত হ'ল। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে কিছু-কিছু দিয়ে তিনি অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'লেন।

সাঙ্কো বললে—"প্রভুর কি অন্তিম ইচ্ছা আমাকে জানান।"

ডন্ কুইকসোট বললেন—"আমার শেষ ইচ্ছা, আমার মৃত্যুকালে আমার সুখদুঃখের সাথী সেই বর্মাটি আর বর্শাটি আমার কাছে রাখ। ঘোড়াটিও যেন দ্বারে বাঁধা থাকে। তবে আর একটি কাজ করতে হবে তোমাকে। আমার লাইব্রেরী থেকে নাইট্‌দের জীবনী ও আশ্চর্য কাহিনীর বইগুলো এনে ঐ জানালার পাশে স্তূপীকৃত করে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে দাও, যাতে আর কেউ ওগুলো পড়ে আমার মত বিড়ম্বিত জীবন না ভোগ করে। আমার এই পাগলামির জন্যেই আমি আমার জীবনের সবকিছু হারিয়েছি। আর কেউনা এ পথে আসে।

সাঙ্কো তখন প্রভুর অবস্থা ভেবে কেবলই চোখের জল ফেলছে।

ডন্ কুইকসোটের অন্তিম ইচ্ছানুসারে সব কিছু করা হ'ল। শেষে একদিন তাঁর মৃত্যুর সময় এল। তিনি ধীর শান্তস্বরে সাঙ্কোকে ডাকলেন—"সাঙ্কো!"

—"আজ্ঞে প্রভু, এই ত আমি আপনার কাছেই আছি।"

—"দেখ দেখি সাঙ্কো, আকাশের রঙ্ কি সুন্দর! কারা যেন আমাকে ডাকছে—"নাইট্ ডন্ কুইকসোট্, এই ত তোমার উপযুক্ত সময়, দিগ্বিজয়ে বার হবে না? এস—"

শেষকথা বলতে বলতে সাঙ্কোর হাতে হাতটি রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ডন্ কুইকসোট।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ এসে চলে গেছে। সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের মনের পথ ধরে ডন্ কুইকসোট আজও চলেছেন দিগ্বিজয়ে—তাঁর সেই বুড়ো ঘোড়ার উপর চড়ে, বর্মের সাজ পরে,' আর হাতে বর্শা নিয়ে। সাঙ্কোপাঞ্জাও আছে তাঁর সঙ্গে। অনাগত যুগেও শোনা যাবে তাঁদের পদধ্বনি, নিখিল বিশ্ব অভিনন্দন জানাবে এই আপনভোলা চিরন্তন নাইট্ মানুষটিকে।

—)০(—

কোপ্‌লন

এ প্রাইস অন হিজ হেড

লেখিকা — শ্রীমতী অ্যানা জেগার্স

অনুবাদিকা — শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

সে রবিবারের পড়ন্ত বিকেলে লোকে ঠাসা একটা ট্রাক বিল্লিঞ্জেন থেকে ওবারভাইলারবাখ্-এর বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল পিছনে ধুলোর ঘন মেঘ উড়িয়ে। ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে বসে ছিল ডজনখানেক কৃষকের ছেলে এবং তাদের বয়স্ক ও অল্পবয়সী আত্মীয়রা, বেশীর ভাগই পুরুষ, পরণে তাদের রবিবারের কালো স্যুট। তরুণ কৃষকেরা পরেছে বেল্ট আঁটা বায়ুরোধী কোট, উঁচু বুট এবং ব্যাজ লাগানো টুপি। ট্রাক এবং ড্রাইভার দুই-ই বিল্লিঞ্জেনের ষ্ট্রহমাইরার ভাটিখানার। আগের দিন সন্ধ্যায় বিল্লিঞ্জেনে সভা হয়েছিল তার জন্য ভাটিখানাওয়ালারা তাদের জায়গা দিয়েছিল এবং এখন ট্রাক, ড্রাইভার ও কয়েক পিপে বীয়ার দিয়েছে প্রমোদ-ভ্রমণে ব্যবহারের জন্য। সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডক্টর ডোয়েবরিংস্—তিনি সেই উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে এসে-ছিলেন, আর বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিল্লিঞ্জেনের চাষী ফেডার এবং দুগ্ধ সমিতির হাইন্‌রিশ্ ব্রাইডাইজ্।

এখন যারা ট্রাকে করে চলেছে তাদের কাছে ড্রাইভারের পাশে বসা ওবারভাইলারবাখ্-এর বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ চাষী ক্রিস্টিয়ান কুঙ্কেলের বলা এক লাইনের গুরুত্ব ওই তিনটি বক্তৃতার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। হাত উঁচু করে কুঙ্কেল মঞ্চে দাঁড়িয়েছিল এবং ব্রাইডাইজ্ পই পই করে তার কাণে যা ঢুকিয়েছিলেন ঠিক সেই ক'টি কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল: "আজ আমার গ্রাম থেকে আমিই একমাত্র লোক, কিন্তু ফের যখন আসব তখন আমরা বিশ-জন, অন্ততঃ বিশজন হব। হাঁ, ভগবানের নামে আপনাদের কাছে এই শপথ করলাম।" কুঙ্কেল তার ছোট ভাই গট্‌লিয়েব-এর কথা উল্লেখ করতে অবহেলা করেছিল। সে পাশের একটা সারিতে ঠাসাঠাসি করে বসেছিল এবং কুঞ্চিত ভ্রু ও দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর নিয়ে ভাইএর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। এখন ট্রাকের পিছন দিকে দুটো তাগড়া জোয়ান ছেলের মাঝখানে গুঁজড়ে বসে সে তার ভাইয়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে ছিল, মুখে তার সেই একই ভাব।

ড্রাইভারের পাশে বসা কুঙ্কেল একটা সানন্দ নীরবতা অবলম্বন করে ছিল। একই উজ্জ্বল মুখ সমস্ত ক্ষেতগুলোতে গিজগিজ করছিল, তারা ওদের দিকে হাঁ করে বড় বড় চোখে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। কুঙ্কেলের পক্ষে আজকের সন্ধ্যা তার জীবনের দ্বিতীয় বৃহৎ ঘটনা। প্রথমটি এসেছিল তার বাবার শেষকৃত্যের দিনে। তার মা তখনও বসে বসে চোখ মুছছিল। ভাই এবং বোন তার দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে ছিল। আর হঠাৎ সে হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে, সে এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করেছিল: "যাও, শালগম কুঁচি কুঁচি কর, সুরু করে দাও"—সে বলেছিল তার ছোট্ট ভাই গট্‌লিয়েব্‌কে। গট্‌লিয়েবের ভুরুটা সামান্য একটু কুঁচকে গিয়েছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সে শালগম কুঁচিয়েছিল।

পরে যখন লোকে কুঙ্কেলকে জিজ্ঞাসা করেছে: "চলছে কেমন?" সে সব সময়ে জবাব দিয়েছে, "আমার কিছু নালিশ করবার নেই।" তাজার হ'লেও লোকের সুনাম হ'ল সিমেন্টের মত যা নাকি বাড়ীটাকে একসঙ্গে জুড়ে রাখে। সে নিজে সারাদিন পরিশ্রম করে এবং তার তিন সাহায্যকারী—মা, ভাই ও বোনকে দাসের মত খাটায়। তার সম্পত্তিতে যে কেবল তার জন্যে যারা কাজ করে তারাই আছে এবং তাকে কারও কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হয়

না এটা তার বেশ পছন্দসই। বিয়ের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার মত যথেষ্ট সুচতুর ছিল সে। তার ধমনীতে এমন এক বিন্দু রক্তও ছিল না যা পারিপার্শ্বিকের কাছে নতি-স্বীকার করত না।

তার অনেক নিজস্ব ধারণা ছিল। সে তার একটা ক্ষেতে টমাটো ফলানর চেষ্টা করেছিল, এবং গ্রামের মধ্যে সেই প্রথম গরমি-ঘর তৈরী করেছিল। মামুলি সময় ছাড়া অন্যান্য সময়েও সে ফুলকপি ও স্যালাডের চাষ করত। ট্রেণ ব্যবহার না করেও মালপত্র বিল্লিঙ্গেনে পাঠানর ব্যবস্থা নিয়ে সে মাথা ঘামাত। বিল্লিঙ্গেন থেকে দুধ-সমিতির, ইহুদীদের এবং ভাটিখানার ট্রাক আসত। শেষোক্তটাই সে পছন্দ করে নিয়েছিল এবং তার জন্য ড্রাইভারকেও বলেছিল। লোকটা সব সময়ে খালি ট্রাক নিয়ে ফিরে যায়, সে ত বাজারের দিনগুলোতে তার মালপত্র নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে। সুসময় হ'লে এই রকম অধ্যবসায়ে তার বেশ শ্রীবৃদ্ধি হ'ত। এখন সে কেবল কোনও রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। সে খবরের কাগজ এবং প্রচার-পত্র জড়ো করে পড়ত। আর আশপাশে উড্ডীয়মান পতাকাগুলো দেখত। "ফেরকে"১ এবং "হাইল" ২, "রোটে ফ্রন্ট"৩ এবং নিডার" ইত্যাদি আওয়াজ তার মাথায় ঘুরত। মুখ সে বন্ধ রাখত। কিন্তু যখনই সময় পেত তখনই সে গভীরভাবে ভাবত কোন্‌টা তার সবচেয়ে কাজে লাগবে।

একদিন সন্ধ্যায় কুঙ্কেল বিল্লিঙ্গেন থেকে ফিরে এল দুটো স্বস্তিকামার্কা পতাকা নিয়ে। একটা টাঙ্গাল তার দরজার সামনে, আর একটা গরমি-ঘরের মাথায়। সহরে গিয়ে কুঙ্কেল যথারীতি নানা ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছিল। বাজারে তার দোকানের ভাড়ার ব্যাপারে সে জেলা অফিসে গিয়েছিল। তার বোনের ফোড়া ফাটিয়েছিলেন যে ডাক্তার তাঁকে দর্শনী দিতে গিয়েছিল। নতুন মূল্যতালিকায় ব্যাপারে সে দুগ্ধ সমিতিতে গিয়েছিল। যেখানেই গিয়েছে সেখানেই কুঙ্কেল আলাপ সুরু করেছে। এবারে সে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেঃ হাঁ, ওটাই সবচেয়ে কাজে লাগবে মনে হয়।'

কারণ কুঙ্কেল, সর্বোপরি, এমন একজন লোক যে সব সময়ে খোঁজ করত তার নিজের সুবিধা কোথায় হবে। যখন সে টমাটো, ফুলকপি, মুলো কিংবা স্যালাড ফলাত তখন অন্য কিছু করবার আগে সে হিসেব করত কত মুনাফা হবে। যখন লোকে তাকে পতাকা, সার্ট, বাজুবন্ধ বা দরখাস্তের ফর্ম দিত সে নিজেকে প্রশ্ন করত এসব লোক বা এসব জিনিস তাকে কোনও দিকে সাহায্য করবে কি না। সোমবারের আগেকার সন্ধ্যায়, যখন একটা পুরো দিনের পরিশ্রমের পরের তুলনায় সে কম ক্লান্ত থাকত অথচ চঞ্চল এবং ক্লিষ্ট বোধ করত, রবিবারে যেসব মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের কর্কশ হাসিতে তার কান ভরে থাকত, তখনও সে এ সমস্ত চাঞ্চল্য সত্ত্বেও চট করে ঘুমিয়ে পড়তে সক্ষম হ'ত, কারণ চঞ্চল হয়ে কোনও লাভ নেই। যাজকের ধর্মোপদেশ সে মন দিয়ে শুনত, কারণ যে লোকটা লেখাপড়া করেছে তার নিশ্চয়ই এমন কিছু বলার আছে যার থেকে অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক একজনের লাভ হ'তে পারে। যখন কুঙ্কেল চোখ তুলে বিশাল আকাশে ভাসমান ছোট্ট সানন্দ একটা ভরত পাখি দেখতে পেত তার মনটায় স্ফূর্তি আসত, সে স্ফূর্তি তার হাত থেকে কর্মে সঞ্চারিত হ'ত, তখন তার ক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া ভরত পাখিটাকে সে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা কিছু ব'লে মনে করত।

॥ ২ ॥

নদী-বরাবর চলছিল ট্রাকটা, পার হয়ে যাচ্ছিল পথচারী ও সাইকেল-আরোহীদের, ধাবমান ট্রাকের দিকে তাদের কেউবা কটূক্তি করছিল, কেউ হাসছিল। ট্রাকটা পিছনে রেখে যাচ্ছিল ধূলোর মেঘ। সব ক'টি চোখ নদীর দিকে নিবদ্ধ। নদীতে ইতস্ততঃ ছড়ানো কয়েকটা বাইচ-নৌকো,

---

১। ফেরকে—নিপাত যাও, মিছিলের আওয়াজ, আমাদের দেশের "ধ্বংস হোক" এর মত।

২। হাইল—অভিনন্দনসূচক অভিবাদন, নাৎসী আমলে 'হাইল হিটলার' অর্থাৎ হিটলার দীর্ঘজীবী হোন—এই ছিল নাৎসী অভিবাদন।

৩। রোটে ফ্রন্ট—লাল মোচা কমিউনিষ্টদের মোর্চার নাম ছিল রোটে ফ্রন্ট।

৪) নিডার—নৈব ফ্যাসিজ্‌ম উঠতে দেব না কমিউ-নিষ্টদের এই ধ্বনি ছিল।

এখানে-ওখানে চষা জমি বসানো বনময় নীচু পাহাড়। নিটোল, পরিচ্ছন্ন, কিছুটা তন্দ্রাবিজড়িত আভায় আভাসিত এবং কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের আবহাওয়া-বিরহিত একটা সুপরিচিত দৃশ্যপটে লোকের চোখে রবিবারের স্বাভাবিক রূপ নেয়। হঠাৎ সকলের মনে গান গেয়ে ওঠার ইচ্ছে হয়। তারা সবে সুরু করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে একটি হাতব্যাগ-দোলান মেয়েকে ছাড়িয়ে গেল তারা।

কয়েকটা ছেলে ট্রাক থেকে বাইরে ঝুঁকে পড়ে ডাকল: "মারি, এই মারি!" কুঙ্কেল ড্রাইভারকে থামতে বলল, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার অনুশোচনা হ'ল কিন্তু তা ব'লে ত সে আবার তক্ষুণি চলতে সুরু করতে পারে না, কারণ মেয়েটি ইতিমধ্যেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

"তোমরা কি ভাইলারবাখ্‌এ যাচ্ছ?"—জিজ্ঞাসা করে সে।

"আমরা এখন ঘরে ফেরার মুখে, সবাইকে নাবিয়ে নাবিয়ে যাচ্ছি। তোমাকেও নাবিয়ে দেব অখন, উঠে পড়।"

তারা মারিকে দুই বাহুর তলায় ধরে টেনে তুলে নেয়।

ট্রাক তার আপন পথে চলতে থাকে। রাস্তায় মারিকে এমন কিছু বিশেষ রকম দেখাচ্ছিল না। কিন্তু এখন হাঁটুতে হাঁটু ছোঁয়া অবস্থায় তার উপস্থিতিতে, তাকে ঘিরে বিরাজমান গ্রীষ্মের আঘ্রাণে ছেলেরা স্থাণুবৎ হয়ে গেল। মারি অনুভব করল তাদের দৃষ্টি তার বুকের দিকে লতিয়ে উঠছে, ব্লাউসের উপরের বোতামটা সেঁটে দিল সে। একজন বলল: "আমরা তোমার কিছু চুরি করে নিতে যাচ্ছিনে।" "কিন্তু তোমরা আমাকে কিছু দিতেও যাচ্ছ না যাহোক।"—জবাব দিল মারি। আর একজন কে বলে উঠল: "যাই হোক্ তোমার ওখানে যথেষ্টই ত রয়েছে।" কুঙ্কেল পিছন ফিরে সজোরে ফিসফিসিয়ে উঠল "সা-স্"। ওরা সবাই নীরব হয়ে গেল। একটা জবাব মারির জিভের ডগায় এসে গিছল কিন্তু সেটা এখন তাকে গিলে ফেলতে হ'ল। তার বদলে সে বলল: "এই যে ক্রিস্টিয়ান, তুমি রীতিমত বড় হয়ে গেছ, চমৎকার ছেলে তুমি। হাঁ, সত্যি।"

একজন বলল: "ওকে বলছ চমৎকার ছেলে! শীগগিরই একদিন আসল চমৎকার ছেলে মানে কি তোমায় আমরা সমঝে দেব।"

তাদের মাথার উপর দিয়ে কুঙ্কেল জিজ্ঞাসা করল: "এখন ফিরে যাচ্ছ না তুমি, মারি? এখন এদিকেই রয়েছ? এখানটা এতই ভাল লেগে গেল তোমার?"

মারি বলে: "আপাতত।" তারপরেই সে ডেকে ওঠে: "আরে, গটিলিয়েব, তোমাকেও বেশ দেখাচ্ছে যে! বাস্তবিক!" সবাই হেসে উঠল। গটিলিয়েব কুঙ্কেল লজ্জায় একেবারে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তার রোদে-পোড়া মুখে একটা ভীরু দৃষ্টি। তার চুল লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য মারি ইতিমধ্যেই হাত বাড়িয়ে ফেলেছিল, কিন্তু মাঝপথে থেমে তার বদলে ওর সার্টের হাতার কাপড়টা পরীক্ষা করল, বলল—"বাস্তবিকই চমৎকার।"

ট্রাকের সামনের দিকে ওরা আবার গান সুরু করেছিল। মারি যোগ দেয়, অন্যরা তার গান ভাল করে শোনবার জন্য গলা নাবিয়ে দেয়। স্বর তার গভীর ও প্রশান্ত—আনন্দ-বেদনায় এবং প্রেমের সমগ্র গুরুভারে স্পন্দিত। যখন শেষ হ'ল তখন সে মাথাটা নীচু করে রইল। একটা ঝাঁকি মেরে থেমে গেল ট্রাকটা। কুঙ্কেল বলল: "যাও, নেবে পড়, মারি। বাকিটা তুমি হেঁটেই যেতে পারবে।" মারি লাফিয়ে নেবে পড়ল, একজন তার হাতব্যাগটা নাবিয়ে দিল। সে শুনতে পেল পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হ্রস্ব "হাইল" ধ্বনির মধ্যে ট্রাকটা গ্রামে ঢুকছে।

॥ ৩ ॥

খানিকটা পথ পার হ'ল সে। তারপর গ্রামের রাস্তার মাথায় পৌঁছল, এক পাশে রইল কনরাড বাস্টিয়ানের বাগান, আর এক দিকে কুঙ্কেলদের গরমি-ঘর। ট্রাকটা ইতিমধ্যে সরু রাস্তাটা পেছনে ফেলে পাশের গ্রামমুখো চওড়া খোলা রাস্তায় পড়েছে। সরু রাস্তাটায় সাদা ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। হল্লায় আকৃষ্ট হয়ে মেয়েপুরুষ জুটেছে, ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে ইস্তাহার পড়ছে। মারিও একখানা তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করে, বাড়ী ফেরার সময়টাকে যতটা পিছিয়ে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা! একই কারণে অনেকক্ষণ ধরে কাগজের টুকরোটাকে সে ভাঁজ করে, তারপর পকেটে রাখে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর ভেতর ঢোকে।

আলগাইয়াররা তখনও খাওয়ার টেবিলে ব'সে—বাবা, মা আর পাউল। মা এবং ভাই মারির মতই বেঁটে ও গোলগাল। বাবা রোগা টিনটিনে, দাড়িগুলো খোঁচা খোঁচা। টেবিলে একখণ্ড পাঁউরুটি রয়েছে, আর কয়েক চাকা সসেজ ভর্তি একটা প্লেট। কারও দিকে না তাকিয়ে মারি বলে, "শুভ সন্ধ্যা।" বসে পড়ে সে নিজের জন্যে একখানা স্যাণ্ডউইচ তৈরি করে। মস্ত ধূমসী মেয়েটাকে রুটি চিবোতে দেখে সকলে রূঢ় দৃষ্টিতে চায়। মা জিজ্ঞাসা করে: "তা, দাঁড়াল কি?" মারি বলে, "ফ্রাউ স্ট্রুবের ওখান থেকে আমার জামাকাপড়গুলো নিয়ে নিলাম, সেগুলো ওখানে ঠিকই ছিল, আমার কাগজপত্রও ছিল।" মা বলতে থাকে, "তা পনর তারিখ পর্যন্ত পাওনা টাকার কি হ'ল?" "সামান্য কয়েক মার্কের জন্য আমি হৈ চৈ করতে যাচ্ছিনে।"

এই হ'ল মায়ের ছুতো। তারস্বরে সে চীৎকার সুরু করল, "তুমি এমন বলছ যেন কয়েকটা মার্ক কিছুই নয়, দম ক'রে চুকে গেল। তুমি ছেনালী করে বেড়াচ্ছিলে, সেই হ'ল ব্যাপার, চুকলি কাটছিলে পেছনে পেছনে, যে রকম করে থাক ঘরে। তা নইলে তোমায় জবাব দেবে কেন? তাও আবার সব ছেড়ে ঠিক এই সময়ে, পাঁচ বছর পরে? আমাদের সবাই-এর কথা একবারও ভাবলে না?"

"পাঁচ বছর ধরে তুমি আমার পঁচিশ মার্ক করে পাঠিয়ে যাচ্ছিলে। এবার তা বন্ধ হ'ল। আর কাস্ট্রিৎসিউজ-এর দেনার কিস্তি—১লা জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতি মাসে পনর মার্ক করে দিতে হবে, এখন আমরা জোটাব কেমন করে? তার উপর আলোর বিল। এখন আমরা কি করব, শুনি? সে বিষয়ে ভাব না কখনও, কেমন? জান, তার মানে কি? বাচাল ছুঁড়ি, পঁচিশ মার্ক?"

মারি বলে, "কোথা থেকে আসছিল আমার জানা নেই নাকি? মনে করছ এতদিন আমি শুধু বসে হাগছিলাম?" ওর মুখে সজোরে এক থাপ্পড় দেয় মা। পাউল চোখ ফিরিয়ে নেয়। মারি নাক টেনে চোখের জল সামলায়।

তার মাও কাঁদছিল। "আর এখন তুমি করবে কি? নিষ্কর্মা হয়ে এখানে বসে বসে কাটাবে? যাতে নাকি সকলে বলাবলি করে, মারি এই, মারি ওই। ঘোড়ার মত গাদবে আর গোলাপী ব্লাউজের বাহার দিয়ে বেড়াবে? কু-চরিত্তির অকম্মা কাঁহাকা।"

মারি বলে, "এখানে ত কোনও কাজের অভাব আমি দেখছিনে।"

"আমি যদি ঠিক ধরতে পারতাম কেন তোমাকে ওরা জবাব দিল।"

"এখন থাম না কেন! সে আমায় জবাব দিয়েছে কারণ ব্যাঙ্ক থেকে তার স্বামীকে ছাঁটাই চিঠি দিয়েছে। ওই ত আমার সুপারিশ দেখ না, লেখা আছে 'অনুগত এবং কঠোর পরিশ্রমী'।"

বাবা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি চুপ হয়ে যায়। হঠাৎ ঘরের ভিতর সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। মায়ের চেঁচানি বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে সন্ধ্যাটা একঘেয়ে এবং ভারী হয়ে আসে। আলগাইয়ার একটা কথাও ব'লে নি। এখনও সে শুধু বলে, "পাউল, আমার টুপিটা দাও!"

ভয়ে ভয়ে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে "যাচ্ছ কোথায়?" চাষী শান্ত ভাবে জবাব দেয়, "মানুষ আর এ সহ্য করতে পারে না।" টুপিশুদ্ধ দরজা দিয়ে পার হওয়ার জন্য সে হাঁটু নোয়ায়, ডাকে: "পাউল, আমার সঙ্গে এস।"

ও চলে যেতেই স্ত্রী আবার নতুন ক'রে সুরু করে কিন্তু এবারে আর জমাতে পারে না। "এটা কর, ওটা কর" বলে হাক ছাড়তে থাকে। কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে মারি সোফার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিজের জন্যে একটা বিছানা ক'রে নেয়। প্রতি সন্ধ্যার মত মা আবার সুরু ক'রে দেয়, "আর তোমার জন্যে এখানে বিছানা নেই, দেখা যাক তা ছাড়া চলে কেমন ক'রে তোমার, ধূমসী কাঁহাকা!"

মারি হাঁটু দুটো গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকায়। আসলে সে তখনও ক্লান্ত হয় নি, কিন্তু চিল্লানি বন্ধ করবার এই ছিল একমাত্র উপায়। সন্ধ্যার হালকা অন্ধকার তার মনের উপর ভারী হয়ে চেপে থাকে। ছ'সপ্তাহ পরেও গ্রাম্য সন্ধ্যার একঘেয়েমি তার গা-সওয়া হয় নি। সে দুঃখ করে না, কারণ দেহটা তার সুস্থ এবং এতকাল ধ'রে সব ধকলই সয়ে এসেছে। মারধোর, কঠোর পরিশ্রম, তিন-চার জন সহুরে প্রেমিকের আলিঙ্গন, বেঁটেখাটো এঁটেল মাটির

মত ডাক্তারটার কারবার—সবই। তার আগের ঝি-টি বোধ হয় বুঝে-সুঝেই ঝি'র কামরার চুনকাম-করা সাদা দেয়ালে ডাক্তারটার নাম লিখে রেখে গিয়েছিল। সরু খোঁচা খোঁচা সোফাটার ধারালো কোণগুলো তাকে পীড়িত করতে পারে নি। বাইরে গ্রামের পথে উল্লাসের "ইউ-হু-উ" রব, অ্যাকর্ডিয়নে দুই-একটা প্যাঁ-পোঁ—এতেই তার স্নায়ুতন্ত্রগুলো শিথিল হয়ে আসে, শান্তভাবে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ৪ ॥

বৃদ্ধ আলগাইয়ার. গ্রামের পথে হাঁটতে থাকে, পিছনে পিছনে আসে তার ছেলে। লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেকখানি এগিয়ে যায় সে। প্রথম দশটা ঘর ছাড়াতেই রাস্তাটা চওড়া হয়ে যায়। দুটো খামারের মাঝখান দিয়ে প্রকাশিত হয় নদীর দিকে সামান্য ঢালু সমতলভূমির দৃশ্যপট। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে প্রসারিত একখানি পথ, দু'ধারে তার সজারুকাঁটার আর হলদে মেঠো ফুলের পাড়, নদীর দক্ষিণ তীর বেয়ে ঢুকেছে গাঁয়ের ভিতর। লাইম গাছটা যেখানে পোঁতা হয়েছে সেটা আসলে কোন চৌখুপী নয়, গলিরই চওড়া হয়ে-আসা অংশ। গাছটার পেছনেই ঠিক বাড়ীগুলো আবার যেন দু'টি সরল রেখা ধ'রে গজিয়ে উঠেছে, তারপরই চট করে এসে পড়েছে গ্রামের সীমা। শুধু মোচাকৃতি শ্যামল বৃক্ষচূড়াটিসহ এই কাণ্ড দণ্ডটি ঘিরেই চলেছে জীবনের টানাপোড়েন। রং-মিস্তিরির সঙ্গে ঝামেলা করতে হয়েছে সরাইখানার মালিককে, কারণ দেয়ালের রং হবার কথা ছিল হলদে, কিন্তু খারাপ ক'রে রং-মিশানোর ফলে দাঁড়িয়েছে গিয়ে কমলা রঙের। মাতাল-করা ফল-মদিরা তৈরী করত সে, আশেপাশে তার নামডাক ছিল। সরাই-মালিকের জীবনের সবচেয়ে বড় লোভ হ'ল খদ্দের। আজ তার সাইনবোর্ডের ওপর দুটো পতাকা উড়ছে—একটা কালো-সাদা-লাল আর একটা স্বস্তিকা মার্কা। ভাটিখানায় ড্রাইভার কথা দিয়েছে যে ঘরে ফেরার মুখে তার কমরেডদের নিয়ে সে থামবে এক চুমুক পান করার জন্য। ওবারভাইলারবাখে যদি তুর্কীরা থাকত সরাইওয়ালা তা হ'লে অর্ধচন্দ্রমার্কা পতাকাও উড়িয়ে দিত।

সরাই ভর্তি ঠাসাঠাসি লোক। এখানে যে-সব চাষীরা বসে আছে তাদের কেউই গতকাল সন্ধ্যায় সহরে যায় নি। তাদের ছেলেরা মিছিলে অংশ নেয় নি, তিন ঘণ্টা ধ'রে মার্চ করার তাদের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না, কারণ ছিল না সকলের চোখের সামনে ট্রাকের উপর লুটোপুটি খাওয়ার।

সরাইএর বসবার ঘরটা আসলে ছিল একটা বড়সড়ো শোবার ঘর। মৌলিক কাঠামোটা এখনও আগের মতই রয়ে গিয়েছে, সাময়িক খদ্দেরদের বসবার এবং নিয়মিত হোটেল-খদ্দেরদের থাকবার—দুই কাজের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে ঘরটা। গোল টেবিলটা ঘিরে রয়েছে একটা কাঠের ঘোরানো বেঞ্চি। টানাদেরাজের টেবিলের কাচের মাথাটার উপর সাজানো রয়েছে লাল এবং সবুজেটে বোতলগুলো। দুটো জানলার মাঝখানে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধান হিণ্ডেনবুর্গের ছবি। মাঝখানের খালি ঘরটাতে কয়েকখানা চেয়ার-টেবিল সাজানো রয়েছে।

কনরাড বাস্টিয়ান এবং মিখাইল মেরৎস্ বসে আছে সোফার উপর। মেরৎস্এর বিরাট দাড়ি এবং মোটা মোটা ভুরু। তার মুখের হাঁ, চোখ দুটো এবং নাকটা বেজায় খুদে খুদে এবং অতিরিক্ত গায়ে গায়ে ঠাসা। গাঁয়ের মধ্যে সেই একমাত্র লোক যে দুটো ঘোড়ার মালিক। তার দু'টি বড় বড় সন্তান. একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কনরাড বাস্টিয়ানের চেহারাটা অনেকটা তার ভাই আন্দ্রিয়াস বাস্টিয়ানের মত। বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর মাঝখানে পাকা গোঁফ চুমরানর অভ্যাস তারও ছিল। তার চেহারা এবং পোশাক-আশাক থেকেই মালুম হয় যে সম্পত্তিবান লোক, বাড়ী, জমি এবং গরুর মালিক। কনরাড বাস্টিয়ানেরও শুধু দুই সন্তান, একটি ষোল বছরের মেয়ে, ফ্যাকাসে এবং অস্থিচর্মসার, ডোরা বাস্টিয়ানের মত, আর একটি ছোট ছেলে। তার বহু ট্যাক্স বাকি, সব সময়েই মনের গহনে ভয় যে এমন একটা কিছু ঘটে যাবে যার ফলে মেরৎস্এর পাশে সোফার আসনটি থেকে তাকে হটে যেতে হবে, পড়তে হবে গিয়ে ওপাশের কোনের দিককার বেঞ্চির আসনে। বাস্টিয়ান এবং মেরৎস্ দু'জনেরই সামনে একটি করে বীয়ার এবং এক এক প্লেট নোনতা বিস্কুট।

মাঝখানের টেবিলগুলোয় কয়েকজন অপরিচিত লোক বসেছিল। তারা এসেছিল নিডারভাইলারবাখ থেকে, এ গ্রামটি ওবারভাইলারবাখ ও বিল্লিঙেনএর মাঝখানে।

তাদের গ্রামটি নদীর উপরেই বলে তারা যেন বেশী দিল-খোলা, পান করছিলও যেন অন্যদের চেয়ে সহজভাবে। তাদের টেবিলে ছিল গুজবেরী মদ, খেজুরে মদ এবং গেল বছরের আপেল চোলান মদ। চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়সের আট থেকে দশ জন চাষী বসে ছিল মাঝখানের গোল টেবিল ঘিরে। তাদের একজনেরও কোনও ঘোড়া ছিল না, গরু কারও ত্রটোর কম ছিল না আবার পাঁচটার বেশী ছিল না। তারা বীয়ার খাচ্ছিল এবং এতক্ষণে প্রায় সকলেই সমপরিমাণ পান করেছিল। একজন অপরিচিত লোক বলল: "কাল ওরা আল্‌বেরস্ট লাম্পরেষ্টকে খুবই ধকল দিয়েছে নিশ্চয়ই। ছোরার ঘায়ে তাকে বিল্লিঙ্গেন্ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সারা রবিবারটা তার মা ঘ্যান-ঘ্যান করছিল।" কনরাড বাস্টিয়ান জিজ্ঞাসা করে: "ওই কি বেরট্‌হোল্ড লাম্পরেষ্টের বড় ছেলেটা? যার আব আছে?"

"হাঁ, সেই বটে। বিল্লিঙ্গেনে এস. এতে* যোগ দিতে চায় বলে বাপকে ঝালাপালা করছিল।"

"বাপের আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি হ'লে কখনও অনুমতি দিতাম না"..."অনুমতি দেবে না! চেষ্টা করে দেখ ষাঁড়কে শিং না-মঞ্জুর করতে পার কি না!"

আলগাইয়ার এবং পাউল কোনের টেবিলে বসে ছিল। পাউলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বক্তাদের উপর। সে একেবারে ঘোর লাল হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন ধরে সে কেবলই তার বাবাকে ঠেলছিল, "আমাকে কুঙ্কেলদের সঙ্গে যেতে দাও।" আর আলগাইয়ার কেবলই বলছিল, "না, আমার পছন্দ নয়।"

"আলগাইয়ার, তুমি বেশ শক্ত করে রাশ ধরে আছ ছেলের।"

পাউল টেবিলের পিছনে মাথা নোয়ায়। লজ্জায় একদম নেতিয়ে পড়ে সে। আলগাইয়ার কথা বলে না। টুপিটা সে মাথাতেই রেখে দিয়েছিল, কারণ তার মাথার পুরোটাই টাক।

কারো দিকে বিশেষ করে না তাকিয়ে মেরৎস্ ঘরের মাঝখানে হেঁকে জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় ঘটল ব্যাপারটা?" সবাই একসঙ্গে কথা বলে ওঠে, জবাব দেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, "হয়েছে উপরে আইখেল্ লেনে। ওদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয়। হয়ত রেন্ডেল হবে। যে চেঁচায় সে গালগল্প বলে আর যে গালগল্প বলে সে পিছনে ছুরি বসায়।"

"ওর অসাধ্য নয় বলে আমি বলব না।"

সরাইওয়ালা আবিষ্কার করে যে গোল টেবিলের দশ জন চাষীর মধ্যে একজন এখনও অর্ডার দেয় নি। ঠেলেঠুলে সে তার দিকে এগোয়। নয়গেবাওয়ার ছোটখাট মানুষটা, মাথাটা চ্যাপ্টা। সরাইওয়ালাকে এগোতে দেখেই সে কুঁকড়ে যায় এবং হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "চেরী ব্র্যাণ্ডি।" তার আসলে চেরী ব্র্যাণ্ডির জন্য অনেকক্ষণ লোভ হয়েছিল কিন্তু অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু চাইতে লজ্জা করছিল। আর বাস্তবিকই সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসতে সুরু করে। সরাইওয়ালা এক গ্লাস চেরী ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসে, তার উপর একটা জমান চেরী ভাসছে। নয়গেবাওয়ার তাড়াতাড়ি তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে চেরীটা মুখের মধ্যে পুরে দেয় এবং যতক্ষণ সম্ভব চুষতে থাকে। চারপাশের চাউনি, হাসি এবং প্রশ্নবাণ যেন হুলওয়ালা এক ঝাঁক মশার মত তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত, তার সামনে সে আরও কুঁকড়ে যায় নিজের মধ্যে।

"ওহে নয়গেবাওয়ার, এখনও যথেষ্ট গরম হও নি তুমি?

"তোমার নতুন গিন্নী তোমায় যথেষ্ট গরম করে নি? এখনও উপরি কিছু দরকার, অ্যাঁ!"

নয়গেবাওয়ার দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছে একজন বিধবাকে। সকলে তার দিকে চায় আর হুল্লোড় করে। "তা বলি চলছে কি রকম? এখনও তোমরা দু'জন কি ক'রে চলবে বুঝে উঠতে পারছ না?" নয়গেবাওয়ারের দ্বিতীয় বৌএর দুর্নাম ছিল। তার স্বামী, তার বোন এবং তাদের দুটো গরু অল্প তফাতে পর পর মরেছিল। কেউ তাকে নিজের ছেলেমেয়ে বা গরুর কাছে ঘেঁষতে দিত না। কালক্রমে তার সম্পর্কে গালগল্পে একটু ভাটা পড়েছিল, সকলকে জড়িয়ে নতুন জটিল সব দুর্ভোগের তরঙ্গে সে সব ভেসে গিয়েছিল। যখন সে ফের বিয়ে করল তখন আবার সুরু হ'ল। নয়গেবাওয়ার নিজেই ওই নোংরা,

---

* এস. এ—নাৎসীদের অসামরিক ঝটিকাবাহিনী।

টিলে মার্কা বিধবাটার কথা ভাবলে শিউরে উঠত। কিন্তু বিয়ের পাওনা থেকে দেনা শোধ করবার তাগিদেই ও তাকে বিয়ে করেছিল। সে খুশী হ'ল ভনভনে ঝাঁকটা যখন তাকে পার হয়ে তার পাশে-বসা চাষী গ্রস্মানকে আক্রমণ করল।

"এই যে গ্রসমান, তোমার বেটার খবর কি?" গ্রসমান ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "কি রকম থাকবে সে? তোমরাই তাকে জিজ্ঞাসা কর।" চাষীরা একে অপরের দিকে চোখ টেপে এবং গ্রসমানের দিকে চায়। গ্রসমান রাগে কাঁপছিল। তার ছেলে বটৎসেন্‌বাখ্-এর একটা মেয়েকে পোয়াতি করেছে। মেয়েটা নাবালিকা। মেয়ের বাপ কত টাকার দায়ে মোকদ্দমা করেছে তা জানতে পেরে গ্রসমান ছেলেকে এমন এক লাথি দিয়েছে যাতে সে জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। টেবিলের চারপাশের চাষীরা একসঙ্গে মদে চুমুক দেয় এবং তার দিকে চেয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে।

তারপর হঠাৎ তারা চুপ ক'রে যায়। তাদের মনে পড়ে এই রকম একটা ব্যাপার বুড়ো মেরৎসএরও ঘটেছে। সে ব'সে আছে পিছন দিককার সোফায়। বুড়ো হয়ত সমানে এতক্ষণ কান খাড়া ক'রে রেখেছে। সে সোজা সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। গেল বছরে তার এক ঝি তার ছেলের কাছ থেকে পোয়াতি হয়েছিল। সে ছেলেকে হয়ত আচ্ছামত ধাতানি দিয়েছিল এবং ঝিটাকে খেদিয়ে দিয়েছিল। পরে আদালতে তার ছেলে জবানবন্দীতে স্বীকার করেছিল যে সে ঝিটার সঙ্গে কয়েকবার থেকেছে একথা সত্যি, কিন্তু যে মাসের কথা হচ্ছে সে মাসে নয়। যখন জজ, দুই গ্রামের পাদ্রীরা আর মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনেরা দেখলেন যে ছেলেটা খুব কড়া হয়ে রয়েছে এবং খেসারতের টাকা দেওয়া সে যেন-তেন-প্রকারেণ এড়াবেই, তাতে যদি মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয় তাও স্বীকার, তখন তাঁরা মোকদ্দমাটা তুলে নিলেন। বুড়ো মেরৎস্ লক্ষ্য না করে পারে না যে মশার ঝাঁকের ভনভনানি এবার তার খুব কাছে পৌঁছেছে। এমন একটা কিছুই হয়নি ভাব দেখিয়ে সে হাত নেড়ে দেয় তারপর কনরাড বার্স্টিয়ানের দিকে ফেরে।

"আমার স্ত্রী বলল তোমার আত্মীয়রা এসেছে?"

বার্স্টিয়ান জবাব দেয়, "আমি ত সে রকম কিছু জানি নে।"

মেৎস বলে, "তোমার ভাই-এর ওখানে কে যেন এসেছে। আমার স্ত্রী দেখেছে তাকে কাঠ কাটছে।

গ্রসমান হাসতে হাসতে বলে, "এ হ'তে পারে না যে আন্দ্রিয়াজ বার্স্টিয়ান টাকা দিয়ে লোক রেখেছে, হ'তে পারে নাকি এখন?"

বার্স্টিয়ান কাঁধজোড়া ঝাঁকায়। সে বিরক্ত হয়, কারণ বাইরে থেকে আসা লোক সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে সে আলগাই-য়ারকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে, "তোমার মারি দেখছি এখনও এখানে? তা হ'লে তার জবাব হয়ে গিয়েছে?"

এবার সবাই আলগাইয়ারকে নিয়ে পড়ে। পাউল ভীরু চোখে বাবার দিকে চায়। আলগাইয়ার পিছনে হেলান দেয়। তামাক মাখা তার অগোছাল দাড়ির গোছা সব সময়ে যেন হাওয়ায় চেরা। দাড়িটা ঠিক টেবিলের উপর দেখা যায়। সে বেশ শান্তভাবেই জবাব দেয়, "হাঁ, ওর জবাব হয়েছে।" নরগেবাওয়ার জিজ্ঞাসা করে, "কেন?" আলগাইয়ার জবাব দেয়, "ওর মনিবেরও জবাব হয়ে গেছে" তখন গ্রসমান বলে, "আমি যদি হ'তাম তা হ'লে আমি ওর মনিবের কাছে ব্যাপারটার জেনে নিতাম। ওরকম মেয়ে নিজের বাপের কাছে আষাঢ়ে গল্প ব'লে দিতে পারে।"

বিশ-ত্রিশ জোড়া হাসিভরা চোখের চাউনি আলগাইয়ারের দাড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। সে বলে, "আমার মেয়ে তেমন নয়, সে মিছে কথা বলে না।"

কিন্তু গ্রসমান চট্ ক'রে বলে, "কি ক'রে তুমি জানলে যে সে মিছে কথা বলে না?"

॥ ৫ ॥

হঠাৎ তারা বাইরে ট্রাক এসে দাঁড়ানর শব্দ শুনতে পেল, শুনতে পেল গলার আওয়াজ আর বুটের খট্‌খট্। চামড়ার জ্যাকেট গায়ে ড্রাইভার ঘরে ঢুকল, সঙ্গে কুঙ্গেলরা এবং আশেপাশের গাঁয়ের আরও ছ' আট জন। কিছু চাষী তাদের দিকে ঘৃণাভরে চাইল, কিছুর চোখে সন্দেহ, কিছু-বা সকৌতুক আবার কিছু চিন্তাকুল।

ক্রিস্টিয়ানের গায়ে গায়ে বসানো চোখ দুটো ঘরটার ভিতর ঘুরতে থাকে। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে উপস্থিত প্রত্যেকটা মুখই বৈশিষ্ট্যবিহীন এবং অভিব্যক্তিশূন্য হয়ে যায়। ক্রিস্টিয়ান বলে, "আমাদের জন্যে জায়গা করে দাও।" সরাইওয়ালা অপরিচিতদের একটা টেবিলে জড়ো করে এবং আরও চেয়ার নিয়ে আসে। এর জন্যে লাগে মোটে এক মিনিট। কিন্তু এই এক মিনিটেই সমস্ত অভিব্যক্তি বদলে যায়। ছেলেগুলো পোশাকে এবং আকারে-প্রকারে পরস্পরের মতই। আলগাইয়ার মাথাটা পিছনেই হেলিয়ে রাখে। নবাগতদের দিকে সে তার সঙ্কীর্ণ দুটো চোখ নিবদ্ধ করে। পাউলের চোখ দুটো গোল হয়ে চকচক করতে থাকে।

সরাইওয়ালা জিজ্ঞাসা করে: "বীয়ার? আপেলের মদ? চেরি ব্র্যাণ্ডি?" ড্রাইভার বলে, "আজ ত তুমি খাওয়াচ্ছ, তাই না?" সরাইওয়ালা চমকে ওঠে, তারপর হেসে বলে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা ত বটেই। হেনলাইন, পান কর, কুঙ্কেল চালাও।"

ড্রাইভার হাসে, "পাত্রগুলো কানায় কানায় ভর্তি কর! ব্যাপারটা কি, তুমি কি ইহুদী নাকি?" "লাম্পরেশ্‌ট্‌-এর কথা কিছু শুনলে নাকি?"—এড়ানোর ভাব নিয়ে সরাই-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করে। "তার ক্ষত বুকের কাছে লেগেছে, হয়ত মরেই যাবে।" ড্রাইভার হেঁকে ওঠে: "মনে কর না আমরা শুনি নি।" কুঙ্কেল বলে, "আমরাই ত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আমরা জানতাম না ওর অবস্থা অতটা খারাপ।" নয়গেবাওয়ার জিজ্ঞাসা করে, "ব্যাপারটা ঘটল কোথায়?" কুঙ্কেল জবাব দেয়: "উপরে আইখেল লেনে।"

তখন নয়গেবাওয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, "এই দেখ, দেখ, আমি জানতাম। তোমরা বরং রেগুেলকে একটা রগড়ানি দাও।" কুঙ্কেল চেঁচিয়ে ওঠে, "তা আমরা দেব।" নিজের গলা শুনে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়, কাল সন্ধ্যার থেকে কত তফাৎ! বাস্টিয়ান বলে, "কি কুঙ্কেল, তুমি নাকি সত্যি একটা বক্তৃতা করলে কাল?"

"তা—ঠিক বক্তৃতা বলা যায় না।"

নয়গেবাওয়ার বলতে থাকে, "তোমাদের উচিত রেগুেলের মাথাটা পা দুটোর মধ্যে গুঁজে দেওয়া—তারপর বেশ উত্তম-মধ্যম! ওর স্ত্রীকে চেন তোমরা?" চাষীরা হেসে ওঠে, "ঘোড়ার পেছনের মত পাছা। দুটো মেয়ে-ছেলে এক করলে তবে ওরকম হয়।"

কনরাড বাস্টিয়ান বলে, "আর গোল্ড এণ্ড সন্-এ বসে বসে সে সব সময়ে লম্বা-চওড়া বাত ঝাড়ে। যাই হোক সে তবু কঠিন পরিশ্রম করে, তার স্বামীটা ত সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরেমি করে।"

(প্রতি বছর বিল্লিঙ্গেনের টিনজাত খাদ্যের কারখানা গোল্ড এণ্ড সন্-এর বড়কর্তা বলে, "তার এক ফেনিসও নয়। তোমরাই হিসের করে দেখ। একদিকে তোমরা আর একদিকে মজুরের টাকা। জানো, ওরা ঘণ্টায় কত ক'রে পায়? এ সমস্তর খরচ কত জান? শুধু শাসটা ছাড়াতেই কত খরচ বল ত?")

নয়গেবাওয়ার আবার সুরু করে, "ওই মহিলাটি সেই চরিত্রের, যারা যেখানেই যায় সেখানেই গোলযোগ বাধায়। অন্য মেয়েদেরও তাতিয়ে দেয়। একটা চেরির বীচি সে বের করবে না একটা হল্লা না ফেলে।"

গ্রসমান হেঁকে ওঠে, "তার অপদার্থ মরদটা সারাদিন ভবঘুরেমি ক'রে, রোজগার করে না, সে সেটা পুষিয়ে নিতে চায় দু'গুণ ক'রে।"

নয়গেবাওয়ার বলে, "ও ত রীতিমত ট্রাকের উপরে বসে বুক টলমলিয়ে 'রোটে-ফ্রন্ট' বলে চেঁচায়।"

"শীগগিরই সবশুদ্ধই টলমল করতে হবে ওকে"—বলে ওঠে ড্রাইভার।

দু'জন নতুন খদ্দের এসেছিল ইতিমধ্যে। জেকব শুহেখ্‌লিন এবং তার শ্বশুর মুলৎস্। শুহেখলিন ছিল মোটা এবং বেটে, আর সারাক্ষণ ঘামত। তার নাকটা ছিল সামান্য ওপরের দিকে ওঠা, তাই অমনিই বড় নাকের ফুটোটা আরও বড় দেখাত। মুলৎস্ ছিল নড়বড়ে, কালা, বেঁটেখাটো বুড়ো, মাথাটায় সম্পূর্ণ টাক, থুতনিতে কেবল কয়েক গাছা চুল। তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল কনরাড বাস্টিয়ান এবং মেরৎস্-এর মাঝামাঝি। সে এসেই গদি-ওয়ালা সোফার পাশের টেবিলে বসে পড়ে।

রোটে ফ্রণ্ট—লাল মোর্চা—জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির আওয়াজ।

গুহেথলিন তার পাশেই বসে, টেবিলে অবশ্য নয় তবে ঘরের মাঝখানের দিকে মুখ করে। সে গরীব মানুষ, বুড়ো সুলৎস্ তার বড় মেয়েকে ওকে দিয়েছিল কারণ সে ছিল একটু মাটো, তা ছাড়া এক যুদ্ধবন্দীর কাছ থেকে তার একটি সন্তান হয়েছিল। সুলৎস্ তাকে বিয়ে দিয়েছিল একটা চুক্তি করে। তাতে ছিল মেয়ের ছেলে হলে সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং গুহেথ্লিন তার জমি ও সম্পত্তির উপসত্ব ভোগ করবে। এই অসুস্থ মেয়েটার ছেলে হবার সম্ভাবনাকে অবশ্য সে সুদূরপরাহত বলে ধরে নিয়েছিল। মেয়েটা বেশী দিন বাঁচবেই না মনে করেছিল।

কিন্তু গুহেথলিন যথেষ্ট শক্তি ধরত, ওই দুর্ভাগা মেয়েটাকে পর্যন্ত কয়েক ছেলের জন্ম দিতে সে বাধ্য করেছিল। সবাই জানতো যে সুসানের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করত—কি দিনের বেলায় কাজেকর্মে, কি রাতে বিছানায় শুয়ে। শেষ বিচারের দিন গুহেথ্লিনের সঙ্গী হবার কারও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দ্রুত অগ্রসরমান মৃত্যু যখন মেয়েটাকে গ্রাস করবে তখন থেকে গুহেথ্লিনের পুনরুত্থান পর্যন্ত এই সময়টার জন্যে ওর সঙ্গে জায়গা বদল করতে সবাই চাইত।

অর্থাৎ, গুহেথলিনের সুনাম ছিল দুই ধরনের, মাথায় একটার উপর আর একটা-দুটো টুপি পরার মত দুটোই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। একদিকে সে ছিল শয়তান ও নিষ্ঠুর দাস-খেদাড়ে, অপরদিকে দক্ষ, সুশৃঙ্খল পরিশ্রমী চাষী, চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী।

"কি চলবে?" জিজ্ঞাসা করে সরাইওয়ালা। শ্বশুরের মাথাটা ধ'রে তার কানের কাছে চিৎকার করে গুহেথ্লিন, জিজ্ঞাসা করে, "গাঢ় না হালকা?" বুড়ো তার টেনে-ধরা থুতনিটা ছাড়িয়ে নিয়ে চটে উঠে বলে, "হালকা।"

সরাইওয়ালা সোফার সামনের টেবিলে দুটো হাল্কা রঙের বীয়ার এনে রাখে। একজন ভিনগ্রামের লোক গুহেথ্লিনের কাঁধে টোকা দিয়ে বলে, "তোমাদের সরাইওয়ালা যে দিনকে দিন ফুলে উঠছে। শীগগিরই একদিন ওর উপর সন্ন্যাসের আক্রমণ হবে—ঠিক দুপুরে, যখন সবচেয়ে গরম পড়ে।"

বুড়ো সুলৎস্ চটেছিল কারণ চারপাশে কি কথা হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না, গুহেথ্লিনের জামা ধ'রে সে টান দেয়। গুহেথ্লিন আবার তার মাথাটা ধরে, তার কানের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে, "বলছে ওর মত ধুমসো থপথপে বেশী দিন টিঁকবে না।" সরাইওয়ালা দেরাজের দিকে ফিরে কাঁচের সেলফের উপর বোতলগুলো গোছাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই সে শিউরে উঠল। এই মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর কথা সে কখনও ভাবে নি। এখন তার খদ্দেররা এমন একটা ভাবনা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিল যা কখনও তাকে রেহাই দেবে না এবং তার বাকি জীবনটাকে বিষিয়ে দেবে।

মাঝখানের টেবিলের ছেলেগুলো শলাপরামর্শ করছিল। "ওকে ব্যাণ্ডেজ করবার জন্যই কেবল আমরা ভিনৎসেন্সৎ হাসপাতালের পাশ দিয়ে গেলাম। আমরা যখন ওকে নীচে নিয়ে গেলাম তখন ও বেশ ফ্যাকাসে।" গ্রসমান হেঁকে ওঠে, "দেখছ এ সবে তোমাদের কি হয়?" ড্রাইভার আগুন হয়ে ওঠে, "তোমরা, তোমরা? আমাদের এ সবে কি হয়? কার জন্য আমাদের লাম্পরেস্ট্ চুরি গেল? আমরা তামাসা করার জন্য বেড়াই, না? আর তামাসার জন্যই ও চুরি গেল, তাই না? তোমরা, তোমরা, তোমরা! তোমরাই ত যীশুকে ক্রস্ থেকে নাবিয়েছ। তোমাদের এই পরিণাম।"

কে একজন ড্রাইভারকে জড়িয়ে ধরল। চাষীরা কুঞ্চিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইল। ঘরের মধ্যের এই ছেলেগুলো পরস্পরের সঙ্গে যেন আঠার মত জড়িয়ে আছে। চোখেমুখে ওদের অর্ধোচ্চারিত হুমকি, গোপন ভয় এবং ইঙ্গিত আর কানাকানি। পাউলের মনে হ'ল তার হৃদযন্ত্র যেন সঙ্কুচিত হ'ল, ওদের দিকেই টান অনুভব করল সে। তার স্কুলের সহপাঠী গটলিয়েব কুস্কেল তার দিকে তাকাল, সে দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য। একটা লজ্জার অনুভূতি নুইয়ে দিল পাউলকে, রবিবারের পোশাকের কলারের ভিতর যেন দম বন্ধ হয়ে এল তার। কনরাড বাস্টিয়ান বলল, "যাকগে, তোমরা সবাই এখনও ছোকরা। তোমরা ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতেই পার।"

এ কথা শুনে ভাটিথানার ড্রাইভার হেঁকে উঠল, "আমি কিছু তেমন ছোকরা নই, আমার তিনটে ছেলেমেয়ে। গেল মাসে আমি তেতাল্লিশে পড়েছি। কিন্তু আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়েদের নাকের তলা থেকে খাবারের প্লেট টেনে নিতে আমি দেব না। তারা

সুন্দর সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী হবে।” সমস্ত চাষীরা এখন ইঁদুরের মত নিঃশব্দে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আছে। ড্রাইভার তখনও অগ্নিশর্মা হয়ে ব’লে চলেছে, “তোমরা—তোমাদের অবশ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে হয় না, তোমাদের জীবিকা রয়েছে, দেনা নেই, ট্যাক্সের বোঝা নেই, ইহুদী গরুগুলো তোমাদের ঘাড়ে চড়ে তোমাদের যা-কিছু প্রাপ্য—আস্তাবল থেকে সুরু ক’রে বাজার পর্যন্ত—তা গ্রাস করছে না। তোমাদের মতে সবই যেমন আছে তেমন থেকে যেতে পারে। যাকগে, আমায় এবার যেতে হবে।” ও উঠে পড়ে, সব ক’টা ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ওর পায়ে পায়ে চলে। চাষীরা বসে থাকে যেন ঘন একটা বর্ষণ হয়ে গেছে। পাউল মরিয়া হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। ওদের ফিরতে হবে না ঝিমিয়ে-পড়া ঘরে, শুনতে হবে না শোকোচ্ছ্বাস, উদার-উন্মুক্ত রাত্রে ওরা বেরিয়ে পড়বে।

বুড়ো মেরৎস্ সমস্ত সন্ধ্যাটা নিশ্চল বসেছিল যেন তার দাড়িটা সীসে হয়ে ঝুলছে। হঠাৎ সে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে উঁচু গলায় বলে, “কুশল হোক।” তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে অন্যদের, বিশেষতঃ কুক্কেলকে দেখতে থাকে যতক্ষণ না তারা ঘর ছেড়ে যায়। খোলা দরজা দিয়ে যখন চলন্ত এঞ্জিনের অপসৃয়মান আওয়াজ পৌঁছায় তখনই সে কেবল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসে। এ ছেলেগুলো যা করতে চায় তাতে হয়ত তার লোকসানের কিছু নেই। কিন্তু তার নিজের ছেলেকে ওদের সঙ্গে গিয়ে গলাকাটা, দাঙ্গা এবং মিছিলে জড়িয়ে পড়তে সে কখনও দেবে না।

· কনরাড বাস্টিয়ান এখনও মনস্থির করে নি। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মেরৎস্ যা করবে, যে ক’রেই হোক, সেও তাই করবে।

ক্রমশঃ

—

[চার]

বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে আমিও বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়ে যথাসময়ে উক্ত সমিতির অধিবেশনে যোগদান করলাম। একটি সুরম্য অট্টালিকার হলে • মিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। সুদীর্ঘ টেবিলের চতুস্পার্শ্বে রক্ষিত চেয়ারে সদস্যগণ বসলেন। মধ্য-স্থলে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করলেন। সমবেত সভ্যগণের মধ্যে ফ্যাসানদুরস্ত য়ুরোপীয় পোষাকের পারিপাট্যে শ্রীজিন্না ও শ্রীসৈয়দ হোসেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের দু'জনের মত স্মার্ট আর কেহ ছিল না।

তখনকার দিনের নিয়মানুসারে বিষয় নির্বাচনী সভায় কোন দর্শক বা খবরের কাগজের রিপোর্টারের প্রবেশাধিকার ছিল না। সভার কার্য আরম্ভ হওয়ার পর জনৈক সদস্য সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন যে কয়েক জন অনধিকারী দর্শক সভাগৃহে প্রবেশ করেছে। তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীঅমল হোমও ছিলেন। অমল সাংবাদিক হিসাবে বোম্বাই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য ভদ্রতা ও মিষ্টভাষিতা ও সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য হাসান ইমাম সাহেব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যে ভাষায় দর্শকগণকে সভাগৃহ ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন তা এখনও আমার সম্পূর্ণ মনে আছে, কারণ ঘটনাটি পুনঃপুনঃ আমি নানা কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। তিনি বললেন যে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নন এমন যদি কেহ ভ্রমক্রমে এখানে উপস্থিত থাকেন তা হ'লে তিনি যেন এ স্থান ত্যাগ করেন।

পরের দিন কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়ে বিষয় নির্বাচনী সভা সেদিনের মত স্থগিত হ'ল।

[পাঁচ]

৩০শে আগষ্ট বেলা ৩টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সুরু হ'ল। পূর্বদিনের মত সভাপতি মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি, বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবক সমভিব্যাহারে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাগৃহে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। গান্ধর্ব্য মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য আরম্ভ হ'ল।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(বিশেষ অধিবেশন—বোম্বাই ১৯১৮)

প্রথমেই সভাপতি মহাশয় নিজে দু'টি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রথমটিতে ভারত সম্রাটের প্রতি যথারীতি আনুগত্য প্রকাশ করা হ'ল এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ও ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেস লীগ স্কীমের প্রতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে আস্থা জ্ঞাপন করা হ'ল এবং বলা হ'ল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা বিনা ভারতবাসী সন্তুষ্ট হবে না।

পরবর্তী প্রস্তাব ছিল দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে শ্রীমতী বেশান্ত এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ শাসন পরিচালনায় উপযুক্ত এবং এর বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র সংস্কারের রিপোর্টে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে এই কংগ্রেস তা মেনে নিতে পারে না এবং কংগ্রেস দাবি করে যে, যুগপৎ কেন্দ্রে ও প্রদেশ-সমূহে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করা হোক্। বেশান্ত মহোদয়া তাঁর দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর হ'তে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে দেখালেন ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল এবং নানা তথ্যদ্বারা প্রমাণ করলেন যে, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, বিহারের নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ, লাহোরের শ্রীবরকত আলী ও শ্রীসৈয়দ হোসেন দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

[ছয়]

অপরাহ্নে কংগ্রেসের অধিবেশন-শেষে বিষয় নির্বাচনী সমিতির কার্য আরম্ভ হ'ল। এই আলোচনার সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হ'ল।

তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই কংগ্রেসকে মালব্য কংগ্রেস বললেও অত্যুক্তি হয় না। সর্বত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে পণ্ডিতজী সম্বন্ধে আলোচনা হ'তে লাগল।

নির্বাচনী সমিতির সভার পর বাসায় ফিরে দেখলাম যে, বাংলার প্রতিনিধিগণ কংগ্রেস সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করছেন এবং কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নাম উল্লেখ করছেন। এমন সময় দক্ষিণ কলিকাতায় একটি যুবক আলিপুরের প্রবীণ উকিল বঙ্কুবাবুকে (পুরো নাম মনে নাই) জিজ্ঞাসা করলেন, "মশাই, এত ত মদনমোহন মালব্যের নাম শুনছি—এই মদনমোহন মালব্য লোকটি কে?" বঙ্কুবাবু উত্তর দিলেন, "মদনমোহন মালব্যকে চেন না? মালব্য এলাহাবাদ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চানাচুর বাদাম ভাজা বিক্রি করেন।" ছোকরার প্রশ্নে বঙ্কুবাবু চটে গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই রাগতভাবে বললেন, "মদনমোহন মালব্যের নাম শোন নি—তুমি কংগ্রেসে এসেছ কেন?" ছোকরাটি বিনা পয়সায় বোম্বাই সহর দেখার লোভে প্রতিনিধি সেজে এসেছিল।

[সাত]

পর দিন ৩১শে আগষ্ট প্রাতঃকালেও বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হ'ল। এর ফলে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় এক ঘণ্টা পেছিয়ে গেল। মণ্টফোর্ড স্কীম আলোচনাতেই বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হ'ল, তথাপি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। আলোচনা মুলতুবী রইল।

বেলা সাড়ে এগারটার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল যথারীতি সভাপতি মহাশয় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। প্রথমেই মহিলাগণ স্বদেশী সঙ্গীত গাইলেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় মাননীয় পণ্ডিত গোকরণ মিশ্র মহাশয়কে ভারতবাসীগণের ন্যায্য অধিকার ঘোষণা (Declaration of Rights) সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, পার্লামেণ্টে যে সংবিধি (Statute) পাশ করা হবে তাতে যেন স্বীকার করা হয় যে (১) সম্রাটের ভারতীয় প্রজাগণ ও ভারতে প্রবাসী অন্যান্য প্রজাগণ আইনের চোখে এক এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক বিচার পদ্ধতি বা শাস্তির বিধান থাকবে না, (২) সাধারণ আদালতের বিচার ছাড়া ভারতীয় প্রজাগণের কোন প্রকার স্বাধীনতা বিপন্ন করা হবে না, (৩) গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকদের মত প্রত্যেক ভারতবাসীর অস্ত্রধারণের ক্ষমতা থাকবে, (৪) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হবে না, এবং (৫) যে অবস্থায় ব্রিটিশ প্রজার দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা আছে তদনুরূপ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় যেন ভারতবাসীকে দৈহিক শাস্তি না দেওয়া হয়।

সুদীর্ঘ ভাষণে মিশ্র মহাশয় বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন বুলবুল্-ই-হিন্দ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীরামভুজ দত্ত-চৌধুরী (ইনি হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন), মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রী টি. ভি. ভেঙ্কটরমন আয়ার, ঢাকার শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের যমনাদাস মেহতা, বেরারের শ্রীব্যাস (ইনি হিন্দীতে বললেন), অন্ধ্রের শ্রীচেলাপতি রাও এবং গয়ার উকিল শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ সেন সুবা (ইনি হিন্দীতে ভাষণ দিলেন)। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

শ্রী সি. পি. রামস্বামী আয়ার রাজস্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য ডোমিনিয়নের যে প্রকার রাজস্বের উপর কর্তৃত্ব আছে ভারতবর্ষকেও যেন সেই প্রকার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সুপণ্ডিত ও সুবক্তা আয়ার মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। সুবক্তা মাননীয় শ্রীআবুল কাসেম, অর্থনীতিবিদ শ্রী এম্. সুবেদার (মনু সুবেদার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন—এবং পরে বোম্বাইতে ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন।) লক্ষ্ণৌয়ের সাংবাদিক শ্রী সি. এ. রঙ্গ আয়ার (অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে দিল্লীর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি সুবক্তা ছিলেন।), বোম্বাইয়ের শ্রীমাভাজী গোবিন্দজী প্রস্তাব সমর্থন করার পর ইহা গৃহীত হ'ল।

এদিনের অধিবেশন তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল, কারণ মুসলিম লীগের অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আমিও মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগদান করলাম।

[সাত]

ঐদিন বৈকালে ৪-৩০ মিঃ সময় পুনরায় বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণও আহূত হয়ে কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভায় আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের ভোটের অধিকার ছিল না।

বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল মণ্টফোর্ড স্কীম আলোচনা করে সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ। বিষয় নির্বাচিত সমিতিতে আলোচনার সময় প্রবল মতানৈক্য দেখা গেল। একদল উক্ত স্কীমকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে চান। অন্য দল স্কীমে ভারতের দাবি যথোচিত মানা না হ'লেও এতে বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থার পরিকল্পনা আছে স্বীকার করে স্কীমের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব পাশ করতে চান। এই আলোচনা গত তিন দিন ধরে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে চলতে থাকে কিন্তু কোন মীমাংসার পথ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হ'ল যে, অধিকাংশ মডারেটগণ ত কংগ্রেস ত্যাগ করেইছেন—তার পর বোধ হয় আবার ভাঙ্গন ধরে। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব তুললেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা হ'তে লাগল। সভায় অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। এমন সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় উভয় মতের সামঞ্জস্য করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব খাড়া করলেন। মালব্যজী ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র সভ্যগণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দাশ মহাশয় সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তখন সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়া হ'ল। বিপুল ভোটাধিক্যে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বাংলার প্রায় সব প্রতিনিধিই মালব্যজীর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এমন কি দাশ মহাশয়ের জামাতা শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। পরাজিত দাশ মহাশয় ক্ষুব্ধচিত্তে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন।

[আট]

১লা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় চতুর্থ বা শেষ দিনের অধিবেশন হ'ল। যথারীতি মহিলাগণ কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য আরম্ভ হ'ল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মঞ্চোপরি দাঁড়িয়ে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে মাননীয় ভারত সচিব ও বড়লাট বাহাদুরের ভারতবর্ষে দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্তন করার ঐকান্তিক চেষ্টা এই কংগ্রেস স্বীকার করছে এবং আরও স্বীকার করছে যে, কোন কোন সুপারিশে কতক বিষয়ে বর্তমান অপেক্ষা উন্নততর ব্যবস্থা আছে তথাপি এই কংগ্রেসের মতে প্রস্তাবগুলি নৈরাশ্যজনক ও অসন্তোষজনক এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত পন্থাস্বরূপ। যে সকল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক কংগ্রেস সে-সম্বন্ধে মত প্রকাশ করছে। প্রস্তাবের পরবর্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট, ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, ভারত অফিস ও পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত ব্যক্ত করা হয়েছে।

পণ্ডিত মদনমোহন তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণে এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে বললেন যে, এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষের ফল।

প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ও মডারেট নেতা স্যর দিনশা পেটিট বললেন যে, তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করছেন কারণ তিনি শুনেছিলেন যে বিনা আলোচনায় ও বিনা সংশোধনী প্রস্তাবে কংগ্রেস মণ্টফোর্ড স্কীম প্রত্যাখ্যান করবে। এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। অথচ এই আশঙ্কা কতক বন্ধুর মনে এমন স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেছে যে, তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করে পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়তে মনস্থ করেছেন।

এর পর মাননীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে স্বীকার করলেন যে, প্রস্তাবটি আপোষের ফল এবং মন্তব্য করলেন যে, আপোষ মীমাংসা কার্যকরী রাজনীতির প্রাণ-স্বরূপ।

দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দ রাঘব আয়ার, মাননীয় ফজলুল হক্, সর্বশ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এস. আর. বোমানজী ও ভি. পি. মাধব রাও কর্তৃক প্রস্তাবটি সমর্থিত হওয়ার পর বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শিল্পপতি, মডারেট নেতা শ্রীলালুভাই সামলদাস বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। (ইনি পরে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত হন।

এঁর সুযোগ্য পুত্র ব্যারিষ্টার, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও সুলেখক শ্রীগগনবিহারী লাল মেহতা আমেরিকায় স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।) তিনি বললেন যে কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিমন্ত্রণে যে কয়জন মডারেট বন্ধু মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা বলেছিলেন যে, কংগ্রেসে যোগ দিলে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে তাঁদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করা হবে। এই আশঙ্কা যে কত অমূলক তা প্রমাণ করতেই সম্ভবতঃ তাঁকে প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে আহ্বান করা হয়েছে।

এর পর প্রবল করতালি, 'বন্দেমাতরম্', 'তিলক মহারাজ কি জয়' হর্ষধ্বনির মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন। তিনি রহস্য করে বললেন যে, এখানে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিবার অনুমতি প্রদানের জন্য বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া তাঁর প্রধান কর্তব্য কিন্তু সভাপতি মহাশয় তাঁর প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মত সদয় হন নি। তাঁকে মাত্র ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। তিলক মহারাজ জানালেন যে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে বিভিন্ন মত চোলাই করার মত কঠিন কাজ সাধিত হয়েছে। বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা মনে করেছিল যে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাবে কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় নি, তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়েছে। মণ্টফোর্ড স্কীম সমালোচনা করে তিনি বললেন যে, কংগ্রেস মাত্র আট আনা স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিল কিন্তু স্কীমে বলা হয়েছে এক আনা দায়িত্বপূর্ণ শাসন আট আনা স্বায়ত্ত-শাসন অপেক্ষা ভাল। কংগ্রেস ঐ এক আনার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ কংগ্রেস লীগ স্কীম গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন শ্রীআব্বাস তায়েবজী (ইনি ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবদরুদ্দিন তায়েবজীর পুত্র। বরোদা হাইকোর্টে জজিয়তি করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মী ছিলেন)। এর পর প্রস্তাব সমর্থন করলেন প্রসিদ্ধ নেতা ও বাগ্মী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ও বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সুপণ্ডিত, বক্তা শ্রী এম্. আর. জয়াকর।

সর্বশেষে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি প্রসঙ্গত বললেন যে স্কীমে শাসন-পদ্ধতিতে ব্রিটিশের বিশিষ্ট গুণ (British charactor) রাখার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন—কেন? ভারতের লোকেরা ত ব্রিটেন নয়—তাঁরা ভারতীয়। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের এই পার্থক্যই কমনওয়েলথের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হবে।

বেশান্ত মহোদয়ার সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। তার পর কয়েকটি মামুলি প্রস্তাবের পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করলেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন শ্রীমতী অনুসূয়া সারাভাই (আমেদাবাদের ধনকুবের শিল্পপতি শ্রীআম্বালাল সারাভাই-এর ভগ্নী। আমেদাবাদের কাপড়ের কলের মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের সময় ভ্রাতা ও ভগ্নী বিবদমান বিভিন্ন পক্ষ দু'টির নেতৃত্ব করেছিলেন। কাপড়ের কলের মালিক সংঘের সভাপতি আম্বালাল মালিকদের পক্ষে এবং অনুসূয়া মজদুরদের পক্ষে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।) শ্রীমতী মোরারজী কামদার ও শ্রীবিভাকর।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দীতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় এখনও হয় নি, কারণ মুসলমান মহিলাগণ অবরোধ প্রথা পালন করেন সুতরাং প্রস্তাব কার্যকরী হবে না।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর ইহা গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী সিভিল সার্ভিস-সংক্রান্ত প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত করেন।

শ্রীরামভুজ দত্ত চৌধুরী সৈন্য বিভাগে ভারতীয়গণের কমিশনে নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর পি. কেশব পিলাই ও দিল্লীর পণ্ডিত নেকিরায় শর্মা কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

এরপর শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় "রৌলেট" কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাবে রৌলেট কমিটির সুপারিশকে তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে, সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করলে ভারতবাসীগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং বলিষ্ঠ জনমত গঠনে বাধা দেওয়া হবে। দাশ মহাশয় বললেন যে,

যখন সমগ্র দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন চলছে সেই সময় কেন যে গভর্ণমেণ্ট লোকের উৎপীড়নের নূতন অস্ত্রের ব্যবস্থা করছে তা বোঝা কঠিন। দেশে বিপ্লববাদী আছে তা তিনি অস্বীকার করেন না কিন্তু তাদের দমন করার নীতি এ নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কখনও দমন-নীতি দ্বারা বিপ্লববাদ রোধ করা যায় নি। এ রোধ করার একমাত্র পথ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

নাগপুরের শ্রীআলেকর এবং মাদ্রাজের মাননীয় শ্রী বি. পি. আয়ার সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাবও শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের মতে ভোটাধিকার, নির্বাচন ক্ষেত্র এবং বিধান পরিষদের গঠন স্থির করার ভার কোন কমিটির উপর অর্পণ না করে পার্লামেণ্টের (হাউস অব কমন্‌স) উপর ঐ সকল বিষয় মীমাংসার ভার দেওয়া হয় এবং তা ভারত গভর্ণমেণ্টের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয় অথবা যদি এই উদ্দেশ্যে কোন কমিটি গঠিত হয় তা হ'লে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগের কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুইজন বেসরকারী সভ্যকে কমিটিতে লওয়া হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশের জন্য অতিরিক্ত বেসরকারী সভ্য সেই প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হয়।

মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর পি. কেশব পিলাই এবং শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বললেন যে, তিনি প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশ সমর্থন করেন কিন্তু প্রথমাংশ সমর্থন করেন না। তাঁর মতে যে পার্লামেণ্ট ভারতের বাজেট আলোচনা করার সময়ই পায় না সেই পার্লামেণ্টের কাছ থেকে ভারতের ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আশা করা দুরাশা মাত্র। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয় এর বিরোধিতা করে বললেন যে, পার্লামেণ্টের হাতেই এই বিষয়টি রাখা ভাল। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে, প্রাদেশিক সরকারী কার্য থেকে ভারত (কেন্দ্রীয়) সরকারের কার্যাদি পৃথক করার জন্য এবং সংরক্ষিত (রিজার্ভড) ও অসংরক্ষিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হবে তাও যেন পূর্ববর্তী প্রস্তাবানুসারে গঠিত হয়।

শেষ প্রস্তাবও সভাপতি মহাশয় পেশ করলেন। এই প্রস্তাব দ্বারা বিলাতে কংগ্রেস ডেপুটেসনের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণের প্রতি অর্পিত হ'ল।

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী এইচ. এন্. আপ্তেকে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে আহ্বান করলেন। আপ্তে মহাশয় মারাঠী ভাষায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

ধন্যবাদের পালা শেষ হ'লে সভাপতি মহাশয় কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তি করে অভিভাষণ দিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি ভারত সম্রাট কর্তৃক কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়ে গৌরব অনুভব করেছেন কিন্তু সম্রাট অপেক্ষাও বৃহৎ যে জনসাধারণ, সেই জনসাধারণ দ্বারা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বিশেষ গৌরব অনুভব করছেন। বিপুল অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকারের জন্য বোম্বাইবাসিগণকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বিশেষ করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিয়ে "বন্দেমাতরম্" বলে সভার কার্য সমাপ্ত করলেন।

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার সম্রাটের নামে থ্রি চিয়ার্স দিলেন এবং সভাস্থ অনেকে "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা'র পরিবর্তে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করে তাতে যোগ দিলেন।

সর্বশেষে একদল মহিলা কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" গীত হওয়ার পর কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল।

[নয়]

এবার কংগ্রেসের অধিবেশনে ও সকাল-সন্ধ্যায় বিষয় নির্বাচনী সমিতির আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় সময়াভাবে বোম্বাই সহর ভাল করে দেখার সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি মাত্র। কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়ে দ্বিপ্রহরে শেষ হওয়ায় সময় পেয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার

এস্. পি. রায় ও বরিশালের একজন উকিল (নাম মনে পড়ছে না—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ক্লার্ক শ্রীললিত মোহন সেনগুপ্তের ভ্রাতা) এবং আমি প্রসিদ্ধ এলিফ্যাণ্ট্যা গুহা দেখতে গেলাম। একটি ষ্টীম লঞ্চে আমরা রওনা হ'লাম। "ব্যাক বে"র শান্ত সমুদ্রপথে এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের দিকে যেতে পথে আশেপাশে কয়েকটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল, এলিফ্যাণ্টা গুহার বিরাট্ বিরাট্ প্রান্তরে খোদিত মূর্তি ও কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হ'লাম। গুহা পরিদর্শনের পর আমরা ফিরে এস ষ্টীমার ঘাটে একটি বেঞ্চে বসে ষ্টীম লঞ্চের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে একজন কুলিশ্রেণীর লোক নোংরা কাপড় পরে আমাদের পাশে এসে বসল। বাংলা দেশে তখন এই শ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের পাশে বসতে সাহস করত না। সেনগুপ্ত মহাশয় "বরিশাল হ'লে একবার ব্যাটাকে দেখিয়ে দিতাম" বলে আক্রোশ প্রকাশ করলেন। বস্তুত বোম্বাই এ সব বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা অনেক উদার লক্ষ্য করেছি। বোম্বাইয়ের রাস্তায় অসংখ্য "বিশ্রান্তি গৃহ" বা "উপাহার গৃহ"গুলিতে চা খেতে গিয়ে অনেক সময়েই দেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণীর লোকও অপরিচ্ছন্ন পোসাক নিয়ে সেখানে চা খাচ্ছে।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোম্বাই সহরে ফিরে বাসায় পৌঁছে দেখি যে আমাদের হলঘরের দরজা বন্ধ করে অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন কর্মী তালা লাগাচ্ছেন। আমরা ত দেখে অবাক্। কথা ছিল যে আমরা সে রাত্রি ওখানে থেকে পরদিন বাসা ছেড়ে দেব। শুনলাম যে বাসের জন্য প্রতিনিধিদের দেয় ভাড়া (accomodation charge) নিয়ে বচসা হওয়ায় বাংলার অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যাঁরা আমাদের সঙ্গে ঐ ঘরে ছিলেন তাঁরা সকলেই চলে গিয়েছেন। আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'লাম। আমাদের জিনিষপত্র সমস্তই হল ঘরে রেখে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেগুলির জন্য আমাদের আশঙ্কা হ'ল কিন্তু দেখলাম যে আমাদের আশঙ্কা অমূলক। আমাদের সুটকেশ, বিছানাপত্র ইত্যাদি সমস্তই এক কোণে সাজান ছিল। আমরা খুব সময়মত এসে পড়েছিলাম নচেৎ সে রাত্রে আমাদের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। আমাদের খুবই মুস্কিলে পড়তে হ'ত। যা হোক উপরোক্ত কর্মীদের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র নীচে নামিয়ে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত "ভিক্টোরিয়া" গাড়িতে চড়ে "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস" ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি মহারাষ্ট্রী হোটেলে উঠলাম। সেখানে আরও কয়েকজন বাংলার প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হ'ল।

হোটেলে সেই রাত ও পরের দিন থেকে বোম্বাই সহর ভাল করে দেখলাম। হোটেলে নিরামিষ খাবার বন্দোবস্ত ছিল। একটা নূতন প্রথা লক্ষ্য করলাম। আমাদের যখন খেতে দিল তখন দেখলাম যে বসবার পিঁড়ির সামনে আর একটি পিঁড়ির উপর থালায় ভাত ও বাটিতে ডাল-তরকারি ইত্যাদি পাচক পরিবেশন করল।

বোম্বাই সহর পরিদর্শন করে কয়েকজন সঙ্গীসহ নাসিকে গেলাম। নাসিক ভ্রমণের সময়ের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। গোদাবরী নদী পার হয়ে পঞ্চবটী বনের পথে যাওয়ার সময় একজন মারাঠী কৃষকের সঙ্গে দেখা হ'ল। লোকমান্য তিলকের কথা উল্লেখ করায় সে হাতজোড় করে লোকমান্যের প্রতি প্রণাম ও ভক্তি জ্ঞাপন করল এবং বলল যে, আগে আমরা ইংরাজের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেতাম না। কেবল তার পায়ের দিকে নজর রাখতাম—তিলক মহারাজের শিক্ষায় এখন আমরা ইংরাজের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছি। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে একমাত্র লোকমান্য তিলকই জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করে নি। তা শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহারাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ মহামতি তিলককে দেবতার ন্যায় ভক্তি করত।

নাসিক থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে আলিপুরের বঙ্ক রায়, মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার আর. মাইতি, খুলনার উকিল হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি নাগপুরে নামলাম। আমাদের সহযাত্রীর এক আত্মীয়ের বাসায় উঠে আমরা নাগপুর সহর মোটামুটি দেখে পরদিনই বোম্বে মেলে কলকাতা রওনা হ'লাম।

তখনকার দিনে ট্রেণে আজকের মত অসম্ভব ভীড় হ'ত না। আমরা মধ্যমশ্রেণীর একটি বড় কামরায় উঠলাম। যথেষ্ট জায়গা ছিল—বেশ আরাম করে বসলাম। আমি যে বেঞ্চে বসেছিলাম সেই বেঞ্চে আমার ডান-দিকে মহা-

রাষ্ট্রীয়ের মত ধুতি সার্ট ও কোট পরে এবং মাথায় টুপি লাগিয়ে লোকমান্য তিলক কর্তৃক সম্পাদিত বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সংবাদপত্র "কেশরী" পড়ছিলেন। ছিপ্ ছিপে শ্যামবর্ণ চেহারা, গাল খানিকটা তোবড়ানো। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করলাম। অন্যান্য সঙ্গীরাও আলাপে যোগ দিলেন। কথাবার্তা আমরা "টুটা ফুটা" হিন্দীতেই চালাতে লাগলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপ কাঁহাসে আতে হ্যায়?"

তিনি উত্তর দিলেন—"নাসিক সে।"

প্রশ্ন করলাম—"হুঁয়া কিয়া কাম করতা?"

উত্তর হ'ল—"ঠিকাদারি।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত স্বল্পভাষী। তিনি কেবল আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কথাবার্তা বেশী বলার আগ্রহ দেখলাম না। মাঝে মাঝে দু'চারটা কথা হচ্ছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন ট্রেণ হাওড়ার নিকটবর্তী হ'ল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপ্ কলকত্তামে কাঁহা ঠারেঙ্গে?" তিনি উত্তর দিলেন "ম্যায় ঢাকা যাউঙ্গা।" প্রশ্ন করলাম, "হুঁয়া আপকো কৈ কাম হ্যায়?" এবার তিমি উত্তর দিলেন, হুঁয়াই মেরা ঘর হ্যায়।" অবাক্ কাণ্ড! বললাম, "আপনি বাঙ্গালী, তবে আমাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথাবার্তা বলছিলেন কেন?" তিনি বললেন, "আপনারা হিন্দী ছাড়া কথা বলেন না। আমি করব কি?" ভদ্রলোক অতিশয় রসিক পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। দেড় দিন ধরে হিন্দীতে কথাবার্তা চালিয়ে আমাদেরকে বুঝতে দেন নি যে তিনি বাঙালী —একবারও আত্মপ্রকাশ করেন নি। আমরা তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিশেষ করে তাঁকে "কেশরী" পড়তে দেখে তাঁকে একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকই ঠিক করেছিলাম। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না, তবে তাঁর কথা কখনও ভুলব না।

কলকাতায় পৌছে দু'একদিন থেকে আমার কর্মস্থল রাজসাহী সহরে ফিরে গেলাম।

॥ উপন্যাস ॥

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(আটাশ)

আগের রাত্রে কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঝড় এবং কিছু বৃষ্টি। তার ফলে গরম বেশ খানিকটা কেটেছে।

শিক-দিয়ে-ঘেরা বারান্দায় বসে বসে রামকিঙ্কর আর সুবল কালবৈশাখীর গল্প করছিল। সকালে খবরের কাগজে ঝড়ের বর্ণনা ছিল। কত তার গতিবেগ এবং কি ক্ষতি করেছে। গড়ের মাঠে একটা এবং দমদমে আর একটা গাছ পড়ে গেছে। বেহালার দিকে একটা টিনের চালা উড়ে গেছে। কেউ হতাহত হয় নি।

হাতের খবরের কাগজটা সরিয়ে দিয়ে সুবল বললে, দেখ, ঝড়ের কাণ্ড! কিন্তু কলকাতার মধ্যেখানে বসে কিছু বোঝবার উপায় নেই। শুধু খানিকটা ঝড়ের গুম গুম আওয়াজ শুনলাম, ব্যস্!

রামকিঙ্কর বললে, গাঁয়ের কথা ভাব। আজ ভোর থেকে বাগানে বাগানে আম কুড়োবার ধূম পড়ে গিয়েছে ছেলেদের মধ্যে। গাছের তলায় তলায় ভাঙা ডাল আর পাতার ভীড়। এখানে সকালে বসে বুঝতেই পারছ না, কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেছে। পথে-ঘাটে ঝড়ের চিহ্ন নেই। চিহ্ন দেখতে গেলে তোমাকে গড়ের মাঠ কিংবা দমদম যেতে হবে। গাঁয়ে কিন্তু এই চিহ্ন ক'দিন ধরে থাকে।

সুবল বললে, গাঁয়ের কথা নয়, ভাই। গাঁয়ের কথা শুনলে মনটা হু হু করে ওঠে।

—বাস্তবিক। এতদিন কলকাতায় রইলাম, কিন্তু কলকাতাকে কিছুতেই আপনার করতে পারলাম না।

রামকিঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, হরেকেষ্টর খবর কি হে?

রামকিঙ্কর হাতের তালু উল্টে বললে, কি করে জানব ভাই? তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

—একটা চিঠি দেওয়া ত উচিত ছিল।

—যেখানে দেবার, সেখানে দিচ্ছে হয়ত। এখানে আর কাকে চিঠি দেবে?

—কেন, তোমার সঙ্গে ত খুব ভাব হয়ে গেছে। যাই বল, লোকটা কিন্তু আশ্চর্য। তোমার সঙ্গে শত্রুতা, অথচ বিশ্বাস করবার সময় তোমাকেই করলে!

রামকিঙ্কর বললে, সেটা আমারও খুব আশ্চর্য ঠেকে। ভাবি, ভেতরে হয়ত গভীর মতলব কিছু আছে। সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে না। পরে বোঝা যাবে।

সুবল বললে, না, না, মতলব কিছু নেই। ভয়ে লোকটার মুখ কি রকম হয়ে গিয়েছিল, দেখ নি? ও সময় অতি বড় শয়তানের মাথায়ও মতলব আসে না।

—না এলেই ভাল। এখন ভদ্রলোক ভালয় ভালয় ফিরে আসুন। এসে আমাকে এই আবু হোসেনীর দায় থেকে মুক্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।

রামকিঙ্কর এখন দোকানের অস্থায়ী ম্যানেজার।

সুবল বললে, ও আর ফিরছে না হে। রাজ্যপাট তোমারই রইল।

—তার মানে? ও মরবে ভেবেছ?

—না। এত শীগগির মরবার লোক ও নয়। কিন্তু ও আর আসছে না।

—কি করে বুঝলে?

—বুঝেছি। ও নিজেই বলে গেল, শুনলে না, আর আমি ফিরব না?

—সেটা ভয়ে বলেছিল। ভেবেছিল, আর বাঁচব না। লোকটা এত ভীতু জানতাম না।

—ওই রকমের লোকেরা ভীতু হয়। ওরা দুঃসময়ে কাউকে দেখে না। ভাবে, ওদের দুঃসময়েও কেউ দেখবে না।

সুবল হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর বললে, কিন্তু ওকে আসতেই হবে।

— হিসেব বুঝিয়ে দেবার জন্যে?

—হ্যাঁ। কিন্তু যা করে রেখেছে, হিসেব বুঝিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। সেদিন উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম, অনেক গোলমাল আছে। সেই গোলমাল চাপবার জন্যে ওকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত গদি আঁকড়ে থাকতে হবে।

—গোলমালগুলো ধরিয়ে দাও না?

—না। আমার কি দায় পড়েছে? যাদের দোকান, তারা যদি না দেখে, আমি কি করব?

—কিন্তু তোমাকে যে এত কষ্ট দিয়েছে, তোমার পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা লেগেছিল, তাকে জব্দ করবার সুযোগ ছেড়ে দেবে?

রামকিঙ্করের লোভ হচ্ছিল। হরেকৃষ্ণ বহু টাকা মেরেছে। সে সমস্ত গিন্নীমার কাছে পেশ করলে হরেকৃষ্ণের নিস্তার নেই। কিন্তু তার রাগ হরেকৃষ্ণের চেয়েও বৃন্দাবন-

চন্দ্রের ওপর বেশী। একটা অপদার্থ মাতাল, স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে। নিজের সম্পত্তি সে যদি নিজে না দেখে, রামকিঙ্কর কি করতে পারে? কেনই বা করবে?

বললে, তোমাকে সত্যি বলছি সুবল, হরেকেষ্ট এসে পড়লে আমি বাঁচি। আমার এ ভাল লাগছে না।

সুবল হেসে বললে, কিন্তু হরেকেষ্ট ফিরে এলে এবার নির্ঘাৎ তোমার চাকরি যাবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রামকিঙ্কর বললে, থাকগে। এই তেলের দোকানের চাকরি যাওয়া একটা মস্তবড় ব্যাপার নয়। চাকরী একটা কোথাও খুঁজে-পেতে জোগাড় করতে পারব। আর কিছু না হোক, দুটো ছেলে পড়িয়েও মেসের খরচা যোগাড় হবে।

ম্যানেজারীর ওপর তার যথেষ্ট লোভ ছিল। সে লোভ ঘুচে গেছে, হরেকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পরে, ম্যানেজারী পেয়ে। এ ক'দিন একবারও সে গদি থেকে বেরুবার সময় পায় নি। খাওয়া-শোওয়ার সময়টুকু ছাড়া সমস্ত ক্ষণই গদিতে বসে। বরাবর সে বাইরে বাইরে ঘুরেছে। তখন মনে হ'ত, পাখার নিচে গদিতে বসে থাকা কি আরামের! এখন একেবারে উল্টো। মনে হয়, একটু বেরুতে পারলে বাঁচি। এর মধ্যে একবারও তার সারদার সঙ্গে দেখা হয় নি। চন্দ্রনাথবাবুর অসুখ শুনেছে। একদিনও দেখতে যেতে পারে নি। বিশ্বনাথ ও তার মা কি ভাবছেন, কে জানে। সমস্তক্ষণ শুধু দোকান, দোকান, দোকান। খদ্দের আর মহাজন ঠেলা। মোটেই ভাল লাগছে না।

•

সন্ধ্যাবেলা রামকিঙ্কর জোর করে সময় করে নিয়ে বিশ্বনাথদের বাড়ী গেল। দরজায় কড়া নাড়ে, সাড়া নেই। আবার কড়া নাড়ে, সেই অবস্থা। বাড়ীতে কেউ নেই না কি? নিস্তব্ধ বাড়ী। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে না, ভিতরে লোক আছে।

দুশ্চিন্তায় রামকিঙ্করের বুকের ভিতরটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

চলে যাবে কি যাবে না, ভাবতে ভাবতে আরেকবার কড়া নাড়লে। এবারে সাড়া না পেলে ফিরেই যাবে।

এবারে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে সুলোচনা। মুখখানা থমথম করছে। রামকিঙ্করকে দেখে চোখে যেন একটু জলও এল।

ভিতরে ঢুকে রামকিঙ্কর থমকে গেল।

জিগ্যেস করলে, কি ব্যাপার?

কোন সাড়া না দিয়ে সুলোচনা নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

কি ব্যাপার? চন্দ্রনাথবাবু কি গুরুতর অসুস্থ? অথবা কি,

এইখান থেকেই উঁকি দিয়ে রামকিঙ্কর দেখলে, চন্দ্রনাথবাবুর শয্যায় কে যেন শুয়ে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত বোধ হচ্ছিল। রামকিঙ্করের বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

যাক, আর যাই হোক, চন্দ্রনাথবাবু বেঁচে আছেন!

ভাবছে, এমন সময় বিশ্বনাথ বেরিয়ে এসে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে। কোন কথা না বলে।

রামকিঙ্করের সমস্ত দেহ তখন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। কণ্ঠ শুষ্ক।

কোনমতে জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে?

কয়েক মুহূর্ত বিশ্বনাথ জবাব দিতে পারলে না। অবশেষে বললে, সবিতা চলে গেছে।

রামকিঙ্কর প্রায় চিৎকার করে উঠল: চলে গেছে! সবিতা নেই? কি হয়েছিল?

বিশ্বনাথ চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গে রামকিঙ্করের কানে এল দু'পাশের ঘর থেকে চাপা কান্নার শব্দ। ঠিক কান্না নয়, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দ।

দু'জনেরই কান সেই দিকে গেল।

একটু পরে বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বললে, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। সবিতা মারা যায় নি। তারও চেয়ে বেশী।

—মৃত্যুর চেয়েও বেশী?

—হ্যাঁ। সবিতা একটি ছেলেকে বিয়ে করে চলে গেছে।

রামকিঙ্কর বুঝতে পারলে না। অস্থির ভাবে বললে, একটি ছেলেকে বিয়ে করে চলে গেছে! সেটা মৃত্যুর চেয়ে বেশী হ'ল কি করে?

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলে:

বাবা সবিতার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। সবিতা কিছুতেই রাজী হয় নি, সে ত তুমি জান। কেন রাজী হয় নি, তার মানে তখন বুঝি নি। এখন বোঝা যাচ্ছে। সবিতা তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করে নি। বাপ-মায়ের অমতে অসবর্ণ বিবাহ করতে গেলে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করা দরকার। এখন সে ক্ষমতা হয়েছে। আই. এ. পাশ করেছে। একটি স্কুলে মাষ্টারী পেয়েছে। একটি কলেজে সকালে বি. এ. পড়ছে। অন্য জাতের সেই ছেলেটিকে এখন সে বিয়ে করবে।

রামকিঙ্কর জড়পুত্তলিকার মত বসে রইল।

বিশ্বনাথ বলে চলল, বাবা-মা প্রথমে তিরস্কার করেছেন, তার পরে কত বুঝিয়েছেন। শেষে কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছেন। সবিতা তথাপি টলে নি।

একটু থেমে বিশ্বনাথ বললে, আজ সকালে সে চলে গেল। বাবার শরীরটা এমনিতেই ভাল যাচ্ছিল না। এখন একেবারে শয্যা নিয়েছেন। মায়েরও সেই অবস্থা। আজ দুপুরে উনুনে আগুন পড়ে নি। কিছু খাবার কিনে এনে বহু কষ্টে দু'জনকে একটুখানি খাইয়েছি। আমি কি করি বল ত?

করুণ চোখে বিশ্বনাথ রামকিঙ্করের দিকে চাইলে।

রামকিঙ্কর শুষ্কমুখে বসে রইল। কি পরামর্শ দেবে?

অনেকক্ষণ পরে জিগ্যেস করলে, ছেলেটিকে জান?

—জানি। তুমিও দেখেছ বোধ হয়। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার সময় সবিতাকে পড়াত।

ছেলেটিকে রামকিঙ্করের মনে পড়ল। দেখতে-শুনতে ভালই। সুপুরুষ বলা যেতে পারে। পড়াশুনোও করেছে। বিশ্বনাথের বাপ মায়ের দোষ দেবে কি, গ্রামের ছেলে সে নিজেও এ শ্রেণীর বিবাহের বিরোধী।

জিগ্যেস করলে, ছেলেটির ঠিকানা জান?

নিস্পৃহ ভাবে বিশ্বনাথ জবাব দিলে, ঠিক জানি না। শুনেছি, কাছাকাছি কোথাও থাকে।

তবে আর কি করা যায়? ঠিকানাটা জানা থাকলে রামকিঙ্কর ওদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে পারত। তাও সম্ভব নয়।

বিশ্বনাথ বললে, বিশেষ করে ভাবছি বাবার জন্যে। এই ধাক্কা তিনি সামলাতে পারবেন বলে মনে হয় না। কি যে করি?

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রামকিঙ্করের মুখের উপর বিষণ্ণতার ছায়া নামল। জিগ্যেস করলে, ভদ্রলোক সবিতাকে কতদিন পড়িয়েছেন।

—স্কুল ফাইনালের বছর দুই।

—ব্যাপারটা যে অন্তদিকে এগুচ্ছে, তোমরা তার কিছুই টের পাও নি?

—না। আমরা ও কথা ভাবিই নি।

—ছেলেটির ঠিকানাও ত তোমরা জান না। বিয়ে কি হয়ে গেছে?

—তাও জানি না।

দু'জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসে রইল। দু'জনেরই মন বিষণ্ণ। দু'জনেরই মুখে গভীর বেদনার ছায়া।

রামকিঙ্কর গ্রামের ছেলে। সমাজ তার কাছে জাগ্রত ও জীবন্ত। গ্রামে এ ঘটনা ঘটলে বিশ্বনাথদের পক্ষে গ্রামে থাকাই কঠিন হ'ত। শহরে সমাজ বলে কিছু নেই। তাই রক্ষা।

তবু আঘাতটা চন্দ্রনাথবাবুর পক্ষে প্রচণ্ড বেজেছে। বিশ্বনাথের আশঙ্কা অমূলক নয়, চন্দ্রনাথবাবু এবং সুলোচনা এই ধাক্কা কাটাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

সবিতার উপর রামকিঙ্করের খুব রাগ হ'ল। সবিতা উদ্ধত চঞ্চল মেয়ে নয়। খুবই শান্তশিষ্ট এবং অমায়িক মেয়ে। অত্যন্ত স্নিগ্ধ তার ব্যবহার। সে যে বাপ-মায়ের মনে এতবড় দাগা দিয়ে কোনদিন নিষ্ঠুর ভাবে চলে যেতে পারে, তা চিন্তারও অগোচর। আকস্মিক বলেই ব্যথাটা এত বেশী বেজেছে।

বেজেছে রামকিঙ্করেরও। সবিতাকে সে নিজের বোনের মতই দেখে এসেছে। তার চিন্তা শুধু চন্দ্রনাথ-বাবুদের জন্যেই নয়, সবিতার জন্যেও।

সংসারানভিজ্ঞ বালিকা মনের ভুলে এবং ভাবের আবেগে কি করে বসল, কে জানে। ছেলেটি, শুনেছে, কোন একটি সওদাগরী অফিসে কি যেন সামান্য একটা চাকরি করে। পরিবার প্রতিপালনের কতখানি শক্তি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বোধকরি সেই জন্যেই বিবাহটা এতদিন স্থগিত ছিল। সবিতা বি. এ. পাশ করার পর বোধ হয় ওদের সাহস হয়েছে। দুজনে মিলে এখন সংসার চালাতে পারবে।

রামকিঙ্কর আপন মনেই হাসলে। বি. এ. পাশের কতটুকু মূল্য সে জানে!

সবিতার জন্যে তার চিন্তা হয়। অথচ করবার কিছুই নেই। ঠিকানাটা জানলে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারত। কান্নাকাটি করে একবার বোঝাবার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু তাতেই বা কি হবে? সবিতা ফেরবার পথ রাখে নি।

এক কথা ভাবতে ভাবতে দোকানে ফিরে দেখে হরেকৃষ্ণ গদীতে সমাসীন! গায়ের রঙ ময়লা হয়ে গেছে। মুখে বসন্তের দাগ খুব স্পষ্ট। শরীরও জীর্ণ বোধ হচ্ছে।

হরেকৃষ্ণ হাসিমুখে প্রশ্ন করলে, ভাল আছ, বাবা?

রামকিঙ্কর নমস্কার করে সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে, হ্যাঁ। আছি এক রকম। আপনার খবর কি? শরীর কেমন?

হরেকৃষ্ণ বললে, আছি ভালই। তবে শরীরে এখনও বল পাই নি।

—তবে এলেন কেন? আর দু'দিন থেকে এলেই ত পারতেন।

হরেকৃষ্ণ সহাস্যে বললে, তা পারতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সমস্ত জের মিটিয়ে এসে নিশ্চিন্তে বসাই ভাল।

হরেকৃষ্ণ হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে, কিসের জের মেটাবেন?

তেমনিভাবে হাসতে হাসতে হরেকৃষ্ণ বললে, এই দোকানের জের। আমি এইবার বিদায় নেব, রাম। আমি আর পারছি না। শরীর আর বইতে চাইছে না। শরীরও নয়, মনও নয়।

হরেকৃষ্ণ চুপ করে রইল।

আশ্চর্য! হরেকৃষ্ণের উপর রামকিঙ্করের এখন আর কোন রাগ নেই। তার মিষ্টি কথা এবং ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে রামকিঙ্করের মন কোমল হয়ে এসেছে। হিসাব-নিকাশের কথাটা ভাবলে। হরেকৃষ্ণ যা করে রেখেছে, তাতে হিসাব-নিকাশ করা খুব সহজ হবে না। রামকিঙ্কর খুব ভাল করে অবশ্য দেখে নি, কিন্তু উল্টে পাল্টে যা দেখেছে, তাতে তার সন্দেহ, হিসাবে গোলমাল কয়েক হাজার টাকা হবে। এই টাকাটা হরেকৃষ্ণ কি করে মেটাবে?

বললে, আমি বলি কি, চাকরিটা এখনই ছাড়বেন না।

হরেকৃষ্ণ বললে, ছেলেরা খুব উপযুক্ত নয়। চাকরী ছাড়লে কিছুটা টানাটানি হবে, কিন্তু ওই যে বললাম, শরীর আর বইছে না।

রামকিঙ্কর বললে, শরীর বইবে। আপনাকে কিছু করতে হবে না। খাবেন দাবেন আর গদীতে বসে থাকবেন। যা করবার সব আমি করব। আপনি চাকরি ছাড়বেন না।

দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরা যে যার জায়গায় বসে ওদের কথা শুনছিল। সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। হরেকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে বাড়ী যাবার আগে পর্যন্ত দু'জনে অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ একদিনে, এক মুহূর্তে কি করে তা এমন বদলে গেল, ভেবে পেলে না—

এমনকি হরেকৃষ্ণ নিজেও কম অবাক্ হ'ল না। রামকিঙ্করকে তার উদ্ধত কুটিল যুবক বলেই ধারণা ছিল। তার মনে যে এত কোমলতা থাকতে পারে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল না, রামকিঙ্কর পরিহাস করছে, অথবা সত্যি বলছে।

অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে, তুমি থাকতে বলছ?

- বলছি। চিরদিন কাজ করে এসেছেন, এই দোকান আপনার প্রাণ। আপনি ভাবছেন, দেশে গিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাবেন। কিন্তু তা হবে না। কাজের মানুষের বিনা কাজে বেশীদিন বসে থাকতে ভাল লাগে না।

রামকিঙ্কর দিব্যি আরামে ম্যানেজারী করছিল, হরেকৃষ্ণকে ফিরতে দেখে বিরক্ত হবে এই কথাই হরেকৃষ্ণ অনুমান করছিল। রামকিঙ্করের কথায় সে মনে মনে খুশী হ'ল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারছিল না।

বললে, তা যা বলেছ, বাবা। গাঁয়ে গিয়ে প্রথম ক'দিন বেশ লেগেছিল। তার পরে আর ভাললাগছিল না।

রামকিঙ্কর জোরের সঙ্গে বললে, লাগবে না জানি। আপনি থেকে যান। চাকরি ছাড়বেন না।

—দেখি।

রাত্রে সুবল চুপি চুপি জিগ্যেস করলে, এটা কি করলে, রাম? আপদটা চলে যাচ্ছিল, তাকে আটকাবার চেষ্টা করলে কেন?

প্রশ্নটা যে রামকিঙ্করের মনে আসে নি, তাও নয়। সেও ঠিক এই কথাই ভাবছিল: লোকটা নিজের ইচ্ছায় চলে যাচ্ছিল, তাকে আটকাবার কি প্রয়োজন ছিল?

বললে, কেন যে করলাম, তা আমিও জানি না। লোকটার অবস্থা দেখে মনটা নরম হয়ে গেল। ওর পুরণো ব্যবহারের কথা মনেই রইল না।

সুবল বললে, যার যা স্বভাব, সে তা ছাড়তে পারে না। গদীতে বসে ও আবার তোমার পিছনে লাগবে।

নিস্পৃহভাবে রামকিঙ্কর বললে, লাগুক।

হরেকৃষ্ণের কথা রামকিঙ্কর ভাবছেই না। তার চিন্তা সবিতাকে নিয়ে। ফুলের মত সুন্দর, নিষ্পাপ একটি মেয়ে। সবে জীবনের শুরু। কোন্‌দিকে পা বাড়াল, কোথায় গিয়ে পৌছুবে, কে জানে!

হঠাৎ সুবল ধড়মড় করে উঠে বসল: ওঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে।

রামকিঙ্করও চমকে উঠল। বললে, কি ভুল হয়ে গেছে?

- সন্ধ্যের ডাকে তোমার একখানা চিঠি এসেছে। আমার পকেটেই রয়ে গেছে। দি, দাঁড়াও।

বলে আলোটা জ্বেলে ঝোলানো সার্টের বুকপকেট থেকে একখানা খামের চিঠি বের করে ওকে দিলে।

রামকিঙ্করের চিঠি এক জায়গা থেকেই আসে। তার কাকার কাছ থেকে। টাকার তাগাদায়। খামের ঠিকানা লেখা দেখেই বুঝলে, এও কাকার চিঠি। কিন্তু খামে কেন? টাকার তাগাদা কাকা প্রকাশ্যভাবে পোষ্টকার্ডেই করে থাকেন।

রামকিঙ্কর খামটা খুলে ফেললে।

লম্বা চিঠি। এত কথা পোষ্টকার্ডে আঁটত না।

দুরু দুরু বক্ষে রামকিঙ্কর চিঠিখানা পড়া শেষ করে ফেললে। ফেলে সুবলের দিকে চেয়ে হাসলে।

সুবল একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়েই ছিল। সেও জানে, চিঠিতে টাকার তাগাদা ছাড়া আর কিছু নেই। তার নিজেরও বাড়ীর চিঠি টাকার তাগাদা এবং দুঃখের কথায় পূর্ণ থাকে। রামকিঙ্করকে হাসতে দেখে সে চমকে উঠল।

—হাসছ যে?

—পড়।

বলে রামকিঙ্কর চিঠিখানা সুবলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে রামকিঙ্করের কাকার চিঠি পড়তে সময় লাগে। সুবলেরও লাগল। চিঠি শেষ করে সুবলও খুশি হয়ে উঠল।

—বাঃ! লাগিয়ে দাও।

—দোব?

—দেবে না? রঙ একটু ময়লা হ'লে কি হয়, ডাগর মেয়ে। তারপরে বাপের একমাত্র সন্তান। শ্বশুরের জমি-জমা আছেও যথেষ্ট। দেবে-থোবেও ভাল। আর কি চাও?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আর কিছু চাই না?

সুবল রেগে গেল: ওরে বাবা, চাইবার ত অনেক আছে। কিন্তু চাইলেই ত পাওয়া যায় না।

—তা বটে। অধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে ত দুর্লভ জিনিষ।

সুবল উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, এ মেয়ে বিয়ে করলে, তোমাকে আর খেটে খেতে হবে না। হরকেষ্টর দাঁত খিচানিরও তোয়াক্কা করতে হবে না। জমি-জমা দেখ আর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে মজাসে খাও, দাও আর স্ফূর্তি কর।

রামকিঙ্করের কেদারকে মনে পড়ল।

'শ্বশুরের ওই একটি কন্যে। পয়সা-কড়ি আছে। তারাও ধরে বসলেন, ও দেখলে গাঁয়ে বসে লাঙল ঠেলে লাভ নেই। বোশেখ মাসে গেল, আর ফিরল না।'

মনে পড়ল, কেদারের সকাতর ক'টি কথা: 'অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে করিস না ভাই। ওতে সুখ নেই। আবার তাও বলি, বিয়ের মজা ওই বৌভাত পর্যন্ত। তারপরে আর মজা নেই।'

রামকিঙ্কর বললে, শেষটায় ঘর-জামাই থাকব, সুবল?

সুবল উত্তেজিত ভাবে বললে, ঘর-জামাই কিসের? ঘর-জামাই ত শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকা পর্যন্ত, তারপরে ত তোমাদেরই বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব। তখন গিয়ে বাস করবে।

রামকিঙ্কর হাসলে। সুবলের বুদ্ধি আছে।

বললে, কিন্তু বৌ যদি গরীব শ্বশুর-ঘর করতে না চায়?

বিছানায় একটা ঘুঁষি মেরে সুবল বললে, আলবৎ করবে। বাঙ্গালীর মেয়ে, শ্বশুর-ঘর করবে না, ইয়ার্কি নাকি?

—কিন্তু অনেকে ত করে না।

—যেখানে স্বামী দুর্বল, সেখানে করে না। আমার পরিষ্কার কথা: গরীব হই আর যাই হই, আমার ঘর যদি কর ত কর, নইলে ফারখৎ। ব্যস!

রামকিঙ্কর অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেদারের কথা ভাবতে লাগল। তার করুণ মুখখানি চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

সুবল বলে যেতে লাগল: তার পর ধর গিয়ে, তুমি যদি এখানকার ম্যানেজার হও, কিংবা, বি. এ. পাশ করেছ, অন্য কোথাও যদি একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাও, তা হ'লে, চাই কি, কলকাতায় বাসাও করতে পার।

নাগরিক জীবন। বৌরাণী অনেক উঁচুতে। তাঁর কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু সবিতা অথবা সামান্যা ঝি সারদা, তাদের পাশেই কি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে এসে দাঁড়াতে পারবে? রামকিঙ্করের চোখে শহরের রঙ লেগে গেছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তার চোখে লাগবে বলে মনে হয় না।

তাকে ভাবতে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে সুবল এক সময় জিগ্যেস করলে, কি ঠিক করছ?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, দেখি। কালকেই ত আর বিয়ে করতে হচ্ছে না। এখন একটু ঘুমোনো যাক।

কিন্তু ঘুম তার এল না। সারারাত্রি তার চোখের সামনে শহরের মেয়েরা বিচিত্র ভঙ্গিতে রাজপথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

(উনত্রিশ)

তখনও অন্ধকার কাটে নি। দোকানের সামনে রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের সকলে তখনও ওঠে নি। রামকিঙ্কর প্রতিদিনের মত শিক-দিয়ে-ঘেরা বারান্দায় বসে বসে চা খাচ্ছে। হরেকৃষ্ণ সবে চা খেয়ে একটি বিড়ি ধরিয়েছে, এমন সময় বাবুদের বাড়ীর ভোজপুরী দরওয়ান তার প্রকাণ্ড কলেবর নিয়ে হন্তদন্তভাবে উপস্থিত হ'ল।

হরেকৃষ্ণ চমকে উঠে জিগ্যেস করলে, কি খবর দরওয়ানজী?

—খবর খুব খারাপ।

খারাপ খবরের কথা শুনে সবাই গদীর ধারে ঘেঁসে এল। রামকিঙ্করও। দরওয়ান সহজে দোকানে আসে না। এত ভোরে ত নয়ই। তার মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছিল, খবর খারাপ ত বটেই, সাংঘাতিক খারাপ।

হরেকৃষ্ণ উদ্বিগ্নভাবে জিগ্যেস করলে, কি খারাপ?

—বাবু মর্ গয়ে!

সকলে লাফিয়ে উঠল: মর্ গয়ে! তাঁর অসুখের কথা ত শুনি নি।

দরওয়ান বললে, অসুখ-বিসুখ কিছু নয়, বাবু। অনেক রাতে বাবু বাগান থেকে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার ডাকাডাকি। একটু আগেই তিনি মারা গেলেন।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

মুহূর্ত কয়েক সবাই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তারপরে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। চল চল, খবর নেওয়া যাক ব্যাপারটা কি হ'ল। কিন্তু দোকান? দোকান ত অরক্ষিত রেখে যাওয়া যায় না।

কি ভেবে রামকিঙ্কর বললে, আপনারা যান, আমি দোকানে রইলাম।

বিস্মিতভাবে হরেকৃষ্ণ বললে, তুমি যাবে না?

রামকিঙ্কর বললে, একজনকে ত দোকান আগলে থাকতে হবে।

তা বটে।

হরেকৃষ্ণ যেতে যেতে বললে, তাই হোক। তুমিই থাক। আমরা খবরটা নিয়েই ফিরে আসছি। চল দরওয়ানজী।

রামকিঙ্কর নিঃঝুম হয়ে বসে রইল।

অতিরিক্ত মদ্যপান এবং শরীরের উপর অত্যাচারের ফলে বৃন্দাবনচন্দ্রের শরীরে হয়ত কিছুই ছিল না, তবু তাঁকে দেখে মনে হ'ত না, শরীরে রোগ ঢুকেছে এবং মৃত্যু আসন্ন। কাল রাত্রেও বাগানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পরে এমন কি ঘটতে পারে, যার জন্যে তিনি মারা গেলেন?

এ রকম ক্ষেত্রে মানুষের মনে স্বভাবতই নানা সন্দেহ আসতে পারে। কার্যকারণের যোগাযোগও রয়েছে। স্বামীর হাতে বৌরাণী কম অত্যাচার সহ্য করেন নি। মনের দিক দিয়ে বৌরাণী যে খুব শক্ত মেয়েমানুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনোহরের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক, ভগবান জানেন। কিন্তু মনোহর ডাক্তারকে রামকিঙ্কর কোনদিন প্রীতির চোখে দেখতে পারে নি। লোকটিকে বরাবর তার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এ রকম লোকের অকার্য কিছু থাকে না।

হয়ত তার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। হয়ত মনোহর এবং বৌরাণী সম্পূর্ণ নির্দোষ। বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যু হয়ত অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

রামকিঙ্কর মন থেকে সন্দেহের বীজ বারবার ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বারবার ঘুরে-ফিরে সেই একই সন্দেহ মনে আসে।

রামকিঙ্কর অস্থির হয়ে উঠল।

সুবল ফিরে এল তাড়াতাড়ি। ওখানকার হাওয়ায় তার দম আটকে আসছিল।

হরেকৃষ্ণকে বললে, আমি যাই বরং, রাম একা আছে।

দম বোধ হয় সকলেরই আটকে আসছিল। কিন্তু ওঠবার উপায় নেই। কার ওপর কখন কি ভার পড়বে, জানে না ত।

হরেকৃষ্ণ বললে, যাবে? তাই যাও। দরকার পড়লেই খবর দোব।

সুবল প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। দেখে, রামকিঙ্কর গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। সুবল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আশ্চর্য ব্যাপার!

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে চাইলে।

সুবল বলতে লাগল, মুখের এতটুকু বিকৃতি হয় নি। কে বলবে, মারা গেছেন। ঠিক যেন চোখ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছেন!

—গিন্নীমা কোথায়?

—তাঁকে দেখলাম না।

—বৌরাণী?

—তিনি খাটে বাবুর পা-তলার দিকে পাথরের মূর্তির মত বসে। নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

—আর কি দেখলে? বাড়ীতে খুব কান্নাকাটি চলছে?

—একেবারেই না।

বলেই বললে, এ কি তোমার-আমার মত গেরস্ত বাড়ী পেয়েছ যে, বৌ, ছেলে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদবে, 'ওগো' আমায় কোথায় রেখে গেলে গো! কাল থেকে আমরা কি খাব গো!'

সুবল হাসতে লাগল। বললে, বাড়ীতে টুঁ শব্দটি নেই। বড় বাড়ির ব্যাপারই আলাদা। যাও, একবার দেখে এস।

রামকিঙ্কর ওঠবার কোন লক্ষণ দেখাল না। জিগ্যেস করলে, ঠাকুর-দালানে গিন্নীমা নেই?

এইটেই আশ্চর্য। সকাল থেকে দুপুর এবং সন্ধ্যা থেকে কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত গিন্নীমার ঠাকুর দালানেই কাটে।

কোনদিন তার ব্যতিক্রম হয় না। আজ প্রথম। রামকিঙ্কর কল্পনা করলে, গিন্নীমা সম্ভবতঃ তাঁর শোবার ঘরের মেঝেয় নিঃশব্দে কাঁদছেন। তাঁর খাস ঝি, সেও হয়ত তাঁর পায়ের তলায় নিঃশব্দে চোখের জল মুচছে। স'ন্তনার একটা কথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

সুবল বললে, তুমি একবার ঘুরে আসবে ?

—এখন নয়।

রামকিঙ্কর জানে, এখন গিয়ে লাভ নেই। এখন সারদার দেখা পাওয়া অসম্ভব। অথচ তার সঙ্গে দেখা না হলে ভিতরের কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

একটা প্রকাণ্ড জনতা শবযাত্রায় গেল।

সকলের মুখে এক কথা: আশ্চর্য মৃত্যু বটে! রোগ নেই, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীর্ঘকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগের ঝামেলা নেই, চোখ বন্ধ করলেন আর মারা গেলেন। ছোট ডাক্তার, বড় ডাক্তার, টেলিফোনে খবর পেয়ে অনেক ডাক্তার ছুটতে ছুটতে এলেন, কিন্তু কারও কিছু করবার রইল না। ঔষধ না, ইনজেকশন না, শুধু একবার নাড়ী দেখলেন, ষ্টেথস্কোপ লাগালেন আর মুখখানা কি রকম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সব শেষ!

ধুমধামের মৃত্যু নয়। তবু বড়লোকের মৃত্যু। যেটুকু সমারোহ না করলে কর্মচারীদের মন ভরে না, সেটুকু হ'ল।

শবযাত্রায় রামকিঙ্কর সঙ্গে ছিল। প্রচুর পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত মূল্যবান খাট বহনও করেছিল। এই খাটে বৃন্দাবনচন্দ্র শয়ন করতেন।

রামকিঙ্করের মনটা কি রকম এলোমেলো হয়ে গেল। বহুলোকের সমাগম তার ভাল লাগছিল না। সে চুপি চুপি পালিয়ে এসে উপরের পান্থশালায় একটি বেঞ্চে এসে বসল। তার মনে এক চিন্তা: কি হ'ল ? এরপর আরও কি হবে ?

শ্মশানকৃত্য শেষ করে সকলের সঙ্গে সেও বড়বাড়ীতে ফিরে এল। এবং সেখান থেকে দোকানে।

বড়বাড়ীতে চারিদিকে একবার চাইলে। বাইরের মহল নিস্তব্ধ। সারদার কোথাও দেখা পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় বৌরাণীর কাছে এবং তাকে নিয়েই ব্যস্ত। রামকিঙ্করের মন যত ব্যস্তই হোক, এখন তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

হরেকৃষ্ণ আজকের লোক নয়। কর্তার আমলের লোক। কর্তার মৃত্যু সে দেখেছে। শবযাত্রায় গিয়েছে। কি ধুমধামের শবযাত্রা! যত লোক গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই একখানা করে নতুন ধুতি দেওয়া হয়েছিল আর পেট ভরে খাওয়ানো হয়েছিল। সে ধুমধামের তুলনা নেই।

হরেকৃষ্ণ সেই গল্প ফাঁদল।

সুবল বললে, আমাদের বাবুরও বয়েস হ'লে ওই রকম ধুমধামই হত। ওই রকম নতুন কাপড় পেতাম আর পেট ভরে খাওয়া।

হরেকৃষ্ণ বললে, পেট ভরে একবারও ত খেলে বাবা।

—তা অবশ্য খেলাম, সেটা বাদ যায় নি।

হরেকৃষ্ণ বললে, তবে দুঃখটা কিসের ? নতুন কাপড়ের ?

সুবল লজ্জিতভাবে বললে, না, কাপড়ের দুঃখ করছি না। সে মৃত্যু ত নয়। কর্তাবাবুর শবযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলেন, তাই বললাম।

রামকিঙ্কর এসব আলোচনার মধ্যে নেই। সে উপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

হরেকৃষ্ণ এক সময় তাকে চুপিচুপি জিগ্যেস করলে, কি বুঝছ রাম ?

রামকিঙ্কর ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে, কিসের কথা বলছেন ?

—এই যা ঘটে গেল। সেই কথাই বলছি।

—কি হবে ? কি জানি, কি হবে ?

হরেকৃষ্ণ বললে, গিন্নীমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। তিনি আর কিছু দেখাশুনা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তা হ'লে? ছেলে ত শিশু। এই বিপুল সম্পত্তি কে দেখবে ?

রামকিঙ্কর বললে, চিন্তার কথা।

পর পর কয়েকদিন সারদার বস্তিতে গিয়ে রামকিঙ্কর ফিরে এসেছে। রামকিঙ্কর বুঝেছে, সারদা বড় বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে খুবই ব্যস্ত। সন্ধ্যার দিকে তার বস্তীর ঘরে ধুপ ধুনা এবং সন্ধ্যা-প্রদীপ দেবার জন্যে সারদা প্রতিদিন একবার করে আসত। এখন আর সময় পাচ্ছে না। রামকিঙ্কর জেনে এসেছে, সারদা তার পাশের ঘরের মেয়েটির হাতে ঘরের চাবি দিয়ে এসেছে। সারদার ঘরে প্রতিদিন সেই মেয়েটিই ধুপ-ধুনা এবং সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয়।

মেয়েটি সারদার দেশের মেয়ে। এবং তারই সমবয়সী হবে। বন্ধুও।

মেয়েটি হেসে বলেছিল, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে না গেলে তার দেখা পাবেন না, বাবু।

তা হ'লে কোথায়, কি করে তার দেখা পাওয়া যায় ?

রামকিঙ্কর বড় বাড়ী গেল। সেখানে কথা বলবার

সুযোগ হবে না নিশ্চয়, দূর থেকে দেখাটা বড় জোর হ'তে পারে।

ঠাকুর-দালানে গিন্নীমা নেই। অশৌচাবস্থায় থাকার কথাও নয়। কাছারি-বাড়ীর একটি কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

বুড়ো মানুষ। আজীবন এই বাড়ীতে কাজ করে পাকা হয়ে গেছে। যত না কাজ করে, ছুটাছুটি করে তারও বেশী, চেঁচায় আরও বেশী। এই করে গত ত্রিশ বচ্ছর চালিয়ে যাচ্ছে।

রামকিঙ্করকে দেখে লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বললে, রামবাবু, এসেছেন? কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না? এ বাড়ীতে এমন কখনও হয় নি!

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, কোথায় গেলেন সব?

—সব ঘুরছেন। বিনা কাজেই ঘুরছেন। দেখাচ্ছেন, খুব কাজ করছেন। আর আমি বুড়ো মানুষ খেটে মরছি!

—গিন্নীমার খবর কি?

লোকটি কপালে করাঘাত করে বললে, তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না। কাল সকালে সবাই একবার ধরাধরি করে ঠাকুর-দালানে নিয়ে এসেছিল। দালানে আর ওঠেন নি, সিঁড়ির কাছ থেকেই রাধামাধবের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে কি বললেন, তারপর প্রণাম না করেই অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন। আবার সবাই ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। আজ আর নামেন নি।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

লোকটি বললে, কি হবে, রামবাবু? গিন্নীমা যদি না উঠে বসেন, তা হ'লে কি করে সব চলবে?

সেই কথা ত রামকিঙ্করও ভাবছে। বৃন্দাবনচন্দ্র কোনদিনই কিছু দেখতেন না। নিজের স্ফূর্তি নিয়ে থাকতেন আর বাড়ী এসে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতেন। তাঁর মৃত্যু সবাইকে চিন্তিত করে তুলেছে এই জন্যে যে, যিনি সমস্ত চালাতেন সেই গিন্নীমার মেরুদণ্ড তিনি ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর বললে, ঠাকুর যা করবেন, তাই হবে। আমাদের ভাবা মিথ্যে।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বললে, এই যা বলেছেন! লাখ কথার এক কথা। ঠাকুর যা করবেন, তাই হবে। আপনি-আমি ভেবে কি করতে পারি?

বলে যে কাজে যাচ্ছিল, সেই কাজে চলে গেল।

মস্ত বড় উঠানে রামকিঙ্কর একা দাঁড়িয়ে রইল। দু'চার জন ঝি-চাকর তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্কর ভাবছে, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চলে যাবে কি যাবে না, ভাবছে, এমন সময় অন্দরের দরজা খুলে সারদা বেরুল। চোখের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে সারদা হন হন করে ফটক পার হয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্কর পিছু পিছু চলল।

পর পর দুটো মোড় পার হয়ে সারদা এক জায়গায় দাঁড়াল। রামকিঙ্কর কাছে এসে দাঁড়াতে সারদা মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে, আপনি আমার ঘরে ক'দিন গিয়ে ফিরে এসেছেন।

—হ্যাঁ, কালকেও গিয়েছিলাম।

—কালকের খবর পাই নি। কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছুই নয়। মাঝে মাঝে যেমন যাই, তেমনি গিয়েছিলাম। তোমার পাশের ঘরের মেয়েটি বললে, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে না গেলে, তোমার দেখা পাওয়া যাবে না।

—সেই রকমই অবস্থা। এর মধ্যে একদিনও ফটকের বাইরে আসি নি। ঝিলমিলির থেকে আপনাকে দেখে বাইরে এলাম।

রামকিঙ্কর বললে, এত ব্যস্ত কি নিয়ে?

—কি নিয়ে! বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টা একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন না?

—পারছি। গিন্নীমার খবর কি?

—জানি না। তাঁর মহলের দিকে উঁকি দেবারও সময় পাই নি।

—বৌরাণীর?

—তাঁর মুহূর্মুহু ফিট হচ্ছে। একদিকে সেই সামলানো, আর এক দিকে খোকাবাবুকে। আমার পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রামকিঙ্কর বললে, আর একটা কথা জিগ্যেস করবার ছিল।

—জানি। সে সব এখন নয়। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। ছাড়ুন, আমি যাই।

সারদা পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেল।

ক্রমশঃ

—*—

এরাও মানুষ ছিলো

পথচারী

তুমি যে মেয়েটির কথা বলছ, তাকে আমিও দেখেছি—ফুটপাথের একধারে সেই লালবাড়ীটার নীচে একহাত ঘোমটা টেনে ব'সে থাকতে। রোজই ব'সে থাকে তার শাঁখা-পরা ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ, মুখফুটে চাইতে পারে না—লজ্জা আছে, সম্ভ্রম আছে, আত্মসম্মানে ঘা-ও লাগে হয়ত। হাঁ, তুমিও যেমন দেখেছ, আমিও তেমনি দেখেছি একই জায়গায় রোজ ব'সে আছে সেই বৌটি, আর আছে তার দু'বছরের ছোট্ট ছেলেটা। একটা ছোট্ট কাঁথা পেতে তাকে শুইয়ে দিয়েছে—প'ড়ে প'ড়ে সে ঘুমোয়। একই জায়গায় একই রকমভাবে ঘুমিয়ে থাকে। তুমিও যেমন কোনদিন জাগতে দেখ নি, আমিও দেখি নি।

তুমি বলছ হয়ত স্বামী-পরিত্যক্তা। বিচিত্র নয়, 'পালাই-পালাই মন' কার না করে। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মত আজকের দিনে বুদ্ধিমানের কাজ আর নেই। কিন্তু পালানোটাই কঠিন। যে এটা পারে তাকে বাহবা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি জানি, ওর স্বামী পালায় নি।

কানা খোঁড়া রুগ্ন অথবা আর কিছু - এমন স্বামীকে স্ত্রী ভরণ-পোষণ করছে শুনলেও আনন্দ হয়, এ নিদর্শন আমাদের দেশে বহু আছে। এই আদর্শ নিয়ে গল্প বানাতে বেশ লাগে।

তুমি হয়ত ভাবছ, অমনি একটা ছোট্ট সংসার, স্বামী অকর্মণ্য, বিছানায় প'ড়ে থাকে, কিংবা বসতে পারে, চলতে পারে না—মুখ বুজে স্ত্রীর সেবা নেয়। সারাদিনের হাত-পাতা পয়সায়, ফিরবার পথে বৌটি কিনে আনে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি। স্বামী-বেচারা পথ চেয়ে থাকে, কখন আসবে ব'লে। দেরি দেখলে ভাবনা হয়। পঙ্গু স্বামী—মনটাই ব্যস্ত হয়, আর ত কিছু করতে পারে না।

স্ত্রী আসে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে, কিন্তু তখনই পড়ে তার আসল কাজ। সংসার, স্বামী, পুত্র···

রান্নাবান্না শেষ ক'রে স্বামীকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সংসারের কাজ সেরে যেটুকু অবসর পায় সেটুকুই তার বিশ্রাম।

সে জানে এইটুকু নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তার পর যেদিন আসবে শেষ বিশ্রাম···

কিন্তু এসব গল্প-কথাই। গল্পের কল্পনার চাইতে কঠিন বাস্তব এই মানুষের জীবন।

বেকার স্বামী। চাকরির চেষ্টা করতেই যার জীবনের অর্ধেক কেটে গেল। উপবাসে ঘৃণায় লজ্জায়—উপরন্তু স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের অক্ষমতায় জীর্ণ-শীর্ণ—

আভিজাত্যের মিথ্যা মুখোসকে বিসর্জন দিয়ে কুলের কুলবধূ সেই স্বামী-পুত্রের জীবনরক্ষার জন্যে পরের কাছে হাত পাতে, সে কি অপরাধ?

যদি অপরাধই হয়, সে অপরাধ কার? সে অপরাধ আমার, তোমার, সমাজের—

কিন্তু আমি জানি, বেকার স্বামীর জন্যে দরদ্ কোন স্ত্রীরই থাকে না।

কিন্তু ঐ ছেলেটা? সে কি অপরাধ করেছে? ঐ ছেলে ত আমার ঘরেও আছে, তোমার ঘরেও আছে—ধনীর প্রাসাদেও আছে। কিন্তু যে শুয়ে আছে ঐ ধূলি-শয্যায়, তার সে বিচার-বুদ্ধি কই? সে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তমনে ঘুমুচ্ছে। সে জানেও না, তার অলক্ষ্যে তার ভাগ্যদেবতা কি রচনা ক'রে চলেছে! কোন দুঃখ নেই, কোন নালিশ নেই, কোন প্রতিবাদও নেই—এমনি নির্বিকার, নির্লিপ্ত, সদানন্দময়।

তুমি বলছ, ছেলেটাকে দেখলে নিজের ছেলের কথা মনে ক'রে ব্যথায় তোমার বুকখানা টন্‌টন্ ক'রে ওঠে। সে অনেকেরই করে। তাইত যাবার পথে যে যা পারে কিছু কিছু দিয়ে যায়।

* * * *

পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, "এরাও মানুষ ছিল" এ শিরোনামার অর্থ কি? এখন কি তারা মানুষ নেই? অথবা, মানুষ নয়ত কি তবে?

'পথচারী' বলেন, মানুষ বলব তাকেই যারা জীব-শ্রেষ্ঠ, অন্যের চাইতে যে আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষায়-জ্ঞানে, ধর্মে ও কর্মে পৃথক্—যার নীতিবোধ আছে সমানুভূতি আছে—দয়া মায়া সরলতা সততা যার গুণ।

কিন্তু এ আদর্শ-মানুষ আজ কোথায়? আজকের মানুষ অপরকে হিংসা করে, পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজে বড় হয়—আজকের মানুষ নীতি কাকে বলে জানে না, না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, অথচ এই দেশের পণ্ডিতরাই সব চাইতে বেশী নীতি-কথা উচ্চারণ করেছেন।

বর্ণ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায় শোনালেন, সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা মহাপাপ, সততার সমান ধর্ম নাই ইত্যাদি।

তার পরেই এলেন চাণক্য পণ্ডিত। যিনি পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, মাতৃবৎ পরদারেষু প্রভৃতি অমৃত-বর্ষণে মানুষের প্রতি পদক্ষেপকে সচেতন ক'রে দিয়ে বলেছেন, এ করো না, ও করো না।

মানুষ সব চাইতে বেশী চেষ্টা করেছে তার এই নীতি-জ্ঞানকে জাগিয়ে তুলে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে। কিন্তু যেদিকে ছিল তার সবার চাইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সেই একটিমাত্র দিক থেকেই এল তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরাজয়। মানুষের নৈতিক-কাঠামো গেল ভেঙে।

নিজের পেটের ছেলে বাঁচে না ব'লে, আর এক মায়ের সন্তানের বিরুদ্ধে সে তুক্-তাক্ করছে—এও ত মানুষের সমাজে দেখতে পাই। বিধবাকে ফাঁকি দিয়ে তার সম্পত্তি এটর্নি আত্মসাৎ করল, এ-সংবাদও নতুন নয়। নবাগত দুধের ছেলে—যে এল উত্তরাধিকারী হয়ে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আপন ভগ্নীও চেষ্টা করেছে, দেখা গিয়েছে। এই মানুষই বাপকে বিষ খাইয়ে মেরে তার সম্পত্তি অধিকার করে। এই মানুষই তার কন্যার অসদ্-উপায়ে-অর্জিত-অর্থে উদর পূরণ করে—এরাই অপরের খাদ্যে বিষ মেশায় নিজে বড় হবে ব'লে। এরাই লক্ষ লক্ষ টাকার চাল ঘরে বেঁধে রেখে দুর্ভিক্ষ আনে!

এ কোন্ মানুষ যে আপন সন্তানকে নষ্ট করে, যে জাতিকে নষ্ট করে, নিজের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে?

"এরাও মানুষ ছিল"—সে 'ছিল' খুব বেশীদিনের কথা নয়, ইংরেজ আসবার অনেক পরেও আমরা এতটা অ-মানুষ হই নি।

আমরা অ-মানুষ হয়েছি একটু একটু ক'রে। মৃদু বিষের ক্রিয়া চলেছিল মানুষেরই অজান্তে। সদা সত্য কথা বলিবে—মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যা সেদিন থেকেই ঢুকল। বিধি-নিষেধের শক্ত বাঁধন যত যত্ন ক'রে বেঁধেছি, তেমনি যত্ন ক'রে তা খুলতেও শিখেছি।

তাই আজকের মানুষ সকল-শেখার-সবজান্তা মানুষ।

আবার সেই বৌটাকে দেখলাম। একই জায়গায়, লালবাড়ীর সামনে। তেমনি এক-গলা ঘোমটা টেনে হাত পেতে বসে আছে, পাশে সেই ঘুমন্ত শিশু-আজও ঘুমুচ্ছে। ও কি জাগে না? আজ দেখলাম ভিড় জমেছে। একটা মেয়ে এসে বৌটাকে শাসাচ্ছে—অনেকগুলো টাকা নাকি পাওনা হয়েছে।

শুনলাম, ছেলেটা ওর নিজের নয়। ভাড়া-করা ছেলে। দুধের সঙ্গে একটু একটু আফিং খাইয়ে অমনি ক'রে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

যাঃ বাবা! কল্পনার ফানুস ফেঁসে গেল!

—১০৫—

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মাকে মানুষ জন্মের সঙ্গেই পায়। তারপর মুখের কথা থেকেই কথাবলা শেখার সঙ্গেই মাতৃভাষাকে পায়। একটু জ্ঞান হ'লে, বড় হ'লে সে মাতৃভূমিকে চিনতে শেখে।

এই তিনটি জিনিষই হ'ল মানুষের প্রথম ভালবাসার বস্তু, চিরকালের অচ্ছেদ্য ভালবাসার জিনিষ, আর পরম মোহময় পূজার মণ্ডপ স্থান।

মা হইলেন দেহময়ী, চিরকাল থাকেন না। তাঁর মৃত্যু আছে। ভাষা কিন্তু চিন্ময় তার মৃত্যু নেই। দেশ মৃন্ময়ী আর চিন্ময়ী দু-ইই। তবু দেখা যায় মানুষকে অনেক সময়েই দেশ ছাড়তে হয় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিপাকে-দুর্বিপাকে পড়ে, যেমন আজকের উদ্বাস্তুদের ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু মাতৃভাষা চিরকাল মুখের অন্নের গ্রাসের মত মানুষের মুখের জিনিষ, জীবনের, প্রাণের ও হৃদয়ের রক্তের মত জিনিষ। সে চিরকাল যুগপরম্পরা যুগকালকে অতিক্রম করে দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েও বেঁচে থাকে। দেশ ছাড়লেও, মার দেহান্ত হ'লেও ঐ ভাষার মধ্যেই মা ও মাতৃভূমির স্মৃতি জাতি ধর্ম দেশ সমস্ত ঐতিহ্য নিয়ে ইতিহাসে অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকে। সেই জন্যেই মানুষ মাতৃভাষাকে এত ভালবাসে। দেশ-বিদেশে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে এই প্রাণের মত প্রাণের চেয়েও ভালবাসার পরিচয়। তাই প্রাণও দিচ্ছেন লোকে। ভাষাতেই মানুষ আপন হয়। ভাষার বন্ধনই স্বজন-বন্ধু দেশবাসীর পরম বন্ধন। আমরাও যেখানেই যাই না, একজন স্বভাষীকে দেখলে বড় আপনার মনে হয়। তখনি কাছে গিয়ে বসি দেখা যায়।

দেখা যাবে যাঁরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, ধর্ম পরিবার স্বজন পিতামাতা সব ত্যাগ করেছেন কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়তে পারেন নি। বিভক্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের মাতৃভূমি বহু হিন্দু ও মুসলমানকে ছেড়ে আসতে হয়েছে, ধর্মান্তরিতও হ'তে হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষার বন্ধনে তাঁরা কঠিন ভাবে বাঁধা আছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্র সম্প্রদায় এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নানাভাষী লক্ষ লক্ষ দেশী খ্রীষ্টান ভারতের সকল প্রদেশে পাহাড়ে পর্বতে মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছেন তাঁরা কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়েন নি ধর্মের সঙ্গে।

বহু ভারতবাসী পৃথিবীর নানা প্রদেশে জীবিকার বন্ধনে বা যে জন্যেই হোক বদ্ধ, তাঁরাও মাতৃভাষাকে ত্যাগ করেন নি। ঐ ভাষাই তাদের সমাজ ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তা ছাড়া অধিকাংশের ভাষা যে হিন্দী এবং একই হিন্দী সেকথাও ঠিক সত্য নয়। আমার দীর্ঘকাল, প্রায় চল্লিশ বছর, বিহার রাজস্থান পাঞ্জাবে দিল্লীতে কেটেছে। সে-সব জায়গায় সাধারণ কথ্য ভাষার সঙ্গে কিছু পরিচয়ও আছে। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশেছি। তাতে যা আমার মনে হয়েছে হয়ত আরও অনেকেরই যেটা মনে হবে, তা হচ্ছে এই হিন্দী ভাষার রকমারী ধরন আছে। এবং প্রয়োগের কথাও ভাবা দরকার। এবং মানুষের মানুষ হওয়ার জন্য মাতৃভাষা সমাজের ঐতিহ্য দু'টি বিষয়েরই সমান গুরুত্ব আছে।

কিন্তু আগে বলছি মাতৃভাষা মনে না রাখার কাহিনী।

দেখেছি চার-পাঁচ শ' বছর আগের উত্তর ভারতের উপনিবেশী অথবা প্রবাসী মথুরা বৃন্দাবন জয়পুর বরৌলী প্রভৃতি দেশের বাঙালী গোস্বামী-বংশীয়েরা, যাঁরা নানা-কারণে বাংলা দেশের সঙ্গে বেশী সংযোগ রাখতে পারেন নি। মাতৃভাষা মনে রাখতে পারেন নি। চর্চা করার সুযোগ পান নি। তাঁরা বাঙালী সমাজ-জীবনের প্রায় সমস্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারার পথ হারিয়ে ফেলেছেন—অথচ বিবাহসূত্রে তাঁদের বাংলায় নবদ্বীপ খড়দহ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কুটুম্বিতাও রাখতে হয়। কিন্তু ঐ মাতৃভাষা ভুলে-যাওয়া মানুষগুলির নিজ জাতি ও ভাষায় কোন দৃঢ় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধন না থাকায় তাঁদের সমাজ ও বংশের কোন-দিকেই কোন রকম বিশিষ্টতা বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায় না। এবং বিবাহসূত্রে যারা আপন হয়, তারাও ঐ ধরনের সমাজের চাপে নিজেদের সব বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলে।

তাতে দুঃখ ছিল না, যদি তাঁরা যে প্রদেশে বাস করলেন সেখানকার সংস্কৃতি ধারাকে পুরো গ্রহণ করে নিয়ে, মিশ্র বা নতুন ধরনের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে

পারতেন। তাঁরা তা পারেন নি। তাঁদের ভাষা হিন্দুস্থানীও নয়, পুরা বাংলাও নয়। এবং অশনবসন ও জীবন-ধারণের ধারা ও দুইয়ের অদ্ভুত দুর্বল মিশ্রণ। যার পরিণাম ফল- হ'ল ঐসব প্রবাসী পুরোহিত বংশ থেকে আর একটিও রূপসনাতন বা শ্রীজীব গোস্বামীর মত চিরকালের উজ্জ্বল মানুষের আবির্ভাব হ'ল না। কোন কবি সাহিত্যিক লেখক জ্ঞানী বিজ্ঞানীরও এখনও দেখা আমরা এ সমাজে পাই নি। তাঁরা দু'প্রদেশের ঐতিহ্যেই বঞ্চিত হয়ে রইলেন।

যার একমাত্র কারণ আমাদের মনে হয় তাঁদের মাতৃভাষা নেই! মা'র ভাষা তাঁরা শিখতে ও মনে রাখতে পারেন নি। তাই তাঁদের বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ভাগীরথীর স্রোতধারা নানা দেশে ও রাজস্থানের মরু-প্রান্তরে হারিয়ে গেছে।

এটা ত সত্য কথা, নিজের জাতির ও ভাষার কথা মনে গভীর ভাবে না থাকলে বা ভুলে গেলে মানুষের চিন্তা কল্পনা আদর্শের মনুষ্যত্বের সাধনার নিষ্ঠা ভাষা ও ভঙ্গির অভাবেই ম্লান হয়ে যায়। ধারা মজে যায়।

মোটামুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ইংরাজী ভাষায় কাব্য লিখে শ্রীমধুসূদন অমর হ'ন নি। মাতৃভাষায় রস সৃষ্টি করেই বাগ্‌দেবীর 'মনকোকনদে' বেঁচে আছেন। অপর পক্ষে কবি মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডুকে না আমরা পূর্ণ ভাবে পেলাম, না, ইংরাজী সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'ল। শুধু প্রশংসাই ত অমর করে না। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে তাঁরা ঐ কাব্য রসসৃষ্টি করলে অমূল্য কিছু পেতাম নিশ্চয়ই।

সুতরাং বিশিষ্ট ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে মাতৃভাষা ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না। এবং হিন্দী ভাষা অধিকাংশের মাতৃভাষা বলে মনে করাও ঠিক নয়।

একটু আগে বলেছি, সব দেশের হিন্দী এক নয়। সাহিত্যেও নয়, কথ্যভাষায়ও নয়। সেই সূত্র ধরেই এখন জানাই শুধু সর্বনামের ব্যবহার কয়েকটা প্রদেশের।

সহর দিল্লী-লক্ষ্ণৌএর হিন্দীতে 'আমরা তোমরা', 'আমাদের তোমাদের' হ'ল, 'মেরা', 'তুমারা' 'ময় হাম'। এবং দিল্লীওয়াল হিন্দী হ'ল উর্দু-প্রধান প্রয়োগ।

গ্রাম ও সহর পাঞ্জাবে আমাদের তোমাদের ও আমরা তোমরা 'শাড়ে তোয়াড়ে', 'অসি তুসী'।

গ্রাম রাজস্থানে আমরা তোমরা—'মাহ্‌রা থারা' 'মাহ্‌কা থাঁকা'। সাধারণ বিহার অঞ্চলে আমরা তোমরা—'তোরা মারা' (হ) মারা। 'হ' স্পষ্ট নয়।

উত্তর প্রদেশের কাশী অযোধ্যা হিন্দী সংস্কৃত-ঘেঁষা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেও। লক্ষ্ণৌ-বেরিলী-আগ্রায় এলাহাবাদে দুইয়ের পরিমিশ্রিত ভাষা। কাশীতে ভদ্র হিন্দী 'আপনার আমার' 'আপকে হমারে' 'মেরা আপকা'।

মধ্যপ্রদেশের ভাষার সঙ্গে উত্তর প্রদেশের সামান্য মিল আছে। স্পষ্ট মিল নেই। ভাটিয়া গুজরাটীদের সাধারণ কথ্যভাষায় রাজস্থানীর ভাষার মিল কিছু কিছু আছে। আবার রাজস্থানী ভাষায় বিকানের যোধপুর জয়শীলমীর এক রকম ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। উদয়পুর জয়পুর আজমীর প্রভৃতির ভাষা একটু অন্য রকম। 'কোথায়' শব্দটি পাঞ্জাবে কাঁথে। রাজস্থানে 'কোড়ে,' কঠে, কঠিনে। দিল্লী-লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশে 'কেঁহা,' কিধর। বিহারে 'কৌন জাগা'

পাঞ্জাবে 'কেন' শব্দটি 'কি' দিয়ে বলা হয় যেমন 'কি গল্' কথা? (কি গল্প) রাজস্থানে 'কাঁইনে'।

উত্তর প্রদেশে হিন্দী ও উর্দুতে 'কেঁউ'? বিহারে কাশীতে 'কাহে,' কাহেলা? কেঁউ। গুজরাটে 'কাঁই'?

'খেয়েছি' 'বলেছি' শব্দগুলি পাঞ্জাবে 'খা'লি' 'বোল লি' (খেয়ে নিয়েছি বলেছি)।

উত্তর প্রদেশে—'খায়া' স্ত্রীলিঙ্গে, 'খায়ি। 'বোলা বো.ল'। বিহারে—'মৈলি কহলি' করলায় 'কৈলি'। রাজস্থানে—'খা চুকা'। বোলা (পুং)। খা চুকি, বোলি (স্ত্রী)।

গ্রাম দেশের রাজস্থানী পাঞ্জাবী গুজরাটী বিহারী হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের খুব একটা বাঁধাধরা নিয়মের প্রয়োগ থাকে না বিশেষ করে মেয়েদের ও গ্রাম-সমাজে।

এখন বলি পথে ঘাটে হাটে বাটে ট্রেণে-চড়ায় সর্বত্র আমরা নানাভাষিণী মেয়ে দেখতে পাই।

পাঞ্জাবী দিল্লীওয়াল রাজস্থানী উত্তর প্রদেশিনী বিহারবাসিনী তাঁরা পরস্পরে বচসা গল্প কলহ কোঁদল করে থাকেন—তাও শুনি। সেটা বুঝতে পারেন কি হিন্দীভাষিণীরা প্রত্যেকে ঐ প্রদেশের? সেইটেই ভাববার।

মেয়েলী ঝগড়া—রাজস্থানী "থাঁকা মুড়া কৈঁয়াছে"? (তোমার চেহারাটা কেমন?') (মুখটা)

ঐ বিহারীতে তোহরা মু কৈসন ভেল্ বা?

" উত্তর প্রদেশে তুমারে বদন কৈসা?

,, দিল্লীওয়াল তুমারি সুরৎ কৈসী ?
,, পাঞ্জাবীতে তোন্ধড়ে মু কি তরহ ?

এই ধরনের বচসা যখন পথে-ঘাটে রেলগাড়িতে সর্বজনীন ভাবে হয় আমার বিশ্বাস, কোন প্রাদেশিক হিন্দীভাষিণীই অন্য প্রদেশিনীর একটি কথাও বুঝতে পারবে না।

আমার নাম ঠিক মনে আছে কিনা বুঝতে পারছি না কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় পড়েছি সেকালের আই. সি. এস. ভারতীয় ভাষাবিদ্ গ্রীয়ারসন সাহেব (?) বলেছিলেন প্রতি ১৫।২০ ক্রোশ অন্তর ভাষার রূপ বদ্‌লায়। বিহারে উর্দ্দু 'রঞ্জ' মানে রাগ করা, রাজস্থানে ঐ 'রঞ্জ' মানে শোকার্ততা। ঐ কথাটা আমি একবার বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়েছিলাম।

মোট কথা যেমন চট্টগ্রামের সিলেটের কথ্য বাংলা ভাষাকেও বাংলা ভাষা বলা হ'লেও আমরা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালী কানে শুনে বুঝতে সময় সময় পারি না। অথচ লেখা ভাষাটা বোঝা যায়। কিন্তু ভাষার সমাধান ত লেখ্য ভাষায় শুধু হবে না, কথ্য ভাষাও বোঝা চাই। বলা চাই। বোঝানো চাই। কাজেই অধিকাংশের ভাষা বলে উত্তর প্রদেশ বিহার রাজস্থান হিমাচল পাঞ্জাবকে একসারে বসিয়ে দেওয়া চলে কি না সন্দেহ। পাহাড়ী হিমালয়ের ভাষা মোটেই হিন্দী নয়।

এটা ত সত্য, আমরা যেমন ইংরেজের মত ইংরেজী বলতে পারতাম না হিন্দুস্থানীর মত হিন্দীও বলতে ও বুঝতে পারব না। ফলে যাঁর মাতৃভাষা ইংরাজী বা হিন্দী তিনিই কর্মক্ষেত্রে সহজেই প্রতাপান্বিত হবেন।

অথচ ক্ষমতা প্রতাপ জীবিকার ক্ষেত্রে সকল মানুষেরই চাই। সে চাওয়াটা ভাষার পথে পরিমাপ করলে যোগ্যতার কোন স্থান রাখা যাবে কি না সন্দেহ।

ঐ সন্দেহই আমাদের দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছে। এবং সন্দেহ ক্রমশঃই সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট ও সত্য হয়ে উঠছে।

অনেকে এই ভাষা-প্রসঙ্গে ভাষার সমৃদ্ধির, ঐশ্বর্যের, অলঙ্কারের কথা বলেন। এই বিতর্কের জবাব হচ্ছে 'মা' মা বলেই তিনি মা। তাঁর ধন-দৌলত ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির জন্য তিনি ভালবাসার পাত্রী নন, হ'ন না। আমরা কেউ কুঁড়েঘরের দরিদ্র জননীকে 'মা' না বলে পাশের অট্টালিকাবাসিনী ঐশ্বর্যশালিনী ধনী-গৃহিণীকে 'মা' বলতে যাই না।

সুতরাং হিন্দী ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সমৃদ্ধির কথার তুলনা করা চলে না। সকলেরই নিজের নিজের জননীর মত মাতৃভাষাও সমান শ্রদ্ধা সমাদরের বস্তু। মা'র মতই তিনি সুন্দর বা অসুন্দর, ভালো বা কম ভালো তা লোকে ভাবে না।

তবে একটা কথা রয়ে যায় ভাষার সমৃদ্ধি-প্রসঙ্গে। সেটা সাহিত্য রসের বিষয়। তা হচ্ছে আধুনিক হিন্দী-সাহিত্য কোন বিদেশী বা ইংরাজী সাহিত্যের মত আমাদের ও দেশবিদেশের সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে মুগ্ধ করে কি না, আকর্ষণ করে কি না। এর উত্তর সবাই জানেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের ভাষা জনসাধারণের জন্য। সাহিত্য সকলের জন্য নয়।

তার পরের কথা হ'ল প্রয়োজনের কথা, দরকারের হিসাব। আমাদের একটি রাষ্ট্রভাষা দরকার বা প্রয়োজন এই কথা।

সেখানেও একটি উত্তর পাওয়া যায় শুধু 'দরকার' বা 'প্রয়োজনের' জন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা সর্বাগ্র অধিকার দেওয়া চলে না। সে-ভাষা যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন আনন্দ-রস নিয়ে না আসতে পারে। যদি শুধু কুলী মজুর ডেকে 'মাল উঠাও', 'ট্যাক্সি বোলাও', 'ইধার চলো', 'উধর যাও' বলার মত দরকারী কাজ সারার ভাষা হয়। জীবনটাতে প্রয়োজনের মত অদরকারী জিনিষও প্রচুর প্রয়োজন হয়। ভাষারও আনন্দের রসের একটা বিস্তৃত ও গভীর ক্ষেত্র আছে।

তাই ইংরেজী অভারতীয় ভাষা হ'লেও তার নানা ব্যাপকগুণে—একটি গভীর আনন্দ-রস ধারায় লোক-মন ভুলিয়ে দেবার গুণে সে এখনও আমাদের মন ভুলিয়ে রেখেছে। শুধু রাজ্য-শাসনের ভাষার গুণে নয়।

তার গুণ: (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ভাষা। (২) তার সমৃদ্ধ-সাহিত্য। যে সাহিত্যে য়ুরোপের অন্যান্য সাহিত্য ও অনুবাদ হয়ে এসে পড়েছে নানা দিক থেকে। (৩) তৃতীয় হ'ল সভ্য বলিষ্ঠ ভাষা। সহজেই যা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত দুই করা যায়।

তবু ধরে নিই ইংরাজী রইল শুধু ভাষা-শিক্ষার্থীদের ও সাহিত্য-পাঠকের জন্য। রাষ্ট্রকর্মে রইল না।

তা হ'লে? তা হ'লে তার এখনকার স্থান কি হিন্দীরই প্রাপ্য হয়? পাওয়া উচিত?

তার একটি মাত্র জবাব হচ্ছে, দেশ সকলের, সকলে তার সুখদুঃখের সমান অংশীদার। সকলেই রাজ্য-পালনের দায়ভার করভার বহন করেন, যুদ্ধে বিগ্রহে, সুখ সমৃদ্ধিতেও। তাঁরা এক সমান ভাগীদার হ'তে চান, হবেন, হওয়া উচিত।

সেই সকলের যদি কোন এক প্রদেশের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করায় আপত্তি থাকে, যে কারণেই হোক—কর্ম-ক্ষেত্রের সুবিধা-অসুবিধা, চাকরি-জীবিকায় ভাষা শেখার অসুবিধা—প্রবল দলীয় কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রতাপ প্রকাশের ঔদ্ধত্য দেখা যায় (অনেক সময় হিন্দীর উদ্ধত প্রাদেশিকতা যা দেখা যাচ্ছে), সে ক্ষেত্রে এই বহুভাষী দেশের বহুভাষী লোকের আপত্তি মেনে না নেওয়া হ'লে অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। নিশ্চিত নিঃসন্দেহে দেখা দেবে।

অতঃপর একটি অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগছে—আমাদের এখনকার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, গান্ধীজীর কাল বিগত হওয়ার পরের কথা বলছি। কেননা গান্ধীজী তাঁর আদর্শ আর কাজকে যতটা সম্ভব মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। যখন পারেন নি তখন প্রায় কোন বিশিষ্ট কারণে বা চাপে পারেন নি। কিন্তু নিজের বেলা তিনি কঠোরভাবেই সে আদর্শ মেনেছেন। যেমন সন্তানদের শিক্ষা কর্মক্ষেত্র স্ত্রী কস্তুরবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে তিনি কঠিন আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর নাতিপুতি কেউ কোটিপতিও নেই, মন্ত্রীও নেই। তাঁর অনুগামী গান্ধীভক্ত হিন্দীওয়ালাদের সন্তান-সন্ততিদের কই বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে ত দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি তাঁরা হিন্দী-হুঙ্কারের অন্তরালে পাবলিক স্কুল ও কনভেণ্টে তাদের পাঠাচ্ছেন প্রথমে। তার পর বিদেশী মুদ্রার কঠোর নিয়ন্ত্রণের আড়াল থেকে অনায়াসেই বিলাত বিদেশ পাঠাচ্ছেন, আমেরিকা পাঠাচ্ছেন—শিক্ষার সৌকর্য্য সাধনের জন্য। ফিরে এলে বিশুদ্ধ ইংরাজী ও মাতৃভাষায় হুঙ্কারিত হিন্দীসহ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। বিদেশী দূত হচ্ছেন। কই, তুলসী-দাস কবীর মীরাবাঈয়ের ভাষা ও সাহিত্য রসে ভুলে থাকেন না ত! মনে পড়ছে সেই বিখ্যাত বিদেশী উক্তিটি।

কিছু লোককে কিছুদিন ঠকান যায়। কিছু লোককে কিছুদিন ভোলান যায়। কিন্তু চিরদিন সব লোককে বোকা বানান যায় না।
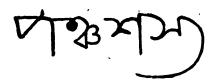
—•—

অভিনব শ্বাসযন্ত্র

পিঠে ঝোলা নিয়ে এই লোকটি কে? একটা কিম্ভুত নল তার নাকে লাগানো। হাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ইনি ডুবুরী ডুবুরী বলতে শুধু যে জলেই নামেন তা নয়, যেখানেই বাতাসের একান্ত অভাব অথবা থাকলেও তা বিষাক্ত সোজা কথায় যেখানেই শ্বাসকষ্ট সেখানেই তার

অভিনব শ্বাসযন্ত্র

অবাধ গতিবিধি। তার পিঠে যে বিচিত্র থলিটি, তাতে রয়েছে অক্সিজেন গ্যাস, তবে এই অক্সিজেন বায়বীয় নয়, তরল অক্সিজেন, দরকার মত তা আপনা-আপনি গ্যাসে পরিণত হয়ে ডুবুরীর "প্রাণ-বায়ু" জোগাবে। এখানেই এই শ্বাসযন্ত্রটির অভিনবত্ব।

আলোর ফিতা

সাপের মতই আঁকাবাঁকা-বাঁকানো— জড়ানো তার গায়। সাপ নয়— আলো। ট্যাপ-লিট নূতন এক ধরনের আলো। সাপের পাকে পাকে ধরা দেওয়া দেখেছি নাগিনী-কন্যা। ছবিতে দেখুন আলোক-কন্যা, আলোর পাকে পাকে যেখানে অন্ধকার নেই কোন।

ট্যাপ-লিট আলোর বিশেষত্ব তার ফিতের মত আকার। ফলে, মেয়েরা যেমন ফিতে নিয়ে নানা ভাবে নানা ঢঙ্গে সাজ-গোজ করে, করতে পারে; এই ফিতে-মার্কা আলোতেও রয়েছে তেমনি সুবিধা। ঘর সাজাতে, দোকান সাজাতে, এমন কি দরকার হ'লে রাস্তায় পর্যন্ত তা ব্যবহার করা চলবে। রাত্রি আলোকিত হবে, শুধু তাই নয়, সজ্জিত হবে। একশ ওয়াট (watt) বাতিতে যে বিজলী খরচা তাতে একশ ফুট লম্বা বাতি হবে।

"ফিতে-বাতি" মাত্র ১/৩২ ইঞ্চি পুরু। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের পাত, তার উপর ফস্ফরাসের আস্তরণ, সর্বোপরি আবরণ

আলোর ফিতা

স্বচ্ছ প্লাস্টিকের। ইলেকট্রোলুমিনিসেন্ট (Electroluminescent) বলে একটা কথা আছে বিজ্ঞানে, যার মানে বিদ্যুৎশক্তি থেকে সরাসরি আলো উৎপাদন (সাধারণ বিজলী বাতিতে বিদ্যুৎ ধাতব জিনিষকে উত্তপ্ত করে আলো বিকিরণ করে), ট্যাপ-লিট—আলোর ফিতা এই লুমিনিসেন্সের গুণে আলোকিত হচ্ছে।

রাত্রি তামস, অন্ধকারাচ্ছন্ন। ছবির মডেল মেয়েটি যেন তার প্রতীক। নূতন আলোর ফিতার পাকে পাকে সেই পুরোনো অন্ধকার বিদূরিত হচ্ছে।

মণিকণা

ফলকথা, ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চার যেগুলি ভিত্তি এখানকার ইংরাজী শিক্ষায় সে ভিত্তিগুলির অভাব। বস্তুগ্রহের উপায় নাই, ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মাইবার যত্ন নাই, পরীক্ষা বিধান নাই সংস্কৃত এবং আরবীয় ব্যাকরণের সূত্র এবং পদসাধন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের নাম এবং তাহাদিগের ব্যাখ্যা শুনা হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে কেন?

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
পাশ্চাত্য ভাব—বৈজ্ঞানিকতা ২)
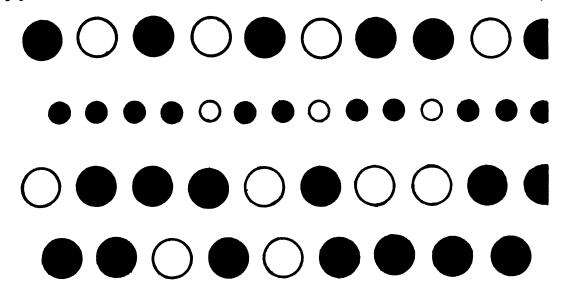
কম্পুটারে লেখা

এ বছর পয়লা বৈশাখে অদ্ভুত এক চিঠি পেলাম। বিদেশের দামী টিকিটের তকমা এঁটে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তা আমার ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছে! নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখা, অথচ লেখা হয়েছে কলমে বা ছবি আঁকার তুলিতে নয়—লেখা হয়েছে কম্পুটার যন্ত্র। আমার এক বন্ধু আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পুটার ল্যাবরেটরীতে কাজ করেন, তাঁরই এই কীর্তি। বিচিত্র এই লিপিট এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি। নিচে লেখা ছিল—"একটা অভিনব যন্ত্রের খবরাখবর জানার প্রয়োজন ছিল, সাধারণ উপায়ে তা সম্ভব ছিলনা। তখন কম্পুটারকে কাজে লাগিয়ে যা পাওয়া গেল তা হ'ল এই লিপিটি -- মানে ভাল, ভাল। আমিও ভাল। শুভেচ্ছা জেনো।"

মহাকাশের পথে পথে

পৃথিবীর সীমানার মাত্র কয়েক শ' কিলোমিটার দূরে মহাশূন্য মহাকাশে সম্প্রতি নূতন নূতন ঘটনা ঘটছে। গত ছ-সাত বছরের মধ্যে বহু রকেট ছুটেছে, স্ফুৎনিক উড়েছে, মানুষ আর পশু মহাশূন্যে ভিড় বাড়িয়েছে। মানুষ এখন চাঁদের দিকে, মঙ্গল গ্রহের দিকে পা বাড়িয়েছে। উল্কাবৃষ্টি আর মহাজাগতিক রশ্মি-পীড়িত মহাকাশে মানুষ সড়ক তৈরি করছে। সম্প্রতি তারই মস্ত অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ছ'নম্বর ভসখদ নামক মহাকাশযানে চেপে পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় কর্ণেল লিওনফ হঠাৎ মহাশূন্যে ঝাঁপ দিলেন, তিনি সাঁতার কাটলেন, সেই ভারহীন শূন্যতাকে সমস্ত দেহে-মনে উপলব্ধি করে নিলেন। এই স্মরণীয় দৃশ্য আবার টেলিভিশন যোগে প্রচারিত করা হ'ল। মাহাকাশযানটি তখন ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল। লিওনফ যাতে অন্তহীন মহাকাশের মধ্যে হারিয়ে না যান তাই রকেটের সঙ্গে দড়ি বা শিকল জাতীয় কিছু দিয়ে (কি জাতীয় ঠিক জানি না) তাঁর দেহ বাঁধা ছিল। এ অবস্থায় বঁড়শিতে ধরা-পড়া মাছের মত তিনি সাঁতার কাটলেন। পৃথিবী ছেড়ে এতদূরে প্রাণের প্রতিকূল পরিবেশে এভাবে উন্মুক্ত মহাকাশের বুকে সন্তরণ নিশ্চয়ই অভিনব ঘটনা। মাটিতে নোঙ্গর করা আমাদের মন এত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণের মনে উদ্দীপনা ছড়ানোর জন্য এত বড় এই পরীক্ষা করা হয় নি। কথা উঠেছে, মানুষ যে মহাকাশের পথে পাড়ি দিতে যাচ্ছে, কিন্তু তার জৈবিক গঠন কতটা ধকল সহ্য করতে পারে। রকেটের উন্নতি হয়েছে, উপযুক্ত মহাকাশযান তৈরি, কিন্তু মহাকাশের অনন্ত পরিসরে যেখানে জিনিষ তার ওজন হারিয়ে সেই ভয়াবহ ভারহীনতাকে তার দেহ কতটা গ্রহণ করে নিতে পারবে। ইতিপূর্বে অবশ্য কর্ণেল বায়কোভস্কি মহাশূন্যে প্রায় ছ'দিন বিচরণ করে এসেছেন। কিন্তু অধ্যাপক মার্সেল ফ্লর্কিনের মত বিশেষজ্ঞরা বলতে সুরু করেছেন, ভারশূন্যহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকা মানুষের পক্ষে বিপদ, এমন কি মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হ'তে পারে। মহাকাশ জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, ভারহীনতার ফলে মানুষের মানসিক ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হয়, তার জৈবিক ক্রিয়া অন্য রকম হয়। অধ্যাপক ফ্লর্কিন বলেন, ভারশূন্যতার ফলে রকেটের মোটর পর্যন্ত অন্যভাবে কাজ করতে পারে। অতিরিক্ত আশাবাদীরা অবশ্য এ সব কথায় কর্ণপাত করতে চান না, তবে অপরিচিত অবস্থার জন্য সব দিক দিয়ে সতর্ক হতে হবে। রাশিয়া ও আমেরিকার মহাকাশ অভিযানের বাণক্রম দেখে মনে হয়, তাঁরা জীবদেহে ভারশূন্যতার সমস্যাটি আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণেল লিওনফের মহাশূন্য সন্তরণের ফলাফলের জন্য সবাই অপেক্ষা করবেন।

"আয়নে" কি না হয়

"আয়ন" হ'ল জিনিষের ছোট ছোট অংশ বা অণুর সেই ভাঙ্গা অংশ যাতে পজেটিভ বা নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি থাকে। এমনিতে অবশ্য "ডান বিদ্যুৎ" আর "বাম-বিদ্যুৎ" অর্থাৎ—পজেটিভ আর নিগেটিভ ইলেকট্রিসিটি গোটা অণু বা মলিকুলের (Molecule) মধ্যে পাশাপাশি থাকে—যোগে আর বিয়োগে যেমন কাটাকাটি হয় অনেকটা সে রকম। এই অণু ভেঙ্গে দু'টুকরো হ'লে দু'ধারের বিদ্যুৎ আলাদা হয়ে যা সৃষ্টি হয় তা হ'ল আয়ন। আয়ন নানা উপায়ে তৈরি হয়ে থাকে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তির চাপে বা ভোল্টে তৈরি আয়নের প্রভাবে কি অদ্ভুত ব্যাপারই

আয়ন যন্ত্র

না হ'তে পারে ছবিতে দেখুন। তারে বোনা খাঁচাটি ঝলমল করছে, অত্যধিক ভোল্টে তা অবশ্য সম্ভব, কিন্তু যা সত্যই অভাবনীয়, খাঁচাটি শূন্যে বেলুনের মত ভাসছে। বেলুনের মত বলা ভুল হ'ল, কারণ বেলুন ত স্বাভাবিকভাবে ভাসবেই--বেলুন বাতাসের তুলনায় হাল্কা। কিন্তু আমাদের এই খাঁচাটি বাতাসের থেকে অনেক ভারী। তবু যে তা ভাসমান, তার কারণ উঁচু মাত্রার ভোল্টে যে আয়ন তেজের সঙ্গে বের হচ্ছে তা ঐ ভারী জিনিষটাকেই মাটি থেকে ঠেলে তুলছে। নূতন ধরনের উড়োজাহাজ তৈরির ব্যাপারে এই নূতন তত্ত্বটি কাজে লাগানো যেতে পারে কি না চিন্তা করা হচ্ছে।

এ, কে, ডি,

-)০(-

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১) নৃত্যের ছন্দে বিকশিত শতদল

আজ থেকে একশ বছর আগেকার কথা। তখনকার দরবারী মজলিসের এক আশ্চর্য ঘটনা—সঙ্গীতের আসরে নৃত্যের অপরূপ ছন্দ-সৃষ্টির অভিজ্ঞতা।

নটী এসেছিলেন দিল্লী থেকে, বর্ধমান-রাজ মহাতপচাঁদের দরবারে। পশ্চিমের নর্তকী এ আসরে নতুন নয়। অনেক নাচের মজলিস এখানে হয়ে গেছে। কমনীয় তনুলতার বিচিত্র ভঙ্গে কত ছন্দিত হিল্লোল; কত মুখ-বিলাস; আঁখির ভাষায়, ভ্রূ-ভঙ্গিতে, কর-মুদ্রায় কত লাস্যময় ভাবপ্রদর্শন; চরণাঘাতে কত জটিল তাললয়ের কারুকর্ম।

কিন্তু এ যেন এক অজানা অসম্ভবের সাধনা। নটীর নৃত্যধারায় আসরের সকলে যখন মুগ্ধ, তখন ছন্দ-সৃষ্টি হয়ে চলেছে অভাবিত পথে, আর-এক রীতিতে। চরণের চকিত বিক্ষেপে এমন বিভ্রম জাগাতে এখানে আর ক'জন আগে দেখেছে?

বাঈজী নাচের অনেক আগেই চাঞ্চল্য এনেছিলেন দরবারে। যেমন করে তিনি আসর সাজাবার ফরমায়েস করেছিলেন, তাও মহাতপচাঁদ ও অনেকের কাছেই নতুন ঠেকেছিল।

বাঈজী যখন বলে পাঠালেন, 'আসর সাজিয়ে রাখতে হবে কিংখাবের চাদরের নীচে······'

কিন্তু সেসব বর্ণনা আরম্ভ করবার আগে আরও কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া দরকার। তা হ'লে গল্পের সঙ্গে সেকালের সঙ্গীত-জগতেরও কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক কথা জানা যাবে। সেজন্যে শুধু মহাতপচাঁদের নয়, তাঁর দরবারী গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর করুণাময়ী দেবীর প্রসঙ্গও আসবে। তখনকার বাংলার একজন উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতা আর বিখ্যাত গায়ক রমাপতি। আর সে-যুগের বর্ধমান রাজ-দরবারের পরিবেশ।

মহাতপচাঁদের কথায় প্রতাপচাঁদের নামও এসে যায়। প্রতাপচাঁদ কিংবা 'জাল প্রতাপচাঁদ'। কারণ তিনি যদি বর্ধমান রাজ্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় না নিতেন আর ভাবী গদীদার হয়ে থাকতেন, তা হ'লে মহারাজা তেজচাঁদও দত্তক নিতেন না মহাতপচাঁদকে। প্রতাপচাঁদের যদি 'মৃত্যু' কিংবা নিরুদ্দেশ না ঘটত, কিংবা তার পনর বছর পরে সেই মামলার রায় যদি অন্যরকম হ'ত, তা হ'লে বর্ধমানেও কেউ মহাতপচাঁদকে এমন ক'রে চিনতে পারত না।

সেসব অবশ্য এই বাঈজীর নাচের আসরের অনেক বছর আগেকার কথা। তখন মহারাজা তেজচাঁদের আমল। আর কুমার হ'লেন প্রতাপচাঁদ। সেই প্রতাপচাঁদের ৩০ বছর বয়সে 'মৃত্যু' হ'ল, কিংবা তিনি 'নিরুদ্দেশ' হ'লেন। সে এক রহস্যময় ব্যাপার এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কিছু আভাস দিয়েছেন তাঁর সুখপাঠ্য 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে। তার ১৫ বছর পরে বর্ধমানে ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যার ফলে প্রথমে বর্ধমানে, তার পর সারা দেশে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল। বর্ধমানের কেউ কেউ দেখতে পেলে—প্রতাপচাঁদ আবার ফিরে এসেছেন! তেজচাঁদ তার আগেই মহাতপচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে, যদিও তখনও তিনি সাবালক হন্ নি। এখন এই আগন্তুককে নিয়ে চমকপ্রদ মোকদ্দমা আরম্ভ হ'ল, একশ' বছর পরের বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মতন। দু'টি মামলাই প্রায় এক ধরনের এবং দেশে একই রকমের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এই দু'টি মামলা উপলক্ষে। মোকদ্দমার পরিচালনায় তফাতের মধ্যে এই যে, ভাওয়াল সন্ন্যাসী বড় তরফের সাহায্য পেয়েছিলেন, কিন্তু 'প্রতাপচাঁদ' বা 'জাল প্রতাপ-চাঁদ' তেমন কারুর সহায়তা পেলেন না। আর প্রভেদ হ'ল মামলার ফলাফলে। ভাওয়াল সন্ন্যাসী আইনত জয়ী হয়ে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার স্বীকৃত হন, কিন্তু বর্ধমান মোকদ্দমার নায়ক 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রতিপন্ন হ'লেন আইনের চোখে। তবে সে প্রতাপচাঁদ আসল কি নকল এবিষয়ে তখনকার বিষ্ণুপুরের রাজা আর বর্ধমানের নানা লোকের মনোভাব কি ছিল, প্রতাপ-চাঁদের দুই রাণীর অন্যরকম সাক্ষ্য দেবার কারণ কি হ'তে পারে, 'জাল প্রতাপচাঁদে'র বিপক্ষে কোন প্রবল স্বার্থ সক্রিয় ছিল কি না—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সঞ্জীব-

চন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন। সে বৃত্তান্ত আমাদের প্রসঙ্গে অবান্তর। এ মামলার উল্লেখ শুধু এইজন্যে করা হ'ল যে, 'জাল প্রতাপচাঁদে'র ঘটনার ৮ বছর পরে মহাতপচাঁদ বর্ধমান রাজ্য লাভ করলেন।

সে যা হোক, মহাতপচাঁদ নির্গুণ ধনী ছিলেন না, নানা সদ্‌গুণে সংস্কৃতিবান ছিলেন তিনি। শুধু বিদ্যোৎসাহী বা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নন, বাংলাভাষায় অনেক গানও তিনি রচনা করেন। বাংলা দেশে বর্ধমান রাজ-বংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় পাঞ্জাব থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন বটে, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বাংলায় বাস ক'রে তাঁরা পরে অনেকখানি বাঙ্গালীর মতন হয়ে যান, বাংলাভাষাকেও নেন আপন করে'। মহাতপচাঁদও বাংলাভাষাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন। সাহিত্য আর বিদ্যাচর্চা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, তিনি ব্যাসদেবের সম্পূর্ণ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মতন। এই মহৎ কাজের জন্যে বিরাট্ আয়োজন ও প্রচুর অর্থব্যয় করেন মহতাপচাঁদ। দরবারের সভাপণ্ডিত তারকনাথ তর্করত্নকে তত্ত্বাবধায়ক করে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তিনি করিয়েছিলেন। তবে এই মহাগ্রন্থ সব খণ্ড প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন নি, পর্বে পর্বে অনূদিত এই মহাভারত প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় মহাতপচাঁদের মৃত্যুর ৫ বছর পরে, ১৮৮৪ খ্রীঃ।

তাঁর বাংলা গান রচনার কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর গান অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বাংলা গানের আসরে। স্বরচিত গানের দু'টি বইও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলা গানের যত সংকলনগ্রন্থ আছে তার মধ্যে মহাতপচাঁদের গান স্থান পেয়েছে। যেমন, 'বাঙ্গালীর গান,' 'সঙ্গীতকোষ,' 'প্রীতিগীতি,' 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' ইত্যাদি। তাঁর গানের সম্পর্কে 'প্রীতিগীতি' সম্পাদক লিখেছেন, 'মহারাজাধিরাজ মহাতপচন্দ্রের রচিত সুমধুর গানগুলি এখনও খুব প্রচলিত।' একথা বলা হয় তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পরে।

মহাতপচাঁদের দরবার ছিল জ্ঞানী-গুণীদের মিলন-সভা। সঙ্গীতজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে নানা বিদ্বান ব্যক্তিরা তখনকার বর্ধমানের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। মহাতপচাঁদের দরবারের এক উজ্জ্বল রত্ন হ'লেন রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাপতি যেমন উচ্চশ্রেণীর গায়ক, তেমনি গীতরচয়িতা। যে নৃত্যের আসরের উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে, সেখানে রমাপতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। শুধু সঙ্গীতজ্ঞরূপে নয়, দরবারী আসরের আদবকায়দা, রীতিনীতি জানা রইস্ লোক হিসেবে তাঁর ওপরে মহাতপচাঁদ কতখানি আস্থা রাখতেন, তা জানা যাবে সে আসরের বিবরণ থেকে।

রমাপতির সঙ্গীতজীবনের অনেক কথা আছে যা' জানবার মতন। তার কিছু কিছু উল্লেখ করবার আগে তাঁর লেখা গানের বিষয়ে একটি গল্প ব'লে নেওয়া যাক।

বর্ধমান রাজসভায় থাকবার সময় রমাপতি বেশির ভাগ স্বরচিত গানই গাইতেন, সেজন্য মহাতপচাঁদ তাঁর অনেক গান ভাল করে জানতেন। অনেক সময় তাঁর ফরমাসেও গান রচনা করতেন রমাপতি। তাঁর গান সে সময় এত জনপ্রিয় হয় যে, কখনো কখনো অন্য গায়করা তাঁরা রচিত গান নিজের বলে' আসরে গেয়ে দিতেন। এমনি এক ঘটনা বর্ধমানেই ঘটেছিল একদিন।

বর্ধমান রাজবাড়ীতে সেদিন গান শোনাতে এসেছিলেন সেকালের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা ও গায়ক গোবিন্দ অধিকারী। তাঁর 'কৃষ্ণ বিদায়' যাত্রাগান সে সময় সারা বাংলায় অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কৃষ্ণ বিদায়' পালায় তিনি স্বয়ং দূতী সেজে গান গেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে' রাখতেন শ্রোতাদের। যাত্রা-গানের আসর থেকে তাঁর এত উপার্জন হ'ত যে, তিনি একাধিক জমিদারী কিনে ফেলেছিলেন।

সেই গোবিন্দ অধিকারী মহাতপচাঁদের আসরে সেদিন গাইতে আরম্ভ করলেন 'কাল রূপে গেল সকল' গানখানি। অতি চমৎকার গান, কিন্তু এটি অধিকারী মশায়ের রচনা নয়। ভক্তাবলী রাগে কাওয়ালী তালে রমাপতি গানটি গঠিত করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী গানটিতে নিজের ভনিতা দিয়ে গাইতে লাগলেন আসর মাৎ করে—

কাল রূপে গেল সকল,
হরিল কুলমান বঙ্কিম নয়নে,
বাঁশীর গানে হইল প্রাণ আকুল।
চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়া বামে,
প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে,
ইচ্ছা হয় ত্রিভঙ্গ ললিত ধামে
বান্ধা থাকি চিরকাল॥
আ মরি কিবা পীত বসন,
হয়েছে অঙ্গের শোভা মনোলোভ,
তার আবরণে নব ঘনে যেন তড়িৎ আভা;

এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে,
মজিলে মন পড়িব বিরূপে। ……

মিলাইলে বিধি নিরবধি পাইব শ্যামনিধি,
কুলেতে কি কাজ তব হইয়া গো কুলবতী,
যদি হন্ অনুকূল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি,
ভনয়ে রমাপতি যাবে না কুল গোকুল।

আগাগোড়া গানখানি গোবিন্দ অধিকারী গেয়ে গেলেন, শুধু 'ভনয়ে রমাপতি'র বদলে নিজের ভনিত যোগ করে', যেন এ গান তাঁরই রচিত।

কিন্তু মহতাপচাঁদের বিলক্ষণ জানা ছিল, গানটি কার রচনা। রমাপতিও তখন সে আসরে তাঁর কাছেই বসেছিলেন, অধিকারী মশায় হয়ত তা' লক্ষ্য করেন নি।

মহতাপচাঁদ গোবিন্দ অধিকারীর চাতুরি বুঝতে পেরে, গান শেষ হ'তেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অধিকারী মশায়, এই গানটি আজ তিন-চার বছর ধরে আমার এই সভায় চলে আসছে। আমি অনেকবার এ গান শুনেছি। এটি কে বেঁধেছেন বলুন ত?'

গোবিন্দ অধিকারী সচেতন হয়ে উঠে বুঝতে পারলে, মহারাজ ব্যাপারটি ধরে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতির দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর, আগে তাঁর বিষয়ে অতটা খেয়াল করেন নি। বুদ্ধিমান লোক, তাই চট্ ক'রে স্থির করে' নিলেন ত্রুটি স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। এবং তা' করলেন নাটকীয় ভঙ্গিতে। রমাপতির সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে আবার গানখানি গোড়া থেকে গাইলেন, রমাপতির ভনিতা দিয়ে।

এবারের গান শেষ হ'তে মহাতপচাঁদ গোবিন্দ অধিকারীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানালেন। সেই সঙ্গে পুরস্কৃত বোধ করলেন রমাপতিও।

রমাপতির গানে যে তাঁর নামের ভনিতা থাকত সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন। রমাপতি কলকাতাতেও অনেকদিন বাস করে' এখানকার সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত হয়েছিলেন গায়ক ও গীতরচয়িতা বলে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতেও তিনি কিছুদিন ছিলেন এবং সম্ভবত আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। যখন তিনি ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন, তখনকার কথা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে এইরকম পাওয়া যায়—'তখন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে স্পষ্ট মনে আছে: রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক ত' ছিলেনই, উপরন্তু তিনি নিজেও অনেক ভাল গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গানের শেষে 'রমাপতি ভাণ' বলিয়া ভণিতা থাকিত।'

বাংলার রাগ-সঙ্গীতচর্চায় রমাপতির নাম আরো এক কারণে স্মরণীয়। তা হ'ল তানসেন প্রমুখ ধ্রুপদ-রচয়িতাদের হিন্দীগানের আদর্শে ও অনুকরণে বাংলায় গান রচনা ক'রে পুস্তক প্রণয়ন। তাঁর সেই 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' বইটি (১৮৬৩ খ্রীঃ, জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রকাশিত) নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ব'লে এখানে তার একটু পরিচয় দেওয়া হ'ল। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, টপ্পা ইত্যাদি রীতির গান অবলম্বনে অবিকল মূল রাগ তাল ও ছন্দে বাংলা গান রচনা করে রমাপতি সন্নিবিষ্ট করেন এই গ্রন্থে। এর নামকরণও লক্ষ্যণীয়। বাংলা রাগসঙ্গীতের মূল ও আদর্শ যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, নামকরণের মধ্যে যেন রচয়িতা এই কথা বলেছেন।

গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় রমাপতি লিখেছেন, 'নানাস্থানীয় বহুবিধ গুণিগণের নিকট হইতে বহু পর্যটন ও বহু পরিশ্রমে বহুকালাবধি স্বীয় ব্যবসায়িক বিদ্যার অতিরিক্ত সঙ্গীতবিদ্যা কিঞ্চিৎ উপার্জন করিয়াছি, তন্মধ্যে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য গান সকল ভাঙ্গিয়া তদনুরূপ বঙ্গভাষায় নানাপ্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয় সাকারবাদী ইত্যাদি যথোচিতভাবে বিরচিত ও তদ্ব্যতীত ভবানীর আগমন্যাদি, রাস ও ঝুলন প্রভৃতি পর্বের সাময়িক বর্ণন এবং টপ্পা ও গজল ইত্যাদি উত্তম উত্তম মন্তব্য সুরে নানাপ্রকার প্রবন্ধে প্রণীত করা হইয়াছে'...ইত্যাদি। এই ভূমিকার পরে লেখক একটি করে মূল হিন্দী (ব্রজভাষা) গান এবং তার সঙ্গে তারই অনুকরণে রচিত বাংলা গান দিয়েছেন। কোন কোন মূল গানের আদর্শে রচনা করেছেন তিন-চারটি গানও।

গানগুলির মধ্যে প্রথমে আছে তানসেনের একটি ধ্রুপদ। সেই গান ও তার অনুকরণে রমাপতি রচিত গানটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হল:

রাগ ভৈরেঁা—তাল চৌতাল

লম্বোদর গজ আনন গিরিজাসুত গণেশ,
এক রদন প্রসন্ন বদন অরুণ বেশ ॥
নর নারীগণ গন্ধর্ব কিন্নর যশ
তোম্বর মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পূজয়ত মহেশ।
অষ্ট সিদ্ধ নব নিধ মুষক বাহন,
বিদ্যাবরকো সুমেরু ত শীষ ॥

তানসেনকো অস্তুতি করত: ভজো
রম্ভারূপ ত্রিরূপ রূপ স্বরূপ আদেশ ॥
'ঐ সুরের অবিকল গান'—
নিরাকার জগতাধার
বিধাতা জগৎপাতা গতি মুক্তিদাতা
নিত্য নিয়ন্তা নিরাকার ॥
সর্বব্যাপী জনবন্দিত নিশ্চল অদ্বিতীয়
নির্মল সর্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম সারাৎসার।

বইখানিতে এমনি অনেক হিন্দী গান ও তাদের অনুকরণে রচিত বাংলা গানের সঙ্গে রমাপতির স্বরচিত গীতাবলীও আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে যেমন দেখা গেছে, রমাপতি গীতরচয়িতা-রূপে সুপরিচিত ছিলেন বাংলা দেশে। তাঁর রচিত বাংলা ও হিন্দী গান শুধু তাঁর সমকালে নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও বিশেষ আদরের বস্তু ছিল বাংলার সঙ্গীতের আসরে। বাংলা গানের নানা সংকলন-গ্রন্থেও সেজন্যে তাঁর গান অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

গান রচনার সঙ্গে রমাপতি ছিলেন একজন শিক্ষিত পটু গায়ক। সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা যেন সহজাত ছিল। পিতা গঙ্গাবিষ্ণু ছিলেন খ্যাতিমান পাখোয়াজী, ধ্রুপদী এবং গীত রচয়িতা। পিতামহ রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সুগায়ক ও ভক্তিগীতির রচয়িতা রূপে প্রসিদ্ধি ছিল।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার হ'লেন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা-নিবাসী। বাংলা দেশের যে ক'টি অঞ্চল সেকালে সঙ্গীতচর্চার জন্যে খ্যাতিলাভ করে, চন্দ্রকোণা তার মধ্যে একটি। সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই সঙ্গীতকেন্দ্রের আর একজন স্বনামধন্য সন্তান।

রমাপতির পিতৃ-পিতামহের সময় থেকে তাঁদের পরিবারে যে সঙ্গীতের আবহ ছিল, তিনি আশৈশব তার মধ্যেই মানুষ হন। তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষাও আরম্ভ হয় বালক বয়সে এবং পিতারই কাছে। পিতা গঙ্গাবিষ্ণু উত্তর ভারতের নানা জায়গায় হিন্দুস্থানী গুণীদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা ক'রে চন্দ্রকোণায় ফিরে আসেন এবং সঙ্গীতচর্চাতে আত্মনিয়োগ করেন। আগে তিনি ছিলেন কাঁথির নিমক মহলের দেওয়ান, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তা এমনভাবে অধিকার করে যে তিনি নিমক মহলের দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই জীবনের অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। ধ্রুপদ সাধনার সঙ্গে তিনি যেমন পাখোয়াজেত্য চর্চা তেমনি গীত রচনাও করতেন।

রমাপতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা যে সহজাত ছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। ছেলেবেলায় তিনি কিভাবে পিতার কাছে প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন তা' বলতে গেলে গল্পের মতন শোনাবে, কিন্তু ঘটনাটি সত্যি।

তাঁর (রমাপতির) তখন সাত, আট বছর বয়স। সেদিন বিকালে গঙ্গাবিষ্ণু রেওয়াজে বসেছিলেন এবং একটি কঠিন রাগের আলাপ করছিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ঠিক যেমনটি চান তেমনটি ক'রে যেন গাইতে পারছিলেন না তিনি। রাগ ভুল হচ্ছিল না বটে, কিন্তু গেয়ে যেন পুরো তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। খানিকক্ষণ এইভাবে রাগালাপ করবার তিনি পর তানপুরা রেখে উঠে গেলেন সন্ধ্যাহ্নিক করতে।

একটু পরে আহ্নিক করতে বসেছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনলেন, কে তাঁর সেই সুর অবিকল নকল করে গাইতে আরম্ভ করেছে। অন্যে শুনে আশ্চর্য হলেন যে, এই গায়কের সুর অনেকটাই তাঁর মতন হয়েছে, যেমন তিনি গাইছিলেন কিছুক্ষণ আগে। ভাবলেন, কোন শিষ্য হয়ত এসে আগে শেখানো রাগটি এখন গাইছে। রমাপতির কথা তাঁর মনে স্থান পায় নি, কারণ তাকে কখনও গান গাইতে তিনি শোনেন নি।

তাই পুজোপাঠ শেষ ক'রে বাইরের ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। দরজার আড়াল থেকে দেখলেন, সেই কঠিন রাগের আলাপ করছে রমাপতি।

বিস্মিত আনন্দে তিনি ঘরের মধ্যে এলেন। তাঁকে দেখে ভয়ে রমাপতি তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যাচ্ছিল, গঙ্গাবিষ্ণু তাকে ধরে ফেললেন। আদর ক'রে অভয় দিয়ে আবার গাইতে বসালেন তাকে।

তারপর থেকে রমাপতিকে তিনি নিজে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এমনিভাবে পিতার স্নেহে-যত্নে রমাপতির সঙ্গীতচর্চা এগিয়ে চলল। পাঁচ-ছ' বছর ধরে তাঁকে নিজের সঞ্চিত বিদ্যা দান করতে লাগলেন গঙ্গাবিষ্ণু।

রমাপতির যখন ১৩/১৪ বছর বয়স, তখন পশ্চিম অঞ্চল থেকে দু'জন ওস্তাদ এসে তাঁদের বাড়ীতে অনেকদিন থেকে যান। তাঁরা হলেন মহম্মদ বক্স ও আসমৎ উল্লা। এই দুই ওস্তাদের কাছে রমাপতি নিয়মিতভাবে পাঁচ বছর গান শিখলেন।

তা ছাড়া, আরও অনেক বড় বড় গায়ক তাঁদের বাড়ী মাঝে মাঝে আসতেন, পাখোয়াজী গঙ্গাবিষ্ণুর

সঙ্গতে গাইবার জন্যে। চন্দ্রকোণার এই দেওয়ান বাড়ীতে নিয়মিত ধ্রুপদের আসর বসত আর বাইরে থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছেও রমাপতি এই বয়স থেকেই কিছু-না-কিছু শিখে নিতেন। মেধাবী, মধুরকণ্ঠ ব'লে তিনি গায়কদের প্রিয়পাত্র হ'তেন আর সুবিধা হ'ত তাঁদের কাছে সঙ্গীতের পাঠ নেবার। এইভাবে ওস্তাদ বৈদ্যনাথ দুবে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতির কাছেও রমাপতি কিছু কিছু গান শিখেছিলেন।

নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার সময় থেকে, প্রথম যৌবন-কালেই তিনি গান রচনাও আরম্ভ করেছিলেন জানা যায়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। পরে বর্ধমান দরবারে থাকবার সময়ে তাঁর এই গুণটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে। মহারাজ মহতাপচাঁদ তাঁকে যে কোন বিষয় নিয়ে গান বাঁধতে ফরমায়েস করতেন এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তা ক'রে দিতেন। গান রচনার অভ্যাসও তাঁর কম বয়স থেকেই প্রকাশ পায়। এবিষয়ে পিতারও দৃষ্টান্ত ছিল, তা ছাড়া সেকালের অনেক বাঙ্গালী গায়কই ছিলেন গান-রচয়িতা। গান রচনার বিষয়ে রমাপতির এমন ক্ষমতা ছিল যে, প্রথম জীবনে ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে চাকুরি করতে গিয়ে উড়িয়া ভাষা শেখেন আর উড়িয়া ভাষাতেও উচ্চাঙ্গের গান রচনা করেন।

ময়ূরভঞ্জের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে রমাপতি নিজেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় গানের একটি আখড়া বসালেন। এখানে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন শিষ্যদের। গায়ক হিসেবে তখন তাঁর নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্রমে বর্ধমান রাজের কাণেও তাঁর নামডাকের কথা পৌঁছল। রমাপতি কাজ পেলেন বর্ধমানের রাজ-সেরেস্তায়। যে কাজ একটা উপলক্ষ্য। আসলে সঙ্গীত-গুণের জন্যেই তাঁর সেখানে কাজ হ'ল। শোনা যায়, মহতাপচাঁদ তাঁকে হাতী পাঠিয়ে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আনাবার ব্যবস্থা করেন বর্ধমানে।

বর্ধমানের কাজে যোগ দেবার আগে রমাপতি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর পত্নী করুণাময়ী ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। করুণাময়ীর মাতুল ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং তাঁর কাছে করুণাময়ী বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাতুল করুণাময়ীর বিদ্যানুরাগ, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্যে তাঁকে বলতেন 'সরস্বতী'। তাঁর কাছে করুণাময়ী সংস্কৃত ও বাংলা ভালভাবে শিখেছিলেন। বিদুষী করুণাময়ীর রীতিমত রচনাশক্তি ছিল, সংস্কৃত ও বাংলা দু'টি ভাষাতেই কাব্য রচনা করতেন তিনি।

উপরন্তু করুণাময়ী সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন, যে-গুণ সেকালে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে প্রায় ছিল না, বলা যায়। তিনি অনেক গান লিখেছিলেন—তাঁর কয়েকটি গান 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' পুস্তকেও আছে—এবং গানও গাইতেন, অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, বাড়ীর মধ্যে। এদিক থেকে তাঁরা ছিলেন আদর্শ সঙ্গীতজ্ঞ দম্পতি। স্বামী-স্ত্রীর এমন একত্র সঙ্গীতচর্চার দৃষ্টান্ত সেযুগে আর বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে তিনি আদর্শ গৃহিণীও ছিলেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো থেকে আরম্ভ করে সাংসারিক কাজকর্ম যেমন করতেন, তেমনি টোট্‌কা চিকিৎসা ইত্যাদিও জানতেন বিলক্ষণ। তাঁর সঙ্গীত-চর্চার মধ্যেও বৈচিত্র ছিল, কারণ তিনি শুধু গায়িকা ছিলেন না, সেতার যন্ত্রেও তাঁর হাত ছিল। তা' ছাড়া, এখন শুনলে অদ্ভুত মনে হবে, তিনি ঘরে পাখোয়াজও বাজাতেন স্বামীর গানের সঙ্গে। অন্য কোন বাঙ্গালী মহিলার বিষয়ে এসব কথা শোনা যায় না।

তাঁরা, স্বামী-স্ত্রী, যে অনেক সময় একসঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করতেন, গান রচনার মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশ পেত। গান লেখার বিষয়ে যেমন সহযোগিতা তেমনি ভাবের আদান-প্রদানও ঘট্‌ত দু'জনের! কোন সময়ে হয়ত রমাপতির লেখা গানের বিপরীত ভাব নিয়ে গান রচনা করতেন করুণাময়ী। রমাপতি মানব-জীবনের অনিত্যতা নিয়ে গান লিখে শোনালেন। তাঁর উত্তর-স্বরূপ করুণাময়ীর গান হ'ল—সন্তান-জন্ম উপলক্ষ্যে।

তাঁদের দুজনের এমনিভাবে গান রচনার একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হল। রমাপতি লিখলেন:

(বেহাগ—একতালা)

সখি শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল করবী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি আভাহীন তারা,
নীলকান্ত-মণি হ'ল জ্যোতিঃহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল॥
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক-কিরণ,
ঊষার প্রভায় হ'ল সংকীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ,
কুসুমেরি হার শুখাল—
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়,

কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল ॥
বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন,
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন বুঝি
বিধি ঘটাল—
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
দেখ বৃক্ষচয় হল অশ্রুময়,
শর্বরী সুরবিলাস ফুরাল ॥

তখন করুণাময়ী বাধ্য হ'য়ে এই তীব্র বিরহে যেন কাতর হয়ে মিলনের গান রচনা ক'রে গাইলেন, ওই দেশাগ রাগে একতালায় :

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধু সঞ্চারে,
কোকিলের সুরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিত্তে নাচিছে বামাঙ্গ,
স্পন্দন করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল ॥
মলয় অনিল প্রণয় রহিত,
বিরহে বিরহে প্রণয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখাল,—
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি,
জলদে জলদে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তাঁ'রা
দুঃখের রজনী সজনী পোহাইল ॥
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হোবে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর, সুধাংশু কিরণ,
বিধিকৃত জালে বিধুরে পাইল।
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়,
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাইল ॥

এই দু'টি গানে কবি ও গীতশিল্পী দম্পতি একসূত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা জানানো দরকার যে, করুণাময়ী রচিত এই গানটি 'সঙ্গীত কোষ,' 'গীত-রত্নাবলী' ইত্যাদি সংকলন গ্রন্থে ভুল ক'রে মুদ্রিত হয়েছে রমাপতির রচনা বলে। কিন্তু এটি যে করুণাময়ীর সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় গানের ভনিতা লক্ষ্য করলে—'ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়....।'

করুণাময়ীর কথা এই পর্যন্ত রেখে, রমাপতির বর্ধমানের প্রসঙ্গ এবার আরম্ভ করা যাক।

রাজ-সেরেস্তার কাজ দিলেও রমাপতিকে সঙ্গীতে গুণপনার জন্যেই মহাতপচাঁদ আসলে নিযুক্ত করেছিলেন। তাই রমাপতির প্রধান কাজ হ'ল, মহারাজকে সঙ্গদান। তাঁকে নিত্য নতুন গান শোনানো। দরবারে গানের মজলিসে স্থাপিত হ'লেন মধ্যমণি। মহাতপচাঁদের অতি প্রিয় পাত্র, প্রধান পার্ষদ।

এখানে প্রথমে তাঁর দিন বেশ শান্তিতে কাটতে লাগল। নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীতচর্চা ও গান রচনা করতে লাগলেন তিনি দিনের পর দিন। আর মহারাজার ইচ্ছায় অনেক সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন পার্শ্বচর হয়ে। প্রায় প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন গান রচনা ক'রে শুনিয়ে মহারাজের চিত্ত বিনোদন করতেন।

কিন্তু 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।' রাজ আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন আরামে বাস করবার পর রমাপতি বিপাকে পড়লেন। মহারাজার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে গেল একদিন, তাঁর ওপর হঠাৎ বিরূপ হ'লেন মহাতপচাঁদ। সে-সব কথা বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করা চলে যে, রমাপতি মহারাজের চাটুকার ছিলেন না এবং তেজস্বী স্বভাবের জন্যেই তিনি মহারাজের বিরাগভাজন হ'লেন। কয়েক-জন তোষামোদার প্ররোচনায় রমাপতিকে তাঁর অপ্রিয় হ'তে হ'ল অকারণে।

তাঁর আত্মসম্মানবোধ অতি প্রচুর ছিল। তাই নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রে তিনি মহারাজাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলেন না। রাজসভা ত্যাগ ক'রে চ'লে এলেন। মহাতপচাঁদ তাঁকে থাকবার জন্যেও অনুরোধ করলেন না, সেরেস্তার চাকুরিটিও গেল রমাপতির। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে তিনি চন্দ্রকোণায় রয়ে গেলেন সঙ্গীতচর্চায় মগ্ন হয়ে।

এইভাবে কিছুদিন কাটল।

তারপর ঘটনাচক্র আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। এমন একটি অভাবিত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে, মহাতপচাঁদ আবার রমাপতিকে দরবারে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

উপলক্ষ্য সেই দিল্লীর বাঈজী।

ভাল মুজরো দেওয়া হবে বলে বাঈজীকে আনানো হয়েছে দিল্লী থেকে। দরবারের মজলিসে তাঁর নাচ

হবে। আয়োজন সব প্রস্তুত, নাচের দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু আসর সাজাবার জন্যে বাঈজী এমন ফরমায়েস করেছেন যে, মহারাজা তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছেন না। দরবারের অন্যান্য পার্ষদদের কাছে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউই সাহায্য করতে পারেন নি তাঁকে। এমন কথা কেউ আগে শোনেন নি।

বাঈজী বলে পাঠিয়েছেন, 'আসর সাজাতে হবে কিংখাবের চাদরের নীচে ময়দা দিয়ে।'

মহারাজা বিব্রত বোধ করলেন আর তাঁর পার্শ্বচর-রাও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ময়দার ওপর কিংখাব বিছিয়ে দেওয়া হবে—এ কথার মানে কি? নাচের আসরে ময়দার প্রস্তাব কেন? এমন কথা তো কখনও শোনা যায় নি! এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁরা স্থির করতে পারলেন না।

মহারাজা অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ময়দার রহস্যের মীমাংসা কেউ ক'রে দিলেন না তাঁকে। একবার ভাবলেন, কারণটা বোঝা না গেলেও ময়দার ওপর কিংখাবের চাদর দেওয়া হোক। তারপর যা হয় হবে। কিন্তু তাতেও মুস্কিল হ'ল এই যে ময়দা, মাখা না গুঁড়ো, কি থাকবে বাঈজীর আসরে? যদি ভুল ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লেও বাঈজীর কাছে অপ্রস্তুত হতে হবে।

এইসব বিষয়ে অচিরেই স্থির করা দরকার, না হ'লে পশ্চিমের এই বাঈজীর চোখে দরবারের মর্যাদা থাকবে না। আর বাঈজীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাও রাজবাড়ির পক্ষে অপমানকর, কারণ তাহলে নটীর ধারণা হবে যে, এ দরবার উচ্চাঙ্গের আসরের রীতিনীতি জানে না।

এমনি সঙ্কটের অবস্থায় মহারাজার মনে পড়ল রমাপতিকে। মনে হ'ল, রমাপতির দ্বারা হয়ত এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, কারণ তাঁর পশ্চিমী নাচের আসরের কায়দা-কানুন জানা আছে।

কিন্তু রমাপতি যখন দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যান তখন তাঁকে থাকতে বলেন নি, অন্য পার্ষদদের প্ররোচনায় তখন তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছিলেন, এসব কথা মনে ক'রে প্রথমে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে সঙ্কোচ হ'ল মহাতাপচাঁদের। শেষ পর্যন্ত নিজের মর্যাদা বাঁচাবার আশায় রমাপতিকে খবর পাঠাতেই হ'ল।

রমাপতি কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। সেবার চাটুকারদের কথায় তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছিলেন, এ অভিমান তাঁর এখনও যায় নি। তাই তিনি মহারাজার লোককে ফিরিয়ে দিলেন, অনিচ্ছা জানিয়ে। কিন্তু মহাতপচাঁদ বার বার লোক পাঠাতে লাগলেন।

অবশেষে রমাপতি আর তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। দরবারে এলেন এবং শুনলেন আসর সাজাবার কথা।

সব শুনে মহাতপচাঁদকে তিনি বললেন, 'আসরে কিংখাবের নীচে গুঁড়ো ময়দা দিয়ে মেঝে ভরাতে হবে।'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এই গুঁড়ো ময়দা কি জন্যে?'

রমাপতি জানালেন, 'নাচের শেষে তা বোঝা যাবে।'

উত্তরটা ঠিক মনঃপূত হ'ল না মহাতপচাঁদের। রমাপতির কথার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলেন না। সাত পাঁচ ভেবে তিনি হুকুম দিলেন—জলসা-ঘরের অর্দ্ধেক কিংখাবের নীচে গুঁড়ো ময়দা আর বাকি অর্দ্ধেকের নীচে মাখা-ময়দা দেওয়া হোক।

সেই ভাবে নাচের আসর তৈরি হ'ল।

যথাসময়ে সাজানো আসরে নটী এলেন নৃত্য প্রদর্শন করতে। দরবারী শিষ্টাচার ইত্যাদির আদব-কায়দা যথারীতি পালিত হবার পর নর্ত্তকী উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু নৃত্য আরম্ভ করবার আগে কিংখাবে পা টিপে টিপে দেখে নিলেন তার নীচে ময়দা কি রকম দেওয়া আছে। বুঝতে পারলেন যে, অর্ধেক জায়গায় আছে মাখা ময়দা আর অর্দ্ধেক জায়গায় গুঁড়ো ময়দা।

তারপর বাঈজী নাচ আরম্ভ করলেন গুঁড়ো ময়দার ওপরকার কিংখাবের দিকে। আসরের আর একদিকে তাঁর পা একবারও পড়ল না।

মজলিসের সকলে মুগ্ধ চোখে নর্ত্তকীর নৃত্য-ছন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। এ নৃত্যকলার প্রধান আশ্রয় হ'ল তাল। তবলার নিপুণ সঙ্গতে অজস্র বোলের সমাবেশে তা যেমন বিধৃত, তেমনি নটীর সুপটু চরণাঘাতে ঘুঙুরের ধ্বনিতে ছন্দিত। সেই সঙ্গে দেহবল্লরীর নানা ভঙ্গিমায় বিভিন্ন অঙ্গহার। চক্ষুর সঞ্চালনে, ভ্রূভঙ্গে, মুখাবয়বে কত ভাবের প্রকাশ।

তনু-সৌন্দর্যে, সঙ্গীতের সহযোগে, ছন্দে ভাবে লাস্যে আসর উদ্বেলিত করে এক সময়ে নর্তন শেষ হ'ল। দ্রুত আন্দোলিত দেহ-লতা স্থির অচঞ্চল ক'রে নর্ত্তকী এসে দাঁড়ালেন মহারাজার সামনে, কুর্ণিস ক'রে।

মহাতপচাঁদ প্রশংসা করলেন নৃত্যের। কিন্তু

বাঈজীর কাছে তা' মামুলি মনে হ'ল। তিনি যেন নিরাশ হ'লেন।

মহারাজকে সেলাম জানিয়ে বিরস মুখে তবল্‌চীর পাশে এসে বাঈজী জনান্তিকে বল্‌লেন, 'এখানে দেখ্‌ছি সমঝ্‌দার নেই।'

রমাপতি এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন মহাতপ-চাঁদের পাশে। তিনি তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন, 'মহারাজ, কিং-খাব তুলে ফেল্‌বার হুকুম দিন।'

তাঁর কথা মতন কিংখাব উঠিয়ে নিতেই আসরের সবাই সচকিত হয়ে দেখলেন—নটীর চরণাঘাতের ছন্দে শুভ্র চূর্ণের ওপর ফুটে উঠেছে শতদল পদ্মের নক্সা!

এতক্ষণে মহাতপচাঁদ ও তাঁর সভাসদদের হৃদয়ঙ্গম হ'ল, গুঁড়ো ময়দার প্রয়োজন কি জন্যে। সভার সকলে তখন শতমুখে নর্তকীর পটুত্বের সুখ্যাতি করতে লাগলেন।

মহারাজা রমাপতিকেও বিশেষ করে সাধুবাদ জানালেন তারপর। রমাপতির জন্যেই আজ তাঁর দরবারের সম্মান রক্ষা হ'ল একথা তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না। এ দিনের পর থেকে তাঁদের অনেকদিনের মনোমালিন্য দূর হয়ে আবার ফিরে এল সেই হৃদ্যতার ভাব।

এখন এই যে নটীর কুশলতার কথা বর্ণনা হ'ল—নৃত্যের তালে শতদলের চিত্ররচনা করা, তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। এ ধরনের নাচের বিবরণ আরও পাওয়া যায়, তার দু-একটি এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মনোরম স্মৃতিকথা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একস্থানে বলেছেন, 'দোতলায় বাবা-মশায়ের বৈঠকখানায়ও হোলির উৎসব হ'ত। সেখানে যাবার হুকুম ছিল না। উঁকিঝুঁকি মারতাম এদিক-ওদিক থেকে। আধ হাত উঁচু আবীরের ফরাস। তার উপরে পাতলা কাপড় বিছানো। তলা থেকে লাল আভা ফুটে বের হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব এসেছেন অনেক—অক্ষয়বাবু তানপুরা হাতে বসে, শ্যামসুন্দরও আছেন। ঘরে ফুলের ছড়াছড়ি। বাবা-মশায়ের সামনে গোলাপজলের পিচ্‌কারি, কাচের গড়গড়া, তাতে গোলাপজলের গোলাপের পাপড়ি মেশানো, নলে টান দিলেই জলে পাপড়িগুলো ওঠানামা করে। সেবার এক নাচিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে নন্দ ফরাস এনে রাখলে মস্ত বড় একটি আলোর ডুমটি। নাচিয়ে ডুমটি ঘুরে ঘুরে নেচে গেল। নাচ শেষ হ'ল; পায়ের তলায় একটি আলপনার পদ্ম আঁকা। নাচের তালে তালে পায়ের আঙুল দিয়ে চাদরের নীচের আবীর সরিয়ে সরিয়ে পায়ে পায়ে আল্‌পনা কেটে দিলে। অদ্ভুত সে নাচ।'

এমনি আর একটি বিবরণ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের কন্যা উমা দেবী তাঁর 'বাবার কথা' নামে বইটিতে: 'বাঈজীকে নাচতে বলা হ'ল। বাঈজী বল্‌লে, তার পায়ের তলায় একটা সাদা চাদর পেতে দিতে। তাই দেওয়া হ'ল। আরম্ভ হ'ল সে নাচ। ...তবলার তালে তালে পা সরতে লাগল বাঈজীর। কি তার পায়ের ছন্দ আর গতি। পায়ের তলায় ফুটে উঠ্‌ল একটি পদ্মফুল। নাচ শেষ হ'ল আসরশুদ্ধ লোক অবাক্‌ হয়ে দেখলে তার পায়ের তলায় ফুটে-ওঠা সেই পদ্ম। মহারাজা (নাটোর) মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তার নাচে।'...

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্যনীতি

কয়েক মাস পূর্বে তখনকার শঙ্কাজনক খাদ্য-সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে যে গরম গরম বিতর্ক ও আলোচনার উদ্ভব হয়েছিল, বর্তমানে সে বিষয়টি দেশের লোকের চিন্তার পশ্চাৎপটে অন্তর্ধান করেছে বলে দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ যে ইতিমধ্যে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ও মূল্যমান উভয় দিক থেকেই অনেকটা উন্নত অবস্থা চালু হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর মন্ত্রণালয়ের বাজেট-দাবী সম্পর্কীয় বিতর্কের উপলক্ষ্যে তাই কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যমকে কোন কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয় নি। কিন্তু তথাপি দেশের প্রশাসনিক আয়োজন যে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'তে পেরেছে এমন দাবি করাটাও একান্তই ভুল হবে। বস্তুতঃ গত বৎসর যে ব্যাপক সমস্যার মধ্য দিয়ে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম এই বহু বাধা ও বিপত্তির দ্বারা কণ্টকিত মন্ত্রণালয়টির ভার গ্রহণ করেন, সেই সময়ের তুলনায় ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির দিক দিয়ে খাদ্য সম্বন্ধীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগে যে খুব একটা নির্ভরযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে, এমনটা কোন মতেই দাবি করা চলে না।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে দেশে খাদ্য সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি বেশ আয়ত্তাধীন রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। খাদ্যশস্য আমদানীর ধারায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ডক ধর্মঘটের ফলে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে রাজ্যগুলিতে গম সরবরাহের পরিমাণে অনিবার্যভাবে যে ছাঁটাই করতে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও দেশের কোন বিশেষ অঞ্চলে কিংবা সাধারণতঃ দেশের সমগ্র ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে যে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এমন কোন অভিযোগ বর্তমানে নাই। মূল্যের দিক থেকে খাদ্য-শস্যের বর্তমান মূল্যমান যদিও এক বৎসর পূর্বের অবস্থার তুলনায় এখনও অনেকটা পরিমাণেই বেশী রয়েছে, তবু নতুন ফসল ওঠবার অব্যবহিত পূর্বেকার মূল্যমানের তুলনায় বর্তমান মূল্য যে অনেকটা পরিমাণে কম সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর মাসে যে-সকল খাদ্যশস্যের পাইকারী মূল্যমান ছিল ১৫০, সেটি কমে গত মার্চ মাসের শেষে ১৪০শে দাঁড়ায়। খোলা বাজারে চাউলের খুচরা মূল্যমানের বেলায় (কলিকাতার সংলগ্ন এলাকা-গুলিতে) দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বরের ১২০ পরিসংখ্যানের আনুপাতিক মূল্যমানের পরিসংখ্যান মার্চ মাসের শেষে দাঁড়ায় ৮০তে, অর্থাৎ ৩৩% কম। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাউল খরিদের পরিমাণ মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১৬ লক্ষ টন ছিল। সরকারী খরিদের এই ধারাটি যদি আগামী তিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক কৃশ-ঋতু (lean season) সুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত রাখা যায় তবে গত কয়েক বৎসরের বার্ষিক সরকারী খরিদের মোট পরিমাণের তুলনায় এই পর্যন্ত সরকারী পরিমাণ যে অনেকটা বেশী হবে তাতে সন্দেহ নাই। এর ফলে মূল্য কমতি হবার সাম্প্রতিক ধারাটি যদি সাময়িক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবুও অন্যান্য বৎসরের মত হঠকারিতা করে সরকারী খরিদ বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন হবে না। কেননা সরকারী মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ খাদ্যনীতি রচনার জন্য একটি একান্ত অনিবার্য্য উপাদান। বৈদেশিক মুদ্রা সম্বন্ধীয় দেশের বর্তমান শঙ্কাজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনে বেশ মোটা পরিমাণ বৈদেশিকী মুদ্রার ব্যবহারের যে আয়োজন করা হয়েছে, খাদ্যশস্যের উপযুক্ত পরিমাণ মজুত (buffer stocks) গড়ে তুলতে না পারলে এত কষ্টের আয়োজন যে মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে অনেকটা ব্যর্থ হয়ে পড়বে সে কথা বলাই বাহুল্য। চাউলের ব্যাপারে অবশ্য গত বছরের আশাতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ বর্তমান উন্নত অবস্থা সৃষ্টিতে খুবই সহায়তা করেছে।

কিন্তু গমের বেলায় অবস্থাটি যে অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত সে কথা স্বীকার করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বর্তমান বৎসরের গমের ফসল গত বৎসরের তুলনায় অনেকটা অতিরিক্ত হবে এমন আশ্বাস পাওয়া গেলেও, এই ফসলের পরিমাণ কতটা অতিরিক্ত হবার সম্ভাবনা সে বিষয়টি এখনও খুবই অনিশ্চিত। অন্যদিকে গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে যে গম আমদানী সুরু

হয়েছে তার ফলে এখনও কেন্দ্রীয় মজুদের পরিমাণে কোন বিশেষ বৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। কেননা রাজ্যগুলিতে গমের বণ্টনের পরিমাণ মোটামুটি আমদানী গমের পরিমাণের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলেছে। আমেরিকার ডক-ধর্মঘটের ফলে এ বিষয়ে পরিস্থিতি, সময় মতন ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্য না পেলে সম্ভবতঃ সঙ্গীন হয়ে উঠত। যাই হোক আগামী তিন মাসের মধ্যে একদিকে আমদানী গমের সরবরাহ যদি অধিকতর পরিমাণে নিয়ন্ত্রণাধীন না করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গমের বর্তমান ফসল থেকে সরকারী খরিদের পরিমাণ উপযুক্তভাবে বৃদ্ধি না করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় মজুদ যে আশানুরূপভাবে গড়ে তোলা যাবে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্যপক্ষে দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে যদি একটা নির্ভরযোগ্য স্থিরতা সম্পাদন করতে হয় তবে এই মজুদ প্রভূত ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মূল্যনীতি

খাদ্যশস্য সম্বন্ধে একটা উপযুক্ত মূল্যনীতি নির্দ্ধারণের পথে গমের মজুদের পরিমাণের স্বল্পতা যে একটা বাধা সৃষ্টি করছে সে বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়। তবু অন্যান্য খাদ্যশস্য সম্পর্কে বর্তমান মূল্য নীতিটি যে খানিকটা পরিমাণে বাস্তবতা অনুসারী সে কথা স্বীকার করা চলে। কিন্তু সম্প্রতি চাউল ও গমের সরবরাহ-মূল্য (issue price) যে যথাক্রমে শতকরা ৪০ ভাগ ও ৩০ ভাগ বাড়ান হয়েছে তার দ্বারা খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দ্ধারণে সরকার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্তের ক্ষমতাটি যে খানিকটা পরিমাণে বাজার প্রভাবের উপর হস্তান্তরিত করা হয়েছে সে কথাটিও অস্পষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা জনসাধারণকে একথাও পরোক্ষে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, পূর্বেকার সস্তা মূল্যের খাদ্যশস্যের আমলে প্রত্যাবর্তনের আশা করা বাতুলতা বলে প্রমাণিত হবে ; সরকার পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বর্তমানের সরবরাহ মূল্যবৃদ্ধির কারণ, যাতে করে খাদ্যশস্যের মূল্যে খোলাবাজারের মূল্যমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধিত হয় ; সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চাষীকে অতিরিক্ত উৎপাদনের আশায় মূল্য-সাহায্য দেবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সম্ভবতঃ বর্তমান মূল্যনীতি সেই সিদ্ধান্তেরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করা হয়েছে। যদি এই উচ্চতর মানে খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থিরতা (stability) সম্পাদন করা সম্ভব হয়, তবে বর্তমানের সরকারী নীতি যে বাস্তবতা অনুসারী সে কথা স্বীকৃত হবে এবং সেই পরিমাণে বর্তমান সরকারী নীতির সাফল্য সূচিত হবে।

কিন্তু আশঙ্কার কারণ এই যে প্রথমতঃ বর্তমানের মূল্যবৃদ্ধি-সহায়ক অর্থব্যবস্থার (inflationary finance) উপরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রভাব নেই এবং সাধারণতঃ সরকারী অর্থনীতি (fiscal policy) মূল্য স্থিরতা সম্পাদনের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানের অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থার ফলে খাদ্যশস্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণের দিকে কোনও প্রস্তুতিরই আভাস দেখা যাচ্ছে না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমানের অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাটি অতি সহজেই বিপরীত প্রভাবের অধীন হয়ে পড়বার আশঙ্কা সব সময়েই বিদ্যমান এবং সরবরাহ ও চাহিদার পারস্পরিক সামঞ্জস্য (balance) অতি সহজেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। যথা, যদি অনুমিত রবি ফসলের পরিমাণ বাস্তবপক্ষে কম হয়ে পড়ে, কিংবা সরকারী ভোগব্যয় যদি চাহিদা বৃদ্ধি করে, তা হ'লে উভয় ক্ষেত্রেই এটি ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খরচ কমাবার সকল প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সরকারী ভোগব্যয়ের পরিমাণ বর্তমান বৎসরেও গত বৎসরের তুলনায় অনেকটা বেশী হবে। খাদ্য-মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে অবশ্য সওয়াল করা যেতে পারে অন্যান্য সরকারী বিভাগের ব্যয়বাহুল্যের জন্য তাঁরা দায়ী নন। কিন্তু এর দ্বারা এটুকু প্রমাণ হয় যে, খাদ্যমন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতি বা আয়োজন ছাড়াও আরও অনেকগুলি অনিশ্চিত (imponderable) কারণ আছে, যার ফলে বর্তমান খাদ্যনীতির মূল ভিত্তিটি ভেঙ্গে পড়বার আশঙ্কা আছে।

মোট কথা, কারণ যাই হোক না কেন, বর্তমান বৎসরের অধিকতর ফসল সত্ত্বেও যদি চাহিদা অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তবে গত বৎসরের শঙ্কাজনক পরিস্থিতির পুনরুদ্ভব হবার আশঙ্কা যে অমূলক নয়, সেই কথাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কাগজে-কলমে বা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী—চাষীর জন্য সহায়ক মূল্যমান (support prices), ভোক্তার জন্য ন্যায্য খুচরা মূল্যমান ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত হারে মুনাফার মান খাদ্যশস্যের বাজারটিকে নির্দিষ্ট মূল্য এলাকায় সীমিত করে রাখবার আয়োজনটিকে একটি সুস্থ নীতি-নির্দ্ধারণের প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও নানা কারণে

এই নীতির মূল্য উদ্দেশ্যটি বানচাল হয়ে যেতে পারে। চাষী যদি তার নিজের ভোগপরিমাণ বাড়িয়ে ফেলে কিংবা তার আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা না পাওয়া পর্যন্ত তার উৎপাদিত শস্য বাজারে ছাড়তে রাজী না হয় তা হ'লে সহজেই অবস্থা শঙ্কাজনক আকার ধারণ করতে পারে। সেই অবস্থায় অবশ্য নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী ফুড ট্রেডিং কর্পোরেশন দায়িত্ব গ্রহণ করে একটা সুসমঞ্জস ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে। কিন্তু যে অসংখ্য ছোট ছোট লেনদেনের দ্বারা বাজার সরবরাহ সাধারণতঃ প্রভাবিত হয় বলে জানা আছে, সেই ক্ষেত্রে এই সরকারী খাদ্য-ব্যবসায় সংস্থাটি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার পথে কোন স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে এমন আশা নানাভাবে বিঘ্নিত হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে হিসাব-বহির্ভূত অর্থাধিকারীদের সম্ভাব্য প্রভাবের কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেখা গেছে সমাজের এই অতি শক্তিশালী গোষ্ঠীটি খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অবশ্য-ভোগ্যপণ্যাদির মূল্যে তথা সরবরাহে গভীর শঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা রাখেন। বাস্তবপক্ষে এঁরা সাধারণতঃ সরবরাহের ধারায় অচল অবস্থা সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি তথা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করে থাকেন। দেশবাসী বা সমাজের কল্যাণ এঁদের এই সমাজবিরোধী কার্যকলাপে তাঁদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা-গ্রস্ত করে তোলে সে দাবি এঁদের পরম মিত্ররাও করবার সাহস পাবেন না। এবং অতীতে এঁরা যেভাবে মুনাফাবাজী করে সমস্ত দেশের জীবন দুর্বহ করে তুলেছেন, উপযুক্ত সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও এঁরা যে তা করবেন না, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব এদের মুনাফাবাজীর সার্থক প্রয়োগ রচনা করতে না পারলে, খাদ্যশস্য সরবরাহের বর্তমান কাঠামো যতদিন বজায় রেখে চলা হবে, ততদিন খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার কোন উপায় নেই। গত বছর খাদ্যসঙ্কটের সময় প্রধানমন্ত্রীর অনুমান অনুযায়ী সরবরাহ থেকে সরিয়ে-ফেলা প্রভূত শস্যের মজুদই এ সঙ্কটের জন্য দায়ী ছিল; তাঁর অনুমান অনুযায়ী এই ভাবে বাজার সরবরাহ থেকে অন্ততঃ ১০০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরিয়ে রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এই রাজ্যে এই ভাবে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন চাউল সরবরাহ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আন্দাজ ১২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরিয়ে ফেলতে গেলে অন্ততঃ ২৪০ কোটি টাকার প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক থেকে এই কারণে পুঁজি সরবরাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাঁদের পুঁজি হিসাবে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাঁদের কাছ থেকেই যে এই অর্থ এসেছিল সে কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সুযোগ পেলে এঁরা যে আবারও এরূপ কর্ম করবেন না এমন ভরসা করবার কোন কারণ আছে কি? অতএব খাদ্যশস্য সম্পর্কে যদি একটি স্থিরতাসূচক অবস্থা কায়েম করতে হয় তবে এরূপ সুযোগ যাতে না ঘটে তার আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যাপক বণ্টন নিয়ন্ত্রণ জরুরী

মুনাফাবাজ যাতে বাজার সরবরাহে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে খাদ্যের বাজারে সঙ্কট পুনরায় সৃষ্টি করতে না পারে, বর্তমান অবস্থায় একমাত্র পূর্ণ র‍্যাশনিং ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় অনুমান করা যায় না। গত বৎসরের সঙ্কটের সময় কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ ঘাটতি রাজ্যগুলিতে এই সিদ্ধান্তটি সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্কট কাটিয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মতান্তরের লক্ষণ দেখা যেতে সুরু করে এবং তার ফলে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী র‍্যাশনিং প্রবর্তন করবার পথে নানা বাধা ও আপত্তি সৃষ্টি হ'তে থাকে। স্মরণ থাকতে পারে যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী সমগ্র দেশে দশ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ লোকসংখ্যার সকল শহরে এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং এবং গ্রামাঞ্চল ও ঘাটতি এলাকাগুলিতে আংশিক র‍্যাশনিং এবং ভোগ-সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা এলাকা এবং পশ্চিম-বঙ্গের ঘন-বসতিসম্পন্ন শিল্পাঞ্চলগুলি ছাড়া আজ পর্যন্ত দেশের অন্য কোন রাজ্যে বা এলাকায় র‍্যাশনিং প্রবর্তনের দিকে কোন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত র‍্যাশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের অধিকার রাজ্য সরকার-গুলির নিজস্ব ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যসরকারগুলি বিভিন্ন কারণে এখন তাঁদের অধিকারে র‍্যাশনিং প্রবর্তনে নিরুৎসাহ এবং কেন্দ্র সরকারও যেন এবিষয়ে তাঁদের ওপর চাপ দিতে ভরসা পাচ্ছেন না। অথচ বর্তমান খাদ্যনীতির মূল কাঠামোর ভিত্তিটি বাস্তবপক্ষে এই বণ্টননিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানের অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ (comfortable) পরিস্থিতির মোহে এই মূল সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে দ্বিধা বা গাফিলতি হ'লে পুনরায় সঙ্কট সৃষ্টি হবার

আশঙ্কা অমূলক নয়, বর্তমান প্রসঙ্গে সেই কথাটাই প্রমাণ করবার প্রয়াস করা হ'ল।

নানা কারণে রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে এই বিষয়ে উৎসাহের অভাব ঘটা স্বাভাবিক। ঘাটতি রাজ্যগুলিতে র‍্যাশনিং প্রবর্তন করতে হলে মূলত: কেন্দ্রের উপরে নির্ভর করতে হবে। গত বছরকার সঙ্কটের সময়ে কেরালায় চাউল সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে তাঁদের মূল দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি পালনে অসামর্থ্য যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলেছিল, কোন রাজ্য সরকারই সেই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে ভরসা পাবেন না, সেটা স্বাভাবিক। র‍্যাশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত দ্বিবিধ বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমত, শহরাঞ্চলে ন্যায্যমূল্যে নির্দ্ধারিত সরবরাহ দেওয়া ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত:, শিল্পাঞ্চলগুলিতে এভাবে ভোগব্যয়ে স্থিরতা সম্পাদন ছিল এই সিদ্ধান্তের অন্য উদ্দেশ্য। তা ছাড়াও এই সকল বিরাট ও ঘনীভূত (massive and concentrated) ভোগ-অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে দিয়ে যাতে মোট সরবরাহের ওপর বর্দ্ধমান চাহিদার দ্বারা চাপ সৃষ্টি হ'তে না পারে, সেটি ছিল এই সিদ্ধান্তের অন্যতম তৃতীয় উদ্দেশ্য। ঘাটতি রাজ্য এলাকাগুলিতে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে র‍্যাশনিং প্রবর্তনের মূল ভিত্তি হবে কেন্দ্র থেকে ঘাটতি পরিমাণের শস্য সরবরাহে নিশ্চয়তা। এই বিষয়ে ভরসার অভাবের ফলেই সম্ভবত: এ সকল রাজ্য সরকারগুলি র‍্যাশনিং প্রবর্তনে একান্ত নিরুৎসাহ। অন্যপক্ষে বাড়তি রাজ্যগুলি (surplus states) মনে করেন তাঁদের অধীনস্থ এলাকায় র‍্যাশনিং প্রবর্তনের কোন জরুরী প্রয়োজন নাই, অথচ র‍্যাশনিং প্রবর্তন করতে হ'লে কতগুলি গুরু ও জটিল প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। একে ত কোন রাজ্যেরই প্রশাসনিক কাঠামো খুব সুদৃঢ় বা শক্তিশালী নয় ও র‍্যাশনিং বাদেও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সব সময় সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার ওপরে এই অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ অনর্থক কতকগুলি জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। সেই কারণেই সম্ভবত: এঁরা র‍্যাশনিং প্রবর্তন করতে খুব উৎসাহী নন। অন্যপক্ষে মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের সরবরাহ-সহায়ক মজুদ গড়ে তুলতে অসমর্থ হওয়ার ফলে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির সিদ্ধান্ত উপযুক্ত প্রয়োগে প্রভাবিত করবার জন্য চাপ দিতে সমর্থ হচ্ছেন না। গত বৎসর কেরালা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালনে শোচনীয় অসামর্থ্য ঐরূপ পরিস্থিতির পুনরুদ্ভবের আশঙ্কা সম্পূর্ণ নিরসন করে উঠতে পারে নি, ফলে বণ্টননিয়ন্ত্রণের একটা সামগ্রিক জাতীয় কাঠামো সৃষ্টি করবার দিকে খুব একটা দ্রুত অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই সামগ্রিক বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তির ওপরেই বর্তমান কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতি গড়ে তোলবার প্রয়াস করা হয়েছে। যদি এখন এ বিষয়ে বর্তমান গাফিলতির ধারাটি অব্যাহত চলতে থাকে তবে কৃশ-ঋতু (lean season) সুরু হবার পরে সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি পুনরায় গত বৎসরের মত শঙ্কটজনক আকার ধারণ করবে না, এমন আশা দুরাশায় পর্যবসিত হবার আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়।

আঞ্চলিক ব্যবস্থা

বর্তমানের এই আধা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যে খাদ্যশস্য সরবরাহে ও চলাচলে আঞ্চলিক বাধা-ব্যবস্থা চালু রাখতে বাধ্য করেছে সে-কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এর ফলে যে কতকগুলি অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে সেটাও স্পষ্ট। চাউলের বেলায় প্রতি রাজ্যকে এই বিষয়ে এক একটি বিভিন্ন অঞ্চল বলে ধরা হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম পাঞ্জাব, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ এলাকাগুলি। যতক্ষণ আবার গত বছরের কেরালার মতন পরিবহনে গোলযোগ সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ এই আঞ্চলিক ব্যবস্থা চালু রাখায় কোন বিশেষ গোলযোগ হবার আশঙ্কা দেখা যায় না। কিন্তু এর ফলে ঘাটতি বা বাড়তি রাজ্যগুলির মধ্যে যে একটা অতিরিক্ত ঘাটতির বা কম করে দেখানো বাড়তির হিসাবের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। বাড়তি রাজ্যগুলি নিজেদের মজুদ শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার জন্য তাঁদের বাড়তি ফসলের হিসাব অনেকটা করে বাদ দিয়ে ধরছেন এবং আনুপাতিক অংশ যাতে ঘাটতি রাজ্যগুলিতে না চালান হয়ে যায় এভাবে তার আয়োজন করছেন। ঘাটতি রাজ্যগুলি আবার তাঁদের ঘাটতির অঙ্কটিকে ফাঁপিয়ে তুলে অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহের দায়িত্ব বাড়িয়ে চলেছেন এবং নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। গমের বেলায় দেখা যায় বিদেশ থেকে আমদানী গমের তুলনায় দেশী গমের চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী এবং তার ফলে মূল্যে একটা অসমঞ্জস ও অনিশ্চয়তাসূচক অবস্থার আভাস দেখা যায়। সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই আঞ্চলিক ব্যবস্থা শীঘ্র তুলে দেবার

আশা এখন সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে, কেননা কেন্দ্রীয় মজুদের বর্তমান স্বল্পতার অবস্থায় বর্তমান আঞ্চলিক বাধা অপসারণের দায়িত্ব স্বীকার করতে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ভরসা পাচ্ছেন না।

অর্থাৎ ভারতের বর্তমান খাদ্যনীতি মোটামুটি অঞ্চল প্রভাবিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এই কারণে একটা পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে। এবং এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটা পারস্পরিক এবং সামগ্রিক (integrated and comprehensive) খাদ্যনীতি বর্তমান আবহাওয়াতে কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। অথচ দেশের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে যদি কোন সার্থক সামগ্রিক এবং স্থিরতাব্যঞ্জক প্রয়োগ গড়ে তুলতে হয় তবে এ সম্পর্কে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধসূচক সমগ্র দেশব্যাপী প্রয়োগের একটা জাতীয় আবহাওয়া ও দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানের বিচ্ছিন্ন এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগবিধি কোন স্থিরতাব্যঞ্জক (enduring) সমাধান রচনার পথে যে গভীরতম বাধা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুতঃ কেবলমাত্র খাদ্যসমস্যাই নয়, দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক নীতিও যে এই আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগের দ্বারা গভীর ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্যা সম্বন্ধে গভীর ঔদাসীন্য

গভীর দুঃখের বিষয় যে, দেশের দূরপ্রসারী (long term) খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে কি সরকারী বা বেসরকারী চিন্তাধারায় বর্তমানে কোন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অতিরিক্ত চাউল ও সম্ভাব্য অতিরিক্ত গমের ফসলজনিত বর্তমান আরামসূচক অবস্থার ফলে তাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাবি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্য-নীতির তেমন কিছু সমালোচনাও হয় নাই। মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম অবশ্য সরকারী কৃষি নীতিটিকেই খাদ্যনীতির নাম দিয়ে চালিয়েছেন। বস্তুতঃ খাদ্যসম্পর্কে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি গভীর ঔদাসীন্য সূচিত করে। এর ফল

ভবিষ্যতে কতটা বিষময় হতে পারে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য

বর্তমান বৎসরের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বার্ষিক আয়-ব্যয় বাজেট সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত কোন আলোচনা করি নাই। করভার-প্রপীড়িত মুমূর্ষুপ্রায় বাঙ্গালী জাতির উপরে রাজ্য অর্থমন্ত্রী এবার নূতন কোন করভার চাপান নাই, ইহাতে খানিকটা দয়া করা হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় ঘাটতি প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে। আমদানী খাতে এবার ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৭·৮৩ কোটি টাকা। গত বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ৬·৩৮ কোটি টাকা। আমদানী ব্যতীত অন্যান্য খাতে এবার অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ধার্য্য করা হইয়াছে ১০·৭৭ কোটি টাকায়, ফলে বৎসরের নীট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭·০৫ কোটি টাকা ; গত বৎসরের অন্যান্য খাতে অতিরিক্ত আয় ৫·৫১ কোটি টাকা ধরিয়া নীট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ·৮৭ কোটি টাকা। এই ঘাটতি সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী কতকগুলি নির্দিষ্ট স্তরের সরকারী কর্মচারীদের জন্য, পেন্সনভোগীদের জন্য এবং রাজ্য বিধান সভার সভ্যদের জন্য, কিছুটা অতিরিক্ত মাগ্‌গীভাতা এবং মাসহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে স্থানীয় মূল্যমানের উপরে কোন চাপ বর্তাইবে কি না এবং তাহার প্রতিরোধের জন্য কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা জানা নাই।

যাহা হোক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ যতটা বাড়ান একান্ত প্রয়োজন তাহা কিছুই করা হয় নাই। একটা জাতির মেরুদণ্ড তাহার জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বহুকাল ধরিয়া—বিশেষ করিয়া স্বাধীনতালাভের পর হইতে গত ১৭ বৎসরে, এই দুইটি বিষয়ে গভীর সরকারী ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। অর্থ ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার কারণে এই দুইটি ভিত্তিমূলক ক্ষেত্রে (basic fields) যতটা আয়োজন করা প্রয়োজন তাহার সামান্য অংশ মাত্র করা সম্ভব একথা স্বীকার করিলেও, একথাও অস্বীকার করা চলে না যে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে যদি আমাদের শাসনকর্তারা সচেতন থাকিতেন এবং জাতি গঠনে এই দুইটি বিভাগের মূল দায়িত্ব সম্বন্ধে ইঁহারা যদি ওয়াকিবহাল থাকিতেন, তাহা হইলে সকল বাধা ও সমস্যা সত্ত্বেও এদিকে উন্নতির প্রচুর অবকাশ থাকিতে পারিত। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে সচেতনতার গভীর অভাব দেখা যাইতেছে।

বাংলা দেশে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের যে, শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে তাহার তুলনা অন্য কোন রাজ্যে নাই। ফলে বাঙালী জাতি দ্রুত চরিত্রে, চিন্তায়, শিক্ষায় মেরুদণ্ডহীন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার এই রাজ্যে যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য পুঁজি বরাদ্দের পরিমাণ অনেকটা পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে। পুঁজি খাতে বরাদ্দ বাড়াইলেও বার্ষিক ব্যয়খাতে যদি আনুপাতিক বৃদ্ধি সাধন না করা হয়, তাহা হইলে উন্নয়ন যেটুকু হইবে তাহা হইতে সামান্য ফল লাভ মাত্রই হওয়া সম্ভব।

বাংলা দেশের বর্তমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামোটিরই আমূল পরিবর্তন যে একান্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধেও যেন আমাদের শাসনকর্তারা মোটেই সচেতন নহেন মনে হইতেছে। শিক্ষাধিকরণের মধ্যে নানা দলাদলি ও অন্যান্য গোলযোগ ও অব্যবস্থার কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি। এ বিষয়ে আশু অনুসন্ধান প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য বিভাগেও নানা গোলযোগের কথা শুনিতে পাই। স্থানাভাববশতঃ এ-সকল জরুরী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এবার সম্ভব হইল না। বারান্তরে তাহা করা যাইবে।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ক্ষ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ মৃত্যু ঃ ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

বিভিন্ন বয়সে কেদারনাথ
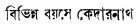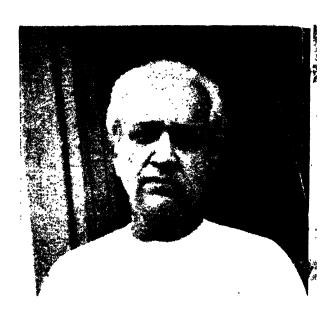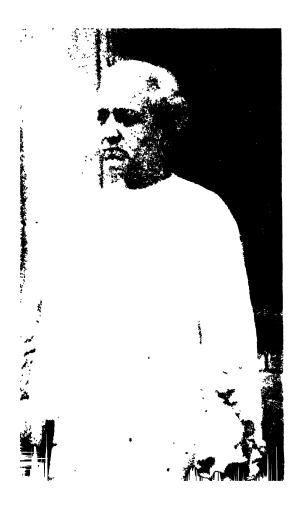
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যু-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। বয়স হইলেও, তাঁহার স্বাস্থ্য দেখিয়া তিনি যে এমনভাবে চলিয়া যাইবেন ভাবি নাই। এরূপ আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুতও ছিলাম না।

গত ১৬ই মে রাত্রি ৯-২৫ মিনিটে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

কেদারনাথ ১২৯৮ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষদের অনেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিজস্ব চতুষ্পাঠীও ছিল। কেদারনাথ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা, প্রখ্যাত সাংবাদিক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলে কেদারনাথ প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতায় আসিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ হইতে বি.এস-সি ও এ-আর সি-এস ডিগ্রী লাভ করেন। লণ্ডনে থাকিবার কালে স্বনামখ্যাত সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

১৯১৪-১৮ সালে কেদারনাথ কেন্টের একটি অস্ত্র-উৎপাদন কারখানায় কাজ করেন। সেই সময় একটি বিস্ফোরণের ফলে তিনি আহত হন। দীর্ঘ সাত বছর বিলাত-প্রবাসের পর তিনি ১৯১৯ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া তিনি কয়েকটি গ্লাস ও সিরামিক কারখানার সহিত যুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুর সম্পাদক হন।

কেদারনাথ খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াও, তিনি আমরণ খদ্দর পরিধান করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার নির্ভীক সমালোচনা প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও মডার্ণ রিভিয়্যুর সম্পাদকীয়, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ছিল।

সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার স্বীকৃতি আজ সর্ব্বজনবিদিত। কেদারনাথকে শুধু সাংবাদিক বলিলেই ভুল হইবে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। জৈন-বৌদ্ধযুগ হইতে প্রাচীন ভারতে কিরূপ অলঙ্কারের প্রচলন ছিল এবং কিভাবে তাঁহারা সেগুলি ব্যবহার করিতেন—তাহার সচিত্র বিবরণ এই সকল প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মিনা ও মিনকারী', 'দারু-শিল্প',

'গজদন্ত-শিল্প', 'কলা-শিল্প', 'ভারতীয় চিত্রকলা ও কাষ্ঠ-খোদন পদ্ধতি', 'ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা', 'ঢাকাই মসলিন' প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে বক্তৃতাও দিয়াছেন।

প্রাচীন রাজপুত-চিত্র সংগ্রহ করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পৃথিবীর বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এবং যেখানে যাহা দেখিয়াছেন, শিল্পীর চোখে দেখিয়াছেন। 'লেপ চিত্রাঙ্কণ' তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বিভিন্ন দেশের প্রাচীর-গাত্রে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি লইয়া এই প্রবন্ধটি রচিত। ইহার অনুরূপ প্রবন্ধ 'প্রতিসন্ধি-চিত্রণ'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হইয়া তিনি পারস্য গিয়াছিলেন। এই 'পারস্য-ভ্রমণ' প্রবন্ধটি প্রবাসীর পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়া পরে বই আকারে বাহির হয়। ভূতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি দেখিলে তাঁহার ঐ বিষয়েও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "ভারতে রত্ন আদি খনিজ" প্রবন্ধটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইহারই অনুরূপ তাঁহার অনেকগুলি লেখা প্রবাসীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, 'অভ্র', 'দর্পণের কথা', 'কাচ', 'এসবেষ্টস্ বা মৃৎকার্পাস', প্রভৃতি।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের "নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" বইখানির তিনি অনুবাদ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে বাহির করেন। পরে ইহা বই আকারে প্রকাশিত হয়।

গত মহযুদ্ধের সময় তিনি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা লইয়া বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। যেমন, 'এরোপ্লেন-বিনাশী কামান', 'পোল্যাণ্ডের সমরসজ্জা', 'প্যালেসটাইন', 'তুরস্কের অভ্যুদয়', 'বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা', 'আধুনিক ইন্দোচীন', 'বলকানে রোম-বালিনের নূতন সহযোগীদ্বয়', 'কম্বোজের পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ললিতকলা', 'রুষের সমস্যা', 'চীন ও রুষরাষ্ট্র', 'রুষের অগ্নিপরীক্ষা', 'সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধ ও প্রাচ্যে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান', 'বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি' প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও 'ভারত' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

কেদারনাথ হালকা রসের গল্পও লিখিয়াছেন। কিশোর-সাহিত্য লিখিবার হাতও তাঁহার ছিল। বহু লেখ তিনি 'মৌচাকে' লিখিয়াছেন।

ব্যক্তি হিসাবেও তিনি ছিলেন সদালাপী এবং বন্ধু-বৎসল। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সেই অগণিত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আজ তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।
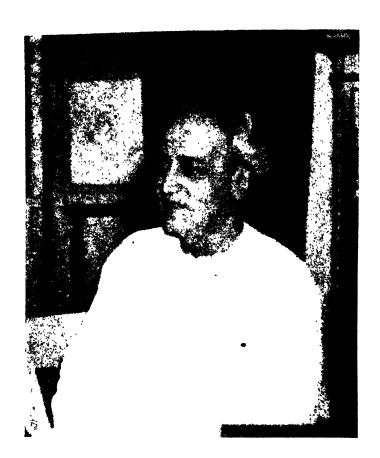
বিভিন্ন বয়সে কেদারনাথ

সপত্নী কেদারনাথ এবং দুই দৌহিত্র

প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইবার পর অকস্মাৎ তিনি পরলোক গমন করেন। সেই কারণে এই স্মারক ক্রোড়পত্রটি এই সংখ্যার সহিত সংযুক্ত করা হইল।
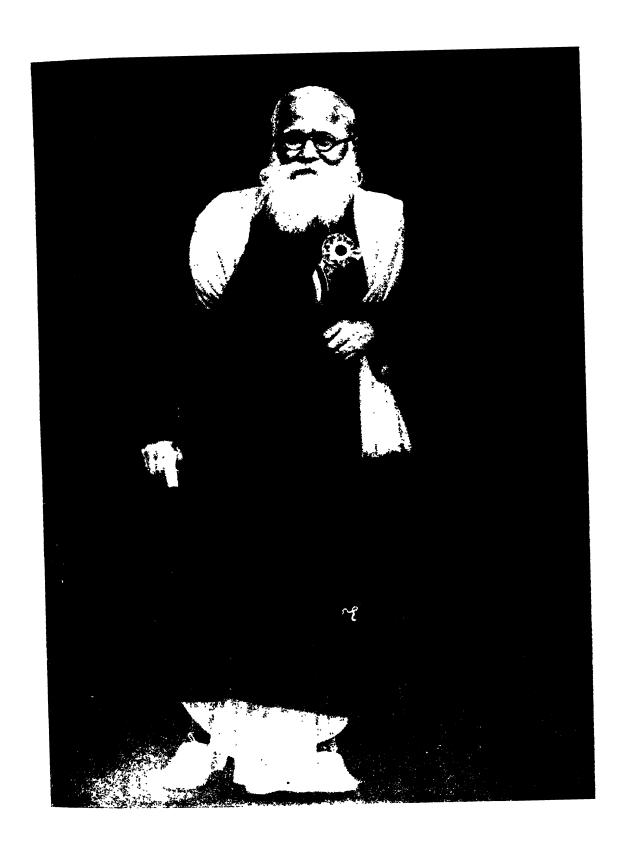
৬৫শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭২

তৃতীয় সংখ্যা

রামানন্দ

মানব-প্রেম ও মানব-সেবার মধ্যে রহিয়াছে রামানন্দের জীবন-দর্শন। ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি এই দুইটি আদর্শকে রূপদান করিয়াছেন। তাঁহার সকল কর্ম্ম, চিন্তা, সাধনার মূলে আছে এই আদর্শ।

সিটি কলেজে অধ্যাপনা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের অঙ্গীভূত বিবিধ কার্য্য রামানন্দের ত্যাগ ও সেবার আশ্চর্য্য নিদর্শন। প্রতিটি কার্য্যে তাঁহার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সবিশেষ লক্ষণীয়। 'দাসাশ্রম' রামানন্দের ত্যাগ ও সেবাব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ধর্ম্মবন্ধু' ও 'দাসী' সম্পাদনার মধ্যে রামানন্দের সেবাব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

রামানন্দ শৌর্য্য বীর্য্যের পূজারী। 'প্রদীপ'-এর মাধ্যমে তিনি বাঙালী জাতির সম্মুখে সেই আদর্শ রাখিলেন।

রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে যে সক্ষম হইবে তাহাও তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। রামানন্দের মতে আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে বাঙালী বা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় শিল্প—স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য-চিত্রকলার গুরুত্ব সম্বন্ধে রামানন্দই সর্ব্বপ্রথম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

রামানন্দ স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি চাহিতেন। রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সাহিত্য শিল্পকলা সবদিকেই আমাদের সমতালে অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চাই। স্বদেশের কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবন এবং শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য তৈরীর ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। বিজ্ঞান অনুশীলনের এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্র হইবে ভারতবর্ষ। একদিকে যেমন ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলন, অন্যদিকে তেমনি শরীরচর্চ্চা—ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য-সমষ্টির দেহ-মন সবল সুস্থ কষ্ট-সহিষ্ণু শ্রম-তৎপর করিয়া তুলিতে হইবে। রামানন্দ স্বদেশের এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন প্রবাসীর মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই রামানন্দ ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনার বিবিধ সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। স্বদেশীয় শিল্প শুধু নয়, স্বদেশীয় বিজ্ঞান, স্বদেশীয় চিত্রকলা স্বদেশীয় সাহিত্য সমুদয়কেই স্বদেশী-ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসায় বিশ্বাসী। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের একযুগ পূর্ব্বেই তিনি নিজ পত্রিকায় এই কথা প্রকাশ করেন।

রামানন্দ পত্রিকার মাধ্যমে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ভারতীয় নব্য চিত্রকলার বহুল প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার অনন্যতুল্য পরিশ্রম এবং ত্যাগ-স্বীকার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙালীদের কৃতিত্ব প্রচারেও রামানন্দের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা তাঁহার দ্বারাই প্রচারিত হয়।

রামানন্দ পরিচালিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিউ' জাতির বিভিন্ন স্বাধীনতা প্রচেষ্টা এবং সর্ব্ববিধ প্রগতিমূলক প্রযত্নের অপূর্ব্ব আকর। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর জাতীয় ইতিহাসের মূল সূত্রগুলি ইহাতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন লোক-শিক্ষক, জনপ্রিয়তা অপেক্ষা জনমত নিয়ন্ত্রণকেই তিনি সাংবাদিকের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

বাল্য জীবন ও শিক্ষা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২৭২ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া শহরে পাঠক পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত বংশ। পিতৃপুরুষদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাহারও কাহারও নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল।

পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। বাকুড়ায় দুই রকম স্কুল ছিল। বাংলা স্কুল ও ইংরেজী স্কুল। বাংলা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ান হইত। শিক্ষার বাহন ছিল বাংলা। ছাত্রাবস্থায় রামানন্দ বড় কবিতার অনুরাগী ছিলেন। অনেক কবিতাই তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায়" প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতেই তাঁহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

বাল্যে ও কৈশোরে রামানন্দ বিদ্যানুশীলনে যেমন অনুরাগী ছিলেন, তেমনি শরীর-চর্চার প্রতিও তাঁহার যত্ন ছিল। খেলাধুলা ছাড়া ঘরে বসিয়াও বিবিধ রকমের পরিশ্রম করিতেন। পৌঢ়ত্বে পা দিয়াও তিনি এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, এলাহাবাদে অধ্যক্ষতাকালেও তিনি রীতিমত ডাম্বেল ভাঁজিতেন। এই জন্যই কঠোর পরিশ্রমকে তিনি কখনও ভয় করেন নাই। কাব্য ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেন। এই দেশাত্মবোধ তাঁহার শৈশব হইতেই জন্মে। তাঁহার চরিত্রের এইটিই বড় দিক।

দেশকে যে তিনি কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা এই নীচের ক'টি লাইন হইতেই বুঝা যায় :

"আমি অনেক ধনশালী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া যে সুখ পাই নাই, অনেক বালিকা-গৃহিণীর ধূলি-নির্ম্মিত ক্রীড়াভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া, তিন্তিড়ীপত্ররূপী চিপিটক ভোজনের অভিনয় ও আহারান্তে তুলসীপত্রের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যে বালক রাত্রিকালে যাত্রা শ্রবণান্তর পর-দিবস রাম সাজিয়া "রে দুর্ব্বৃত্ত দশানন" বলিয়া রাবণের উদ্দেশে বক্তৃতা না করিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বালক নামে অভিহিত করিব?

আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এরূপ খালকে আমাদের জেলায় "জোড" বলে। একদিন আমার ও আমার তিনজন সঙ্গীর ইচ্ছা হইল, এই জোড়টির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে হইবে। এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংবাদ শুনিতে পাইলে ষ্ট্যান্‌লী সাহেব ভয় পাইতেন কি না জানি না। যাহাই হউক, আমরা চারিজন জোড়ের তীর দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে সামান্য পয়ঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। অনতিদূরে কয়েক-স্থান মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্গুলি পরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে। সেখানে তিনটি ছোট বাব্‌লা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? যে সুবৃহৎ স্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্দ্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আমরা স্ব স্ব নামের আদ্য অক্ষর সংযোজিত করিয়া জোড়টির নাম রাখিলাম "কারাপরা।" হায়, কারাপরা, অপরের কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের কারণ হইতে পার, কিন্তু আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি আমার সোনার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়া দিলে। তোমার সেতুর পার্শ্বে তৃণ-শয্যায় শুইয়া কত সুখস্বপ্নই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহ্নে তোমার সেতুর পার্শ্বে শুইয়া তোমার ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের কুলকুল ধ্বনি শুনিতেছিলাম। দুই দিকে দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত্র। বায়ুভরে ধানের গাছগুলি এক একবার শুইয়া পড়িতেছিল, আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সমীরণ ধান্যরাজি হইতে সুস্নিগ্ধ অতি মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ আনিয়া দিতেছিল—নাগরিকগণ নগরে থাকিয়া যতই অর্থব্যয় করুন না কেন,

এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র জনপদবর্গেরই উপভোগ্য। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইলেন। পশ্চিমাকাশ যেন গতাসু সূর্য্যের চিতানল-শিখা দ্বারাই লোহিতাভ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই শোভা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইল। ধূসরবাসা সন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পশ্চিম গগনে শুক্রতারা তাঁহারই ললাটে সিন্দুর বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ব্রীড়ান্বিতা কিশোরীর ন্যায় মৃদুগীতি গাহিতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগমে যেন সে হঠাৎ মুখরা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখরতা কেমন মর্ম্মস্পর্শিনী!…গ্রামের অদূরবর্ত্তী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার এক কবি-বন্ধুর সহিত প্রাতে উহার মধ্যে একটি বনে বেড়াইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্জ্বল শ্যামলশ্রী চক্ষুর পরিতৃপ্তি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন যে বৃষ্টির পরও কর্দ্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম। স্থানটি এমনই পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথি-সৎকারের জন্য উহা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থান-মাহাত্ম্য বশতঃ আমরা উভয়েই নির্ব্বাক ও আত্মহারা হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব গভীর শান্তিরসের আস্বাদন করিতেছিলাম; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলাম, সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখাপত্ররাজি আন্দোলিত করিয়া চালিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রার্পিত-প্রায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল। আমার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহস্র অঙ্গুলির সঙ্কেত সহকারে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি ব্যপদেশে তাঁহার মানব অতিথি দুইজনকে "স্বাগত" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের দুইজনের একবার ঐ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ আনন্দ সকল দিনে সম্ভোগ্য নয়; সর্ব্বদা সুলভও নয়। পূর্ব্ব দিবসের আমোদ কি সকল দিন পাওয়া যায়?…বাল্যসহচরী ক্ষুদ্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সাধে কি আত্মহারা হই? অপরের নিকট আমি সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য "বাবু" পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি; অপরে আমার সহিত ভদ্রতা করে; তাহারা আদর করিলে মনে হয়, বুঝি বা ইহার ভিতর কত অনাদর লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মভূমিতে আমি নগ্নদেহে অসভ্য অবস্থায় বিচরণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহে শরীর মন পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার নিকট আমার দেহ-মনের কোন সংবাদ অজ্ঞানা নাই, যাঁহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেহের সহিত কোলে নেন, এমন আর কে পারে? তাঁহার নিকট আমি যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাঁহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এত মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?"

(দাসী, মে, ১৮৯৫। পৃষ্ঠা: ২৬৭—৭১)

কলেজ জীবন

কলেজে পড়িবার জন্য রামানন্দ যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন, তখন নব জাতীয়তার আলোড়নে কলিকাতা মুখরিত। প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ব্বদিকে ট্রাম-লাইনের অপর পারে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন একটি গ্যালারি সমন্বিত পৃথক ঘর ছিল। (দুঃখের বিষয় এখন তার অস্তিত্ব নাই—পরিবর্ত্তে একটি বিরাট্ বাড়ী উঠিয়াছে)। সেই ঘরে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন, কবিবর মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে ছাত্রাবস্থায় পড়াইতেন। পরবর্ত্তীকালে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভার সাধারণ অধিবেশন এই ঘরের ভিতরেই হইত, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশপ্রেমের যুগান্তকারী বক্তৃতা করিতেন। রামানন্দ কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর এই সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাদি হইতে নূতন করিয়া স্বদেশপ্রেমের পাঠ লইতে লাগিলেন। রামানন্দ লিখিয়াছেন: "আমরা যখন কলিকাতায় পড়তে আসি তখন 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' নামক একটি সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ নেতা ছিলেন। এই সভার অধিবেশন

হিন্দু স্কুলের একটি ঘরে হতে দেখেছি। সেই কক্ষে গ্যালারী ছিল। কত যুবক সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।"

(রামানন্দ, পৃঃ ১৬)

এইরূপ অনুপ্রাণনার কথা রামানন্দ পরবর্ত্তীকালেও অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন : "বয়ঃকনিষ্ঠ আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার দাবী ও আশা যে তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথ) চেয়ে বেশী হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ তিনি জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ না করিলে, একজাতীয়তার আদর্শ সমগ্র দেশে, সকলের মনে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা না করিলে, আমাদের আকাজ্ঞা দাবী ও আশা আদর্শ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত না।"

(রামানন্দ, পৃঃ ১৬)

বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে তিনি সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলন-অনুষ্ঠানের সঙ্গেও যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। স্বদেশের কাজে যেখান হইতেই ডাক আসিত, যেখানেই সমাজহিতকর কার্য্যাদির সন্ধান পাইতেন সেখানেই রামানন্দ উপস্থিত হইতেন, কখনও নিজে সেবাকার্য্যে লাগিয়া যাইতেন। দেশভক্ত রামানন্দ ১৮৮৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

বাঁকুড়া স্কুলে পড়িবার সময় তিনি কুলভী মহাশয়ের উপদেশ শুনিয়া অন্যান্য বিষয়ের মত ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেরও অনুরাগী হইয়া উঠেন। ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, সমাজ-সেবা এই তিনটি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য। বি. এ. পড়িবার সময় রামানন্দ ব্রাহ্মনেতাদের সংস্পর্শে আসেন। সিটি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের পরেই আনন্দমোহন বসু এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে ছাত্র-সমাজ গঠন করেন। প্রায় এই সময় রামানন্দ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আনন্দমোহন বসুর আত্মীয়। পরে রামানন্দ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। শিবনাথের কঠোর শ্রমশক্তি দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উহা তাঁহার মধ্যেও ধীরে ধীরে অনুক্রামিত হইতেছিল এবং পরে তাঁহার প্রভাবেই রামানন্দ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

রামানন্দ যখন সিটি কলেজে তখন স্বাভাবিক ভাবেই অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক মৈত্র নূতন ছাত্র রামানন্দের একটি রচনা দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হন। রামানন্দও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং গভীর মননশীলতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামানন্দ লিখিয়াছেন : "আমি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমাকে অবস্থাচক্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে পড়িতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুটি কলেজে বাঙালী, ইংরেজ, এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইংরেজ নহেন এরূপ ইউরোপীয় কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যাধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের সকলের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, গভীর ভাব ও চিন্তার ব্যাখ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কোনও অধ্যাপকের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি সুনীতির কঠোর ও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। প্রকৃতিতে মানুষে এবং মানুষের রচিত ও সৃষ্ট সমুদয় বস্তুতে, সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে সৌন্দর্য্যের তিনি চির অনুরাগী ও রসগ্রাহী ছিলেন।"

(প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃঃ ৭৪২)

অধ্যাপনায় রামানন্দ

১৮৮৮ সনে রামানন্দ বি. এ. পরীক্ষা দিলেন। অনার্স পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি সিটি কলেজ হইতে মাসিক চল্লিশ টাকার 'রিপণ বৃত্তি' পাইলেন। অধ্যাপক মৈত্র খুব খুশি হইলেন। তাঁহার একজন সহকারীর প্রয়োজন ছিল। তিনি রামানন্দকেই এইরূপ সহকারী করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট। স্থির হয় যে রামানন্দকে অবেতনে সহকারীর কাজ করিতে হইবে। পূর্ব্বে কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া চলিত। রামানন্দ স্থির করিয়া ফেলেন যে, সিটি কলেজ হইতেই এম. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন। অধ্যাপক মৈত্র তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজী মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এর সম্পাদক। তাঁহার অনুরোধে রামানন্দ এই পত্রিকাখানির সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদটিও ছিল অবৈতনিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে এইখান হইতেই রামানন্দের সাংবাদিক জীবন আরম্ভ। ইহার পর হইতে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন কাগজে লিখিতে সুরু করেন।

অধ্যাপনার প্রস্তুতি বাদে রামানন্দ এই সকল পত্র-পত্রিকার জন্য ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মন্তব্যাদি লেখায় ব্যস্ত থাকিতেন। শুধু তাই নয়, 'মেসেঞ্জার'-এ প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত রচনাদি তাঁহাকে সংশোধন করিতে হইত। সম্পাদক হেরম্বচন্দ্রকে সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপকরণাদিও তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তা ছাড়া, অপরের প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও সংশোধন ব্যতিরেকে রামানন্দকে প্রুফ সংশোধনও করিয়া দিতে হইত। প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হইতে হইলে যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া চলিতে হয়, রামানন্দ এই সময় তাহার প্রতিটিই অনুশীলন করিবার সুযোগ পান।

রামানন্দ ১৮৯০ ফেব্রুয়ারী মাসে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন।

রামানন্দ পত্র-পত্রিকার সেবার সঙ্গে সঙ্গে নানা জনহিতকর কার্য্যেও লিপ্ত হইয়া পড়েন এই সময়। নারী-সমাজের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বিধবাদের দুর্দ্দশা বিমোচন, পতিতা নারীর উদ্ধার, আতুর ও অনাথের সেবা, কৃষক শ্রমজীবী তথা সাধারণ মানুষের আর্থিক ও নৈতিক মান উন্নয়ন, চা-বাগানের নিপীড়িত কুলিদের দুর্গতি লাঘব, মাদক দ্রব্য—অহিফেন ও সুরার বিলোপ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হইয়া কাজে নামিলেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় প্রগতির দিকেও তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শে রামানন্দ অনেকেরই ন্যায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

ব্রাড্‌ল প্রস্তাবিত ভারত শাসন ব্যবস্থার সংস্কার-কল্পে যে খসড়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়, তাহার সমর্থনে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে। রামানন্দ নিজ জন্মভূমি বাঁকুড়া শহরে একটি সাধারণ সভা করিয়া উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বিলাতের পার্লামেণ্টে চারি শতাধিক লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত একখানি আবেদন-পত্র ১৮৯০ সনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের কোন কোন অধিবেশনে এই সময় হইতেই সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯০ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। এবারে সভাপতি হন ফিরোজ শা মেহতা।

সেবাব্রতী রামানন্দ

সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রামানন্দ তিনটি বিশেষ কাজে হাত দেন। যেমন, 'ধর্ম্মবন্ধু' সম্পাদনা, 'দাসাশ্রম' পরিচালনা এবং ইহার মুখপত্র 'দাসী' সম্পাদনা। 'দাসাশ্রম' একটি সেবালয়। দুঃস্থ নর-নারীদের আশ্রয় দান এবং রোগীদের সেবাই হইল ইহার প্রধান কাজ। তিনি সেবা করিতে ভয় পান নাই। দেওঘরে একটি কুষ্ঠরোগীদের কুষ্ঠাশ্রমও খুলিয়াছিলেন। মানিকতলা ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া এই দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় (২৭শে জুন, ১৮৯১)। নিঃসম্বল রোগীদের এবং রাস্তা হইতে কুড়ান ব্যাধিগ্রস্ত আতুরদের আশ্রয়স্থল হইল এই দাসাশ্রম। কর্ম্মীরা নিজেদের দাস ও দাসী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই দাসাশ্রমের অধীনে মফঃস্বলে ৭।৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। রামানন্দ কখন কখন নিজ বেতনের মোটা অংশ দাসাশ্রমের জন্য দান করিতেন। রামানন্দ চরিত্রের ইহাও আর একটা দিক।

এই দাসাশ্রম হইতেই তাহার প্রচার উদ্দেশ্যে 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেবাকে রামানন্দ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকেই তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। 'দাসী'-র প্রথম প্রকাশের প্রস্তাবনাতেই তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। প্রস্তাবনাটি এই :

"বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের এতাদৃশ দুষ্কর কার্য্যের অনুরূপ শক্তি নাই। আমরা বিশ্ব-সেবাব্রত ধারণের উপযুক্ত নই। কিন্তু সংসারে কেহই অলসভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হন নাই। যাঁহার যতটুকু শক্তি তিনি ততটুকুই জীবের সেবায় নিয়োজিত করিবেন, ইহাই ভগবানের আদেশ। পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যা-সমাগমে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইবামাত্র অন্ধকার বিদূরিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তারকাগণ চন্দ্রালোকে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেও, নিজ নিজ ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিতে ক্ষান্ত হয় না। জগতের অতি নিকৃষ্ট জীবও বৃথা জীবন ধারণ করে না। তাহার দ্বারাও সংসারের হিত সাধিত হয়। উচ্চাভিলাষ বা যশোলিপ্সা প্রণোদিত হইয়া আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। কেবল এই ভরসায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি যে, যদি ভগবানের কৃপা থাকে, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে।

বর্তমানে বঙ্গদেশকে দুঃখের জলধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশে দুর্ভিক্ষ ত লাগিয়াই আছে। অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারীর জন্য, ক্ষুধিত-সন্তান-পরিবেষ্টিতা অসহায়া জননীর জন্য, কাহার প্রাণ না কাঁদে? এই বর্ষার দিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যখন প্রকৃতির মুখ বিষাদগম্ভীর হইয়া উঠে, তখন কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণে শত শত নিরাশ্রয় নরনারীর বিষাদের ছায়া পতিত না হয়? ইহার উপর আবার জ্বর, বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতির উপদ্রবে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত। অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার অভাবে কোন কোন গ্রাম অধিবাসীশূন্য হইয়া পড়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ষে বর্ষে 'জল! জল!' এই যে তৃষ্ণার্ত্তের আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, ইহার কি আর বিরাম হইবে না? দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং জল-কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে

দুঃখের অভাব নাই। দরিদ্রা বহু-সন্তানবতী বিধবা জননীর ক্লেশ, অর্থহীন বিদ্যার্থীর মনোবেদনা, দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির নৈরাশ্য ও রোগযন্ত্রণা, মহা-নগরীতে অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা, প্রভৃতি—অস্মদ্দেশে এই সকলের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাহার পর, সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের নৈতিক অধোগতির কারণ পানদোষ এবং ব্যভিচারের নিয়ত-প্রবহমান স্রোতে কত নরনারীর, কত পরিবারের সুখশান্তি ভাসিয়া যাইতেছে, ইহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোন সরল-প্রাণা রমণীর একবার পদস্খলন হইলে, কে তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে? কে তাহাকে অনন্ত করুণাময়ী বিশ্ব-জননীর অপার দয়ার কথা বলে? সে ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে।

দুঃখময় বঙ্গদেশে সেবা কথাটি নূতন নহে। অপর দেশের কথা জানি না, কিন্তু মনে হয় বুঝি বা বঙ্গ-কুল-ললনাগণ বিশেষতঃ বঙ্গবিধবাগণ অপেক্ষা করুণাময়ী সেবাপরায়ণা রমণী জগতে আর নাই। নানা কারণে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের অনেকেরই জীবনে সেবাব্রত-মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গ-দেশের নরনারীগণ এই সেবাপরায়ণা মহিলাগণেরই ত পুত্র-কন্যা ভ্রাতা-ভগিনী? তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে দুঃখ দারিদ্র্যের চিত্র প্রসারিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। নতুবা 'দাসী'র এমন কি শক্তি আছে যে উল্লিখিত দুঃখরাশি অপসারিত করে? 'দাসী' কেবল সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে, সংসারে দুঃখীর অভাব নাই, দয়াবৃত্তি পরিচালনের যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সুযোগ আছে। 'দাসী' নিজ শক্তি অনুসারে মানব-সেবা-ব্রতে নিযুক্ত থাকিবে। সকলকে দুঃখীর জন্য অন্ততঃ অশ্রুপাত করিয়াও ব্রত পালন করিতে বলিবে। বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে। বিলাসী সুখশয্যায় শয়ন করিয়া মোহাবেশে নিজ প্রতিবেশীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান না। ভগবান 'দাসী'র মস্তকে কৃপাবারি বর্ষণ করুন। 'দাসী' যেন এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হয়।"

(দাসী, আষাঢ় ১২৯৯)

সম্পাদক রামানন্দ সমাজ-কল্যাণকর বিবিধ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তা করিতেন তাহার ছাপ পড়ে তদীয় নানা রচনার মধ্যে। 'ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা', 'অন্ধের বিদ্যা-শিক্ষা' এবং 'প্রাদেশিক কথিত বাংলা' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্ধশিক্ষার পশ্চিমী ব্রেল-পদ্ধতিকে (Brail-System) ভিত্তি করিয়া স্থানীয় ভাষার উপযোগী সংস্কার সাধন এবং এ দেশে অন্ধ-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা সেবাব্রতী রামানন্দের মনে প্রথম উদিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আঞ্চলিক শব্দসম্ভার সংগ্রহের যে আয়োজন করেন, এবং উহার সূত্র ধরিয়া সুপণ্ডিত যোগেশ-চন্দ্র রায় পরে যে অভিধান সংকলনে প্রবৃত্ত হন, তাহার মূলে রহিয়াছে রামানন্দের এই দূরদর্শী প্রস্তাব।

শিক্ষা-সংস্কারে রামানন্দ

রামানন্দ ১৮৯৫ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সপরিবারে এলাহাবাদে যান এবং কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। কায়স্থ পাঠশালাকে একটি আদর্শ বিদ্যায়তনে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন। পাঠাগার সম্প্রসারণ, লেবরেটরী পুনর্গঠন ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতির দ্বারা ইহাকে সমৃদ্ধ করা, খেলাধূলার যথোচিত ব্যবস্থা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে ছাত্রদের লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কার্যো হস্তক্ষেপ করেন। বাস্তবিক, শিক্ষার ব্যাপক উন্নতির জন্য রামানন্দ সে সময় যাহা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে আজ শ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসে। শিক্ষা বিষয়ে আজ যে সুবিধাগুলি সহজপ্রাপা হইয়াছে, তাহার মূলে রামানন্দের যে কিরূপ প্রচেষ্টা ছিল, তাহা কয়েকটি ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। শিক্ষাবিদ্ রামানন্দ দেখিলেন, উচ্চতর শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন বাধাগুলি আশু নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। ঐ সময় ছাত্রগণকে সপ্তম, পঞ্চম ও তৃতীয় শ্রেণীতে সরকারী শিক্ষা-বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে হইত। এই সকল বেড়া ডিঙ্গাইতে পারিলে তবে তাহারা প্রবেশিকার মান পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিত। শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে এগুলি ছিল মস্ত বড় বাধা। লক্ষ্ণৌয়ের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'এডভোকেট' পত্রিকায় রামানন্দ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই আন্দোলনের ফলে সমস্ত বাধা অপসারিত হইল এবং শিক্ষার্থীদিগের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত পথ সরল ও সুগম হইল।

পূর্ব্বের গঠন-পাঠন সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন :

"চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ বিচার, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বই পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কখনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মুখ দেখি নাই। অন্যান্য বহির মত বৈজ্ঞানিক বহিও মুখস্থ করিতাম, এবং কল্পনার সাহায্যে যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও শিশুদিগকে উদ্ভিদবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। আমরা পল্লীগ্রামতুল্য মফঃস্বলের ছোট সহরে পড়িতাম। সেখানে অনায়াসে আমাদের পাঠ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের "উদ্ভিদ বিচারে" উল্লিখিত উদ্ভিদ লতা পাতা ফল ফুল মূল সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে কোনদিন একটিও গাছগাছড়া সংগ্রহ করিতে বা দেখিয়া আসিতে বলেন নাই, নিজে যে কখন আমাদিগকে দেখাইবার জন্য সংগ্রহ করেন নাই, কিংবা স্কুলের ভৃত্যকে সংগ্রহ করিতে বলেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বরং শৈশবসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দু-একটা উদ্ভিদ খুঁজিয়া বাহির করিতাম। অন্যান্য বিষয় পড়াইবার সময় যেমন করিতেন, উদ্ভিদ বিচারের ঘণ্টাতেও তেমনি পণ্ডিত মহাশয় চটি-জুতা হইতে পা দুখানি বাহির করিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিতেন, এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মূল কাহাকে বলে ?' আমরা অমনি মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'উদ্ভিদের যে অংশটি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, যাহার বলে উদ্ভিদ মৃত্তিকার উপর সোজা থাকে, এবং যদ্দারা মৃত্তিকার রস শরীরস্থ করিয়া উদ্ভিদ জীবিত থাকে, তাহাকে মূল কহে।' তখন পণ্ডিত মহাশয় হয়ত আবার প্রশ্ন করিতেন, 'মূলের এই সংজ্ঞায় কি কি দোষ আছে ?' তখন আমরা আবার গ্রামোফোনের মত বলিতাম, 'মূলের উক্ত প্রকার নির্ব্বাচন করিলে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি লক্ষিত হয়। যথা :—গিরিগুহা বা গৃহাদির উপরিভাগ হইতে লম্বমান উদ্ভিদের মূল অধোধাবিত না হইয়া উর্দ্ধে উঠে। এতদ্ভিন্ন বায়ব্য এবং জলীয় উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত নামিতে না পারে (এরূপ সচরাচরই ঘটিয়া থাকে), সুতরাং সে স্থলে উক্ত উদ্ভিদ্ পোষণ সামগ্রী মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ করে না।'

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এইরূপ চমৎকার প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। গত চল্লিশ বৎসরের

মধ্যে পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই ৪০ বৎসরে জাপান "সেকেলে" অবস্থা হইতে আধুনিকতম জাতিদের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন যে স্থিতিশীল দেশ চীন, তাহাও ঘুম ভাঙ্গিবার পর চোখ রগড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘর গুছাইয়া নিজের বিষয় কর্ম্মে মন দিয়াছে। কিন্তু আমাদের বাংলা স্কুলগুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বাংলা স্কুলগুলির কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, দেশের অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা বাংলা স্কুল পাঠশালাতেই হয়: কলেজে পড়িবার সুযোগ কয়জনের হয়? অতএব শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে ঐ পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয়ে খুব অল্প বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে।"

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২২। পৃঃ ৫৪৭

আজ এই প্রদেশে শিক্ষার বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে। ইহার মূলে রামানন্দের পরিশ্রম ও চেষ্টা যে কতটা ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

শুধু শিক্ষার প্রসারের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে তিনি ছেলেদেরকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। (যাহা আজও চালু আছে)। চোখে দেখার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি এবং শিক্ষার পক্ষে তাহা কতটা কার্য্যকরী তাঁহার লিখিত "ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা" প্রবন্ধে দেখিতে পাই। তিনি লিখিলেন:

"ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা—ভারতবর্ষের অনেক নগর, অনেক দৃশ্য, প্রাচীন কবিত্বের স্মৃতি-বিজড়িত, প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নানাজাতীয় পর্য্যটকগণ ভারতভূমি দর্শনার্থ এখানে আসিতেন। এখনও দেশ বিদেশ হইতে কত লোক ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসকল দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। অথচ আমরা সেই দেশে, সেই সকল স্থান ও সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে বাস করিয়া তাহার কোন সংবাদই রাখি না। ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ও ভারতের অতীত ইতিহাসের জীবন্ত ছবিস্বরূপ অনেক দৃশ্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ আমরা তৎসমুদয় দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করি না। আমাদের দেশের সাধারণ নিরক্ষর লোকেরা ত ইতিহাস জানে না, ইতিহাস পাঠ করে না। কিন্তু যাঁহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহাদের নিকটও উহা কতকগুলি নীরস নাম এবং তারিখের তালিকা মাত্র। অথচ আমাদের হাতের কাছে এমন সকল উপকরণ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষা উপন্যাস পাঠ অপেক্ষাও প্রীতিকর হইতে পারে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই জীবনকে কবিত্ব-ময় এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ করিতে পারে।

ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। ইহাতে অসংখ্য সাধু মহাত্মা, অসংখ্য ধর্ম্মবীর; অসংখ্য স্বদেশপ্রেমিকের নশ্বর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করিলে জীবনের গৌরব বৃদ্ধি হয়, আত্মার মূল্য বাড়িয়া যায়। দেশের দারিদ্র্যের কথা উঠিলেই সকলে বলেন:—"ভারতের এত খনিতে এত ধাতু আছে, ভারতের উর্ব্বরা ভূমিতে এত ফল শস্যাদি জন্মে; শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইলে এই সকলের দ্বারাই দেশের অভাব দূর হইতে পারে।" ধনোৎপাদনের উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার না হওয়ায় যেমন আমরা গরীব হইয়া রহিয়াছি, তেমনি অতীতসাক্ষী এই সকল স্থান ও দৃশ্যের সদ্ব্যবহার না হওয়ায় আত্মার অভাব দূর হইতেছে না। আমরা কেবল ধনের কাঙ্গাল নই; আমরা ধর্ম্মের কাঙ্গাল, কবিত্বের কাঙ্গাল, জ্ঞানের কাঙ্গাল, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের কাঙ্গাল।

পুরাকালে তীর্থ পর্য্যটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিত। বই পড়িতে না পারিলে কি হয়? দেখিয়া শুনিয়া লোকে অনেক শিখিত। এখনও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে তীর্থভ্রমণের রীতি হ্রাস পায় নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতি-নীতি, প্রাচীন কীর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া হৃদয় প্রশস্ত এবং স্বদেশপ্রেম বর্দ্ধিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে দেশভ্রমণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার নাম আর

তীর্থযাত্রা নাই, তাহার নাম বায়ু-পরিবর্ত্তন বা তদ্রূপ আর কিছু। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। বায়ু-পরিবর্ত্তন অথবা আমোদের জন্য দেশভ্রমণ নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তীর্থযাত্রার মধ্যে যে একটি উচ্চ এবং মহৎ ভাব নিহিত থাকে, ইহাতে তাহা নাই। দেখিবার জিনিস সেই একই, কিন্তু উভয়ে প্রভেদ আছে। তীর্থযাত্রার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঔৎসুক্য দেখা যায়, শুধু দেশভ্রমণে তাহা নাই। তবে এখন কর্ত্তব্য কি? পুনর্ব্বার তীর্থযাত্রার প্রথা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অনেকে বলিলেন, "আজ-কাল অনেকে আর দেব-দেবীর অস্তিত্বে, তীর্থাদির মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা কেন তীর্থভ্রমণ করিবেন?" ইহার উত্তর এই যে এরূপ লোকেরাও তীর্থভ্রমণ দ্বারা উপকৃত হইবেন। নানা দিক্ হইতে উপকার লাভের আশা আছে।

উড়িষ্যার দেবমন্দিরসকল ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জন্য নির্ম্মিত গিরিগুহাদি দেখিলে কে ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবে অবিশ্বাসী থাকিতে পারে? বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়িয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে, যে আমরা সৃষ্টিকালাবধি পরাধীন নিকৃষ্ট জাতি। এই সকল অতীতসাক্ষী কীর্ত্তিমালা অন্য কথা বলে। বুদ্ধ গয়ার বৌদ্ধ-মন্দির এবং বোধিদ্রুম দর্শন করিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। মনে হয়, কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইল, কিন্তু সেই যে এক রাজকুমার ধর্ম্মের জন্য, অক্ষয় শান্তির জন্য, সংসারে বিরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত থাকিয়া সংসারকে পবিত্র করিতেছে। মনে হয়, এই অধঃপতিত জাতির মধ্যেও পুরাকালে এরূপ এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কি স্বদেশে কি বিদেশে মানবের মনোরাজ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম আজিও কোটি কোটি মানবের সংসারক্লিষ্ট আঁধার হৃদয়ে আশার আলো আনিয়া দেয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, বুদ্ধ-গয়া সকলেরই তীর্থ-স্থান। ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ নৃপতি অশোকের প্রস্তর স্তম্ভ-সকল দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাঁহার অনুশাসনসকল খোদিত রহিয়াছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে জাতি, বর্ণ, এবং ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সমভাবে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পশুদিগের জন্যও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। অশোক তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা হইতে কেবল যে ইতিহাস শিক্ষা হয়, তাহা নয়; ধর্ম্মলাভ হয়; যুগযুগান্তের শত শত ঘটনা শত শত গম্ভীর দৃশ্য মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে প্রশান্ত-গম্ভীর কবিত্বরসে আপ্লুত করে। বহু-দূর যাইতে হয় না, এলাহাবাদের দুর্গের মধ্যেই একটি অশোক-স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিল্লী নগর এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষপূর্ণ ভূভাগ দর্শন করিলেই ভারতবর্ষের দুই সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। দিল্লী এবং আগ্রার সুন্দর সুন্দর প্রাসাদগুলি সম্রাট্‌গণের বিলাসিতার পরিণামের সাক্ষ্য দেয়। হায় মানব! মৃত্যুকালে তুমি তোমার জীর্ণ ভগ্ন কুটিরখানি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ কর; আর দিল্লী ও আগ্রার স্বপ্নপুরীবৎ প্রাসাদগুলি আজ জনশূন্য। সম্রাট্‌গণকে ইহাদেরও মায়া ছাড়িতে হইয়াছিল। ভরদ্বাজাশ্রম, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট প্রভৃতি দেখিলে কাহার হৃদয় ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির কথা ভুলিয়া অতীতের প্রিয় স্বপ্নগুলির মধ্যে বিচরণ না করে? অমৃতসরের গুরুদরবার দেখিয়া কি কিছু শিখিবার, কিছু অনুভব করিবার নাই। দিল্লীর চাঁদনি চৌকের নিকটে কোতোয়ালির সম্মুখে নবম শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বলেন, "তুমি যে গুরু তাহা কোন অলৌকিক কার্য্যদ্বারা প্রমাণ কর, নতুবা মুসলমান হও।" তিনি উভয়ের মধ্যে কোন প্রস্তাবেই সম্মত না হওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। শেষে অনেক অনুরোধ উপরোধে তিনি অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে সম্মত হইয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া তাহা গলদেশে ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্রের বলে আমি এক্ষণে তরবারির আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ।" তাঁহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য সম্রাটের আদেশে জল্লাদ তখনই তাঁহার গলদেশে তরবারি আঘাত করিল। তাঁহার

মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। সম্রাট কৌতূহলী হইয়া কাগজটি পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "শির দিয়া, সার নাহি দিয়া।" (মস্তক দিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্ম দি নাই)। এই কোতোয়ালির সম্মুখস্থ স্থান দর্শন করিলে নির্জ্জীব প্রাণেও তেজস্বিতার সঞ্চার হয়।

এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের উপরেই দুর্গ। তন্মধ্যে অক্ষয়বট, এবং অশোক স্তম্ভ। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ইতিহাসের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। নদীর অপর কূলে ঝুঁসী নামক মনোরম স্থান। কথিত আছে, তাহা পুরূরবা রাজার রাজধানী ছিল। নাম প্রতিষ্ঠানপুর। এক্ষণে তথায় কতকগুলি সন্ন্যাসী বাস করেন। বর্ষাকালে আতটব্যাপী নদীস্রোতের উপর জ্যোৎস্নালোক পড়িলে সে স্থানের দৃশ্য বড়ই রমণীয় হয়। তখন সন্ন্যাসীদিগের কক্ষগুলির পাদদেশে কল কল নাদে জল প্রবাহিত হয়। স্থানটি দেখিলে শান্তিময় প্রাচীন আশ্রমের কথা মনে হয় ভাবতে ঈদৃশ স্থান আরও কত আছে। ...পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যে প্রসিদ্ধ ঈদৃশ স্থান-সকল কি বৃথাই রহিয়াছে? নবযুগে নূতনবিধ তীর্থযাত্রা না করিলে আর এ সকলের মাহাত্ম্য আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না। তজ্জন্য আমরা কয়েকটি প্রস্তাব করিতেছি। (১) ছাত্রদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল কলেজ হইতে যাত্রীর দল গঠিত হউক। এই দল ছুটির সময় এক এক প্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেই সেই প্রদেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, পৌরাণিক বৃত্তান্ত, এবং কাব্যে বর্ণিত স্থানসমূহের বিবরণ অবগত আছেন, এরূপ এক বা ততোধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক স্বরূপ থাকিবেন। কোনবার উড়িষ্যা, কোনবার দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি, কোনবার বা চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থান এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য ছাত্রগণকে সকল বিষয়ে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে। নতুবা দেশ-ভ্রমণের সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে না। (২) বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একটি দল গঠন করিয়া নিজ নিজ কার্য্য হইতে কিয়দ্দিনের জন্য অবসর লইয়া এইরূপ একটি দল গঠন করিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে ইতিহাসজ্ঞ ও কাব্যরসগ্রাহী কাহাকেও নেতা নির্ব্বাচন করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদিগেরও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এলাহাবাদ, দিল্লী কিম্বা আগ্রার লোক ঐ সকল স্থান সম্বন্ধে এমন অনেক বিষয় জানিতে পারেন, যাহা অন্যে জানে না। (৩) সাধারণ লোক এবং স্ত্রীলোকগণ দলে দলে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্য স্থানীয় লোকেরা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কথকতার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। যেমন বুদ্ধগয়ায় "বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ" সম্বন্ধে কথকতা হইতে পারে। (৪) যখন কেহ সপরিবারে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবেন, তখন তিনি নিজে পরিবারবর্গকে সকল স্থানের ইতিহাস বলিতে পারেন।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, এক এক প্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থান, কি উপায়ে তথায় যাওয়া যায়, ভ্রমণের ব্যয় কত পড়ে, প্রভৃতি বিষয়ক এক একখানি পুস্তক থাকা উচিত। সাধারণ 'রেলওয়ে গাইড' অপেক্ষা এই সকল পুস্তক বিস্তারিতভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

(দাসী, জুলাই ১৮৯৩, পৃঃ ২১)

জ্ঞান লাভের বিষয় ত একটি নহে। বিশেষ করিয়া ছাত্রদের প্রথমাবধি ভূগোল ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতেই হইবে। নিজের দেশকে জানিতে হইলে, জাতিকে জানিতে হইলে ভূগোল, ইতিহাস অপরিহার্য্য। শিক্ষাব্রতী রামানন্দের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তাই এইদিকে প্রথম আলোকপাত করিলেন:

"ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা—বিদ্যার এমন কোনশাখা নাই, এমন কোন জ্ঞান নাই, যাহা মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক বা মূল্যহীন। কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা না হইলে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া মানুষ মোটেই দাবী করিতে পারে না, তাহা সকলেরই অবশ্য শিক্ষণীয়। যেমন লিখিতে ও পড়িতে শিখা এবং কিছু হিসাব জানা। তৎপরে মানুষের সুস্থ ও সবলভাবে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবার জন্য নিজের শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গঠন, ও বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। এইজন্য শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের স্থূল জ্ঞান সকলের থাকা উচিত। বাঙ্গলা ইস্কুলসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার

বহি পড়ান হয়, কিন্তু ইংরাজী ইস্কুল সকলে হয় না। এই ক্রটি সংশোধিত হওয়া উচিত।

মানুষ নিজের দেশের এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবরণ না জানিলে তাহাকে কখন সভ্য বলা যায় না। যে নিজের দেশের ও পৃথিবীর ভূগোল জানে না সে কূপমণ্ডুক মাত্র। যে জাতির মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী, সে জাতি কখনও মহৎ ও উন্নত হইতে পারে না। অথচ এখন আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে একজন লোক ভূগোলের কিছুই না জানিয়া এম্, এ; ডি, এস্‌সি; পি এইচ, ডি; পাস পর্য্যন্ত করিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে কি না, তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষায় বেশ মনোজ্ঞ করিয়া ভূবৃত্তান্ত এরূপ ভাবে লেখা উচিত, যাহাতে উহা ছেলেমেয়েদের প্রিয় বহি হইতে পারে, এবং অন্তঃপুরিকারাও আগ্রহের সহিত পড়িতে পারেন। সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় টোলের যত ছাত্র উপস্থিত হন তাহাতে অনুমান করা যায় যে কত হাজার হাজার শিক্ষিত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিও পৃথিবীর আধুনিক কোন তথ্য না জানিয়া জীবন যাপন করেন। ভূবৃত্তান্ত এই সকল শ্রেণীর লোকের সাগ্রহ গৃহ-পাঠ্যপুস্তক হয়, এরূপ ভাবে উহা লিখিত হওয়া উচিত। অবশ্য উহা একখণ্ডে সমাপ্ত হইবে না, অনেক ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ভূবৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক আনাইয়া, সেই সমুদয় পুস্তকের উৎকৃষ্ট লিখন ও শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ও তৎসমুদয়কে আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া আমাদের ভূবৃত্তান্ত লেখা উচিত। ইহাতে নানাবিধ মানচিত্র, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৃক্ষ, ফল, ফুল, মানব ও প্রাণী জাতির চিত্র, বিখ্যাত নরনারীর চিত্র, দুর্গ অট্টালিকাদির চিত্র, প্রভৃতি আঁকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন-প্রণালী, শিক্ষা-প্রণালী, সাহিত্য, পরিচ্ছদ, বাণিজ্য ও শিল্প দ্রব্য, প্রভৃতির বর্ণনা ইহাতে থাকা উচিত।

পরিবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীতে এখন ইতিহাস না জানিয়াও অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। কিন্তু ইতিহাস না জানিলে আমরা কখন সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করিতে পারি না। ইতিহাস জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের এক প্রধান প্রতিষেধক। নানা দেশের ইতিহাস পড়িলে নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয়ে আত্মসম্মান জন্মিবে, আশা বদ্ধমূল হইবে এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি বললাভ করিবে। অতএব বাঙ্গলা ভাষায় সমগ্র মানব-জাতির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ দেখাইয়া একখানি ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন এই ক্রমোন্নতি ও বিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নানা উন্নত ও প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ও আধুনিক জাতির ইতিহাস পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লেখা উচিত।

এইরূপ ইতিহাস ভূগোল প্রকাশ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যে পুস্তকপ্রকাশক বা ধনী ব্যক্তি এইরূপ ভূগোল ও ইতিহাস প্রকাশ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বজাতির মহা উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।"

(প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৬, পৃঃ ৫২৭)

রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে নিষ্ঠাবান। তাই দেখি, এলাহাবাদে আসিয়াও অল্পকাল পরেই স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে রত হইয়াছেন। রামানন্দ বরাবর জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। তিনি ১৯০৫ সনে কাশী কংগ্রেসে শিক্ষা-সংস্কার ও সরকারী শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে একটি ব্যাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। ইহার এক স্থলে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন, "India's Political Salvation depends on mass education..." প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এলাহাবাদ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ জনহিতকর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। রামানন্দের

মননশীলতা এবং কর্ম্মশক্তি এই সমুদয়ের উন্নতিতে নিয়োজিত হয়। প্রায় প্রতিটি কাজেই তিনি মালবীয়কে সহায় ও সঙ্গীরূপে পাইয়াছিলেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ১৮৯৬ সনে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্গতদের বহু সন্তান নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে রামানন্দ এলাহাবাদে একটি 'অনাথ আশ্রম' খোলেন। তাঁহারা অন্নবস্ত্রের সাহায্য ত করিলেনই, উপরন্তু তাহাদিগকে সাধারণ হাতের কাজ শিখাইবারও ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৯৭-৯৮ সনে ভারতের নানাস্থানে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। এলাহাবাদও বাদ পড়িল না। রামানন্দ সেবাকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দাসাশ্রমের প্রাক্তন প্রধান কার্য্যকারক ইন্দুভূষণ রায় তখন সপরিবারে এলাহাবাদে আসিয়াছেন। রামানন্দ স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু ইন্দুভূষণের অন্তরঙ্গ সহযোগী হইয়াছিলেন। এইবারে রোগী ও আতুরদের সেবাকার্য্যেও তাঁহারা মিলিত হইলেন। প্লেগের আবির্ভাবে প্রতিবারের মত এবারেও বহু লোক শহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সেবাব্রতী রামানন্দ সপরিবারে এলাহাবাদেই থাকিয়া গেলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে নানা রকম বিপদেরও সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

রামানন্দের কর্ম্মময় জীবনের মধ্যেও কিন্তু জ্ঞান-চর্চ্চা অব্যাহত ছিল। তিনি বিবিধ বিষয়ের পুস্তকাদি আনাইয়া অধ্যয়নে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শিশু পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার প্রতিও তিনি সমান অবহিত ছিলেন। তখন শিশুদের জন্য "Century Primer" ও "A. B. C. Picture Book" শীর্ষক দুইখানি ইংরেজী প্রাথমিক শিক্ষার বইও লেখেন।

ভাষা সংস্কার রামানন্দ

প্রবাসে থাকিয়াও বাঙ্গালীরা তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার কারণও ছিল, সেই সেই স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁহারা একাত্ম হইয়া ছিলেন। তিনিও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আপামর সাধারণের হিতকর্ম্মে লিপ্ত হন এবং তাহাদের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। বাঙ্গালীরা যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানকার ভাষা না শিখিলে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় কথা না বলিলে, উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ জন্মিতে পারে না। তাই রামানন্দ নিজে হিন্দীভাষা ভাল করিয়া তখন আয়ত্ত করেন। দেহাতী হিন্দীতেও তিনি পটু ছিলেন।

বাংলা ভাষায় অনুরাগী রামানন্দ, তাই স্কুলের পঠন-পাঠনও বাংলা ভাষায় করাইতে চাহিয়াছিলেন। ভাষা-সংস্কার বিষয়ে তিনি এইজন্যই বরাবর আগ্রহী ছিলেন।

"শিক্ষার উদ্দেশ্য—লেখাপড়া শিল্প বার্ত্তা কলা ইত্যাদি যত কিছু শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি ধারা আছে, যাহা পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া চলে। যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতন আশ্রয় করিয়া স্থগিত হইয়া থাকে, নূতন পথে না চলে, সেখানে সেই শিক্ষা কেবলমাত্র পুরাতনের অনুকরণ হয়, নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও পণ্ড হয়।

সুতরাং শিক্ষা ব্যাপারটা কেবল নিষ্ক্রিয় ভাবে পুরাতন গ্রহণ নয়, মানুষের আত্মার আনন্দ সৌন্দর্য্য গভীরতা ও মহত্ত্বকে কল্পনায় ও নব নব সৃষ্টির দ্বারা বিকশিত ও প্রকাশিত করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বিশেষ করিয়া রস-সাহিত্য ললিতকলা ও শিল্পের শিক্ষা ও সাধনায়। যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ, তার চর্চ্চা ও আলোচনায় মানব-চিত্ত ও নর-চরিত্র সুন্দর ও মহৎ হইয়া উঠিবার অবকাশ পায়, এবং মহৎ ও সুন্দর যে সৃষ্টি করিতে পারে বা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে সে আপনাকে আপনি সম্মান করিতে শিখে, সে জগতে আপনার প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং অপরের নিকট হইতে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে। একদিকে শিল্প-সাধকের জীবন যেমন নূতন সৌন্দর্য্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহৎ হয়, অপর দিকে তেমনি সৌন্দর্য্যের আদর্শের আয়ত্তাতীত মহত্ত্ব সাধককে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে না দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে উন্নততর হইতে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যের উপাসনায় ব্যক্তির জীবনের এবং তার ফলে সমাজের বহু কদর্য্যতা দূর হইয়া যায়; শিক্ষার অভাবে এতদিন যে কুশ্রীতার দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, বা অসতর্ক অজ্ঞতায় যাহাকে কুশ্রী বলিয়া বোধ হয় নাই, শিক্ষার ফলে সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে, সুশ্রী ও বিশ্রী বিভেদ করিবার বুদ্ধি জন্মে।

শিক্ষায় চিন্তাশক্তি প্রচলিত হয় এবং স্বয়ং সব-কিছু পরীক্ষা সিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; অতীত ও বর্ত্তমানকে এইরূপে আত্মপ্রত্যয়ে যাচাই করিয়া চলিতে চলিতে ভবিষ্যতের রাজপথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রতিষ্ঠার স্বর্ণরথ অবাধে চলিবার উপায় করা হয়। এই আত্মবোধ হইতে আত্মার স্ফূর্ত্তি লাভ হয় এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বক্ষেত্রে তীব্র ও ব্যগ্র হইয়া উঠে, প্রত্যেক নরনারীর জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এবং যে আবেষ্টনে তাহাদের বাস তারও সৌন্দর্য্য ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত ও সুবিন্যস্ত হইতে থাকে। মানব-জীবন ও মানব-সমাজকে সুন্দর মহৎ ও নব নব সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিয়া আত্মার স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধির জন্য য়ুরোপে নানাবিধ আয়োজন হইতেছে। তাদের অন্যতম **The Society for New Ideals in Education** অর্থাৎ শিক্ষার নব-আদর্শ সমিতি।

গত আগষ্ট মাসের শেষে কেম্ব্রিজ সহরে ঐ সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আলোচনার বিষয় ছিল—**The Creative Impulse and its place in Education** সৃজনী শক্তি ও শিক্ষায় তার স্থান;

The Effect of Handicraft on Mind and Body—মন ও শরীরের উপর হাতের কাজের প্রভাব; Drawing and the Imaginative Side of Education—অঙ্কন ও শিক্ষার কাল্পনিক দিক; Nationality in Music সঙ্গীতে জাতীয়তা; The Educational value of the; Artistic Crafts—শিল্প-কারিগরীর-শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূল্য; The Training of the Dramatic Instinct—অভিনয়-বৃত্তির অনুশীলন। এই সব বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে মনীষী বলিয়া সুপরিচিত লর্ড লীটন, লর্ড হ্যাল্‌ডেন, স্যার স্যাড্‌লার, চিত্রশিল্পী রোটেনস্টাইন প্রভৃতি।

য়ুরোপে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় করানো শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয় করাতে উচ্চারণ স্পষ্ট হয়, বাক্যের জড়তা ও প্রকাশের সঙ্কোচ দূর হয়, তৎপরতা ও সঙ্গীত অভ্যাস হয়, মুখস্থকরার শক্তি বৃদ্ধি হয়, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও রসবোধ জন্মে। আমাদের দেশেও বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষাকে আনন্দে ও উৎসাহে পরিণত করিয়াছেন; সেখানে পরীক্ষার নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও বাঁধা পাঠ্যপুস্তকের জুলুম বালকদের আনন্দকাকলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত আনন্দ ও স্বাধীন মুক্ত ভাবকে শিক্ষার সহচর করিয়া তোলা; শিক্ষার উদ্দেশ্যই যে শিশু-আত্মাকে জগতের সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব আনন্দের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া প্রমুক্ত স্বাধীনতায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বিকশিত করিয়া তোলা।"

(প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৬, পৃঃ ৮৩)

রামানন্দ দেশের প্রত্যেকটি লোককে শিক্ষিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নহে, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করেন। কলেজের ছুটির অবকাশে পল্লীর মানুষকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ যে কতখানি, এ বিষয়ে রামানন্দ বলেন:

"আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত ত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি মজুরের কাজ করিয়া বা কোনপ্রকার কারিগরি মিস্ত্রিগিরি করিয়া খায় তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে।

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিদ্যা ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা-প্রণালী জাতীয় হইতে পারে না।" (রামানন্দ, পৃঃ ১৯৫)

এইজন্যই বাংলা-ভাষার প্রচার বৃদ্ধি করা ও বাংলা-ভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা রামানন্দের একটা বিশেষ কাজ ছিল। মাতৃভাষানুরাগী রামানন্দ তাই সর্ব্বপ্রথম ভাষা-সংস্কার কার্য্যে মন দিলেন। তিনি লিখিলেন:

"**বাঙ্গলার ভাষাভেদ**

অনেকে বলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীরা গভর্ণমেণ্টকে অযথা সন্দেহ করেন। কিন্তু সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলে আমাদের সন্দেহ ঠিক বলিয়াই মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ চৌদ্দ মাস পূর্ব্বে প্রবাসীতে লেখা হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গ উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ এবং চট্টগ্রাম বাংলা দেশ হইতে বিভিন্ন হইলে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে কিনা, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। আমরা এখানে এ বিষয়ে চিন্তার কিছু উপকরণ দিতেছি।

"দু'টি ভাষার মধ্যে কি পরিমাণ প্রভেদ থাকিলে একটি অপরটির প্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কি পরিমাণ প্রভেদ থাকিলে তাহারা স্বতন্ত্র দু'টি ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বলা কঠিন। স্কচ ভাষা ইংরাজীর প্রভাষা বলিয়া গণ্য, কিন্তু উভয়ে যত পার্থক্য আছে, আসামী ও বাংলা তদপেক্ষা বোধ করি বেশী নাই। স্কচ এবং আসামী উভয়েরই প্রাচীন সাহিত্য আছে। কিন্তু আসামী বাঙ্গলা হইতে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ইংরেজ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন; অথচ স্কচকে ইংরাজী

হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজা এক না হইয়া গেলে বোধ হয় আজ ঐ দুই দেশের ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র হইত। আসামী ও বাঙ্গালী একই রাজার অধীন, কিন্তু রাজপুরুষদের শাসন-প্রণালী ভেদনীতিমূলক বলিয়া বাংলা এবং আসামের ভাষা ও সাহিত্য এক হইবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে।

ইংরাজ পণ্ডিতদের মতে কথিত বাংলা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান প্রভাষায় বিভক্ত; যথা—মধ্য-বঙ্গীয়, পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ়ী উত্তরবঙ্গীয়, বঙ্গপুরী বা রাজবংশী, পূর্ব্ববঙ্গীয় বা মুসলমানী এবং চাটগাঁইয়া। তাঁহারা বলেন, এই প্রভাষাগুলির মধ্যে কেবল মুসলমানী বাঙ্গলার সাহিত্যিক গুরুত্ব আছে। কেবল এই প্রভাষাতেই লিখিত পুস্তক আছে। ইহা বলিয়াই ইংরাজ পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৯১—১৯০১ এই দশ বৎসরে বাঙ্গলা হিন্দী প্রভৃতি যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার হিসাবের মধ্যে মুসলমানী বাঙ্গলা পুস্তকের সংখ্যা বাঙ্গলা হইতে সতন্ত্র করিয়া দেখান হইয়াছে। এই সংখ্যা ২৮৬। এখন দেখা যাক, মুসলমানী বাঙ্গলা কোথায় কোথায় চলিত। উহা যশোর, খুলনা, ত্রিপুরা, এবং ঢাকা বিভাগের সমুদয় জেলায় চলিত। মধ্যবঙ্গের সর্ব্বত্র মুসলমানেরা এই ভাষা ব্যবহার করেন। বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা কত তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

	হিন্দু	মুসলমান
পশ্চিমবঙ্গ	৬৮৫৫১৬৪	১০৮৪৮২০
মধ্য-"	৩৮৮৩৩৬৭	৩৭৭৩৩২১
উত্তর-"	৩৯৩৮৫২৬	৫৮৭৬৪০৮
পূর্ব্ব-"	৫৫১৪০২৫	১১১২০৪২৭
মোট	২০১৯১০৮২	২১৯৫৪৯৭৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৯৪ জন বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা হিন্দুর দ্বিগুণ, উত্তরবঙ্গে প্রায় দেড় গুণ। বগুড়ায় শতকরা ৮২ জন মুসলমান, রাজসাহীতে ৭৮, নোয়াখালিতে ৭৬, পাবনায় ৭৫, এবং মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রামে ৭১। ইংরেজ পণ্ডিতেরা বলেন "লিখিত বাংলা অশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে অবোধ্য। আবার একজন ত্রিপুরা বা সিলেটের চাষার কথা একজন মারাঠা বা সিন্ধীর কাছে যেমন দুর্বোধ্য, মুর্শিদাবাদের লোকের কাছেও তেমনি। সুতরাং ইংরেজ মতে ঢাকাই, মৈমনসিংহী বা চাটগাঁইয়া মুসলমানী বাংলা ও হুগলীর লোকের পক্ষে অবোধ্য।

"এখন যদি বঙ্গের অনুচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গাদির কথিত ও লিখিত মুসলমানী বাঙ্গলাকে স্বতন্ত্র একটা ভাষা করিতে বেশী দেরী না লাগিতে পারে। হিন্দী ও উর্দ্দুতে যে প্রভেদ, মুসলমানী ও সাধারণ বাঙ্গলায় তদ্রূপ প্রভেদ। উর্দ্দুর স্বতন্ত্র (ফার্সী) অক্ষর আছে, মুসলমানী বাঙ্গলায় তাহা নাই, এই যা রক্ষা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও উর্দ্দুর ঝগড়ায় হিন্দুস্থানী সাহিত্যের খুব অনিষ্ট হইয়াছে। একই ভাষার দু'রকম অক্ষরে লেখা দু'টা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় বৃথা শক্তিক্ষয় হইতেছে। ভগবান করুন বাঙ্গলা দেশে তদ্রূপ কোন বিবাদ যেন কখনও না হয়। কিন্তু মুসলমানী বাঙ্গলা পুস্তকের স্বতন্ত্র গণনা কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে হইতে পারে যে আমরা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীরা ঘরপোড়া গরুর মত সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইতেছি। ভয়ের কিছু কারণও আছে। সম্প্রতি আগ্রা ও অযোধ্যা গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, প্রথম শিক্ষার পুস্তকগুলি সাধারণ লোকের বোধ্য চলিত ভাষায় লিখিতে হইবে; বর্ত্তমান স্কুলপাঠ্য বহিগুলি নাকি তাহা নয়। যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয় এবং ভবিষ্যৎ পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মত এবম্বিধ হয়, তাহা হইলে মুসলমানী বাঙ্গলাতেই পূর্ব্ববঙ্গের কেতাবগুলি হয়ত লেখা হইবে।

কারণ উহাই মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা এবং উহাতে লিখিত পুস্তক "Collopuial Vocabulary"-র (কথিত শব্দাবলী) বাহুল্য আছে। আমরা মুসলমানী বাঙ্গলার প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করিতেছি না। আমরা কেবল একটা সম্ভাবনার কথা বলিতেছি। যত বেশী লোকে কোন ভাষা বলে ও ঐ ভাষার সাহিত্যের চর্চ্চা করে, ততই উহার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টির সম্ভাবনা। এই-জন্য আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিখণ্ডিত হইবার

সম্ভাবনাকে অত্যন্ত আশঙ্কার চক্ষে দেখি। ভাষা আংশিকভাবে পৃথক হইয়া গেলেও জাতীয় ঐক্যবোধ হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় শক্তি কমিয়া যায়।”

এখন পাঠকগণ বলুন, চৌদ্দমাস পূর্ব্বে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা কি অমূলক? কারণ, সকলেই জানেন গবর্ণমেন্টের এক কমিটি ভাষাভেদ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া দেশময় আলোচনা চলিতেছে।

বাঙ্গলা ভাষাটিকে চারিটি প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত করিবার কারণ কি? লিখিত বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান, কৃষকের ছেলেদের তাহা বুঝিতে কষ্ট হইতেছে, বর্ত্তমান শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি পাড়াগাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুপযোগী, এই যুক্তি বলে কমিটি ভাষাকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কথা কখনই কৃষকদের কঠিন বলিয়া মনে হয় নাই। বটতলাকে জীবিত রাখিয়াছে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থের বহু সংখ্যক বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ বটতলার ছাপাখানা যোগাইয়া থাকে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এই বইগুলি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা ক্রয় করে, পাঠ করে, ব্যাখ্যা করে। এই সকল পদ্য গ্রন্থে ইন্দীবর শ্যাম, পদ্ম পলাশনেত্র, আজানুলম্বিত বাহু খগরাজ নাসা প্রভৃতি সংস্কৃত উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি, রূপ বর্ণনাগুলি নিছক সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ। চিরকাল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা পড়িয়া আসিতেছে। কথকঠাকুর যখন যুদ্ধ বর্ণনা বা প্রাকৃতিক বর্ণনা উপলক্ষে অমরকোষ হইতে অজস্র শব্দ চয়ন করিয়া সমাসবদ্ধ সুসংস্কৃত বাক্যে স্বীয় প্রসঙ্গ পল্লবিত করেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা একাগ্রতার সহিত শুনিয়া থাকে। যাত্রার আসরে দুই যোদ্ধা পরস্পরকে গালি দেওয়ার ছলে এক ঘণ্টাকাল সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, ঋষিগণ আসিয়া বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবন বর্ণন প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল সমাস-লহরীর অজস্র বৃষ্টি করিয়া থাকেন। বরং ভদ্রলোকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাঁহাদের অনেকে হয়ত উঠিয়া যান, কিন্তু চাষারা বিনিদ্রচক্ষে পরম উৎসাহে অভিনেতাগণের প্রতি বাক্যটি যেন গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। আমি এরূপ বলিতে চাহি না, তাহারা সবগুলি কথা বোঝে, ঠিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রোতা নির্ব্বাচন করিতে হইলে অনেক ভদ্রলোককেও বাদ দিতে হয়, চাষার ত কথাই নহে, কিন্তু একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, তাহারা সমস্ত শুনিয়া মোটামুটি রকমে ভাব আদায় করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে ভদ্র ও ইতর সমাজের মধ্যে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এমনই একটা ভাবের আদান-প্রদান ও বিনিময় সম্বন্ধ আছে, যাহা শাস্ত্রশাসিত হিন্দু-সমাজের নিম্নতম স্তরে পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথা প্রচলিত ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতকে উপেক্ষা ও ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা করিয়া কোন চাষাই এসমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। শুধু হিন্দু সমাজে নহে, সংস্কৃত কথা আশ্চর্য্য পরিমাণে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। আলোয়ালের পদ্মাবত কাব্য পাঠ করিলে দেখা যায়, মুসলমানকবি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন,—অথচ এই কাব্য ভদ্রসন্তানেরা পড়িয়াছেন, এরূপ প্রমাণ নাই। ইহা হইতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায় এই অসামান্য রূপে সংস্কৃত শব্দে পুষ্ট কাব্যখানি বিগত আড়াই শত বৎসর কাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন? এতদ্ব্যতীত কবির গান, তরজার লড়াই, হেঁয়ালীর ব্যাখ্যা, বাউল সঙ্গীত, দাশরথি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবি ও সাধকের গান, চাষারা যেরূপ উপভোগ করে, ভদ্রসমাজে উহাদের তদ্বিধ প্রচলন নাই। বৈষ্ণব গানের বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। আমি গোস্বামীদের কথা বাদ দিয়া বলিতেছি, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মাঝি, কৈবর্ত্ত, চাষা, ইহাদের মধ্যে বেশ একটা হেঁয়ালী বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া থাকে। “চৌদ্দভুবন” বলিতে কি বুঝায় হঠাৎ আমাদের বলা শক্ত, কিন্তু অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহার মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে। রামায়ণ মহাভারতের কথা অনেক স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা জানা নাই, যতটা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পরিজ্ঞাত। চণ্ডীদাসের সহজিয়া মত সম্বলিত

পদগুলির ব্যাখ্যা নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক বেশ করিয়া থাকে, অথচ সেগুলি আমাদের নিকট উদ্ভট হেঁয়ালীর মত শুনায়।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির সন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, ভদ্রলোকেরা সংস্কৃত পুঁথির আদর করিয়া থাকেন, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, কৈবর্ত্ত ইঁহাদের ঘরেই বাঙ্গলা পুঁথি, সংস্কৃত শব্দবহুল দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদযুক্ত প্রাচীন বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ সংরক্ষিত ছিল। এতদিন যাহারা এই সকল পুঁথি রক্ষা করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে নীরব গৌরব-প্রদান করিয়াছে, আজ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই ভাণ্ডার হইতে তাহাদিগকে অযোগ্যতার অপরাধে বঞ্চিত করা কি উচিত হইবে? অনেক নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা ভাল ভাল বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ইহাদের শিশুরা সরল বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক বুঝিতে পারিবে না, একথা কখনই আমরা মানিব না যদি তাহারা তাহা বুঝিতে অসুবিধা বোধ করে, প্রাদেশিক কথিত ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে সেই অসুবিধা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহার কারণগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি।

গ্রীয়ারসন সাহেব বাঙ্গলা একটা প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, এদেশের প্রত্যেক দশ ক্রোশ দূরে ভাষা নতুন। প্রাদেশিক কথিত ভাষা জগতের সর্ব্বত্রই কিছু কিছু স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। গ্রাম্য ভাষা, যাহার সাহিত্য নাই, অভিধান নাই, যাহার উচ্চারণ রীতি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শৃঙ্খলিত করা হয় নাই, যাহা এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান, তাহার কোন্‌টি আশ্রয় করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচিত হইবে? বাঙ্গলা ভাষাকে চতুর্ব্বিধভাগে বিভক্ত করিলে কুলাইবে না, কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি ভাষাভেদ করিলে, বঙ্গ ভাষাকে শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এই যুক্তি কৃষক শিশুর পক্ষে সুবিধা হইতে পারিবে, নতুবা যে সকল কথা অভিধানে নাই, ব্যাকরণে নাই, তাহার অর্থ তাহারা বুঝিবে কিরূপে? পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা বলিয়া যে ভাষা গৃহীত হইবে, সে ভাষা বহুরূপিণী। পূর্ব্ববঙ্গের একাংশের কথা অপরাংশে একান্ত দুর্ব্বোধ, এ অবস্থায় কোন এক প্রাদেশিক উপ-ভাষাকে আশ্রয় করিলে ছেলেদের অসুবিধা বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না। লিখিত বাঙ্গলা ভাষার দুরূহ শব্দ অভিধানের সাহায্যে বোঝান যাইতে পারে, কিন্তু অভিধান বহির্ভূত পাড়াগেঁয়ে কথার অর্থ করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যা অনেক স্থলে কুলাইবে না।

বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ পল্লীই কৃষকবহুল, অধিকাংশ পল্লীরই অবস্থা এই যে দু'চারি ঘর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সঙ্গে বহু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক তথায় বাস করিয়া থাকে। সেই সকল স্থলে কৃষকের ছেলেদের সঙ্গে ভদ্র-লোকের ছেলেরাও গ্রাম্য ভাষা শিখিবে। তৎপর উর্দ্ধতন স্কুলে যাইয়া তাহাদের নূতন বাঙ্গলা শিখিতে যে কি বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা লিখিয়া শেষ করা কঠিন। একবার সবগুলি ক্রিয়া বিভক্তি ও সর্ব্বনাম—এমন কি বানান পর্য্যন্ত উলটাইয়া গেলে তাহা বিশুদ্ধ পথে প্রবর্ত্তিত করা তাহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইবে। বর্ণাশুদ্ধি একবার পাকিয়া গেলে কিছুতেই তাহা দুরস্ত হইতে চাহে না, এ বিষয়ে চিরকাল বাঙ্গলার চর্চ্চা করিয়া আমরা যে সাক্ষ্য দিতেছি, আশা করি তাহা প্রামাণিক হইবে। ভদ্রলোকেদের সম্বন্ধে ত এই কথা। আর চাষার ছেলেরা অবশ্য চিরকালই চাষ-বাস করিবে, এ ভাবা স্বাভাবিক হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ উচ্চশিক্ষা পাইতে পারিবে না, এরূপ বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা সেইরূপ শিক্ষার পথে প্রবল অন্তরায় উপস্থিত করিয়া দেওয়া কি উচিত? যে ঘরে থাকে তাহার জন্য কি আকাশের দিকে তাকাইবার উপযোগী একটা ছিদ্র বা জানলার ব্যবস্থা রাখা অন্যায়? আমরা দেখিয়াছি এই দেশের চাষাকুলের মধ্যে দেশের মাথার কিরীট স্বরূপ দুই একটি মনীষী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। চিরকাল পুষ্করিণীর জল খাইতেছি বলিয়া কি তাহার জন্য গঙ্গাস্নানের পথটি অবরুদ্ধ করিয়া ফেলা উচিত।

দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া যে সকল কার্য্য করিতেছেন, যে সকল চিন্তা ও সাধনার দ্বারা জাতিকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন, সেই শিক্ষা-দীক্ষার বারিবিন্দু সমাজের অধস্তন স্তরে নিপতিত হইয়া

তাহাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা রাখা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। দেশের উর্দ্ধতন সম্প্রদায় ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের প্রধান উপায় ভাষা, সেই উপায়কে ছিন্ন করিয়া একটা কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়া দিলে—তাহাতে দেশের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বড়লোকদের বাড়ীতে নানা উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে, ভদ্রলোকের কথিত সাধুভাষা অনুকরণ করিয়া বলিতে পারিলে তাহারা কৃতার্থ হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া থাকে, এস্থলে তাহারা স্বাভাবিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত স্বীকার করিতে হইবে। সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিলে তাহারা কখনই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ পল্লীই কৃষকবহুল, এবং সেই সকল পল্লীতেই ভদ্র সন্তানদেরও বাস, সুতরাং ভাষা চারিপ্রকার অবয়ব ধারণ করিলে তাহার ফল সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে, এবং কালে বাঙ্গলা ভাষা চারিটি পৃথক নাম গ্রহণ করিয়া ইহার পূর্ব্বসৃষ্ট বিবিধ রত্নপূরিত ভাণ্ডার হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যহীন শ্রীহীন প্রাদেশিক প্রাকৃতে পরিণত হইবে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মধুসূদন, রামমোহনের গ্রন্থাবলী আর কে পড়িয়া বুঝিবে? ইহা আমাদের কেশচ্ছেদনকারী সূক্ষ্ম আশঙ্কা বা কল্পনামূলক নহে। আসামে পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন আমাদের গ্রন্থকারগণ সে দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন, এখন সে দেশে গ্রাম্য আসামী ভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আসামীবাসীদের সঙ্গে এখন আমাদের আকার ইঙ্গিতে বা ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয়। আসামী ভাষার সঙ্গে প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষার যে প্রভেদ, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাবাসীর ভাষার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ। খাস চট্টগ্রামী ভাষায় যদি তথাকার লোকেরা কথা বলেন, তবে আমাদের কি সাধ্য তাহাতে দন্তস্ফুট করি? কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে নবীনচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র দাস, ও নবীনচন্দ্র দাস বাঙ্গলা ভাষার মহারথী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা কি কখনও মনে করিতে পারি ইঁহারা আমাদের পর? মূল কথা প্রাদেশিক প্রাকৃত আর মূল ভাষার একটা সম্বন্ধ আছে। প্রাদেশিক প্রাকৃতগুলি মূল ভাষার শাখা-স্বরূপ। শাখাগুলি কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ তাহারা শুকাইয়া যায়, যাহা জীবিত ও বর্দ্ধনশীল ছিল, তাহা শুধু কাষ্ঠে পরিণত হইয়া পরিত্যক্ত হয়, মূল ভাষা হইতে শাখা প্রাকৃতগুলিকে ছেদন করিয়া দিলেও তাহা একান্ত গ্রাম্য ও সাহিত্য রচনার অযোগ্য হইয়া পড়িবে।

যেরূপ ব্যক্তিগত রুচি ও প্রকৃতির ভেদ বর্জ্জন করিয়া একটা সাধারণ ক্ষেত্রে ঐক্যের বন্ধনে সমবেত হইয়া সমস্ত লোক দাঁড়াইতে পারিলে, তাহা বলশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ প্রাদেশিক প্রাকৃতের বিসদৃশ লক্ষণগুলি পরিহারপূর্ব্বক ভাষা যদি একটা সাধারণ স্থানে দাঁড়াইতে পারে, তবেই তাহা সার্থক হইতে পারে। ইংরেজী ভাষা মার্কিন, অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বত্র একরূপ। এই সকল দেশের কথিত ভাষা অসম, বিসদৃশ, অথচ লিখিত ভাষা এক। স্কচ, মার্কিনী, ডর্সেটশায়ারী প্রভাষায় সাহিত্যও আছে। সে সব দেশে কৃষকদের জন্য কৃষকদের ভাষায় পুস্তক রচিত হয় না কেন? ডেভনশায়ার ও ল্যাঙ্কেশায়ারের কথা খাস লণ্ডনবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন। তাহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে সকল চলে নাই, শুধু ওয়েল্‌সে সেখানকার ভাষা একেবারে স্বতন্ত্র—আমাদের কাছে যেরূপ সাঁওতালী ভাষা ইংরেজদিগের নিকট ওয়েলস্‌ ভাষা সেইরূপ—সেই ওয়েল্‌সে বহু চেষ্টায় যখন দেখা গেল ছেলেরা ইংরেজী বুঝে না—তখন তথায় ইংরেজী ও ওয়েল্‌স এই দুই ভাষায়ই শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ওয়েল্‌সে আদিম বৃটনগণের ভাষা প্রচলিত, তাহা অ্যাংলো স্যাক্সনের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের ভাষা নহে, সেখানেও বহু চেষ্টায় ইংরেজীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে। অথচ বাঙ্গলা ভাষার জন্মস্থান হইতে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প হইতেছে। স্বদেশের চাষাদের চেয়ে আমাদের চাষাদের বেশি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইংরেজদিগকে একটু সন্দেহ স্বভাবতই হয় না কি? কথায় বলে যে মায়ের চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে ডাইনী। এও কতকটা তদ্রূপ।

কোন একটি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সংকল্প করিলে তাহা যত বৃহৎ আয়তনের দেশ জুড়িয়া প্রচলিত করা যায়,

ততই তাহার উন্নতির পথ মুক্ত হয়। সংস্কৃত ভাষা এরূপ শ্রীশালিনী হইল কেন? তাহার কারণ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মনীষীগণ এই ভাষার উপকরণ জোগাইয়াছেন। যখন বহু মনীষীগণের পরিচর্য্যা দ্বারা কোন ভাষা স্ফূর্ত্তিশালিনী হইয়া উঠে, তখন সেই ভাষাকে যাঁহারা মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারা ধন্য। কারণ, সুবিপুল তপস্যা-লব্ধ, বহুযুগসঞ্চিত সাহিত্যিক স্তর ও জ্ঞানের অর্জ্জিত ভাণ্ডারের নিকট তাঁহারা শিশুকাল হইতে আত্মসমর্পণ করিয়া অলক্ষিতভাবে উপকৃত হন। মুক্ত প্রান্তর প্রবাহিত উদার বায়ুস্রোত যেরূপ অলক্ষিতভাবে শিশুকে সবল করিয়া তোলে, একটা প্রবল চিন্তাস্রোতের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে, শিশুর মন সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে বিকাশ পাইয়া উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত হয়। গবর্ণমেণ্ট একটি প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, কৃষকের ছেলেরাও যাহাতে চিন্তাশীল, কার্য্যদক্ষ ও সুনিপুণ হইতে পারে, প্রাথমিক শিক্ষায় সেইরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষা এখন বহু সদ্‌গ্রন্থে পূর্ণ। এই পরম ঐশ্বর্য্য, যাহা তাহাদের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহাদের চিন্তাশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইলে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে তাহারা জ্ঞানের যে অবারিত পথে স্বাভাবিকভাবে আসিয়া উপস্থিত ছিল, কৃত্রিমভাবে ভাষা ভেদ করিয়া তাহাদিগের সেই পথ অবরুদ্ধ করা হইবে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল কৃষিসম্বন্ধীয় পুস্তকপত্রাদি লিখিত হইয়াছে ও হইবে, তৎসমুদয় হইতে কৃষকগণকে বঞ্চিত করা হইবে। আরো একটা কথা এই যে, কৃষি নানাবিধ অপর বিজ্ঞানের সহিত সংপৃক্ত। সেই সকল বিজ্ঞানের বহি সাহিত্যিক বাঙ্গলায় লেখা। কৃষকরা কেন তাহা পড়িতে পাইবে না?

এক জেলাবাসী অপর জেলাবাসীর নিকট পত্রাদি লিখিতে অসুবিধা বোধ করিবেন। কুচবিহারী লিখিবেন "সেলা তাঁয় তাক্ কহল বা তুঁই সদাই আমার কাচোৎ আচিস্, আর আমার যে গুলা যা আছে তা কুল্লে তোর।"

ময়মনসিংবাসী লিখিবেন—"আউয়াল পোষাক আন্যা তারে পিন্দা আতে একটা আংগুটি দে।" নোয়াখালিবাসী লিখিবেন, "ই রয়ম কুষ্ কুড়াও কেয় হেইতারে দিত না। তারহর হেইতর বুঝ্ হেডে হড়ি আম্‌নে আম্‌নে কইতে লাগিল।" চট্টগ্রামবাসী—"ছোড্ পোয়া হক্কালাইন অওর করি দূরে এক দেয়ত গেল্, হেণ্ডে মণ্ডামি করি তার ধন হক্কালাইন উড়াইল্।" এই সমস্ত নমুনা আমরা গ্রীয়ারসনের নব প্রকাশিত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম্। যেরূপ মৃন্ময়ী দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কতকগুলি খড় দড়ি ও কাদা বাহির হইয়া পড়ে, বঙ্গভাষার শ্রীমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গ্রীয়ারসন সেইরূপ সকল উপকরণ বাহির করিয়াছেন। হায়! দেবীমূর্ত্তি যে স্থানে অভিষিক্ত ছিলেন—সেই স্থানে কি এই সকল খড় দড়ি স্থাপিত হইবে?

গ্রীয়ারসনের পুস্তকে এইরূপ বহু নমুনা আছে। সেইগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, সত্য সত্য বাঙ্গলা ভাষা যাঁহারা বলেন ও লেখেন, তাঁহারা কি গৃহে এক স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করেন? তাহা নহে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে এই সকল প্রাদেশিক কথা যদিও অন্যরূপ শুনায় তাহারা সকলগুলিই মূলতঃ একরূপ; উচ্চারণ-বৈষম্যে এরূপ বিসদৃশ শুনায়। যেমন সকল শব্দটি কোন কোন স্থানে 'হকল' রূপে প্রচলিত। শুধু উচ্চারণ-বৈষম্যে ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করা উচিত নহে—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রদেশগত কথিত ভাষার ভেদ আছে—কিন্তু দেশের লিখিত ভাষা এক থাকা চাই। সেই একত্বই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়,—বিচ্ছিন্ন ও একতা ভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের ন্যায় ভাষাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

বাস্তবিক এই ভাষা ভেদ শুধু কৃষক সমাজের অপকার সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। রিপোর্টে নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেরূপ দৃষ্ট হইল তাহাতে নিশ্চিত মনে হয়, আর পাঁচ সাত বৎসরে তাহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপরে উঠিবে। এই বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই শিশুরা পড়িয়া থাকে। শুধু শহরগুলি ও ভদ্রবহুল পল্লী বাদ দিলেই ভদ্র সমাজ এই প্রস্তাবিত সংস্কারের অনিষ্টকর প্রভাবের হাত এড়াইতে পারিবেন না। কারণ, কৃষকবহুল পল্লীগুলির মধ্যে যত ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের সমষ্টি করিলে তুলনায়

সহর ও "ভদ্রপল্লীর" ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। বার আনার অধিক ভদ্রলোকের সন্তানগণ এই কৃষকবহুল পল্লীর নব ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে যত প্রকার বর্ণাশুদ্ধি 'খাইমু', 'যামু', 'করুম,' 'করবাম', প্রভৃতি বিচিত্র ক্রিয়াপদ, 'আমাগোর,' 'আমরার', 'মোহর' প্রভৃতি বিচিত্র বিভক্তি, এবং যত প্রকার ভাষার আবর্জ্জনা—যাহা ভদ্র-সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে, সকলই মুখস্থ করিয়া, হাতে লিখিয়া একবারে বিগড়াইয়া যাইবে। যে সকল পশ্চিমবঙ্গের লোক কার্য্য-বশতঃ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে বাস করিবেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া নিজের পরিবারের সঙ্গে মিশিতে পারিবেন না। বাঙ্গলার লিখিত ভাষা এখন সমস্ত প্রাদেশিক কথিত ভাষাকে শাসিত ও মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই মার্জ্জিত সুন্দর আদর্শের বলে বঙ্গদেশবাসীরা পরস্পরের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন, সেই লিখিত ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত করিলে, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের রাজপথ চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

বাঙ্গলা দেশে সরকারী আদালতের ভাষা এক, চারি রকমের নহে। সরকার বাহাদুর আইনের অনুবাদ একই ভাষায় করেন, সরকারী বিজ্ঞাপন, ঘোষণাপত্রাদি একই ভাষায় প্রচার করেন। এই এক ভাষাতেই প্রজাদিগকে দরখাস্ত করিতে হয়। এই ভাষা ছাড়িয়া চাষারা এক এক কিম্ভূত-কিমাকার ভাষা শিখিবে, সরকারের সহিত প্রজার যোগ বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা কি বাঞ্ছনীয়? জমিদারী সেরেস্তার ভাষা, মহাজনদের ভাষাও, মূলে সর্ব্বত্র এক। প্রজা যাহাতে নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে, প্রতারিত বা উৎপীড়িত না হয়, তজ্জন্য এক ভাষাই শিখা দরকার। অথচ কৃষকের হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এ ভাষা শিখিতে দিবেন না। তা ছাড়া, চাষা বলিয়া ত কোন একটা স্বতন্ত্র জাতি নাই। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মনেতর সকল বর্ণের মধ্যেই কৃষিজীবী আছে। যিনি উকিল বা হাকিম, তাঁহার জ্ঞাতি চাষী, পল্লীগ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাষাভেদ জন্মান কি উচিত? আমাদের দেশে ধনশালিতা অনুসারে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ নাই, সরকার কি ইহা জানেন না? পল্লী-গ্রামবাসী "ভদ্র" বা "ইতর" শ্রেণীর চাষীর ছেলে, জজ হইতে পারে। তাহাকে কূপমণ্ডূক করিবার ব্যবস্থা কেন করা হইতেছে?

হেমাটন নামক ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ইংরাজেরা যে প্রকারর মিথ্যা কথা বলে, তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার সহিত সত্য এমনভাবে মিশান থাকে, যে উভয়কে বিশ্লিষ্ট করা শক্ত। আমাদের মনে হয় ইংরাজের দেশশাসননীতিও এইরূপ। আসল উদ্দেশ্য যাই হৌক, ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহার সঙ্গে প্রজার হিতেচ্ছাটা মিশাইয়া দেন; এমন সকল যুক্তি দেখান যে ইহা সম্পূর্ণ-রূপে সাহস করিয়া বলা যায় না যে, সরকারের অমুক ব্যবস্থায় প্রজার কোনই সুবিধা হইবে না। কিন্তু অনিষ্ট যে খুব বেশী, ইষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশি হইবে, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়। অবশ্য বিন্দুমাত্রও ইষ্ট যে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সমাজ হইতে কমিটির প্রস্তাবের প্রতিবাদ গিয়াছে—সকলে একবাক্যে এই ভাষাভেদের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের ছোটলাট বাহাদুর এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া এতৎ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের জন্য আরও একমাস সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে মতামত গৃহীত হইবে

ইংরেজ-প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের অসামান্য পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। আশা করা যায় গবর্ণমেণ্ট স্বচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষার এই ঊর্দ্ধবাহিনী গতিমুখ ফিরাইয়া ইহার বহু আশাময় ভাবী উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন না।"

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১২, পৃঃ ৫০)

এ চিন্তা রামানন্দের মনে নূতন নয়। বহু পূর্ব্বে 'প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা' প্রবন্ধে তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন:

"প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা—যে যে ভাবে জীবন কাটায়, তাহার কথাবার্ত্তা হইতে তাহা বুঝা যায়। উকীলের মুখে মোকদ্দমার কথা, শিক্ষকের মুখে শিক্ষকতার কথা, মুদির মুখে চাল ডালের কথা, কেরাণীর মুখে বড় সাহেবের গল্প প্রায়ই শুনা যায়। মেয়েরা

একত্র হইলে তরী-তরকারী ও গহনাদির কথা বলেন। কথাবার্ত্তা হইতে যেমন মনুষ্যের ব্যবসায়াদি নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ তাহার চরিত্র ও প্রকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নত-চরিত্র সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্ত্তা একরূপ, পশুপ্রকৃতি বাসনাসক্ত ব্যক্তির কথাবার্ত্তা অন্যবিধ। ব্যক্তিবিশেষের সহিত তাহার কথাবার্ত্তার যে সম্বন্ধ, কোন জাতির সহিত তজ্জাতীয় সাহিত্যের সেই সম্বন্ধ। কারণ, সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়। যে দেশের অধিবাসী-বর্গের জাতীয় জীবন যত দীর্ঘকালব্যাপী, তাহার সাহিত্যের ইতিহাসও তত দীর্ঘকালব্যাপী। যে দেশের লোকেরা জীবনের যত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে স্ব স্ব শক্তির নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের সাহিত্যও তত বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনেকে বলেন, কোন মার্কিন লেখক যে এ পর্য্যন্ত মার্কিন জীবনঘটিত কোন অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিতে সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ, আমেরিকার অধিবাসীবর্গের মধ্যে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের অভাব। পৃথক পৃথক শ্রেণীর স্বার্থ, প্রকৃতি, শ্রেণীগত সংস্কার প্রভৃতির সহযোগিতা ও সংঘর্ষেই উপন্যাসের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন্ত ছবির উৎপত্তি হয়। যে জাতি যত গভীরভাবে সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহার জাতীয় সাহিত্যও ভাবের গভীরতার জন্য সেই পরিমাণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় যে কোন উৎকৃষ্ট নাটক লিখিত হইতেছে না, তাহার একটি কারণ এই যে বাঙ্গালী জাতিগত ভাবে কোন সুখ বা কৃতিত্বে উৎফুল্ল-চিত্ত হয় নাই, কিংবা কোন গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করে নাই। সুস্থ শরীরেই হর্ষের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। অপরদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় অঙ্গে কোন বেদনা অনুভূত হয় না। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কোথায়, জাতীয়তাই বা কোথায়, যে আমরা জাতীয় গৌরবে আত্মহারা এবং জাতীয় অপমানে ম্রিয়মান হইব? যে জাতি নিজ শক্তি ও উদ্যমশীলতা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্যে আত্মগৌরব, আশা ও উদ্যমের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। আবার যে জাতি অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অধঃপতিত জাতির সাহিত্যে পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিজনিত অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতাও কখন কখন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা উন্নত জাতির আত্মগৌরব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ।

সাহিত্যে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ জাতীয় প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ জাতীয় চরিত্র ও জীবন একই বস্তুর দুইটি দিক্‌ মাত্র। উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। চরিত্র অন্তরের জিনিষ, জীবন তাহারই বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু আত্মা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; তজ্জন্য তাঁহার সভ্যতায় বাহ্য ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বৈভব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। হিন্দু ধ্যানপরায়ণ, আত্মরত ও কর্ম্মবিমুখ। তাই তাঁহার সাহিত্যে প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। আত্মার উন্নতি, সম্প্রসারণ, বিকাশ ও মুক্তি যাঁহার প্রধান চিন্তা ও সাধনের বস্তু, তিনি আত্মার ইতিহাস লিখিতেন; কিন্তু তিনি অনিত্য বাহ্য ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতেও পারেন;—যদিও বাহ্য ইতিহাস ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। হিন্দুর সাহিত্যে যেমন হিন্দুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, অন্যান্য জাতির সাহিত্যেও তদ্রূপ তাহাদের চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

জাতীয় জীবন বলিলে শ্রেণীবিশেষের জীবন বুঝায় না। রাজা, অভিজাতবর্গ, কিংবা ধন ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের জীবনই জাতীয় জীবন নয়। যাহারা খাটিয়া খায় ও খাটিয়া খাওয়ায়, বরং তাহাদের জীবনই জাতীয় জীবন নামে আখ্যাত হইবার অধিকতর দাবী করিতে পারে। বণিক, কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সকলেরই জীবন জাতীয় জীবনের অন্তর্ভূত। সুতরাং কোন সাহিত্য বাস্তবিক জাতীয় নামের যোগ্য কিনা, বিচার করিতে হইলে, দেখা উচিত, তাহাতে সকল শ্রেণীর সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্যম, আমোদ প্রভৃতির যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি না। আমরা শৈশবে যে সকল উপকথা শুনিতাম, তাহার অধিকাংশই রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র, সহরকোটাল, সুয়ো ও দুয়ো রাণী প্রভৃতির কাহিনীতে পূর্ণ। উপকথা-রাজ্যে চাষাভুষা গরিব

লোকদের অতি বিরল বসতি। যদি বা তাহারা তথায় বাস করে, অধিকাংশ স্থলে সে কেবল রাজরাজড়াদের সুবিধার জন্য। অনেক জাতির সাহিত্যও তেমনি কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়াই ব্যস্ত। গরিব-লোকদের কথা তাহাতে নাই।

এখন দেখা গেল যে, সাহিত্যকে জাতীয়তা দিতে হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের ছবি থাকা চাই। তাহাতে এরূপ কথা থাকা চাই, যাহা সকল শ্রেণীর লোকের মর্ম্মস্পর্শী হয়, এবং সকলেরই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে। চাষা চাষার সুখ-দুঃখের কাহিনী, মাঝি মাঝির সুখ-দুঃখের কাহিনী, যে যে-শ্রেণীর লোক সে সেই-শ্রেণীর লোকের সুখ-দুঃখের কাহিনী যেমন বুঝিবে, অপরের কাহিনী তেমন বুঝিবে না। জীবন কথাটি কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি এক্ষণে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। যেসকল চিন্তা ও ভাবের স্রোত মানুষের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়, আভ্যন্তরীণ জীবন বলিলে আমরা সেই সমস্তই বুঝি। বাহ্য জীবন বলিলে বুঝি, মানুষ কি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কিভাবে বিশ্রাম-সময় যাপন করে, কিরূপ আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া করে, কিরূপ বেশভূষা করে, ইত্যাদি। ধর্ম্মবিশ্বাস আভ্যন্তরীণ জীবনেরই অন্তর্ভূ‌র্ত। ইহা মানুষের অনেক কার্য্যের নিয়ামক, অনেক সুখ দুঃখের মূলীভূত। সুতরাং মানুষের জীবন বলিলে আমরা তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহও বুঝিব।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর কথা ইহাতে লিখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী-জীবনের সত্য, পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে হইলে বাঙ্গালী যতপ্রকার কার্য্য করে, এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়, সকলেরই কথা ইহাতে থাকা চাই। সুতরাং এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করা চাই, যাহা লিখিত বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত নয়। চাষা গাড়োয়ান, ছুতার কামার, নৌকার মাঝি, মুচি, রাখাল, রাজমিস্ত্রি, কুম্ভকার, সহিস, দোকানদার, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, পোদ্দার, কলু, গোয়ালা, মুদি, তামুলি, প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, তৎসমুদয় এবং তাহারা যে সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি লইয়া কার্য্য করে, তাহাদের নাম অধিকাংশ স্থলেই "সাধুভাষার" বহির্ভূত। তাহারা যে সকল ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়, তাহারও অনেক পারিভাষিক শব্দ পুস্তকের ভাষায় অপ্রচলিত। তাহাদের নানাবিধ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যদ্রব্যাদির সমুদয় নামও লিখিত বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; এই সকল শব্দ কথিত বাঙ্গলার অন্তর্গত। তাহাদের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রবহির্ভূত, সুতরাং কথিত বাঙ্গলার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাধুভাষায় অবর্ণনীয়। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র বুঝিতে হইলে—বঙ্গদেশের উপকথা ও মেয়েলি ছড়া রূপ যে অলিখিত জাতীয় সাহিত্য আছে, তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। এই সকলেও সাধু-ভাষার বহির্ভূত অনেক কথিত বাঙ্গলা শব্দ আছে।

ভাষা যতদিন লিপিবদ্ধ না হয়, ততদিন অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল থাকে, এবং সহজেই পৃথক্ পৃথক্ প্রভাষা বা প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। অসভ্যদেশে দুই এক ক্রোশ অন্তর যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, সভ্যদেশে তদ্রূপ দেখা যায় না। ভাষা লিপিবদ্ধ ও পুস্তকগত হইলে, অনেক পরিমাণে তাহার পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভাজ্যতা হ্রাস পায়। এইজন্য দেখা যায়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লেখকগণের পুস্তকের ভাষা প্রায় এক, কিন্তু তত্তৎ অঞ্চলের কথিত ভাষা অতিশয় বিভিন্ন; এত বিসদৃশ যে একজন বর্দ্ধমানবাসী একজন চট্টগ্রাম-বাসীর খাঁটি কথিত ভাষা বুঝিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এমন কি এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে একই জিনিষ, একই গাছ, একই প্রাণীর স্বতন্ত্র নাম। এইজন্য প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলার একটি অভিধান প্রস্তুত করা উচিত।

প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলার অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অন্যান্য দিক্ দিয়াও বুঝা যায়। (১) বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেগুলি বুঝিতে হইলে, ঐ সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেক জেলায় প্রচলিত পারিভাষিক নাম জানা চাই। কারণ, তাহা না জানিলে, নানাস্থানে প্রচলিত প্রক্রিয়া জানিয়া তাহাদের উৎকর্ষাপ-

কর্ম্ম বুঝা যাইবে না। বিদেশ হইতে আনীত কোন অভিনব উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ার প্রচলনার্থও এবম্বিধ জ্ঞান প্রয়োজন। (২) উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে নানাবিধ কৃষিজাত ও স্বভাবজ গাছ-গাছড়ার নানা জেলায় প্রচলিত নানাবিধ নাম জানা দরকার। আমরা স্বদেশজাত উদ্ভিদ্সমূহের নাম জানি না, কিন্তু Roxburgh প্রভৃতি ইংরাজগণ বহুবিধ ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদের বাঙ্গলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি নাম নিরূপণ করিয়াছেন। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদে অনেক উদ্ভিদের নাম আছে, যাহাদের বাঙ্গলা নাম এক-স্থানে একপ্রকার, অন্যস্থানে অন্যপ্রকার। এই সমুদয় নাম সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। (৩) প্রাণীবিদ্যার উন্নতিসাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার পশু-পক্ষ্যাদির স্থানভেদে বিভিন্নপ্রকার বহুবিধ নাম সংগৃহীত হওয়া দরকার। বড় বড় জানোয়ারের নাম প্রায় সর্ব্বত্রই এক। কোথাও কোথাও বা একাধিক নাম প্রচলিত। যেমন মহিষ বা "মোষ" বলিলে সকল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারে যে কোন্ চতুষ্পদের নাম করা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে মহিষকে "কাঢ়া" বা "কাড়া" এবং মহিষীকে কাড়ীও বলে। ইহার একটি "শিষ্ট প্রয়োগ" মনে পড়িল। কথিত আছে, মানভূম অঞ্চলে একবার এক যাত্রার দলের অধিকারী রামায়ণের একটি পালা গাহিতেছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের চন্দনচর্চ্চিত দেহের শোভা বর্ণন প্রসঙ্গে গাহিলেন—"রামের গায়ে চন্দন কিবা সাঝেরে, যেমন পাঁকমাখা কাঢ়াটা;" অর্থাৎ "রামের গায়ে চন্দন কিবা সাজেরে, যেন তিনি একটি পঙ্কাক্তদেহ মহিষ!!" রাম ও মহিষের গায়ের রঙ্গ এক কি না, কবিগণ বিচার করিবেন। বড় বড় জানোয়ারের নাম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ক্ষুদ্র চতুষ্পদ, নানাবিধ পক্ষী, মৎস্য ও কীটপতঙ্গাদির নামে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (৪) একটি কথিত বাঙ্গলা শব্দ এক জেলায় শ্লীল, অপর জেলায় হয়ত অতি অশ্লীল। ইহাতে অনেক সময় অনেককে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সমাজেই বড় অপ্রতিভ হইতে হয়। প্রাদেশিক বাঙ্গলার অভিধান থাকিলে এরূপ লজ্জিত হইতে হয় না। (৫) আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন, ঋতু বর্ণন, নরনারীর রূপ বর্ণন, প্রভৃতি বড় একঘেয়ে ও পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। যেন পূর্ব্ব কবিগণ সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং উপমারও আর নূতন বস্তু রাখিয়া যান নাই। উপমা ও বর্ণনাগুলি তাঁহাদের মানসোদ্যান হইতে সদ্যশ্চয়িত, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত বোধ হয় না। খঞ্জনপক্ষী কয়জন দেখিয়াছেন, জানি না, কিন্তু চক্ষুর প্রশংসা করিতে হইলেই যেন কেহ "খঞ্জন গঞ্জন আঁখি" বলিতে মাথার দিব্য দেয়। যিনি গজেন্দ্রগমন ভালবাসেন না, তিনিও হয়ত নিজ তন্বঙ্গী-নায়িকাকে "গজেন্দ্র গমনী রাই"এর সহিত তুলনা করেন। যিনি কোন জন্মে হয়ত মুক্তা দেখেন নাই, তিনিও "মুক্তার মত দন্ত পাঁতি" বলিতে ছাড়েন না। তুষার দর্শন খুব কম বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু তবু সকলেই নিষ্কলঙ্ক শ্বেত বুঝাইবার জন্য তুষারের উল্লেখ করেন। সংস্কৃত কবিগণ কেকার বড ভক্ত। আমার কিন্তু ময়ূরের ডাক ভাল লাগে না। আমি কেন কেকার মোহিনী-শক্তির বর্ণনা করিব? আমরা বাস্তবিক যে সকল পশুপক্ষীর রূপে, গতিতে, বা স্বরে মুগ্ধ হই, যে সকল বৃক্ষলতা, ফলপুষ্পের শোভা ও সৌরভে আকৃষ্ট হই, যদি কাব্যে তৎসমুদয়েরই উল্লেখ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই পাঠকগণের মনে একটা সৌন্দর্য্য, সুস্বর বা সৌরভের ছাপ পড়ে। কারণ পুরাতন পুঁথিগত উপমা-গুলা কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা হৃদয়ে কোন ভাববিশেষের উদ্রেক করিয়া দেয় না। কিন্তু প্রত্যেক কবিকে যদি স্বানুভূত সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময় "সাধু" ভাষায় কুলায় না; তাঁহাকে প্রাদেশিক কথিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই কথিত ভাষার অভিধান না থাকিলে অপর প্রদেশের লোকেরা তাঁহার কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে না।

(৬) প্রাদেশিক ভাষা হইতে চরিত্রতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান অনুশীলনের বিশেষ সুবিধা হয়। এই বিষয়টি এরূপ গুরুতর যে ইহা লইয়াই একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। আমরা এখানে কেবল দুই একটি সামান্য উদাহরণ দিব। যে জাতির ভাষায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু অক্ষরের যত বেশী প্রচলন, সাধারণতঃ তাহাদের স্বভাব তত রুক্ষ ও বীর্য্যশালী। যেমন মারাঠাদিগের ভাষা।

জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে এই নিয়ম যেমন সত্য, এক জাতি ও ভাষার অঙ্গীভূত পৃথক পৃথক স্থানের লোক ও প্রভাষা সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলের কথা বড় কর্কশ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঁকুড়ার মত বঙ্গের আর কোথাও বোধহয় "ড়" অক্ষরটির এত ব্যবহার নাই। প্রথম, "বাঁকুড়া" নামটিতেই "ড়" আছে। তাহার পর আরও কতকগুলি স্থানের নাম শুনুন। লড়্রা, কড়্রা, বদ্ড়া, মুড়্রা, সেন্দড়া, কেঞ্জ্যা-কুড়া, আড়্রা, মোষ্যাড়া, কুলমুড়া, তেঁতুলমুড়ী ঝাড়্-মাসড়া, খামারবেড়্যা, জামজুড়ী, বেল্যাড়া, বেল্যাতোড়, বড়জোড়া, কলাইবেড়্যা, প্রভৃতি। "ড়" যুক্ত নামের একটি ছড়া আছে। সেটি ভুলিয়া গিয়াছি। নতুবা তাহা নিশ্চয়ই পাঠকগণের কৌতুক উৎপাদন করিত।

আর একটি উদাহরণ দিতেছি। "মুখখোলা" স্পষ্ট উচ্চারণ অপেক্ষা "মুখ-বুজা" অস্পষ্ট উচ্চারণ সভ্যতর বটে, কিন্তু উহা আলস্যের পরিচায়ক। যেমন, বাঁকুড়ার লোকের মত "হুঁকা" বলিতে হইলে মুখ যতটা "হাঁ" করিতে হয় এবং যেমন স্পষ্ট "আ" উচ্চারণ করিতে হয়, সভ্যতর কলিকাতাবাসীদের মত হুঁকো বলিতে হইলে ততটা মুখব্যাদান করিতে হয় না। অন্ত্যস্বরটাও না স্পষ্ট "ও"-কার, না স্পষ্ট "আ"-কারের মত উচ্চারিত হয়। এখন প্রাদেশিক ভাষা হইতে ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষার কিরূপ সুবিধা, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। ভিন্ন ভিন্ন প্র-ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও শব্দগত বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ব্যতীত এগুলি বুঝা যায় না। প্রথম, ব্যাকরণের কথা। মধ্য ও পশ্চিম বাংলার লোকেরা বলেন, "আমি যাই নাই পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলেন, "আমি গিয়াছিলাম না।" "যাইব, করিব", প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে "যাইমু, করমু" প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত পদ দুইটির সহিত সংস্কৃত "যামি" ও "করোমি" পদদ্বয়ের সাদৃশ্য সকলেই অনুভব করিবেন। এইরূপ সাদৃশ্য হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের সম্বন্ধ নির্ণয় পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে। তাহার পর দেখুন হিন্দীতে বলে, "নেহি যাঙ্গে," বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলে বলে, "নাই যাব," কিন্তু বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "যাব না"। ইহা হইতে হিন্দী এবং পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূমের প্র-ভাষার নিকট সম্বন্ধ অনুভূত হইবে। এই নিকট সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃত অঙ্গন শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ "আঙ্গিনা" "বাঁকড়ী" প্রতিশব্দ "আগনা" বা "এগ্না"। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্নানের ব্রজভাষানুযায়ী প্রতিশব্দ "সিনান" কথাটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়ার লোকেও "সিনান" বলে। বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "কি জন্যে যাব," পশ্চিম বাঁকুড়াবাসী বলে "কিসকে যাব।" এই "কিসকে" কথাটি হিন্দীর অনুরূপ। এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ সংগৃহীত হইলে হিন্দী ও ব্রজভাষার সহিত বাঁকুড়ার প্র-ভাষার সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে। বলাবাহুল্য, কেবল বাঁকুড়ার প্র-ভাষা সম্যক্‌রূপে জানি বলিয়াই ইহার এতবার উল্লেখ করিতেছি। আর একটি কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত ব্যতীত, পারসী, আরবী, ইংরাজী প্রভৃতি শব্দও প্রবেশ করিয়াছে, তদ্রূপ অনেক সাঁওতালী প্রভৃতি অনার্য্য ভাষার কথাও মিশ্রিত হইয়াছে। যেমন, বাঁকুড়া ও মানভূমের অনেক স্থানে "মার দৌড়" না বলিয়া "মার দেলাং" বলে। এই "দেলাং" কথাটি সাঁওতালী ভাষা হইতে গৃহীত।

প্র-ভাষাসমূহের অভিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা বুঝা গেল। এখন কথা এই, এরূপ অভিধান প্রণয়নের ভার কে লইবে?

(দাসী, জুন ১৮৯৫, পৃঃ ৩৪৩)

রামানন্দ এলাহাবাদে বারো বৎসরের উপর ছিলেন। কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়াও আরও কিছু-দিন তিনি এলাহাবাদে থাকেন। এই সময় হইতে রামানন্দের বিপুল কর্ম্মশক্তি নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেসের ডেলিগেট বা প্রতিনিধি হিসাবে রামানন্দ প্রতিবারই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। কংগ্রেসের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, কংগ্রেস রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে যত সামান্যই সক্ষম হোক না কেন, ইহা যে সে সময় বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসমষ্টিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ কৃতিত্বও বড় সামান্য নয়।

উত্তর-প্রদেশে অবস্থানকালে রামানন্দ নিজ আচরণ

দ্বারা সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছিলেন। এই ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করা বড় সহজ ছিল না।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রসার, বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার প্রভৃতি কাজে এই সময়ে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী-প্রধানরা তাঁহার এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন। রামানন্দের এইরূপ একটি প্রধান উদ্যোগ ছিল প্রয়াগ বাঙ্গালী সম্মেলন। ১৩১২ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শক্তি-চর্চ্চা ছিল এই সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মসূচী। এই উদ্যোগের মধ্যেই পরবর্ত্তীকালের বৃহদাকারে আরব্ধ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বীজ যে নিহিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময় 'প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দির' নামীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম সভাপতি ছিলেন রামানন্দ। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সমাজ-হিতৈষী, সাহিত্য-সেবী, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণকে রামানন্দ বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাণিনি অফিসের শ্রীশচন্দ্র বসু, তাঁহার ভ্রাতা বামনদাস বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ওয়াহদেদার, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (ইঁহার পূর্ব্ব নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দের সহপাঠী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রামানন্দের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। বামনদাসের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির বিবিধ বিষয়ের বইগুলি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেন। বামনদাস একবার তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা শুধু বই-ই কেনেন, অবশ্য পড়েনও, কিন্তু তার সারগ্রহণ করিয়া সদ্ব্যবহার করেন রামানন্দ। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসারের উপায় সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র, বামনদাস ও রামানন্দের মধ্যে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হইত। ইহা উক্ত বাঙ্গালী সম্মেলনের মধ্যে আংশিক ভাবে রূপ লাভ করে।

এলাহাবাদ প্রবাসের শেষ দিকে রামানন্দ দুইটি বিশেষ কাজে হাত দেন। এক 'প্রবাসী' ও দুই 'মডার্ণ রিভ্যু' প্রকাশ। মধ্যে বঙ্গ বিভাগ জনিত যে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়, স্বদেশভক্ত রামানন্দ তাহাতে স্বভাবতই জড়িত হইয়া পড়েন। এই স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব থেকেই তিনি মনে-প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। সাদা-সিধা পোষাক ও সাধারণ আহার তিনি গ্রহণ করিতেন। নিজের পরিধেয় কাপড়-জামা স্বহস্তে কাচিতেন—এমনি স্বাবলম্বী ছিলেন তিনি।

রামানন্দ একনিষ্ঠ স্বদেশী হইয়াও যুক্তিবাদী। তিনি এমন কথাও লিখিয়াছেন যে, স্বদেশের সবকিছু ছাড়িয়া বিদেশের সবকিছু গ্রহণ করিলে যদি দেশের ও জাতির সত্যিকার কল্যাণ হয় তবে তাহা করিতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু ইহার অনুকূলে প্রমাণ কোথায়? তাই তিনি স্বদেশীকে যেন পূর্ণমাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তবে তিনি ধ্বংসাত্মক কাজের চেয়ে গঠনমূলক কাজেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ইহার দ্বারাই দেশের যথার্থ কল্যাণ হইবে। বক্তৃতায় ও লেখায় এই কথাই তিনি বারবার বলিয়াছেন।

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ

'প্রবাসী' প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩০৮ সালে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় তিনি সচিত্র কাগজখানি বাহির করেন। এ কার্য্যে তাঁর প্রধান সহায় হন ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ। তাঁহার সাহায্য না পাইলে ঐরূপ নিঃস্ব অবস্থায় এ কাগজ বাহির করা সম্ভব হইত না। 'প্রবাসী' বাহির করিবার সময় রামানন্দ বলেন, কাগজের সম্পাদক যদি তাহার স্বত্বাধিকারী না হন তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং নিজ মতে সর্ব্বক্ষেত্রে চলিবার স্বাধীনতা তাঁহার থাকে না। স্বাধীনচেতা রামানন্দ 'প্রদীপে' সেই অসুবিধা অনুভব করিয়াছিলেন। চিন্তামণি ঘোষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রেস হইতে 'প্রবাসী' ছাপাইয়া দেন। তাঁহার সম্বন্ধে রামানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন, আমাকে টাকার জন্য কখনও তাগিদ দেন নাই। অনেক মাস কাগজ বাহির হইবার পর তবে আমি টাকা দিতে আরম্ভ করি। তাঁহার এইরূপ অনুকূলতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার কোন সঞ্চয় না থাকায়, আমি এরূপ অনুকূল ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হয়ত কাগজখানি বাহির করিতে পারিতাম না, কিম্বা বাহির করিলেও স্থায়ী করিতে পারিতাম না।

রামানন্দ ইহার পূর্ব্বে অনেকগুলি কাগজই সম্পাদনা করিয়াছেন। যেমন, ধর্ম্মবন্ধু, দাসী, কায়স্থ সমাচার (পরে হিন্দুস্থান রিভিয়ু), প্রদীপ। একমাত্র 'প্রদীপ' পত্রিকাতেই তাঁহার আদর্শের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। প্রদীপে যাহার সূচনা প্রবাসীতে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। প্রদীপে শুধু গল্প কবিতা সাহিত্যিক প্রবন্ধই থাকিত না, তাহাতে থাকিত ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ভারতীয় সভ্যতা ও তাহার প্রসার, ভাষা-রহস্য সমালোচনা, ছাত্র-সমস্যা, নারী-প্রগতি, মহাজন-জীবনী। এই নূতন আলোকপাতে রামানন্দই পথিকৃৎ। 'প্রদীপ'ই প্রথম সচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রদীপের যুগে হাফটোন চিত্র সবে হইয়াছিল, কিন্তু তখন ইহাতে খরচ পড়িত খুব বেশি, তবু প্রদীপে হাফটোন চিত্র ও কাঠ-খোদাই চিত্র দুই-ই থাকিত। প্রবাসী বাহির হইবার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "প্রথম যখন রামানন্দবাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি।"

প্রদীপে রামানন্দ 'সাময়িক সাহিত্যের কথা' প্রবন্ধে লেখেন, যে কোন উচ্চমানের পত্রিকাকে স্থায়িত্ব দান করিতে হইলে, তাঁহার মতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এক, সম্পাদক ও পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তিকে হইতে হইবে, দুই, পত্রিকার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা চাই এবং তিন, বিভিন্ন বিষয় লেখার জন্য লেখকগোষ্ঠী তৈয়ারী করা এবং তাঁহাদের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলিয়াছেন, শিক্ষক বা অধ্যাপকের মত সম্পাদকের কাজও সমান পবিত্র।

এইরূপ চিন্তা ও প্রস্তুতির ফলে হইল 'প্রবাসী'। সূচনায় রামানন্দ লেখেন:

সূচনা

"সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা 'প্রবাসী' প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম

করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠককর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এইজন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।"

প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। আবাহন (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রয়াগধামে কমলাকান্ত—শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা, আদর্শ কবি—ঐ, অজন্তা গুহা চিত্রাবলী (সচিত্র), প্রবাসী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীববিদ্যা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ক্ষীরাংকুম্ভ (সচিত্র)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, শর্করা বিজ্ঞান—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রসঙ্গ। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'অজন্তা গুহা চিত্রাবলী' প্রবন্ধ সম্পাদক রামানন্দের রচনা। ভিতরে প্রথমেই পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি: জয়পুরের মহারাজা ও দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মলাটের অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব প্রকাশ হইবামাত্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে ছিল ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী অধিবাসীকৃত স্থাপত্যের পবিত্র নিদর্শনসমূহের সমাবেশ—মঠ, মন্দির, চৈত্য-বিহার, তাজমহল-মিনার, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা প্রভৃতি। কি বিষয়বস্তু, কি চিত্রসৌষ্ঠব উভয় দিক হইতেই 'প্রবাসী' সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল।

'প্রবাসী' এতই সমাদৃত হইল যে প্রকাশের পরই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

চিত্রকলা এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলির প্রতিরূপ প্রকাশে রামানন্দ প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয়তার দিক হইতে যে ইহার গুরুত্ব কত অধিক তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকায় শিল্পী গণপৎ কাশীনাথ ক্ষাত্রে নির্ম্মিত একটি নারী মূর্ত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ভাষা শিখিয়া আমরা ভিন্ন প্রদেশবাসীদের জানিতে ও বুঝিতে পারি। ইহার দ্বারা প্রদেশে প্রদেশে বিরোধ নিরাকৃত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের কৃতিত্ব অসাধারণ। কোন চিত্র বা মূর্ত্তির শিল্পরীতির বিষয় না জানিয়াও সাধারণ মানুষ তাহার ভাব সহজে গ্রহণ করিতে পারে। ইহার দ্বারা পরস্পরের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে আমরা যেমন দ্রুত পরিচিত হইতে পারি এমনটি আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব নয়। চিত্র-সুষমা, রসমাধুর্য্য, অন্তর্গূঢ় আত্মশক্তি—এ সবের সঙ্গেই সাধারণ মানুষ অতি সহজে পরিচিত হইয়া উঠে। আর ইহার দ্বারা জাতীয় ঐক্যবোধ দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। রামানন্দ এই উদ্দেশ্যেই শিল্প তথা চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘটাইতে প্রথম হইতেই কৃতসঙ্কল্প হন। প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই কোন না কোন উচ্চমানের চিত্র প্রকাশিত হইত। ইউরোপীয় চিত্রও ছাপিতেন। এ সম্বন্ধে রামানন্দ বলেন, উন্নত ও উৎকৃষ্ট শিল্পের কোন জাতি বিচার, দেশ বিচার বা ধর্ম্মবিচার নাই, ইহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের।

স্বদেশীয় চিত্রশিল্পীদের—যাঁহাদের ছবি সে সময় ছাপা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রবি বর্ম্মা, রাম বর্ম্মা, গণপৎ কাশীনাথ ক্ষাত্রে, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহুবর্ণ চিত্রের প্রকাশ রামানন্দই প্রথম 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। 'প্রবাসী' ১৩০৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হয়। পরে কলিকাতায় কুন্তলীন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ হইতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা সুরু হয়। 'সুজাতা ও বুদ্ধ', 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' তাঁহার বিখ্যাত চিত্র দুটি কিন্তু এক রঙে ছাপা হয়। ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি চিত্রও রঙীন দেখিতে পাওয়া গেল না। কলিকাতায় হাতে আঁকা বহুবর্ণ চিত্রের রঙীন ব্লক করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। পরে অবশ্য বহু রঙীন চিত্রই তাঁহার প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর চেষ্টায় এ দেশে ব্লক নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার ঋণ ভুলিবার নয়। কাগজে ছবি ছাপিবার রেওয়াজ আমাদের দেশে তখন ছিল না। সকল শিল্পীই তখন একরূপ অজ্ঞাত ছিলেন। রামানন্দই

তাঁহাদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছবি ছাপাইয়া জনসমাজে পরিচিত করাইয়া দিলেন :

এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ এক সময় লেখেন :

"ছেলেদের জন্যে বই লিখি, কিন্তু সে-বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু, এই নয় ব্লক তৈরী করাতে ছুটতে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে! হাফটোন এবং থ্রী কলার বলে। দুটো জিনিষই তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দবাবুর মাথায় খেয়াল উঠল সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ করার। আমি তখন আছি এলাহাবাদে চার্চ্চ-রোডে জজ সাহেবের বাংলোয়, আর রামানন্দবাবু থাকেন ভরদ্বাজ-আশ্রমের কাছাকাছি আর একটা বাসায়—দু'জনেই প্রবাসী আমরা! ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণিবাবু তখন নতুন ছাপাখানাটা সুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর, সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবারই ভবিষ্য অবস্থান তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। সেই সচিত্র মাসিক পত্রের আরম্ভের যুগে সেই সময়ে রামানন্দবাবুর দুঃসাহসে ভর করে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার দেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেকদিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আসত ভাবনাটা; তাই রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষ না বিপদে পড়েন। সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমানভাবে চলে এল, নতুন নতুন আর্টিষ্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে। এ যে হ'ল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু। নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আলবামে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে, আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপাতো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলে-খেলার ছবি সস্তম, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু।

কোথায় ছিল তখন নবযুগ, কোথায় বঙ্গবাণী, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় বা বসুমতীর পুরস্কার! প্রবাসীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বিনা মূল্যে দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্ক বহু বৎসর আগে সেই প্রবাসে স্থির হয়ে গেছে। এখনকার আর্টিষ্ট তাঁরা কেউ সত্যিই আমার ছাত্র—কেউ ছাত্র না হয়েও ঐ নামে চলে যায়, সবাইকে 'প্রবাসী' বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক থেকে বল্‌ছি, শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩।"

রামানন্দ প্রথম হইতেই প্রবাসীকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। কাগজখানিকে শুধু সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন করিলেই চলিবে না, প্রথম শ্রেণীর লেখকদের রচনাসম্ভারে পূর্ণ করাই যথেষ্ট নয়, ইহাকে স্থায়িত্ব দান করিতে হইলে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, কাগজখানিকে নিয়মিত-ভাবে প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। প্রথম প্রথম তাহা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে ইহা মাসের পয়লা তারিখে বাহির হইতে লাগিল। আর একটি ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন লেখকদের লেখার জন্য দক্ষিণা দানের ব্যবস্থা। এ রীতির প্রবর্ত্তন তিনিই প্রথম করেন।

'প্রবাসী' প্রকাশ করিতে প্রথম বৎসরেই দেড় হাজার টাকা লোকসান হইয়া গেল। তথাপি দ্বিতীয় বৎসর হইতে ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। প্রথম যখন 'প্রবাসী' প্রকাশিত হয়, সম্পাদক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মিলিয়াই সমস্ত প্যাক করার কাজ করিয়াছিলেন। কুটির-শিল্পের মত করিয়া কাজ সুরু হয়।

রামানন্দ বিশ্বাস করিতেন, আমরা প্রথমে ভারত-বাসী, পরে বাঙ্গালী। ভারতবাসীর পক্ষে যাহা

কল্যাণকর, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর পক্ষেও তাহা কল্যাণপ্রসূ না হইয়া পারে না। প্রবাসী ক্রমান্বয়ে ভারতবাসীর বিবিধ সমস্যার আলোচনা ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। চিন্তাশীল পণ্ডিত লেখকগণ ইহাতে সারগর্ভ রচনা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই রামানন্দের লক্ষ্য। কাজেই উন্নতি-মূলক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, উদ্যোগ, অনুষ্ঠান এই সকল আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা-সাহিত্য যেমন প্রাচীন সংস্কৃত, পালী, এবং আধুনিক বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল, গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি। অনুবাদ-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, পুরাবৃত্তের কাহিনী প্রভৃতির কথাও উল্লেখযোগ্য। চাকমা, মিস্‌মি, নাগা, খাসিয়া, কোল প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতিদের সংস্কার ও সমস্যাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ ক্রমে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিবিধ শিল্প—লবণ শিল্প, শর্করা শিল্প এবং নানা প্রকার শিল্প ও কৃষি বিষয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চিত্র সহযোগে বহু প্রবন্ধ ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। শিক্ষা ও সেবামূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান, যেমন অন্ধদের বিদ্যালয় প্রভৃতিও নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে সবিস্তারে ও চিত্রসহযোগে লিখিত হয়। জাতীয় মহাসমিতির প্রত্যেকটি অধিবেশনের বিবরণ ও কার্য্যকলাপের কথা প্রবাসীর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া উঠে। জাতিগঠনমূলক প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রবাসীই প্রথমাবধি সজাগ। বিশেষ করিয়া রামানন্দের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' একটি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক রচনা।

রামানন্দ লোকশিক্ষক। সাধারণের মধে স্বল্প পরিসরে ও সুলভে জ্ঞান বিতরণ তাঁহার উদ্দেশ্য। এ কারণ শুধু জাতীয় সমস্যা বা বিষয় নহে, বিবিধ বিদ্যারও আলোচনা ক্ষেত্র হইয়া উঠিল 'প্রবাসী'।

ভাষাতত্ত্ব, রাসায়নিক পরিভাষা, হিন্দী পরিভাষা প্রভৃতির আলোচনা হইতে ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিচিন্তা ও প্রসার লাভ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ, রেডিয়াম প্রভৃতি—জগদীশচন্দ্র বসুর নব নব আবিষ্কার উদ্ভিদতত্ত্ব, পক্ষীতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, লোকগাথা ও লোকসংস্কৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, জাতিতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালী তথা ভারত-বাসীর সমুদ্রপারে উপনিবেশ স্থাপন, দেশ-বিদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতি কত বিষয়ই না প্রবাসীতে লেখা হইত।

এই সময় চিন্তাবীর ও কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ রামানন্দ কলেজের কাজ করিয়াও প্রবাসী সম্পাদনায় কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়াও নানাবিধ সভা-সমিতিতে তাঁহাকে যাইতে হইত। ইহার মধ্যে আসিল বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্ত। স্বদেশভক্ত রামানন্দ এতদিন নীরবে কার্য্য করিয়াছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াও একবার ব্যতীত কখনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দেন নাই। কিন্তু রামানন্দ এবারে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মায়ের ডাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে আসিয়া একেবারে জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এ সম্বন্ধে রামানন্দ লেখেন :

"বঙ্গ বিভাগ—লর্ড কার্জ্জনের মত খারাপ শাসন-কর্ত্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা ঠিক্ তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে? আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে একথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Growth of the English Constitution নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন :

"Srange it may at sight seem that the founder of the later liberties of England was not an English man. Simon of Mount Fort, a native of France, did for the land of his adoption what even he might not have been able to do for the land of Birth. Any why? The land of his birth was—Shall I say Flourshing or suffering? Under the baleful vitues of he most righteous of kings. Saint Lewis reigned in France, Saint Lewis the just and holy, the man who has never swerv-

ed from the path of right, the who sware to his own hindrance. Under his righteous rule there could be no ground for revolt or disaffection. By surrounding the crown with the reflected glory of his own virtues, he did more than any other to strengthen its power. He thus did more than any-other man to pave the way for that foul despotism of his successors whose evil deeds would daily vexed his righteous soul. In England on the other hand, we had the momentary curse, the lasting blessing of a succession of evil kings. We had kings had no spark of England feeling in their breasts, but from whose follies and necesities our fathers were able to wring their freedom, all the more lastingly because it was bit by bit that is was wrung. A Latin poet once sang that freedom never flourishes more brightly than it does under righteous king. And so it does white while that righteous king himself tarries among men. But, to win freedom as an heritage for ever, there are times when we have more need of the vices of king than of their virtues. The Tyranny of our Angevin masters woke up English Freedom from its momentary grave."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর। কারণ, অপরের ভাল রাজার, প্রদত্ত অধিকার নিজস্ব জিনিষ নয়, তেমন স্থায়ীও নয়; যাহা নিজে বুঝিয়া, জিনিয়া লওয়া হয়, তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি। তবে এ কথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস চাই, স্বার্থত্যাগ চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে মনুষ্যত্বকে, আত্মমর্য্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে স্বার্থত্যাগ আছে কি? যদি পারি, তাহা হইলে লর্ড কার্জ্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালীকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতে গিয়া বাঙ্গালীর একতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যদি আমরা জাতীয় জীবনের মাল মসলা সম্বন্ধে একান্ত নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয়তার মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে যথার্থই বঙ্গমাতার পূজা করিতে পারিব।

বঙ্গবিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্য্যন্ত যে-সকল সরকারী কাগজপত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যপ্রদেশের ওড়িয়াদিগকেও বাংলার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙ্গলা বলে ও একই শাসনকর্ত্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছেন! অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতার (**old associations**) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জ্জিলিঙ্গকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গলাকে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্কযুক্তিতে গবর্ণমেণ্টের হার হইয়াছে; তবু গবর্ণমেণ্ট নিজের গোঁ ছাড়িতেছেন না। এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র? না, তা নয়। এরূপ একগুঁয়েমির গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই, হয়তো কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা।...

যাক্ সে কথা। আমরা বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি প্রকৃত কারণ নহে; গূঢ় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ

লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকারমত খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি না; কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধর্ম্ম হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। সরকারী কাগজপত্রে অনেক সময়ে মিথ্যা কথাই থাকে; অবশ্য তৎসমুদয় হইতে সত্য বাহির করা যায় বটে; কিন্তু রাজপুরুষেরা মিথ্যাবাদী, এইরূপ সন্দেহ করিয়া অগ্রসর হইলে তবে সত্যের দেখা পাওয়া যাইতে পারে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার **Methods of Historical Study** নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন:

"But when we come to for manifestos, proclamations, diplomatic which have not yet reached the stage of treaties, the case is wholly different. Here we are in the very chosen region of lies; they are lies told by people who knew the truth; truth may even; by various processes, be go out of the lies; but it will not be out of them by the process of believing them. He is of child like simplicity indeed who believes every royal proclamation or the preamble of every act of Parliament, as telling us, not only certain august persons did, bus the motives which led them to do it;"

ফ্রীম্যান প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সরকারী কাগজপত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে তবে তাহা হইতে সত্য কথা বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দার্জ্জিলিঙ্গের পক্ষে ও মধ্যপ্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি দুটি খাটিল, পূর্ব্ববঙ্গের বেলা তাহা না খাটিতে দেখিয়াই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীন কালাগত সম্বন্ধে, মায়ামমতায় আবদ্ধ একটি জাতিকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য।

এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙ্গালীরা (অর্থাৎ কার্য্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ বিভাগের উদ্দেশ্য। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালী, মুসলমান বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহারী অপেক্ষা কম। তবেই উভয় প্রদেশেই হিন্দু বাঙ্গালীর দাবী-দাওয়া, মত, গভর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন। আমাদের ইহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু বাঙ্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক; বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হউক। আমরা, হিন্দু বাঙ্গালীর ও মুসলমান বাঙ্গালীর স্বার্থ পৃথক, এরকম মনে করিয়া একথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক; ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল, এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, বেহারী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম; এই জন্য তাহারা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দু বাঙ্গালী নেতারা যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী করেন, তাহা যদি সামান্য হয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমান বাঙ্গালী ও বেহারীরা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা অপর সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে থাকুন; স্বার্থান্বেষী ইংরাজ রাজপুরুষদের দ্বারা তাঁহাদের সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন; ইহাই আমাদের অভিলাষ। সমস্ত বাঙ্গালীর একত্র থাকা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইবে। এইরূপ কিছুদিন চলিতে থাকিলে যখন বাঙ্গালী মুসলমানগণ শিক্ষাগুণে হিন্দু-বাঙ্গালীরই মত জাতীয় অধিকার চাহিয়া রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের

ভেদনীতি হয়ত ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। তখন আর স্থান বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর প্রাধান্য অপ্রাধান্যের কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

বাঙ্গলা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ষা বিদ্বেষ নাই। এইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই ভেদনীতি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এই অশুভ নীতি এখানেই থামিবে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেও ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ব্ববঙ্গে চাকুরী পাইবে না, এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে, এবং তাহা হইলে একই জাতির দুই শাখায় রাজপুরুষদের চিত্ততোষক বেশী ঈর্ষাবিদ্বেষ জন্মিবে।

বহু সংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, সকলের টাকা একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের পথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারে, অল্প সংখ্যক লোকে তাহা পারে না, সুতরাং দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

তাহার পর, আর এক কথা। স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের ঐক্যের প্রভাব, আবশ্যক হয়। বাঙ্গালী জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্তার অধীনে দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভাকৃত বিভিন্ন আইনের অধীনে, বাস করিলে, এই জাতির দুই শাখার অভাব, অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পরিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।

আমরা চাই এক হইতে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিভিন্ন আইন, শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতির অধীনে আনিয়া দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন।

সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তোলে। যে-সাহিত্য যত বেশী লোকে পড়ে, যাহার রস ও বল যত বেশী মানুষের হৃদয় হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য্য হইতে বিরত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে পারিবেন। মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচয়িতারা, এবং হয়ত কোন কোন মুসলমান লেখক গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের সহায় হইবেন। বাঙ্গালী সমাজের যদি মাথা থাকে, এবং সেই শীর্ষস্থানীয় লোকদিগের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে স্কুল-পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যাহাই হউক, উচ্চ সাহিত্যের বড় বেশী ক্ষতি বোধ হইবে না। কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার শক্তি যে কিছু কমিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য! এগুলি গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল। ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহক সংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাহকেরা স্বভাবতঃ নিজের প্রদেশের, নিজের জেলার, নিজের সহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা অধিক পড়িতে ভালবাসেন। আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার এক হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির যত জায়গা অধিকার করে, আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা বা অন্যবিধ গুরুতর সমস্যা তাহার সিকি স্থানও পায়না। এই হেতু বঙ্গবিভাগ হইলে কলিকাতার শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ব্ববঙ্গের কথা তত আলোচনা করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হারাইয়া আয়ের ন্যূনতাবশতঃ তেমন সুপরিচালিত হইবে না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের আবির্ভাব হইতে অনেক বৎসর লাগিবে। এই প্রকারে গবর্ণমেণ্টের পথের এক প্রধান কণ্টক সংবাদপত্র কিছুদিনের জন্য ভোঁতা হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করেন। তাই এখন আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয় ঘর ঠিক আছে কি না। আমাদের এক হওয়া সোজা নয়। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (caste) উচ্চতা নীচতার একটা ধূয়া তোলায় বুদ্ধিমান বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আশা করি

এখন সে ঝগড়া থামিয়াছে। তাই এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু মুসলমানকে একই ভগবান, একই দেশের জলবায়ু ও খাদ্যে পুষ্ট করিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। ইংরাজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু লেখকেরা মুসলমানদের উপর অনেক অবিচার করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন। হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন।

হিন্দু মুসলমানের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এখন কোমর বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের যাঁহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানের যে উৎসাহ, বীরত্ব ও একাগ্রতা একদিন তাঁহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা চির দিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বাঙ্গালীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হণ্টর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী এক প্রবল সমুদ্রচর জাতি হইতে পারে। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ তাঁহাদের অমুসলমান ভ্রাতা ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত করুন, মুসলমান পুরুষ ও নারীদিগের মহৎ কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখুন! শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক কাগজে লিখিলে হইবে না। দুরূহ ফরাসী আরবী কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বের উপযুক্ত; এই জন্য শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি। তা ছাড়া, কারণ যাহাই হউক, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক আছে, যাহারা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া হীন মনে করে। ইহাদিগকে মনের ময়লা সাফ করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীর হিতকর কোন মহৎ কার্য্যে হাত দিতে হইবে; কারণ কেবল সরকারের বিরোধিতারূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদের মধ্যে আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ একান্ত বন্ধন জন্মিতে পারে না। সদনুষ্ঠানে একপ্রাণতা হইতে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পারে। শিল্প, বিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন, ইহা উক্ত রূপ একটি কার্য্য। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ করা আংশিক ভাবে আর একটি তদ্রূপ অনুষ্ঠান। আংশিক ভাবে বলিতেছি এই জন্য, যে শুধু এরূপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। বাঙ্গলা দেশে যে সব জিনিষ খুব ভাল হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কাজ, প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষা দান, জ্ঞান দান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সফল হইবে না। কারণ দেশের মঙ্গল বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষা-সাপেক্ষ। একদিনে জাতি তৈয়ার হয় না, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হয় না। আশা, ধৈর্য্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই মহাতপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমরা লুপ্ত পৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার দলের ইংরাজেরা আমাদিগকে কীটেরও অধম মনে করিয়াছেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, জড় পদার্থ-নির্ম্মিত অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নহে: মনে রাখিবেন, সব সব দিন সমান যায় না: মনে রাখিবেন, **Vengeance sleeps long but never dies**; মনে রাখিবেন ন্যায়বান্ ভগবান আছেন: মনে রাখিবেন, পূর্ব্বেকার পরপদানত ইংলণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমানকালের পরপদানত ভারতবর্ষ বিধাতার বরে আবার জাগিবে, উঠিবে।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১২, পৃঃ ৩৫৩)

এলাহাবাদেও বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। বঙ্গভঙ্গের নির্দ্দিষ্ট দিনে কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ, সহকারী অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দেব ও বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ নগ্নপদে কলেজে যান। শহরের মহল্লায় মহল্লায় সাধারণ সভায় উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেকটি সভারই সভাপতি ছিলেন রামানন্দ।

এই সময় বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখকবৃন্দ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্বদেশের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রচনার বিষয়বস্তু ছিল বঙ্গবিভাগের উদ্দেশ্য ও বৃটিশ কূটনীতি, স্বদেশী ও বয়কটের মূলকথা, জাতীয় শিক্ষা, দেশীয় চরকা ও তাঁতের প্রচার, স্বরাজ্য বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সরকারী ভেদনীতি ও মুসলমান সমাজ, নূতন পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজ-সংস্কার, চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান পার্থক্য ও ইহার ফলে সুরাটের 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রভৃতি।

এক কথায় এই সময় হইতে প্রবাসীর আলোচনারও মোড় ফিরিল।

কিন্তু রামানন্দের স্বদেশীব্রত ইহাতেই নিবদ্ধ রহিল না। যে সব কার্য্যে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়, স্বদেশবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্য্যাদাবোধ দৃঢ় হইতে পারে তাহাও ইহার অঙ্গীভূত বলিয়া তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এইজন্যই স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অভিনব আবিষ্কার বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লেখেন :

"কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ানো নয়, জাতীয় দলের সহিত মোকর্দ্দমায় পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেন্টের পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়; সর্ব্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর উদ্ভিদের সাড়া (Plant Response) নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি; কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদের সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা কমিয়া আসিবে। যাহাতে আমাদের কোনও স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা।"

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৩, পৃঃ ২৮২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কেহ অমর্য্যাদা করিলে কিংবা ভারতবর্ষকে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনও কিছু অধিকার লাভের অযোগ্য বলিলে তাহাকে রামানন্দ সহজে মুক্তি দিতেন না। ভারতহিতৈষীদের মুখেও তিনি এমন কথা কোনও দিন সহ্য করেন নাই। ১৯০৭-এ Madras Mail-এর একজন Interviewer মিসেস বেসান্টের জবানীতে ছাপাইয়াছিলেন "English democracy cannot be plainted in India. India is not fitted for it." রামানন্দ রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতে সুরু করিয়া নানা যুক্তি দেখাইয়া যখন এই মতের বিরুদ্ধে লিখিলেন তখন ভারতীয় সংবাদপত্র মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

তাঁহার সুযুক্তি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক নজীর, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী প্রতিভার বলে তিনি ভারতীয় কোন্ কোন্ সমস্যার কি কি সমাধান করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নয়।

স্বদেশী যুগের পর দেশ নিত্য নূতন সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ জামালপুরে অত্যাচার, পূর্ব্ববঙ্গে অরাজকতা, কাল কলিকাতায় পুলিশের জুলুম কি পঞ্জাবে দলন-নীতি যখন যাহা দেখা দিত কোনটাই তিনি ভুলিতেন না। তাহার উপরে দেশের প্লেগ, দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডব তাঁহার মন জুড়িয়া ছিল। তাঁহার মনের ছবি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার কাগজের পাতায় পাতায়। ক্ষুধিত ও পীড়িতের ক্রন্দনে লাটবেলাটেরা যে সকল ভুয়া কথার হরিরলুট দিতেন সেগুলি পিষ্ট করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দেওয়া ছিল তাঁহার কাজ।

১৩১৪ সাল হইতে 'প্রবাসী'র নবযুগের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যায় একটি কবিতা লেখেন। তাহার পর দীর্ঘদিন কিছু লেখেন নাই। এলাহাবাদে থাকিতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে রামানন্দের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। রামানন্দের বড় ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে নিয়মিত লেখেন। ১৩১৪ ভাদ্র সংখ্যা হইতে তিনি 'গোরা' উপন্যাস লিখিতে সুরু করেন। ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর নিয়মিত লেখক। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

'প্রবাসী' তখন বাংলায় ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিকট বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রচার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। কিন্তু তখনও পত্রিকাখানি লাভের মুখ দেখিতে পায় নাই। স্বদেশীর সময় রামানন্দ দেখিলেন, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা এবং ভারতবাসীর জাতীয়তা-বাদের আদর্শ ভিন্ন ভাষাভাষীর গোচরে আনিতে হইলে ইংরেজীর মাধ্যমে তাহা প্রচার করা আবশ্যক। আর একটি কারণেও একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তখন বিশেষভাবে অনুভূত হইল। শুধু বঙ্গেতর অপরাপর প্রদেশবাসীর মধ্যে নয়, শাসক-জাতি এবং বিশ্ববাসীর মধ্যেও আমাদের মর্ম্মকথা জানাইবার পক্ষে ইংরেজী পত্রিকার গুরুত্ব অনেকখানি। ইহারই ফল 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা।

'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা ১৯০৭ জানুয়ারী মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহাও এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। এই কাগজ বাহির করিবার পূর্ব্বে অনেকেই তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংকল্প হইতে চ্যুত হন নাই।

'মডার্ণ রিভ্যু' প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত মহলে সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়। ঐ সময়কার চিন্তাশীল সুধিবৃন্দ ইহাতে সারগর্ভজাতীয় উন্নতিমূলক বিবিধ রচনা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, ঐতি-হাসিক, অর্থ ও রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যরসিক, শিল্পসমালোচক, সমাজসেবী অনেকেই। যেমন, আচার্য্য যদুনাথ সরকার, ভগিনী নিবেদিতা, কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরি, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রজনীকান্ত গুহ, 'লীডার' সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র বসু, বামনদাদ বসু, লজপৎ রায়, আনন্দ কুমার স্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনশা এদুলজি ওয়াচা প্রভৃতি।

বাংলা তথা ভারতে তখন স্বদেশী আন্দোলন হেতু নব অভ্যুত্থানের যুগ। মনীষীদের দৃষ্টি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে। রামানন্দ এইরূপ মহেন্দ্রক্ষণে 'মডার্ণ রিভ্যু' প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের চিন্তারাজি ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের কাহিনী পরিবেশনের ক্ষেত্র করিয়া দিলেন। মডার্ণ রিভ্যু যে নূতন বার্ত্তা লইয়া আবির্ভূত হইল তাহা দিকে দিকে ভারতবাসী এবং বিদেশী ভারতহিতৈষী উভয়ের মনেই একটা আলোড়ন উপস্থিত করে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল রামানন্দের notes বা সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি।

মডার্ণ রিভ্যুর পীঠস্থান এলাহাবাদ। রামানন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের শাসন-প্রক্রিয়া ফাঁস করিয়া দিতে থাকেন। দৃষ্টি পড়িল ব্রিটিশ-শাসকদের। কিন্তু রামানন্দকে জালে ফেলা কঠিন ছিল। তাহা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে 'মডার্ণ রিভ্যু' পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিল, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ ছাড়িতে হইল।

রামানন্দ স্বদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। নানা সুখ দুঃখের মধ্যে কাটাইলেও এলাহাবাদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কলিকাতায় আসিয়া পত্রিকা দুইখানি কুন্তলীন প্রেস হইতে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর কলিকাতাই রামানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় আসিয়া 'প্রবাসী'র মলাটে লিখিলেন,

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাসখতে সমুদায় দিলে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।।"

অনেকের ধারণা আছে, প্রবাস হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া পত্রিকাখানির নাম 'প্রবাসী' হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য নয়, উক্ত কবিতা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও লেখেন :

তোমার সম্পাদিত প্রবাসী এবার ষড়বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গের বাহিরে সুদূর এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, প্রবাস হইতে প্রকাশিত হইল

বলিয়াই বোধ হয় পত্রিকাখানির নামকরণ হইল প্রবাসী। পরে জানিতে পারিলাম, তখন হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলে। প্রবাসীর মলাটে লেখা থাকিত,

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাস-খতে সমুদয় দিলে॥"

অনেকদিন হইতেই দেশে চারিদিকে একটা জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে। অতি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা প্রতিদিন জাতীয় জীবন কলুষিত করিতেছে। দেশের যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন দুঃখকে সে নানা দিক্ দিয়াই নিদারুণ করিয়া তোলে। কেবলমাত্র অতীতের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি। কথারগ্রন্থি বন্ধনে আমরা যে-জাল বিস্তার করিয়াছি, সে জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে: ভয়ের অতীত হইতে হইবে; সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টাও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু। এই নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলোক আছে। যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জাতীয় জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়। এ-সব অন্ধকারের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। যে শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্বের অনুসন্ধান করিত,... সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশে অন্তর্হিত হয় নাই। এ শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু।
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩।

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় ফিরিয়া কিছু সময়ের মধ্যেই রামানন্দ সব গুছাইয়া লইলেন! আর ইহাতে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন স্ত্রী মনোরমা দেবী।

রামানন্দ দল-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী হইয়াও কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইতে পারেন নাই। গোয়েন্দা-বিভাগ বেশ কিছুদিন তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। নির্ভীক রামানন্দ ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তখন বিপ্লবীদলের কার্য্যকলাপ সবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সময় বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত আলিপুর মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ছাপাইয়া কম সাহসের পরিচয় দেন নাই। আবার নিতান্ত সন্দেহবশে বাংলার নয় জন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও নেতা যেমন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধেও সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করিয়া জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

'প্রবাসী' ক্রমে লোকশিক্ষার ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। শুধু সুবিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্যই নহে, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও সাধারণ শিক্ষিত জনেরও ইহা মনের খোরাক যোগাইতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ চিত্তবিনোদন ও চিত্তোৎকর্ষ দুইই ছিল সম্পাদক রামানন্দের রচনা পরিবেশনের লক্ষ্য। একদিকে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, অপরদিকে দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উন্নত-মানের রচনায় 'প্রবাসী' সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহা দ্বারা সম্পাদক রামানন্দ প্রবাসীতে এমন কতকগুলি বিভাগ খুলিলেন, যাহার ফলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ দেশ-বিদেশের জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন।

এইখানে রামানন্দের একটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিতে হয়। রামানন্দের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ মডার্ণ রিভ্যুতে তাঁহার রচনার অনুবাদ পাঠাইতে সুরু করেন। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' মডার্ণ রিভ্যুতে প্রথম প্রকাশিত হয়—যে বইখানির উপর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান।

রামানন্দ প্রথম আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত তাঁহার নব নব আবিষ্ক্রিয়ার কথা চিত্র-সহযোগে প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।

ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রচারক ছিলেন রামানন্দ। রঙীন চিত্র ছাপাইবার সুযোগ পাইবামাত্র তিনি এইদিকে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। শিল্পী-মন, সংগ্রহে ব্যস্ত। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুকুলচন্দ্র দে, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুখলতা রাও প্রভৃতির বহু চিত্র প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। এইগুলি একত্র করিয়া পরে "Chatterjee's Picture Album" (১৭ খণ্ড) নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার কোন কোনটি ছবি ছাপা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সহিত রামানন্দের ঘনিষ্ঠতা তখন সর্ব্বজনবিদিত। রামানন্দের ইচ্ছা ছিল, বিদেশী পত্র-পত্রিকা হইতে কৌতূহলোদ্দীপক অথচ শিক্ষাপ্রদ জ্ঞানবর্দ্ধক বিচিত্র বিষয়ের সংকলনের ভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। বন্ধুর অনুরোধ রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সংকলনগুলি লিখিয়া দিবার ভার লইলেন। এই আদর্শেই অনুবর্ত্তরূপে 'কষ্টিপাথর' নামক একটি বিভাগ খোলা হয় ১৩১৮ সালে। ইহাতে বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্র হইতে রচনা সংকলন করিয়া দেওয়া হইত। প্রবাসীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে চিত্র-পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা দেওয়া সুরু হয়। এইরূপ বিভাগ পরে অনেকগুলি হইয়াছে। যেমন, স্বরলিপি, আলোচনা, পঞ্চশস্য, দেশের কথা। দেশের কথা বিভাগটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক আরম্ভেই লেখেন : "বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বলের সহিত 'প্রবাসী'র পাঠকদের অন্তত কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে আমরা এই দেশের কথা বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কার্য্যকলাপ, মতামত, অভাব-অভিযোগ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব।"

পল্লীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের এই ইচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পল্লীর উন্নয়নে স্বদেশবাসী যেন নিয়ত-সচেষ্ট হন।

দূরদর্শী রামানন্দ রস-সাহিত্য ও মনন-সাহিত্য দুই বিভাগেই প্রবীণদের মত তরুণ লেখকদেরও রচনা পরিবেশনে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিতেন। লেখায় বস্তু থাকিলে তিনি ভাষা সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করিয়া তৎসমুদয় পত্রস্থ করিতেন। তাঁহার সম্পাদনা-নৈপুণ্যের এরূপ খ্যাতি ছিল যে, লেখক রচনা প্রবাসীতে বাহির করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিত এবং জাতে উঠিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত।

'প্রবাসী'র আর একটি বৈশিষ্ট্য পরে লক্ষ্য করা গেল, ভারতীয় শিল্প (পণ্যশিল্প) সম্বন্ধে। ভারতীয় নানা প্রদেশের নানা শিল্পের ফোটোগ্রাফ ছাপিয়া, জিনিষ তৈয়ারী করিবার প্রণালী ও ফর্ম্মুলা ছাপিয়া, দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিয়া—এমন কি কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধেও বড় প্রবন্ধ ছাপিয়া 'প্রবাসী' স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করেন।

এইরূপে জনশিক্ষার বিবিধ উপায়গুলি রামানন্দ ক্রমে ক্রমে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বড় চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : "রামানন্দ জনগুরু। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া রামানন্দবাবু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। আমরা তাহার সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করিতাম তখনকার দিনে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষার কোন সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, উন্নতিশীল জাতির আধুনিক বিবরণ, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি যত বিবিধ তথ্য এই পত্রিকার সাহায্যে জানিয়াছি এবং শিখিয়াছি অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভবপর হইত না। এই হিসাবে রামানন্দবাবু আমাদের যুগের যুবকদের শিক্ষাগুরু।...তিনি একটি মাত্র বিদ্যায়তনের শিক্ষকতার পরিবর্ত্তে দেশব্যাপী যুবকগণের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি।"

এই লোকশিক্ষার ইচ্ছা লইয়াই যে তিনি কাজে নামিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় ১৩০৭-এর 'প্রদীপ'-এর এই প্রবন্ধটি হইতে। রামানন্দ বলিতেছেন : "একখানি

আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আপাততঃ আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয়, তাহা নির্ব্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড়লোকেরা টাকা দেন, তেমনি ভাল কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত।···আমি সম্পাদকের কার্য্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।···স্কুল কলেজের উন্নতি করিতে হইলে endowment চাই। যেমন পুরাকালে চতুষ্পাঠী এবং দেবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূমি দান করা হইত, একালে তদ্রূপ বিদ্যা-মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তি দান প্রয়োজন। আমার মতে সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও এইরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন।"

(প্রদীপ, ১৩০৭)

'ধর্ম্মবন্ধু'র যুগ হইতেই রামানন্দ একাধারে ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখিতেন। এবং অনেক সময়ই দুইখানি করিয়া কাগজের সম্পাদন-কার্য্যেও নিযুক্ত থাকিতেন। যখন তিনি 'ধর্ম্মবন্ধু'র সম্পাদক তখনই তিনি 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এর সহকারী সম্পাদক, আবার যখন তিনি 'প্রদীপ'-এর সম্পাদক, তখন তিনি 'কায়স্থ সমাচার'-এর সম্পাদক। বাংলা 'সঞ্জীবনী' এবং ইংরেজী 'ইণ্ডিয়ান মিরর' উভয় পত্রেই তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন। 'ইণ্ডিয়ান পীপল' এবং 'এডভোকেট'-এর সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এ সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন: "শিক্ষার সহিত তাঁহার প্রথম জীবনে যে যোগ ছিল তাহাতে শিক্ষকের প্রাপ্য মর্য্যাদা তিনি নিজ পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন পত্রিকা-সম্পাদকত্ব বরণ করিয়া লইলেন তখন সেই মর্য্যাদা তাঁহার আসনকে মহীয়ান করিয়া রাখিল···সমাজচক্ষে একাধারে তাঁহার স্থান হইল শিক্ষা-গুরুর এবং সাহিত্যিকের, চিন্তা-নায়কের এবং রস-পরিবেশকের। তিনি ছিলেন জীবনের সমালোচক, জনগণের ও শাসকবর্গের বিবেকের উদ্বোধক।"

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই পরিচয় ক্রমে গাঢ় আত্মীয়তায় পরিণত হয়। নিবেদিতা বাংলা জানিতেন না, কিন্তু আশ্চর্য্য এনই প্রবাসীর সকল খোঁজ-খবরই তিনি রাখিতেন। তিনি ঐরূপ একখানি ইংরাজী কাগজের প্রকাশের সম্ভাবনা প্রবাসীর মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে বলিয়াছিলেন: "ঐ যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন আরও প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।":

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০, পৃঃ ২৬৮)

'মডার্ণ রিভ্যু' প্রকাশের পর ক্ষিতিবাবু আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোক-স্তম্ভের মহাদীপের মত যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়?"

(ঐ)

নিবেদিতা প্রথম প্রথম চিত্র-পরিচিতি হিসাবে বহু চিত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছেন। রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও মডার্ণ রিভ্যুতে ইতিহাস অর্থনীতি, চারুশিল্প, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয় এই সময় হইতেই।

নারী হিতৈষী রামানন্দ

রামানন্দ দেশভক্ত এবং দেশাচারে নানাদিকে নিষ্ঠাবান ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও কোন জিনিসের ওজন ভুলিতেন না। এই জন্য এত বড় দেশভক্ত হইয়াও তিনি ছিলেন সংস্কারক। যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন আছে, সেখানে দেশভক্তির দোহাই দিয়া তিনি চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিতেন না। এবং তাঁহার এই সংস্কারমুখী মন শুধু ধর্ম্ম কি রাজনীতির সংস্কার করিয়া সন্তুষ্ট হইত না। তিনি একদিনের জন্যও ভুলেন নাই যে, সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য ঘোর স্বদেশীর দিনেও ১৩১৩ সনের আশ্বিনের প্রবাসীতে তিনি দীর্ঘ ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, "সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পর সাপেক্ষ।" রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—কোন বিষয়ের সংস্কারকেই তিনি অন্য কোন সংস্কার হইতে ছোট মনে করিতেন না। "এইটি আগে, এইটি পরে," এমন কথাও বিশ্বাস করিতেন না। স্বদেশীর দিনে দেশের নানাপ্রকার শিল্পোন্নতির জন্য তিনি চাষবাসের কথা হইতে সুরু করিয়া চরকা, কাপড়বোনা, কলকারখানা, জাতীয় শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্ক্রিয়া, ইণ্ডিয়ান আর্ট, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিষয় ভাবিয়াছেন এবং তাহার প্রচারকার্য্যে সহায় হইয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য, ধর্ম্ম বা সমাজকে ভুলেন নাই বা বাদ দেন নাই। অবশ্য তিনি একথা বলিয়াছিলেন, "যিনি সংস্কারক তাঁহার কোনও বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না; তবে, ইহা সত্য যে মানসিক প্রবণতা (tendency) ও শক্তির পার্থক্যবশতঃ কেহ বা এক বিষয়ে কেহ বা অন্য বিষয়ে হাত দিবেন। কেহ কেহ আবার একাধিক বিষয়েও হাত দিবেন। কিন্তু ইহা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে সর্ব্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ ও জাতীয় উন্নতি সর্ব্ববিধ সংস্কারসাপেক্ষ।"

যেখানেই কোন সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, রামানন্দ সেখানেই আগাইয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'সমাজ সংস্কার সমিতি'র অধিবেশন হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরও নয়। তিনি লিখিলেন: "কংগ্রেসের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার সম্মেলনে যে প্রায় ৬০০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন, ইহা গভীর আশা ও আনন্দের বিষয়।...... জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার পরিবারিক জীবনের উপর; যে জাতির পরিবার, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির কেন্দ্র হইয়া উঠে নাই, সে জাতি কেমন করিয়া বড় হইতে পারে? তাই নারীকে তার বর্ত্তমান দুর্গতির ঊর্দ্ধে টানিয়া তুলিতে হইবে; কারণ, নর ও নারী একসঙ্গে উঠে ও পড়ে। সামাজিক প্রগতিকে এড়াইয়া রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়; বালির ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণ অসম্ভব। জাতীয় স্বাধীনতার সৌধ স্থায়ী হইবে যদি সামাজিক উন্নতির পাষাণ ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্তপাত ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ যদি বা সম্ভব হয়, তবু তাহা কায়েমী রকমে দখল করিতে হইলে বহু নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কংগ্রেস নেতাদের ভাগ্যে সর্ব্বদা শান্তির আবহাওয়া থাকিবে এবং প্রশান্ত রাজনৈতিক সাগরে পাড়ি দিবার সৌভাগ্য হইবে, ইহা কল্পনা করা যায় না। ঝড় বিপদের অন্ধকার দিন আমাদের সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে। (ইহা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের কথা) সেই মহান্ সংগ্রামে অবিচলিত শৌর্য্য ও ও আনন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরাই যুদ্ধ করিতে পারিবেন যাঁদের গৃহে জননী, ভগ্নী ও পত্নীরা তাঁদের অতন্দ্র সেবায় দিব্য প্রেরণা যোগাইতেছেন।"

তিনি বলিয়াছেন, সমাজ সংস্কার ছাড়া, নরীজাতির উন্নতি ছাড়া জাতির উন্নতির আশা নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন কংগ্রেসের সম্মুখে দেশের রাজনীতিকদের সম্মুখে দুঃখ-দুর্দ্দশার দিন ঝড়-ঝঞ্ঝার দিন আগাইয়া আসিতেছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ সহধর্ম্মিণী মনোরমা দেবী

এমন দিনে নারী যদি রক্ষা-কবচের মত গৃহ হইতে প্রেরণা না যোগান তবে কংগ্রেস-নেতাদেরও সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না।

রামানন্দ নারীকে কেবল নারী বলিয়া সম্মান করিতেন না, আত্মা বলিয়াই করিতেন। তিনি মনে করিতেন, পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ, কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ নহে। তিনি চাহিতেন যে, "নারী নারী প্রকৃতির সমুদয় সদ্‌গুণে ভূষিত হউন।"

নারীর উপর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া রামানন্দ যেরূপ বিচলিত হইতেন সেরূপ প্রায় কোন কারণেই হইতেন না।

তিনি বলিয়াছেন :

"দুর্বৃত্তদের পাশব প্রবৃত্তির আতিশয্য একটা ব্যাধি। তাহার জন্য জেলে তাহাদের ভ্যাসেক্টোমী (Vasectomy) নামক অস্ত্র চিকিৎসার আইন হওয়া উচিত।......"

বাল্যকাল হইতে নারীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উন্নতিসাধন অবশ্য প্রয়োজন এবং পুরুষদের বিপন্নার রক্ষায় সমর্থ হওয়া প্রয়োজন, তিনি মনে করিতেন। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, যে-দেশে অরক্ষিত অবস্থাতেও নারী নিরাপদে বিচরণ করিতে পারে না সে-দেশকে তিনি সভ্য মনে করিতেন না।

নারীর দুঃখ ও অপমান বিষয়ে তিনি বহুবার বহু কথা লিখিয়াছেন।

পরমুখাপেক্ষিতায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় ইহা রামানন্দ মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন: "স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র মনে করেন না যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী বা মাতার ভরণ-পোষণ করিতেছেন; ইহা সত্য। কিন্তু সকল পিতা, স্বামী,—ভ্রাতা বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে।......সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।......যুদ্ধ করা যে নারীর কাজ নয়, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।"

তিনি বলিয়াছেন: "ভরণপোষণের জন্য যাঁহাদের উপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও অর্থকর কোন কাজ করিলে তাঁহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান বাড়ে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যদেরও ধারণা উচ্চতর হয়।"

নারীদের প্রতি অত্যাচার বিষয়ে তিনি প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০ সালে বিবিধ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"জগতের সভ্যতম দেশ সকলেও মানুষ অনেক বিষয়ে বর্ব্বরতার অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। একটি বিষয় এই যে, দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই সুবিধা পাইলেই শত্রু জাতির স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের সময় যে যে দেশে অবস্থিত ছিল, সেখানেই স্ত্রীলোকদের উপর পাশব আচরণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময়েই হউক, কিংবা শান্তির সময়েই হউক, নারীর উপর এইরূপ অত্যাচার যখন আর হইবে না, তখন বুঝা যাইবে যে, মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবত্ব লাভ করিয়াছে।

বস্তুতঃ নারী যে দেশে, অরক্ষিত অবস্থাতেও যত নিরাপদ, সেই দেশকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। নারীর নিঃশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন সভ্যতার একটি মাপকাঠি।

আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা আমাদের জাতির কোন দোষের আলোচনা করিলেই পাশ্চাত্য দেশসকলে সেই দোষ বা তাহার মত অন্য কোন দোষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এবং মনে করেন যে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল যে, আমরা খুব ভাল। কিন্তু যদি কোন দোষ পৃথিবীর সকল দেশে থাকে, তাহা হইলেও তাহা দোষ; এবং তাহা আমাদের মধ্যে থাকিলে তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে আগে আগে যখন যুদ্ধ হইয়াছে তখন নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে। আধুনিক সময়েও মোপলা বিদ্রোহের সময় এই প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া, আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা প্রভৃতিতেও নারীর উপর অত্যাচার হয়। পুলিশের দ্বারা এরূপ অত্যাচার বিরল নহে। ডাকাইতরাও কখন কখন এইরূপ অত্যাচার করে।

নারীর উপর আর একপ্রকার অত্যাচার আমাদের দেশে শান্তির সময়ে হয়, যাহা অন্য কোন সভ্য দেশে হয় কি না জানি না। হইলেও তাহার দ্বারা এদেশের অত্যাচারী পুরুষদের পশুত্ব এবং লাঞ্ছিতা নারীদের আত্মীয়স্বজন ও স্বধর্ম্মীদের কাপুরুষতা প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।

বঙ্গে অনেক দুর্ব্বৃত্ত লোক ভয় দেখাইয়া ও বলপ্রয়োগ করিয়া অনেক বিধবার সর্ব্বনাশ করে। কখন কখন আদালতের বিচারে এই নরপশুদের শাস্তি হয়; কিন্তু তাহাতে এই প্রকার পাপাচার কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা পাশব আচরণে যে কুসাহস দেখায়, সৎ লোকেরা তাহা দমনে ও নিবারণে তাহা অপেক্ষা বেশী, অন্ততঃ তাহার সমান, সৎসাহস না দেখাইলে ইহার প্রতিকার হইবে না। সমাজের মধ্যেও নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। এখন যে-সব দুর্ব্বৃত্ত লোক এই সব কাজ করে তাহারা সমাজে পতিত হয় না, কিন্তু লাঞ্ছিতা নারীরা সমাজ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। যেসব দুর্ব্বৃত্ত লোক এইরূপ কাজের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তাহারা পর্য্যন্ত বুক ফুলাইয়া সমাজে দশজনের সহিত অবাধে মেলামেশা করে। সমাজ-দেহে প্রাণ থাকিলে লাঞ্ছিতারা পতিতা বা পরিত্যক্তা হইতেন না, দুরাচার পশুরাই পতিত ও বহিষ্কৃত হইত।

এক দিকে অসুরত্ব ও পিশাচত্বের এবং অন্যদিকে কাপুরুষতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে বার বার পাওয়া যাইতেছে। পতিগৃহ হইতে, পতির ও আত্মীয় স্বজনের সম্মুখ হইতে জোর করিয়া স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের দৃষ্টান্ত আর অন্য কোন সভ্য দেশে পাওয়া যায় কি না জানি না। এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত পড়িলে মুমূর্ষ বৃদ্ধেরও রক্ত গরম হইয়া ওঠে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, এবং বুদ্ধদেব প্রভৃতি জগতের সাধু-শিরোমণিগণের অহিংসার উপদেশ ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু উত্তেজনায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কোন লাভ নাই। প্রতিকার কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে হইবে।

বাল্যকাল হইতে নারীগণকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের দেহে বল ও মনে সাহস হয়, এবং যাহাতে তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষা নারীধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, প্রয়োজন হইলে আততায়ীর প্রাণ বধ করিয়াও ধর্ম্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এইজন্য তাঁহাদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখান উচিত। কোন কোন মহিলা আততায়ীর প্রাণ বধ করিয়া কিংবা তাহাকে জখম করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, এরূপ আধুনিক ঘটনার বৃত্তান্ত খবরের কাগজে অনেকে পড়িয়া থাকিবেন।

দৈহিক বল আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের জোর আরও বেশী আবশ্যক। যে আত্মরক্ষায় মরীয়া, দুরাচার পালোয়ানও তাহাকে ভয় করে। মনের জোর বাড়াইতে হইলে নারীদিগকে স্বাধীনতায় অভ্যস্ত করিতে হইবে। স্বাধীনতায় বিপদের সম্ভাবনা আছে, জানি; কিন্তু সে বিপদ কাটাইবার একমাত্র উপায়ও স্বাধীনতা।

প্রতিকারের উপায়ের গোড়াতেই নারীদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির কথা বলিলাম এইজন্য যে, নারী নিজেই যদি নিজের রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রে ও সব সময়ে তাঁহার রক্ষা হইতে পারে না;—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে। সব বাঙালী ভীরু বা কাপুরুষ নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু সাহস অধিকাংশ বাঙালীর একটি জাতিগত গুণ, ইহাই বা বলি কি প্রকারে? কত বাঙালী সাহসী ও কত বাঙালী ভীরু তাহার বিচার কে করিবে? করিয়া ফলই বা কি হইবে? বাঙালীর ভীরুতার দুর্নাম ঘুচানো প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য। এই দুর্নাম এরূপ রটিয়াছে যে, বঙ্গের বাহিরে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ইহা স্থান পাইতেছে। অনেক দিন হইল, এলাহাবাদের গত ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উর্দ্দু হইতে

ইংরেজী অনুবাদের জন্য যতগুলি বাক্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিতে এতদিন ইচ্ছা হয় নাই, এখন আবশ্যকবোধে দুটি উদ্ধৃত করিতেছি। "বাঙালী লোগ কোই মজবুত কৌম্ নেঁহি হায়" ("বাঙালীরা একটা মজবুত জাতি নহে"), "উন্‌কি .এক খাস্তিং বাত য়েহি হ্যায়, কি, মর্দ্দ আউরতোকে তরেহ আওর আউরতে মর্দ্দো "কি তরেহ মালুম হোতে হ্যায়" (উহাদের সম্বন্ধে একটি আজব কথা এই হয়, উহাদের পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকের মত ও স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের মত মালুম হয়)। এসব কথা কতটা বাহ্য আকৃতি সম্বন্ধে ও কতটা মানসিক গুণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এখন কেবল ইহাই বক্তব্য যে, বাঙালী পুরুষেরা যদি পৌরুষযুক্ত না হন, তাহা হইলে অন্ততঃ বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উদ্ধৃত উর্দ্দু বাক্যটি যেন সত্য হয়।

যেসব পুরুষজাতীয় মানুষ স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহারা ত কাপুরুষ বটেই; যেসব নরপশু নারীর লাঞ্ছনা করে, তাহারাও কাপুরুষ। প্রকৃত পৌরুষ যাহাদের আছে, তাহারা ন্যায্য কারণে পুরুষের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার পরিচয় দেয়। •

প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায়, বাল্যকাল হইতে পুরুষদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা সুস্থ, সবলদেহ, সচ্চরিত্র, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে, এবং নিজের প্রাণ দিয়াও, দুর্ব্বৃত্ত নরপশুর প্রাণ বধ করিয়াও, বিপন্না নারীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

স্ত্রীলোকের উপর যেরূপ অত্যাচারের কথা লিখিতেছি, খবরের কাগজে প্রকাশিত তাহার অধিকাংশ সংবাদে, অত্যাচারীরা মুসলমান, এইরূপ দেখা যায়। অতএব এ বিষয়ে ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানদের কর্ত্তব্য তাঁহারা নিজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ আছে, তাহার প্রচার একান্ত আবশ্যক।

তৃতীয় উপায়, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দুরাচার পুরুষগণের সামাজিক শাসনের সমুচিত ব্যবস্থা।

নারীর আর এক প্রকার লাঞ্ছনার দ্বারা বাঙালী সমাজে কলঙ্কিত। বহু স্বামীর দ্বারা বালিকা ও যুবতী স্ত্রীর উপর এবং অনেক শাশুড়ীর দ্বারা বালিকা ও যুবতী পুত্রবধূর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। কখন কখন শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদেরাও ইহাতে যোগ দেয়। ফলে অনেকে কাপড়ে আগুন লাগাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করে। কোন কোন অত্যাচারের কাহিনী আদালতে বিবৃত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের গোচর হয়। কখন কখন এইসব পিশাচেরা দণ্ডিত হয়। বধূর অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ও ঘৃণ্য কারণ, তাহাকে পাপাচরণ দ্বারা রোজগারে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা ও সেই রোজগারের টাকা নিজেরা লইবার ইচ্ছা।

এইরূপ অভিযোগও আদালতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? বাড়ীর লোকেরা বালিকা বা যুবতী বধূকে বধ করিয়াছে ও পরে আত্মহত্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ ঘটনাও আদালতে উপস্থিত হইয়াছে।

যত প্রকারের যত অত্যাচার প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অত্যাচার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন করিয়াই হউক, এবং যেরূপ অযোগ্য পাত্রের সহিতই হউক, প্রত্যেক বালিকার বিবাহ দিতেই হইবে, এই ধারণা ও রীতির উচ্ছেদ সাধিত না হইলে, এবং সুশিক্ষার দ্বারা নারীর ধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, আত্মরক্ষণ সামর্থ্য, উপার্জ্জন ক্ষমতা, ও স্বাবলম্বন শক্তি বৃদ্ধি না হইলে কল্যাণ নাই। তাঁহাদিগকে "দেবী" বলিলে এবং "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" ("যেখানে নারীরা পূজিত হন তথায় দেবতারা বিরাজ করেন"), এই শাস্ত্রীয় বচন বার বার উদ্ধৃত করিলে কেবল ভণ্ডামিই বৃদ্ধি পাইবে, যদি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক ব্যবহার আমাদের কথার অনুরূপ না হয়।

শুধু স্ত্রী-শিক্ষার কথাই তিনি বলেন নাই। তাহাদের

উন্নতিতে কাহাকেও কিছু করিতে দেখিলে উল্লসিত হইতেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের কথায় তিনি লিখিয়াছেন :

"ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(১) এই মহামণ্ডল স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতি সাধন করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রী জাতিকে একত্র করিবার জন্য ইহার সভ্যাদের মধ্যে সাময়িক মিটিং হইবে। (৩) ভারতবর্ষীয় নারীদিগের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইবে। (৪) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে ভারতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার হয় ও সদ্‌গ্রন্থসকল স্বল্পব্যয়ে ও সহজে তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

(৫) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে "পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার" নামে ডিপো খোলা হইবে। ঐরূপ নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণ পোষণের উপায় হইবে···স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা এখন আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন······প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে অন্তঃপুরে শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। যে সকল মহিলা অল্প লেখা-পড়া জানেন, তাঁহারাও অপরকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইয়া দিতে পারেন। অল্পশিক্ষিতা বা অধিক শিক্ষিতা প্রত্যেক মহিলা বিদ্যাদানকে একটি ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতে পারে।···"

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৮, পৃঃ ৬৫০)

দেশ-প্রেমিক রামানন্দ

রামানন্দ-চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক হইল, তিনি দেশ-প্রেমিক। এই দেশ-প্রেমই তাঁহাকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। দেশকে তথা মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার কল্যাণে অমন করিয়া তিনি আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। সাংবাদিক জীবনে এই দেশের কথাই তিনি সবচেয়ে বেশি বলিয়াছেন। দেশ কি, দেশ কি সকলের উপরে, দেশকে বড় করিতে হইলে মানুষের কি কর্ত্তব্য—এই সকল বিষয়ে বার বার আলোচনা করিয়া মানুষকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার তিনটি প্রবন্ধ হইতে আমরা সবিশেষ জানিতে পারিব :

"দেশ কি সকলের উপরে ?—যে মানুষ নিজের সুখ ও স্বার্থকে নিজের পরিবার বর্গের সুখ-সুবিধার উপরে স্থান দেয়, তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। যে ব্যক্তি দেশের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের পরিবারবর্গের সাংসারিক সুবিধা আগে দেখে, তাহার চরিত্র অনুকরণযোগ্য নহে। কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি অপেক্ষাও জগৎ ও মানবজাতি বড়, এবং ভগবান ও ধর্ম্ম সকলের উপরে, ইহাও ভুলিলে চলিবে না। স্বদেশ-প্রেমের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু গর্হিত উপায়ে পৃথিবীর অনেক জাতির লোক স্বজাতির উপকার করিতে চাহিয়াছে। এই জন্য মনে রাখা দরকার যে, যাহা সমগ্র মানব জাতির ও সমুদয় জগতের পক্ষে কল্যাণকর নহে, এবং যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তাহা স্বদেশের পক্ষেও কল্যাণকর। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন, "আমরা দেশের লোকের কথা না ভাবিয়া আগে 'গ্রীণ-ল্যাণ্ডের' কথা ভাবিতে পারি না।" কিন্তু তাহা করিতে বলা হইতেছে না। নিজের, নিজের পরিবারবর্গের, নিজের গ্রামের বা শহরের ও নিজের দেশের কল্যাণ কিসে হয়, তাহা আগে ভাবাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং যাহারা যত নিকটে আছে তাহাদের পক্ষে মঙ্গল সাধন তত সহজ। যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, তাহাতে কল্যাণ হইতে পারে না ; এবং যাহা দ্বারা অপরের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয়, তাহাতে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না। অনিষ্ট ও অকল্যাণ কথাগুলির মানে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। একজন চোর যদি আমার বাড়ী হইতে আমার জিনিস মধ্যে মধ্যে চুরি করে, তাহা হইলে তাহার চুরির পথ বন্ধ করা নিশ্চয়ই উচিত। তখন এ আপত্তি করা চলিবে না যে, তাহার চুরি বন্ধ হইলে তাহার আয় কমিবে ও তাহার ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাহার ক্ষতি করিয়া নিজের সম্পত্তি রক্ষা করা অনুচিত। কেননা, চোরের আর্থিক লাভটা তাহার কল্যাণের কারণ নয়, অকল্যাণেরই কারণ।

এইরূপ অনেক জাতি অন্য জাতিদের ধন লুণ্ঠন করিয়া বা অন্য জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিয়া আপনারা ধনশালী হইয়াছে। এই সব পরস্বাপহারক জাতিদের ক্ষতি হইবে বলিয়া, কোন জাতিকে নিজের ধনরক্ষা করিতে, ও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে নিষেধ করা যায় না ; জার্ম্মেণী বা অষ্ট্রিয়া নিজের জন্য চিনি উৎপন্ন করুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমাদের গুড় চিনির ব্যবসা যে কেহ নষ্ট করিয়া ধনবান হইবে, তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা নিজের সুতা ও কাপড় নিজে উৎপন্ন করিব, তাহাতে কোন দেশের লোকের লোকসান হইলে আমাদের তাহাতে কোন অপরাধ নাই, কিন্তু আমাদের যেন এ ইচ্ছা না হয় যে চীনদেশের বা ঐরূপ অন্য কোন দেশের সুতা কাপড়ের

ব্যবসা নষ্ট করিয়া বা তাহাকে বাড়িতে না দিয়া আমরা ধনশালী হইব।"

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫, পৃঃ ১৮২)

কিন্তু দেশ উন্নত হইলেই কি সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে? যাহাদের লইয়া দেশ—সেই দেশের মানুষ যদি 'মানুষ'ই না হইল তবে সবই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলিলেন, আগে মানুষকে 'মানুষ' হইতে হইবে। লিখিলেন :

"মানুষ হওয়া—আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা না জন্মিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। দু চারজন লোকের চেষ্টায় বা দু এক শ্রেণীর লোকের চেষ্টায় দেশ উন্নত হইতে পারে না। অথচ সকল শ্রেণীর লোকের সচেষ্ট না হইবার কারণ অনেক রহিয়াছে। একেই তো অধিকাংশ লোকের ধারণা নাই যে আমাদের দুরবস্থা কিরূপ শোচনীয়; তাহার উপর আবার দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ যে মানুষের, সুতরাং আমাদেরও সাধ্যায়ত্ত সে দৃঢ় বিশ্বাস অল্প লোকেরই আছে। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণ জুটিয়াছে। মানুষ দেখিতেছে, আমাদের দেশে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইংরেজরা যাহা করিতে চায়, তাহা হয়; আমরা যাহা চাই তাহা হয় না। ইহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ইংরেজরা যদি আমাদের উন্নতি করিয়া দেয়, তবেই উন্নতি হইবে, নতুবা হইবে না। এইজন্য দেশবাসীর মন হইতে এই ভাব দূর করিয়া দিয়া আত্মনির্ভরের ভাব জন্মাইবার নিমিত্ত কখন কখন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে ভারতবাসীদিগকে মানুষ করিয়া দেওয়া ইংরেজদের স্বার্থের বিরোধী, অন্যান্য জাতির মত ইংরেজরাও স্বার্থপর, অতএব তাহারা আমাদিগকে মানুষ করিয়া দিবে না। প্রমাণস্বরূপ ইহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে ব্রিটিশ রাজত্বকালে এ পর্য্যন্ত ইংরেজরা ভারতবাসীর জন্য বড় এরূপ কোন কাজ করে নাই যাহাতে ভারতবাসীদের চেয়ে তাহাদের নিজেদেরই বেশী লাভ হয় নাই, এবং ভারতপ্রবাসী অধিকাংশ ইংরেজ ভারতবাসীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পদবৃদ্ধি, শিক্ষালাভের সুবিধা বৃদ্ধি, প্রভৃতির প্রতিকূলতা করিয়া ভারতবাসীদিগকে চিরকাল শক্তিহীন ও নিজকরায়ত্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরের ভাব জাগাইবার জন্য—ইংরেজের বিরুদ্ধে উক্তরূপ কিছু প্রমাণ করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। ভারতবাসীদের মধ্যে দেশে বিদেশে যাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা, কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক বা যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাজগুলি তাঁহাদিগকেই করিতে হইয়াছে। তাঁহারা ইংরেজের, ফরাসীর, জার্ম্মেনের বা আমেরিকানের কাজগুলি ধার করিয়া বা ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া নিজের নামে বেনামী করিয়া চালাইতেছেন না। তাঁহাদের নিজের শক্তি, নিজের প্রতিভা, নিজের চিন্তা, নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়, নিজের সাহস, নিজের তপস্যায় তাঁহারা কৃতী ও কীর্ত্তিমান হইয়াছেন।

একজন মানুষের মানুষ হইবার যে পথ, এক একটা জাতিরও মানুষ হইবার সেই পথ। খুব ভাল কাগজ কলম কালি দিয়া, সর্ব্বদেশের ভালো ভালো কাব্যে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর সুসজ্জিত নির্জ্জন গৃহে কাহাকেও বসাইয়া দিলেই সে কবি হয় না, তাহার নিজের প্রতিভা ও তপস্যা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বাহিরে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, হয়ত অনেক স্থলে সেইজন্যই, কত লোক কবি হইয়াছেন। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ও রাসায়নিক দ্রব্যে পূর্ণ গৃহে একটি মানুষকে বসাইয়া দিলেই সে আবিষ্কারক হয় না। মানুষটির নিজের শক্তি ও তাহার সুপ্রয়োগ ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। অন্যদিকে সামান্য দুএকটা শিশি, একটু কাচের টুকরা বা নল বা লৌহখণ্ড বা একটু তার বা সুতার সাহায্যে কত অতি দরিদ্র ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। নিজের মাথা না ঘামাইয়া কেবল গৃহশিক্ষকের বা অঙ্ক সমাধান পুস্তকের সাহায্যে কে কবে গণিতজ্ঞ হইয়াছে? আবার এরূপ সাহায্য খুব অল্প পাইয়া কিংবা একটুও না পাইয়া কত লোক গণিতে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

তুমি যদি ঘোড়ায় চড়া শিখিতে চাও, তাহা

হইলে একজন তোমাকে একটা ঘোড়া দিতে পারে, জিন লাগাম দিতে পারে, চাই কি ধরাধরি করিয়া বা সিঁড়ি লাগাইয়া ঘোড়ার পিঠেও উঠাইয়া দিতে পারে; কিন্তু নিজে ঘোড়ার পিঠে চড়িবার ক্ষমতা ও ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকিবার সাহস ও শক্তি তোমারই চাই। ঘোড়া দৌড়িলে পড়িয়া না যাইবার শক্তি, পড়িয়া যাইবার বিপদ-সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস ও শক্তি, দুর্দ্দান্ত ঘোড়াকে বশে আনিয়া বাগ মানাইবার সামর্থ্য— এ সব তোমারই চাই। নতুবা ঘোড়া পাওয়াটা বা তাহার পিঠে নিজেকে আসীন দেখাটা তো সৌভাগ্য না হইয়া তোমার দুরদৃষ্ট বলিয়াই গণিত হইবে। তাছাড়া অনুগ্রহপ্রাপ্ত, ধার করা বা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার চেয়ে নিজের অর্জ্জিত একটা ঘোড়া যে খুব ভাল, তাহা সকলেই বুঝে।

ইংরেজকে খুব মহানুভব, খুব সদাশয়, খুব ন্যায়-পরায়ণ, খুব নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর খুব ভারতহিতৈষী বলিয়া বিশ্বাস করিলেও মানুষ হইবার আসল চেষ্টা যা, তা আমাদিগকেই করিতে হইবে। কেহ কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না। আর একজন আমার জন্য কিছু করিয়া দিবে এইরূপ অভিলাষ ও আশাই যে মানুষকে অমানুষ করিয়া রাখে। মনের ভাব যাহার এমন, সে এরূপ ভাব থাকিতে কখন মানুষ হইবে না। তোমার ভিতর হইতে যাহা না হইতেছে তাহা তোমার নয়; তাহা দ্বারা তুমি বড় বা শক্তিমান কখনই হইতে পার না।

যে কৃশ তাহার গায়ে তুলা ও কাপড় জড়াইয়া বা সর্ব্বাঙ্গে পুরু করিয়া ছাগ-মাংসের প্রলেপ দিয়া তাহাকে স্থূলকায় করা যায় না। যে দুর্ব্বল তাহার হাতে পায়ে মজবুত ইস্পাতের শিক বাঁধিয়া এবং বুকে পিঠে শক্ত ইস্পাতের পাত লাগাইয়া তাহাকে বলবান করা যায় না। মানুষটা খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করিয়া নিজের পরিপাক শক্তির দ্বারা তাহা নিজের অঙ্গীভূত করিলে এবং আনন্দের সহিত অঙ্গচালনা করিলে তবে পূর্ণমাত্রায় বল পাইতে পারে। নিজের চেষ্টায় যাহা হয়, তাহাই খাঁটি লাভ, স্থায়ী লাভ, খাঁটি প্রাপ্তি—স্থায়ী প্রাপ্তি।

অতএব আর কেহ আমাদের জন্য কিছু করিয়া দিবে এ বাসনা, এ আশা আমরা যেন পরিত্যাগ করি। মানুষ মানুষকে টাকা দিতে পারে, জমি দিতে পারে, পদ দিতে পারে, উপাধি দিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। মনুষ্যত্ব ত দূরের কথা, বিদ্যা দিতে পারে না, প্রতিভা দিতে পারে না, কোন প্রকার শক্তিই দিতে পারে না।

জাতীয় উন্নতির সোপানের অনেকগুলি ধাপ। প্রথমে বুঝি আমাদের কত দূর দুর্গতি হইয়াছে; তাহার পর বুঝি যে আমাদেরও অন্তর্নিহিত শক্তি আছে; তাহার পর বুঝি যে অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা আমাদেরও মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর; তাহার পর বুঝি যে, কেহ কাহাকেও মানুষ করিয়া দিতে পারে না, মানুষ নিজেই নিজের প্রদীপ, নিজেই নিজের যষ্টি, নিজেই নিজের অবলম্বন। অতএব অপরের অনুগ্রহ কামনা মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়; তাহার পর আত্মোন্নতি চেষ্টারূপ দৃঢ় ও কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। যিনি এই যুক্তি-মার্গ দেখাইয়াছেন, তিনিই লক্ষ্যস্থলেও ঠিক পৌঁছাইয়া দিবেন।

(প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২১, পৃঃ ৪৮১)

স্বদেশী আন্দোলন তাঁহাকে বড় রকম নাড়া দিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আগে দেশকে জান। 'স্ব ও দেশ' প্রবন্ধে লিখিলেন:

"স্ব ও দেশ—স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কোন কোন কাগজে একটা প্রস্তাবের কথা পড়িয়াছিলাম, যে, যাহারা মদ খায়, তাহারা যেন বিলাতী মদ খাওয়া ছাড়িয়া দেয়; অর্থাৎ খারাপ কাজটা না করিয়া উপায় নাই; সুতরাং দেশী রকমে কর! ইহা অতি চমৎকার "স্বদেশীত্ব"! সেদিন একটা গল্প শুনিতেছিলাম যে, কলিকাতায় একজন পাহারাওয়ালা একটা লোককে পথে মাতলামি করার জন্য ধরিবার চেষ্টা করায় মাতাল বলিল, "থাম্, মন্তরটা মনে করে নি।" এই বলিয়া সে "বন্দেমাতরম্" চীৎকার করিয়া উঠিল, ও অমনি কতক-গুলি যুবক, কেহ বিপদে পড়িয়াছে ভাবিয়া সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পাহারাওয়ালা বলিল, "বাবুরা, ও যে মাতাল"। মাতাল তখন বলিল, কেন বাবা, আমি ত দেশী মদ খেয়েছি। সংবাদপত্রে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সঙ্গে

মাতালটির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভেই শুনিলাম, রাশি রাশি বিদেশী সিগারেট পুড়াইয়া ফেলা হইতেছে। ভাবিলাম আপদ গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজওয়ালারা উল্লাসের সহিত জানাইলেন যে, সিগারেট-সেবীদের মুখে বিদেশী সিগারেটের পরিবর্ত্তে স্বদেশী বিড়ি শোভা পাইতেছে, এবং স্বদেশী সিগারেট প্রস্তুত হইতেছে। তখন আমাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম সিগারেটসেবীরা স্বদেশভক্তির প্রভাবেও স্বভাব বদ্‌লান, কু-অভ্যাস ত্যাগ সুসাধ্য মনে করিতে পারিলেন না।

দেশে যে স্বদেশভক্তির হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এমন কেন হয়?

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমে মনে হয় "স্বদেশ" কথাটি দুটি শব্দের সংযোগে গঠিত হইয়াছে—"স্ব" এবং "দেশ"। যাঁহারা "স্ব"-এর উন্নতি করিতে পারেন না, তাঁহারা দেশের উন্নতি কেমন করিয়া করিবেন? ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই এরূপ হয়। "ইন্দ্রিয়ের" দাস যেবা বার মাস" স্বদেশ উদ্ধার তাহার কার্য্য নয়, ইহা খুব পাকা কথা, খুব বড় কথা। এখানে একথা তুলিলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মশা মারিবার জন্য কামান পাতা হইতেছে। সুতরাং অত বড় কথা না বলিয়া, ইহা বলিলেই হইবে যে, স্বদেশ-ভক্তকে পাপাচার ত দূরের কথা, বিলাসিতা ও সৌখিনতাও ত্যাগ করিতে হইবে।

"স্ব"-এর উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য অনাবশ্যক ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিয়া, এখন যে দেশী জিনিষের প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তজ্জন্য কিভাবে "স্ব"-এর উন্নতি আবশ্যক, তাহার কথাই ধরা যাক্। সকলেই জানেন যে সাধারণতঃ মানুষ নিজের ক্ষতি করিতে চায় না, কিন্তু যখন প্রকৃত স্বদেশভক্তি জন্মে, তখন ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া মনে হয় না। আমরা কিন্তু বণিক ও কারিগরদিগকে স্বদেশভক্তির প্রভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আমরা তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ কিসে সিদ্ধ হয়, তাহাই বুঝিয়া সিদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছি। মানুষ এবং ইতর প্রাণীতে একটা প্রভেদ এই যে, মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, ভবিষ্যতের মঙ্গলা-মঙ্গল চিন্তা করিয়া কাজ করে। ইতর প্রাণীরা তাহা করে না। আমরা বণিক ও কারিগরদিগকে তাঁহাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির মঙ্গলের জন্য, দেশী দ্রব্যের প্রতি মন দিতে বলিতেছি। তাঁহারা অনেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতেছেন, কিন্তু অনেকে বুঝিতেছেনও না। অনেকে দেশী জিনিষের কাট্‌তি দেখিয়া উহার দাম খুব বাড়াইয়া দিতেছেন; বুঝিতেছেন না যে তাহাতে লোকে আবার সস্তা বিলাতী জিনিষ কিনিতে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে কারিগর ও বণিকদের "স্বদেশের" উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাদের "স্ব"-এর উন্নতির অগ্রে প্রয়োজন মনে হইতেছে। এই উন্নতি তাঁহাদের শিক্ষার, জ্ঞানের, বুদ্ধির, নীতির উন্নতি।

তারপর আর এক দিক্ দেখুন। আমরা চাই দেশী চিনি; কিন্তু ব্যবসাদারেরা বিদেশী চিনিকেই মাড়িয়া নানা উপায়ে তাহার রং দেশীর মত করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া আমাদিগকে পাঠাইতেছেন। কারণ বিদেশী চিনিতে লাভ বেশী। আমরা চাই দেশী কাপড়। ব্যবসাদারেরা সুযোগ পাইয়া দেশী কাপড়ের খুব দাম চড়াইয়া লাভ করিতেছেন। ইহাতে তবু প্রতারণা নাই; কিন্তু কোন কোন ব্যবসাদার বিলাতী কাপড়ে দেশী ছাপ মারিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইতেছেন।

এইরূপ লোকদের "স্ব" নৈতিক হিসাবে উন্নত না হইলে, তাহাদের স্বদেশের মঙ্গল কেমন করিয়া হইবে?

ইংরেজ কারিগর ও দোকানদার দেশী কারিগর ও দোকানদারগণ অপেক্ষা সাধু কি না, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে, অনেকে বেশী দাম দিয়াও ইংরেজের নিকট হইতে জিনিষ লয় এই ধারণায় যে, তাহা হইলে ঠকিতে হয় না, দরদস্তর করিতে হয় না। এই ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ইহা ত ঠিক যে আমাদের দেশী কারিগর ও ব্যবসাদারের সম্বন্ধেও এইরূপ ধারণা জন্মিলে

তাঁহাদের ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে। আমাদের দেশে বড় ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকদের মধ্যে সৎলোক অনেক আছেন; কিন্তু অধিকাংশ কারিগর ও ব্যবসদারকে বিশ্বাস করা যায় না, এইরূপ ধারণা কেন জন্মিল? তাহাতে কি তাঁহাদের কোন দোষ নাই? আমরা স্বীকার করি, ক্রেতাদেরও দোষ আছে, তাঁহারা "একদর" বলিলেও অনেকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দোষ এক পক্ষের বা উভয় পক্ষেরই হউক, এখানেও দেশের উন্নতির আগে "স্ব"-এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। ছুতার, মুচি, দর্জ্জি, সেকরা প্রভৃতি কারিগরেরা কথা রাখে না। যেদিন ফরমাইসি জিনিষ দিবে বলে, সেদিন দেয় না। দরদস্তুরও অনেক করে, ইংরাজেরা যদি এই সকল কাজে হাত দেয়, তাহা হইলে এই সকল কারিগরদের অন্ন মারা যাইবে। বাস্তবিকও দেখিতেছি যে আমরা অনেকে স্বদেশী বলিয়া যে সকল জুতা পরিতেছি, তাহা ভারতবর্ষে ইংরাজ-পরিচালিত কারখানায় নির্ম্মিত। কারিগর দেশী কিন্তু বেশীর ভাগ লাভ বিদেশী লোকে পাইতেছে। দেশী কারিগর নিজে কারবার চালাইতে পারিলে এমন হইত না। তাহার মূলধন নাই বটে; কিন্তু তাহার "স্ব"-এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

আমাদের দেশে মজুরী বিলাত অপেক্ষা অনেক সস্তা। তবু আমাদের শ্রমজীবী কারিগরদের সাহায্যে উৎপন্ন জিনিষ বিদেশী জিনিষের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে না কেন? এরূপ যে কেবল তাহাদের দুর্ব্বলতা বা নৈপুণ্যের অভাব প্রযুক্ত হয়, তাহা নয়। তাহাদিগকে না খাটাইলে তাহারা খাটিবে না, ফাঁকি দিবে; বিদেশী শ্রমজীবী ও কারিগর অপেক্ষা দেশী লোকদিগের নিকট কাজ লইতে হইলে তাহাদের উপর বেশী চোখ রাখা (Supervision) দরকার হয়, ইহাতেও ত খরচ আছে।

সুতরাং এখানেও দেখিতেছি, দেশের আগে "স্ব"-এর উন্নতি আসিয়া পড়িতেছে।

দেশী অনেক জিনিষ এখন হইতেছে, আগেও হইত। অনেক জিনিষ দেশী বলিলেই, বাহিরে দেখিতে বেশ হইলেও অনেকের মনে যেন একটা সন্দেহ হয় যে উহার ভিতর কোথায় কি একটা ফাঁকি আছে। সকল কারিগরই কি প্রতারক? তা নয় কিন্তু অনেকের দোষে এই সন্দেহ জন্মিয়াছে। কাজে কাজেই এখন প্রত্যেকের "স্ব" উন্নত না হইলে দেশীর উপর বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিবে ও বদ্ধমূল হইবে?

বিদেশী শিল্প ও কলার উন্নতির একটা কারণ যৌথ কারবার। আমাদের দেশে যৌথ কারবারের সংখ্যা কম। তাহার একটা কারণ এই যে আমাদের পরস্পরের প্রতি কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতা হিসাবে বিশ্বাস নাই। যৌথ কারবারের কথা উঠিলেই কত লোক আছেন, যাঁহারা লোকপ্রাপ্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব এইরূপ কারবারগুলির ফর্দ্দ আওড়াইয়া দেন। তাঁহারা যে মিথ্যা কথা বলেন তা ত নয়, অথচ যৌথ কারবার না চালাইলেও উপায় নাই সুতরাং আমাদিগকে কার্য্যক্ষমতা ও সাধুতা হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ সেই পুরাতন কথা, "স্ব"-এর উন্নতি আবার আসিল।

আমাদের দেশের লোকের অদৃষ্টের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকায় উদ্যোগিতা দেখা যায় না। অথচ এই দেশেই প্রাচীনকাল হইতে বলা হইতেছে, "উদ্‌যোগিনম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।" অদৃষ্টবাদ না ঘুচিলে দেশের উন্নতি কোথা হইতে হইবে? সুতরাং এখানেও "স্ব"এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

যখন দেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন অনেকেই বলিয়াছেন, বাঙ্গালী কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে? আমরা কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিব? এখনও অনেকে সেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা না রাখিতে পারার কারণ নানা প্রকার হইতে পারে। দেশী জিনিষ ব্যবহারে যথেষ্ট জিনিষ না পাওয়া প্রভৃতি অসুবিধা আছে। কষ্ট আছে, কোন কোন বিষয়ে ফ্যাশন ও বাহারের কিছু কমতি হয়, খরচ বেশী হয়, এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, গবর্ণমেন্টের ভয়, রাজপুরুষদের উৎপীড়ন আছে! তাহা হইলে কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে, আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে পারিব কি না, আর্থিক ক্ষতি সহিতে পারিব কি না, কিছু কম বাহার দেওয়া ও বাবুয়ানি করা আমাদের পোষাইবে কি না, এবং রাজপুরুষদের ধমক, গুর্খার ও পুলিসের লাঠি এবং সম্ভবতঃ জেলে যাওয়া

আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারিব কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এই সন্দেহ যাইবে কেমন করিয়া? পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করিলে যাইবে না, ভগবানের দিকে তাকাইলে যাইবে। প্রকৃতি, স্বদেশভক্তি ও ভগবদ্-ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। ভগবান্ চান যে আমরা মানুষ হই, আমাদের জাতিটা মানুষ হউক, দেশের মঙ্গল হউক। যাঁহারা তাঁহার এই ইচ্ছার সহিত নিজ নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের ভয় নাই। তাঁহারা সব কষ্ট ও অসুবিধা সহিতে পারেন, অর্থনাশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, নিজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য জবড়জঙ্গ সাজিতে পারেন, ধমক, লাঠি, গলাধাক্কা সহিতে পারেন, জেলে যাইতে পারেন, এবং দরকার হইলে প্রাণটা দিতে পারেন। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাসবান্ হই; তাহা হইলে প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিব কি না, এ সন্দেহ আমাদের চিত্তের ত্রিসীমায় আসিতে পারিবে না। আমাদের দেশে এইরূপ বিশ্বাসবান্ স্বদেশভক্তের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, সুখের বিষয় এরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। আমাদের স্বভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ লোকের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই দেশের উদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে।

সকলেই জানেন, দেশের মঙ্গলের জন্য একদল সাহসী উদ্যমশীল লোকের দরকার। তাঁহারা চাকরির জন্য লালায়িত হইবেন না, নানা কাজ শিখিবেন, নানা কাজে হাত দিবেন;—কখন বা কৃতকার্য্য হইবেন, কখন বা বিফলকাম হইবেন; দশবার পড়িবেন, দশবার উঠিবেন; এইরূপ লোক বিবাহিত ও পরিবার-গ্রস্ত হইলে চলিবে না। একটা পেট চালানো খুব সোজা; তাহাতে খুব সাহস ও উদ্যমও থাকে। এইরূপ সাহসী ও উদ্যমশীল লোক বাল্য-বিবাহিত সমাজে মিলে না। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য একটি সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমের এবং শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ কাজের গৌরব লোকে বুঝে না।

এই জন্য শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পাশকরা ভদ্র-সন্তান ১০।১৫ টাকার চাকরি করা ছুতার কামারের কাজ অপেক্ষা ভাল মনে করেন। ৩০ টাকা দিয়া একজন ভাল ছুতার পাওয়া যায় না, কিন্তু বি, এ, পাশ-করা লোক পাওয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটি কুফল জন্মিয়াছে. প্রথমতঃ যথেষ্ট চাকরী না থাকায়, লেখাপড়া-জানা লোকেরা দারিদ্র্যে কাল কাটাইতেছে, এবং স্বাধীন-চিত্ততা ও তেজস্বিতা হারাইতেছে; কারণ উমেদারী বা চাকরী উভয় অবস্থাই স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতার শত্রু। দ্বিতীয়তঃ কারিগরের কাজ অশিক্ষিত একটি শ্রেণীর লোকের হাতে থাকায়, ঐ কাজে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকের মাথা খেলিতেছে না; ধনশালী লোকের মূলধন শিল্পকলায় খাটিতেছে না। তাঁহাদের বুদ্ধি ও উদ্যম এইরূপ কাজে লাগিলে কেবল যে কাজের উন্নতি হইত তা নয়, দেশের সম্পদও বাড়িত;—শুধু আর্থিক সম্পদ নয়, মানসিক সম্পদও বাড়িত, লোকে অধিকতর আত্মনির্ভরপ্রিয়, স্বাধীনচিত্ত ও তেজস্বী হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শারীরিক শ্রম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। সুখের বিষয় এরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিদেশে ও স্বদেশে কারিগর শ্রেণী-বহির্ভূত অনেক যুবক নানা কলা ও শিল্প শিখিতেছেন। এমন কি কলিকাতার ভদ্র সন্তানেরা মাথায় কাপড়ের মোট লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। এই সকল যুবকেরা ধন্য। ইঁহারা এখন বামুনের ছেলে বা কায়স্থের ছেলে, এ অভিমান ভুলিয়া গিয়া দেশের ছেলে হইয়াছেন। ইঁহাদের "স্ব" বদ্‌লাইয়া গিয়াছে বলিয়া ইঁহারা দেশের প্রকৃত সেবক হইতে পারিয়াছেন।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার দরকার নাই। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে দেশের মঙ্গল করিতে হইলে "স্ব"-এর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নিজে ভাল না হইলে অন্যের বা স্বজাতির ভাল কেমন করিয়া করিব? কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা যতদিন সর্ব্ববিধ দোষশূন্য না হইব, ততদিন দেশের কাজে হাত দিব না? তা নয়, ভাল না হইলে যেমন দেশের কাজ করা যায় না, তেমনি আবার দেশের কাজ প্রাণের সহিত করিতে গিয়াও মানুষ ভাল হইয়া যায়, মানুষের "স্ব" বদ্‌লাইয়া যায়।

কাপড়ের মোটবাহক ভদ্র যুবকদিগকে আগে জাত্যাভিমান, বংশের অহঙ্কার ছাড়িতে বলিলে তাঁহারা

হয়ত তাহা ছাড়িতেন না; কেহ তাহাদিগকে আগে ছাড়িতে উপদেশও দেয় নাই। এখন কিন্তু তাঁহারা দেশের কাজে লাগিয়া দেখিলেন, যে ইহাতে কিয়দ্দূর গিয়া থামিলে বা পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না, মোট বহা দরকার হইলে মোটই বহিতে হইবে। তেমনই আমরা দেশের কাজে প্রাণ-পণ করিয়া লাগিব। যখনই আমাদের কোন প্রিয় পাপ, কোন ব্যসন, কোন বিলাসিতা, কোন সৌখিনতা, কোনও প্রকার ভয়, মান, অভিমান, আলস্য বা দুর্ব্বলতা জন্মভূমির সেবার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইবে, তখনই তাহাকে নির্ম্মমভাবে দূর করিয়া বীরের মত, কিন্তু বিনীত ও শান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইব। আমরা উৎপীড়িত হইলেও উৎপীড়ন করিব না; গবর্ণমেণ্টের অনেক লোক বে-আইনী অন্যায় কাজ করিতেছে, আমরা কোন বে-আইনী অন্যায় কাজ করিব না। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাও ভুলিব না, বা ছাড়িব না। সকলে মনে রাখিবেন আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কাজ—স্বদেশী প্রতিজ্ঞারক্ষা। ইহা রাখিবার জন্য আমাদের চরিত্রের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা অবিলম্বে করিতে হইবে।

(প্রবাসী, মাঘ, ১৩১২ পৃঃ ৬০৭)

টিলক-বেসান্ট প্রবর্ত্তিত 'হোমরুল' (স্ব-শাসন) প্রচেষ্টারও রামানন্দ ছিলেন ঐকান্তিক সমর্থক। ভারতবাসী যে স্ব-শাসনের উপযুক্ত তাহা তিনি নিজ সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলিতে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করিয়া স্বদেশবাসীদের এবং শাসক জাতিকেও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

রামানন্দ এই সময় (১৯১৭) হইতে নিজের এবং অপরের লিখিত প্রবন্ধগুলি গ্রথিত করিয়া **'Towards Home Rule'** নামক পুস্তক তিন খণ্ডে পর পর প্রকাশ করিলেন। প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সভ্য ও তথাকথিত অসভ্য মানুষের মধ্যে কিরূপ স্ব-শাসন প্রচলিত ছিল, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহে এখনও ইহা কিরূপ বিদ্যমান—উক্ত গ্রন্থে কোন কোন অধ্যায়ে ইহার নানা দৃষ্টান্তও দেখান হইয়াছে।

স্বাজাত্যবোধ ও মানবতা রামানন্দ-জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এজন্য স্বদেশীয়দের মধ্যে যেসব অসাম্য কলুষ ক্লেদ ও ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান তাহা দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করেন। জাতিকে সুস্থ, সংহত, শক্তিমান করিতে হইলে এই সমুদয়ের নিরাকরণ একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য দেশেরও মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে মানবতা-বিরোধী কার্য্যকলাপ দেখিলে তিনি তাহার তীব্র নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই।

রামানন্দের ইচ্ছা ছিল স্বদেশ ও বিদেশের বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয় লইয়া লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ এবং এইরূপে একটি জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তোলা। তিনি ১৯১১ সনে রজনীকান্ত গুহের "মেগাস্থিনিশের ভারত বিবরণ" ও ১৯১২ সনে "সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনিনাসের আত্মচিন্তা" প্রকাশ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর **'The History of the Brahmo Samaj'** শীর্ষক দুইখণ্ডে সমাপ্ত ইতিহাস পুস্তকের প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের আরও দুইখানি বই **'Men I have Seen'** এবং "আত্মজীবনী" প্রকাশ করেন। রামানন্দ পর পর রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-ধর্ম্ম, চরিত কথা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবিধ ইংরেজী বাংলা পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। একখানি পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিতও হইতে হয়।

'প্রবাসীর' তৃতীয় সংখ্যা (১৩০৮) হইতেই প্রবাসী-বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি লিখিতে সুরু করেন। সে সময়ে কাশী ও প্রয়াগে সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, "যে সকল স্কুলের ছাত্রেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বা শিক্ষাবিভাগের কোন সাধারণ পরীক্ষা দিতে অধিকারী, তথায় বাংলা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না।" তিনি এবিষয়ে সার আণ্টনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে এই আদেশ সার আণ্টনীর শিক্ষা-নীতিরই বিরোধী হইয়াছে। নিজ মাতৃভাষার সাহায্যেই ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা সহজ হয় একথা তিনি বলেন এবং পূর্ব্বে অন্য কারণে সার আণ্টনীও যে এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা দেখান। তাছাড়া বাঙালীর বাঙালিত্ব রক্ষা করার জন্যও যে বাংলা শিক্ষা প্রয়োজন একথাও তিনি বরাবর বলিয়াছেন। রামানন্দ তখন

হইতে আজীবন সর্ব্বদেশে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবাসের বিদ্যালয়ে বাংলা পড়িবার অধিকার লইয়া লড়িয়া আসিয়াছেন। হিন্দুস্থানী-বাঙালীদের যে চুপ করিয়া থাকা উচিত নয় একথা তখন এবং তৎপূর্ব্বেও তিনি বলিয়াছেন। বাঙালী ছাত্রদের পুরাকালে রুড়কী কলেজে লইত না। কিন্তু অন্য প্রদেশের অধিবাসী বাঙালীদের ছেলেরা রুড়কীতে পড়িত তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "প্রবাসী বাঙালীদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ যাহাতে সংকীর্ণ বা লুপ্ত না হয়, প্রবাসীদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ না হইয়া আসে, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয় তাহা দেখিবার জন্য একটি মুখপাত্রের প্রয়োজন।"

বাংলা ভাষার প্রতি এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি চির-অনুরাগী রামানন্দ তাই বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাংলা সাহিত্যের যাহাতে প্রসার হয় তাহার চেষ্টাও কম করেন নাই। তিনি লিখিলেন :

"বাংলা সাহিত্য ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা—বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের চেষ্টা ও মানসিক শক্তির ফল, তাঁহারা বিশেষ কোন একটি গ্রামের সহরের বা জেলার লোক নহেন। তাঁহারা বঙ্গের নানা জেলা, নানা সহর ও গ্রামের অধিবাসী। তাঁহারা কেবল পুরুষ কিম্বা কেবল নারী নহেন; গ্রন্থকারদের অধিকাংশ পুরুষ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেক নারীও আছেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখিকার সংখ্যাও বাড়িতেছে। কেবল পুরুষেরা লিখিলে যাহা হইত, নারীরা লেখনী ধারণ করার পর তাহা হইতে স্বতন্ত্র নূতন জিনিষ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস যেমন বাড়িতে থাকিবে, তাঁহারা তেমনি কেবল পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে না লিখিয়া স্বাধীন ভাবে লিখিতে থাকিবেন; এবং তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে নূতন সম্পদ সঞ্চিত ও নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইবে। বাঙালী গ্রন্থকারেরা কেবল হিন্দু বা মুসলমান নহেন; কেবল শূদ্র নহেন; বা দ্বিজ নহেন; কেবল ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য বা কায়স্থ নহেন; অন্যান্য জাতির লোকও ভাল ভাল বই লিখিয়াছেন। যাঁহারা যে পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মানুষ হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করে, মনে যে তত্ত্ব আবিষ্কার ও উপলব্ধি করে, যে-সব তথ্য সংগ্রহ করে, তৎসমুদয় সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া পাঠক ও শ্রোতাদের আনন্দ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। খুব বেশী প্রতিভাশালীও হইলে একজন মানুষ বা এক শ্রেণীর মানুষ নিখিল বিশ্ব মানব-প্রকৃতি বা মানব-জীবন হইতে সাহিত্যের সমুদয় উপাদান আকর্ষণ বা সংগ্রহ করিতে পারে না। যত বেশী শ্রেণীর লোক সাহিত্যের সেবা করিবে, সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে। যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে, তাহারা যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে ঢালিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্যে যে বাস্তবতা, যে প্রাণের সঞ্চার হয়, নাগরিকের আরামপূর্ণ জীবন হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সত্য বটে, অবিরাম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে অনেক সময় অসাড় করিয়া দেয়, কিন্তু কি মাত্রায় শ্রম করিলে এরূপ কুফল ফলে তাহা বলা যায় না। দারিদ্র্য ও শারীরিক শ্রমের সহিত সাহিত্যিক প্রতিভার একান্ত বিরোধ নাই; উভয়ের একত্র অস্তিত্ব পৃথিবীতে বিরল নহে। আমাদের বনের কাঠুরিয়া সুন্দরবনের ও নদী-চরের চাষী, আমাদের পদ্মা, মেঘনার মাঝিমাল্লা, আমাদের সমুদ্রগামী লস্কর, ইহাদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে এখনও স্থান পায় নাই। ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত কয়েকটি শ্রেণীর লোক ছাড়া অপরাপর শ্রেণীর লোকে এখনও সাহিত্যের সেবায় বিরত আছেন। নারীর নিজের কথা সাহিত্যে খুব অল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। মুসলমানের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, উৎসাহ ও শক্তি এখনও বাংলা সাহিত্যকে বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত করে নাই।

বাংলা সাহিত্য এখন যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপ্রসাদের কারণ হইলেও, উহা রসের বা কাব্যের দিক দিয়া যেরূপ পুষ্ট হইয়াছে, তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়া সেরূপ হয় নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিদ্যার নানা

শাখায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বড় কম, অনেক শাখায় একেবারেই নাই। সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সমুদয় শ্রেণীর লোকদের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত আমাদের সাহিত্য কখনও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুপুষ্ট ও শক্তিশালী হইবে না। সাহিত্যের সেবায় সকল রকমের লোককে লাগাইতে হইলে সকলকেই সাহিত্যরস আস্বাদনে অধিকারী করিতে হইবে। তজ্জন্য সকলকে লিখিতে ও পড়িতে শিখান দরকার। উচ্চতর শিক্ষায় যাঁহার আগ্রহ হইবে, তিনি তাহার জন্য চেষ্টিত হইবেন, এবং ক্রমশ তাহার ব্যবস্থাও হইবে। আপাতত ভিত্তি স্থাপিত হউক। পুরুষ নারী ছেলে বুড়ো সকলকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা দেশের সর্ব্বত্র আবশ্যক। অক্ষর চিনাইবার বহির জন্য কয়েকটি পয়সা এবং অক্ষর চিনাইবার ও চিনিবার জন্য প্রত্যহ কয়েকটি মিনিট সময় দিলেই কয়েক মাসের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক লিখন-পঠনে সমর্থ হইয়া উঠিবে।"

(প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২১, পৃঃ ৪৯১)

ইহা ছাড়া যখনই সাহিত্য-প্রসঙ্গ উঠিয়াছে তখনই তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্যই জাতির পরিচয়। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের কতটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তা তাঁহার লিখিত নিম্নের প্রবন্ধ হইতে বুঝা যায়:

"সাহিত্যে বিপ্লব—সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা অতীত ও বর্ত্তমান কালের মানুষের বাহিরের ও ভিতরের জীবনের কতকটা ছবি, কতকটা সমালোচনা, কতকটা ঐ জীবন ভবিষ্যতে কিরূপ হইতে পারে তাহার আভাস ও তাহার দিকে মানুষকে প্রেরণ করিবার শক্তির আধার। বাহিরের আবেষ্টন যেমন এক একজন মানুষের চিন্তা ও ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার আন্তরিক জীবনকে পরিবর্ত্তিত করে, তেমনি এক-একটা শ্রেণী-সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তাকেও পরিবর্ত্তিত করে। আবার এক-একজন মানুষের এবং শ্রেণী-সম্প্রদায়ের সমাজ ও জাতির ভাব ও চিন্তার এবং আভ্যন্তরীণ আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাদের আবেষ্টনও পরিবর্ত্তিত হয়। এবং বাহ্য জীবন আর পূর্ব্বের মত থাকে না। এই প্রকারে আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনে চিরকাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। আগে আমাদের সাহিত্যে অন্তরের ও বাহিরের যেসব জিনিষ থাকিত, এখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র অনেক জিনিষ তাহাতে নিবদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ভাষাও তদনুসারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আগে আমাদের চিন্তা ভাব আদর্শ যাহা ছিল, এখন কেবল যে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিস্তর নূতন ভাব চিন্তা আদর্শ আমাদের মধ্যে আসিয়াছে; সুতরাং সেই সকলকে প্রকাশিত করিবার জন্য ভাষার শব্দ সম্পদ বাড়াইতে হইয়াছে, এবং সাহিত্যেরও আকার-প্রকার বদলাইয়াছে। কতকগুলি লোক যদি সারাটা জীবন নিজেদের গ্রামে থাকিয়াই কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা সেই গ্রাম্য জীবনের ঘটনা ভাব চিন্তা আদর্শ ব্যক্ত করিবার মত হইলেই চলে। কিন্তু যদি সেই গ্রামের মাঝখান দিয়া কেবল একটা রেলের লাইন চালান যায়, তাহা হইলে শুধু সেই একটা পরিবর্ত্তনেই তাহাদের জীবনে নানা পরিবর্ত্তন ঘটে, নূতন নূতন মানুষের চলাচল হয়, তাহাদের মানসিক দৃষ্টি ও কল্পনা গ্রামের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন নূতন নূতন শব্দেরও আমদানী সেই গ্রামে হইতে থাকে। এই জাতীয়, কিন্তু বৃহত্তর, একটা পরিবর্ত্তন সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে ঘটে। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই রকম একটা বিপ্লব ইউরোপের নানা জাতির মনোরাজ্যে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের সাহিত্য পরিবর্ত্তিত, প্রসারিত ও শক্তিশালী হইয়াছিল। আমাদের দেশটি ঠিক একটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা গ্রামের মত কখনই ছিল না বটে, সকল সময়েই বাণিজ্য লুণ্ঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিদেশী জাতি এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি সকলের এদেশে আসিবার পর, এবং তন্মধ্যে ইংরেজের এদেশে প্রতিষ্ঠার পর, যেমন বহু দূরদেশ ও দূরবর্ত্তী জাতিদের সঙ্গে নানাভাবে আমাদের প্রতিবেশিতা,

প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, পরিচয় ঘটিয়া আসিতেছে, আগে এমন হয় নাই। আগে ভারতে যে সব বিদেশী আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ এশিয়ার মানুষ। এশিয়ার জাতিদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এইসব প্রাচ্য-বিদেশীদের আগমনেও ভারতবর্ষের পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আমাদের জীবনের মূলে ঘা পড়িয়াছে। আর এক দিক দিয়াও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষের মানুষকে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সব ধর্ম্ম গড়িয়াছে, সেগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্য আছে; এমন কি পরে যে মুসলমান ধর্ম্ম আসিয়া দেশকে বিপর্য্যস্ত করে, কয়েকটি খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং বাহিরের ক্রিয়াকলাপ বাদ দিলে, তাহার সহিতও ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সকলের সাদৃশ্য আছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রথম প্রথম ইহার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচ্য ধর্মের খুব সাদৃশ্য ছিল, এখনও ইহার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনেকটা প্রাচ্য ভাবাপন্ন। কিন্তু আধুনিকখ্রীষ্টধর্ম্ম প্রাচ্য ধর্ম্ম সমূহ হইতে অনেকটা পৃথক। পুরাকালে প্রাচ্য জাতি ও পাশ্চাত্য জাতি সকলের প্রকৃতি যাই থাক, তাহাদের মধ্যে এখন একটা প্রধান প্রভেদ এই দেখা যায় যে, প্রাচ্যেরা পরলোকমুখী, পাশ্চাত্যেরা ইহলোকমুখী; ধর্ম্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচ্যদের জীবন নিয়মিত; পাশ্চাত্যদের জীবনের উপর ধর্ম্মমত ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খুব কমিয়া আসিয়াছে। এমন কি, তাহাদের ধর্ম্মের উপরও পারলৌকিকতা অপেক্ষা ইহলৌকিকতার প্রভাব বেশী লক্ষিত হইতেছে।

এখন আমাদের জগৎ শুধু আমাদের গ্রামটি নয়; শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া নয়; এখন পৃথিবীর জ্ঞাত সব দেশের কথা বালক-বালিকারাও ভূগোল ইতিহাসে পড়িতেছে, তথাকার অদ্ভুত নানা রকমের প্রাণী আলিপুরের জীব-নিবাসে দেখিতেছে। সুমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্ত্তী পৃথিবীর অজ্ঞাত কোন স্থান আবিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার খবর এক পয়সার বাংলা দৈনিক কাগজে লোকে পড়িতেছে, এবং চারি আনা খরচ করিয়া তথাকার ছবি বায়োস্কোপে দেখিতেছে। প্রাচ্য প্রাচীন পারত্রিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নবীন ঐহিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক প্রথা রীতিনীতি পরিবারের গঠন এখন ঠিক মনুস্মৃতির ব্যবস্থা মত কিম্বা কোরাণ-শরীফের অনুযায়ী থাকিতে পারিতেছে না; লোকে জানিতেছে দেখিতেছে যে অন্য প্রকারের প্রথা রীতিনীতি আদর্শও আছে এবং তাহাতেও মানুষের জীবন যাপন অসম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে আধুনিককালে একনায়কত্বের চেয়ে সভ্য দেশ সকলে গণতন্ত্রেরই যে প্রাধান্য ঘটিতেছে, তাহাও আমাদের বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত পুস্তকে মাসিক পত্রে খবরের কাগজে পড়িতেছে।

মানুষের মনের মধ্যে এত নূতন জিনিষ আসিয়া পড়িলে ভাব চিন্তা ও আদর্শের, রীতিনীতি ও প্রথার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও যে পরিবর্ত্তন আসিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরিবর্ত্তন কখন কখন ধীরে ধীরে হয়, কখন কখন বা উহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। বিপ্লবের কুফল আছে কিন্তু সুফল নাই, এমন মনে করা মহাভ্রম। ইতিহাস যিনি পড়িয়াছেন, তিনি এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না।

সাহিত্যক্ষেত্রে বা ধর্ম্মজগতে বা অন্য কোন বিষয়ে যে সব বিপ্লব ঘটে, তাহা বর্ষাকালের নদীর প্রবল বন্যার মত। কূল ছাপাইয়া বন্যার জল মাঠে পথে লোকালয়ে ঢুকিলে ঘরবাড়ী গ্রাম নষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু বহুকালের সঞ্চিত ময়লা আবর্জ্জনাও পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে, এবং ক্ষেতে পলি পড়িয়া মাটিতে নূতন জীবন-শক্তির সঞ্চারও হইতে পারে। এরূপ হইয়াও থাকে। নদীর বন্যার মত দৈব ব্যাপারকে মানুষের শক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিতে এখনও কোন জাতি পারে নাই; আমেরিকার এঞ্জিনীয়ারিঙের খুব উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও এখনও বন্যায় প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু ছোটখাটো বন্যাকে আয়ত্তাধীন করিয়া কাজে লাগাইতে অনেক দেশের লোক সমর্থ হইয়াছে। বাঁধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া উহার ধ্বংস-শক্তিতে বাধা দিয়া কেবল হিতকরী শক্তিটির সাহায্যে উপকারলাভ করিতে

তাঁহারা পারিয়াছেন। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে-ছেন যে, বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের বন্যা আসিয়াছে, আসিতেছে। নদীগর্ভে দাঁড়াইয়া উত্তরীষের প্রাচীর উত্তোলন করিয়া, কিম্বা ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধ বাঁধিয়া এই বন্যা আটকাইতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাজ কি না, সহজেই বুঝা যায়। যতটা সম্ভব, বন্যার জলকে সুপথে সুক্ষেত্রে চালাইয়া কাজে লাগান ভাল। প্রতিভাশালী যাঁহারা তাঁহারা এই কাজ করিতেছেন।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৩, পৃঃ ৫২১)

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ

রামানন্দ ১৯১৭ সনে কনিষ্ঠ পুত্রকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ভর্তি করিবার জন্য লইয়া আসিলেন। এই সময় দুই বৎসরকাল তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করেন। সেখান হইতেই প্রবাসী ও মডার্ণ রিভ্যুর সম্পাদকীয় কাজ করিতে থাকেন। এই সময়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সি. এফ. এণ্ড্রুজ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত মনীষিগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দের বন্ধুত্ব এই সময়েই প্রগাঢ় হয়। রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুসংখ্যা স্বল্প। সেই স্বল্পের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন রামানন্দ। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও লেখেন, "রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।"

বিশ্বভারতীর শিক্ষা-ভবন বা কলেজ-বিভাগ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে প্রথম খোলা হয়। এই সুযোগে কলেজ পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও অধ্যক্ষতা কর্ম্মে সুদক্ষ রামানন্দকে অধ্যক্ষপদটি লইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন। রামানন্দ স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এই অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করায় সত্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার মঞ্জুরী পাওয়া সম্ভব হইল। রামানন্দ অবশ্য বেশিদিন বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ ছিলেন না। পূর্ব্ব-কথামত ছয়মাস পরেই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

অধ্যক্ষতা পদে ইস্তফা দিলেও রামানন্দ বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই চলিতেন। শান্তিনিকেতনে থাকিতে রামানন্দ একবার রবীন্দ্রনাথকে বলেন, বিলাতে 'Home University Library Series' বা গ্রন্থমালার আদর্শে এখান হইতেও ছোট আকারের সুলভ সহজ-বোধ্য অথচ সারগর্ভ গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের বড় সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব মনে লাগে। ইহার পর 'লোক শিক্ষা সংসদ' গঠিত হয় এবং সংসদের আনুকূল্যে গুণী-জ্ঞানী লেখকদের গ্রন্থসমূহ 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া একে একে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

শান্তিনিকেতনে রামানন্দ যে বাড়ীটিতে বাস করিতেন, তাহাতে তিনখানি মাত্র ঘর, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বারান্দা। বারান্দারই দুই কোণ ঘিরিয়া রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। বারান্দাতে প্রথমে কাঠের খুঁটি ছিল পরে মোটা মোটা ইটের থাম হইল। দেওয়ালে চুণ-বালি ধরাইয়া পাকা বাড়ীর মত পালিশ করা হইল, বারান্দার কোলে লাল কাঁকর ঢালিয়া সুদৃশ্য করা হইল, বেশ ছবির মত দেখাইত কুটিরটিকে। ইহার কোণে একটি শিশু পেয়ারা গাছ ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। বাড়ীর প্রত্যেক ঘর হইতেই দেহলির উপর তলায় রবীন্দ্রনাথের ঘরটি দেখা যাইত। ভোরে উঠিলেই চোখে পড়িত রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের বারান্দায় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া উপাসনায় বসিয়াছেন। এই বাড়ীটির কথা ১৩৪৮, ভাদ্রের প্রবাসীতে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমরা শুতে যাবার আগে নিবতে দেখিনি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি হয় তিনি বারান্দায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখন শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা

আজীবন রামানন্দ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ

প্রথম ভাগ।
বৈশাখ, ১৩০৮।
প্রথম সংখ্যা।
প্রবাসী
সচিত্র
মাসিক পত্র।
সম্পাদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ.।
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।
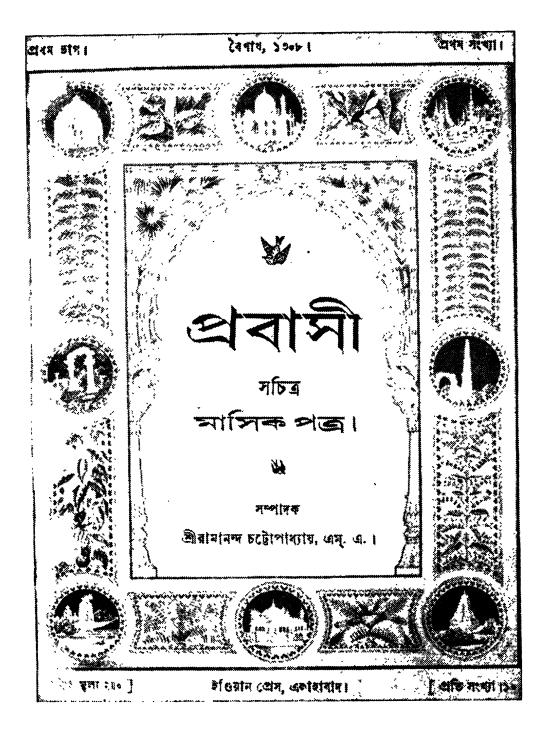
চালাতে দেখিনি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা ছিল না।"

সারাদিনই ইঁহারা দুইজন যেন পরস্পরের চোখের সামনে থাকিতেন। একটি মাঠের দুই প্রান্তে দুটি ছোট বাড়ীতে দুটি মনীষী প্রায় সারাদিনই কাগজ, কলম ও বই লইয়া ব্যস্ত থাকি:তন।

সেকালে দেহলীর ছাদে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি ডেক-চেয়ার লইয়া বসিতেন। অন্ধকারে একটা **Mosquitol** তেলের শিশি লইয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন, হাতে পায়ে মাঝে মাঝে সেই তেল মাখিতেন। লেবুফুলের মত একটা মৃদু গন্ধ দূর হইতে পাওয়া যাইত।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু' পত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া ডায়ার এবং ওডায়ারের কীর্ত্তি সম্বন্ধে যত আলোচনা সম্পাদক করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যায় না। 'মডার্ণ রিভ্যু'র সম্পাদকীয় মন্তব্য দেশ-বিদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার মতকেই সুধীজনে ভারতের প্রকৃত মত বলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন। উপাধি ত্যাগ করার পূর্ব্বে তিনি রামানন্দ এবং সি. এফ. এণ্ড্রুজ মহোদয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেন। দুইজনের মধ্যে রামানন্দই উপাধি-ত্যাগ অনুমোদন করেন। ইহা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের সহিত পরামর্শ করিতে প্রায়ই আসিতেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়ে রাজনৈতিক আলোচনা চলিত।

স্বদেশী আন্দোলনের পর গোয়েন্দা পুলিশের ভাবনা ছিল রামানন্দের নিত্য সহচর। যখন-তখন উপর-ওয়ালাদের নিকট হইতে কড়া ধমক ও হুকুম আসিত। ইহার ফলে শুধু যে দুশ্চিন্তা ছিল তাহা নয়, আর্থিক প্রচুর ক্ষতিও ছিল। কত সময় সমস্ত ছাপা-ফর্ম্মা পুড়াইয়া নূতন ফর্ম্মা ছাপিতে হইয়াছে।

রামানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু' তখন দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা তখন দেশ ও সমজেসেবামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত। রামানন্দ ইতিপূর্ব্বে আঘাতের পর আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু ১৯১৯ সেপ্টেম্বর মাসে কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে যে ভীষণ শোক পান তাহাতে মুহ্যমান হইয়াও তিনি তাঁহার মানস-সন্তান এই পত্রিকা দুইখানির মধ্যেই একেবারে ডুবিয়া গেলেন আর ইহারই মধ্যে তিনি যেন খুঁজিয়া পাইলেন পরম সান্ত্বনা। স্ত্রী মনোরমা কিন্তু এই আঘাত সহ্য করিতে পারেন নাই, ঐ সময়ে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। হৃতস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া পান নাই।

মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের রাজনৈতিক পট অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এ সম্বন্ধে পাঠকগণকে ওয়াকি-বহাল করার জন্য 'পারাপারের ঢেউ' নামক একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮)। এরূপ যখনই প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন তখনই নূতন নূতন বিভাগ সংযোজন করিয়াছেন। যেমন, 'ছেলেদের পাততাড়ি,' 'মহিলা মজলিশ', 'বেতালের বৈঠক', 'কষ্টিপাথর', 'পঞ্চশস্য', 'দেশের কথা', 'আলোচনা' প্রভৃতি।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু'র মুদ্রণ পারিপাট্যের 'দিকে রামানন্দের নজর ছিল বরাবর। নিয়মিতরূপে পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের নিমিত্ত একটি নিজস্ব ছাপাখানার প্রয়োজন তিনি বহুদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন। প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯১, আপার সার্কুলার রোডে 'প্রবাসী প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় **'Wel-fare'** নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র রামানন্দ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় বাহির হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ভারতবর্ষের অসহায় অবস্থা মনীষীগণের নিকট সম্যকরূপে প্রকটিত হইল। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ দ্বারাই আমরা পুনরায় আত্মনির্ভর ও শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারিব, এই ভাবনায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব ১৯২০ সনের কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত হইল। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতিকার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব রচিত হয় বটে, কিন্তু ইহার মূল লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয় অবিলম্বে ভারতবাসীর স্বরাজলাভ। দেশভক্ত রামানন্দ বরাবর ভারতবর্ষের স্বাধিকার লাভের জন্য লেখনী পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, এবারে এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যকে তিনি স্বাগত জানাইলেন। রামানন্দ বরাবর হিংসার উপরে অহিংসারই স্থান দিয়া আসিয়াছেন।

তিনি "বাধ্যতা ও স্বাধীন চিন্তা" সম্বন্ধে লিখিলেন :

"অবাধ্যতা ভাল নয়, বাধ্যতা ভাল ; আজ্ঞানুবর্ত্তীদিগকে (তাহারা বয়সে বালক, যুবক বা প্রৌঢ়ই হউক) শাসনে রাখা উচিত, প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় ; এইরূপ নীতিবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলে হউক বুড়ো হউক, মানুষকে যদি সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, বিশেষ কোন আদেশ পালন করিতে হয়, তাহা হইলে সে নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া নিজে দায় ঝুঁকি লইয়া কাজ করিতে শিখিবে কখন? বিদেশীরা আমাদের চরিত্রে একটা প্রধান খুঁৎ এই ধরে যে আমরা বেশ ভাল অনুচর, কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আমাদের নাই। অর্থাৎ নিজে পথ আবিষ্কার ও উপায় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা আমাদের নাই ; আপনার পথে আপনি চলিবার এবং অপরকে চালাইবার সাহস ও শক্তি আমাদের নাই ; নেতৃত্বের দায় ঝুঁকি লইবার মত নির্ভীকতা ও মনের বল আমাদের নাই। ইহা যে কতকটা সত্য তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার জন্য কি আমরাই দোষী? আমাদের পারিবারিক প্রথা, আমাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী যদি আমাদিগকে শৈশব হইতে কেবল নিয়মানুগত্য, আদেশ পালন, গতানুগতিকতা, আইনমানা, ইহাই শিখায়, নিজের স্বাতন্ত্র্যবিকাশের এবং নেতৃজনোচিত যোগ্যতা অর্জ্জন ও বর্দ্ধনের কোন সুযোগ না দেয়, তাহা হইলে আমরা এক এক জন (readymade) তৈরী নেতা হইয়া আকাশ হইতে পড়িব, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। "তবে কি তুমি চাও যে মানুষ শৈশবে মা বাপ গুরুজনকে মানিবে না, বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষক অধ্যাপকের কথা শুনিবে না, সামাজিক সব বিধিব্যবস্থা উল্টাইয়া দিবে, আইনকানুন কিছুই মানিবে না?" না। আমি বলি, বিধিব্যবস্থার, আদেশের হুকুমের এবং নিয়মের সংখ্যা ও প্রয়োগক্ষেত্র কমাও, আইনের সংখ্যা ও মানবজীবনের উপর প্রভুত্ব কমাও। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষকে অনুভব করিতে দাও, যে, বিধিনিষেধের, হুকুম-নিয়মের এবং আইনকানুনের বাহিরে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের জন্য বৃহৎ সীমাহীন ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে সে নিজে প্রভু, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও ইচ্ছাই নিয়ম। তাহা হইলে বলিষ্ঠ, দৃঢ়, সাহসী, নেতৃত্বের যোগ্য মানুষ পাওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব বাড়াইবার অন্য উপায় নাই। এই উপায়ে, অনেকে বিপথে যাইবে, এরূপ আশঙ্কা আছে; কিন্তু তথাপি ইহাই উপায়; দ্বিতীয় উপায় কোন দেশে কখনো ছিল না, এখনও নাই। ভুল না করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়ে পরের গড়া-বিধিব্যবস্থার আনুগত্য "গো-বেচারী" বা "ভালমানুষ" গড়িবার পক্ষে ভাল; কিন্তু মনুষ্যের গণনায় আসে, এমন মানুষ ওরূপ উপায়ে তৈরী হয় না।

বিদেশীরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও একটা কথা বলেন যে আমরা নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্কার করিতে পারি না। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহারও কারণ উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে। সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, সকল বিষয়েই আমাদের জন্য "দাগা বুলাইবার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে দাগা-বুলান ছাড়িয়া কিছু গবেষণার সুযোগ দিবামাত্রই সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এরূপ যে এখানে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" এরণ্ডকে অতিক্রম করিয়া আমাদের শালগাছ হইবার যো বেশী আছে কি? শুনিয়াছি অশ্বিনীকুমার দত্তের নির্ব্বাসনের অন্যতম কারণ এই ছিল যে বরিশালে তাঁহার প্রভাব ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশী হইয়াছিল।"

(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১, পৃঃ ৬)

অহিংসাপন্থী রামানন্দ অহিংসারও সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

অহিংসার সীমা—"এইখানে একটা কঠিন সমস্যা দেখা দিবে। অসহযোগীরা অহিংসাবাদী। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি ভিতরের ও বাহিরের সশস্ত্র শত্রুদিগের হাত হইতে দেশরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবেন কি না? অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ না করিয়া সশস্ত্র শত্রুকে, বিশেষতঃ বহিঃশত্রুকে নিরস্ত করিবার অন্য কোন ফলদায়ী উপায় আছে কি?

এরূপ শান্তিপ্রিয় লোক পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতীয় অসহযোগীরা ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারা সাহসী সেই শ্রেণীর লোক কি না।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে পূরামাত্রায় অহিংসাচারী হইতে সম্মত হইতে পারি, নির্ব্বিবাদে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতেও পারি; কিন্তু এক জায়গায় খট্‌কা লাগে। আততায়ীর প্রাণ বধ ছাড়া নারীর উপর অত্যাচার নিবারণের যদি আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে আততায়ীর প্রাণ বধ করা উচিত কি না?

পুরুষের উপর অত্যাচার ও নারীর উপর অত্যাচারে প্রভেদ আছে। নারীর উপর অত্যাচারে তাঁহার জীবন এরূপ কালিমাময় দুর্ব্বহ ও দুঃসহ হইতে পারে, যাহা অপেক্ষা মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য আবশ্যক হইলে আততায়ীর প্রাণ বধ করা উচিত নহে কি? একজন দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ কি নারীর স্বচ্ছন্দ পবিত্র নারী জীবন অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও মূল্যবান্? আমরা পুরুষজাতির পক্ষ হইতে এই সব কথা লিখিতেছি; কারণ দেশের উপর শত্রুর আক্রমণ নিবারিত না হইলে নারীর অপমান অবশ্যম্ভাবী, এবং যে পুরুষ তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে নিবারণ না করে, সে কাপুরুষ। নারীরা আত্মরক্ষার জন্য স্বয়ং আততায়ীর প্রাণ বধ পর্য্যন্ত করা উচিত মনে করেন কি না, তাহা তাঁহারা স্থির করিবেন।

আমরা কংগ্রেস ও খিলাফৎ দলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা লঘুচিত্ততা বশতই লিখিতেছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। পুলিশ ও সেনা বিভাগে কাজ করার অনুরোধ যদি তাঁহারা অন্তরের সহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুলিশ ও সৈনিকদের শান্তিরক্ষার কাজ তাঁহারা অন্তরের সহিত করুন ও করিতে প্রস্তুত থাকুন। আয়ার্ল্যাণ্ডের শিন্-ফেন্ দলের লোকেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রভাবাধীন জেলা সকলে শান্তিরক্ষা ও সুবিচারের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। ভারতীয় অসহযোগীরা অহিংসাবাদী, সুতরাং সশস্ত্র যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু শান্তিরক্ষা ও সুবিচারের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কেবল ভাঙ্গিব, গড়িব না, ইহা ত হইতে পারে না। যদি গড়িতে না পারেন, ভাঙ্গিবেন না।"

(প্রবাসী, পৌষ ১৩২৮, পৃঃ ৪৩৬)

গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় অনেকেই তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন। বিশেষ করিয়া মডারেট-পন্থীরা বলিবার সুযোগ পাইলেন। তাহা ছাড়া ছিল ব্রিটিশ সরকারের উস্কানি। আমাদের দেশে পিছনে হাততালি দিবার লোকের কোনদিনই অভাব হয় না—এ ক্ষেত্রেও হইল না। আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ, আমরা ব্যক্তির কাজ দেখিয়া বিচার করি না। আমরা ছিদ্রান্বেষী, ছিদ্র পাইলেই হইল। রামানন্দ ছিলেন গান্ধীজীর পূর্ণ সমর্থক। তাঁহাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন, এই একটি লোক, যাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে। যিনি এত বড় একটা দায়িত্ব লইয়া কাজে নামিলেন তাঁহাকে অত সহজে বিচার করিলে চলিবে কেন? "মহাত্মা গান্ধীর দায়িত্ব এবং দেশের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে রামানন্দ (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮) বিবিধ প্রসঙ্গে যে বিস্তারিত আলোচনা করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। আমরা তাহা পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"মহাত্মা গান্ধীর দায়িত্ব ও দেশের কর্ত্তব্য—বেসরকারী সমুদয় অত্যাচারের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে পরোক্ষভাবে দায়ী অনেকে করিতেছে, সাক্ষাৎভাবে দায়ীও কেহ কেহ করিতেছে। এই প্রকারে তাঁহার ঘাড়ে দায়িত্বের ও দোষের বোঝা চাপান খুব সোজা। কিন্তু প্রথম দোষ কে করিয়াছে, প্রথমে কে ঢিল ছুড়িয়াছে, তাহাও নির্ণীত হওয়া উচিত।

আমরা অনেকে এখন ঘরে বসিয়া কখন গবর্ণমেণ্টকে কখন গান্ধী মহাশয়কে, কখন বা উভয়কে দোষ দিতেছি। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া, জীবন তুচ্ছ করিয়াও, গান্ধী গবর্ণমেণ্টের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে ইহা তাঁহার করা উচিত হয় নাই); তিনি বরাবর অসহযোগী ছিলেন না। এরূপ সহযোগী গান্ধী অসহযোগী কেন হইলেন, তাঁহার সমালোচকদের তাহা জানা উচিত, বিশেষতঃ সেইসব সমালোচকদের জানা উচিত যাঁহারা কখন তাঁহার মত

গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করেন নাই। গান্ধী কেন অসহযোগী হইয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছিলেন, এবং তাহা নানা সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, সহযোগিতা দ্বারা ইংরেজদের নিকট হইতে স্বরাজ জিনিয়া লওয়া যাইবে না; যুদ্ধে মানুষ যেমন সাহস দেখায় এবং কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করে, অস্ত্রহীন নিরুপদ্রব রক্তপাতহীন সংগ্রামে সেইরূপ সাহস দেখাইয়া এবং কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিয়া আমাদিগকে স্বরাজ জিনিয়া লইতে হইবে।

এবিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকিতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতসংস্কার আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়া স্বরাজ পাওয়া যাইবে এবং ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার—বেসরকারী সভ্যদের ও গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কাজের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই দেখ কতটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বরাজ-প্রাপ্তি নহে, কেননা কর্ত্তা ইংরেজই থাকিতেছে। তা ছাড়া ইংরেজ আম্‌লারা দু-চারটা বিষয়ে যে "মিষ্ট যুক্তি মার্গানুসারিতা" (Sweet Reasonableness) দেখাইতেছে, তাহা অসহযোগ প্রচেষ্টার বিদ্যমানতা-বশতঃ কি না, "সংস্কারপন্থী"রা তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক, গান্ধী মহাশয়ের মত আমরাও মনে করি, যে, কেবল "সহযোগিতা" দ্বারা স্বরাজ-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না; সম্পূর্ণ হউক, বা কোন কোন বিষয়ে হউক অসহযোগের প্রয়োজন।

অসহযোগ আন্দোলনে দেশে খুব অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা অসহযোগীরাও স্বীকার করিবেন। তবে, তাঁহারা বলিবেন এই, যে, গবর্ণমেণ্ট দেশমত অনুসারে চলিলে দেশের দাবী গ্রাহ্য করিলে কোন অশান্তি ত হইত না; গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্তে, দেশমতে অবজ্ঞা দেখাইয়া নিগ্রহনীতির অনুসরণ করায় অশান্তি হইয়াছে। অসহযোগীদের জবাব না হয় নাই শুনিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রথম ঢিল ছুড়িয়াছিল কে? একজন প্রবীণ ও সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় উদারপন্থী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম ঢিল ছুঁড়িয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট এবং সেই ঢিলটি হইতেছে রৌলট্ আইন।" দেশের সব রাজনৈতিক দলের মতের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাস করিয়া দেশের লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং পরোক্ষভাবে দলন-ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সুতরাং খুব মডারেটরাও আশা করি স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান অশান্তির জন্য গবর্ণমেণ্টেরও কিছু দায়িত্ব ও দোষ আছে।

যেমন কান টানিলে মাথা আসে, তেমনি অসহ-যোগের সঙ্গে সঙ্গে আসে অবাধ্যতা। "বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতির হিতসাধন ও সম্মানরক্ষার জন্য যাহা দরকার, তাহা করে না, বরং ইহার দ্বারা ভারতীয় জাতির চূড়ান্ত অপমান হইয়াছে, এবং ইহা জাতীয় মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করায় জাতীয় অধিকার ও আত্মকর্ত্তৃত্ব ইহা অস্বীকার করিয়াছে; অতএব ইহার সহিত সহযোগিতা করা অধর্ম্ম", এইরূপ বিশ্বাস যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তিনি শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, যে, আমি এই গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিব না; তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, এই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মানিব না, ইহাকে ট্যাক্‌স দিব না, ইহার কাজ অচল করিব, এবং ইহার স্থানে এরূপ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব, যাহা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব কার্য্যতঃ মানিয়া চলে। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা না মানা, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অচল করা, এবং তাহার স্থানে জাতীয়-আত্মকর্ত্তৃত্ব-স্বীকারকারী শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা, প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। এক হইতে পারে, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা এবং আর এক রকম হইতে পারে নিরস্ত্র নিরুপদ্রব অবাধ্যতা ও প্রতিরোধ দ্বারা। মহাত্মা গান্ধী অহিংসাপন্থী ও আত্মিক-শক্তিতে বিশ্বাসী। এই জন্য তিনি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, কোন অবস্থাতেই কাহারও কোন গবর্ণমেণ্টের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন, কোন আইন লঙ্ঘন, কোন প্রকার অবাধ্যতা করা উচিত নহে, অথবা কোন গবর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠতর অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। যাঁহাদের মত এ প্রকার, তাঁহারা যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ বহুদেশের

প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে লেখা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের মডারেট দলের নেতারা এই শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাদের আন্তরিক মত সম্ভবতঃ তিন রকমের হইতে পারে:—(১) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এত খারাপ নহে যে ইহার আজ্ঞা লঙ্ঘনাদি করিয়া ইহার পরিবর্ত্তে অন্য রকমের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক, কেননা ইহারই ক্রমপরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি দ্বারা জাতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। (২) ভারতীয় জাতির অবস্থা ও চরিত্র বর্ত্তমানে এরূপ যে ইহার মধ্যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট গঠনের মালমশলা নাই, সুতরাং নূতনবিধ গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলেও তাহা টিকিবে না বা তাহা অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। (৩) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের জায়গায় শ্রেষ্ঠ অন্যবিধ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক বটে, কিন্তু বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় ও জাতি এমন শক্তিমান যে তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার শক্তি ভারতীয় জাতির নাই।

এই তিন প্রকার মতের কোনটিকেই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না, যে, এই তিনটি মতের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য বা অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। বোধ হয়, ইহা বলিলে কোনদিকেই বেশী বলা হইবে না, যে, এই মতগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। তাহা হইলে ইহার বিপরীত মত সত্য হইতেও পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের জায়গায় অন্য রকম গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের ইচ্ছা ও চেষ্টা একান্ত ভ্রম-প্রসূত ও অনাবশ্যক না হইতেও পারে! অন্য রকম গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের মত শক্তি ভারতীয় জাতির আছে, এবং এই জাতির মধ্যে এরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠনের উপযোগী উপাদান আছে, এরূপ বিশ্বাসও নিতান্ত ভ্রান্ত না হইতে পারে। উল্লিখিতরূপ ইচ্ছা, চেষ্টা ও বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীর থাকায় তিনি অতি কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট বা প্রভুত্ব শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না ও নহেন। কেহ তাঁহার কথা শুনিতে আইনতঃ বা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহে। লোকে তাঁহার কথা শুনে তাঁহার যুক্তি শুনিয়া এবং জীবন দেখিয়া। তিনি বলপ্রয়োগ দ্বারা কাহাকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করেন না। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষভুক্ত লোকেরা বলেন, গান্ধীর দলের লোকদের উৎপীড়নে ও ভয়ে লোকে তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য হয়। তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা চাহিতে অধিকারী, যে, গান্ধী কি প্রকারে এত সংখ্যাবহুল ও শক্তিমান দলের নেতা হইলেন যাহার ভয়ে গবর্ণমেণ্টের ভয় অনুগ্রহ ও প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া লোকে ঐ দলের কথা শুনিতে বাধ্য হয়? গান্ধী লোককে ধন মান পদ কিছু দেন না, দিতে পারেন না, তিনি লোককে গরীব হইতে বলেন ও এমন কাজ করিতে বলেন যাহাতে লাঞ্ছনা, প্রহার, কারাদণ্ড, সর্ব্বস্বান্ত ও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে, যে, গান্ধী নিজে যাহা বিশ্বাস করেন, অন্যকেও তাহা বিশ্বাস করিতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে বলেন। তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে গেলে যে দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত, ইহা লোকে জানে ও দেখিয়াছে; ইহা তাঁহার অসামান্য প্রভাবের অন্যতম কারণ।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কেহ যদি কাহারো উপর বলপ্রয়োগ না করিয়া কেবল নিজে দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়া নিজের মত ও বিশ্বাস প্রচার করেন, তাহা হইলে তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। গান্ধী এই প্রকারের মানুষ, সুতরাং তাঁহার এই অধিকার আছে। এখানে আপত্তি এই উঠিবে, যে, "গান্ধীর মত শান্ত ও সংযত মানুষ ত জনসাধারণ নহে; সুতরাং তাঁহার মতানুযায়ী কাজ শান্ত ও সংযত ভাবে করিতে না পারিয়া তাহারা উত্তেজনাবশে ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। অনেকের অভিপ্রায়ই নহে তাঁহার মত অনুসারে কাজ করা, তাহারা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, কেবল লুট-তরাজের জন্য অবাধ্যতা-প্রচেষ্টার দল পুরু করিতেছে। গান্ধী জানেন, যে, দেশে এই দুই রকম লোক আছে। অতএব এহেন দেশে

তাঁহার মত ও বিশ্বাস প্রচার করা ও লোককে তদনুযায়ী কাজ করিতে বলা তাঁহার উচিত হয় নাই।"

ইহার উত্তরে কিছু বক্তব্য আছে। যাহা কিছু অন্যায় গর্হিত অবৈধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মিক বিষয়—সবক্ষেত্রেই প্রতিকারের প্রয়োজন হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকার-চেষ্টা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য, অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা নয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। এইরূপ প্রতিকার-চেষ্টা বুদ্ধ, ঈশা, মোহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি জগতের ধর্ম্মগুরুরা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের লোকদের বা তথাকথিত দলের লোকদের কাহারও দ্বারা পৃথিবীতে অত্যাচার অনাচার পৈশাচিক ব্যবহার কাহারও সংঘটিত হইয়াছে; তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রচারিত হওয়ায় জগতের উপকারও হইয়াছে। অত্যাচার অনাচার আদি হইয়াছে বলিয়া কেহ এমন বলে না যে বুদ্ধ ঈশা শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহারা যেমন কাহাকেও গর্হিত কাজ করিতে বলেন নাই, গান্ধীও তদ্রূপ কাহাকেও গর্হিত কাজ করিতে বলেন না, বরং বার বার নিষেধ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং গান্ধীর মত প্রচারের বিরুদ্ধে কেন আপত্তি হইতেছে?

অনেকে ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের তুলনা অসঙ্গত মনে করিবেন। তজ্জন্য, যদিও গান্ধীর মত ও প্রচেষ্টা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্কার-বিষয়ক নহে, তথাপি আমরা রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রচেষ্টার অতীত ও আধুনিক দৃষ্টান্ত সকলই ধরিব। অনেক জাতি স্বাধীন হইতে গিয়া রক্তপাত ও নানা অত্যাচার করিয়াছে; অনেক অত্যাচার নেতাদের আদেশের বিরুদ্ধে ও অজ্ঞাতসারেও হইয়াছে। কিন্তু এইসব হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকে ঐতিহাসিকেরা অন্যায় বলেন নাই। আমাদের যুক্তি এ নয়, যে, যেহেতু অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার সঙ্গে রক্তপাত ও অত্যাচার জড়িত ছিল, অতএব আমাদের দেশে তদ্রূপ কিছু ঘটা দোষের বিষয় নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া, আমরা একদিকে যেমন স্বাধীনতার চেষ্টা করিব অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি রক্তপাত অত্যাচারাদি পরিহার করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিব; এবং রক্তপাত ও অত্যাচারাদি হইবার সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে সে চেষ্টা আরম্ভ করিব না। দেখিতে হইবে যে, গান্ধী রক্তপাত ও অত্যাচার পরিহার ও নিবারণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন কি না, এবং যাঁহারা নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিতে চান, শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ তাঁহাদিগকে কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছেন কি না। আমাদের বিশ্বাস এই দু'রকম কাজই তিনি করিয়াছেন। কোন স্থানের অধিবাসীরা নিরুপদ্রব অবাধ্যতা করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহাদিগকে তৎপূর্ব্বেই যে যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে ও যে যে সর্ত্ত পালন করিতে হইবে, তাহা কঠিন; বঙ্গের কোন স্থানে সেরূপ কৃতিত্ব দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের দু একটি স্থান হয়ত এই কঠিন পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে. সমষ্টিগত নিরুপদ্রব অবাধ্যতা (mass civil disobedience) করিতে এই জন্য গান্ধী লোকদিগকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছেন। তাঁহার নিজের পরিচালনা ও নেতৃত্ব ব্যতীত ট্যাক্স না দেওয়া রূপ অবাধ্যতা যাহাতে কোথাও করা না হয়, তজ্জন্যও অনেক অনুরোধ করিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশ অনুসারে, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক লোকদিগকে যে-প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করান, তাহাও কঠিন প্রতিজ্ঞা।

এসকল সত্ত্বেও যদি অনুপযুক্ত লোকদের দ্বারা অবাধ্যতা হয়, তাহা হইলে গান্ধীর দায়িত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং গবর্ণমেণ্টের দলভুক্ত লোকরা স্বীকার করিবেন যে, নরহত্যা, প্রহার, অন্যবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন, এবং লুণ্ঠন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নানা আইন, নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, সরকারী কোন কোন লোকদের দ্বারা নরহত্যা প্রহার লুণ্ঠন প্রভৃতি সময় সময় হইয়া আসিতেছে, ইহা প্রমাণিত তথ্য। কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি নিজের বৈধ কাজ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন, না আইনাদি ভস্মীভূত

করিয়াছেন? তাহা করেন নাই। তাহা হইলে দলের কোন কোন লোক বা অন্য লোক গর্হিত কাজ করে বলিয়া, গান্ধীকে নিজের বৈধ কাজ হইতে কেন ক্ষান্ত হইতে বলা হয়? আমরা তাঁহার কাজকে ধর্ম্ম অনুসারে অবৈধ মনে করি না। আইন অনুসারেও উহা বৈধ; কারণ উহা অবৈধ হইলে গবর্ণমেণ্ট এতদিনে নিশ্চয়ই উহা বন্ধ করিয়া দিতেন। কেহ কেহ অবশ্য বলিতে পারেন যে, উহা আইন অনুসারে অবৈধ হইলেও গবর্ণমেণ্ট গূঢ় রাষ্ট্রনীতি অনুসারে তাঁহার কাজে, অর্থাৎ তাঁহার মত ও বিশ্বাসের প্রচারে, বাধা দেন নাই। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ, যে, গবর্ণমেণ্ট, যে-কোন কারণেই হউক, গান্ধীকে এমন একটা অবৈধ কাজ করিতে দিয়া আসিয়াছেন যাহার ফলে দেশে নানা অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে শুধু গান্ধীকেই দোষ দেওয়া হয় কেন? গবর্ণমেণ্টকেও ত দোষ দেওয়া উচিত। আমরা কাহাকেও দোষ দিবার জন্য উৎসুক নহি। আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়াও যে প্রকাশ্য কাজে বাধা দেন না, তাহা গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে বৈধ।

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে দেশে বর্ত্তমান সময়ে অশান্তি, উপদ্রব অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী কি পরিমাণে দায়ী, তাহা স্থির করিবার পক্ষে সাহায্য হইবে। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, গান্ধী মহাশয়কে যদি খুব দোষী বলিয়াও মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, একমাত্র তাঁহার প্রভাবে দেশে এত অশান্তি ও উপদ্রব হইতে পারিত না, যদি অন্যান্য যথেষ্ট কারণ না থাকিত। কৃষকেরা দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত। যথেষ্ট অন্ন ও বস্ত্র তাহাদের অধিকাংশের নাই। তাহাদের বাস-গৃহ অস্বাস্থ্যকর, সংকীর্ণ ও জীর্ণ। তাহারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। রোগে তাহাদের চিকিৎসা হয় না। তাহাদের অধিকাংশ সম্বন্ধে এই কথা সত্য। কারখানার ও রাস্তা-ঘাটের শ্রমীরা তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে আগে খুব সামান্য পারিশ্রমিক পাইত; এখনও যথেষ্ট পায় না। জ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর গৃহ, রোগে চিকিৎসা, প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের অবস্থা কৃষকদের চেয়ে ভাল নয়। অধিকন্তু, তাহারা নিজ গ্রাম্য-সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মস্থান হইতে দূরে বাস করে বলিয়া তাহাদের চরিত্রের উপর এমন কোন প্রভাব থাকে না যাহা তাহাদিগকে দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইসব কারণে এবং আবগারী বিভাগের কৃপা ব্যবস্থিত সুরা-সুলভতায় তাহারা সহজেই পানাসক্ত ও পাশব-ভাবাপন্ন হয়।

ইহা ব্যতীত, কৃষকদের উপর ভূস্বামীর (অর্থাৎ খাস-মহল-সকলে রাজস্ব-সংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারীদের, এবং অন্যত্র জমিদারদের) উৎপীড়ন, অবমাননা এবং অন্যায় আদায় আছে। কৃষক, গাড়োয়ান, কুলী-মজুর, অনেককে অধস্তন পুলিসের অপমান ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। অশান্তি ও উপদ্রবের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে এইসব কথা ভুলিলে চলিবে না।

সর্ব্বশেষে একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিতে হইতেছে। গত মহাযুদ্ধে যে-সব দেশ ও জাতি এক বা অন্য পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এবং অন্যত্রও, এক মহা সামাজিক আলোড়ন এবং বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বুঝিয়াছে, তাহারা কেউ-কেটা নয়। যুদ্ধে জয়ের জন্য তাহাদের সাহায্য যে কি পরিমাণে আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, রক্ত দিয়াছে, কিম্বা কোন না কোন অঙ্গ দিয়াছে অধিকতম সংখ্যায় তাহারা; যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমীর কাজ করিয়াছে কেবলমাত্র তাহারা; এবং যুদ্ধের জন্য আবশ্যক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলী, বারুদ, জাহাজ, অর্ণবযান এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ-সম্ভার (munitions) প্রস্তুত করিয়াছে অধিকতম সংখ্যায় তাহারা। এই প্রকারে তাহারা নিজেদের গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার উপর রুশিয়ার বিপ্লবে যে শ্রমীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে, সে খবরটা আমাদের মত অজ্ঞ নিরক্ষর দেশের নিরক্ষর শ্রেণীর লোকদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আর এক প্রকারের সামাজিক আলোড়ন ও উলটপালটের সূত্রপাতও হইয়াছে। যুদ্ধজয়ের গৌরব এবং লাভ প্রধানতঃ শ্বেত-জাতিরা ও জাপান পাইলেও আফ্রিকার ও আমেরিকার কৃষ্ণকায়েরা

এবং ভারতের অশ্বেত লোকেরা ইহা বুঝিয়াছে যে তাহাদেরও সাহায্য ব্যতিরেকে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইত না।

এইসব কারণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এবং অশ্বেত পরাধীন দেশ ও জাতির সকল লোকদের মধ্যে মনুষ্যোচিত অধিকতর মর্য্যাদা গৌরব ধন সুখ সুবিধা ও আত্মকর্তৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অথচ সব দেশেই প্রভুত্ব শক্তিবিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ও ধনীরা অন্য সকলকে এখনও তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নহে, যাহারা নীচে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি এখনও সতেজ রহিয়াছে। শ্বেতেরা অশ্বেত জাতি-সকলকে এখনও ছলে-বলে-কৌশলে দাবাইয়া রাখিতে ব্যগ্র।

সুতরাং অসন্তোষ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এমন অবস্থায় গান্ধীর মত সাহসী শক্তিশালী সাধু পুরুষ যখন নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদেরও মনুষ্যত্বে, চরিত্রে, লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার শক্তির অস্তিত্বে, বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে সুপ্ত মনুষ্যত্ব যে জাগিয়া উঠিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শক্তি ও শক্তিবোধ জাগাই যথেষ্ট নহে; সংযম, দায়িত্ববোধ, এবং সাফল্যলাভের জন্য শক্তিপ্রয়োগ-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হওয়াও আবশ্যক। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ও যথাসময়ে না জন্মায় অনেক অমঙ্গল হইয়াছে।

গান্ধী মহাশয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে দেশের অর্থাৎ দেশবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাই।

গান্ধী নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেছেন। তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসঙ্গতি দোষ এবং বিবেচনার ত্রুটিও হইয়া থাকিবে; কিন্তু তিনি সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়া কাজ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত অনুচরেরাও সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়া কাজ করিতেছেন। গান্ধীর উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যদি অনেক লোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য কেবলমাত্র তাঁহাকে দায়ী করা চলে না; গুণ্ডা বদমায়েস অর্থগৃধ্নু লোকেরা যদি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার জন্য কি তিনি দায়ী? বত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিশাল দেশের সর্ব্বলোকের নাড়ী-নক্ষত্র জানা কি একজন লোকের পক্ষে সম্ভব? তিনি নিজের সাধু উদ্দেশ্য ও একপ্রাণতার দ্বারা চালিত হইয়া যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের চরিত্র ও সাধু অভিপ্রায় সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আরামে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সমালোচনা করিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য করা হইয়া যাইবে? তিনি দেশবাসী সকলকে যতটা নির্ম্মল স্বদেশপ্রেমিক সাধু চরিত্র ও সংযত মনে করেন, ততটা ভাল হইবার এবং সকলকে সেইরূপ ভাল করিবার জন্য আমাদের কি কোন চেষ্টা করিবার নাই? সেরূপ চেষ্টা কি আমরা করিয়াছি ও করিতেছি?

গান্ধী যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা করিতেছেন। অপবাদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, গৃহবিচ্ছেদ, সর্ব্বনাশ, প্রাণনাশ, অনুচরদের বিরাগ-বিদ্রোহ, কিছুতেই তিনি বিচলিত ভীত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে ভ্রান্ত মনে করেন, কিম্বা কপট ভানকারী অভিনেতা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রচেষ্টাকে বলহীন ও ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে অধিকারী। কিন্তু এই চেষ্টা কাহাদের দ্বারা এবং কি আকারে হইতেছে?

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে ইহাই দেখা যাইতেছে, যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয় চরিত্র জীবন হৃদয় সমবেদনা দেখিয়া। বুদ্ধ, যীশু, মোহাম্মদ, শঙ্কর, আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস্, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি অপেক্ষা ধনী মানী প্রভুত্ববান পণ্ডিত তাঁহাদের সমসাময়িকদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের উপর রাজত্ব এইসব লোকদের অধিগত হয় নাই; হইয়াছিল সর্ব্বত্যাগী, দারিদ্র্যব্রতী, গরীব দুঃখী পাপীর ব্যথার ব্যথী সাধুদের। যাঁহারা গান্ধীর দৃষ্ট আলোককে আলেয়া বা কল্পনা মনে করেন, তাঁহারা চোস্ত্ ইংরেজী লিখিয়া ও বলিয়া, ভাল পোষাক উচ্চপদ মোটরগাড়ী প্রাসাদ রাজানুগ্রহ পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রভৃতির বলে দেশের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিবেন না, যদি তাঁহারা ত্যাগী না হন, গরীব দুঃখী পাপীর ব্যথার ব্যথী না হন, যদি তাঁহারা সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ না করেন।

দেশী-মন্ত্রীরা বার্ষিক চৌষট্টি হাজারের এক পয়সা

কনিষ্ঠ পুত্র—পরলোকগত প্রসাদ

কৈশোরে জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ

ও কনিষ্ঠা কন্যা সীতা

কম, স্ব-ইচ্ছায় বা লোকমতের খাতরে, লইতে রাজী নন। তাঁহারা গান্ধীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবেন? যেসব উদারনৈতিক অর্থাৎ মডারেট নেতা রাজপদ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদেরও জীবনে সাধু চরিত্রের, গরীবের প্রতি সমবেদনা ও রাজ-অবিলাসিতার, এবং রাজভয়কে অগ্রাহ্য করিবার প্রমাণ না থাকিলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে না। চাঁদপুরে কুলিদের জন্য মডারেট নেতাদের মধ্যে যিনি যিনি প্রাণ দিয়া খাটিয়াছেন, টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসা করিয়াছি ও করি; তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু ভগবানের দাবী সবটার উপর। নিজের জন্য একটু কিছুও কেহ রাখিলে, তাঁহার জীবন ও চেষ্টা সেই পরিমাণে বিফল হইবে। গান্ধীরও হৃদয়ের কোণে যদি নিজের জন্য একটুমাত্র জায়গা থাকে, তাহা হইলে তিনিও অব্যাহতি পাইবেন না।

সরকার ও ঘটকদের মত যাঁহারা খবরের কাগজের পাতায় গান্ধীর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা গরীব দুঃখী অত্যাচারিত অস্পৃশ্য অজ্ঞ অপমানিতদের জন্য গান্ধীর সমবেদনার কিয়দংশেরও অধিকারী কি না, আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করুন। তাঁহার দেশের দারিদ্র্য অজ্ঞতা অসুস্থতা, অবনত অত্যাচারিত অবস্থা ও পরাধীনতার প্রতিকারের নিমিত্ত সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ চেষ্টা করুন, শুধু গান্ধীকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিলেই হইবে না। তাহাতে দেশে কেবল অন্তর্বিবাদ বাড়িবে, এবং সরকার ও ঘটক প্রমুখ ব্যক্তিদের ইংরেজদের বাহ্য অনুগ্রহ ও আন্তরিক অবজ্ঞা লাভ ঘটিবে।··· (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮, পৃঃ ৭১৩)

লীগ অফ নেশন্‌স—রামানন্দ ১৯২৬ সনের মাঝামাঝি লীগ অব্ নেশন্‌স হইতে উহার কার্য্যকলাপ সাক্ষাৎভাবে দেখিবার আমন্ত্রণ পান। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বেসরকারী ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আমন্ত্রিত হইলেন। লীগ তাঁহার যাতায়াতের ব্যয় ও রাহা খরচ বাবদে ছয় হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচিত্ত রামানন্দ ইহা লইতে সরাসরি অসম্মত হন। এই অসম্মতির কারণ তিনি পরে বিশেশ্বর শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় লেখেন: "জেনিভায় লীগ অফ নেশন্‌সের এক বিশেষ অধিবেশনে নানা দেশের প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলের রামানন্দবাবু। লীগ প্রতিনিধিগণকে পাথেয় দিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দবাবু ইহা এই আশঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করেন যে, পাছে তাহা হইলে লীগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন অভিপ্রায় অনুরূপ হইয়া পড়ে। ইহা তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন।"

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০, পৃঃ ২৮৮)

রামানন্দ লীগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াই এই মর্ম্মে লেখেন যে, লীগ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, শিল্প বাণিজ্য শ্রমিক ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির কিরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। নারী-ঘটিত পাপ-ব্যবসা দমন, চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কার্য্য বাদে নানা প্রকারের মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করা লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের মধ্যে গবেষণা ও অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান বিতরণে সাহায্য করাও লীগের অন্যতম প্রধান কার্য্য। রামানন্দ বলেন যে, এসব বিষয়ে লীগের কার্য্যকলাপ অবগত হইবার চেষ্টা করিবেন।

লীগের অধিবেশন আরম্ভ হইতে বিলম্ব থাকায় রামানন্দ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যান এবং প্রতিটি দেশে কয়েকদিন থাকিয়া যতটা সম্ভব ইহার লোকজন ও শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করেন। লীগের অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এবং পরেও সুইজারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী ও জার্ম্মানীর কোন কোন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'সম্পাদকের চিঠি' শিরোনামে প্রবাসীতে (কার্ত্তিক, ১৩৩৩ হইতে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেন।

লীগে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে রামানন্দ খুসী হইতে পারেন নাই। লীগের বিভিন্ন বিভাগের রিপোর্ট ও কাগজ-পত্রাদি যাহা যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। লীগ-কর্ত্তাদের ব্যবহারে রামানন্দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি না হওয়ায় এবং বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও

লীগের অর্থগ্রহণ না করায় তিনি লীগ-কর্ত্তাদের তেমন আস্থাভাজন হইতে পারেন নাই। এ-কারণে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভে অসমর্থ হন। রামানন্দ আরও কিছুকাল জেনেভায় অবস্থান করেন। রোমাঁ রলাঁর পল্লীভবনে গিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াও আসেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর রামানন্দ লীগ সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কথা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যুতে' ব্যক্ত করিতে থাকেন।

রামানন্দ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যুকে' সাজাতিকতার দিক হইতে আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে এবং শাসনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইলে বহির্ভারতে প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। তখন পূর্ব্ব আফ্রিকা, কেনিয়া, ফিজি, ব্রিটিশ গায়না এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপতিদের হস্তে ভারতীয় শ্রমিকদের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ ক্রমে 'মডার্ণ রিভ্যু'তে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা লিখিতে সুরু করেন। 'প্রবাসী'তেও এইসব বিষয় আলোচিত হইতে থাকে। ভারতবাসী ও বহির্ভারতের প্রবাসী-ভারতীয়দের মধ্যে আত্মিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিলেন। তিনি হিন্দী মাসিক 'বিশাল ভারত' এই জন্যই প্রকাশ করিলেন। (১৯২৮, জানুয়ারী)। বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদীর উপর এই কাগজের সম্পাদনার ভার দিলেন। 'মডার্ণ রিভ্যু'তে "Indians Abroad" শীর্ষক একটি অধ্যায়ও সংযোজিত হইল। বলা বাহুল্য, এই সব কারণে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গও বহির্ভারতে গিয়া পৌঁছায় এবং প্রবাসী-ভারতীয়েরা নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির এবং সমুদ্র-পারের দূর দূর দেশেরও একদা সংযোগ ঘটিয়াছিল। এই বিষয়টির উপর রামানন্দ বৈশাখ ১৩৩২ সালের প্রবাসীতে 'মহত্তর ভারত' শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন :

"মহত্তর ভারত

ইংরাজীতে "গ্রেটার ব্রিটেন" বলিয়া একটা কথা চলিত আছে। পৃথিবীর যেসব দেশে ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেগুলিকে আপনাদের দেশ করিয়া লইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে যে-সব দেশ এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আছে, সাধারণতঃ সেই সকল দেশের সমষ্টির নাম গ্রেটার ব্রিটেন। ইংরেজী গ্রেট শব্দটির মানে মহৎও হয়, বৃহৎও হয়। গ্রেটার ব্রিটেনের অর্থ সুতরাং বৃহত্তর ব্রিটেন কিম্বা মহত্তর ব্রিটেন দুই-ই হইতে পারে। বৃহত্তর ব্রিটেন অর্থেই সম্ভবতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ইংরেজরা এ-পর্য্যন্ত যে-সব দেশে গিয়া তথায় পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে, সেই সকল দেশের লোকেরা সমষ্টিগতভাবে, এ-পর্য্যন্ত মানুষের কোন প্রকার ভাব চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে এমন-কিছু করে নাই, যাহা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের কোন কীর্ত্তি অপেক্ষা মহত্তর; ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির কোন মানুষও কোনও কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এমন-কিছু করেন নাই, যাহা কার্য্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের কীর্ত্তি অপেক্ষা মহত্তর। অথবা অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়, উপনিবেশগুলির দ্বারা ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব বা গৌরব বৃদ্ধি পায় নাই; বরং তাহারা এ-পর্য্যন্ত ইংরেজদের অগৌরবেরই কারণ হইয়া আছে। ইংরেজদের উপনিবেশগুলির আয়তন ইংলণ্ড অপেক্ষা বড়। এইজন্য তাহাদিগকে বৃহত্তর ব্রিটেন বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস আগে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। পরে ঐ রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হয়, এবং ইউনাইটেড স্টেট্স নামক সাধারণতন্ত্রে আপনাদিগকে পরিণত করে। ইউনাইটেড স্টেট্সকে দুই-একটি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা মহত্তর বলা যাইতে পারে। যেমন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ইংলণ্ডে আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের সমকক্ষ বা তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইউনাইটেড স্টেট্স স্বাধীন হইয়া যাওয়ায় উহাকে আর গ্রেটার ব্রিটেনের অন্তর্ভূত বলা চলে না।

আধুনিককালে ও মধ্যযুগে যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, প্রভৃতির সভ্যতা নানা দেশে বিস্তৃত হয়, প্রাচীনকালে তেমনি ভারতবর্ষের ও গ্রীসের সভ্যতা নানা দেশে বিস্তার-

লাভ করিয়াছিল। আধুনিক প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার ও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিস্তারের প্রণালী ও প্রকৃতিতে প্রধানতঃ একটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার প্রধানতঃ রাজ্য বৃদ্ধি ও ধনলাভের চেষ্টার পরোক্ষ ফল। এই চেষ্টা করিতে গিয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে নির্মূল বা প্রায় নির্মূল করিয়াছে, অবশিষ্ট লোকদিগকে অধীনতা-পাশে বদ্ধ ও নিঃস্ব করিয়াছে। তাহার পর তাহারা উপনিবেশগুলিকে হোয়াইট ম্যান্স ল্যাণ্ড বা শ্বেত মানুষের দেশ আখ্যা দিয়াছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের লোকেরা সবাই সাধু ছিল, কেহ কখন স্বদেশে বা বিদেশে কোন অপকর্ম্ম করে নাই, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে; সমষ্টিগত ভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকদের সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা সত্য, তাহাই আমরা বলিতে চাই।

ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যেমন অন্য অনেক দেশকে নিজেদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, এবং এই সকল পরাধীন দেশের শাসননীতি যেমন লণ্ডনে ও প্যারিসে নির্দ্ধারিত হয় ও তদনুসারে কাজ হয়, ভারতবর্ষের কোন রাজা বা সম্রাট সেভাবে কোন বিদেশকে জয় করিয়া ভারতবর্ষস্থিত কোন রাজধানী হইতে উহার শাসননীতি নির্দ্ধারণ বা রাষ্ট্রীয় কার্য্য-পরিচালন কখনও করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক দেশের ও এক জাতির সহিত অন্য দেশের ও অন্য জাতির যুদ্ধ এবং তাহাতে জয়-পরাজয় প্রাচীনকালে অবশ্যই হইত। সে-সম্বন্ধে মানব অর্থাৎ মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিধি দৃষ্ট হয়, যে কোন রাষ্ট্র বিজিত হইবার পর, উহার শাসনভার উহারই প্রাচীন রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে হইবে। এই বিধি কেবল কেতাবে আবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীনতম মুসলমান লেখক সুলেমান নামক একজন সওদাগরের উক্তি শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল তাঁহার হিন্দুপলিটি বা হিন্দু শাসননীতি নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতীয় রাজারা প্রতিবেশী রাজাদের রাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে না……কোন রাজা কোন রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার পর উহার শাসনভার উহার রাজ পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তিরই উপর অর্পণ করে, জায়সবাল তাঁহার পুস্তকে আরিয়ান কর্ত্তৃক মেগাস্থেনীসের পুস্তক হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত মর্ম্মের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন— "কথিত আছে, হিন্দু রাজাদিগকে তাহাদের ন্যায়বুদ্ধি ভারতবর্ষের সীমার বাহিরের কোন দেশ জয় করিবার চেষ্টা হইতে বিরত রাখিত।"

জায়সবাল বলেন, কেবল এইরূপ কোন কারণ দ্বারাই ইহা বুঝা যায় যে, যদিও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তৎকালীন সমুদয় রাজা অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই জন মৌর্য্য-বংশীয় রাজাদের আমলেও মৌর্য্য সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল, এবং যদিও তাঁহাদের প্রতিবেশী সেলিউকস-বংশীয়দের সাম্রাজ্য দুর্ব্বল ও ধ্বংসোন্মুখ ছিল, তথাপি তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সীমা হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অভিযান করিবার কোনও প্রবৃত্তি তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই।

ভারতবর্ষে বসিয়া বিদেশের উপর প্রভুত্ব করিবার এবং রাজ-কর্ম্মচারী ও বণিকদিগের সহযোগিতা দ্বারা বিদেশের অর্থ শোষণ করিয়া ভারতবর্ষে আনিবার প্রবৃত্তি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কোন রাজার বা জাতির লক্ষিত হয় নাই।

ভারতীয় প্রভাব ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আনাম, কোচিন, কাম্বোডিয়া প্রভৃতির উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা, প্রভৃতির উপরও ঐ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। হয়ত ভারতীয় কোন-কোন রাজা বা রাজ-পুত্র বা অন্য-কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ঐ সকল দেশে উপনিবেশ ও রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহার পর ঐ-ঐ দেশেরই লোক হইয়া গিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় ও তত্তৎ দেশের লোকের মিশ্রণে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদের সভ্যতাও ঠিক ভারতীয় সভ্যতা নহে। ভারতীয় সভ্যতার প্রবল প্রভাব তাহাতে লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহা ভারতীয় সভ্যতা হইতে ভিন্নও বটে। ঐ সকল দেশের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে-সব নিদর্শন এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহার স্বতন্ত্র গৌরব আছে। সেই-সেই দেশের জাতীয় প্রতিভা ঐ গৌরবের কারণ। এই জাতীয়তার মধ্যে ভারতীয় উপাদানের প্রাধান্য এত বেশী যে, যবদ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলেও বর্ত্তমান সময়েও ভারতীয়ত্বের ছাপ তাহাদের উপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে অনেক পর্য্যটক ও গ্রন্থকার ইহা লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সী এফ এণ্ড্রুজ সাহেব কারেণ্ট থট্ নামক মাসিকে একথা লিখিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভাব যে-সব দেশের উপর পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে চীন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দেশ এখনও স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান, ইহার

সভ্যতাও এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। চীন নানা প্রকারে ও নানাদিকে ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন চীনে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে তথাকার একজন প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক লিয়াং চি চাও যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভারতের নিকট চীনের ঋণের বিষয় খুলিয়া বলেন। তাঁহার বক্তৃতা গত ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসের ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে মুদ্রিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রচারকেরা পুরাকালে চীনে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং চৈন অনেক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে ধর্ম্ম এবং কোন-কোন বিদ্যাশিক্ষা করেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অধ্যাপক লিয়াং চি চাও বলেন: "আমরা সাত আট শত বৎসর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া স্নেহশীল ভাইয়ের মত বাস করিয়াছিলাম।

এখন আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, আধুনিক কালে আমরা এতদিন পরে তবে সভ্য (!) জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। তারা আমাদের নিকট কেন আসিয়াছে? তাহারা আমাদের ভূমি ও আমাদের ধনে লোভপ্রযুক্ত আসিয়াছে; তাহারা আমাদিগকে তাজা রক্তে রঞ্জিত কামানের গোলা উপহার দিয়াছে; তাহাদের কারখানায় নির্ম্মিত পণ্যদ্রব্য ও কল প্রত্যহ আমাদের দেশের লোকদিগকে তাহাদের শিল্প হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু অতীতকালে আমরা দুই ভাই এ রকম ছিলাম না। আমরা উভয়েই বিশ্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম; আমরা মানব জাতির লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; আমরা পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা চীনেরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্ব ও পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে কেহই বিন্দুমাত্রও স্বার্থপরতার প্রেরণার দ্বারা কলঙ্কিত হই নাই—উহা আমাদের মোটেই ছিল না।

"যে সময়ে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহ ছিল, তখন, দুঃখের বিষয়, এই ছোট ভাইয়ের বড় ভাইকে দিবার বিশেষ কিছু ছিল না; বড় ভাই আমাদিগকে যে অসামান্য ও অমূল্য উপহারসকল দিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারি না।

আমরা কি পাইয়াছিলাম? ১। ভারতবর্ষ আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাব শিক্ষা দিয়াছিল—সকল স্বাধীনতার ভিত্তিভূত সেই মানসিক স্বাধীনতা যাহা আমাদিগকে পরম্পরাগতি ও অভ্যাসের এবং বর্ত্তমান কোন যুগেরও রীতিনীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থ করে,—সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যাহা দৈহিক ও জাতীয় জীবনের দাসকারী শক্তিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে সমর্থ করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা সেই (বাহ্য বন্ধনের) অভাব-আত্মক স্বাধীনতা নহে যাহার অর্থ শুধু বাহ্য অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে অব্যাহতি অর্জ্জন, কিন্তু ইহা সেই স্বাধীনতা যাহার মানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে 'অহং' হইতে মুক্তি, যদ্দ্বারা মানুষ মহামোক্ষ, মহা স্বাচ্ছন্দ্য ও মহা নির্ভীকতা লাভ করিতে পারে।

[যাঁহারা অজ্ঞতা বা ভ্রম বশতঃ মনে করেন, স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিষ নহে, কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী, তাঁহারা চীন পণ্ডিতের এই উক্তির অর্থ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রবাসী সম্পাদক]

'২। ভারতবর্ষ আমাদিগকে পূর্ণ প্রেমের ভাব ও শিক্ষা দিয়াছিল, সকল জীবের প্রতি সেই নির্ম্মল প্রীতি যাহার প্রভাবে সকল-রকমের ঈর্ষা, ক্রোধ, অধৈর্য্য, বিরক্তি ও প্রতিযোগিতার ভাব দূরে যায় যাহা নির্ব্বোধ, দুর্ব্বৃত্ত ও পাপীর প্রতি গভীর করুণা ও সহানুভূতির আকারে প্রকাশ পায়—সেই পূর্ণ প্রেম যাহা সর্ব্বভূতের অভেদ্যতা স্বীকার করে, স্বীকার করে "মিত্র ও শত্রুর সাম্য" "আমার ও সকল পদার্থের একতা"। ভারতের এই মহৎ দান বৌদ্ধশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজিতে নিবদ্ধ আছে। এই সাত হাজার খণ্ড গ্রন্থের উপদেশের সারমর্ম্ম এই—

জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য এবং করুণা দ্বারা পূর্ণ প্রেমলাভের জন্য সহানুভূতি ও বুদ্ধির অনুশীলন।

"কিন্তু আমাদের বড় ভাইয়ের ইহা ছাড়া আরও কিছু দিবার ছিল। তিনি আমাদিগকে সাহিত্যের এবং শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে অমূল্য সাহায্য দিয়াছিলেন।..."

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ চীনকে যে-সকল বিদ্যা শিখিতে বা তাহাতে উন্নতিলাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল, অধ্যাপক লিয়াং চি চাও-এর মতে তাহা সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ, নাটক রচনা ও অভিনয়, কবিতা ও উপন্যাস কাহিনী-আদি রচনা, জ্যোতিষ, ও মাস-বর্ষাদি গণনা, চিকিৎসা, বর্ণমালা ও লিপি-উদ্ভাবন, গদ্য লিখিবার উৎকৃষ্ট রীতি, হেতুবিদ্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান-রচনা, ইত্যাদি।

স্থাপত্যের বিষয় বলিতে গিয়া অধ্যাপক মহাশয় চীন দেশে প্রাচীনকালে ভারতীয় রীতিতে নির্ম্মিত বহু মন্দিরের উল্লেখ ও তাহাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার

চেকস্লোভাকিয়াতে রবীন্দ্রনাথ ও ডঃ উইনটারনিটজ সহ রামানন্দ

সম্পাদক রামানন্দ
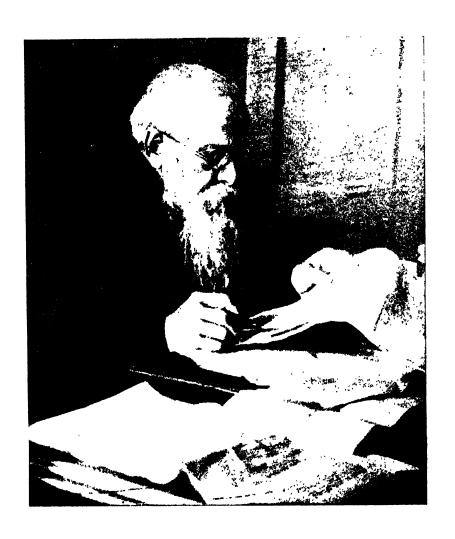
মধ্যে বজ্রকূট মন্দির একটি। এই মন্দির কয়েক মাস পূর্ব্বে ধসিয়া গিয়াছে। বর্ণমালা-উদ্ভাবন সম্বন্ধে চীন অধ্যাপক মহাশয় বলেন, যে, যদিও চীনপ্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনদেশকে নূতন বর্ণমালা ও লিপি দিবার চেষ্টা সফল হয় নাই, তথাপি উহা চীনদিগকে এই বিষয়ে নানা প্রকার একস্‌পেরিমেন্ট্‌ বা পরীক্ষা করিবার উপাদান দিয়াছিল।

চীনের রাজধানী পেকিঙের সাম্রাজিক গ্রন্থাগারে এখনও ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল উভয় মিলাইয়া ৭০০০০ হাজার পুঁথি আছে শুনিয়াছি। অনেকগুলির মূল ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে।

তিব্বতের সভ্যতাও ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, এরূপ অনেক সংস্কৃত বা পালি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ আছে যাহার মূল ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে। এইরূপ একটি তিব্বতী পুঁথি হইতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। কোরিয়াতেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়িয়াছিল।

জাপানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কতক কোরিয়ার মধ্য দিয়া, কতক চীনের মধ্য দিয়া, কতক সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হইয়াছিল। জাপানে রক্ষিত ও ভারতে লুপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন জাপানী কোন কোন মূর্ত্তির পাদদেশে এবং প্রাচীন কোন কোন মন্দির-গাত্রে ভারতীয় ভাষায় ও লিপিতে লিখিত কথা এখনও দেখা যায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত।

মধ্য-এশিয়ার যে বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এখন প্রধানতঃ বালুকাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার নানা-স্থানে বালুকা সরাইয়া অনেক প্রাচীন বিহার, মন্দির, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা হইতে অনেক মূর্ত্তি, পুঁথি, চিত্র পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুঁথি অধুনালুপ্ত কোন কোন প্রাচীন ভাষায় লিখিত, যাহার সহিত সংস্কৃতের সম্পর্ক আছে, আবার কোন কোন পুঁথি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। এই সকল বহু বিস্তীর্ণ বালুকাচ্ছন্ন দেশ ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিল।

পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াই যে কেবল প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী তাহা নহে। ইহুদীদের দেশেও সীরিয়াতেও এবং মিশরেও যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল, অনেক পণ্ডিত এইরূপ বলেন, অনেকে আবার তাহা অস্বীকারও করেন। তেমনি গ্রীস্‌ ভারতের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী, ইহা সাধারণতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অস্বীকার করিয়া, ভারত-বর্ষকে প্রায় সকল বিষয়েই গ্রীস্‌ ও অন্য কোন কোন দেশের নিকট ইঁহারা ঋণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। ভারতবর্ষ কাহারও নিকট ঋণী নহে, এই অসত্য কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু ভারতবর্ষের নিকটে কাহারা ঋণী—তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম লিখিতব্য বিষয়।

পশ্চিম এশিয়ার, ইউরোপের ও আফ্রিকার কোন-কোন দেশ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও আরব জাতি যে প্রাচীন ভারতের নিকট কোন কোন বিদ্যা শিখিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। গণিতের কোন কোন বিষয়, রসায়নী বিদ্যার কোন কোন বিষয়, চিকিৎসার কোন কোন বিষয়, এবং আরও কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন আরবেরা প্রাচীন ভারতীয়দিগের নিকট শিখিয়াছিল, আরবী নানা গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়।

ভারতীয় ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প, সভ্যতা যে যে দেশে নীত হইয়াছিল, সেই সেই দেশের লোকেরা নিজ নিজ প্রতিভার দ্বারা তাহাকে কোন কোন স্থলে নূতন রূপ দিয়াছেন, তাহার উন্নতি সাধনও কোথাও কোথাও করিয়াছেন। এই প্রকারে সেই সব দেশের লোকদের ব্যক্তিত্ব প্রকটিত ও রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বীজের গুণ এবং স্বরূপ একেবারে চাপা পড়িয়া যায় নাই।

স্থূল অর্থে ভারতবর্ষ মানে ভূগোলে বর্ণিত একটি সীমা-বদ্ধ দেশ। কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থে ইহার মধ্যে কোন কোন জায়গা ভারতবর্ষ নহে, আবার ইহার বাইরেও কোন কোন জায়গা আছে, যাহাকে ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে। মাটির কোন জায়গাকে আমরা ততটা ভারতবর্ষ মনে করি না, ভারতীয় হৃদয় মন আত্মা যে-যে রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যতটা ভারতবর্ষ বলিতেছি।

এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা বংশতঃ ভারতীয়, বাসও করেন ভারতবর্ষ নামধেয় ভূখণ্ডে, কিন্তু যাঁহাদের জীবনে, হৃদয় মন আত্মার প্রকাশে ভারতীয়ত্ব অপেক্ষা বৈদেশিকত্ব অধিক ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভারতীয় মনে করা যায় না, তাঁহাদের অধ্যুষিত ভূমি ভারতবর্ষের অংশ হইলেও তাহার বাহিরে।

আবার ভূগোলের ভারতবর্ষের বাহিরে এমন জায়গা আছে ও তাহাতে এমন লোক আছে, যাহাদের হৃদয় মন ও আত্মার প্রকাশ প্রকৃত ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার রূপ দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করে। ইঁহারা যদি বংশতঃ ভারতীয় নাও হন, তাহা হইলেও ইঁহারা আমাদের আত্মীয়।

প্রাচীনকালে নানা দেশে ভারতীয় প্রভাব ব্যাপ্ত

হওয়ায় আমাদের এই প্রকার আত্মীয়দিগের দ্বারা অধ্যুষিত অনেক স্থানকে আমরা ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার স্বদেশ বলিতে পারিতাম। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ এবং তাহার বাহিরের আমাদের এইসব স্বদেশ—সবগুলির সমষ্টিকে আমরা বৃহত্তর ও মহত্তর ভারতবর্ষ বলিতেছি। বৃহত্তর বলিতেছি কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়;—ভারতবর্ষ যত বড় দেশ, তাহার বাহিরের এই দেশগুলি তাহাতে যোগ করিলে, সমুদয়ের আয়তন তাহা অপেক্ষা বৃহৎ হয়। মহত্তর ভারতবর্ষ বলিবার কারণ এই যে, শুধু ভারতবর্ষে প্রধান ভারতীয় হৃদয় মন আত্মার যে রূপ ও প্রকাশ আমরা এখনও দেখিতে পাই, তাহা হইতে উহার মহত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠতার যে-ধারণা আমাদের হয়, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত দেশসকলে ঐ সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার ধারণা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর হয়।

পূর্ব্বপুরুষের গৌরব বর্ণনা করিয়া অলস ও অকৃতীর যে অহঙ্কার জন্মে, তাহার উদ্রেক করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতেছি না। বড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বরং লজ্জা ও দীনতা অনুভব করিয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা কি কারণে মহত্তর ভারত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং আমরাই বা কেন তাহা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। আমাদের মহত্তর ভারত সৃষ্টি করিতে পারা দূরে থাক, ইংরেজরা আসিয়া ভারতবর্ষকেই বরং বৃহত্তর ব্রিটেনের সামিল করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। যদি ভারতের মহত্তর ব্রিটেনের সামিল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও তাহা মন্দের ভাল মনে করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ অন্য অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা জ্ঞানে ধর্ম্মে সভ্যতায় উন্নত ছিল বলিয়া এবং ভারতীয় আদর্শ উন্নত ছিল বলিয়া ভারতীয়েরা অন্য অনেক জাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও শিক্ষকের কাজ করিতে পারিয়াছিল। এখন বিস্তর দেশ ভারতবর্ষকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এখন বিদেশে ভারতবর্ষের আদর প্রধানতঃ ইহার প্রাচীন জ্ঞান-গৌরব, আধ্যাত্মিকতার গৌরব ও সভ্যতার জন্য। আধুনিক কয়েকজন লোক মাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার জন্যও সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন ভারত জগতকে যাহা দিয়াছিল, নূতন ভারতকেও তাহার অনুরূপ কিছু দিতে হইবে, নতুবা নূতন করিয়া মহত্তর ভারতের সৃষ্টি হইতে পারিবে না। তাহা দিবার ক্ষমতা যে এখনও ভারতের আছে, তাহা কয়েকজন আধুনিক ভারতীয় মনীষীর কৃতিত্ব দ্বারা বুঝা যায়।

পুরাকালে ভারতবর্ষের লোকেরা অনেকে শিক্ষক হইয়া বিদেশ যাত্রা করিতেন। তাহার মধ্যে কেহ কেহ নিহতও হইতেন। তথাপি ভারতীয় লোকহিত সাধকদের বিদেশ যাত্রা সেকালে বন্ধ হয় নাই। বন্ধ হয় নাই বলিয়াই প্রাচীন কালে মহত্তর ভারতের উদ্ভব হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যেসব ভারতীয় বিদেশে গিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশ কুলী নামে অভিহিত হয়। স্বাধীন দৈহিক শ্রমের গৌরব আছে। কিন্তু ভারবাহী পশুর মত কিম্বা কলের অঙ্গের মত অপরের হুকুমে এবং অপরের অর্থলোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য বিদেশে মালের রপ্তানি হওয়ায় গৌরব ত নাই-ই, অধিকন্তু জাতীয় অপমান ও লাঞ্ছনা আছে। বিদেশে অধিকাংশ ভারতীয়ের নমুনা অনুসারে কুলীর জাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়ার অসম্মান হইতে আমাদিগকে স্বচেষ্টায় উদ্ধারলাভ করিতে হইবে। ইহা প্রারম্ভিক কাজ। মহত্তর ভারত সৃষ্টি পরের কথা।

আধুনিক ভারতবর্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে লোকহিত চেষ্টায়, এমন কি আধ্যাত্মিকতাতেও, জগতে প্রথম শ্রেণীস্থ বলিয়া দাবী করিতে পারে না বটে; কিন্তু জগতে এখনও অনেক অনুন্নত জাতি আছে যাহারা আধুনিক ভারতীয়দিগের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিতে পারে; প্রাচীন শাশ্বত ভারতীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত আধুনিক কোন ভারতীয় ত নিশ্চয়ই তাহাদিগের হিত সাধন করিতে পারেন। ভারতবর্ষের নিকটেই তিব্বত। তিব্বতীদিগকে ভারতীয়েরা শিক্ষা দিতে পারেন; কিন্তু কোন ভারতীয় সে উদ্দেশ্যে সেখানে যান না।

আফ্রিকার যে-সকল দেশে ভারতের লোকেরা বাণিজ্য বা চাকরি করিতে যান, তথাকার আদিম নিবাসীরা অসভ্য। তাহাদের সেবার জন্য কোন ভারতীয় যান না। ঐ সকল দেশে ইউরোপীয়দের দ্বারা অনেক অত্যাচার হয়, অনেক অন্যবিধ অন্যায় কাজও হয়; কিন্তু ইহাও বলা দরকার, যে, সংখ্যায় নিতান্ত কম হইলেও, ঐ সব দেশে কৃষ্ণকায়দিগের হিতসাধক ও সেবক ইউরোপীয়ের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের অপেক্ষকৃত নিকটবর্ত্তী ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-সকলের এবং মালয় উপদ্বীপে ভারতীয় জনসেবকের প্রয়োজন আছে। ফিজি দ্বীপে ভারতীয় জনসেবকের প্রয়োজন আছে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল কার্য্যে মন না দিলে মহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অথবা দূরে যাইবার প্রয়োজন কি? মাতৃভূমি ভারতেই প্রত্যেক প্রদেশে আদিম-নিবাসী কোল ভিল

সাঁওতাল প্রভৃতি রহিয়াছে, হিন্দু সমাজভুক্ত বা তাহার বহির্ভূত অনুন্নত অবজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছে; তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে মহত্তর ভারতের উদ্ভব নিকটতর হইবে, তাহাদের সেবা না করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।

যে-সকল দেশের সমষ্টিকে বর্ত্তমানকালে সভ্যজগৎ বলা হয়, আমরা চেষ্টা করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে তাহাদিগকেও আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের অংশী করিতে পারি—যেমন পুরাকালে প্রাচীন ভারতীয়েরা ভারতের বাইরের নানা জাতিকে করিয়াছিলেন।

(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২, পৃঃ ১১৯)

ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির দ্বারা দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীরা যে এক সময়ে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেখান হইতে আনীত রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রাবলী প্রতিরূপে তাহা প্রমাণিত হয়। 'প্রবাসী'তে রামানন্দ এই সকল চিত্র প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন। বাংলার সুধী ও মনীষিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করিয়া Greater India Society বা বৃহত্তর ভারত পরিষদ্ গঠন করিলেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানন্দ উচ্চমানের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, শিক্ষা, শিল্প বিষয়ক জীবনী গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া একটি জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবন্ধু ডঃ জ্যাবেজ টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড কৃত "India in Bondage; Her Right to freedom" নামক পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন ১৯২৮, ২১শে সেপ্টেম্বর। গ্রন্থখানিতে লেখক ভারতবাসীর স্বরাজ সাধনা, স্বাধীনতালাভে তাহার যোগ্যতা, পরাধীন অবস্থায় ভারতের, ব্রিটেনের ও জগতের অমঙ্গল প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যনির্ভর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়।

কিন্তু সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। বইখানি নাকি রাজদ্রোহাত্মক। গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ অকস্মাৎ ২৪শে মে, ১৯২৯ তারিখে 'প্রবাসী' অফিস ও সম্পাদকের বাড়ি খানাতল্লাসি করে। তাহারা বইখানির যতগুলি খণ্ড পাইল সবই লইয়া গেল, উপরন্তু পুস্তকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর সজনীকান্ত দাসকে রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার করিল। রামানন্দ স্বয়ং রাজদ্রোহের অপরাধে পরবর্তী ৬ই জুন ধৃত হইলেন। খানাতল্লাসির সংবাদেই তাঁহাকে এক পত্রে মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেন্টের এই কার্য্যের কঠোর নিন্দা করিয়া লেখেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রেও এই প্রসঙ্গে লিখিলেন: "কোন ভারতবর্ষীয় যত বড়ই হউক না কেন, তাহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়াইয়া দিতে হইবে—পাছে সে তাহার অবস্থার কথা ভুলিয়া যায়। গবর্ণমেন্টের 'রক্তনখর' দেখাইবার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

(ইংরেজীর তাৎপর্য্য, আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃঃ ৪১৩)।

যথাসময়ে বিচার হইল। বিচারে প্রকাশক ও মুদ্রাকর রূপে সজনীকান্ত দাসের এবং 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী রূপে রামানন্দের মোট দুই হাজার টাকা জরিমানা হয়।

এই সাণ্ডারল্যাণ্ড সম্বন্ধে রামানন্দ ১৩৪৩, আশ্বিনে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লেখেন:

আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ড

আচার্য্য জাবেজ টি সাণ্ডার্ল্যাণ্ড "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" ("শৃঙ্খলিত ভারত") নামক পুস্তকের লেখক বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত। তিনি আরও কুড়িখানি বহি লিখিয়াছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" নামক পুস্তক প্রকাশ করায় প্রবাসী প্রেসের সত্বাধিকারী ও মুদ্রাকরের নামে মোকদ্দমা হয় এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা হয়। গ্রন্থকার ইংলণ্ডের শত্রুতা সাধনের জন্য এই বহি লেখেন নাই। তিনি নিজে জন্মতঃ ইংরেজ, আমেরিকায় বাস করিয়া আমেরিকান হইয়া গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের কল্যাণের জন্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, এবং জগদ্ব্যাপী স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার এই সত্য ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ স্বশাসক না হইলে জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, তাঁহার এই বহিখানির উপর সাম্রাজ্যোপাসক ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা বড়ই জাতক্রোধ। তাঁহারা এই বইটির তথ্য ও যুক্তিতর্কের উত্তর দিবার যথোচিত চেষ্টা করেন নাই; ভারতবর্ষে ইহার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করিয়াছেন, প্রকাশককে শাস্তি দিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজদের প্রভাবে এই বহির জন্য তিনি আমেরিকাতেও সহজে প্রকাশক পান নাই।

তিনি ধনী ছিলেন না, বহু বৎসর একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান য়ুনিটেরিয়ানদের গীর্জ্জায় আচার্য্যের কাজ করিয়া-

ছিলেন। তাহা ধনী হইবার পথ নহে। অথচ ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রীতি ছিল এবং তাহার কল্যাণ তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ও কায়মনোবাক্যে এরূপ চাহিতেন, যে, নিজের অনেক হাজার টাকা খরচ করিয়া এই বহি আমেরিকায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার বহির ইংলণ্ডে প্রকাশের বাধা এবং আমেরিকায় প্রকাশে তাঁহার নিজের ব্যয়বাহুল্যের কথা আমি জানিতাম না। ঘটনাক্রমে তাঁহার একখানি চিঠিতে আমি তাহা জানিতে পারি।

"আপনার কোন আমেরিকান প্রকাশক পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে মনে হইতেছে না। এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত, যে, আপনার কোন সাহায্য করিতে পারিতেছি না; কেননা, গ্রেট ব্রিটেন দ্বারা ভারতবর্ষে যে 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' বহির প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে আমি তাহার লেখক বলিয়া বিদিত।"

তিনি তাঁহার ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজের একটি সংক্ষিপ্তসার পুস্তিকা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া পৃথিবীর নানা সভ্য দেশে সাত হাজারখানা বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র ভারতের স্ব-শাসন অধিকারের সমর্থক সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বহি বলিয়া স্বীকৃত।

তিনি ১৮৯৫ সালে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন। তখন তাঁহার সহিত এলাহাবাদে আমার পরিচয় হয়। সেবার তিনি পুনরায় কংগ্রেসে, সমাজ সংস্কার কনফারেন্সে, ও একেশ্বরবাদীদের কনফারেন্সে বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার অনেক বৎসর পরে ১৯১০ সালে আর একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতিথি ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজ জ্ঞান সর্ব্বদা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত ও ভ্রান্তিহীন রাখিবার নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষের সাতটি খবরের কাগজের গ্রাহক ছিলেন এবং প্রধান প্রধান সমুদয় সাময়িকপত্র লইতেন। আমেরিকায় এবং আরও অনেক দেশে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বিস্তর ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা কথা প্রচারিত হয়। এরূপ কিছু আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের চোখে পড়িলেই তিনি অবিলম্বে তাহার প্রতিবাদ করিয়া সত্য প্রকাশ করিতেন। ইহা অনেকবার দেখিয়াছি।

আমাদের দেশে তিনি বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের পর্য্যালোচক ও লেখক বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং পুস্তিকা ও পুস্তক লেখা। তিনি সাতিশয় জ্ঞানী ও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ুতে ইংরেজী সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাঁহার সাহিত্যরস সাহিত্যের পরিচায়ক।

তিনি পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতার সমর্থন করিতেন এবং যুদ্ধের উচ্ছেদ ও সর্ব্বত্র শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্যে বরাবর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বিদেশে তাঁহা অপেক্ষা ভারত-প্রেমিক ও অক্লান্তকর্ম্মা ভারতহিতৈষী কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃঃ ৯২৯)

হিন্দুমহাসভা:

'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তকের জন্য বিচারের যে প্রহসন ঘটে, অতঃপর রামানন্দের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি নিখিল ভারত 'হিন্দু মহাসভা'র সুরাট অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন ২রা এপ্রিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে আশ্চর্য্যের কথা, তিনি ব্রাহ্ম হইয়াও 'হিন্দু মহাসভা'র আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। কোনো গোড়ামি তাঁহার ছিল না। তিনি সংস্কারপন্থী। হিন্দু সমাজ বরাবর জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতের স্বাধিকার লাভে প্রয়াসী। কিন্তু আভ্যন্তরিক অজ্ঞতা, অসাম্য, কুসংস্কার ও গলদ্ দূরীভূত না হইলে ইহা ততখানি বলশালী হইতে পারে না যতখানি বলশালী হইলে এই প্রকার সরকার-পোষিত এবং মুসলমানের স্বার্থ-বিজড়িত ভেদনীতির প্রতিরোধ করা সম্ভব। তখন সরকার এই ভেদনীতিকেই একমাত্র অস্ত্র করিয়াছিলেন। হিন্দু মহাসভা রামানন্দকে পুরোধা করিয়া জাতীয়তার আদর্শে আত্মসংগঠন কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি 'হিন্দু মহাসভা' সম্বন্ধে লিখিলেন:

"হিন্দু মহাসভা হিন্দুর যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হয়ত ইতিপূর্ব্বে কথায় কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান ছিল। মহাসভার মতে যে-কেহ ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই আপনাকে হিন্দু বলিবার অধিকারী। হিন্দু বা 'সনাতন ধর্ম্ম', জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্য সমাজের ধর্ম্ম, এগুলি ভারতবর্ষে উদ্ভূত প্রধান ধর্ম্ম। আমরা উপরে হিন্দু নাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, এই সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই কতকগুলি লোক আপনাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি কাশীতে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জি. কে. নারিমান্ নামক একজন বিদ্বান্
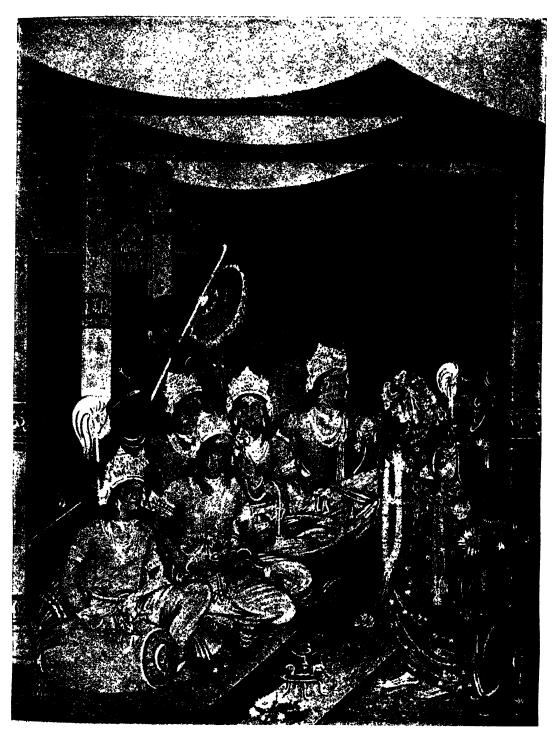
পারসী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, পারসীদের ধর্ম্ম অর্থাৎ জরথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত না হইলেও উহা এক্ষণে ভারতবর্ষেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান আছে; অতএব, তাঁহার মতে পারসীদেরও হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়া উচিত, এবং হিন্দু মহাসভারও পারসীদিগকে যোগ দিবার অধিকার দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম এবং ইরানীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম ঠিক সেইরূপ, আর্য্য সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা, যেমন ভারতীয় লোকেরা ও ইরানীরা (অর্থাৎ পারসীরা) আর্য্য জাতির দুই শাখা। নারিমান্ মহাশয়ের মত অনুসারে কাজ করিতে হইলে মহাসভার নাম আর্য্য মহাসভা করিলে ঠিক হইবে।

বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার সপ্তম অধিবেশন; সুতরাং মহাসভা নূতন করিয়া স্থাপিত হয় নাই। মুসলমানদের মনে মহাসভার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহার নূতনত্ব সম্ভবতঃ একটি, কিন্তু ইহা নূতন নহে। তা ছাড়া তাহা থাকিতে মুসলমানদের যদি স্বতন্ত্র সভা সমিতি থাকিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুদের সেইরূপ স্বতন্ত্র সভাসমিতি স্থাপনে তাঁহারা আপত্তি করিতে পারেন না। মুসলমানরা যখন কংগ্রেসে যোগ দেন নাই, তখন তাঁহাদের মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স (Muhammadan Educational Conference) ছিল এবং এখনও আছে। উহার নাম শিক্ষা সম্বন্ধীয় হইলেও উহা আংশিক ভাবে রাজনৈতিক সমিতিও বটে। মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দিবার পরেও স্বতন্ত্র মোস্‌লেম্ লীগ আছে। যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, কেবল সেই সকল প্রদেশেই যদি মুসলমানদের স্বতন্ত্র সভা সমিতি থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, তাঁহারা সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় (Minority) বলিয়া এরূপ সম্প্রদায় সকলের স্বার্থরক্ষার অধিকার অনুসারে কাজ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গে ও পাঞ্জাবে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই দুই প্রদেশেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র সভা সমিতি ও প্রচেষ্টা আছে।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে যাহার বা যে উদ্দেশ্যগুলির সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে, তৎসাধনকল্পে হিন্দুদের চেষ্টায়, আর যিনিই আপত্তি করুন বা তাহার দোষ প্রদর্শন করুন, মুসলমানেরা তাহা করিতে পারে না। ইহা সত্য কথা, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমুদয় ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থ এক। এই সত্যটি সকলে উপলব্ধি করিয়া একযোগে কাজ করিলে তাহাই আদর্শানুযায়ী কাজ হয়; এবং সেই ভাবে সেইরূপ কাজ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও বটে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা বুঝেন নাই। মুসলমানেরাই বিশেষ করিয়া, যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যায় বেশী সেখানেও, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে কেবলমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধির দাবী এই অজুহাতে করিয়া আসিতেছেন যে, তাহা না হইলে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা হইবে না। অতএব তাঁহারা যদি মনে করেন যে তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ দেশের অন্যান্য অধিবাসীদিগের হইতে আলাদা এবং তাহা রক্ষার জন্য তাঁহাদের আলাদা সভা সমিতি, প্রচেষ্টা প্রতিনিধি চাই, তাহা হইলে হিন্দুরাও যদি মনে করেন যে, তাঁহাদেরও স্বার্থ আলাদা এবং তাহা রক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিন্দু সভা-সমিতি প্রচেষ্টা আদির দরকার আছে, তাহাতে মুসলমানদের আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ বা অধিকার নাই। আপত্তি ও দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন কেবল তাঁহারা, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সমুদয় ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য এক ও সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই, এবং এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করেন। কিন্তু এই আদর্শবাদীরা হিন্দুকে যেমন দোষ দিবেন, মুসলমানকেও তেমনি দোষ দিবেন। তাঁহারা মুসলমানদের দোষের উল্লেখ আগেই করিবেন, কারণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থবাদের উল্লেখ ও তদনুযায়ী আচরণ মুসলমানেরাই আগে করিয়াছেন। কিন্তু ঐ আদর্শবাদীরাও হিন্দুকে ততদিন বিশেষভাবে দুষিতে পারিবেন না, যতদিন মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকিবে।"

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩০, পৃঃ ৮৫৪)

ইহার পর হিন্দু মহাসভার কার্য্যকলাপ রামানন্দ ব্যাখ্যাত এই মূলনীতির অনুসরণেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। কোন্ অজানা ইঙ্গিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের দাবী ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। মিঃ জিন্না তাহাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে চৌদ্দ দফা দাবী করিয়া বসিলেন। রামানন্দ তাহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া কাগজে লিখিতে থাকেন। এবং ইহার ফল যে কতখানি বিষময় হইতে পারে সেদিকেও তখন হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই ভাবে তিনি তখন প্রতি সভাতেই যোগ দিয়াছেন। স্বদেশহিতৈষী রামানন্দ সকলের ডাকে সাড়া না দিয়া পারেন নাই। নিখিল ভারতীয় দেশীয় প্রজা-সম্মেলন, একেশ্বরবাদী সম্মেলন, সমাজ-সংস্কার সম্মেলন, জাত-পাত তোড়ক সম্মেলন, শিক্ষক ছাত্র-যুব সম্মেলন সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি। রামানন্দ ছিলেন ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘের সভাপতি, এবং পি. ই. এন-এর ভারতীয় শাখার সহ-সভাপতি। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষিশিল্প, স্বাস্থ্য

প্রদর্শনী, ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল প্রভৃতি বিবিধ সমাজ-উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানেও যোগ দিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি পৌরোহিত্য করেন। বঙ্গের অধিবাসী ও প্রবাসী বাঙালীর ভিতর প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয় প্রবাসীর মাধ্যমে, কাজেই, ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে (১৯২৩) কাশীধামে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ঐরূপ একটি সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। এই সম্মেলন সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি এই :

"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—প্রবাস শব্দটি প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্র রঘুবংশ অভিজ্ঞানশকুন্তল উত্তররামচরিত ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রবাসী শব্দটিও পুরাতন। সুতরাং যখন ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদ হইতে এই মাসিক পত্রটি বাহির করিবার সঙ্কল্প স্থির করি, তখন আমাকে প্রবাসী শব্দটি রচনা করিতে হয় নাই। কিন্তু এই মাসিক পত্রটির এই নাম দিবার পূর্ব্বে আমাকে অন্যান্য কয়েকটি নামের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইয়াছিল। শেষে যখন প্রবাসী নাম রাখাই স্থির করিলাম, তখনও যে উহার সমালোচনা শুনিতে হয় নাই, বা আমারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এমন নয়, যাহা হউক, এই কাগজখানার নাম প্রবাসী রাখা হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লোকমুখে ও ছাপার অক্ষরে প্রবাসী শব্দটির ব্যবহার যতবার হইয়াছে, আগে ততবার বোধ হয় ৩৫ বৎসরে কখনও হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে যে-সকল বাঙ্গালী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, যাঁহাদিগকে প্রবাসী বাঙ্গালী—বলা হয়, তাঁহাদের বিষয়ে এই কাগজখানাতে যত বেশী বার যত বেশী লেখা হইয়াছে, ইহার জন্মের পূর্ব্বে ও পরে বোধ হয় কোন বাংলা পত্রিকায় তত বার তত লেখা হয় নাই। ইহার প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় গোড়াতেই জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি ছিল ও ভিতরে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা ছিল। ঐ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রবাসী বাঙ্গালীর একখানি স্নেহপ্লুত পরিহাসাত্মক ছবিও ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক যে বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, এবং আশা করি, যাহার আরও একখণ্ড তাঁহার বাংলা অভিধানের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়া গেলে তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহারও উৎপত্তি "প্রবাসী" হইতে হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু সেই পদকটি পান, এবং তাঁহার প্রবন্ধটি "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হয়। অতএব প্রবাসী, প্রবাসী বাঙালী প্রভৃতি কথার আধুনিক প্রয়োগ ও প্রচলনের দায়িত্ব ও অপরাধ আমি অস্বীকার করিতে পারি না। নয়া দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

যে-কেহ সেই প্রবন্ধ শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহার জন্মের জন্য আংশিক দায়িত্বও আমার ছিল না, তাহার জন্য গৌরব ত নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নহে; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান নামটির জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব হয়ত এই একটু ছিল যে, ইহার নামকরণ যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল, তখন হয়ত নামদাতারা আমার কাগজখানার নামের দ্বারা ও তাহাতে বহুবার ব্যবহৃত প্রবাসী বাঙ্গালী শব্দ দুটি দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিপথচালিত হইয়াছিলেন। উপরে শুধু আমার দায়িত্বের কথা বলি নাই, অপরাধের কথাও বলিয়াছি। তাহা বলিবার কারণ, এই, যে, সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনেই দেখিলাম কেহ-না-কেহ উহার "প্রবাসী" নামটির সমালোচনা করিয়াছেন, এবং যদি নামটি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও কেহ-না-কেহ করিবেন। যে নাম সমালোচনার কারণীভূত, তাহার জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব খুব সামান্য থাকিলেও তাহা অপরাধ বিবেচিত হইতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে যেসব বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাদের কর্ম্মস্থানে ঘরবাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করেন; তাঁহাদের অনেকের বঙ্গে এখন ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত নাই বা না-থাকার মধ্যে। তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা যায় না—বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ও যাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের জন্ম হইয়াছে বঙ্গের বাহিরে। যাঁহারা অস্থায়ী ভাবে বঙ্গের বাহিরে থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঠিক প্রবাসী বলা চলে কি না তাহা নির্ণয় করিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান আমার নাই; তবে বাংলায় হয়ত চলে। ইহার উপর আরও একটি তর্ক আছে—"ভারতবর্ষ" আমাদের দেশ, ভারতবর্ষের যেখানেই থাকি তাহা প্রবাস নহে। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক তর্ক এবং সত্যও বটে। কিন্তু যেসব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে কোথাও স্থায়ীভাবে ২।৩।৪ পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও কি তত্রত্য পূর্ব্বতন ভিন্ন-ভাষাভাষী সেই সব বাসিন্দার সহিত মিশিয়া একসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন যাঁহারা পুরুষানুক্রমে আরও দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিতেছেন? ভারত ভক্তিজাত ভাবুকতা হইতে আমরা যাহাই বলি না কেন, অতি অল্প সংখ্যক বাঙালী-অবাঙালী বিবাহ হইলেও, বাঙালীর ঔদ্বাহিক ক্রিয়াকলাপ বাঙালীর সঙ্গেই করিতে হইতেছে, এবং আরও কত দীর্ঘকাল করিতে

হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। একটি সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতি, (culture) এবং চিন্তা ও ভাবের ধারা থাকিলেও ভারতের প্রত্যেক ভাষাভাষীর এক একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং ভাব ও চিন্তার ধারাও আছে। বাঙালীর সংস্কৃতি এবং ভাবচিন্তা-ধারা অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট এ দাবী করিতেছি না, কিন্তু তাহার নিকৃষ্টতাও স্বীকার করি না। যাঁহাকে বাঙালী সমাজে থাকিতে হইবে, তাঁহাকে বাঙালীর সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ভাবচিন্তা-ধারার সহিত পরিচিত হইতে ও তৎসমুদয়কে নিজের করিতে হইবে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন দ্বারা এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হয়।

আমাদের এই সম্মেলনের প্রবাসী নামের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা যাইতে পারে, স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় ইহার গোরখপুরের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সংক্ষেপে তাহা প্রায় সমস্তই বলিয়াছেন, কিন্তু প্রবাসী নামটারও যে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা তিনি মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি। "যদিচ আমরা বাংলা দেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সঙ্কোচ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি ক'রে বলবে? সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই প্রবাসী আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথা হয়, তিনিও "প্রবাসী" নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বহির্বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন বললে কি রকম হয়; তিনি বলেছিলেন বেশ ভাল কথা, "বহির্বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন" বলতে পার অথবা বঙ্গেতর সাহিত্য সম্মেলন বলতে পার। যদিও আমাদের ঐ সম্মেলনের একাধিক বার নাম পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবু আমি এ বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে এ কথা বলতেই হবে, "প্রবাসী" নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাস কথাটার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা দেশের বাইরে। প্রবাসী নামে যত কিছুই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলা দেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ কথাটি নূতন ক'রে যেন মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আমরা আপন দেশ বলে মনে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এ দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে 'মা' কিন্তু অন্য মা'দের চেয়ে একটু পৃথক, সে জননী, শুধু 'মা' নয়। বাঙ্গালা জননী, এ কথাটি মনে রাখা বড় দরকার।

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাদের তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, পাখীর গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্ট দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল ক'রে মনে হ'ল আমি ভুলিনি ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাইনি। দূরদেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান।

যদিও এদেশও আমাদের দেশ, এ দেশেই আমরা অনেক ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এদেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এ-দেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়ত এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব, তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট আমার ভাইবোনগুলি, আর সেই যে ভাটিয়ালী বাউল ও কীর্ত্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট বাঙ্গলা কথা ও বাঙ্গলা ভাষা, সেই যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ত ভুলতে পারি না।

তবে একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি তবু এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্ম্মভূমি, অন্নভূমি। এ দেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাঙালী আছেন যাঁদের এদেশই জন্মভূমি। এদেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাই-বোন; ভাই-বোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। অন্তরের ভালবাসা এদের দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এ-দেশের লোকদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—উদারচরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্—মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।"

অতুলপ্রসাদ ঠিকই বলিয়াছিলেন। নয়া দিল্লীর অধিবেশনে শ্রীমতী শৈলবালা দেবী মহিলা-বিভাগের অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রীরূপে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও যথার্থ। তিনি বলিয়াছিলেন:—"এখন

বাংলা দেশে ছিলাম, তখন জন্মভূমিকেই একমাত্র স্বদেশ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু প্রবাসে থাকিয়া আমাদের মনের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। যদিও অনেক কাল দেশছাড়া তবু স্নেহ মায়া যেন বাঙ্গালীর মুখে দেখিতে পাই, সেই সুমধুর বাণী যেন বাঙালীর মুখে শুনি। আজ মনে হয় পুণ্যভূমি ভারতের যেখানে বাস করি সেই আমার দেশ। ভারতবাসী মাত্রেই আমার স্বজাতীয়, আমাদের প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা সকলের উপরেই রাখিতে হইবে। তবুও বাংলার সহিত অন্তরের নিবিড় যোগ—সুমধুর মাতৃভাষা ও ভাবধারার ঐক্যের মধ্য দিয়া আগে আমরা বাঙ্গালী পরে ভারতবাসী। বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীর কত আপনার, বাঙ্গালী বিহীন দেশে গেলে তাহা বুঝা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কাশ্মীর গিয়াছিলাম। ডিঙ্গিতে অবিরত নানা জাতীয় লোক ভ্রমণে বাহির হইত, আমি বোটের জানলায় বসিয়া কিংবা বেড়াইতে বাহির হইয়া সর্ব্বদা বাঙ্গালী খুঁজিতাম। নানা দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদধারী লোক চলিয়া যাইত, বাঙ্গালী কদাচিৎ চোখে প'ড়িত। একদিন বেড়াইতে গিয়া দূর হইতে একখানি বোটে বাঙ্গালী মহিলা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে গেলাম। তাঁহারাও আমাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা ছিলেন মুঙ্গের প্রবাসী। এই মনের টানের প্রধান কারণ আমাদের চিন্তাধারা এক। এই যোগসূত্র যাহাতে ঘনিষ্ঠতর হয় ইহাই আমাদের এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা। এই জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গালী জাতির বিশেষ কল্যাণকর। বৎসর বৎসর গুণী জ্ঞানী চিন্তাশীল ও বিদ্বান লোকের মেলামেশা ও আলোচনা হয়, আমরা বিদুষী মহিলাগণের আগমনে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করি। এবং আগ্রহের সহিত আমরা এই মিলনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। আমরা জন্মভূমি হইতে যত দূরেই থাকি আমরা বাঙ্গালী। আমরা চাই আমাদের পুত্র কন্যারাও বাঙ্গালী হইবে, বাংলার প্রাণ হইতে, ভাবধারা হইতে, তাহারা যেন বিচ্যুত না হয়। এ বাংলা ভাষাকেই যেন তাহারা মাতৃভাষা বলিয়া মনে করে। যেন সুশিক্ষা দ্বারা তাহাদের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠে।

কলিকাতায় সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সর্ব্বাগ্রে স্মর্ত্তব্য।

তিনি বলেন:—"এমন একদিন ছিল, যখন বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাঙালী পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলা ভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। বাঙালী-চিত্তের যে বিশেষত্ব, মানব সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে; ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোন মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে, তা হ'লে স্রোতের আঘাত থেকে সেক্ষেত্রে রক্ষা পায়। বাংলা দেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলা দেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ঘটত তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্ম্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার প্রধানতম কারণ বাংলা সাহিত্য। বাংলা দেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে, তার ভাষা, তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙ্গালী উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙ্গালীচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙলার চৈতন্যকে ব্যাপক ভাবে, গভীর ভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালী যত দূরে যেখানেই থাক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ছেলে বিলাত গেলে ভাষায়, ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অবাঙালীত্বের আড়ম্বর করত এখন তা নেই বললেই চলে—কেননা বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল, তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রবাস শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সাতিশয় প্রণিধানযোগ্য।

"রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশী যে, অন্য প্রদেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা

সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা, সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্ত-প্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয়, অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ ও শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখীতা অন্য দিকে, অথচ সে সকল ভাষার মধ্যে হয়ত নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়। আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি—যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তর পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা বা সাহিত্য-রসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

"তাই বলছি আজ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করবে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানা দিক-গামী তটকে এক ক'রে নেয়, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে বলেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই বলেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না, এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।"

আমিও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। তাহার কোন কোন কথার পুনরাবৃত্তি করা এখানে একান্ত অনাবশ্যক হইবে না।

যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করা আবশ্যক। তাহারা যদি বৃহত্তর লোকসমষ্টির অঙ্গীভূত থাকে, যেমন বাঙালীরা বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত, তাহা হইলেও তাহাদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আবশ্যক। ইহার প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া অনুভূত হয়, যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এই লোকসমষ্টি কোন প্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত হয়। সেইরূপ অসুবিধা যে অধুনা বাঙালীদের ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির সাধারণ যে অসুবিধা আছে, বাঙালীদের তাহা ত আছেই। তদতিরিক্ত কতকগুলি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধা বাঙালীদের ঘটিয়াছে। এই জন্য বাঙালীদের ঐক্য খুব বেশী হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যের উদ্দেশ্য অন্য কাহারও অনিষ্টসাধন নহে—ইহা কেবলমাত্র আপনাদের কল্যাণ সাধন এবং অপর সকলেরও কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন জাতিই সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভূত অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মহাজাতির অন্যান্য অংশের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি হইতে কিছু শিখিবার, কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিবার আছে। আমরা বাঙালীরা বঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার কিছু শিখিতে ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারি; আবার যে সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মারফতেও শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পাইতে পারি। ভারতীয় মহাজাতির অন্য সব অংশকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহাও আমরা কিছু সাক্ষাৎভাবে, কিছু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের হাত দিয়া দিতে পারি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা যদি কেবলমাত্র নানা প্রদেশের বাঙালীদের আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব বৃদ্ধির সুযোগ হইত, তাহা হইলেও তাহা কম লাভ হইত না। কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য লাভও আছে। এই সম্মেলনে যে-সব অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তাহা এইরূপ অন্যান্য সভার অভিভাষণাদি অপেক্ষা উৎকর্ষহীন নহে। ইহাতে আলোচনাও যোগ্যতার সহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন নূতন স্থান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভের এবং চিন্তার উন্মেষের সুযোগও সম্মেলনে হয়।...

যাহা হউক, তাহা হইতে যদি ইহা বুঝিবার সুবিধা হয়, যে, বাঙালী যেখানেই থাকুন, সেখানেই বঙ্গের মানসিক পরিবেষ্টন কতকটা বিদ্যমান আছে, সেখানেই ছোট ছোট বঙ্গ বিরাজিত আছে, তাহা হইলে তাহাও কম লাভ নহে। জার্ম্মানীদের একটি কবিতা আছে, যাহা জার্ম্মানদের পিতৃভুমি কোথায়? তাহা কি প্রুশিয়া? তাহা কি সোয়াবেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ। উত্তর কতকটা এই মর্ম্মের যে, যেখানেই অধিবাসীদের মাতৃভাষা জার্ম্ম্যান, সেই স্থানই জার্ম্ম্যানী। আমরাও বলিতে পারি, যেখানেই কোন বাঙালী বাস করে ও বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহাই বাঙালীর পিতৃভুমিস্বরূপ ও বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই সব অধিবাসীর

মাতৃভাষা এক নহে; ভিন্ন ভিন্ন ছোট-বড় অংশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য তাহারাও যে যে প্রদেশে বাস করে তাহা আমাদের পিতৃভূমিস্বরূপ এবং বৃহত্তর গুজরাট, বৃহত্তর উড়িষ্যা, বৃহত্তর বিহার ইত্যাদির অংশ। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব অংশ সব ভারতীয়ের পিতৃভূমি।

দীর্ঘকাল হইতে যে-সব অঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গভাষাভাষী লোকদের বাস, এ রকম কয়েকটি ভূখণ্ড আসাম ও বিহারের সহিত জুড়িয়া দিয়া বাংলা প্রদেশকে ছোট করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেরই কতকগুলি লোকের কোন-না-কোন কারণে অন্যান্য প্রদেশে গিয়া বসবাসের প্রয়োজন হয়। বাংলা প্রদেশের কতকগুলি লোকের এই প্রয়োজন অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। কারণ, একদিকে আমাদের প্রদেশটিকে ছোট করা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার লোক-সংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী।...

এই জন্য—অনেক বাঙ্গালীর বঙ্গের বাহিরে যাওয়া ও থাকা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের বাঙালীরা ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা পরস্পরের কোন সাহায্য করিতে পারুন, বা না পারুন, উভয়ের হৃদয়ের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতির যোগ তাহার পরিচায়ক ও পরিবর্দ্ধক এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মত সম্মেলন—তাহার নাম যাহাই হউক—এই যোগরক্ষার ও বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়।

নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল তথাকার বাঙালী বালকদের বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় উঁচু খোলা প্রশস্ত জায়গায় নির্ম্মিত। বিদ্যালয়-গৃহ বৃহৎ। ইহাতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের থাকিবার জায়গা এবং অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কাজের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণ কর্ম্মসচিব মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। পৌষে দিল্লীতে খুব শীত। বিদ্যালয়টিতে খুব রোদ লাগিত বলিয়া প্রতিনিধিরা শীতে কষ্ট পান নাই। অন্যান্য ব্যবস্থাও ভাল হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহাদের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের হাতায় ঢুকিবার মুখে সাঁচী-স্তূপের তোরণের অনুকরণে একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছিল। তালকটোরা-উদ্যানে বৈকালিক সম্মিলন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয় গৃহেই মহিলাদের একটি স্বতন্ত্র প্রামোদ-মিলন হইয়াছিল। নৃত্য-গীতাদি ও "রক্ত করবী"র অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই।

অধিবেশনের সমুদয় বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে যথাসময়ে বাহির হইয়াছে। মূল সভাপতির, মহিলা বিভাগের নেত্রীর এবং সমুদয় বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীমান্ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাও দৈনিকে বাহির হইয়াছে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার ভার ছিল প্রবাসীর সম্পাদকের উপর। তাঁহার সামান্য বক্তব্যেরও কিছু দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী নীরব কর্ম্মী সহকারী সভাপতি ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন মহাশয় বিদায়কালে যে হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা কোন কাগজে দেখি নাই। বোধ হয় কেহ লিখিয়া লন নাই।

মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রীর, মূল অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতির এবং মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের বক্তৃতাগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সেগুলি সমস্তই দৈনিক কাগজে বাহির হওয়ায় বিস্তর লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কোন মাসিক কাগজে এতগুলি অভিভাষণ যথাসময়ে ছাপিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অভিভাষণগুলি শুধু দৈনিকে মুদ্রিত হওয়া যথেষ্ট নহে। তাহার প্রধান কারণ দুটি। দৈনিক কাগজ লোকে মুখ্যতঃ সংবাদের জন্য পড়ে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত দুরূহ বিষয়ের কোন আলোচনা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পঠিত হয় না; আবার, যেদিনকার কাগজে তাহা থাকে তাহার পরদিন আবার আর একখানা কাগজ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আগেকার দিনের কাগজটি পড়িবার অবসর হয় না।

সকল পাঠকের পক্ষে একথা না খাটিতে পারে, কিন্তু অনেকেরই পক্ষে একথা খাটে। দ্বিতীয় কারণ, দৈনিক কাগজ সাধারণতঃ কেহ বাঁধাইয়া রাখে না, বড় বড় অনেক লাইব্রেরীতেও পুরাতন দৈনিকের ফাইল পাওয়া যায় না। সুতরাং অভিভাষণগুলি কেবল দৈনিকে ছাপা হইলে সেগুলির প্রতি অবিচার হয় এবং যাঁহারা ধীরে অবসর মত মন দিয়া সেগুলি পড়িতে চান, তাঁহাদের সুবিধা হয় না। ভবিষ্যতে কেহ সেগুলি দেখিতে বা পড়িতে চাহিলে পান না। এই জন্য দৈনিকে প্রকাশ ছাড়া সেগুলি সম্মেলনের রিপোর্টের আলাদা একটি খণ্ডরূপে মুদ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সম্মেলনের সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উদ্যোক্তাদের হাতে প্রায়ই এত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না যাহাতে তাঁহারা বিস্তারিত রিপোর্ট ও অভিভাষণগুলি ছাপিতে পারেন। আমরা কলিকাতার অধিবেশনের সব অভিভাষণ, এমন কি ভাল অন্য প্রবন্ধগুলিও ছাপিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা করিতে পারি নাই। নয়া দিল্লীর অধিবেশনের অন্যতম

প্রক্রান্ত কর্ম্মী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের নিকট সংবাদ লইয়া অবগত হইয়াছি, তথাকার অভ্যর্থনা সমিতি অভিভাষণাদি মুদ্রিত করিতে পারিবেন। ইহা সুখের বিষয়।

সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের নেত্রী, মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের মধ্যে বাংলা দেশ হইতে দু-একজন লওয়া ভাল। তাহাতে বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে যোগ রক্ষিত হয় এবং ভাবধারা ও চিন্তাধারার আদান প্রদান হয়। কিন্তু অধিকাংশ সভাপতি বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্য হইতে যে লওয়া হয়, তাহাই ঠিক। আমি ত কয়েকবারের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি; দেখিয়াছি বঙ্গের বাহিরের যে সকল বাঙালী মূল বা বিভাগীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের বেশ পড়াশুনা ও চিন্তাশীলতা আছে। এ বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গের সমশ্রেণীস্থ শিক্ষিত লোকদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন, বরং কখন কখন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়াছি।

যেখানে যেবার সম্মেলনের অধিবেশন হয়, অধিকাংশ সভাপতি সেখান হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী-দের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু যাতায়াতে অনেক সময় লাগে, কষ্ট ও ক্লান্তি হয়, এবং ব্যয়বাহুল্যও আছে বলিয়া বোধহয় দূরের লোকদিগকে পাওয়া অনেক স্থলেই কঠিন হয়। ইহার কোন প্রতিকার হইতে পারে কি না, চিন্তিতব্য।

অতঃপর সম্মেলন যেখানে হইবে তথাকার উদ্যোক্তাদিগের এবং সম্মেলনের পরিচালক সমিতির নিকট আর একটি কথা নিবেদন করিতেছি। অনেকগুলি দেশী রাজ্যে বাঙালীর বাস আছে। কেহ কেহ আগে তথায় খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও হয়ত কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। দেশী রাজ্যের বাঙালীদের মধ্যে কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লোকও আছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে মূল বা বিভাগীয় সভাপতি পাইবার চেষ্টা প্রতি বৎসরই হওয়া উচিত, এবং দেশী রাজ্যসমূহ হইতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধি যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত হন, তাহারও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

ভবিষ্যৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগের নিকট আরও একটি নিবেদন আছে। সম্মেলনে সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ও সংগীত, সংস্কৃতির এই তিনটি বাহ্য রূপ বা অঙ্গের আলোচনা হইয়া থাকে। এই তিন দিকেই বঙ্গের বিশিষ্টতা আছে। সাহিত্যের আলোচনা ভালই হইয়া থাকে—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয় না। কুরুচি, অশ্লীলতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হয় বটে; কিন্তু তদ্দারা বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন প্রতিকূল সমালোচনা করা হয় না। কারণ, কুরুচি ও অশ্লীলতা কেবল যে কোন কোন বাঙালী লেখক-দেরই দোষ, এমন নয়। সুকুমার শিল্পের আলোচনাও উত্তম রূপে হয়, কোন কোন অধিবেশনে চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও থাকে। সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার, অন্ততঃ যথেষ্ট ন্যায্য বিচারের অভাব, আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি—যদিও কোনও অধিবেশনের উদ্যোক্তারা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন, এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি সংগীতজ্ঞ নহি। সংগীত ভালবাসি বটে। অন্য কোন সাধারণ আনাড়ী লোকের এ বিষয়ে মতের যে মূল্য, আমার মতের মূল্য তাহা অপেক্ষা বেশী না হওয়াই সম্ভবপর। তথাপি দু কথা আমাকে বলিতে হইতেছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতার বিষয়, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির, এবং নাটক এবং ছোট ও বড় গল্পের ও তাহার রচনার রীতির অনাদর আমরা বাঙালীরা করি না। কিন্তু বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প সব দিক দিয়া প্রাচীন কবিতা আদির ঠিক অনুসরণ করে না বলিয়া বাঙালীরা ও অন্যেরা বাংলা সাহিত্যকেও উপেক্ষা করেন না। কিন্তু সংগীতের বেলায় দেখিতে পাই, এমন বাঙালী ও অবাঙালী আছেন, যাঁহারা বঙ্গের নিজস্ব সংগীতকে হয় আমলই দিতে চান না, নয়ত খুব নিম্ন স্থান দিতে চান। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর করিয়াও বাংলা সাহিত্যের আদর করা যায়, তেমনি চিরাগত প্রাচীন হিন্দুস্থানী সংগীতের বিন্দুমাত্রও অনাদর না করিয়া বঙ্গের নিজস্ব সংগীতের আদর করা যাইতে পারে এবং করা উচিত। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে সমবেত শ্রোতৃবর্গ বঙ্গের উৎকৃষ্ট সংগীত শুনিতে পান। বালিকারা বা বালক-বালিকারা যে গীত-নৃত্যাদির দ্বারা অভ্যাগতদের চিত্ত বিনোদন করেন—এবারও করিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু তার চেয়ে অধিক নিপুণ লোকদের সংগীতেরও প্রয়োজন। বঙ্গের নিজস্ব সংগীত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক পাওয়া গেলে আরও ভাল। ওস্তাদ বা ওস্তাদ বলিয়া বিবেচিত লোকেরা যাহাই ভাবুন, আমরা সাধারণ লোকেরা এই জানি যে, বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ যত রকমের যত অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে নানা বিচিত্র সুর বসাইয়াছেন, ভারতে আর কেহ তাহা করেন নাই—পৃথিবীতে কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। অধিকন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে, তাঁহার শিক্ষা দস্তুরমতই হইয়াছিল, এবং তিনি তাহার গুণগ্রাহীও বটেন। ইহা সর্ব্বদা মনে

রাখিতে হইবে, যে, কাব্যে তিনি যেমন স্রষ্টা, সংগীতেও তিনি তেমনই স্রষ্টা; পূর্ব্বতন কাব্যের দ্বারা যেমন তাঁহার কাব্যের বিচার হয় না, পূর্ব্বতন সংগীতের দ্বারাও তেমনি তাঁহার সংগীতের বিচার হয় না। যে কোন লোক বা লোকসমষ্টি বঙ্গের সংস্কৃতির আদর করেন বলিয়া সত্য দাবী করিতে চান, তিনি বা তাঁহারা সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সমুচ্চ স্থান দিতে বাধ্য। আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। এখন শেষ কথা লিখি। সম্মেলনের কথা বঙ্গের ও বঙ্গের বাঙালীদিগের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা খুব আবশ্যক। গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর প্রচারকল্পে একখানি মাসিক বার্ত্তাবাহিনী পত্রিকা (bulletin) প্রকাশ করা হইবে। শীঘ্রই এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র প্রচার সাতিশয় বাঞ্ছনীয়। ইহা বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের গৃহে স্থান পাইলে সুফল ফলিবে।

(প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৭১৪)

ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এলাহাবাদে ১৩৩০ সালের পৌষ মাসে। রামানন্দ এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। "প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন" শীর্ষক সভাপতির অভিভাষণটি এখানে পঠিত হইয়াছিল। আমরা সেই অভিভাষণটি সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"...সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে, মানুষের হিতসাধন করিতে পারে, যাহা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীণ। ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প দর্শন প্রভৃতি সকল দিকে লক্ষ্য থাকিলে, যেরূপ সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানুষ সত্য চায়, জ্ঞান চায়, মানুষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানুষ আনন্দ শুচিতা শ্রীসৌন্দর্য্য চায়। কোন সভ্যতাতে ইহার কোনটির অভাব হইলে, তাহা অঙ্গহীন, অস্থায়ী, মানবের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হইবে। বাঙালীর সকল দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতীয় অন্য কোন জাতি বাঙালীর চেয়ে এ বিষয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন, মনে হয় না। ধর্ম্ম বিষয়ে দেখা যায়, বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা হইয়াছে; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে ভারতীয়তা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে; সত্যপীর পূজাদি দ্বারা মুসলমানধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মিলন চেষ্টা হইয়াছে; বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ও আহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে; বহু শতাব্দীর পরে নূতন করিয়া বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্ম্মিত হইয়াছে ও বৌদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব বঙ্গেই হইয়াছে; পরমহংস রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ বঙ্গেই হইয়াছে; নব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারচেষ্টাও বঙ্গে হইয়াছে। নানাদিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ও নারীর অধিকার স্থাপনের চেষ্টা বঙ্গেই আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে কার্য্যকালে বাঙালী পিছাইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে বাঙালীর কৃতিত্ব জগতের সভ্য জাতিদের তুলনায় সামান্য হইলেও, অন্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

নানা সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যদি চিত্রকলা ও সঙ্গীতের কিছুই না জানেন, যদি এই দুই ললিতকলার রস আস্বাদনেও সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাহা লজ্জার বিষয় বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়া জানার মত এগুলিও কাল্‌চারের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেননা, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা বিলাসীর ও অলসের আমোদের জিনিষ মাত্র নহে, মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহ্নও বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীত ভদ্র সমাজের সম্ভোগ্য থাকিলেও উহার চর্চ্চা ভদ্রমহিলারা করিতেন না, ভদ্র পুরুষদের মধ্যেও উহার বেশী প্রচলন ছিল না; অথচ বাক্‌দেবী সরস্বতী বীণাবাদিনী! বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা তো বাড়িয়াছেই, নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও গীতবাদ্যের চর্চ্চা দৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ভারতে বিচিত্র সুরের এবং নানা ভাব ও রসপূর্ণ এত গান রবীন্দ্রনাথের মত কেহই রচনা করেন নাই। তিনি সুরের রাজা। চিত্রকলা সম্বন্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিত্রকরেরা আর পটুয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হন না। সমাজে পেশাদার চিত্রকরদেরও সম্মানিত স্থান হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বহু শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ ও মহিলা নিজের আন্তরিক ভাব ও আদর্শ প্রকট করিবার জন্য কিম্বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, চিত্রকলার অনুশীলন করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রের ও মূর্ত্তির দুটি প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। 'রূপম' নামক উচ্চ অঙ্গের একটি ললিতকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রাদিকে চিত্র শোভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে,—যদিও অনেক জঘন্য চিত্রও মুদ্রিত হইতেছে। চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিখাইবার আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি উৎকৃষ্ট ভদ্র অভিনয় দ্বারা নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ রবীন্দ্র-

নাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা বহুবার হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কলাভবনে দেশী নানা শিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে।. এই সকল চেষ্টা যথেষ্ট নহে, কিন্তু আরম্ভ হিসাবে আশাপ্রদ।

লালা লাজপৎ রায় বাঙালী-পূজক নহেন; কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ছেলেদের প্রশস্ত কালচ্যার (culture) নাই; তাহারা কেবল পাশ করে, চিত্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না; বাঙালীর ছেলেরা এবং কতকটা মারাঠারা এ বিষয়ে ভাল।

বাঙালী সভ্যতার ও কালচ্যারের এই যে নানা দিকে গতি, ইহা শুভ লক্ষণ। আমি বাঙালীর স্তাবক নহি। "প্রবাসী"তে আমাদের নিজেদের দোষোদ্ঘাটন খুবই করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল দোষ দেখাইয়া একটা অবসাদ ও নৈরাশ্য উৎপাদন করা উচিত নয়। শুভলক্ষণগুলিও মনে রাখিয়া আশান্বিত ও উদ্যমশীল হওয়া আবশ্যক। আমরা প্রবাসী বাঙালীরাও যেন বঙ্গের সভ্যতা কালচ্যার ভাব চিন্তা ও আদর্শের ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিতে হইবে।

বাংলা দেশে যাতায়াত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। বঙ্গের সহিত ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান এবং কুটুম্বিতা স্থাপন ও রক্ষা সহজতর হইয়াছে। বাংলার বহি, বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, এখন আমরা সহজেই (এলাহাবাদে রবিবার ও ডাকঘরের অন্য ছুটির দিন ছাড়া) নিত্য পাইতে পারি। এইরূপ নানা উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগরক্ষা সহজ হইয়াছে। অবশ্য ছাপাখানার কৃপায়, অনেক আবর্জ্জনা ও অশুচি কুৎসিত জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের ঘরে ঘরে আসিতেছে। আটকাইবার উপায় সব সময়ে করা যায় না; কিন্তু মানসিক বাহ্য সন্মার্জ্জনীর ব্যবহার সকল সময়েই করা যায়, এবং করা উচিত।

বাঙালীত্ব রক্ষা প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। বাঙালীত্ব চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট আকৃতি অবয়ব-প্রাপ্ত অপরিবর্ত্তনীয় একটি কোন গুণ আদর্শ ছাঁচ ধাঁচ নহে। বাঙালী যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত গতিশীল জাতি নহে, তেমনি বাঙালীত্বও পূর্ণতাপ্রাপ্ত খুঁত অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ এবং গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে, বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি বিস্তার-সঙ্কোচ হইতে পারে। বাঙালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার হইবে, বাঙালীত্বও তেমনি জগতে বরেণ্য ও অনুসরণীয় হইবে। বাংলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব বাঙালীই এই প্রার্থনা করি।

বাঙালীকে উদার মহৎ শক্তিশালী উন্নত করিবার পক্ষে প্রবাসী বাঙালীদেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সুযোগও আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষা পদ্ধতিতেই দেশভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী নানা আশ্রমে বিদ্যাপীঠে ও পণ্ডিত সভায় যাইতেন। তীর্থদর্শন ত ছিলই। জার্ম্মেনীতে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিত সমাজে সুপরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ নিজের দেশ ছাড়া অন্য আরও স্থান না দেখিলে মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না, মানুষ কূপমণ্ডুক থাকিয়া যায়। কথিত আছে, একবার মানস সরোবরের এক রাজ-হংস বঙ্গের এক ডোবায় আসিয়া পড়ে। ডোবার পাতি-হাঁস মরালকে মানসসরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল শতদল প্রভৃতির বর্ণনা করে। ডোবার পাতিহাঁস তাহার রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, সেখানে শামুক গুগলি আছে? মরাল বলে, নাই। তাহাতে পাতিহাঁসের দল হি-হি করিয়া হাসিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যাহারা চিরকাল নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা ডোবাকে সমুদ্র এবং উইটিবিকে হিমালয় মনে করিতে পারে। দেশভ্রমণ এই কূপমণ্ডুকতা দূর করিতে পারে। আমরা প্রবাসী বাঙালীরা কার্য্যগতিকে বাংলা ছাড়া অন্য স্থানেরও অভিজ্ঞতা লাভ করি; বরং কেহ কেহ বাংলা দেশকেই কম জানি চিনি।

এই হেতু, প্রবাসী বাঙালীরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পকলা, প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বঙ্গের বাঙ্গালী অপেক্ষা সহজে অর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান চাই, অনুসন্ধিৎসা চাই; সর্ব্বোপরি চাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি। আমরা যদি মনে করি, আমাদের অজ্ঞাতসারে মনের কোণেও যদি এই বিশ্বাস লুকায়িত থাকে, যে, আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্ব্বগুণাধার, আমাদের কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিলেও আমাদের কোন উপকার হইবে না। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা যদি অনুসন্ধিৎসু বিনীত শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতি-মান হই, তাহা হইলে নানা দেশে-প্রদেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে উদারতর এবং অধিকতর জ্ঞানবান করিয়া বাঙালীত্বের প্রসার ও গভীরতা বর্দ্ধন করিতে পারিব।

এমন এক সময় ছিল, শুনিয়াছি, যখন প্রবাসী বাঙালীরা বঙ্গের বাঙালীদের পরিহাস উপহাস ও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। ইহা সত্য, যে, বহু পূর্ব্বে ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভে, যেসব বাঙালী যুবক শিক্ষার অল্পতা বা অন্য কোন প্রকার অবস্থা বৈগুণ্যবশতঃ বঙ্গে উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না, প্রধানতঃ তাঁহারাই বিদেশে যাইতেন। কিন্তু এই সব যুবক পণ্ডিত না হইলেও, একটা কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাঁহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরশীলতা, পৌরুষ ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না, যাহারা অজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে, তাহারা মানুষ হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান পাওয়া বা করিয়া লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিরে গিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে সব ইংরেজ বিদেশে গিয়া প্রথমে বাণিজ্য-ব্যবসা দ্বারা, সাম্রাজ্য স্থাপন দ্বারা, ইংলণ্ডের শক্তি ও সম্পদ বাড়াইয়াছে, তাহারাও অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ডি, এস, সি, পি, এইচ, ডি ছিল না। তাহাদের অনেকের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না; সে-বিষয়ে তাহারা প্রশংসনীয় বা অনুকরণ-যোগ্য নহে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুরুষকার নিশ্চয়ই ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য। বহু পূর্ব্বের প্রবাসী বাঙালীদিগের সহিত এই সকল ইউরোপীয়ের তুলনা আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টান্ত স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিলাম। এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দিবার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, যে, পাণ্ডিত্যের যেমন মূল্য আছে, তেমনি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুরুষকারের, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তিরও মূল্য আছে। এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিতে বহু পূর্ব্বের প্রবাসী বাঙালীরা হীন ছিলেন না।

সেদিন বহুদিন হইল গত হইয়াছে। বহু বৎসর হইতে বাঙালীদের মধ্যে বরেণ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেক গ্রন্থকার, বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক, অনেক ঐতিহাসিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক ব্যবসায়ী, অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক—জীবনের নানা বিভাগে কৃতী অনেক ব্যক্তি, বঙ্গে যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি আছেন। এখন আর আমরা কেবলমাত্র "মায়ে তাড়ান, বাপে খেদানো, ডানপিটে ছেলের" দল নহি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন যেমন বিদ্বান্ ও কৃতির সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের স্ব স্ব নিবাস-ভূমিতে লোকহিতসাধনের কেন্দ্র অধিকতর রূপে হইতে পারিতেছি কি না, তাহা ভাবা উচিত। কারণ, যদিও প্রথম যুগের বাঙালীরা অনেকে শিক্ষার ও পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাকা রোজগার করিবার জন্যই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা নানা স্থানে দেশ-হিতকর কার্য্যে অগ্রণীদের অন্যতম ছিলেন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন; লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ও সূচনা একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই বিশেষত্ব সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হওয়া প্রার্থনীয়।

আমাদের এই বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনটি উত্তর ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই, কিম্বা দক্ষিণ ভারত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে কখনও কোন প্রধান স্থান অধিকার করে নাই, এমন নয়; এরূপ অপ্রকৃত কথা বলিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক, যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই—প্রধানতঃ উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর—অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে অনেকটা গঠন করিয়াছে। উত্তর ভারতের এই পুরাকালীন ঐতিহাসিক প্রাধান্যের কারণ নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহা নহে। এই প্রাধান্যের উল্লেখ মাত্র করিয়া, আমি বলিতে চাই যে, আমরা উত্তর ভারতে থাকি বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার, উহা লিখিবার আমাদের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যাঁহারা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাঁহাদেরও তৎসম্পর্কীয় ভারতেতিহাস অনুশীলন ও রচনা করিবার সুযোগ আছে। সকল অঞ্চলেরই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কোন কোন প্রবাসী বাঙালী করিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্থান সকল দেখিয়া ইতিহাস লিখিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে। বহু পারসী ও দেশভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপকরণ, বহু চিত্র, মূর্ত্তি, মুদ্রা প্রভৃতি এখনও অনাবিষ্কৃত ও অনুদ্ধৃত রহিয়াছে। বাংলা দেশে দেশী রাজ্য মাত্র দুটি আছে; তাহাও ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের ঐতিহাসিক গৌরব কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে। তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাসপ্রথিত। তাহাদের গ্রন্থাগারে ও দপ্তরে এখনও বহু অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান আছে—যদিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, যে, বহু গ্রন্থ ও অন্য কাগজপত্র কীট ও কাল ধ্বংস করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহারও উদ্ধারসাধন করিতে হইবে। বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এ বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীর সুযোগ যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমনি অধিক। কেহ কেহ এই কর্ত্তব্য

সাধন করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, সুতরাং কর্ম্মীও আরও অনেক চাই।

উত্তর ভারতে দেশী রাজ্য থাকায় কেবল যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সুযোগই বেশী, তাহা নহে। এক-একটি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজ চালাইবার সুযোগও এখানে আছে। আমি প্রধানতঃ ক্ষমতা লাভ, অর্থ লাভ বা প্রভুত্ব করার দিক দিয়া একথা বলিতেছি না। কার্য্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কার্য্য দ্বারা দিবার সুযোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বলিতেছি। জয়পুরে, বরোদায়, কোচিনে, মৈসুরে, এবং আরও দুই-একটি রাজ্যে বাঙালী এই পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কেরাণী অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও খুব দরকারী কাজ করেন; সুতরাং সম্মান ও আদরের যোগ্য। বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষা-পরিচালক, গ্রন্থকার, ব্যবসায়ী, ধর্ম্মোপদেষ্টা, জনসেবক প্রভৃতি সকলেই আমাদের গৌরবস্থল। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে যে আরও রাষ্ট্র-পরিচালক থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কেবল বহির সাহায্যে রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রে শিখিয়া শিখাইতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকারে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত। ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

ইতিহাস ব্যতীত উত্তর ভারতে নৃতত্ত্ব (anthropology) জাতিতত্ত্ব (ethnology) সমাজ বিজ্ঞান (sociology), নানাবিধ শিল্প, নানাবিধ শ্রমিক ও বাণিজ্যিক সংঘ (trade guild's and craftsmen's guilds), প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। এদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়; কিন্তু আরো কর্ম্মী চাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নানা নিদর্শন, মুদ্রাআদি প্রত্নতত্ত্বের নানা উপাদান নানা স্থানে বিস্তর রহিয়াছে। তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু কিছু করিয়াছেন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

হিমালয় পর্ব্বত ও পার্ব্বত্য অঞ্চল বনস্পতি ওষধি ভেষজ প্রাণী শিলা—নানা ঐশ্বর্য্যের সম্ভারে মণ্ডিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সকল উপকরণ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে। বিদেশী লোকেরা ক্রমশঃ তাহা করিতেছে। হিমালয় পার্ব্বত্য অঞ্চলের জলের শক্তি (water power) আমরা কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে আমরা কি ফলের উদ্যান রচনা করিয়া লাভবান হইতে পারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশলাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক স্থান হইতে পাথরিয়া কয়লার খনি সকল বহু দূরে অবস্থিত, অথচ ঐ সকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্ব্বত্য-দেশের নিকটবর্ত্তী। ঐ সকল স্থানে কাঠ হইতে নানা লভনীয় নানা রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশনের এবং কাঠের কয়লা উৎপাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার (wood distillation)-এর কারখানা আমরা কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি না? বাঙালীর মস্তিষ্ক নিকৃষ্ট নহে, নানা পণ্যশিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে; খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ কারবার চালাইবার মত টাকা, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, এবং সততা কি আমাদের নাই? সাহিত্য সম্মিলনের কাজের সহিত এসব কথার কোন সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যতদিকে যত বাড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই জন্য নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন কাজে বাঙালীদের প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত যোগরক্ষা যে আমরা সহজেই করিতে পারি, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা শুধু কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী তাহা করিয়াছেন। বাংলা বই লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরেজীতে বই লিখিয়াছেন, তাঁহারাও বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। বাঙালীর লিখিত যে কোন ভাষার বহিকে আমি বাঙালীর সাহিত্য বলিতেছি। তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে ও হইবে—বাংলা গ্রন্থকারেরা ঐ সকল ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন ও লইবেন।

যে সকল প্রবাসী বাঙালীর স্বতন্ত্রভাবে বহি লিখিবার ক্ষমতা বা সুযোগ নাই, তাঁহাদের অনেকে অনুবাদ দ্বারা বঙ্গের সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী সাহিত্য বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও মূল্যবান। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে,

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই কোন-না-কোন বহির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যে-সব ভারতীয় বা অন্য-দেশীয় আদিম জাতির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, গাথা, উপকথা, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদ বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত অহঙ্কার বা আলস্য কিংবা উভয়ই আছে। আমরা হয়ত ভাবি, যে, যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক অন্য ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা কোন কোন দিকে উৎকৃষ্ট, অতএব অন্য প্রদেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও আমাদের কিছুই লইবার নাই। কিন্তু বহু ঐশ্বর্য্যশালী ইংরেজী সাহিত্যের জন্য যদি হিন্দী গুজরাতী মারাঠী উর্দু পঞ্জাবী তেলুগু তামিল হইতে অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সব দেশী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহা বাছিয়া অনুবাদ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক কবীর দাদূ তুলসীদাস রবিদাস গরীবদাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক মধ্যযুগের সাধুসন্তের বাণী বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। উত্তর ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্‌হাখণ্ডের মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্গ, প্রভৃতি যে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা উত্তর ভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল উল্লেখ করিলেই চলিবে।

কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাহা নহে। মানবজীবনের যত প্রকার কাজে মানুষের যত প্রকার চেষ্টা উদ্যম অধ্যবসায় ধৈর্য্য সাহস সহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সকলের দ্বারাই জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, স্ফূর্ত্তি, আনন্দ বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগের বণিকরা, নাবিকরা, যোদ্ধারা, ভৌগোলিক আবিষ্কর্ত্তারা, সকলে সাহিত্যিক অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে সেই যুগের ইংরেজ-জীবনের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য উদ্যম সাহস ও শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেহ কি? তখনকার ইংরেজ লেখকরা ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা-হুতাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাব্য লিখিয়া যান নাই। একা শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতেই কি আশ্চর্য্য চরিত্র-ও ঘটনা-বৈচিত্র্য! ইংরেজ জাতি তখন নানা কাজ, নানা চিন্তা, নানা উদ্যম, নানা আবিষ্কার করিয়াছিল, নানা আদর্শের কথা ভাবিয়াছিল, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্য তখনকার ইংরেজী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। ভিক্টোরিয়ার যুগের সাহিত্যও এবম্বিধ কারণে সমৃদ্ধ।

জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাতি বড় হইলে সাহিত্যও বড় হয়। আবার ভগবৎ কৃপায় প্রতিভাশালী লেখক কোন জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন।

নানা দেশে নানা সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদি তাহাদের উদ্যমশীলতা বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান হয়। ইহার একটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের এক কোটি আটষট্টি লক্ষ লোক গুজরাতী ভাষায় কথা বলে; কোন-না-কোন রকমের হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর লোক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ। শুধু কি তাই; আধুনিক গুজরাতীতে এমন কোন কোন রকমের বহি আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংলা ভাষায় কথা বলে চারি কোটি তিরাশী লক্ষ লোক—গুজরাতীর চারিগুণেরও বেশী। গুজরাতীদের এই সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটি কারণ, এই যে, গুজরাতীভাষী, পারসী, ভাটিয়া বোরা প্রভৃতি বণিক ও অন্যবিধ লোকেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও বিষয়কর্ম্ম করে। এই বিশেষত্বটির উল্লেখ করিয়া গুজরাতী সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয় "The Wandering Gujarati." "ভ্রমণশীল গুজরাতী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাঙালীরাও যত দেশে যত রকম কাজে যাইবে, তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীরা এই প্রকারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

ধর্ম্মভাব ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি মূল উৎস। বাংলা সাহিত্যের একটি মূল উৎস বাংলার নানা ধর্ম্মপ্রচেষ্টা। মনসা পূজা ও শিব পূজার দ্বন্দ্ব হইতে বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি। কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামপ্রসাদের পদাবলী, কালী কীর্ত্তন প্রভৃতি শাক্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সংখ্যা করাই কঠিন। তাহার পর আধুনিক সময়ে খৃষ্টীয় মিশনারী কেরী, প্রভৃতির দ্বারা, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা নব বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য অল্প বা

অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত, গঠিত, সৃষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে। রামমোহন যে আধুনিক লিখিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তক, তাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অক্ষয়-কুমার দত্ত যে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রবে বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধর্ম্মো-পদেষ্টাদের মধ্যেই সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে বাংলা সাহিত্যেও তাঁহাদের সম্মানিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বঙ্কিম-চন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়া সুবিখ্যাত, কিন্তু তিনি শেষ জীবনে নব হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ইচ্ছায় উপন্যাসাদি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উৎস, এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার চেষ্টার মূলে যে গভীর ধর্ম্মভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার মধ্যে ও মূলে ধর্ম্মভাব ও লোকহিত চেষ্টা রহিয়াছে।

এসব কথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। প্রবাসী বাঙালী আমাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম্মভাব মনকে উদ্বুদ্ধ আলোড়িত আলোকিত করিলে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব হয়। অতএব ধর্ম্মভাব দ্বারা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে ধর্ম্মসাহিত্য বলে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। সাধারণতঃ প্রশস্ততর অর্থে যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার কথাই বলিতেছি।

আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোকদের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হইবে, ইহা ত সোজা সাংসারিক অর্থেও সহজবোধ্য। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্ব্বদা কথিত হয়। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংলা সাহিত্য প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা একান্ত আবশ্যক, যে, আমরা প্রবাসের স্থান সকলের আদি অধিবাসীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখি। নতুবা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন এংলো ইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নাই, তেমনি প্রবাসী বাঙালীরাও শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না।...

ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজ সম্বন্ধেই গল্প, উপন্যাস, কাব্য বা অন্যবিধ বই লেখেন না; অন্য জাতিদের সম্বন্ধেও লেখেন। যে যে স্থলে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নাই, সে সব স্থলে তাঁহাদের বইগুলো ভাল হয় না। আমরা যদি কেবল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ লইয়াই গল্প উপন্যাস কাব্য বা অন্যবিধ বহি লিখি, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহাতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য না বাড়িতে পারে। আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান থাকায় এমনিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা একঘেয়ে। যদি প্রবাসী বাঙালীরা প্রবাসী বাঙালী জীবন লইয়াই লেখেন, তাহা হইলে ত বিষয় আরও সঙ্কীর্ণ হইবে এবং লেখা একঘেয়ে হইতেও পারে। নব নব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, নূতনতর সামাজিক সমস্যার কথা, সাহিত্যে আনিতে হইলে বাঙালী-সমাজের বাহিরে যাইতে হয়। তাহার সুযোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে। অতীত কালের হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির, মধ্য-যুগের মুসলমান, মরাঠা, শিখ কীর্ত্তির স্থানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন। এই সকল স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বই তাঁহারা লিখিলে ভাল হয়। যিনি সারনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধগয়া দেখেন নাই, রাজগৃহ দেখেন নাই তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু লিখিলে, তাহা খুব ভাল না হইতে পারে। তাজ না দেখিয়া শাহাজাহানের জীবন-সংশ্লিষ্ট কিছু লিখিলে তাহা শ্রেষ্ঠ রচনা না হইবার সম্ভাবনা।

আমরা যদি আধুনিক হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি সমাজ-সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা হইলে শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতিমান্ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে হইবে। দোষ দেখিব না দেখাইব না, তাহা নহে। কিন্তু কেবল নাক সিঁটকাইয়া ও মুখ ভ্যাংচাইয়া কখন কোন বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। যে উত্তর ভারতে ব্যাস, বাল্মীকি, জনক, বুদ্ধ, অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে উত্তর কালে নানক, কবীর, তুলসীদাস, গুরুগোবিন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথায় এখন শ্রদ্ধা করিবার, ভালবাসিবার, আনন্দ পাইবার কিছু নাই, ইহা হইতে পারে না। নিশ্চয়ই এই সব দেশে এখনও শ্রদ্ধা করিবার ও ভালবাসিবার জিনিষ আছে। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ জনগণের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলী বিদ্যমান আছে। কেবল এখানকার বাহ্য প্রকৃতিতে, কেবল এখানকার অতীত-সাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও বিদ্যমান মানবের কীর্ত্তি-সমূহে নহে, পরন্তু বর্ত্তমানে জীবিত মানবমণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার লীলা প্রকট হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য সুন্দর শিবরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা যত আমাদের অবাঙালী প্রতিবেশীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া, আপনার

জন মনে করিয়া প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাঙ্গলা সাহিত্য সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে তত সমৃদ্ধ হইবে।

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত বড় হইবার সম্ভাবনা। যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, তাহার সমৃদ্ধি বাড়িবার তত সম্ভাবনা। এখন বাংলা প্রায় পাচ কোটি লোকে বলে। ইহারা বাঙালী। কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংলা বলিতে ও পড়িতে পারেন। অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। সমগ্র আসামে ও ওড়িষাতে বাংলার প্রচলন হইবার সম্ভাবনা খুবই ছিল; রাজনৈতিক কারণে তাহা হইতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষাজ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার ও ব্যাপ্তি দ্বারা অনেকটা কাজ হইতেছে। সমগ্র বিহারেও বাংলা সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত। না হওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে; কিন্তু ইহার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের অভাবও যে কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দী না হইয়া বাংলা কেন বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত, তাহার কারণ বলিতেছি। ১৯০১-এর সেন্সস রিপোর্টের প্রথম ভল্যুমের ৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে:

> "The face of the Bihari is ever turned towards the north-west; from Bengal he has only experienced hostile invasions. For these reasons. the language of Bihar has often been considered to be a form of the "Hindi" said to be spoken in the United Provinces, *but really nothing can be farther from the fact. In spite of the hostile feeling with which Biharis regard everything connected with Bengal, their language is* a sister of Bengali, and only a distant cousin of the tongue spoken to its west. Like Bengali and Oriya, it is a direct descendant of the old Magadha Apabhramsa."

তা ছাড়া ইহা সকলেই জানেন যে, মৈথিলী অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মূলে ঠিক এক। বিদ্যাপতিকে মিথিলার লোকেরা ও আমরা উভয়েই নিজেদের কবি মনে করি। অতএব, হয়, বিহারী ভাষাই বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকের সাময়িক পত্রে খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক ছিল; নতুবা বাংলারই ঐ স্থান পাওনা ছিল। কিন্তু হিন্দী ঐ স্থান পাইয়াছে। ইহার-জন্য রাজনৈতিক কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দায়ী। যাহা হউক বঙ্গীয় শিক্ষাজ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার ও ব্যাপ্তি-প্রযুক্ত, এখনও বাংলা সাহিত্য পাঁচ কোটি অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের দ্বারা অধীত হইতে পারে। তাহাতে উহার শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। আমরা বাংলা সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া, যত গভীরতা, উদারতা, গাম্ভীর্য্য, শক্তি, আনন্দ উহাতে নিহিত করিতে পারিব, উহা তত বড় সাহিত্য হইবে। তা ছাড়া, আমরা নিজ নিজ জীবন ও কার্য্যের দ্বারা যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিব, আমাদের সাহিত্যও তত বেশী লোকের আদরের জিনিষ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি অপরকে না দিলে অপরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। অতএব আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল চাই, প্রসার চাই, প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও প্রভাবের বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে—

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘু চেতসাম্।
উদার চরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

"লঘুচেতা লোকেরা মনে করে অমুক আমার আপনার জন, অমুক আমার পর, কিন্তু উদার-চরিত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় মনে করেন।"

(প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩০, পৃঃ ৫৮৮)

প্রথম দিকে এই সম্মেলনের নাম ছিল "উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন।" পরে ইহার নাম "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন" হয়। এ নামের সহিত আজকের বাঙালী-মাত্রেই পরিচিত। কিন্তু ইহার সহিত রামানন্দের কতটা যোগ ছিল তা আজ হয়ত অনেকেই জানেন না। তাঁহার এই সুকৃতির জন্য সম্মেলনের রাঁচী অধিবেশনে (১৩৪৩, পৌষ) রামানন্দ বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত হন। অভিনন্দন-পত্রে বলা হয়:

"আজ যে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন প্রেমমন্ত্রে স্বীয় ভাষা জননীর সংস্কৃতির ভিত্তিতে বৃহত্তর বাঙ্গলা গঠন প্রয়াসে বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহারও উদ্বোধন গীতি আপনারই 'প্রবাসী' সাধনার মধ্য দিয়া প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। আপনার ঋণ মাতৃঋণের ন্যায়ই অপরিশোধ্য।" (রামানন্দ, পৃঃ ২৩৪)

এখানে বলা আবশ্যক, প্রবাসীর কাজ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকায় সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব হইতে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর রামানন্দের পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক দিক দেখিবার ভার লইলেন। চারুচন্দ্র ১৯২৪ সনে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অন্যতম অধ্যাপক হইয়া ঢাকায় চলিয়া যান। অতঃপর প্রধান সহকারী সম্পাদক হইয়া আসেন অশ্বিনীকুমার ঘোষ। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত চারুবাবুর সময় হইতেই ছিলেন, পরে আরও কেহ কেহ আসিয়া যোগ দিলেন। যেমন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৯২৮), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৯)।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ঐকান্তিক সাধনায় রামানন্দ 'প্রবাসী'র একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' হইতে "সভ্যতার সঙ্কট" পর্য্যন্ত বিস্তর রচনা এই যুগেও প্রবাসীতে স্থান পায়। তাছাড়া, এমন একদল নবীন সাহিত্যিকের প্রবাসীতে স্থান হইল যাঁহারা পরে প্রথিতযশা হইয়াছেন এবং যাঁহাদের কেহ কেহ আজ সাহিত্যিক সমাজের শীর্ষস্থানে। তিনটি সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী "হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর", "পারস্যভ্রমণ, "নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এই সময়ে। প্রথমটির লেখক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইহার যাবতীয় ছবিই শিল্পীর নিজের অঙ্কিত। দ্বিতীয়টির লেখক রবীন্দ্র-সঙ্গী শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয়টির কাহিনী পরলোকগত পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন লিখিত এবং শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

এই দশকের প্রথমদিকে দুইটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার প্রত্যেকটির সঙ্গে রামানন্দের যোগ ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি-বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন হয় (১৭ই পৌষ, ১৩৩৮)। এই উৎসবকে একটি স্থায়ী রূপ দিবার জন্য 'Golden Book of Tagore' নামে গ্রন্থ রচনা করা হয়। ইহার জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি স্থাপিত হইল। কমিটি এইরূপ একখানি স্মারকগ্রন্থের সম্পাদনাভার রামানন্দের উপর পুরাপুরি অর্পণ করেন। ভারতবর্ষের ও বিশ্বের আড়াই শতাধিক মনীষীর রচনা-সম্ভারে এই গ্রন্থখানি পূর্ণ।

ইহার দুই বৎসর পরে রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকী উৎসব আয়োজিত হইল। রামানন্দ রামমোহনকে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা বলিয়া পুস্তকে ও ভাষণে বিবিধ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। এই উৎসবে রামানন্দও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রামমোহন ছিলেন রামানন্দের আদর্শ। রামমোহনের বিরুদ্ধে অনেক তথ্যাদিপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও রামানন্দ লিখিয়াছেন, আলোচনা পর্য্যালোচনা করিবার পরও রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার মত ও দৃষ্টিভঙ্গি এতটুকুও বদলায় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে রামানন্দর কতখানি শ্রদ্ধা ছিল ইহা হইতেই বুঝা যায়। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন:

রামমোহন রায়

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার একষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালীদের, ভারতীয়গণের এবং সমগ্র মানবজাতির যে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, অর্থব্যয়, এবং স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ তাঁহার নিজের প্রতিভা ও চিন্তা হইতে প্রসূত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও জীবিত ছিলেন, তখন সেই আদর্শ অনন্যসাধারণ ছিল, এবং তখনকার পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। এখনও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুসরণ করিবার লোক বিরল; তাঁহার মত ভগবদ্ভক্তি, মানবপ্রীতি, সত্যপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সেই আদর্শের অনুসরণে সমর্থ একজন মানুষও এখন ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন ভারতীয় মহাপুরুষ তাঁহার মত আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করেন নাই বা তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কল্যাণের আদর্শের কোন কোন অংশের সাধনায় তাঁহা অপেক্ষা শক্তিমান ও কৃতী ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কল্যাণের আদর্শ অখণ্ড। দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, কোন একদিকে করিতে চাহিলে অন্য সকল দিকেও করা আবশ্যক। ধর্ম্মে সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায় ও জ্ঞানে, সাহিত্যের সকল বিভাগে, ললিতকলায় ও পণ্যশিল্পে, কৃষিবাণিজ্যে ও আর্থিক সকল বিষয়ে এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ভারতবর্ষের উন্নতি আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের কোন দিকে উন্নতি, অন্য কোন-না-কোন এক বা একাধিক বিষয়ে উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই যে মানব জীবনের নানা বিভাগের উন্নতি ও প্রগতি পরস্পরসাপেক্ষতা, তাহার অনুভূতি ও উপলব্ধি রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও কৃতিত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সকল চেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, মানবে প্রীতি ও মানবের মঙ্গলসাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও তাঁহার সেবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

তিনি যে সাতিশয় প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও লোকনিন্দা ও উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া, নানা দুঃখ বরণ করিয়া,

প্রাণহানিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাও এই বিশ্বাসে যে, তাঁহার জীবিতকালে হউক বা না-হউক, ন্যায় ও সত্যের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গলসাধন চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে। এইজন্য বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গলবিধাতা এক পরব্রহ্মে তাঁহার বিশ্বাসকে বাদ দিয়া তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাহিত্যিক এবং অন্যবিধ কার্য্যাবলীর আলোচনা ও প্রশংসা করিলে বৃক্ষের মূলটি বিস্মৃত হইয়া পত্রপুষ্পফলের বর্ণনা ও প্রশংসার মত শুনায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি ভারতীয় মহাজাতিকে, মানবজাতিকে, যে-অবস্থায় আরূঢ় দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এখনও সে অবস্থায় আমরা উপনীত হই নাই। ইহা যদি সত্য হইত, যে, আমরা সকল বিষয়ে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে দুঃখের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। সমগ্র ভারতে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা, একমেবাদ্বিতীয়মের আধ্যাত্মিক উপাসনা এবং তজ্জনিত চারিত্রিক উৎকর্ষ ও দৃঢ়তা ও জাতীয় ঐক্য ও একাগ্রতা তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা তাঁহার সময় অপেক্ষা এখন কিছু অধিক সংখ্যক লোক করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই সামান্য উন্নতির প্রগতিকে সন্তোষজনক বলা যায় না। তদ্ভিন্ন যাঁহারা এরূপ উপাসনার সমর্থক, তাঁহাদের উপাসনা কি পরিমাণে মৌখিক ও মতগত এবং কি পরিমাণেই বা জীবনগত, তাহার বিচার করিতে গেলে অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না। তাহার উপর আবার ধর্ম্ম মাত্রেরই, ধর্ম্ম জিনিষটিরই প্রতি অনাস্থা ও ঔদাসীন্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা ও নাস্তিক্য ঘোষিত হওয়ায় ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ ইহা ধ্রুব সত্য যে ধর্ম্ম অত্যাবশ্যক ও একান্ত আবশ্যক।

সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালেই তাহা আইনের দ্বারা রহিত হয়। কিন্তু এখনও মধ্যে মধ্যে সহমরণ বা তাহার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে কাগজে পত্রে এবং মুখে মুখে যে সব আলোচনা হয়, তাহাতে এই ধারণাই জন্মে যে, সতীদাহ নিবারক আইন না থাকিলে এখনও হয়ত সমাজের বৃহৎ এক অংশ স্বেচ্ছায় সহমরণকে উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিত ও তাহার সমর্থন করিত, যদিও বলপূর্ব্বক বা কৌশলপূর্ব্বক বিধবাদাহের অনুষ্ঠান করিত কি না বলা যায় না। বস্তুতঃ উহা যে উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে, শাস্ত্রীয় আদর্শও নহে, সতীত্বের উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে, এই বিশ্বাস এখনও আমাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই। উহা আদর্শ হইলেও পুরুষেরা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ আদর্শের অনুসরণ না করায়, এবং অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না, যে, পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক ঐ প্রথার প্রশংসা পুরুষ স্বভাবের একটা মন্দ অংশ হইতে এবং নিষ্কারুণ্য হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমানে হিন্দু আইন বলিয়া গণিত বিধি অপেক্ষা অধিক ন্যায্য হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার-বিষয়ক বিধান প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। রামমোহন তাহা প্রদর্শন করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সময়ের অনুদার ও অন্যায্য বিধিই বলবৎ আছে।

সতীদাহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান অনুমিত ঐ জনমত হইতে এবং দেশে নারীদের নানা নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হইতে মনে হয়, যে, যে-রামমোহন সতীদাহ নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যিনি যে কোন জাতির বয়সের ও অবস্থার দণ্ডায়মানা নারীর সমক্ষে আসন গ্রহণ করিতেন না, নারী জাতির প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ ও সানুকম্প ভাবের দিকে অগ্রসর হইবার এখনও অবসর আছে। সহমরণ-বিষয়ক তাঁহার একটি পুস্তিকায় তিনি নারীদের উচ্চতম জ্ঞানলাভের অধিকার ও যোগ্যতা, তাঁহাদের সাহস, ধৈর্য্য, সংযম এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রমাণিত করিয়াছেন। এরূপ মত কি এখনও দেশে ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইয়াছে?

জ্ঞানের, সভ্যতার ও স্বাধীনতার যে উচ্চ শিখরে তিনি ভারতবর্ষকে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, দেশ এখনও সেখানে পৌঁছে নাই। অতএব সেই সব দিকেও অগ্রসর হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষ এশিয়াকে জ্ঞানোজ্জ্বল করিবে, তিনি এই আশা পোষণ করিতেন। সেই আশা পূর্ণ হইতেছে কি? এখনও ভারতে শতকরা ৯২ জন নিরক্ষর, এবং জাপানে শিশুরা ছাড়া সবাই লিখন-পঠনক্ষম।

শাস্ত্র জ্ঞানের বিস্তার বিশেষ কি হইয়াছে? পুরাণ-উপপুরাণের প্রচার অনেক হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপনিষদ প্রচার তিনি আধুনিক যুগে আরম্ভ করেন, তাহার চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে কি?

রামমোহন সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এখন সাতিশয় সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত। তিনি স্বদেশবাসীকে উচ্চ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন। কিন্তু বাদশাহী ও নবাবী আমলেও দেশের লোকেরা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে-সব উচ্চ কাজ করিতে পাইত ও পারিত, তাহারা এখনও তাহার অনেকগুলি হইতে বঞ্চিত।

রামমোহন জমিদার ও রায়ত উভয়েরই দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ষ্ট্যাটিষ্টিক্স দ্বারা

নিজের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহা অনুসৃত হয় নাই। কৃষকদিগকে অস্ত্র দিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া "মিলিশিয়া"ভুক্ত করিয়া তিনি দেশরক্ষায় সমর্থ করিতে এবং সেই উপায়ে পরোক্ষভাবে পেশাদার স্থায়ী সৈনিকদের সংখ্যা হ্রাস ও সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অনুসৃত ব্রিটিশ রাজনীতি এখনও এই অতিসমীচীন প্রস্তাবের অনুকূল নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। কৌশলী ইংলণ্ড অধীন ভারতবর্ষের নিকট হইতে কর বলিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করে না। কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ভারতবর্ষের রাজস্বের অনেক কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে নীত হয়। এই তথ্যটি রামমোহন প্রথম হিসাব করিয়া দেখান ভারতবর্ষের রাজস্বের বহু কোটি টাকা এখনও প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়।

রামমোহন যে-সব কারণে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়নী বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, যন্ত্রনির্ম্মাণ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ভারতীয়গণকে শিখান তন্মধ্যে প্রধান একটি কারণ। এই সব বিদ্যার জ্ঞান এখনও এ-দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ আছে।

পাশ্চাত্য নানা বিদ্যা শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয়গণকে এরূপ ভাবে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা ঐহিক বিষয়ে ঔদাসীন্য না জন্মাইয়া পারত্রিক কল্যাণের সঙ্গে ঐহিক কল্যাণেরও সহায় হয়। বেদান্তের চর্চ্চা এখনও এরূপ ভাবে ভারতবর্ষে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত মত গ্রহণ সম্বন্ধে আপনাকে রামমোহনের পথের পথিক বলিয়াছেন এবং বেদান্তকে ঐহিক উদ্যমশীলতার পরিপোষক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাই বা কার্য্যতঃ কত লোক গ্রহণ করিয়াছে?

রামমোহন যে ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বা পুনঃ-প্রবর্ত্তক, যে ধর্ম্মসমাজ তিনি স্থাপন করেন, সংস্কৃত "ব্রহ্মন্" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন তাহার "ব্রাহ্ম" নাম হইতে, তাঁহার রচিত সঙ্গীত-সঞ্চয় হইতে, তাঁহার ইংরেজী বাংলা ও হিন্দী অনুবাদসহ বেদান্তসার ও কয়েকটি উপনিষদ প্রকাশ হইতে, খ্রীষ্টীয় প্রচারীদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কে, হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন হইতে, "ব্রাহ্মণ সেবধি" ও "ব্রাহ্মিনিক্যাল ম্যাগাজিন" নাম দুইটি হইতে, বহু হিন্দু প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে ভূরি ভূরি হিন্দুশাস্ত্র বচন উদ্ধার হইতে এবং আরও নানা প্রমাণ হইতে সহজেই বুঝা যায়, যে, তিনি হিন্দুত্ব হইতে একটুও চ্যুত হন নাই। অথচ—অথবা তিনি প্রকৃত হিন্দু এবং আদর্শ ভারতীয় ছিলেন বলিয়াই—তিনি মুসলমানের কোরাণের এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানের বাইবেলের সাত্ত্বিক বাণীগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র শ্রদ্ধার সহিত মূল ভাষার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরমত-অসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম্মদ্বেষ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ও অন্য সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় যে নানা সাম্প্রদায়িক, কলহ, বিবাদ, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ ও রক্তপাত, তাহা তাঁহার মত আচরণ ও আদর্শের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান বা হিন্দু কোন সম্প্রদায়ই এ-বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক যথেষ্ট অনুসরণ করেন নাই। রামমোহনের মত উদার জ্ঞানী, সত্যদর্শী, সমদর্শী নিরপেক্ষ দেশনায়কের প্রয়োজন এখন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে—অন্ততঃ হওয়া উচিত।

রামমোহন বাঙালী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও ও পরোক্ষভাবে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল ব্রাহ্ম সমাজের বা কেবল বাঙালীর সম্পত্তি ও শিরোমণি নহেন। তাহার হিতচিন্তা ব্রাহ্ম সমাজে বা বাঙালী সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ভারতীয়, তিনি এশিয়ার মানুষ, তিনি মহামানব, তিনি বিশ্বমানবের আত্মীয়। তাঁহার "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাব শ্লোকে কথায় কথায় আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সময়ে যে-ইটালীতে যাইতে ছয় মাস লাগিত, তাঁহার নেপলস্বাসীদের স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ায় তিনি বিষাদমগ্ন হইয়াছিলেন, চীন, পারস্য, আফগানিস্থানের রাজনীতির আলোচনা নিজের সংবাদপত্রে করিতেন, ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের জয়গান সোৎসাহে করিতেন, আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি চাঁদা তুলিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে যে দক্ষিণ আমেরিকা যাইতে তখন এক বৎসর লাগিত, তাহার স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী লাভ করিবার সংবাদ কলিকাতায় পৌছিলে তিনি টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন, ইংলণ্ড প্রবাসকালে বলিয়াছিলেন যে, তথাকার রিফর্ম্ম বিল (পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনবিধি সংস্কারের পাণ্ডুলিপি) আইনে পরিণত না হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিবেন, এবং সাধারণ ভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতার শত্রুরা আমাদের বন্ধু নহে, তাহারা পরিণামে কখনও জয়যুক্ত হইবে না। নিখিল জগতের নাগরিক এই মহামানব শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে লিখিত একখানি চিঠিতে বলেন যে, দেশে দেশে ঝগড়া বিবাদ মতানৈক্য হইলে যুদ্ধ ও রক্তপাত না করিয়া [illegible]

দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সভায় আলোচনার দ্বারা তাহার মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং তাহা করা উচিত। তিনি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের এই যে উপায় নির্দ্দেশ করেন, প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রধানতঃ সেই উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য লীগ অব নেশ্যন্স স্থাপিত হয়।

আধুনিক কালে অনেক মনীষী, রাজনীতিবিদ্ ও অন্য অনেক লোক বুঝিয়াছেন সকল দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গল অন্য সব দেশের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করে, কেহই সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জীবনযাপন করিতে পারে না। শতবর্ষ পূর্ব্বে রামমোহন রায় ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আন্তর্জ্জাতিকতা (ইণ্টারন্যাশনালিজম্) প্রাণবান্ ছিল ও তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত, এবং তিনি অতি দূরবর্ত্তী দেশের লোকদেরও সুখ-দুঃখভাগী হইতে পারিয়াছিলেন।

মানুষের হৃদয় মনের ঐশ্বর্য্য—ভাব ও চিন্তা তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন মানুষ যেমন অন্য একজনকে নিজের এই সম্পদের অংশী করিয়া তাহাকে নিজের জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করে, তেমনি দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেও এইরূপ সম্পদের আদান-প্রদান দ্বারা তাহাদের মৈত্রী স্থাপিত হয়। যখন রেল, ষ্টীমার, এরোপ্লেন ছিল না, তখনও পুরাকালেও এই আদান-প্রদান ছিল; তখনও দানে আতিথ্য ও গ্রহণে ঔদার্য্য ছিল। অন্যপ্রকার আতিথ্যের মত এই মানস আতিথ্যও ভারতবর্ষের ছিল। কিন্তু এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ভারতবর্ষ কেবল বিজেতার শক্তিতে পরাভূত হইয়া কিছু লইতে ও কিছু দিতে বাধ্য হইত—তাহাতে আদান-প্রদানের আনন্দ ও ঔদার্য্য ছিল না, এবং ইহা কেবল বিজেতার সঙ্গেই হইত।

রামমোহন যে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে বিজেতার কৃষ্টি স্বীকার বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষ জাগতিক ভাব ও চিন্তার স্রোতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং জগতকেও নিজস্ব যাহা তাহা দিতে সমর্থ হইতেছে। রামমোহন নিজেই ইংরেজীর সাহায্যে শুধু ব্রিটিশের নহে, অন্য পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতকে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার অংশী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবী-নামক বৃহৎ জড়পিণ্ডের অংশ ছিল বটে, কিন্তু জাগতিক মানস ঐশ্বর্য্যে ভারতীয়দের অধিকার ছিল না—তাহা হইতে তাহারা কিছু লইতে পারিত না; সেই ঐশ্বর্য্যে কিছু রত্ন সংযোগ করিতেও তাহারা পারিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আমাদের গ্রহণ ও দান উভয়ই সম্ভব হইয়াছে, এবং এই প্রকারে ভারতবর্ষ আধুনিক জগতের অংশ হইয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিকতা উৎপাদিত হইয়াছে।

রামমোহনকে যে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়, তাহার এক কারণ, তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক হইবার পথে স্থাপন করেন, প্রাচীনের জরা পঙ্গুতা ও স্থাণুতার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নবীনের তারুণ্য উদ্যম ও সচলতা দান করেন। অন্য কারণ, তিনি যুগ-প্রবর্ত্তক; তিনি আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, ধার্ম্মিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহু প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক।

(প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪০, পৃঃ ৫৭৫)

কংগ্রেস ও রামানন্দ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামানন্দের সহিত কংগ্রেসের বরাবরই যোগ ছিল। এলাহাবাদে যখন তিনি চাকরি করিতেন তখন কংগ্রেস-কর্ম্মী বলিতে সেখানে প্রধান দুইজন ছিলেন—মদনমোহন মালবীয় ও রামানন্দ। কংগ্রেস যখনই যাহা বলিয়াছে, দেশের মঙ্গল হইবে জানিলেই রামানন্দ তাহা লইয়া দিনের পর দিন আলোচনা করিয়াছেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন: "প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কংগ্রেসের সহায়তা করা উচিত। আমাদের ভারতবাসীদের ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি, সামাজিক রীতিনীতি, পোষাক বিভিন্ন; কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ একবিধ। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব কিরূপ তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনেকে বলেন, এত বৎসর ধরিয়া এত টাকা খরচ করিয়া কংগ্রেস আমাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই। ইহা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ ত একটা কাজ। বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ যে গবর্ণমেন্টের বিবেচ্য বিষয় হইয়াছে ইহাও ত একটা কাজ। কংগ্রেস যদি আর না কিছু করিতেন, কেবল সমুদয় ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক, সুতরাং লক্ষ্যও এক হওয়া উচিত, আমাদের মনে এবম্বিধ চিন্তার উন্মেষ করিয়া দিতেন, তাহা হইলেও আমরা এত লোকের সমুদয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতাম।"

এই জন্যই তিনি খুব অসুস্থ হইয়া না পড়িলে বরাবরই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতেই লিখিলেন:

"কংগ্রেসের অধিবেশনে আমার উপস্থিতি—১৮০৫ সালে কংগ্রেসের যখন বোম্বাইয়ে প্রথম অধিবেশন হয়, তখন প্রবাসীর সম্পাদক ছাত্র। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়। তখনও আমি ছাত্র। এই অধিবেশনের অন্য কিছু মনে নাই, কেবল একটা এই অস্পষ্ট স্মৃতি আছে, যে, ইহাতে একজন বাঙালী প্রতিনিধি পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার লম্বা দাড়ি বিনুনী করিয়া কানের উপর দিয়া লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন—যেমন—"পশ্চিমা" অনেক লোক সেকালে করিত, এখনও করে। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা যুবকেরা কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম—এইরূপ মনে পড়িতেছে, যে, আমরা ভাবিয়াছিলাম তিনি শিখ হইয়া গিয়াছেন।

ইহার পর যে কংগ্রেসে আমি উপস্থিত ছিলাম, তাহা ১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। ফিরোজ শাহ মেহতা ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহা টিভোলী গার্ডেনে হইয়াছিল। আমি তখন সিটি কলেজের অধ্যাপক। ইহাতে আমার সহধর্ম্মিণী ও আমি—আমি প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। ফিরোজ শাহ মেহতা কার্ডিন্যাল নিউম্যানের "Lead, Kindly Light" কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন। ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ইহাতে একটি প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যান।

অতঃপর ১৮৯২ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসে আমি কলিকাতার অন্যতম প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলাম। মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন, একজন প্রতিনিধি তাঁহার বক্তৃতায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের উল্লেখ করেন "মিষ্টার গোখেল্" বলিয়া। গোখলে মহাশয় উত্তর দিতে উঠিয়া প্রথমেই বলেন, আমি গোখেল নহি, আমি গোখলে, এবং পরে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার যুক্তিতর্কের উত্তর দেন। এই কংগ্রেস আলফ্রেড পার্কের নিকটস্থ, সে সময়ে দরভঙ্গা কাস্‌ল্ নামে পরিচিত, অট্টালিকার হাতায় হইয়াছিল। একদিন বিষয় নির্ব্বাচন কমিটির অধিবেশনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিঃ ডিগবীর বিলাতী কংগ্রেসপত্র "ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি সম্পর্কীয় "গোলমেলে" হিসাব বুঝাইয়া দেন—অবশ্য ইংরেজীতে; এবং ব্যাখ্যা হইয়া গেলে বাংলা করিয়া সমবেত বাঙালী প্রতিনিধিদিগকে বাংলায় এই মর্ম্মের কথা বলেন:—

'একটা গোলমেলে হিসেব যদি বুঝিয়ে দিতে না পারব, তা হলে বৃথাই এতদিন ব্যারিষ্টারী করেছি।'

১৮৯৪ সালে মান্দ্রাজে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমি এলাহাবাদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। সে বৎসর পণ্ডিতমদনমোহন মালবীয় অসুস্থতাবশতঃ কংগ্রেসে যাইতে পারেন নাই। উত্তর পশ্চিম (এখন আগ্রা-অযোধ্যা) প্রদেশ হইতে সেবার লক্ষ্ণৌয়ের পরলোকগত

মুন্‌শী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, কাশীর শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ক্ষত্রিয়, লক্ষ্ণৌয়ের একটি কাশ্মীরি ভদ্রলোক এবং এলাহাবাদ হইতে আমি, এই চারিজন প্রতিনিধি গিয়াছিলাম। ক্ষত্রিয় মহাশয় বড় গোছালো লোক। যাতায়াতের প্রত্যেক দিনের জন্য নিজের (ও সঙ্গীদের) দাঁতন (দন্তকাষ্ঠ) লইয়া-ছিলেন, এবং খাদ্য সম্বন্ধে "আচারনিষ্ঠ" ছিলেন বলিয়া তাঁহার বাড়ীর তৈরি কিঞ্চিৎ অম্লমিশ্রিত ঘৃতপক্ব এরূপ কচুরী আদি লইয়াছিলেন, যাহা যাইবার সময়েও তিনি প্রতিদিন খাইলেন এবং আসিবার সময়েও খাইলেন— তখনও নষ্ট হয় নাই। আমরাও ভাগ পাইয়াছিলাম। আমরা জব্বলপুর, মনমাড় প্রভৃতি স্টেশন দিয়া গিয়াছিলাম। মনমাড় জংশনে পুণার দিক হইতে বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ট্রেণ আসিল। টিলক, মাল্যবিভূষিত হইলেন, জলযোগ করিতে অনুরোধ করায় জুতা খুলিয়া জলযোগ করিলেন। রেণীগেণ্ট্‌ ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে কংগ্রেস পক্ষ হইতে কতকগুলি ভদ্রলোক কিছু আহার করিবার জন্য প্রতিনিধিদিগকে নামিতে বলিলেন। বর্ম্মাজী ও ক্ষত্রিয়জী অজ্ঞাত ব্যক্তির রান্না খাইবেন না বলিয়া খাইতে গেলেন না। আমি বাঙালী গেলাম। পরিষ্কার কলাপাতার উপর গরম গরম ভাত ডাল দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম ও ভোজন করিলাম। কিন্তু ডালে খুব পেঁয়াজ ছিল বলিয়া মুখ পরদিন পর্য্যন্ত বিস্বাদ ছিল। মান্দ্রাজে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত এক বৃহৎ অট্টালিকায়—খুব ভাল ছিল, কিন্তু শৌচের ব্যবস্থা অতি জঘন্য—শ্লীলতা রক্ষার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না। আহার্য্য জিনিষগুলি ভালই ছিল, কিন্তু ডাল তরকারিতে ঝাল বড় বেশী। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া এক্‌জন ভলাণ্টীয়ার তাঁহাদের বাড়ীতে আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে আয়োজন বেশ ছিল, কিন্তু আমি ঝালের আতিশয্যে খাইতে পারিতেছি না দেখিয়া ছেলেটির মাতা ও ভগ্নী তাহার মারফৎ আমাকে তরকারিতে বেশি করিয়া ঘি মিশাইয়া লইতে বলিলেন; তাহাতে কিছু সুবিধা হইল। ছেলেটি আমাকে ইংরেজী করিয়া বলিলেন, মা ও দিদি বলিতেছেন, আপনি বাঙালী বলিয়া ঝাল কম দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আপনি খাইতে পারিতেছেন না। আমরা এমনই ঝাল কম খাই; মাদুরার বরযাত্রীরা মান্দ্রাজে আসিলে তাহারা সঙ্গে মরিচের গুঁড়া আনে, কেননা, মান্দ্রাজী রান্নার ঝাল তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

মান্দ্রাজের এই অধিবেশনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অভিভাষণ এবং শেষ দিনের শেষ বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা মহাশয় মান্দ্রাজ পৌঁছিয়াই পীড়িত হইয়া পড়ায় আমাকেই সেবার পরবর্তী অধিবেশনের স্থান লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের এই অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে আমি উপস্থিত ছিলাম। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে প্রথম চাক্ষুষ দেখি, তাঁহার সহিত পত্রের দ্বারা পরিচয় আগেই ছিল।

কলিকাতায় ১৯০১ সালে যে কংগ্রেস হয় তাহাতে আমি বোধ হয়, প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। ইহা যদি বিডন স্কোয়ারে হইয়া থাকে ও স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জোষীর ভানুতাপ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের উত্তাপে ভাজা লুচি যদি ইহাতে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ইহাতে উপস্থিত ছিলাম। এদুলজী দীনশাওয়াচা সভাপতি ছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রারম্ভিক সংগীতের গায়কদের নেতা ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলাম। সর্ হেন্‌রী কটন সভাপতি ছিলেন। মান্দ্রাজী প্রতিনিধিদের শিবিরে একদিন মিঃ চিন্তামণির নিমন্ত্রণে কফি ও নুন লঙ্কা দেওয়া হালুয়া খাইয়াছিলাম। বঙ্গের বাঙালী প্রতিনিধিরা খুব সামুদ্রিক মাছ খাইয়াছিলেন।

১৯০৫ সালের কাশীর কংগ্রেসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভার আমার উপর ছিল—আমি তখনও এলাহাবাদের একটি কলেজে কাজ করি। আমি বক্তৃতা লিখিয়া পড়িয়াছিলাম। সপরিবারে গিয়াছিলাম। আমার প্রতিনিধির টিকিট ছিল, অন্য সকলের জন্য দর্শকের টিকিট কিনিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লর্ড কার্জ্জনের নীতির সহিত আওরঙ্গজেব বাদশাহের নীতির তুলনা করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। বঙ্গের মিঃ গজনবী ("ঠিক" কিংবা বেঠিক গজনবী, বলিতে পারি না) একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলে অনেক শ্রোতা "উর্দ্দু উর্দ্দু" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহাতে তিনি বলেন, আমি "বাঙালী" এবং ইংরেজীতেই বক্তৃতা শেষ করেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহার কয়েক মাস আগে সেপ্টেম্বর মাসে আমি এলাহাবাদের চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও এলাহাবাদ ছাড়িয়া আসি নাই। এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আসি। ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। কিন্তু যখন

কলিকাতার কংগ্রেসে আসি, তখনই এই প্রথম সংখ্যা ছাপাইয়া কয়েকখানি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কলিকাতার এই কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজী মহাশয় আধুনিক কংগ্রেস রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম "স্বরাজ" শব্দ ব্যবহার করেন। "স্বরাজ" শব্দটির যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেন, সে সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিতেছি।

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসের জন্য আমি প্রতিনিধিরূপে সুরাট যাই। কিন্তু যেদিন পৌছি সেই দিনই রাত্রে জ্বরে পড়ি ও অনেক দিনই সুরাটেই ভুগি। সুতরাং অধিবেশনের দিন যে গোলমাল হইয়াছিল, তাহা দেখি শুনি নাই। রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

১৯১০ সালে সর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও বোধ হয় আমি একজন প্রতিনিধি ছিলাম; কিন্তু ঠিক মনে নাই।

ইহার পর আমি কোন কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যাই নাই, কিন্তু কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। তাহার কেবল উল্লেখ করিতেছি:—১৯১১ সালের কলিকাতা কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দার; ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু; ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু; ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেস, সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল; ১৯৩৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেস, সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই সকল অধিবেশনের বিষয়ে আমরা প্রবাসীতে যথাসময়ে অনেক কথা লিখিয়াছি।"

(প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪২, পৃঃ ৪৩৭)

কংগ্রেস হইতে তখনও রাষ্ট্রভাষা কি হইবে ঘোষিত হয় নাই। তার বহু পূর্ব্ব হইতেই রামানন্দ লক্ষ্য করিতেছিলেন, কংগ্রেসে আর একটি নূতন উৎপাত সুরু হইয়াছে। কোন বক্তা মাতৃভাষায় বা ইংরেজীতে বলিতে উঠিলে, তাঁহাকে "হিন্দী হিন্দী" জিগীর তুলিয়া থামাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার কথাতেই বলি:

"হিন্দী-হিন্দী"—

কংগ্রেসে আর একটি পরিবর্ত্তন কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগে প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলিতে পর্য্যন্ত বক্তৃতা আদি ইংরেজীতে হইত, প্রস্তাবগুলির মুসবিদা ইংরেজীতে হইত। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, কিন্তু বঙ্গের প্রাদেশিক কনফারেন্সে পাবনায় প্রথম রবীন্দ্রনাথ সভাপতির বক্তৃতা বাংলায় করেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যে, প্রত্যেক প্রদেশের বা উপ-প্রদেশের সার্ব্বজনিক সভাদির কাজ তথাকার ভাষায় হওয়া উচিত। উপ-প্রদেশ বলিবার কারণ এই যে, কোন কোন প্রদেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত। যেমন, বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে এক রকমের হিন্দী, ওড়িয়া এবং বাংলা প্রচলিত; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মরাঠী, গুজরাটী, কন্নাড প্রভৃতি প্রচলিত; মান্দ্রাজ প্রদেশে তেলুগু, তামিল, কন্নাড, মলয়ালম প্রচলিত।

সমগ্র ভারতীয় সমুদয় সার্ব্বজনিক সভার সমুদয় কাজে কি ভাষা-ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে কংগ্রেস কোন বিচার বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু কার্য্যত: তাঁহারা হিন্দী উর্দু বা হিন্দুস্থানী চালাইতেছেন দেখিতে পাই। নেহরু কমিটির রিপোর্টেও আছে, যে, হিন্দুস্থানীই সমগ্র ভারতীয় কাজের ভাষা হইবে। বিকল্পে ইংরেজীও চলিতে পারে। এ বিষয়ে আমরা তর্ক-বিতর্ক করিব না। প্রধানত: কেবল পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি। যাঁহারা ইংরেজীতে বেশ ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, আগে কংগ্রেসে তাঁহাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। এখন তাহা নাই। বস্তুত: এখন বাগ্মিতার প্রভাব বেশী অনুভূত হয় না। সুযুক্তি ও সুপ্রযুক্ত তথ্যেরও যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহাও মনে হয় না। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী। তিনি যাহা বলেন, তাহার পশ্চাতে কোন যুক্তি ও তথ্য নাই বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুযুক্তি ও সুপ্রযুক্ত তথ্য থাকিলেও কখন কখন তাঁহার সিদ্ধান্তই বজায় থাকে দেখিয়াছি। তাহার কারণ তাঁহার জীবন ও চরিত্র এবং কয়েকবার সত্যাগ্রহ দ্বারা সাফল্যলাভ। লর্ড আরুইনের সহিত সন্ধির ফলে যে সত্যাগ্রহ আপাতত: স্থগিত আছে, তাহা সকল সত্যাগ্রহগুলির অন্যতম বলিয়া গণনা করিতেছি না; কারণ এই সন্ধির শেষ ফল না দেখিয়া তাহার সফলতা বা নিষ্ফলতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে না।

অন্য যাঁহাদের বেশী প্রভাব আছে, তাঁহারা মহাত্মাজীর সহকর্ম্মী বা দলভুক্ত, কিংবা তাঁহারা প্রীতিভাজন অনুগ্রহের পাত্র।

হিন্দীর কথা বলিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার হিন্দীর কথাই বলি।

গান্ধীজী হিন্দীকে ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক কাজের ভাষা করিতে চান—সম্ভবত: অন্য সব ভারতীয় ভাষাকে চাপা দিয়া একমাত্র দেশভাষা করিতে চান না; কারণ তাঁহার গুজরাটী পত্রিকা আছে এবং তিনি গুজরাটীতে বহিও লিখিয়া থাকেন। তাঁহার হিন্দী ভাল হিন্দী নহে, তবে কাজ চলা-গোছ বটে। করাচী কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই পটেল মহাশয়ের হিন্দীও সেইরূপ। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কেবলমাত্র ভার্ণাকিউলারে

সব কাজ হইবে। ইহার অর্থ বোধ করি এই যে, উহা কেবল হিন্দীতে হইবে। এ বিষয়ে কোন তর্কযুক্তি বৃথা। কারণ আজকাল সংখ্যাবহুল এবং চীৎকারপটুদের প্রভুত্বের যুগ। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন উৎকলে হইবে—সম্ভবতঃ পুরীতে। প্রতিনিধি ও দর্শকদের অধিকাংশ নিশ্চয়ই ওড়িয়া হইবেন। অথচ ওড়িয়া ভাষাতেও বক্তৃতাদি হইতে পারিবে না, হিন্দীতেই হইবে, এ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির নেতার বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা ইংরেজীতে লিখিত হয়। তাহার পর তাঁহারা উহার লিখিত হিন্দী অনুবাদ পড়েন বা হিন্দীতে মৌখিক উহার তাৎপর্য্য বলেন, কখন কখন বেশীও বলেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির ইংরেজীতে মুসাবিদা হয়, সংশোধনের প্রস্তাবাদিও ইংরেজীতে হয়। ইহা সত্ত্বেও, কেহ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে উঠিলে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কতকগুলি লোক "হিন্দী-হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করেন! আমাদের বিবেচনায় যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তাঁহাদের হিন্দীতে বক্তৃতা করা উচিত। যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে, তাঁহারা হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে পারিলে, কংগ্রেসের রীতি অনুসারে, তাহাই করা উচিত। না পারিলে, কাহারও "হিন্দী হিন্দী" বলিয়া তাঁহার নিকট হিন্দী বক্তৃতার দাবি করা অনুচিত।

ইংরেজী ভারতশাসকদের ভাষা ও বিদেশী ভাষা বলিয়া তাহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির নেতার ও কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যদি ইংরেজীতে লিখিত হইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ কেহ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে তাহাতে এমন কি অপরাধ হয়? ইংরেজী বিদেশী বলিয়া তাহা বর্জন করা হইতেছে। কিন্তু করাচীতে সভাপতির সভাস্থলে আসিবার সময় তাঁহার আগে আগে বাদ্যকরদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের ব্যাগ-পাইপ ও ভারতবর্ষের ঢাক বাজাইবার লোক ছিল। ব্যাগ-পাইপটা ত হিন্দী নহে।

হিন্দীতে বক্তৃতাদি করায় আপাততঃ যে কয়েকটি অসুবিধা হইতেছে, তাহা বলিতেছি। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারা বলেন, যে, ভারতবর্ষের উত্তর অংশের সর্ব্বত্র লোকে হিন্দী বুঝে। ইহা ঠিক নহে। ইহা সত্য হইলেও, সাধারণ কেনাবেচার হিন্দী বুঝা এক কথা এবং হিন্দী বক্তৃতা বুঝা অন্য কথা। আমি সাধারণ কেনাবেচার এবং মামুলী ভদ্রতার ও দৈনন্দিন খবরাখবরের হিন্দী বুঝি ও বলিতে পারি। কিন্তু হিন্দী বক্তৃতা সব বুঝিতে পারি না। মুসলমান ভারতীয়েরা যে হিন্দীতে (অর্থাৎ উর্দ্দুতে) বক্তৃতা করেন, তাহা আরও কম বুঝি। কোন কোন অমুসলমান ভারতীয়, যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বা কাশ্মীর পণ্ডিত ইক্‌বাল নারায়ণ গুর্ট্টু, যে হিন্দী বলেন, তাহা বস্তুতঃ উর্দ্দু। তাহা আমাদের মত লোকে বুঝিতে পারে না। করাচী কংগ্রেসে ডাক্তার আন্সারী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; সভাপতি পটেল মহাশয় বুঝিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

কংগ্রেসে সকলকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে বাধ্য করিলে অনেকে শীঘ্র হিন্দী শিখিবে, বুঝিতে পারি। সকলে শিখিবে না। কিন্তু সকলে হিন্দী শিখিয়া ভবিষ্যতে হিন্দী বক্তৃতা করিবে, এই কারণে, আপাততঃ যাহারা ইংরেজীতে ভাল করিয়া নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে এবং সৎপরামর্শ ও সুযুক্তি দিতে পারে, তাহাদের কার্য্যকারিতা হ্রাস বা নষ্ট করা আমরা উচিত মনে করি না।

কংগ্রেসে বক্তৃতাদি যাহা হয়, দৈনিক সকল কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে হিন্দী ভাল করিয়া রিপোর্ট করিবার লোক হিন্দী কাগজওয়ালাদের নাই; ইংরেজী কাগজওয়ালাদেরও—বিশেষতঃ পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্য সব প্রদেশের—নাই। যাহারা আছে, তাহাদিগকে হিন্দীতে রিপোর্ট লিখিয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ খবরের কাগজ সকলে পাঠাইতে হয়। এইরূপ অনুবাদিত রিপোর্ট কখনও যথাযথ হইতে পারে না।

হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে তাঁহারা তাড়াতাড়ি হিন্দী শিখিয়া কোন প্রকারে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেও, হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের সকলের বক্তৃতা বুঝিতে তাঁহাদের বহু বিলম্ব ঘটিবে। হিন্দীতে তর্ক-বিতর্ক করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। আমরা বাল্যকাল হইতে ইংরেজি পড়িতেছি। তথাপি ইংরেজদের ও আমেরিকানদের সকলের সব কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতা এখনও বুঝিতে পারি না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অল্পদিন হিন্দী শিখিয়া অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষীদের সব বক্তৃতাদি বুঝিয়া হিন্দীতে ভাল করিয়া আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

হিন্দীকে ভারতবর্ষের সমুদয় সার্ব্বজনিক কাজের ভাষা করায় এখন যে ভাষাগত ও লিপিগত দাবি প্রধানতঃ পঞ্জাব আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহারে আবদ্ধ আছে, তাহা সমুদয় ভারতবর্ষে ছড়াইবে। ঐ প্রদেশগুলির মুসলমানেরা তত্তৎ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে হিন্দী বলিতে রাজী নহেন; তাঁহারা তাহাকে উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী বলেন এবং ভাষাটিকে নাগরী অক্ষরে না লিখিয়া আরবীয় অক্ষরে লিখিয়া থাকেন।

অনেক অবিখ্যাত ও বিখ্যাত হিন্দুও তাহা করিতেন ও করেন। যেমন লালা লাজপৎ রায়ের দেশভাষায় লিখিত অধিকাংশ পুস্তক-পুস্তিকা উর্দ্দুতে লিখিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লাহোরের "বন্দেমাতরম্" নামক খবরের কাগজ উর্দ্দুতে লিখিত হয়। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে আগে আদেশ আদালতের যে-সব কাজ দেশ-ভাষায় হইত সমস্তই উর্দ্দুতে করিতে হইত। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ হিন্দুদিগকে অনেক চেষ্টা করিয়া আদালতে নাগরীরও ব্যবহারের সরকারী অনুমতি পাইতে হইয়াছে। হিন্দীকে কংগ্রেসের একমাত্র ভাষা করার অর্থ এই হইবে যে, উহার সমুদয় প্রস্তাব রিপোর্ট প্রভৃতি নাগরী ও আরবী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রিত করিতে হইবে। যে-সকল স্বাজাতিক অর্থাৎ ন্যাশ্যান্যালিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়া থাকেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। পরে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে এবং তাঁহারা আরবী অক্ষরেও প্রস্তাব রিপোর্টাদি মুদ্রণের দাবি করিতে অধিকারী হইবেন। কংগ্রেস তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ করাচীর অধিবেশনে সর্ব্বসাধারণের যে সকল প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে, "Protection of the culture language and scripts of the minorities," "সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের কালচার (কৃষ্টি), ভাষা এবং লিপিসমূহ সংরক্ষণ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, অতঃপর কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি অভারতীয় দেশ ও মানুষদের জন্য ইংরেজীতে এবং ভারতীয় মানুষদের জন্য নাগরী ও আরবী অক্ষরে হিন্দী ও উর্দ্দুতে ছাপিতে হইবে। পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের হিন্দীভাষী জেলাগুলি ছাড়া আর কোথাও সকলেই হিন্দী বা উর্দ্দু পড়িবে এমন আশা করা যায় না। সুতরাং যখন যে-প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তখন তথাকার ভাষা ও লিপিতেও কংগ্রেসের প্রস্তাবাদি রচিত ও মুদ্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ আগামী বৎসর যখন উৎকলে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তখন ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু ও ওড়িয়াতে প্রস্তাবাদি মুদ্রিত করিতে হইবে। অবশ্য, কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত কেবল হিন্দীতে (এবং পৃথিবীর অভারতীয় লোকদের জন্য ইংরেজীতে) করিতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের পক্ষে উড়িষ্যায় বসিয়া তথাকার অধিকাংশ লোকের একমাত্র বোধগম্য ওড়িয়া ভাষা ও লিপিকে বাদ দিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।"

(প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃঃ ১৩৮)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, 'হিন্দী'কে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য তখন হইতেই চীৎকার শুরু হইয়াছে। এই গোপন-প্রস্তুতি সকলেরই জ্ঞাতসারে চলিয়াছিল ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। শুধু কংগ্রেসেই নয়, করাচীতে 'হিন্দু মহাসভার এক সভায় এইরূপ 'হিন্দী হিন্দী' চীৎকার শুনা গিয়াছিল। সে সম্বন্ধেও রামানন্দ লেখেন:

"লীগ অব নেশ্যন্সের ও ভারতীয় কংগ্রেসের ভাষা

লীগ অব নেশ্যন্সের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হউক বা না-হউক, সকল মহাদেশের অধিকতম সংখ্যক জাতির এত বড় প্রতিনিধি সভা পৃথিবীতে আর নাই। এই মহাজাতি-সংঘে পৃথিবীর ৫০টির উপর স্বশাসক জাতির প্রতিনিধিরা একত্র আলোচনা করেন, প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, রিপোর্ট ও নানা প্রকার পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইউরোপের রুশীয় ছাড়া প্রধান সমস্ত জাতি ইহার সভ্য। এশিয়ার চীন জাপান ও ভারতবর্ষ ইহার সভ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সব প্রধান দেশ ইহার সভ্য। আফ্রিকার দক্ষিণআফ্রিকা ইহার সভ্য, মিশরও শীঘ্র সভ্য হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পৃথিবীর কত ভাষাভাষী লোক এই মহাজাতি-সংঘের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আলোচনাদি করে। তাহারা কি ভাষা ব্যবহার করে?

লীগের সাধারণ নিয়ম এই যে, ইহার এসেম্ব্লীর ও কমিটিসমূহের অধিবেশনে বক্তৃতাদি হয় ইংরেজীতে নতুবা ফ্রেঞ্চে করিতে হইবে। ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে তাহা শেষ হইবামাত্র লীগের সুদক্ষ অনুবাদক ফ্রেঞ্চে তাহার অনুবাদ পাঠ বা আবৃত্তি করেন, ফ্রেঞ্চে বক্তৃতা করিলে তাহা শেষ হইবামাত্র ঐরূপ সুদক্ষ অন্য অনুবাদক তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ বা আবৃত্তি করেন। ইংরেজী বা ফ্রেঞ্চ ব্যবহার না করিয়া কোন প্রতিনিধি নিজের মাতৃভাষাও ব্যবহার করিতে পারেন। ১৯২৬ সালে যখন আমি লীগের নিমন্ত্রণে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেবার জার্ম্মেনী প্রথম লীগে যোগ দেয়। তাহার পররাষ্ট্র সচিব হের ষ্ট্রেসেম্যান জার্ম্মান ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে আনীত অনুবাদকেরা তাহার ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। এক বৎসর আয়ার্ল্যাণ্ডের এক প্রতিনিধি তাঁহার মাতৃভাষা আইরিশে বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে সমবেত লোকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই উহা বুঝিয়াছিলেন। তথাপি, তিনি আইরিশ ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলে শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ 'ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ' বা 'ইংরেজী ইংরেজী' বলিয়া তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। ভারতবর্ষের হিন্দীভাষীদের মধ্যে অনেকের ততটুকু সৌজন্য ও বিবেচনা না থাকায় তাঁহারা কলিকাতার কংগ্রেসে পর্য্যন্ত "হিন্দী হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

এবার করাচীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সিন্ধু দেশবাসী সিন্ধী একজন প্রধান বক্তাকে এইরূপ লোকেরা সিন্ধী ভাষায় বক্তৃতা করিতে দিলেন না, ইংরেজীতেও না! তাঁহাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে হইল। অথচ শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সিন্ধিই বুঝিত, হিন্দী নহে। উপদ্রবকারী হিন্দীভাষীরা ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা যে হিন্দীভাষী এবং অন্যেরা নহে, তাহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, তাহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্বগৌরব নাই এবং অন্যদের কোন অগৌরবও নাই। তাঁহারা হিন্দীকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও ভাবপ্রকাশক ভাষা এখনও করিতে পারেন নাই।

আমাদের বিবেচনায় লীগ অব নেশুন্সের সভ্য অধিকাংশ দেশের ভাষা ইংরেজী বা ফ্রেঞ্চ না-হওয়া সত্ত্বেও যেমন ঐ দুই ভাষায় উহার কাজ হয় এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রতিনিধির নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ কংগ্রেসে ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক কাজে হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার থাকা উচিত—বিশেষতঃ সেই প্রদেশের মাতৃভাষা যেখানে কোন বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। সাধারণ ভাষারূপে ইংরেজীর ব্যবহার নেহরু কমিটির রিপোর্টেরও অনুমোদিত। আগামী বৎসর উৎকলে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অতএব ঐ অধিবেশনে হিন্দুস্থানী ইংরেজী এবং ওড়িয়া ব্যবহার করিবার অধিকার প্রতিনিধিবর্গকে দেওয়া উচিত।

মাতৃভাষা ব্যবহারের এই অধিকার উৎকল বা ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের অন্য কোন প্রদেশের চেয়ে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্ধ্রদেশ, তামিল নাড় (তামিলভাষীদের দেশ), কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দেশের জন্য আরও অধিক দরকার। কারণ ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের প্রধান সব ভাষা সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রধান ভাষাগুলি তাহা নহে। এইজন্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ লোকের পক্ষে হিন্দী না শিখিয়া বুঝা অসম্ভব; বাঙালী, আসামী, ওড়িয়া, মরাঠা, গুজরাতীদের পক্ষে তাহা নহে। তাহারা হিন্দী না শিখিলেও সামান্য হিন্দী বুঝিতে পারে।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃঃ ১৪১)

পরে এই কংগ্রেস হইতেই 'হিন্দী'কে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা হয়। রামানন্দ ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া প্রবাসীতে বহু প্রবন্ধ লেখেন। আমরা প্রবন্ধগুলি পর পর তুলিয়া দিলাম:

"ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে স্যার উইলিয়ম ভিন্সেন্ট বলিয়াছেন যে, আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গবর্ণমেন্টের মত হইলে, ভারত গবর্ণমেন্ট শ্রীহট্ট জেলা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের ইচ্ছাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য; তাঁহাদের অধিকাংশ যাহা চাহিবেন, তাহাই করা উচিত। আসামের ব্যবস্থাপক সভা ও গবর্ণমেন্ট নিজেদের এলাকা, লোকসংখ্যা ও আয়ের হ্রাসে সম্মত না হইতেও পারেন।

যাহারা এক ভাষা বলে, তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড এক দেশ বা এক প্রদেশভুক্ত এবং এক শাসক বা শাসকপরিষদের অধীন হওয়াই স্বাভাবিক ও ন্যায্য। কিন্তু অন্য দিকেও কিছু বলিবার ও বিবেচনা করিবার আছে। এক একটি দেশ বা প্রদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য কিছু অবশ্যম্ভাবী খরচ আছে। কোন ভাষাভাষীদের সংখ্যা দেশ বিশেষে এত কম হইতে পারে, যে, তাহারা নিজে এই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইতে পারে। বেলজিয়মের ৩২ লক্ষ লোক ফ্লেমিষ ভাষা বলে, ২৮ লক্ষ লোক ফরাস্ ভাষা বলে, পৌনে নয় লক্ষ ফ্লেমিষ ও ফরাস দুই বলে। কিন্তু বেলজিয়মকে দুটি দেশে ভাগ করা সুবিধাজনক নহে। সুইজারল্যাণ্ডের ১৫টি জেলার ভাষা জার্মান, ৬টির ফরাস, ১টির রুমান্স্, এবং ২টির ইতালীয়। কিন্তু তা বলিয়া ৩৯ লক্ষ লোকের বাসভূমি এই ক্ষুদ্র দেশটিকে ৪টি দেশে ভাগ করা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা একই দেশে বা প্রদেশে বাস করিলে তাহার বহু অসুবিধা আছে, কিন্তু সুবিধাও কিছু আছে। কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা কম হইলে, যে শাসন ব্যয় তাহাদের পক্ষে একা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য, তাহা অন্য ভাষাভাষীদের সহিত মিলিয়া তাহারা অনায়াসে বহন করিতে পারে। কোন ভাষাভাষী একাই একটি প্রদেশে বাস করিলে একপ্রকার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা জন্মে, যাহা একাধিক ভাষাভাষীরা একত্রে বাস করিলে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু কোন ভাষাভাষী লোকেরা যদি সংখ্যায় অধিকতর অন্য ভাষাভাষীদের সহিত এক প্রদেশভুক্ত হইয়া থাকিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের প্রতি অবিচার হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। ওড়িয়ারা বিহার, মান্দ্রাজ, ও বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া আছে, কোথাও তাহাদের প্রাধান্য নাই, এবং তাহাদের শিক্ষা, রাজকার্য্য

প্রাপ্তির সুবিধা, প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি সুবিচার হয় না। এই জন্য একটি স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হওয়া ভাল। তাহাদের মোট সংখ্যা এক কোটির উপর। তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের আয়তন লোকসংখ্যার অনুপাতে বৃহৎ, সুতরাং অধিবাসী আরও বাড়িতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ও তাহারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

অন্ধ্র দেশের লোকদিগেরও একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের সুবিধা দেওয়া উচিত। ইহাদের ভাষা তেলুগু। মান্দ্রাজ প্রদেশভুক্ত অন্ধ্রদের সংখ্যা দেড় কোটির উপর।

যে যে স্থলে নূতন প্রদেশ ও গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে না, তথায় ত এক ভাষাভাষীদিগকে একই প্রদেশভুক্ত করা নিশ্চয়ই উচিত। বাঙ্গালীর জন্য নূতন করিয়া প্রদেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে না। পুরুষানুক্রমে বঙ্গভাষীর অধ্যুষিত যে সব ভূখণ্ড পূর্ব্বে শাসনকার্য্যের জন্যও বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিছু কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে বাংলার সহিত আবার জুড়িয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ৩২ লক্ষ বাঙালীকে আসামের এবং প্রায় ২২ লক্ষ বাঙালীকে বিহারের এলাকার অধীন করিয়া রাখা উচিত নয়, তাহাদের বাসভূমিকে আবার বাংলা দেশের সামিল করিলে নূতন করিয়া কোন একটা গবর্ণমেণ্ট গড়িতে হইবে না।”

(প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৮, পৃঃ ১৩৩)

ইহার বহু বৎসর পরে লিখিলেন :

“ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা—ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা কি হওয়া উচিত, এই বিষয়ের আলোচনা নূতন নয়। কিন্তু প্রশ্নটির আলোচনা কলিকাতায় সম্প্রতি দু'-তিনটি সভায় হইয়া গিয়াছে, খবরের কাগজেও হইয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন, বাংলারই সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হইয়া উচিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ, ভাষার সহজ শিক্ষণীয়তা, ভাষার সর্ব্ববিধ ভাব, চিন্তা ও তথ্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, বর্ণমালার উৎকর্ষ, এবং বহুলোকের দ্বারা ব্যবহার—এই সমস্ত গুণ একসঙ্গে বিবেচনা করিলে বাংলার সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ভারতবর্ষীয় অন্য কোন ভাষার দাবী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু যাঁহারা হিন্দী উর্দ্দুর পক্ষপাতী, তাঁহারা এই গুণটির উপরই বেশী জোর দিয়া থাকেন, যে. হিন্দী-উর্দু অথবা হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা ও সকলের চেয়ে বেশী লোকে বুঝে।' ইহা সত্য কথা, যদিও হিন্দুস্থানী সমর্থকেরা উহা কত লোকের মাতৃভাষা ও কত লোকে উহা বুঝে, সে বিষয়ে অত্যুক্তি-পূর্ণ ও মিথ্যা দাবী করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকে বলে ও বুঝে, তাহার এই গুণটি ছাড়া আর সব বিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতায় আমরা বিশ্বাস করি।

হিন্দুস্থানীর যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তাহা কংগ্রেসই বেশী জোর করিয়া বলেন, এবং কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে, হিন্দুস্থানী যাহারা বলিতে পারে না, তাহাদের মুখ খোলা দুঃসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ ইংরেজীতে কিছু বলিতে চাহিলে তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাংলায় কেহ কিছু বলিতে চাহিলে কি ঘটিবে, কল্পনা করিতে পারি না। লীগ অব নেশ্যন্সের ভাষা ইংরেজী ও ফরাসী, কিন্তু যে কেহ নিজের মাতৃভাষায় সেখানে বক্তৃতা করিতে পারে। আমরা সেখানে জার্ম্মান ভাষায়ও বক্তৃতা শুনিয়াছি।

বাংলার দাবী কংগ্রেস নেতাদের কাছে কেউ উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। করিলেও তাহাতে বাঙালী ছাড়া কেহ কর্ণপাত করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অবাঙালী কংগ্রেস নেতারা সাধারণতঃ বাংলা জানেন না, সুতরাং উহার দাবী তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তদ্ভিন্ন, নানা কারণে বাংলা দেশ, বাঙালী, বাংলাভাষা ইত্যাদি বঙ্গের বাহিরে লোকপ্রিয় নহে—যদিও বঙ্গ হইতে সংগৃহীত ধন সকলেরই প্রিয়। কেন এইরূপ হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইবে না; সুতরাং সে চেষ্টা করিব না।

কয়েকটা কথা বাঙালীদিগকে জানান বা মনে পড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দীর চেয়ে বাংলার সহিত বিহারের ভাষার সাদৃশ্য বেশী। বিহারের উপপ্রদেশ মিথিলার ভাষা বাংলার আরও নিকট। মিথিলার ও বাংলার বর্ণমালা এক। অথচ বিহারের লোকেরা নিজেদের ভাষাকে হিন্দী বলেন, এবং বিহারে বাঙালীর প্রতি বিরূপতা খুব বেশী। বিহারীরা বেশী সংখ্যায় বাংলা বুঝেন। আসামের ও বাংলার বর্ণমালা এক, আসামীয় বর্ণমালার বেশীর মধ্যে আছে কেবল, পেটকাটা ব। আসামের ও বাংলার ভাষার মধ্যে প্রভেদ কলিকাতার ও চট্টগ্রামের কথিত ভাষার প্রভেদের চেয়ে বেশী নয়। অথচ আসামীরা বাংলা ভালবাসে না, যদিও বুঝিতে পারে অনেকেই।

উড়িয়্যার ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে প্রভেদ কম। উড়িয়্যার বর্ণমালা পৃথক। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় উড়িয়্যার পুস্তক লিখিত হইলে, তাহা বাঙালীদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। শিক্ষিত উৎকলীয়েরা সাধারণতঃ বাংলা বুঝেন

ও বলিতে পারেন। অশিক্ষিত অনেক উৎকলীয় সম্বন্ধেও একথা সত্য। অথচ উৎকলে বাঙালী বিরাগভাজন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বাংলার জ্ঞান বিস্তার করা হিন্দীর জ্ঞান বিস্তার করা অপেক্ষা ভাষার দিক দিয়া সহজতর, কিন্তু লোকের বিরাগ দূর করা অত্যন্ত কঠিন। বিহারে ত হিন্দী বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আদালতে চলিয়াই গিয়াছে। উৎকলে ও আসামে লোকেরা বরং হিন্দী শিখিবে তবু বাংলা শিখিবে না। ইহার জন্য এই সকল প্রদেশের লোকদিগকে দোষ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে।

বাঙালীদের মনে রাখা উচিত, যে, তাঁহারা বাঙালী ছাড়া অন্য লোকদিগকে নিজের ভাষা ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

আমরা নানা কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য কোন আন্দোলন করি নাই। আমাদের ধারণা, এরূপ আন্দোলন সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু এরূপ আন্দোলন করিলে বাংলার প্রতি বিরুদ্ধতা বাড়িবে। যেমন রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদী আছে, তেমনি ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী আছে। হিন্দুস্থানীর সমর্থকেরা সকলে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী। মিথিলায় যে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা'র মত ধীর ও শান্ত মানুষও বলিতেছেন, যে, হিন্দী তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, মৈথিলী তাঁহাদের মাতৃভাষা, এবং তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোকের নেতৃত্বে যে মৈথিলীকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, বহু হিন্দুস্থানী সমর্থকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ তাহার পরোক্ষ কারণ বলিয়া মনে করি।

আমাদের ধারণা এই, যে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব কংগ্রেস মহলে আমল পাইত, তাহা হইলেও হিন্দীকে সুদূর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও লোকদের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে দলবদ্ধ সাগ্রহ ও সোৎসাহ চেষ্টা চলিতেছে ও যাহার ফলে ছয় লক্ষ মান্দ্রাজী ইতিমধ্যেই চলনসই হিন্দী শিখিয়াছে, বাঙালীদের পক্ষ হইতে সেরূপ কোন চেষ্টা হইত না। ইহা সুখের কথা নয়, গৌরবের কথা নয়, কিন্তু সত্য কথা।

হিন্দীকে যাঁহারা রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাঁহারা অ-হিন্দীভাষীদিগকে হিন্দী শিখাইবার জন্য অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। অবাঙালীদের বাংলা শিখিবার যে অল্প সংখ্যক বহি আছে, তাহার প্রকাশক ইংরেজ, এবং তৎসমুদয় ইউরোপীয়দিগের বাংলা শিখিবার সুবিধার জন্য লিখিত। ভারতীয় অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য বাঙালীরা কয়খানি বই লিখিয়াছেন জানি না। হিন্দীভাষীদের পক্ষে বাংলা শিখা খুব সহজ। অন্ততঃ তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার নিমিত্ত বাঙালীরা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখানর কথা ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গের বাহিরে যে সব বাঙালী বঙ্গদেশ হইতে দূরে বাস করেন, তাঁহাদের বাংলার জ্ঞান ও বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

ভারতীয় এবং বিদেশী অবাঙালীদিগকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদের ও উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধির খবর জানাইবার প্রধান উপায়, ইংরেজী এরূপ সাময়িক পত্রিকাসমূহে বাংলা পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ যেরূপ পত্রিকা ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া থাকে। বঙ্গের এরূপ একখানা ইংরেজী মাসিকে সম্পাদকীয় সমালোচনার্থ বাংলা বহি পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ, বাংলা পুস্তকপ্রকাশকদিগের উক্ত মাসিকের সম্পাদকের আবেদনে অমনোযোগ। ঐ মাসিকে গুজরাটি, হিন্দী, তেলেগু প্রভৃতি বহির সমালোচনা বাহির হয়, বাংলা বহির প্রায়ই হয় না। বলা আবশ্যক, উক্ত সম্পাদকের বাংলা বহি পাইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তাহার কোন লাভ হইত না। বইগুলি সমালোচকদের হাতে যাইত ও তাহাদের সম্পত্তি হইত।

আমরা যদি আমাদের সাহিত্য সম্পদ অপরকে জানাইবার ও অপরকে তাহার অংশী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করি, কেবল নিজের ঘরে নিজের সাহিত্যিক গর্ব্ব লইয়া বসিয়া থাকি, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ অভিমান ক্রোধ প্রকাশ করি, যে, কেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অবাঙালীরা স্বীকার করিল না, তাহা হইলে এরূপ মনোভাবের ও বাহ্য আচরণের সঙ্গতির প্রশংসা করা যায় না।

আমরা উপরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীর সমর্থকদিগের অনেকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার একটি প্রমাণ এমন একজন প্রসিদ্ধ নেতার লেখা হইতে দিতেছি যিনি স্বয়ং হিন্দুস্থানীর রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সমর্থন করেন অথচ পূর্ব্বোক্ত সমর্থকদিগের মনোভাবের সমর্থন করেন না। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু। (ইঁহার নামের 'ব'টি অন্তঃস্থ 'ব'। এ স্থলে আসামীর পেটকাটা 'ব' ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।)

নেহেরু মহাশয়ের ইংরেজী আত্মচরিত হইতে আমাদের দরকারী কথাগুলি আমাদিগকে অনুবাদ করিতে হইবে না। ঐ পুস্তকের যে সরল সহজপাঠ্য অনুবাদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার করিয়াছেন এবং যাহা পরিপাটিরূপে ছাপিয়া সুলভ মূল্যে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই কথাগুলি লইব। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন :

"হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" (পৃঃ ৫২৫)। পরে অন্য একটি ঘটনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করিলাম যে, আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাংলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষা অধিক অগ্রসর, বিশেষ ভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

"এই সকল কথা বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সভায়, উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু উপস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

"আমার বিরুদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি বাঙালী, গুজরাটী, ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে গভীর ভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি?—ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। এই বাদানুবাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই। শুনিয়াছি কয়েক মাস ধরিয়া আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্য্যন্ত উহা চলিয়াছিল।

"এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায়, অসহিষ্ণু একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধৈর্য্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ রহিয়াছে।

"একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর" কথায় হিন্দীভাষী জগতে ঝড় বহিয়াছিল। বাঙালীরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা ভারতময় ঘোষণা করিলে কিরূপ তুফানের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতজীর ভাষায়, "ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ" থাকিতে পারে, কিন্তু সেকথা বাঙালীরা বলিলে রক্ষা আছে কি? বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অবাঙালীরা কোনক্রমেই মঞ্জুর করিবে না, তাহাতে কেবল হলাহল উঠিবে। অতএব ওরূপ চেষ্টা না করিয়া সেইরূপ চেষ্টাই করা ভাল যাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সে চেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা, সেই সম্পদের বার্ত্তা বাংলার সমালোচনা ও সর্ব্বত্র লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙালীদিগকে জানান, এবং ইংরাজীতে বাংলা বহির সমালোচনা ও অনুবাদ দ্বারা অবাঙালীদিগকে জানান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ কেবল আমরা বাঙালীরাই ঘোষণা করি না। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পাদরী উইলিয়ম "কেরী" ইহা বলিয়াছলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক ডক্টর জেমস্ ড্রমণ্ড এণ্ডার্সন টাইম্স্ কাগজে লিখিয়াছিলেন, "এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুটি উৎকৃষ্ট আধুনিক সাহিত্য আছে। তাহা ইংরেজী ও বাংলা।"

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪, পৃঃ ২৯৮)

যদি বাংলা উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, তবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হইবে না কেন? ভাষা অনুযায়ীই যদি বাংলা প্রদেশ ধরা হয় তবে সেই একই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। 'ভাষা অনুযায়ী বাংলা প্রদেশ' প্রবন্ধে রামানন্দ লিখলেন :

"ভারত সচিবের পক্ষ হইতে যে বলা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট আর প্রদেশ সংখ্যা বাড়াইবেন না, তাহাতে বাংলা প্রদেশটিকে ভাষা অনুসারে পুনর্গঠনের কোন বাধা হয় না। কারণ, তাহা করিলে নূতন কোন প্রদেশ গঠিত হইবে না, প্রদেশসমূহের সংখ্যা বাড়িবে না; কেবল বঙ্গের যাহা প্রাপ্য তাহা বঙ্গকে দিতে হইবে মাত্র।

বহু পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আসামকে আলাদা প্রদেশ করায় আমাদের আপত্তি নাই, ছিল না; কিন্তু তাহার সহিত বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল কতকগুলি জুড়িয়া দেওয়া এবং তাহার পর তথাকার বাঙালীদের প্রতি অবিচার আপত্তির কারণ হইয়াছে।

১৯১২ সালে নূতন বিহার প্রদেশ গঠিত হয়। তাহাতে আমরা আপত্তি করি নাই, এখনও করি না। আপত্তি তাহার সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি জুড়িয়া দেওয়াতে। বিহারের প্রতি সুবিচার হইয়াছে তাহা ভালই, কিন্তু বঙ্গের প্রতি অবিচার নিন্দনীয়। এই অবিচার এখনও চলিতেছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে দুটি নূতন প্রদেশ ভাষা-অনুসারে গঠিত হইয়াছে—উড়িষ্যা ও সিন্ধু।

কর্ণাটের ও অন্ধ্র দেশের লোকেরা ভাষা অনুসারে দুটি নূতন প্রদেশ চাহিতেছে, এবং এই ইচ্ছা কংগ্রেস দ্বারা ও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে, বাঙালীদের ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ চাওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে, এবং তাহাতে গবর্ণমেন্টের বা কংগ্রেসের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ কংগ্রেস বিহার প্রদেশের বাঙালী-প্রধান অঞ্চলগুলি বাংলাকে ফিরাইয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের কতকগুলি অংশ বিহার ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় নানা দিক্ দিয়া বাঙালীদের ক্ষতি হইয়াছে। বাংলা গবর্ণমেন্টের আয় কমিয়াছে। নানা আরণ্য ও খনিজ দ্রব্যপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল বিহার প্রদেশ ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় বাঙালীদের ও বাংলা গবর্ণমেন্টের তাহা হইতে ধনী হওয়ার বাধা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর ও বিরলবসতি অঞ্চলগুলি বঙ্গের বাহিরে যাওয়ায় কেবল ঘনবসতি রোগজীর্ণ অঞ্চলসমূহে থাকিয়া বাঙালী জাতির বর্দ্ধিষ্ণু ও আরও লোকবহুল হওয়ায় বাধা ঘটিয়াছে। যে সকল অঞ্চল বঙ্গের মধ্যে থাকিলে বাঙালী তথায় স্বভাবতই চাকরি ও সরকারী ঠিকাআদি পাইতে পারিত, এখন সেখানে তাহার নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী ও পরানুগ্রহকামী হইতে হইয়াছে। যে সকল অঞ্চল বঙ্গে থাকিলে তথাকার বাঙালী ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই অবাধে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইতে পারিত এবং গুণানুসারে যোগ্যতম হইতে বৃত্তি পাইতে পারিত, এখন তাহাদের সেই সব ন্যায্য সুবিধা লাভ পরানুগ্রহসাপেক্ষ হইয়াছে। মোটের উপর, এই সব অঞ্চলে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সব বাঙালীর মনে একটা নিকৃষ্টতার, একটা পরবশতার চাপ পড়িতেছে। ইহা সাতিশয় অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছনীয়।

যে-সকল অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, যেখানকার প্রধান অধিবাসীরা বাঙালী এবং অন্যেরাও বাংলা বুঝে ও বলে, কোথাও কোথাও তথাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলার পরিবর্ত্তে অন্য ভাষা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক জায়গায় বাঙালীরা উদাসীন, কিংবা সচেতন হইলেও কর্তৃপক্ষ অবাঙালী বলিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃঃ ৪৩৭)

রাষ্ট্রভাষা লইয়া মতবিরোধ দেখা দিল। কেহ বলিলেন, রাষ্ট্রভাষা একটি হইবে, আবার কেহ বলিলেন দুটি। রামানন্দ সেই প্রসঙ্গ তুলিয়াও লিখিলেন :

"রাষ্ট্রভাষা একটি না বস্তুত দুটি হইবে?—কংগ্রেসের ব্যবস্থা এই, যে, হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে, এবং তাহা ব্যবহর্তার ইচ্ছা অনুসারে নাগরী বা আরবী লিপিতে লিখিতে হইবে। কংগ্রেসের অভিপ্রায় হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া সকল প্রদেশের লোকদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান সহজ করা। এই আদান-প্রদান মুখে কথা বলিয়া হইতে পারে, এবং লিপি দ্বারা হইতে পারে। আমার প্রয়োজন আমি মৌখিক জানাইতে পারি, চিঠি লিখিয়া জানাইতে পারি। কাহারও ভাব ও চিন্তা বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে, কিম্বা লিখিত ও মুদ্রিত সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও পুস্তক দ্বারা হইতে পারে। হিন্দী ও উর্দ্দুকে হিন্দুস্থানী বলা হইতেছে। এই দুটী যদি এক ভাষা হয়, তাহা হইলে ইহার মৌখিক রূপ একই হইবে, কিন্তু লিখিত চেহারা দুই—অর্থাৎ নাগরীঅক্ষরের ও আরবী অক্ষরের—হইবে; কথিত হিন্দুস্থানী নাগরীওয়ালা আরবী-ওয়ালা উভয়েই বুঝিবে, কিন্তু নাগরীঅক্ষরপ্রিয় ব্যক্তির লিখিত হিন্দুস্থানী ও আরবী অক্ষরপ্রিয় ব্যক্তিরলিখিত হিন্দুস্থানী উভয়ই বুঝিতে হইলে দুরকম অক্ষরই জানিতে হইবে। ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের ও প্রদেশের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান যখন হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্য, তখন যিনি হিন্দু ও মুসলমান, নাগরী-অক্ষর-প্রিয় ও আরবী অক্ষরপ্রিয়, সব লোকের সঙ্গে ঐরূপ বিনিময় চান তাঁহাকে উভয় লিপিই শিখিতে হইবে।

অতএব যদি হিন্দী ও উর্দ্দু ভিন্ন লিপিতে লেখা এক ভাষাই হয়, তাহা হইলেও কংগ্রেসের ব্যবস্থাকে আশানুরূপ ফলপ্রদ করিতে হইলে লোককে দুটা লিপি পড়িতে ও লিখিতে শিখিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ।

হিন্দী ও উর্দ্দু একই ভাষা, না দুটা ভাষা, এ তর্কের মধ্যে আমি যাইব না। ইহার মীমাংসা করিবার মত জ্ঞান আমার নাই। হিন্দী আমি এখনও পড়িতে ও কিছু বুঝিতে পারি; এলাহাবাদে থাকিতে ছেলেমেয়েদের পাঠ্য খান চার পাঁচ উর্দ্দু বহি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি উর্দ্দুতে নিরক্ষর, উহা পড়িতে পারি না।

কথিত হিন্দুস্থানীতে (হিন্দী ও উর্দ্দুতে) সাধারণ কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বলিতেছি। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের (এবং অন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের) হিন্দী বক্তৃতা আমি মোটামুটি বুঝিতে পারি, এবং অশুদ্ধ হিন্দীতে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চালাইতে পারি। করাচী কংগ্রেসে ডাক্তার আনসারীর উর্দ্দু বক্তৃতা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এলাহাবাদে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দু মুসলমান ঐক্য বিধায়ক কনফারেন্স হইয়াছিল তাহাতে মৌলানা আবুল কলাম আজাদ, ইংরেজী জানিলেও, যাহা কিছু বলিতেন সব উর্দ্দুতে। আমি বুঝিতে (সুতরাং প্রয়োজন মত উত্তর দিতে)

পারিতাম না। এবং সালেমের শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়র, যিনি কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন, তিনি ত পারিতেনই না। অতএব উর্দ্দু যদি হিন্দীর সহিত ব্যাকরণের ও কাঠামোর দিক্ দিয়া এক ভাষা হয়ও তাহা হইলেও শিক্ষিত উর্দ্দু-ভাষীদের উর্দ্দুর শব্দ-সমষ্টি এত অধিক পরিমাণে আরবী ফারসী হইতে গৃহীত, যে, তাহা সাধারণ হিন্দী জানা লোকদের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। আমি যখন এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম, তখন তথাকার ফারসীর অধ্যাপক মুন্শী শীতলা সহায় কখন কখন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমাকে কিছু বলিতে আসিতেন। তিনি খুব ভাল উর্দ্দু বলিতেন, এই জন্য আমি বুঝিতে পারিতাম না।

মান্দ্রাজে ও অন্যত্র ইস্কুলে ব্যবহার্য্য এবং এরূপ হিন্দুস্থানী বহি লেখান হইতেছে, যাহা নাগরী অক্ষরে লিখিলে হিন্দী পদবাচ্য হইবে। আরবী অক্ষরে লিখিলে উর্দ্দু পদবাচ্য হইবে, ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ সহজ বিষয়ে এরূপ বহি লেখা কঠিন নহে; কারণ, এরূপ শব্দ বিস্তর আছে যাহা, সংস্কৃত বা আরবী ফারসী যাহা হইতেই আসুক, হিন্দী ও উর্দ্দু উভয়েই চলে (বাংলাতেও তো অনেক আরবী ফারসী কথা চলিয়াছে)। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক,... বহি লিখিতে গেলেই সাধারণ কথাবার্ত্তায় অব্যবহৃত বিস্তর শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, কতক নূতন করিয়া সংগ্রহ করিতে বা গড়িতে হইবে। তাহার জন্য একপক্ষের সংস্কৃতের, অন্য পক্ষের আরবী ফারসীর স্থান আবশ্যক হইবে। হিন্দীওয়ালারা এরূপ শব্দ লইবেন বা গড়িবেন সংস্কৃত হইতে, উর্দ্দুওয়ালারা আরবী ফারসী হইতে। এই জন্য এই সকল বহি কেবল লিপিতে ভিন্ন হইবে না, বিস্তর শব্দ সম্বন্ধেও ভিন্ন হইবে। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পাঠ্য পুস্তকগুলি নাগরীতে ছাপিয়া দিলেই কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা কাশী বিদ্যাপীঠে চলিবে, কিংবা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কাশী বিদ্যাপীঠের পাঠ্য পুস্তকগুলি আরবী অক্ষরে ছাপিয়া দিলেই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিবে, এরূপ মনে করা ভুল।

উপরে উচ্চ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-পুস্তকের কথাই বলিলাম কিন্তু উপন্যাসরূপ লঘু সাহিত্যেও হিন্দী ও উর্দ্দুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দি। আমার কাছে মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশের জন্যে কখন কখন উর্দ্দু উপন্যাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আসে। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বিস্তর উর্দ্দু উপন্যাসের নাম ও সমালোচনা ছিল। কিন্তু এখন আমার যতটা মনে পড়িতেছে, এই নামগুলির একটিরও অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য, ইহা আমার হিন্দুস্থানীর অজ্ঞতার ফল হইতে পারে। কিন্তু হিন্দী উপন্যাসের আমার অবোধ্য এই রূপ কোন নাম মনে পড়িতেছে না।

উপরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম, হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী ও উর্দ্দুকে) রাষ্ট্রভাষা করিলে দুটি লিপি শিখিতে ও শিখাইতে হইবে, এবং শব্দ সংগ্রহ ও শব্দ গঠনের জন্য, ও হিন্দীতে ও উর্দ্দুতে লিখিত উচ্চাঙ্গের বহির বিস্তর শব্দের অর্থবোধের জন্য, সংস্কৃত ও আরবী ফারসী উভয়ই জানিতে হইবে।

বাংলা ভাষার একটি সুবিধা এই, যে, ইহার লিপি এক, এবং ইহাতে নূতন শব্দ আনিতে হইলে সংস্কৃত জানাই যথেষ্ট।”

(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃঃ ৫৯৭)

“ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃতের ও আরবী ফারসীর স্থান

হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করা লইয়া নানা রকম তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটা কথা হিন্দুস্থানী-ওয়ালারা বলেন, যে, পণ্ডিতরা হিন্দীতে বড় বেশী সংস্কৃত চালাইতে চান, মৌলবীরা বড় বেশী আরবী-ফারসী চালাইতে চান। কোন বিষয়ে আতিশয্যের পক্ষপাতী আমরাও নহি; কিন্তু ভারতীয় কোন ভাষায় নূতন শব্দ আনিতে হইলে সংস্কৃত ও আরবী ফারসীর উপযোগিতা সমান, ইহা মোটেই সত্য নহে। সংস্কৃত ভারতবর্ষের ভাষা, ইহা হইতে শব্দ সংগ্রহ বা গঠন করা স্বাভাবিক। আরবী ফারসী ভারতবর্ষের ভাষা নহে, এবং ইহার কোনটিই সংস্কৃত অপেক্ষা সমৃদ্ধ নহে। সংস্কৃত হইতে আহৃত বা গঠিত শব্দ ভারতীয় আধুনিক ভাষা-সমূহের সহিত যেমন খাপ খায়, বিদেশী ভাষা হইতে সংগৃহীত বা গঠিত শব্দ তেমন খাপ খায় না। ইহা যে কেবল উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষাসমূহ সম্বন্ধেই সত্য, তাহা নহে, দক্ষিণের দ্রাবিড় তামিল ভাষাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে এবং নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে তামিলরা সংস্কৃতের আশ্রয় লন।

ভারতীয় ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দ সাধারণতঃ কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে চলে।

হিন্দুস্থানীতে সংস্কৃত শব্দ ঢুকাইলে উহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের এবং অধিকাংশ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর পক্ষে আরবী ফারসী অপেক্ষা বোধগম্যও হইবে।

সংস্কৃত শব্দবহুলতার জন্য বাংলা ভাষার এইরূপ বোধ-সৌকর্য্য থাকায়, ভারতবর্ষের সব প্রধান ভাষায় ইহার বহু-সংখ্যক পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে—গ্রন্থকারদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃঃ ৫৯৮)

বঙ্গদেশকে খণ্ডীকরণ

"ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এবং তাহার পূর্ব্বে নবাবী আমলেও, যে ভূখণ্ডের লোকেরা বাংলায় কথা বলে তাহা একই প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। বাংলাকে বিশেষ ভাবে খণ্ডীকৃত করা হয় লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ বিভাগ ব্যবস্থায়। তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হওয়ায় বঙ্গ খণ্ডীকরণের সেই ব্যবস্থা রহিত হয়, কিন্তু যে সব জেলা ও মহকুমার স্থায়ী অধিবাসীদের প্রধান ভাষা বাঙলা সেগুলিকে একসঙ্গে রাখিয়া একটি অখণ্ড বাঙলা প্রদেশ গঠিত হয় নাই, বরং নূতন রকমের বঙ্গ বিভাগ হয়। তাহার ফলে বাঙলার সীমান্তর্ভূত কয়েকটি জেলা ও মহকুমাকে বঙ্গপ্রদেশের বাহিরে ফেলা হইয়াছে। প্রদেশগুলির সীমা নির্দ্ধারণের জন্য আবার অনুসন্ধানাদি হইবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের এইরূপ একটি আশ্বাসবাণী ছিল, সাইমন কমিশনও সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিন্ধু দেশকে আলাদা করা হইতেছে, বঙ্গের ঠিক সীমা নির্দ্দেশ করিয়া সকল বাঙালীর পৈতৃক বাসভূমিকে এক প্রদেশভুক্ত করিয়া অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ গড়িবার চেষ্টা করা হইতেছে না। এই বিষয়টির প্রতি বাঙালীদের মন দেওয়া আবশ্যক।

যাহারা এক ভাষায় কথা বলে তাহারা এক রাষ্ট্রে থাকিলে তাহাতে তাহাদের ও তাহাদের রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রভাব বাড়ে। রাষ্ট্র যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে এই শক্তি ও প্রভাব রাষ্ট্রের লোকেরা খুব বাঞ্ছনীয় মনে করে। তাহাতে তাহাদের আর্থিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিগত সুবিধাও হয়। এক ভাষাভাষীদের ভূখণ্ড যদি স্বাধীন না হয়, কিংবা উহা যদি রাষ্ট্র না হইয়া উপরাষ্ট্র হয়, তাহা হইলেও, ঐরূপ শক্তি ও প্রভাব এবং উল্লিখিত রূপ আর্থিক সাহিত্যিক সংস্কৃতি বিষয়ক সুবিধা কম বাঞ্ছনীয় হয় না।

এই সব কারণে আমরা অখণ্ড বাংলা চাই। পাঠকেরা জানেন, জার্মানীর জার্ম্মানরা যে সব প্রদেশের জার্ম্মানদের সঙ্গে এক হইবার জন্য সফল চেষ্টা করিয়াছে এবং ফরাসীরা যে সে চেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার মূলে আছে উপরে বর্ণিত কারণসমূহ। ডানজিগ লইয়া যে জার্ম্মেনী ও পোলাণ্ডে মতভেদ হইয়াছে তাহারও মূলে উহা আছে। জার্ম্মান ভাষাভাষী অনেক লোক আছে, যাহারা জার্ম্মানভাষী অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্ম্মেনীর এক রাষ্ট্র-ভবন চায়। ফ্রান্স তাহার বিরোধী, এবং সম্ভবতঃ ইউরোপের আরও কোন কোন জাতি তাহার বিরোধী। এসব সমস্যা ও প্রশ্নের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, আমরাও মানুষ বলিয়া কেবল গৌণ দূর সম্পর্ক মাত্র আছে। তবে যে এগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহা আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার নিমিত্ত।

কারণ, যদিও ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র নহে, বাংলা দেশও স্বাধীন উপরাষ্ট্র নহে, তথাপি ভবিষ্যতে অল্প বা অধিক যতটুকু ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ফেডারেটেড ইণ্ডিয়ার) হাতে আসিবে, তাহাতে অন্যান্য উপরাষ্ট্রের মত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও যোগ্যতার উপর বঙ্গের উন্নতি-অবনতি কতকটা নির্ভর করিবে। উপরাষ্ট্র বঙ্গ যত বড় হইবে ও তাহার প্রতিনিধির সংখ্যা যত অধিক হইবে, বাঙালীদের শক্তি ও প্রভাব তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। অতএব, ব্রিটিশ শাসিত বাংলাকে বড় করার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা অসঙ্গত ও অন্যায় নয়।..."

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃঃ ১৪০)

"বিহারে বাঙালী" প্রসঙ্গে তিনি লিখিলেন :

বিহারে বাঙালী

"এমন কতকগুলি অঞ্চল বিহার প্রদেশের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যেখানে বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীরা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে, যেখানকার প্রধান অধিবাসী তাহারা এবং যেখানকার প্রধান ভাষা বাংলা। এই সব অঞ্চল ছাড়া খাস বিহারেও অনেক বাঙালী বাস করেন যাঁহাদের অধিকাংশ তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। রেলের কাজ, সরকারী চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বনে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও ইঁহারা বিহারে গিয়াছিলেন। বিহারে এইরূপ "ঔপনিবেশিক" বাঙালী যত আছেন, তাঁহাদের চেয়ে বেশী সংখ্যক বিহারী বঙ্গে আছেন। এই বিহারীরা প্রায়ই বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা নহে, তাঁহাদের মোট উপার্জ্জন বিহারের "ঔপনিবেশিক" বাঙালীদের মোট উপার্জ্জনের চেয়ে বেশী, এবং তাঁহাদের উদ্বৃত্ত ও পুঁজি বিহারে প্রেরিত ও সঞ্চিত হয়। বিহারের ঔপনিবেশিক বাঙালীদের উপার্জ্জন সেখানেই ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, বিহারে বাঙালীরা যাহাতে চাকরী না পায়, ঠিকাদারী না পায়, তাহার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে; বাঙালীদের অন্যান্য বৃত্তিতেও বাধা জন্মিতেছে। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জীবন সংগ্রামে প্রতিযোগিতা হইলে এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিহারী ভ্রাতাদের বিবেচনা করা উচিত, যে, বিহারে বাঙালীদেরও টিকিয়া থাকিতে হইবে। তাহারা বিহারে উপার্জ্জন করিয়াছে ও করে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে

এবং সংবাদপত্র প্রচলন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাহারা বিহারের উপকারও করিয়াছে।

নূতন ভারতশাসন আইন প্রণীত হইতেছে। এখন কথা উঠিয়াছে বিহারের বাঙালীদের জন্য বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক ও উচিত কি না। এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস "বেহার হেরাল্ড" কাগজে দেওয়া হইয়াছে।

ভারত-শাসন বিলে বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত হয় নাই। বিহারের সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য ৮৯টি আসন রাখা হইয়াছে। বিহারের জন্য যে ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কিন্তু ইচ্ছা করিলে বিহারী ও বাঙালী উভয় লোকসমষ্টির সম্মতিক্রমে বাঙালীদিগের জন্য কয়েকটি আসন রাখিতে পারেন, এবং বিহারের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ফ্রাঞ্চিস কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী নিয়ম করিতেও সমর্থ।

লোথিয়ান কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য বিহারে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা অধিকাংশের মতে বাঙালীদের জন্য চুটি আসন রাখিবার সুপারিশ করেন (রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় দেখান যে, চুটি আসন যথেষ্ট নহে), কিন্তু বিহার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। বিহারের অন্যতম মন্ত্রী সার গণেশ দত্ত সিং সাইমন কমিশনকে প্রেরিত নিজ মন্তব্যে বলেন, যে, বিহারের প্রত্যেক ডিবিজনে বাঙালীদের জন্য একটি করিয়া আসন রাখা উচিত। অর্থাৎ বিহারে চারিটি ও উড়িষ্যায় একটি। উড়িষ্যার কথা এখন বলিতেছি না। বিহারীরা ৮৯টি আসনের মধ্যে ৪টি বাঙালীদিগকে দিলে তাঁহাদের শক্তি হ্রাস ও ক্ষতি হইবে না। অবশ্য বিহারের অধিবাসীদের শতকরা ৫·৬ জন বঙ্গভাষী বলিয়া তজ্জন্য তাহাদের অন্যূন ৬টি আসন পাওয়া উচিত। বিবেচক বিহারী ইহা বুঝিলে ভাল হয়।

আমরা কোথাও কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতির লোকদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী নহি। সুতরাং বিহারের বাঙালীদের জন্য আসন সংরক্ষণের আলোচনা কেন করিতেছি, তাহা বলা আবশ্যক। বিহারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাবু নন্দকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক এই প্রশ্ন স্থাপিত হইলে সরকার পক্ষ হইতে মাননীয় মিঃ হইট বলেন :

"The idea has been that when a domiciled Community takes its place in the province, it should take its place with the other natives of the soil as part of the people of Bihar and Orissa". "যে ধারণা অনুসারে কাজ করিতে হইবে তাহা এই যে, যখন কোন লোকসমষ্টি এই প্রদেশে আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তখন তাহাদিগকে বিহার ও উড়িষ্যার লোকদের মধ্যে তথাকার পুরাতন অধিবাসীদের সঙ্গে স্থান লাভ করিতে হইবে।" অর্থাৎ তাহারা বিহার ও উড়িষ্যার চিরন্তন অধিবাসীদের সামিল হইয়া যাইবে।

এই ধারণা আদর্শ বা নিয়ম, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু বিহারে বাঙালীদের প্রতি এই নিয়মে কাজ করা হয় না—তাহাদিগকে বিহারের লোকদের সামিল মনে করা হয় না। নানা বিষয়ে বাঙালী যোগ্যতর হইলেও, তাহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অন্যকে সুবিধা দেওয়া হয়। কোন একটা সুবিধার জন্য যদি ৫ জন বিহারী প্রার্থী হয়, তাহা হইলে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই সুবিধা দেওয়া হয়, বিহারী বাঙালী প্রভৃতি সবাই প্রার্থী হইলে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই সুবিধা দেওয়া হউক—সেই যোগ্যতম ব্যক্তি বাঙালী হইলেও তাহাকেই সুবিধা দেওয়া হউক, বাঙালীরা ইহাই চান; বাঙালী যোগ্যতম না হইলেও তাঁহাকে দেওয়া হউক ইহা তাঁহারা চান না।

কিন্তু বাঙালীদিগকে একদিকে মুখে বলা হইতেছে "তোমরা বিহারেরই লোক বলিয়া আপনাদিগকে গণ্য কর, আলাদা আসন কেন চাও", অন্যদিকে তাহাদিগকে কার্য্যতঃ বিহারী হইতে আলাদা বলিয়া নানা প্রকারে গণ্য করা হইতেছে, এবং বাঙালী ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সেন্সাসের জন্য কাহার মাতৃভাষা কি তাহা নির্দ্ধারণের সময় বাংলাভাষীদের সংখ্যা কম দেখাইবার চেষ্টা বহু বৎসর হইতে হইয়া আসিতেছে। মানভূমের অন্তর্গত ধানবাদে জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীতে রাখিবার নিয়ম করা হইয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রদিগকে সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরের পরিবর্ত্তে নাগরীতে লিখিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা হয়। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও সিংহভূমের কোন কোন অঞ্চলে দেশভাষার বিদ্যালয়গুলিতে বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন করা হইয়াছে।

বিহারে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে আগত লোক বাস করে। কিন্তু কেবলমাত্র বাঙালীদিগকেই স্থায়ী বাসিন্দাত্বের (ডোমিসাইলের) সার্টিফিকেট লইতে বাধ্য করা হয় যদি তাহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার, ছাত্ররূপে সরকারী বৃত্তি পাইবার এবং সরকারী চাকরী

পাইবার যোগ্য বলিয়া রেজিষ্টরীভুক্ত হইতে চায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও অন্য এশিয়ানদিগকে রেজিষ্টরীভুক্ত করিবার নিয়মের বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত লড়িয়াছেন, অথচ এইরূপ নিয়ম প্রকারান্তরে বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। বিহারের এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে না—কাহারও পিতামহ সার্টিফিকেট পাইলে পরে তাহার পিতাকে, তদনন্তর তাহাকে এবং কালক্রমে তাহার পুত্র-পৌত্রাদিকেও নূতন করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয়! যে যে-"নীতি" বা "নিয়ম" বা "সর্ত্ত" অনুসারে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাহা ক্রমশঃ কঠোরতর করা হইতেছে।

কিন্তু সার্টিফিকেট লইলেও বাঙালী ও বিহারীকে সমান চক্ষে দেখা হয় না। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করিবার সময় খুব একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বাঙালী ছাত্রকে লওয়া হয়, যেসব বিহারী ছাত্রকে লওয়া হয় তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বহু বাঙালী ছাত্র (ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত থাকিলে এবং তাহা থাকেও) ভর্ত্তি হইতে পায় না, বিহারী ছাত্রেরা নিকৃষ্ট হইলেও তাহাদিগকেই এরূপ স্থলে ভর্ত্তি করা হয়। সরকারী চাকরীতেও শতকরা খুব কম কাজ বাঙালীর জন্য রাখিয়া তদতিরিক্ত কাজে, যোগ্যতর ও যোগ্যতম বাঙালী থাকিতেও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিহারীদিগকে কাজ দেওয়া হয়। সরকারী বৃত্তিতেও এইরূপ। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এইরূপ নিয়ম থাকায় বহু ব্যয়ে পরিচালিত ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিখাইবার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে অনেক অযোগ্য বিহারী ছাত্র লওয়ায় তাহারা অনেক স্থলে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করিতে বা পাস করিতে পারে না, কেবল তাহাদের জন্য কতকগুলা টাকা নষ্ট হয় মাত্র। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যেসব সরকারী বৃত্তি আছে, ১৯২০ সালের পর এ পর্য্যন্ত তাহার একটিও বিহারের বাঙালী কোন ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব সত্ত্বেও পায় নাই। সরকারী চাকুরীতে প্রাদেশিক বিভাগসমূহে (প্রভিন্স্যাল সার্ভিসসমূহে) গত বার-তের বৎসরের যোগ্যতম হওয়া সত্ত্বেও খুব কম বাঙালীকে লওয়া হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত 'বেহার হেরাল্ডে' দেওয়া হইয়াছে। সরকারী চাকরীর কোন বিভাগে চাকর্য্যের সংখ্যা কমাইবার দরকার হইলে, হুকুম দেওয়া আছে যে, আগে বাঙালী চাকর্য্যেদিগকে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। তাহার ফলে যোগ্য পনের-ষোল বৎসরের চাকর্য্যে অনেক বাঙালীর কাজ গিয়াছে, বিহারী তিন-চার বৎসরের চাকর্য্যের কাজ যায় নাই।

এই প্রকারে বিহারে বাঙালীরা স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও তাহাদিগকে বিহারীর সমান অধিকার দেওয়া হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারী সদস্যদের প্রস্তাবে ও সমর্থনে বিহার ব্যবস্থাপক সভায় ধার্য্য হইয়াছে, কেবল বিহারীরাই ঠিকাদারী কাজ পাইবে, অর্থাৎ বাঙালীরা পাইবে না। গভর্ণমেণ্ট ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। কেরানীগিরি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম হইয়াছে।

এই সকল কারণে বিহারের বাঙালীদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের জন্য কয়েকটি আসন রক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তাহাতেই যে তাহাদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত হইবেই এমন আশা করা যায় না। কিন্তু তাহাদের অভাব-অভিযোগ বিজ্ঞাপিত হইতে পারিবে।

লীগ অব্ নেশুন্সের উদ্যোগে ইউরোপে প্রায় ২০টি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার্থ যে সব ট্রীটি (Minorities Protection Treaties) হইয়াছে, তাহাতে ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক প্রথা, ধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) আলাদা হইলে সংখ্যালঘুদিগের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিয়ম আছে। বিহারের অধিকাংশ বাঙালীর ধর্ম্ম হিন্দু বিহারীদের মত বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক, রীতিনীতি ও ব্যক্তিগত আইন আলাদা। তদুপরি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়া আসিতেছে। এইজন্য তাহাদের আলাদা আসনের দাবী গ্রাহ্য হওয়া উচিত। তাহারা বিহারের লোক, মুখে ইহা স্বীকার করিলেই তাহাদের আলাদা আসনের দাবী বাতিল হয় না। কারণ, বিহারের আদিম নিবাসীদের, খৃষ্টীয়ানদের, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযান নাই, কিন্তু তাহাদিগকে আলাদা আসন এবং আলাদা নির্ব্বাচক মণ্ডলী দ্বারা, নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাহারাও বিহারের লোক। বাঙালীরা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচন চান না। তাঁহারা কেবল কয়েকটি আসন চান এবং সেইগুলির জন্য বাঙালী প্রতিনিধি বিহারী ও বাঙালী উভয়ে মিলিয়া নির্ব্বাচন করিবেন, এই চান।

বিহারের অধিবাসী সংখ্যা ৩২৩৭১৪৩৪। তাহার মধ্যে বাংলাভাষী—১৮১৬১৭২ অর্থাৎ শতকরা ৫·৬ জন। ঠিক সংখ্যা বিশ লক্ষের অধিক মনে হয়। কারণ, বাঙালীদের সংখ্যা নানা প্রকারে কম দেখাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, যাহা হউক শতকরা ·৬ হইলেও তাহারা প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য।

কৌতূহল

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

খ্রীষ্টীয়ানরা বিহারে শতকরা একজনও নহে, অথচ তাহাদিগকে শতকরা ৪টি আসন দেওয়া হইয়াছে, মুসলমানেরা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৪.৪, অথচ তথায় তাহাদিগকে শতকরা ১২.৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানেরা শতকরা ৫ জনেরও কম; অথচ তাহাদিগকে তথায় তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে।"

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃঃ ১৪৬)

স্বাধীনতার পূজারী রামানন্দ

স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়াই রামানন্দ ভারতে ও ভারতের বাহিরে সম্মানিত। স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করিবার জন্যই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার মনে স্বাধীনতার রূপ কিরূপ ছিল এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি কি কারণে তিনি অনুভব করিতেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলা ভাল। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন :

"স্বাধীনতা কথাটি দুরকম অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন দেশ অন্য কোন দেশের লোকদের দ্বারা শাসিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাধীন দেশ বলা হয়। যেমন আফ্‌গানিস্তান, আবিসীনিয়া, ও নেপাল স্বাধীন দেশ; কারণ এই সব দেশের রাজারা উহাদেরই বাসিন্দা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও, যখন রুশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল, তখনও উহা ঐ অর্থে স্বাধীন ছিল; কেননা রুশিয়ার সম্রাট রুশিয়ারই অধিবাসী ছিলেন। এই অর্থে গত শতাব্দীতে জাপানের সম্রাট কর্ত্তৃক তথায় প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও জাপান স্বাধীন ছিল; কারণ, উহা কোন বিদেশী লোকের দ্বারা শাসিত হইত না। স্বাধীনতার এই অর্থকে আমরা পরে প্রথম অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব।

স্বাধীনতার আর একটি অর্থ আছে, তাহা উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহাকে আমরা দ্বিতীয় অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিব। যে দেশের লোকেরা নিজে বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের আইন প্রণয়ন বা রদ করে, ট্যাক্স বসায় বা উঠায়, কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করে, দেশের আয়-ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি করে, তাহারা এই উৎকৃষ্টতর অর্থে স্বাধীন। রাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র, উভয় প্রকার শাসন-প্রণালীতেই এই প্রকার স্বাধীনতা থাকিতে পারে। ফ্রান্সে ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডের রাজা আছে। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে এই তিনটি দেশই সমান স্বাধীন। যে সব দেশ এই উৎকৃষ্ট অর্থে স্বাধীন, তাহাদের অধিবাসীদেরও স্বাধীনতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ শ্রমজীবীদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না, তাহারা বাস্তবিক পরাধীন ছিল এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিত না। এখন কিছুদিন হইতে তাহারা ঐ অধিকার পাইয়াছে, যদিও এখনও পার্লামেন্টের অধিকাংশ সভ্য শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি নহে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এবং আরও অনেক স্বাধীন দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না। অল্প কাল হইল তাঁহারা এই অধিকার পাইয়াছেন। বস্তুতঃ এতদিন তাঁহারা পরাধীন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন দেশ এক অর্থে স্বাধীন হইলেও দেশের লোক কিংবা অধিকাংশ বা কিয়দংশ লোক অন্য অর্থে পরাধীন থাকিতে পারে। কিন্তু কোন দেশ যদি তদ্দেশজাত ও তদ্দেশবাসী রাজার দ্বারা শাসিত হয়, অর্থাৎ প্রথম অর্থে স্বাধীন হয়, তাহা হইলে সেই দেশের লোকেরা সাধারণতঃ যত সহজে ও যত অল্প কালে দ্বিতীয় ও উৎকৃষ্টতর অর্থে স্বাধীন হইতে পারে, বিদেশজাত ও বিদেশবাসী লোকের দ্বারা শাসিত লোকেরা তত সহজে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।"

(প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, পৃঃ ৫৭২)

সার্ব্বজনীন কাজে মানুষের উক্তি, ব্যবহার বা কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা করা পত্রকারদিগের একটি কাজ। এই কার্য্যে রামানন্দ কখনও উচ্চ নীচ, খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র, আত্ম-পর বিচার করিতেন না—ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার এই খ্যাতি ভারতের বাহিরেও ছিল।

জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার ভক্তির পাত্র-দিগের সহিতও যখন তাঁহার মতভেদ হইয়াছে তখন তিনি তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। গান্ধীজি, ব্রজেন্দ্র-নাথ শীল, স্যর আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, চিত্তরঞ্জন, রাধাকৃষ্ণণ, রামন্, সুভাষচন্দ্র ও আরও বহু রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের মহারথীদের সমালোচন তিনি নির্ভীকভাবে করিয়াছেন। যাঁহাদের তিনি বহু ক্ষেত্রে সাধুবাদ দিয়াছেন এবং যাঁহাদের পক্ষ বহুস্থানে

সমর্থন করিয়াছেন, প্রয়োজন বুঝিলেই তাঁহাদেরও কার্য্য-বিশেষের বিরুদ্ধে লিখিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

মিসেস বেসান্টকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি করা বিষয়ে রামানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতভেদ হয়। তিনি বলেন, একজন বিদেশীয়কে কংগ্রেসের সভাপতি করা কখনই উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত হইয়াও তিনি বহুবার তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

রামানন্দ গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করিতেন। গান্ধীজি ভারতে খ্যাত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ত্যাগ ও কীর্ত্তির বিষয় তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র মহৎ জীবন ও সাধনার কথা রামানন্দ বহুবার বলিলেও, তাঁহার সহিত মতভেদও বহুবার হয়। গান্ধীজীর আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ ঘোষণার সময় রামানন্দ বলেন:

"অন্ধভাবে আইন অমান্য করার ভাবটা জাগান ঠিক নয়। কারণ এই ভাব দ্বারা চালিত লোকেরা যতদিন গান্ধী মহাশয়ের মত লোকের অনুসরণ করিবে ততদিন তাহারা নিজের বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহারা আপনাদের প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়ে কিংবা এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয় যে গান্ধী মহাশয়ের মত সাধু, কল্যাণকামী ও শান্তিপন্থী নয়, তাহা হইলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা আছে।"

গান্ধীজি অসহযোগ ঘোষণা করিলে পিতামাতাদের গবর্ণমেণ্ট শিক্ষালয়ে সন্তানদের প্রেরণ না করার সমর্থন রামানন্দ করেন নাই।

বাংলা ১৩২৭-এ গান্ধীজি এক বৎসরে স্বরাজলাভের আশা করাতে রামানন্দ বলেন:

"গান্ধী মহাশয় এক বৎসরে স্বরাজ্য পাইবার আশা রাখেন। তাহা অপেক্ষাও উৎসাহী ও আশাশীল কেহ-বা ছয় মাস কেহ-বা ছয় দিনে পাইবার আশা করেন। ইহাদিগকে স্মরণ করাইতেছি, যে, কোন জাতি সশস্ত্র যুদ্ধ করিয়াও এক বৎসরে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই। ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা সম্পত্তি, সামান্য রকমের সৌখীন সহযোগিতা বর্জ্জন-হেতু ইংরেজ ছাড়িয়া দিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।"

গান্ধীজির "চরখা আন্দোলন"ও তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিলেন:

চরখা ও স্বরাজ

"চরখার প্রবর্ত্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কি না, এই প্রশ্ন অনেকে করেন। চরখার প্রবর্ত্তন দ্বারা সাক্ষাৎভাবে স্বরাজ লাভ হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না; কারণ, কিরূপে তাহা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেহ বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে ইচ্ছুক আছি। দেশে যখন কেবল চরখার সুতা ও হাতের তাঁতের কাপড় ছিল, তখনও ত দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। যে অবস্থা স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদিগকে সমর্থ করে নাই, তাহা স্বাধীনতা পূর্ণ লাভে সাক্ষাৎভাবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই সমর্থ করিবে, ইহা বলা যায় না। তবে পরোক্ষভাবে চরখার প্রচলন দ্বারা স্বরাজ লাভের পথ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। সংক্ষেপে খুলিয়া বলিতেছি। স্বরাজ জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার নহে। উহা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ত বটেই, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বও বটে। যেমন দেহের কোন একটি অঙ্গকে বলশালী করিতে হইলে অন্য অঙ্গগুলিকেও সবল করিতে হয়, এবং দেহের বলবিধানে মনঃসংযোগ আবশ্যক হয়; তেমনি এক-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে আত্ম-কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, এবং সকল বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ সজাগ সতর্ক অনলস মন ও দেহের উপর নির্ভর করে। কোন একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতির চেষ্টাকে একমুখী, সুশৃঙ্খল ও সমবেত করিতে হয়, এবং সকলকে নিজের স্বার্থ অন্ততঃ কতকটা ত্যাগ করিয়া সমস্ত জাতির মঙ্গলচিন্তায় ও অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইতে হয়। চরখা ও হাতের তাঁতকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার প্রধান উপায় করিতে হইলে, সুশৃঙ্খল, সমবেত একমুখী চেষ্টার এবং পরার্থপরতার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই সাধনায় আমরা যদি সিদ্ধিলাভ করি, তাহা হইলে পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের একটি প্রধান অংশে আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ত হইবেই, অধিকন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্র ভালর দিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইবে, যে, তাহা রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ স্বরাজ লাভে আমাদের খুব কাজে লাগিবে। যে জাতির লোকেরা একজোট হইয়া বস্ত্র সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে পারে, তাহার অন্যান্য দিকেও সেই দলবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভে সমর্থ হইতে পারে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। খদ্দরের উৎপাদনে বিস্তর লোক কাজ পাইবে; শুধু যাহারা সূতা কাটিবে ও কাপড় বুনিবে তাহারা নহে।

যাহারা চরখা ও তাঁত তৈয়ার করিবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করিবে, তাহারাও। লক্ষ লক্ষ উৎপাদক ও লক্ষ লক্ষ ক্রেতার মধ্যে এইরূপে একটি যোগ স্থাপিত হইবে। জাতীয় একতা এইপ্রকার নানা উপায়ে জন্মে। স্বরাজ লাভ করিতে

হইলে নানা প্রকারের প্রচারক ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। তাঁহাদের ভরণ-পোষণ ও যাতায়াতের ব্যয়, পুস্তিকা ও পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যয়, প্রভৃতির জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। ভারতের আবশ্যক কাপড় ভারতের তুলায় ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্যস্বরূপ যে অনেক কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা দেশেই থাকিবে, এবং তাহা হইতে স্বরাজ প্রচেষ্টায় সাহায্য পাওয়া যাইবে। এরূপ আরও অনেক সুবিধার বিষয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা হৃদয় মনের আত্মার উন্নতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ মনে করি। নিজেদের দরকারী কাপড় নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের মনে যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর জন্মিবে, আমরা যেরূপ উৎসাহিত হইব, তাহা আমাদিগকে নানা কার্য্যক্ষেত্রে "অসাধ্য" সাধনে সমর্থ করিবে। আরও একটি লাভ আছে। যাঁহারা গরীবদের জন্য নিজের সুখ-সুবিধা কখন ত্যাগ না করায় আমাদের মত আত্মগ্লানি অনুভব করেন, তাঁহারা খদ্দর পরিধান করিয়া এই তৃপ্তিবোধ করিতে পারিবেন, যে, হয়ত ইহার কিছু সূতা কাটিয়া কোন গরীব লোক এক বেলার মুড়ি জলপানের সংস্থান করিয়াছে।"

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৯, পৃঃ ১৪৪)

হিন্দীকে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলায় রামানন্দ গান্ধীজির প্রতিবাদ করেন :

"মান্দ্রাজে যে হিন্দীকে অবশ্য শিক্ষণীয় করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন প্রসঙ্গে মহাত্মাজী "হরিজন" কাগজে লিখিয়াছেন. ইংলণ্ডের স্কুলসমূহে লাটিন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়। এখনও তাহা অবশ্য শিক্ষণীয় কি না জানি না। কিন্তু যদি তাহা হয়ও, তাহা হইলে ইংলণ্ডে লাটিনকে অবশ্য শিক্ষণীয় করার সহিত তেলুগু-তামিল-কন্নড়-মলয়ালমভাষী মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দীকে অবশ্য শিক্ষণীয় করার কোন সাদৃশ্য নাই। লাটিন একটি 'মৃত' ভাষা। উহা কোন দেশের বা ইংলণ্ডের কোন অংশের মাতৃভাষা নহে। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে যদি উহা অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ও তাহা হইলে তাহা উহাকে তথাকার রাষ্ট্রভাষা করিবার নিমিত্ত নহে। তাহার কারণ অন্যবিধ। তাহার কারণ অনেক শতাব্দী হইতে লাটিন জানা ইংলণ্ডে শিক্ষিতত্বের ও সংস্কৃতিশালিতার একটা প্রমাণ ছিল, লাটিন খ্রীষ্টিয়ান পুরোহিতেরা ব্যবহার করিতেন (রোমান ক্যাথলিক পাদরীরা এখনও করেন), অনেক ইংরেজী শব্দ লাটিন হইতে উৎপন্ন এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নূতন ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ রচনার-জন্য লাটিন ও গ্রীক ধাতু ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজে হিন্দী প্রচলনের সপক্ষে এরূপ কোন প্রয়োজনগত যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দীর জ্ঞান শিক্ষিতত্বের ও সংস্কৃতিশালিতার প্রমাণ কখনও ছিল না; উহা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যের ভাষা নহে, ছিল না; মান্দ্রাজের ভাষাগুলি হিন্দী হইতে বহু শব্দ গ্রহণ করে নাই, এবং পারিভাষিক শব্দ রচনার জন্য তাহাদিগকে হিন্দীর সাহায্য লইতে হয় না, হইবে না।" (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৫, পৃঃ ১৭৪)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বহু উক্তি প্রভৃতির সমালোচনা ১৩৩২-এর পূর্ব্বের প্রবাসীতে আছে।

রামানন্দ সমালোচক হইলেও মতভেদ-অসহিষ্ণুতা পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বদেশসেবীদের সম্বন্ধে বলিতেন, "সব দলের মধ্যেই অকপট স্বদেশপ্রেমিক আছেন। কোন দলের লোকই সত্যের সব দিকটা দেখিতে পান বলিয়া মনে করি না। ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়াও একই লক্ষ্যে যাওয়া যায়।"

তিনি বলিতেন, "দলের ছাপ দেখিয়া মানুষের বিচার করা উচিত নয়, আচরণ দেখিয়া করা উচিত।...মনে রাখিতে হইবে, অহিংসার মানে শুধু এ নয়, যে, আমরা অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা ইংরেজকে তাড়াইতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে চাহিব না। অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, যে, স্বদেশবাসী ও বিদেশী কাহারও প্রতি মনেও হিংসার ভাব পোষণ করিব না।"

"মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত ও বিকশিত না হইলে মানুষ স্বাধীন হইতে পারে না, ইহা যেমন সত্য; মানুষ স্বাধীন না হইলে তাহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত ও বিকশিত হইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। ইংরেজ ভারতের প্রভু হইবার পূর্ব্বে আমাদের নিজের শক্তি যতটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই।...

পরাধীনতা মানুষকে কখনও বল দিতে পারে না; উহা মানুষকে দুর্ব্বলই করে, মানুষের কল্পনা, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে পর্য্যন্ত শৃঙ্খলিত করে।...

জাগতিক ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের ও জাতির মঙ্গল অন্য প্রত্যেক দেশের ও জাতির মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। এই জন্য জাতীয় স্বাধীনতার পরেও আর একটি লক্ষ্য মানুষের আছে। তাহা সকল জাতির পরস্পরের উপর নিভর (interdependence of nations)। কিন্তু ইহার আগে জাতীয় স্বাধীনতা চাই। যে-জাতি স্বাধীন নহে, সে ত জাতিই নহে, তাহার ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। তাহার উপর আবার অন্য জাতিরা কি নির্ভর করিবে?"

(আশ্বিন, ১৩২৮)

বিবিধ

স্বরাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি কত কথাই না বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিভিন্ন অংশগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রয়োজন ইহার নানা অভাব-অভিযোগ দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ দরিদ্রতম।...সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত সকল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা শতকরা অধিক সংখ্যক নিরক্ষর লোক বাস করে। ইংরেজরা ইহার সম্যক্ প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই বা করিতে পারে নাই। সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাধি-ক্লিষ্ট এবং মহামারী দ্বারা কবলিত।...

"কিন্তু আমাদের নানা দুঃখ-দুর্দ্দশা অভাব-অভিযোগই আমাদের স্বরাজ লাভ চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। যদি ইংরেজ রাজত্ব একেবারে নিখুঁত হইত, যদি দেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, সংক্রামক ব্যাধি, মহামারী প্রভৃতি না থাকিত, কিম্বা যদি ভবিষ্যতে ইংরেজের কুশাসনে অচিরে দেশে ঐরূপ দুর্দশার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বরাজ চাই, নিজের দেশের কাজ নিজেরা চালাইতে চাই।

"তাহার কারণ আমরা মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু কিম্বা দ্বিপদ বনমানুষ নই। ঈশ্বর আমাদিগকে মানব জন্ম দিয়াছেন। সুতরাং আমরা কেবল সুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আমরা নিজেরা স্বশাসক ও সুশাসক হইতে চাই, নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে চাই। প্রকৃতিস্থ মানুষের ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, সে আত্ম-নির্ভরশীল। শিশু টলিতে টলিতে চলিয়া বার বার পড়িয়া গেলেও সর্ব্বদা কোলে থাকিতে চায় না, নিজের সব কাজ অকাজ ত নিজে করেই, অধিকন্তু গৃহকর্ম্মও করিতে গিয়া পিতামাতা গুরুজনের কাজ এত বাড়াইয়া দেয় যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাহার কর্ম্মিষ্ঠতার সাময়িক কিছু হ্রাস কামনা করিতে বাধ্য হন। কোন মানুষের পক্ষেই সর্ব্বদা অপরের যত্ন পাওয়া, অন্যের নিকট হইতে সর্ব্বদা উপকার লাভ হিতকর ও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে শুধু যে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের, স্বাবলম্বী হইবার বাধা জন্মে তাহা নহে, ইহা দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব অপমানিত হয়। যে যে-পরিমাণ অক্ষম, সে সেই পরিমাণে অপরের নিকট হইতে যত্ন ও উপকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অল্পবয়স্ক ও অতিবৃদ্ধ মানুষদের পক্ষে ইহা আবশ্যক এবং তাহাতে তাহাদের কোন অপমান নাই। কিন্তু সমর্থ বয়সের সকল নরনারীর পক্ষে অন্যের যত্ন ও উপকার চাওয়া ও পাওয়া অপমানের বিষয়। ইহাতে তাহাদের মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা হয়।

"সুশাসন তাহাই, যাহা মানুষকে বাহিরে ও অন্তরে প্রকৃত মানুষ হইতে দেয় ও হইতে সাহায্য করে। পর-শাসন হাজার ভাল হইলেও সুশাসন নামের যোগ্য হইতে পারে না।"

কংগ্রেস হইতে উদ্ভূত স্বরাজ্যদলের কার্য্যকলাপকেও রামানন্দ সম্পাদকের শ্যেনদৃষ্টিতে পরখ করিতে লাগিলেন। বাংলার স্বরাজ্য দল কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট বা চুক্তি নিষ্পন্ন করে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে করা হইলেও উহা যে অচিরে জাতীয় ঐক্যের মূলেই আঘাত হানিবে এবং ক্রমে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিবে রামানন্দ পত্রিকা দুইখানিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া লেখেন।

রামানন্দ ছিলেন নির্ভীক। কখন কোন কারণে কাহারও নিকট মাথা নত করেন নাই। রাজদ্রোহে দণ্ডিত হইয়াও তিনি সত্য কথা বলিতে ভয় পান নাই। যে মানুষের নিজের ভিতর কোন পাপ নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করিয়াছেন। শুধু মন্দ যে করে না সে চরিত্রবান্—ইহা তিনি বলিতেন না, মন্দের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে এবং শুভকে যে আহ্বান করে সেই চরিত্রবান।

ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসী-দের মধ্যে স্থায়ী ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড শুধু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পৃথক নির্ব্বাচন চালু করার প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অবর্ণ হিন্দুদের জন্যও পৃথক নির্ব্বাচনের রায় দিলেন। এই শেষোক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৩ সনে যারবেদা জেলে বসিয়াই জীবনান্ত প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। তাঁহার দৃঢ়তা এবং সবর্ণ-

অবর্ণ হিন্দু নেতৃবর্গের ঐক্যমত দৃষ্টে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা তুলিয়া লইতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হন।

ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া 'হোয়াইট পেপার' বা শ্বেতপত্রের মাধ্যমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষে কতকগুলি মুসলমানপ্রধান প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব থাকে। সবচেয়ে মারাত্মক—পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে আইন-সভা গঠন। ইহার ফলে মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে স্থায়ীভাবে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপনের আয়োজন হয়। বাংলা এবং পঞ্জাবও এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়েরই কর্তৃত্বাধীনে আসিল। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি সম্মিলিত নির্ব্বাচন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইল।

রামানন্দ রাজনৈতিক দলের ঊর্দ্ধে থাকিলেও, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক ইহার পরোক্ষ সমর্থন জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐক্য তথা ভারতের সার্ব্বভৌমত্বের মূলে বিষম আঘাত হানিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইহার পর জাতীয়তাবাদে ও জাতীয়-ঐক্যে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টি গঠন করিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, নরসিংহ চিন্তামন্ কেল্‌কার এবং রামানন্দ স্বয়ং। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৪ সনে ভারতীয় আইন-সভার নূতন নির্ব্বাচনে বঙ্গদেশের যে পাঁচ জন হিন্দু সদস্য নির্ব্বাচিত হন তাঁহারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস জাতীয় দলভুক্ত। এই দলের নিখিল ভারতীয় সম্মেলন প্রথম হইল বোম্বাই এ ১৯৩৪ সনের ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন সুরু হইবার একদিন পূর্ব্বে ইহা শেষ হয়। এই প্রথম কংগ্রেস জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি হইলেন রামানন্দ। সম্মেলনের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবের মধ্যে পুরাপুরি বিধৃত হইয়াছে :

"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস নির্ব্বিচারে অসাম্প্রদায়িক সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং সমান নির্ব্বাচনাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনপ্রণালী গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এই সর্ত্তও পালিত হওয়া আবশ্যক যে, কোনও সম্প্রদায়কে ন্যায্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে না।"

(রামানন্দ, পৃঃ ২৩৭)

কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ-নীতি যে কতখানি ক্ষতিকর হইয়াছিল এখন আর তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভ্যু্র কথা বলিতে হইলে, এই কথাই বলিতে হইবে, শতাব্দীর আরম্ভাবধি ভারতবর্ষে জাতীয় তথা স্বরাজ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের দিগ্‌দর্শনরূপে ঐ পত্রিকা দুখানি কাজ করিয়াছে। ১৯৪২ সনের শেষে জরা আসিয়া রামানন্দকে আশ্রয় করে।

দেহ-মন তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। পর পর কয়েকটি শোকে তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"...আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনও করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে।"

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮)

কবিগুরু চলিয়া যাইবার দুই বৎসরের মধ্যেই ৩০শে জুন ১৯৪৩ সনে রামানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা বলিব তাঁহার কর্ম্মময় মহৎ জীবনের অবসান হইল।

এই সংখ্যাটি গ্রন্থন-কালে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-কৃত "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়" ও শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী-কৃত "রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" গ্রন্থ হইতে অনেক তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি

* * প্রয়াগ হইতে ১৩০৮ সালে "প্রবাসী" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমার বয়স ১১ কি ১২ বৎসর। প্রবাসী বাহির হইবার পাঁচ-ছয় মাস কি এক বৎসর পরে, ইহার প্রথম সংখ্যাখানি আমার হাতে কি করিয়া আসিয়া পড়ে। এখনও পর্য্যন্ত সেখানি আমি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। বেশ মনে পড়ে, ইহাতে প্রকাশিত অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ—কাহার লেখা, তাহার উল্লেখ নাই*—প্রাচীন ভারতের চিত্রে ধৃত কল্পলোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। প্রথম-প্রথম কয়েক বৎসর 'প্রবাসী' নিয়মিত পড়িতে পাইতাম না; কিন্তু এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সদস্য হইলাম, তখন ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারে নিয়মিত 'প্রবাসী' পাঠ করিবার সুবিধা হইল। এখন এই ঘটনার প্রায় ৪০ বৎসর পরে, অতীত জীবনের কৈশোর ও যৌবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং নিজ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—সাহিত্যের অমৃত রসের দ্বারা চিত্তের প্রসারণে ও পরিপোষণে 'প্রবাসী' পত্রিকা হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তেমন বোধ হয় অতি অল্প কয়েকটি বস্তু ছাড়া আর কিছু হইতে লাভ করিতে পারি নাই। 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'বান্ধব', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার পরে, এই গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র যুগই চলিয়া আসিয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে "নারায়ণ", "সবুজপত্র", "মানসী ও মর্ম্মবাণী" প্রভৃতি বিভিন্নধর্ম্মী কয়েকটি পত্র-পত্রিকার উদয় ও অস্তগমন ঘটিয়াছে; কিন্তু 'প্রবাসী' যেন এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মত বাঙালীর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। "প্রবাসী"র এই সম্মাননীয় প্রতিষ্ঠা যে রামানন্দবাবুর ব্যক্তিত্বের কল্যাণেই ঘটিয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। "প্রবাসী" ও পরে ইহার সঙ্গে-সঙ্গে 'মডার্ণ রিভিউ,' এই পত্রিকা দুইটি সারা বাঙ্গালা দেশের ও ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। তাহার মূলে ছিল রামানন্দবাবুর সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার সহজ সাহিত্য-বুদ্ধি এবং তাঁহার নির্ভীক দেশসেবা। তিনি উচ্চশিক্ষিত শিক্ষাব্রতী অবস্থায় মাসিকপত্র সঞ্চালনের ভার গ্রহণ করেন; শিক্ষার সহিত তাঁহার প্রথম জীবনে যে যোগ ছিল তাহাতে শিক্ষকের প্রাপ্য মর্য্যাদা তিনি নিজ পাণ্ডিত্য ও চারিত্র্যগুণে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন পত্রিকা-সম্পাদকত্ব বরণ করিয়া লইলেন তখন সেই মর্য্যাদা তাঁহার আসনকে মহীয়ান করিয়া রাখিল—সমাজচক্ষে একাধারে তাঁহার স্থান হইল শিক্ষা-গুরুর এবং সাহিত্যিকের, চিন্তানায়কের এবং রস-পরিবেশকের। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে রসস্রষ্টা বলিলে যাহা বোঝায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরূপটি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনের সমালোচক, জনগণের ও শাসকবর্গের বিবেকের উদ্বোধক; তবে পত্রিকা-সম্পাদকের কাজে তাঁহার মত শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তির আগমনে

---

* প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।

বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে নূতন সাড়া পড়িয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাগ্রহ সহযোগিতা, প্রথম হইতেই নিজ ব্যক্তিত্বের বলেই তিনি পাইলেন; 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইহা বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনীষার সর্ব্বপ্রধান প্রকাশভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে 'প্রবাসী'র মধ্যে স্থান পাওয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে to be a peer of the Gods-এর মত সমস্ত উদীয়মান সাহিত্যিকের কাম্য হইল। কলেজে পড়িবার কালে এবং তাহার পরে বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা 'প্রবাসী'র মাধ্যমেই পাইতাম; সাহিত্য-সম্রাট-রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান দর্শন-ঝরোখা ছিল 'প্রবাসী'র পত্র, সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকগণ সেখানেই মাসের পর মাস নিয়মিত ভাবে তাঁহার রচনার দর্শন পাইত। শুধু রবীন্দ্রনাথ নহে; বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রস সাহিত্যের সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ লেখকগণও এইরূপে যথাসম্ভব নিয়মিত 'প্রবাসী'তে প্রকট হইতেন। 'প্রবাসী'র সহায়তায় এই যুগের বহু প্রথিতনামা লেখক বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমরা যাহারা লেখক ছিলাম না, আগ্রহবান্ পাঠক ছিলাম, আমরা মাসের পর মাস উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতাম, কবে মাস-পয়লা হইবে, 'প্রবাসী' দেখিতে পাইব। সে আগ্রহ ভুলিবার নহে। ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারে আমরা সকাল-সকাল আসিয়া উপস্থিত হইতাম। গ্রন্থাগারের খাতায় জমা হইলেই এবং 'প্রবাসী'তে ইনষ্টিটিউটের রবারের শীল-মোহরের ছাপ পড়িলেই, অপেক্ষমান তিন-চারিজনের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। যিনি প্রথম দখল করিতেন, সেদিনের মত তিনি 'প্রবাসী' ছাড়িতেন না; প্রথমেই ধরিতেন ধারাবাহিক গল্প রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিম্বা প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী,' তার পরে নানা তথ্যপূর্ণ বা বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ ত আছে, ছোট গল্প আছে এবং রামানন্দবাবুর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' আছে; কিছুই বাদ যাইত না। আর সকলে হতাশ হইয়া একবার 'প্রবাসী'খানি চাহিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতাম, প্রথম দখলকার ঔদার্য্যের সঙ্গে আমাদের দেখিতে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিবিধার্থ সংগ্রহ পড়িতেন এবং বঙ্গদর্শনের জন্য পথ চাহিয়া থাকিতেন, আমাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তদপেক্ষা কম ছিল না। ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ'-এর জন্যও আমাদের এইরূপই আগ্রহ হইত, এবং 'মডার্ণ রিভিউ'র চাহিদা কিছু কম ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইবার পরে দক্ষিণের তেলুগু তামিল মারাঠী যুবকদের কাছে শুনিয়াছি, কাশীর সাধারণ পাঠাগারে কারমাইকেল লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি, এলাহাবাদের, লাহোরের কলেজের ছাত্রদের কাছেও জানিয়াছি, 'মডার্ণ রিভিউ'-র জন্য শিক্ষিত জনগণের আগ্রহ সেই রকমই ছিল—এবং এখনও বহুল পরিমাণেই আছে।

বৎসরের পর বৎসর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র বিভিন্ন মাসের সংখ্যা ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের তথা ভারতবর্ষের এই ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে পারা যাইবে; এইরূপ ইতিহাস লিখিতে হইলে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র ফাইল বা পূর্ব্বাপর সংগ্রহ অপরিহার্য্য হইবে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিতে 'প্রবাসী'র কার্য্য সম্বন্ধে আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি লিখিবেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' আরও দুই-তিনটি কাজ হাতে লইয়া ও সেগুলিতে আত্মনিয়োজিত হইয়া, আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে ও প্রবর্দ্ধন করিতে এবং আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও সংহতি-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে সমগ্র ভারতীয় জনগণের যে উপকার করিয়াছে, তাহা আর কোনও পত্র-পত্রিকার অথবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করার সৌভাগ্য হয় নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার কঠিন সংঘাতে আমাদের শিক্ষিত জন আপনার অজ্ঞাতসারে নিজ সংস্কৃতির মৌলিক প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, নিজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে যে সত্যকার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল, একদেশদর্শী বিদেশী সভ্যতার ও দৃষ্টিভঙ্গির মোহে পড়িয়া সে উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে

পরিচয়ের ফলে, একদিকে স্বদেশে ও বিদেশে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ জোরের সঙ্গেই চলিতে থাকায়, এবং স্বদেশে মধ্যযুগের ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে নূতন করিয়া আমাদের পরিচয় ঘটিতে থাকায়, ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের কাছে কোনও কোনও বিষয়ে আদর্শ বলিয়া আদরণীয় হয় এবং আমাদের সাহিত্যের সত্যকার মূল্য যাচাই করিবার কষ্টিপাথররূপে কার্য্যকর হয়; ইহাতে আমরা সাহিত্য বিষয়ে শীঘ্রই অর্থাৎ বিগত শকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে, বিশেষ করিয়া ইহার চতুর্থ পাদে, স্বরাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হই. আমাদের দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য চেষ্টার মূল্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হই, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীনের যোগ বা পারম্পর্য্য রক্ষা সম্বন্ধে কতকটা অবহিত হই—আধুনিকতাকে বর্জ্জন করিয়া নহে, বরং যথাসাধ্য আমাদের জীবন-প্রবাহের উপযোগী করিয়া লইয়া। সাহিত্য বিষয়ে এই emancipation বা নিষ্কৃতির ফলে আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একজন বঙ্কিমচন্দ্র, একজন মধুসূদন ও একজন রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি।

সাহিত্য ভিন্ন অন্য প্রকাশাত্মক কলার মধ্যে সঙ্গীতে বিশ্বমানব সমক্ষে আমরা এখনও তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই, যদিও আমাদের সঙ্গীতে নিজ বিশিষ্ট পথে 'স্বেমহিম্নি' আপন বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের নিজের ইতিহাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী লক্ষণীয় নবীন বিকাশ ঘটিয়াছে। উত্তর-ভারতের তানসেন কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে যাহার গৌরব বর্দ্ধিতহই য়াছিল, সেই 'ধ্রুপদ' সঙ্গীত, দক্ষিণ-ভারতের ত্যাগরাগ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত 'কীর্ত্তনম্' সঙ্গীত· বাঙলা দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত 'কীর্ত্তন', পাঞ্জাবের শোরী মিয়াঁর 'টপ্পা', মধ্যভারতের গায়কদের 'দাদ্রা,'—অতীত যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের এই সব বিভিন্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের বাঙলা সুর এবং রীতিকেও ধরিতে হয়। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গীতের harmony অর্থাৎ বিবাদীর আধারে গঠিত সংবাদী রীতি আমরা এখনও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া, আমাদের সঙ্গীত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের composition বা কৃতির পাশে স্থান করিয়া লইতে পারিতেছে না; অদূর ভবিষ্যতে যিনি ইউরোপের harmony ভারতীয় সঙ্গীতে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারিবেন, তিনি যে এ বিষয়ে যুগ প্রবর্ত্তক হইবেন, সন্দেহ নাই; × ×

রূপ-শিল্পে ইংরেজের ছোঁয়াচে পড়িয়া আমরা একেবারে রসবোধ-হীন দৃষ্টিশক্তি-হীন বর্ব্বর বনিয়া যাইতেছিলাম; ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজী শিল্পের ও শিল্প বিষয়ে ধারণার প্রভাবে পড়িয়া গিয়া, আমরা রূপ দেখিবার মত চোখ এবং রূপ ধরিয়া রাখিবার মত হাত দুই-ই হারাইয়া ফেলিতে-ছিলাম। × × ভারতীয় শিল্পের প্রতি আমরা তাকাই নাই, তাকাইবার অবকাশ ও সুযোগ দুই-ই ছিল না। আমরা অজ্ঞ, রসহীন এবং অনুভূতিহীন ইংরেজ শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া, উৎসাহের সঙ্গে বড় গলা করিয়া বলিতেছিলাম—ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প জানিত না, তাহারা এতাবৎ যাহা করিয়াছে, তাহা, সত্য কথা বলিতে গেলে আদিম জাতিরই মতন, শিশুচেষ্টিতের মতন, প্রৌঢ় সুসভ্য জাতির উপযুক্ত শিল্প তাহা নহে। 'প্রবাসী' প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে কতগুলি জিনিষ দেখা দিল। সেগুলির ফলে ভারতে জাতীয় শিল্প বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া গেল, ভারতীয় শিল্পেতিহাসের ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন করিয়া এক অভিনব শিল্প রচনার ধারা প্রবর্ত্তিত হইল,—আমরা শিল্প বিষয়ে আবার জাতীয় প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম, ভারত শিল্পের এক নবযুগ আরম্ভ হইল। তখন এদিকে শিল্পকলাবিৎ রসিকের চোখে দেখিবার লোক খুব কমই ছিল, বেশীর ভাগ লোকই—ইঁহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ-যুক্ত বুদ্ধিমান্ লোকও অনেক ছিলেন—এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং নূতন শিল্পবিষয়ক জাগৃতির ও শিল্পপ্রচেষ্টার বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সবল ও দৃঢ় দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সহজ ও সুবুদ্ধিযুক্ত রসবোধ প্রথম হইতেই এই নবীন শিল্পের অনুকূলে নিজ মত এবং কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' উভয় পত্র, বহু-বর্ণ চিত্রের নিয়মিত প্রকাশ দ্বারা ও এই জাতীয় চিত্রের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী এবং প্রবন্ধ দ্বারা, ভারতের পুনরু-

জীবিত চিত্রকলার সাদর আহ্বান করিয়াছিল, এবং সোৎসাহে প্রচারের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে অমূল্য সহায়তা করিয়াছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত চিত্রাবলী পৃথক আকারে Chatterjee's Picture Albums-এর আঠারোটি খণ্ড এই নবীন চিত্রকলার classic বা প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ রচনার প্রকাশক স্বরূপ হইয়া আছে। ইহার জন্ম ভারতীয় ও বৈদেশিক কলারসিক এবং নবীন চিত্রকর-গোষ্ঠীর চিত্রকরেরা উভয়েই রামানন্দ-বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

পনেরোর ও ষোলোর শতকে যখন পর্তুগীজেরা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিতে চাহিল, ইতালীয় নাবিক কলম্বাসের নেতৃত্বে স্পেনীয়েরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল, পোর্তুগীজ নাবাঙ্ক্যক্ষ ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিলেন, তখন ইউরোপের কতকগুলি কর্ম্মীজাতির লোকেরা সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাহির হইল। *** ষোলোর, সতেরোর ও আঠারোর শতক—এই তিনশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয়দের অবাধ ধন সংগ্রহ চলিল।... কল্পতরু এশিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি দোহন যখন চলিতেছে তখন ইউরোপের...তত্ত্বান্বেষীরা চাহিলেন এশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা দর্শন আদির ভাণ্ডার খুলিয়া দেখিতে—আর্থিক সমৃদ্ধির পিছনে তাঁহারা মানসিক ও পারমার্থিক সম্পদের কথা ভাবিলেন।...ভারতের হিন্দু জগতের, ইস্লামীয় জগতের এবং চীনা জগতের ভাব-সম্পদ শতবর্ষের মধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতদের দ্বারা বিশ্বমানব সংস্কৃতির সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

বাকি রহিল প্রাচ্যের রূপকলা; তাহারও প্রতি বিশ্বরুর বা সর্ব্বগ্রাহী সুসভ্য পাশ্চাত্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, উনিশের শতকের শেষপাদে;...বিংশ শতকের প্রারম্ভে জাপানীদের ও পরে চীনাদের চোখ খুলিল, তাহারা নিজ প্রাচীন শিল্পের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল। এ বিষয়ে তাহারা প্রথম ইউরোপীয়দের মুখেই ঝাল খাইয়াছিল। জাপানে, আমেরিকার চীন-জাপান-শিল্প কলাবিৎ পণ্ডিত ফেয়েনোসার বন্ধু কাকুজো ওকাকুরার চেষ্টায়, নিপ্পোঙ-বিজিৎসু-ইঙ নামে জাপানে স্বদেশীয় শিল্পের অনুরাগীদের একটি পরিষৎ স্থাপিত হইল, এই পরিষদের চেষ্টায় জাপানে শিল্পবোধ সম্বন্ধে একটা যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে।...ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পের কতকগুলি ইউরোপীয় অনুরাগী এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺গগনেন্দ্রনাথ ও অন্য কয়জন উচ্চ সংস্কৃতিযুক্ত ভারতীয় শিল্পের চর্চ্চায় সমবেত হইলেন; (ইঁহাদের সঙ্গে) হাইকোর্টের জজ স্যর জন উডরফ সুইডেন হইতে আগত হালমার পন্টেন-মোলর প্রভৃতি মিলিয়া Indian Society of Oriental Art স্থাপন করিলেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে।* অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পাইল। তিনি আর্ট স্কুলে নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার—প্রভৃতি ছাত্রদের লইয়া, আধুনিক ভারতে চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন করিলেন।

...ইতিপূর্ব্বে গুণগ্রাহী হাভেল সাহেব আর্ট স্কুলের চিত্র সংগ্রহে অবনীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কয়খানি চিত্র টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন—ভারতের শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এই ছবি কয়খানির মূল্য অসাধারণ—"বুদ্ধ ও সুজাতা," "অভিসারিকা" ও "মেঘবিহারীসিদ্ধদ্বন্দ্ব"...এগুলি কাগজে আঁকা। ...১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে হাবেল সাহেব লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্পকলা বিষয়ক পত্রিকা Stud o-তে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান রঙ্গীন ও অন্য ছবি দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন;† ...

এমন সময়ে ১৯০৭ সালের গোড়া হইতে রামানন্দ

* Art Society প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই ১৩০৯ সনে মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবাসীতে 'সুজাতা ও বুদ্ধ' এবং বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতীর প্রতিলিপি বাহির হয়।

† তৎপূর্ব্বেই ১৩০৯ সনের ভাদ্র মাসে প্রবাসীতে রামানন্দ-বাবু লেখেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। তাঁহার কয়েকখানি চিত্র শীঘ্রই বিলাতের Studio পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

চট্টোপাধ্যায় 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম হইতেই রামানন্দবাবু প্রাণ দিয়া এই নবীন শিল্প প্রচেষ্টায় আমরাই বা এক পথের পথিক হইয়া, দেশমধ্যে ইহার প্রচারের ভার লইলেন। ইহাতে তাঁহার লাভ কিছুই ছিল না; মূর্খ ও অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট তিনি এইজন্য অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এইভাবে ভারতের সংস্কৃতির এই অভিনব ও যুগোপযোগী কলাময় প্রকাশের অকারণ মিত্র ও পৃষ্ঠপোষকরূপে ছিলেন। এইভাবে শিল্প বিষয়ে তিনি যে গঠনমূলক কাজ করিয়া গেলেন তাহা অমূল্য। (১৯০২ হইতে প্রবাসীতে) এবং ১৯০৭ হইতে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে মাসের পর মাস ধরিয়া অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের চিত্র ত্রিবর্ণ ব্লকে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন।...ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে রামানন্দবাবু সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন ভগিনী নিবেদিতার এবং শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার স্বামীর। প্রথমে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশের শিল্প-রসিকম্মন্য ব্যক্তিগণ,...এই সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শিল্পের হাওয়া বহিতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের মনের ভিতরে অস্বস্তি আনিয়া দিল। ...কিন্তু ধীরে ধীরে শিল্পকলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল,...যখন দেখিলাম সারা বিশ্বে ইহার জয়গান হইতেছে, তখন আমাদের পূর্ব্বশিক্ষার উপযোগিতা বা মূল্য সম্বন্ধে আমরা একটু সন্দিহান হইতে লাগিলাম। এইভাবে, মুখ্যতঃ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর মারফৎ রামানন্দবাবুর প্রসাদে, বাঙ্গালী ও ভারতবাসী স্বদেশে শিল্পকলার—চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের—পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইল।

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ কর্ত্তৃক এইভাবে চিত্রময় প্রচারের মাধ্যমে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভারতশিল্পের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের মত দুই দশজনের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ও আনন্দের সংবাদ হইয়াছিল।......বোধ হয় ১৯০৪ সালের শীতকাল, Y. M. C. A. Boys Branch-এর পরিচালক পাদ্রি Arthur Lefevre সাহেব আমাদের একদিন আর্ট স্কুলের ছবি সংগ্রহ দেখাইতে লইয়া যান। ...আর্ট স্কুলে তখন হাভেল সাহেবের সংগৃহীত মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলী দেখিলাম, অবনীন্দ্রবাবুর ছবি কয়খানি দেখিলাম। যেন নূতন এক কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ......এই সব ছবির সুন্দর-সুন্দর রঙীন প্রতিলিপি সহজ-লভ্য হইতে পারিবে, এরূপ চিন্তা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু যখন অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলি একে একে রামানন্দবাবু তাঁহার পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার আনন্দ ও পুলক বর্ণনার নহে।

...রামানন্দবাবুর এই সৎকার্য্য তাঁহার অজ্ঞাতে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ও আনন্দবিধানে কতটা সাহায্য করিয়াছিল তাহার একটু আভাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। সোসাইটি ও আর্ট স্কুলের আনীত এই শিল্পবিষয়ক জাগৃতির সহিত রামানন্দবাবুর সহযোগিতার ফল এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ভারতীয় শিল্পের জয়জয়কার এখন ভারতময় সর্ব্বত্র। বাঙ্গালা দেশে এই শিল্পের উৎস ছিল বলিয়া, বাঙ্গালা এখন শিল্প-বিষয়ে প্রায় সারা ভারতে পথিকৃতের সম্মান পাইতেছে, বাঙ্গালীকে আধুনিক ভারতের শিল্পগুরু বলা অসঙ্গত হইবে না। ...এ বিষয়ে রামানন্দবাবুর সহজ সুবুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া, ভারত-শিল্প তাহার যোগ্য মর্য্যাদা পাইতে পারিয়াছে। Nation-building বা সংগঠনকার্য্যে রামানন্দবাবুর এই সহায়তা যেন আমরা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণে রাখি—ভারতীয় শিল্পের কৃতী সন্তানগণের এবিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত হওয়া উচিত।...

রামানন্দবাবু প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ আরম্ভ করিয়াছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির একজন উদ্যোগী পরিপোষক রূপে —ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় জাতীয়তার 'যোগ' অর্থাৎ ইহার পরিবর্দ্ধন এবং 'ক্ষেম' অর্থাৎ ইহার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ বস্তুর সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁহার অনুপ্রাণনা। ইহার অতিরিক্ত তিনি সত্যের এবং ন্যায়ের উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই সত্যাগ্রহ ও ন্যায়-নিষ্ঠাই তাঁহার জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। তিনি প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও

Modern Review-এর Notes শীর্ষক অংশে নিয়মিত ভাবে ভারত ও বাঙ্গলা দেশের ঘটনা ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতেন, এবং নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাহিত্যে এই বিবিধ প্রসঙ্গ ও Notes একটি মস্ত বড় স্থান—এবং সম্মাননীয় স্থান—পাইয়া আছে। তাঁহার আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ্য এবং স্বাধীনতা; এই আদর্শের আবাহনে তিনি অনুচিত ভাষায় লঘুতা বা উম্মা প্রকাশ না করিয়া, কেবল তথ্য ও যুক্তি দ্বারা ভারতের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের কথায় আলোকপাত করিতেন, এবং ভারত সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের খণ্ডন করিতেন। সত্য ও ন্যায়ের সেবক হিসাবে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের প্রতি তাঁহার দরদ যে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক; এবং এই দরদের তিনি শেষে ধীরে ধীরে ভারতের স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ আদর্শগত ঐক্যমত বজায় রাখিয়া, হিন্দুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার এবং হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের হানির বা বিলোপের চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হিন্দু মহাসভার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের ছেলে রামানন্দ বাবু উপবীত ত্যাগ করিয়া যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, প্রচলিত "সনাতন" হিন্দু ধর্ম্ম ও তাহার অনুমোদিত প্রতীকের মাধ্যমে, পূজাদি উপাসনায় অনুষ্ঠান তাঁহার মনোভাবের অনুকূল ছিল না বলিয়া। এরূপ ক্ষেত্রে রুচির স্বস্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলে যাহা অনেক সময় ঘটিয়া থাকে দেখা যায়, রামানন্দবাবুর মনে সেরূপ কোনও গোঁড়ামি বা superiority complex অর্থাৎ আত্মগৌরবের গূঢ়েষণা দেখা যায় নাই। একদিকে হিন্দু মহাসভার দ্বারা গৃহীত 'হিন্দু' নামের সর্ব্বঙ্কর সংজ্ঞা, ওদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সুযুক্তিপূর্ণ নির্দ্দেশ যে ব্রাহ্মসমাজ বিরাট্ হিন্দুসমাজেরই এক অচ্ছেদ্য অংশ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবুর মনে হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু কৃতিত্বের প্রতি সত্যনিষ্ঠ, ঐতিহাসিকতা-বোধযুক্ত শ্রদ্ধা; তাহার উপরে একদিকে ভেদনীতিমূলক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুসলমান-প্রীতির উদ্দেশ্যে হিন্দু-দলন রীতি, মুসলমান-সমাজের একটি মুখর অংশের হিন্দু-বিরোধী মনোভাব, এবং হিন্দুদের মধ্যে সংহতি শক্তির অভাবে রাষ্ট্রের এককতার পক্ষে প্রতিকূল এই-সব শক্তির সমক্ষে অসহায়তা; এই সব দেখিয়া, কর্ম্মী ও বস্তুতান্ত্রিক রামানন্দবাবু কেবল গগন-বিহারী আদর্শের বুলি আওড়াইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই; হিন্দু মহাসভার সহিত সহযোগিতা করা ছাড়া তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে আর কিছুই সম্ভবপর ছিল না; তিনি হিন্দু জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ আপৎকালে 'দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে' বলিয়া, সরিয়া দাঁড়াইবার লোক ছিলেন না; 'হরিণ জগত বৈরী আপনার মাসে', বাঙ্গালা দেশে হিন্দু হিন্দুকে রক্ষা করিতে চাহে না, হিন্দুর হইয়া একটা কথা বলিবার কেহ নাই, সকলেই উদার-হৃদয়, মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায়; এ অবস্থা দুঃস্থের প্রতি দরদী রামানন্দবাবুর সহ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র মত দুইখানি প্রভাবশালী কাগজে রামানন্দবাবুর মত কর্ম্মী ও মনীষীর পূরা সহযোগ পাইয়া, আরও শক্তিশালী হইল; দুই-চারিজন অদূরদর্শী অন্ধ-মতের রাজনৈতিক ইহা দেখিয়া খুশী হন নাই, কিন্তু রামানন্দবাবু নিজে ইহাতে সৎকর্ম্মের ফল মানসিক শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছিলেন, এবং হিন্দু-মহাসভার মাধ্যমে, ন্যায় ও সত্যের পথে আরও উৎসাহের সহিত দেশের সেবা করিয়াছিলেন। হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ, এবং সাধারণ্যে তাঁহার কার্য্যাবলী, তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। এখানে কর্ত্তব্যের সঙ্গে বিশেষ গঞ্জনা ও ভীতির সমাবেশ ছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিরোধ-শক্তি আরও কার্য্যকরী হইয়াছিল। মধ্যে কংগ্রেসের পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই মোসলেম লীগ প্রমুখ ভেদনীতিমূলক মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের খুশী রাখিবার আশায়, হিন্দুর প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, হিন্দুর 'বোটি বেটি রোটি'-র প্রতিকূলে অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, হিন্দু নারীর মর্য্যাদা, এবং হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন।

ইহার ফলে, একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ক্লৈব্য আসিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিতেছিল। ইহার প্রতিকার করা স্বরাজসাধনের পথেরই একটি অবশ্যপালনীয় অঙ্গ বলিয়া রামানন্দবাবুর নিকট প্রতিভাত হয়। বিগত কয় বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র সম্পাদকীয় টিপ্পনী এবং বিভিন্ন লেখকের ও স্বয়ং রামানন্দবাবুর প্রবন্ধ হিন্দু মহাসভার সময়োপযোগিতা ও সার্থকতার একটা অকাট্য প্রমাণরূপে ঐতিহাসিক নথীপত্রের ভাণ্ডারে চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দু মহাসভার কার্য্য সম্পর্কে রামানন্দবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ডাক্তার মুঞ্জে ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক দামোদর সাবরকর প্রমুখ মহাসভার নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে যে কতটা আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা দেখিবার মত ছিল। তিনি কেবল হিন্দু মহাসভার নেতাদের নহে—সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেশহিতৈষী ও কর্ম্মীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। হিন্দু মহাসভার ময়মনসিংহ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেখানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি হইয়া যান, অবস্থাগতিকে আমাকেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেখানে হিন্দু মহাসভা বিরোধীদল, দুই একটি বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া মহাসভার অধিবেশন পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামানন্দবাবুর সুযুক্তি তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য ছিল —এমন কি সেখানে মারামারিরও সম্ভাবনা ছিল; প্রবীণ রামানন্দবাবুর শান্ত ও ধৈর্য্যপূর্ণ সাহস সেদিন আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রসংসাপূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৫ সালে সুরাটে নিখিল ভারতীয় হিন্দু-মহাসভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হইয়া রামানন্দবাবু সুরাটে যান। (সেই সময়) তাঁহার সঙ্গে একত্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, হিন্দুমিশনের শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ ...এবং আমার।...হিন্দুমহাসভার সভাপতি বলিয়া সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে রামানন্দবাবুর বিপুল সম্বর্দ্ধনা দেখি। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং পত্রিকা মারফৎ তাঁহার দেশসেবার সর্বজন স্বীকৃত খ্যাতি, সেবারের হিন্দুমহাসভার অধিবেশনকে বিশেষ একটা মর্য্যাদা দিয়াছিল। রামানন্দবাবু সুরাত ভ্রমণের এবং আমেদাবাদে অবস্থানের ও আবু পাহাড়ের জৈনমন্দির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নিজ নিষ্কলুষ ও সত্যনিষ্ঠ জীবনে স্বনির্ব্বাচিত সাংবাদিক ও পত্রিকা-পরিচালকের পথে অতন্দ্র ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা-দ্বারা সমগ্র দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের হার্দ্দিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এখন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন নিজ জীবনের অবদান, নিজ আদর্শের মহত্ব, নিজ কর্ম্মের সার্থকতা; রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্মৃতি, এবং উন্নত ও কৃতকার্য্য সাহিত্যিকের ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দীর মাধ্যমে তাঁহার বাণী তিনি দেশবাসীর নিকট এতদিন ধরিয়া শুনাইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুধী সাংবাদিক রামানন্দ

ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসের আলোকে যে কয়জন সাংবাদিক পুরোধার নাম আমাদের মনে সর্বপ্রথম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মধ্যে স্বর্গত সুধী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম শুধু অন্যতম নয়, সবিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একাধারে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী সাময়িক পত্রের সার্থক সম্পাদনার কৃতিত্ব বোধ হয় একমাত্র রামানন্দবাবুরই প্রাপ্য এবং তাঁর পরিচালিত ও সম্পাদিত ইংরাজী মাসিক পত্র 'মডার্ণ রিভিয়্যু' যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল আজ তা এই স্বনাম-ধন্য সম্পাদকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিংশ শতাব্দীর একেবারে সুরুতে মাসিক প্রবাসী প্রকাশ আরম্ভের পর থেকেই বাঙালী পাঠক-সমাজের মধ্যে একটা আনন্দের আলোড়ন দেখা দেয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সময় সম্পাদক রামানন্দের সাহস, ক্ষমতা, নানা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় পেয়ে প্রবাসীর আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাঙলা দেশে এমন একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করা ও জনপ্রিয় করে তোলা যে সম্ভব তা ভেবে রবীন্দ্রনাথ সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রবাসীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ছয় সাত বছর পরেই রামানন্দবাবু তাঁর বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'মডার্ণ রিভিয়্যু' প্রকাশ করলেন। শুধু উৎসাহিত হয়েই নয়, নিছক অর্থলাভের জন্যও নয়—আসল উদ্দেশ্য পরাধীন ভারতের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগের কথা নানা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। সে উদ্দেশ্য তাঁর সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়েছিল।

সত্যনিষ্ঠ সংবাদ এবং যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য—এই ছিল রামানন্দবাবুর সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। এবং সৎ সাংবাদিকতার এই আদর্শ থেকে তিনি কোনোদিন বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি, এই হলো তাঁর জীবন থেকে ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের গ্রহণীয় সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা।

মূলতঃ অমলিন সত্যনিষ্ঠা এবং অকাট্য যুক্তিনিষ্ঠার জন্যই 'মডার্ণ রিভিয়্যু' মাসিক পাত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরাধীন ভারতের সেই যুগে তেমন স্বীকৃতি পাওয়া খুব সহজ ছিল না। বিদেশী সংবাদপত্রে বিশেষ করে বিলেতী পত্র-পত্রিকায় তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা হতো এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাঁর মন্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করতেন সেইসব যুক্তিজাল খণ্ডন করা সম্ভব হতো না বলেই।

এমনি একজন সাংবাদিক প্রবরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল, সেদিক থেকে আমরা সৌভাগ্যবান। আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রশ্নে তো বটেই, সমাজ সংস্কারে, নারী শিক্ষার প্রসারে, পল্লী উন্নয়নে এবং অন্যান্য নানা জাতীয় সমস্যার সমাধানে রামানন্দবাবু সব সময়েই যুক্তিপূর্ণভাবে খোলাখুলি আলোচনা করতেন, কখনো কোনো অবাঞ্ছিত কঠোর শব্দ ব্যবহার করতেন না। যুক্তি যেখানে জোরালো সেখানে শব্দের নিষ্ঠুরতায় সমস্যার জটিলতাকে বৃদ্ধি করতে যাওয়া কেন? তাই সমস্ত ব্যাপারেই তিনি ভাষার শালীনতা ও সৌজন্য রক্ষা করে যুক্তির ও ন্যায়ের প্রশস্ত পথ ধরে অগ্রসর হতেন। এমনি ভাবেই প্রতিপক্ষেরও তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হতেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের আনন্দও পেতেন। তাঁর পরিচালিত মাসিক পত্রিকা কয়খানিতে কখনো কোনোরূপ কুরুচি প্রশ্রয় পেতো না, সেও একটা বড়ো কথা এবং খুবই আনন্দের বিষয় যে সে ঐতিহ্য আজও রক্ষিত হয়ে আসছে।

সময় সময় ভাবাবেগের প্রয়োজন দেখা দিলেও সাংবাদিকতায় মূল বক্তব্যই বড়ো কথা। রামানন্দবাবু সব সময়েই অতি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মূল বক্তব্যকে শাসক-শ্রেণী এবং দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন এবং সেই সব বক্তব্য সপ্রমাণে এমন সব নির্ভুল তথ্যাদি পরিবেশন করতেন যা খণ্ডন করার সাহস কারুরই বড়ো একটা হতো না। কোনো বিষয়ে কলম ধরবার আগে সে বিষয়ে সর্বরকমের তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে যুক্তি বিন্যাস করলেই সে আলোচনা যে ফলপ্রসূ হয়, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। রামানন্দবাবুর সমস্ত মন্তব্যই হতো অত্যন্ত তথ্য-নির্ভর, কাজেই প্রতিবাদেরও কোনো সুযোগ থাকতো না। আর তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে এবং তার জন্য অনেক সময় তাঁকে খুব বেশী পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ও করতে হতো। একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে তিনি কোনো তথ্যই প্রকাশ করতেন না এবং তার ওপর মন্তব্য করার কথাও চিন্তা করতেন না। একালের এবং ভবিষ্যতের সাংবাদিকদের কাছে এ দিক থেকেও রামানন্দবাবু একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

যে ধরনের সৎ সাংবাদিকতায় রামানন্দবাবু অভ্যস্ত ছিলেন তার আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। উদ্ধৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ছাড়া তিনি কখনো কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি হিসেব রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তৎকালীন সম্পাদক মতিলাল ঘোষ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখায় 'প্রবাসী'র উল্লেখ না থাকায় সম্পাদক মহাশয় সে বিষয়ে একটি অভিযোগ-পত্র পাঠিয়েছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের কাছে। সবিনয়ে সেই অভিযোগের যে উত্তর মতিলালবাবু সেদিন দিয়েছিলেন আজও তা' আমার মনে আছে এবং সে কথার উল্লেখ করেই মহান্ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। অভিযোগের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, উদ্ধৃতির সূত্র যেখানে সরকারী এবং কোনো ভাব গ্রহণ করা হয় নি যেখানে, সেখানে পৃথকভাবে স্বীকৃতির কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবুও এমনি অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন সত্যি-সত্যিই তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

বাস্তবিকই রামানন্দবাবুর মত সৎ সাংবাদিক এবং সৎ মানুষ সব দেশেই দুর্লভ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

ভারতীয় চিত্রকলায় নব-আন্দোলন

এই শতকের আরম্ভে, হাভেল্ সাহেবের প্রেরণায় আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের নূতন পদ্ধতির চিত্রকলার সূত্রপাত করেন। ভারতের মধ্যযুগের চিত্রশৈলীর ধারা অনুসরণ করে রাজপুৎ, মুঘল ও পাহাড়ী-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিচক্ষণরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী—এক নূতন চিত্র পদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন যাহার মধ্যে প্রাচীন ভারতের চিত্র পদ্ধতি আর এক নবজীবন লাভ করিল। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির চিত্রশৈলী নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহার মধ্যে আধুনিক জীবনের উপযোগী ভাষা রচনার বীজ ও উপকরণ বিদ্যমান আছে। একদিকে অবনীন্দ্রনাথ মুঘল ও রাজপুৎ চিত্রের ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ধারার চিত্র পদ্ধতি হইতে—নূতন বিকাশের পথে, এক নূতন রীতির ভাষার সৃষ্টি করিলেন —যাহার মধ্যে মুঘলাই চিত্রশৈলী আর এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল, মুঘল কলমের রীতি পদ্ধতি যে নূতন পথে অগ্রসর করিল তাহা প্রাচীন ধারার অন্ধ অনুকরণ নহে, পরন্তু মুঘল পদ্ধতির আর এক নূতন পরিণতি। "উমর খায়েমের" কবিতার নূতন চিত্র-মালায় অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন মুঘল পদ্ধতির চিত্রশৈলীকে জীবন্ত করিয়া—বর্ত্তমান যুগের উপযোগী এক নবীন চিত্রকলার ভাষাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। এই পথে তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল "ঔরঙ্গজেব দারার মুণ্ড দেখিতেছেন।" এই বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রটি ১৯০৫ সালে স্টুডিও পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রথম "উমর খায়েমের" চিত্র হাভেল সাহেবের "ইণ্ডিয়ান পেন্টিং এণ্ড স্কাল্পচার" পুস্তকে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রচিত হয় "মৃত্যু-শয্যায় শাজাহান"। এই চিত্র দিল্লীর দরবারের প্রদর্শনীতে ১৯০৩ সালে একটি প্রশংসার পদক লাভ করে। এই চিত্রে প্রাচীন মুঘলাই কলমের রীতি, অবনীন্দ্রনাথের রচনায় নূতন রূপ লাভ করে। তাহার পরে অবনীন্দ্রনাথ কালিদাসের "ঋতু সংহারের" কয়েকখানি চিত্রে আর এক নূতন রীতির চিত্র লিখিয়া ভারতের নবীন চিত্র পদ্ধতিকে নূতন পথে পরিচালিত করেন।

ইতিমধ্যে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর এবং অসিতকুমার হালদারের মত তিনজন প্রতিভার শিষ্যকে

তাঁহার সহায়ক লাভ করিয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে নব নব পথে পরিচালিত করিলেন। নন্দলাল ও অসিতকুমার লেডি হেরিংহ্যামের সহিত অজন্তা গুহায় যাইয়া বহুদিন অজন্তার ভিত্তি-চিত্রের নকল করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ-চিত্র হইতে রেখা পদ্ধতির নূতন শিক্ষা লাভ করিলেন—এবং এই রেখা পদ্ধতি হইতে নূতন রহস্য আত্মসাৎ করিয়া নবীন চিত্র পদ্ধতির অনুকূল নূতন চিত্রের নূতন পরিণতির সন্ধান পাইলেন।

তাহার পরিচয় আমরা পাই নন্দলালের দুইটি চিত্রে —"দময়ন্তীর স্বয়ম্বর", এবং "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা"র চমৎকার চিত্রে. এই দুই চিত্রে অজন্তার গুহা চিত্রের স্ত্রীলোকের কয়েকটি 'আদর্শ' বা 'টাইপ' অনুসৃত হইয়াছে কিন্তু তাহা অজন্তার স্ত্রী-চিত্রের সঠিক নকল নহে। অজন্তার স্ত্রী-চিত্রের অবয়ব কল্পনা আর এক নূতন রূপে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অনেক দুষ্ট সমালোচক নন্দলালকে অজন্তার চিত্রের নকলনবীশ বা 'রিভাইভালিস্ট' (Revivalist) বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। নন্দলাল তাহার এই শ্রেণীর চিত্রে অজন্তার রীতিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়া ভারতীয় চিত্রশৈলীর ধারাকে এক নূতন পথে এক পরিণতির পথে সম্পূর্ণ এক নূতন ভাষা রচনার পরিচয় দিয়াছেন—যে ভাষা অজন্তার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—অথবা, তাহার সহিত কিছু যোগ আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে নন্দলাল এক নূতন পদ্ধতিতে নূতন কলেবরে নবীন রূপ দিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন ভাষা রচনা করিলেন যাহাকে কোন-ক্রমেই অন্তজার ভাষার পুনরুক্তি বলা যায় না।

প্রাচীন বিষয়বস্তু "রামায়ণ" ও "মহাভারতের" কথা ও কাহিনীমাত্র অবলম্বন করিলেও, নন্দলাল ও অবনীন্দ্র-নাথ—এই প্রাচীন কাহিনীকে সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় নূতন রূপ দিয়াছেন। এই নূতন ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের 'মায়ামৃগ' চিত্রে এবং নন্দলালের শৈব চিত্রমালার অলৌকিক চিত্রায়ণে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আর দুটি চিত্রে আমরা নূতন চিত্র পদ্ধতির অগ্রগতির পরিচয় পাই—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতার" কল্পনায় এবং নন্দলালের "সতীর" চিত্রে। এই দুইটি চিত্র ভাবময় চিত্রশৈলীর নূতন অগ্রগতির পথে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ দুইটি চমৎকার কীর্ত্তিস্তম্ভ।

সুরেন্দ্রনাথ ও অসিতকুমার সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে এই নবীন চিত্রকলা পদ্ধতিকে নূতন গতি দান করিলেন—সুরেন্দ্রনাথের "বত্রিশ সিংহাসনের" চিত্র সম্পূর্ণ নূতন কল্পনা, প্রাচীন ভারতীয় ধারার অনুকরণ নহে, নূতন ভাষায়, নূতন পদ্ধতিতে নূতন কল্পনার পরিচয়। এবং অসিতকুমারের দুইখানি চিত্র—"যশোদা ও বালকৃষ্ণ" এবং "কুমারসম্ভবের" পার্ব্বতীর "ন যযৌ ন তস্থৌ"—ভঙ্গীর অদ্ভুত পরিকল্পনা ভারতীয় নূতন পদ্ধতির দুইটি নূতন কীর্ত্তিস্তম্ভ।

কিন্তু আর একটি সম্পূর্ণ নবীন অধ্যায় রচনা করিলেন নন্দলাল তাহার শৈব কাহিনীর চিত্রমালায়। ইতিপূর্ব্বে কাঙড়া চিত্রে নানা শৈব চিত্র রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নন্দলালের শিবের কল্পনা—কাঙড়ার শিশুসুলভ দুর্ব্বল কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছে। নবীন ভারতীয় পদ্ধতির পরিণতির ইতিহাসে নন্দলালের শৈব চিত্রমালা উজ্জ্বল দীপমালা, মধ্যযুগের ভারতের চিত্র-শৈলীতে ইহার তুলনা নাই। নন্দলাল এই সব কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করেন ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের শিব-কল্পনার নানা আদর্শ হইতে।

বাংলার যাত্রাগানে এবং বাংলার মধ্যযুগের শৈব-কাহিনীতে শিবের যে বৃদ্ধ রূপের দেবতার পরিচয় আমরা পাই নন্দলালের শিব কল্পনা তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের নূতন সৃষ্টি। নন্দলালের শিব বৃদ্ধ দেবতা "(বুড়ো শিব)" নহে, তিনি হইলেন গুম্ফ-শশ্রুবিহীন চিরন্তন চিরকুমারের চিরশক্তিমান এক, আধ্যাত্মিক কল্পনা। বাংলার "বর্ষফল কথনের" চিত্রে প্রাচীন ধারাকে নন্দলাল এক অভিনব রূপ দিলেন—এই অলৌকিক চিত্রে শিবের তুষার ধবল অবয়বের মূর্ত্তির সহিত নন্দলাল সংযুক্ত করিলেন এমন একটি বর্ণ সমুজ্জল অদ্ভুত রীতির সাড়ী পরিহিত এক পার্ব্বতীর চিত্র, যাহার আদর্শের প্রাচীন কোনও চিত্রে তুলনা পাওয়া যায় না। এই চিত্রটি নন্দলালের মৌলিক কল্পনাশক্তির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নন্দলালের অলৌকিক রূপ সৃষ্টি যেমন শিবলীলার চিত্রায়ণে নবীন চিত্রকলাপদ্ধতিকে ঐশ্বর্য্যশালী

করিল—ক্ষিতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণলীলার চিত্রায়ণে আর এক নূতন দ্বার উন্মোচন করিলেন এই নব্যকলার চিত্রশৈলীর আর এক নূতন বিকাশে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের রাধা ও কৃষ্ণের কল্পনা কোনও প্রাচীন ধারার কিছুমাত্র অনুকরণ নহে। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব কল্পনা। কেবল রাধাকৃষ্ণের চিত্রে নহে—চৈতন্য-লীলার নানা অভিনব কল্পনায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ নব্য চিত্র-কলাকে এক নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন। কেবল বৈষ্ণব চিত্রের রূপায়ণে নহে—তিনি "গঙ্গা" ও "যমুনার" মূর্ত্তিকে যে অপরূপ রূপ দিয়াছেন—ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে—তাহা অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। গঙ্গা ও যমুনার নানা চিত্র প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যে আমরা অনেক দেখিতে পাই—কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই দুই নদীর চাক্ষুষ রূপ কল্পনা উচ্চস্তরের মৌলিক, অতুলনীয় সৃষ্টি ভারতের পৌরাণিক চিত্রায়ণে সম্পূর্ণ নূতন যোজনা।

অনেকে বলেন যে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যরা প্রাচীন বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একটা সহজ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। কারণ ভারতের মানুষের প্রাচীন বিষয়বস্তুর উপর একটা আকর্ষণ আছে এবং এই আকর্ষণের কৃত্রিম সৌধের উপর এই সব নবীন শিল্পীদের তথাকথিত সাফল্য প্রতিষ্ঠিত—বিশেষ কিছু নিজস্ব মৌলিকতার উপর নহে। এই অভিযোগের সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায়—এই চিত্রশিল্পীদের কয়েকটি ধর্ম্ম-কাহিনী বিবর্জ্জিত কয়েকটি চমকপ্রদ—ধর্ম্মকাহিনী বিবর্জ্জিত 'সেকুলার' চিত্রমালায়। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল—নন্দলালের 'কন্যার শ্বশুরবাড়ীর যাত্রা'র চিত্রে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে ২।১ চিত্রে।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের এই ক্ষেত্রের মাষ্টারপিস হইল "বড়দিনের ভোজের" চিত্রে উইলসন হোটেলের বাবুর্চ্চির খাদ্য-সরবরাহ। এবং বাংলার আধুনিক যাত্রা-অভিনয়ের নানা ব্যঙ্গচিত্রে।

অবনীন্দ্র শৈলীর অসংখ্য চিত্রাবলীর (ইতিহাস রচনা দূরে থাক)—সামগ্রিক সমীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবার চেষ্টা আজও হয় নাই।

মধ্যে মধ্যে আংশিকভাবে এই শৈলীর সমীক্ষণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

(১) ১৯১৪ সালে প্যারী নগরের প্রদর্শনীর মাদাম হোলবেক্ রচিত চমৎকার প্রবন্ধ ("লার্‌দেকোরাতিফ্")

(২) ১৯১৬ সালে বিলাতে জার্ণাল অফ্ ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ

(৩) ১৯২১ সালের জানুয়ারীতে "রূপম্" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ—**A New Contribution to Shaivaite Art** (সচিত্র)

(৪) শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশিত "ভারতীয় চিত্রকলার নূতন যুগ" (সচিত্র)

(৫) একাধিক লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ নন্দলাল-সংখ্যা "নিরীক্ষা" (৩য় বর্ষ, ২।৪ সংখ্যা আশ্বিন, ৮৪ রবীন্দ্রাব্দ বহুচিত্র সম্বলিত (১৩৫০—৫১)

(৬) ইংরাজী বিশ্বভারতী পত্রিকা—"অবনীন্দ্র সংখ্যা"।

অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বিশ্বভারতীর উপরে উল্লিখিত সংখ্যা ব্যতীত যে শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখানে অবনীন্দ্রনাথ—আচার্য্যের পদ অলংকৃত করেন, এবং নন্দলাল বসু—সারাজীবন অতিবাহিত করে কলাভবনের শিক্ষক থেকে সর্ব্বভারতীয় আসনে বসাইলেন—সেই বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠে অবনীন্দ্র শৈলীর সম্যক সামগ্রিক সমীক্ষা হয় নাই এবং গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের গর্ব্বের বিষয় হইল এই যে এই শৈলীর ইতিহাস রচনার প্রচুর প্রামাণিক উপাদান, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলেন একজন বরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী জাতীয়তা-বাদী সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর পাতায় পাতায়। ইঁহার মত অকৃত্রিম বন্ধু নব্যতন্ত্রের বাংলার চিত্রকরগণ আর কখনও পান নাই। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অবনীন্দ্র শৈলীর চিত্রসৃষ্টি দেশে-বিদেশে অনবরত প্রচারিত হইয়াছে।

এই সহযোগিতার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কে প্রভুত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

"সাহিত্য" পত্রিকার পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়কে মাসের পর মাস কটুবাক্যে লাঞ্ছিত করিয়াছেন তাহার জন্য আজও আমাদের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই, এই সুযোগে, তাঁহার এই প্রভুত ঋণ স্বীকার মাত্র করিয়া আমরা ধন্য হইলাম।

সম্প্রতি আমার সুযোগ্য বন্ধু একজন উদীয়মান কলা-সমালোচক অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় "শিল্পী নন্দলালের" চিত্র সমালোচনা করিয়া (পরিচয়—মাঘ, ১৩৭০) এই শৈলীর কিছু সামগ্রিক সমীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য—

"এই নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার ভাগ্যে এককালে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই জুটেছিল। এখন এর ভাগ্যে শুধু নিন্দাই জোটে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যার কয়েকটি সত্য, এবং বেশীর ভাগই মিথ্যা এবং রসের বিচারে অপ্রয়োজনীয়। বলা হয়েছে এইসব শিল্পীরা শুধু অতীতের দিকে তাকিয়েই ছবি এঁকেছেন, বর্ত্তমান জগৎকে এঁরা উপেক্ষা করেছেন···শিল্পের বিষয়বস্তু দিয়ে শিল্পকর্ম্মের মূল্য বিচার হয় না। অতীতের দিকে তাকিয়েই ছবি আঁকলেই যদি সে ছবি অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে, তাহলে অজন্তা থেকে ইতালীয় রেনেসাঁর সব ছবিকেই ফেলিয়া দিতে হয় আঁস্তাকুড়ে।···

অনেকের ধারণা অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এ ধারণা ভুল। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলা—যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল অজন্তার দেওয়াল চিত্রে—সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজে কোনদিন অজন্তায় যান নি। তাঁর ঝোঁক ছিল বরং মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্রাকৃতি (মিনিয়েচার) চিত্রকলার প্রতি। মোগল চিত্রকলার অলংকরণ, রঙের মীড় এবং সূক্ষ্ম রেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু মোগল ছবির বিষয় বৈচিত্র্যহীনতা তাঁর ভাল লাগে নি। তাহার মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মোগল চিত্রকরদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ছবিতে চাইতেন গল্প, নাটকীয়তা, কৌতুকরস ও গীতিময়তা। এই সবের মিলন ঘটেছিল তাঁর ছবিতে, এবং সেজন্য তিনি ভিন্ন টেকনিক্ (তাঁর নিজস্ব "ওয়াশ") উদ্ভাবন করেছিলেন। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা নন্দলালের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে নি। ১৯১৩ সালে তিনি যখন জনকয়েক সতীর্থদের সঙ্গে অজন্তায় গিয়েছিলেন সেখানকার ছবি কপি করবার জন্য, তখন ভারতের ধ্রুব রীতির চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। অজন্তা চিত্রের দ্রুত সাবলীল রেখা তাঁকে অভিভূত করেছিল। আধুনিক ভারতে তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর তুলিতে অজন্তার ছবির সাবলীল ছন্দময় রেখা ধরা দিয়েছে এবং সেদিক থেকে তাঁকেই ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলার উত্তরসাধক বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকায় তিনি যতখানি সার্থকতা অর্জ্জন করেছেন—এরকম সাম্প্রতিককালে আর কেউ করেছে কি না সন্দেহ।"

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

—

জাতীয় সংস্কৃতির পতাকাবাহী
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র-জীবনে কিশোর বয়সে কাশীরামের মহাভারত পাঠে নিবিড় আনন্দ অনুভব করতাম। কাহিনীর পর কাহিনী তাদের মাধুর্য্যস্রোতে বালকের চিত্তকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো! এখনকার ছেলে-মেয়েদের জীবন-রঙ্গভূমিতে কাশীদাসের কি কোন ভূমিকা আছে? একটি নিম্ন বুনিয়াদী কলেজে ছাত্র-ভর্ত্তির ব্যাপারে পরীক্ষকের কাজ করতে হয়েছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে জেনেছি, পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার্থিনীদের সাড়ে পনেরো আনা অংশ কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েনি। কাশীরাম এবং কৃত্তিবাস ভারতবর্ষের দুইখানি মহাকাব্যের অমৃতরস গৌড়জনকে আকণ্ঠ পান করিয়েছেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত অমূল্য উপাখ্যানগুলি ছন্দোবদ্ধ সুললিত ভাষায় বাঙালীকে শুনিয়েছেন তাঁরা। কিশোর বয়সে যাদের মন-মধুপ কৃত্তিবাসী রামায়ণের কমল বনের পদ্মমধুর আস্বাদ পেলো না, কাশীরাম দাসের মহাভারতের কাব্যের পুষ্পিত অরণ্যে ছেলে-বেলায় যারা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারলো না তাদের আমি কোনমতেই ভাগ্যবান ব'লে ভাবতে পারিনে।

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বহু কীর্ত্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম কীর্ত্তি: কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় সুমার্জ্জিত হ'য়ে সুঠাম সুন্দর কলেবর নিয়ে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কোহিনুরের জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। জার্ম্মান পণ্ডিত **M. Winternitz** একটা দামী কথা বলেছেন **A History of Indian Literature**-এ। তাঁর মন্তব্যটি হোলো: **The Mahabharat makes it more suited than any other book, to afford us an insight into the deepest depths of the soul of the Indian people.** ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মহাভারতের জুড়ি নেই গ্রন্থজগতে। আর উইন্টারতনিজের (Winternitz) ভাষায়, রামায়ণ তো পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের একটি পরম সম্পদে। পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যে রামায়ণের মতো আর কোন কাব্য কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা জাতির চিন্তাধারাকে এমন করে প্রভাবিত করেছে? যুগে যুগে এক কবিকে কাব্য রচনার প্রেরণা এবং মাল-মশলা জুগিয়েছে? আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের এবং সাহিত্যের বৃহত্তম সার্থকতা কোথায়? তারা আমাদের জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরে আলোকপাত করে। আর জাতীয় চরিত্রের সেটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তারই তো পুনঃপুনঃ অভিব্যক্তি আমাদের চোখে পড়ে জাতির যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিলতার মধ্যে। জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে পরানুকরণের পথে কোন জাতির অভ্যুদয় সম্ভব নয়। রামায়ণ এবং মহাভারত—ভারতবর্ষের এই দুইটি অমূল্য মহাকাব্যের স্বর্ণমুকুরে জাতির চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যকে আমরা প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই, তার প্রাণপুরুষকে আমরা প্রতিফলিত দেখি।

ভারতবর্ষীয় চিত্তের গভীর থেকে যুগ-যুগান্ত ধরে যে-সুরটি উঠে আসছে—সেটি নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতার সুর। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিল, মৃত্যুর ছায়ায় ক্ষণভঙ্গুরের মরীচিকা দিয়ে আত্মার পিপাসা মিটবার নয়। ভারতবর্ষের চিন্তা-নায়কেরা বাস্তববাদী ছিলেন নিশ্চয়ই। দারিদ্র্য এ দেশে কখনো জাতীয় আদর্শের গৌরব পায় নি। জীবনকে তাঁরা সানন্দে স্বীকার করেছিলেন। অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ ব্রতম। এ বাণী উপনিষদের। শরীরং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্—এ কথা শুধু জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার

কথা নয়। আমাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি স্বর্গলোকের দিকে নিবদ্ধ থাকতে পারে কিন্তু আমরা মর্ত্ত্যলোকের জীব এবং সেই জন্যেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাস—এই বাস্তববোধকে ঋষিরা কখনো বিসর্জ্জন দেন নি। চরৈবেতির মহামন্ত্রের মধ্যে গতিশীল জীবনেরই জয়ধ্বনি। কিন্তু বাহিরের উপকরণ-রাশির প্রাচুর্য্যের মধ্যে ভোগে আকণ্ঠ ডুবে থাকায় জীবনের পরিপূর্ণতা নেই। এ কথা ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছিল, শুধু জৈবস্তরে বেঁচে থাকার জান্তব জীবন দুঃসহ ক্লান্তি থেকে মানুষকে কখনো বরাবর রক্ষা করতে পারে না। এমন কিছুতে তার প্রয়োজন আছে যা জীবনকে অতিক্রম করে রয়েছে, যা অসীম, যাকে স্পর্শ করতে পারে না কালের করাল দংষ্ট্রা। ভারতবর্ষের আত্মার গভীরতম আকূতির প্রতীক নচিকেতা—কঠোপনিষদের সেই নচিকেতা যে পার্থিব সমস্ত ভোগ্যবস্তু বর্জ্জন করেছে তাদের অনিত্যত্ব চিন্তা করে। নচিকেতা সেই শাশ্বত অসীমের দিকে তার তরুণ বাহু দুটি প্রসারিত করে দিয়েছে যাকে জানলে মানুষ মৃত্যু ভয়ের অতীত হতে পারে। নচিকেতার আধ্যাত্মিকতার ছাপ জাতির আত্মায় চিরন্তন হয়ে রইলো। অধোগতির চরম মুহূর্ত্তেও ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিকতা হারায় নি।

একটা সময় এলো যখন ইউরোপীয় ভাবধারার ফেনিল প্লাবনে ভারতবর্ষ হোলো ডুবুডুবু। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা আমাদের আত্মবিশ্বাসের মূলে করলো কুঠারাঘাত। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের চাইতে সর্ব্ববিষয়ে বড়ো—ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে—এই রকমের একটা মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা বৈদেশিক সংস্কৃতির অনুকরণে ব্রতী হোলাম। ইংরেজ তখন রাজসিংহাসনে, বিজেতার মস্‌নদে। আমরা পরাজিত, পরাধীন নেটিভের দল! বছরের পর বছর আমাদিগকে বলা হ'তে লাগ্‌লো: আমাদের সমস্ত ইতিহাস, আমাদের সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলি, আমাদের সমস্ত সাধনা অতলস্পর্শী মূঢ়তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমরা একই কথা বিজেতার মুখ থেকে বার বার শুনতে শুনতে একদিন স্বদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম আর জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায়, **"no night of the soul is blacker than that."** নিজের জাতির প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব আমাদের আত্মাকে যতখানি তমসাচ্ছন্ন করে এমন আর কিছুতেই নয়। সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে সুরু হোলো 'বিলিতী বাঁদর' সাজবার আত্মঘাতিনী প্রচেষ্টা। শ্রীঅরবিন্দ **The Renaissance in India**-তে লিখেছেন: **It was a crucial moment and an ordeal of perilous severity; a less vigorous energy of life might well have foundered and perished under the double weight of the deadning of its old innate motives and a servile imitation of alien ideas and habits.** সেই অগ্নিপরীক্ষার সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত! উপনিষদের যুগের অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসা অর্থহীন আচারের মরুবালুরাশির তলায় লুপ্তপ্রায়! অন্যদিকে বিদেশের আদর্শ এবং চাল-চলন-গুলির অনুকরণের একটা দাসসুলভ মনোভাব। আমাদের জীবনীশক্তি ভাগ্যিস ম্লান হয়ে যায় নি! নইলে অর্থহীন আচারের দাসত্ব এবং পরানুকরণের সর্ব্বনেশে প্রয়াস—এই দুই দিক থেকে মার খেয়ে আমরা কোন্‌ রসাতলে তলিয়ে যেতাম!

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি ভারতবর্ষকে নূতন প্রাণের বসন্তের মধ্যে সজীব এবং সতেজ করে তুলবেন। এবং কোন জাতির ইতিহাসে যখন অভ্যুদয়ের শুভ লগ্ন ঘনিয়ে আসে তখন বিধাতা অনেকগুলি প্রতিভা-শালী মানুষকে সেই জাতির মধ্যে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা একসঙ্গে আসেন উপর্য্যুপরি যেন সার বেঁধে। কামারের লৌহমুদ্গরের ঘায়ে ঘায়ে একটা জিনিষ ক্রমশঃ রূপ পায়। সেই তপ্ত জিনিষটিকে ঠাণ্ডা হবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। এও তেমনি। সেরা সেরা মানুষগুলি খুব তাড়াতাড়ি এসে জাতিকে দেন ধাক্কার পর ধাক্কা। সেই ধাক্কায় ঘুমন্ত জাতি জেগে ওঠে।

১৮৬১তে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৬৩তে বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৮৬৪তে মতিলাল ও আশুতোষ। ১৮৬৫তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৯এ গান্ধী। ১৮৭২এ শ্রীঅরবিন্দ। এঁরা সবাই **creative individual** আর ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায় "All

growth originates with creative individuals or small minorities of individuals…"

ভারতবর্ষের নবজাগরণের ব্যাপারে একজন মহাকবির যেমন প্রয়োজন ছিল রামানন্দবাবুর মতো একজন চিন্তা-শীল এবং বিপ্লবাত্মক মনোভাবসম্পন্ন সাহসী সম্পাদকেরও কি প্রয়োজন ছিল না? অরবিন্দের মতো দার্শনিক এবং গান্ধীর মতো কর্ম্মবীরের একত্র আবির্ভাব না ঘটলে কি ভারত এত তাড়াতাড়ি জাগতো?

কিন্তু এই প্রবন্ধে যে-রামানন্দ বিশেষ করে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু তিনি প্রবাসীর এবং মডার্ণ রিভিউ-এর মনস্বী সম্পাদক রামানন্দ নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যাঁর কথা বিশেষ করে বলতে চেয়েছি তিনি কাশীদাসী মহাভারতের এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পাদনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রতি আপনার গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। এবং আমাদের মনেও সেই অনুরাগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতিতে এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ যতটা জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, রামানন্দবাবুও। শ্রীঅরবিন্দ The Renaissance in India-তে মন্তব্য করেছেন: All great movements of life in India have begun with a new spiritual thought and usually a new religious activity. রামানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন আর ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ভিত্তি তো আধ্যাত্মিক। সমাজকে নূতন করে গড়ার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় কোন শৈথিল্য ছিল না—কিন্তু ঐ সমাজের উৎপত্তি তো বেদান্তকে নতুন করে প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে। আর্য্য সমাজও যে পাঞ্জাবে শিকড় গাড়লো—তারও মূলে বৈদিক আদর্শ-গুলির ভিত্তিতে নূতন ভারতকে গড়ে তোলার প্রেরণা! রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের উৎসও আধ্যাত্মিকতা। বৈরাগ্যের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হোলো মানব-সেবার সাধনা!

ইউরোপীয় সংস্কৃতির এবং চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে একটা সুফল ফলেছিল। ঐ সংস্কৃতির সংস্রবে এসে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সব কিছুকে যাচাই করে নেবার বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে উন্মেষিত হোলো। প্রবাসীর এবং মডার্ণ রিভিউ-এর সম্পাদকের লেখনীপ্রসূত মন্তব্যগুলির মধ্যে ঐ শাণিত বুদ্ধির তরবারির ঝলকানি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আর-এক রামানন্দও ছিলেন যিনি ছিলেন ধর্ম্ম-জগতের মানুষ, আধ্যাত্মিকতায় ছিল যাঁর সুগভীর বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অতীতে যাঁর ছিল নিবিড় শ্রদ্ধা, যিনি তাঁর অতীতের ভিত্তিতেই রচনা করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষের অতীতে শ্রদ্ধাবান, সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে আস্থাসম্পন্ন রামানন্দ চেয়েছিলেন, তাঁর দেশের মানুষগুলি রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্য দিয়ে জাতির মর্ম্মবাণীকে ভালো ক'রে জানুক। কেবল বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করলেই ভারতবর্ষ মহান হবে—এমন কোন গোঁড়ামিকে রামানন্দ প্রশ্রয় দেন নি। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ভারত যদি পিছিয়ে থাকে, ধর্ম্মরাজ্যের অনির্ব্বচনীয় অভিজ্ঞতা-গুলিকে সে যদি আমল না দেয়, বিষয়ের লোভে লুব্ধ হয়ে মানুষের জীবনের প্রতি যদি সে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তবে স্বদেশ সম্পর্কে গৌরব করবার কিছুই থাকবে না—এ কথা রামানন্দবাবু বিশ্বাস করতেন। তাঁর শতবার্ষিকীতে সেই রামানন্দকে নতশিরে স্মরণ করি যাঁর মধ্যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একত্র মিলিত হয়েছিল।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দ

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার হিসাবে আমার খ্যাতি অখ্যাতি যা অর্জন করেছি, তার ভূমি-পত্তন হয় ছোট একটি পুস্তিকা দিয়ে, নাম তার রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রচনা করি—১৩৩৮ বৈশাখ ২৫। রামানন্দবাবু সেই সময়ে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন; এই পুস্তিকার খসড়া তাঁকে দেখাতেই তিনি সেটি প্রকাশনের ভার নিলেন। নিজে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে প্রবাসী প্রেস থেকে ছাপিয়ে এনে দিলেন উৎসবের প্রাতে। রবীন্দ্রনাথের জীবন তথ্য ও তত্ত্ব আজ সুপরিচিত, বহু মনীষী গবেষণা করছেন। কিন্তু এই ভুলে-ভরা পুস্তিকাটি সকল প্রচেষ্টার পথিকৃৎ এবং রামানন্দবাবু আমার প্রথম উৎসাহদাতা, এই ঘটনাটি অনেকেই জানেন না। এই পুস্তিকা মুদ্রণের ব্যয় তিনি বহন করেন, বিক্রয়ের যে সামান্য অর্থ উঠেছিল, সেটা আমাকেই দেন। এই পুস্তিকা মুদ্রিত না-হলে হয়ত আমার পক্ষে 'রবীন্দ্র জীবনী' রচনা সম্ভবই হতে না। তাই আজ রামানন্দ-শতবর্ষপূর্তি উৎসব দিনে সেই দিনটির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

সাংবাদিকরূপে ভারতের ও ভারতের বাহিরের বহু মনীষীর সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠত হয়; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেশবিদেশের ক্ষুদ্র, মহৎ, অগণিত সাংবাদিক সাহিত্যিকের পরিচয় হয়। কিন্তু সাংবাদিক রামানন্দ ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল, তা কেবল বৈষয়িক পর্যায়ে সীমিত ছিল না—হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিশ্বাস উভয়কে একাত্ম করেছিল। এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে বৈষয়িক দিক থেকে উভয়ে লাভবান্ হয়েছিলেন—এ কথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের রচনাপুষ্ট হয়ে প্রবাসীর নাম ও মান দুই-ই বাড়ে; তেমনি মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীর ন্যায় দুইটি শক্তিশালী পত্রিকার মারফতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সম্ভার দেশে-বিদেশে প্রচারিত হতে কম সহায়তা করে নি। বর্তমান যুগে প্রেস ও পত্রিকার সহযোগিতা ব্যতীত কারও পক্ষে কিছু করা বা হওয়া সম্ভব হয় না—এ তত্ত্ব সাহিত্যিক, রাজনীতিক সবাই জানেন। সেইজন্য বর্তমান সভ্যতায় সম্পাদক-সাংবাদিকের স্থানকে সবাই মানেন। রবীন্দ্র-নাথ জীবনভর পত্রিকার আনুকূল্যে তাঁর সাহিত্যসম্ভার প্রচার করেছিলেন; কিন্তু রামানন্দ-সম্পাদিত পত্রিকাদ্বয় থেকে যে অনুকূলতা পেয়েছিলেন, তা তুলনাহীন। তা কেবলমাত্র রচনা প্রকাশ করে নয়, পুরাতন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-এর সম্পাদকীয় লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন।

সাংবাদিক-সাহিত্যিকের পারস্পরিক স্বার্থের সম্বন্ধ ছাড়া রামানন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীরতর যোগ ছিল। রামানন্দের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলে জীবনের নানা সঙ্কট মুহূর্তে কবিকে তাঁর সহযোগিতার সন্ধান করতে দেখেছি। আবার রামানন্দও কবির পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়েছেন।

একদা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দারুণ অর্থকষ্টের সময়ে রামানন্দ কবিকে তিন শ' টাকা পাঠিয়ে বলেন, যখন সুবিধা হয় একটা গল্প যেন লিখিয়া দেন। রবীন্দ্র-নাথ 'মাষ্টারমশায়' গল্পটি লিখে পাঠালেন; কিন্তু কবির মনে হোল, তিনশ টাকার উপযুক্ত গল্প হয় নি; আরও কিছু বড় লেখা পাঠানো উচিত। তাই আরম্ভ করলেন 'গোরা'। তখনকার দিনের তিনশ' টাকা একটা বিরাট অংক। রামানন্দ ধনী ছিলেন না—ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর বাঁকুড়ার পৈতৃক ভিটামাটির প্রতি কোন দাবী-দাওয়া করেন নি। চিরজীবন ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে যান

বাঁকুড়ায় ছাড়া কলকাতায় বা অন্য কোথাও ঘরবাড়ি কিছুই নির্মাণ করেন নি। শান্তিনিকেতনে একটি মাটির বাড়ি কেনেন। তাঁর ছোট ছেলে মুক্তিদাপ্রসাদ বিদ্যালয়ে পড়ত; তাকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে মা-বাবা ও দিদিরা এসে থাকতেন সেই বাড়িতে। তারপর প্রসাদের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর পর রামানন্দ সেই বাড়িটিও বিশ্বভারতীকে দান করে দেন।

বিশ্বভারতী যখন স্থাপিত হলো (১৯২১) তখন রামানন্দের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রকাশক এলাহাবাদের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ কবির যাবতীয় মুদ্রিত গ্রন্থের মুদ্রণ-মূল্য মাত্র গ্রহণ করে বিশ্বভারতীকে সমস্ত বই দিয়ে দেন; আজ বিশ্ব-ভারতী প্রকাশনী বিভাগের যে সুনাম তার পটভূমির ঘটনা এটি। কবির একটি নাটক 'মুক্তধারা' প্রবাসী থেকে প্রকাশিত হয়। রামানন্দ সেই নাটকের সমস্ত কপি বিশ্বভারতীকে দান করে দেন। অর্থগৃধ্নুতা—যা ব্যবসায়ীমাত্রেরই স্বভাবগত ধর্ম—সেই লালসা-মুক্ত ছিলেন রামানন্দ।

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়োপূর্তি উপলক্ষে বাংলা দেশ কবি-সম্বর্ধনা করে। এই সময়ে রামানন্দবাবু **'The Golden Book of Tagore'** নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তার কথা একালের কবি-ভক্তের নিকট প্রায় অজ্ঞাত। ১৯৬১ সালের কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ও বিশেষভাবে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের প্রচেষ্টায় যে বিশ্বব্যাপী উৎসব হয়েছিল তার কথাই লোকের মনে আছে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তখন বাঙালী আত্মপ্রচেষ্টায় যা করেছিল, তা অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত হয়। **The Golden Book of Tagore**-এ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবির সম্মান সর্বদেশের সাহিত্যিকদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান —কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট। কিন্তু ১৯২৬ সালে যখন প্রথম কলেজ অংশ স্থাপিত হয়—তখন রামানন্দবাবু অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রামানন্দবাবু চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীকে স্বাধীনভাবে গড়তে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মফস্বলস্থিত বহু কলেজের অন্যতমরূপে গড়বার অনুকূলে তিনি ছিলেন না; তাই এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু এই মতভেদ দ্বারা উভয়ের মধ্যে মনের অমিল হয় নি।

কোন ব্যক্তি—তা তিনি মহাপুরুষ হলেও—তাঁর সকল কথা, সকল মত, সকল ব্যবহার, সকল কাজ সকলে মেনে নেয় না—মতভেদ থেকেই যায়। তেমনি সাহিত্যিকদের সকল রচনা প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি হয় না, সুতরাং সমালোচনার ঊর্দ্ধে হতে পারে না। যে কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে স্তুতি-প্রশংসা যেমন বর্ষিত হয়েছিল, নিন্দা-কুৎসা তেমনি উদারভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। রামানন্দবাবু প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-এ এইসব নিন্দামোদী লেখকদের মুখরতা স্তব্ধ করার জন্য যেসব যুক্তি ও তথ্য পত্রিকাদ্বয়ে উপস্থাপিত করতেন, তা রবীন্দ্র জীবনীর ও সমকালীন মানুষের মনন ইতিহাসের আকর, তরুণ গবেষকরা অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পাবেন সেসব খণ্ডের পাতা উল্‌টোলে।

ভারতের বাইরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কথা প্রচার করেন 'মডার্ণ রিভিউ'। ইংরেজ-পাঠক রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পরিচয় পায় এই পত্রিকার মাধ্যমে; বিলাতে বহু ভারত-দরদী এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি 'কাবুলিওয়ালা' গল্প অনুবাদ করে মডার্ণ রিভিউ-এ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ পড়ে বিলাতে উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন 'কাবুলিওয়ালা' গল্প লেখকের অন্যান্য রচনার খোঁজ চেয়ে পাঠান। এর থেকে সুরু হলো কবির সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের পত্র বিনিময়ের পালা—যার পরিণতি হ'ল গীতাঞ্জলি বা সঙ্‌-অফারিংস রচনায়। বিলাতে কবির খ্যাতি প্রসারের জন্য রামানন্দবাবুর মডার্ণ রিভিউ কতখানি দায়ী, তা ঐ পত্রিকার পুরাতন ফাইল ঘাঁটলেই জানা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জালিয়নবালাবাগের হত্যাকাণ্ড ব্যাপারটি কী গভীর রেখাপাত করেছিল, তা কবির জীবনী-পাঠকদের নিকট সুবিদিত। ১৯১৯ সালের মে

মাসের শেষ দিকে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। ৩০শে মে শান্তিনিকেতনে কোন বধূগমনোপলক্ষে কবি উপাসনা করবেন—একথা শান্তিনিকেতনের সকলেই জানতাম। কিন্তু হঠাৎ ২৮শে মে কবিকে কলকাতায় রামানন্দবাবুদের বাসায় উপস্থিত হতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশের সঙ্কীর্ণ গলির উপর একটি বাড়িতে তাঁরা থাকেন—নিচের তলায় প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ অফিস উপরতলায় তাঁদের বাস। সঙ্কীর্ণ গলিতে হঠাৎ দেখি রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ রামানন্দবাবুর বাড়ীর দিকে চলেছেন। রামানন্দবাবু ও তাঁর কন্যারা এঁদের বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। আমরা সেদিন মন্দিরের পিছনে খোলা মাঠে বিশেষ কোন আনন্দ উৎসবের জন্য সমবেত হয়েছি। কবিকে দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম—পরশু না শান্তিনিকেতনে তাঁর উপাসনা বধূ-গমন উপলক্ষে! কী হলো—কেন কবি চলে এলেন? কিছুই বুঝতে পারলাম না।…পরে সব জানতে পারি: রামানন্দবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করার পরই বোধহয় লর্ড চেমসফোর্ডকে কবি তাঁর 'স্যর' পদবী বর্জন লিপি লেখেন। রাজনৈতিক দিক হতে এই সময়টা খুবই সঙ্কটপূর্ণ—সেইজন্য কবি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের জন্য মিলিত হয়েছিলেন।

আমার জীবনে রামানন্দবাবুর একটি কথা মন্ত্রের মত ধ্যানের বস্তু হয়ে আছে। ১৯১৮ সালের ঘটনা—তখন আমি কলকাতায় থাকি, সকালে বিকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাই, সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা' ক্লাবের কর্মোপলক্ষে। একদিন আমরা মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট দিয়ে ফিরছি, কথা হচ্ছিল আমার পরিকল্পিত 'ভারতপরিচয়' গ্রন্থ নিয়ে। রামানন্দবাবু বললেন, 'আমরা সকলেই সাহিত্য-স্রষ্টা হতে পারিনে; কিন্তু ইচ্ছা করলে অনেকেই লেখক হতে পারি যে-লেখার দ্বারা সাধারণ লোকের প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ হতে পারে।' সেই কথাটি স্মরণ করে আমার সীমিত শক্তি প্রয়োগ করে চলেছি, সাহিত্যের দরবারে মজদুরী করি—শিল্পী হবার ব্যর্থ বাসনায় আলেয়ার পিছনে চলি নি। সাধারণ লোকের জন্য তথ্য সাজিয়ে পরিবেশন করে চলেছি।

রামানন্দবাবুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কী ঋণী, তা রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জীর প্রকাশ ইতিহাসে পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। ত্রিশ বৎসর পর ১৯৬২ সালে সেই বইটি অনেক বড় করে পুনর্লিখিত হয়: 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী সেটি প্রকাশ করেছেন—রামানন্দবাবুর ঋণ সেখানেও স্বীকৃত হয়েছে। আর একখানি গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন রামানন্দবাবু। সে বইটি 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'। বহু বৎসর পরে বইটি পুনর্লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (গ্রন্থম্ প্রকাশনী): অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘ ভূমিকা লিখে আমায় সম্মানিত করেন। এই গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে; আমি রামানন্দবাবুর ভূমিকাটি আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদের চিহ্নরূপে প্রতি সংস্করণে রক্ষা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলি 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার প্রায় ছয় বৎসর পরে 'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী' প্রকাশিত হয়।

রামানন্দ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক যে সব বিবিধ প্রসঙ্গ প্রবাসীতে ও Notes মডার্ণ রিভিউতে লিখেছিলেন, তার থেকে বহু জিনিষ পুনর্মুদ্রণের যোগ্য—অনেক কথা বলে গিয়েছিলেন যা সময়-মত সম্পন্ন হয় নি বলে, আজও বাংলা দেশ দুঃখ পাচ্ছে। রামানন্দ কেবল যদি সমালোচনা করেই নিবৃত্ত হতেন, তবে ত তাঁর স্মরণায়োজনের ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না; তিনি সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে গিয়েছিলেন—সেইখানে তিনি রাজনৈতিক দ্রষ্টা, কেবলমাত্র সাংবাদিক নন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী কথার চল ছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইহার অনুসরণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর প্রয়োগ দেখিতাম, যেমন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অথবা সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী। সাময়িক সাহিত্য-সংসারে এইরূপ 'সম্রাট' পদবাচ্য যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, একথা হয়ত আজিকার দিনে নূতন ঠেকিবে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দশক হইতে বর্ত্তমান শতকের অন্তত চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রামানন্দবাবু সাময়িক সাহিত্যে শুধু নূতন পথ নয়, একটি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এখানে পূর্ব্ব শতকের 'ধর্ম্মবন্ধু', 'দাসী' এবং 'প্রদীপ' সম্পাদনার কথা বলিতেছি না, ইহার পরবর্ত্তী 'প্রবাসী' সম্পাদনা ও পরিচালনায় রামানন্দ-বাবু যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কোন কোন মাসিকপত্র নিশ্চয়ই উচ্চতর মানের ছিল বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিলে প্রবাসীর জুড়ি এই দীর্ঘকালের মধ্যে দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়ে না। সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ভারতবর্ষ" প্রকাশের কিছুকাল পরে ইহার পরিচালককে রেঙ্গুন হইতে লিখিত একাধিক পত্রে প্রবাসীর উচ্চতর মানের কথার সপ্রশংস উল্লেখ করেন এবং তাঁহাকে এই অনুরোধ জানান যাহাতে উক্ত পত্রিকাখানিকেও অনুরূপ করিয়া তোলা যায়। ইহা যতদূর স্মরণ হয় ১৯১৫-১৬ সনের কথা। বস্তুত প্রবাসী যুগপৎ জ্ঞানদান এবং চিত্ত-বিনোদন এই দুইটি কার্য্যেই প্রায় প্রথমাবধি আত্মনিয়োগ করে, আর ইহার মূলে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আমি সম্প্রতি মুখ্যতঃ সাহিত্য-সাধনার পরিচিতি স্বরূপ রামানন্দের একখানি জীবনী-গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনুকূল্যে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করিয়াছি। তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে বিস্তর তথ্য জানিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে যাঁহাদের কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে তাঁহারা বাঙালী জীবনে প্রবাসীর প্রভাব ও প্রেরণার যথোচিত সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। আমাদের এক যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী জাতীয় অধ্যাপক ডকটর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও নিজ জীবন হইতে ইহার

সাক্ষ্য দিতে পারি। পরবর্ত্তীকালে আমি প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ম্মীরূপে রামানন্দবাবুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি এবং কৈশোরে প্রবাসীর মধ্যে যে-আদর্শ ও উদ্দীপনার সন্ধান পাই তাহার মূর্ত্ত প্রতিরূপই যেন দেখি এই সাদাসিধা সুদর্শন বৃদ্ধ মানুষটির মধ্যে।

প্রথমেই দুইটি ব্যাপার আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রথমটি হইল ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে সুরাটে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে রামানন্দবাবুর সভাপতিত্ব। এই অধিবেশনে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষে জাতীয়তা তথা স্বাধীনতার ইতিহাসে একখানি প্রকৃষ্ট দলিল। মডার্ণ রিভিয়ুতে এই সুচিন্তিত সারগর্ভ দিব্যদৃষ্টিসঞ্জাত অভিভাষণটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। রামানন্দবাবু ছিলেন ভারতবর্ষে জাতীয়তার একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি কেমন করিয়া হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইতে পারেন? তাঁহার যুক্তি ছিল হিন্দু জাতিকে (তখন হিন্দু বলিতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী যেমন বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলকেই বুঝান হইত) কলুষমুক্ত ভেদ-বৈষম্য-বিরহিত জাতীয়তার আদর্শে সংহত ও সংঘবদ্ধ করিয়া তোলা, যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরাপর সম্প্রদায়ের মত তাহারাও সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে, আর এইরূপেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হইবে। ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া শাসক-জাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় মুসলমান' সম্প্রদায় তখন যে জাতীয়তা-বিরোধী কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিল তাহার প্রতিষেধকল্পে জাতীয়তার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ সংগঠনেরও আবশ্যকতা প্রতীত হইয়াছিল। প্রথমে যাঁহারা রামানন্দবাবুর সভাপতিত্ব পদ গ্রহণে বিস্ময় প্রকাশ করেন, পরে উক্ত অভিভাষণ পাঠে তাঁহাদেরও বিস্ময় কাটিয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হইল ডকটর জ্যাবেজ টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড-কৃত India in Bondage বা শৃঙ্খলিত ভারত (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশের জন্য প্রবাসী প্রতিষ্ঠান তথা রামানন্দের উপর রাজরোষ। ইহা ঘটিল এই সনেরই মে-জুন মাসে। নাম হইতেই গ্রন্থখানির বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আঁচ করা যায়। পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের নিমিত্ত মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত দাস ধৃত হন। প্রবাসী আপিস ও রামনন্দবাবুর বাড়ী খানা-তল্লাসী হইল। রাজদ্রোহের অভিযোগে অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারীরূপে রামানন্দবাবু ধৃত হইলেন। বিচারে উভয়েরই একুনে দুই হাজার টাকা জরিমানা হইল। হাইকোর্টে আবেদন করিয়াও মুদ্রাকর ও প্রকাশকের পক্ষে আপীলের অনুমতি পাওয়া গেল না। আবেদন অগ্রাহ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় খণ্ডই আপিস হইতে লইয়া যাওয়া হয়। এই সব ঘটনা আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ধীর-স্থির-গম্ভীর রামানন্দের মধ্যে এজন্য কোন উদ্বেগ বা অনুশোচনা আমার মত যুবক-কর্ম্মীর চোখেও ধরা পড়ে নাই। সজনীকান্ত লিখিয়াছেন, এই সময়ে রামানন্দবাবু যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখান তাহার তুলনা নাই।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, রামানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে গিয়া ব্যক্তিগত কথাও আসিয়া পড়িতেছে। এ জন্য পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। মানবসেবা ও মানবপ্রেম রামানন্দ জীবনের এই দুইটি আদর্শের দ্বারা আমরাও সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইতে থাকি। তখন স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আমরা সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছি। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-সেবীদের চিত্তকেও ইহার তরঙ্গ উদ্বেলিত না করিয়া পারে নাই। সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র-সেবীদের আর্থিক কৃচ্ছ্রতা তখনকার দিনে ছিল সুবিদিত। ইহার জন্য তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতেও হইত যথেষ্ট। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রতা আমাদিগকে সেবার পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অনেকে ঐ সময় কারাবরণও করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাহিরে ছিলেন তাঁহাদেরও কষ্টের অবধি ছিল না। কারাগারের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, সকল প্রকার দুঃখকষ্টই আদর্শের সম্মুখে কোথায় যেন উবিয়া যাইত। আমরা তখন সাময়িক সাহিত্য কি সংবাদ সাহিত্য উভয়ের সেবাকেই জীবনের 'মিশন' বা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করি। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে পারি রামানন্দবাবুই ছিলেন আমাদের

সম্মুখে এমন একটি ত্যাগ ও সেবার আদর্শ যাহার ফলে এই ব্রতকে জীবনব্রতরূপে অতি সহজেই অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। রামানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বার বার প্রণাম জানাই।

আমি ১৯২৯ সনের জানুয়ারী হইতে প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হই এবং ক্রমে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করি। রামানন্দ-জীবনের শেষ পনর বৎসরকাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসি। পরোক্ষভাবে বলি এই জন্য যে মধ্যে প্রায় চারি বৎসর অপর একটি পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকরূপে কার্য্য করি। তখনও কিন্তু আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। প্রথমাবধি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাইলাম উভয় পত্রিকার প্রধান সহকারী সম্পাদকরূপে। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলিতেন, নিয়োগ-পত্র গ্রহণকালে রামানন্দবাবুর সঙ্গে এই প্রকার কথা হইয়াছিল : "দেখুন আমার কাগজ দুইখানিকে নির্ভুল করিয়া ঠিক সময়ে বাহির করিতে চাই। এই কাজটি হইলেই আমি খুসি। আপনি অবশ্যই অবসর সময়ে আপনার গবেষণা-কার্য্য চালাইয়া যাইবেন।" প্রবাসী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তাঁহারই উৎসাহে আমিও গবেষণা-কার্য্যে লিপ্ত হই। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু বিদ্যার কেন্দ্র। আমিও বিদ্যার চর্চ্চায় লাগিয়া গেলাম। ইহাতে কোনরূপ বাধা পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তুলনামূলকভাবে বলিতে পারি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলেই আমার গবেষণা-কার্য্য রীতিমত চলিবার সুযোগ পায়। গবেষণার ফলাফল প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করি। প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার প্রথম লেখা 'রাধানাথ শিকদার'। রচনা মনোনয়নের ভার তখন সাধারণ নিয়মে অপরের হস্তে ছিল। কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ম্মী আমাদের রচনা রামানন্দবাবুই দেখিয়া দিতেন। 'রাধানাথ শিকদার' প্রবন্ধটি স্বয়ং পড়িয়া রামানন্দবাবু আমাকে সহকর্ম্মীদের সম্মুখেই বলেন—"লেখাটি বেশ হইয়াছে, তবে কিছু কিছু অংশ কমাইয়া দিলে ভাল হয়।" আমি সহকর্ম্মীদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, নূতন লেখক। তখন গবেষণায় হাত পাকাইতেছি মাত্র। রামানন্দবাবুর এই মন্তব্যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হই।

কিছুদিন পরের কথা। রামানন্দবাবু আমাদের ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এই চিঠিখানি নিন। ডকটর মেঘনাদ সাহা আমাকে লিখিয়াছেন। চিঠির উপলক্ষ্য আমি বটে, কিন্তু লক্ষ্য আপনি। অবিলম্বে 'রাধানাথ শিকদার' লেখাটি ইংরেজী করিয়া তাঁহাকে পাঠান। তিনি লণ্ডনের 'নেচার' কি অন্য কোন বিজ্ঞান-পত্রিকায় ছাপাইয়া দিতে চান।" রামানন্দবাবুর কথায় দ্বিতীয়বার আমি উৎসাহদৃপ্ত হইলাম। সব কথা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। ঘটনাচক্রে মডার্ণ রিভিয়ুর এপ্রিল সংখ্যায় আমাকে ইংরেজী রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধটি সত্বর ছাপাইয়া দিতে হয়। ঐ সময় হিউ রাটলেজ কর্ত্তৃক হিমালয় অভিযান আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গেল। ২ এপ্রিল সর্ব্বপ্রথম এভারেষ্ট শৃঙ্গের উপর দিয়া এরোপ্লেন উড়িয়া যাইবারও কথা শুনি।

প্রবন্ধটি বাহির হইবার পরই কোন কোন ইংরেজী খবরের কাগজ হুবহু বা আংশিক উদ্ধৃত করিলেন। বাংলা কাগজেও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল। দেখি, ইংরেজী বাংলা নানা পত্রিকায়ই আমার প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধও বাহির হইতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্য (৭ই এপ্রিল ১৯৩৩) প্রকাশিত করেন। রামানন্দবাবু ঐ দিন সকালে ইহা পাঠ করিয়াই আমাকে একখানি পত্র লেখেন, নানা কারণে পত্রখানি ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদক ও মানুষ রামানন্দকে বুঝিবার পক্ষে ইহা আজিও প্রণিধানযোগ্য। পত্রখানি এই :

"যোগেশবাবু—আজকার আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনার M. R.র (Modern Review'র) রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২টা প্যারাগ্রাফ আছে দেখিয়া থাকিবেন। আমার বোধ হয় আপনি জ্ঞানেন্দ্রবাবুর (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) বহি হইতে কোন উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহার কৃতিত্বের লাঘব আপনি করিতে চান না—আমিও চাই না। কিন্তু আপনি আগে প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছেন এবং আমি M. R. ও

প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছি তাহা অনুল্লিখিত থাকা উচিত নয়। Englishman হইতে উদ্ধৃত অংশটি M. R. ও প্রবাসীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আগে বাহির হয়। ইহা জ্ঞানেন্দ্রমোহনবাবুর দেওয়া জিনিষ নয়। রাধানাথ শিকদার যে Mount Everest-এর আবিষ্কারক ইহা তাহার একটি প্রমাণ। অন্য প্রমাণটি Nature হইতে আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে শিকদার মহাশয় সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পুরাতন কথা—প্রবাসীতে মুদ্রিত আপনার প্রবন্ধে আছে।

বস্তুতঃ আপনি রাধানাথ শিকদার মহাশয় সম্বন্ধে যত কথা বাহির করিয়াছেন, আগে তাহা অন্য কাহারও জানা ছিল না। আনন্দবাজার পত্রিকায় কি বাহির হইয়াছিল তাহা আমি জানি না।

এ বিষয়ে আপনি আনন্দবাজার পত্রিকায় লোক মারফৎ (পিয়ন বহি সমেত) একখানি চিঠি লিখিলে ভাল হয়। ইতি। ৭-৪-১৯৩৩। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

রামানন্দবাবুর পত্র পাইয়া আমার আনন্দ আর ধরে না। ঐ দিনই রামানন্দবাবুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমার বক্তব্য পত্রাকারে লিখিয়া আনন্দবাজারে পাঠাই, ইহা পরবর্ত্তী ৯ এপ্রিল মুদ্রিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'রাধানাথ শিকদার', 'এভারেষ্ট শৃঙ্গ'—এ দু'টি সম্পর্কে তখন ইংরেজী বাংলা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিস্তর চিঠি ছাপা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একখানি ছিল বিশেষ তথ্যপূর্ণ। লেখক সরকারী জরীপ বিভাগের অঙ্গীভূত 'Geodetic' শাখার ডিরেকটার কর্ণেল ডকটর আর. এইচ. ফিলিমোর, ডি. এস-সি। এখানি Statesman-এ প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে ডকটর ফিলিমোরের সঙ্গে রামানন্দবাবুর মাধ্যমে আমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। এবং রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে আমরা উভয়েই বিশদ আলোচনা করি। বলা বাহুল্য আমাদের আলোচনার ভিত্তি ছিল Modern Reviewতে প্রকাশিত আমার এই ইংরেজী প্রবন্ধ। ফিলিমোর সাহেব আমার খোঁজ করিয়া রামানন্দবাবুকে একখানি পত্র লেখেন। রামানন্দবাবু পত্রখানি পাইয়া আমাকে লেখেন :

"কল্যাণীয়েষু—যোগেশবাবু, এই ভদ্রলোকটিকে চিঠি লিখিয়া বা ফোন করিয়া জানাইলে ভাল হয় আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিবেন কি না, এবং পারিলে কখন পারিবেন। শুভানুধ্যায়ী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

রামানন্দবাবুকে লেখা ডকটর ফিলিমোরের পত্রখানিও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রামানন্দবাবু পত্রখানির উপলক্ষ হইলেও এবারেও মোটামুটি লক্ষ্য ছিলাম আমি। ডঃ ফিলিমোর তখন অবসর লইয়াছেন। এই সময় ভারত সরকার তাঁহার উপরে ভারতীয় জরীপ বিভাগে ইতিহাস লেখার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

রাধানাথ সম্পর্কে আমার আরও দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়। এখানে শুধু রাধানাথ সম্পর্কেই লেখা হইল। আমার আরও বহু ইংরেজী ও বাংলা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রামানন্দবাবু সাগ্রহে পত্রস্থ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে আমি পুনরায় এই প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া আসি। তখনও রামানন্দবাবু প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে সম্পাদকীয় মন্তব্য নিজেই লিখিতেন। প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ তিনি এই সময় চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দবাবুর মন তখনও কিরূপ সংস্কারমুক্ত ছিল এবং ভাষাগত নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তিনি কতখানি উন্মুখ ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপই এই বিষয়টির এখানে উল্লেখ করিলাম। রামানন্দবাবুর নিকট আমরা যে কত ঋণী এবং আমার ব্যক্তিগত গবেষণা কার্য্যে তাঁহার নিকট হইতে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাই তাহার নিদর্শন স্বরূপই এখানে কিছু লিখিলাম। বলিতে দুঃখ হয় আজিকার দিনে এই ধরনের উৎসাহ প্রেরণা নিরতিশয় দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দ জন্মশতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব হইতে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও জাতি নূতন প্রেরণা ও শুভবুদ্ধি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রামানন্দবাবুর কথা

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার ন্যায় প্রবাসীতে রামানন্দবাবুর কথা লেখা। কথা-সাহিত্যের কর্ত্তৃপক্ষ রামানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা বাহির করিলেন স্থির করিয়া আমাদের নিকট গত শীতকালে লেখা চাহেন। তাঁহাদের "রামানন্দবাবুকে যেমন দেখিয়াছি" বলিয়া একটা লেখা দিয়াছি; ঐ লেখায় যাহা আছে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া রামানন্দবাবুকে যেমন যেমন দেখিয়াছি সেই সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ইহাতে ব্যক্তিগত কথা বেশী থাকিবার সম্ভাবনা, থাকিলে পাঠকগণকে তাহা বুড়া বয়সের দোষ বলিয়া ক্ষমা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

রামানন্দবাবুর নাম স্কুল-কলেজে পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। তিনি কলিকাতায় আসিয়া যখন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের কাছে থাকিতেন তখন তাঁহাকে দেখি। বরাবরই মডার্ণ রিভিউ পড়ি, একবার একটি কপিতে ছাপা পাতা উল্টাইয়া গিয়া দোবরা করিয়া ছাপা হইয়াছিল; এই কপিটি প্রবাসী আপিসে গিয়া বদলাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে রামানন্দবাবু সশব্যস্তে সেই কপিটি বদলাইয়া দিলেন, আর বলিলেন যে আমাদের দোষেই এই কপি বাজারে বাহির হইয়াছে। এই রামানন্দবাবুর সহিত প্রথম কথা কওয়া বা আলাপ করা।

ইংরাজী মডার্ণ রিভিউতে আমাদের লেখা বাহির হইবার পর তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়; তিনি একবার আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আমার ছোট ছেলে তুলু, তখন ৩।৪ বছরের, মা-মরা ছেলে বলিয়া একটু বেশী আব্দারে; রামানন্দবাবুর দাড়ি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তিনি তুলুকে কোলে লইয়া তাহার হাতে দাড়ি বুলাইয়া বলেন যে ইহাতে ভয়ের কিছুই নাই।

তাঁহার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বলি আপনার যে ফটোগ্রাফখানি আপনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করেন, আমাকে দিবেন। তাহাতে তিনি বলেন কামাক্ষীর বোনের পাকা দেখার সময় আমার যে ফটো কামাক্ষী তুলিয়াছে, সেইটাই আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, বলিয়া একখানি **print** দেখাইলেন; আর বলিলেন যে এখানি এক নাতনিকে দিয়াছি; আপনাকে এই ফটো একখানি আনাইয়া দিব। ঘর থেকে আর একখানি ফটো—অন্য প্রকারের, আনিয়া আমাকে দিলেন।

মডার্ণ রিভিউতে কয়েকটি লেখা উপর্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেন (আমরা বয়সে ত ছোটই, অন্যান্য বহু বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা ছোট থাকা সত্ত্বেও তিনি বরাবর আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন —অনুযোগ করিলেও শুনিতেন না ; চিঠিপত্রে 'যতীন্দ্র-বাবু' ; 'দত্তমহাশয়' লিখিতেন) বড় তীব্র কড়া ভাষায় লেখেন; ভাষার তীব্রতা অনেক সময়ে বক্তব্যের, উদ্দেশ্যের ক্ষতি করে—বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে লেখকের তিনটি **P** থাকা দরকার—**Patience, Prudence** ও **Prescience**। তখন স্যর জন এণ্ডারসন পরে লর্ড ওয়েভারলি বাংলার লাট ; খুব ধরপাকড় চলিতেছে ; একটি লেখা মডার্ণ রিভিউতে ছাপিতে দিয়াছি ; ছাপা হইয়াছে রামানন্দবাবু 'পেজ প্রুফ' দেখিতে দেখিতে আমাদের চিঠি দিয়া, ফোন করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন লেখাটির জন্য আপনাকে 'সিডিসনের' মামলায় পড়িতে হইতে পারে, আপনি উকীল, জেল হইলে আপনার ক্ষতি হইবে, উহা কি ছাপাইব। আমি (অর্থাৎ তিনি) ছাপাইতে রাজি। ভয় পাইয়া বলিলাম ছাপাইব না। প্রেস হইতে আপত্তি উঠিল কাল কাগজ বাহির হইবে, কোথায় এখন নূতন 'ম্যাটার' পাওয়া যাইবে। তিনি সব সমাধান করিয়া দিলেন।

মেদিনীপুর জেলা ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে, উপর্যুপরি কয়েকজন সাহেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করার দরুন, বৃটিশ সরকার এই সুযোগে জেলাবাসীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করে। ইহার বিরুদ্ধে কলিকাতার কয়েকজন [illegible], সম্পন্ন নেতা—ইঁহাদের মধ্যে রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত নেতাও আছেন—প্রবাসী প্রেস হইতে এক পুস্তিকা ছাপান। রামানন্দবাবু ইহার জন্য তাহারা রাজরোষে পড়িতে হইতে পারে বলিলে তাঁহারা ঐ পুস্তিকা আর প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। ছাপার খরচ ত দূরের কথা, কাগজের দামও দিলেন না। আমাদের দেশে অপরের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া শিকার করা অনেকের অভ্যাস। পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের চেরী প্রেস, স্বদেশী যুগের এক প্রখ্যাত প্রেস, প্রেস হইতে যত স্বদেশী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, সংখ্যা নাই। কেহ দাম দেয় নাই ; ফলে চেরী প্রেস উঠিয়া গেল।

সুভাষবাবু তখন ভিয়েনাতে। মডার্ণ রিভিউতে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। রামানন্দবাবু তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য একটি বেশী টাকার চেক্ আমাদের সামনে খামে ভরেন। এই টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহাকে বলি যে আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী টাকা সুভাষবাবুকে দিতেছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বিদেশে সুভাষ-বাবুর অনেক খরচ—আরও বেশী দেওয়া উচিত, পারি না।

তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার বেশ রুচিবোধ ছিল। বর্দ্ধমানে হিন্দু কন্‌ফারেন্স হইবে। ট্রেনের এক কামরায় তাঁহার সহিত যাইতেছি, কথায় কথায় বলি যে আমরা ত আপনার কাগজে অনেক লিখিলাম, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তা বড় একটা পড়ে না ; এমন কি আমার সহকর্ম্মী উকীলদের বলিলেও বড় একটা কেহ গা করে না। চুপ করিয়া শুনিলেন ; বলিলেন আপনার ৩ জন পাঠক **sure** আছে। তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন আপনি ত লেখাটি শেষ করিয়া একবার ভাল করিয়া পড়েন—আপনি একজন ; আমি সম্পাদক, সব লেখা আগাগোড়া পড়িয়া তবে 'সিলেক্‌সন' করি—আমি আর একজন ; আর নীরদ 'পেজ-প্রুফ' দেখে, নীরদ আর একজন। হাসিয়া ফেলিলাম ; তিনি বলিতে লাগিলেন আমরা ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত, খুব 'প্রোগ্রেসিভ' বলিয়া দাবি করি ; রাজা (রাজা রামমোহন রায়) আজ একশত বৎসর মারা গিয়াছেন, আমরাই কি তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী সব কাজ করিয়াছি, না, করিতে পারিয়াছি। আপনি যদি সত্য কথা লিখিয়া থাকেন ত কালে তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে। আপনি ত বিজ্ঞানের ছাত্র, **Mendel**-এর কথা ভাবুন না।

আর একদিন তিনি **G. Feidlay Sleirras**-এর **Poverty & Kindred Problems** বইখানি আনিয়া নীরদবাবুর হাতে দিয়া ডাঃ স্যাণ্ডারলাণ্ডকে পাঠাইবার জন্য বলিলেন। বইখানি দেখি বলিয়া লইয়া নড়াচাড়া করিতে করিতে একটি ভুল চক্ষে পড়িল ; তাঁহাকে বলিলাম দেখুন এইটি ভুল লিখিয়াছে। তিনি

মনোযোগের সহিত সেই অংশটি পড়িলেন, বলিলেন ভুলই ত বটে। বইখানি কিনিবার পর আমিও নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়াছি, কৈ ভুল ত আমার চোখে পড়ে নাই। আপনি দেখিতেছি ভস্মলোচন; ভুল লাফাইয়া আপনার চোখে পড়ে। সকলেই হাসিতে লাগিলাম।

রায়বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সুখচরের বাগানে 'বেঙ্গল হোম ক্রাফ্‌টিং এসোসিয়েশন' স্থাপিত করিয়া একসঙ্গে বাড়ির লাগাও জমিতে ম্যালেরিয়ার মশক নিবারণ ও নিজ কায়িক পরিশ্রমে শাকসব্জী উৎপাদন শিক্ষা দিতেন যাহাতে গৃহস্থের কিছু সাশ্রয় হয়। রামানন্দবাবুকে ইহা দেখাইতে লইয়া যাই, দেখিয়া শুনিয়া তিনি খুব খুসী হয়েন ও প্রবাসীতে এই সম্বন্ধে একটি লেখা দিতে বলেন। গোপালবাবু আমাদের সবাইকে ঘোলের সরবৎ, সোদপুরের রামচাকী ও পানিহাটির গুঁপো সন্দেশ খাওয়ান। আমার ছেলে বিলু সঙ্গে ছিল। প্রবাসীতে আমার লেখা বাহির হইবার কিছুদিন বাদে একদিন প্রবাসী আপিসের সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, তখন রাস্তায় আলো জলিয়াছে, দেখি সম্পাদকের ঘরে আলো জলিতেছে। কৌতূহলী হইয়া ঢুকিয়া দেখিলাম যে রামানন্দবাবু প্রুফ সংশোধন করিতেছেন; কাল কাগজ বাহির হইবে। বিলু তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর বিলুকে কোন্ ক্লাশে পড় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। হঠাৎ বিলু বলিয়া উঠিল যে আমিও আপনাকে সন্দেশ ও ঘোল খাওয়াইব; আমার লেখা ছাপিতে হইবে। খুব লজ্জা হইল; রামানন্দবাবু বিলুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে বড় হও, লিখ, তোমার লেখাও ছাপিব—ভাল লেখা হইলে। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন যে আমার অনেক বদনাম আছে; কিন্তু ঘোল খাইয়া লেখা ছাপাইয়াছি কেহ বলে নাই; তোমাকে ঘোল খাওয়াইতে হইবে না আমি এমনই তোমার লেখা ভাল হইলে ছাপিব। বিলুর লেখা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে বটে; কিন্তু তখন রামানন্দবাবু স্বর্গে।

রামানন্দবাবু কিরূপ তেজস্বী ছিলেন তাহার একটা গল্প বলি। তিনি তখন ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের বাসায় থাকিতেন। পাঞ্জাবের এক দেশীয় নৃপতি বড় অত্যাচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার খুড়শ্বশুরকে হত্যা করিয়া খুড়শাশুড়ীকে জোর করিয়া বিবাহ করেন। নাইট উপাধিধারী এক ব্যক্তির কন্যা রাজপ্রাসাদ দেখিতে যাইলে তাঁহাকে ধর্ষণ করিলে এই কন্যা দুঃখে, অপমানে আত্মহত্যা করে। এই নাইট প্রমাণ প্রয়োগসহ রাজার অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করিয়া ছাপান ও বিলি করেন। একদিন কাছারীর ফেরত তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, বড় গরম বলিয়া তিনি ঘোলের সরবত প্রভৃতি খাইতে দিয়াছেন, এমন সময়ে এক সুবেশ পাঞ্জাবী মধ্যবয়সী লোক দামী মোটরগাড়ী হইতে নামিয়া রামানন্দবাবুকে বলিলেন যে আমি আপনার সহিত গোপনে কথা বলিতে চাহি, এই ভদ্রলোককে উঠিয়া যাইতে বলুন। রামানন্দবাবু আমাকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কিছু বই দিলেন; বই উল্টাইতেছি, এমন সময়ে রামানন্দবাবুর ক্রুদ্ধ স্বর শুনিতে পাইলাম—**Get out, get out; nobody has dared to offer me bribe; I care little for your Rs. 10,000** ইত্যাদি। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের কথা বুঝিতে না পারিলেও বুঝিলাম তিনি অনুনয় করিতেছেন—আর রামানন্দবাবু 'গেট্ আউট, গেট আউট' বলিতেছেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম রামানন্দবাবুর মুখচোখ লাল, উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, রাগে কথা বলিতে পারিতেছেন না। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। মিনিট কতক বাদে রামানন্দবাবু বলিলেন যে লোকটা আমাকে ঘুষ দিতে আসিয়াছিল, দেখিতেছেন দেশের কি অবস্থা। সেদিন তিনি আর ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না।

রামানন্দবাবু উৎসাহ দিয়া, **Subject suggest** করিয়া তাহার জন্য মাল মশলা বই আনাইয়া দিতেন, লেখক সৃষ্টি করিতেন। ডঃ সত্যচরণ লাহার আগড়পাড়ার বাগানে যে পক্ষীশালা বা **Aviary** আছে, তাহা বিলাতের **Aviary** পত্রিকার মতে **one of the finest in the world.** রামানন্দবাবু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও আমরা একদিন এই পক্ষীশালা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি ডঃ লাহাকে পাখীর সম্বন্ধে লিখিতে

বলিলে ডঃ লাহা তাঁহার 'সাজেসন' অনুযায়ী "কালিদাসের পাখী" বই লিখেন।

কোন পাখী একটি ডিম একবারে পাড়ে, আবার কোন পাখী একবারে ২টি, ৩টি, ৪টি, ৫টি পাড়ে। ডিমের size টুনটুনি পাখীর ডিম, মটরের মতন থেকে উট পাখীর ডিম ছয়-সাত ইঞ্চি অবধি হয়। খোলা অতি পাতলা, ক্ষণভঙ্গুর থেকে টাকার মতন পুরু ও ইটের মতন শক্ত আছে। আর বর্ণবৈচিত্রের ত কথাই নাই। আমাদের এই ডিমের বৈচিত্র সম্বন্ধে লিখিতে বলিয়াছিলেন, বই ত আনাইয়া দিয়াছিলেনই, ডিমের ছবিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের অপারগ দেখিয়া আমার এক ভাইকে এই ডিমের কথা ও ঠাকুর পূজায় যে যে ফুল ব্যবহৃত হয় তাহাদের কথা লিখিতে বলেন। জবা ফুলই কত রকমের, একমুখী, জোড়ামুখী, পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী, বিলে জবা, সাদা জবা, লম্বা জবা কতরকমের আছে। ধুতরা ফুল সাদা, হলদে, নীল—একমুখী, দুমুখী, পাঁচমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, আকারেও ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা থেকে এক ফুট, সওয়া ফুট লম্বা পাওয়া যায়। আমরা কেহই পারি নাই। বেলপাতা সাধারণতঃ তিন-মুখী হয়, ১০,০০০ হাজার বেলপাতার মধ্যে এক একটি পাঁচমুখী হয়। চারমুখী বেলপাতা আরও দুর্ল্ভ। আমার ভাই এইসব বেলপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক কাগজে করিয়াছিল। আমার এই ভাই রবীন **Smallest flowering plant** আবিষ্কার করিয়া রামানন্দবাবুকে বলে, এই গাছ ১ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট। তিনি ইহার ছবি ইত্যাদি, যেখানে পাওয়া গিয়াছে সে স্থানের ছবি ছাপিতে রাজি ছিলেন। রবীন তখন সরকারী চাকুরী করে, এই লেখা ছাপাইবার অনুমতি পায় নাই। পরে যখন চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন হইল, তখন রামানন্দবাবু স্বর্গে। এ বিষয়ে সে বিলাতের **Nature**-এ ও ফরাসী দেশের **Natura**-য় লিখিয়াছে। আমাদের দেশে কত গবেষণা, কত স্বাধীন চিন্তা উপরওয়ালাদের আহাম্মুকীর দরুণ নষ্ট হয় কে তাহার হিসাব করিবে? স্বাধীনতার পর এই অসুবিধা আরও বাড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

রামানন্দবাবু বলিতেন যে তিনি স্যর নীলরতন সরকারের মুখে শুনিয়াছেন যে রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু গবেষণা উপরওয়ালা সাহেবের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহেব পাইলেন খ্যাতি, আর গোপালবাবু হইলেন রায়বাহাদুর, তাহাও বহুদিন পরে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বাংলা অভিধান প্রভৃতির লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বলিতেন যে ভারত-বর্ষের মধ্যে রামানন্দবাবুই সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রিকায় লিখিলে টাকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ছবি ছাপা হইলেও টাকা দিতেন। ইহাতে লেখক যে শুধু উৎসাহিত বোধ করিতেন তাহা নহে, লেখকের লিখিবার জন্য যে আনুসঙ্গিক খরচ হইত তাহা পাইয়া লেখক আরও ভাল লেখা লিখিত। আমরাও এইরূপ টাকা পাইয়া বই কিনিয়াছি, লাইব্রেরীর চাঁদা দিয়াছি, যে সব লাইব্রেরীতে চাঁদা নাই সেখানকার বই থেকে অনুলিখনের খরচা যোগাইয়াছি। লিখিবার জন্য বহু বই রামানন্দবাবু আমাদের দিয়াছেন। বইয়ের সন্ধান দিয়াছেন, কখনও কখনও আনাইয়া দিয়াছেন।

বাংলা দেশে গুণগ্রাহিতা খুবই কম; খাটাইয়া পয়সা দিব না বা তাহাকে স্বীকার করিব না ইহাই হইতেছে ছোট বড় সকলকার নিয়ম। মডার্ণ রিভিউতে বহু **Notes** লিখিয়াছি, রামানন্দবাবু তাহা ছাপিয়াছেন—নীচে আমার নামের আদ্যাক্ষরগুলি থাকিত। যে সব নোট্‌সের তিনি কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতেন সেগুলিতে আমার নাম থাকিত না; কারণ আমার ভাষা তীব্র হইত;- অনেক স্থলে তথ্য এক হইলেও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতানৈক্য হইত।

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আমাদের অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহা বলিব। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি তখন স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। একদিন কথা হইল বাংলার হিন্দু অস্পৃশ্য জাতিদের সংখ্যা ও অস্পৃশ্যতার রকম সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতিতে কি আছে তাহা জানিতে পারিলে ভাল হয়। বলিলাম সব বছরের সেন্সাস রিপোর্ট ত আমাদের কাছে নাই; আর রিজলি সাহেবের **Tribes and Castes**-এর দুই খণ্ডের এক খণ্ড 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তেও নাই। কোন উৎসাহী

ছেলেছোকরাকে দিয়া এই কাজটি করাইতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিলেন করান। পরে নির্ম্মলকুমার বসু মারফত নৃতত্ত্ব পড়ে এমন একটি ছেলের সন্ধান পাইলাম। ছেলেটি প্রাইভেট টিউসানি করিয়া পড়ে, বাড়ির অবস্থা ভাল নহে। তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া টাইপ করা প্রায় ৩০ পাতা আমাদের দিল। হিন্দু মহাসভায় এই ৩০ পাতা দাখিল করিয়া তাহার পারিশ্রমিক চাহিতে মন্মথবাবু ১০৲ টাকা মঞ্জুর করিলেন; বলিলাম বড় কম হইল, উহাকে অনেক জায়গায় যাইতে হইয়াছে, অনেক খাটিতে হইয়াছে, টাইপ করাইতে হইয়াছে আরও কিছু দিউন। মন্মথবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন তবে কি ১০০৲ টাকা দিতে হইবে? আপনার টাকা থাকে ত দিউন। আমার রাগ হইল, বলিলাম, যাহা দিবার আমিই দিব, ও ১০৲ টাকা রাখিয়া দিউন। শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্মথবাবুর মান রাখিবার জন্য বলিলেন ও ১০৲ টাকা লউন, তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিবেন। ছেলেটিকে আমি সবশুদ্ধ ২৫৲ টাকা দিয়াছিলাম; আর শ্যামাপ্রসাদবাবু তাহাকে একটি 'ওয়েল-পেড্' টিউসানি করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ তখন হিন্দু মহাসভার টাকা যে নাই তাহা নহে, কর্পোরেসন ইলেকসনে আমাদের হাত দিয়াই প্রত্যেক মিটিংয়ের জন্য দৈনিক ১০০।১২৫৲ টাকা খরচ হইতেছে—অন্য খরচও আছে।

একবার তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য খবর পাঠান ও দুই তিনখানা চিঠিও লেখেন। সে সময়ে আমার মেজ-ছেলে নিলু মারা যাওয়ায় দেখা ত করিই নাই, চিঠির জবাবও দিই নাই। বেশ কিছুদিন বাদে যখন দেখা করি, নিলুর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, পাঁচ-সাত মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন যে এ শোক না পাইয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না ইহার জ্বালা কিরূপ; আপনার স্ত্রী নাই—শোকের অংশীদার নাই। বুক ফেঁাপরা হইয়া যায়। কর্ণ ও বৃষকেতু দেখিতে এক-রকম ছিল; কর্ণের জীবদ্দশায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বৃষকেতুর মৃত্যু হয়। যুদ্ধের শেষে যখন দাহ করিবার ব্যবস্থা হয়, কর্ণের মাথা কোন দেহের সহিত যুক্ত হইবে? কর্ণের ও বৃষকেতুর দেহ দেখিতে ত একই রকম। কর্ণ পুত্রশোক পাইয়া মরিয়াছেন, তাহার বুক ফেঁাপরা হইয়া গিয়াছে, যে দেহে বর্শা সহজে প্রবেশ করিবে সেইটি কর্ণের। সেদিন আর বেশী কথা হইল না; দেখিলাম তাঁহার চোখে জল। আসিবার সময় বারে বারে বলিলেন আপনি ভগবানের কাছে শোকে শান্তি দিবার জন্য প্রার্থনা করুন।

স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট কোন বিষয়ে জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে রামানন্দবাবু আপনার সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছেন, আপনি primary প্রামাণ্য source জানিতে চাহেন; ওরকম প্রামাণ্য primary source উপস্থিত আমার কাছে নাই, আমি খুঁজিয়া রাখিব, আপনি মাসখানেক বাদে আসিবেন। পরে যাইলে তিনি বলেন যে সেরূপ প্রামাণ্য source পাই নাই, তবে একটি লেখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে কি আপনার কাজ চলিবে? রামানন্দবাবু পরোক্ষে বহু লোকের কাছে আমার প্রশংসা করিয়াছেন। ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছি। মেঘনাদ যখন এলাহাবাদে রামানন্দবাবু 'যতীন্দ্রবাবু'র খুব প্রশংসা করেন; মেঘনাদ ধরিতে পারে নাই যে আমরা তাহার সহপাঠী। পরে কলিকাতায় আসিলে কথা-প্রসঙ্গে বলে, ওঃ, তুমিই রামানন্দবাবুর "যতীন্দ্রবাবু"; আমি মনে করি কি আর কেহ। এইরূপ কত লোকের কাছে যে তিনি সুখ্যাতি করিয়াছেন কে জানে। আমাদের অসাক্ষাতে রামানন্দবাবুর আমাদের প্রশংসা করিয়া কি লাভ হইত? একটুতেই তিনি প্রশংসা করিতেন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপকের ব্যবহার পাঠকগণের গোচরে আনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আজ থেকে ২৫।২৬ বৎসর আগে mathematical economics সম্বন্ধে একটি ছোট লেখা লিখি। লিখিয়া ঠিক হইল কিনা জানিবার জন্য ঐ অধ্যাপকের সহপাঠী, উপস্থিত আমাদের সহকর্মী তাঁহাকে বলি যে উঁহাকে এই লেখাটি দেখাইয়া উঁহার মতামত আমাদের জানান। তিনি আমাদের লেখাটি লইয়া ঐ অধ্যাপককে দেখাইলে তিনি বলেন, "ও পাগলার লেখা আবার কি দেখিব?

বিজ্ঞানের ছাত্র, ওকালতী করিয়া খায়, আবার 'ইকনমিক্‌স'-এর প্রবন্ধ লিখিয়াছে !!" লেখাটি ফেরৎ আসিলে সব কথা শুনিয়া ক্ষোভ হইল। বিলাতে Lord Keynes-কে ঐ লেখাটি পাঠাইলে তিনি বিলাতের 'ইকনমিক্ জার্ণাল'এ উহা প্রকাশ করেন ও ৩ গিনি ও ২৫টি 'রিপ্রিন্ট' দেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীর লেখা 'ইকনমিক্ জার্ণাল'-এ প্রকাশিত হয় নাই।

রামানন্দবাবুকে সমস্ত কথা বলিলে তিনি বলিলেন যে এই ব্যবহারের পার্থক্যের জন্যই ইংরাজ আজ এত বড়, আর আমরা এত ছোট। কাহাকেও নিরুৎসাহিত করার মতন পাপ আর নাই। নিজের কথা বলিলেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের যখন ছাত্র ছিলেন তখন রমেশচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ইংরাজী স্কুলে ভালই জানিতাম; রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একদিন স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমার ভাল ইংরাজী জ্ঞান দেখিয়া একখানি বই উপহার দেন। এই উপহার পাইয়া আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল; ইংরাজী ভাল করিয়া শিখিবার, ইংরাজী সাহিত্য পাঠের আগ্রহ দশগুণ বাড়িয়া গেল।

সামান্য উৎসাহের অভাবে কত ভাল ভাল ছেলে নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে আমাদের দেশে। অধ্যাপক বুথ সাহেবের উৎসাহ না পাইলে আশুবাবুর মতন মেধাবী ছাত্রেরও অঙ্কশাস্ত্রে নূতন নূতন গবেষণা করা সম্ভব হইত না। তাহার পর এক পাঞ্জাবী দেশী কৃশ্চানের কথা বলিলেন—নামটা ভুলিয়া গিয়াছি, ইনি পরে পাতিয়ালার শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইনি ডি. মরগান-এর এলজাবরা-য় একটি 'ভুল' বাহির করিয়া ডি. মরগানকে লিখিলে ডি. মরগান তাঁহাকে তাঁহার **elegant solution**-এর জন্য ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখেন। এই পত্র পাইয়া তিনি খুব উৎসাহিত বোধ করেন ও অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

আপনাদের পানিহাটির পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আমাদের দেশ পানিহাটি) লক্ষ্ণৌতে পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করিতেন। তাঁহার আবিষ্কারের সহিত সাহেব একমত হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে ধমকাইলেন—পূর্ণবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। এখন ত দেখা যাইতেছে যে পূর্ণবাবুর কথাই ঠিক। পূর্ণবাবু পুরাতত্ত্ব বিভাগে থাকিলে খুব ভাল হইত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সামান্য চাকুরী করিত। লর্ড কার্জ্জন মিউজিয়ম দেখিতে আসিয়া রাখালের গুণের পরিচয় পাইয়া পদোন্নতি করিয়া দেন। এই পদোন্নতি না হইলে রাখাল মহেঞ্জো-দাড়ো আবিষ্কার করিতে পারিত না, বা উড়িষ্যার ইতিহাস লিখিতে পারিত না।

আমাদের উপর রামানন্দবাবুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব খুব বেশী। লেখক বলিয়া আমাদের যদি কোন সুনাম থাকে ত তাহার একটা মোটা অংশের জন্য রামানন্দবাবুর প্রভাব দায়ী। তাঁহার স্মৃতিকে প্রণাম করিয়া এই লেখাটি শেষ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আমার বয়স এখন ছিয়াত্তর। জীবনের এই পথ-পরিক্রমায় যাঁহাদের সস্নেহ আশীর্বাদ এবং অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে সাংবাদিক-প্রবর, জ্ঞান-তপস্বী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। সে আজ বহুদিন পূর্বেকার কথা; তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চাঞ্চল্য বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় আকাশকে মথিত করিতেছে; ১৯১০ সালের সেই সময় আমি ছিলাম বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র; বয়স তখন আমার একুশ বৎসর; এই সময় আমার মেজদাদা (বাগবাজার মহারাজা কাশীমবাজার পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—প্রধান শিক্ষক, স্বর্গীয় অনাথনাথ মিত্র) রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করিতেন; ছাত্র জীবনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে আমার তাঁহার দেখাদেখি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অনুবাদের দুরাশা জাগিল; বঙ্গবাসী কলেজের এক অতি সাধারণ ছাত্রের রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করার চেষ্টা দুরাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সেই দুঃসাহসিক ইচ্ছা আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; 'গল্পগুচ্ছ' হইতে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি বাছিয়া লইলাম। বারবার পড়িলাম, অভিধান দেখিয়া অনেক বাংলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ খুঁজিয়া বাহির করিলাম; তাহার পর কাগজ ক্রয় করিয়া দুরাশাকে সফল করিবার জন্য কালি কলম লইয়া বসিলাম; প্রায় ২।৩ মাস ধরিয়া বহু চিন্তা করিয়া, বহু পাতা ছিন্ন করিয়া সাধ্যমত 'পোষ্টমাস্টার' গল্পের অনুবাদ করিয়া ফেলিলাম; কিন্তু আমার অপটু হস্তের ফসল কাহাকে দিয়া পরখ করাইব তাহা লইয়া চিন্তিত রহিলাম; অবশেষে সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করিয়া একদিন কম্পিত বক্ষে বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া আমার এই দুঃসাহসিকতার কথা বলিলাম এবং অনুবাদটি পরখ করিয়া দেখিবার অনুরোধ জানাইলাম; তিনি হাস্যসহকারে অনুবাদটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রসন্নতা আজিও আমার স্মরণে আছে; আমার রচনাটির দশা কি হইবে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তখন দিন গুনিতেছি; এমন সময় অধ্যাপক মহাশয় সংশোধিত অনুবাদটি আমাকে ফেরৎ দিয়া উহা **Modern Review**-তে ছাপাইতে দিবার জন্য বলিলেন। আমি ত বিস্ময়ে হতবাক! রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' তখন সমগ্র ভারতের সবচেয়ে অভিজাত সম্পাদক ও পত্রিকা; কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "সোজা রানানন্দবাবুর কাছে যাবে, তিনি বাঘ নন্।"

হ্যাঁ, আমি কয়েকদিন পরেই বুঝিয়াছিলাম তিনি অনধিগম্য নহেন; পরিচয়হীন আমি কোন সুপারিশ ব্যতীত তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ফিরাইয়া দেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলিতে তখন "মডার্ণ রিভিউ" ও "প্রবাসী"র অফিস ছিল। একদিন সকাল দশটার সময় দ্বিধাজড়িত পদে একতলায় রামানন্দবাবুর আপিস-ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি তখন লেখাতে নিমগ্ন ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াছি, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি ও তাঁহার রচনাবলী পড়িয়াছি। সুতরাং তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব হইতেই আমার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট-সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ আসে নাই; অতি অল্পক্ষণ পরেই তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হইলেন ও আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দান করিলেন। প্রণামের পালা চুকিতেই তিনি আমায় বসিতে বলিলেন; আমি আমার বক্তব্য

তাঁহাকে বলিয়া অনুবাদটি তাঁহার হস্তে দিলাম। অনুবাদটির কয়েক পৃষ্ঠা সাধারণ ভাবে দেখিয়া তিনি আমার সম্পর্কে কিছু জানিতে চাহিলেন। চলিয়া আসিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন "আবার এস।" ফিরিয়া আসিবার সময় মনে হইল তিনি বাঘের মত বলেন এবং লেখেন কিন্তু ব্যক্তি রামানন্দ সদাস্নেহশীল।

পরবর্তী বৎসর "মডার্ণ রিভিউ"তে "পোষ্টমাষ্টার" গল্পের আমার ইংরাজী অনুবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল। একে ইংরাজী লেখা, তাহার উপর "মডার্ণ রিভিউয়ের" ন্যায় বিখ্যাত পত্রিকায় তাহার প্রকাশ আমাকে আনন্দে আপ্লুত করিল; বঙ্গবাসী কলেজের এক সাধারণ ছাত্রের রচনাকে রামানন্দবাবু যে "মডার্ণ রিভিউর" প্রথিত-যশ লেখকদের সমমর্য্যাদা দান কবিবেন ইহা ছিল আমার ধারণার বাহিরে; তখন হইতেই রামানন্দবাবু আমার নিকটে নূতন রূপে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করেন।

ইহার পরেই আমি সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাবোর কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাই এবং তখন হইতেই বাংলায় কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করি। মনে আছে সাবোর হইতেই "ফুলকপির চাষ" সম্বন্ধে আমি 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পাঠাই। উহা ১৩১৯ সনের প্রবাসীর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আজ হইতে বাহান্ন বৎসর পূর্বে সেই আমার প্রথম "প্রবাসী"র সহিত লেখক হিসাবে সংযোগ সাধিত হইল। "মডার্ণ রিভিউ"তে নিজের ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া যে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ তাহা অপেক্ষা কম আনন্দ দেয় নাই। আর কিছু না হউক প্রবাসীর ন্যায় প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে আমার প্রকাশিত প্রবন্ধ যেন ছাত্রাবাসের অন্যান্য সদস্য হইতে আমাকে পৃথক করিল; মনে আছে সাবোর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় আমার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

রামানন্দবাবুর বিশেষত্ব এইখানেই; সহজেই তিনি আমার উভয় রচনাকে বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সম্পাদকসুলভ উন্নাসিকতার কোন চিহ্ন আমি কোনদিন তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাই নাই। সম্পাদকের ডেস্কে বসিয়া তিনি প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতে "প্রবাসী" সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "প্রবাসী" পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া কত যে "লিজেণ্ড" আছে তাহার ইয়ত্তা নেই; রামানন্দবাবুর সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা বহু সাহিত্যিককে খ্যাতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। তাঁহার মত বাঘা সম্পাদক তখন ক'জন ছিলেন, এখনই বা ক'জন আছেন জানি না। কিন্তু অনামা ও অর্বাচীন লেখককে উৎসাহ দানের ক্ষেত্রে রামানন্দবাবু অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মনে হয় তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক লেখক-গোষ্ঠী প্রস্তুত করা।

সাবোর কৃষি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সরকারী কার্য উপলক্ষে আমাকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিতে হইয়াছিল। কাজে কাজেই প্রথম পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ হইল না, কিন্তু রামানন্দবাবু আমাকে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত আমার পত্র বিনিময় হইত। কৃষি-বিষয়ক পুস্তক সমালোচনার জন্য তিনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। "মডার্ণ রিভিউ" ও "প্রবাসীতে" আমার সেই সকল সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। ঠিক মনে নাই, 'মডার্ণ রিভিউ'তে আমার ২।৩ টি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'প্রবাসীতে' যে আমার কতগুলি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া দুষ্কর। একথা শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় আমাকে বলিতেই হইবে যে, তিনি 'প্রবাসী'র দরজা আমার জন্য খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই দরজা বন্ধ করেন নাই। সময় সময় রামানন্দবাবু বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার নির্দেশ দান করিতেন।

বৃহৎ মানুষের মানসিক বৈভব ও চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া স্বতই প্রকাশিত হয়। আমার স্মৃতিতে রামানন্দবাবুর হৃদয়ের মণিকণিকা সঞ্চিত আছে তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব।

গল্পের মধ্য দিয়া উন্নত কৃষি প্রসারের জন্য "ভুলের

ফসল" শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলাম; বলাবাহুল্য তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করি নাই; কৃষির নিরস বিষয়কে গল্প কথায় সরস করার প্রয়াস পেয়েছিলাম মাত্র। প্রবাসীতে উক্ত পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচক মহাশয় বিরূপ সমালোচনা করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি পরিহাসচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে লেখক চাষা, লিখিয়াছেন গল্প; তাঁহার এই মন্তব্য ও চাষারূপে আমাকে অভিহিত করায় আমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। ইহার পরে কলিকাতায় রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমার উক্ত মন্তব্য-সঞ্জাত মানসিক আঘাতের কথা বলিয়াছিলাম; তিনি তাঁহার নিজস্ব মৃদু হাসির সহিত আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার কর্তব্যকর্মের পটভূমিকায় আমার এই চাষা আখ্যা অন্যায় নহে এবং এই আখ্যার জন্য তিনি আমাকে গর্ব অনুভব করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; তখন হইতে আমি সভাসমিতিতে রামানন্দবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া নিজেকে 'চাষা' রূপে পরিচিত করিতে আরম্ভ করি। ইহার ফলে গ্রামের কৃষক সাধারণের সহিত আমার দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। এই সামান্য ঘটনাটুকুর মধ্য দিয়া কৃসি ও কৃষক-সমাজের প্রতি তাঁহার মনোযোগ প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' কার্যালয় হইতে কৃষিক্ষেত্র বহু দূরে ছিল কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত চিন্তা মাটির সমস্যার প্রতিও প্রধাবিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই "প্রবাসীতে" কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কীয় যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমার মনে হয় আর কোন পত্রিকাতে (কৃষি পত্রিকা ব্যতীত) প্রকাশিত হয় নাই।

আর একটি ঘটনার মধ্য দিয়া রামানন্দবাবুর অনন্য দৃঢ়তার পরিচয় লাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার কর্মজীবনের কোন এক সময়ে বাঁকুড়ায় একটি কৃষিশিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তখন জেলার শাসক। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদত্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের ভাষণের আমি অনুলেখ করি; উক্ত অনুলেখনটি আচার্যদেব স্বয়ং "প্রবাসীতে" ছাপাইবার জন্য রামানন্দ সমীপে গমন করিয়াছিলেন এবং আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন; রামানন্দবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে বাঁকুড়ায় তাঁহার বাড়ি, অত ছবি সহ উক্ত অনুলেখনটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আসিতে পারে। ইহা ছাপান কোনক্রমে তাঁহার পক্ষে শোভন হইবে না। অতঃপর স্পষ্টই তিনি আচার্যদেবের মুখের ওপরেই বলিয়াছিলেন 'প্রবাসী'তে তিনি ছাপিতে পারিবেন না। নিজের নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য সদা প্রকাশমান। সাংবাদিকতার উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্য আর কয়জন সম্পাদক নির্ভীক হইতে পারিতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় মানুষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে? বর্তমানের বাংলা সাহিত্য-জগতের ও সাংবাদিকতার পরিবেশে ইহা গল্প কথা বলিয়াই মনে হইবে।

নিজের সীমাহীন পাণ্ডিত্যকে কখনই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে দেখি নাই। অন্য-কৃত যে কোন ব্যাপারকে বাহবা দিবার তাঁহার একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। ইডেন গার্ডেনে ওয়েম্বলে প্রদর্শনীর পূর্বে যে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল; তাহার কৃষি বিভাগের ষ্টলের আমি ছিলাম ভারপ্রাপ্ত। বিভিন্ন ইংরাজী শব্দের আমায় বাংলা করিতে হইয়াছিল। Pedigree Bull-এর আমি বাংলা করিয়াছিলাম "বংশ জানা ষাঁড়"। রামানন্দবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাংলা প্রতিশব্দটি যথার্থ হইয়াছে কিনা। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন যে তিনি এর চেয়ে সহজ বাংলা প্রতিশব্দ করিতে পারিতেন না; তখনও আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হয় তাঁহার সেই উক্তি সে কেবল স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিরাট পুরুষ! তাঁহার বিরাটত্বের সম্যক আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। নিকট ও দূর হইতে তাঁহার যে রূপ আমি দেখিয়াছি তাহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের জ্ঞান-তাপস ঋষিদের কথাই স্মরণে আসিয়াছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অবিস্মরণীয়! রাজরোষের রক্তচক্ষু অস্বীকার করিয়া "মডার্ণ রিভিউতে" বৃটিশ সরকারের যে নির্ভীক

সমালোচনা তিনি করিতেন তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহার দেশপ্রেমের গভীরতা প্রকাশমান; রাজনীতির প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিলে নেতৃত্বের উচ্চ আসনে সহজেই তিনি আসীন হইতে পারিতেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাবিহীন জীবনে সহজলভ্য সম্মানের কোন আবেদনই ছিল না। ভারতের জাতীয়তার প্রতি, অখণ্ডতার প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত আগ্রহ তাহার প্রকাশ দেখা যায় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী সম্মেলন আহ্বানের মধ্যে। আজ সমগ্র ভারতে সমস্যার অভাব নাই। কিন্তু তাহার অন্যতম কারণ নেতৃত্বের সঙ্কট। চিন্তা-দীনতা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। এই সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় যাঁহারা একদা তাঁহাদের মনীষা ও প্রজ্ঞার দ্বারা জাতীয় জীবনের অন্ধকার পথকে আলোকিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করা। আমরা সমারোহে বহুজনের শতবার্ষিকী করিতেছি। ধূপ ও ধুনার ধোঁয়ায়, কিন্তু তাঁদের আদর্শকে আমরা অস্পষ্ট করিয়াই রাখিতেছি! বার্ণার্ড শ ঠিকই বলিয়াছিলেন :—

"In a stupid nation the man of genius becomes a gcd, everybody worships him and nobody does his will."

অন্তত আর কোথাও না হউক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও যদি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা ও আদর্শকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেও এই শতবার্ষিকীর সার্থকতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

স্মৃতিকথা

শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি সাংবাদিক, দেশহিতব্রতী ও সমাজসেবীরূপে এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন, সেই অকুতোভয় কর্ম্মী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে যে স্মারক সংখ্যাটি তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "প্রবাসী" পত্রিকার পক্ষ হইতে বাহির হইতেছে তাহাতে তাঁহার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঋণ এবং তাঁহার চরিত্রের যে মূল্যায়ন আমার মনে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা লিখিবার অনুরোধ পাইয়া কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি; কেননা আমি জানি তাঁহার প্রকৃত মূল্যানের শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। তথাপি সাংবাদিক জীবনে আমার প্রবেশের মূলে যে তাঁহার সস্নেহ আহ্বান ও সযতন শিক্ষাদানে সম্ভব হইয়াছে সেই কথা স্মরণ করিয়া আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাঁহার সাদর আহ্বান আমার ছাত্র জীবনে পাইয়া উহাকে আমার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণের প্রেরণা আমি পাই। সাংবাদিক হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তরুণদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার অসাধারণ দক্ষতা তাঁহার ছিল। তাই আমা অপেক্ষা বয়সে কম শ্রীঅমলচন্দ্র হোম বয়সে অত্যন্ত নবীন এবং কাঁচা, তখনই রামানন্দবাবু অমলের সাংবাদিক-বৃত্তি অবলম্বন করিলে যে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল তাহা অনুভব করিয়া তাহাকে প্রবাসী পত্রিকায় উহার প্রথম পাঠ গ্রহণের জন্য ডাকিয়া সযতনে শিক্ষা দিয়া অতি অল্পদিনেই এক দক্ষ সাংবাদিকে পরিণত করেন। আমাকেও তিনি "প্রবাসী"তে দেশ-বিদেশের কথা ও পারাপারের ঢেউ শীর্ষক দুইটি বিভাগের ভার অর্পণ করেন। এই কাজ আমার মত অনভ্যস্ত লেখকের পক্ষে কখনই পাঠযোগ্য রচনায় পরিণত করিতে সম্ভব হইত না, যদি তাঁহার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা আমার এবিষয়ে শিক্ষাদানেরও না থাকিত।

উত্তর জীবনে যেটুকু সাফল্য আমার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহার গোড়া পত্তন হয় তাঁহারই কৃপায় এবং সেজন্য আমি তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। অবশ্য আমার মত একজন ব্যক্তির ঋণ তাঁহার মত মহৎ ব্যক্তির পরিচয়ে অতি সামান্য ব্যাপার; তথাপি তাঁহার বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে সেই ঋণের কথা প্রথমে স্বীকার না করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এবিষয়ে উল্লেখের প্রয়োজনও এই যে সাধারণ মেধা ও বুদ্ধির লোককেও তাঁহার প্রভাব কি ভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে সহায়ক হইয়াছে তাহারই এক সামান্য উদাহরণ। সত্যসন্ধ এই মহাপ্রাণের সত্যকে নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রকাশ করিবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে ভারতের মধ্যে যে মহাজনকে তিনি শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং যাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, সেই রাজর্ষি রামমোহনের চরিত্রে মসীলেপন করিয়া ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা প্রকাশার্থে "প্রবাসী"তে প্রদান করিলে, ঐতিহাসিকরূপে বিদিত ব্রজেন্দ্রবাবু যে বিশেষ স্বার্থে তথ্য বিকৃতি ও তথ্য বিলোপ করিয়া কুযুক্তি ও কুতর্কের অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই—যদিও তাঁহার রামমোহন চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণা তাঁহাকে রামমোহনের একান্ত অনুরাগী ভক্তে পরিণত করিয়াছিল এই চরিত্র-চিত্রণ সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া তিনি উহার সত্যতা সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই; তথাপি যদি এই চরিত্র-চিত্রণের কোনও সত্য ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করা উচিত বোধে ওই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হইতে চাহেন নাই।

তাহার পর যখন আমি সত্যকে যুক্তি-তথ্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রমাণ করিলাম যে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত অপবাদের কোনও সত্য ভিত্তি নাই, উহা স্বেচ্ছাকৃত তথ্য বিলোপ ও তথ্য বিকৃতির উপরেই রচিত তখন তিনি আনন্দিত চিত্তে উহা প্রকাশ করেন এবং পরে ব্রজেন্দ্রবাবু যে ভুল তথ্যের উপর বাঙ্গলা গেজেটের অগ্রে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার সম্পাদকরূপে অর্দ্ধশিক্ষিত একজন কম্পোজিটার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে প্রকৃত সম্পাদক সুবিদ্বান ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হরচন্দ্র রায়ের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনুসরণে প্রবাসীতে লেখেন,

তখন তাঁহার সেই অপকীর্ত্তির প্রমাণ সহকারে খণ্ডন ও একজন বাঙ্গালীর প্রাপ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করি তাহাও তিনি সাদরে প্রকাশ করেন।

তাহার পরে তিনি রামমোহন জীবনী সম্পর্কে নব নব তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য বার বার তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহ আমাকে এই পরিশ্রম-সাধ্য কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং নানা পত্রপত্রিকায় আমি বহু অজ্ঞাত অথবা বিস্মৃতপ্রায় তথ্যের সন্ধান পাইয়া যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছি এবং কুমারী কলেটের রামমোহন জীবনীর যে সংস্করণ আমার ও অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাসের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূলে রামানন্দবাবুর প্রেরণা ও আগ্রহই প্রধান ছিল। সত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কি প্রকার আগ্রহ ছিল তাহার সম্পর্কে ধারণা ইহা হইতেই পাঠকগণ করিতে পারিবেন। তাঁহার নিকট হইতে আর একটি বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি তাহা হইল অকুতোভয়তা ও পক্ষপাতহীন বিচার।

ইংরেজ যখন এদেশের শাসক তখন তাঁহাদের শাসনের দোষ-ত্রুটি প্রদর্শনে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সাহসের প্রয়োজন ছিল। রামানন্দবাবু দেশের কল্যাণের পক্ষে অমঙ্গলকারী কোনও কার্য্য বা বিধান ইংরেজ সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার জন্য কয়েকবার শাসকবর্গের নিকট হইতে সাবধানতা-সূচক তাগিদ পাইয়াও তিনি কোনও দিন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। রেভারেণ্ড জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের রচিত এরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহার অর্থদণ্ড ও পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি নিরপেক্ষ বিচারের এমন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যাহাকে অনুসরণ করা সাংবাদিকতার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না; সেজন্য সকল দলের দোষ ত্রুটি যেমন তাঁহার নিকট সরা পড়িত, তেমনই সকল দলের প্রাপ্য গৌরব দিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

আমাদের দেশে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে নরমপন্থী, চরমপন্থী ও বিপ্লবী দলের মধ্যে আদর্শগত যে সংঘাত চলিতেছিল তাহাতে প্রতিটি দল অপর দুই দল অপেক্ষা নিজদলের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র গ্রহণীয় আদর্শরূপে প্রচার করিতেন। রামানন্দবাবুর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এই সোই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই তিনটি ভিন্ন পথাশ্রয়ী দলের প্রচেষ্টাই দেশের কল্যাণসাধনে সহায়ক এবং সজন্য প্রত্যেকেরই দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। সংঘাতের সূচনাকালেই এই মত তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে "অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র চরমপন্থী ও অসহযোগীরাই স্বাধীনতা চান এবং তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়েই স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। ওই উপায়েই যে স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা নরমপন্থী, উদারনৈতিক বা মডারেট নামে অভিহিত, তাঁহারা আপাতত যাহা চাহিতেছেন তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও তাঁহাদের অনেকের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহারা এখন যাহা চাহিতেছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইবার একটি ধাপ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এইজন্য তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার উল্টা দিকে যাইতেছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।"

নিরপেক্ষ দৃষ্টির এরূপ বহু আলোচনা তাঁহার মন্তব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে তাঁহার স্মরণীয় অবদান যত বেশী, অপর কাহারও তাহা আছে কি না সন্দেহ। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্রশোভিত মুদ্রণ-পারিপাট্যে অনবদ্য, সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ পত্রিকা সৃজন করিয়া পাশ্চাত্য দেশের সমতুল পত্রিকা এদেশে স্থাপন করেন। মডার্ণ রিভিউ সেজন্য এদেশেই নয়, পাশ্চাত্য মহলেও আদরণীয় হইয়া উঠে। যে-যুগে পত্রিকা প্রকাশ লাভজনক ছিল না, সেই যুগে এরূপ ব্যয়বহুল পত্রিকা-সৃজনে প্রবৃত্ত হওয়া কম সাহসের পরিচায়ক নহে। এ বিষয়ে তিনি সাহসিকতার সহিত পথিকৃৎ হওয়াতে ভারতে উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী ও প্রাদেশিক ভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নিয়মিতভাবে বহির্ভারতে ভারতীয়দের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, দাবীদাওয়ার কাহিনী এদেশে প্রচার করিয়া প্রবাসী ভারতবাসীদের বিষয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিজের জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশের যে সংস্ত কৃতী সন্তান বাঙ্গলার বাহিরে নিজেদের কৃতিত্বে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাঙ্গলা দেশকে অন্যত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহা "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিতে তিনি ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাহার ফলেই জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সুবৃহৎ পুস্তক "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

তাঁহার আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি হইল যে-যুগে ভারতীয় চিত্রকলা এদেশে সম্পূর্ণ অনাদৃত ছিল সেই যুগের উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া তিনি বহু উপহাস সহ্য করিয়া বহু ব্যয়ে অবনীন্দ্রনাথবাবুর প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলার নব রূপ এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার বিভিন্ন রূপ-প্রকাশক চিত্রের প্রতিলিপি [illegible]

পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশ করিয়া উহাকে সমালোচকের দৃষ্টি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনে সহায়ক হইয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে খুবই সহায়ক হইয়াছে। এজন্য ভারতীয় চিত্রকলার ঋণ তাঁহার নিকট অশেষ। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের আরম্ভ হয় তাঁহার মনে যৌবনে যে সমাজসেবার প্রেরণা জাগে তাহাকে রূপ দিবার ইচ্ছা হইতে।

যৌবনে তাঁহার বন্ধু ইন্দুভূষণ রায়, মৃগাঙ্ক রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস প্রমুখ কয়েক জনের সহিত মিলিত হইয়া রুগ্ন, আর্ত্ত এবং অসহায়দের সেবার জন্য যে দাসাশ্রম নামক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন, তাহার সংস্রবেই তিনি "দাসী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা স্থাপন করেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার সাংবাদিক জীবনের আরম্ভ। এই "দাসী" পত্রিকাতেই তিনি অন্ধদের জন্য পঠন-পাঠনের জন্য যে ব্রেল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাকে বাঙ্গলা অক্ষরে প্রয়োগের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। প্রয়োজনের তাগিদে যে আবিষ্কারও হয়, ইহা তাহারই একটি পরিচয়।

যৌবনে তিনি যে সেবাব্রতকে জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন সেই ব্রতে ব্রতী ছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে আমার জীবনে এক রোগপীড়ায় যখন আমি অসহায় অবস্থায় পড়ি তখন তাঁহার সেবার পরশে আমি আরোগ্যলাভের সুযোগ পাই। সেই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার কাহিনী বলিয়া আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করিব। ১৯১১ সালে আমি আমার ভগ্নীপতি মন্মথনাথ হালদারের কর্ম্মস্থল তাঁহাদের নিজস্ব চা-বাগিচা কমলপুরে কলেজের ছুটি উপভোগের জন্য গমন করিয়া তথায় তরাইএর দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হই। তখন আমার ভগ্নীপতি দার্জ্জিলিঙের আবহাওয়া সুস্থ হইয়া উঠিবার সহায়ক হইবে বোধে আমাকে তাঁহাদের দার্জ্জিলিংস্থ "হালদারকট" নামক গৃহে লইয়া যান। সেখানে একজন নেপালী দরওয়ান ও তার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া আমাদের পরিবারের বন্ধু দার্জ্জিলিঙের ডাক্তার শ্রীবিপিনবিহারী সরকারের চিকিৎসাধীনে রাখিয়া আমার ভগ্নীপতি তাঁহার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যান।

ডাক্তার সরকারের নিকট আমার সংবাদ পাইয়া একজন দরওয়ানের দ্বারা এক পীড়িত তরুণের প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা ও যত্ন হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া রামানন্দবাবু নিজে হালদারকটে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া আমাকে তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। সে বৎসর রামানন্দবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিঙে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিনের জন্য ছিলেন। তখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁহার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে পরিচিত পরিবারের একটি তরুণ প্রায় অসহায় অবস্থায় রোগগ্রস্ত হইয়া আছে শুনিয়া এই সেবাপরায়ণ মানুষটির সেবা করিবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে। তাঁহার বাসায় তাঁহার ও তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মনোরমাদেবীর সেবা আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই আদর-যত্ন এবং সাংবাদিক জীবনে দীক্ষার কথা ভুলিবার নয়। অবশ্য গুরুর উপযুক্ত শিষ্য আমি আমার অক্ষমতার জন্য হইতে পারি নাই, তবুও যেটুকু নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা আমার সাংবাদিক জীবনে আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তাহা তাঁহার শিক্ষা এবং বাঙ্গলা দেশের সাংবাদিকতার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মরণে সম্ভবপর হইয়াছে।

রামমোহন, হরিশচন্দ্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ হইতে যে ধারা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের ধারা সৃজিত হইয়াছিল, তাহা রামানন্দবাবুতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। আজ সাংবাদিকগণ প্রধানতঃ মালিকের ইচ্ছাতে কিম্বা যেখানে মালিকানার পরিবর্ত্তে দলীয় মত প্রচারে দলের দ্বারা চালিত সেক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থে চালিত হয়। আজ সাংবাদিকের সে গৌরব কোথায়? তাই আজ রামানন্দ-বাবুর অভাব আরও তীব্র করিয়া বাজে। দেশের এই দুরবস্থা দূর করিতে তাঁহার মত লোকের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এলাহাবাদে পিতৃদেব

শৈশবে আমি আমার পিতৃদেবকে যেরকম দেখেছিলাম, তার সব কথা আজ মনে নেই, থাকবার কথাও নয়। তবু সেই অর্দ্ধবিস্মৃত ছবির কিছু কিছুই আজ প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

আমার স্মৃতির জাগরণ এলাহাবাদে। সেখানে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের কাছে সাউথ রোড নামের একটি রাস্তার উপরে রোশনলাল নামক এক ব্যারিষ্টারের ছোট বড় কয়েকটি বাড়ী ছিল। বড়টিতে তিনি স্বয়ং থাকতেন প্রগণে, মাঝারি একটা বাড়ীতে আমরা থাকতাম। কলেজ বাড়ী থেকে খুব কাছেই ছিল। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হেঁটেই কলেজে যেতেন। একজন চাপরাশী একটা হাতবাক্স আর অন্যান্য জিনিষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেত। তিনি স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করতেন বলে এণ্ডি ও মুগার সুট কলেজের জন্য ব্যবহার করতেন, মাথায় দিতেন হিন্দুস্থানী টুপি। শীতকালে লাহোরের গরম কাপড়ের গ্রে ও প্রায় কালো পোষাক পরতেন। গলাবন্ধ সেই কোটগুলিকে তখন চেষ্টারফিল্ড-কোট বলত। শীতের সময় ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ত, মনে পড়ছে ভোরে বেড়াবার সময় তিনি Balaclava cap পরে বেরোতেন, চোখ-মুখ আর নাক ছাড়া সবই ঢাকা থাকত। বরাবরই দেখেছি তিনি বেশী শীত সহ্য করতে পারতেন না। তিনি খুব যে নানা জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াতেন তা মনে পড়ে না। বিশেষ কয়েকজন বন্ধু তাঁর ছিলেন যাঁরা প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন এবং তিনিও যেতেন। তবে মনে হয় বন্ধুরাই বেশী আসতেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ছিলেন এইরকম একজন বন্ধু আর একজন ছিলেন মিউর কলেজের অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ। ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ ত ছিলেনই। চিন্তামণিবাবু পরে তাঁর বড় একজন সহায় হয়ে ওঠেন। যাঁরা অধ্যাপক বা সাহিত্যকর্মে রত ছিলেন না, সাধারণ অন্য কাজ নিয়ে থাকতেন এমন বন্ধুও তাঁর দুই-একজন ছিলেন। রামচরণ গুপ্ত ছিলেন সেই রকম একজন। পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য। ইনি কেবল নিজেই পণ্ডিত ছিলেন না, এঁর মাতা ধন্য গোপী দেবী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর সন্তানের কোষ্ঠি তিনি নিজেই করেছিলেন।

একবার আমার ভাই-ভগ্নীদের খুব কঠিন পীড়া হয়। তখন এলাহাবাদের সাহেব ডাক্তার ওব্রাযাম রোগীদের দিবারাত্রি টানাপাখার তলায় রাখতে বলেন। তিনটি ঘরে তিনটি বালক-বালিকাকে রাখা হত। এতজন পাখা-কুলি রাখা শক্ত ছিল। তখন পিতৃদেবের বন্ধুরা পালা-করে পাখা টানবেন ঠিক করলেন। আমার এখনও

মনে পড়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ঘরের বাইরে বসে পাখার দড়ি ধরে টানছেন।

এলাহাবাদে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। তা বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃদেবের এলাহাবাদ গমনের পর সমাজের কাজ আবার নূতন করে সুরু হয়। সমাজের উপাসনা-গৃহ আমাদের বাড়ী থেকে দূরে ছিল। মনে আছে প্রতি রবিবার আমাদের মত শিশুদেরও নিয়ে আমাদের পিতামাতা ঘোড়ার গাড়ী করে সেখানে যেতেন। মা উপাসনায় গান করতেন। তাঁর আশ্চর্য্য সুমিষ্ট ও জোরালো গলা ছিল। উপাসনা করতেন কখনও ইন্দুভূষণ রায়, কখনও পিতৃদেব, কখনও বা নেপালবাবু বা নগেনবাবু। আমরা যে বাড়ীতে রবিবারের উপাসনায় যেতাম সেটি ছিল মেজর বামনদাস বসু মহাশয়দের বাড়ী। তাঁরা বাড়ীটি ব্রাহ্মসমাজকে ভাড়া দিয়েছিলেন। তার একাংশে উপাসনা হত, অন্য অংশে ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় সপরিবারে থাকতেন। তার আগে ব্রাহ্মসমাজের কাজ অন্যত্র হত। সে বাড়ীটি আমি দেখিনি।

আমরা যখন সাউথ রোডের বাড়ীতে ছিলাম তখন রোশনলাল ব্যারিষ্টারের তৃতীয় বাড়ীটিতে কিছুদিন সি. ওয়াই. চিন্তামণি, কিছুদিন নেপালচন্দ্র রায় ও গিরীশ-চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। চিন্তামণি পিতৃদেবের খুব ভক্ত ছিলেন। প্রায় আসতেন এবং বহুক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতেন। কাগজ-পরিচালনা বিষয়ে তিনি পিতৃদেবের পরামর্শ নিতেন। তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল তার নাম লক্ষ্মীরাম। সেই ছেলেটি বাবাকে বলত "চ্যাট্যার্জ্জি গাড়ু।" 'গাড়ু' মানে বোধ হয় মহাশয়।

মেজর বামনদাস বসু মহাশয় অল্প বয়সেই চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তার আগে নানা প্রদেশে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতেন। ১৮৯৫ থেকে পিতৃদেব এলাহাবাদে চাকরী নেন। কিন্তু ১৯০১ পর্য্যন্ত বামনদাস বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। বামনদাস বসু বলেন, "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি আমার পত্নীর অসুখের জন্য একমাসের ছুটি লইয়া এলাহাবাদে আসি। তখন ওখানকার চ্যাঠাম লাইনের দ্বারভাঙ্গা রিট্রিট নামক বাংলোয় অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেই সময় সেইখানে ২রা সেপ্টেম্বর রামানন্দবাবুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দবাবু আমাকে কয়েক মাসের প্রবাসী উপহার দেন ও প্রবাসীর জন্য কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমি জাতিতে বাঙালী হইলেও আমার জন্মভূমি লাহোরে, এবং শিক্ষা, কর্ম্মভূমি ও বসবাস পাঞ্জাব, বোম্বাই বা আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশেই হইয়া আসিয়াছে। আমি মুদ্রিত করিবার মত বাংলা কখনও লিখি নাই, লেখায় তত দক্ষও ছিলাম না। ইহা রামানন্দবাবুকে বলায় তিনি আমার লেখায় আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।"

বামনদাসবাবু তখন থেকেই প্রবাসী ও পরে মডার্ণ-রিভিউ-এর নিয়মিত লেখক হন। অল্পবয়সে চাকরী হতে পেনসান নিয়ে পরে তিনি এলাহাবাদেই বসবাস করেন। অল্পে অল্পে তিনি পিতৃদেবের একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়ান। আমার যতটা জানা আছে তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বামনদাস বসুর মত প্রিয় বন্ধু তাঁর আর কেউ ছিলেন না। অবশ্য একথাও ঠিক যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি তাঁর সকল বন্ধুকেই গভীরভাবে ভালবাসতেন, সেখানে তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না। বন্ধুরা সকলেই তাঁকে নিকটতম মনে করতেন।

বাঙালী নন এমন বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন মালবীয় তাঁর খুবই প্রিয় ছিলেন। সমাজ-সংস্কার, জাতীয় আন্দোলন, শিক্ষা সমস্যা এই সব বিষয়ে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই একত্রে কাজ করেছেন। আমার মনে পড়ে এলাহাবাদে হোলির সময় নানা রকম হল্লোড় হত যেগুলিকে অভদ্র আচরণ বলা উচিত। অত্যন্ত ভদ্র লোকেরাও তাতে যোগ দিতেন অনেকে। সেই প্রথাকে দূর করবার চেষ্টায় মালবীয়জি ও বাবা পরস্পরের সহকর্মী ছিলেন। আরও অনেকে হয়ত তাঁদের সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁদের নাম আমার মনে নেই।

পিতৃদেবের চেষ্টায় বাঁকিপুর হতে ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় এলাহাবাদে আসেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজের ভার নেন। আমরা ও বামনদাসবাবুর বাড়ীর মেয়েরা ছেলে-বেলায় ইন্দুভূষণবাবুর কাছে পড়তাম। তাঁকে আমরা আত্মীয় বলেই জানতাম। ইন্দুভূষণবাবু দাসাশ্রমের কর্ম্মী ছিলেন। এলাহাবাদেও তিনি পীড়িতের সেবায় অগ্রণী ছিলেন। এমন কি প্লেগের সময়ও তিনি প্লেগ-রুগীদের চিকিৎসা করতে যেতেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে পিতৃদেবকে যেতে দেখতাম। তাঁরা বাড়ীর বাইরে জুতো খুলে রাখতেন, পরিহিত কাপড়-চোপড় বাড়ীর বাইরেই ওষুধ-জলে ভিজিয়ে নূতন কাপড় পরে ঘরে ঢুকতেন। পিতৃদেবের বন্ধু উমেশচন্দ্র ঘোষের পত্নীর প্লেগ রোগে মৃত্যু হয়। তাঁহাকে দাহ করতে নিয়ে যাবার লোক না পাওয়াতে ইন্দুভূষণবাবু ও পিতৃদেব প্রভৃতিই সে কাজ করেন। এলাহাবাদে প্লেগের সময় একবার আমরা সহর

ছেড়ে অনেক দূরে হেলথ-ক্যাম্পে বাস করতে চলে যাই। সেখানে পাতার কুঁড়ে ঘরে আমাদের বাস করতে হত। আগুন লাগা ও চোর-ডাকাত পড়ার উৎপাত প্রায়ই হত। তখন ছেলেরা রাত জেগে পালা করে পাহারা দিতে সুরু করে। পিতৃদেব তাঁর কাজের জন্য সারাদিন সহরে থাকতেন সন্ধ্যায় বাড়ী আসতেন। অনেক বাড়ীর গৃহ-কর্ত্তাদেরই এই রকম করতে হত। সেকালে বাস ছিল না, গাড়ীও সব সময় পাওয়া যেত না। যতদূর মনে পড়ে কখনও এক্কাগাড়ীতে, কখন বা হেঁটেই তিনি ক্যাম্পে ফিরে আসতেন। কোন কোন বৎসর আমাদের বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজে ছুটি না হওয়া পর্য্যন্ত এলাহাবাদেই থাকতেন।

এলাহাবাদে এই মহামারী যেমন ভয়ঙ্কর ছিল, তেমনি চিত্তাকর্ষক ছিল মাঘমেলা বা কুম্ভমেলার দৃশ্য। পিতৃদেব অতিথিপরায়ণ ছিলেন, আমার মা সে-বিষয়ে তাঁর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। সারা বৎসরই আমাদের বাড়ী অতিথি সমাগম হত। মাঘমেলার সময় ত প্রতি-বৎসরই আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু লোক আমাদের বাড়ীতে গঙ্গাস্নান বা বা কল্পবাসের উদ্দেশ্যে আসতেন। শুধু যে আমাদের মত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকই আসতেন তা নয়। অনেক সময় মণি-অর্ডারওয়ালার পুত্রবধূ বা বেয়ান প্রভৃতি অৰ্দ্ধ শিক্ষিত, দরিদ্র পরিবারের লোকেও পিতৃদেবের আতিথ্য গ্রহণ করত। বাড়ীতে অনেক ঘর থাকাতে তাদেরও স্থান হয়ে যেত। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু গঙ্গাস্নানার্থীদের যত্ন ও আতিথ্যে তাঁর কখনও কোন ত্রুটি হত না। অনেকে বাংলা দেশ থেকে তাঁদের বৃদ্ধা আত্মীয়দের প্রয়াগে কল্পবাসে পাঠিয়ে দিতেন নিঃসঙ্গ এবং পিতৃদেবকে ভার দিতেন সেই বৃদ্ধা মহিলাদের দেখা-শুনার। কুম্ভমেলার সময় আমরা বাবা-মার সঙ্গে মেলায় নানা সাধু-ভক্তদের "ডেরায়" ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোন কোন সাধু আমাদের দলের বহু লোকের মধ্যে বাবাকে একলা ডেকে নিয়ে কথা বলতেন ও আশীর্ব্বাদ করতেন। পণ্ডিত সাধুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয়েও কথা হত।

এই ছোট লেখায় আর বেশী কিছু না বলে শুধু পিতৃদেবের চাকরী ছাড়ার কথা বলব। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মতে না মেলাতে তিনি যখন প্রিন্সিপ্যালের কাজ ছেড়ে দেন, তখন ছেলেরা তাঁকে একটা বিরাট বিদায়-সম্বর্দ্ধনা দেয়। তারা সদলবলে গাড়ী নিজেরা টেনে সেই গাড়ীতে তাঁকে বসিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে আসে। লোকে লোকে সমস্ত রাস্তা ভরে গিয়েছিল। তিনি নিজের বাড়ীর বারান্দায় ওঠার পর ছেলেরা একে একে তাঁকে প্রণাম করতে থাকে। পায়ের উপর মাথা পেতে দিয়ে তারা আর উঠতে চায় না। অপেক্ষমান অন্য ছেলেরা যতক্ষণ না তাদের সরিয়ে দেয় ততক্ষণ কেউ ওঠে না। সে এক করুণ মধুর দৃশ্য! তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ছাত্ররা তাঁকে মনে করে রেখেছিলেন। তিনি এত ছেলেকে পড়িয়েছিলেন, কিন্তু কখনও কারুর নাম ভুলতেন না। কোন্ ছাত্র কি রকম পোষাক করত, কার কি বিশেষ অভ্যাস ছিল এগুলিও তিনি মনে করে করে গল্প করতেন। এলাহাবাদ সুখে ও দুঃখে তাঁর জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। তিনি চিরদিন তীর্থস্থানের মতই বারে বারে এলাহাবাদে বেড়াতে যেতেন। মেজর বসুর বাড়ী দীর্ঘদিন থেকে আসতেন।

আজ সে এলাহাবাদের সঙ্গে যোগসূত্র যেন সব ছিন্ন হয়ে গেছে। ছবির মত কত কথা, কত মানুষের মুখ মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু নাগাল পাই না।

শ্রীশান্তা দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

যাঁর শতবার্ষিকী স্মারকবর্ষ এবারে আরম্ভ হ'ল, ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের অগ্রগণ্য সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য মনীষী ও অসাধারণ নিরপেক্ষ সেই মানুষটির কথা এবছরে সকলেরই মনে হচ্ছে এবং হবে।

তিনি যে কার মত ছিলেন, কেমন ছিলেন, মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন তা সহজে কেউই বলতে পারবেন না। এক কথায় তিনি কারুর মতই ছিলেন না।

নির্ভীক আদর্শে বলিষ্ঠ নিরপেক্ষতায় চিন্তার স্বচ্ছ সততায়, দেশাত্মবোধে, সাহিত্য রসজ্ঞতায় শিল্পকলা-জগতের সূক্ষ্ম রসবেত্তার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর মত দীপ্তিমান সম্পাদক আগেও কেউ ছিলেন না। পরেও এখনো কেউ আসেন নি।

উনিশ শতকের বাঙালীর নানা মহিমাময় গভীর আদর্শনিষ্ঠ নানামুখী চরিত্রের বহু মানুষের মধ্যে তিনিও অন্যতম একজন বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল মানুষ। যে যুগের বাঙালীর কাছে মহৎ জীবনের মহৎ আদর্শের চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না। যাঁদের দীপ্তি এখনো ভারতের আকাশে পৃথিবীতে মহামহিমায় ছড়ানো আছে, মিলিয়ে যায় নি। যাবে না।

পূজনীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আগেও আমাদের দেশে বলিষ্ঠ চিন্তাশীল সম্পাদকের অভাব ছিল না। ১৮৬০-এর আগেই রাজনীতি-জগতে হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন! সাহিত্য-জগতে বঙ্গদর্শনের ও সাধনার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন তার পরে। দুই অতুলনীয় প্রতিভা। কিন্তু এঁরা দুজনেই মূলতঃ সাহিত্যিক। সাহিত্যের নানা দিক নানা রস নানা ভঙ্গীর সৃষ্টির কাজ নিয়েই যাঁদের কল্পনা, চিন্তা, আদর্শ নানা দিকে প্রবাহিত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে, গভীর হয়েছে। তারি ফাঁকে, তারি মাঝে, তারি সঙ্গে তাঁরা দেশের কথা সমাজের কথা রাজনীতির নানা কথাও ভেবেছেন, বলেছেন। তাঁদের পত্রিকায় সে-সব আলোচনা স্থানও পেয়েছিল।

কিন্তু বললেও সে সব পত্রিকায় সেই বক্তব্যগুলিই মুখ্যও ছিল না এবং ধারাবাহিকতাও ছিল না তাতে। সাহিত্যের নানা রসই সে সাহিত্যের মূল ধারা ও মুখ্য ধর্ম ছিল। এবং তাই থেকেই শেষ অবধি ঐ পত্রিকা দুখানিই সাহিত্যিকপত্ররূপেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘায়ু হতে পায় নি। আসলে তাঁরা জাত সম্পাদক ছিলেন না। ছিলেন জাত সাহিত্যিক।

প্রবাসীর জন্ম হয় ১৩০৮ সালে। তার আগেও রামানন্দবাবু দুখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, অনেকেই জানেন আমার বয়স্করা। প্রবাসীর আগে ছিল প্রদীপ। বছর দুই ছিল মনে হয়। বাড়ীতে বাল্যকালে দেখে-ছিলাম। তার আগে ছিল তাঁরই সম্পাদিত দাসী। সেটা আমরা কখনো হাতের কাছে দেখিনি। সেটা কিন্তু বছর দশেক বেঁচে ছিল।

আমরা প্রবাসী দেখি ১৩০৮ সালে। চমৎকার কাগজ, নতুন ভঙ্গী, নতুন বক্তব্য নিয়ে সাহিত্য-জগতে প্রবাসীর প্রবেশটা আমার আজো মনে আছে। ছবিওয়ালা কাগজ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে "রাজোচিত প্রবেশ করা" বলেছিলেন; প্রবাসী সম্পাদনাকেও একই কথাই বলা যায়।

কিন্তু ঐ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের নানামুখী অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া আমার মেয়েলী ক্ষমতার সাধ্যের বাইরের বিষয়। কাজেই আমি তাঁরই প্রায় চল্লিশ বছরের বিবিধ প্রসঙ্গের নানা ধরণের উক্তি বক্তব্য ও মন্তব্যগুলির বিশেষ বিশেষ সময়ের কিছু কিছু থেকে তাঁরই লেখার আলোতে তাঁকে দেখার ও দেখাবার চেষ্টা করাই শ্রেয় আর ঠিক হবে মনে করছি। 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আর কি'!

সে যে কত কৌতূহলের শিক্ষার আনন্দের কৌতুকের জ্ঞানের সমারোহময় জিনিষ এবং আদর্শবাদী রচনা পুরাণো প্রবাসীর পাতায় পাতায় তার পরিচয় ছড়ানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত সৌম্যমূর্তি সম্পাদক মহাশয়কেও মনে করিয়ে দেয়।

১৩০৮ বৈশাখ। সম্পাদকীয় মন্তব্য।

(প্রবাসীর) প্রথম সংখ্যা কাগজ দেখিয়া কোন মন্তব্য করা যায় না। প্রথম সংখ্যা মনের মত করা বড় কঠিন। আশা করি প্রথম সংখ্যা দেখিয়া কেউ চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন না। আমরা ক্রমশঃ ইহাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ কবিতা গল্প ও বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশ করিব।

এই সংখ্যায় ছিল জয়পুর প্রবাসী বাঙালী রাজমন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন ও কর্মের আলোচনা কথা। (প্রধানমন্ত্রী)।

১৩০৮। ভাদ্র ঐ বৎসরেই দুই তিন মাস পরের সংখ্যায় ছিল "রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষত্বে"র প্রসঙ্গ।

১৩০৯।১৩১০ "রামকৃষ্ণ কথামৃত" এবং বিবেকানন্দের চিত্র একখানি এক সংখ্যায় ছিল।

১৩১০ মাঘ। "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন সত্যবাদী (?) ইংরাজ নানা প্রকারে এই প্রতিবাদ সভাগুলির গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের মত ও আসামের ভূতপূর্ব চীফ কমিশনার কটন সাহেবের মত প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বড় অপ্রতিভ হইয়াছেন। এবং সরকারী কাগজপত্র গোপন রাখার জন্য গোপনীয় সংবাদ-বিষয়ক আইন রচিত হইতেছে।"

১৩১১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন আলোচনা মহর্ষির বিশেষত্ব বিষয়ে।

১৩১২। বঙ্গবিভাগ। (সম্পাদকীয় রচনা)

"লর্ড কার্জ্জনের মত খারাপ শাসনকর্ত্তার আগমন এদেশে অনেকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন।...কিন্তু অত্যাচারী অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কবে কোথায় প্রজার মঙ্গল ও স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে...।

তবে একথা মানিতেই হইবে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে হইলে, পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস চাই, স্বার্থত্যাগ চাই। সকল সুবিধার সম্পদের চেয়ে মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদাকে বড় করা চাই।

তার জন্য সকলের চেয়ে বড় কাজ প্রত্যেক বাঙালী পুরুষ ও নারীকে জ্ঞান দান ও শিক্ষাদান। কারণ দেশের মঙ্গল বুঝা নিজের স্বার্থসিদ্ধি ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ।

আমরা লুপ্ত পৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জ্জন আমাদের কীটের অধম মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন সবদিন সমান যায় না।

পূর্ব্বেকার পর-পদানত ইংলণ্ডের মত পরপদানত বর্ত্তমানকালের ভারত আবার উঠিবে। জাগিবে।"

(কিন্তু এই বছরের কোন সংখ্যায় রাখীবন্ধন ও তার গান পেলাম না)।

মাঘ ১৩১১। "ডানহাত বন্ধক" সম্পাদকের লেখা একটি ছোট গল্প। অনেকেই বোধ হয় ভুলে গেছেন গল্পটির কথা। হয়ত তাঁর প্রথম এবং শেষ গল্প। স্বদেশী যুগের কথা নিয়ে গল্পটি চমৎকার ভাবময়।

মাঘ ঐ। "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা একটা কুলক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সাহিত্যের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। এখানে নাই জাত বিচার।"

আশ্বিন ১৩১৩। "সর্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশ যাওয়া দরকার। আমরা আর কিছু না পারি মন খুলিয়া সত্য কথাটা যদি বলিতে লিখিতে চাই তাহা হইলে বিদেশ ছাড়া গতি নাই।"

ফাল্গুন ১৩১৩। (জাতীয় যজ্ঞ (বর্জন) সম্পর্কে)। "আমরা বিদেশী বর্জন প্রতিজ্ঞা করিয়া ভালই করিয়াছি। এতে অন্য প্রদেশের লোক যাহাই বলুন আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ নাই।"

কার্ত্তিক ১৩১৫। রজনীকান্ত গুহ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ (স্বাধীনতা ধর্ম স্বদেশপ্রেমমূলক) আলোচনায়—সম্পাদকীয় মন্তব্য পাদটীকায়।

"ধর্ম স্বাধীনতা বা ঐশ্বর্য্য দেন বলে অনুসরণীয় নহেন। ধর্ম ধর্মের জন্যই অনুসৃতব্য।"

স্বদেশী কাগজ সম্পর্কে। ১৩১৬ (?)

"আমাদের একটা বিষয়ে বড়ই লজ্জা হয় আমরা যে কাগজে স্বদেশীয় বিষয়ে প্রবন্ধাদি ছাপি তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইলেও বিদেশীর প্রস্তুত। প্রবাসীর মলাটটি শুধু খাঁটি স্বদেশী, স্বদেশের লোকদ্বারা প্রস্তুত।...দেশভক্ত ধনী মহাশয়রা কি একটা কাগজের কল স্থাপন করিয়া আমাদের এই লজ্জা নিবারণ করিতে পারেন না? খাঁটি স্বদেশী কাগজ না হইলে জোর কলমে লিখি কোন মুখে?"

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। বোমার মামলার রায়।

"অরবিন্দ ঘোষ আর আরো ষোলজন খালাস পাইবেন। তিনি নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে পূর্ব হইতেই সুপণ্ডিত সুলেখক স্বদেশহিতকল্পে আত্মোৎসৃষ্ট বলিয়া লোকে জানিত। এখন তাঁহার গোপনীয় পত্র কথাবার্তা পারিবারিক জীবনের মধ্যেও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের দৃষ্টি ও নীচতা বাহবা লইবার ইচ্ছা দেখা গেল না।

এই মামলাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে এই স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা দেশব্যাপী।...আর দেশবাসীর লাভ দ্বিবিধ হইয়াছে। ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে সকল শারীরিক ও আত্মিক বৃত্তির সাহায্যে মানুষ বড় বড় কাজ করে তাহা আমাদের জাতির মধ্যেই আছে।"

শ্রাবণ ১৩১৬। গান্ধীজী সম্পর্কে।

"কংগ্রেসের এবারে দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী মোহন-দাস করমচাঁদকে কংগ্রেসের সভাপতি করা উচিত। যিনি স্বজাতির জন্য জেলে গিয়াছেন, এবারে জর্জরিত ও

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন···। তবু সে দেশে ভারতবাসীরা যাতে মানুষের মত ব্যবহার পায় সে চেষ্টায় বিচ্যুত হন নাই। তিনি চরিত্রে আত্মোৎসর্গে নেতৃত্বের পংক্তিতে। দল বাঁধিবার ক্ষমতায় ভারতের কোন নেতার চেয়ে কম নহেন।

মর্লির ভারত শাসন সম্পর্কে মন্তব্য।

"মর্লির ভারত শাসন আইন ত পাশ হইয়া গেল ইহাতে অনিষ্ট আর অপমান যা হইবার তা হইয়া গেল। মুসলমান ছাড়া আর সকলের এই অসম্মান হইল যে তাহাড়া নিকৃষ্ট জীব, মুসলমান উৎকৃষ্ট···। ইহাতে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যেখানে বিদ্বেষ ছিল না যেখানে সুপ্ত ছিল তাহা জাগানো এবং জন্মানো হইল। ইহাতে জাতি গঠিত হইবার পথে বিঘ্ন জন্মিল।"

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। সম্পাদকের আদর্শ।

"সম্পাদকের কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন ভারতবর্ষে সেরূপ ব্যবস্থা কোথাও নাই। কেহ সাধারণ শিক্ষা পাইয়া সম্পাদক হন। কেহ কোন সম্পাদকের অধীনে কাজ করিয়া কাগজ চালাইবার শিক্ষা লাভ করেন। আমরা যেভাবেই কাজে প্রবৃত্ত হই চেষ্টা করিলে তাহাতেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সম্পাদকের অর্থনীতি রাষ্ট্র বিজ্ঞান (পলিটিক্যাল সায়েন্স), সমাজতত্ত্ব, সংখ্যা বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সিভিকস্, লৌকিক ও বৈষয়িক পৌরজানপদবর্গের অধিকার, অপরাধ বিজ্ঞান নানাদেশের গ্রাম ও শহরের শিক্ষা শান্তিরক্ষা বাণিজ্য বিষয় উন্নতির বিবরণ আমরা অল্পই জানি···। তথাপি আমাদের মুরুব্বিয়ানাকে একমাত্র হাতিয়ার বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেননা সম্পাদক বলিয়া ত আমরা সবজান্তা নহি।"

শিক্ষার আদর্শ। "শিক্ষার আদর্শ মানুষকে জ্ঞান দান। তাহার অজ্ঞাতপূর্ব শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা, চরিত্র গঠন, জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা জন্মানো। এই প্রসঙ্গে বলা যায়। প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বসু ও রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের প্রভাবান্বিত ছাত্ররা এখনো আছেন।"

ঐক্য। "যে যত বেশী সংখ্যক মানুষের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করিতে পারে সে তত মহৎ ও শক্তিমান হয়। ঐক্যের অনুভূতিই বড় জিনিষ।"

দেশ ঋণ। "আমরা দেবঋণ পিতৃঋণ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি দেশঋণও একটি প্রকৃত ঋণ। এই ঋণও প্রত্যেকের পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাশেষে কোন দেশহিতকর কাজে এক বৎসর নিযুক্ত থাকা—কয়েকটি নিরক্ষরকে শিক্ষা দেওয়া হইলে দেশের কিছু ঋণ শোধ হইল মনে করিয়া আনন্দ পাইবেন।"

মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ। "আমাদের দেশের নারীর মনের ভাব মনে রাখিয়া আত্মস্থ থাকাই শিষ্টাচারের আদর্শ। ইংরেজীতে বলিতে গেলে "রিজার্ভ এণ্ড ডিগনিটি" আমাদের নারীদের চরিত্রের ভূষণ।······ এ বিষয়ে আমরা প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যে তুলনা করিতে অনিচ্ছুক। প্রত্যেক জাতির সমাজে পরিবারে চরিত্রে গুণের ভাগ আছে,···কিন্তু উন্নতির জন্য নিজের প্রতিষ্ঠা ভূমি ছাড়িয়া অন্য আদর্শ ধরিতে যাওয়া সর্ব্বনাশের হেতু।"

১৩২২। সমালোচনা সম্পর্কে।

সমালোচকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু আমরা সব সময়ে সে বুদ্ধির পরিচয় দিই না। যখন যে বই সমালোচনা হইতেছে তখন তাহার সমালোচক যদি লেখকের চেয়ে বিদ্বান হন তাহলে সমালোচনা ভাল হইতে পারে। কিম্বা সমালোচ্য বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলেও কাজ চলিতে পারে।···

এক রকমের সমালোচনা আছে তাহার নাম মুরুব্বিয়ানা। আরেক রকম আছে তাহাকে পণ্ডিতি বলা যায়···। কোন গ্রন্থে বা রচনায় কি বলা হইয়াছে, কেমনভাবে বলা হইয়াছে তাহাই বিচার্য্য। লেখক নতুন কিছুকে বা পুরাতন কিছুকে নুতনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন কি না তাহার আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে বিদেশের দৃষ্টান্ত লইলে ভাল হয়।"

দুর্ভিক্ষ। "সমস্ত দেশের জন্য একটি সুচিন্তিত বিজ্ঞান-সম্মত কার্য্যপ্রণালী স্থির করা দরকার···।"

১৩২২ আশ্বিন। পূজা ও সেবা।

"মানুষ যখন ছোট থাকে তাহাকে সেবা করিতে হয়।··· চিরকাল তাহাকে অশক্ত অসহায় নাবালক করিয়া ভালবাসা দেখানো হইতেছে বলা চলিবে না···। যাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান দান করিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিলেই তাঁহারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ সেবা করিবেন।"

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে।

আগামী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বর্দ্ধমানের মহারাজাকে সভাপতি বরণ করা হয়। তিনি সেই গৌরবের পদ বিজ্ঞতার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন।

বলেন, "(১) সাহিত্য সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তাঁর

ধারণা হয়েছে যিনি সভাপতি হবেন তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দরকার। তাহা তাঁর নাই।

(২) যিনি আজীবন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক এবং জীবিত প্রধান সাহিত্যসেবীদের অন্যতম তাঁরই এই পদে অধিকার।...

(৩) গত বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর আতিথ্য ও সৌজন্যে লোকে প্রীত হয়েছেন। অনেকের অনুমান সেই জন্যই ইহা তাঁহার অগ্রাহ্য।"...

সম্পাদকীয় মন্তব্য। "অর্থকেই সকল গুণের আকর যাঁরা মনে করেন ও অর্থশালীতার সমাদর করেন, মহারাজা তাঁদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ। "মার্শ্যাল ল" কি জয়। "বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত অজ্ঞ ও পাগল ছাড়া কেহই ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ হইবে কল্পনা করিতে পারে না।"

ঐ সময়ে সামরিক আইন সম্পর্কে সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি। "সামরিক আইন হচ্ছে সমস্ত আইনকে নিষ্ক্রিয় করার একটি সুন্দর সংজ্ঞা।" লর্ড মর্লি (১৯১০)।

১৩২৬ আষাঢ়। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড সম্মান প্রত্যাখ্যান-পত্রের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয় বলেন, "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ইতিহাসের তত্ত্বদর্শী...তিনি ইতিহাসের মর্ম্মমূলে পৌছিতে পারিয়াছেন। আমরা যদি সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মানুষের পাশে দাঁড়াইতে পারি তাহা হইলেই রবীন্দ্র-নাথের-এই পত্র সার্থক হইবে।"

"পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গে ক্রনিকল সম্পাদক হর্নিম্যান সাহেব এবং লাহোরের ট্রিবিউন সম্পাদক কালীনাথ রায়ের বিচারে প্রভেদ। হর্নিম্যান সাহেব যে অপরাধে স্বদেশে পাথেয় খরচসহ নির্ব্বাসিত হলেন কালীনাথ রায় সেই অপরাধে জেলে সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে শস্য পিষিতেছেন।"

সার মাইকেল ওডোয়ারের সম্পর্কে। সার মাইকেল ওডোয়ার মহাশয় কি পোষা বিড়ালকে বুনো বাঘ ভাবিয়াছিলেন।

১৩৩৩। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা। আলোচনা।

১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ। গান্ধীজী কারাগারে। গোল-টেবিল সভাকে সম্পাদক (গণ্ড) গোল টেবিল কন্‌ফারেন্স বলেন।

"মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে উপ-আইন প্রয়োগ। বাংলা দেশে বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৮ খৃঃ সালের আইন প্রয়োগে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নির্ব্বাসন হয়। গান্ধীজীকে ১৮২৭ সালের আইন অনুসারে বন্দী করা হইয়াছে...। তিনি বন্দী হইবার পূর্ব্বে ও পরে সরকারী ও বেসরকারী লোকদের দ্বারা যে সব উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।"

১৩৩৬ বৈশাখ। নারীরক্ষা সম্বন্ধে।

"নারীরক্ষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে প্রাণ পর্য্যন্ত ঋণ করিয়া তাঁদের রক্ষা করা তাঁদের আত্মরক্ষায় সমর্থ করা আমরা সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য মনে করি।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে বিদেশীর প্রভুত্ব থেকে মুক্তি অথবা ভারত নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা চাও, আমি বলিব দুই চাই। কিন্তু যদি দুটির মধ্যে একটি লইতে বলা হয়, তাহা হইলে নারীর নির্ভয় নিরাপত্তা অবশ্যই নির্ব্বাচন করিব।...

"আমি মানি দেশের স্বাধীনতার উপরেও নারীরক্ষার সামর্থ্য নির্ভর করে।"

১৩৩১। শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জীবনকথা (সম্পাদকীয় রচনা)। যে জীবনকথা কোন পত্রিকায় পূর্ব্বে দেখা যায় নি।

১৩১৬ আষাঢ়। পাঠিকা ও পাঠক সম্পর্কে।

"আমরা উপরে 'পাঠিকা ও পাঠকদের' লিখিয়াছি তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ বা সীতারাম প্রভৃতি যুগলনামের উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি।

আমাদের ঐ প্রয়োগের কারণ অন্যবিধ। পাঠিকারা মাসিকপত্র পড়েন বলিয়াই আমাদের কাগজ অনেকটা চলে। কেবল পাঠকদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিলে আমাদের সম্পাদক-মহলে দুর্ভিক্ষ পড়িয়া যাইত।"...

এখানে লেখা আর না বাড়িয়ে লেখকদের সম্বন্ধে একটি কৌতুক উৎপাদক ঘটনার কথায় সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বের কথা বলে আমি কথা শেষ করি।

একবার সম্পাদক মহাশয়ের কাছে এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসেন। এসে বলেন, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

কর্ম্মব্যস্ত সম্পাদক বিব্রত ভাবে চিনতে পারেন নি জানালেন। তখন পাশের একজন চারুবাবু (?) বলেন, "উনি প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

সম্পাদক মহাশয় একটু হেসে বলেন, 'আমি লেখা চিনি। তাই লেখক চিনতে পারি নি।'

(প্রবাসীর পাদটীকা থেকে)

এই চমৎকার কথাটা তাঁরই যোগ্য। এযুগে কথার ব্যবহারটা উলটে গেছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি সংগ্রহ আমার ইচ্ছানুযায়ী সম্পূর্ণ করা গেল না। তার কারণ তিনটি :

(১) প্রথম সময়-সংক্ষেপ আর তাঁর উক্তি অজস্র।

(২) প্রথম দিকেরউক্তি এখনকার অনেকের চোখের সামনে নেই সেইজন্য সেইগুলিই সংগ্রহ করেছি যথাসাধ্য।

(৩) লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তবু আমার শেষ কথা হ'ল এই দেশ বিভাগের পর আজো যে পূর্ব্ব বাংলার নরনারীর লাঞ্ছনা চলেছে, দেশে আকাশ-পাতাল-জোড়া দুর্নীতি চলেছে, আজকে রামানন্দবাবু থাকলে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে এগুলো ভাবতে শিখতাম। এখন নিজের সম্পর্কে দু-একটা কথা বললেই আমার কথা শেষ হয়।

আমি বহুদিন প্রবাসেই ছিলাম। এবং সেকালের ধরনের পর্দানসীন রক্ষণশীল বাড়ীর মেয়ে ও বৌ। কাজেই কোন পত্রিকার সম্পাদক বা লেখকদের সঙ্গে কখনোই চেনা-জানা ছিল না।

প্রবাস থেকে জয়পুর পাঞ্জাব দিল্লী থেকে এবং কলকাতা থেকেও "প্রবাসী"তে লেখা পাঠিয়েছি। পৌঁছনর প্রাপ্তিস্বীকার পত্রও সম্পাদক মহাশয়ের সেকালের নিয়মে পেয়েছি। মনোনীত হ'ল কি না তাও জানিয়েছেন কেউ সহকারী কর্ম্মচারী। এবং যথাসময়ে স্বতঃই তাঁদের নির্দ্ধারিত দক্ষিণাটিও মণি অর্ডারে পাঠানো হয়েছে লেখিকার ঠিকানায়। ১৩৩৭-৩৮ সাল তখন। বলা বাহুল্য যদিও বলা উচিত আমি অখ্যাতনামা লেখিকাদের দলের একজন ছিলাম। লেখক দেখে তাঁরা 'লেখা' নির্ব্বাচন করতেন না বলেই বোধ হয় 'প্রবাসী'র পাতায় একটু ঠাঁই পেয়েছিলাম।

তারপর অনেক দিন পরে কলকাতায় এসে বাস করছি। তখন মনে হয় ১৯৩৪ সাল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটি অধিবেশন মহা সমারোহে কলকাতায় টাউন হলে হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। তিনিই সাহিত্য পরিষদ ভবনে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। রামানন্দবাবু কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে ছিলেন। লেডী অবলা বসু মহিলা শাখার উদ্বোধন করেন। এবং দিল্লীর ডাক্তার জে. কে. সেন মহাশয়ের পত্নী কবি শৈলবালা সেন মেয়েদের বিভাগে সভানেত্রী হন।

আমি যাওয়া-আসা করি। এবং রামানন্দবাবুকেও নানা কর্ম্মে যাতায়াত করতে দেখতে পাই।

বাল্যকাল থেকেই ঐ আমার না-চেনা বিখ্যাত নাম "নিজ বাসভূমে পরবাসী" "প্রবাসীর" সম্পাদক মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম।

সেকালে ত অনেক কাগজ, অনেক লেখক, অনেক পত্রিকা, বই ছিল না। বিদেশে আমাদের কাছে প্রবাসীই একমাত্র সুনিয়মিত এবং সমৃদ্ধ পাঠ্য-সুরুচি সুন্দর পত্রিকা ছিল বলা যায়।

একদিন বিকেলে সভার একদিকে একটু গিয়ে বসে আছি। দেখি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় অন্য এক দিক দিয়ে যাচ্ছেন। চুপ করে দেখি।

তারপর দিন তিনি যখন যাচ্ছেন, কোন সময়ে সহসা গিয়ে তাঁকে একটা প্রণাম করলাম।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু মুখে আমার দিকে চাইলেন বটে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

আর আমিও সেকেলে বাড়ীর মেয়ে, লজ্জা সঙ্কোচে কোন নাম বা পরিচয় কিছু বলতে পারলাম না। তখন কিন্তু 'প্রবাসী'তে কয়েকটা গল্প এবং সঙ্কলন বিভাগে অসবর্ণ বিবাহ (জয়শ্রী) দু-একটা প্রবন্ধও বেরিয়েছে। বলতে পারতাম নিজের নামটা। দেশের প্রবাসের নামটা। এইটেই এর কৌতুক।

আজ ভাবি বড় সেকেলে ধরনের নির্ব্বোধ ছিলাম। কিন্তু সে যাক, প্রণাম জানানোই ত আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল কতদিনের। সে প্রণাম করা হয়েছিল।

পরিশেষে নিবেদন প্রথমদিকের সাল মাসের ধারাবাহিকতা শেষে রাখা সম্ভব হয় নি আবার পাতা উলটে দেখার সময়। পাঠকরা মার্জ্জনা করেন যেন।

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৮ সালে আমি হিমালয় হইতে আসিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ দিলাম। সেই বৎসরেই রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং ঠনঠনিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশে একটি ছোট্ট বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ এই দুইখানি কাগজ চালাইতে লাগিলেন। রামানন্দবাবু একেবারে সাদাসিধা মানুষ, নিতান্তই সরল তাঁহার জীবনযাত্রা। সেই বাড়ীখানির ক্ষুদ্র একখানি ঘরে প্রবাসী মডার্ণ রিভিউর অফিস। ক্রমে সেই স্থানটুকু নানা দেশীয় মনীষীদের একটি তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সেখানে হার্বার্ট ফিশার, র‍্যামসে ম্যাক্‌ডানাল্ড, সিষ্টার নিবেদিতা, অধ্যাপক গেডিস্ প্রভৃতি বিদেশী বিশিষ্ট লোকদের, এবং রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্র শীল, প্রফুল্লচন্দ্র, গোখলে প্রভৃতি ভারতীয় মহাপুরুষদের দর্শনীয় স্থান হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বহুবার গিয়াছেন।

রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বহু বাংলা গ্রন্থ প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। প্রবাসীর পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মডার্ণ রিভিউ কাগজেও তাঁহার অনেক ইংরাজি লেখা বাহির হইয়াছে। তখনকার দিনের প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাই এমন একটি সংখ্যাও বড় মিলিবে না। আর একখানি বাংলা কাগজের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মধ্যে কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে লেখা তেমন দেন নাই! তাহা ছাড়া তাঁহার বহু লেখাই প্রবাসীর মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশিত। এই কয়েকটি বৎসর বিগত হইলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়াছেন।

যখন কবির ইংরাজী গীতাঞ্জলির জন্ম হয় নাই তখনও তাঁহার ইংরাজী লেখা মডার্ণ রিভিউ পত্রে বাহির হইত। ১৯১১ সালে রামানন্দবাবু একবার তাঁহার কাছে তাঁহার কবিতার কিছু ইংরাজি অনুবাদ চাহেন। কবি তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের করা 'নিষ্ফল কামনা' (মানসী) কবিতার অনুবাদ রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়া দেন। "Fruitless Cry" নামে তাহা ১৯১১ সালের মে মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে (পৃঃ ৪৬৩) বাহির হয়। লোকেন্দ্রনাথেরই করা রবীন্দ্র কবিতার আর একটি অনুবাদ কবির কাছে ছিল। তাহার নাম সন্ধ্যা সঙ্গীতের "তারকার আত্মহত্যা"। Death of a Star নাম দিয়া তাহা ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসের (পৃ ২০১) 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় বাহির হয়।···ইহার পর রামানন্দবাবু স্বয়ং কবিকে ধরেন তাঁহার কবিতা নিজেই অনুবাদ করিতে। কবি বাল্যকালে ইংরাজী শিক্ষায় অবহেলা করিয়াছেন এই অজুহাত দেখাইয়া নিষ্কৃতি চাহিলেন। কবি তাঁহার মায়ার খেলা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—

> "বিদায় করেছি যারে নয়নজলে
> এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে।"

এই কবিতাটি কড়ি ও কোমলে ভুল নামে ছাপা হইয়াছে। রামানন্দবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে আছে রামানন্দবাবু একদিন কবিকে বলিলেন, "আপনি ইংরাজিকে নয়নজলে বিদায় করেন নাই। প্রেমের লীলায় ওসব লোকদেখানো উপেক্ষার ভঙ্গীতে আমি ভুলিব না। তাহার সঙ্গে আপনার হৃদয়ের যে প্রীতিযোগ আছে সে কথা আমার কাছে লুকাইবেন না।" দেখিলাম অবশেষে কবিকেই হার মানিতে হইল। ১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে (২০৪ পৃঃ) বাহির হইল "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী" গানের অনুবাদ।···

এই যে আপন কবিতার অনুবাদে কবি প্রবৃত্ত হইলেন তাহারই ফল হইল গীতাঞ্জলি। কিন্তু এই অনুবাদের কর্ম্মে যাহারা কবিকে প্রবৃত্ত করান তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দবাবু একজন প্রধান। তাঁহার কাগজেই এই কবিতাগুলির প্রথম আবির্ভাবের স্থান হয়।···

কর্ম্মশ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় 'প্রবাসী'তে লেখার কথা ভুলিয়াই যাইতেন। এমন সময় শেষ মুহূর্ত্তে যখন রামানন্দবাবুর তাগিদসহ লোক আসিত তখন তিনি তাহাকে বসাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই লেখার জন্য বসিতেন। "গোরা"র*

---

* 'এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যস্বরূপ পাঠালেন তিনশ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবী করব না। এত বড় প্রস্তাব নিষ্ক্রিয় ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম "গোরা"—আড়াই বছর ধরে। মাসে মাসে নিয়মিত লিখছি কোনো কারণে একবারও ফাঁকি দিইনি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম'। রবীন্দ্রনাথ, (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৪) "গোরা" আরম্ভের সময় রামানন্দবাবু এলাহাবাদে থাকতেন।

জন্য এইরূপ অনেক কিস্তি তাঁহার লোক বসাইয়া লেখা। তাই মাঝে মাঝে সেই সব পুস্তকে ছোটখাট ভুলচুকও রহিয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম, জানালা-কবাট সব খোলা, বাহিরে 'প্রবাসী'র লোক, রবীন্দ্রনাথ মাদুরে বসিয়া লেখা শেষ করিতেছেন, এই দৃশ্য বহুবার দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বহু লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার অন্যের কৃত ইংরাজি অনুবাদও রামানন্দবাবু চিরদিন আগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন।

রামানন্দবাবুর সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে যে কবির মতভেদ হইত না তাহা নহে, তবে তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। ১৯১৭ সালে মিসেস বেসাণ্টকে যখন কবি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতে চাহেন তখন রামানন্দবাবু তাহাতে সম্মত ছিলেন না। নন-কো-অপারেশনের অনেক প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের এমন মতভেদ কত বারই হইয়াছে। অসহযোগ লইয়াও মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান" পড়িয়াছেন।*

রাজা, শারদোৎসব প্রভৃতি যে সব নাটক আশ্রমে অভিনীত হইত তাহাতে প্রত্যেকবারই সপরিবারে রামানন্দবাবু আসিতেন। এইভাবে বহুবার তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার পর কবিকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনে যে একদল সাহিত্যিক কলিকাতা হইতে আসেন সেই ১৯১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর সপরিবারে রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।* (সাহিত্যিক নহেন এমন অনেক গণ্যমান্য লোকও আসিয়াছিলেন।) ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে আসিয়া রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের সব ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার ছেলে প্রসাদকে এখানে রাখিয়া পড়াইতে উৎসুক হইলেন। প্রসাদের ডাকনাম ছিল মুলু। মুলুর ত উৎসাহের সীমা নাই। কিন্তু মুলুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলিয়া কথা হইল যদি একখানা কুঁড়েঘর পাওয়া যায় তবে তাহাতে মুলুকে এখানে রাখা যায়, সঙ্গে তাহার মা বাবা বোন কেহ থাকিতে পারেন।

নাগপুরের স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্র বসু মহাশয় ছিলেন আগরার রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্য। তিনি কিছুকাল এই আশ্রমে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করেন। সে সময় কঠোর সাধনায় তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তাঁহার স্ত্রী তাই তাঁহাকে লইয়া এখানে বাস করিবার জন্য একটি কুটীর করেন। পরে তাঁহাদের এক কন্যা পীড়িত হওয়ায় এবং পরে কন্যাটি মারা যাওয়ায় তাঁহারা এই বাস উঠাইয়া লইয়া যান। ১৯১৭ সালে রামানন্দবাবুরা সেই কুটীরখানি কিনিয়া শান্তিনিকেতনে বছর দুই কাল বাস করেন। তখন রামানন্দবাবু মাঝে মাঝে কলিকাতায় প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর জন্য গেলেও প্রায়ই এখানেই থাকিতেন। মুলুর সঙ্গে সীতাদেবী ও শান্তাদেবীও থাকিতেন। তাঁহাদের মাতা মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। রামানন্দবাবুর বড় ছেলে কেদারনাথ তখন বিলাতে। এই সময় প্রায়ই রামানন্দবাবু কবির কাছে দেহলী গৃহের ছাদে আসিয়া বসিতেন। চমৎকার নানা প্রসঙ্গ হইত। রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিশুদের জন্য জগতের নানা সাহিত্য হইতে ভাল ভাল জিনিষ লইয়া বাংলা ভাষাতে নূতন নূতন সব গ্রন্থ রচনা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের ভাল ভাল পুস্তক অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ চলিত।

এক-একদিন ইউরোপীয় রাজনীতির কথা উঠিত। একদিন কবিগুরু বলিলেন, "যতদিন লোকে যাহা উৎপন্ন করিতে পারে তাহার চেয়ে বেশি ব্যয় ও সম্ভোগ করিতে বিরত না হইবে ততদিন পররাজ্যের প্রতি লোভ, অন্যকে নানাভাবে প্রবঞ্চনা, জোর-জুলুম প্রভৃতি নানাবিধ পাপের অন্ত হইবে না। প্রাচীন ভারত তাহার জীবন অত্যন্ত শান্ত সরল ও সংযত করিয়াছিল অথচ তাহার তত্ত্বচিন্তা ছিল খুব উচ্চ ধরনের। যতদিন ভারতীয় এই প্রাচীন পুণ্য আদর্শ লোকে গ্রহণ না করে ততদিন জগতে জোর-

---

* "সত্যের আহ্বান" পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

* বাংলা ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়ায় টাউন হলে যে কবি-সম্বর্দ্ধনা ১৪ই মাঘ হয়, সেখানেও তিনি সপরিবারে উপস্থিত হন, সেই উপলক্ষে রামানন্দবাবুর লেখার উপসংহারে ছিল, "তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বাঙালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না।" রবীন্দ্রনাথের সত্তর পূর্ণ হওয়ার পর কলিকাতার রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় "গোল্ডেন বুক অফ ঠাকুর" কমিটির সভাপতি ও গোল্ডেন বুকের সম্পাদক রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে "গোল্ডেন বুক" উপহার দেন। "গোল্ডেন বুকে"র ভূমিকা রামানন্দবাবুর লেখা। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ পূর্তি উৎসব কমিটির একজন প্রধান সভ্য রামানন্দবাবু ছিলেন। কবির সত্তর বৎসরের জয়ন্তী কমিটির প্রথম সভা আহ্বান স্যর জগদীশ, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ও রামানন্দবাবু প্রভৃতির নামে হয়।

জুলুম যুদ্ধ কিছুতেই আসিতে পারে না। ভারতের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেরাও দীর্ঘকাল সেইরূপ জীবন-যাপন করিয়াছেন। তাহার পর ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও দুর্গতি হইল। এখন জগতের অন্য সব দেশে কোন্ লজ্জায় এই যুগের ব্রাহ্মণেরা এই আদর্শের কথা প্রচার করিবেন? আপনি রামানন্দবাবু কিন্তু ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বড় বড় চাকুরী করিয়াও ব্রাহ্মণত্বের বড়াই ও আদর্শ প্রচারের মত নির্লজ্জতা আর নাই।"

রামানন্দবাবু বলিলেন, "দেখুন আপনিও এই বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে উপদেশ দিতে পারেন। দূর হইতে আপনাকে দেখিলে মনে হয় আপনার বোধহয় খুব আড়ম্বরময় জীবন। কিন্তু কাছে আসিয়া দেখি আপনার জীবনযাত্রাও খুব সাদাসিধা। আপনার ঘরে একখানি হাতপাখা পর্য্যন্ত নাই। দারুণ গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নে আপনি সব জানলা-দরজা খুলিয়া সারাদুপুর চৌপর দিন কাজ করেন। চেয়ার নাই, টেবিল নাই, মাদুরে বসিয়া সামান্য ডেস্কে রাখিয়া লেখেন। ঘরের জিনিষ শিকাতে ঝুলাইয়া রাখেন। আসলে আপনার চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর্সা কাপড় পরিলেই আপনাকে রাজার মত দেখায়।"

১৯১৭ সালের ৮ই পৌষ মধ্যাহ্নে আহারান্তে কবিগুরু রামানন্দবাবুকে বলিতেছিলেন, "এইরূপ সহজভাবে শিক্ষা-লাভ করাই ছিল ভারতের আদর্শ। আমাদের দেশে আলো-বাতাসের মত জ্ঞানও ছিল সর্ব্বসাধারণের সাধারণ ধন। তাহা গুরুর কাছে পয়সা দিয়া কিনিতে হইত না। শিষ্যের কাছে পয়সা লইয়া তাহা বেচাও চলিত না। ছেলেদের পড়ার ব্যয় পিতা বা অভিভাবককে বহন করিতে হইত না। ছাত্ররা সব ব্রহ্মচারী। যেখানেই সে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিবে, 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' বলিবে, সেখানেই তাহার জন্য অন্ন আছে। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের হইয়া সে জ্ঞানের সাধনা করিতেছে। জ্ঞান যে ছিল তখন সবারই ধন।"

"...প্রাচীনকালে তপোবনে বসিয়া ভারতের যে সরল উন্নত মহান্ আদর্শ ছিল তাহাই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম এই শান্তিনিকেতনে। আমার তখনকার দিনের সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও আমি আমার দিক হইতে কম চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তবু পারিলাম না। সমাজের সেই সহযোগিতা পাই নাই। তাই পরিশেষে আপন আপন ছেলেদের ব্যয়ের জন্য অভিভাবকদের শরণাপন্ন হইতে হইল।

...পিতামাতারাই যখন সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেছেন তখন এই শিক্ষার মালিকও তাঁহারাই। ইহা এখন তাঁহাদের বৈষয়িক সম্পত্তির মধ্যেই।"

গভীর দুঃখে কবি এই কয়টি কথা বলিলেন। রামানন্দ বাবু বলিলেন, "দেখুন, আমিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মধ্যে শিক্ষার যে সার্ব্বজনীন সামাজিক রূপ ছিল তাহার কতকটা আজও আছে আমাদের দেশের টোল ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে। আমিও এইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরেরই ছেলে। আমি আপনার মনের দুঃখটা বুঝিতে পারি। আজ শিক্ষার জন্য যে ব্যয়, তাহাতে কয়জন লোক সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারেন? ব্রহ্মদেশে শিক্ষাটা সমাজ-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সেখানে কেহই নিরক্ষর নাই। আজ ভারতের সর্ব্বত্র অজ্ঞান ও অন্ধকার। আপনি সেই সাধনাকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিবেন না। নিষ্ফল হইলেও আবার চেষ্টা করুন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার এই কথা আমারও মনে জাগিতেছে। যদি ভুলিয়া যাই তবে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিবেন।"...যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের কল্পনা গুরুদেবের মনে স্থির হইল তখন তিনি রামানন্দ-বাবুকে একদিন বলিলেন, "দেখুন, এখন আমি আমার সেই সঙ্কল্পকে যে আবার প্রাণবান্ করিতে পারিব সেই সম্ভাবনা আসিয়াছে।"

রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার শিক্ষার প্রণালীর কি কিছুটা স্থির করিয়াছেন?" গুরুদেব বলিলেন, একেবারে আগে হইতে সব ঠিক-ঠাক করিয়া রাখা আমার স্বভাব নহে, জীবনের ধর্ম্মও তাহা নহে, এবং তাহা আমি প্রার্থনীয়ও মনে করি না। তবু আমার মনে মনে যে একটা সুস্পষ্টরূপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মোটামুটি এইরূপ :...

সব শুনিয়া রামানন্দবাবু বলিলেন, "আপনার মনে যে শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট রূপ আসিয়াছে তাহা চমৎকার ও পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তাহা কি আপনি ছেলেদের জন্যই বদ্ধ রাখিতে চাহেন? এই সঙ্গে কি মেয়েদের কথাও ভাবেন?"

গুরুদেব বলিলেন, "মেয়েদের কথাই আমার সর্ব্বাগ্রে মনে হয়। শিশুদের দুঃখ দেখিয়াই আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করি। এখন আরও কোথাও কোথাও ছেলেদের জন্য চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য এখনও তেমন কোন আয়োজন হয় নাই। আর মেয়েদের দুঃখও অনেক আছে। তাহা আমার অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করে। কিন্তু শুধু মেয়েদের দিয়াই তাহা চালানো যাইবে না। আপনি ও নেপালবাবু প্রভৃতি না থাকিলে ত চলিবে

না। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দুঃখ দূর হয় ইহাই আমার বিশেষ ইচ্ছা।"

গুরুদেব বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রীতিমত ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পরও তিনি ছেলেদের লইয়া শেলি ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কঠিন কঠিন কবিতা লইয়া অধ্যাপনা করিতেন।…এইসব অধ্যাপনার সময়ে রামানন্দবাবুও এখানে থাকিলেই আসিয়া বসিতেন।…রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে বলিতেন, "মহাশয়, আমি ছোট ছেলেদের পড়াই। তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বড়দের পড়াইবার অভিজ্ঞতা আমার নাই। সেখানে আপনি আমাদের চালাইতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে ত আমি দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটদের আসরে আসেন?"

(পরে) বিশ্বভারতীতে যখন শিক্ষা ভবন অর্থাৎ কলেজ-বিভাগ স্থাপিত হয় তখন কবি রামানন্দবাবুকে আনিয়া সেই বিভাগের অধ্যক্ষতা দেন। রামানন্দবাবু বিনা বেতনে সেই কাজে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগের বিষয়ে তাঁহার অন্য মত থাকায় তিনি অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া দেন। ১৩৩২ সালের ৬ই ভাদ্র লেখা সেই বিষয়ক পত্রও আমি দেখিয়াছি।

যাহা হউক ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে (ইং) যখন রামানন্দবাবু এখানে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি ছাত্রদের সাহিত্যসভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সভাপতির কাজও করিতেন। তাহাতে নানা বিষয়ে ভাল ভাল উপদেশও রামানন্দবাবু দিয়াছেন। সেইসব সভার কার্য্য-বিবরণী খুঁজিয়া দেখিলে রামানন্দবাবুর অনেক আন্তরিক অপূর্ব্ব উপদেশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

…১৯১৮ সাল, বর্ষাকাল। একদিন সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের মূল সূত্রগুলি কেমনভাবে পাইলেন, সেই কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কাবুলীওয়ালা গল্পের মিনি হইল আমার বড় কন্যা বেলা। সে ঠিক ঐ রকম। সারাদিন বক্ বক্ করিত। তার মা ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন, আমিই ছিলাম তাহার একনিষ্ঠ শ্রোতা।…

এমনভাবেই এক একদিন রামানন্দবাবু এক এক করিয়া তাঁহার পুরাতন সব গল্পের জন্মকথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কবি তাঁহাকে একে একে সেই সব কাহিনী শুনাইতেন। এই সব মজলিস প্রায়ই সন্ধ্যায় সময় বসিত। এমনভাবে "সমাপ্তি", "পোষ্টমাষ্টার", "দুরাশা" প্রভৃতি অনেক গল্পের জন্মকথা তিনি বলিয়াছেন।

স্বল্পভাষী রামানন্দবাবু দেখিতে গম্ভীর হইলেও রীতিমত রসজ্ঞ ছিলেন। নিজেদের মজলিশে তিনি বেশ জমাইয়া গল্প করিতেন। জীবনের শেষভাগে দেখিয়াছি তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার মেয়েদের ও নাতনীদের লইয়া খুব গল্প জমাইয়া বসিয়াছেন। দেখা হইলেই তাঁহার মুখে শুনিতে পাইতাম আমার কন্যাদের ও নাতনীদের বিষয় অনেক গল্প ও তাঁহার নাতনীদের সব গল্প।

রামানন্দবাবু নীতিপরায়ণ বলিয়া কাব্যরস ও জীবনের রস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার মন খুব উদার ছিল। ১৯২০—১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার কথা উঠে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগীত অভিনয় প্রভৃতির কথা তুলিয়া অনেক ব্রাহ্ম ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রবীণ হইলেও রামানন্দবাবু আগাগোড়া তরুণদের দলে যোগ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে লড়িয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে সব মজার মজার চিঠি নানা স্থান হইতে আসিত। কবি তাহা রামানন্দবাবুকে দেখাইলে দুইজন বৃদ্ধ বসিয়া রীতিমত তাহার রস সম্ভোগ করিতেন।

…তখনকার দিনে আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথের পিতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন। দ্বিপুবাবু খুব মজলিশী মানুষ ছিলেন। রামানন্দবাবু নেপালবাবু এই দুইজনে মিলিয়া দ্বিপুবাবুর দরবার সরগরম করিয়া তুলিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাহাতে যোগ দিতাম।

মুলু ছেলেটি পিতার এই সরসতা পাইয়াছিল। সুকুমার রায় মহাশয়ের সহিত মুলু এখানে অনেকবার সুকুমারবাবুর অদ্ভুত রামায়ণ গান করিয়াছে। আবার মুলুর হৃদয় চারিদিকের দুঃখী-দুর্গতদের দুঃখেও সদাই ব্যথিত হইত। এমন সহৃদয় বালক বড় একটা দেখা যায় না। নিকটবর্ত্তী গ্রামের দরিদ্রেরা ছিল তাহার পরম বন্ধু। তাহাদের জন্য সে একটি নৈশ বিদ্যালয় করিল। ইহার জন্য আপন যাহা কিছু সঞ্চয় তাহা সে ব্যয় করিত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পরিত্যক্ত সব খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া কাঁধে করিয়া বহিয়া সে বোলপুর শহরে বিক্রয় করিয়া আসিত। অর্থ যাহা পাইত তাহা সে নৈশ বিদ্যালয়ে ও দুর্গতদের সহায়তায় ব্যয় করিত। এই জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আশ্রমের উৎসবে আনন্দ বাজারে ছেলেদের লইয়া সে প্রদর্শনী খুলিত, সার্কাসের আয়োজন করিত। তাহার এই সব উৎসবের কাজে গুরুদেব ও রামানন্দবাবু অর্থ সাহায্য করিতেন। মাঝে মাঝে মুলু নৈশ বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইত। তাহাতে রামানন্দবাবুর

বিশেষ উৎসাহ ছিল। খুব অল্পদিন মুলু বাঁচিয়াছিল। ১৯১৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মুলু সামান্য কয়েকদিন রোগে ভুগিয়া মারা যায়।·· পরদুঃখকাতরতায় ও লোক-সেবাতেও মুলু রামানন্দবাবুরই পুত্রের যোগ্য ছিল।

তাহার মৃত্যুর পর রামানন্দবাবু তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ দান করেন তাহার সহায়তায় এখনও সেই প্রসাদ বিদ্যালয়ের সেবাকার্য্য চলিতেছে। গ্রামবাসী দরিদ্র শিশুরা এখনও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মুলুর সেই সেবার স্মৃতিকে জীবন্ত রাখিয়াছে।

রামানন্দবাবু যে কত বড় মহাশয় মানুষ ছিলেন তাহার একটি পরিচয় বিশ্বভারতীর ইতিবৃত্ত হইতেই আমরা দিতে পারি। এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থ-গুলির সমস্ত হিন্দী অনুবাদের অধিকার ও মালিকানা নিজে হইতেই রামানন্দবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার বহু বৎসর পরে রামানন্দবাবুকে প্রদত্ত এই মালিকানা স্বত্বটা বিশ্বভারতীর পক্ষে পুনরায় পাওয়া একান্ত আবশ্যক হইল। এই স্বত্বটা না পাইলে বিশ্বভারতীর শুধু যে আয়ের ক্ষতি হয় তাহা নহে, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর ভারতীয় অনুবাদগুলির সুব্যবস্থাও বিশ্বভারতী করিতে পারেন না। অথচ যে বস্তু দিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা তো ফেরৎ চাওয়াও যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাহা কিছুতেই চাহিলেন না। কিন্তু কি করিয়া রামানন্দবাবু তাহা টের পাইলেন। এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কবিগুরুর কাছে প্রাপ্ত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর সমস্ত স্বত্ব ও মালিকানা তিনি সানন্দে বিশ্বভারতীকে প্রত্যর্পণ করেন।···

রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা এতক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই। তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী সংসার-ভোলা লোক। রামানন্দবাবুকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামানন্দবাবুও তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সব লেখাই তিনি রামানন্দবাবুকে পাঠাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন। এক এক সময় রাত্রিকালে আসিয়াও তিনি আমাকে শুনাইতেন রামানন্দ-বাবুকে তিনি কি লিখিয়াছেন অথবা রামানন্দবাবু তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই বাংলাতে Shorthand বা রেখাক্ষর লেখন-রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সেই প্রণালীই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এখনও চলে। তিনি তেমন বৈষয়িক লোক নহেন বলিয়া সেই প্রণালীর যে তিনিই আদি প্রবর্ত্তক সে কথা অনেকেই এখন জানেন না।

এই রেখাক্ষর বিষয়ে নানা চিত্রসহ তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে নানা চমৎকার সরস কবিতার উদাহরণ সমেত দ্বিজেন্দ্রবাবু সাজাইয়া লিখিতেন। তাহা ছাপাইতে গিয়া কোনো মুদ্রাযন্ত্রেই তাহা ঠিক তেমনটি করিয়া মুদ্রিত করা গেল না। তখন রামানন্দবাবু বলিলেন, "যদি ছাপানই না যায় তবে আপনার স্বহস্তে লেখা পাতাগুলি হাফটোন করিয়া বই ছাপানো যায়।" তাহাতে দ্বিজেন্দ্রবাবু অতিশয় প্রীত হন এবং রামানন্দবাবু সেই ভাবেই মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।*

দ্বিজেন্দ্রবাবু শুনিয়াছিলেন রামানন্দবাবু অন্ধদের জন্যও এইরূপ লিখন-প্রণালী বাহির করিয়াছিলেন। তাহাও কোন সাধারণ প্রেসে ছাপিবার মত ছিল না। সেই জন্যই রামানন্দবাবু হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের উৎসাহটার অর্থ বুঝিয়াছিলেন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রামানন্দবাবুকে একটি কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে এই দেশের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ দেবার জন্য আপনি চাকুরী প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছিলেন! আপনার সেই চেষ্টা এতদিনে ধন্য হইয়াছে। আপনি আপনার জীবনের প্রারম্ভে অন্ধদের দৃষ্টিহীনতার দুঃখ দূর করিতে তাহাদের জন্য অক্ষর রচনা করিয়াছিলেন, আপনি ধন্য। অন্ধকে দৃষ্টি দিয়া বোবার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া আপনি জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। ভগবান আপনার সহায় হউন। বহুকাল আপনি ছিলেন গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমতীর্থ প্রয়াগধামে। আপনার মধ্যে এখনও জ্ঞান ও সেবার ধারা সমভাবে প্রবাহমান। আপনি এখনও জ্ঞান ও সেবার সঙ্গম-ক্ষেত্রে সেই মুক্তিতীর্থবাসী।"

"আপনি অক্ষয় বটের তলে সাধনা করিয়াছেন। আপনার সাধনা অক্ষয় হউক। দ্রৌপদীর স্থালী ছিল অক্ষয় স্থালী। যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে না খাইতেন ততক্ষণ তাঁহার স্থালীর অন্ন ফুরাইত না। স্বার্থের স্পর্শ না ঘটিলে ভগবানের দান অক্ষয় হয়। আপনি নিঃস্বার্থ সাধক, আপনার সাধনা অক্ষয় হইবে। সেই সাধনার অক্ষয় বটমূলে আপনি চিরকাল সমাসীন থাকুন।"

রামানন্দবাবুর জীবনাবসানে দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই মহাবাণী স্মরণ করি।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

---

* দ্বিজেন্দ্রবাবুকে রামানন্দবাবু এতভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে দ্বিজেন্দ্রবাবু একবার তাঁহার লেখায় (রেখাক্ষর বিষয়ে) সামান্য একটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বোধ করাতে রামানন্দবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে খুসী করিবার জন্য প্রবাসীর একটি ছাপা ফর্ম্মা নষ্ট করিয়া নূতন করিয়া আর একটি ফর্ম্মা ছাপিয়া দেন।

মহামনীষী রামানন্দ

শ্রীকালিদাস রায়

সারস্বত তাপস মহান্
দেশসেবাব্রতে তব স্মরি সেই নিবেদিত প্রাণ
অসত্যের চিরবৈরী স্বতন্ত্র উদাত্ত নির্ভীক
সত্য তব ছিল প্রাণাধিক।
গুল্মবনে বনস্পতিসম তুমি ছিলে উচ্চশির,
সাহিত্য বিহঙ্গবৃন্দ আশ্রয়ে তোমার বাঁধি নীড়
সন্ধ্যা প্রাতে কলকণ্ঠে করিয়া কূজন
আনিল এদেশ ভরি ভাবের প্লাবন।
হে আচার্য লোকগুরু, তোমার সাধনা
একনিষ্ঠ বাণী আরাধনা
অঙ্গীভূত হয়ে আছে দেশে নব কৃষ্টি কল্প মাঝে
নব নব সৃষ্টিরূপে গৌরবে বিরাজে।

হে চিন্তানায়ক
চিনাইলে কারা দেশে বৈদগ্ধ্যের ধারক বাহক।
যত হেরি দেশভরা শফরীর লীলাচপলতা
তত আজ স্মরি তব কথা,
অগাধ জল সঞ্চারী অবিকারী রোহিতের মতো
ছিলে তুমি। ঋষিকল্প দণ্ডে অহুদ্ধত
দ্বন্দ্বাতীত মিতবাক অপ্রমত্ত চরিত তোমার
আদর্শ মনীষী হেন কোথা পাবে আর?
আতিশয্য মুক্ত তব ন্যায়নিষ্ঠ সংযত ভাষণ
আবেগ-প্রমত্ত মূঢ় কোলাহল করেছে শাসন,
করেছে শাসন নিত্য যত ভণ্ডতারে
সমাজে, সাহিত্যে রাষ্ট্রে মিথ্যাচারে যত অনাচারে।

স্বাধীন চিন্তার পথে তুমিই দিশারী
কবীন্দ্রের দানের ভাণ্ডারী,
যে রথে রবীন্দ্র রথী সেই রথে তুমিই সারথি,
যে ব্যোমে রবিই রবি সেই ব্যোমে তুমি বৃহস্পতি।
পীড়া দিত অমার্জিত রুচি
মার্জিত করিলে তারে পরিচ্ছন্ন শুচি।
প্রজ্ঞা তব দেশের রুচির
দাসীত্ব করেনি কভু স্বার্থ লাগি ওগো কর্মবীর।
একদিকে কুসংস্কারী তামসিক সমাজজীবন
অন্যদিকে রাজসিক পাশ্চাত্ত্যের অন্ধানুকরণ
সব্যসাচী দুই হস্তে করিয়া সংগ্রাম
সত্ত্বাশ্রিত অগ্রগতি তব অবিরাম।
ছিলে অর্ধশতাব্দীর প্রাণবন্ত জ্ঞানপ্রতিষ্ঠান
তোমার উদ্দেশে করি প্রণিপাত আজি মহাপ্রাণ।

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। } বৈশাখ, ১৩০৮। { ১ম সংখ্যা।

সূচনা

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা "প্রবাসী" প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

আবাহন

১

এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী;
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে! হে ভারতি,
এস, এস আজি। কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে সুহস্তে লয়ে; গালভরা হাসি
মুখে; নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি;
মোহন শ্রবণযুগে রক্তোৎপল দুল,
ঝলমল্ ঝলমল্ বাসন্তী দুকুল;
এস, বিশ্ববিমোহিনি, লয়ে রূপরাশি।
এস মা, এস মা আজি, উষা যথা আসে,
আলোক-আবীর-রাশি ঢালি, হাসি, হাসি,
অরুণের শিরে!—আসি যথা পৌর্ণমাসী
খুলি দেয় জ্যোৎস্না-ফোয়ারা!—বিশ্ব ভাসে
আনন্দ-সলিলে! লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া!

২

এস মা, কবির নেত্রে সহসা উদয়
অফুরন্ত ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে! ভক্ত-সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্ট-দেবতা-মূরতি
হয় যথা আবির্ভূত! বন্ধ্যারে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময়
গৃহাঙ্গণ, আঁধারেতে জ্বালি শত জ্যোতি,
জননী-উৎসঙ্গে শোভে সুন্দর তনয়!
শিশু যবে, গৃহ ছাড়ি, পথ হারাইয়া,
হয়, আহা! ভয়-ত্রস্ত, ক্রন্দন-আকুল,
মা তাহার, শশব্যস্তে, এলাইয়া চুল,
উন্মাদিনী-প্রায়, লয় বাছারে তুলিয়া!
আমি কাঁদি এ প্রবাসে; কোথা মা গো তুমি?
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি!

৩

বহুদিন পাই নাই শেফালীর বাস;
বহুদিন শুনি নাই কোকিল-কাকলী!

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বর্ষামঙ্গল

শিল্পী : অমর দাশগুপ্ত

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭২

চতুর্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ
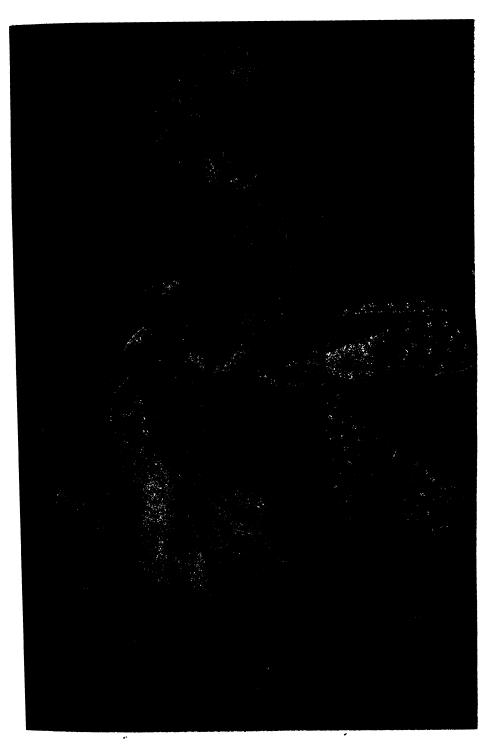
ভারত সরকারের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার বিষয়ে জগতের বাজারের খবর এই যে, স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় ভারতে অবাধে চলিতেছে। ভারতীয় অর্থনীতির ক্রম-অবনতির ফলে ভারতের জনসাধারণের বিশ্বাস এই দাঁড়াইয়াছে যে, সম্ভবতঃ ভারত সরকার কোনও একটা শেষ চেষ্টা হিসাবে ভারতীয় কাগজের মুদ্রার উচ্চ মূল্যের "নোট"গুলি লইয়া কিছু একটা করিবেন। এই কারণে সকলে "নোটে"র বদলে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া সেই মূল্যবান ধাতুতে নিজ নিজ সম্পদ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ইহাই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান কারণ। ভারতের খবরের কাগজে স্বর্ণমূল্য সম্বন্ধে খবর বাহির হয় ও তাহাতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে স্বর্ণমূল্য অতি উচ্চেই রহিয়াছে এবং যথেষ্ট স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। শুধু স্বর্ণকারদিগের পেশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, সরকারের স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ পন্থা এবং তদনুযায়ী নিয়মে চব্বিশ ভাগে চৌদ্দ ভাগ মাত্র স্বর্ণ থাকিবে এই আদেশ।

চৌদ্দ "ক্যারেট" স্বর্ণে অনেক রকম নক্সাই উঠান সম্ভব হয় না এবং উক্ত স্বর্ণ বাইশ "ক্যারেট" অপেক্ষা কঠিন বলিয়া মজুরি পোষায় না ইত্যাদি কারণে এবং চৌদ্দ "ক্যারেটে"র গহনা কেহ লইতে চায় না বলিয়া স্বর্ণকারদিগের কাজ জোটে না। অনেকে আত্মহত্যা করিয়া অনাহারে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অনেকে কারখানার কুলির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। একটি অতি সুন্দর ও বিশ্বজনসাধারণের আদরের বহু পুরাতন শিল্প স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঙালী, মান্দ্রাজী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি কারিগরদিগেরই এই শিল্পে সংখ্যাধিক্য ছিল। তাহারাই মার খাইয়াছে। যে তত কিছু ক্ষতি হয় নাই। কয়েক লক্ষ ব্যক্তির পেশা নষ্ট করিয়া ও বহু দোকানদারের সর্ব্বনাশ করিয়া, ভারত সরকার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম প্রতীয়মান হইয়া বিশেষ লজ্জিত বা অনুতপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহাদিগের আদর্শ অনুসরণে বিফলতা এতবার ঘটিয়াছে, যে, তাহারা বিফলতার স্তম্ভের উপরেই সফলতা গঠন করা হইয়া থাকে এই প্রবচনের প্রমাণে আত্মনিয়োগ করিয়া উত্তরোত্তর আরও উচ্চতর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছেন। সফলতার পরিকল্পনার এখনও হয়ত সময় হয় নাই। যখন হইবে, তখন বিফলতার গভীর স্তম্ভারণ্যে কে বিচরণ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? যাহাদিগের হারাইবার কিছু নাই—বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ কিংবা সূক্ষ্ম কর্ম্মক্ষমতা শুধু তাহারাই বোধ হয়। এ প্রায় আণবিক মহাযুদ্ধের পরে শুধু চীনারা মাত্র কিছু সংখ্যায় বাঁচিয়া থাকিবে, মাও ৎসে তুঙ্গের সেই অমর বাণীর মতই একটা "আশার" কথা। মানুষের মধ্যে কে জীবিত থাকিবে কে জানে? বাসনের মধ্যে থাকিবে শুধু লোটা, বস্ত্রের মধ্যে ল্যাঙ্গোটি ও খাদ্যের মধ্যে ছাতু। হয়ত দড়ির চারপাই দুই একটা।

ভারত সরকার, অর্থাৎ কংগ্রেস-চালিত ভারত "গবর্ণমেণ্ট", ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ভারতীয় জনসাধারণকে নানা ভাবে সুনীতির পথে চলিতে শিখাইতেছেন। সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনও জয়যুক্ত হয় না ইহা এই শিক্ষার আরম্ভ। তৎপরে ত্যাগধর্ম্ম, সাদাসিধা বিলাসিতা-বর্জ্জিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, মদ্যপান নিবারণ, গোহত্যা নিবারণ, সকল স্তরের লোকের মধ্যে সাম্য আনয়ন প্রভৃতি অসংখ্য ছোটবড় বিষয়ে সুনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে ভারত সরকার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা বিশেষ সক্ষম হন নাই। ভারতে, এমন কি কংগ্রেসের দপ্তরেও,

সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক বিবরণ যাহা প্রকাশিত হয় প্রতি বৎসরে, হিন্দী ভাষার প্রচারের জন্য মৈথিলী, ভোজপুরী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে হিন্দীর অন্তর্গত বলিয়া প্রচার, কংগ্রেসী নেতাদিগের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে মিথ্যার ভেজালের আধিক্য থাকিলে তাহা দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইতেছে বলা চলে না। ত্যাগ-ধর্ম্ম ও বিলাসিতা বর্জ্জন ভারত সরকারের দপ্তরে, যানবাহনের প্রাচুর্য্যে, শত শত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মহারথীদিগের বাসের ব্যবস্থায়, দেশ ভ্রমণে ও গোপনে অর্থ উপার্জ্জনে প্রমাণ হয় না। মদ্যপান বোম্বাই প্রদেশে ও রাজধানী দিল্লীতে প্রবল ভাবে চলিয়া থাকে। অন্যত্রও মদ্যপান ক্রমবর্দ্ধনশীল। পূর্ব্বে যাহারা কখনও মদ্যপান করিত না এখন তাহারাও মদ্যপান করে। সাম্যবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অর্থনৈতিক স্তরগুলি আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কেহ খাইতে পায় না ও অনেকে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ৫০০০০।১০০০০০ টাকা কাঠা হিসাবে জমি কিনিয়া ও আকাশ অবধি উচ্চ দশ, বার কিংবা চৌদ্দতলা প্রাসাদ গঠন করিয়া শহরগুলির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতেছে। অনেকে রিক্শা ব্যতীত অপর যানে উঠিতে অক্ষম এবং কেহ কেহ গোপনে লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদেশী মোটর গাড়ি ক্রয় করিতেছেন। মন্ত্রীগণও অনেকে ঐরূপ বিদেশী গাড়ি চড়িয়া বেড়ান। কালোবাজার সর্ব্বব্যাপ্ত এবং সরকার তাহা বন্ধ করিতে পারেন না কিংবা পারিলেও বিশেষ বিশেষ কারণে বন্ধ করেন না।

কচ্ছ

কিছুকাল পূর্ব্বে কচ্ছের আন্তর্জ্জাতিক সীমানা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানের সৈন্যদল ভারতে ঢুকিয়া পড়ে ও কোন কোন স্থানে যুদ্ধ হয়। সে সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষের হতাহত কিছু কিছু হয় এবং ইহা পরিষ্কার প্রমাণ হইয়া যায় যে, পাকিস্তান আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছে। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক গোল-যোগের সূত্রপাত হয় ও আমেরিকা অন্তত জোরগলায় না হইলেও মৃদুকণ্ঠে পাকিস্তানকে এই সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়া নিজেদের আপত্তি জানান। অতঃপর ভারত সরকার পাকিস্তান ও জগতের সকল জাতিকে জানাইয়া দেন যে ভারত পাকিস্তানের এই আক্রমণ কদাপি সহ্য করিবেন না এবং ভারতের সীমানা ছাড়িয়া, অর্থাৎ ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বের অবস্থায়, পাকিস্তানের সকল সৈন্য ফিরিয়া না যাইলে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা করা চলিবে না ইত্যাদি। এই বিষয়ে ব্রিটেন সম্যক্ আলোচনার প্রচেষ্টা ও যুদ্ধ বন্ধ করিবার ব্যবস্থার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহাদিগের চেষ্টার ফলে ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যে সকল সর্ত্তে পাকিস্তানের সহিত অস্থায়ী সন্ধি করিয়াছেন তাহাতে ভারতের যুদ্ধারম্ভের সময়কার ঘোষণার সহিত বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। কারণ সে সময় ভারত সরকার বলিয়াছিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সীমানা সঠিক সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট করা আছে ও পাকিস্তান নিঃসন্দেহে সেই সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের ভিতরে আসিয়া স্থান দখল করিয়াছে। সুতরাং যতক্ষণ ভারতের সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিও উহাদের দখলে থাকিবে ততক্ষণ ভারত পাকিস্তানের সহিত কোনও আলোচনায় যোগদান করিবেন না।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধবন্ধ ব্যবস্থাতে ভারত মানিয়া লইয়াছেন যে, কচ্ছের সীমানা অনির্দ্দিষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। বর্ত্তমানে পাকিস্তান কচ্ছের শুধু সীমানা নহে সম্পূর্ণ কচ্ছদেশের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি লইয়া আলোচনার সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। এবং অনেকটা জায়গা, যাহা ভারতের ভিতরে ছিল, সেখানে পাকিস্তান ভারত স্থায়ীভাবে সেই স্থল নিজ দখলে লইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেখিবার অধিকার পাইল। অর্থাৎ শ্রীরামমনোহর লোহিয়ার ভাষায় ভারত ত্রিবিধভাবে পাকিস্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। (১) ভারত নিজ সীমানা ছাড়িয়া অনেকদূর হটিয়া থাকিতে রাজি হইয়া নিজ রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। (২) ভারত নিজ সীমানার ভিতরে পাকিস্তানের প্রবেশ অধিকার মানিয়া লইলেন। (৩) ভারত সমগ্র কচ্ছদেশ বিভাগ-বিবাদের বিষয় বলিয়া মানিয়া লইয়া অযথা পাকিস্তানকে নানা প্রকার দাবিদাওয়া পেশ করিবার পথ খুলিয়া দিলেন। এই "আত্মসমর্পণ" করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু গায়ে পড়িয়া ভারতের যুদ্ধবিরুদ্ধতা বড় করিয়া দেখাইবার আগ্রহে ইহা করা হইল। ভারতের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ বিচার ও রক্ষার ব্যবস্থা যে কতদূর ঢিলা ধরনে চালান হয় কচ্ছের ব্যাপারে তাহা প্রকটভাবে মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের জনসাধারণ এখনও যদি কংগ্রেস সরকারের "আদর্শবাদ", জগৎ রাষ্ট্রমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ও দুর্ব্বলতার পূজা বন্ধ করাইবার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তাহারা যদি পুনরায় পরদাসখতে নাম লিখাইতে বাধ্য হন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।

ভারতের সমরসচিব চাবান মহাশয়ের মতে যাঁহারা কচ্ছ সংক্রান্ত ব্যবস্থা লইয়া ভারত সরকার পাকিস্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বা পাকিস্তানকে খুসী করিবার জন্য নিজ অধিকার হারাইয়াছেন মনে করেন তাঁহারা পরাজয় বিকার আক্রান্ত এবং নিজেদের জটিল মনোভাব প্রসূত কাল্পনিক অক্ষমতার ভয়ে ভীত। আমরা বিকার ইত্যাদির বিচারে সক্ষম নহি, এমন কি মনোবিজ্ঞান যাহা যৌবনে পাঠ করিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। চাবান মহাশয়ও

করিয়াছেন, কারণ তিনি যেরূপ তৎপরতার সহিত কংগ্রেস সরকারের সমালোচকদিগের মানসিক ব্যাধিগুলির বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিয়াছেন যদি ততটা তৎপরতা তিনি দেশশত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিতে দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে এই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইত। তাঁহার উচিত সমর-সচিবের পদ ত্যাগ করিয়া শ্রীলালবাহাদুরকে বলিয়া একটি মনোবিজ্ঞান-সচিবের পদ সৃষ্টি করাইয়া সেই পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। কারণ তিনি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের খাদ্য সমস্যা, বিদেশী মুদ্রার অভাব, নিরক্ষরতা, চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব, বেকার সমস্যা, চোর-ডাকাইতের অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব, কালোবাজার ও ট্যাক্স ফাঁকি প্রভৃতির নিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

শুধু সমরক্ষেত্রে আমরা মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা বাস্তব সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও যুদ্ধক্ষমতা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করি। চাবান মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান ও চীন জগতের চক্ষে হেয় প্রমাণ হইয়াছেন এবং ভারত শান্তিপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উত্তম কথা। আমরা মনে করি আমরা যখন যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হইয়াছি তখন আর অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। অতিরিক্ত খ্যাতির ক্ষুধাও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ব্যাধি বলা যাইতে পারে। আর একটা ঐ বিজ্ঞানের কথা আছে যে মানুষের দোষগুণ নানা প্রকার কাল্পনিক সাফাই গাহিয়া গুণ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সমষ্টিগতভাবে ঐরূপ চেষ্টা রাষ্ট্রীয় দলগুলির মধ্যেও দেখা যায়। অক্ষমের পক্ষে নিজেকে সক্ষম মনে করা দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে, সেইজন্য ধর্ম্মপথের পথিক যিনি বা যাঁহারা, তাঁহার বা তাঁহাদিগের উচিত যে কার্য্য করিতে তিনি বা তাঁহারা অক্ষম সে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া উপযুক্তর হস্তে সেই ভার ন্যস্ত করা।

বাংলায় কেন্দ্রীয় পুলিশের রাজ্যবিস্তার আকাঙ্ক্ষা

বাল্যকালে আমরা "আরব ও উষ্ট্র" বলিয়া একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি উষ্ট্র শীতের রাত্রে এক আরবের নিকট যাইয়া তাহাকে বলে, "ভাই আরব, বড় শীত, তোমার তাবুর মধ্যে আমার নাকটুকু শুধু রাখিতে দাও।" আরব তাবুতে নাক ঢুকাইতে দিল। কিছু পরে উষ্ট্র বলিল "ভাই আরব, আমার বড় শীত করিতেছে। দয়া করিয়া তাঁবুতে মাথা গলাইয়া দিতে দাও"। আরব তাহাকে তাঁবুতে মাথা গলাইয়া থাকিতে দিল। এইভাবে ক্রমশঃ উষ্ট্র আরবকে তাঁবু হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাঁবুটি পূরা দখল করিয়া লইল। আরবের পরিস্থিতি কি হইল গল্পে সে কথা লেখা ছিল না। তাঁবু হারাইয়া আরব সম্ভবতঃ মরুভূমিতে আশ্রয় লইল।

বাংলা দেশে বাঙ্গালীর অবস্থা অনেকটা ঐ দয়ালু আরবেরই মত। ইংরেজ বাংলায় প্রথম আসিয়া সঙ্গে অসংখ্য পাইক-বরকন্দাজ একত্র করিয়া মহা সমারোহের সহিত রাজত্ব করা আরম্ভ করে। এই সকল পাইক-বরকন্দাজ, খিদমতগার, বাবুর্চ্চি, মশালচি, মুৎসুদ্দি, পোদ্দার মুনীম, গাইয়ে-বাজিয়ে, সভাসদ প্রভৃতির বহু লোকই মুসলমান আমলের বাদশাহী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ। ইহাদিগের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু আগন্তুক ছিল যাহারা অনেকে বাংলায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

বাঙ্গালী যাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সহায়তা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে সুরু করিলেন তাঁহারাও অনেকে পূর্ব্বে মুসলমান নবাবদিগের সভাসদ ছিলেন। এবং অনেক নূতন লোকও নূতন রাজত্বে লাভের আশায় জুটিয়া গেলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দেশভক্তি দেশপ্রীতি প্রভৃতি গুণ থাকিলেও জোরাল ভাবে ছিল না। ইঁহারা লাঠিয়াল, খাজনা আদায়ের লোক প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমদানী করিতেন ও রাজপুতানা পাঞ্জাব ও আউধ হইতে বহু কর্ম্মচারী ইঁহাদিগের দফ্‌তরে কাজ করিত। বহুকাল রাজত্ব ও ব্যবসা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিপাহী যুদ্ধের পরে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে তুলিয়া দিয়া হটিয়া গেল ও সাম্রাজ্যবাদীরা প্রবল ভাবে ভারত গ্রাসের প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিল। এই সময় বাংলা দেশ ভারতের কেন্দ্র ছিল ও কলিকাতা ছিল রাজধানী। এমত অবস্থায় কলিকাতা আন্তর্জাতিক ব্যবসারও কেন্দ্র হইয়াছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে কারখানায় খনিতে আড়তে জমিদারি সেরেস্তায় শত শত অল্প বেতনের কর্ম্মী নিযুক্ত হইতে লাগিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরে মালিক হইয়া দাঁড়াইল। ভারতীয় রাজাদিগের অর্থ কলিকাতায় খাটিতে লাগিল এবং বাঙ্গালীর বিলাসিতা ও অলসতা দোষের সুযোগ লইয়া উচ্চ সুদে ঋণ দিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালীর ব্যবসা সম্পদাদি অপরে আপন করায়ত্ত করিয়া লইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার চূড়ান্ত হইল। বাঙ্গালীর ব্যবসা এই সময় আরও অধিক পরিমাণে অপরাপর জাতির লোকের হস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল ও শীঘ্রই বিদেশী ব্যবসার এজেণ্ট বা এতদ্দেশীয় প্রতিনিধি বাঙ্গালী আর বিশেষ কেহ রহিল না। চাকুরীতেও বাঙ্গালী সরাইয়া অপরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা রাখিতে লাগিল। সুদের হার আরও বাড়িয়া শতকরা মাসিক ৬৲ টাকা দাঁড়াইল ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আর রহিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ছোট ছোট দোকানও ক্রমশঃ বাঙ্গালীর রহিল না, কারণ পাইকারগণ অবাঙ্গালী দোকানদারদিগকে অধিক সুবিধায় মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। বাঙ্গালী কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্ব্বাগে থাকিয়া ব্রিটিশের হস্তে অধিকতর কঠোর ভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল। হাজার হাজার যুবক জেলে আটক হইল, শত শত যুবক দ্বীপান্তরিত হইল বা ফাঁসির মঞ্চে ও গুলীর আঘাতে প্রাণ দিল, অনেকে অবাঙ্গালী পুলিশের লাঠিতে আহত হইল

কলিকাতা ও মফঃস্বলে ধনী বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া লুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থায় ভারতের রাজধানী দিল্লীতে চলিয়া গেল ও বাংলার অবস্থা আরও খারাপ হইল। স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিতে লাগিল ও প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে শত শত কোটি টাকা ব্যয় হইল ও তাহার কিছু অংশ অবাঙ্গালী ঠিকাদারগণ লাভ করিয়া সেই অর্থে সকল সহরে সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিল।

যুদ্ধাবসানে দেশে অসহযোগ আন্দোলন অহিংসভাবে চলিতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী কিন্তু যুদ্ধ করিয়া বিপ্লব সাধন চেষ্টা ছাড়িল না। চট্টগ্রাম দখল করিয়া অল্প সময়ের জন্য ব্রিটিশকে সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া বাঙ্গালী বিপ্লবীরা ইতিহাস সৃষ্টি করিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি ভারত স্বাধীনতার প্রধান কারণ বলিয়া সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইল। ভারত স্বাধীন হইল দ্বিখণ্ডিত হইয়া। ইহার ফলে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অবস্থা শোচনীয় হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলার যে সকল জেলা অপর প্রদেশে সংযুক্ত করিয়াছিল তাহা বাংলা ফিরিয়া পাইল না এবং পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানে পরিণত হইল। বাংলার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের যে বাঙ্গালীকে দাবাইয়া রাখা ও সকলভাবে ছোট করার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গ বলিয়া চালিত ছিল স্বাধীনতা লাভের পরে তাহার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এমন কি উক্ত নীতির ক্রমবিকাশের পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে বাংলার প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠার উপর ভিতর হইতে আক্রমণ ক্রমাগতই চলিয়া আসিতেছে। যাহাতে বাংলা দেশ ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর করায়ত্ত হয়া বাঙ্গালী শুধু অপরের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার চেষ্টা বাংলা দেশের দ্বারা পালিত ও পুষ্ট অবাঙ্গালীদের অনেকেরই মধ্যে সদা-জাগ্রত। এই কারণে এবং নিজেদের দুর্নীতিপ্রবণ ব্যবসা বাণিজ্য পদ্ধতি গোপন রাখিবার জন্য ও সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা শক্তি আহরণ ইচ্ছায় বহু বাঙ্গালীকে এই সকল লোক চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। অবাঙ্গালীর কারবারে বাঙ্গালী কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না বলিলেই চলে।

এই জাতি দেখিয়া চাকুরি দেওয়া ভারতের কনস্টিটিউশন-বিরুদ্ধ; কিন্তু সে কথা তুলিয়া কোন লাভ নাই। উপস্থিত আলোচনার বিষয় হইল বাংলার কারখানাগুলিতে কেন্দ্রীয় পুলিশ বসানর কথা। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীপ্রফুল্ল সেনের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কয়েকজন কারখানার মালিকের অনুরোধে বাংলার কারখানাগুলিতে কেন্দ্রীয় পুলিশ মোতায়েন করিবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই কথা সত্য হইলে বাংলার পক্ষে ইহা চরম অপমান ও বেআইনী-ভাবে বাংলার প্রাদেশিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ব্যবস্থা। কোন্ কোন্ কারখানার মালিক বলিয়াছেন যে বাংলার পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন তাহা আমাদিগের জানা প্রয়োজন এবং সেই সকল ব্যক্তি যাহাতে বাংলা দেশ হইতে বহিষ্কৃত হন তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় যখন জামসেদপুর ও রাওরখেলাতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রবলতম ছিল, তখন বাংলায় কোথাও ঐ জাতীয় দাঙ্গা হয় নাই। কলিকাতায় কিছু মুসলমান পাকিস্তানী দালালদিগের প্ররোচনায় গোলমাল করিয়াছিল কিন্তু তাহা সহজেই থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাংলার পুলিশ খুবই উত্তমরূপে শান্তিরক্ষার কার্য্য চালাইতে সক্ষম এবং কারখানাগুলির কোন অসুবিধা পুলিশের অক্ষমতার জন্য হয় না। দিল্লীতে কাহারও জীবন নিরাপদ নহে। সেখানে পুলিশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগেরও প্রাণ বাঁচাইতে অক্ষম। সান্যাল ও কাইরণের হত্যা এখনও সকলের স্মরণ-পটে প্রকট ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। আরও কত হত্যাকাণ্ড কেন্দ্রীয় পুলিশের এলাকায় ঘটিয়াছে তাহার হিসাব কে করিবে? উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ চুরি-ডাকাইতির জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে কেন্দ্রীয় পুলিশ পাঠাইয়া শান্তিরক্ষা করা হয় না কেন? বাংলা দেশে অবশ্য কিছু সংখ্যায় ব্যবসা-দারদিগের ধরপাকড় হইয়াছে, কালোবাজারের কারবারের জন্য। যে সকল ব্যক্তি দুর্নীতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের বাংলা দেশে পূর্ব্বের ন্যায় আর অবাধে আইন ভঙ্গ করিয়া উপার্জ্জন চলে না। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যাহারা মাল চুরি, ওয়াগন লুণ্ঠন ইত্যাদি করিয়া থাকে, বাঙ্গালী পুলিশের সহিত তাহাদিগের বিলি-ব্যবস্থা ততটা সহজে হয় না। সকল দিক দিয়া দেখিলে বাংলার পুলিশ তথা বাংলার শাসনকার্য্য অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অতি উৎকৃষ্ট।

সুতরাং কেন্দ্রীয় কাহারও এদেশে আসিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। পোর্ট, রেলওয়ে ও সীমান্ত কেন্দ্রীয় পুলিশের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যৌবনে বিপ্লববাদী ছিলেন। পরে তিনি অহিংস অসহযোগের পথে চলিয়া যান। তাঁহার নেতৃত্ব-কালে যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই ভাবে বাংলার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালীর অপমানের চূড়ান্ত করিয়া দিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহার নাম বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে না নিশ্চয়ই। বাঙ্গালী জাতি তাঁহার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া থাকিবে যদি তিনি এই অসম্মান হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেন। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কারখানায় কি ঘটিয়াছে যাহার জন্য এইরূপ একটা অসম্মানকর ব্যবস্থা এদেশের উপর জোর করিয়া করা হইতেছে? বাংলা দেশের লোক এ কথার উত্তর পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে শুনিতে চাহেন। যদি কোন কারখানার মালিকের এই দেশের ব্যবস্থা পছন্দ না হয়, তাহার জন্য অপর দেশে যাইবার রাস্তা

উন্মুক্ত আছে। বাংলায় যদি শ্রমজীবীদিগের আন্দোলন কোথাও কোথাও আপত্তিকর রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার মূলে কি বাংলার পুলিশ আছে? কেন্দ্রীয় পুলিশ আসিয়া কি শ্রমিক আন্দোলন থামাইয়া দিবে? বিষয়টা কিছু জটিল। ইহার ভিতরের কথা কি, সাধারণের জানা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় শাসকদিগের কর্ত্তব্য দেশরক্ষা ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ সুনীতি, ন্যায় ও আইনসঙ্গত রাখা। ইহা ব্যতীত দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতি, কেন্দ্রীয় রাজস্ব আদায় ও মুদ্রার মূল্য, পরিমাণ ইত্যাদির সুরক্ষণও কেন্দ্রীয় শাসকদিগের কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি যে, দেশরক্ষার কার্য্য কেন্দ্রীয় শাসকগণ কিরূপ ভাবে চালাইতেছেন। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। দেশবাসীর খাদ্য অপর দেশ হইতে ভিক্ষা অথবা অন্য উপায়ে অনেকাংশে সংগৃহীত হইতেছে। রেলওয়ে, পোষ্ট-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সুসংযত নহে। জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত প্রায় সকল ব্যবসায়ই বিরাট লোকসানে চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসকদিগের লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দেশবাসীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি ঔদ্ধত্যের পথের পথিক হইয়া অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে যান তাহা হইলে সে বাতুলতার চিকিৎসা কি ভাবে করা যাইতে পারে?

সমরশক্তি হ্রাস করিয়া নতন কিছু কর

কচ্ছে পাকিস্তান ভারতের সীমানা সামরিক অভিযান করিয়া লঙ্ঘন করিলে পর যে সর্ত্তে গুলী চালান বন্ধ করা হইয়াছে তাহার মূল কথা হইল সালিশী মানিয়া বিচার করান যে, কচ্ছে পাকিস্তানের কোনও স্থলে কোনও অধিকার আছে কি না। যদিও কথাটা সীমান্ত নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেই কিন্তু সর্ত্ত পাঠ করিলে মনে হইতে পারে যে, সমগ্র কচ্ছ দেশই আলোচ্য বিবাদের বিষয়। সে যাহা হউক গুলী-গোলা চালান কচ্ছে সালিশী মানিয়া থামান হইয়াছে ও ন্যায্য অধিকার কাহার কোথায় সে কথা সালিশগণ ঠিক করিবেন। এই সালিশীর বিষয় শুধু কচ্ছ দেশের, কিন্তু পাকিস্তান রেডিও স্টেশন হইতে প্রচার আরম্ভ করিয়াছে যে, কাশ্মীর ও অপরাপর বিবাদ-বিরোধের কেন্দ্রস্থলগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ সালিশী মানিয়া মীমাংসা করা হইবে। ভারত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, কচ্ছের সীমানা ব্যতীত অপর কোনও কথা এই সূত্রে উত্থাপন করা চলিবে না। কিন্তু পাকিস্তান প্রায় সর্ব্বত্রই গুলী-গোলা চালাইয়া বিবাদ আছে প্রমাণ করিতে ব্যস্ত এবং একটু অধিক মাত্রায় গুলী-গোলা চালাইলেই ইঙ্গ-আমেরিকা আসিয়া পড়িয়া মধ্যস্থতা করিবার ভার লইতে ব্যগ্রতা দেখাইতে আরম্ভ করেন। পাকিস্থান ইঙ্গ-আমেরিকার পোষ্য এবং তাঁহাদিগের অভিসন্ধি ও মন্ত্রণা অনুসারে চলিয়া থাকে। ইঙ্গ-আমেরিকা ইচ্ছা করিলেই পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে এবং তৎপরে পুনরায় আর একটা সালিশীর ব্যবস্থা করিয়া, কাশ্মীরকে ভারত হইতে বিচ্যুত করিয়া পাকিস্তানে যুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইতে বিলম্ব না হওয়াই সম্ভব। অপরাপর স্থলেও পাকিস্তান ঐভাবে আরও দেশ-দখল করিয়া রাজত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে নিশ্চয়ই। এমত অবস্থায় ভারতের পক্ষে নিজ দেশরক্ষা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এবং ইহার একমাত্র প্রতিকার উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি। কিন্তু কচ্ছের এই অপরূপ সালিশীর ব্যবস্থা হইবামাত্র আমাদের দেশের প্রধানতম ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণ এক জায়গায় উচ্ছসিত ভাবে বলিয়া ফেলিলেন যে, অতঃপর আমরা সামরিক খরচা কমাইয়া দেশোন্নতি প্রচেষ্টায় আরও খরচ করিতে পারিব। দার্শনিকের উপযুক্ত কথা। কিন্তু দেশ থাকিলে তবে না তাহার উন্নতি করার কথা উঠিবে?

ইহা ছাড়া ভারতের ঐশ্বর্য্য যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ভারত পাকিস্তান ও চীনের পক্ষে উত্তরোত্তর অধিক লোভনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় কচ্ছে সালিশী মানিয়া ও কারগিলে ইউ এন. মানিয়া হাতিয়ার ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়া কংগ্রেসী ধর্ম্মসাপেক্ষ হইলেও সুবুদ্ধির দৃষ্টিতে মূর্খতার চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পড়িবে। অনেকে বলেন যে, আমাদের পয়সা নাই ত সামরিক শক্তি বাড়াইব কি করিয়া? যদি পয়সা নাই তাহা হইলে ডাইনে বাঁয়ে অমুক পরিকল্পনা অমুক পরিকল্পনা বলিয়া পয়সা অপব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? অভদ্র ভাষায় বলে গরীবের ঘোড়া রোগ বড়ই মারাত্মক। আমাদের দেশ বড়ই গরীব। আমাদের অত শত শত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার কি প্রয়োজন? সহস্র সহস্র ঠাণ্ডাঘর, বরফ-কলের বাক্স, বহির্দেশে বিচরণ, এই প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্ট করিয়া লক্ষ লক্ষ অনুৎপাদক "কর্ম্মী" নিযুক্ত করিয়া পয়সা নষ্ট করিবারই বা কি প্রয়োজন? আমরা কংগ্রেসী নেতাদিগের তুলনায় অন্তত সমান বুদ্ধির লোকেদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দেশরক্ষণাবেক্ষণ,শাসনকার্য্য প্রভৃতি ঠিকভাবে চালাইয়া চলিলে, আমরা পাঁচ ছয়টি পঞ্চমবর্ষ পরিকল্পনা না করিয়াও, ততটাই সমৃদ্ধি লাভ করিতাম যাহা ঋণ-কর্জ্জে ডুবিয়া হইবে কি হইবে না স্থির নিশ্চয় বোঝা যাইতেছে না এখনও। অর্থাৎ মহা অপব্যয় ও [illegible] ঋণ করিয়া আমাদের বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। জাতির সকল ব্যক্তির অবস্থা খারাপ হইলেও সমাজ লাভবান হইতেছে বলা যায় কি? অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অথচ সমাজ মঙ্গলের ভাবে ভাবাক্রান্ত, এরূপ কষ্ট-কল্পনার "সোসিয়ালিজম" বা সমাজবাদের কোন মূল্য নাই। জেরেমি বেনথাম বলিয়াছিলেন সমাজবাদের মূলমন্ত্র সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্ব্বাধিক মঙ্গল।

যদি দেখা যায় সর্ব্বাধিক ব্যক্তির সর্ব্বাধিক অমঙ্গল হইতেছে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে সমাজবাদের আদর্শ হত ও বিনষ্ট বলিয়া ধরিতে হইবে। সে অবস্থায় বড় বড় কথার আড়ালে যে সর্ব্বনাশের আগুন ক্রমশঃ বাড়বানলে পরিণত হইতেছে দেখা যাইবে, সে আগুনের সময় থাকিতে নিবৃত্তি প্রয়োজন। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্য ও দেশরক্ষা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ধরা প্রয়োজন। দেশরক্ষার জন্য অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা অত্যধিক সংখ্যায় সৈন্য অধিক প্রয়োজন। সামরিক ব্যয় না কমাইয়া অপর সকল ব্যয় কমান প্রয়োজন। অর্থাৎ যে সকল পরিকল্পনার সহিত খাদ্য ও দেশরক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সে সকল বিষয় অপেক্ষাকৃতভাবে পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমদানী খাদ্যের উপর ভারতের প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করিতেছে। কোন কারণে ঐ খাদ্য আমদানী বন্ধ হইয়া যাইলে ২ কোটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটিবে। এই অবস্থায় খাদ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা প্রয়োজন। ভারতের প্রধান শত্রু চীন-দেশ সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া জগৎ জয় করিবার কল্পনা করে। অস্ত্রের গুণাগুণের উপর চীনের ততটা বিশ্বাস নাই। ভারতের জনসংখ্যা যথেষ্ট এবং সাধারণ অস্ত্র যথেষ্ট প্রস্তুত করিয়া লইবার ক্ষমতা ভারতের আছে। ভারতের সাধারণ অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য-সংখ্যা দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিয়া লওয়া উচিত। ইহাতে দেশের সীমানা সর্ব্বত্র রক্ষা করা সহজে হয়। পাকিস্তান ও চীনের যুদ্ধপদ্ধতি সংখ্যাও দ্রুতগতির উপরে গঠিত। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ভারতের সৈন্যসংখ্যা ২০।২৫ লক্ষ হওয়া প্রয়োজন। আমদানী রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, মালমশলাবর্জ্জিত বন্দোবস্ত ভারতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কারণ যুদ্ধের ব্যবস্থায় অপর দেশের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। সমরশক্তি হ্রাস করা দেশের উন্নতির নূতন পথ নহে; পতনের বহু পুরাতন পন্থা।

বাংলার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি

বাংলার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির কথা সকল বাঙ্গালীর অন্তরে সদাজাগ্রত থাকে। আমাদের মাতৃভূমির উপর দিয়া যে সকল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তখন বাংলাকে ভাগ করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাংলার সর্ব্বনাশ করিবার প্রথম চেষ্টা করে। তাহার ফলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইল তাহাতে বহু লোকের প্রাণ গিয়াছিল, আরও অনেকের সম্পদ, ব্যবসা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, পাঠাধ্যয়ন প্রভৃতি নষ্ট হইয়া তাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বিপ্লববাদের ঐ সময় আরম্ভ এবং ব্রিটিশ বাঙ্গালীকে দমন করিবার জন্য ঐ সময় হইতেই একান্তভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যখন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রহিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ পুনরায় একসঙ্গে মিলিত হইয়া একবঙ্গ হইল তখন ব্রিটিশ বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমদিকে মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, প্রভৃতি অনেকাংশ কর্ত্তন করিয়া অপর প্রদেশে জুড়িয়া দিয়া, বাংলার খনিজ সম্পদ পরহস্তগত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। বাংলার সাধারণ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উত্তরোত্তর আরও বহু সংখ্যায় যোগদান করিয়া চলিল এবং হিংস ও অহিংস উভয় প্রকার সংগ্রামেই বাঙ্গালীর অবদান বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশের অর্থবল ও সমরশক্তি লুপ্তপ্রায় হইবার ফলে এবং সুভাষচন্দ্রের জাতীয় সেনাদলে ভারতের সকল জাতির সৈন্য যোগদান করিয়া, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ব্রিটিশের সাম্রাজ্যরক্ষা কার্য্যে অনাস্থার সৃষ্টি করাইয়া দিল, তখন ভারতকে স্বাধীনতা দানের কথা ব্রিটিশ কর্ত্তব্য বলিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয়েও ব্রিটিশ ভারতকে শক্তিহীন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি করিল এবং যে সকল জাতি পূর্ব্বে ব্রিটিশের দাসত্ব করিতে অধিক আগ্রহ দেখাইত, সেই সকল জাতির শক্তি বর্দ্ধন করিবার চেষ্টাও নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া করিবার ব্যবস্থা করিল। বাংলা ও বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রমঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িল ও আন্তর্জাতিক আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার অন্তরালে ভারতের অনিষ্ট সাধনে যত্নবান হইল। পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকা এই গুপ্ত আক্রমণের কার্য্যে ব্রিটিশ ও পরস্পরকে সাহায্য করিতে লাগিল।

বর্ত্তমানে বাংলা তথা ভারতের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিয়াছে। ভারতের কারখানাবাদ একটা মহা জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়া ভারতকে ঋণগ্রস্ত করিয়া ক্রমশঃ আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করিতেছে। খাদ্য আমদানী করার ফলে এক মহা দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা অদূরে ছায়াপাত করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে। শত্রুর আক্রমণ সততসম্ভব হইয়া বাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাট, আসাম, সিকিম, ভূটান ও নেপালের সাধারণের নিরাপত্তা ক্রমশঃ হৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার ব্রিটিশের নিকট একপ্রকার দানলব্ধ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যা আড়ম্বরের অভিনয়ে নিমগ্ন এবং কংগ্রেসের নেতাগণ শক্তি, বিদ্যা ও অর্থবল বৃদ্ধির কথা ভুলিয়া, নিজ নিজ অহমিকায় নিমগ্ন থাকিয়া দেশের দৈন্য ও দুর্দ্দশা দূর করিতে অক্ষম হইতে অক্ষমতর হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এরূপ অবস্থায় জনশিক্ষা ও জনশক্তি দ্রুত বাড়াইবার উপায় কি? দেশের লোকের নিজ চেষ্টায় যদি কিছু হয় তাহা হইলে এই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা জাতীয় ভাবে হওয়া প্রয়োজন—এবং অবিলম্বে। সেই সকল আলোচনায় কংগ্রেসী নেতাদিগেরও যোগদান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাঁহারা পরে ইতিহাসের বিচারে হেয় প্রমাণিত

না হন। বাংলা দেশের প্রধান প্রয়োজন শক্তি ও উপার্জ্জন-ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা। শক্তির সহিত শুধু যে দেশ-রক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, শক্তিলাভে উপার্জ্জন ক্ষমতা বাড়ে এবং ঔষধ ক্রয় বা ডাক্তারের দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয় না।

শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় এক সময় এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাংলার অন্তত বড় বড় সহরগুলিতে সকল অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে শরীর সাধন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর' অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি কলিকাতায় অনেকগুলি শরীর সাধন আখড়া স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সম্ভবত কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের অক্ষমতাহেতু এই চেষ্টা বাস্তব রূপ ধারণ করে নাই। বাংলায় শত শত আখড়া আছে। সেই গুলিকেই যদি নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করা হয় তাহা হইলে শক্তি আহরণকার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে শরীর সাধন না করিলে, তাহার অনুমতি পাওয়া যাইবে না নিয়ম করিলে সকল তরুণ তরুণী বাধ্যতামূলকভাবে শক্তি সাধনাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহার সহিত শিক্ষালাভও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করিয়া দিলে জাতীয় উন্নতির পথ সরলতর হইবে। কতকগুলি কারখানা খুলিয়া তাহাতে অপর প্রদেশের শ্রমিক নিযুক্ত করিলে বাংলার উন্নতি হইবে কি করিয়া?

বাংলা দেশে কারখানা ও বর্ডার-পুলিশ

বাংলার সীমানা সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ মোতায়েন করা উচিত হইবে না। ইহার কারণ সীমানা হইলেও উহা বাংলা দেশ ও সেই স্থলের সাধারণ লোক বাঙ্গালী। পাকিস্তানের লোক অজানিতভাবে বাংলা দেশে ঢুকিয়া পড়িলে কেন্দ্রীয় পুলিশ অপেক্ষা বাংলার পুলিশের পক্ষেই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলা সহজ। স্থানীয় লোকের সহিত সংযোগ রক্ষাও সহজ এবং সীমানার এলাকা ছাড়িয়া ভিতরে চলিয়া আসিলে, সেই সকল পাকিস্তানীদিগের অনুসরণ-কার্য্যও বাংলার পুলিশই করিবে। সুতরাং শুধু সীমানা এলাকায় কিছু অধিক অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত কেন্দ্রীয় পুলিশ রাখার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বাংলার লোক সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইলে সেই কার্য্য করিতে পারিবে না ইহা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের ভুল ধারণা। বরং তাহারাই কাজটি আরও উত্তমরূপে করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

কারখানাতে কেন্দ্রীয় পুলিশ বসানও ঐ একই কারণে উচিত হইবে না। পুলিশ যাহার অধীনেই থাকুক না কেন তাহার কার্য্য আইন অনুযায়ী হইতে হইলে, সর্ব্বদাই আদালতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া পুলিশকে চলিতে হইবে। খবরাখবর প্রয়োজন হইলেও সেই অঞ্চলের লোকের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেখানে কেন্দ্রীয় পুলিশ কার্য্য চালাইতে পারিবে না ঠিক ভাবে। কার্য্য করিলে সুসংযতভাবে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। লণ্ডন হইতে পুলিশ আসিয়া দিল্লীরক্ষা করা অবিবেচনার কথা। অতএব সময় থাকিতে এই সকল কষ্টকল্পিত ব্যবস্থা রদ করা প্রয়োজন। উপযুক্ত লোক বাংলায় অসংখ্য রহিয়াছে সকল প্রকার কার্য্যের জন্যই। বাহির হইতে লোক আনা নিষ্প্রয়োজন ও অবাঞ্ছনীয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালী

বাঙ্গালীরা কোনকালে যুদ্ধ কবিতে পারিত না এবং পারিবে না, এইরূপ একটি মিথ্যার প্রচার ইংরেজ আমলে চালিত ছিল। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা কোনও কাজই করিতে পারে না, কারণ তাহাদিগকে কোন কাজেই সহজে লাগান হয় না। এই ব্যবস্থার প্রচলন অবাঙ্গালী ব্যবসাদার ও রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়াছে। এবং ইহা বিশেষ করিয়া ভারতীয় মানবের জাতীয়তার মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার জন্যই করা হইয়াছে। বাংলার লোকের সকল কার্য্যেই নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সকল কার্য্যই বাঙ্গালী করিতে পারে। এই সুজলা সুফলা দেশ বাঙ্গালীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভিক্ষা করিয়া বা দান হিসাবে প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বকালের রীতি অনুসারে শক্তি ও বীরত্বের দ্বারাই দেশ তাঁহাদিগের অধীনে আসিয়াছিল। পরে অলসতা ও বিলাসিতা হেতু তাঁহারা দেশরক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে পারিত ও এখনও ডোম, বাগ্দী, বাউরী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি যোদ্ধাদিগেরই বংশধর। তাহাদিগকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলে এবং ঠিকভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে দিলে তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় মহাযোদ্ধাতে পরিণত হইতে পারিবে।

এই কার্য্য কে করিবে তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারি না। ভারত সরকার করিবেন না বলিয়াই মনে হয়; কারণ তাঁহারা যোদ্ধাজাতি বলিয়া যাহাদিগকে মানেন তাহারা ব্রিটিশ-অনুমোদিত যোদ্ধা জাতিগুলি মাত্র। ব্রিটিশের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য অবশ্যই তাহাদিগের নিজ সুবিধা অনুযায়ী হইত। অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারে যে সকল সৈন্য অধিক উপযুক্ত ছিল তাহারাই ভারত সাম্রাজ্যের সেনাদলে নিযুক্ত হইত। যে সকল সীমান্তে অথবা সামরিক হিসাবে ঘটনাবহুল এলাকাতে, ব্রিটিশরাজ প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়োজন হইত, সেই সকল স্থান সংরক্ষণ কার্য্য যাহারা সহজে করিতে পারিত তাহারাই যোদ্ধাজাতি ছিল। এই কারণে বাংলা দেশে ব্রিটিশের যোদ্ধা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইত না। জাহাজে করিয়া নিজ দেশের সৈন্যও বাংলা দেশে সহজেই আনা যাইত। কিন্তু এখন বাংলা দেশ সীমান্ত অঞ্চলে পরিণত এবং সেইজন্য

পারিবে বলিয়া মনে হয়। ইহার ব্যবস্থা শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় করিতে চেষ্টা করিবেন কি ?

"নেতাজী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হইতেন"

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ (যোগাযোগ সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রসভা বিষয়ের মন্ত্রী) বিদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন ও নানা দেশ পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বগুণে অলঙ্কৃত লোকের দেশভ্রমণে ভারতের যশ বৃদ্ধি হয়। দুর্ভাগ্যের কথা যে, সকল মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের অনুচরগণ সুকৃষ্টি ও সুরুচির প্রতীক নহেন। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের সহিত এক ফরাসী মন্ত্রীর ভোজের আসরে কথাবার্তা হইতেছিল। ফরাসী মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন যে নেতাজী সুভাষ নাৎসীদিগের সাহচর্য্য করা সত্বেও তাঁহার চিত্র একটা ডাক টিকিটে কেন বসান হইল। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ উত্তরে বলিলেন যে, নেতাজী সুভাষকে ভারতের এক শ্রেষ্ঠতম দেশভক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন দেশকে স্বাধীন করিবার জন্যই করিয়াছিলেন। যদি চার্চিল কম্যুনিষ্টদিগের সহায়তাতে নাৎসী ও জাপানীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য নেতাজী যদি নাৎসী ও জাপানীদিগের সাহায্য লইয়া থাকেন তাহাতেই বা দোষের কি আছে ? তিনি আরও বলেন যে, নেতাজী জীবিত থাকিলে তিনিই প্রথমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতেন। ভারত সরকার কিন্তু কংগ্রেসী আওতায় দিল্লীতে উপযুক্ত স্থানে নেতাজীর মূর্ত্তি স্থাপন এখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কলিকাতার পথে জলপ্লাবন

বৃষ্টিপাত যদি কিছুমাত্র সজোরে ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় তাহা হইলে কলিকাতার বহু রাজপথ এবং অলিগলি ঘোর জলপ্লাবনে আক্রান্ত হইয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও অনেক স্থলে দিনের পর দিন রাস্তা চলা অসম্ভব হইয়া যায় —এমন কি লোকের গৃহেও জল ঢুকিয়া মালপত্র নষ্ট করিয়া দেয়। গরীবের বস্তিতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার "সহর পিতা"-দিগের যতটা চেষ্টা করিয়া অবস্থার উন্নতি করা উচিত তাহা তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন না বহু বর্ষ ধরিয়াই। কেন পারেন না তাহা বোঝা যায় না। কি কি চেষ্টা কবে কবে করা হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার জানা যায় না। অবস্থা ক্রমশঃ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং ইহার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। ভোটে জিতিয়া যাঁহারা সহর সামলাইতে অক্ষম প্রমাণিত হন, তাঁহাদিগের বহিষ্করণ ব্যবস্থা করা হয় না কেন ? অক্ষমতা ও মিথ্যার রাজত্ব আর কতদিন চলিবে ?

সন্দেশ

সন্দেশের ছানা আসে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী এমন সকল গ্রাম হইতে যেখান হইতে বাহিরে দুগ্ধ বিক্রয় করা চলে না। যথা, ২ সের ৫ সের দুগ্ধ বহন করিয়া ১৫।২০ মাইল দূরে বিক্রয় করার মজুরি পোষায় না। কিন্তু গ্রামের অনেক লোকের দুগ্ধের ছানা কাটিয়া তাহা একজন লোকই কয়েক মাইল দূরে রেল ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে পারে ও এই ভাবে গ্রামের লোকেরা সহজে দুগ্ধের ছানা বিক্রয় করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। এই সকল দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা অর্থনীতিসাপেক্ষ হইলে সেইরূপ ভাবে দুগ্ধ বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহা হয় না এবং হইতে পারে না. গ্রাম ও সহরের সংযোগের জন্য রাস্তা করা হয় নাই বলিয়া। সুতরাং ছানা কাটিয়া বিক্রয়ই ঐ দুগ্ধের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। এ অবস্থায় যাঁহারা সন্দেশ উঠাইয়া দিয়া শিশুদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করিবার কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা বিষয়টি না বুঝিয়া নির্দ্দেশ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সন্দেশ খাদ্য হিসাবে মূল্যবান। একটা সন্দেশে যা খাদ্যমূল্য আছে তাহা সমান ওজনের অপর প্রকার খাদ্য অপেক্ষা অনেক অধিক। শিশুদের জন্য দুগ্ধ শুধু সন্দেশ বন্ধ করিলে হইবে না; গাভীর সংখ্যা বাড়াইলে হইবে, পথঘাট নির্ম্মাণ করিয়া গ্রাম ও সহরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিলে হইবে এবং শিশুদিগের অভিভাবকদিগের রোজগারের পথ না খুলিয়া দিলে হইবে না।

পরলোকে জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক 'ভাস্কর' গত ১৯শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি 'ভাস্কর' নামে সুপরিচিত হইলেও শিক্ষা-জগতেও তাঁহার নাম কম ছিল না। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৮৯৬ সনে যশোহর জেলার ঘাষিয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এবং এম. এ. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হন। তিনি এডিনবরা হইতে পি. এইচ. ডি ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সভ্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন উপদেষ্টা ছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য— যেমন, গণিতের ভিত্তি, বাংলায় একটি রত্ন, লেখা, মজলিস, কথিকা, ভজহরি, এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড বুক, ম্যাট্রিকুলেশন এ্যালজেবরা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(বাল্যকাল)

৺ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী জালালপুর ও টাকী হইতে দাসাশ্রম উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতায় তাহার প্রতিষ্ঠা করেন ২৮শে জুন ১৮৯১ সালে। পথ হইতে দুঃস্থ রোগীদের কুড়াইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান করা এবং নিজ হস্তে তাহাদিগের সেবা করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এই ছিল তাঁহাদিগের কাজ। ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত এইরূপ প্রতিষ্ঠান তখন ভারতবর্ষে আর একটিও ছিল না। ইঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ বা প্রচার করিতেন না। স-স্ত্রীক এই দুঃস্থদিগের আপন হাতে নিজেদের ভাই বোন পুত্র কন্যার মত সেবা করিতেন এবং দাস ও দাসী নামে অভিহিত হইতেন।

ইহার অল্পদিন পরেই ২৮।১ ঝামাপুকুর লেনে, বিখ্যাত উকীল রাম মিত্রের ভাই কানাই মিত্রের বাড়ীতে ১৮৯১ সালের ১২ই ডিসেম্বর কেদারনাথের জন্ম হয়। শুনিয়াছি, যে বুবা (কেদারনাথের ডাক নাম) এত সুন্দর হইয়াছিল, যে পাড়াশুদ্ধ সকলে তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত।

ইহার অল্পকাল আগে বা পরে মেসোমশাই (শিশুকাল হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পত্নীকে মেসোমশায় মাসিমা বলিয়াই জানিতাম। আমার নিজের মেসো-মাসির নিকট হইতে জীবনে আমি এত সেবা যত্ন ভালবাসা পাই নাই) দাসাশ্রমে যোগ দেন, এবং অবিলম্বে ইহার কর্ণধার হইয়া "দাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার কিছুকাল পরেই আমার পিতা ইন্দুভূষণ রায় ও মা সরোজবাসিনী আসিয়া দাসাশ্রমে যোগদান করেন। এখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে তখনকার দিনে এই সকল উচ্চবংশের গৃহস্থ বধূগণের পক্ষে এটি কি পরিমাণ দুঃসাহসের কর্ম ছিল। বিশেষত মাসীমা তখন বালিকা মাত্র। ঐ কচি শিশু লইয়া এই বিপদসঙ্কুল রোগচর্যার কর্মে বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা আপত্তিতে লাগিয়া যাওয়া অতুলনীয় বীরত্বের এবং হৃদয়ালুতার কর্ম বলিয়া আমি মনে করি।

এই নিঃস্বার্থ আবহাওয়ায় বুবার জন্ম ও শিশু কাল অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তাহার চরিত্রে ও জীবনে ইহার প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল।

১৮৯২ সালে, দাসাশ্রম যখন সারকুলার রোডে, রামমোহন রায়ের বাটীর পাশের (ঐ বাটীতে পুলিশ ষ্টেশন ছিল) বাড়ীতে ছিল তখন আমার খুব মরণাপন্ন পীড়া হয়। মাসীমা প্রধানত আমার সেবা করিতেন, মা গৃহকর্ম করিতেন ও মাঝে মাঝে মাসিমাকে সাহায্য করিতে আসিতেন এবং আমার দিদি, সোহিনী, তখন ১০।১১ বছরের মেয়ে, বুবাকে রাখিতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য আমার চিকিৎসা করিতেন—দাসাশ্রমের রোগীদেরও দেখিতেন। একটা শব্দ, বেঙ্গর্স ফুড, ও একটা দৃশ্য ছবির মতন, কেমন করিয়া জানি না, স্পষ্ট আমার মনে রহিয়া গেছে। মেসোমশায় ডাক্তারের পরামর্শে এক টিন বেঙ্গর্স ফুড আনিয়া দিয়াছিলেন; ডাক্তার নীলরতন আমার বিছানার ধারে জানলার কাছে বসিয়া একটা মনে হয়, স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া, মাসিমাকে বেঙ্গার্স ফুড তৈরী করা শিখাইতেছেন—এই একটা ছবি আমার চোখের উপর ভাসিতেছে।

১৮৯৪ সালে আমরা সকলে—অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, স-পরিবারে দেওঘরে গিয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন, একজন যুবক খবরদারী করিবার মানুষ হিসাবে। তখন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জীবিত এবং সর্বদাই ডুলি করিয়া

আমাদের দেখিতে আসিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার পুত্র পালোয়ান মণিবাবু আমাদের সকলকে একদিন দীঘলিয়া পাহাড়ে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বাঘ শিকারের গল্প করিয়াছিলেন। বুবা (কেদারনাথে)র তখন পূরা তিন বছর বয়সও হয় নাই। কিন্তু দেওঘর হইতে ফিরিয়া গিয়া আমরা যখন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থাকি তখন বুবাকে সর্বদাই দেখা যাইত যে সে একলা দোতলায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীর দিকের বারান্দার এপার হইতে ওপারে দ্রুত পায়চারী করিতেছে ও বীরদর্পে বলিতেছে "তড়াক তড়াক তড়াক ক'রে দীঘ্‌লিয়ার পাহাড়ে উঠলুম। গুম ফটাশ ক'রে বন্দুক ছুড়লুম, ধড়াস করে বাঘটা পড়ে গেল ইত্যাদি। অনর্গল এইরূপে বাঘ মারার অভিনয় করিতে করিতে সে খাঁচার বাঘের মতই বারান্দার এপার ওপার ঘুরিতে থাকিত: আর সকলে এই দৃশ্যটি কৌতুকপরায়ণ হইয়া দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বড় হইয়াও একা একা বারান্দায় পায়চারী করা তাহার বহুদিন পর্যন্ত অভ্যাস ছিল—ব্রাহ্মসমাজ পাড়ার তেতলার বারান্দায়ও (তখন তাহার বয়স ১৭।১৮) তাহাকে এইরূপ পায়চারী করিতে দেখা যাইত। তবে নীরবে। এই সময়ে সে নানা বিষয় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

তাহার পর কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদে চলিয়া যান। বছর দুই তাহাকে দেখি নাই। এলাহাবাদে, সাউথ রোডের বাড়ীতে আমার মায়ের তত্ত্বাবধানে অশোকের জন্ম হয়। তখন আবার মায়ের সঙ্গে এলাহাবাদে গেলাম। বুবা তখন বছর ৫ বয়সের হইবে। একদিন মনে পড়ে বুবাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শেষে দেখা গেলো যে সে একখান ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরা লইয়া খাটের তলায় উপুড় হইয়া পড়িতেছে। পড়িতে শিখিয়া অবধি সে ঐরূপ যাহা পাইত তাহাই টানিয়া লইয়া একটা নিরিবিলি স্থান বাছিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে পড়িত। এই পড়ার নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

এখানে তাহার পাঠ প্রবৃত্তির কথাটাই আগে বলিয়া লই। সে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত পড়িতে পরিত। এবং তাহার দ্রুত অর্থগ্রহণ ও স্মৃতিশক্তির জন্য, যাহা একবার পড়িত তাহা মোটামুটি বেশ মনে রাখিত। মনে আছে, বিলাতের Review of Reviews পত্রিকা হইতে Books for the Bairns বলিয়া বালপাঠ্য একশতখানি বইয়ের একটা পার্সেল খুব মোটা কার্ড বোর্ডের বাক্সে ভর্তি করিয়া সাউথ রোডের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ রকম সব বালপাঠ্য ভাল বইয়ের খবর পাইলেই তাহার পিতা তাহা ছেলেপিলেদের জন্য আনাইয়া দিতেন। সেই একশতখানি বই, যতদূর স্মরণ হয়, সে একমাসের মধ্যে শেষ করিয়াছিল। আমি সেই সময়ের মধ্যে মাত্র ১০ খানি পড়িতে পারিয়াছিলাম। অথচ সেই সময় আমি বুবার চেয়ে দু ক্লাস উপরেই পড়িতাম। তখন তাহার ৯।১০ বছর বয়স হইবে।

ইহা ছাড়াও তাহার বাবার লাইব্রেরীতে, এনসাইক্লোপিডিয়া, ওয়েবটারের ডিকশনারী ৬ ভলিউম রয়াল ন্যাচারাল হিষ্ট্রী, ঈজিপ্টের ইতিহাস, এ্যাবটের নেপোলিয়নের জীবনী, যাহা কিছু তাহার হাতে ঠেকিত তাহাই সে পড়িত।

কিছুদিন সে স্কুল (Anglo Bengali School) ছাড়িয়া ঘরেই পড়িত। তাহার বয়স তখন ১২ বছরের বেশী নয়। মেসোমশায় রোজ কলেজের লাইব্রেরী হইতে তাহাকে একখানি করিয়া পুস্তক নির্বাচন করিয়া আনিয়া দিতেন এবং বুবা একদিনেই বইখানি শেষ করিয়া পরদিন নূতন বইয়ের দরকার করিত। এখনো মনে আছে মেসো-মশায় একদিন Tom Brown's School Days বইখানি আনিয়া দিলেন সেখানিও যখন সে একদিনে শেষ করিল তখন বোধহয় মেসোমশায়ের একটু সন্দেহ হইল। তিনি বইখানি লইয়া এখান ওখান হইতে গুটিকয়েক প্রশ্ন তাহাকে করিলেন। দেখিলেন বুবা যে বইখানি পড়িয়াছে শুধু তাই নয় বেশ রসগ্রহণ করিয়াই পড়িয়াছে। বলিলে লোকে হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না; ঐ বয়সে সে বাবার কলেজ লাইব্রেরী হইতে মান্ধাতার আমলের Webster

Dictionaryর মত মোটা এবং ক্ষুদে ক্ষুদে লেখায় ছাপা ওয়েভারলি নভেলস সংগ্রহ করিয়াছিল। আমি নিউমনিয়ায় পীড়িত হইয়া একটা ঘরে শুইয়া আছি। তাহারই সামনের কম্পাউণ্ডে লেপ তোষক সব রোদে দেওয়া হইয়াছে। দারুণ শীত। খাবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল বুবা কোথায় গিয়াছে তাহার উদ্দেশ নাই। অবশেষে আমারই ইঙ্গিতে মাসীমা বা মা ঠিক মনে নাই তাহাকে সেই লেপ বালিসের স্তূপের মধ্যে হইতে টানিয়া বাহির করিলেন।

ক্রমে ক্রমে সে নানা রকম ম্যাগাজিন পড়ার দিকে সে ঝুঁকিয়া পড়িল। বাড়ীতে মেসোমশায়ের কাছে অনেক রকম ম্যাগাজিন আসিত এবং বুবা সেগুলিকে আদ্যোপান্ত গলাধঃকরণ করিত। এই ম্যাগাজিনগুলি পড়িয়াই বুবা বহুবিধ জ্ঞানের কথা শিখিতে লাগিল। বস্তুত এই ম্যাগাজিনগুলি তাহার আসল শিক্ষাদাতা ছিল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সে পড়িত না। পরীক্ষার পূর্বে কয়েক দিন পড়িয়া গিয়া পরীক্ষা দিত।

ম্যাগাজিন ছাড়াও সে ডিকেন্স, জর্জ ইলিয়ট, কোনান ডয়েল, স্যার ওয়াল্টার স্কট, থ্যাকারে এবং বাংলা উপন্যাসও বেশ কিছু পড়িয়া শেষ করিয়াছিল।

পড়ার নেশা ছিল বলিয়া সে যে শুধু পড়া লইয়াই থাকিত বা গ্রন্থকীট ছিল তাহা নহে। সে নিয়মিত খেলাধুলাতেও যোগ দিত। তখনকার দিনে "স্বদেশী ক্লাব" এলাহাবাদে খেলাধূলায় একটি শ্রেষ্ঠ ক্লাব ছিল। তাহার ক্যাপ্টেন অনিলচন্দ্র মিত্র ইন্টার প্রভিন্সিয়াল ম্যাচেও ইউ পির প্রতিনিধিত্ব করিত। কলিকাতা বারের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সুশীল চৌধুরীর মত সর্বপ্রকার খেলায় ওস্তাদ খেলোয়াড় কমই দেখা যাইত। ঐ স্বদেশী ক্লাবের হকির সেন্টার ফরোয়ার্ডরূপে কেদারনাথ নামকরা খেলোয়াড ছিল। তাহা ছাড়া সে খুব ভাল বল করিত। গত যুগের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক ও গণেশ বসু এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। বুবা টেনিসও খেলিত।

কেদারনাথই আমাকে কোনান ডয়েলের বই আনিয়া পড়াইয়াছিল। আমাদের দুজনের একটি গোপন সমিতি ছিল, তাহার নাম ছিল জে, কে, এণ্ড কোং। কোনান ডয়েলের বই পড়িয়া আমরা ঐ রকম নৃত্যশীল মানুষের (dancing men) এ অক্ষর ব্যবহার করিতাম এবং দেশোদ্ধারের নানা উদ্ভট প্লান আঁটিতাম।

সাউথ রোডে থাকিতে, বাড়ীর ধারে অনেকগুলি টোপা ও নারকুলে কুলের গাছ ছিল। সেটা ছিল সিভিল লাইনস্ এবং আশে পাশের ফিরিঙ্গিদের ছেলেরা কুল চুরি করিতে আসিত। আমাদের এক বীরত্ব ছিল সেই ফিরিঙ্গীদের ছেলেদের ঠ্যাঙ্গানো। বুবা চমৎকার ইট ছুড়িতে পারিত। হাতের তাকও ছিল খুব লাগসই। তাদের মধ্যে দু'একজন বেশী ষণ্ডামার্ক ছিল তাহাদের হাতে আমাদের কখনো কখনো দু'চার ঘা খাইতে হইত বৈকি, কিন্তু বাকীগুলোকে আমরা জুৎ পাইলেই ঠেঙাইতাম এবং ইট ছোড়াতে তাহারা বুবার কাছে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। প্রত্যেকটি পাথর মোক্ষম লক্ষ্যে গিয়া ঘায়েল করিত। এলাহাবাদের একটি স্থায়ী বাসিন্দার ছেলে বুবাদের সঙ্গে পড়িত। বুবার ইট ছোড়া দেখিয়া খুব তারিফ করিয়া তার নিজস্ব অপ-বাংলায় বলিয়াছিল "বেটা চিড়িমার হচ্ছে" অর্থাৎ বুবা ইট ছুড়িয়া উড়ন্ত চিড়িয়া পাখীও মারিতে পারে।

এডমনষ্টন রোডে একসময় বুবার এলাহাবাদের অতি সজ্জন ও সমাজসেবী বিদ্বান, ব্যবহারজীবী সতীশ-চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পাশে থাকিত। তাঁহার পুত্র ইন্দুর সহিত বুবার খুবভাব হয়। ইন্দুর সাহায্যে সে সতীশ-বাবুর বিরাট লাইব্রেরীর বইয়ের সদ্ব্যবহার করিত।

এলাহাবাদে বুবার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে অনিল মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার সুশীল চৌধুরী, সুধাময় চ্যাটার্জি ও কৃপাময় চ্যাটার্জি ন্যাড়াবাবু (উকীল সত্যচরণ মুখার্জির পুত্র) ইহারা সকলেই খুব ভাল খেলোয়াড় ছিল। এবং শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্রদ্বয় রণেন্দ্র ও সুধীন্দ্রও আমাদের খুব বন্ধু ছিল।

যদিও বুবা বাহিরের বই পড়িয়া প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল তবু সে পড়ার বই একেবারে পড়িত না বলিয়া এণ্ট্রান্সে ভাল ফল দেখাইতে পারে নাই। সকলে খুবই আশা করিয়াছিলেন কিন্তু সেরকম কিছু হইল না।

তাহার পর প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু অফিস কলিকাতার সমাজ পাড়ায় উঠিয়া আসে এবং সেই সঙ্গে বুবারা সকলেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

ছেলেবেলা হইতেই বুবা ইংরেজি বাংলা বেশ ভাল লিখিত এবং লিখিবার বিষয়টি বেশ গুছাইয়া প্রকাশ করিত। কিন্তু সে যে সত্যই বেশ ভাল বক্তৃতা করিতে পারে তাহা ইস্কুল জীবনে আমরা বুঝি নাই।

শিশুপাঠ্য ইংরাজি বাংলা বই সে পড়িয়াছিল বিস্তর এবং শিশু-রোচন গল্পও সে খুব ভালই লিখিত কিন্তু সে বিস্তর লিখিল না। নহিলে আমাদের বিশ্বাস সে শিশুসাহিত্যে একটা নাম রাখিয়া যাইতে পারিত। সন্দেশে তাহার "ভবম্ নাপিতে"র গল্পে বাদ্যকরদের প্রচ্ছন্ন উক্তি এখনো মনে করিলে কৌতুকের সঞ্চার করে।

শানাই বলিল—রাজাকে ছুই সিং।

করতাল জিজ্ঞাসা করিল—কিস্লে কহা? কিস্লে কহা? তখন ঢোল নামটা ব্যক্ত করিল ভবম্ ভবম্নে, ভবম্ ভবম্নে। এবং বাজিতেই লাগিল।

বিলাত বাস কালে সে বন্ধুবান্ধবদের পিকচার পোষ্ট কার্ডে মজার মজার কবিতা লিখিয়া পাঠাইত। তবে তাহার মধ্যে অনেকেই ইহজগতে নাই।

তাহার আর একটা ক্ষমতার একটু নমুনা না-দিয়া পারিতেছি না।

সেবার, বিখ্যাত পারফিউমার, এইচ বসু মহাশয় মাঘোৎসবে পরে একটা ষ্টীমার পাটি দিয়াছিলেন। বৎসরটা মনে হইতেছে ১৯১০ এর জানুয়ারী; ঠিক মনে নাই। তাতে (৺সুকুমার রায়), মণি (৺সুবিনয় রায়), মঙ্গলী (প্রফুল্ল গাঙ্গুলী), জঙ্গলী (প্রভাত গাঙ্গুলী), কচি (৺সুধাময় চাটার্জী), ৺জীবন মুখার্জী ও আমি সমাজ পাড়ায় বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের একতলার ঘরে আসিয়া জমায়েৎ করিয়াছি। বুবার বেশ জ্বর হইয়াছে—সে যাইতে পারিবে না শুনিয়া সকলেই আমরা দুঃখ করিতেছি। সুকুমার বলিল, দুঃখ করে কি হবে? এসো সকলে মুখে মুখে ষ্টীমার পার্টির একটা কবিতা বানাই। মণি হঠাৎ সুরু করিয়া দিল—"মাঘোৎসবের ষ্টীমার পার্টি মস্ত মজার ব্যাপার; হঠাৎ আবক্ষ মস্তক আলোয়ানে ঢাকিয়া বুবা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এবং বলিয়া উঠিল, "জ্বোরো রুগী চল্ল ক্ষেপে মাথায় ঝেঁপে র‍্যাপার।" আমরা আনন্দে হৈ হৈ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম। এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই, এ বিষয়ে তাহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এলাহাবাদে এবং কলিকাতায় বাস করিবার সময়, কি স্কুলে, কি ক্লাবে, কি খেলার মাঠে কি নানা আড্ডায় তাহার মজার গল্প বলিবার ক্ষমতা, সহজ ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব এবং মর্য্যাদাপূর্ণ আচরণের গুণে সে সব জায়গাতেই অনায়াসে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া লইত।

আজও নিশ্চয় তোমার অজ্ঞেয় সত্তা আবার তোমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়জনের অজ্ঞেয় সত্তার মধ্যে আনন্দময় সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে—মনের মধ্যে এমনি একটি সান্ত্বনাপূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতেছে।

শ্রীজীবনময় রায়

কেদারনাথ

মনোজ বসু

সুগৌর সুঠাম দীর্ঘ মূর্ত্তি, সাদা চুল, ধবধবে সাদা কাপড়-জামা—তাঁর পুণ্যশ্লোক পিতা রামানন্দকেও ঠিক এমনি পোষাকে দেখতাম। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু সম্পাদনায় একান্তভাবে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু এইটুকু মাত্রই কেদারনাথের পরিচয় নয়। তাঁর স্বকীয় বিশালতার পরিমাপ কষ্টসাধ্য—প্রায় অসম্ভব বলা চলে। আশ্চর্য্য লাগে, চিরজীবন সাংবাদিকতার মধ্যে থেকেও আত্মবিলোপ তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেছিল। প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুয়ে কখনো তাঁর একলা ছবি বেরিয়েছে, মনে পড়ে না। অন্যত্রও অতি সামান্য বেরিয়েছে। অথচ অজুহাত খুঁজে ছবির পর ছবি ছাপবার কিছুমাত্র বাধা ছিল না, কলে-কৌশলে নিজের সম্বন্ধে নানান গাল-গল্পও রচনা করা যেত। আত্ম-প্রচারের ঢক্কামুখর আজকের দিনে এ জিনিষ নিতান্তই সম্পাদকীয় ব্যতিক্রম। নিজ সম্পর্কে এমনি নিস্পৃহতা সেকালের বিপ্লব কর্ম্মীদের মধ্যেই দেখেছি—নিজেকে একেবারে মুছে দেওয়া তাঁদের আদর্শ ও জীবন ব্রত।

সুদীর্ঘকাল থেকে কেদার দা'কে জানি—তিরিশ বছরেরও বেশী। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা যদি কিছু আমার হয়ে থাকে, তার মূলে প্রবাসী ও বিচিত্রার প্রথম আনুকূল্য। সেই তখন থেকে কেদার দা'র সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বলতে পারি নে। অমায়িক বন্ধুবৎসল মানুষ—সামান্যতমের প্রতিও তাঁর অবহেলা ছিল না। তবু কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম শালীনতা ও বৈদগ্ধ্য তাঁকে ঘিরে থাকত, সেই বাধা ভেদ করে সহজ অন্তরঙ্গতায় মিলিত হওয়া কঠিন হ'ত অনেকের পক্ষে। কয়েক বছর ধরে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর দোকানে সায়াহ্নের কয়েক ঘণ্টা তাঁকে আমরা নিবিড়ভাবে পাচ্ছিলাম।

পূতনাম বিপ্লবনেতা মাখনলাল সেনের সঙ্গে একত্র হয়ে কেদারনাথ 'ভারত' কাগজ বের করলেন। যথোচিত অর্থ নেই, আয়োজন নেই - কয়েকটি আত্মভোলা কর্ম্মী এগিয়ে এলেন কাগজ দাঁড় করানোর জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে তখন, দেশের নিদারুণ সঙ্কটকাল। কাগজের উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা নয়—আন্দোলন জোরদার করা, স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা। ইংরেজ সরকার কাগজওয়ালাদের জন্য এক হাতে পুরস্কার, অন্য হাতে শাস্তির চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়েছে—পছন্দ করে নাও যেটা খুসি। এবং বহুজনে মেয়ের মত মাথা নীচু করে কর্তৃপক্ষের প্রসাদ ভক্ষণ করছে। এই নীতিহীনতার মধ্যে জাতীয় আত্মসম্মানের নিদর্শনরূপে ভারতের আবির্ভাব ঘটল। কংগ্রেসের গুণ্ডামি সম্পর্কে নানা বিচিত্র বিজ্ঞাপন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরবরাহ হচ্ছে, এবং মোটা টাকার বিনিময়ে ছাপাও হচ্ছে কোন কোন দেশী কাগজে (আজকে দেখতে পাই, তাঁদেরই মধ্যে অনেকে কংগ্রেসের পাণ্ডা)। নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে ভারত-এর তখন টলটলায়মান অবস্থা, কিন্তু ঘৃণ্য বিজ্ঞাপন তাঁরা ছুড়ে ফেলে দিলেন। পরিণামে উঠেও গেল কাগজ, কিন্তু আদর্শচ্যুতি এঁরা ঘটতে দেন নি। সেদিনের জাতীয় দুর্য্যোগে কেদারনাথ-মাখনলাল যে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে আজ ক'জনে সে কথা মনে রেখেছেন জানিনে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষ, আবার শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপারে ছিল অতুলন রুচিবোধ ও মানসিক কমনীয়তা। আমাদের সায়াহ্ন অবসরের কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁর পড়াশোনা চিন্তা ও অনুভূতি কচিৎ কখনো স্ফুরিত হয়ে উঠত, মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে পড়তাম। এক সময়ে তাঁর বাড়ীতে আমার যাতায়াত ছিল, তখন লক্ষ্য করেছি কি বিপুল বিচিত্র তাঁর শিল্পসংগ্রহ—এবং বস্তুগুলি কত উচ্চাঙ্গের। স্বদেশের এবং সর্ব্বদেশের—শিল্পের মধ্যে তাঁর জাত-বিচার ছিল না।

সুধীর সরকার মশায়ের সায়াহ্ন আসরে কেদারনাথের একটি নির্দ্দিষ্ট চেয়ার—শীতে গ্রীষ্মে বৃষ্টি-বাদলার দিনেও ঠিক সময়টিতে সেখানে এসে তিনি আসীন হ'তেন। এই কিছুদিন থেকে চেয়ার শূন্য পড়ে থাকে। মানুষটি নেই, আর আসবেন না।

গল্পকার কেদারনাথ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সকাল বেলায় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলাম! প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। মনে হ'ল—যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ না হ'তেই বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন! অথচ তাঁর বয়স চুয়াত্তর!

এই বয়স শোক দুঃখ অবসাদ মনস্তাপ জরাব্যাধি ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ উপকরণ মিলিয়ে দেহ ও মনকে আর একটি ভূমিকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। দৃশ্যমান জগৎ থেকে অদৃশ্য এক জগতের দিকে যাত্রার প্রস্তুতি। সময়-সীমার নির্দ্দেশ অলঙ্ঘ্য বলে মনে হয়। সেই ইঙ্গিত ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হ'তে থাকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে; দৃষ্টি শ্রুতি মেধা বীর্য্য বাক্য কর্ম্ম ব্যবহার স্বধর্ম্মচ্যুতির ভূরি ভূরি প্রমাণ জমিয়ে তোলে। সন্দেহ থাকে না এ সমস্তই নূতন ভূমিকাভিনয়ের প্রস্তুতি। কিন্তু কেদারনাথের দেহে বা মনে এ সবের চিহ্নমাত্র ছিল না। জরাজয়ী আশ্চর্য্য চুয়াত্তর বৎসর!

এই তো সেদিন—মাত্র একমাস আগে মৌচাক অফিসে দেখে এসেছি নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসে গল্পের আসর জমিয়ে তুলেছেন। নানাদিকের অভিজ্ঞতা, সুগভীর জ্ঞান ও অধ্যয়ননিষ্ঠা সতেজ স্মৃতিশক্তির সঙ্গে মিলে বাক্-ভঙ্গিটি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। আর সেই অটুট স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, যা দেখে কোনদিনই প্রশ্ন করার অবকাশ ঘটেনি—কেমন আছেন? শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ, অন্তর-বাহির সর্ব্বশুভ্র মানুষটি যেন একটি ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি।

সেইদিন কথাপ্রসঙ্গে শুনলাম—কিছুদিন থেকে ওঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। সামান্য ব্রঙ্কাইটিসের মত হয়েছে। তবে সেটা খুব চিন্তার বিষয় নয়। ও এমন আর কি অসুখ—দেহ-ধারণে অমন একটু-আধটু বৈকল্য হয়ই! কথাটা উনি তোলেন নি—অন্যের মুখে শুনলাম। উনি ততক্ষণে গল্পের আসর জমিয়ে তুলেছেন।

এত শীঘ্র সে আসর ভেঙ্গে গেল!

সংবাদপত্রখানা হাতে করে বিমূঢ়ভাবে বসে রইলাম। তাই ত—বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন!

রামানন্দবাবুর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদনা করেছেন কেদারনাথ। উত্তরাধিকারের যোগ্যতা নিয়ে পিতার আদর্শকে সাধ্যমত উজ্জ্বল রেখেছেন। যে গুণপনার পরিচয় দীর্ঘকাল ধরে বহন করেছে দু'টি পত্রিকা। সম্পাদনা অর্থে শুধু লেখকের নাম মিলিয়ে রচনা নির্ব্বাচন নয়—লেখার গুণাগুণ বিচার করে পত্রিকাস্থ করা। ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল ধরে যে লেখা প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে তার মনোনয়ন ভার প্রধানত ওঁর উপরেই ছিল। এই প্রসঙ্গে আমার একখানি উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে। উপন্যাসটি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর উনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন আলোচনার জন্য। গল্পের এক জায়গায় চটকল ধর্ম্মঘটের একটা চিত্র ছিল—যা ওঁর কাছে বাস্তব যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। সেই বিষয় নিয়ে উনি বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলেন, যার ফলে সেই অংশটি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। পরে দেখা গেল সেই পরিবর্ত্তন গল্পটিকে অযথা ভাবালুতা থেকে রক্ষা করেছে। এমনি আরও দু'-একটি ঘটনা দেখেছি, যাতে করে পত্রিকা সম্পাদনায় ওঁর সজাগ দৃষ্টির পরিচয় মিলেছে।

প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও মডার্ণ রিভিয়ুর নোটস-এ তাঁর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন ও মত প্রকাশের দক্ষতা কে না লক্ষ্য করেছেন ? এ ছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে তঁার দূরদৃষ্টি ও বিচার-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। আবার শিশু সাহিত্যে জগন্নাথ পণ্ডিতের গল্পগুলি তাঁর ভূয়োদর্শন ও মজলিসি মনের পরিচয় বহন করছে। আসলে গুছিয়ে গল্প বলাতেই তঁার কৃতিত্ব সমধিক।

মজলিসই তাঁকে বেশী করে আকর্ষণ করতো—মজলিসে বসেই তিনি সুন্দর স্বভাবটিকে অতি অনায়াসে প্রসারিত করতে পারতেন। আর হয়তো বা এই কারণেই গল্পের আসরে বসে নিজেকে গল্পের বিষয়বস্তু করে তোলার কথা তাঁর মনে হয়নি। দু'খানি শক্তিশালী পত্রিকার সম্পাদক হয়েও নিজেকে অপ্রচারিত রেখেছেন।

আশ্চর্য্য, গল্পের আসরে কোনদিনই নিজের সাহিত্য-কর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করলেন না, আত্ম-কৃতিত্বের কাহিনী শোনালেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্ব-বিশ্রুত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেও নিজেকে বিস্ফারিত করতে পারলেন না। অভিজাত-সুলভ মর্য্যাদার উচ্চমঞ্চে সমাসীন হয়েও মর্য্যাদাবোধের উগ্র প্রকাশ তঁার আচরণে লক্ষণীয় হ'ল না।

যুগ-মানসের এ এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম !

—

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

পিতৃ অগ্নি গৃহ তুমি উত্তর ঋত্বিক
সত্য ন্যায় দেশপ্রেমে বলিষ্ঠ নির্ভীক,
সত্য বাণী, দীপ্ত বাণী, রুদ্র বাণীময়
জাগায়ে রাখিয়াছিলে, ভয় পরাজয়
নাহি মানি।
বিশবর্ষ রাখি অনির্ব্বাণ
আজ চির ধ্রুব লোকে করিলে প্রয়াণ।
পিছনে কি রেখে গেলে সে দীপ বর্ত্তিকা
হে সত্য ন্যায়ের বন্ধু, তার সেই শিখা
বারে বারে দেখায়েছে যে আলো অম্লান
স্তুতি নিন্দা মোহহীন পথের সন্ধান।
দেখেছে তোমারে কেহ। কেহ নাহি চিনে।
তবু তারা বাঁধা ছিল যেন কোন্ ঋণে :—
সত্য ন্যায় জ্ঞান ঋণ, দেশ ঋণ আর !
তারা আনিয়াছে অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাভার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ বৎসর বয়সে সেক্সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথ অনুবাদ করেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও তিনি লিখেছেনই ত ৬৭।৬৮ বৎসরের অধিককাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭।১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্যরকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পরে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা, গদ্য কাব্যও বহু সংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থ সমালোচনা, বিদেশ ভ্রমণ, প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তা ছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক পরিহাসাত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী নাট্য আছে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের জন্য লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প বলে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় করে এবং আরও নানা রকমের ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেও নয়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই ত তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি করে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাদের সে ক্ষোভ দূর করে গেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশের ও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে বলে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্মান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোষ্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

১৯২৫ সনে তিনি প্রথম ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেকচার্স দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্বলাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর গান ও গীত রচনা, তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু হাজার বা আরও বেশী বহু ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্য মহাদেশের লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানের রচয়িতা মনে করে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝতেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের

সৃষ্টি—এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীত-স্রষ্টা বলে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপ দেখেন। তাঁর গান-গুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে বহু পরিমাণে গড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়।

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও ছিল সাহিত্যধর্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যতদিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারও কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না হলেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করলেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চলল কতদিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্র জাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে। যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হলেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্র-নীতি ক্ষেত্রে কর্মীরূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত হল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশীদিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথম করেন এবং তার কার্যতঃ প্রতিবাদ-স্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্পদিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব-বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ সনে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ সনে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। "মুক্তধারা" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এই রকম কথা বলেছেন। "গীতাঞ্জলি"র ইংরেজী অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্বসাহিত্যিক-বাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজি লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার জন্যে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কি অলোক-সামান্য নম্রতা!···

"অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বাচৌড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর পরিবারে ও শান্তি-নিকেতনে, "অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য বরাবর নিযুক্ত হয়ে আসছে অবাধে।

যে সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তাঁর পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরও দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ করে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন।

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন।···

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় একচল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায়—যার গোড়ায় আছে:

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁর "ন্যাশনালিজম্" নামক ইংরেজি গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না করে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতা-বিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের-প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তারা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান ও শুচি থাকবেন এক ও অসীমের চরণে মাথা নত করে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্র-বয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কেরাও যাতে অন্য যে কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সেদিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও কৈশোরে বাড়ীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২।১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌর-গোপাল ঘোষ বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ, ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এসকলের শিক্ষার স্থান। ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষ-ত্রুটির বিচারের জন্য তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।…

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকাল সন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা সংসদ" স্থাপন করে গেছেন। এর জন্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয় যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন, এর কেরাণীগিরি পর্যন্ত করেছেন, স্বয়ং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য সহকারে পড়িয়েছেন। কিছুদিন আগেও নিজের কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন, গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন, তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প বলে চিত্তবিনোদন করেছেন, তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন, মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন, তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহ-মনের অলোকসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী কবির অন্য

ব্যসন ত ছিলই না; পান তামাকের অভ্যাস পর্যন্ত না থাকায় তিনি সকলের আদর্শ "গুরুদেব" ছিলেন।

কবি দ্বাদশবার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর-বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী-জগৎ শান্তিকামী।

বহু বৎসর পরেও তার শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্যদৃষ্টির শক্তি ছিল আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে।...বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না। যদিও নিজের সম্বন্ধে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন:

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মত স্নেহময় ও নির্ভরশীল মনে করতেন, তাই মৃত্যু সম্বন্ধে বলেছেন:

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

কবি নারীকুলের—বিশেষ করে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশী ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা করেছেন ও করতে চেয়েছিলেন তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল; অর্থাভাবে তা ঘটে ওঠে নি। বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশী উদ্বিগ্ন হতেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে দিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীতভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষণ-ব্যবস্থা সমেত শ্রীভবনটি রাখবেন। কবি তাঁর সহধর্মিণীর পরলোক-যাত্রার পর "স্মরণ" শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোন গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালে পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কি গভীর ছিল। কবির সন্তানসহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার, প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক।

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য ও সংযমের সহিত।

আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে।...চোখ কান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নেই। এখনো মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হ'ত। 'ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে'—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮)

প্রকৃতির প্রতিশোধ গ্রন্থে রবীন্দ্রদর্শন

ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যখানি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১২৯১ সালে। তখন তাঁর বয়স তেইশ কি চব্বিশ। বঙ্গ-সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয়, কিন্তু বইখানির সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনা ... হয় নি। এই গ্রন্থে যে-সত্যনির্ণয় রয়েছে তার মূলে ... প্রকৃতির মায়াবাদ-খণ্ডনে রবীন্দ্রদর্শনের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা। শৈশবে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রবীন্দ্র-মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার প্রমাণ মেলে কবি-র অনেক রচনায়; কিন্তু বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ। এই জন্য নাট্যকাব্যখানি বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দাবি রাখে।

প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন মানুষ জড়ের মত প্রাণহীন, আর প্রকৃতি-সংযোগে সেই মানুষ হয় প্রাণবন্ত; প্রকৃতি-সংসর্গচ্যুত মানব নিষ্ঠুর, নির্মম ও হিংস্র, আর প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে সেই মানুষ স্নেহময় ও করুণাবান; প্রকৃতির স্নেহহারা মানুষ জীবনরসাস্বাদনে চিরবঞ্চিত, কিন্তু প্রকৃতি-আশ্রিত সেই মানুষ জীবনরসের মূলীভূত কারণ নির্বিশেষ রূপরতনের কৃপালাভে সার্থকজন্মা। এই দু'টি বিপরীত ভাবের সমাবেশ হয়েছে নাট্যকাব্যের দু'টি চরিত্র সন্ন্যাসী ও বালিকার মধ্যে। পরিশেষে সন্ন্যাসীকে ব্রত ভঙ্গ করে নূতন ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়েছে। তখনই তিনি দেখতে পেলেন সত্যের আলোক, প্রাণের মহিমা; এবং লাভ করলেন অরূপরতনের স্পর্শ।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রূপকাশ্রিত নাট্যকাব্য। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলি উপস্থাপিত করেছেন বিশেষ বিচক্ষণতার সঙ্গে। অস্পৃশ্যতা সন্ন্যাসীকে কতদূর নীচে নামিয়েছিল—পদে পদে যে মানবতা হয়েছে ক্ষুণ্ণ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিতে; আর দেখিয়েছেন সন্ন্যাসী চরিত্রের মধ্যে এক ধর্মবিপ্লব। পরিশেষে গ্রন্থের সত্যদর্শনে জানা যায় যে, অসীমকে খুঁজিতে গেলে সীমার সঙ্গ চাই। নির্বিশেষকে জানতে হ'লে বিশেষকে করতে হয় আশ্রয়; বিশ্বভূপের দর্শন পেতে হ'লে তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব বা প্রকৃতির সংসর্গ করতে হয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে বা তাকে অবহেলা করে অর্থাৎ বিশ্বপিতার অংশোদ্ভূত প্রকৃতি-আশ্রিত জীবজগতকে উপেক্ষা করলে সেই অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব—আশীর্বাদ প্রাপ্তি ত দূরের কথা। নাট্যকাব্যের রঘুদুহিতা বিশ্বপ্রকৃতির রূপকরূপে গৃহীত এবং অসীম বা পরমাত্মার তত্ত্বান্বেষী হ'লেন প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসী। নাট্য-কাব্যের বিষয়বস্তু উদ্‌ঘাটনে আলোচনা পরিষ্কার হবে।

প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন গুহান্ধকারবাসী আত্মসমাহিত কোন সন্ন্যাসী অনন্তের উপলব্ধির জন্য নির্জনে ধ্যানমগ্ন। কোথা দিয়ে যে দিন-রাত চলে যায় তার খোঁজ তাঁর নেই। আপনাতে আপনি অটল হয়ে বসে থাকেন। প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে পাওয়া যায় না—এই সন্ন্যাসীর ধারণা। তাই প্রকৃতি থেকে দূরে—লোকালয়ের বাইরে পার্বত্য গুহায় তিনি থাকেন। জগতের মায়াবরণ যে তিনি ছিন্ন করতে পেরেছেন, তাতে তাঁর মহা আনন্দ,—

> তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
> সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।
> জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
> অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
> ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ।

শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়শক্তি সন্ন্যাসীকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। চন্দ্র-সূর্যরূপ দৈতজ্ঞান তাঁর মধ্যে অবলুপ্ত। মায়ার কুহেলিকা অপসারিত হওয়ায় জগৎ অলীক বলে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। সৃষ্টির অতীতে বিরাজিত মহাদেব যে-আনন্দে বিরাজ করেন, সেই আনন্দের আভাস পেয়ে তিনি বড়ই উৎফুল্ল,—

> দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
> গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
> কোটি কোটি যুগ ব্যাপী সাধনার পরে,
> যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে
> সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
> ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
> যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
> পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
> জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া

কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ !
পলে পলে ঘুঝি ঘুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ ।

প্রকৃতির মায়াফাঁদে পড়ে সন্ন্যাসীর যে কী কষ্ট হয়েছিল, এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মনে। সন্ন্যাসী বলছেন, তাঁর হৃদয়রাজ্য প্রকৃতির প্রভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; বাসনার কশাঘাতে পথ দিয়ে পাগলের মতো ছুটেছেন তিনি নিজের ছায়া বক্ষে ধরার জন্য কতই না নিষ্ফল প্রয়াস করেছেন; খাদ্য বলে ধরতে গেলেই তা ধূলিমুষ্টি হয়ে অদৃশ্য হয়েছে; তৃষ্ণার সলিলরাশি হয়েছে বাষ্প; সুখের মুখ দেখতে গিয়ে হয়েছে দুঃখের আবির্ভাব; সুখের নেশায় দিবারাত্র ঘুরেছেন তিনি এই প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু দুঃখই হয়েছে লাভ। এই প্রকাণ্ড বিশ্বপ্রকৃতি শুধু মায়া—একথা বুঝতে পেরে সন্ন্যাসী একদিন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—

একদিন—একদিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।...
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল।

প্রকৃতিমায়া-মুক্ত সন্ন্যাসী গুহান্ধকারে সাধিত তপোলব্ধ শক্তি নিয়ে একদিন গুহার বাইরে এলেন। তার চোখে পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র মনে হ'ল; চতুর্দিক যেন আবদ্ধ। তিনি চলেছেন রাজপথ দিয়ে, আর দেখছেন, নরপিপীলিকা চারদিকে আনাগোনা করছে। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, —

কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা?

এই সময় অস্পৃশ্য রঘুর কন্যা আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে রাজপথ দিয়ে। কেউ তাকে আশ্রয় দেয় নি; শেষে সন্ন্যাসীর কাছে বালিকা আশ্রয় পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়। সন্ন্যাসী বালিকাকে তত্ত্বশিক্ষা দেন কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। সে চায় শুধু আশ্রয়। এর উত্তরে সন্ন্যাসী বলেন,—

আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসার-মাঝে।
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।

বালিকা সন্ন্যাসীর কথায় সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। সে দেখতে পায় জগতের সকলেই সুখী; কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, জগৎ হ'ল জীবন্ত মৃত্যুরূপী; এখানে ভোগ করতে হয় অনন্ত যন্ত্রণা। যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তা একমাত্র মৃত্যুই। তাই তিনি স্পষ্ট করে বলেন,—

বিশ্ব মহামৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে—
দু'দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

ইতিমধ্যে অপর একজন পথিক আশ্রয়ের জন্য কাতর প্রার্থনা করছে। তাই শুনে সন্ন্যাসী বললেন তাকে, এ জগতে আশ্রয় কোথাও নেই বা কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু,—

আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া আর কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়পাথারে।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে বালিকা শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; সে সংসারের অনাদর জ্বালা সব গেছে ভুলে; মায়ের কোলে যেন অতিনিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। এই সময় সন্ন্যাসীর মনে হ'ল, বালিকা যেন তাঁকে ধীরে ধীরে মায়ায় আবদ্ধ করছে। সন্ন্যাসী পালাতে চাইলেন এই অবসরে; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, —

পলায়ন! পলায়ন! ছি ছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে!
প্রকৃতি; এই কি তোর মায়াফাঁদ যত!
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

এর মধ্যে বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তার আশঙ্কা, সন্ন্যাসী তাকে ফেলে চলে গেছেন। তাই ঘুম থেকে উঠেই তার আশঙ্কার কথা সে বললে সন্ন্যাসী তাকে জানালেন, কার ভয়ে তিনি চলে যাবেন। বরং—

ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।

সন্ন্যাসী স্থির করলেন, বালিকার সান্নিধ্যে থেকে বা সংসারের কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করেও নির্জনতা রচনা করবেন এবং নগরপথের মাঝেই প্রতিষ্ঠা করবেন তপোবন জগতের মায়াস্পর্শ থেকে দূরে থেকে। এইভাবে নিজেকে জানাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। সন্ন্যাসী বালিকাকে তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু

সরলা বালিকা তার কিছুই বুঝতে না পেরে ভীত হয়ে পড়ে। তখন সন্ন্যাসী তাকে বলেন,—

তবে থাক, তবে তুই কাছে আয় মোর
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।
এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ ঘোর?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান?

পরক্ষণেই হঠাৎ সন্ন্যাসীর ভ্রম ভেঙ্গে যায়। তিনি বালিকার কাছ থেকে দূরে চলে যান; কিন্তু বালিকার কাতরতায় আবার তিনি ভাবেন. সংসারপিঞ্জরের ক্ষুদ্র বালিকাটিকে অনন্তের মাঝে নিয়ে কি ফল হবে? সে লুকিয়ে থাকতে চায় তাঁরই বুকের কাছে। বালিকার উপর ক্রমে স্নেহ এসে পড়ে সন্ন্যাসীর। তখন তিনি ভাবেন,—

বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।

পরক্ষণেই আবার সন্ন্যাসী নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি সত্যই বালিকাটিকে স্নেহ করেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি ভাবেন যে তার শক্ত মনের মধ্যে ত স্নেহ-দ্বেষ কিছু নেই। শেষে তিনি স্থির করলেন,—

কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

বালিকা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে ভাবে সন্ন্যাসী তাকে স্নেহ করেন। সন্ন্যাসী তাকে ডেকে বললেন, তিনি সমাধি-আসনে বসবেন গুহার মাঝে। তাই তিনি বালিকাকে নগরে যেতে উপদেশ দিলে সে বলল যে সন্ন্যাসীর কাছেই সে থাকবে। এই কথা শুনে সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন ধ্যানের জন্য আর মেয়েটি রইল তাঁর ধ্যানভঙ্গ কালের প্রতীক্ষায়। ইতিমধ্যে বালিকা সন্ন্যাসীর জন্য কিছু ফুল ও ফল সংগ্রহ করে এনেছে। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী গুহার বাইরে এলে বালিকা তাঁকে ফুল ও ফল উপহার দিল। তিনি তাই দেখে বললেন,—

দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।
একমুঠো ফুল যদি ভালো লাগে তোর
একমুঠো ধূলা সেও কী করিল দোষ?
ভাল মন্দ কেন লাগে? সবই অর্থহীন।

বালিকার সারাদিন কিভাবে কাটল, একথা সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে বালিকা বলল যে একটা লতা নিয়ে সারাদিন খেলা করেছে; আর সেই লতাটি সন্ধ্যায় নুয়ে পড়েছে; কচি ডালগুলি মাটিতে পড়েছে লুটে, পাতাগুলি মুদে গিয়ে জড়াজড়ি করে আছে। বালিকা সন্ন্যাসীকে এই ঘুমন্ত লতাটির গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে বললে সন্ন্যাসীর হঠাৎ চমক ভেঙে যায়। তিনি ভাবেন,—

এ কিরে মদিরা আমি করিতেছি পান!
একি মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কিরে স্বপনঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরাণে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

এই ভেবে সহসা ফুলগুলি ছিঁড়ে আর ফলগুলি দূরে ফেলে দিয়ে বালিকাকে ভর্ৎসনা করে সন্ন্যাসী বললেন, এ ছেলেখেলা ভাল নয়। তাকে মনে রাখতে হবে যে সন্ন্যাসী হ'ল যোগী, মুক্ত এবং নির্বিকার। বস্তুজগৎ তাঁর কাছে ধূলির মত; কিন্তু পরক্ষণেই বালিকার সজল চোখের দিকে চেয়ে করুণায় তাঁর মন ভরে ওঠে। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, সন্ন্যাসীকে কোন জিনিস আকর্ষণ করতে পারে না; কারণ তাঁরা বিরাগী। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়েও হঠাৎ তাঁর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার ও মনে চাঞ্চল্য আসায় তিনি বিমূঢ় হয়ে ভাবেন,—

ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট।
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁসিয়া!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো জানিনে।
হৃদয় শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

এই সময় মন বড় অস্থির হয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর। তিনি আবার ফুলগুলি তুলে আনতে বলেন বালিকাকে; লতাটিকেও তিনি দেখতে চান। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তিনি বালিকাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নগরের দিকে চললেন। তিনি পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাবেন, তাঁর চোখে কেন মায়াঘোর এল? জগৎ কেন এত সুন্দর লাগছে তাঁর চোখে? চারদিকে যেন শান্তিময়ী নিঃস্তব্ধতা। সন্ধ্যা নেমে আসছে ধরণীর বুকে। দূরে শ্যামল তরুরাজির মধ্যে নগরের গৃহ দেখা যায়। কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন; দু'-একটি করে দীপ জ্বলে উঠছে; আরতির শঙ্খ বেজে উঠল। এই সব দেখে প্রকৃতি-সৌন্দর্য-মুগ্ধ সন্ন্যাসী বলে উঠলেন,—

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখিনি কখনো—
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,

হেথায় বসি না কেন রাজার মতন।
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।...
উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

পরে নগর থেকে ফিরে এলেন সন্ন্যাসী। গুহাদ্বারে এসে বালিকাকে ডেকে বললেন যে গুহার কাছে বড়ই অন্ধকার, অত্যন্ত স্তব্ধতা। বালিকাকে বললেন চাঁদের আলোতে গিয়ে বসতে। সেখানে বসে প্রকৃতির অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। তাঁর মন শীতল হয়ে গেল যেন শান্তিবারিবর্ষণে। তিনি আনন্দে বলে উঠলেন,—

আহা এ কি সুমধুর! এ কি শান্তিসুধা!
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।

সন্ন্যাসী বালিকাকে আরও নিকটে আসতে বললেন। সেও তাই শুনে সন্ন্যাসীর কাছে এসে প্রকৃতির ঐশ্বর্য-মণ্ডিত একটি গান করলে হঠাৎ আবার সন্ন্যাসীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন তিনি যেন কোথায় চলেছেন; নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছেন না। তিনি বোধ হয় এমনই ভাবে লুপ্ত হয়ে যাবেন। চোখ যেন তাঁর বন্ধ হয়ে আসছে; চারদিক যেন তাঁকে ঘিরে ফেলছে। সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি নিজেকে বলে উঠলেন,—

এখনই ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া।
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।

এই ভেবে তখনই সন্ন্যাসী ছুটে চললেন গুহার ভিতরে। সেখানে দেখতে পেলেন তিনি পরম শান্তি, গভীর বিরাম। নিজের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে সন্ন্যাসী রইলেন সেই নির্জন গুহায়—প্রকৃতির ছোঁয়া সেখানে বিন্দুমাত্র নেই। এইভাবে দু'-দিন দু'-রাত্রি কেটে গেল। শেষে সন্ন্যাসীর ডাক যেন শুনে বালিকা গুহার ভিতরে গিয়ে পিতাকে জানায় যে সে আর থাকতে না পেরে তাঁর কাছে এসেছে। বালিকাকে দেখে সন্ন্যাসী তার মুখের দিকে শুধু চেয়ে থাকেন; তাতে ভয় পেয়ে বালিকা বলে যে তাঁর যদি ভাল না লাগে তবে সে চলে যাবে। তাই শুনে উত্তর দেন সন্ন্যাসী,

একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভাল করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর!
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা!
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।

সন্ন্যাসীর আবার মনে হয়, বালিকা মিথ্যা বা দু'-দণ্ডের ভ্রম নয়। তারি মত সুন্দর ও সত্য হয়ত এই জগৎ। তাই তিনি বাইরে এলেন গুহা থেকে এই বলে,—

সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

বাইরে এসে প্রভাতের আলোকে সন্ন্যাসী হ'লেন মুগ্ধ। তাঁর মনে হ'ল জগৎ বুঝি সত্য, মিথ্যা নয়। শুধু অজ্ঞানতার জন্যই প্রকৃতি ভ্রম বলে মনে হয়। এখানেই অসীম ব্যক্ত হচ্ছে সীমারূপে; যা-কিছু ক্ষুদ্র সবই অনন্তের অংশ, বালুকণাও অসীমেরই একটি প্রকাশ, ওর মধ্যেই অনন্ত আকাশ আবদ্ধ। এখানে বড়-ছোট কিছু নেই, সকলই মহৎ। পরে নিজেকে খানিক তিরস্কৃত করে বলে উঠলেন,—

আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!...
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ,
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

ইতিমধ্যে দু'-জন পথিকের কথাবার্তায় সন্ন্যাসীর মন আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। পথিকদ্বয়ের মধ্যে একজন যাচ্ছে চলে অনেক দূরে, তাই আরেকজনার মন হয়েছে ব্যাকুল। যতদূর পারা যায়, বিদায়ী বন্ধুকে অনুগমন করে চলেছে অপরজন। বন্ধু তাকে আর অনুগমন না করতে অনুরোধ করে; তাদের মন আকুল হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ-বেদনায়। অবশেষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। যে অশোক গাছের তলায় বসে কত দিন কত রাত্রি তারা গল্প করেছে, যে-গৃহে তারা একত্র কত দিন ছিল সেই সব দেখে তারা বিহ্বল হয়। শেষে তারা বিদায় নেয় চোখের জলে। এই দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসী চিন্তা করেন,—

আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে।
বিপুল জগৎ-মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা,
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।...
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ-দুঃখ নিয়ে তবু করিবিরে খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস!

এই মোহবন্ধনই যে সুখ-দুঃখের কারণ তা বুঝতে পারেন সন্ন্যাসী। যে থাকবে না তাকেও রেখে দেবার কি মিথ্যা প্রচেষ্টা। তিনি বুঝতে পারছেন, কে যেন তাঁকে অবিরত বন্ধনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে; জগৎচক্রের মধ্যে যেন তিনি ঘুরে ঘুরে পড়ছেন। অশ্রুর বাঁধন যেন চারদিক থেকে জড়াচ্ছে; তাঁর চলার শক্তিও যেন আসছে কমে। এইসব ভেবে ভেবে সন্ন্যাসী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে হয়, কে যেন পিতা পিতা বলে ডেকে আবার বন্ধনের মধ্যে ফেলতে চায়; কিন্তু সন্ন্যাসী এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর প্রকৃতির বন্ধনে পড়বেন না। শেষে ছুটে চলেন গুহা থেকে, আর মনে মনে বলেন,—

ছিঁড়ে ফেল্, ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

সন্ন্যাসী অনেক দূরে চলে এসেছেন; কিন্তু যতই এগিয়ে আসছেন ততই বালিকার করুণ মুখখানির কথা মনে পড়ছে। আবার তিনি ভাবেন, বালিকা ত কিছু চায় না; শুধু মনের মাঝে একটু স্থান পেলেই সে সুখী। তিনি দেখতে পান প্রকৃতির মধ্যে যে যার কাজে চলেছে, সুখে দুঃখে তাদের দিন যায় কেটে; শুধু তিনি একাই সংসারের প্রতিকূল স্রোতে ভেসে চলেছেন। তাতে তাঁর কিছু লাভ হয়েছে কি না এতে সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি বলেন,—

পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
বিপরীত মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া—
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই!

এর পরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কতকগুলি স্ত্রীলোকের কথা-বার্তায় তিনি জানতে পারেন যে, তারা সকলে সুখেই আছে; কিন্তু এ-সুখের যে কোন মূল্য নেই তা সন্ন্যাসী বুঝতে পেরে ভাবেন,—

সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়
তরঙ্গের নৃত্যসনে নৃত্য করিতেছে।
দু'-দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি তো পেয়েছি কূল অটল পর্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।

সন্ন্যাসী হৃদয় শান্ত করে ভাবেন, যত সব মরীচিকা দূর হয়ে যাক; আবার ফিরে আসুক সেই অন্ধকার, অকূল স্তব্ধতা। সংসারের কোলাহলে কর্ণ বধিরপ্রায়। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আত্মনিমগ্ন আছেন, এমন সময় সেই বালিকা পিতা পিতা বলে ছুটে এল; কিন্তু সন্ন্যাসী তখন বলে উঠলেন,—

চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা!
আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।

বালিকা তখন সকাতরে বলে,—

আমারে যেয়োনা ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।
শুধারে শুধারে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা এসেছি যে আমি।

বালিকার এই কথা শুনে সন্ন্যাসী হঠাৎ আবার ফিরে আসলেন তার কাছে এবং বললেন, আর তিনি তাকে ফেলে যাবেন না; তাঁর পাষাণ প্রাণ বালিকার অশ্রুতে ভেঙে গেছে। যে পদাঘাতে জগৎ ভেঙেছিলেন, সেই জগৎ আবার বালিকার ছোট দু'টি হাতে গড়ে উঠেছে। বালিকার শুষ্ক মুখখানির দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন,—

তিন দিবসের পথ, কেমনে এলি রে!
আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

আবার ফিরে গেলেন সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে। সেখানে তিনি ভাবেন, এইখানেই বুঝি তার সব শেষ হয়ে যাবে। যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হবেন বলে বিশ্বের বাহিরে আসন পেতেছিলেন তা আরম্ভ হ'তে না হ'তেই ভেঙে গেল। শুধু চারদিকে তিনি দেখেন গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহরাশি, লোকজন; আর ভাবেন বালিকার কথা। মিথ্যাই তাঁর সব আশা, মিথ্যাই তাঁর সব জ্ঞান। যে আকাশবিহারী পাখী আকাশে উড়ত, মাটির ব্যাধ তাকে বাণ মারায় সে ক্রমশঃ মাটির দিকেই চলে আসছে; ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে তার দেহ, পাখা ভগ্ন। যে-মাথা আগে অভ্রভেদী ছিল, তা ক্রমেই নুইয়ে পড়ছে। পরিশেষে লুটিয়ে পড়তে হবে ধূলায় মৃত্যুর মধ্যে। তবে কি আর উপায় নেই! শুধু—

লৌহ-পিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।

এইরূপ গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে যখন সন্ন্যাসী আপতিত, ঠিক এমনই সময় বালিকা একটি কুঁড়িভরা লতা সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বলল,—

দেখ পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

এই কথা শুনে হঠাৎ সন্ন্যাসী ছুটে এসে লতাটিকে ছিঁড়ে ফেললেন; আর তাই দেখে বালিকা সকরুণ ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন,—

রাক্ষসী পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনই তুই যারে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি!
ওরে, তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল!

এই বলে সন্ন্যাসী দ্রুত গুহা থেকে বহির্গত হয়ে প্রস্থান করলেন, আর বালিকাও মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। সন্ন্যাসী চলেছেন অরণ্যের মধ্য দিয়ে। একে ত অন্ধকার রাত্রি, তাতে অবিশ্রাম ঝড়বৃষ্টি। সন্ন্যাসী যাচ্ছেন আর যেন শুনতে পাচ্ছেন সেই বালিকার আর্ত কণ্ঠধ্বনি। তিনি ভাবেন, এখনও বালিকার মায়া কাটাতে তিনি পারলেন না; তাই তিনি আরও দ্রুত চলেন সেই জগতপ্রান্তে, যেখানে বালিকার ডাক শোনা যাবে না; কিন্তু তিনি জানেন না, কোথায় গেলে বালিকার মুখখানি মনে পড়বে না। তাই তিনি ভাবেন,—

যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা মাঝে
দিগ্বিদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই।

কিন্তু সন্ন্যাসীর হৃদয় ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে। শেষে আর স্থির হ'তে না পেরে অরণ্য থেকে ছুটে বাইরে চলে আসেন। সন্ন্যাসীর চিহ্ন দণ্ড-কমণ্ডলু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—

যাক্ রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু
আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী।
পাষাণসঙ্কল্প-ভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলি বাচি একবার
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা একা সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ঐ যেতেছে চলিয়া
আমিও চলিতে চাই উহাদেরই সাথে।
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।

সন্ন্যাসী চারদিক তখন চেয়ে দেখলেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি আনন্দময় হয়ে দেখা দিল। তখন তাঁর মনে হ'ল যেন জগতের লোকে তাঁকে দেখতে আসছে; নদ-নদী, তরু-লতা, পশু-পাখী সব হাসছে; হাসি মুখে সবাই নিজেদের কাজে চলেছে; চাষী সুখে ধান কাটছে, কেউ বা করছে চাষ; গান গেয়ে গরু নিয়ে যাচ্ছে রাখাল; পূজারী পূজোর জন্য ফুল তুলছে; নৌকায় যাত্রীদের পার করে দিচ্ছে পাটনী; পথ চলতে চলতে বন্ধুরা কত কথা বলছে; ছেলেরা খেলা করছে ধূলায় বসে; কেউ স্নান করছে, কেউ তুলছে জল। এই সব দেখে সেই বালিকাটির কথা মনে পড়ল সন্ন্যাসীর যাকে তিনি মূর্ছিত অবস্থায় ফেলে এসেছেন। সেই অনাথাকে হয়ত কেউ আশ্রয় দেয় নি; ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কারো কাছে হয়ত সে যায় নি; পিতার মতো করে কেউ তাকে বুকে তুলে অশ্রুজল মুছে দেয় নি! বালিকার করুণ নয়ন দু'টি কেবল মনে পড়তে লাগল সন্ন্যাসীর। তিনি তখন মনে করলেন,—

আহা, কাছে যাই তার—বুকে নিয়ে তারে
শুধাই সে কী হয়েছে, কী করেছি আমি!
একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

সন্ন্যাসী দ্রুত চলেছেন গুহার অভিমুখে। পথে যাকে দেখছেন তারই মুখে হাসি। জগৎ তাঁর কাছে আনন্দের হাসি নিয়ে দেখা দিয়েছে। আনন্দের তরঙ্গ খেলছে চন্দ্র-সূর্যকে ঘিরে; লতায়-পাতায় আনন্দের ঝরণা; পাখীর গলায় আনন্দের কলধ্বনি; কুসুমরাশি ফুটে পড়ছে আনন্দে। প্রকৃতির এই আনন্দোৎসব দেখতে দেখতে চলেছেন সন্ন্যাসী আর পথিকজন এসে তাঁর চরণধূলি নিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। তিনি ভাবতে পারছেন না কেন তারা সব প্রণাম করছে তাঁকে। তিনি মনে করেন যে তিনি ত এখন আর সন্ন্যাসী নন, তাদেরই মত একজন। তাই কেউ প্রণাম করতে এলে তিনি তাকে আলিঙ্গন করে বললেন,—

আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো—
এস ভাই আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরই গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

পরে তিনি সকলের কাছে বালিকাটির খোঁজ নিতে থাকেন। কেউ কি তাকে আশ্রয় দেয় নি বা স্নেহভরে ঘরে তুলে নেয় নি। তার মলিন মুখ দেখে কি কেউ তার কাছে আসে নি—এই সব ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসী দ্রুত গুহাদ্বারে এসে ধূলায় পতিত বালিকাকে দেখে ছুটে গেলেন এই বলে,—

নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন—ওঠ মা ওঠ মা—

বালিকা তবুও নিরুত্তর থাকলে সন্ন্যাসী ভাবলেন, বুঝি অভিমান করে সে পড়ে আছে। তাই মনে করে তার দেহ স্পর্শ করতেই সন্ন্যাসী বুঝলেন, সে অভিমানে প্রাণত্যাগ করেছে। তখন হাহাকার করে তিনি বললেন,—

বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কী করিলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!

এইখানেই নাট্যকাব্য পরিসমাপ্ত।

প্রকৃতিরূপিণী যে-বালিকাকে সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তাকে তিনি জীবিত অবস্থায় আর পেলেন না। সন্ন্যাসীর অজ্ঞানতার প্রতিশোধ সত্যই নিয়েছে প্রকৃতি। কত ভাবে, কত কথায় সন্ন্যাসীকে বুঝিয়েছিল বালিকা যে তাকে ত্যাগ করলে—প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দূরে চলে গেলে সাধনা হয় না। প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে সেই অরূপরতন; তাঁর স্পর্শ রয়েছে ফুলে, ফলে, লতায়, নদী-নালায়, গিরি-পর্বতে, পশু-পাখীতে, নর-নারীর মধ্যে। তিনি অসীম হয়েও রূপ প্রকট করেছেন সীমার মধ্যে। প্রকৃতি হচ্ছে সেই অসীমেরই অংশ। প্রকৃতির মধ্য দিয়েই অসীমকে পাওয়া যায়—এ শিক্ষা দিয়ে গেল বালিকা সন্ন্যাসীকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে। হাতের কাছে পেয়েও তিনি হারিয়েছেন। এ যেন সেই একই সুর—দেবতামন্দিরে ভক্ত দিবারাত্র ভগবানকে ডেকে চলেছেন। একদিন সত্যই ভগবান এলেন দীনবেশে—বেশহীন হয়ে। চাইলেন তিনি ঐ মন্দিরে একটু আশ্রয়; কিন্তু অপবিত্র বলে তাঁকে ভক্ত ঠাই দিলেন না। তখন,—

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও সন্ন্যাসীর আরাধ্য অসীম বা অনন্ত প্রকৃতি বা বালিকার রূপে এসেছিলেন সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর মোহ ভেঙে দিতে। যে-অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন সন্ন্যাসী, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য বালিকা কত প্রকারে চেষ্টা করেছে। অসীমের স্পর্শ যে এই প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি প্রতি বিষয়েই যে অনন্তের অস্তিত্ব রয়েছে, তা সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন নি। প্রকৃতিরূপিণী বালিকার কথায় ও তার সংসর্গে সন্ন্যাসীর মাঝে মাঝে অজ্ঞানতার তন্দ্রাঘোর কেটে যাচ্ছিল; কিন্তু পুনরায় মোহাবরণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। প্রকৃতিকে ভালবাসলে, প্রকৃতির প্রতিশক্তিকে আরাধনা করলেই যে অনন্তের আস্বাদন সম্ভব, অবিদ্যাগ্রস্ত সন্ন্যাসী তা বুঝতে পারেন নি। তাই প্রকৃতি যখন কিছুতেই সন্ন্যাসীকে জ্ঞানালোকে নিয়ে যেতে পারলেন না, তখন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বালিকা শিখিয়ে দিয়ে গেল সন্ন্যাসীকে অনন্তলাভের উপায়—জানিয়ে গেল অসীমের সন্ধান। ক্ষুদ্রকে নিয়েই যে বৃহৎ, ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যেই যে বৃহৎ অনন্তের সত্তা, তা সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন নি। যখন সন্ন্যাসীর সে বোধ জন্মাল, সে মোহঘোর কেটে গেল, অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার আবরণ যখন ছিন্ন হ'ল, তখন তিনি জানতে পারলেন প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে অসীমের সত্তা এবং সীমার মধ্য দিয়েই অসীমের প্রকাশ। তখনই সন্ন্যাসী ছুটে চললেন প্রকৃতিরূপিণী বালিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। বালিকার এটুকুই ছিল প্রয়োজন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সত্যের প্রকাশ করে গেল সে।

অনুরূপ সত্যদর্শন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রভাত সংগীতে। সেখানে দেখি সন্ধ্যা সংগীতের কুহেলিকা অপসারিত। কবির মনের অন্ধকার, দ্বিধা, সন্দেহ সব কেটে গেছে; প্রভাতের আলো দেখতে পেয়েছেন তিনি। স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে নির্ঝরের—সে নিজেকে মুক্ত করেছে অন্ধকার গুহা থেকে—ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে অনন্ত সমুদ্রের দিকে। সে বুঝতে পেরেছে তার মধ্যে রয়েছে অসীমের শক্তি—অসীমের অংশ। সেই শক্তি অর্জন করেই সে নিজেকে বিলীন করে দিতে চায় অনন্ত সমুদ্রে—এতেই প্রতিষ্ঠিত হবে মধুর সম্বন্ধ। এইজন্য ব্রহ্মরূপী অনন্ত সমুদ্রে মিশে গিয়ে সে সার্থক করে তুলেছে নিজের সত্তাকে।

প্রভাত সংগীত ও প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রায় এক সময়ের রচনা। প্রভাত সংগীত রচিত হয় এক বৎসর পূর্বে। সেই কারণে প্রভাতসংগীতের ধ্বনি বেজে উঠেছে প্রকৃতির প্রতিশোধে। সহজে বলা চলে, প্রভাত সংগীতের সৃষ্টি-চেতনাই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৃতির প্রতিশোধে। প্রভাত সংগীতের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে। যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম—অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি।

'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটি ভাব এসেছিল —বিশ্বজগতে আসা ও যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মত আলোতে ওঠা ও অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর ও অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা।' …'প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ' —এই গোচর ও অগোচরের বা প্রকাশ ও অপ্রকাশের নিত্য সম্বন্ধই রূপান্তরে দেখতে পাই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ অনন্ত ও প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রে। প্রভাত সংগীত-এর আবাহনে কবি গেয়েছেন,—

জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে—
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশ্বাস
ঢালিস বিষের ধারা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও অনুরূপ সংশয় জেগেছে কবির মনে। সন্ন্যাসী দেখছেন, সংসারের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে অবিরাম গতিতে। যে যার কাজ করে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, সুখে-দুঃখে দিন তাদের কাটে। তাই দেখে সন্ন্যাসী নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন,—

আমি কেন দিবাদিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে।
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
বিপরীত মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি।

আবার প্রভাত সংগীত-এ কবি গেয়েছেন,—

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেন রে শুকায়ে যায় …
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা
কোথাও বা সুখগান—
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া
আকুল পরাণে নয়ান মুদিয়া
অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবিরে মধুপান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর,
যেদিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সন্ন্যাসীর যখন মোহঘোর কেটে গেল, অবিদ্যা যখন তিরোহিত, তখন সন্ন্যাসীর চোখে সবাই সুন্দর হয়ে দেখা দিল,—

জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দ তরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

প্রভাত সংগীতে কবির তন্দ্রাভাব কাটায় তাঁর মনের যে দ্বার খুলে গেল, তাতে তিনি প্রকৃতিকে দেখতে পেলেন অভিনব এক সত্য রূপে। তিনি পরম মুগ্ধ হয়ে বললেন,—

এমন বাতাস পরাণ পুরিয়া
করেনি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখনো করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ।
দেখরে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন রে কী গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া শোন রে সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়!

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও মোহাবরণমুক্ত সন্ন্যাসী প্রকৃতিকে সত্য ও নূতন রূপে দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেছেন,—

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।

উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।

সুতরাং, লক্ষণীয়, প্রভাত সংগীতে কবি যে সত্যদর্শন করেছিলেন, তারই পুনর্দর্শন পাওয়া যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ।

রবীন্দ্রনাথের এই সত্যদর্শন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সীমার মধ্যে অসীমের নিত্যলীলা দেখতে পেয়েছেন তিনি সর্বত্র এবং তাঁর নানা রচনার মধ্যে এর প্রতিষ্ঠা রয়েছে। ব্রহ্ম এক হয়েও যে জীবজগৎ-বিশিষ্ট, তিনি অনন্ত হয়েও যে শান্ত তা স্বীকৃত হয়েছে কবিগুরুর নানা রচনায়। সীমার মাঝে অসীম আপন সুরে অহরহ বাজিয়ে চলেছেন। সীমা-অসীমের মধুর সম্বন্ধ, মিলনের জন্য তাদের সদা উৎকণ্ঠা—ইহা সত্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-দর্শনে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিধ্বনিও দুর্লক্ষ্য নয় রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ। এই গ্রন্থে দেখা যায়, সন্ন্যাসী দু'টি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ; আর দ্বিতীয় হ'ল—ব্রহ্ম সত্য কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মেরই অংশ। মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সন্ন্যাসী প্রথমে ভেবেছিলেন, জগৎ মায়া বা মিথ্যা। তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—

পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।...
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে।...
আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু নয়।

ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রকৃতি রূপিণী বালিকা যখন সন্ন্যাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে জগৎ ত মিথ্যা নয়; এখানে সকলেই সুখে আছে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের অংশই বিদ্যমান; সামান্য লতার কুঁড়ির মধ্যেও বিশ্বভূপের ছায়া রয়েছে, তখন থেকে সন্ন্যাসীর সংশয় কেবলই বাড়তে থাকে এবং কখনও জগতকে তিনি সত্য বলে দেখতে লাগলেন আবার পরক্ষণেই তাঁর সে ধারণা দুর হয়ে যেতে লাগল। কখনও তিনি বলেন,—

জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।

একদিন গুহার বাইরে এসে সন্ন্যাসী প্রকৃতির ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন,—

আহা একি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।...
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার অবিদ্যা এসে সন্ন্যাসীকে আচ্ছন্ন করায় তিনি বলে ওঠেন প্রকৃতিকে ভর্ৎসনা করে,—

বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে;
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোর রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি।

আবার সন্দেহ জেগেছে সন্ন্যাসীর মনে। তাঁর মনে হয়, প্রকৃতি মিথ্যা নয়—প্রকৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে অনন্তের পরিচয়। বালিকার মধ্যে কখনও তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন আবার কখনও তাকে মায়া বলে মনে হয়েছে। পরিশেষে এই বিরাট দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এক করুণ পরিণতির মধ্যে। বালিকার স্নেহ-স্পর্শেই সন্ন্যাসী সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সেই মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে সন্ন্যাসী বুঝতে পেরেছেন,—

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি!
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—

এই নাট্যকাব্যের মধ্যে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের মূল স্বরূপ-আভাস। এই জন্য গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য আছে। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এখানে স্বীকৃত হয় নি। নাম-রূপাত্মক এই জগৎ যে মিথ্যা নয় তারই প্রতিষ্ঠা হয়েছে আলোচিত গ্রন্থে। সেই দিক থেকে রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্মরণীয়। তাঁরা উভয়ই জগতকে সত্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বেরও প্রতিধ্বনি পাই এই নাট্যকাব্যে। বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ ও সার্বভৌমের সঙ্গে বিচারে মহাপ্রভু অদ্বৈত-

বাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্বটি মোটামুটি এই—জগৎ ও জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয় আবার অভিন্নও নয়। জগৎ ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাতে অভেদের মধ্যে ভেদ এবং ভেদের মধ্যে অভেদের নিত্য প্রতিষ্ঠা। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নয়, আবার ব্রহ্মের বাইরেও নয়। ব্রহ্ম জীব ও জগতের স্রষ্টা ও নিত্য আশ্রয় হয়েও জগৎ থেকে স্বতন্ত্র। এই তত্ত্ব থেকে জানা যায়, অনন্ত ব্রহ্ম যখন আপনাকে নানা রূপ-রসে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করতে লাগলেন, তখনই এই আনন্দময় জগতের সৃষ্টি। এই অনন্তই জীব ও জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। ইনি আনন্দস্বরূপ, ; কাজেই সৃষ্টির সব কিছুই আনন্দময়।

প্রকৃতির এই আনন্দময় রূপ সন্দর্শন করেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী অনন্ত বা অসীমের স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাতেই তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্ত হয়েছে চিরশান্ত।

দামী শাড়ী-ব্লাউজে ঝকমকে সাজ।

ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল ভদ্রমহিলা রেস্তরাঁয় ঢোকার মুখে অনিমেষ আর বাসবীকে দেখে নিশ্চল হয়ে গেছে। কৌতূহলে না ঈর্ষায় সেটা বোঝা গেল না।

বাসবী যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, দেখল অনিমেষ তখনও তার বাহুমূল আঁকড়ে ধরে আছে।

শরীরকে ঝাঁকানি দিয়ে অনিমেষের কবল থেকে বাসবী নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বেলাদেবী হাসিতে ভেঙে পড়ল। বাসবীর মনে হ'ল একরাশ কাঁচের বাসন যেন ঝনঝন করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

অনিমেষের পিছন পিছন দ্রুত পা ফেলে বাসবী মোটরে এসে উঠল।

রেস্তরাঁর দরজার দিকে চোখ তুলে চাইবার সাহসটুকুও তার অন্তর্হিত। মনে হ'ল তেমনি বঙ্কিম ভঙ্গিতে দু'চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ মাখিয়ে বেলাদেবী বুঝি দাঁড়িয়ে আছে।

আসন্ন পতন থেকে বাঁচাবার জন্য অনিমেষ যে বাসবীর হাত ধরেছিল এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা বেলাদেবী বুঝতে চাইবে না। তার দু' ঠোঁটের কুঞ্চন দেখে সেটুকু বেশ বোঝা গেল। দু'জনের মধ্যে গভীর এক সম্পর্কের সূত্র সে আবিষ্কার করেছে।

লজ্জায়, সঙ্কোচে বাসবী মাথা তুলতে পারল না।

মোটর চালু করার মুখেই বাধা।

মেমসাব সেলাম দিয়া।

রেস্তরাঁর একটা ওয়েটার মোটরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিরক্তকণ্ঠে অনিমেষ বলল, আভি হামারা টাইম নেই হ্যায়।

হঠাৎই বাসবীর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

কি বলছেন শুনেই আসুন না।

মোটরের দরজা খুলে অনিমেষ নেমে পড়ল।

এতক্ষণ পরে বাসবী আড়চোখে চেয়ে দেখল। না, রেস্তরাঁর দরজায় কেউ নেই। বেলাদেবী সম্ভবত ভিতরেই অপেক্ষা করছে।

অনিমেষ রেস্তরাঁর মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

সেই মুহূর্তে বাসবী প্রতিজ্ঞা করল। এই শেষ। আর কোনদিন অনিমেষের আহ্বানে সাড়া দেবে না। তার সঙ্গী হবে না। বেলাদেবীর সঙ্গে অনিমেষের বর্তমানে কোন সম্পর্ক নেই, সত্যি কথা। কিন্তু এমন একটা সম্পর্ক কি এত সহজেই শেষ হয়ে যায়। সঙ্গীতের রেশের মতন, ধ্বনির প্রতিধ্বনির মতন, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণন তোলে।

অনিমেষের মনের খবর বাসবী জানে না। বেলাদেবীর মনের খবরও নয়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার আবীর চিহ্ন আজও আছে কিনা, সে কথা বাসবীর জানার নয়। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পারল, বেলাদেবীর হৃদয় থেকে নিঃশেষে সব কিছু মুছে যায় নি। তা যদি যেত, তা হ'লে অনিমেষ আর বাসবীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ওভাবে তার দুটো চোখ জ্বলে উঠত না; ঠোঁটের দু'টি প্রান্ত বেঁকে যেত না অমন ভাবে।

অনেকক্ষণ। বাসবীর মনে হ'ল যেন এক যুগ। অপেক্ষা করে করে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। পথচারীর দল বিশ্রীভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। দু'-একজন রসিকতাও করল। বাসবী আরক্ত হয়ে উঠল। একবার ভাবল, মোটর থেকে নেমে সোজা হাঁটতে সুরু করবে। এতক্ষণে ট্রাম-বাসের ভীড় বোধ হয় একটু হাল্‌কা হয়েছে। বাড়ী ফিরতে বিশেষ কষ্ট হবে না। কিন্তু আবার ভাবল, এভাবে মোটর খালি রেখে চলে যাওয়াটা বোধ হয় শোভন হবে না।

মনের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কখন যে অনিমেষ মোটরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বাসবীর খেয়াল নেই।

অনিমেষ মোটরের দরজাটা খুলতেই বাসবী চেঁচিয়ে উঠল, কে?

আমি। খুব শান্ত, ধীরকণ্ঠে অনিমেষ উচ্চারণ করল, তারপর চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন ষ্টার্ট করল।

মোটর ঘুরিয়ে চৌরাস্তার কাছ-বরাবর নিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, কিছু মনে করবেন না।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে অনিমেষকে জরিপ করার চেষ্টা করল।

দু' একটা চুল ঘামে ভিজে কপালের ওপর লেপ্‌টে রয়েছে। চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা।

গিটটা আলগা করে টাইটা অনেকখানি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনিমেষকে দেখে মনে হচ্ছে প্রবল একটা স্নায়ুযুদ্ধ শেষ করে সে ফিরে আসছে।

মোটরের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'ল। কোন কথা নয়। অনিমেষ এক ভাবে সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে সামনের পথ তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য ফেলে-আসা জীবন।

বেশ কিছুটা এগিয়ে অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় আর কপাল মুছে ফেলল, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কিছু টাকা আমার বিশেষ দরকার। যত চড়া সুদ দিতে হয়, আমি রাজী আছি, কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন অপমান আর আমার সহ্য হয় না।

এবারও বাসবী কোন উত্তর দিল না। বাসবীর কাছ থেকে এ খেদোক্তির উত্তরও অনিমেষ নিশ্চয় আশা করে না। অনিমেষ আর বেলাদেবীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করা বাসবীর পক্ষে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ।

মোটর ভবানীপুর এলাকার মধ্যে ঢুকতে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় নামবেন দয়া করে বলে দেবেন।

বাসবী জানে যে গলিতে তার বাসা, সে গলিতে মোটর ঢুকবে না। রিক্সাও যায় না। তা ছাড়া, ঠিক কোথায় সে থাকে সেটা অনিমেষকে জানতে দিতে সে নারাজ। খাতাপত্রে একটা ঠিকানা আছে, সেটুকুই থাক, ঠিকানার আসল চেহারা কি বীভৎস সেটা অনিমেষের দেখে দরকার নেই।

একটু এগিয়েই বাসবী বলল, বাঁদিকে রেখে দিন, আমি এখানেই নামব।

অনিমেষ মোটর থামাল। নীচু হয়ে বলল, কোন্ বাড়ী?

বাসবী হাসল, সে বাড়ী এখান থেকে দেখতে পাবার নয়। সদর রাস্তায় আস্তানা পাতার মতন ভাগ্য করি নি, আমাদের বাসা অপরিসর গলিতে।

চলুন না, একেবারে বাড়ীর সামনেই নামবেন।

দরজা খুলে বাসবী নেমে পথে পা দিল। অনিমেষের দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। চলি।

অনিমেষকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই বাসবী হন হন করে এগিয়ে গেল। আর একটু এগোলেই অপ্রশস্ত গলি মিলবে। যে পথে পায়ে-হাঁটা মানুষ ছাড়া কোন যানবাহনের যাবার উপায় নেই।

দিদি, ও দিদি।

বাসবী দাঁড়িয়ে পড়ল।

গলি ছোট হ'লে কি হবে, লোক চলাচলের কমতি নেই। সূর্যোদয় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জনাকীর্ণ।

কে তাকে ডাকল।

একটু এদিক-ওদিক চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল।

ফুটপাতের ধারে খোকন আর রুবি। দু'জনে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাসবী তাড়াতাড়ি ফিরে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কিরে, তোরা এখানে কেন?

খোকন বলল, মা'র জন্য মুড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে খোকন হাতের ঠোঙাটা তুলে দেখাল।

রুবি ছুটে এসে বাসবীর একটা আঙুল চেপে ধরল।

তুমি রাস্তায় বেরিয়েছ কেন রুবি?

বাসবী নীচু হয়ে দু' আঙুলে আলতো রুবির গাল টিপে দিল। রুবি কিছু বলল না, উত্তর দিল খোকন।

রুবি কাঁদছিল বলে, মা বলল, ওকে নিয়ে বের হ'তে।

বাসবী একটা হাত খোকনের কাঁধে রাখল। একপাশে ভাই, আর একপাশে বোন। বাসবীর সংসারের কিছুটা। তার ভবিষ্যৎ।

সমস্ত দিনের গ্লানি, অবসাদ, বিরক্তি এদের স্পর্শে সব যেন মুছে গেল। এদের জগতে বক্রোক্তি নেই, ঠোঁটের কুঞ্চন নেই, পরিহাসের সুর নেই। নির্মল, পবিত্র পরিবেশ।

দিদি তুমি মোটর গাড়িতে এলে? খোকন প্রশ্ন করল।

কি সুন্দর গাড়িটা দিদি! রুবির গলা।

সে কথার বাসবী কোন উত্তর দিল না। রুবিকে টানতে টানতে দ্রুত পায়ে চলতে চলতে বলল, তাড়াতাড়ি চল রুবি, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েই বাসবী দেখতে পেল মা বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তায়

বেরিয়েছে। স্বভাবতই মা একটু ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটো না ফেরা পর্যন্ত সংসারের অন্য কাজে মন দিতে পারছে না। অথচ এদের বাইরে না পাঠিয়েও উপায় নেই।

চাতালে পা দিতেই মা প্রশ্ন করল, কিরে তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরলি? টিউশনিতে যাস নি?

না মা, শরীরটা একটু খারাপ বলে সোজা বাড়ী চলে এলাম।

পাশ কাটাতে কাটাতে বাসবী বলল।

হ্যা মা, দিদির শরীর খুব খারাপ। দিদি গাড়িতে এল। খোকন মাকে বোঝাল।

বাসবীর পিছন পিছন সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকল।

তক্তপোশের পাশে ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে বাসবী সোজা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মা এসে তক্তপোশের এক প্রান্তে বসে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, তুই কি ট্যাক্সিতে এলি বাসী? শরীর খুব খারাপ।

খুব শ্রান্ত গলায় বাসবী বলল, না মা, ট্যাক্সিতে আসবার পয়সা কোথায়! ম্যানেজার এদিকেই থাকেন, শরীরটা খারাপ বলে তিনি নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

এ ঘরের বাতিটাও জ্বালান হয় নি। ঘরে ঢুকে বাসবীরই জ্বালান উচিত ছিল। সে জ্বালায় নি।

এখন শুয়ে শুয়ে বাসবী ভাবল ভালই করেছে। এই অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাবে না। ছলনার অভিনয়টুকুও ধরা পড়ার কোন ভয় নেই।

শুয়ে শুয়েই বাসবী বুঝতে পারল খোকন আর রুবি পাশের ঘরে চলে গেল। মা কিন্তু তখনও চুপচাপ বসে।

মা কিছু হয়ত প্রশ্ন করবে এই ভেবে বাসবী অপেক্ষা করল। মা কোন কথা বলল না। মনে হ'ল এই নিশ্ছিদ্র তমসার মধ্যেও বাসবীর মুখের সূক্ষ্মতম রেখাও মা'র কাছে সুপরিস্ফুট। মা'র চোখকে ফাঁকি দিতে বাসবী পারে নি।

তুই খাবি না কিছু?

অনেকক্ষণ পরে খুব আস্তে আস্তে মা বলল।

বাসবী উঠে বসল। খুলে-আসা চুলগুলো জড়াতে জড়াতে বলল, হ্যাঁ, খাব বই কি। একটু মাথার যন্ত্রণা ছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছি। তুমি চা ঠিক কর, আমি ধুয়ে আসি।

রাত্রে মা আর মেয়ে পাশাপাশি খেতে বসল।

খেতে খেতেই মা বলল, তোদের অফিসে আর কোন মেয়ে কাজ করে না বাসী?

একদিন ত তোমায় বলেছিলাম মা, আর একজন কাজ করে। কৃষ্ণা পালিত।

তাকে একদিন নিয়ে আসিস না আমাদের বাড়ী।

আমাদের বাড়ী? কেন বল ত? বাসবী রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

এমনি, দেখব তাকে।

বাসবী হাসল, সে তোমার মেয়ের চেয়েও দুর্ভাগা মা। আমাদের সংসারে প্রাচুর্য নেই, কিন্তু শান্তি আছে, কিন্তু কৃষ্ণার সংসারে দারিদ্র্য আর অশান্তি দুই আছে।

মা কোন কথা বলল না। নির্নিমেষ নয়নে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

আমার বাবা যেমন সংসারকে বাঁধবার জন্য নিজের শেষ রক্তবিন্দু পাত করতেন, কৃষ্ণার বাবা সংসারের শেষ রক্তটুকুও নিংড়ে নেন।

হেঁয়ালী রাখ বাসী, কি ব্যাপার বল।

ব্যাপার আর কি, কৃষ্ণার বাপের বদরোগ সব আছে। তার জের সামলাতে কৃষ্ণা প্রাণান্ত।

বাসবী আর কথাটা শেষ করতে পারল না। মা'র দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল মা'র দু' গাল বেয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছে।

নিশ্চয় সরে-যাওয়া মানুষটার কথা মনে পড়ছে। যে লোকটি সংসার-অন্ত প্রাণ ছিলেন। মায়া, মমতা, নিবিড় স্নেহে ভরপুর কোমল একটি সত্তা।

বাসবীর কোনদিন মনে পড়ে না, বাবা কাউকে ধমক দিয়েছেন বা চড়া গলায় কথা বলেছেন। অভাব আর অনটনের সংসারে অভিযোগ থাকেই। ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মেজাজ তিক্ত হয়ে ওঠে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটাও স্বাভাবিক।

কিন্তু বাসবীর বাবা মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেছেন। খুব অসহ্য যখন হয়েছে তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে মোড়ের পার্কে গিয়ে বসেছেন।

বাসবীর মা আক্ষেপ করেছে। এমন লোকের হাতে পড়ার জন্য ভাগ্যকে বার বার অভিসম্পাত দিয়েছে, কিন্তু আসল মানুষটাকে হাতের নাগালের কাছে পায় নি।

মানুষটা আজ চিরদিনের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাই বুঝি মা'র অশ্রু আর বাধা মানছে না।

কি করছ মা, খেয়ে নাও।

বাঁ হাত দিয়ে নিজের আঁচলটা টেনে বাসবী মা'র চোখের জল মুছিয়ে দিল।

মা'র খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাসবী একটি কথাও বলল না।

মা'র মুখ-হাত ধোয়া হ'তে বাসবী বলল, আচ্ছা মা, বাবা থাকলে আমি চাকরি করছি দেখে খুব সুখী হতেন, তাই না?

উনি থাকলে তোকে চাকরি করতেই হ'ত না।

মা ঝাঁটা হাতে রান্নাঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত হ'ল।

এই সময় মা আর মেয়েতে প্রতিযোগিতা সুরু হয়। কে কার আগে ঝাঁটা নিয়ে রান্নাঘরের সংস্কার সুরু করবে। পারতপক্ষে মা বাসবীকে ধারে-কাছে আসতে দেয় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে বাসবী বিশ্রাম করুক। তাকে আর সংসারের কাজ করতে হবে না।

বাসবীও নাছোড়বান্দা। ঝাঁটা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে।

আজ কিন্তু বাসবী কিছু করল না। নিজের এঁটো থালাটা কলতলায় রেখে মুখ-হাত ধুয়ে চৌকাঠে বসল।

অন্য একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধেছে। কথাবার্তা সে বলছে বটে, কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে চড়া রং-মাখা একটা মুখ ভেসে উঠছে মাঝে মাঝে। ভ্রূকুটি, কুঞ্চন আর বিদ্রূপের রেখায় সে মুখের ভাব বাসবীর কাছে অসহ্য।

রান্নাঘর ঝাঁট দিতে দিতে মা বলল।

তিনি থাকলে তুই যেমন পড়ছিলি তেমনই পড়তিস।

পড়া ত একদিন শেষ হ'ত মা।

পড়া শেষ হ'লে ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিতেন। আমাদের সামর্থ্য কম। অনেক টাকা আমরা ঢালতে পারতাম না, কিন্তু টাকার অভাব বিদ্যা দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করতাম। সেই জন্যই তিনি এত কষ্টের মধ্যে তোকে পড়িয়েছেন।

না মা, তুমি জান না। বাবার মনে মনে কি ইচ্ছা ছিল, আমি জানি। তাঁর সাধ ছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখে তাঁকে সাহায্য করবে। স্কুলে হোক, অফিসে হোক, যেখানে হোক একটা চাকরি নিয়ে সংসারের অভাব পূরণ করবে। সংসারের ভার তিনি আর সামলাতে পারছিলেন না।

কি জানি মা, আমার ত তা মনে হয় না। অবশ্য এ নিয়ে আমার সঙ্গে কোনদিন কথা হয় নি। তবু আমার মনে হয় মেয়ের রোজগারে খাবার কথা তিনি ভাবেন নি।

কি ভাবে মা কথাটা বলেছিল, মা-ই বলতে পারে, কিন্তু পলকে বাসবীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

তা হ'লে মা'র মনের কথাটাই কি এ ভাবে প্রকাশ পেল। মা কি সুখী নয়! এ ভাবে বাসবী নিজেকে নিঃশেষ করে সংসারের রসদ জোগাচ্ছে তবুও মা তৃপ্ত নয়।

না, তা নয়। বাসবী নিজের মনকে বোঝাল।

মা ভয় পেয়েছে। এ বংশের মেয়েরা কোন দিন কেউ বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে জীবিকা অর্জনে ব্রতী হয় নি। মেয়েদের বাইরে বেরোবার অসুবিধা অনেক। দেহলোভী নরপিশাচের দল ভদ্রলোকের আবরণে শরীর ঢেকে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। একটা মেয়ের পদস্খলন হ'তে বিশেষ দেরি হয় না। একবার একটু অসাবধান হ'লেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মা'র ভয় সেইখানেই।

ম্যানেজারকে মা'র ভয়। মা'র ভয় দীপককে। আসল কথা বাসবীর ওপর মা আস্থা হারিয়েছে। তাকে বুঝি আর বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না।

বাসবী তর্ক করল না। রোজগারের ব্যাপারে ছেলে আর মেয়েতে যে কোন প্রভেদ নেই সেটা প্রতিপন্ন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল না।

শুধু হাই তুলে বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে মা, শুয়ে পড়ি।

মা'র উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাসবী নিজের ঘরে ফিরে এল। বাতিটা নিভিয়ে তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ল।

মশারিটা ফেলতে পারলে ভাল হ'ত কিন্তু সেটুকু পরিশ্রম করতেও বাসবীর ইচ্ছা হ'ল না।

পরের দিন অফিসে গিয়েই প্রথমে বাসবী কৃষ্ণার কাছে গেল।

কৃষ্ণা কিছু বলবার আগেই বলল, তোমার বাবার কথাটা কাল আমি ম্যানেজারকে বলেছি।

অনেক ধন্যবাদ। আমি থানায় গিয়ে শুনলাম বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মিষ্টার রায় ও. সিকে টেলিফোন করেছিলেন।

অনিমেষ বাইরে, কাজেই সারা অফিসে বেশ একটু ঢিলেঢালা ভাব। টেলিফোন-এক্সচেঞ্জেও খুব ব্যস্ত নয়। কৃষ্ণার কাজও অনেক কম।

বাসবী টেবিলের একটা কোণ চেপে বসল।

একটা কথা কৃষ্ণা।

কি?

আমি ম্যানেজারকে বলার আগেই তিনি শ্যামপুকুর থানায় ফোন করেছিলেন। কাজেই আমার কৃতিত্ব কিছু নেই।

কৃষ্ণা ভ্রূ কুঁচকে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

তোমার কাছে ব্যাপারটা শুনেই তিনি ফোন করেছিলেন।

তুমি বলার আগে?

হ্যাঁ, তাইত বলছি। আমি কিছুই করি নি। যা করার ম্যানেজারই করেছেন।

কিন্তু আমার মাথাটা একেবারে হেঁট হয়ে গেল। এত দিন বাড়ীর কথা অফিসের কেউ জানত না। শুধু তোমাকে একটু বলেছিলাম, কিন্তু এবার ম্যানেজার পর্যন্ত জানলেন আমার বাবা মাতাল। ছি, ছি, কি লজ্জা!

বাসবী কিছু বলবার আগেই বাইরের ফোন এল।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি ধরল। কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনল, তারপর বলল, বুঝেছি, কিন্তু মিষ্টার রায় মানে ম্যানেজার নেই। কাকে? বাসবী সেন, ও, আচ্ছা একটু ধরুন।

কৃষ্ণা বাসবীর দিকে ফিরে বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

কে? বাসবী বিস্মিত হ'ল।

বেলাদেবী, মানে ওই আগে যিনি ম্যানেজারের স্ত্রী ছিলেন।

কিন্তু আমার সঙ্গে কি কথা?

বাসবীর কণ্ঠ কেঁপে উঠল। কিছুতেই গলার স্বর স্বাভাবিক করতে পারল না।

কি জানি, নাও?

কৃষ্ণা টেলিফোন এগিয়ে দিল।

হাতটা প্রসারিত করতে গিয়ে বাসবী বুঝতে পারল সারা দেহটাই থরথরিয়ে কাঁপছে।

আমি বাসবী সেন কথা বলছি।

কাঁপা কাঁপা গলায় বাসবী বলল।

বাসবী, তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোটই হবে। 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে কর না। একটু দ্রুত এগোচ্ছ তুমি। এখনও সাবধান হও। আমি যে আগুনে পুড়েছি, সে আগুন তোমায় ক্ষমা করবে না।

খটাস করে তারের ও-প্রান্তে একটা শব্দ হ'ল। তার মানে, বেলাদেবী কথা শেষ করেই টেলিফোন রেখে দিয়েছে। বাসবীর বক্তব্য শোনার কোন আকাঙ্ক্ষা তার নেই।

কিন্তু সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসবীর সারা মুখ পাংশু হয়ে গেল। মুখ তুলে কৃষ্ণার দিকে চাইতে পর্যন্ত পারল না।

কি বলল বেলাদেবী?

কৃষ্ণা প্রশ্ন করল।

বাসবী বার দুয়েক ঢোক গিলল। দ্রুত চিন্তা করে নিল মনে মনে। কি বলবে কৃষ্ণাকে। কি উত্তর দিলে সে সন্দেহ করবে না।

যে-কথা বাসবী কৃষ্ণার কাছেই একবার শুনেছিল, সেটাই ফেরত দিল।

মিষ্টার রায়ের কাছে কি টাকা পাওনা আছে, সেই কথা বলছিলেন।

তোমাকে? বিস্মিত কৃষ্ণা একদৃষ্টে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

কেন বল ত? কোথায় কার কি বাকি আমি তার কি জানি।

বাসবী চোখে-মুখে সারল্যের ভাব ফোটাল।

তোমাকে ম্যানেজারের সঙ্গে কোথাও দেখেছে বোধ হয়।

আমাকে? আমাকে কোথায় দেখবে?

কথাটা বলেই বাসবীর মনে পড়ে গেল। ম্যানেজারের মোটরে বাসবী যে কয়েকদিন এসেছে এ খবর অফিসের অনেকেরই জানা। দু'একজন চোখেও দেখেছে। কাজেই সেটা নিশ্চয় কৃষ্ণার অজানা নেই।

তাই বাসবী সামলে নিয়ে বলল, দু'একদিন আসার সময় ম্যানেজার আমাকে লিফ্ট দিয়েছেন, সেই সময় সম্ভবত বেলাদেবীর চোখে পড়ে থাকবে।

বেলাদেবীর বোধহয় ধারণা ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, সেই সম্পর্কের জোরে পুরোণো দেনাটা তিনি মিটিয়ে দিতে বলছেন।

বাসবী চমকে উঠল। মুখ তুলে দেখল কৃষ্ণা হাসছে। তা হ'লে কথাটা পরিহাস। তবু এ ধরনের পরিহাস শুনতে বাসবীর ভাল লাগে না।

বাসবী টেবিল থেকে নেমে পড়ল।

চলি কৃষ্ণা, কাজে বসি গে যাই।

কৃষ্ণার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাসবী এগিয়ে গেল।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতেই নিশিবাবু বলল, গোটা দুই দরকারী চিঠি এসে পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর, ও দুটো আগে এ্যাটেণ্ড করুন।

বাসবী কাজে মন দিল।

মুখ না তুলেই বুঝতে পারল বাসববাবু বার দুয়েক টেবিলের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করল। বাসবী খুব ব্যস্ত দেখে কথা বলতে আর সাহস করল না।

একটা ফাইল নিয়ে বাসবী নিশিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখুন ত, এই ফার্মটা বোধ হয় নাম বদলেছে। আগে ছিল কাপুর এণ্ড সন্স এখন হয়েছে কাপুর ইঞ্জিনীয়ারীং সিণ্ডিকেট। এই মর্মে একটা চিঠিও বোধহয় দিয়েছিল। তাই না?

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে নিশিবাবু বলল, ম্যানেজারের ফিরতে দিন পাঁচেক দেরি হবে।

বাসবী অবাক হ'ল। ম্যানেজারের ফিরতে দেরি হোক না হোক তাতে বাসবীর কি প্রয়োজন? না কি নিশিবাবুর এ কথার মধ্যেও কোন প্যাচ রয়েছে।

মনের কথা বাসবী মুখেই প্রকাশ করে ফেলল। এই কথাটা নিশিবাবুই একবার বলেছিল।

দেখুন আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কি?

কলমের উল্টো দিক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে নিশিবাবু একটা চোখ কুঁচকে হাসল, জাহাজে যদি আদা চালান আসে তা হ'লে আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খোঁজ রাখতে হয় বই কি।

বিরক্ত হয়ে উঠল বাসবী। সমস্ত অফিসের লোকের কেবল এক চিন্তা। এক ধারণা। সকলেই ভেবে বসে রয়েছে যে, অনিমেষ রায়ের সঙ্গে বাসবী সেনের গোপন অথচ মধুর একটা সম্পর্ক বুঝি গড়ে উঠছে। কত সহজেই এরা গভীর সমস্যারও সমাধান করে ফেলে। একটু মিষ্টি কথা, বার দুয়েকের দৃষ্টি বিনিময়, ব্যস্, নারী-পুরুষের আদিম একটা সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়ে গেল। সব চেয়ে জটিল সম্বন্ধের এত সহজে এরা রূপনির্ণয় করে।

কিন্তু সুরু থেকেই আপত্তি করা উচিত। নয়ত সকলের মনে একটা ভুল ধারণা থেকে যাবে। অনিমেষ রায়ের সঙ্গে বাসবী সেনের প্রকৃত সম্পর্ক, একই অফিসের একজন ম্যানেজার আর একজন কনিষ্ঠতমা কেরাণী, এ ছাড়া আর যে কিছুই নয়, এটা ভাল করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রতিবাদ না করলে সবাই এই মিথ্যাটাকেই সত্যের আবরণ পরাবে, সত্যের আকৃতি দেবে।

আপনার কথাটার মানে? আমার সঙ্গে ম্যানেজারের কি সম্পর্ক?

বিরক্তির ঝাঁজটা বাসবীর কথায় ফুটে উঠল।

নিশিবাবু আকর্ণ হাসল, শুধু আপনার সঙ্গে কেন আমাদের সকলের সঙ্গেই ত ম্যানেজারের সম্পর্ক। ম্যানেজার দেরি করে আসা মানেই ত আমাদের বিশ্রাম। গোটা অফিসটার চেহারা দেখছেন না? ঠিক যেন মনে হচ্ছে অফিসটা হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে আলস্যের রোদ পোহাচ্ছে। কোন ব্যস্ততা নেই, ডিসিপ্লিনের বালাই নেই।

বাসবী আস্তে আস্তে সরে গেল।

নিশিবাবু অত্যন্ত চতুর লোক। তার তল পাওয়া দুষ্কর। সকালের দিকে বাসবী কুক্কার কাছে কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করেছে কথাবার্তায় সেই ইঙ্গিতই দিল কি না কে জানে!

এ নিয়ে আর আলোচনা না করাই শ্রেয়। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়ত প্রসারিত ফণা ভুজঙ্গেরই সাক্ষাৎ মিলবে। তার চেয়ে বুঝতে না পারার ভান করাই সমীচীন।

বাসবী আবার কাজে মন দিল।

একটু পরেই অফিস একটু তটস্থ হয়ে উঠল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘরে ঢুকছেন। পিছনে বেয়ারা।

সকালে এসেছিলেন, তার পর কি কাজে বুঝি বেরিয়েছিলেন। আবার ফিরলেন।

নিশিবাবু ফাইল নিয়ে ভিতরে ঢুকল। আধ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত। এখন আর নিশিবাবু বের হবে না।

বাসবী একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে নিল। টিফিন হ'তে এখনও আধ ঘণ্টা।

হাতে গোটা দুই ফাইল রয়েছে। সেগুলো শেষ করতে করতেই দেড়টা বেজে যাবে।

বাসবী মাথা নীচু করে কাজ করছিল, হঠাৎ ফাইলের ওপর একটা ছায়া।

বাসবী মুখ তুলল না। মুখ না তুলেও কার ছায়া বুঝতে পারল। বাসববাবু এসে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় কাল কিংবা পরের শনিবার তার থিয়েটার। বাসবীকে একটা কার্ড দেবে আর যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করবে।

হৈ-হল্লা করে বেড়াতে বাসবীর ভাল লাগে না। নিজের টলমলে সংসারের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলেই, তার মনে হয় শুধু উপার্জন আর উপার্জন। যেভাবে হোক টাকা উপায় করে সংসারকে বাঁচাতে হবে। এ ভাবে মুখ গুঁজে দারিদ্র্যের ছেঁড়া কাঁথায় সর্বাঙ্গ জড়িয়ে পশুর মতন বাঁচা নয়, সুস্থ, সবলভাবে মানুষের মতন প্রাণ ধারণ করা।

যতদিন না সংসারকে বাসবী সে অবস্থায় আনতে পারছে, ততদিন বিলাসব্যসনে যোগ দেবার তার কোন অধিকার নেই।

খুব ব্যস্ত রয়েছ মা?

চমকে বাসবী মুখ তুলল।

টেবিলের পাশে মহীতোষবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই ভদ্রলোক যেন সত্যযুগ থেকে ছিটকে আজকের পঙ্কিল, আত্মসর্বস্ব জগতে এসে পড়েছে। কোন ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই, নির্বিবাদী মানুষ।

সারা অফিসে এই একটি লোককেই বাসবী অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে।

ও, আপনি, কি বলুন ?

ঠিক আছে মা, তুমি হাতের কাজটা শেষ করে নাও। আমি দাঁড়িয়ে আছি।

না, না, এমন কিছু দরকারি কাজ নয়। বলুন আপনি।

ফাইল সরিয়ে বাসবী ঘুরে বসল। মহীতোষবাবুর দিকে চেয়ে।

সামনের রবিবার তোমার সময় হবে মা ?

রবিবার ? কেন বলুন ত ? কি ব্যাপার ?

না, ব্যাপার কিছু নয়, মহীতোষবাবু আড়ষ্টভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না, সন্ধ্যার দিকে আমার বাড়ীতে চ'টি খাবে।

আপনার বাড়ী ? নেমন্তন্নটা কিসের ?

মহীতোষবাবু চেষ্টা করেও কথা বলতে পারল না।

কারও বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নাকি ?

না, না, মহীতোষবাবু আরও সঙ্কুচিত হ'ল, আমার ত ছেলেমেয়ে নেই, কাজেই বিয়ে-পৈতের ব্যাপার নয়।

তবে ?

মহীতোষবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে বাসবী খুব পুলক অনুভব করল। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যটা কি ? কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মহীতোষবাবু যুবজনোচিত লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে।

সে এক বিশ্রী ব্যাপার, মহীতোষবাবু মৃদু কণ্ঠে অন্যদিকে চেয়ে বলতে লাগল, মানে, আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে এই রবিবারে, তাই গৃহিণীর ইচ্ছা—

বাসবীর হাসির দমকে মহীতোষবাবু কথাটা আর শেষ করতে পারল না। তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারে ফিরে গেল।

বাসবীর হাসতে খুব ভাল লাগল। নির্মল, অনাবিল হাসি। এ যুগের মাপা হাসি নয়। এ অফিসের সকলের কথাতেই খোঁচ আছে, হাসিতে কৃত্রিমতা, শুধু এই একটি মানুষ ব্যতিক্রম। একেবারে সহজ মানুষ। ঈর্ষা নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই।

তাই বাসবী এর কথায় এমন ভাবে হাসতে পারল।

বাড়ী গিয়েই বাসবী মাকে কথাটা বলল।

সামনের রবিবার আমার নিমন্ত্রণ মা।

মা খোকনকে পড়াচ্ছিল। রুবি পাশে বসেছিল।

বিবর্ণমুখে নিরুত্তেজ গলায় বলল, কোথায়, ম্যানেজারের বাড়ী ?

হাসি পেল বাসবীর। ম্যানেজারভীতি মা'র মন থেকে এখনও দূর হয় নি।

হেসে বলল, ম্যানেজারের বাড়ী কি আর কেরাণীর নিমন্ত্রণ হয় মা। সামাজিকতাটা সমানে সমানেই হয়। আমার নিমন্ত্রণ মহীতোষবাবুর বাড়ী।

মহীতোষবাবু ?

মা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল।

বাসবী বুঝতে পারল মা কল্পনায় মহীতোষবাবুর একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে। কত বয়স, দেখতে কেমন, স্বজাত কি না।

এ নামটা মা'র কাছে নতুন। 'অনিমেষ রায় আর দীপক গুপ্তর নামই শুনে এসেছে। দীপককে ত দেখেওছে নিজের চোখে। মা ভাবছে, বাসবীর জীবনে এই বুঝি তৃতীয় আর একটি ব্যক্তি প্রবেশ করল।

ভাবছে আর বিস্মিতও হচ্ছে।

যে কলেজে বাসবী পড়েছে সে কলেজে সহশিক্ষা ছিল। ছেলেরাও পড়ত বাসবীর সঙ্গে। কিন্তু কোন ছেলেকে সঙ্গে করে বাড়ী আনা দূরে থাক, কোনদিন কোন পুরুষ সহপাঠীর নামও মুখে আনে নি।

অবশ্য দিনকালও অনেক বদলেছে। সংসারের চেহারাও।

আগে বাড়ীর কর্তা জীবিত ছিলেন। খুব শান্ত, নিরীহ ধরনের মানুষ, কিন্তু কোন কদাচার কখনও সহ্য করতেন না। মুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু প্রচ্ছন্ন একটা কর্তৃত্ব ছিল সকলের ওপর।

সে মানুষটি চিরদিনের জন্য অপসারিত।

তা ছাড়া আজকাল সংসার চলেছে বাসবীর উপার্জনে।

বাকি তিনজন অন্নবস্ত্রের জন্য তার দিকেই চেয়ে আছে। সে অন্যায় করলেও, বিপথে চললেও বলার অধিকার কারও নেই। তা হ'লেই বিরোধ বাধবে।

অবশ্য এ পর্যন্ত বাসবী এমন কিছু করে নি যার জন্য তাকে দোষারোপ করা যেতে পারে। বাইরে বের হ'লে পুরুষ মানুষের সঙ্গে মিশতেই হবে, বিশেষ এক অফিসে পাশাপাশি বসে যখন কাজ।

সেজন্য মা'র বলার কিছু নেই, কিন্তু বাসবীর মুখ-চোখের চেহারা দেখে মনে হয় সে যেন কিছু লুকাচ্ছে। যতটুকু মাকে বলে, তার চেয়ে অনেক বেশী সে বলে না। মনের মধ্যে চেপে রাখে।

সেইখানেই মা'র আপত্তি। মা'র ভয়।

মা'র থমথমে মুখের অবস্থা দেখে আসল কথাটা বাসবী বলেই ফেলল।

কিসের নিমন্ত্রণ জান মা ?

তুমি না বললে জানব কেমন করে।

মা'র মনের মেঘ যে কাটে নি সেটা গলার আওয়াজেই বোঝা গেল।

মহীতোষবাবুর বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হ'ল, তাই উৎসব।

মা'র মুখের অন্ধকার একটু কমল, কিন্তু মা আর এক প্রশ্ন করল।

তোমার মহীতোষবাবু খুব বড়লোক বুঝি?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য বাসবী ঠিক বুঝতে পারল না।

কেন, খুব বড়লোক হ'তে যাবে কেন?

না হ'লে আর বিয়ের পঁচিশ বছর ঘটা করে পালন করেন।

মা'র দুঃখটা এবারে বাসবী বুঝল। নিজের বিবাহিত জীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কোন উৎসব ত দূরের কথা, কবে নিঃশব্দে যে সে পরম লগ্ন পার হয়ে গেছে মা জানতেও পারে নি। বাড়ীর মানুষটিও নয়। প্রথম যৌবনের সব মধু দারিদ্র্যের স্পর্শে গরলে রূপান্তরিত হয়েছিল। অভাব, অভাব আর অভাব। সহস্র-ছিন্ন সংসারের রিপু করতে করতে, কোথা দিয়ে বসন্ত বিবাগী হয়ে গেছে, খেয়াল নেই।

দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য কোনদিন বিশেষ হয় নি, কিন্তু অভাবের তাড়নায় দু'জনে দু'জনের ঘন সান্নিধ্যলাভেও বঞ্চিত হয়েছে।

কি ব্যাপার জান মা, বাসবী বলতে লাগল, ভদ্রলোকের ছেলেপুলে নেই, কেবল স্বামী আর স্ত্রী, কাজেই কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মা কিছু বলল না। চুপ করে শুনল।

বাসবী বাথরুম থেকে ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি দিবি?

বাসবী থমকে দাঁড়াল। এ কথাটা এতক্ষণ তার কিন্তু মনে হয় নি। কিছু একটা দেওয়া দরকার। একেবারে খালি হাতে ত যাওয়া চলে না।

কি দিই বল ত মা?

আমি কি বলব? আমাদের সময়ে কি এ সব ছিল?

তবে ত মুস্কিল হ'ল।

মুস্কিল আর কি, অফিসের আরো সবাই ত যাবে। খোঁজ করিস তারা কে কি দেবে। সবাই মিলে চাঁদা তুলে দিলে তোর খরচও কম পড়বে, জিনিষটাও ভাল হবে।

ঠিক বলেছ। কালকের দিনটা ত হাতে আছে, কাল কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করব।

মা বাসবীর খাবার আনতে রান্নাঘরে চলে গেল। বাসবী তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল, হঠাৎ গায়ে আলতো স্পর্শ লাগতেই চমকে উঠল।

কে রে?

রুবি বাসবীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

বাসবী আদর করে রুবির গালদুটো টিপে দিল।

আমার রুবি সোনার কি খবর?

রুবি দিদির দিকে আর একটু সরে এল।

নেমন্তন্ন বাড়ীতে অনেক ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায়, না দিদি।

হুঁ, খাওয়ায় বই কি।

অনেক রকমের মিষ্টি।

হ্যাঁ।

রাবড়ি খাওয়ায়?

তা খাওয়াতে পারে বৈ কি।

রুবি একেবারে দিদির গায়ের ওপর এসে পড়ল। বাসবীর হাঁটুতে গালটা ঘষতে ঘষতে বলল, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে দিদি? আমার আলাদা পাতা চাই না, তোমার সঙ্গে খাব।

বাসবী নীচু হয়ে রুবিকে নিজের কোলে তুলে নিল। তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলল, আমি সামনের মাসে মাইনে পেলেই তোর জন্য রাবড়ি নিয়ে আসব রুবি। ঠিক নিয়ে আসব। আমি যেখানে নিমন্ত্রণ খেতে যাব সেখানে রাবড়ি হবেই না। শুধু ভাত, ডাল, এই সব।

রুবির মুখ দেখে মনে হ'ল দিদির প্রতিশ্রুতির ওপর সে খুব আস্থা রাখতে পারছে না।

এর আগেও দিদি কয়েকবার রাবড়ি আনার কথা বলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনে নি। ঠিক কোন্ তারিখে দিদি মাইনে পায় সেটা রুবির জানা নেই।

সে যখনই মনে করিয়ে দিয়েছে, বাসবী আক্ষেপ করেছে, আহা, আর ক'দিন আগে যদি মনে করিয়ে দিতিস, মাইনের টাকা যে সব ফুরিয়ে গেল। ওই দেখ না খোকনের একটা ব্যাগ কিনতে হ'ল, মা'র জন্য শাড়ী আর জুতোটায় হাফসোল দিতে হ'ল। এর পরের মাসে ঠিক নিয়ে আসব তোর জন্য।

নিয়ে আসবার চেষ্টা যে বাসবী করে নি, এমন নয়। দোকানের সামনে গিয়েও ফিরে এসেছে। রাবড়ির সের ছ' টাকা। তার নীচে আর নামে নি। মনে মনে ভেবেছে বিয়ের লগ্নগুলো পার হয়ে গেলে দাম একটু কমে যাবে, তখন কিনবে। কিন্তু বিয়ের লগ্নের শেষেও দামটা তার নাগালের মধ্যে আসে নি।

এবার রুবির মুখের দিকে চেয়ে বাসবী আবার প্রতিজ্ঞা করল, এবার মাইনে পেলে রুবির জন্য রাবড়ি একটু আনবেই। যতটুকুই হোক।

খোকনও কাছাকাছি ছিল। তাকে বাসবী ডাকল।

খোলা বই হাতে নিয়ে খোকন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দিদির দিকে মুখ তুলে।

কার মতন দেখতে হয়েছে খোকন? বাবার মতন, না মা'র মতন! কিংবা বুঝি নিজেরই মতন।

এই খোকন একদিন বড় হবে। নিজের দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দিদির কাঁধ থেকে সংসারের জোয়াল তুলে নেবে নিজের কাঁধে।

কিন্তু সে কবে? কতদিন পরে?

ততদিনে বাসবীর চুলে রুপোলী স্পর্শ লাগবে। মুখে বার্ধক্যের কয়েকটা আঁচড়। সময়ের স্বাক্ষর। তখন ঘর বাঁধবার, নিজের সংসার সাজাবার সাধ কোথায় মিলিয়ে যাবে, ঠিক আছে।

'কবে খেয়ে নে। মা মনে করিয়ে দিল।

খাচ্ছি মা। বাসবী চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, খোকনের কথা ভাবছি মা।

'ক ভাবছিস?

খোকন কবে বড় হবে, মানুষ হবে। পরিশ্রম থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দেবে।

মা তক্তপোশের এককোণে মেয়ের পাশে বসল।

ও সব আর আমায় দেখতে হবে না। তার অনেক আগেই আমি চলে যাব। খোকন আর রুবিকে তুই দেখবি। খোকনটা যেন মানুষ হয়, রুবি ভাল ঘরে পড়ে, ব্যস, মধ্যবিত্ত মানুষ এর চেয়ে আর কি বেশী কামনা করে।

'ক জানি কি কামনা করে। বাসবী ভাবল। মধ্যবিত্ত কামনার শেষ নেই। সম্বল, সামর্থ্য পরিমিত, তাই বুঝি কামনাও আকাশচুম্বি। যা পায় না, পাবার কোন আশা নেই সেইদিকে লোভের হাত বাড়ায়। নিজের চিন্তার ধরন দেখে বাসবী নিজেই চমকে উঠল।

সেও লোভের হাত বাড়ায় নি নাগালের বাইরের বস্তুর দিকে। অনিমেষ রায়ের সঙ্গ আর সাহচর্য তার ভাল লাগে একথা জোর গলায় সে বলতে পারে। পথের পাশে প্রতীক্ষা করতে করতে পরিচিত হর্ণের শব্দ শুনে সে কি শুধু চমকেই ওঠে, সারা শরীরে রোমাঞ্চের হিল্লোল বয়ে যায় না!

অনিমেষ রায় তার মোটরে ওঠার আহ্বান জানালে, বাসবী কি শুধু পথশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দেই পুলকিত হয়! আর কিছু নয়!

অমন একটা কৃতী পুরুষের সঙ্গে জীবন জড়াতে তার সাধ হয় না! কেবল বুঝি অফিসে নিজের উন্নতির জন্যই বাসবী অনিমেষের সান্নিধ্য কামনা করে, আর কিছু নয়! পৃথিবীর সব লোককে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে যায় না। বাইরের সকলকেই যা খুশী একটা বোঝানো যায়, কিন্তু নিজের হৃদয়ের কাছে অনৃতভাষণ চলে না।

আরও একটা কথা, নারীর চোখ এ বিষয়ে ভুল দেখে না। বেলাদেবী ভুল দেখে নি। দেখে নি বলেই সাবধান করে দিয়েছে।

বাসবী উঠে পড়ল।

বাইরে গিয়ে বারান্দা ধরে দাঁড়াল। উন্মুক্ত আকাশ। নক্ষত্রখচিত নয়। অন্ধকার। বাসবীর জীবনের মতনই। তবু এটুকু আছে বলেই যেন বাসবী বেঁচে আছে। বদ্ধ ঘরের পরে অবারিত এক টুকরো আকাশ।

দূরে কোথায় রেডিয়োর গান সুরু হয়েছে। কে একজন কাতর কণ্ঠে ডাকছে যৌবনের সাথীকে। মিলন-বাসর যাতে বৃথা না যায়।

বাসবী সরে এল। মেয়েকেরাণীর জীবনে বুঝি যৌবন আসে না। প্রকৃতির নিয়মে দেহে হয়ত আসে, কিন্তু মনে আসা পাপ। যৌবনের দেবতা অন্ধ, কিন্তু বাসবীদের জীবনে এ দেবতা শুধু অন্ধ নয়, খঞ্জও। স্খলিত পায়ে আসে। পদক্ষেপে কোন দৃঢ়তা নেই, বলিষ্ঠতা নেই।

একটা কান্নার সুর কানে আসতেই বাসবী টান হয়ে দাঁড়াল।

মা বুঝি আবার কাঁদতে সুরু করেছে। বাবার ফটোটার ওপর চোখ পড়লেই মা চোখে আঁচল চাপা দেয়। কান্নাসম্বল জীবন, এ ছাড়া তার আর কিছু নেই।

আশ্চর্য লাগে বাসবীর। এরা সবাই একই পৃথিবীর বাসিন্দা ভাবতেও বিস্মিত হয়। যারা রেডিয়োতে যৌবনের গান শুনে সময় কাটাচ্ছে, আর যারা বাসবীদের মতন এমনি অপরিসর প্রকোষ্ঠে অশ্রুসিক্ত জীবন যাপন করে চলেছে।

এগোতে গিয়েও বাসবী থেমে গেল। না, কান্না নয়, মা গান গেয়ে রুবিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। গানেও যেন কান্নার রেশ। অচিন দেশের রাজপুত্র এসে রুবিকে তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুলে নেবে।

যে রাজপুত্র বাসবীর জীবনে এল না, সে রুবির জীবনে আসুক। রূপকথার রাজপুত্র নয়, সরকারী অফিসের পাকা চাকরি কোন সম্ভ্রান্ত কুমার।

(ক্রমশঃ)

প্রাণের স্পর্শ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহারা জীবনের "থ্রি স্কোর এ্যাণ্ড টেন" অর্থাৎ তিনকুড়ি দশ বৎসর পার করিয়া বাকী ক'টা দিন শেষ যাত্রার জন্য গণিয়া কাটাইতেছেন, তাঁহারা অনেক কিছু নূতন পাইতেছেন, যাহা তাঁহাদের কৈশোর ও যৌবন-কালে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই সকল বৃদ্ধদের ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অধিকাংশই অতীতের তুলনায় সবই মন্দ, এমন কি মন্দতর হইতেছে বলিয়া মত দিবেন। কারণ তাঁহাদের দৃষ্টি অতীতের দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া নূতনের আস্বাদে আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই।

হয়ত একথা যুক্তিসহ নহে। যাহা গিয়াছে তাহার তুলনায় ভাল কিছুই হয় নাই, এ কথা বলায় বিরাট তর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। কিন্তু যদি বলা যায় যে শতবর্ষ পূর্ব্বে যে-সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সংখ্যক মহাগুণের অধিকারীরূপে দেখা যাইত, তাহা আজ নিতান্ত বিরল। তাঁহারা বিদ্যা, বিনয়, জ্ঞান, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে যে বিরাট আসন পাতিয়া আত্ম-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, গত ষাট বা তাহারও অধিক-কালের মধ্যে সেরূপ কোনও মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কালে বাঙ্গালীর পরিবার সন্তানলাভে সমৃদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু খাঁটি "মানুষ"-লক্ষণযুক্ত লোক একটিও ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া কোনও গুজব পর্য্যন্ত নাই।

যাহারা 'তিনকাল পার' করিয়াছে, তাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল ঐ সকল মহাপুরুষদের সমকালীন বলিয়া গৌরব লাভ করিতে, সান্নিধ্যে আসিয়া ধন্য হইতে, তাঁহাদের যশের পরিব্যাপ্তিতে বাঙ্গালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে। এই সকল পূর্ণ মানুষের অনেকেই ছিলেন দরিদ্র শিক্ষক। যে 'মাষ্টারি' করিলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যাদানে চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, তাঁহারা ছিলেন সেই 'মাষ্টার মশাই।' একই সঙ্গে তিন 'মাষ্টার' বাঙ্গলার যশোসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকে যে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে তিনজন অতি সাধারণ লোকেরও নিকট অতি-সাধারণ তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতে মনে পুলকের সঞ্চার হয়।

আজ কোন্ প্রকৃত বাঙ্গালী তিন দরিদ্র শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নাম সগৌরবে গ্রহণ করবে না? বলা বাহুল্য যে ঐ যুগের পাঠশালা ও পাঠার্থীদের ভাগ্য ছিল বড় অনুকূল —রামতনু লাহিড়ী, দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, এমন কি তার কিছু পূর্ব্বে গেলেও ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মা প্রভৃতি। এ তালিকা অতি দীর্ঘ, বর্ত্তমানে তাহা অবান্তর।

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় মনে আসিয়া প্রথমে স্থান গ্রহণ করিবার দাবি পেশ করিল। যাহারা ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল কি অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধা যে তাহাদের মুগ্ধ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত তাহার একাংশও আজ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ শ্রদ্ধা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অন্তরে অনুভূতির বস্তু। একটা সামান্য উদাহরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু প্রকাশের পূর্ব্বেই তাহার ভাষা পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। উমেশচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার, রামানন্দ প্রভৃতি নামই মনের মধ্যে তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত স্নেহ, শিক্ষা, সম্মান, সখ্য প্রভৃতি ভাবের উৎস খুলিয়া দেয়। মনে হয় একবার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে প্রস্রবণের মুখ হইতে প্রেম সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই সৌম্য মূর্ত্তি, যাহা ভক্তি-স্পর্শে মহনীয় মনোহারী হইয়াছে। একবার সামনে দেখিলেই মনে হইত যেন হৃদয়-কন্দর উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য কাহারও হয় না; কিন্তু মনে হইয়াছে, ইঁহারা তদপেক্ষা করুণাময়, কারণ সশরীরে আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছেন। মনে হয় যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কথা, কার্য্যে নিরত অবস্থা, গভীর বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কথা ভাবিয়া গতি মন্থর হইয়া উঠিত। মন যত ছুটিয়া কাছে আসিবার জন্য লালায়িত হইত, অনুপাতে পদের গতি শ্লথ হইত। অথচ কারণ ছিল না, দু'টি কথা "এসো, বসো।" তাহাতেই প্রাণ আনন্দে গর্ব্বে ভরিয়া উঠিত।

মানুষের নিকট উপকার পাইলে, পাইবার আশা থাকিলে স্বার্থ সিদ্ধ হইলে বা সম্ভাবনা থাকিলে, বা অতীত উপকার স্মরণ করিবার মত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতালেশ

থাকিলে এই অপরূপ ভাষাহীন শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। বহু সহস্র লোক বাঙ্গলায় আছে, যাহাদের এ সুযোগ লাভের সম্ভাবনা হয় নাই, তবুও তাহারা শ্রদ্ধায় অভিভূত। ইঁহারা নিজেদের বিলাইয়া মানুষকে যাহা অকাতরে দিয়াছেন, বর্ত্তমানে অকৃতজ্ঞ নরকুলের মধ্যে সে-সকল কথা স্মরণ করিবার লোক আজও নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিলে আমার অপর দুই পরম শ্রদ্ধাভাজন মহাপুরুষদের কথা একই সঙ্গে বলা হইবে। ইঁহারা স্নেহ দিয়া জয় করিতে জানিতেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে দিতেন সম্মান, মর্য্যাদা যাহার মাদকতা মানুষ "অহং" সহজে ভুলিতে পারে না। কোনো মানুষই ইঁহার কাছে হেয় ত নয়ই, তুচ্ছও নয়। যে যতটা দরের মানুষ তাহার ষোলো আনা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাইয়াছে। যাহাকে কোনো মর্য্যাদা দেওয়া যায় না, তাহাকেও বলিবার এমনি ভঙ্গি ছিল যাহাতে বাসনা পূর্ণ না হইলেও ক্ষুণ্ণ হইয়া ও তিক্ততা লইয়া স্থান ত্যাগ করিতে হয় নাই। আসিবার সময় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেষ হয় নাই, সারা জীবনই সেই মনোভাব পোষণ করিতে হইয়াছে।

রামানন্দ ছিলেন লোক-শিক্ষক। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ ছিল। পাঠশালার শিক্ষার কথা নয়, তাঁহার কাছে আসিলে তাঁহার বাক্য, তাঁহার ব্যবহার আগন্তুকের মনে একটা গভীর রেখাপাত করিয়া দিত। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ শিক্ষার বাহন ছিল, তাঁহার সম্পাদনাকালে জীবনের নানা ক্ষেত্রে মানুষ শিক্ষালাভ করিয়াছে। এমন লোক আমার বিশেষ জানা আছে, যিনি অর্থনীতিক বলিয়া পরিচিত, অর্থনীতির বই লিখিয়া কিছু যশ লাভও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার বিদ্যা প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউর সম্পাদকীয় আলোচনার বাহিরে অর্থনীতি বিজ্ঞানের অধিকার বিশেষ কিছুই ছিল না। পত্রিকার আলোচনা এবং এদিক-ওদিক হইতে পরিসংখ্যান (Statistics) সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া লিখিবার আর্ট তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কত লোকে এ ভাবে ঠকিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতারণা বিদ্যা প্রবাসীর দান নয়; তাহা লেখকের নিজস্ব অর্জ্জন।

গভর্ণমেণ্ট হইতে সারা দেশবাসী প্রবাসী-মডার্ণ-রিভিউর মন্তব্য জানিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত। এই পত্রিকা সেদিনে ছিল উগ্র ও নরম-পন্থী রাজনৈতিক দলের সেতু-স্বরূপ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা এত পরিষ্কারভাবে প্রগতিপন্থীদের পক্ষে প্রকাশ পাইত যে তাহারা সোৎসাহে সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থন উল্লেখ করিয়া দলের মত ভারি করিয়া লইত।

কিন্তু এ শিক্ষার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; বার্দ্ধক্যের দোষে আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শিক্ষা ছিল লেখক, বিশেষতঃ নতুন লেখকদের উৎসাহ দিয়া তাহার ভবিষ্যতের "আখের" গড়িয়া দেওয়া। তাঁহার আমলে কোনো লেখা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ফেরত যাইত না। যাহার মধ্যে কিছু "বস্তু" আছে, তাহাকে তিনি সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। লেখককে কাছে ডাকিয়া বলিতেন যে আর একটু 'দেখিয়া দিলে' অর্থাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা নূতন তথ্য সম্বলিত করিয়া যথাযোগ্য ভাষায় লিখিয়া দিলে, তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। কখনও বা বলিতেন যে লেখকের যদি আপত্তি না থাকে, তিনি নিজেই পরিমার্জ্জন করিয়া লইবেন। নূতন লেখক হইলে তাহার মনের ভাব কি হইত তাহা আমি প্রকাশের বৃথা চেষ্টা করিব না; সে শক্তি আমার নাই। এমন তদানীন্তন বহু নবীন (এমন কি প্রবীণ) লেখক জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেও করিতে পারেন।

উৎসাহ দিবার অপরূপ ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া লোকে এমনভাবে আকৃষ্ট হইত যাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

গ্রাহিতা শক্তি ছিল তাঁহার বড় গুণ। তিনি গুণের সমাদর করিতেন, সম্মান দান করিতেন। তাঁহার আরও সব নূতন পথ ছিল। সামান্য কাগজের টুকরা, যথা ডাকঘরের ছাপ-মারা খাম প্রভৃতি, যাহার ব্যবহার আছে, তিনি তাহা ফেলিয়া দিতেন না। তাহারই এক টুকরা ছিঁড়িয়া কোনো অর্দ্ধ-মনোনীত প্রবন্ধের সঙ্গে আলপিন আঁটিয়া লিখিয়া দিতেন, "অমুককে দেখিয়ে নিয়ো।" যাঁহার নাম লিখিয়া দিতেন, তিনি নিজে হয়ত মোটেই পণ্ডিত নহেন, তবে সেই বিষয়ের চর্চ্চা করার অভ্যাস তাঁহার আছে। এই "চিরকুট" পাইয়া মনে যে অহঙ্কার ও আনন্দ হইত তাহাই তাঁহাকে সে বিষয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিত। সম্পাদক মহাশয় অন্য কোনও স্থানে বলিতেন যে ঐ ভাবে লোকের জ্ঞানের স্পৃহাকে আরও উদ্বুদ্ধ করিতে হয়।

আত্মবিশ্বাসকে তিনি ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইতেন। কোনো লেখক হয়ত প্রবন্ধ কি হইবে, বা প্রবন্ধ কি ভাবে লেখা হইবে, তাহার মধ্যে কি বস্তু দিতে হইবে,

এই শ্রেণীর প্রশ্ন করিলে বলিতেন, "নিজে ভাল ক'রে দেখে-শুনে লেখ না, পরে আমি যা-দরকার হয় ক'রে নেব।" নিজ শক্তি উদ্বোধিত হইলে তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন। পরনির্ভরতার কখনো কোনো সময় প্রয়োজন আছে স্বীকার করিলেও তাঁহার উপদেশ ছিল, "নিজ পায়ে দাঁড়াও; যা পার নিজে খেটে-খুটে কর।" অনুকরণ করিয়া "বড়" হওয়াও প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। তাঁহার নিজ রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, "বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মানুষকে অনুভব করিতে দাও, যে, বিধিনিসেধের, হুকুম-নিয়মের এবং আইন-কানুনের বাহিরে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও আচরণের জন্ম বৃহৎ সীমাহীন ক্ষেত্র পড়িয়া আছে।"

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার সমর্থন করিতে পারিতেন না। ঐ "ছাপ-মারা" একই রকমের বিভিন্ন আকারের জীব হইলেও, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের সুযোগের বাধাকে তিনি অপছন্দ করিতেন। অকপটে প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার মনে হইত পরানুকরণ, মহতের মনোরঞ্জন, চাটুবাক্য প্রয়োগ ও তাহাতে জীবন-যাত্রার পথে সাফল্য, সুষ্ঠ অথবা সম্মানজনক পথ নয়।

দত্ত, মিত্র ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দরদ ছিল সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া। দারুণ বসন্ত রোগীর সেবা, শিক্ষা, মূক-বধিরের বেদনায় ব্যথাতুর, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্ম পত্রিকা পরিচালন ছিল দত্ত মহাশয়ের বিভূতি।

মিত্র মহাশয় ছিলেন দুর্গতদের বন্ধু। দরিদ্র ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ জানিতে পারিলে তাঁহার শান্তি থাকিত না তাহা দূর না-করা পর্য্যন্ত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশীযুগের অন্যতম অগ্রণী, তাঁহাকে রাজদণ্ড নির্ব্বাসন ভোগ করিতে হইয়াছে। অবহেলিতা, নির্য্যাতিতা, অবমানিতা নারীর দুঃখ-দুর্দ্দশা কলঙ্কমোচনে, অপরাধীর যথাযোগ্য শাস্তিবিধানের চেষ্টায় তাঁহার অক্লান্ত শ্রমের কথা দেশ স্মরণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। দেশের স্বার্থে যাহাতে মানুষ স্বার্থ ও ভয় ত্যাগ করিয়া আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বরাজের দাবি ভাস্বর রাখিয়া সততার সহিত দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারে, তিনি এই বাণী দিয়াছেন "সঞ্জীবনী"র ছত্রে ছত্রে। রাজরোষ তাঁহাকে শঙ্কান্বিত করিতে পারে নাই।

প্রবাসী-মডার্ণ রিভিউ দুই পত্রিকার দৃষ্টি প্রসার ছিল, সারা ভারত ও ভারতের বাহিরে, যেখানেই দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দেখা গিয়াছে। অকুতোভয়ে তিনি যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার যোগ্য সম্মান দেশ আজও দেয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সি.ওয়াই. চিন্তামণি, তেজবাহাদুর সাপ্রু, জয়াকর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নেতৃবর্গ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, অসহায় ছাত্র সম্প্রদায়, বিপন্ন শিল্পক্ষেত্রের কর্ম্মী প্রভৃতি তাঁহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনীতির অনিশ্চয়তা, ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য কলা কৃষ্টি কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। দুর্দান্ত সাহস ছিল অন্তরে; বাহিরে তাহার আস্ফালন ছিল না। সাণ্ডারল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" প্রকাশ করিয়া তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল না হইলেও সে যুগেও সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না। ধনী ছিলেন না, সুতরাং যখন বই বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল, তাঁহাকে প্রচুর ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, কেহ বিচলিত হইতে দেখে নাই।

বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মানবজাতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেরই ব্যথায় প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যাইত। এইরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এক অজ্ঞাত কুলশীল লোক সমাজের বিভিন্ন স্তরে কি ভাবে নির্য্যাতন চলিতেছে, অর্থাৎ বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে 'উপহার,' কন্যার বিবাহে বর্ণ পণ ভবিতব্য সম্বন্ধে আলোচনা, উগ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলাফল, সংসারে আয়ের অধিক অপরিমিত ব্যয়, গৃহস্থের সংসারে সিনেমা দেখার উৎকট নেশা প্রভৃতি কতগুলি প্রবন্ধ লইয়া একখানি পুস্তক প্রকাশের বাসনা হয়। ভদ্রলোক, ধরা যাউক "অ". তাঁহাকে মুদ্রিত 'ফাইল কপি' দিয়া একটু মুখবন্ধ লিখিয়া দিবার অনুরোধ জানান। তাঁহার মত বিরাট্ খ্যাতিমান পুরুষকে এই সামান্য কাজের জন্য অনুরোধ করিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তি সহজভাবেই বলিলেন যখন "ঐগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল তিনি লেখার বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধারা দেখিয়া অতি যত্ন সহকারে পড়িয়াছেন। কথা কয়টি শুনিয়া "অ" একেবারে হতবাক্।

যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বইখানি গ্রহণের জন্য হাত বাড়াইলেন, তখন লোকে যেমন ভক্তি সহকারে যোড় করে পুষ্পাঞ্জলি দেয় গ্রন্থকার সেই ভাবে বইখানি নর-দেবতার হাতে তুলিয়া দিল। কথা রহিল অমুকবারে গিয়া মতামত লইয়া আসিতে হইবে। যথারীতি উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন যে বইখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ

করিয়াছেন এবং গতকাল সন্ধ্যা বা আজ সকালে ছোট একটি 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিবেন বলিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু গতকাল দুপুরে এক জরুরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে মাদ্রাজ হইতে, তাঁহাকে আজই রওনা হইতে হইতেছে। তাঁহার বড় দুঃখ তিনি নিজে লিখিয়া দিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন ছাপা হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, তিনি ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণ বই দেখিতে চান। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি বিষয় উল্লেখ করিতে চান, তাঁহার মতে ইহার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে।

পুস্তক-পুস্তিকা স্তূপাকার কাগজ-পত্র হাতড়াইতেছেন, সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্যে গাদা-প্রমাণ কাগজপত্র বাছিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতেছেন। তাহার মধ্যে বলিলেন,

"আমি বলছি তুমি লিখে নাও, বইয়ের শেষটায় তুমি ছেপে দিও, মনে থাকে যেন।"

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "পাত্রী দেখিতে বলিলেই পাত্রপক্ষ নিজের আবাসস্থলের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে পাত্রী আনিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন, বলা বাহুল্য ইহাতে যে ব্যয় হয়, তাহা পাত্রী পক্ষের। কিন্তু আসল কথা, বিবাহ যখন উভয় পক্ষের প্রয়োজন, তখন পাত্রীকে স্থানান্তরে আনিয়া দেখাইতে বলা কি ন্যায়সঙ্গত? যাঁহাকে 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব' বলিয়া ঋগ্বেদ স্থান দিয়াছে তাঁহাকে এইরূপ হাটে বেচা' জন্তু-জানোয়ারের মত স্থান হইতে স্থানান্তরে 'ঘরের কড়ি' দিয়া বিক্রয়ের জন্য টানিয়া লইয়া বেড়াইতে বলা কি অশিষ্টতা নয়?

"আজকাল বয়স্থা কন্যারই বিবাহ হইয়া থাকে। যখন বিবাহের জন্য অপর লোক 'দেখিতে' আসেন, তখন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকিয়া সভায় উপস্থিত হওয়া এক বস্তু। কিন্তু অন্য স্থানে, সম্ভবতঃ আত্মীয়-স্বজনবর্জ্জিত স্থানে 'সাজিয়া' বাহির হইতে খুবই সঙ্কোচ বোধ হয়, তাহার উপর যখন 'রূপের বাজারে' পছন্দ নাই জানিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, তখন যাইবার সময় তৎস্থানের ও স্বগৃহে আত্মীয়াদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে 'দের পছন্দ হয় নি' বলিয়া যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তখন কন্যা মনে করেন 'বসুন্ধরা, দ্বিধা হও।' ...র বক্ষে এই সকল কুরুচি আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কন্যার পিতা হইলেই যে সমাজে তাহাকে নিগ্রহ করিতে হয়, কন্যার সহিত তাঁহাকে যে অপমানিত হইতে হয়, ইহা যে অত্যন্ত গর্হিত তাহা যিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নহেন, তিনিই বুঝিতে পারেন।"

এই কয়টি কথার মধ্যে কত দূরদৃষ্টি, সামাজিক প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, কি গভীর দরদ একটি অনূঢ়া যুবতী কন্যার হৃদয়ের ব্যথার অনুভূতি ও প্রকাশ একই সঙ্গে লাভ করা যাইতেছে। কন্যা পক্ষের সামান্য আর্থিক ক্ষতির কথা আর নাইই বলিলাম।

ধর্ম্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তিনি অদ্ভুত সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে দৈহিক আঘাতের সম্ভাবনা সেখানেও তাঁর মত প্রকাশে ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায় নাই। কোনও একটি রাজনৈতিক (উগ্র) দল তাঁহার সমর্থন লাভে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস আসরে যথেষ্ট সম্মান ও সুযোগ লাভ করে। তাহার পর সেদল আরও উগ্র হইয়া উঠে এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে টাউন হলে এক সভা হয় এবং তাহাতে যথেষ্ট গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে। তিনি সে সভায় অনুপস্থিত হইলে কাহারও ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা উঠে নাই। কিন্তু তিনি মনে করিলেন যে "মুখ খুলে" তাঁর, "মনের কথা" বলা না হইলে সেই উৎকট মতে তাঁহার সমর্থন আছে বলিয়া প্রচারের সুযোগ লওয়া হইতে পারে। যখন তিনি সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন, সেই সময় মহা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়, চেয়ার ছোড়াছুড়ি, সভার একাংশে ধ্বস্তাধ্বস্তিও চলিতে থাকে। তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষীরা সভার নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, কারণ তাঁহার দেহে গুরুতর আঘাত লাগা অসম্ভব নয়। তিনি অচল অটলভাবে আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি এবং ধীর গম্ভীর ও দৃঢ় ভাষণ যেন সমস্ত অশালীনতার বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া সভায় বিবদমান দুই পক্ষই শান্ত হইল। তিনি তাঁহার মতামত স্ফটিক-স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। উপস্থিত বিরাট জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তাঁহার কাছে সন্তানের অধিক স্নেহ পাইয়াছি, ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট সাংবাদিকতার, প্রবন্ধ রচনা বিদ্যায় যথেষ্ট শিক্ষা পাইলেও, প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ ও তাঁহার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লেখায়

আত্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছি; আজ যে পরিচয়ে তাঁহার স্মৃতি-সংখ্যায় লেখার আমন্ত্রণ পাইয়া ধন্ত হইয়াছি সে বিদ্যা তাঁহারই দান। ইহা "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করা হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সব জানা-কথা বলিতে গেলে আমাকেই প্রবাসীর একটি বিশিষ্ট সংখ্যায় হিজিবিজি লিখিবার সুযোগ করিয়া দিতে হয়। জানি তাহা অপাঠ্য হইবে, কেহ চিমটা দিয়াও স্পর্শ করিবেন না, তবুও আমার মনের কথা বলা হইবে। তাঁহার প্রবন্ধাদির বিষয়বস্তু ও তাঁহার মতামত আলোচনা করিলে নিজেকে ধন্ত মনে করা হইবে, এবং সে লেখার সীমা টানা দুষ্কর বলিয়া মনে হইবে।

ভারতবর্ষে তাঁহার পরিচয় দিতে যাওয়া নবারুণ রাগের উপর তুলি বুলাইবার চেষ্টার মত মনে হয়। জাতি যদি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহার কাণে তপ্তশলাকা দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেও তাঁহার কথা প্রবেশ করানো সম্ভব হইবে না। তবে প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক জ্ঞানী, দরদী, নির্যাতিতের আশ্রয়, পরম শ্রদ্ধাভাজন ঋষিকল্প স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাবধারা, কার্য্য-পরিচয়, বাণী অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ত্তি পালিত হইতেছে। তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন বিশ বৎসরের উপর, কিন্তু তিনি আজও জীবিত; তাঁহার প্রভাব আজও নিঃশেষ হয় নাই।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গলার বেকার সমস্যা

শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালী বেকার সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর একটি ব্যাপার দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলার চাকুরি ক্ষেত্রে বাঙ্গলার ছেলে এবং যুবকদের স্থান ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় অবাঙ্গালীদেরই অতিপ্রাধান্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ খড়্গপুরের রেলওয়ে শিল্প নগরীর কথা বলা যায়। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে কারখানায় খালাসী নিয়োগের নির্ব্বাচন সবে সমাপ্ত হইয়াছে। আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল [illegible]—ইহার মধ্যে ইন্টারভিউ-এ আহ্বান করা হয় [illegible] জনকে এবং ৫৮৫ জনকে খালাসীর পদের জন্য বাছাই করা হয় এবং এই সংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র ১১০ জন! বাকী সবই বহিরাগত অবাঙ্গালী।

প্রকাশ যে খড়্গপুরের বিশেষ এক শ্রেণীর রেলওয়ে অফিসার বাঙ্গালীর উপর সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত হইয়া আছেন এবং তাঁহাদেরই কারসাজিতে যে করিয়াই হউক বাঙ্গালীকে তাহাদের নিজের দেশেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং দাবী হইতে সদাই বঞ্চিত করা হইতেছে। এমনও শুনা যায় যে জনৈক অফিসার ফল প্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে [illegible] পেটোয়া ১৫।২০ জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন!

খড়্গপুরে বাঙ্গালী-খেদানোর অপচেষ্টা বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে এবং আজ স্বাধীন ভারতে ঐ অপচেষ্টা আরও প্রকট হইয়াছে।

স্বর্গত বিধানচন্দ্র রেলওয়েকে একবার অতি কঠোর ভাষায় এ-বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং রেলওয়ের প্রত্যেক নির্ব্বাচনী-বোর্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রতিনিধির স্থানও করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—কিন্তু আজ সেই ব্যবস্থারও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে!

খাস বাঙ্গলাতেই যদি বাঙ্গালীর স্থান না হয়, তাহা হইলে হাজার হাজার বাঙ্গালী বেকার কোন্ নব-দণ্ডকারণ্যে যাইবে? বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কি এ-বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না? বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ মহাশয়, শুনিতে পাই, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নানা সমস্যার সমাধান করিতেছেন—কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নেতা হইয়া তিনি কি বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর দুঃখ, অভাব, অভিযোগ মোচনের চেষ্টা করাটাকে নেহাৎ ছোট কিংবা অবান্তর বলিয়া মনে করেন?

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে অবস্থিত একটি অবাঙ্গালী জুট মিলের কর্ত্তারা মান্দ্রাজের একটি সংবাদ-পত্রে তাঁহাদের মিলের জন্য সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট কর্ম্মীর জন্য বিজ্ঞাপন দেন! ভদ্র মান্দ্রাজ সরকার ইহার প্রতি বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই বলিয়া যে বাঙ্গলা দেশে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের ছড়াছড়ি থাকিতেও—মান্দ্রাজের দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিবার রহস্য কি তাহা অনুসন্ধান করিতে। বাঙ্গলা সরকারের প্রশ্নের জবাবে মিল কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে মান্দ্রাজী কর্ম্মপ্রার্থী কম বেতনে পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা পছন্দ করেন বাঙ্গালী অপেক্ষা মান্দ্রাজী কর্ম্মপ্রার্থীদের! এ-বিষয় শেষ পর্য্যন্ত কি হইয়াছে জানা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে এখন বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান পশ্চিম বাঙ্গলায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাদের মালিক এবং কর্ত্তৃপক্ষ—কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিয়াই ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে প্রয়োজন মত লোক আমদানী করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন! স্বাধীন ভারতে তাঁহাদের এই প্রচণ্ড বাঙ্গালী-নিধন ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার কেহই নাই বলিয়াই মনে হয়! এবং এই প্রকার স্বাধীন-ইচ্ছা প্রয়োগের ফলে যদি হাজার হাজার বাঙ্গালী বেকার মৃত্যু পথযাত্রী হয়, তাহা হইলেও বেকারদের এই মৃত্যু-স্বাধীনতার প্রতিরোধও কেহ করিবে না।

বাঙ্গলায় শিক্ষিত বেকারদের ভীষণ চিত্র

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তাহাদের উপযোগী চাকুরি সমান তালে সৃষ্টি হইতেছে না। বরং কতকগুলি ক্ষেত্রে শিক্ষিতের চাকুরির হার কমিতেছে বা একই থাকিয়া যাইতেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর চাকুরির চাহিদা ক্রমশঃ ভয়াবহ উদ্বেগজনক আকার

লইতেছে। তাহার সঙ্গে রহিয়াছে আধা-বেকার শিক্ষিতের চাকুরির চাহিদা।

পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ম্যাট্রিক এবং গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী প্রায় দেড় লক্ষ চাকুরিপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। এই সংখ্যার অন্ততঃ তিন গুণ চাকুরিপ্রার্থী এক্সচেঞ্জে হয় নাম লিখান নাই কিংবা আশাহীন হইয়া নাম কাটাইয়া বাজারে চাকুরি খুঁজিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৫ লক্ষের বেশী। ইহার সঙ্গে এবার যোগ দিতেছে নতুন নতুন পরীক্ষায় হাজার হাজার নব উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ প্রার্থী। ফলে, শিক্ষিত চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের হিসাবে দেখা যায় (৩১শে ডিসেম্বর) ম্যাট্রিক পাশ কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৭৫ হাজার ৯১৮ জন। হায়ার সেকেণ্ডারী, ইণ্টারমিডিয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট প্রার্থীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ২৩৬ জন। গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ হাজার ২৫১ জন। ইহার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬৬ ও ১০৩। মোট শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৫ হাজার ১৩৩ জন। ১৯৬৩ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াছে ১২'১ শতাংশ।

একদিকে যখন শিক্ষিত বেকারদের চাকুরির তীব্র চাহিদা, তখন অপরদিকে বহু ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর অভাবে অনেক পদ অপূর্ণ থাকিতেছে, বিশেষ করিয়া কারিগরি চাকুরিতে।

একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বেকারের সংখ্যা যত বাড়িতেছে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ততই প্রার্থীর সংখ্যা কমিতেছে। ১৯৬৩ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৬৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে তালিকাভুক্ত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে। কারণ কি তাহা রাজ্য কর্ম্মসংস্থান দপ্তর অনুসন্ধান করিতেছেন।

তবে ইহার প্রাথমিক কারণগুলি মনে হয়:

" "(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর একসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যেভাবে লোক নিয়োগ করা হচ্ছিল তা এখন অনেকটা সীমিত হয়েছে; (২) বিকল্প কর্ম্মসংস্থানের জন্য বেকার স্বর্ণশিল্পীর এখন ভীড় কম; (৩) বছরের পর বছর নাম রেখেও চাকুরি যাঁরা পান নি তাঁরা ক্রমশঃ কার্ড আর রিনিউ করাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন।"

ইহার ফলে, ১৯৬৩ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে তালিকাভুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা শতকরা ১৩'১ কমিয়াছে। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে যেখানে লাইভ রেজিষ্টারে ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৪৯১ জনের নাম ছিল, ১৯৬৪ সালে সেইখানে রেজিষ্টারে নাম তালিকাভুক্ত ছিল ৫ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮৭ জনের।

১৯৬৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসের তালিকাভুক্তির সংখ্যাতেও এই কমতি হার লক্ষ্য করা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে নতুন চাকুরীর হার গত পাঁচ মাসে কমিয়াছে; কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত কোয়াসি গভর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে নতুন চাকুরির হার কিছুটা বাড়িয়াছে।

আশ্চর্য্যের কথা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যত চাকুরির খোঁজ বা নোটিশ আসে তার অর্দ্ধেকও এক্সচেঞ্জের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হয় না!

না হইবার কারণ এই যে—যে-সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞপ্তি পাঠান—এক্সচেঞ্জ হইতে প্রেরিত কর্ম্মপ্রার্থীকে নিযুক্ত করা বা না-করা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্ত্তাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে।

প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নূতন কর্ম্মী নিযুক্ত কিংবা কাজে বহাল হইবার পর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কর্ম্মখালির সংবাদ পাঠান হয়—কেবলমাত্র পিস্ত রক্ষার জন্য। বিশেষ করিয়া এ-রাজ্যের অবাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানাগুলির অবাঙ্গালী মালিকগুলি তাঁহাদের নিজ রাজ্য বা গাঁও হইতে লোক আমদানী করিয়া খাস বাঙ্গলা দেশেই বাঙ্গালী ছেলেদের সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বুকের রক্তস্বরূপ কোটি কোটি টাকা বাঙ্গলার বাহিরে নিজের নিজের রাজ্যের ধন ভাণ্ডার ফাঁপাইয়া তুলিতেছে। এমন ব্যাপার বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে দেখা যাইবে না, কারণ ঐ সব রাজ্যের সরকার স্থানীয় লোকদের স্বার্থরক্ষায় সদা সজাগ এবং অতি তৎপর রহিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মত বিরাট উদারতা অন্যত্র বিরল!

পশ্চিম বাঙ্গলায় নূতন উদ্বাস্তু

কেন্দ্র সরকার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের সাহায্য দান সম্পর্কে ক্রমশ হাত গুটাইতেছেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ-রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যাও এক অতি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ইহার উপর এ-রাজ্যে নূতন

করিয়া উদ্বাস্তুর দল পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে আবার আসিতেছে এবং তাহার সহিত দণ্ডকারণ্য হইতেও উদ্বাস্তুর দল পশ্চিম বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। উদ্বাস্তুর সংখ্যা যখন নূতন করিয়া বৃদ্ধি-মুখে—ঠিক সেই সময় কেন্দ্র সরকার পুরাতন উদ্বাস্তু ঋণ বাবদ বকেয়া টাকা বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করিলেন—আমাদের রাজ্য সরকার তাহার কারণ এখনও যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে নিম্নে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ দেওয়া হইল :—

'৩রা জুন যে-সপ্তাহ শেষ হ'ল, তাতে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে মাইগ্রেশন নিয়ে ৫২২ জন আর বিনা ছাড়পত্রে ১১০ জন এসেছেন। তার আগের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৮৫ ও ১৪৮। বর্ডার সীল করার সিদ্ধান্তে সরকার অটল যদি থাকেনও, ছাড়পত্রহীন উদ্বাস্তুদের একাংশের এ-রাজ্যে প্রবেশ তাঁরা বন্ধ করতে পারেন নি।

"অন্যদিকে দণ্ডকারণ্য-ফেরতা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা: ১লা জুন—২২; ২রা—১০; ৩রা—২২, ৪ঠা—৫৫; ৫ই—৪; ৬ই—১৬১; ৭ই—৬০; ৮ই—৫০; ৯ই—৩৩; ১০ই—১৫৩; ১১ই—২৯।

"১৯৬৪-র পয়লা জানুয়ারী থেকে আজ অবধি এ-রাজ্যে আসা নতুন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৭ শত ৮০।

"দু'দিক থেকে এখন যে উদ্বাস্তু আসছেন, তাঁদের দায়িত্ব কেউই নিচ্ছেন না। না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্র। তাই এঁরা, কোথায় যাচ্ছেন, কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন, সে-কথা কেউ বলতে পারবেন না।"

তবে পশ্চিম-বঙ্গে অনাহারে মৃত্যু নিষিদ্ধ। মহকুমা হাকিমদের কাছে এই সরকারী নির্দেশ আছে: কেউ যেন না খেয়ে না মরে।

"তাই, সরকারী মহল বুঝতে পারছেন, শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটা তাঁদের স্কন্ধেই চাপবে।"

উপরের প্রদত্ত হিসাব কম করিয়াই দেওয়া হইয়াছে, কারণ বিনা ছাড়পত্রে যে-সব উদ্বাস্তু এ-রাজ্যে আসিয়াছে এবং এখনও বানের জলের মতই প্রবেশ করিতেছে—তাহাদের সংখ্যা সঠিক বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাও সত্য যে ৩রা জুনের পর আজ পর্যন্ত বেশ কয়েক হাজার নূতন উদ্বাস্তু এ-রাজ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছে—এবং আরো আসিবে।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার উদ্বাস্তু ছাড়া বার্মা হইতে বিতাড়িত বাঙ্গালী কয়েক হাজার উদ্বাস্তু কলিকাতা এবং কাছাকাছি অঞ্চলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহাদের প্রতি কেন্দ্রের কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া মনে হয়। রাজ্য সরকার কত ভার সহিতে পারিবেন জানা নাই!

উদ্বাস্তু এবং দরদী নেতার দল!

ভারতবর্ষকে কাটিয়া যখন গদিতে বসিবার আয়োজনে কংগ্রেসী নেতারা অতি তৎপর এবং ব্যস্ত, সেই সময় নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া বড়, মেজ, সেজ, ছোট প্রভৃতি সকল কংগ্রেসী মোড়লই উদ্বাস্তুদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ভীষণ প্রতিজ্ঞা এবং পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই! কিন্তু আজ সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিব কথা কি কাহারও মনে আছে? নাই, নাই, নাই!!! এক একজন নূতন উদ্বাস্তুমন্ত্রী কেন্দ্রে আসন গ্রহণ করিতেছেন এবং আসন গ্রহণ করিয়াই—কি ভাবে, কোন্ উপায়ে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ঘায়েল করা যায় সেই পরিকল্পনাই সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিতেছেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হইতেছে:

"উদ্বাস্তুদের 'বকেয়া সমস্যা' সমাধানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। অনাদায়ী উদ্বাস্তু ঋণের দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকার না দিলে কেন্দ্র আর কোন সাহায্য দেবেন না,—এ কথার যৌক্তিকতা কিছুতেই রাজ্য সরকার বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কেন্দ্রীয় দরবারে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন,—এমন কথা ছিল কি?

"তাঁর মতে, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তের ফলে তা থেকে তাঁরা সরে আসছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ উদ্বাস্তুরই যথাযথ আর্থিক পুনর্ব্বাসন এখনও হয় নি। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে এখুনি ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব নয়। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে আর কোন সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহৃত না হলে এই রাজ্যের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে।

"জানা গিয়েছে, আগে কেন্দ্রীয় সরকার কখনও উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণের টাকা সংগ্রহের

সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ দেওয়ার প্রশ্নটি জড়ান হয় নি।

"অথচ গত ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানান যে, উদ্বাস্তদের বকেয়া সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপাতত ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে সময় অনাদায়ী ঋণের টাকার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। এমন কি কেন্দ্র থেকে এ নির্দ্দেশও দেওয়া হয় যে, কি ভাবে ঐ অর্থ ব্যয় হচ্ছে বা হবে তার একটি হিসাবও রাজ্য সরকারকে রাখতে হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একটি বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন।

"রাজ্য সরকারী মহলের আলাপ-আলোচনায় জানা যায় যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না। কারণ সুস্পষ্ট। উদ্বাস্ত সমস্যার ব্যাপারটি শুধু রাজ্যেরই নয়—কেন্দ্রেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। অতএব রাজ্যের ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন তা তাঁদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।"—(যুগান্তর)

কেন্দ্রীয় সরকার এ-বিষয়ে এমন একটা ভাব দেখাইতেছেন যাহাতে মনে হয়—উদ্বাস্তর জন্য অর্থব্যয়টা যেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন জমিদারীর তহবিল হইতে হইতেছে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সরকারী বড় বড় উপরওয়ালাদের অযথা-অকারণ বিদেশ ভ্রমণ এবং রাজকীয় চালে বসবাসের জন্য যে কোটি কোটি টাকা অপচয় হইতেছে—তাহার হিসাব কে রাখে? কেন্দ্রের শনির দৃষ্টি কি কেবল উদ্বাস্তদের উপরেই নিবদ্ধ থাকিবে?

বহু-নিনাদিত পঞ্চায়েত রাজ

সাপ্তাহিক আত্রেয়ী বলিতেছেন:

দেশে পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অঞ্চল-নেতৃবর্গ নবোদ্যমে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা রূপায়ণের জন্য যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে সিমেন্টের আবশ্যকীয় পরিমাণ জানাইয়া আবেদন করিয়াছেন।

পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষে অঞ্চল নেতৃবর্গ এমন কোন পরিকল্পনা প্রদান করেন নাই যে তাহা হইতে পারে না। প্রায় সব অঞ্চলেরই প্রধান পরিকল্পনা ছিল, সাঁকো নির্ম্মাণ এবং পানীয় জলের জন্য রিংকূপ প্রতিষ্ঠা।

তাঁহারা বহু আশা লইয়া সিমেণ্টের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আসিয়াছেন—তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহারা দিনের পর দিন এ-অফিস হইতে ও-অফিসে চরকি-পাক ঘুরিয়াছেন, কিন্তু সিমেণ্ট সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ফলে, পল্লী উন্নয়নের নিমিত্ত পরিকল্পিত সামান্যতম কাজও কোন অঞ্চলে হইতে পারে নাই।

পল্লী নেতৃবর্গ আমলাতান্ত্রিক চরকিতে পড়িয়া দ্বাদশ-ভুবন দর্শনান্তে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে আশার আলোক দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই ১৯৬৪-৬৫ সালের প্রদত্ত পরিকল্পনা আপিসী-চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া যে অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিল, তাহাতে মনে হইতেছে সুযোগ্য বি-ডি-ও-গণ অচিরাৎ পঞ্চায়েত রাজের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পথ সুগম করিতে পারিবেন। সুতরাং কর্ম্মদক্ষতার জন্য সরকারী খেতাব—পদ্মবিভূষণ-টিভূষণ ইত্যাদি ইঁহারা না পাইলে আর কাহারও পাওয়া উচিত নয়।"

পঞ্চায়েত রাজ স্থাপনের অনতিবিলম্বেই যে এ প্রকার কিছু ঘটিবে, তাহা বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বলেন, কিন্তু এ-দেশে অনেক মুখ্য ব্যক্তিরাই যে মুর্খ-প্রধান তাহা তাঁহাদের কাজে এবং চাল-চলনেই প্রমাণিত হইতেছে!

কলিকাতার নিকটস্থ কয়েকটি পঞ্চায়েত রাজ এলাকার অবস্থাও একই প্রকার। কিন্তু পঞ্চায়েত রাজ যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নহে। এমন সংবাদও প্রকাশ পায় যে পঞ্চায়েত রাজ-প্রধানদের অনেকেই স্ব স্ব অবস্থার কিছু 'উন্নয়ন' করিয়াছেন এবং ইহাদের সাধু দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য প্রধানরাও ক্রমে পোক্ত হইবেন। এই প্রধানগণ দেশেরই লোক, কাজেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক 'উন্নয়নকে' —প্রকারান্তরে দেশের উন্নয়নই বলা যায়।

ভোটে বহু কিছুই করা যায়। কিন্তু করা যায় না—মুর্খকে পণ্ডিত, অকর্ম্মাকে কর্ম্মী এবং অসাধুকে সাধু।

চোরাবাজারী স্পেশাল ট্রেণ?

দামোদরে প্রকাশিত নিম্নে প্রদত্ত পত্রখানি পাঠকদের প্রীতি সম্পাদন করিবে বলিয়া মনে হয়:

"মহাশয়, রাঁচি প্যাসেঞ্জার, যে ট্রেণটি সকালে বর্দ্ধমান হতে ছাড়ে এবং রাত্রি ১০টায় বর্দ্ধমানে ফিরে আসে, ঐ ট্রেনটি বর্দ্ধমানের দিকে আসবার সময় ওয়ারিয়া ষ্টেশনে পৌছলে প্রায় ২০০ বস্তা কয়লা ঐ ট্রেণের যাত্রী কামরায় বে-আইনী ভাবে তোলা হয় এবং মানকড় ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের দক্ষিণ দিকে নিয়মিত ভাবে নামানো হয়। এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা আছে। জানা গেল ওয়ারিয়ায় কয়েক লক্ষ টাকার কয়লাকে বাতিল বলে ফেলে রাখা হয়েছে, কিন্তু ঐ কয়লাই নিয়মিত ভাবে এরূপে পাচার হচ্ছে। দেখলাম ঐ কয়লা বহনকারীরা সকলেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছে এবং যারা ভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে যাত্রী কামরায় আসছে, তাদের উপরেই ঐ কয়লার বস্তা নিক্ষেপ করছে। ঐ সময়ে ওয়ারিয়া হতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ঐ ট্রেণের মধ্যে চরম অরাজকতা চলে। এ বিষয়ে কি রেল কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না? এই অপকর্ম কি ট্রেণের গার্ড, চেকার ও ড্রাইভারদের অগোচরেই হয়? ১০ই মে, ১৯৬৫

শ্রী··· তেওয়ারী

চৌধুরী বাজার, বর্দ্ধমান"

কিন্তু ঠিক এই প্রকার বিচিত্র কাণ্ড অন্যান্য বহু স্থানেও চলিতেছে। শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনের রাত্রীকালীন ট্রেণগুলিতে এক শ্রেণীর লোক বা তথাকথিত ব্যবসায়ী বিরাট চোরা এবং ছিনতাই কারবার চালাইতেছে। ইহা দমন করিবার কোন সার্থক প্রচেষ্টা রেল-পুলিশ কবে করিবে জানি না।

খাস শিয়ালদহ ষ্টেশনে—বিশেষ করিয়া সাউথ ষ্টেশনে টিকিট কালেকটার মহাশয়গণ ব্যাপারী এবং ভেণ্ডারদের নিকট হইতে সকাল-বিকাল গেটের সামনে প্রকাশ্যে কি ভাবে উপরি রোজগার করিতেছেন—তাহা বহু যাত্রী প্রত্যহ দেখিতেছেন। অথচ সাউথ ষ্টেশনেই পুলিশের ডিপো রহিয়াছে। পুলিশ কর্ত্তারা ঐ ডিপোতে অবশ্যই চোখ বন্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন। পাপের কিম্বা অপকর্ম্মের দৃশ্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই নয়ন নিমিলিত অবস্থায় অবস্থান করেন!

"সাদা পোষাকে কালোবাজার"

'ত্রিপুরা' সাপ্তাহিক বলিতেছেন:

"কালোবাজারীদের খেইল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরার চীফ কমিশনার শ্রী এস, পি, মুখার্জ্জী গত শনিবার (৮ই মে) অতি সাধারণ বেশে পায়ে হাঁটিয়া বটতলা বাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপস্থিতির প্রায় সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতেই নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের বাজারে উল্লেখযোগ্য অনাচার ও ব্যভিচার চলিতেছিল।······

"চীফ কমিশনার সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বেশে গোটা বাজারটি জরিপ করিলেন। কোথাও নির্দ্ধারিত (তথাকথিত ন্যায্য) মূল্যের সন্ধান পাইলেন না। উপরন্তু কেন বেশি দর চাওয়া হইতেছে প্রশ্ন করিয়া শুনিতে পাইলেন "যুদ্ধ লাগিবে, বেশি দরে খরিদা মাল" ···ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যখন জানাজানি হইল যে চীফ কমিশনার স্বয়ং বাজার দর যাচাই করিয়া গিয়াছেন, তখন দেখা গেল মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তি-মাফিক দরই চালু হইয়াছে। এক কথায় বলা চলে যুদ্ধের গুজব রটনা করিয়া ত্রিপুরার ব্যবসায়ী মহল রাজধানীতেই সাতদিন সমানে যদৃচ্ছা মুনাফা শিকার করিয়াছে: মফঃস্বলে বোধ হয় আজও চলিতেছে। বিজ্ঞপ্তিতে সরিষার তৈলের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে প্রতি লিটার চারি টাকা। অথচ আমরা জানি ১লা মে পর্য্যন্ত সাড়ে তিন টাকার উপরে কোন তৈল বাজারে ছিল না। এখনও অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তৈলের পাইকারী দাম তিন টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই। প্রতি লিটারে এক টাকা মুনাফা অস্বাভাবিক নয় কি? ইহারই নাম সাদা পোষাক পরিহিত কালো বাজার। শুধু সরিষার তৈল নহে, ডালের বাজারেও অনুরূপ সাদা পোষাকে কালোবাজার চলিতেছে। নূতন ডাল পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। পুরাতন ডাল চালাইবার জন্য ব্যবসায়ী মহাত্মারা নূতন ডালের কোটা পাইয়াও মাল আমদানী করেন নাই। আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে অবগত হইয়াছি, যে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী অর্থে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য (চিনি, ময়দা, তৈল, ডাল, নুন প্রভৃতি) আমদানীর পারমিট পাইয়া থাকে সেই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ছয় মাসে বরাদ্দ করা কয়েক গাড়ি মাল ল্যাপ্স্ করিয়াছে। চিনির বাজারে দুর্ভিক্ষ, ময়দার অভাবে কয়েক শত লোক বেকার, নূতন ডালের অভাব প্রভৃতি যে সকল সমস্যা এক রকম স্থায়ী হইতে চলিতেছে, তাহার প্রধান কারণ বরাদ্দকৃত কোটা ল্যাপ্স্ হওয়া; অর্থাৎ মাল আমদানীতে অব্যবস্থার দরুনই অভাবের সৃষ্টি। এবং এই অভাবকে পুঁজি করিয়াই অতি মুনাফার অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে বরাদ্দকৃত কোটার মাল ল্যাপ্স্ হওয়া অর্থাৎ আমদানী না করার জন্য আমদানীকারককে সরকার হইতে কিছু বলা হয় না বা সেই পারমিট অন্য কোন ব্যবসায়ীকেও দেওয়া হয় না। ইহা সরকারী কর্ম্মচারীদের কারসাজি। অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারীদের আর ব্যবসায়ীদের যোগসাজসেই অভাব সৃষ্টি হয়, এবং তাহার মাশুল দিতে হয় জনসাধারণকে। এই ত গেল নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের। চাউলের বাজারেও

অনুরূপ সাদা কালোবাজার কায়েম হইয়াছে। সরকার নির্দ্ধারিত পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে যে চাউল পাওয়া যায়, উহা খাওয়া যায় না। খাইবার মত চাউল পাইতে হইলে দর দিতে হয় আটত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা। ইহাতেও সরকারী কর্ম্মচারীদের পুরোদস্তর কেরামতি। স্বল্প মূল্যে চাউল আমদানী ও বিক্রয়ের পারমিট দেওয়া হইতেছে নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের। তাহারাও তথৈবচ। সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের ঠেলায় চাউল আমদানি ও আগরতলা বাজারে উহা বিক্রয় পেরাশানি পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। অর্থাৎ সদর মহকুমার বাহির হইতে চাউল আনিতে পারমিট ইস্যু করেন জনসংভরণ দপ্তর, চাউল আসিলে বিক্রয়-দরও সাব্যস্ত করেন তাঁহারাই। এই দুইটি কাজে অহেতুক পেরাশানির দৌলতে মালআমদানি ব্যাহত হইতেছে। ফলে বাজার দর পড়ি পড়ি করিয়াও পড়ে না। অতএব সাদা পোষাকে কালোবাজারই চলিতেছে।"

সর্ব্বত্রই একই অবস্থা—একই প্রকার কালোবাজারে প্রকাশ্য কারবার।

তিন ভাষার অভিযান!

বর্ত্তমানে দেশের হাজার রকম অতি কঠিন সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র-সরকার হিন্দীকে দিল্লীর রাজ-তক্তে বসাইবার বাসনা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না! অহিন্দী অঞ্চলগুলি হইতে প্রবল বাধা পাইয়া কেন্দ্র সরকার (অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী এবং দলীয় কয়জন) এইবার চোরা-পথে হিন্দীকে ভারতের রাজ-ভাষার স্থান দিতে বদ্ধ-পরিকর। এই ভাষা ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ এবং বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষও যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অবাক হই নাই, কারণ ইহা স্বপ্রকাশ যে স্বাধীন ভারতের তথাকথিত কংগ্রেসী নেতারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ গোপন মতলব কিংবা দিল্লীর রাজ-দরবারে আসন পাকাপোক্ত করিবার জন্য—কোন ছল চাতুরীকেই অন্যায় মনে করিতে পারিতেছেন না।

'আবশ্যিক তিন ভাষা' নীতির বিরুদ্ধে কলিকাতায় কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সভাতে আলোচনা এবং প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যুগান্তরে প্রকাশিত এই রিপোর্টে তাহার বিবরণী পাওয়া যাইবে।

কলকাতা, ২১শে জুন—"স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক তিন ভাষা নীতি প্রবর্তনের আমরা বিরোধিতা করছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা এবং ইংরেজী ভাষা থাকবে। সম্ভব হ'লে ৮ম তপশীলে উল্লিখিত যে কোন একটি ভাষা তৃতীয় ভাষা হিসেবেশেখানো যেতে পারে।" —ভাষা বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত ভারতীয় জাতীয় ভাষা উন্নয়ন সমিতির এক সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জির পৌরোহিত্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এল-সি, প্রাক্তন আই-সি-এস শ্রীশৈবাল গুপ্ত, ডঃ পি সি চক্রবর্ত্তী, শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রী কে কে সিংহ, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এস দেব, শ্রী জে এন মজুমদার, শ্রীহিরণ স্যান্যাল, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মোট ছ'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অন্যান্য পাঁচটি প্রস্তাব পর পর দেওয়া হ'ল :—

বিভিন্ন রাজ্যের প্রার্থীরা বিভিন্ন ভাষায় পরীক্ষা দিলে যোগতার যথার্থ বিচার সম্ভব নয় বলে ইউনিয়ন পাব্লিক শার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে যতদিন প্রয়োজন ততদিন ইংরেজীকেই রাখতে হবে।

ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় কোন আবশ্যিক 'ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার' থাকবে না। ইংরেজীকে সহায়ক ভাষা হিসেবে রেখে রাজ্য-ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। রাজ্য সরকারসমূহের শাসন রাজ্য-ভাষাসমূহের মাধ্যমে চলতে পারে, অবশ্য আবশ্যিক ক্ষেত্রে ইংরেজী রাখতে হবে।

কেন্দ্রে সরকারী ভাষা হিসেবে থাকবার যোগ্যতা-হিন্দীর হয়নি। প্রতি ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের মনোনয়ন আবশ্যিক।

হিন্দী সহ সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা সমভাবে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত না অহিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যসমূহ ইংরেজীর বিকল্প কোন ভাষাকে মেনে না নেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী ভাষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সংযোগকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীকে রাখতে হবে।

সভায় গৃহীত এই ছ'টি প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি দিল্লীতে পাঠান হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবটির সমর্থনে জনমত গঠনের জন্য একটি নিখিল বাংলা সম্মেলন করবার সিদ্ধান্তও সভায় করা হয়েছে।

প্রস্তাব অবশ্যই অতি উত্তম—কিন্তু কেন্দ্র কর্ত্তাদের নিকট এই প্রস্তাব মূল্যহীন বিবেচিত হইবে, কারণ কেন্দ্রীয় মালিকরা যে-যুক্তি বরাবর স্বীকার করিয়াছেন, সেই যুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবে কিছুই বলা হয় নাই।

হিন্দী রাজতক্তে বসিবার পূর্ব্বেই দিল্লীর কর্ত্তারা অহিন্দীভাষী ছাত্রদের হিন্দী শিক্ষা করিবার জন্য এক হাজার বৃত্তিরূপী টোপের ঘোষণা করিয়াছেন। গৌরী সেনের টাকা অপচয় প্রতিরোধ করিবার কাহারো কোন অধিকার নাই! ভারতীয় জনগণের একমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কর্ত্তাদের দাবীমত রাজকোষে খাজনা দিবার—অর্থাৎ টাকা দিবার বেলায় সাধারণ মানুষ, আর অপচয় করিবেন কেন্দ্রীয় মহাশাসকের গুষ্টি! কেবলমাত্র একটি আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীর জন্য সাধারণের টাকা বরবাদ করিবার অধিকার কেন্দ্রকে কে দিল?

ভাষা সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে—এবং ইহাও সত্য যে বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ছাড়া আর কোন রাজ্যের জনগণ হিন্দীর একাধিপত্য চাহেন না। রাজ্যগুলির কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কথা অবশ্যই বাদ দিয়া।

ভাষা সম্পর্কে যুগান্তরের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা অন্যায় বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"বলা দরকার যে সরকারী ভাষার ব্যাপারে অহিন্দীভাষীরা সঙ্গতভাবেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা কর্তৃপক্ষ এখন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। আবহাওয়া একটু শান্ত বুঝলেই, পাছ-দুয়োর দিয়ে তাঁরা হিন্দী চালিয়ে দেবেন। প্রস্তাবিত বিলটি কার্য্যকর হলে সে-ভয় খানিকটা দূর হবে এবং হিন্দীর একক আধিপত্য রাতারাতি গোটা ভারতের ওপর চেপে বসবে না। কিন্তু কেবলমাত্র ভাষা বিলে আশঙ্কা স্থায়ীভাবে দূর হবে না। আবার নূতন একটি বিল এনে এটি নাকচ করার সুযোগ ত থেকেই গেল। সংবিধানের ভাষা-সম্পর্কীয় তপশীলটি সংশোধন ভিন্ন স্থায়ী সমাধান বলে গণ্য হতে পারে না কোন ব্যবস্থাই।

"তা ছাড়া হিন্দী সরকারী ভাষারূপে চালু হওয়ার আগেই যে-ভাবে ডাক টিকেটে, রেল ষ্টেশনে, মণিঅর্ডার ফর্মে তা নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ হয়েছে, তাতে ইংরেজীর নলচা আড়াল দিয়ে হিন্দীর লাঠি ঘোরানো বন্ধ হবে না এবং দ্বিভাষিক নীতির লক্ষ্য ব্যর্থ করার আয়োজন চলতেই থাকবে বলে মনে করার হেতু ত থেকেই যাচ্ছে। জিনিষটা হচ্ছে অনেকটা যেন অনুগ্রহ করে ইংরেজীকে একটু স্থান দেওয়ার মতো। রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন খা যায় দূর তীর্থ দরশনে। সেইভাবে হিন্দীর লেজুড় ধরে ঝুলে থাকবে ইংরেজী!

"অর্থাৎ হিন্দীভাষীদের ভাষা-জুলুম থেকে ভারতের সামাজিক স্বস্তিকে নিরাপদ ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে বাধামুক্ত করার কাজ এতে বেশী অগ্রসর হবে না। এইজন্যেই কথা উঠেছে সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করা হোক এবং ইংরেজীকে সুযোগরক্ষী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হোক। বলা হোক যে লোকসভায় যে-কোন ভাষায় বক্তৃতা করা চলবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আদান-প্রদান করা চলবে যে-কোন ভাষায় এবং ইংরেজী সহ যে-কোন ভারতীয় মাতৃভাষায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়া যাবে। এতেই আপাতত পাওয়া যাবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান। তারপর যে-ভাষা প্রচারকদের গায়ের জোরে নয়, নিজ প্রাণশক্তিতে একক প্রাধান্য নিতে পারবে, তা-ই হবে ভবিষ্যতের সরকারী ভাষা।"

কিন্তু উপরে উক্ত পথে হিন্দীওয়ালারা যাইতে বা ঐ ব্যবস্থা মানিতে রাজী নহেন, কারণ তাঁহারা জানেন যে হিন্দী সুদূর ভবিষ্যতে যখন সরকারী ভাষা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে, সেই সময় বাঙ্গলা, তামিল, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাগুলি নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবে না—এই ভাষাগুলিও সেই সময় আরো সমৃদ্ধ হইয়া হিন্দীকে আরো বহু গুণে অতিক্রম করিয়া যাইবে। ন্যায়-সঙ্গত পথে চলিলে হিন্দীর ভাগ্যে ভারতের রাজসিংহাসন প্রাপ্তির কোন আশা নাই—কাজেই ঠেঙ্গার জোরে কাজ হাঁসিল করতে হিন্দী ফেরিওয়ালারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছেন যে মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু প্রাণ বলি হইয়াছে—এবং প্রয়োজন হইলে আরো হয়ত হইবে। কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা এবং হিন্দীওয়ালারা আশা করি সময় থাকিতে সাবধান হইবেন—এবং সংহতির নামে ভারতকে ভাঙ্গিয়া চৌদ্দ টুকরা করিবার প্রয়াস সময় থাকিতে পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

'দামোদর' বলিতেছেন:

সদাচার সমিতির গঙ্গাযাত্রা

"গত ১৬ই মে বর্দ্ধমান নগরীতে বহু-আলোচিত সংযুক্ত সদাচার সমিতির আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা বিশ্লেষণের জন্য আহুত সভায় সমিতির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত

হাইকোর্টের জজ শ্রীদেবব্রত মুখার্জ্জী যে ভাষণ দিয়েছেন, তাতে সমিতির কর্ম্মপন্থা ও কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের জনমনে সন্দেহ ও হতাশার উদ্রেক হয়েছে। দেশের প্রতিটি স্তরে যে দুর্নীতি জমাট বেঁধে রয়েছে তাকে অপসারণ করে নূতন আবহাওয়ায় সৎ ও নূতন সমাজ গড়ে তোলবার কঠোর দায়িত্ব নিয়ে সর্ব্বভারতে সমিতি অগ্রসর হচ্ছেন শুনে জাতির মধ্যে একটা নবপ্রেরণা দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যখন ১৯৬৩ সালের ৩০শে নভেম্বর জাতির নিকট অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি যে পরিবেশে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বিভাগে কাজ করেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে তিনি যদি বর্ত্তমান দুর্নীতির অবসান ঘটাতে উল্লেখযোগ্য ফল দেখাতে না পারেন তা হ'লে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ করবেন এবং এ রকম কাজের অযোগ্য বলে তিনি নিজেকে মনে করবেন। জাতির প্রতি শ্রীনন্দের আহ্বানের পর সমগ্র দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল তাতে জাতি যেন একটা নূতন পথের সন্ধান পেল। কিন্তু আজ দেখা গেল শ্রীনন্দের প্রতিজ্ঞার দুই বৎসর পূর্ণ হ'তে না হ'তেই তাঁকে, মন্ত্রীত্ব থেকে নয়,—সদাচার সমিতি হ'তেই বিদায় নিতে হয়েছে। যে সংযুক্ত সদাচার সমিতির তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যখন দল ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের চাপে ডিগবাজি খেলেন, তখন আর জাতি কার উপর ভরসা করবে?

পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত শ্রীদেবব্রত মুখার্জ্জী তাঁর মামুলি বক্তৃতায় শ্রোতাদের চিত্তে এতটুকু আশার সঞ্চার করতে পারেন নাই। এই সমিতিতে রাজনৈতিক দলভুক্ত কেউ থাকতে পারবেন না, নিরপেক্ষ সৎ লোক নিয়ে সমিতি গঠিত হবে, সমিতি সরকারী আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করবেন না, সমিতির দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ এলে তাঁরা সরকারী দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। কি সরকার যে সততার সঙ্গে তা তদন্ত ও দুর্নীতির প্রতিকা করবেন এমন নিশ্চয়তা কোথায়? আমরা মনে করি যদি সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদে ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমিতিতে নেওয়া হ'ত, ত হ'লে কিছুটা কাজ হ'তে পারত। কিন্তু সদাচার সমিতি এ বিষয়ে ছুঁৎমার্গ রেখেছেন। এতেই যদি সমিতি সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয় তখন বর্দ্ধমানে সদাচার সমিতির প্রথ সভায় কংগ্রেস নেতা শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি করা হ'ল কেন? বর্দ্ধমানের জেলা জজ বা কোন বিচারককে ঐ আসনে বসানো উচিত ছিল। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে শ্রীনন্দের বিদায়ের পর সদাচার সমিতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে।"

দেশের সর্ব্বত্রই সদাচার সমিতির এই পরিণাম ঘটিতেছে। শ্রীনন্দ সদাচার সমিতি পরিত্যাগ করিলে সত্য কথা, কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত মন্ত্রিত্ব এখনও ছাড়িলেন না কেন? আমরা মনে করি শ্রীনন্দর মত সজ্জন ও ভদ্র-ব্যক্তির পক্ষে আর বেশী দিন মন্ত্রিত্ব কর হয়ত চলিবে না। দিল্লীর বাদশাখানায় যাঁহার নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারেন, তাঁহারা ভিন্ন-জাতির মানুষ এবং তাঁহাদের কাছে ন্যায় ও নীতির একটা ভি মান ও মাপ আছে—যে মান ও মাপকে সাধারণ মানু ন্যায় ও নীতি বলিয়া মানিতে পারে না।

দিল্লীর বর্ত্তমান আবহাওয়াতে কিছুদিন বসবা করিলেই পণ্ডিত হয় মূর্খ, মূর্খ হয় গণ্ডমুর্খ সৎ হ অসৎ, সাধু হয় চোর, চোর হয় সমাজপতি নির্ম্মল চরিত্রে ময়লার ছাপ পড়ে, দাগী ব্যক্তিরাই বিবেচিত হয় পাকা 'পরিকল্পক' এবং বুদ্ধিমান হইয়া যা বুদ্ধু!!

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

॥ সতের ॥

পদ্মাদেবীর পত্র পাঠ ক'রে দুর্গাভাইএর চিত্ত যুগপৎ ব্যথিত, চমৎকৃত ও বিস্মিত হ'ল। স্বামীকে ত্যাগের উদাস পথে আনতে না পেরে পত্নী নিজেই সংসার ত্যাগ ক'রে কাশী চলে যাচ্ছেন; একমাত্র পুণ্য-প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাড়া এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত আজ আর কোথায় মিলবে?

পদ্মাদেবীর পত্রের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। "দেখবেন, অত বড় মানুষটা যেন অনেক নীচে নেমে না যান।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভাবতে গিয়ে দুর্গাভাই বুকে কোথায় কেমন একটা বেদনা অনুভব করলেন, সত্যিই "এত বড় মানুষ"। অসীম দুঃসাহস; বিরাট বুকের পাটা; এই বয়সেও কি অক্লান্ত শ্রমশক্তি! দশজনকে যে মাপকাঠিতে বিচার করা যায়, তিনি যেন তাঁর বাইরে। অথচ তাঁর সহধর্মিণী সে সাধারণ রাজনীতির মাপকাঠিতেই তাঁকে বিচার করেছেন। রাজনীতিতে "নেমে যাওয়া" কাকে বলে? অন্যায়, দুর্নীতি, অসতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্বার্থকে নিজের বা দলীয় স্বার্থের চেয়ে ছোট করে দেখাই ত "নেমে যাওয়া"। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্ত কি কি অস্ত্র ব্যবহার করেছেন দুর্গাভাই-এর তা জানা নেই। তিনি শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন যে মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এখন গোপনে তাঁর সঙ্গে মিতালি করেছেন বা করতে চাইছেন। এমন কি সুদর্শন দুবেও তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী। কিন্তু কি দাম দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এ অসামান্য সাফল্য কিনতে হয়েছে তিনি জানেন না। অথচ এই নিয়েই পদ্মাদেবীর প্রধান দুশ্চিন্তা! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পতিত মন্ত্রীসভাকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে তার ওপর নেতৃত্ব করবেন যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তাঁর সঙ্গে এতদিনের গৌরব-দৃপ্ত মানুষটির বিশেষ সামঞ্জস্য থাকবে না। যে-সব এম. এল. এ.-দের সুদর্শন দুবে হাত করেছিল তাদের নিজের তাঁবুতে ফিরিয়ে এনেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিসের জোরে? কেন এরা তাঁকে ত্যাগ করে সুদর্শন দুবের দলে ভিড়েছিল, আবার কেনই বা সুদর্শনকে ত্যাগ করে তাঁর কাছে ফিরে এল? দলীয় রাজনীতির এই রহস্যময় অন্ধকার দিক দুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাইর অজানা: আসবার আগে এ নিয়ে এতখানি কৌতূহল কখনও তাঁর হয় নি। অথচ এই কৌতূহল মেটাবার সাহস তাঁর নেই। না-জানার শুচিশুদ্ধতাটুকু তাঁর কৃপণের ধন। জানলে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মন্ত্রীসভায় তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে।

চন্দ্রপ্রসাদ সম্বন্ধে পদ্মাদেবীর অনুরোধ রহস্যে ভরা। সে যে নিজের চেষ্টায় এয়ার ফোর্সে কমিশন পেয়েছে তাতে দুর্গাভাই খুশি; ছেলেটাকে তাঁর বেশ পছন্দ। কিন্তু তাঁর কাছে চন্দ্রপ্রসাদের কি চাইবার আছে? এমন কোনও 'ফেবর' যা পিতার কাছে চাওয়া সম্ভব নয়? দুর্গাভাই-এর মন অনুদার হ'ল। না, তা নিশ্চয় নয়; তা হলে পদ্মাদেবী অমন করে অনুরোধ জানাতেন না।

দুর্গাভাই লন থেকে দপ্তর-ঘরে গিয়ে বসলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ফোন করা দরকার।

হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীর অনুরোধ না-মঞ্জুর করার কথাটা জানাতে হবে। সরোজিনী সহায় যে দেখা করতে আসছে সেটাও বলে রাখা ভাল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারবেন নিশ্চয়। পর্শু রাত্রির ঘটনাও তাঁর জানা।

কিছুক্ষণ পরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই টেলিফোন এল। দুর্গাপ্রসাদ কোশলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার সুপরিচালনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দুর্গাভাই কাজে মনোনিবেশ করলেন।

দুর্গাভাই জানেন দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রিয়তম, যোগ্যতম পুত্র। তার রাজনীতি বিপ্লবাত্মক। গান্ধীপন্থী

দুর্গাভাই শ্রেণী-সংগ্রামে অবিশ্বাসী। সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ তাঁর প্রিয়, কিন্তু সংঘাতের, রক্তিম বিপ্লবের পথ তাঁর গ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া, তাঁর ধারণা, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ মিলনাত্মক ঐতিহ্য আছে; তার গুরুত্ব বহুকে এক করায়, এককে বহু করায় নয়। সমন্বয়ে। বিভক্ত করায় নয়। সুতরাং বিপ্লব বলতে তিনি গান্ধীবাদের চেয়ে বড় কিছু আছে বলে মনে করেন না। সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী বিপ্লব হ'ল মানুষকে নিয়ে। যে বিবর্তন মানব-মনের পরিবর্তন সাধন করে না, তার প্রতি দুর্গাভাইএর আকর্ষণ নেই। তথাপি মুখ্যমন্ত্রীপুত্র দুর্গাপ্রসাদকে তিনি খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, যেহেতু তার নিজের পথে চলবার সাহস আছে, নিজের আদর্শের জন্য কষ্টভোগ করতে সে রাজী। দু'বার তার জেল হয়ে গেছে। দুর্গাভাই জানেন আজকার জেল-জীবনে তাঁদের সময়কার কারাবাসের গৌরব নেই। স্বাধীন ভারতের জেল বন্দী-জীবনের পক্ষে ইংরেজ আমলের চেয়ে দুঃসহ। দুর্গাপ্রসাদ দুবারই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হয়ে সত্যিকারের কষ্টের মধ্যে দেড় বছর কাটিয়েছে। তার বর্তমান অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। কাপড়ের কলে ধর্মঘটের সময় আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রমিকদের দু'জন বাদে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই; সে বলেছে যে ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি পুলিশের মস্তিষ্ক-প্রসূত 'সত্য'। বোধ করি তাই; নতুবা পুলিশ এ কেস সম্বন্ধে এতটা ক্ষীণোৎসাহ হ'ত না। পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছিলেন কেসটা তুলে নেওয়া হোক, কিন্তু পাছে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন যে বিনা কারণে তাঁর পুত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সে ভয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজী হন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিশ্চয় ব্যাপারটা সব জানেন। অথচ কেস যাতে ভাল ভাবে চলে, দুর্গাপ্রসাদ যেন সহজে রেহাই না পায় এ ইচ্ছে তিনি কেন প্রকাশ করলেন দুর্গাভাই সহজে বুঝে উঠতে পারলেন না। নতুন কোনও কারণে কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাপ্রসাদের ওপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছেন? বর্তমান মন্ত্রীত্ব সঙ্কটে কি দুর্গাপ্রসাদ সুদর্শন কোশলকে কোনও রকমে সাহায্য করেছে?

হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলেন দুর্গাভাই। মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এবং তার পরে যা শুনলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

হোম সেক্রেটারী বললেন, "আপনি জানেন নিশ্চয়, স্যর, কোশলজি আরও একটা অর্ডার পাঠিয়েছেন।"

"কি অর্ডার।"

"দুর্গাপ্রসাদজিকে আজ, একটু পরে, গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"তাই নাকি? কেন?"

"হ্যাঁ স্যর। দুর্গাপ্রসাদজি এখন কোশলজির সঙ্গে খাস-কামরায় বাতচিত করছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বাইরে এলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বাইরে এলেই?"

"জি। দুর্গাপ্রসাদ এখন 'বেইলে' আছেন। 'বেইল' প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুরাতন অভিযোগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।"

দুর্গাভাইএর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে পড়ল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগে থাকতেই তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অথচ কি কারণে এমন নাটকীয় ঘটনার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করতে বাধ্য হলেন তা দুর্গাভাইএর হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। খুব বড় কারণ না থাকলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে দুর্গাপ্রসাদকে মুখ্যমন্ত্রী ভবনের সামনেই পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না, এ বিশ্বাস দুর্গাভাইএর ছিল। একমাত্র একটাই সম্ভবপর কারণ তিনি খুঁজে পেলেন। দুর্গাপ্রসাদ নিশ্চয় পিতার বিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসনকে দুর্বল করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গুপ্তচরেরা তার কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। নতুবা এই নিদারুণ ঘটনার প্রয়োজন কিছুতেই হ'ত না।

অনেকটা শান্ত হলেন দুর্গাভাই। অন্তরে একদিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। মনে পড়ল, মুখ্যমন্ত্রী একদিন বলেছিলেন, যারা রক্তাক্ত বিপ্লব চায় এবং নিজেদের বামপন্থী বলে, তাদের কাছে পথের অর্থ কেবল লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য। "ধরুন, বর্তমান মন্ত্রীত্ব-সঙ্কট। এরা জানে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সুদর্শন দুবে অথবা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির চেয়ে ভাল মুখ্যমন্ত্রী। জানে বলেই তাঁর পতন ঘটাতে এদের এত উৎসাহ। সুদর্শন দুবে

বা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠিকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারলে উদয়াচলের শাসন দুর্বল ও জনকল্যাণ পঙ্গু হবে; জনসাধারণের অসন্তোষ যাবে বেড়ে; এবং এদের আন্দোলন করবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সত্যিই রাজনীতি বোঝেন। এই যে প্রিয়তম পুত্রের হাতে নিজেই নিজভবনের দ্বারদেশে পুনরায় শৃঙ্খল পরালেন এর পেছনে তাঁর কংগ্রেস-প্রেম ও উদয়াচলের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক আবেগ রয়েছে।

অন্যদিকে, দলীয় রাজনীতি দুর্গাভাইর কাছে আরও কদর্য ও বিভীষিকাময় রূপে দেখা দিল। যে-রাজনীতিতে বিপক্ষ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের সাহায্য নেয়, তার বাইরে থাকতে পারার জন্য তিনি পুনর্বার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন।

চিন্তাকুল চোখে দেখতে পেলেন চন্দ্রপ্রসাদ দপ্তরঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। সাক্ষাৎপ্রার্থী।

তাকে ভেতরে না ডেকে নিজেই বাইরে এলেন।

বললেন, "বসন্তকে পেলে?"

চন্দ্রপ্রসাদ চমকে উঠে, গম্ভীর হয়ে বলল, "অন্দরেই ছিল।"

"তোমার কাকীমা কোথায় গেলেন বলতে পার?"

"আপনার সেবায়।"

"হুঁম। এস, লনে বসি। দেহটা তেমন ভাল লাগছে না।"

"কিছু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে? ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না, কাকাবাবু।"

"না, তেমন কিছু নয়।"

"এক কাজ করুন, কাকাবাবু। আপনি অন্দরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি বসছি আপনার দপ্তরে। জানেন না বোধ হয় আমি অন্যের গলা বেশ ভাল নকল করতে পারি। দেখুন, আপনার স্বরে কথা বলছি।"

নিজ কণ্ঠের নিখুঁত অনুকরণ শুনে দুর্গাভাই বালক-সুলভ কৌতুকে জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর অনুরোধে চন্দ্রপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এবং অন্য মন্ত্রীদের স্বরও অনুকরণ করে শোনাল।

"পরীক্ষায় পাশ, কাকাবাবু?"

"ফার্স্ট ক্লাস।"

"তবু একটা পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেলাম।"

দুর্গাভাই পুনরায় হেসে উঠলেন।

"তা হ'লে, কাকাবাবু, আপনি ভেতরে যান। আমি আপনার কাজকর্ম কয়েক ঘণ্টা ঠিক চালিয়ে নেব। টেলিফোন এলে বলব, একটু অপেক্ষা করুন। আপনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসব। তার পর ...ব্যাপারটা খুব সোজা।"

"যদি গিয়ে দেখ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

"ফিরে এসে টেলিফোনের মধ্যে ঠিক আপনার মত নাক ডাকতে সুরু করব। অপর পক্ষ বুঝবেন, আপনি ঘুমুচ্ছেন।"

হাসতে হাসতে দুর্গাভাই বললেন, "তুমি চেয়ার টেনে ব'সো। শোবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে একটু কথা বললেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

"বসন্তকে ডাকি, কাকাবাবু?"

"ডাকবে? আচ্ছা, একটু পরে ডেকো। তোমাকে দুটো-একটা প্রশ্ন করব।"

"বলুন।"

"তোমার ভাই দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কিছু আছে কি?"

"পিতাজির সঙ্গে নেই। মাতাজি এতদিন ও-বাড়ীতে যান নি। পিতাজির সম্মতি ছিল না। দুর্গাপ্রসাদ ভাইয়া মাঝে-মধ্যে মা'র সঙ্গে এসে দেখা করেন। আজ সন্ধ্যায় মা যাবেন ওঁর বাড়ী। পিতাজির অনুমতি পেয়েছেন।"

"তোমরা, ভাইরা?"

"বড়ে ভাইয়া এক-দু'বার গেছেন। স্বর্গপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্ক রাখে না। আমি হরদম যাই।"

"তুমি হরদম যাও? কেন?"

"কারণ অনেক, কাকাবাবু। প্রথমত, আমার কিছু করার নেই, আমি বেকার। দ্বিতীয়ত, কমলা ভাবীকে আমার বড় ভাল লাগে। তৃতীয়ত, ওদের একটা মেয়ে আছে, তার সঙ্গে খেলতে আমার ভয়ানক মজা লাগে। চতুর্থত, গেলেই ভাবীজি ভাল ভাল খাবার দেন। পঞ্চমত, মেজ ভাইয়াকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

"তুমি জান আজ দুর্গাপ্রসাদ তোমার বাবার সঙ্গে

দেখা করতে এসেছে? এখন বোধ হয় তারা একসঙ্গে?"

"জানি না ত। পিতাজি নিশ্চয় মেজ ভাইয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিজে তিনি কখনও আসবেন না।"

"তুমি এতে বিস্মিত হচ্ছ না?"

"পিতাজির কোনও কাজেই আমি অবাক হই না। কারণ ও প্রয়োজন না থাকলে তিনি কিছু করেন না।"

"এবার তোমায় যা বলব তাতে তুমি নিশ্চয় অবাক হবে।"

দুর্গাভাই একটু সময়ের জন্য নীরব রইলেন। ভেবে নিলেন, বলা ঠিক হবে কি না।

"দুর্গাভাই তোমাদের বাড়ীর বাইরে হওয়া মাত্র পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। তোমার পিতাজিই এ অর্ডার দিয়েছেন। আমাকে জানান নি পর্যন্ত।"

চন্দ্রপ্রসাদ ক্ষণিক স্তব্ধতার পরে বলল, "ভালই হ'ল।"

"ভাল হ'ল? কেন?"

"মেজ ভাইয়ার একটু বিশ্রাম দরকার। বড় বেশি পরিশ্রম করতে হয়। সেদিন বলছিলেন, পড়াশোনার সময় পাইনে, আর একবার জেলে না গেলে চলছে না। বলে দে না পিতাজিকে!"

"তুমি বলেছিলে?"

"না। ভুলে গিয়েছিলাম। তবে, পিতাজি অনেক সময় আমার মনের কথা বুঝতে পারেন।"

"তা হ'লে এতেও তুমি অবাক্ হচ্ছ না।"

"কাকাবাবু, আমি রাজনীতি একেবারে বুঝি না। ও নিয়ে মাথাও ঘামাই না।"

"কবে যাচ্ছ কাশীতে?"

"মাকে নিয়ে যাচ্ছি। মা যখন যাবেন, তখন।"

"কবে যাবেন, জান?"

"না। তবে আন্দাজ করছি, আজ রাতে, নয় কাল সকালে।"

"এত জলদি?"

"ভুলে যাবেন না, কাল পিতাজির পুনর্নির্বাচনের কন্‌টেষ্ট্।"

"ও।"

বসন্ত এসে কখন পাশে দাঁড়িয়েছে দুর্গাভাই দেখতে পান নি।

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "কাকাবাবুর শরীর ভাল নেই।"

বসন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে পিতাজি। ডাক্তার সাবকে খবর দেব?"

চন্দ্রপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলল, "চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি ইলাজ করছি।"

"তুমি?"

"জিজ্ঞেস করে দেখ! কাকাবাবু, আপনি একটু ভাল বোধ করছেন না?"

"অনেকটা।"

"দেখলে?"

"পিতাজি, আপনি ভেতরে গিয়ে একটু শোবেন?"

"না, মা। আমি বেশ আছি।"

"চন্দ্রপ্রসাদ!"

"বলুন।"

"তোমাকে আর একটা কি প্রশ্ন করার ছিল। মনে পড়ছে না।"

"মনে করিয়ে দেব?"

"তাও দিতে পার নাকি?"

"নিশ্চয় বসন্তকে নিয়ে কিছু।"

"আমাকে নিয়ে কেন? আমাকে নিয়ে পিতাজি তোমাকে প্রশ্ন করবেন কেন?"

"কাকাবাবু, মনে পড়েছে?"

"পড়েছে। বসন্তকে নিয়ে নয়। তোমাকে নিয়ে।"

"আমাকে?"

"তোমার মাতৃদেবী লিখেছেন, তুমি যদি কিছু প্রার্থনা কর—"

"পিতাজি, আমি আসছি।"

"বসন্ত অমন করে পালাল কেন?"

"পেটে কামড় দিয়েছে বোধ হয়।"

"কি প্রার্থনা হে তোমার?"

"কাকাবাবু—"

হঠাৎ দুর্গাভাই বুঝতে পারলেন। এতক্ষণের রহস্য কিসের যাদুতে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখ গম্ভীর হ'ল। চিন্তার কুঞ্চন ফুটে উঠল কপালে।

"তুমি বসন্তকে বিবাহ করতে চাও?"

"আপনার অনুমতি পেলে।"

"তোমার কাকিমা সহজে রাজী হবেন না।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন তা হ'লে তাঁকে আমরা রাজী করাব।"

একটু পরে: "মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ? লোকে বলবে কি?"

"সাধু বলবে, কাকাবাবু।"

"কেন?"

"বলবে দুর্গাভাই কৃপা ক'রে কন্যাকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি। তোমাদের ধৈর্য আছে ত?"

"আছে।"

"তোমার পিতাজির সম্মতি আছে?"

"আছে। তিনি নিজেই আপনার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসবেন, বলেছিলেন।"

"না, না। তিনি কেন আসবেন? তিনি পাত্রের পিতা।"

"পিতাজি বলছিলেন, দুর্গাভাইজি কখনও কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাজির হবেন না।"

"বললেন? বললেন বুঝি?"

"জি হাঁ।"

"ঠিক বলেছেন। আমাকে চেনেন কোশলজি।"

দুর্গাভাইএর আত্মতৃপ্ত হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে চন্দ্রপ্রসাদ বলল:

"আপনাকে আমরাও চিনি, কাকাবাবু।"

॥ আঠার ॥

মুখ্যমন্ত্রী ভবনের সিংহদ্বারপ্রান্তে দুর্গাপ্রসাদের অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারের খবর অল্প সময়ে বিলাসপুরে ছড়িয়ে পড়ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিগত অনুরোধে বিলাসপুরে বেতার-কেন্দ্র হ'তে খবরটা জনসাধারণকে জানান হ'ল বৈকালিক প্রোগ্রামের প্রারম্ভেই।

সীতাচরণ পণ্ডিতকে কাছে ডেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কি ভাবে সংবাদটি পরিবেশন করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে "মর্নিং টাইম্‌স্"-এর জরুরী এডিশন বেরিয়ে গেল।

সীতাচরণ পণ্ডিতের রচিত রিপোর্ট পড়ে সম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায় চমৎকৃত হ'ল।

"পণ্ডিতজি", সীতাচরণকে বলল সে, "এ ত বহুৎ খুব!"

সীতাচরণের মুখে যে-হাসি ফুটল তার অর্থ, রেখে দিন, সম্পাদক মশাই, আর জ্বালাবেন না।

"এ নাটকীয় দুর্ঘটনার মানে, পণ্ডিতজি?"

সীতাচরণ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বিধাতা পুরুষের ইঙ্গিত করল।

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় আপন মনে বলে চলল, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ধুরন্ধর ব্যক্তি হ'তে পারেন, রাজনীতিতে বিবেক বস্তুটি অচল হ'তে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটা কেবল একটা ষ্টাণ্ট্ এ কথা মন মানতে চাইছে না। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর প্রিয়তম পুত্র। তাকে নিজের বাড়ীর সামনে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করা হ'ল, এতে জনসাধারণের কাছে কোশলজির "কঠিন-মানুষ" পরিচয় আর একবার বিঘোষিত হবে। সবাই ভাববে, দুর্গাপ্রসাদ তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, যদিও সংবাদপত্রে তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ একেবারে অন্য বলে প্রচার করা হচ্ছে। এতে একদল লোক যেমন কোশলজির লৌহকঠিন দৃঢ় মনের প্রশংসা করবে, অন্য একদল বলবে, তিনি বাপ হয়ে ছেলের হাতে শৃঙ্খল পরালেন নিজের গদি রক্ষা করার জন্যে। কি এমন বড় লাভের জন্য কোশলজি এ কাজটা করলেন, মাথায় ঢুকছে না।"

সীতাচরণের দিকে তাকিয়ে, "পণ্ডিতজি, কিছু আলো দান করুন না?"

ক্লান্ত সীতাচরণ হাই তুলল ডান আঙুলে তুড়ি কেটে।

বলল, "আলো বলুন, অন্ধকার বলুন, সব ঐ কোশলজির কাছে। তবে—"

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সীতাচরণ।

"তবে কি?"

"তবে, জগমোহন তিওয়ারী এখুনি এখানে আসছে।"

"সাপ্লিমেণ্ট ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে ?"

"জি হাঁ।"

"সেজন্তেই এসেছে বোধ হয়।"

এমন সময় তিওয়ারী দ্বারপথে এসে দাঁড়াল।

"কোনও সেবা, এডিটর সাব ?"

সুভাষের হঠাৎ মনে হ'ল তিওয়ারীকে বীভৎস দেখাচ্ছে। চোখে-মুখে সজীবতার চিহ্নমাত্র নেই। ছোটবেলায় কবর থেকে উঠে-আসা মরা মানুষের অভিযান দেখেছিল সিনেমায়। তিওয়ারী যেন কবর থেকে উঠে-আসা মৃত মানুষ। কোটরাগত চোখ প্রায় নিষ্পলক ; জীবন্ত সঞ্চালন নেই, আছে মরা, ধারাবাহিক, শীতল চেয়ে থাকা। হাড়-বার-করা গালের সঙ্গে চামড়া লেপ্টে রয়েছে ; মোটা ওষ্ঠাধর পান-দোক্তার কষে কুৎসিত।

মনে পড়ল অম্বিকাপ্রসাদের কথা, "পিতাজি মুখ্যমন্ত্রীত্বে পুনর্বার বহাল হবার পর, আপনাকে বলে দিলাম, আপনার কাগজের মালিক হবে জগন্মোহন তিওয়ারী। ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে নাম বেরবে তারই।"

মনে মনে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগপত্র রচনা করতে প্রবৃত্ত হ'ল।

মুখে বলল, "আসুন, তিওয়ারীজি, আসুন। একটু বসুন এসে। এক কাপ চা হোক।"

তিওয়ারী ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল।

সীতাচরণ পণ্ডিত বলল, "আমি প্রেসে যাচ্ছি।"

"ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারখানা কপি নিয়ে আসুন।"

প্রস্থানরত সীতাচরণের দিকে তাকিয়ে তিওয়ারী প্রশ্ন করল, "বয়স কত হ'ল ?"

"কার ? আমার ?"—সুভাষের কণ্ঠে বিস্ময়।

"না। সীতাচরণের।"

"জানি নে। পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে।"

"ওকে দিয়ে কাজ হয় ?"

"কোশলজির নিজের লোক। বেশ সাচ্চা মানুষ। পরিশ্রমও করেন খুব।"

"মাইনে কত ?"

"তিন শ'।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের কেমন অস্বস্তি লাগল। তিওয়ারী কি এখন হ'তেই কাগজের মালিক হয়ে বসল নাকি ?

"কেন ?" সে অনুসন্ধানী প্রশ্ন করল। "এ সব কথা কেন, তিওয়ারীজি ? পণ্ডিতজিকে অবসর দেবেন নাকি ?"

"অবসর দেওয়া-না-দেওয়া কোশলজির ইচ্ছে।"

"তা হ'লে কি মাইনে বাড়াবেন ? কিছু বাড়ালে বেশ হয়।"

তিওয়ারীর দৃষ্টি কঠিন।

চা এসে গেল। দু'জনে দু'কাপ হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

"এ ঘটনার তাৎপর্য কি, তিওয়ারীজি ?"—সুভাষ প্রশ্ন করল, কথোপকথনের তাগিদে।

"কোন্ ঘটনার ?"

"এই গ্রেপ্তারের ?"

তিওয়ারী যেন কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হ'ল। চা খুব গরম ছিল না। দু' মিনিটে পান করে ফেলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোশলজি আপনাকে একবার ডেকেছেন। সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশে।"

"হাজির হব।"

জগন্মোহন তিওয়ারী চেয়ার ছেড়ে উঠল। ডান হাত কপালের দিকে তুলে নমস্তের ভঙ্গি করল। সোজা চলে গেল ছাপাখানায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল 'ভারত টাইমস'-এর সংবাদদাতা গোপালকৃষ্ণণকে প্রায় আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখবার জন্য মার্জনা চাইলেন।

"ভারত টাইমস" বাইরের কাগজ হ'লেও উদয়াচলে সর্বাধিক প্রচারিত। ভারতবর্ষে অন্যতম প্রধান সংবাদ-পত্র। গোপালকৃষ্ণণ মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র।

"আজকের দিনটা এত ব্যস্ত যে সময় আর কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছি নে। মাপ ক'রো।"

গোপালকৃষ্ণণকে বসিয়ে নিবেদন করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে কোনও সাংবাদিককে বেকার বসে থাকতে হয় না, কোশলজি।"

"অর্থাৎ তুমি এই আধঘণ্টা একেবারেই বেকার ছিলে না।"

"ঠিক তাই।"

"বেশ। তা হ'লে আমার আফসোসের কারণ কমল। সময় খুব কম। তুমি একটা স্পেশাল ইনটারভিউ চেয়েছিলে। আধঘণ্টা সময় তোমাকে দিতে পারি।"

"অনেক ধন্যবাদ। কি কি বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাব?"

"যে-কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করতে পার। শুধু, আধ-ঘণ্টার বেশী সময় দিতে পারব না।"

নোটবই-পেন্সিল নিয়ে তৈরী গোপালকৃষ্ণণ প্রশ্ন করল:

"আগামী কাল বিধান সভার কংগ্রেস পার্টি নতুন দলপতি নির্বাচন করবে। আপনি ত অন্যতম প্রার্থী। নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে আপনার আন্দাজ জানতে পারি কি?"

"বিধান সভায় কংগ্রেস দল আগামী কাল বিকেলে একত্রিত হচ্ছেন। প্রধান কর্তব্য, দলপতি নির্বাচন। আমি দলপতি পদে পুনর্নির্বাচনের প্রার্থী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেসী দলের অধিকাংশ সদস্য আমাকে নির্বাচন করবেন। সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনের সম্ভাবনাও কম নয়।"

"অন্য প্রার্থী কে বা কারা?"

"আমার জানা নেই। সম্ভবত কনটেষ্ট হবেই না।"

"এ আশার কথা একেবারে নতুন। জনসাধারণের ধারণা কনটেষ্ট হবে। হবে না, এমন ধারণা করবার কারণ বলবেন কি?"

"কংগ্রেস এখনও একটি সুসংবদ্ধ এক-মত এক-পথ রাজনৈতিক দল নয়। কংগ্রেস বহু মানুষের, বহু মত ও পথের মিলিত সংগঠন। ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতীক। কংগ্রেসের ঐতিহ্য একসঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা। কংগ্রেসের ইতিহাস পড়লে দেখবে, বার বার মত ও পথের সংঘাত হয়েছে, কিন্তু কখনও ঐক্য নষ্ট হয়ে যায় নি। উদয়াচলের কংগ্রেসেও বর্তমানে মত ও পথের কিছুটা সংঘাত দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্মীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য, দেশের সেবা ও উন্নয়ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল পার্টি মিটিংএ কংগ্রেসের ঐক্য বিভেদের চেয়ে বলবান প্রমাণিত হবে।"

"এ আশা পোষণ করবার কি কোনও বাস্তব কারণ আছে।"

"আশাটাই ত পুরো বাস্তব। কারণও আছে।"

"জানতে পারি কি?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখে আনন্দিত হয়েছি, যে, উদয়াচলের কংগ্রেস-নেতারা আজ থেকেই ঐক্য ও সংহতির কথা গভীর ভাবে ভাবছেন।"

"আপনার প্রতিপক্ষ, সুদর্শন দুবেজির সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে?"

"সুদর্শন দুবে উদয়াচল কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি বহু দিনের দেশসেবক, জনপ্রিয় দেশনেতা। তাঁর সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁকে আমি চিরদিন সহকর্মী হিসাবে শ্রদ্ধা করে এসেছি, এখনও করি। শাসনকার্যে সব সময়েই প্রয়োজনমত তাঁর পরামর্শ আমি নিয়েছি, এবং অনেক সময় তাঁর পরামর্শে অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। এখনও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হচ্ছে। আজ সকালে এ গৃহে প্রথম আগন্তুক ছিলেন তিনি, এবং আজ রাত্রিতেও হয়ত তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় আলাপ-আলোচনা হবে।"

"এ কথা কি সত্যি যে সুদর্শন দুবে আপনাকে কতগুলি আপোষ প্রস্তাব দিয়েছেন? আপনি যদি তাঁকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করেন, তিনি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?"

"না। সুদর্শন দুবে এখন কোনও প্রস্তাব আমাকে দেন নি। দেবার মত লোকও তিনি নন। মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ নেই বলেই আমি জানি।"

"আপনার ও তাঁর দল একত্র হয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা আছে কি?"

"মন্ত্রীসভা কোনও দলাদলির ভিত্তিতে গঠিত হয় না। কোনও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীই এ ভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করেন না। অপর পক্ষে, প্রত্যেক মন্ত্রীসভাতেই বিভিন্ন স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

দুর্গাভাইজি, সুদর্শন দুবে ও আমি একত্র বসে সর্বজনগ্রাহ্য মন্ত্রীসভা স্বল্পায়াসে গঠন করতে পারব।"

"এ বিষয়ে হাই কমাণ্ডের নির্দেশ কি?"

"হাই কমাণ্ড চান উদয়াচলে কংগ্রেস এতদিন যে-ভাবে সংহতি ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে শাসনকাজ চালিয়ে এসেছে ভবিষ্যতেও তেমনি চালিয়ে যাক। হাই কমাণ্ড কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"আপনি যদি পুনরায় দলপতি নির্বাচিত হন, মন্ত্রীসভা কাদের দিয়ে গঠন করবেন ভেবেছেন কি?"

"এ প্রশ্ন বর্তমানে ওঠে না। এ ভাবনার সময় এখনও আসে নি।"

"আপনার সহকর্মীদের সবাই কি স্থান পাবেন?"

"আমার সহকর্মীদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁরা উদয়াচলের মঙ্গলের জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করেছেন। দোষত্রুটি স্খলন যদি কিছু হয়ে থাকে তার দায়িত্ব আমার এবং সমগ্র মন্ত্রীসভার। যদি আমি পুনর্বার মন্ত্রীত্ব গঠনের সুযোগ পাই, আমার বর্তমান সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা আমার অন্যতম প্রধান কাম্য হবে। তাঁরা কেউ মন্ত্রীত্বলোভী নন। মন্ত্রীসভার বাইরে থেকেও দেশের সেবা করতে তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত।"

"বর্তমান মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা অথবা তার অভাব সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন কি?"

"গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সরকারের সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের। হয়ত আলোচনার চেয়ে সমালোচনা আমরা বেশি করে থাকি; ওটা আমাদের জাতীয় স্বভাব। তা ছাড়া, আমাদের দেশের নীতি হ'ল 'যত-সম্ভব-বেশি গভর্ণমেণ্ট', যত-সম্ভব-কম গভর্ণমেণ্ট নয়। অর্থাৎ, সরকার জনকল্যাণকে আদর্শ করে অনেক কিছু একসঙ্গে করতে চাইছেন, অন্তত করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। তাতেও জনসাধারণ বেশি সমালোচনা বা নিন্দার হেতু খুঁজে পাচ্ছেন। যেখানে যা কিছুর অভাব, জনসাধারণ দাবি করছেন, সরকার তা পূর্ণ করবেন, এবং আমরাও এ দাবি মেনে নিয়ে কেবলমাত্র সময়, ধৈর্য এবং সহযোগিতা চাইছি। অথচ আমরা জানি, জনকল্যাণ সাধন করতে বহু বছর লাগবে, জনগণের দাবি মেটাতে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কিছু গণ-অসন্তোষ অনিবার্য। কংগ্রেসী শাসনে আমরা কাউকে পুরো খুশি করতে পারব না; কেননা কংগ্রেস কোনও বিশেষ শ্রেণীর সংগঠন নয়। মালিক বলুন, শ্রমিক বলুন, জমিদার কি রায়ৎ, মধ্যবিত্ত কি উচ্চবিত্ত, গ্রামীণ মানুষ কি সহর-বাসিন্দা, ছাত্র কি শিক্ষক—কেউ এ শাসনে পুরো সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা হচ্ছে কোনও শ্রেণীকে পুরো অসন্তুষ্ট করেও আমরা রাখি নি, রাখব না। এই হ'ল কংগ্রেসী সমাজবাদের মূল কথা। সবাই আমাদের কম-বেশি নিন্দা করবে, কিন্তু ভোটের সময় অধিকাংশই গিয়ে দাঁড়াবে কংগ্রেসের তাঁবুতে। তারা জানে কংগ্রেসী রাজত্বে কিছু মঙ্গল তাদের সবারই হয়েছে। কেউ খালি হাতে ফিরে যায় নি কংগ্রেসী রাজদরবার থেকে।"

"এবার আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।"

"করো। সময় কিন্তু বেশি নেই।"

"একটু আগে আপনার বাড়ীর দরজায় দুর্গাপ্রসাদ কোশলকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। এ আদেশ কি আপনি দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"গ্রেপ্তারের আগে তাঁর সঙ্গে আপনার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। আপনি কি তাঁকে বিপজ্জনক রাজনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়েছিলেন?"

"না। দুর্গাপ্রসাদ আমার ছেলে। তার প্রতি আমার দুর্বলতা কারুর অজানা নেই। বহু দিন তাকে দেখি নি, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে পারিবারিক কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা হয় নি। ফটকের বাইরে যাবার আগে গ্রেপ্তারের কথা সে একেবারেই জানত না।"

"এ গ্রেপ্তারের কি সত্যই প্রয়োজন ছিল?"

ম্লান হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "না থাকলে পিতা পুত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দিত না।"

"দুর্গাপ্রসাদ কোশলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?"

"উদয়াচলের শান্তি ও শৃঙ্খলা নিরাপদ রাখার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

পাঁচটা বাজতেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করলেন।

"এবার শেষ করতে হয়। অনেক সহকর্মী আসছেন দেখা করতে। আজ আমার একেবারে সময় নেই।"

"ধন্যবাদ, কোশলজি।" গোপালকৃষ্ণণ বিদায় নিতে নিতে বলল, "আশা করি কাগজে ইণ্টারভিউটা বেশ ভাল করেই ছাপা হবে।"

"এবার আমার একটা অনুরোধ আছে।"

"নিশ্চয়।"

"এই ইণ্টারভিউটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুদর্শন দুবে জানতে পারলে ভাল হয়।"

"সবটা?"

"অন্তত তার সম্বন্ধে আমি যা বলেছি।"

"বেশ ত।"

"কৌশলে জানাতে হবে। সে যেন ধারণা না করে যে আমার কথায় তুমি তাকে বলেছ।"

"বুঝতে পেরেছি।"

গোপালকৃষ্ণণ বিদায় নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে তলব করলেন।

"কাল সকালের 'ভারত টাইমস্' প্রত্যেক কংগ্রেসী এম. এল. এ-র হাতে আটটার মধ্যে পৌঁছন চাই।"

"জি।"

"নীচে কারা বসে আছেন?"

"বালকৃষ্ণ শুক্লজি, হরিসাধন ইংলে-জি, আর তুলসীদাস গৌতমজি।"

"হুঁম। আচ্ছা, এঁদের তিনজনকে একসঙ্গে নিয়ে এস।"

তিওয়ারী দরজার বাইরে যাবার আগেই আবার ডাক পড়ল।

"শোন।"

ভিতরে এসে দাঁড়াতে, "তোমার কাজে বেশ গাফিলতি দেখতে পাচ্ছি।"

তিওয়ারী নীরব জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে রইল।

"মনে রেখ, তোমার ওপরে নজর রাখবার লোকও রয়েছে।"

"কিছু গলতি হয়েছে কি আমার?"

"যা করেছ—বা কর নি—তুমি ভালই জান। তুমি আমার সেবা কম কর নি। তোমাকে আমি অনেক দিয়েছি। আরও দেব। কিন্তু লোভকে ভয়ানক বাড়িয়ে তুল না। সর্বনাশ হবে।"

তিওয়ারী কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে:

"এখন নয়। তোমার কথাও আজই শুনব। রাত ন'টার পরে। এখন যাও, কাজ করগে।"

উঠে দাঁড়াতে:

"সেই মেয়েটির সঙ্গে সংযোগ করেছ?"

"জি হাঁ।"

"কি বলে সে?"

"দেখা করতে চায়।"

"কবে?"

"আজই।"

"আচ্ছা দাঁড়াও।" একখণ্ড কাগজে আজকার কর্মসূচী লিখে রেখেছিলেন। তাতে চোখ রেখে, "আটটা দশ মিনিটে হ'তে পারে। খবর পাঠিয়ে দাও।"

দেড় ঘণ্টা ধরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপদলপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। কাউকে ডেকে আনলেন একা; আবার কয়েকজনকে এক সঙ্গে। বিস্তারিত কথাবার্তা নয়; যে-রাজনৈতিক সংলাপ আগে থেকেই চলে আসছিল তার সুচারু সমাপ্তি। কারুর কারুর কাছে তিনি কঠিন হলেন, আবার কারুর কাছে ননীর মত কোমল। সবাই দেখতে পেলেন, দেখে বিস্মিত হলেন, মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে আগে থেকেই ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত প্রস্তুত রেখেছেন। অনেকে সচকিত হয়ে দেখতে পেলেন তাঁদের কার্যকলাপের এমন বিশেষ কিছু নেই যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অজানা; কেউ কেউ ভীত হয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী এ সব গোপন তথ্য স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহারে উদ্যত; আবার অনেকে দেখে আশ্বস্ত হলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা, জীবন-ধারণের প্রয়োজনে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে মানুষ যা ক'রে থাকেন তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল; তাঁর সংবেদন-সিক্ত ব্যবহারে তাঁদের চক্ষু আর্দ্র হ'ল। অনেকের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাঁচ-দশ মিনিটের রাজনৈতিক বিতর্কে

সংযুক্ত হয়ে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর এমন সব অকাট্য তথ্য ও যুক্তি রয়েছে যার কাছে তাঁদের অভিযোগ দাঁড়াতে পারে না। আবার কারুর কাছে অকপট বিনয়ে ও মার্জনাভিক্ষায় তিনি এমন ভাবে অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে তাঁদের মানতে হ'ল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্বের দৃঢ়তা। যাঁদের নালিশ ছিল যে তাঁদের জিলার চেয়ে অন্য জিলার উন্নতিকল্পে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরে হতবাক হ'লেন যে তাঁদের নালিশ সত্যি নয়। আবার দু' ক্ষেত্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ত্রুটী স্বীকার করে ভবিষ্যতে পুরোপুরি পুষিয়ে দেবার অঙ্গীকার দ্বারা সমর্থন জয় করলেন। যার যা কাম্য, প্রার্থনা, অভিযোগ, নালিশ, সব তিনি ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে শুনলেন। উপদলপতিগণ প্রদেশের ঘটনাবলী ও জীবনযাত্রা বিষয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জ্ঞানের ব্যাপকতায় বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কোন্ জিলায় কি শস্য উৎপন্ন হয়; কোথায় কোন পুরাতন বা নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে; কোন সহরে কি নিয়ে সাম্প্রতিক কালে কোন্ কলহের সূত্রপাত হয়েছে; কোথায় কোন নদী, পাহাড়, অরণ্য; কোন সহরের কোন কংগ্রেসকর্মী কবে উল্লেখযোগ্য কি করেছে; অথবা কোন সহর বা গ্রামাঞ্চলের বিশেষ কি সমস্যা: সব তাঁর নখদর্পণে। কারুর নাম তিনি কদাচ বিস্মৃত হন না; কোনও মুখ একবার দেখলে কোনও দিন ভোলেন না। বায়াবৃদ্ধ আগন্তুককে পুত্র-কন্যাদের নাম উল্লেখ ক'রে কুশল প্রশ্নে তিনি যেমন বিগলিত করলেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত নবীনদের বিস্মিত করলেন পিতা, পিতামহের খবর জানতে চেয়ে। লছমনপুর জিলার কৃষাণ সভার সভাপতি রসুল মহম্মদকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অভিভূত করে ফেললেন।

"জনাব, আপনার একটা জাঁদরেল গাভী ছিল। সে এখন কেমন আছে?"

গাভীটি রসুল মহম্মদ পাঞ্জাব থেকে কিনে এনেছিলেন। ষোল থেকে বাইশ সের দুধ দেয় সে। রসুল মহম্মদের তাকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই।

"ভাল আছে, কোশলজি। কিন্তু তার খবর আপ[নি] জানলেন কি করে?"

"তাই ত, রসুল মিঞা! আপনারা ভাবেন আমি [শু]ধু মুখ্যমন্ত্রীত্বই করি—আপনাদের কারুর কোনও খব[র] রাখি না। আপনার গরুটি পাঞ্জাবের ফিরোজপু[র] থেকে কেনা, গত বছর রোজ আধ মণ দুধ দিত; প্রাদেশিক গোবর্ধন মেলায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। চকচকে কালো আর সাদা দেখতে, কি বলেন?"

"জি হাঁ। কিন্তু—"

"তাই ত, রসুল মিঞা, আমি জানি কি ক'রে? আমিও ত চাষী—আপনার মত আমিও এককালে কৃষানপুর কৃষাণসভার সভাপতি ছিলাম। আপনি আমি হচ্ছি এক দলের লোক—আর আজ কি না আপনি সুদর্শন দুবের সঙ্গে ভিড়েছেন?"

"না, কোশলজি। আমি মোটেই পাকা ভিড়ি নি। তবে কি না—"

"মানছি, আপনার জিলায় সে রকম রাস্তা তৈরী হয় নি। সেচের যে খাল তৈরী হয়েছে, আপনার জমির সামনে দিয়ে তা কেটে নেওয়া উচিত ছিল, তাও হয় নি। আপনার ছেলে মুন্সেফের পদের জন্য দরখাস্ত করেছে তাও আমার অজানা নয়। লছমনপুর জেলায় আরও দু'-তিনটি মাদ্রাসা তৈরী করাও এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এ সব সামান্য ব্যাপার আপনি আগে থেকে আমাকে জানালেই পারতেন।"

"আপনাকে ত দু'-তিনবার বলেছিলাম। একটা মেমোরেণ্ডামও পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি? কসুর হয়ে গেছে। নানা কাজে হয়ত ওদিকে মন দিতে পারি নি। কিন্তু ঠিক মনে আছে সব কিছু। দেখুন, আরও বলছি, আপনার কথা। আপনার ছোট ছেলে আকবর আলির বিরুদ্ধে গাড়ি[র] পারমিট বিক্রী করার অভিযোগে পুলিশ কেস চলছে। ঠিক কি না?"

"আজ্ঞে, সে নির্দোষ।"

"নির্দোষ বৈকি। তাই ত ভাবছি ও কেসটা তুলে নেওয়া সম্ভব কি না।"

"কোশলজি, আমি—আমরা তিন জন—আপনার সঙ্গেই আছি। অন্য দু'জনের কথাও একটু ভাববেন।'

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। জনাব মনসুর আলি এবং জনাব রুস্তম খান। এই দেখুন এঁরা কি চান তাও আমি ফাইলে লিখে রেখেছি।"

রসুল মিঞা বিদায় নেবার ঠিক আগে:

"ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, মিঞা সাহেব, আমাদের সবারই আছে। আমরা দেশসেবী হ'লেও মানুষ ত বটে। তবু আমি জানি আপনারা আমার পাশে দাঁড়াবেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, উদয়াচল ও ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে। এটুকু বিশ্বাস আছে বলেই এ বৃদ্ধ বয়সেও এ গুরুভার বইবার সাহস আমি রাখি। আমার বল ভরসা যা-কিছু সব আপনারা।"

ক্রমশঃ

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কাশীর বীণকার মহেশচন্দ্র

১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। পশ্চিম অঞ্চলে তীর্থ-দর্শনে বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরবাবুর তীর্থে যাবার কথা শুনে তিনিও সঙ্গী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন নিত্য-সহচর সেবক ভাগিনেয় হৃদয়নাথ, তাঁর 'হৃদু'।

পশ্চিমের পথে তাঁরা প্রথম তীর্থ করলেন বৈদ্যনাথ-ধামে। তারপর বারাণসীতে এলেন।

এ যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হ'ল যোগীবর তৈলঙ্গ-স্বামীর সঙ্গে, গঙ্গার ধারে। মৌনী মহাযোগীকে প্রশ্ন করলেন—ঈশ্বর এক, না বহু?

তাপসের কাছে ইঙ্গিতে উত্তর পেলেন।···

বারাণসী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সদলে প্রয়াগ দর্শনে গেলেন। তারপর মথুরা। শেষে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে পনের দিন রইলেন। তারপর সেখান থেকে আবার এলেন কাশীতে।

সঙ্গীত যে পরমহংসদেবের কত প্রিয়, তা তাঁর জীবনী-পাঠকদের অজানা নেই। 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে তাঁর গানের প্রসঙ্গ অজস্র পাওয়া যায়। কত অধ্যাত্ম-বিষয়ে গান তিনি গাইতেন—কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, ভজন, রামপ্রসাদী। ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন যেমন, শুনতেও তেমনি ভালবাসতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের এক পরম অঙ্গ। সঙ্গীতের আবেদনে তাঁর সমগ্র সত্তা এমনভাবে সাড়া দিত যে, সঙ্গীতকারের ওপর তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন। উৎকৃষ্ট গায়কের সঙ্গীত-গুণের জন্যে তাঁকে পরমা শক্তির এক বিশিষ্ট আধার জ্ঞান করতেন তিনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দের দিকে এই গুণের জন্যেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নরেন্দ্র-নাথের উদাত্ত কণ্ঠের মর্মস্পর্শী গান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের এক আবাস ছিল বলা যায়! গুরু-শিষ্যের যতদিনের দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেশির ভাগেই আছে সঙ্গীত। সঙ্গীত যেন তাঁদের আধ্যাত্মিক সম্মিলনের সেতু রচনা করেছিল। নরেন্দ্রের গানে পরম-হংসদেবের ভাবস্থ হবার কত দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনী গ্রন্থাদির মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেসব বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়, গান তাঁর অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রার ছিল বাহন স্বরূপ। গান গাওয়া কিংবা ভাল গান শোনা, এই দুই-ই ছিল তাই একই প্রক্রিয়ার এপিঠ ওপিঠ, রূপ ভেদ মাত্র!

শুধু গান নয়, সঙ্গীতের অন্যান্য বিভাগও তাঁর কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিল। এখানে তার একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেওয়া হবে। এ তাঁর বারাণসীতে তীর্থবাসের একদিনের ঘটনা। কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতপ্রীতির একটি সুন্দর উদাহরণ।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে থাকবার সময় একদিন বললেন, 'আমি বীণা শুনব।'

শুধু যে নিজে গান গাইতে কিংবা গান শুনতে ভালবাসতেন, তা নয়। কথাহীন সুরও ভালবাসতেন। তাই শুনতে চাইলেন বীণাবাদন। শুদ্ধ সুরের লহরী।

কাশী শুধু শিবের ক্ষেত্র নয়, সঙ্গীতেরও একটি অতি প্রাচীন ক্ষেত্র। কাশী তীর্থ যেমন প্রাচীন, তার সঙ্গীত-চর্চাও তেমনি। সুদূর অতীত থেকে ভারতের যে কটি সঙ্গীতকেন্দ্র আছে তার মধ্যে কাশী একটি বিশিষ্ট। আর এখানকার সঙ্গীতের ধারায় এক প্রধান অঙ্গ হ'ল বীণার সাধনা। সমগ্র উত্তর ভারতে সুপ্রাচীন যুগ থেকে বীণা-বাদনের এমন ঐতিহ্য আর বেশি সঙ্গীত-কেন্দ্রে দেখা যায় না।

সে সময়েও বারাণসীর সঙ্গীত ক্ষেত্রের আকাশে-বাতাসে বীণার মধুর ধ্বনি ভেসে বেড়াত। অনেক বীণকার ছিলেন তখনও। তাই পরমহংসদেবের বীণা শোনবার বড় ইচ্ছা হ'ল।

মহেশচন্দ্র সরকারের বীণা বাজাবার খ্যাতি সে-সময় কাশীর সীমানা পার হয়ে অনেক দূর ছড়িয়েছে। বাঙ্গালী টোলার দিকে মদনপুরা মহল্লার মহেশচন্দ্র সরকার। অতি গুণী বীণকার তিনি, সঙ্গীতের একজন সত্যিকার সাধক বলে সকলে তাঁর নাম জানে।

মদনপুরার এই সরকার মহাশয়রা কাশীর এক বনেদী

বাঙ্গালী পরিবার। তখন তাঁদের তিন পুরুষ ধরে কাশীবাস চলছে। মহেশচন্দ্রের পিতামহ বলরাম সরকারের আমল থেকে তাঁদের বারাণসীতে বাসের পত্তন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন বলরাম সরকার। পাটনার ইংরেজ কুঠীর দেওয়ানী পেয়ে পাটনায় চলে আসেন। পরিবারের অনেকে থেকে যান কলকাতায়, কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বাস করতে আসেন পাটনায়। এখানে অনেকদিন দেওয়ানীর কাজ করে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে বলরামের ইচ্ছা হ'ল শেষজীবন কাশীবাস করতে। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কাশীধামে এলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রইলেন কলকাতায়।

বলরাম সরকার যখন বারাণসীতে বাসের পত্তন করলেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণের ওই প্রসঙ্গের প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা। প্রথম থেকেই সরকারদের মদনপুরায় নিবাস। বলরাম কাশীধামে এসেই এই মহল্লায় বিষয় সম্পত্তি কেনেন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে বসবাস আরম্ভ করেন।

রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র মহেশচন্দ্রের জন্ম কাশীতে। খিদিরপুরের ভূকৈলাস-রাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বারাণসীতে যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন, সেখানেই মহেশচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে সঙ্গীতের ওপর তাঁর বেশি আকর্ষণ দেখা যায় বালক বয়স থেকেই। তাঁর পিতাও সঙ্গীতচর্চা করতেন, সেতার বাজাতেন। সেজন্যে মহেশচন্দ্রের অনুরাগ দেখে তার অল্প বয়সেই সেতার শেখাতে আরম্ভ করেন বাড়ীতে।

মহেশচন্দ্রের সেতার শিক্ষা যেমন ভালভাবে এগিয়ে যেতে লাগল, লেখাপড়া তেমন অগ্রসর হ'ল না। ক্রমে সঙ্গীতচর্চাই প্রায় অধিকার করে বসল সেই তরুণের মন-প্রাণ। পিতা তখন তাঁকে বড় ওস্তাদের কাছে রীতিমত শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। তখন কাশীর এক বিখ্যাত সেতারী ও বীণ্‌কার ছিলেন গণেশ বাজপেয়ী-জী। তাঁর কাছে মহেশচন্দ্র তালিম নিতে আরম্ভ করলেন—প্রথমে সেতার ও পরে বীণায়। শেষে সেতার ছেড়ে দিয়ে বীণা যন্ত্রে নিরলস সাধনায় মগ্ন হ'লেন। তাঁর যথার্থ পরিচয় হ'ল বীণ্‌কার রূপে। তখনকার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কলাবতদের সঙ্গে এক আসরে বসে বীণাতেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। উত্তর ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কার হিসাবে সঙ্গীত-সমাজে স্বীকৃত হন মহেশচন্দ্র।

তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার কথায় আরো একটু যোগ করে দেবার আছে। গণেশ বাজপেয়ী-জী তাঁর প্রধান সঙ্গীত-গুরু হ'লেও আরো দু'একজনের কাছে কিছু কিছু শিখে-ছিলেন বা উপকৃত হন সঙ্গীত বিষয়ে। যেমন, তানসেনের পুত্রবংশীয় বলে সুপরিচিত, রবাববাদক ও বীণ্‌কার সাদিক আলী খাঁ। সমসাময়িক সঙ্গীত-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সাদিক আলী খাঁও কাশীনিবাসী ছিলেন। তাঁর এবং তাঁদের বংশীয় নিসার আলী খাঁ (সুরশৃঙ্গার-বাদক) প্রভৃতির সঙ্গ করেও সঙ্গীতবিষয়ে লাভবান হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র।

অত বড় গুণী হয়েও কিন্তু তিনি সে-যুগের বেশির ভাগ বাঙ্গালী সঙ্গীতাচার্যদের মত সৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার ছিলেন। সঙ্গীতের বেসাতি করেন নি কখনো। বরং সঙ্গীতের সখ মেটাতে মুক্তহস্তে খরচ করে যেতেন। ব্যক্তি জীবনেও সৌখীন ছিলেন খুব। তাঁর সুশ্রী এবং ব্যায়ামে সুগঠিত দেহটিকে উৎকৃষ্ট পোষাকে প্রসাধনে সযত্নে রাখতেন। এত দামী আতর ব্যবহার করতেন যে, মদনপুরার গলি দিয়ে হেঁটে যাবার খানিকক্ষণ পরেও জায়গাটি ভরপুর থেকে যেত সুগন্ধে।

আর তাঁর বীণা-চর্চা ছিল একদিকে যেমন সাধনা, অন্যদিকে তেমনি মানসবিলাস। অনেক বীণকারের কথাই ত শোনা যায়, কিন্তু মহেশচন্দ্রের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবিষয়ে আর কোথাও আছে কি? নিয়মিত মাস মাহিনায় তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত কারিগর নিযুক্ত রেখে দিতেন বীণাযন্ত্র তৈরী করে দেবার জন্যে। শুধু তাই নয়, বীণার উৎকৃষ্ট দণ্ড পাবার জন্যে তিনি সুদূর চীন, জাপানে পর্যন্ত লোক পাঠাতেন, ভাল বংশখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করতে। এত অর্থব্যয় করে বীণা তৈরী করাবার পরও বীণা পছন্দ না হলে তা আর বাড়ীতে রাখতেন না।

বীণা সাধনই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ছ'টি বিভিন্ন আধারের বীণাযন্ত্র তিনি প্রস্তুত করিয়েছিলেন বহু ব্যয়ে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাজাবার জন্যে। তাঁর এই ছ'টি বীণা হ'ল—লাউ, শ্বেতচন্দন, গম্ভার, পিতল, তামা এবং মিশ্র অর্থাৎ কাঠ, ফল ও ধাতুর মিশ্রণে তৈরি। এই বীণাগুলিকে তিনি প্রাণের প্রিয় সন্তানদের তুল্য যত্নে রেখে দিতেন। প্রতি যন্ত্রের জন্যে থাকত পৃথক শয্যা আর পালঙ্ক। সেই পালঙ্কে আবার ধ্যানের মন্ত্র লেখা দেখা যেত।

দিবারাত্রির ছ'টি বিভিন্ন সময়ে মহেশচন্দ্র এক একটি বীণা বাজাতেন যথাবিহিত পূজা-পাঠের পরে। সকালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং প্রথম, মধ্য ও শেষ রাত্রে তিনি এক একটি বীণার পূজা করতেন। তার পর ধ্যানস্তুতির শেষে বাজাতে বসতেন যন্ত্র। এমনিভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি বীণার সাধনা করে চলেন। এই তাঁর দ্বিতীয় সত্ত্বা।

ক্রমে বীণকার বলে তাঁর এমন সুনাম ছড়িয়ে পড়ে

যে, কোন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি কাশীতে উপস্থিত হ'লে তিনি মহেশচন্দ্রের বীণা শোনবার জন্যে ব্যগ্র হ'তেন।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বীণা শুনতে চাইলেন, তখন হৃদয়নাথ, মথুরবাবু প্রভৃতি জানতে পারলেন মহেশচন্দ্রের নাম। তাঁরা স্থির করলেন, মহেশচন্দ্রের বীণাবাদন পরমহংসদেবকে শোনাতে হবে।

মথুরবাবুর ইচ্ছা ছিল, বীণকার তাঁর বাড়ীতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে বীণা শোনাবেন। অন্য আর পাঁচজন কলাবতের মতন মহেশচন্দ্র সম্পর্কে ভেবেছিলেন মথুরবাবু। বাড়ীতে আনিয়ে ফরমায়েস করে যাঁদের গান-বাজনা ইচ্ছা মতন শোনা যায়।

কিন্তু মহেশচন্দ্র সে ধাতুর ছিলেন না। তিনি যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে কোথাও বিশেষ যেতেন না কাউকে বীণা শোনাতে। নিজের বাড়ীতে নিজের সময়ে নিজের মেজাজ মতন বাজাতেন, যিনি সত্যিকার আগ্রহী, তাঁকে শোনাতেন। যেমন অর্থের প্রতি দৃকপাত করতেন না, তেমনি নাম-যশের দিকেও লক্ষ্য ছিল না আদৌ। যত বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হোন কারুর উপরোধে নিজের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হ'তেন না।

তাঁর কাছে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন কাশীর পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ও মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তিকায় মহেশচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কথার মধ্যে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে সঙ্গীত সাধক মহেশচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ে ধারণা করা যায়।

ঘটনাটি এই যে, কাশী-নরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিং একবার সরকার মহাশয়ের বীণা শোনবার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন রামনগর রাজবাড়ীতে। কিন্তু মহেশচন্দ্র মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত হন নি। কারণ তাঁর মতে, যথারীতি সম্পন্ন হয় নি দেবী সরস্বতীর আবাহন।

হরিনারায়ণের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, সরকার মহাশয়ের মদনপুরার বাড়ী সদাই সঙ্গীতের উৎসবে মুখরিত থাকত।

তাঁর সঙ্গীতজীবনের এ সমস্ত কথা অবশ্য মথুরবাবু বা শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন না। তাই তাঁকে বাড়ীতে আনিয়ে বীণা শোনবার কথা ভেবেছিলেন মথুরবাবু।

মহেশচন্দ্রকে অবশ্য বাজাতে আসবার অনুরোধ করা হয় নি! পরমহংসদেব তাতে আপত্তি করেছিলেন। তিনি অবশ্য অন্য দিক থেকে বিবেচনা করে দেখেছিলেন, তাঁর নিজের মতন করে। অত বড় সাধক বলেই আর এক ভাবের সাধকের মর্ম বুঝেছিলেন। মহেশচন্দ্রকে তিনি সঙ্গীতের সাধক বলেই জ্ঞান করলেন—এত বড় বীণ্‌কার যিনি, নিশ্চয় তিনি তাঁর নিজের ভাবে সাধক। তাঁকে বীণা শোনাতে আসবার জন্যে ফরমায়েস করা উচিত নয়!

সেবক হৃদয়কে নিয়ে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে এলেন। সুখের বিষয় যে বীণকার তখন বৈঠকখানাতে ছিলেন সঙ্গীতের পরিবেশে। দক্ষিণেশ্বরের এই অনন্য সাধকের মাহাত্ম্যের বিষয় তিনি তখনো কিছুই জানতেন না। কারণ পরমহংসদেবের পরিচয় সেসময় বাইরে বিশেষ প্রচার হয় নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অনাড়ম্বরভাবে মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে এলেন, তেমনি বিনা ভূমিকায় তাঁকে জানালেন, 'বীণা শুনব বলে আমি এসেছি।'

তাঁকে বীণা শোনাবার অনুরোধ মহেশচন্দ্র তখনি রক্ষা করলেন। এই অপরিচিত শ্রোতাটির সম্বন্ধে কিছু না জেনেও তাঁর আন্তরিক সারল্য ও মাধুর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হ'লেন বীণ্‌কার। শিল্পীর সহজাত অনুভবে তিনি বুঝতে পারলেন, এ ব্যক্তি হৃদয়বান সুর-ভক্ত। এ বোধ না জন্মালে তিনি সঙ্গীতের প্রেরণা পেতেন না এবং সঙ্গীতের প্রেরণা লাভ না করলে কিছুতেই কারুর জন্যে যন্ত্রে হাত দিতেন না তিনি।

সানন্দে বীণায় তার বেঁধে নিয়ে মহেশচন্দ্র রাগালাপ করতে বস্‌লেন।

বীণার প্রথম ঝঙ্কারেই বীণকার সুরসৃষ্টির এমন আবেশ সৃজন করলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাণে সে সুর প্রবেশ করবামাত্র ভাবস্থ হলেন তিনি।

মহেশচন্দ্র তখন তন্ময় হয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছেন। ইতোমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধচেতনায় জাগরিত হয়ে আচ্ছন্ন কণ্ঠে তাঁর ইষ্ট দেবীর উদ্দেশে বলে উঠ্‌লেন, 'মা গো, আমার জ্ঞান হারিয়ে দিস্‌নি। এ বীণা যেন আমি শুনতে পাই।'

তারপর তিনি সম্বিৎ বজায় রেখে বীণাবাদন উপভোগ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠ্‌লেন যন্ত্র-সঙ্গীতের সুরে একাত্ম হয়ে। মহনীয় শ্রোতা ও বরণীয় বাদক ক্রমে সেই সুরের উৎস-ধারায় একমুখী হয়ে গেলেন।

এমনিভাবে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ল যখন বীণায় শেষ ঝঙ্কার দিলেন মহেশচন্দ্র। তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ তদ্‌গতচিত্তে বীণা শুনলেন যে অতিথি, তিনি কোন সাধারণ শ্রোতা নন। সুরে পরম পরিতৃপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সাদরে মিষ্টিমুখ করালেন।

তারপরে বীণ্‌কারের কাছে বিদায় নিলেন তিনি।

কিন্তু পরে যে ক'দিন কাশীতে ছিলেন, মহেশচন্দ্র প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মথুরবাবুর বাড়ীতে।

(৩) হিন্দু না মুসলমান ?

সাধারণত দেখা যায়, অনেক মুসলমানের ধর্মের জন্যে একটা অহমিকাবোধ আছে। মুসলমান ব'লেই যেন তারা গর্বিত। এই ধারণা থেকে নিজেদের সম্বন্ধে একটা শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ জেগে থাকে। যে যে বিষয়ে চর্চা তারা করে, সেসব বিষয়ে অন্য কোন ধর্মীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে না—এমন একটা মনোভাব অনেকের মধ্যে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতজগতও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক আকার নিয়ে প্রশ্নটি কখনো সঙ্গীতাসরে প্রকট হয়নি, এই রক্ষা। নইলে সুরের আসরে আর এক রকমের অসুরের উপদ্রব ঘটে যেত। এক পক্ষের সহনশীলতাও অবশ্য শান্তি রক্ষার কারণ হয়েছে অনেক সময়ে। সেজন্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচ্ছন্ন থেকে অন্তঃসলিলার মতন কাজ করেছে অপর পক্ষে, নগ্নভাবে প্রকাশ হবার তেমন প্রয়োজন হয় নি। তা, ছাড়া, বাস্তব প্রয়োজন, বেশীর ভাগই ভিন্ন ধর্মীয়দের আনুকূল্যে জীবিকার সংস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় আন্তরিক মনোভাবও রাখতে হয়েছে সঙ্গোপনে। তা সত্ত্বেও অসতর্ক মুহূর্তে মাঝে মাঝে ফুটে বেরিয়েছে প্রকৃত ধ্যান-ধারণা, অপর পক্ষের পরম উদারতার জন্যে তা নিয়ে অবশ্য আর তিক্ততা সৃষ্টি হ'তে পারে নি।

এসব কথা এখন থাক। এবার আসরের একটি গল্প হোক। এ ঘটনাটি ঘটেছিল নাড়াজোল রাজবাড়ীর একটি জলসায়। উনিশ শতকের শেষ দিকের কোন সময়ের কথা।

মেদিনীপুর জেলার এই ভূম্যধিকারী পরিবার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকরূপে আগেকার কালে সুপরিচিত ছিলেন। বিশেষ মহেন্দ্রলাল খাঁ, নরেন্দ্রলাল খাঁ প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রলাল নিজে সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। সেতার যন্ত্রের চর্চা করতেন তিনি। বিষ্ণুপুরের গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আলোচ্য আসরের ঘটনা অবশ্য নরেন্দ্রলালের পিতা মহেন্দ্রলাল খাঁর আমলের।

সেদিনের আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে গুণী হিসেবে সকলের আগে দু'জনের নাম করতে হয়। সরদবাদক মুরাদ আলী এবং সেতার-সুরবাহার-বাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য। দু'জনেরই সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় এখনকার কালে একরকম বিস্মৃত বলা যায়। সেজন্যে তাঁদের পরিচিতি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল।

সুমিষ্ট হাতের বাজনার জন্যে সেকালের সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন সরদী মুরাদ আলী। ভারতবর্ষে যে ক'টি পরিবারে কাবুলি সরদ থেকে ভারতীয় সরদের চর্চা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, মুরাদ আলীর পরিবার তার মধ্যে অন্যতম। মুরাদ আলীর পিতা গোলাম আলী এই বংশে সরদের প্রথম প্রচলন করেন। সরদ যন্ত্রের যে আকার-প্রকার বর্তমানে দেখা যায় তা প্রথম প্রবর্তন হয় উনিশ শতকের মধ্য ভাগে এবং সেই প্রথম যুগে যাঁরা এই যন্ত্রে ভারতীয় রাগ বাজাতেন, তাঁদের সকলেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন আফগানিস্তান নিবাসী ও কাবুলি সরদ (তাঁদের ভাষায় 'সরুদ') বাদক। সে সময়ে, অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে যাঁরা প্রথম সরদ সাধনা আরম্ভ করলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন নিয়ামৎ উল্লা খাঁ। মুরাদ আলীর পিতা গোলাম আলী ছিলেন নিয়ামৎ উল্লার সমসাময়িক অন্যতম সরদ-বাদক।

রেবারাজ্যের অধিপতি, সঙ্গীত-গুণী এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বনাথ সিংএর দরবারে গোলাম আলী দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং মহারাজা বিশ্বনাথের কাছে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে নানাভাবে ঋণী। মহারাজা স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ায় তাঁর কাছে গোলাম আলী অনেক পরিমাণে সঙ্গীত-বিদ্যা লাভ করবার সুযোগ পান, একথা পরবর্তীকালে এই বংশীয় সরদগুণী হাফিজ আলী খাঁ উল্লেখ করতেন। উপরন্তু, রেবারাজ্যের দরবারে থাকবার সময় মহারাজার নিযুক্ত গুণীবৃন্দ জাফর খাঁ,' প্যার খাঁ প্রভৃতির সঙ্গীত-চর্চা শুনেও উপকৃত হন গোলাম আলী। এইভাবে তাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়।

গোলাম আলী সরদ-বাদক রূপে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি বটে, কিন্তু আর একটি কারণে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে সরদ-বাদনের ক্ষেত্রে। তাঁর বংশধরগণ গুণী সরদী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে উত্তর ভারতে একটি বিশিষ্ট সরদী পরিবাররূপে পরিগণিত হন। একটি পরিবারের অন্তর্গত এতগুলি প্রথম শ্রেণীর সরদগুণীর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আর বিশেষ দেখা যায় না। গোলাম আলীর তিন পুত্রই সরদ-বাদক—হোসেন খাঁ মুরাদ আলী ও নান্নে খাঁ। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হোসেন খাঁ সব চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন, এসব প্রসিদ্ধি আছে। হোসেন খাঁর সঙ্গীত-কৃতি পিতার তালিমের ফল নয়, তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত সুরবাহার-গুণী গোলাম মহম্মদের নাড়া-বাঁধা শিষ্য। হোসেন খাঁর পুত্র আসঘর আলীও একজন উচ্চাঙ্গের যন্ত্রশিল্পী ছিলেন, দ্বারবঙ্গ রাজের দরবারে নিযুক্ত এই গুণীর প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

গোলাম আলীর কনিষ্ঠ পুত্র নায়ে খাঁ ছিলেন বর্তমানের প্রবীণ সরদ-শিল্পী হাফিজ আলী খাঁর বিপিতা। নায়ে খাঁ তাঁর অপর দুই ভ্রাতার তুল্য প্রখ্যাত ছিলেন না।

গোলাম আলীর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলী সুনাম অর্জন করেছিলেন কৃতী সরদীরূপে। তিনি দ্বারবঙ্গের রাজ-দরবারে অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন, কখনো কখনো অন্যান্য সঙ্গীতাসরেও আমন্ত্রিত হয়ে গুণপনা প্রদর্শন করতেন। তাঁর বাজনার এক প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর অতি মিষ্টি হাত। আলাপে, বিশেষত বিলম্বিত আলাপে নিপুণতা তাঁর আর এক বিশিষ্ট কৃতিত্ব।

মুরাদ আলীর সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধে এই জানা যায় যে, তিনি প্রথম জীবনে পিতার কাছে কিছু গৎ শিখেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত ঋণী ছিলেন অন্য ওস্তাদের কাছে। বিশেষ করে গোলাম মহম্মদ (যার উল্লেখ করা হয়েছে হোসেন খাঁর শিক্ষা-প্রসঙ্গে) এবং আমীর খাঁর কথা বলতে হয় এ ক্ষেত্রে। গোলাম মহম্মদের চেয়ে তিনি (মুরাদ আলী) আমীর খাঁর কাছে বেশি লাভবান হয়েছিলেন। এই আমীর খাঁ হ'লেন ওমরাও খাঁর পুত্র এবং রামপুর ঘরাণার অন্যতম প্রবর্তক। রামপুরে আমীর খাঁর কাছে অনেক সময় থেকে মুরাদ আলী অনেক বিদ্যা আদায় করেছিলেন। যদিও গোলাম মহম্মদ বা আমীর খাঁ কারুরই নাড়া-বাঁধা শিষ্য ছিলেন না তিনি। এমনিভাবে সঙ্গীত সম্পদ আহরণ করে আপন প্রতিভা ও সাধনায় মুরাদ আলী তৎকালীন সঙ্গীত-জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হন।

তিনি ছিলেন অপুত্রক। সেজন্যে আবদুল্লা খাঁকে পোষ্যপুত্র নেন। আবদুল্লা খাঁ ই মুরাদ আলীর একমাত্র শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। আবদুল্লা খাঁ পরিণত বয়সে মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেও বেশির ভাগ দ্বারবঙ্গেই থাকতেন। তাঁর কাছে একাধিক বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ কিছু কিছু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, জানা যায়। গয়ার চিকিৎসক ও এস্রাজ-বাদক যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ভেলুবাবু নামে সুপরিচিত) আবদুল্লা খাঁর শিক্ষা কিছু লাভ করেন। তারপর বাংলার আর এক এস্রাজী শীতল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে দ্বারবঙ্গে তাঁর কাছে শিখতে যেতেন রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে। শেষ বয়সে আবদুল্লা খাঁ যখন কলকাতায় আসতেন, সেসময় তরুণ বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতেন। তবে, বেশির ভাগ পেশাদার ওস্তাদদের মতন আবদুল্লা খাঁরও যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র—বাংলা দেশে খ্যাতনামা সরদী আমীর খাঁ। কলকাতায় আমীর খাঁ দীর্ঘকাল বাস করেন এবং তাঁর প্রায় সমস্ত শিষ্যই বাঙ্গালী ছিলেন। আমীর খাঁর কোন পুত্র ছিল না। এই দিক থেকে বলা যায়, মুরাদ আলীর সঙ্গীত-বিষয়ে উত্তরাধিকার আবদুল্লা খাঁ ও আমীর খাঁর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশে এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্তেছিল। মুরাদ আলীর সঙ্গীত-জীবনের উত্তরকালে এই এক লক্ষ্যণীয় ফলশ্রুতি।

এসব প্রসঙ্গের সঙ্গে অবশ্য মুরাদ আলীর সেদিনকার আসরের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

সে আসরে আর একজন যে গুণীর কথা বলা হয়েছে—বামাচরণ ভট্টাচার্য—মুরাদ আলীর মতন তাঁর কোন সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্ম হয় নি। কিন্তু বাংলায় এই বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভা কোন প্রকার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বাল্যকাল থেকে লালিত না হ'লেও, পরবর্তীকালে অসাধারণ প্রতিভায় নিজেই এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান যন্ত্র-সঙ্গীতের একটি বংশধারা পত্তন করে।

তাঁর পুত্র ও শিষ্য জিতেন্দ্রনাথ তখনকার সর্বভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রের নিরিখেও একজন প্রথম শ্রেণীর সুরবাহার ও সেতার গুণী ছিলেন। বামাচরণের সঙ্গীত-সম্পদের তিনি শুধু যোগ্য উত্তরাধীকারী ছিলেন না, আপন প্রতিভা ও সাধনায় তাকে ভাবীকালের জন্য প্রবর্ধিতও করে যান। তাঁর আলাপচারিতে মনোমুগ্ধকর সুদীর্ঘ মিড় ইত্যাদির সূক্ষ্ম কাবকর্ম এবং ছেড়ে, জেড় প্রভৃতি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করত আসরে। জিতেন্দ্রনাথের পুত্র লক্ষ্মণ অকালে মৃত্যু-কবলিত হ'লেও প্রতিভাবান সেতারী-রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণের শিষ্যধারায় বামাচরণের যন্ত্রসঙ্গীতের ঐতিহ্য বাংলাদেশের সেতার সুরবাহারের চর্চায় একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হয়ে আছে।...

জন্মসূত্রে সঙ্গীতের কোন উত্তরাধিকার বামাচরণ লাভ করেন নি। তাঁদের বংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পেশাও শাস্ত্র-চর্চা। পিতা রামকমল শিরোমণি পণ্ডিতী করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতেন। চব্বিশ পরগণার বারাসাত অঞ্চলে নিবাস ছিল তাঁর। পুত্র বামাচরণকেও সেইভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রামকমল করেছিলেন। শিক্ষার্থী জীবনে বামাচরণ ব্যাকরণ শিখেছিলেন, আর দর্শন শাস্ত্রের কিছু কিছু। তারপর বেদ অধ্যয়ন করতে কাশীতে যান। পরে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে।

কিন্তু সে সবই বলা যায় তাঁর বহিরঙ্গ জীবনের কথা। বাহ্য পরিচয়। তাঁর যথার্থ স্বরূপ হ'ল সঙ্গীতজ্ঞরূপে। সে এক অনন্য কাহিনী। অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতের প্রতি

বামাচরণ গভীর ও অন্তরঙ্গ আকর্ষণ বোধ করতেন বটে, কিন্তু তখন তার কোন প্রকাশ বাইরে ঘটে নি। রীতিমত ভাবে শিক্ষার কোন সুযোগ পান নি তিনি।

সে সুবিধা পেয়েছিলেন পরে এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। যজমানী বৃত্তির জন্যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন সেকালের কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার পরিবারের সঙ্গে। যেমন গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবার। তারপর তাঁদের অন্তরঙ্গ আরো ক'টি তুল্য পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বামাচরণের ঘনিষ্ঠতা হয়। যথা, মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী ও রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশ। সেকালের অনেক ভূম্যধিকারী পরিবারের মতন এঁরাও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক যেমন ছিলেন, তেমনি উৎসুক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ওস্তাদের অধীনে শিক্ষালাভের আনুকূল্যও করতেন। এমনিভাবে জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী এবং পাল চৌধুরী পরিবারের সঙ্গীতপ্রেমীদের সদাশয় সুযোগদানের ফলে তাঁদের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কলাবতের শিক্ষালাভ করেন বামাচরণ। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, শোনা যায়। শৌরীন্দ্রমোহনের সহযোগিতার জন্যেই তাঁর নিযুক্ত গুণী সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে শিক্ষার সুযোগ বামাচরণ পেয়েছিলেন, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতে। সঙ্গীতে তাঁর প্রতিভা এবং শিক্ষা করে নেবার অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর উক্ত অনুরাগীরা এমন কয়েকজন ভারত বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে তাঁর শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্ভাবনাও তাঁর অবস্থার পক্ষে অভাবিত ছিল।

যাদের কাছে বামাচরণ এইভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'ল:

সুরবাহার, গুণী মহম্মদ খাঁ, বীণকার ওয়ারিস খাঁ, সেতার-সুরবাহার-গুণী সাজ্জাদ মহম্মদ, রবাবী বাসৎ খাঁ, ধ্রুপদী যদু ভট্ট, খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ, ঠুংরি-গায়ক চন্নি খাঁ, এবং হিজনজান ও দিলজান বাঈজীদ্বয় (রাণাঘাটের পালচৌধুরী ভবনে নিযুক্তা)। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি মহম্মদ খাঁর কাছে। তা ভিন্ন সাজ্জাদ মহম্মদ ও বাসৎ খাঁর শিক্ষাও তিনি উল্লেখ্যভাবে পান। এই তিন জনের কাছে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তার সাধনাতেই তাঁর সঙ্গীতসত্তা বিকশিত হয়। একজন সত্যকার গুণী যন্ত্রীরূপে তিনি আদৃত হন সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে।

প্রধানত সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে বামাচরণ সাধনা করলেও, কণ্ঠ-সঙ্গীতের চর্চাও তিনি করেছিলেন। তবে, আসরে গান গাইতেন না, সাধারণত সেতার বাজাতেন এবং কখনো কখনো সুরবাহার।

ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর কাছে তিনি যে ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা সম্ভব হয় গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জন্যে। জ্ঞানদাপ্রসন্ন নিজে মহম্মদ খাঁর তালিমে সুরবাহার-বাদক রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁর কাছে অনেক সময় জ্ঞানদাপ্রসন্নের সঙ্গেও শিখতেন বামাচরণ, গোবরডাঙ্গায় এবং তাঁদের কলকাতার ভবনে।

মহম্মদ খাঁর কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার, কারণ যে আসরের কথা নিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা সেখানে মহম্মদ খাঁকে উপলক্ষ্য করেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।

মহম্মদ খাঁর কথায় সাজ্জাদ মহম্মদের প্রসঙ্গও কিছু আসবে। কারণ তাঁরা একই 'ঘরের'; এবং দুজনেই কলকাতায় এসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন এক সঙ্গে। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত সুরবাহার-গুণী গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য ছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদ। মহম্মদ খাঁও লক্ষ্ণৌতে গোলাম মহম্মদের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু খুব বেশি শিক্ষার সুযোগ পান নি। তাঁর ওস্তাদের পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং অত্যন্ত গুণীও। সেজন্যে সাজ্জাদ মহম্মদের কাছেই মহম্মদ খাঁ শিখেছিলেন বেশি। সাজ্জাদ মহম্মদ লক্ষ্ণৌ থেকে পরে বাংলা দেশে এসে মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই থাকেন, সেসময় দীর্ঘকাল ধরে মহম্মদ খা তাঁর সেবা-পরিচর্যা করেন এবং তাঁর সঙ্গীতের উত্তরাধিকারীও হন।

তেমনি বামাচরণবাবুও মহম্মদ খাঁর কাছে যেমন শেখেন, তেমনি সাজ্জাদ মহম্মদের শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। বামাচরণবাবুকে দুজনেরই শিষ্য বলা যায়, তবে মহম্মদ খাঁর শিক্ষা হয়ত পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি। সেজন্যে বাইরে অনেক জায়গায় বামাচরণ মহম্মদ খাঁর শিষ্যরূপেই অধিকতর পরিচিত হয়েছিলেন।

নাড়াজোলের যে আসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত মুরাদ আলী বামাচরণকে মহম্মদ খাঁর শিষ্য হিসেবে বোধ হয় সেখানেই জানতে পারেন।

মুরাদ আলীর পারিবারিক সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় দেবার সময়ে আগে বলা হয়েছে যে, তিনি গোলাম মহম্মদের শিক্ষা কিছু পেয়েছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন খাঁ ছিলেন গোলাম মহম্মদের একজন প্রকৃত শিষ্য। সুতরাং মুরাদ আলীর গোলাম মহম্মদ

এবং তাঁর 'ঘরের' কথা অর্থাৎ শিষ্যাদির কথা সবিশেষ জানা ছিল, বোঝা যায়। গোলাম মহম্মদ এবং তাঁর কৃতী পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ দু'জনেরই শিষ্য মহম্মদ খাঁকেও ভালভাবে চিনতেন মুরাদ আলী।

কি কারণে জানা যায় না, মুরাদ আলী মহম্মদ খাঁকে অপছন্দ করতেন। মহম্মদ খাঁর প্রতি তাঁর সেই বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ল সেদিনকার নাড়াজোল রাজবাড়ীর আসরে।

মুরাদ আলী সে আসরে প্রথমে বাজালেন। আগেকার আমলের মজলিসে এটি প্রায় প্রথা ছিল যে, প্রবীণ বা বয়োজ্যেষ্ঠ গুণী প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, পরে গাইবেন বা বাজাবেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা।

মুরাদ আলীর বাজনার পরে বামাচরণের বাজাবার কথা। কিন্তু তাঁর বাজনা আরম্ভ হবার আগে মুরাদ আলী মহম্মদ খাঁর নামে কিছু নিন্দাবাদ করলেন। মহম্মদ খাঁর সেতার যন্ত্রে কৃতিত্ব নিয়ে তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করলেন মুরাদ আলী।

বামাচরণ নিজের ওস্তাদের সেতার বাদনের নিন্দা এমন প্রকাশ্য আসরে শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'লেন। মহম্মদ খাঁকে তিনি যন্ত্র-সঙ্গীতের ওস্তাদরূপে শ্রদ্ধা করতেন বিশেষভাবে। কারণ তাঁর কাছেই তিনি সুরবাহার সেতারে সবচেয়ে বেশি শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর একটি প্রতিকৃতি স্বহস্তে খোদাই করে রেখেছিলেন নিজের হাতের সেতার যন্ত্রটিতে। বামাচরণের এই আর একটি গুণ ছিল যে, তিনি নিজে সেতার যন্ত্র তৈরী করতে পারতেন। এবং তাঁর স্বহস্ত-নির্মিত সেতারটিই তিনি আসরে বাজাতেন। তবুরার বদলে কাঠের তব্‌লিতে তৈরী তাঁর সেই হাতের সেতারটি পরে তাঁর পুত্র জিতেন্দ্রনাথও রক্ষা করেছিলেন সযত্নে।...

যা হোক, মুরাদ আলীর মুখে নিজের ওস্তাদের নিন্দা শুনে বামাচরণ কিন্তু কলহে প্রবৃত্ত হ'লেন না। তিনি স্থির করলেন মুখের কথার জবাব না দিয়ে মুরাদ আলীর নিন্দার উত্তর সমুচিত ভাবে দেবেন যন্ত্রেরই মাধ্যমে। মহম্মদ খাঁর যে সেতার-বাদনের অপযশ মুরাদ আলী করেছেন, মহম্মদ খাঁর শিষ্যরূপে সেই সেতার বাজিয়েই তিনি গুরুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বামাচরণ নিজের হাতে-গড়া সেতারটি নিয়ে তখন আসরে বাজাতে বসলেন। ওস্তাদের শিক্ষা ও নিজের সাধনায় সিদ্ধ বাদন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন শ্রোতাদের সমক্ষে।

মুরাদ আলী প্রথম দিকে বামাচরণের বাজনার কোন গুরুত্ব দিলেন না। অগ্রাহের ভাব দেখিয়ে বসে রইলেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। বামাচরণের নিপুণ হাতের সেতার ঝঙ্কৃত হ'তে লাগল উত্তরোত্তর তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এমন সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ সে বাদন-পদ্ধতি যে মুরাদ আলী বেশিক্ষণ উদাসীনতার ভান করে থাকতে পারলেন না। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, এই নবীন সেতারী নিজস্ব ধারায় বাজাবার পর আবার এমন সব অলঙ্করণ করছেন যা বিশেষ করে সরদের জিনিষ এবং যা তিনি এই আসরে খানিক আগেই প্রয়োগ করেছেন।

বামাচরণ মুরাদ আলীর সরদের সেসব কায়দা সেতারে বাজিয়ে দেখিয়ে দেন যন্ত্রের ভাষায় তাঁকে বলতে চান যে—এই ত আমি সেতারে আপনার সরদের কাজ দেখাচ্ছি। এখন আমি সেতারে যে সব জিনিষ বাজাচ্ছি, আপনি সরদে দেখান ত?

এ যেন সাঙ্গীতিক ভাষায় একরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানান। মুখের কথায় কলহ না করে সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতিযোগিতা করা।

অবশেষে বামাচরণ যখন বাজনা শেষ করলেন শ্রোতাদের প্রশংসাধ্বনির মধ্যে, তখন মুরাদ আলী কিন্তু প্রত্যুত্তরে যন্ত্র নিয়ে বসলেন না। বামাচরণের উদ্দেশে তারিফ করে তাঁদের একটি প্রাণের কথা বলে ফেললেন—আপনি নিশ্চয় মুসলমান। হিন্দু ব্রাহ্মণ সেজে এখানে এসেছেন। পুরুষানুক্রমে পেশাদর না হ'লে এমন শেখা অসম্ভব।

কথাটা অদ্ভুত বটে। কিন্তু বামাচরণবাবু কিংবা উপস্থিত অন্য কোন হিন্দু ভদ্রতা ও সৌজন্যের বশে মুরাদ আলীর মুখের ওপর একথা বলতে পারলেন না—ভাল বাদক হ'লে তাকে কি মুসলমান হ'তেই হবে? অন্য দৃষ্টান্তের ত অভাব নেই! এই আসরেই যে হিন্দুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেলো, তাতেও ত আপনার ধারণা ধূলিসাৎ হওয়া উচিত। আর পুরুষানুক্রমে পেশাদার হওয়ার অজস্র উদাহরণ পশ্চিমের হিন্দু কলাবত সমাজে অভাব নেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে না থাক! তা ছাড়া, সঙ্গীতের আসরে হিন্দু মুসলমানের নাম, আলাদা ক'রে করা কি শোভা হয়? শিল্পী হিসাবে তার পরিচয় তা হ'লে আপনার কাছে যথেষ্ট নয়! বাদকের ধর্মের কথা আপনার মনে আসে কেন?...

এসব কথা উচ্চারণ করতে সাধারণ হিন্দুর উদারতায় বাধে। পাছে কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দেয় এই দুর্ভাবনায় সে সদা-সন্ত্রস্ত। অসাম্প্রদায়িক হ'তে গিয়ে

যে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে সে চিন্তার বালাই তার নেই! তাই স্থূল সংসারে যেমন দেখা যায়, অর্ধ-সত্য বা প্রায়-মিথ্যাকে অত্যন্ত মোটা ভাবে কিংবা বার বার বিঘোষিত করার ফলে এবং প্রতিবাদের অভাবে তা লৌকিক ক্ষেত্রে সত্যের মর্যাদা লাভ করে, এখানেও তাই হ'ল। মুরাদ আলীর এমন একটি অবান্তর কথা বলার জন্যে যেখানে অপদস্থ হবার কথা তিনি তা আদৌ হ'লেন কি? বরং তাঁর কথাটিই সেখানে টিঁকে রইল—বামাচরণবাবু এত ভাল বাজিয়েও হিন্দু ও ব্রাহ্মণ থেকে যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন! আর এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ধরে দিয়েছেন মুরাদ আলী!

ব্যাপারটি আরো মজার এই জন্যে যে, মুরাদ আলীকে সে আসরে বাজাবার জন্যে দক্ষিণা দেবেন হিন্দু এবং আসরের প্রায় সমস্ত শ্রোতাও হিন্দু।

তবু মুরাদ আলীর অতি অযৌক্তিক মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ সেখানে শোনা গেল না। (ক্রমশঃ)

সত্য-মিথ্যে

শৈবাল চক্রবর্ত্তী

রোগা বিধবা মেয়েটা ছাদের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে জল, মুখটা থমথমে।

ছন্দা বলল, ওসব ন্যাকামি আমরা বুঝি। ধানকাটার সময় হয়েছে তাই দেশে যেতে হবে—তাই না? ও ভাইপোর অসুখ-টসুখ নেহাৎ ছুতো।

নন্দা বলল, তা না ত কি।

বাড়ীর বৌ সবিতা ফিস ফিস করে বলল, কদিন ধরেই ওর কেমন উড়ু-উড়ু ভাব। কাজে-কর্মে মন নেই।

ছন্দা বলল, তার মানে ফন্দী আঁটতে ব্যস্ত ছিলেন আর কি।

খানিক আগে কর্ত্তার পায়ে ধরে পড়েছিল। তিনি এসে মেয়েদের মত জিজ্ঞেস করাতেই তারা এই রকম উক্তি করছিল।

ছন্দা হাত নেড়ে বলল, বাবা, তুমি কি করে বলছ! বৌদির মিউজিক কমপিটিশন মঙ্গলবার, নন্দার ফাইনাল পরীক্ষা আসছে সপ্তাহ থেকে, এই সময় রান্নার লোক দেশে বেড়াতে গেলে কি চলে!

আর তিন মাসের মধ্যে যদি দু'বার রাঁধুনীকে ছুটি দিতে হয় তা হ'লে তাকে না রাখাই ভাল, বলল সবিতা। এই কমপিটিশনের জন্যে সে এক বছর ধরে মাষ্টার রেখে গলা সাধছে।

আগের লোক দুটো ওই রকম দেশে যাওয়ার নাম করেই পালিয়েছে। ওই অমুকের অসুখ কি তমুকের অসুখ বলে হাতে-পায়ে ধরে বাড়ী যায় আর সেই যে ডুব মারে আর ফেরার নামটিও করে না। সুবালা এই মাসখানেক আগে দেশ থেকে ফিরেছে। জমি নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে নাকি ভীষণ মামলা চলেছিল। তার অংশের জমিটুকু তার শ্বশুর গ্রাস করে নিতে চাইছে, সেইটা বাঁচাবার জন্যেই তাকে পড়ি-কি-মরি করে যেতে হয়েছিল।

আজকে আবার সে দরবার করেছে তার ভাইপো শঙ্করকে দেখতে যাবার জন্যে ছুটি চাই। শঙ্করের পায়ের দয়া হয়েছে আজ ক'দিন, কিন্তু সুবালা খবর পেয়েছে আজই মাত্র। এখানে তাদের দেশের একটা লোক রয়েছে সে কোথেকে জেনে এসে বলেছে। শুনে পর্য্যন্ত সুবালা যাবার জন্যে অস্থির হয়েছে।

কিন্তু ছন্দা বলছে ওই লোকটাকে কি আমরা চিনি যে ওর কথা শুনেই ছুটি দিতে হবে।

কর্ত্তা পায়ে চটি গলিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন, তারপর বললেন, না বাপু, তোমার এখন যাওয়া চলবে না। তুমি যখন-তখন বাড়ী যেতে চাইলে কি করে চলে বল!

—আমাকে একটি দিনের ছুটি দিন বাবু। ওকে একবার দেখেই আমি চলে আসব। ম-মরা ভাইপো আমার—।

—যদি অসুখ করে থাকে ত তুমি গিয়েই বা কি করবে বল? অসুখে ডাক্তার-বদ্যির দরকার, সে ব্যবস্থা করবার জন্যে লিখে দাও।

সুবালা আর কিছু বলল না। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ডালের কড়াটা চাপিয়ে দিল।

—বাজে কথা, সব বাজে কথা। দিন-রাত গোয়েন্দা-গল্প পড়া ছন্দা এসে দিদিকে, বৌদিকে বলল। আমি বলতে পারি ওর চোখের জল বাজে। কেননা ও যখনই কাঁদছে, মুখ ঢেকে কাঁদছে।

—আরে বাবা, সত্যি তেমন যদি অসুখ করত তা হ'লে ও ছুটির পরোয়া করত না, ছুটেই চলে যেত। চকোলেট খেতে খেতে বলল নন্দা।

আসলে মেয়েছেলে রাখার নানা অসুবিধে। একটা-না একটা বায়না তাদের লেগেই থাকে। কিন্তু বাড়ীতে তিনটে বড় বড় মেয়ে থাকার জন্যে পুরুষ লোক রাখা সম্ভব হয় নি।

গতবারে এক কাণ্ড করে বাড়ী গেল। বলল, দেশে মামলা আছে। তার শ্বশুর তার জমিটা নিজের নামে লিখিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। কালকের মধ্যে না গিয়ে পড়লে জমিটা বাঁচানো যাবে না। চোখের জলে মন ভিজিয়ে অনুমতি আদায় করল সেবার। এল এক সপ্তাহ পরে, এরা তিন বোন আর নতুন বৌ তখন হেঁসেল নিয়ে বিপর্য্যস্তের একশেষ। ছন্দা অসুখেই পড়ে গেল। লোক রেখেও যদি নিজেদের হাঁড়ি ঠেলতে হয়, রান্নাঘরের

চাইপাশ ঘাঁটতে হয়, তা হ'লে মাসে মাসে সে লোককে মাইনে দেবার দরকার কি ?

তাই কর্ত্তা এবারে আর সাহস করলেন না। রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এখন তাকে ছুটি দেওয়া যাবে না। সেজ দিদিমণির পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিঝুম বাড়ীতে সুবালা যখন কাপড়-জামা গোছাচ্ছিল এমন সময় নীচে একটা লোক এল। এই লোকটা পঞ্চাননতলার কাঠের গোলায় কাজ করে। সুবালাদের গ্রামের পাশেই এর বাড়ী।

শ্বশুরের সঙ্গে মামলা লড়ার সময় এই লোকটিই তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল।

—সুবালা আছে ?

—হ্যাঁ। কেন ? নন্দা পরীক্ষার পড়া করছিল বৈঠকখানায় বসে। সকাল থেকে সাতজন লোক এসেছে, ওকে চারবার ওপর-নীচে করতে হয়েছে। বিরক্তির সঙ্গে সে বলল, 'কেন ? আবার কার অসুখ করল ?'

—আজ্ঞে না, কারও অসুখ করে নি। তেনার ভাইপো শম্ভু, যার মায়ের দয়া হয়েছিল, বলবেন সে রাত্তিরে মারা গেছে। এখন এই সাতটা বাইশের গাড়িতে গাঁয়ের লোক এসে আমায় খবর দিয়ে গেল।

সুবালা কিন্তু কাঁদল না খবরটা শুনে। ওরা ভেবেছিল হাউমাউ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধাবে।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। বরং এখবরটা শোনার পর থেকে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। ভিজে কাপড়গুলো দড়িতে মেলে দিল, আচারের শিশিগুলো রোদে ঠেলে দিয়ে রেশনের চাল নিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করতে বসল সে।

নন্দার পরীক্ষা, তাই বাড়ীতে অনাবশ্যক গোলমাল নেই। কর্তার চটির আওয়াজ শোনা গেল, তিনি মেয়েদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন একবার। মেয়েরা আড়চোখে তাঁর পায়ের দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

কিন্তু একটু পরেই থমথমে ভাবটা কেটে গেল। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল আর ভেতর থেকে নামল ভবেশ, বাড়ীর বড় ছেলে। হাসিতে মুখ-ভরা। মন্মথবাবু হাঁকডাক করতে করতে নীচে নেমে এলেন। পেছনে মেয়েরা। কোন খবর নেই, হঠাৎ দাদা এসে হাজির। ভারী আনন্দ! সবিতাকে পর্য্যন্ত আসার খবর জানায় নি। ভবেশ কানপুরে চাকরি করে, সহজে ছুটিছাটা পায় না। তাই তার আকস্মিক আগমনে সবাই খুব আনন্দ পেয়েছে।

—কি রে তুই হঠাৎ ? খবর কি ? মন্মথবাবু প্রশ্ন করলেন। হেঁট হয়ে বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে ভবেশ বলল, খবর ভাল। কাল রজতের বৌভাত, তাই এলাম।

—আচ্ছা। বৌ-ভাতে অদ্দূর থেকে এসে হাজির হ'লি! কাল ও বলছিল বটে ভবু না এলে আমি বড় কষ্ট পাব।

ছন্দা নন্দা বলল, যাক দাদা এসেছে এখন আমরাও নেমন্তন্নে যেতে পারব। চল, নিউমার্কেটে গিয়ে একটা ভাল শাড়ী কিনে আনি।

—কেন ? কেন ? ভবেশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল!

—বাঃ, বৌয়ের মুখ দেখতে হবে না। খুব একটা ভাল শাড়ী কিনতে হবে।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ রে তা ছুটি পেলি কি করে? তোদের সেই মাদ্রাজীর পাষাণহৃদয় কি করে গলালি ?

ভবেশ হাসল। বলল, ছোটনকে বলেছিলাম আপনার খুব শরীর খারাপ এই বলে টেলিগ্রাম করতে। রজতকে কিছু জানাই নি ওকে চমকে দেব বলে। সেই টেলিগ্রাম দেখাতেই পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল।

—০-

ঋষি রামানন্দ ঃ শতাব্দী প্রণাম

শান্তশীল দাশ

একটি তেজস্বী প্রাণ, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক সতত,
দেশের মঙ্গল চিন্তা নিত্য যার নিদ্রা জাগরণে ;
নিরলস কর্মব্রতী, আত্মসুখে সদা উদাসীন,
সমগ্র জীবনখানি ত্যাগদীপ্ত একটি সাধনা।

পরাধীন দেশে জন্ম, তবু শির চির সমুন্নত,
বাক্য নয়, কর্মে যার দেশজননীর আরাধনা
একনিষ্ঠ চিত্ত লয়ে ; আর সেই চিত্তের আলোক
বিচ্ছুরণ দিকে দিকে, তমসার ক্রম উৎসাদন।

জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী, মানবকল্যাণব্রতী সদা,
পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত সরল জীবন ;
প্রাচীন ভারত ঋষি মূর্ত যেন ও জীবন মাঝে ;
প্রাচ্যের মনীষা আর প্রতীচ্যের কর্ম সমন্বয়।

তব জন্ম-শতাব্দীর পুণ্যক্ষণে স্মরি ওই নাম,
শ্রদ্ধায় আনত চিত্তে ও চরণে জানাই প্রণাম।

কুলু অভিমুখে—মণ্ডি ও আউট-গিরি-সঙ্কট

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈজনাথ ধর্মশালার প্রান্ত থেকে যে ক্রমোচ্চ সড়কটি মোচড় খেয়ে হিমাচল রাজ্যের অন্তপুরে প্রবেশ করেছে—আমাদের যাত্রা আজ সেই দিকে। সকাল সাতটায় বাসে চেপে এই বাঁকা পথটি অতিক্রম করছিলাম আমরা। পথের খানিকটা এসেই কাংড়া উপত্যকা শেষ হয়েছে—যদিও জেলার নামটা রয়ে গেছে কুলু উপত্যকার শেষ পর্য্যন্ত। কুলুর প্রকৃত রূপ কিন্তু যোগিন্দরনগর না পেরুলে চোখে পড়বে না। যোগিন্দরনগরের সীমান্তে এলে হিমালয়ের আর একটি তোরণদ্বার খুলে যায়। চিড়-পাইনের অরণ্য-ভূমিতে পৌঁছে দৃশ্যটা অল্পে অল্পে বদলে যায়। ঈষৎ উঁচু-নীচু জমিতে বসতি চিহ্ন—দু'ধারে পরিচ্ছন্ন বন-বিস্তার, মাঝখানে আয়নার মত চকচকে পথ—এখানে-ওখানে লোকযাত্রার শান্ত-মন্থর ছবি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলে দলে পথ চলছে—ওদের কাঁধে ঝুলছে ইস্কুল ব্যাগ—হাতে লম্বামত একখানা শ্লেট। পড়ুয়ার দল চলেছে পাঠশালায়। বাস আসছে দেখে ওরা থামাবার জন্য কোলাহল করছে, পথের মাঝখানে দাঁড়াচ্ছে দু'একজন দুঃসাহসী। বাস-চালক হাত ইসারায় জানাচ্ছে—জায়গা নেই। সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে বাসকে। ছেলেমেয়ের দল কৌতুকে হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে। বাসে উঠতে না পেরে ওরা বিমর্ষ নয়—কৌতুকবোধে সমান সতেজ। এই বাসগুলিতে বসবার আসনছাড়া অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ার নিয়ম নাই। উঁচুনীচু ভূমিতে আকণ্ঠ বোঝাই গাড়ী নিরাপদ নয় বলেই এই নিয়ম। প্রত্যেকটি আসনে নম্বর-দেওয়া—একজন না নামা পর্য্যন্ত অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং চালক বরাবর হাত নেড়েই চলেছে।

ছেলেমেয়েরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। পথের বহুদূর পর্য্যন্ত এই রকম কৌতুক জমিয়ে রাখল। বাসকে আসতে দেখে ওরা হাত উঠিয়ে চীৎকার তুলছে 'জয়হিন্দ'। বাসে জায়গা না পেয়েও সেই আনন্দধ্বনি—'জয়হিন্দ'। এখানে সার্থকতায় বা আশাভঙ্গে ধ্বনির তারতম্য নাই। বরং বাস চলে যাওয়ার পর ওদের উচ্ছ্বসিত হাসিটি আরও উদ্দাম হয়ে উঠছে।

বন-বিভাগের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে—হিমালয়ের অরণ্য-সম্পদকে তোমার নিজের সম্পদ বলে মনে করবে।

চোখে পড়ছে এই সম্পদ আহরণের চেষ্টা। চিড়-পাইন গাছ থেকে প্রচুর গর্জন তেল পাওয়া যায়। সেই তেল সংগ্রহের চেষ্টায় গাছের গায়ে টিনের কৌটা বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে। অবিকল খেজুর রস সংগ্রহের কৌশল। মাটির কলসীর পরিবর্ত্তে টিনের পাত্র—তফাৎ এইটুকু।

বাস চলেছে আঁকা-বাঁকা পথে। একদিকে পাহাড়—অপর দিকে খাদ। খাদ গভীর নয়—স্তরে স্তরে নেমে গেছে উপত্যকা-ভূমি। দূরে আর একদল গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত সেই তরঙ্গ। পাহাড়ের গায়ে থাক-কাটা (Terraced) কৃষিক্ষেত্র। চাষের জমি নয়—যেন অসংখ্য সিঁড়ির মেলা। এখন—এই জুনের প্রথমে—মাঠ শস্যহীন। দিন কয়েক আগে বৃষ্টি হওয়াতে জমি নরম হয়েছে—কোথাও বা সামান্য সামান্য জল জমে রয়েছে। হাল-বলদ নিয়ে চাষীরা নেমেছে মাঠে। সকালের নরম রোদ এসে পড়েছে নরম জমিতে—ওদের চোখে-মুখে। বীজ বপনের আনন্দে ওদের সর্ব্বাঙ্গ চক্‌চক্ করছে। সারা কাংড়া উপত্যকায় চাষের জমি প্রচুর—যারা মাটিতে ফসল ফলায় তাদের সংখ্যাও পরিপুষ্ট। বর্ষার প্রারম্ভে এ যেন আর এক বাংলা দেশ।

যোগিন্দরনগর থেকে মণ্ডি পঁয়ত্রিশ মাইল। মণ্ডিতে বাস বদল করে আমরা কুলুর বাসে উঠব। তারও দূরত্ব তেতাল্লিশ মাইল। আর বৈজনাথ থেকে যোগিন্দরনগর তেরো মাইল। আজ সব মিলিয়ে আমরা একানব্বই মাইল যাব বাসে। সকাল সাতটায় যাত্রারম্ভ করেছি—যাত্রা শেষ হবে বেলা দু'টোয়। শরীর মন ক্লান্ত হবার অবকাশ যথেষ্ট। কিন্তু চারদিকের পার্ব্বত্য-পরিবেশ মনকে পীড়িত হবার সুযোগ দেয় না। অতএব মনের বাহন শরীরও তাজা থাকে। মাঝে মাঝে বাস-থামিয়ে দু'দশ মিনিট বিশ্রামের সুবিধা করে দেয়

বাস-চালক। তখন একটু পায়চারি করে বেড়াও, গিরিগাত্রচ্যুত ঝরণার জল পান করে তৃষ্ণা মেটাও, পথের ধারে ছোট গ্রাম পড়লে চা কিংবা খাবার কিনে নাও ইচ্ছামত। একটু এধার-ওধার গেলেও বাস তোমাকে ফেলে পালাবে না। নির্দ্দিষ্ট আসন-সংখ্যা ভর্ত্তি না দেখলে ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে তোমাকে ডাকবে। তোমার জন্য দেরি হল বলে মুখ ঝাম্‌টা দেবে না। যাত্রীরাও কেউ অনুযোগ করবে না। সবাই জানে এ-পথে এমন ছোটখাটো ত্রুটি অনিবার্য্য। হিমালয়ের রূপ দেখে হিসাব ভুলবে না—এমন অরসিক মানুষ এরা কল্পনাই করতে পারে না।

আরও দু'একটি আইন এরা অমান্য করে চলে। সে নিয়ে চালক বা আরোহী কাউকে আপত্তি তুলতে দেখি নি। বাসে লেখা আছে ধূমপান নিষেধ—আইনের চোখ রাঙানীটা অবশ্য নাই। ঠিক সেই কারণেই কি না জানি না—আইনটা ওরা মানে না। বিড়ি-সিগারেট ত সামান্য কথা—গড়গড়ার উপর কল্কে বসিয়ে চলন্ত বাসের শব্দ-তরঙ্গে নূতন সুর যোজনা করে কোন কোন ধূম-রসিক তাম্রকূট দেবীর আরাধনা করতে করতে চলেন। বাস থামলে এঁরা পথে নেমে নূতন ছিলিম তৈরী করে নেন। ফিরতি পথে আমার পাশে বসে একজন প্রবল বেগে বিড়ি টানছিল—তার পিছনে বসেছিলেন এক পাঞ্জাবী মহিলা। ধূমজাল তাঁর চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করাতে তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন, কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। আমি ধূমপায়ীর হাতটি ধরে সবিনয়ে আইনের কথা জানালাম। প্রথমটা সে খুবই অবাক হ'ল। পরে মহিলাটির অসুবিধা হচ্ছে বলায়—ত্রস্তে নেমে গিয়ে বিড়িটা শেষ করলে কয়েকটা টানে।

মহিলাটি অল্প হেসে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। আরও একটি অনাচারের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করব।

ঘোরা পথে পাক খেতে খেতে বাস চলেছে। গর্জ্জন কিছু আছে বটে—ঝাঁকুনিটা একদম নাই। বরং দোলনায় চেপে দোল খাওয়ার মত আরামই লাগছে। বেশীর ভাগ যাত্রীই সুস্থ রয়েছেন। কচিৎ কারও কারও 'চক্কর' লাগে। জ্বালামুখীর পথে একজনকে চক্কর লাগতে দেখেছিলাম। এ পথে তেমন কিছু ঘটল না।

এদিকে চিড়-পাইন যদি বা শেষ হ'ল—সুরু হয় দাড়িম্ব বন। ফুল-ফোটার কাল শেষ হয়েছে—দাড়িম্ব বন এখন প্রচুর পরাগে রক্তিমরাগে প্রগল্‌ভ নয়—কোমল রঙ-ধরা ফলের গৌরবে শাখাগুলি ঈষৎ অবনতাঙ্গ। সমতলের মানুষ আমরা এই সুস্বাদু মেওয়ার বে-ওয়ারিশত্ব দেখে লুব্ধ হ'লাম বই কি! ডাক্তারের পথ্য তালিকায় না উঠলে ক'টি সুস্থ লোকের ভাগ্যে বা এই অমৃত ফলের আস্বাদ লাভ ঘটে!

এই পথে লোক চলাচল ছিল না বললেই হয়। জায়গায় জায়গায় শুধু কর্ম্মী-শ্রেণীর লোকেদের দেখা যাচ্ছিল,—ওরা পথ মেরামতের কাজে লেগে রয়েছে। মেরামতি চলছে ব্যাপকভাবে। পাথর ভেঙ্গে কুচি কুচি খোয়া তৈরী করা—গলানো পীচের সঙ্গে মিশিয়ে পথে ঢালা, সাঁকো তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম টেনে আনা...দীর্ঘ পথের অঙ্গচর্য্যায় বহু মানুষই ব্যস্ত দেখছি। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রাম পড়ছে। সামান্য দোকান-পাট—আলাপ-আলোচনার সামান্য শব্দ, কিছু হাসি, সেই সঙ্গে বাঁশীর সুর, সরল চাউনির ছেলেমেয়েরা, কার্য্যরত বধূ—এক এক টুকরো ছবি—চলন্ত বাসের দু'পাশে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। পথের বাঁকে বাঁকে নালা আর সেতু—জলনিকাশের ব্যবস্থা। বাঁ ধারের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছুটছে বাস, ডান ধারে ছড়ানো উপত্যকায় ধাপে ধাপে সাজানো চাষের জমি—নদীর খাত—তার কোল বেয়ে অপর পারের খাড়াই গিরিপ্রাচীর। আরও দূরের পাহাড়গুলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢাকা—যেন আরব্য রজনীর সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যটা সবে পাত্রের ঢাকা খোলা পেয়ে ধোঁয়ার দেহটাকে আকাশে ঠেলে তুলছে।

অনেকখানি পথ আসার পর দৃশ্যপটে নূতন একটি রেখার সংযোগ ঘটল। বহুদূরে হাজার ফুট নীচের খাদে একটি রূপালী রেখার আবির্ভাব। যাত্রীদলে গুঞ্জন উঠল বিয়াস-বিয়াস। অর্থাৎ এই রাজ্যের জীবন-দায়িনী নৃত্য-চঞ্চলা নদী বিপাশা। এইবার উনি আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গিনী হবেন। কুলু উপত্যকার শেষ পর্য্যন্ত ওঁর গতির নিশানা ধরে আমরা এগিয়ে যাব।

বিপাশা ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হ'ল। ওর তরঙ্গ-সঙ্গীতে যাত্রাপথ হ'ল মুখরিত। এতক্ষণ দু'ধারের গিরিপথে আর উপত্যকায় ছড়ানো ছিল অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার—দৃষ্টি সাঁতার কেটে চলেছিল রূপসাগরে, এইবার সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ করে সঙ্গীতের সুর-স্রোতে ভরে উঠল শোত্র। উপলাহত জলস্রোত ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করে ধেয়ে চলেছে নীচে—দূরে দূরান্তরে। নৃত্যচপলা নটী অতি দ্রুত পদক্ষেপে ধেয়ে চলেছে প্রিয়তমের উদ্দেশে। পাষাণ অবরোধ ভাঙ্গার উল্লাসে সে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা—দু'পাশের উদ্ধত শিলাতটের উপরেই তার যত আক্রোশ।

এখন কাছে এসে আর সঙ্গীত নয়—রীতিমত গর্জ্জন, অক্লান্ত আস্ফালন—বিপাশা রণরঙ্গিনী। বাসের গতি-পথে আর একটি বিপরীতমুখী গতিবেগ দেখে মন মেতে উঠলো—আনন্দে ভরে উঠল। কেন আনন্দ জানি না। বাসা ছাড়া পাখী নীল নভো অঙ্গনে বিহার লালসায় যেমন অধৈর্য্য হয়ে ওঠে একি সেই অত্যুগ্র মনোবাসনার প্রতিচ্ছায়া?

মণ্ডি শহরের প্রবেশ মুখে এসে বিপাশার গৈরিকদেহ আরও স্পষ্ট হ'ল—তরঙ্গ-গর্জ্জন সমস্ত শব্দকে আত্মসাৎ করল। সুর-ঝঙ্কৃত একখানা বাঁকা তলোয়ার যেন সূর্য্য কিরণে ঝলসে উঠল। পুলের মুখে এসে থামল গাড়ি। এখন ভার না কমিয়ে গাড়ি পুলের উপর উঠবে না।

বেশীর ভাগ যাত্রী নেমে গেল। পায়ে পায়ে হেঁটে ওরা পুল পার হ'ল—ওপারে এসে আবার গাড়ি চাপবে। ইতিমধ্যে রোদটাও বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে—হাওয়া কমে গেছে।

মণ্ডি পাহাড়ে শহর হয়েও বেশ গরম। ওর তাপমাত্রা নিয়ে এদিকে রীতিমত আলোচনা চলে। চেহারাটা ওর জমকালো। পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ে, উপত্যকা-অধিত্যকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে সব জনপদ—তাদের গোত্রে মিলবে না এর গোত্র। এ শহর মুখ ফিরিয়েছে দিল্লী সিমলার দিকে—বাইরের বেশবাসে পার্ব্বত্য রীতিকে যদিচ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করতে পারে নি। দু'ধারের পাহাড়কে মুছে দিয়ে এ শহরকে দেখলে দেখা যাবে কলকাতা-বোম্বাই-এর বড় আয়নাটার একাংশে পড়েছে সযত্ন প্রসাধিত ছায়া। সৌধ-সজ্জায়, বিপণীতে, পথের চেহারায়—সর্ব্বত্রই সওদাগরি মনোবৃত্তি প্রতি-ফলিত। ত্রুটি হয়ত মিলবে মানুষের চালচলনে—কথা-বার্ত্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আহারে, বিহারে, আচার-অনুষ্ঠানে—কিন্তু এহ বাহ্য। অন্তরে অন্তরে মণ্ডি-সুন্দরী আজ বণিক-সভ্যতার অঙ্কশায়িনী হবার অভিলাষ পোষণ করছে। শান্ত উদার হিমালয়ের মাঝখানে বসেও সে হাত বাড়িয়েছে মুনাফালোভী বাণিজ্য-তরণীর কর্ণধারদের দিকে। সিমলা-কাংড়া-অমৃতসর প্রভৃতি পাঞ্জাবের বড় বড় কেন্দ্রগুলিকে পণ্য-পরিবহনের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে আছে মণ্ডী। এই শহরের আবহাওয়া, বাজারদর, শিক্ষাসহবৎ নিয়ে পাহাড়ীদের আলোচনা চলে প্রতিদিন।

বাসেই শুনছিলাম মণ্ডিতে এবার গরম পড়েছে খুব। আখরোটের বাজার খুব তেজী। চাউল, আটা, বনস্পতি? বলা বাহুল্য শেষেরটি অরণ্য-রাজ্যের অধিরাজ নয়, হিমালয়ের গভীরেও এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মণ্ডি থেকে আরও বহুদূরে হিমালয়ের অভ্যন্তরে, কুলুতে, মানালিতে, হোটেল রেষ্টুরেণ্টে খাবারের দোকানে এ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব চালাচ্ছে। কেউ এসে যদি বলে অমুক জায়গায় খাঁটি ঘি পাওয়া যাচ্ছে। তার উত্তরে অনায়াসে খেদোক্তি করা চলে, নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা!

এই মণ্ডিতেই মণ্ডি-কুলু ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের প্রধান অফিস। হিমালয়ের এই পথে—কাংড়া কুলু উপত্যকার যাত্রী ও মালপত্র বহনে ওদেরই একচেটিয়া রাজত্ব। আরও দু'একটি কোম্পানী অবশ্য আছে—তাদের বিস্তার বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যেই। যেমন জ্বালামুখী হাসিরপুর বাস সার্ভিস—কুলু-মানালি কো-অপারেটিভ বাস সার্ভিস কিংবা কুলু-বজৌরা সার্ভিস। সংখ্যায় এরা নগণ্য। এম-কে-আর-টি-কে সার্ভিসের মত সুসংবদ্ধ-সুনিয়মিত, আরামদায়ক পরিবহন এ রাজ্যে দ্বিতীয় নাই। এদের হল্টিং ষ্টেশনগুলিতে প্রতীক্ষালয় আছে, টাইম টেবল অনুযায়ী গাড়ি যাতায়াত করে, আসন সংরক্ষণ ও মাল বুক করার ব্যবস্থা আছে। সব দিক দিয়ে যাত্রীদের মনে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব এরা বহন করছে।

বৈজনাথে যখন আসন সংরক্ষণ করি—কন্ডাক্টর আমায় বলেছিল, এই বাস মণ্ডি পর্য্যন্ত যাবে, সেখান থেকে বাস বদল ক'রে কুলু-মানালি যেতে পারবেন। টিকেট থ্রু পাবেন। এখানে যে সীট নম্বর থাকবে ওদিকের বাসেও সেই নম্বরের সীটে বসবেন। সে সীটে আর কেউ বসবে না। বাস বদলের সময় বিশেষ ঝঞ্ঝাট হবে না। দুটো বাস পাশাপাশি থাকবে এ বাসের মাথা থেকে ও বাসের মাথায় মালগুলো গুছিয়ে নেবেন মজুরকে দিয়ে। মজুর খরচ যৎসামান্য।

বেলা তখন সাড়ে দশটা—মণ্ডি ষ্টেশনে বাস থামল। বৈজনাথ থেকে আমরা এসেছি প্রায় পঞ্চাশ মাইল। শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট, বড় বড় ইমারত, পার্ক ময়দান, জলের কল, লাইট, বাড়ী-ঘর, তদুপরি শহরের প্রান্তবাহিনী একটি উদ্দাম নদী... উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর এসব ভালই লাগে। ওরই মধ্যে বৈচিত্র্য ত। কিন্তু বাস ষ্ট্যাণ্ডটি মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। এমন একটা ভালমত আচ্ছাদন নাই—যেখানে ভ্রমণ-ক্লান্ত যাত্রীরা বসে-দাঁড়িয়ে খানিকটা সুস্থ হ'তে পারে। হয়ত দশ-বিশ মিনিটের

মামলা বলে পরিচালকরা এক তরফা ডিক্রিজারির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আবার মণ্ডির রোদটাও বেশ চড়া। তাতে কি—দশ-বিশ মিনিট এটুকু আর সহ্য করা যায় না? জলতৃষ্ণা পেয়েছে? এই ত দু'পা গেলেই পথের কলটা পড়বে—ওখানে গিয়ে গেলাস না থাকে অঞ্জলি পাত গে। অথবা চা-সরবতের দোকানেও যেতে পার। খাবার আর চায়ের দোকান ত আঙুলে গুনে ওঠা যাবে না। ইচ্ছে করলে পাঁউরুটি বিস্কুট—মুখরোচক সিঙ্গাড়া, ফুলুরি কিনতে পার। ফলও কিছু পাবে কিন্তু দুধের আশা করো না। ওটা চায়ের দোকানে কড়াই ভর্ত্তি দেখতে পাবে, বিনা চায়ে ওটি সুলভ্য নয়। হালুয়ের দোকানেও দুধ দেখবে। দুধ যদি ঘন জ্বালে বসানো থাকে পাবে না। ওই দুধে বরফি বা পেঁড়া তৈরী হবে অথবা দই পাতা হবে। তবে কি দুধ মিলবে না? অবশ্যই মিলবে। যোগানের দুধ টিনে ভর্ত্তি হয়ে যখন পাহাড় থেকে আসবে (বেলা দশটা-এগারোটার আগে আসে না) তখন কাচ্চি অর্থাৎ কাঁচা দুধ কিনতে পার, অথবা ইচ্ছা করলে পাক্কি অর্থাৎ গরম দুধও নিতে পার। শেষেরটা ঠিক জ্বাল দেওয়া দুধ নয়—খানিকটা তাতানো আর কি! ব্যস্, ওই আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি সংগ্রহ করতে পারলে ভাল, না হ'লে সারা দিনমান আর দুধের আশা করো না। দুধ তখন বরফি-দই-প্যাঁড়ায় রূপান্তরিত অথবা চায়ের জন্য সংরক্ষিত।

দুধের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা গেল—কিন্তু দুধ পেলাম না। ওটি আমার পক্ষে ঔষধ পথ্য দুইই। চা চলে না, অতখানি দুধ চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পানীয়ে রূপান্তরিত করা সত্ত্বেও নয়। মিষ্টি ফল অবশ্য চলে। এটা জুনের প্রথম সপ্তাহ। বাংলার মধুফল আমের এখন ছড়াছড়ি, এখানে আমের চিহ্ন দেখছি না। খোবানি উঠেছে বটে—ওটায় বিশেষ রুচি নাই। কলা চোখে পড়ল না। গ্রীষ্মকালে বাংলায় কত রকমের যে ফল! কুলু শুধু আপেল ন্যাসপাতির জন্য বিখ্যাত। তা সে সবও পাওয়া যাবে সেপ্টেম্বরে। যাঁরা নির্ব্বিচারে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেন মণ্ডি তাঁদের পক্ষে প্রীতিকর শহর। হোটেল রেষ্টুরেন্টে দেশী বিলাতী আমিষ ও নিরামিষ সবজাতীয় ভোজ্যই পাওয়া যায়। যাঁরা নির্ব্বিচারে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেন না তাঁদেরও সান্ত্বনা রয়েছে—গরম জিলাপী কিংবা প্যাঁড়া, ত্রিকোণ (সিঙ্গাড়া) অথবা পাঁউরুটি বিস্কুট। আজকাল জন-মনোরঞ্জনে জনতার অবদানই সর্ব্বক্ষেত্রে প্রকট! সেলুন, স্টোভ, মনিহারী দ্রব্য, ট্রেণ, বাস, বিড়ি, বাসন, আসবাবপত্র এই একটি মাত্র ট্রেড মার্কে বিশ্বজয়ের ইঙ্গিত—খাবারের মধ্যে জিলাপীও তেমনি সর্ব্ব রসনার পরিতৃপ্তিদায়ক বলে বোধ হচ্ছে। এই পাহাড়ে হিমাচল রাজ্যে সকাল বিকাল দুপুর সর্ব্বক্ষণই খোলা চাপানো রয়েছে—গরম জিলাপী যে কোন সময়ে পাওয়া যায়।

আপাতত ভোজ্য সংগ্রহের চেষ্টা ত্যাগ করে বাসের দিকে মনোযোগ দিলাম। কুলুগামী বাসটা এসে লাগল আমাদের পরিত্যক্ত বাসের গায়ে। মালপত্র চালান হয়ে গেল এ ছাদ থেকে ও ছাদে—আমরাও নম্বর-দেওয়া আসন ফিরে পেলাম। এখানে নূতন যাত্রীদল উঠল। অনেক মেয়ে আর পুরুষ—যাদের বেশ-বাসে হিমালয়ের চিহ্ন আঁকা। বৈজনাথ থেকে যারা আসছিল সবাই কাংড়া উপত্যকার বাসিন্দা, এক কালে দেশছাড়া রাজপুতের দল। এখানে যারা উঠল তারা কুলুর লোক। কাংড়া আর কুলু দু'টি উপত্যকাই পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। বাসিন্দাদের চেহারায় ও বেশবাসে ভিন্ন প্রকৃতি ও পোষাকের ছাপ। আবার উপত্যকা দু'টি একই জেলার ফাঁসে বাঁধা। আমরা বৈজনাথ থেকে দু'খানা চিঠি লিখেছিলাম কুলু ও মানালীর রিসেপশান অফিসারকে—বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। ঠিকানায় ছিল হিমাচল প্রদেশ—জেলা কাংড়া। এদিকটায় হিমাচল প্রদেশ আর পাঞ্জাবে এমন মেশামিশি হয়ে গেছে যে ডাক লপ্তে কোন ভূখণ্ডকে সনাক্ত করাই মুশকিল। পরদেশীয়দের কাছে এ রীতিমত গোলকধাঁধার ব্যাপার।

বাস ছাড়ল সামান্য বিলম্বে; মণ্ডির বাজার পার হয়ে প্রশস্ত ময়দানের পাশ কাটিয়ে অচিরাৎ বিপাশার তীরভূমিতে এসে পৌঁছল। এবার বিপাশা বাম বক্ষে ঊর্দ্ধগামিনী। এপার ওপার—দু'পারেই খাড়া পাহাড়। তবে একেবারে সঙ্কীর্ণ খাদে বন্দিনী নয়। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী তীরভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। আবার তীরে শুধু পাথরের কাঁড়ি জমে নেই, বালির মসৃণতাও দেখা যাচ্ছে। বালুতীরের কাছে স্রোত মন্থর—গর্জ্জন কম। অনেকখানি সমতল জায়গা পেয়ে শান্ত-শিষ্ট মেয়ের মত বিপাশা গা এলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে আর কতটুকু! একটু পরেই বাঁক আসছে, বক্রগামিনী বিপাশা সেখানে রণরঙ্গরসে প্রমত্তা। স্রোতের করতালে ঝঞ্চনা তুলে আছড়ে পড়ছে ঢালু-দেশে, পলকে বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট।

যতই এগুচ্ছে বাস—পাহাড়ের পথটাও যেন সঙ্কট-সঙ্কুল হয়ে উঠছে। মণ্ডির ওধারেও ছিল আঁকা-বাঁকা

উঁচু-নীচু পথ। দু' পাশের পাহাড়ের ব্যবধান ছিল বিস্তৃত। ধাপ-কাটা চাষের জমি খাদের বিভীষিকা ঢেকে রেখেছিল। আর সেই দিকেই মোটর পথের সঙ্গে অনেকখানি সমতল ভূমি হাত ধরাধরি করে ছুটছিল। মোটর যদিবা চলার ভুলে জমির কোণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে—তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবে না—এই ভরসাও মনে ছিল। কিন্তু মণ্ডির পর থেকে পাহাড় যেমন ঋজু কঠিন হয়ে উঠছে—সমতল জমিও তেমনি সঙ্কোচে গুটিয়ে যাচ্ছে। নদীও তরঙ্গ-আবর্ত্ত রচনা করে সগর্জ্জনে শাসন-বাণী উচ্চারণ করে ধেয়ে আসছে। চলার ভুলকে এরা ঈষৎ ভর্ৎসনা করে শুধরে দেবে না—প্রচণ্ড একটি আঘাতের দ্বারা চরম পরিণতির দিকেই নিয়ে যাবে।

মানুষের উপর এই পাহাড়ের ক্রোধও সঞ্চিত রয়েছে বই কি। মানুষ প্রতি দণ্ডেই আঘাত করছে পাহাড়কে—আগ্নেয় বিস্ফোরণে ওর দেহকে টুকরো টুকরো করে পথকে করতে চাইছে প্রশস্ত-সুগম। পাহাড়ের অস্থিচূর্ণ সংগ্রহ করে পথকে দিচ্ছে নব কলেবর। এখন ব্লাষ্টিং-এর কাজ চলছে—দশ-বিশ মাইল জুড়ে—পুরোদমে। এইজন্য বাসকে বার কয়েক থামতে হ'ল। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে আবার সে এগিয়ে গেল—ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ মাড়িয়ে। অনেকখানি এই ভাবে চলে বাস এসে থামল একটি সেতু মুখে। এই সেতু পার হয়ে গাড়ি আবার চলবে—বিপাশা দিক পরিবর্ত্তন করে আসবে ডান পাশে। এবারও গাড়ির ভার কমাবার জন্য বহু যাত্রী নেমে পড়ল। ওরা পায়ে হেঁটে পুল পার হয়ে গেল। গাড়ি এগিয়ে যাবে ছাড়পত্র নিয়ে।

এখানে বিপাশার ধারায় যোগ দিয়েছে আরও একটি ছোট নদী। তারই নামে নাম মিলিয়ে সেতুটির নাম পাণ্ডো সেতু (Pandoh Bridge)। কিংবা নদী-তীরবর্ত্তী কোন গ্রামের নামানুসারে সেতুটি চিহ্নিত হ'তে পারে। যাই হোক, এই সেতু পারাপারের ব্যবস্থাটি একটু কড়া রকমের। কারণ ওপারের তেরো-চৌদ্দ মাইল লম্বা পথটি গিয়েছে গিরিসঙ্কটের মাঝখান দিয়ে—অতি সঙ্কীর্ণ একমুখো রাস্তা। মাঝখানে বিপাশার ধারা, দু'পাশে গিরিশ্রেণী যুধ্যমান বীরের মত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়িয়ে নাই—পরস্পরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে। দুই পাহাড়ের খাদটুকুতে রণ-রঙ্গিণী বিপাশার নিষেধের তর্জ্জনী কাঁপছে থরথর। ওই ঝুঁকে-পড়া একটি পাহাড়ের কোল দিয়ে গেছে পথটা। সে পথে একটি মাত্র গাড়ি কোনমতে যেতে পারে—তাই বিপরীতমুখী বাসগুলিকে এমুখে পাণ্ডো সেতুর মুখে আর অপর প্রান্তে আউট গ্রামের সীমানায় জড়ো করে হিসাব মিলিয়ে একমুখো পথে চালিয়ে দেবার ব্যবস্থা। লোহার মোটা শিকল দিয়ে সেতু-পথ আটকানো, রীতিমত তালাচাবি আঁটা। ছাড়পত্র পেলে একজন শান্ত্রী তালার চাবি খুলে শিকলটা নামিয়ে দেবে—আর সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক বুকে-পিঠে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সেতু মুখে এসে দাঁড়াবে। তারপর পুলের উপর দিয়ে বাসের আগে আগে খুব আস্তে আস্তে চলবে লোকটি, যেন হাঁটি হাঁটি পা পা। বাসও চলবে গড়িয়ে গড়িয়ে, ঘণ্টায় পাঁচ মাইলও গতিবেগে নয়। বেশ খানিকটা সময় গেল, এমনি আদব-কায়দার কানুন মানতে গিয়ে।

নূতন পথে বাস ছুটল। কিন্তু পথ কোথায়? এ যে দু'ধারে দুই উত্তুঙ্গ শৈলদানব প্রকাণ্ড মুখ ব্যাদান করে পথ রোধ করেছে। নীচেয় বয়ে চলেছে খরস্রোতা বিপাশা। দশ-বিশ হাত যেতে-না-যেতে বাঁক ঘুরছে বাস, আর নূতন নূতন দৃশ্যপট নিয়ে গিরিশ্রেণী ভয়াল ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। পায়ের তলায় নদী নেমে যাচ্ছে প্রবল বেগে, বিপরীত দিকে গতির ঢেউ তুলে একের পর একটি বাঁক পার হচ্ছে বাস। মাথার উপরে ভাসছে একফালি মন্থর আকাশ। এই কৌতুক-রঙ্গ দেখতে বাসের মাথার উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পাহাড়। একটু যদি ধাক্কা লাগে বাঁক ঘুরতে, একখানি পাথর যদি গড়িয়ে আসে উপর থেকে, কি যে ঘটতে পারে—সে চিন্তা আমাদের মনে উঠছে না। অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে ওঠে নি—মন এখন মরণ-দোলায় চেপে সুখস্বপ্তি-রোমাঞ্চে বিবশ বিহ্বল। অনবরত বাসের দোলা খেয়ে খেয়ে স্তিমিত অনুভূতিতে শিথিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থানে এসে না দাঁড়ালে বুঝি এমন পরম রমণীয় স্পর্শানুভূতি লাভ করার সৌভাগ্য ঘটে না।

এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথেও সরকারী উদ্যমে শৈল বিদারণ কার্য্যটি এগিয়ে চলেছে। পথকে আরও চওড়া করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিংবা শ্লেট পাথর সংগ্রহের জন্য কাজটা চলেছে। একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী গোপন একটি তথ্য আমাদের জানালেন, সেটির সত্যাসত্য না জেনে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

মণ্ডির পর থেকেই পথটা যত দুর্গম হচ্ছে—সংস্কারের কাজটাও যেন ব্যাপক হয়ে উঠছে। পুরাতন সেতুগুলি মেরামত নয় সম্পূর্ণ নূতন করে তৈরী হচ্ছে—বাঁকগুলি যথাসম্ভব সরল হয়ে উঠছে। এতে গাড়ির গতি দ্রুততর হবে—এক সঙ্গে বিপরীতমুখী যান চলাচল

সম্ভব হবে, সময়ও বাঁচবে অনেকখানি। আমাদের বাস বহু জায়গায় থামল, বহু অস্থায়ী পথের উপর দিয়ে মন্দগতিতে চলল, ছাড়পত্র সংগ্রহেও গেল কিছু সময়। বহুস্থানে মজুরেরা বিস্ফোরিত পাথরের টুকরো-গুলো এক পাশে সরিয়ে বাস যাওয়ার পথটি সুগম করে দিলে ফিস্‌ফিস্‌ আলোচনা চলল: চীনের ড্রাগনটা হিমালয়ের লাডাক সীমানায় থাবা গেড়ে বসে নখদন্ত শাণিয়ে আস্ফালন করছে বলেই এত সব উদ্যোগ আয়োজন।

এধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে চলেছে বাস—বিপাশা দ্রুতবেগে নেমে আসছে তার বশে বশে। কিংবা স্রোতের তরবারি চালিয়ে বিপাশা সৃষ্টি করে নিয়েছে এই বাঁকা-চলন পথটি। এ পাশের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি না আমরা—একেবারে বাসের গা থেকে খাড়া উঠে গেছে আকাশে। ওপাশের পাহাড়ে অজস্র বন-জঙ্গল। নানা অপরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত গাছের জটলায়, অতি পরিচিত খেজুর গাছ দেখলাম।

অবশেষে গাড়ি এসে দাঁড়াল আউট গ্রামের বেড়ার ধারে। এইখানেই ভয়ঙ্কর গিরি-সঙ্কটের শেষ। বেড়ার ওপাশে মণ্ডিগামী গাড়িগুলি জড়ো হয়েছে। ঠিক তার পাশ দিয়ে একটি পথ—ওপাশের পাহাড়ের ধারে ধারে চলে গেছে। মাঝখানে একটা পুল অবশ্য আছে। ওই পথটা গেছে 'লারজি' উপত্যকায়। যে সময়ে 'আউটের গিরিসঙ্কট ভেদ করে কোন পথের সৃষ্টি হয়নি—তখন কুলু উপত্যকায় আসার রাস্তা ছিল 'লারজি' উপত্যকার মাঝখান দিয়ে—ওই পথে। এখনও ওপথে মানুষের যাতায়াত কম নয়। ওই পথে এগিয়ে গেলে চমৎকার 'বানজার' গ্রামটি দেখা যাবে। ওই পথ আবার মিশেছে 'জলোরি' গিরিসঙ্কটে। আরও দূরে পথ চলে গেছে শতদ্রু পার হয়ে 'কুমারসাঁই'তে।

'আউট' গ্রামটি ছোট হ'লেও জলযোগ ও খানা-পিনার ব্যবস্থা আছে—একটি পুলিশ চৌকিও আছে। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার গাড়ি থামে। কালটা আবার মধ্যাহ্ন—যাত্রীদের প্রয়োজনে খাবার দোকান ও রেষ্টুরেণ্ট বেশ জমে উঠেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ঝরণার জল-ধারা—নীচেয় অফুরন্ত সলিল-সম্ভার নিয়ে বিপাশা। এই জলকে কোথাও খাল কেটে কোথাও পাথরের নালার মধ্য দিয়ে টেনে এনে, কোথাও পাইপ বসিয়ে অন্তঃপুরচারী করে মানুষ তার নানা প্রয়োজন মিটিয়ে নিচ্ছে। এখানকার জমি উর্ব্বরা, নদীর ধারে ধারে আপেল নাসপাতির বাগানগুলি পত্র পুষ্প ফলভারে স্বাস্থ্যশ্রীতে ঝলমল করছে।

সবাই আমরা বাস থেকে নেমে পায়চারি করে নিলাম। দেহের এঞ্জিনে কিছু রসদও ভরে নেওয়া গেল—যার যেমন রুচি। একটানা বাসে বসে থেকে যেটুকু অবসাদ এসেছিল (যদিও চারিদিকের প্রকৃতি পটভূমি নব নব সৌন্দর্য্য-সম্ভারে মনকে ক্লান্ত হবার অবকাশ দেয় না—কিন্তু দেহ-মনের অগোচরেও সামান্য ক্লান্তি সঞ্চয় করে নেয় বই কি!) তা কেটে গেল। দু' দিকেই দু'টি খাড়া গিরি-প্রাচীর--আবার এমন একটি বাঁকের মাঝখানে আমরা রয়েছি যে সেখান থেকে আসা-যাওয়ার পথটাও চোখে পড়ছে না। এমন সঙ্কীর্ণ একটি গিরিরন্ধ্রে আমরা আটক পড়েছি। আমাদের মাথার উপর সামান্য এক টুকরো আকাশ ভাসছে—এতটাই ছোট হয়ে গেছে পৃথিবী! এমন সময়ে বহুদিন আগে-পড়া একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি এই গিরিবর্ত্মে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মহা পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট আওরঙ্গজীব বন্দী হয়েছেন উদয়পুরের গিরিপথে—সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সৈন্য, অন্তঃপুর, রসদপত্র। পথ রোধ করে বসে আছেন রাণা রাজসিংহ। আর উপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে বড় বড় পাথরের পিণ্ড—। স্মরণ মাত্রই উপরের পানে আবার চাইলাম। হাঁ—এখানেও সে সম্ভাবনা রয়েছে। ওই ঢালু পাথরের গায়ে অসংখ্য চিড় গাছ, এলোমেলো পাথর, তার উপরে ছাগল চরছে। এক পাথর থেকে আর একটা পাথরে ওরা অনায়াসে লাফিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ছাদেও ঝুঁকে-পড়া পাহাড়-কাটা পাথরেরা দাঁত বার করে ভয় দেখাচ্ছে। এখানকার মানুষরা বুঝি পাহাড়কে ভয় করে না। যখন ঝড়-জলে প্রকৃতি দুর্য্যোগময়ী ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে তখনও কি এরা ঘরের মধ্যে বসে এমনি হাসি-আনন্দে গল্প করতে পারে? গান গায়, বাঁশী বাজায়, প্রেম-গুঞ্জন করে নিঃশঙ্ক চিত্তে?

গাড়ী-ছাড়ার বাঁশী বাজতেই চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। আমরা উঠে বসলাম যে যার জায়গায়। চেক-পোষ্টে হিসাব মিলিয়ে গাড়ীগুলো বিপরীতমুখী হল। খানিকটা এগিয়ে আসতেই মস্তবড় একটা সাইনবোর্ডে সরকারী অভ্যর্থনা-বাণী জল জল করে উঠল:

Kulu valley welcomes You'

স্বাগত জানাচ্ছে কুলু-উপত্যকা।

—0—

॥ ৬ ॥
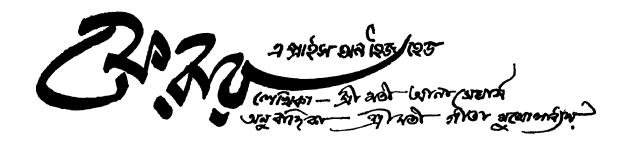
তার কিছুক্ষণ পরেই আলগাইয়ারও বাড়ী চলে গেল। সে আগেই জানত সরাইতেও এমন কিছু প্রীতিকর লাগবে না। কিন্তু কখনও কখনও একটা বিপদ থেকে আর একটা বিপদের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয় যাতে অবস্থাটা সহ্য করার ক্ষমতা পাওয়া যায়। তারা কেবল পথে পা ফেলেছে এমন সময় পাউল সুরু করে :

"শোন বাবা, আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে দাও। ওদের দলটা সচ্চরিত্র ছেলেদের নিয়েই। তুমি নিজেই বলেছ কুঙ্কেল কাজের ছেলে। আমায় ওদের সঙ্গে যোগ দিতে দাও।"

"না, আমার পছন্দ নয়।"

"কি পছন্দ হ'ল না তোমার? কুঙ্কেল ত ভালই, আর ড্রাইভার যা বলল সে কথাও ঠিক। বাবা, কেন আমায় যেতে দেবে না?"

"পছন্দ হয়না।"

"কেন তুমি শুনছ না, বাবা!"

"এখন চুপ কর ত, অনেক রাত হয়েছে।"

আলগাইয়ার খুব চটে শক্ত ক'রে ওর কাঁধ দুটো পাকড়ায়। পাউল আর কথা বলে না, ওকে এড়িয়ে টুক ক'রে দরজা দিয়ে পিছনের ঘরে ঢুকে যায়। আলগাইয়ার ঘরে ঢুকে সোফার সামনে একবার থামে। চোখ নাবিয়ে মারিকে দেখে। তার গভীর অবিচলিত ঘুম, তার তরুণ বুকের নিয়মিত ওঠাপড়া দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে সে।

তার ইচ্ছা হ'ল মারিকে ঘুম থেকে তুলে তাড়িয়ে সহরে পাঠিয়ে দেয়, পাঠিয়ে দেয় সেই মহিলার কাছে, যিনি অল্পবয়সী মেয়েদের জন্য ঝি ইত্যাদির কাজ খুঁজে দেন। পাঁচ বছর আগে তাঁরই কাছে মারিকে নিয়ে গিয়েছিল আলগাইয়ার। মারিকে বলেছিল তল্পিতল্পা গুটিয়ে, চুল ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে সঙ্গে আসতে যাতে মাসে মাসে তার মাইনের টাকা বাড়ী পাঠাতে পারে এবং বাইরের লোকের বাড়ী খাওয়া-দাওয়া চালাতে পারে। মারির রাত্রের পোশাকের খাটো জ্যাকেট এবং গায়ের ঢাকার মাঝখান দিয়ে তার চোখে পড়ে একফালি সাদা ঝকঝকে মাংস। 'চাষীদের কাছ থেকে যত কথা শুনেছিল এখন সেগুলো মনে পড়ে সে রেগে ওঠে, হঠাৎ তার মনে হয় ওরা ঠিকই বলেছিল, তার মেয়ে তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। তার হাতখানা উঠে পড়ে, তালুর সরু পাশটা দিয়ে ওই সাদা মাংসের উপর আঘাত করতে উদ্যত হয়। মেয়েটার সমর্থ ক্ষুধার্ত দেহটাকে এখন তাকে খাওয়াতে-পরাতে হবে, এ কথা ভাবতেই তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তার পর সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় দেখে যে একটা ন্যায়বিচারবোধ তাকে অধিকার করে, বজ্রধ্বনির মত তাকে উচ্চকিত করে। বাইরে থেকে আসা এই প্রভাব তাকে বিস্মিত করে। এই অনুভূতি যেন সহ্য করা কঠিন। অবশ্যই মারির মালিক তাকে বরখাস্ত করেছে, কারণ তার নিজেরই আর মাইনে দেবার ক্ষমতা ছিল না ওকে। চিঠিটা যে মুহূর্তে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে মারি তাকে দেখিয়েছিল, সে হ'ল গতবার সে যখন ছুটিতে এসেছিল সেই সময়ে। সে সময়ে আলগাইয়ার বেশী কিছু বলে নি, সে নিজে সমস্ত ফলাফল তখন বুঝতে পারে নি। সে কয়েকটা জিনিষ কিনেছে, কয়েকটা মেরামতের কাজ করেছে কিস্তিতে শোধ করার চুক্তিতে। এই খেপগুলো শোধ হ'ত ঠিক মারির মাইনেটা দিয়ে। মাখন তোলার একটা নতুন যন্ত্র কিনেছে সে। পাঁচ সপ্তাহ আগে তারা এক কিস্তির জন্য প্রথম হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছে। সে থলি ঝেড়েঝুড়ে কোনও প্রকারে পঁচিশ মার্ক পাঠিয়েছিল, তারা দু'সপ্তাহের সময় দিয়েছিল ফলে। পরের কিস্তি আবার পাওনা হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে তারা জানিয়েছে যে শনিবারের

মধ্যে যদি টাকা না পায় তা হ'লে তারা যন্ত্রটা নিয়ে যাবে। টাকা সে দিতে পারে নি। আলগাইয়ার বিশ্বাস করে না যে তারা হুমকি অনুযায়ী কাজ করবে। যে সব দুর্ভাগ্য সে কল্পনা করতে পারে শুধু সেইগুলোতেই সে বিশ্বাস করে।

॥ ৭ ॥

শেষরাত্রির দিকে জোহানের ঘুম ভেঙে যায়, হতবুদ্ধি অবস্থাতে সে বাগানে দৌড়য়। মোরগগুলোর চড়াডাকেই নিশ্চয় ওর ঘুম ভেঙেছে, কারণ আর একটা নতুন দিন যে অবধারিত ভাবে এসে পড়ল তা সহরের সমাগত প্রভাতের সাড়াশব্দের চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় মোরগদের এই নির্দয় চিৎকারে। তাদের বোধ হয় অন্যদিনের চেয়ে সামান্য একটু আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ট্রাকের শব্দে। ট্রাকটা বটৎসেনবাখের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, কারণ ঐখানেই ভাটিখানার ড্রাইভার এবং তার সাথীরা রাত কাটানোর ঠিক করেছিল। মাঠের ওপার থেকে উদীয়মান সূর্যের অরুণ ছটা কুয়াশাঢাকা রাস্তায় ঝকমকিয়ে তুলছিল ছেলেদের পোশাকের ধাতুময় অংশগুলোকে, টুপির বোতামগুলোকে। জোহান বেড়ার উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে। ট্রাকটা থামে, একজনকে নাবিয়ে দিয়ে আবার চলে যায়। জোহানের চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না সে। হঠাৎ ওর বুকের ভিতরটা ভয়ানক রকমে ধকধক ক'রে ওঠে।

পাম্পের পাশে পিপের উপর একগোছা হলদে ভ্যাপসা খড় ঝুলছিল। তার পাশেই ঝুলছিল কয়েকটা তৈরী বিনুনী, আর একটা ছিল যেটা সুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয় নি। জোহান দাঁড়িয়ে সেটাই বিনতে সুরু করল! "আর আমায় কি কাজ ওরা দেবে? আর কি কাজ থাকতে পারে যার জন্য ওরা আমায় রাখতে চাইতে পারে? আমার ক্লান্তি দূর হয়েছে, খাওয়া হয়েছে, এবার আমি যেতে পারি। কিন্তু এখানে থাকাটা অপেক্ষাকৃত ভাল হ'ত, নিরাপদ হ'ত। এখানে আমাকে কেউ চেনে না, এখানে আমায় খুঁজতে আসবে না কেউ। ভালয় ভালয় উতরে যাবে।"

খড়ের বিনুনীটা সে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর যে তক্তাখানা দিয়ে রাত্রে পাম্পটা ঢাকা থাকে সেটা সরিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে বাস্টিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওর দিকে সে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, প্রথমে গোপনে, তারপর জোহান ফিরে দাঁড়ালে সরাসরি। শেষবারের মত দ্বিধা করে বাস্টিয়ান, তারপর বলে: "শোন, ব্যাপারটা এইরকম। আমি ভাবছিলাম—শুনে নাও, এই হপ্তার শেষে, বড়-জোর সামনের হপ্তার গোড়ায় আমি রাইসর্যের হাত দেব। গেল বছরেই আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি ক'রে সব তুলব। এবার কি হবে আমি জানিনে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ—আমি আছি, মার্গারেট আছে আর ছেলেপিলেদের মধ্যে আছে ডোরা, তা সে যে কি রকম পলকা চিজ তা ত দেখতেই পাচ্ছ।

"তোমারও ত বিশেষ কোনও তাড়া নেই মনে হচ্ছে। খুব কিছু জরুরী তোমার কাজ আছে ব'লেও মনে হয় না। আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধেও তোমার একটা খুব টান দেখছিনে। চুপ কর, বাধা দিতে হবে না।

"আমি তোমায় খোলাখুলিই বলি: মজুরি দিয়ে কাউকে আমি রাখতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার হবে না—কোনও দিনই না। কাজেই আমি ভাবছিলাম: যদি তুমি খাওয়া থাকার বদলে রাজি হও। যদি তুমি তাতে থাকতে পার।"

জোহান জবাব দেয়: "তাতেই আমি থাকব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাঠের বেঞ্চ এবং বাচ্চাদের মাথার উপরের ছাদে এবং একমাত্র জানলার উপরে বর্ষার নৃত্য চলছে। গরম আলুর ধোঁয়ার মধ্যে বাস্টিয়ান প্রার্থনার শেষ বাক্যটি ধমকের সুরে উচ্চারণ করে: "...এ দিন আমাদের দাও।" একমাত্র জোহানই বৃষ্টি দেখে সঙ্গোপনে আনন্দিত হয়। গতকাল আর আজ বৃষ্টির জন্য ফসলকাটা সুরু হ'তে পারে নি, তেমনি তার যাওয়াও দু'দিন পিছিয়ে দিয়েছে। গতরাতে আকাশ পরিষ্কার হ'তে সুরু করেছিল, কিন্তু আজ সকালের বাতাস আবার ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, আকাশে সূর্যের রঙও যেন মরচেধরা। থেকে থেকে ঘন বর্ষণ হচ্ছে, পাকা ফসলের উপর আঘাত হানছে যেন নিরিখ ক'রে ক'রে অঝোরে ঝরছে মাটিতে যেন এপ্রিল মাসের মত। ছেলে-মেয়েরা বাস্টিয়ানের দিকে মুখ তুলে চাইছে না, কারণ কারও বাবার দুর্ভাগ্য হ'লে তার মুখের দিকে তাকান ভাল নয়।

বাস্টিয়ান বলে: "আমি জানিনে এবারকার শীতে কি হবে।"

ভ্রূজোড়ায় কেবল সামান্য অধীর কাঁপন দেখা দেয় তার স্ত্রীর, শান্তভাবে সে জবাব দেয়: "অপেক্ষা করে দেখা যাক।"

ডোরা তাড়াতাড়ি মায়ের দিকে চায়। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে খাওয়াচ্ছিল সে, এই সবার ছোট বাচ্চাটিও ইতি-মধ্যে বাস্টিয়ানের অন্য ছেলেমেয়েদের মত শান্ত হয়ে উঠেছে।

ডোরা মাথা নীচু করে। সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে আগামী শীত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং তার মুখে স্পষ্ট ছাপ ফেলে। তার হাল্কা হাতের মধ্যে দুধের বালতির বরফের মত ঠাণ্ডা শানিত হাতলটা যেন কেটে বসে। গেল বছরের জুতোপরা পা দু'খানা যেন গলিত তুষারে ভিজে ওঠে। পেটভরার মত রুটি মেলে না, ময়দা আর জলের একটা পাতলা সুরুয়া তার পেটে পড়ে। ক্ষিধেয় আতুর হয়ে ওঠে সে, কানের মধ্যেটা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে, মা-বাবার মুখগুলো যেন চোখের সামনে দুলে ওঠে। কিছুদিন হ'ল তার বাবা তাকে অন্যদের বাড়ীতে কাজ করতে পাঠাবে ব'লে বলছে। ডোরা চিনত এলি ব'লে মেয়েটাকে, তার চেয়ে সামান্য একটু বড়ো, বিকেল-বেলায় মেরৎস্ পরিবারের বেড়ার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত। সামনে তার বেঞ্চের উপর দুটো কাপড় কাচার গামলা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোজা কাচত। ওই রকমভাবেই সেও দাঁড়িয়ে থাকবে আর কারও বেড়ার পিছনে. ভিনগ্রামে বন্দিনী হয়ে। টেবিলের উপরকার পাউরুটির গুঁড়োর মধ্যে অধীরভাবে সঞ্চালিত হ'তে থাকে তার আঙুলগুলো। বাস্টিয়ান দেখতে পেয়ে তার আঙুলের সন্ধিতে জোরে আঘাত করে, টেবিলের তলায় হাত টেনে নেয় ডোরা। তাড়াতাড়ি হাতখানা ধরে জোহান। ডোরা গভীর তাকিয়ে তার দিকে চায়। বাস্টিয়ান অধীর হয়ে ওঠে। বলে: "আমাদের সঙ্গে নতুন রুটি খাওয়া তোমার হবে না, হবে না। ভাল কথা, আমি কেবল ভাবছিলাম—তুমি তা হ'লে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকছ। আগে হোক, পরে হোক রাইএর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্যেই ত তুমি রইলে, তাই না? তোমার ত নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে।" নিজের ভীতবিহ্বলতা ঢেকে ফেলে জোহান জিজ্ঞাসা করে: "কোথায়?"

"কোথায়? জেলা অফিসে। আর জেলা অফিস হ'ল খামারের মালিক মেরৎস্।"

জোহান বলে: "ঠিক আছে। রাত্রে খাবার পর আমি সেখানে যাব।"

বাস্টিয়ান বলে: "মেরৎস্‌কে আমার নমস্কার জানাতে পার কিন্তু দেখো যেন তোমার কাছ থেকে বেশী কথা বের করতে না পারে। এখানে আমরা কি আলোচনা করি, কি খাই এ সমস্ত বিষয়ে তোমার কাছ থেকে কথা বের করতে কোনও মতেই দিও না কিন্তু ওকে।

॥ ২ ॥

পরে জোহান যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন জানলা দিয়ে মাথা বের ক'রে দেখছিল লোকেরা। ও পার হয়ে গেলে মাথা ঢুকে যাচ্ছিল। মন্তব্য চলছিল: "ওই ত বাস্টিয়ানের লোক।" "ও কি থাকছে নাকি?" "সাহায্য করার জন্য রয়েছে, অসুরের মত খাটে—শুধু শুধু।" "কিসের জন্য?"

অন্ধকার গ্রামপথের একান্ত নিরালায় বাইরে থেকে আসা জিনিষ ছিল দু'টি মাত্র—সে নিজে এবং বর্ষা। বাঁকে ক'রে দুই বালতি নিয়ে আসছিল একটি বুড়ী, তার জন্য পথ ছেড়ে দেয় জোহান। বেশী বেশী ক'রে হাঁপাচ্ছিল বুড়ী, পদে পদে থামছিল নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্যে। বেজায় নোংরা চেহারা। অনেকগুলো বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরেছিল, রাস্তায় জমা জল ঘাঁটাতে তারা ব্যস্ত। ব্রণভর্তি মুখখানা বিকৃত করে বুড়ী। এই হ'ল নয়গেবাওয়ারের ডাইনী বৌ—ক্লেদাক্ত, বহু-নিন্দিত।

রাস্তাটা অলক্ষিতে নেবে এসেছিল চৌখুপীর গায়ে। এখান থেকে তাকে বড় রাস্তার দিকে বাঁক ঘুরতে দেখা যায়। এখান থেকে হেঁটে চলে যাওয়াটা কি সোজাই হ'ত! ক্ষেতের মাঝ দিয়ে মাটি পার হয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। হঠাৎ সহরের জন্য মন কেমন করে ওঠে জোহানের। সে চোখ বন্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে বর্ণাঢ্য নগর-রাত্রি। কানে বেজে ওঠে তার কোলাহল। ভীড়ের মধ্যে ঠেলে যেন পথ ক'রে নেয় তার কাঁধজোড়া। আমি কোথায় রইলাম তা নিয়ে কি ওরা মাথা ঘামাবে? আমি যাতে পালাতে পারি তার জন্য ওরা পনর মার্ক চাঁদা তুলেছিল, ওরা কি চিঠি লিখবে? ইতিমধ্যে অনেক কিছু ত ঘটে গেছে।

একটা বেড়ার পিছনে একটা কাপড়কাচার গামলা নিয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল একটা মেয়ে। আমি যদি সরে থাকি? হয়ত বাস্টিয়ানরা আমার পেছনে পুলিশ পাঠাবে। অবশ্য আমি নিশ্চিত জানিনে, ওদের সম্পূর্ণভাবে জানা নেই আমার। মেরৎস্‌এর বাড়ীর দরজা খোঁজে সে, বাড়ীটা চৌখুপীর উপর সরাইখানাটার ঠিক উল্টোদিকে। বন থেকে যে পথটা নেবে এসেছে তার উপরই বাড়ীটার দরজা। দরজার গায়ে একটা পিতলের

রেজিষ্ট্রি—জার্মানীতে তখন সমস্ত লোককে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হ'ত। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে সাময়িক-ভাবে থাকলেও তা লেখাতে হ'ত।

হাতল। তিনটি পাথরের সিঁড়ি ছিমছাম করে কাটা, জানলাগুলোর ঝকঝকে পালিশ। বুক ঢিপঢিপ করে জোহানের। এখন আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার। ও কিছু জিজ্ঞাসা করবেনা, কিছু খেয়াল করবে না। বাড়ীর সহরের কর্তৃপক্ষকে কিছু লিখবে না। সে কথা ভাববেও না ও। আমি এখন এখানেই রয়ে যাব। তা ছাড়া এদেশে আমি যাবই বা কোথায়? হাওয়ায় তো মিলিয়ে যেতে পারিনে।

বুকের ঢিপঢিপটা বন্ধ হবার জন্য একটু অপেক্ষা ক'রে তার পর ও দরজা খোলে। সোজা রান্নাঘরে পৌঁছেচে যে সরু হলটা তার ভিতরে ঢোকার আগেই দরজার একটা ফাটল দিয়ে ভাজা বেকনের গন্ধ বেরিয়ে ওকে ঘিরে ধরে। মেরৎস্ পরিবার তখনও রাত্রের খানা খাচ্ছিল। খেদিয়ে দেওয়া ঝি'র জায়গায় বহাল হয়েছে এক শীর্ণ, বয়স্ক ঝি, সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে আসে এবং তার পিছনে পিছনে বেরোয় তরুণ মেরৎস্। তার মুখে দাড়ি নেই, চোখে রূঢ় দৃষ্টি। তার রূঢ় দৃষ্টির কারণ হিসাবে সেই প্রেমের কাহিনীর কথাটাই ভাবল জোহান, কাহিনীটা সে আগেই শুনেছিল। কিন্তু তরুণ মেরৎস্ সে-কথা অনেক দিন আগেই ভুলে গেছে। তার এই বিরক্ত-ভাবের কারণ হ'ল বৃষ্টি। মাথা নেড়ে সে বাবাকে ডাকল।

বুড়ো লোকটার ঘন দাড়ি রুটির গুঁড়োয় ভর্তি। "ও, বাস্টিয়ানের ছোকরা তুমি—" সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল সে। গভীর আশঙ্কা নিয়ে ঘরে ঢুকল জোহান। বসবার ঘরটা জিনিষপত্রে ঠাসা এবং অব্যবহৃত। নিজের ডেস্ক খুলতে মেরৎস্-এর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কৃত্রিম ফুলভরা দুটো ফুলদানির মাঝখানে জোহান তার কাগজপত্র রাখল। বুড়ো মেরৎস্ একটা ড্রয়ার থেকে কালি এবং কলম, রেজিস্ট্রি ফর্ম ও টিকিট বের করল। জোহান যখন ফর্মটা পুরণ করছিল মেরৎস্ তখন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। কিছুই তার নজর এড়াল না, এমন কি তার পোষাকের তালিগুলো পর্যন্ত নয়। সে বলল: "তুমি আন্দ্রিয়াজ বাস্টিয়ানের আত্মীয় হও, তাই না?"

জোহান জবাব দেয়: "ওঁদের সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম আমি।"

বুড়ো মেরৎস্ মনে মনে ভাবে বুড়ো বাস্টিয়ান বোবার ভান করে কিন্তু আসলে সে যারপরনেই চালাক। মাইনে না দিয়ে সাহায্য জোগাড় করে।

বাইরে সে বলে: "বেশ, ঠিক আছে।" কাগজখানা দূরে ধরে পড়তে থাকে সে। দম বন্ধ ক'রে বুড়ো মেরৎসকে দেখতে থাকে জোহান। কিন্তু বুড়ো মানুষটা কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, কিছুই মিলিয়ে দেখে না, কাগজের উপর তার স্ট্যাম্প মেরে দেয়। তারপর জিনিষপত্র আবার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখে। উদ্গত স্বস্তির নিঃশ্বাসটা গিলে ফেলে জোহান। বুড়ো মেরৎস রান্নাঘরে ফিরে যায় বৌয়ের কাছে সমস্তটার বিবরণ দেবে বলে, জোহান বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। মাটি থেকে গরম বাষ্প উঠছে। দরজার সামনে কয়েকটি তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে, দু'টি বাইরের ছেলে, মেরৎসের ছেলে আর তার বোন, একটি বড়সড়ো গড়নের মেয়ে—তার চোখ দু'টি কালো, আর একটি ছোট মোটাসোটা মেয়ে। ছোট মেয়েটা ডিঙি পেড়ে দাঁড়িয়ে বড় মেয়েটার গলায় একটা রুমাল বেঁধে দেবার চেষ্টা করছিল। সবাই মিলে ওরা হাসছিল আর ওর দিকে চাইছিল। মেয়েদের হাসি অনেকক্ষণ ধরে গড়িয়ে চলে-ছিল। জোহান রাস্তা দিয়ে নেবে গেল, মিশিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে এবং ক্ষীয়মান কুয়াশার মধ্যে। এ যেন আরও খারাপ হ'ল। আমার ইচ্ছে হবে আবার হাসতে, ইচ্ছে হবে একটি মেয়েকে পেতে, নৌকাবিহারে যেতে, নদীর মধ্যে শরবনে ছপছপ করতে। আমার ইচ্ছে হবে সমস্ত বোঝাটা থেকে মুক্তি পেতে—যদি মুহূর্তের জন্য হয় তবুও। ওরা যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হবে এক মামুলী সন্ধ্যায় যার শেষে অপেক্ষা করছে সত্যিকারের সুষুপ্তিময়ী রাত্রি এবং নরম শয্যা। যা হোক, সে কথা ছেড়ে দাও, ছাড় এখন জোহান, ও থেকে বেরিয়ে এস। যথেষ্ট বিলাপ হয়েছে। তুমিও এখানে আপন জন খুঁজে পাবে অন্যদের মতই, খুঁজতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ লঘু হয়ে যায় তার মনটা। আবার নতুন করে সুরু করবে সে। যে ছোট্ট মেয়েটা মোজা কাচছিল আবার বেড়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার চুলগুলো লণ্ডভণ্ড করে দেয় জোহান। মেয়েটি চমকে ওঠে, বিচলিত হয়, জোহান তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হয়ে যায়।

বাস্টিয়ান দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে, সন্ধানী চোখে চেয়ে ছিল আকাশের দিকে। ওর ছোট্ট বুড়ো মুখখানাতে প্রস্ফুট আশার আভা।

॥ ৩ ॥

কেবল এক সপ্তাহ পরের কথা। কালা বুড়ো মুলৎস-এর জামাই, খামারের মালিক জেকব গুহেথ্‌লিন রাতের খানা খেতে বসেছে, টেবিলের অপর পারে তার বৌ সুসান। তাদের সামনে দুটো পাত্র, একটায় আলু আর একটায় টক

দুধ। শুহেথ্‌লিন অবিরাম গালির স্রোত বইয়ে দিচ্ছে, কারণ দুধটা থেকে মাখন তোলা হয় নি এবং আলু ভাল করে সিদ্ধ হয় নি। স্ত্রী কোনও জবাব দিচ্ছে না। তার প্লেটে তিনটি আলু, তার লম্বা হাতখানা অনড় হয়ে প'ড়ে আছে প্লেটের পাশে, যেন পেরেক দিয়ে টেবিলে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের দিকে আর এগোতে সে পারছে না, কারণ পেটের ভিতরকার বাচ্চাটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। তিনটি ছোট ছোট ছেলে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট মুঠো দিয়ে আলু চটকাচ্ছে। আলোর তলায় মাছি আটকানোর কাগজখানা মাছিতে কালো হয়ে গেছে, মাছিগুলো উড়ে উড়ে বসছে ছেলেগুলোর চটচটে গালে, টেবিলের উপরকার পাত্রগুলোয়, তাকের উপরকার দুধের পাত্রে এবং স্ত্রীলোকটির স্থির বিবর্ণ হাত দু'টিতে।

"খাও", ঝাঁঝিয়ে ওঠে লোকটা।

ও তাড়াতাড়ি খাওয়া সুরু করে এবং গিলতে থাকে। সাত বছর পরেও লোকটা বুঝল না যে, ও যে রকম সেই রকমই থাকবে।

শুহেথ্‌লিন গ্রামের মধ্যে সবার আগে ফসল কাটা সুরু করেছে—কাল রাত তিনটে থেকে। তার সব সময়ে ভয় হ'ত যে মজুর না নিয়ে বুঝি সে পেরে উঠবে না কারণ পরিস্থিতি যা তাতে শুধু নিজের শক্তির উপরই তার নির্ভর করতে হ'ত, যদিও সে শক্তি ছিল নিঃসন্দেহে অসাধারণ। সে পনর ঘণ্টা ধরে একটানা কাজ করে গেছে, মাঝখানে বস্তুতঃ কোনও ছেদ না ফেলে। ভিজে চপচপে হয়ে গেছে, শুধু তার বুকের স্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুততর হয় নি। আগামী কাল গির্জের পরও চালিয়ে যেতে সে কৃতসঙ্কল্প। সে জানত যে লোকে তা পছন্দ করবে না, এবং পাদ্রীও কৈফিয়ৎ চাইবেন। কিন্তু এমনিতেও সকলেই তাকে অপছন্দ করে এবং পাদ্রীর কাছে কৈফিয়ৎ হিসাবে সে বৌ-এর পোয়াতি অবস্থার কথাটা ব্যবহার করবে···সে চায় না ফসল কাটার সময় বৌ আঁতুড়ে থাকুক···যদিও আঁতুড়ে যাবার হয়ত কয়েক সপ্তাহ দেরি রয়েছে।

"জল তুলেছ?" বৌকে জিজ্ঞাসা করে শুহেথ্‌লিন। ভয়ে জোর একটা ঢোক গেলে বৌ। তারপর আশ্চর্য তাড়াতাড়ি দৌড় দেয়। লোকটা নিজে নিজেই খেয়ে চলে, বেশ পেট ভ'রে, মোটেও না থেমে। কিছুক্ষণ পরে মেঝেতে বালতি নাবানোর শব্দ শোনা যায় বাইরে থেকে। মেয়েটা ভিতরে এসে বসে পড়ে। চোয়ালটা তার ঝুলে পড়েছে। আবার স্বামী চেঁচিয়ে ওঠে: "খাও"।

ভয় পেয়ে নিজের হাঁএর মধ্যে একটা আলু গুঁজে দেয় মেয়েটা। স্বামী জিজ্ঞাসা করে: "চার বালতি তুলেছ?" তাড়াতাড়ি আবার উঠে পড়ে দৌড় দেয় মেয়েটা। আগের মতই পর পর বিভিন্ন আওয়াজ আসে: পায়ের শব্দ, দরজা খোলা, বালতি নাবান। মেয়েটা নিজের জায়গায় ফিরে আসে, এবার সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে শক্ত করে। লোকটার এখন খেয়াল হয় সার্টটা বদলাতে হবে, ঘামে ভিজে শক্ত হয়ে গিয়েছে গায়েরটা, "আমার একটা পরিষ্কার সার্ট দরকার" খিঁচিয়ে ওঠে সে। এবার মেয়েটা এমন ভয় পায় যে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। "সাফ করে রাখ নি?" চিল্লিয়ে ওঠে লোকটা। টেবিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বৌয়ের কণ্ঠায় বুড়ো আঙুলটা ঠেসে তাকে ঝাঁকি দিতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সে মেয়েটাকে ছেড়ে দেয়। তারা দু'জনেই হাঁপাতে থাকে। চাষীটা ভাবতে থাকে: ওর যে রকম ভাবগতিক তাতে কাল ওকে আমার সঙ্গে রাই কাটতে নিয়ে যেতেই হবে। যেতেই হবে ওকে। বাকি ঘন দুধটা সে নিজের প্লেটে ঢেলে নেয়। এখন সে বুঝতে পারে যে সে বৌয়ের মৃত্যুকামনা করছে। আর সে মৃত্যু যে কোনও দিন, যে কোনও সময়ে হ'লে চলবে না, সে চায় কালই হোক—ফসল কাটার সময়েই। গেলবার প্রসবের সময়েই অতিরিক্ত স্রাবে প্রায় মর-মর হয়েছিল সে। প্রসবব্যথা অনেক সময়ে ক্ষেতের মধ্যেই হয়—কাজের চাপের ফলে। তখনও ধাত্রীও বহুদূরে থাকবে।

নিজের চিন্তার গতি দেখে সে নিজেই ভয় পায়। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধ আচ্ছন্ন করে তাকে। সে তার ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে থাকে—পথের মধ্যে গর্তে হোঁচট খেলে যেমন লোকে গর্তটাকে গাল দেয়। কেন সে এমন দারিদ্র্যের গহ্বরে জন্মাল যাতে একমাত্র বিয়েই তাকে উদ্ধার করতে পারে? একবার এটা চুকে গেলে সে তার দেনাগুলো শোধ করতে পারবে, ছেলেগুলোকে ঠিকমত পোশাক পরাতে পারবে, তাদের স্কুলে পাঠাতে পারবে এবং সত্যিকারের একটি স্ত্রী ঘরে আনতে পারবে। তাকে এত খাটতে হবে না, ওর জন্যে সন্তানের জন্মও দিতে হবে না। তার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তারী খরচা সে শহরে জমিয়ে রাখবে নগদ টাকায়। ছেলে তার যথেষ্ট হয়েছে, তবে বৌ হয়ত শুধু একটা মেয়ে চাইবে। মেয়েটাকে সে কেমন সাজিয়ে রাখবে, দেখিয়ে বেড়াবে চারদিকে। সে মেয়েকে এমন লোককে বিয়ে করতে হবে না যার গায়ে ঘামের গন্ধ, যে তাকে জন্তুর মত গণ্য করবে, অবিরত খেঁচাবে। তার জন্য সে অন্য ধরনের স্বামী পছন্দ করবে।

এখনও অবিবাহিত এক নারীর এই অজাত কন্যাটি এ জগতে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করবে।

প্লেটটা মুখে তুলে চুমুক দেয় গুহেথ্‌লিন। কিন্তু কিছুরই স্বাদ পায় না সে, অনুভব করে না আরামদায়ক শীতলতাকে। প্লেটের কোণ দিয়ে সে মেয়েটার দিকে তাকায়। হঠাৎ সে বুঝতে পারে ওর সঙ্গে বাস করার দিন তার সত্যিই শেষ হয়ে আসছে। মুখখানা তার অনড় অচল হ'লেও কখনই সত্যিকারের শান্তি ছিল না তাতে। এবার ওই চওড়া মুখে অবধারিত ভাবে মৃত্যুর ছাপ পড়েছে। এবার তার চোখ জোড়া ঘিরে কালো চাকা দেখা দিয়েছে, মুখের উপর এক অদৃশ্য ছায়া পড়েছে, সে ছায়া সমস্ত ঘরের মধ্যে কেবল ওরই মুখে। সাত বছর ধরে ও চোখে কোনও দিন দীপ্তি ছিল না। কোনও দিন সে চোখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে চায় নি ওর দিকে। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরে—গুহেথ্‌লিনের মনে হয় সাত মাস পার হবার পর থেকেই—কখনও কখনও ওর চোখে একটা মন্থর তীক্ষ্ণ আভা ভেসে উঠছে। মনে হয় এর থেকে যেন ওর একটা অনভ্যস্ত আত্মবিশ্বাস আসছে, কখন কখন ও সরাসরি চোখ তুলে একটা কঠিন দৃষ্টিনিবদ্ধ করছে সে গুহেথ্‌লিনের দিকে।

মেয়েটার সামনে টেবিলে এখনও দুটো আলু পড়ে রয়েছে, ছোঁওয়া হয় নি।

"খেয়ে নাও", ঝাঁঝিয়ে ওঠে লোকটা।

মেয়েটা মাথা উঁচু ক'রে ওর কপালের দিকে তাকায়। একটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি আন্দোলিত করে তার অনড় মুখখানাকে, যেন বলে : কেন আমি খাব ?

লোকটা জিজ্ঞাসা করে, "হয়েছে—তা হ'লে সাফ করে ফেল।"

॥ ৪ ॥

"এখনও ও আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এতে কি বলতে চাও তুমি ?" কুঙ্কেলের মা রান্নাঘরের জানলায় মুখ রাখে। এখান থেকে সে গরমিঘরের লাগোয়া ছোট্ট চালাটাকে দেখতে পায়।

"তুমি ঠাণ্ডা হও দেখি, ও ঠিক সময়মত উঠে পড়বে।"

"মোমের জন্যে পয়সা কি আমরা দিই, না ও দেয় ?"

"তুমি থাম দেখি, ও গুছিয়ে চলার লোক।"

দরজায় দাঁড়িয়ে গটলিয়েব কুঙ্কেল মা এবং ভাই-এর মধ্যে কথা কাটাকাটিটা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে শোনে। তার ঈষৎ কাঁপা মুখখানাতে একটা উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

"কে এর জন্যে পয়সা দেয় আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি।"

"চুপ !"

এবার সে চেঁচিয়ে ওঠে। কঠোর স্বর শুনে সিঁটিয়ে যায় মা। এ স্বর তার মৃত স্বামীর। তার দীর্ঘকায় ছেলের দিকে চোখ তুলে চায় সে। ছেলের জন্যে সে সত্যিকারের গর্ববোধ করে। ক্রিস্টিয়ান এবার ভাই-এর দিকে ফেরে : "যাও, শুয়ে পড়গে জলদি। শীগগিরই উঠে পড়তে হবে আবার।" হাঁক দেয় ছেলেটাকে। তার পর সে চালাটায় যায়। খড়ের গোছা, মাটির টুকরো, বাসনপত্র এবং বস্তার মাঝে একটা খড়ের গদিতে শুয়ে বই পড়ছিল একটা ছেলে। পরনে তার খাটো ইজের, বুকখানা পালিশ, রোদে পুড়ে গাঢ় তামাটে। তার পাশেই মাটিতে একটা মোমবাতি জ্বলছে। উপরে পরার ঢিলে পোশাক এবং হাতাটা সযত্নে ইস্ত্রী করা একটা বায়ুরোধী কোট পাশাপাশি ঝুলছে দেয়ালের গায়ে। তলায় সাজানো রয়েছে এক জোড়া খড়ের চটি এবং এক জোড়া বুট। ছেলেটা বইখানাকে পাশে রেখে দেয়। তার প্রশান্ত মুখের অভিব্যক্তিটি সরল এবং খোলামেলা।

ছেলেটির দিকে চেয়ে কুঙ্কেল চোখটা কুঁচকোয় : "এখানে ত জায়গা নেই বিশেষ, কমরেড।"

ছেলেটি জবাব দেয় : "ঘুমোবার জন্য তাতে কিছু আসে যায় না।"

বিল্লিঙ্গেনে কুঙ্কেলের কোয়েস্‌লিনের সঙ্গে ভাব হয়। সে যখন জানল যে কোয়েসলিন বাগানের কাজ জানে কিন্তু বেকার তখন সে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওবারভাইলারবাখে আসতে প্রবৃত্ত করেছিল। সাময়িক-ভাবে, তখন কুঙ্কেল ক্ষেতে কাজ করবে তখন খাওয়া-থাকার বিনিময়ে কোয়েস্‌লিন তাকে ফসল কাটায় সাহায্য করবে। ক্রিষ্টিয়ান অবশ্য তাকে বাড়ীর ভিতর স্থান দেওয়ার বিষয়ে মনস্থির করতে পারেনি। বোনটার হাঁদামার্কা বকবকানি, মায়ের ধারাল জিভ, গটলিয়েবের সদাসতর্ক দৃষ্টি—তা ছাড়া এমনিতেও বিদেশী লোক বাড়ীর মধ্যে না নেওয়াই ভাল।

কুঙ্কেল বইখানা তুলে নেয়, পাতাগুলো উল্টোয় তারপর কোয়েস্‌লিনের পাশে খড়ের গদিতে বসে। মাথার মাথা ঠেকিয়ে তারা ছবিগুলো দেখতে থাকে : পতাকা উৎসর্গ, পতাকার সমুদ্রের মধ্যে শেষকৃত্য, বিভিন্ন লোকের মুখ। কুঙ্কেল বলে : "আমাদের মত লোকের এ সবের জন্যে সময় নেই।" কোয়েস্‌লিন জবাব দেয় : "আমার কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে সময়ে সময়ে এক-

আধখানা বই পড়া। তা নইলে সারা বছর ধরে কিই বা করার আছে?"

"তা এখানে তোমার সময় চটপট কেটে যাবে।"

"তাতেও ঠিক আছে। আমার মত লোকেরা কিছু ভুলে যায় না। এত বছর ধরে আমি ভাবতাম: আবার যদি আমি কয়েকটা বীজ হাতে পেতাম, আবার যদি শুধু একবার বেঁকা কাঁচির দাগ আমার বুড়ো আঙুলে বসত!"

কুঙ্কেল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। সে হাসে।" বলে: "বেশ, কাল সন্ধ্যায় তুমি তোমার বুড়ো আঙুলের দাগ ফিরে পাবে।"

কোয়েস্‌লিন বলে: "হাঁ, সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে।"

"এতে কতদিন হ'ল আছ তুমি?"

"এই আমার দ্বিতীয় বছর, আর তুমি?"

"এই সবে এসেছি।"

"এখনও একা? তোমার ভাই আর তুমি?"

"আরে আমার ভাই গট্‌লিয়েব ত এখনও দুধের ছেলে। শোন কোয়েস্‌লিন, আমাকে একটু সাহায্য কর না! আমি ব'লে এসেছি বিশজন নিয়ে আসব, আমার ত গা শিউরে উঠছে। আর সতের জন কোথায়? তুমি, আমি আর গট্‌লিয়েব।"

"সকলের কথাই আমাদের একে একে ভেবে দেখতে হবে। প্রত্যেকের সঙ্গেই চেষ্টা করতে হবে।"

"কয়েকজন আছে যাদের ইচ্ছে আছে, কিন্তু তারা সাহস করছে না। বুড়োরা কড়কে দেবে তাদের। ওই ও পাউল আলগাইয়ার। সব সময়ে আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। ও বলে ওর বাবা বলেছে যেখানে কয়েক নীদি পড়েছে সেখানে আর একটা কুকুর নিশ্চয়ই বসতে আসবে এবং টিপি বাড়াবে, কিন্তু আমাদের মত লোকের তাতে কোনও লাভ নেই।"

"তাকে ব'লো আগে ঢাললে তবেই লাভ আসে। আর তা ছাড়া সে যদি নিজে যোগ দেয় আখেরে লাভই হবে।"

"ছোট মেরৎস্‌ও আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তার বাবা বলছে কোনও মতে নয়। যদিও তোমরা তাদের এস-ও-সি এই তিন অক্ষরের বর্ম পরিয়েছ, যদিও ঝকঝকে পোশাক-আশাকে তাদের সাজিয়েছ, তবু তাদের সঙ্গে এক পোশাকে ছেলেকে কোনও মতেই দেব না, সারা পৃথিবীর বিনিময়েও নয়।"

"জিজ্ঞাসা কর রুশ কায়দা তার বেশী পছন্দ হবে কি না: অন্যের লাঙল টেনে সারা হবে তার নিজের ঘোড়া! এখন আমরা যা ভাবছি তা হ'ল একটা সভা করার কথা, যেখানেই একটা মূল জমায়েতের জায়গা সেই রকম সমস্ত গ্রামগুলোতে ঘোরার কথা। তোমাকেও বলতে হবে। রবিবারেও ত তুমি মুখ খুলেছিলে, তাই নয়?"

"কিন্তু আপনজনদের মধ্যে কথা বলতে কি রকম বোকা বোকা লাগে যেন।"

এতখানি স্বীকার ক'রে ফেলার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে অনুতাপ করে কুঙ্কেল। ফসল কাটার সময়টাতে কোনও নিষ্ফল ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে ভয় পায়। সে ভাবতে থাকে বুড়ো মেরৎসএর দাড়ির উপর তার অনড় মুখখানার কথা, শুয়েথ্‌লিনের লোমওয়ালা বিরাট নাকের ফুটোটার কথা আর শ্লেষভরা বুড়ো আলগাইয়ার-এর কথা। এ কথা ভেবেই ও অস্বস্তি বোধ করে যে এই সভা তার পক্ষে অন্ততঃ কোনও কাজেই না আসতে পারে।

কোয়েস্‌লিন বলে: "ওবারভাইলারবাখ জার্মানীতে ত বটেই, না কি?"

কুঙ্কেল অবাক হয়ে বলে: "অবশ্যই, জার্মানীতে ত বটেই।"

"আর তোমাদের এখানে কারো ধার-দেনা নেই?"

"আলবাৎ আছে।"

"ট্যাক্স নেই তা হ'লে?"

"আলবাৎ আছে।"

"তা হ'লে ইহুদী নেই এখানে?"

"হাঁ, দু'জন বাইরে থেকে। নাফ্‌টেল আর তার জামাই।"

"আর তোমাদের এখানে লাল কেউ নেই?"

"না, তা আমাদের এখানে নেই। এখানে লাল নেই —আমি বলছি সত্যিকারের লাল আর কি—সহরের মত, বটৎসেনবাখের ওই ইবস্‌ট্-এর মত, ওরকম এখানে নেই।"

হঠাৎ কুঙ্কেলের মনে পড়ে যায় তার মা হয়ত এখনও রান্নাঘরের জানলায় নাক ঠেকিয়ে আছে। সে সাবধানে ওঠে যাতে চালে ধাক্কা না খায়। "এ বিষয়ে আবার

কমরেড—নাৎসী পার্টিতেও পরস্পরকে কমরেড ব'লে সম্বোধন করা হ'ত।

এস, ও, সি—নাৎসী দলের বেসামরিক ঝটিকা বাহিনীর নামের আদ্যক্ষর।

কাল আমাদের আলাপ করতে হবে। এখন এস ঘুমিয়ে পড়া যাক।"

কুঙ্কেল বাড়ীর ভিতরে চলে যায়। সে যা ভেবেছিল, তার মা এখনও জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাকে ডেকে সে বলে: "তুমি হিসেব করে দেখ না কেন? ওর মজুরিতে কত যেত আর মোমে কত যাচ্ছে।" আর ভাই-এর দিকে চেয়ে ও ঝাঁঝিয়ে ওঠে: "তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?"

গটিলিয়ের ভাই-এর দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে আস্তে আস্তে সরে যায়। কুঙ্কেল গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। শেষ পর্যন্ত চালাঘরের আলোটা নিভেছে। অন্ধকারে গা এলিয়ে দেয় কোয়েসলিন। চালাটার মধ্যে গরম। আগামী দিনটার জন্য সে আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করে, প্রতীক্ষা করে ক্ষেতে যাবার জন্য, দুশো আকাটা-টম্যাটো চারার জন্য। সব কিছু খতিয়ে দেখে সহর থেকে গ্রামে জায়গাবদল করার জন্য সে খুশীই হয়েছে। সত্যি কথা, সে এর থেকে কিছু হাতখরচও পাবে আশা করেছিল, কিন্তু কুঙ্কেল অন্ততঃ তাকে আবার বাগানে নাক গুঁজতে দিয়েছে। গেল কয়েক বছরের ক্রমবর্ধমান ভয়, জীবন যেন তার চারদিকে জীবন্ত সমাধি রচনা করবে সেই ভয় হঠাৎ যেন চলে গেছে। কোয়েস্‌লিন স্বয়ং শয়তানের সঙ্গেও চুক্তি করতে প্রস্তুত, যতক্ষণ শয়তানে তাকে নরকে গিয়ে কাঠ কাটতে দিতে রাজি আছে।

ক্রমশঃ
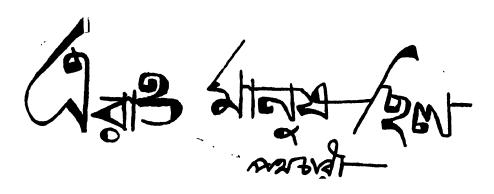
মানুষ কি হাসতে ভুলে গেল? সবারই মুখের দিকে চেয়ে দেখি, মুখখানাকে গুম্‌রো ক'রে ব'সে আছে! কারো মুখে হাসি নেই! আগে আগে দেখেছি, মুখে যেন হাসি লেগেই থাকৃত। হাসি মুখই মনে পড়ত, কারণ সেইটেই ছিল স্বাভাবিক মুখ। আজ আর হাসি-মুখ মনে করতেই পারিনে! হাসিমুখ দেখি চিত্রকরের ছবিতে, ভাস্করের খোদিত মুখে, কবির কল্পনায়।

কোথায় গেল সে হাসি? চণ্ডীমণ্ডপের তাশ-পাশার আড্ডা থেকে উঠত যে হাসি—বিরামবিহীন উচ্চহাস্য, অট্টহাস্য, যে-হাসি শেষ হ'ত আড্ডা-ভাঙার সঙ্গে!

আজ সে-হাসি মনে করতেই বুকটা চেপে ধরি। আজকের দিনে সে-হাসি ক'জন হাসতে পারে—বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে!

কিন্তু এরাই তো হেসেছে একদিন। ঠিক অমনি ক'রেই হেসেছে। গোলদীঘির বৈকালিক আসরে বুড়োরা এসে জমায়েৎ হয়েছে—তাদের সে কি প্রাণ-খোলা হাসি! হাসিরও যে প্রাণ আছে, আজকের মানুষকে দেখলে তা বোঝা যায়। আজকের মানুষ হাসে—সে হাসি ওজন-করা হাসি, ইঞ্চি-মাপা হাসি, কাষ্ঠ-হাসি, ভদ্রতার হাসি, না-হাসলে-নয় হাসি।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? মানুষের এই স্বাভাবিক আনন্দের বুকে এমন ক'রে আঘাত কে করল?

আজ দেখি, পথে-ঘাটে সবাই চলেছে মুখখানাকে ম্লান ক'রে। কি যেন হয়ে গিয়েছে, কি যেন হারিয়েছে—যেন 'ঝড়. হয়ে গেছে কাল রজনীতে রজনীগন্ধার বনে।'

মুখোমুখি দেখা হ'লে সে প্রাণের আকুতি নেই, সে সরলতা নেই, সে সহজ সম্ভাষণ পর্যন্ত নেই! —এমানুষ কারা? যাদের দেখেছি আমরা ছোট-বেলায়, যাদের কথা পড়ি গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, যারা আমাদেরই সমগোত্র,—তারা আজ কোথায় গেল? এরা কি তারা নয়, যাদের আমরা ফেলে এসেছি?

পথে মেয়েরা যায়, সেখানেও দেখেছি তাদের মুখে হাসি নেই। সেই গুম্‌রো মুখ, মুখে যেন বিষ ঝরছে। অথচ মেয়েরাই হাসত সবচাইতে বেশী! তাদেরই মুখের হাসি নিয়ে হাসির নামকরণ হয়েছে। 'মুচকি-হাসি,' 'ঠোঁট-বাঁকানো হাসি,' 'দন্ত-কৌমুদী হাসি,' 'দেখন-হাসি,' সলজ্জ-হাসি,' 'ঝলকানি-হাসি,' খিল্‌খিল-হাসি।' 'খিলখিল' ক'রে হাসি ওরাই হাসতে পারে। কিন্তু সব কি ভুলে গেল ওরা?

হাস্যমুখ বিধাতার আশীর্বাদ। সেই হাসিকে আমরা দেশছাড়া করেছি। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, পরিবেশ-অনুযায়ী মুখাবয়ব পরিবর্তিত হয়। আজকের পরিবেশ দুঃখের পরিবেশ। দেশে খাবার নেই, পয়সা নেই—পেটের জ্বালায় মানুষ দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, আনন্দ করবার তার আজ অবসর কই?

দুঃখ ভুলতে মানুষ আজ সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। রঙ বে-রঙের তামাসা দেখে মানুষ আজ হাসতে চেষ্টা করে। সে-হাসি তৈরি-করা হাসি, এক মিনিটের হাসি, ক্ষণিক উত্তেজনার হাসি।

বন্ধু রেগে উঠলেন, বললেন, কি হাসির কথা বল্‌ছ! জানো, হাসির জন্যে একজনকে ইংরেজের আদালতে জরিমানা দিতে হয়েছিল! লোকটি সাক্ষ্য দিতে হুজুরের সমীপে হাজির, কিন্তু হুজুরের কৃত্রিম চুল আর পোষাকের বাহার দেখে সাক্ষী হেসে ফেলে। সে কি হাসি, হা-হা··হি-হি- হো-হো, আদালতশুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। লোকটিকে যত জেরা করা হয় তত হাসি, হাসি আর থামে না। পাগল নয় নিশ্চয়ই,—হুজুর জরিমানা ক'রে তাকে আদালত থেকে বের ক'রে দিলেন।

সব ভুলে গেলাম, রাস্তার একটা পাগলের চীৎকারে। দেখি, লোকে-লোকারণ্য—

পাগল সবাইকে শাসাচ্ছে, চুপ, কেউ হাসবে না—হেসেছো কি সাঁটিয়ে দেব। ব'লে, তার হাতের বেত-খানা আস্ফালন ক'রে সে দেখিয়ে দিলে।

বন্ধু বললেন, ঐ পাগলটাই ঠিক। অমনি আমাদেরও অলক্ষ্যে বিধাতা-পুরুষ বেত নিয়ে ব'সে আছেন, আর শাসাচ্ছেন, খবরদার কেউ হাসবে না।

মড়ার মুখে হাসি দেখেছ? চিতায় শুইয়ে কান পেতে শুন, শুনতে পাবে।

শুধু হাসি নয়, ওরই মধ্যে—ঐ হাসির মধ্যেই আছে সকল অভিব্যক্তি। যেন পৃথিবীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ও চলে গেল!

* * *

আর একটা হাসি দেখেছিলাম সীতানাথের। অদ্ভুত হাসি—নির্বিকার হাসি। তবে গল্পটা বলি।

সংসার কি ক'রে চলছে সীতানাথ খোঁজও রাখে না। যেন চলাটাই স্বাভাবিক, না চলাটাই অন্যায়। চার মাস সীতানাথের চাকরি নেই, কিন্তু সে দেখছে, চাকরি থেকেও সংসার যেমন ভাবে চলেছিল—আজো ঠিক একই ভাবে চলছে। হাসি পায়, কিন্তু হাসতে পারে না—পাছে ওলট-পালট হয়ে যায়।

পাশের ঘর থেকে ছোট খোকাটা তারস্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে। সীতানাথের কেমন লাগে—যেন সুর কেটে যায়!

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে। স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে ওঠে—কেন চেঁচাচ্ছে জানো না? খেতে চাচ্ছে—

—তা খেতেই দাও না।

—লজ্জা করে না। চারমাস ব'সে ব'সে গিলছ—কি ক'রে অন্ন-ব্যঞ্জন জুটছে, কোনোদিন জানতে চেয়েছ?

সপাং ক'রে কে যেন সীতানাথকে চাবুক মারল! সীতানাথ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজপথ। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, দ্বি-চক্রযান আর চতুশ্চক্র-যানের ভিড়। শুধু শব্দ।

টাকা চাই। মনে মনেই সীতানাথ উচ্চারণ করে, টাকা চাই।

—জুতোটা সেলাই ক'রে নিন বাবু!

সীতানাথ নিজের জুতোর দিকে চাইল। চমকে উঠে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেল—টাকা চাই।

সামনে একটি তরুণী—ছিপ্‌ছিপে গড়ন—বাঃ, বেশ মেয়েটি! মেয়েটি একটি বাসের প্রতীক্ষা করছিল। বাস আসতেই উঠে পড়ল। সীতানাথের চমক ভাঙে। আবার পথ চলে—টাকা চাই, মুঠো মুঠো টাকা, যা সে চার মাস ধ'রে রোজগার করতে পারে নি।

—দয়া করুন বাবু, অন্ধ মানুষকে দয়া করুন।

—হ্যালো, রমেশ কোথায় চলেছ? সুমিত্রা বুঝি ঘাড় থেকে নামে নি এখনও?

রমেশ হাসল। সীতানাথও হাসল। বেশ জীবন—আনন্দের জীবন! বিচিত্র পৃথিবী—বিচিত্রতর ওদের জীবনযাত্রা। আলো-ছায়ার খেলা! কান্নার পাশে হাসি। সীতানাথ ভাবে। কিন্তু অমন ক'রে আমি হাসতে পারিনে কেন? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি?

একটি নগ্নশিশু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

সুকান্তর সঙ্গে দেখা হ'ল। সীতানাথের বড় ছেলে। তার মুখ-চোখ ক্লান্তিতে শুষ্ক-মলিন, দৃষ্টি উদাস, চলার ভঙ্গিতেও ক্লান্তি।

ভাবতে ভাবতে চলেছে সুকান্ত। ভারী অদ্ভুত লাগে সীতানাথের—অতটুকু ছেলে সে অত কি ভাবে?

হ্যাঁ, ভাববে বই কি। আমি ভাবছি—দুনিয়া ভাবছে। দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় ভাবতেই হবে। মাথা নীচু ক'রে, পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল গতিতে ব'সে ভাব—

আমিও ভাবতাম—ও-বয়সে আমিও ভাবতাম, তখন আমি যুবক, আমার সুদর্শন চেহারা—আকাশে তখন পাখীরা উড়তে উড়তে গান গাইত,

জনতার আবর্তে সীতানাথ আবার হারিয়ে যায়।

—এই যে যতীনবাবু, ভাল আছেন ত?

—চাল পাওয়া যাচ্ছে না, কি করি বলো ত?

—মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি হে!

—একটা বিড়ি খাওয়াও না মাইরি!

বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন আওয়াজ।

বাঃ, বেশ মেয়েটা ত! সীতানাথ দু'পা এগিয়ে যায়। কর্কশ কণ্ঠে পিছনে মোটরের হর্ন। সীতানাথ যতটা এগিয়ে ছিল, ততটা পিছিয়ে গেল। তখুনি মনে পড়ল, তার টাকা চাই। মুখ দিয়ে সেকথা বোধ হয় স্বল্প উচ্চারিতও হয়ে গেল। টাকা চাই, টাকা চাই—নেশার মতো কয়টি কথা সীতানাথকে পেয়ে বসলো। বারবার ক'রে সে উচ্চারণ করে, চীৎকার ক'রে উচ্চারণ করে।

পোদ্দারের দোকানে গিয়ে বলে, টাকা চাই—ব্যাঙ্কে গিয়ে বলে টাকা চাই। তারা ভয় পেয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেয়।

পুলিশের মার—ভীষণ মার! সীতানাথের উত্তপ্ত মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

জমাদার সাহেব চোখ পাকিয়ে বলে, কেয়া, টাকা মাংতা?

—নেহি জমাদার সাহেব !

—বোলো, আভি কেয়া মাংতা ?

—কিছু চাই না জমাদার সাহেব ! —হাঁ, হাঁ, চাই—মরতে চাই ।

—তব্‌ ইধার চলা যাও, গঙ্গা কিনারমে । ব'লে জমাদার সাহেব গঙ্গার পথ দেখিয়ে দিলে ।

সীতানাথ মুক্তি পেয়ে সেই পথ ধরল । হাসে আর বলে, এই ভাল, এই ভাল ।

লৌকিকতা

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভর দুপুর ।

দুলাল সেকরার দোকানের সম্মুখে একটা পর্দা-টাকা রিক্‌শা এসে দাঁড়াল । প্রথমে পর্দাটা একটু ফাঁক হ'ল । ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে মুখুজ্জে গিন্নী নামলেন । গায়ে একটা গরদের চাদর দু'ভাঁজ করে জড়ান । প্রচণ্ড গরমে রাস্তার পিচগুলো গলে গেছে । মুখুজ্জে গিন্নী নামবার সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌শাওয়ালা গাড়িটাকে থানার কাছে একটা বট-গাছের নীচে দাঁড় করাল । থানাতে একজন পুলিশ রাইফেল হাতে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে । ঘর্মাক্ত রিক্‌শা-ওয়ালা একটা গামছাকে পাখার ব্লেডের মত করে নিজের মুখের সামনে ঘোরাতে লাগল । একবার জ্বলন্ত আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল । বটগাছে ক'টা কাক হাঁ করে ধুঁকছে । বাড়ীগুলোর দরজা-জনলা সব বন্ধ । প্রাইভেট কারখানা থেকে শুধু লেদ মেসিনের একটানা সুর ভেসে আসছে । দু'একটা টেম্পো যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল । সামান্য সময়ের জন্য পাড়াটা জেগে উঠল, আবার যে কে সেই !

মুখুজ্জে গিন্নীকে দেখে, লাল খেরো-খাতাটা দূরে সরিয়ে রেখে দুলাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এল । বুঝিবা একটু বিচলিত হয়ে পড়ল ।

—একি মা, ছেলেকে ডেকে পাঠালেই পারতেন—এই দুপুরে কাক-পক্ষীও কাহিল হয়ে পড়ছে—মিছেমিছি কেন কষ্ট করে এলেন মা ।

—বলছি দুলাল, একটু দম নিতে দাও, বড় গরম পড়েছে ! মুখুজ্জে গিন্নী থানের আঁচলটা দিয়ে ঘামে-ভেজা মুখটা বার কয়েক মুছলেন । এই ফাঁকে দুলাল একটা নড়বড়ে চেয়ারকে নিজের গামছা দিয়ে ভাল করে মুছে মুখুজ্জে গিন্নীর দিকে এগিয়ে দিল । সম্পত্তির মধ্যে একটা নড়বড়ে আলমারি, দুটো টুল, সেকরার দোকানের টুকিটাকি জিনিষ । মুখে-চোখে একরাশ বিনয়ের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে, যথাসম্ভব সম্ভ্রম বজায় রেখে দুলাল কমলা দেবীকে 'আবার বলল —বসুন মা, আপনাকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে—দোহাই, ছেলেকে আর পাপের ভাগী করবেন না মা ।

—একটা জরুরী প্রয়োজনে তোমার কাছে ছুটে এসেছি দুলাল, কথা আর বাড়াব না, তোমার ত নাওয়া-খাওয়া হয় নি এখনও ।

—তা হোক, আমাদের আবার নাওয়া-খাওয়া ! চটপট বলুন মা, আর ছেলেকে ভাবাবেন না—দোহাই !

মুখুজ্জে গিন্নীর মুখের রেখা পড়ে নিয়ে আসলে দুলালের একটুও বুঝতে দেরি হয় নি । পাকা জহুরী, শুধু সোনাদানা নিয়েই নাড়াচাড়া করে না, সুদীর্ঘ পোড়-খাওয়া জীবনের

থামে অনেক অভিজ্ঞতার স্মৃতি ভরা আছে। মানুষের বিস্ময়কর গোপন কথা—চোখের জল—দীর্ঘশ্বাস—প্রাণ-বেরুনো হা-হুতাশ জানা হয়েছে—দেখা আছে তুলালের।

সব অভাবগ্রস্ত মানুষের গতিবিধি এক নয়। মধ্যবিত্তের মার-খাওয়া রূপটাই যা একটু ভিন্ন। ওরা মচকাবে তবু ভাঙবে না। হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হবে তবু মুখে একটা হাসির ছোঁয়া—একটা সরলতার বর্ম পরিয়ে রাখবে। এখানেই সময় সময় ভুল বোঝাবুঝি হয়। হাসিকে কান্না ভেবে আর কান্নাকে আনন্দাশ্রু ভেবে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই ধনীদের দুঃখ-বিলাস ধরা পড়ে—সর্বহারাদের রিক্ততা ঢেকে রাখা যায় না—কিন্তু আশ্চর্য এই মধ্যবিত্ত জাত! লজ্জা ঢেকে, নিজের মান মর্যাদা বাঁচিয়ে চলা—যে কথা হাটে-বাজারে জানাতে পারবে না এমন গোপন দুঃখের কথা! শুধু এক নিশাচর পেচক-বৃত্তির মত নিজেকে সরিয়ে রাখা।

দুলালের বুঝতে দেরী হ'ল না। মুখুজ্জে গিন্নী কি চাইছেন। একটা নিরিবিলি ঘর। যেখানে কেবলমাত্র দুলালের কাছেই নিজের গোপন কথা বলে নিজের ভার কিছুটা হাল্কা করতে চান। তাই তাকে বলতে হয়:

—আপনি ভাবনা না করে বলুন মা, কেউ আসবে না, শেষ সময়ে ক'টা মেথরাণী রূপোর গয়না নিয়ে এসেছিল—চলে গেছে।

কমলা দেবী কিছুটা সময় চুপ করে কি যেন ভেবে নিলেন, তার পর আলমারিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে এক রকম ফিস ফিস করে বলে উঠলেন—আমাকে বাঁচাও দুলাল, হাতে মাত্র একটা দিন সময় আছে, এদিকে মাসের শেষ, শেষ পুঁজিটুকু র‍্যাশন আনতে আজ ফুরিয়ে যাবে অথচ কিছু একটা না দিলেই নয়—বলতে বলতে আঁচলের খুঁট খুলে একটা আংটি বার করলেন মুখুজ্জে গিন্নী।

—আংটিটা না ভেঙ্গে শুধু একটা নাম বসাতে হবে দুলাল—বানীর টাকা মাসের গোড়াতেই দেব—কথার হেরফের হবে না—বামুনের মেয়ে দিন-দুপুরে কথা দিচ্ছি।

জিভটা কেটে দুলাল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—মা, লজ্জা দেবেন না, আপনাদেরই খাচ্ছি মা, মুখুজ্জে মশায় কত করেছেন—কি নাম হবে মা আংটিতে?

—'উৎপল', কালই চাই কিন্তু, কত বানী লাগবে বললে না ত?

ঠুং ঠুং করে রিকৃশাওয়ালার তাগিদের ঘণ্টি শোনা গেল। সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে ধ্যান ভাঙ্গার মত দুলাল বলে উঠল:

—আট টাকাই দেবেন মা, মাগ্যিগণ্ডার বাজার—একটা কথা বলব মা, যদি অবশ্য কিছু মনে না করেন তবেই বলি।

আবার ঠুং ঠুং শব্দ।

—বল দুলাল, মা'র কাছে লজ্জা কি!

—দু'মাসেই টাকাটা দেবেন, কর্তাবাবুর আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল এ সময় কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এলেন কমলা দেবী।

—একটা কথা ছিল দুলাল, দেখ বাবা কথাটা কেউ যেন না জানতে পারে অবশ্য তোমাকে বিশ্বাস করি, তবু—

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মা।

গাড়িতে উঠলেন। রিকৃশার ঠুং ঠুং আওয়াজ ক্রমে মিলিয়ে গেল। দুলালের চোখ দুটো কড়কড় করে উঠল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহিনীকে তার দোকানে ছুটে আসতে হল: ঘামে ভেজা, রোদে পোড়া মুখুজ্জে গিন্নীর পরিশ্রান্ত মুখটার কথা ভেবে দুলালের বুকটা হু হু করে উঠল। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তবু লৌকিকতা বজায় রাখতে হবে! তার দোকানে এমন ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক না ঘটলেও প্রায়ই ঘটে থাকে

দুলালের দোকানে কিইবা আছে। কয়েকটা রেডিমেড ঝুমঝুমি—পায়ের মল, মেয়েদের খোঁপার প্রজাপতি, সিঁদুরের কৌটো, তাও সোনার নয়, রূপোর। চিন্তার ভীমরুলগুলোর অসহ্য দংশনে দুলাল আজ পর্যুদস্ত। স্বর্ণকারদের দুরবস্থার একশেষ! প্রথম ধাক্কায় দুলাল দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সেইদিনকার কথা। যখন সোনার বেচাকেনা বন্ধ হয়ে গেল। তাদের রুজি-রোজগারে ঘা পড়ল।

প্রথম ধাক্কায় সব মানুষই বেসামাল হয়ে পড়ে বুঝি-বা। অভ্যস্ত জীবনের একটানা একটা ছন্দবদ্ধ সুর থাকে।

মানুষ মাকড়সার জালের মত নিজের গণ্ডির মধ্যে তৃপ্ত-পরিতৃপ্ত হয়ে মত্ত থাকে। কালবৈশাখীর রুদ্র রূপের তাণ্ডব-লীলার মত এক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়! যারা দুর্বল, রূঢ় বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় না—তারা আত্মহত্যা করে। নিজেকে শেষ করে বাকী সবাইকে পথে বসিয়ে যায়। দুলাল সে দলের নয়। না, দুলাল সে পথ ধরে নি। ছোট ভাইকে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছে—বৌমা দিয়েছে গলায় দড়ি। সে একটা সময় এল। পট পট করে মানুষগুলো মরতে লাগল। সাপুড়েকে যেমন বিষাক্ত সাপ আহ্বান করে তেমনি 'বোতল-ভরা অ্যাসিডও দুলালকে হাতছানি দিয়েছিল। পারে নি। অসম্ভব মনের জোরে মন্দিরতলার মাঠে মাইকের সম্মুখে দাড়িয়ে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছিল—অস্পষ্ট অন্ধকারে চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল—তবু সবাইকে শুনিয়েছিল অভয় বাণী। বাঁচতে হবে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মাথার দুষ্ট কীটগুলো যতই বিপথে চালনা করুক—কেউ যেন সে ফাঁদে ধরা না দেয়।

আবার সেই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

দিন পনের পরের এক সন্ধ্যা। লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে চাটুজ্জে মশায় দুলালের দোকানে এসে দাঁড়ালেন। খদ্দেরের ভিড় ফাঁকা হ'তে দুলালের নজর গেল বৃদ্ধের দিকে। হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। কোঁচার খুঁট দিয়ে টুলটা মুছে বসতে দিল, সসম্ভ্রমে হাত দু'টি জোড় করে দাড়িয়ে রইল দুলাল। চাটুজ্জে মশায় ব্যাগ খুলে একটা আংটি বার করলেন। দুলালের হাতে দিলেন।

আংটিটা দেখেই দুলালের বুকটা একটা ব্যথায় টন টন করে উঠল। কপালে চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—কি দেখছ দুলাল, এটার ওপর নতুন একটা নাম খোদাই করে দিতে হবে বাবা, জরুরী প্রয়োজন। নাতিটা ক'দিন আগে পৈতে উপলক্ষে মুখুজ্জে বাড়ী থেকে পেয়েছিল!

—কি নাম হবে বাবাঠাকুর? আট টাকা বানী লাগবে কিন্তু, কবে নাগাদ চাই? দুলাল আজকাল অগ্রিম প্রশ্ন-গুলোর কিছুটা আভাস দিয়ে রাখতে চায় বুঝি।

—হ্যাঁ বাবা নামটা 'শতদল' হবে, একটু তাড়াতাড়ি দিও, মুখুজ্জে বাড়ীতে কাজ। মুখুজ্জে গিন্নী নিজেই নিমন্ত্রণ করে গেল।

—পরশু আসবেন বাবাঠাকুর, কিছু দেবেন কি আজ? বড় টানাটানি যাচ্ছে ক'দিন।

—দুটো টাকা নাও এখন, বাকীটা মাসের শেষে দেব। অসুবিধা হবে না ত দুলাল?

—না বাবাঠাকুর,

—আচ্ছা চলি তাহলে দুলাল

কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এলেন চাটুজ্জে মশায়—

—দুলাল, একটা কথা ছিল।

—বলুন, কেউ জানবে না ব্যাপারটা এই ত! মাথা নীচু করে বলল দুলাল।

—হ্যাঁ দুলাল, মনের কথাটা টেনে বলেছ, আচ্ছা আসি তা হ'লে।

থমথমে একটা মুখ নিয়ে চাটুজ্জে মশায় চলে গেলেন।

দুলাল অপসৃয়মান বৃদ্ধের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইল।

মুখুজ্জে গিন্নীর বানীর টাকাটা হাতে আসবার আগেই, আংটির চেহারাটা বদল হয়ে গেল! এই যা!
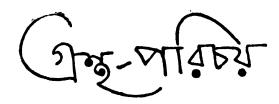
পঙ্কপল্বল—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত। ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা-১২। প্রথম প্রকাশন বৈশাখ ১৩৭১। ২৯২ পৃঃ। মূল্য আট টাকা।

বিভূতিবাবুর যে-প্রকার গল্প-উপন্যাসের সহিত আমরা পরিচিত—আলোচ্য গ্রন্থখানি ঠিক সেই পর্যায়ের নহে। এই রচনার আরম্ভ শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তু শিবিরে, একটা উদ্বাস্তু বালক, একটি বালিকা এবং একটি ভাগাহতা তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া। বিনে (বিনোদ), বিধু (বিধুমুখী)—এবং বেলা—এই বালক, বালিকা এবং তরুণী বিধবা বধূর সর্ব্বহারা উদ্বাস্তু জীবনের চরম দুঃখ-জর্জ্জরিত জীবন কথা লইয়াই 'পঙ্ক ও পল্বলে'র বিচিত্র কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র ঘটনাবহুল এই কাহিনী পাঠকের চিত্তকে বিচলিত, বিভ্রান্ত করে, এক এক সময় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু-জীবনের চিত্র মনের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তোলে। 'পঙ্কপল্বলকে' ঠিক উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না সন্দেহের বিষয়। বিভূতিবাবুর রচনার কৌশলে বাস্তব এবং কল্পনা বিচিত্ররূপে মিশ্রিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব বিষয়বস্তু বিচিত্র রস-রূপে প্রায় বাস্তব হইয়া প্রকট হইয়াছে। যাঁহারা শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তু সমাবেশ এবং তাহাদের অ-মানুষ প্রায় জান্তব জীবন-ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা আলোচ্য পুস্তকে নূতন করিয়া আবার সেই ভীষণ দৃশ্য মানস-চক্ষে দেখিতে পাইবেন। বিভূতিবাবু বলিতেছেন :

'ভিড়, হট্টগোল, আবর্জ্জনা ; তার পর যেদিকেই চাওয়া যায়, দারিদ্র্য থেকে নিয়ে একটা জাতির জীবনে অধঃপতনের যতগুলি বিকার ঘটতে পারে সবগুলি যেন ফেনিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ কেটে উঠছে। তার উপর নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ।…একটা আশা…অন্তরের উত্তাপ দিয়ে পুষ্ট করেন শ্যামাচরণ। দূর অতীতের কথা টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেন।…হবেই ; এই মহাপঙ্কের নীচে পড়ে আছে মহাপুরুষদের বাণী, কর্ম্ম, তপস্যার বীজ—রবীন্দ্র-সুরেন্দ্র-অরবিন্দ-বিবেকানন্দ আরও সবার, এ পঙ্কপল্বল ভেদ করে কমলের দল একদিন উঠবেই ফুটে।"

যে তিনটি ভাগ্যতাড়িত এবং নিপীড়িত উদ্বাস্তু মানুষকে লইয়া কাহিনীর আরম্ভ, শেষে সেই তিনটি মানুষকে সমস্ত পঙ্কমলিনতা মুক্ত হইয়া জীবনের সহজ এবং স্বাভাবিক যাত্রা পথে চলিতে দেখিয়া পাঠকের মনে উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়ত নূতন আশার সঞ্চার হইবে। কিন্তু পুস্তকে বর্ণিত উদ্বাস্তুহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত—শ্যামাচরণ এবং মুরারির মত মানুষ এ পোড়া বাঙ্গলা দেশে চোখে পড়ে কই? বেশির ভাগ বাঙ্গালী—(পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের) ত দেখি উদ্বাস্তুদের জঞ্জাল বলিয়াই মনে করেন। কিসের কারণে, কত দুঃখে এবং সর্ব্বভাবে নিপীড়িত ও বঞ্চিত হইয়াই যে নিজেদের বহুপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে মাথা গুঁজিবার, একটু শান্তিতে মরিবার স্থানের জন্য আসিয়াছে। তাহা কে ভাবিয়া দেখে—ভাবিবার প্রয়োজন অনুভব করে? বিভূতিবাবু যে দৃষ্টিআবেগ লইয়া 'পঙ্কপল্বল' রচনা করিয়াছেন—তাহার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা অবশ্যই জানান দরকার।

সত্যসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শতবর্ষপূর্ত্তি সংখ্যা, শ্রীরবি দত্ত এম. এ. ২১।১, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য এক টাকা। স্বল্প পরিসরে রামানন্দ-চরিত্রের সকল দিক লইয়া এই গ্রন্থে যেভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের সংযোজন-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লেখক তাঁহার বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন দিক দেখাইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দেশ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই দেশ-প্রেমই উত্তরকালে তাঁহাকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তিনি সত্য আর স্বাধীনতা এই দুইটি আদর্শের জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। রামানন্দ-চরিত্রের সেই আদর্শের সঙ্গে আজকের বালক-বালিকাদের পরিচয় ঘটিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীগৌতম সেন

চাঁদের ছবি
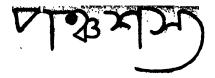
প্যাট্রিক মুর, ইংলণ্ডের অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, চাঁদ সম্বন্ধে খুব সুন্দর এক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের বর্ণনা করেছেন। ১৯৫৯ সালের কথা সোভিয়েট রকেটযান লুনিক-দুই চাঁদের দিকে চলছে। মস্কো থেকে ঘোষণা।

চাঁদের ছবি (ক, খ, গ)
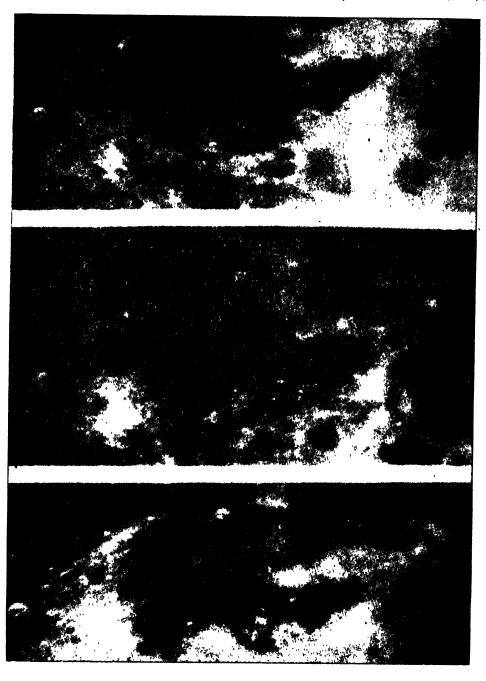
করা হয়েছে ১৩ই সেপ্টেম্বর গ্রীনীচ সময় (G.M.T.) রাত্রি ৯টা ৫ মিনিটে তা চাঁদে পৌঁছবে। পৃথিবী থেকে কোন জিনিষ প্রথম চাঁদে যাচ্ছে এ ঘটনায় সবাই তৎপর হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দূরবীণগুলি চাঁদের দিকে তাগ্ করা। বি. বি. সি. বিশেষ টেলিভিশন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ক্ষণে ক্ষণে লুনিকের গতিবিধি বর্ণনা করা হচ্ছে—যেন ফুটবলের "রীলে" হচ্ছে। প্যাট্রিক মুর তার সাড়ে বারো ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপটি নিয়ে বড় ব্যস্ত। জাডর‍্যাল ব্যাঙ্কের বিশাল (২৫০ ইঞ্চি ব্যাসের) রেডিও-টেলিস্কোপ লুনিক থেকে রেডিও-সংকেত স্পষ্ট "শুনতে" পাচ্ছে। এমন সময়, ৯টা ২ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে লুনিকের রেডিও-সংকেত বন্ধ হয়ে গেল। বোঝা গেল, রকেটটি ঠিক এ সময়ে চাঁদের কঠিন দেহে আঘাত খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এ হ'ল রেডিও-টেলিস্কোপে "দেখা" খবর। মানুষের চোখে কি দেখা গেল প্যাট্রিক মুর সে কথাই বলছেন।

মুর তাঁর ছোট টেলিস্কোপটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন, চোখের পাতা পড়ে না আর কি। ঠিক ৯টা ২ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে তিনিও যেন কি দেখলেন। গহ্বরময় চাঁদের হাইজিনাস নামক গহ্বরের কাছে তিনি যেন হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি দেখলেন—দু নম্বর লুনিক চাঁদে নামার সময় সোডিয়ামের আগুন জ্বেলে ওঠার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এইচ. পি. উইলকিন্‌স্ বলে এক ভদ্রলোকও ঠিক ঐ জায়গায় ঠিক ঐ সময়ে ঐ দৃশ্য দেখেছিলেন। আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সমর্থন পেয়ে প্যাট্রিক মুর ভাবলেন সত্যই বুঝি তিনি রকেটের চাঁদে অবতরণ লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। সে বিশ্বাসে বিখ্যাত বিজ্ঞান সাপ্তাহিক "নেচারে" ছোট্ট একটা নোট পর্যন্ত প্রকাশ করলেন।

এ ঘটনার এগারো মাস পরের কথা। প্যাট্রিক মুর রাশিয়ায় গেছেন। স্বাভাবিকভাবে লুনিক-দুইয়ের কথা উঠল। মুর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। দেখা গেল অনেকেই দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখেছেন, কিন্তু স্থান এবং কাল প্রত্যেকেরই আলাদা। অর্থাৎ আসল ব্যাপারটা কেউ দেখেন নি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, চোখে ধাঁধাঁ লেগেছিল, চাঁদে যা দেখেছেন বলে মনে হয়েছিল তা আসলে হয়েছিল চোখেরই পাতায়। চোখের দৃষ্টি দূরবীণ যন্ত্রে বলীয়ান হ'লেও অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল।

লুনিক-পাঁচ সম্বন্ধে এ বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। ক্যামেরার আলোক-চিত্রে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। পাঁচ নম্বর লুনিক এ বছর ১১ই মে তারিখে চাঁদের টাইকো গহ্বরে গিয়ে লাগে। ক ছবিটি সদ্য লাগার সময়ে তোলা, সাদা অংশে দেখুন কেমন ধুলোর মেঘ উঠেছে। খ ছবিটি দু' মিনিট পরে তোলা, ধুলোর মেঘ আকার বদলাচ্ছে। গ চিত্রে ধুলো থিতিয়ে পড়ছে। (ফটো তিনটি রোডোভিশ মানমন্দিরের অধ্যাপক এডগার গেন্‌জেল-এর তোলা, তথ্যপত্রিকা জুন ১৯৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

এ, কে ডি,

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্য-সমস্যা

চাউল ব্যবসায়ীদের নিকট সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে জাতীয় খাদ্যশস্য সংস্থার (Food Corporation of India) প্রধানাধ্যক্ষ বলিয়াছেন যে, আগামী অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতকে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানীর উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যশস্য মজুদের অবস্থা তাঁহার মতে এমনই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, বস্তুতঃ বর্তমানে মজুদ সৃষ্টি করিবার কোনই অবকাশ মিলিতেছে না; বন্দর হইতে সরাসরি ভোক্তার ব্যবহারের জন্য এই আমদানী শস্য চালান করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য একটি সংবাদে জানা যাইতেছে যে চাউল আমদানীর পরিমাণ প্রয়োজনমত সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না; ফলে কেন্দ্রীয় ঘাটতি মজুদ গড়িয়া তোলার পথে আশানুরূপ সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবাদটির সহিত পূর্বে প্রচারিত সরকারী-সংবাদ—যথা এই বৎসর কেন্দ্রীয় ঘাটতি মজুদে (buffer stocks) আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ হইয়াছে, ইতিমধ্যেই চাউল সংগ্রহের পরিমাণ ১৯ লক্ষ টন পরিমাণ হইয়াছে—এই দুইয়ের কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

সম্প্রতি খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েকের প্রকাশ্য বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়াছি। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া প্রচার যে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোন সুষ্ঠু ও সুস্থ খাদ্যনীতি রচনা ও প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার মতে সমগ্র দেশের জন্য একটি সুপরিকল্পিত খাদ্যনীতি রচিত ও প্রযুক্ত হওয়া একান্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে যে সকল রাজ্য ঘাটতি ভোগ করিতেছে, বাড়তি উৎপাদক রাজ্যগুলির উচিত তাহাদের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র রাজ্যে—বিশেষতঃ বোম্বাই ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে—পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্তন করার প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই সাপক্ষে শস্য সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হইলে তিনি কোনক্রমেই এই গুরু দায়িত্বের ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নন।

সম্প্রতি পুণা শহরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেন যে ভারতের সর্বত্র পাঁচ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ সংখ্যার শহরগুলিতে অবিলম্বে পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার মতে এই সকল র‍্যাশন-বিধৃত এলাকাগুলি ব্যতীত দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচলের বিরুদ্ধে বর্তমানে বলবৎ সকল বাধা অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

এই সকল টুকরা টুকরা সংবাদ হইতে এই প্রতীতি সাধারণ্যে জন্মান স্বাভাবিক যে, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি পুনরায় একটি সঙ্গীন পরিণতির অভিমুখে ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিয়াছে। ইহার প্রকৃত আভাস গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে ক্রমেই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কয়েক সপ্তাহ হইল র‍্যাশনের অন্তর্গত খাদ্যশস্যাদির মূল্য সরকারীভাবে বেশ কিছুটা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু যে বিষয়টি এখন পর্য্যন্ত সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তাহা এই: র‍্যাশন-গণ্ডির অব্যবহিত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের খুচরা মূল্যের ক্রমবর্দ্ধমান প্রকোপ। বর্তমান সপ্তাহে এই খোলা বাজারে চাউলের খুচরা মূল্যের নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা অনুভূত হইবে:—

মোটা—ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ—১ কিলোগ্রাম—১.১০ পয়সা
ঐ—মিল ছাঁটা ঐ— ঐ —১.১২ "
মাঝারি—ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ— ঐ —১.২০ "
ঐ—মিল ছাঁটা ঐ — ঐ —১.২৫ "
ঐ—মিল ছাঁটা আতপ— ঐ —১.২০ "
সরু (যথা
বাঁকতুলসী, চামরমণি
ইত্যাদি)—ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ— ঐ —১.৩০ "
ঐ—মিল ছাঁটা ঐ— ঐ —১.৩৫ "
ঐ— ঐ আতপ— ঐ —১.৪০ "

সরকারী খুচরা মূল্যের পরিমাপের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে খোলা বাজারে সরকারী ০.৬৭ পয়সা মূল্যের চাউলটির বর্তমান দাম ১.১০ পয়সা, অর্থাৎ প্রায় ৬২.৭% বেশী; ০.৭৬ পয়সার চাউলটির মূল্য ১.২০ পয়সা, অর্থাৎ ৫৮% বেশী ও ১.০৮ পয়সার চাউলটির মূল্য ১.৩৫ পয়সা, অর্থাৎ ২৫% বেশী।

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে বর্তমানে, খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক কৃশ-ঋতু (lean season) সুরু হইবার বহু পূর্ব হইতেই চাউলের মূল্য এ সকল এলাকায় একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির অভিমুখে চলিতে সুরু করিয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহার খানিকটা আভাস পাওয়া যাইবে:—

কলিকাতার শহরতলীর খোলাবাজারে খুচরা চাউলের দাম।

চাউলের নমুনা	ঢেঁকি বা মিল ছাঁটা	সিদ্ধ বা আতপ	২৮-২-৬৫ দাম	৬-৭-৬৫ দাম	শতকরা মূল্যবৃদ্ধি
মোটা	ঢেঁকি ছাঁটা	সিদ্ধ	৮০ পয়সা	১.১০ পয়সা	৩৭.৫%
ঐ	মিল ছাঁটা	ঐ	৮৫ "	১.১২ "	৩১.৮%
মাঝারি	ঢেঁকি ছাঁটা	ঐ	৯০ "	১.২০ "	৩৩.৩%
ঐ	মিল ছাঁটা	ঐ	৯২ "	১.২৫ "	৩৫.৮%
ঐ	ঐ	আতপ	৯০ "	১.২০ "	৩৩.৩%
সরু	ঢেঁকি ছাঁটা	সিদ্ধ	১.০০ "	১.৩০ "	৩০.০%
ঐ	মিল ছাঁটা	ঐ	১.০৫ "	১.৩৫ "	২৮.৫%
ঐ	ঐ	আতপ	১.১০ "	১.৪০ "	২৭.৩%

সরকারী স্বীকৃতি অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসরের খাদ্যসঙ্কটের পূর্বে জানুয়ারী হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত চাউলের খুচরা দর খোলাবাজারে মোটামুটি গড়পড়তা ১৪% বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জুলাইয়ের শেষ-ভাগ হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দরবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০%। এই বৎসর দেখা যাইতেছে যে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে সুরু করিয়া জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলিকাতার শহরতলার খোলাবাজারে চাউলের গড়পড়তা খুচরা দরবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রায় ৩১% পরিমাণ। এবার খাদ্যশস্যের কৃশঋতু সুরু হইবার সময় আসিয়াছে। এখন হইতে চাউলের দরবৃদ্ধির ধারা এর পরিমাণ কিরূপ এবং কতটা হইবে, তাহারই উপর নির্ভর করিবে খাদ্যশস্যের মূল্যে গত বৎসরের ভয়াবহ সঙ্কটের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কি না।

খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও তথা খোলাবাজার-মূল্য পরিস্থিতি যে ক্রমেই আবার সঙ্কটজনক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে সুরু করিয়াছে তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত বিভিন্ন বিবৃতি ও বক্তৃতাদির সারমর্ম হইতেই প্রতীয়মান হইবে। ইহা ছাড়াও কয়েকদিন মাত্র পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রকাশ্যভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভরসা দিয়াছেন যে আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত র‍্যাশন-বিধৃত ও আংশিক বণ্টনকারী কেন্দ্রগুলিতে যথোপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা তাঁহার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। অতএব—মাভৈঃ, ভয়ের কোন কারণ নাই! সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীদের মধ্যে যে ৬৭ লক্ষ লোক র‍্যাশন ও আংশিক র‍্যাশন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে আশঙ্কার তেমন কোন কারণ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু বাকী প্রায় পৌনে চারি কোটি বঙ্গবাসীর পক্ষে কি হইবে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রচার করায় জরুরী ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়িবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। এইরূপ একটি আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়া একমাত্র চাউলের কালোবাজারীদের তৎপর করিয়া তোলা ও খোলাবাজারের উপরে তাহাদের আক্রমণটিকে আরো জোরদার করিয়া দেওয়া ব্যতীত ইহার আর কি তাৎপর্য থাকিতে পারে তাহা একমাত্র প্রফুল্ল সেনই জানেন। আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি এবং বর্তমানেও দেখিতেছি যে যখনই খাদ্যপরিস্থিতি

একটা শঙ্কাজনক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে সুরু করে, তখনই পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতম্মন্য মুখ্যমন্ত্রী এমন এক একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া বসেন যাহার প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের পক্ষে প্রাণঘাতী এবং মুনাফাবাজ কালোবাজারীদের পক্ষে প্রভূত লাভজনক হইয়া থাকে। এই প্রশ্ন তখন স্বতঃই উদয় হয় যে মুখ্যমন্ত্রী কি কেবলমাত্র হঠকারিতাবশতঃ বারংবার এরূপ বিবৃতি প্রচার করিয়া থাকেন, না এ সকল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাণী?

সম্প্রতি দ্রুতগতিতে কলিকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে মানুষের খাদ্যের অন্যান্য সাধারণ উপাদানগুলির যে ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার দিকে একটু চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে আমরা কোন্‌দিকে চলিতেছি। গত ৬ সপ্তাহে আলুর মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে,—অর্থাৎ ৫৪ পয়সা হইতে ৯০ পয়সা হইয়াছে, কুমড়া তথৈবচ, এমন কি ঝিঙ্গার মূল্য পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ২৫ পয়সা হইতে ১ টাকায় উঠিয়াছে; পটলের দর ৬০ পয়সা হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে ১।০ টাকায়, বেগুনের দর ৫০ পয়সা হইতে ১।০ টাকায় উঠিয়াছে। এ সকল সাধারণ সজ্জী সাধারণতঃ নিম্নমধ্যবিত্তেরাই বেশী আহার করিয়া থাকেন, বিশেষ করিয়া নিরামিষভোজীরা। বাঙালী আমিষভোজী সাধারণতঃ সজ্জী খুব একটা বেশী ব্যবহার করেন না,—কিন্তু আমিষভোজীরা বাধ্য হইয়াই বহুকাল ধরিয়া নিরামিষভোজী হইয়াছেন। ৫ টাকা কেজি মাছ ও মাংস খাইবার মতন আর্থিক সামর্থ্য তাঁহাদের নাই, পাওয়া গেলে কখনও কথনও তাঁহারা মাছ ও মাংসের গন্ধমাত্র আহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নিরামিষ খাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে,—একটা পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্কের পরিবারে একটা ডাল ও একটা নিরামিষ তরকারি রাঁধিবার মতন উপযুক্ত পরিমাণ সজ্জী খরিদ করিবার মত সামর্থ্য বর্তমান বাজারে আর তাঁহাদের নাই। এবং এই সকল পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য নির্দ্ধারণে সরকার কখনো কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়াস করেন নাই। মাছের বাজারে খানিকটা প্রয়াস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ফল একমাত্র এই হইয়াছে যে মাছ বাজার হইতে সম্পূর্ণ উধাও হইয়া গিয়াছে এবং বাজারের বাইরে আনাচে-কানাচে, বিশেষ করিয়া শহরতলী অঞ্চলে যে দরে মাছ বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা কোন নিম্ন, এমন কি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আয়ত্তের সম্পূর্ণ অতীত।

সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে দেশের দরিদ্রতম ১০% অধিবাসীর মাথাপিছু ভোগ্য আয়ের (disposable income) পরিমাণ মাসিক ১০ টাকারও কম। এই আয়ের মধ্যে একটা লোক কি করিয়া বর্তমান অবস্থায় খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা সাধারণের বুদ্ধিতে সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোককে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অন্ততঃ ১৫।১৬ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য (চাউল বা /এবং গম), ২কিলোগ্রাম ডাইল, লবণ, সামান্য হইলেও কিছুটা খাদ্য-তেল, একটু সজ্জী ইত্যাদি এবং কম করিয়া হইলেও তিন পোয়া গজ কাপড় ব্যবহার করিতেই হয়। এই সকলের খরচা দাঁড়ায়:—

		টাকা	পয়সা
১৬ কিঃ	চাউল	১৭·	৬০
২ ,,	ডাইল	২·	২০
১/২ ,,	তেল	১·	৫০
	লবণ	০	০৩
		২১	৩৩
৩/৪ গজ কাপড়		১·	০০
	মোট	২২	·৩৩

অর্থাৎ কোনক্রমে কেবলমাত্র চাউল ডাইল দিয়া উদরপূর্তি করিতে এবং কটিবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতে হইলেও বর্তমান বাজারে কোনক্রমেই ২২টাকা ৩৩ পয়সার কমে সঙ্কুলান হয় না। যার মাসিক আয় মাত্র ১০ টাকা সে কি করিয়া দেহ ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে ইহাই তাহার নিকট কঠিনতম সমস্যা। ইহার ঊর্দ্ধতর আয়ের দেশের ৬০% লোকসংখ্যার অবস্থাও যে তুলনায় এমন কিছু ভালো তাহা বলা চলে না; তাহার আয়ও মাসিক ২০ টাকার কম। কিন্তু প্রাণ-ধারণের জন্য নিম্নতম পরিমাণ খাদ্য উপাদানের মূল্যও তাহারও নিকট আয়ত্তাতীত। এবং প্রতিদিন এই অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে ইহার প্রতিকারের কোন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াস ত দূরের কথা, ইহার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। কর্তৃপক্ষগোষ্ঠী জানেন দেশের লোক মূর্খ, উঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্যহীনতার কথা বুঝিবার মতন বিদ্যাবুদ্ধি তাহাদের কিছুমাত্র নাই; তাহারা ত মরিবে এবং মার খাইবেই। ইহাই তাহাদের নিয়তি! ইতিমধ্যে কেবলমাত্র বড় বড় কথা ও সুদূর ভবিষ্যতে ফলপ্রসব-সম্ভাবনাসূচক বড় বড় প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তির আফিঙে তাহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে নিজেদের জীবনান্ত পর্যন্ত ক্ষমতার আসনের

উপর পাকা দখল কায়েমী করিয়া রাখতে পারা যাইবে। অনুমান তাঁহাদের অবশ্য নিতান্ত অমূলক নহে। দেশের লোক নিতান্ত মূর্খ না হইলে ইহাদিগকেই বা তাহারা বারংবার ক্ষমতার গদীতে বসাইতেছে কেন।

সে যাহাই হউক, দেশের এবং বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি যে আবার একটা সঙ্কটজনক পরিণতির দিকে অনিবার্য্যভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহা আজ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সত্যকার প্রতিকার সুস্থ ও সবল সরকারী প্রয়োগ। এরূপ কোন প্রয়োগব্যবস্থা রচনা করিবার দিকে কোন প্রকার সরকারী প্রয়াসের লক্ষণমাত্র নাই। পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে ইহাও মনে করিবার কারণ আছে যে, সেরূপ কল্পনা বা সামর্থ্যও ইহাদের নাই। দেশের খাদ্য পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির একমাত্র কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং অনুপাতে কৃষি-উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত মন্দগতি উন্নতি, এইটুকু বলিয়াই ইঁহারা দায়িত্বমুক্ত হইতে চান মনে হয়। কারণ যাহাই হউক, দেশের লোকেদের এই প্রাণঘাতী সঙ্কট হইতে বাঁচাইবার উপায় উদ্ভাবন ও তাহার সার্থক ও সফল প্রয়োগের দায়িত্বও যে তাঁহাদেরই সে কথা ইঁহারা অস্বীকার করেন কি করিয়া?

অবশ্য কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিবার মত বুদ্ধি ও বিবেচনা থাকিলে বর্তমান পরিস্থিতির সত্যকার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা কষ্টকর হইবার কথা নহে। বিশেষ করিয়া গত বৎসরের নিদারুণ অভিজ্ঞতার ফলে এই বিশ্লেষণ সহজ ও স্পষ্ট হইবার কথা। একথা সত্য যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতির তুলনায় গত কয়েক বৎসরে দ্রুততর গতি লাভ করিয়াছে। ইহাও সত্য যে দেশের খাদ্য-সমস্যার সত্যকার ও স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে উৎপাদনের গতিবেগ বাড়ান একান্ত

প্রয়োজন। কিন্তু ইতিমধ্যে সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা প্রতি বৎসর এই যে দেশব্যাপী গভীর সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে, তাহা প্রতিরোধ করা অসম্ভব হওয়া উচিত ছিল না। কিছুকাল পূর্বে এই প্রসঙ্গে আমরা সংখ্যার দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি যে যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে দেশে উৎপন্ন সকল প্রকার খাদ্যশস্য, - মিহি শস্যের মধ্যে চাউল ও গম এবং বাজরা ইত্যাদি মোটা শস্যাদি—যদি উপযুক্ত অনুপাতে মানুষের ভোগে লাগাইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে দেশের বর্তমান জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু দৈনিক ১৬ আউন্স শস্যের বরাদ্দ (০—৪ বৎসর বয়স্কদের জন্য ৪ আউন্স এবং ৫—১৪ বৎসর এবং ৬৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য ৮ আউন্স) ধরিয়া লইলেও দেশের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার খাদ্য-বরাদ্দ করিয়া, অনিবার্য্য অপচয় ও বীজ-শস্যের জন্য উৎপাদনের ১০% রাখিয়াও আরো সামান্য কিছু শস্য উদ্‌বৃত্ত থাকিবার কথা। অবশ্য দেশের সকলেই যদি তাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষুন্নিবৃত্তি কেবলমাত্র গম ও চাউলের দ্বারাই পূরণ করিতে চান, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইবে না। সকলকেই আনুপাতিক পরিমাণে সকল শস্যই ব্যবহার করিতে হইবে। এইটুকু পর্যন্ত দেশের বর্তমান উৎপাদন হইতেই সঙ্কুলান হইতে পারে। কিন্তু মধ্যে দুই বৎসর ব্যতীত, এই উৎপাদনের উপরেও প্রভূত পরিমাণ গম এবং কিছুটা পরিমাণ চাউলও আমরা গত বহু বৎসর ধরিয়া বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া আসিতেছি। তবুও আমাদের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি মিটিতেছে না।

মূল কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই ঘাটতির কারণ সরবরাহের বাস্তবিক অপ্রতুলতা (physical deficit) নহে। অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের (money supply) দরুণ,—তাহার কারণ বা অজুহাত যাহাই হউক না কেন—যে চাহিদাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার সুযোগ লইয়া অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির সরবরাহে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ঘাটতি সাধন। ইহারই ফলে এই সঙ্কটের বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। এই মূল সমস্যাটির সমাধান করিতে না পারিলে বিশেষ করিয়া খাদ্য সঙ্কট হইতে এবং সাধারণতঃ মূল্য সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই আশা নাই। বর্তমানে দ্রুত অগ্রসর খাদ্য সঙ্কটের দীর্ঘ ছায়া আবার আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা ছায়া মাত্র, এই বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। দেশের সরকারী নেতৃবৃন্দ যদি এই সমস্যা সমাধানে অসামর্থ্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত শাসন-ক্ষমতা ত্যাগ করা। সমাধান সহজ নহে ইহা স্পষ্ট ; কিন্তু তাহা যতই বিঘ্নসঙ্কুল হউক না কেন, তাহা উত্তীর্ণ হইবার দায়িত্বও দেশের রাজশক্তির।

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
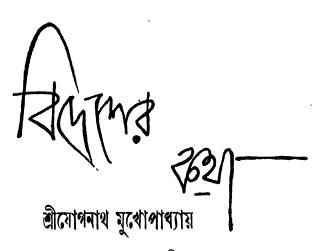
ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনাম সঙ্কট দুর্নিবার গতিতে প্রলয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। সারা বিশ্বের, এমনকি স্বদেশেরও জনমত উপেক্ষা ক'রে প্রেসিডেণ্ট জনসন ভিয়েৎকঙদের নিঃসহায় ও হীনবল করার আশায় উত্তর ভিয়েৎনামে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ সুরু করেন। মার্কিন বোমার আঘাতে উত্তর ভিয়েৎনামের সেতু, সড়ক, সামরিক ঘাঁটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জনসনের তাতে বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও উত্তর ভিয়েৎনামের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না, পরন্তু প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের দুর্জয় দৃঢ়তা সারা বিশ্বের জনগণকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। নানা কারণে যেসব দেশ ভিয়েৎনামে মার্কিন তৎপরতা সম্বন্ধে নীরব থাকতে চায় তাদের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত নীরব থাকা সম্ভব হয় না। আবার একই সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং গেরিলাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন সরকারের মারমুখী নীতির অসারতা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট সরকারের সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎকঙ বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আইনানুগ সরকারকে উৎখাত করে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম করতে চায়, সুতরাং উত্তর ভিয়েৎনামকে ঐ অন্যায় ও বেআইনী সাহায্যদান থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীরা হার মানতে বাধ্য হবে—উত্তর ভিয়েৎনামে হামলা সুরুর পক্ষে এই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বেপরোয়া মার্কিন হামলা চলাকালেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকঙ আক্রমণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং ভিয়েৎকঙ-শাসিত ঐ অঞ্চলে ভিয়েৎনামের সরকারী বাহিনী বা তাদের সহায়তাকারী মার্কিন সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু বলদর্পী মার্কিন সরকারের পক্ষে এই নিষ্ঠুর সত্যটা কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাঁরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে পঁচাত্তর হাজার করতে চান, আর সেই সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর আক্রমণ আরও প্রচণ্ড করে তুলতে চান। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকঙ-শাসিত অঞ্চলগুলির উপরেও তাঁরা বিমান আক্রমণ সুরু করার কথা চিন্তা করছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। একটি কম্যুনিষ্ট দেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বেপরোয়া হামলা আর সব কম্যুনিষ্ট দেশ বরাবর মুখ বুজে সহ্য করবে এটা যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না। সুতরাং অবিলম্বে যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার নীতি পরিবর্তন না করেন তবে বুঝতে হবে যে, একটা সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েই তাঁরা উত্তর ভিয়েৎনামে আক্রমণ সুরু করেছেন। যে কোন কারণেই হোক সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন কোন বড় রকমের যুদ্ধে নিজেকে জড়াতে চায় না। কিন্তু একটি কম্যুনিষ্ট দেশ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন অবশ্য তাঁদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে এবং ঐ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেবে কম্যুনিষ্ট চীন। কম্যুনিষ্ট চীন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যকলাপে তার নিরাপত্তা সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হয়েছে এবং অবিলম্বে যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার সংযত না হয় তবে উত্তর ভিয়েৎনামে তারা স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাতে বাধ্য হবে। চীন যদি উত্তর ভিয়েৎনামের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেয়

তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আর কিছুতেই চুপ থাকা সম্ভব হবে না। বিশ্বযুদ্ধও তখন অনিবার্য হয়ে উঠবে। মার্কিন কূটনীতির আর একটা মারাত্মক ভুল এই যে, উত্তর ভিয়েৎনামের নায়ক ডঃ হো চি মিন চীন-সোভিয়েট তাত্ত্বিক বিরোধে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে জোর করে চীনা শিবিরে ঠেলে দিচ্ছেন।

ডোমিনিকান রিপাবলিক :

ডোমিনিকার ইতিহাস অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, লাঞ্ছনা ও শোষণের ইতিহাস। লাতিন আমেরিকার এই ক্ষুদ্র দেশটি ১৮০৯ সালে ফরাসীদের বিতাড়িত করে ও ১৮২১ সালে স্পেনীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্র পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হাইতির কবলিত হয় এবং বাইশ বছর ধরে হাইতি ডোমিনিকার উপর নৃশংস শাসন বলবৎ রাখে। ১৮৪৪ সালে হাইতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হওয়ায় ডোমিনিকা সেই সুযোগে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে কিন্তু শান্তি ফিরে পায় না। তার পরের সত্তর বছরে বাইশ বার বিদ্রোহ হয়েছে ডোমিনিকায়, এবং ১৮৬১ সাল থেকে '৬৫ সাল পর্যন্ত আর একবার স্পেন তার উপর শাসন কায়েম করে। ১৮৬৯ সালে নিরুপায় ডোমিনিকা একবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট তা অনুমোদন করলেও মার্কিন কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে একমত হন না। পরে ১৯১৬ সালে ডোমিনিকায় আবার যখন অশান্তি সুরু হয় তখন তা দমন করতে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে নৌবাহিনী পাঠায় ও প্রায় আট বছর ধরে ডোমিনিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন থাকে। এর পর ১৯৩০ সালে ডোমিনিকা রাফায়েল ত্রুজিলোর একনায়কতাধীন হয় এবং ১৯৬১ সালে ত্রুজিলো নিহত না হওয়া পর্যন্ত ঐ একনায়কতন্ত্র বজায় থাকে। ত্রুজিলো যখন মারা যান তখন তিনি প্রায় ৮০ কোটি ডলার সম্পত্তির মালিক ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের দখলে ঐ দেশের উর্বরা জমির ৩৫ শতাংশ, ১৬টি চিনিকলের মধ্যে ১২টিও দেশের মোট চিনি উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ। এই রকম নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর শোষণের ইতিহাস বিরল। ত্রুজিলোর মৃত্যুর পরেও গত চার বছরে চারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে ডোমিনিকায়। গণতন্ত্র সে দেশে কোনদিন ছিল না, আজও নেই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বোবা ও সামাজিক ব্যভিচার ডোমিনিকার উনত্রিশ লক্ষ নরনারীর জীবনের নিত্যসঙ্গী। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশই কম্যুনিজম প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেন ডোমিনিকায়, কিন্তু তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়পুষ্ট সরকারের স্বার্থেই ব্যয় হয়, সাধারণ মানুষের কাছে তার অতি সামান্য অংশও পৌঁছায় না। সুতরাং ডোমিনিকার সাধারণ মানুষ যদি যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী হয় তবে তাতেও কিছু বলার থাকে না।

ডোমিনিকার সর্বশেষ অভ্যুত্থান যুক্তরাষ্ট্র সরকার ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দমন করেছেন। প্রেসিডেণ্ট জনসন স্পষ্টই বলেছেন, আমেরিকা মহাদেশে আর একটি কিউবা সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি তিনি কিছুতেই নেবেন না। সুতরাং অভ্যুত্থানকারীদের দমন করতে যত শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা তিনি করবেন। প্রেসিডেণ্ট জনসনের উদ্দেশ্য আপাতত সফল হয়েছে, বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে ডোমিনিকায়। কয়েক হাজার বিদ্রোহী প্রাণ হারিয়েছে মার্কিন সৈন্যদের হাতে, এবং ডোমিনিকার রাজধানী সান ডোমিঙ্গোয় মানুষের মৃতদেহ এক সময় এমন স্তূপীকৃত হয় যে, সাংঘাতিক মড়কের আশঙ্কায় ঐ মৃতের স্তূপ অপসারণকল্পে উভয় পক্ষ একদিনের জন্য যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

কিন্তু আজ ডোমিনিকায় যে শান্তি কায়েম হয়েছে তা শ্মশানের শান্তি, কেউই মার্কিন হস্তক্ষেপ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি। সুতরাং অনতিবিলম্বে আবার যদি ডোমিনিকায় বিক্ষোভের ঝড় ওঠে তবে সেটা কারও কাছেই আশ্চর্যের বিষয় হবে না।

আফ্রো-এশিয় সংহতি :

ঘানার রাজধানী আক্রায় গত মে মাসে চতুর্থ আফ্রো-এশিয় গণ-সংহতি সম্মেলন হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। বলা বাহুল্য আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণের সংহতি ও সমৃদ্ধিই ঐ সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সম্মেলন ক্ষেত্রে দেখা যায়, লালচীনের প্ররোচনায় পাকিস্তান সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে কচ্ছের রান অঞ্চলে "সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের" অভিযোগ-সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি করছে, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়াকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রীড়নক বলে ধিক্কার দিচ্ছে। পর্তুগীজ উপনিবেশ এঙ্গোলার দু'টি নির্বাসিত রাজনৈতিক দলের একটি অপরটির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট বলে অভিযোগ আনছে, এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিয়াও চেং-চি প্রকাশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে" বিশ্বকে ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগ আনছেন। ঐ "ঐতিহাসিক" সম্মেলনকে চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে

প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা সম্মেলন প্রাঙ্গণে তাঁর নিজের একটি পঁচাত্তর ফুট উঁচু মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

উল্লেখিত ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রায়ই যে আফ্রো-এশিয় শীর্ষ সম্মেলন, আফ্রো-এশিয় গণ-সংহতি সম্মেলন, জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন, প্রভৃতি সম্মেলনগুলি হয় তার প্রকৃত তাৎপর্য কি।

চৌর হতাশা ঃ

চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ 'এন লাই জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তানজানিয়া সফরে যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল, জুন মাসের শেষে আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশিয় শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের আগের কটা দিন আফ্রিকাতেই ঘুরে ঘুরে কাটাবেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। তানজানিয়ায় চার দিন সফরের পর আর কোন দেশ থেকে না পাওয়ায় চৌ মনের দুঃখে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর বিশেষ বন্ধু প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা "অত্যন্ত ব্যস্ত" থাকায় ঘানায় চৌকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন নি। গিনির সেকু তুরও এ সময়ে চৌ'র গিনি সফর "অসুবিধা-জনক" হবে বলে মনে করেন। আর কেনিয়ার প্রেসিডেণ্ট জোমো কেনিয়াট্টা চৌ'র আফ্রিকায় উপস্থিতিকালেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, অতীতের সাম্রাজ্যবাদীদের মত লাল সাম্রাজ্যবাদ এখন আফ্রিকার বৃহত্তম শত্রু। পুব, পশ্চিম দু'দিকের মতলব সম্বন্ধেই আফ্রিকাকে সজাগ থাকতে হবে।

বুরুণ্ডি, তোগো প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেছে, এবং মালাগাসি ও পশ্চিম আফ্রিকার নয়টি দেশ চীনা কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের রক্ষার দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে।

পুনর্বাসন ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়নে কাকে কখন বীরের সম্মান দেওয়া হবে সেটা দলীয় প্রয়োজন অনুসারে স্থির হয়। একদিন যার নামাবলী জড়িয়ে আছে সারা সোভিয়েট দেশ, পরের দিন হয়ত তার একটা ছবিও খুঁজে পাওয়া যাবে না সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিয়াশি লক্ষ বর্গমাইল এক্তিয়ারে। পরাভূত দেবতার প্রশংসামণ্ডিত বইগুলিও মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

এমনিভাবে গত দশ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস ও রাজনীতিতে নিশ্চিহ্ন হন তার ত্রিশ বছরের সর্বাধিনায়ক ষ্টালিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম সফল নায়ক মার্শাল জুকফ, সোভিয়েট নৌবাহিনীর জনকরূপে খ্যাত এডমিরাল কুজ্‌নেৎসফ ও আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তি। ক্রুশ্চেভোত্তর যুগে তাঁদের কিছু কিছু পুনর্বাসনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 'বোনাপার্টিজ্‌মের অভিযোগে ক্রুশ্চেভ জুককে পদচ্যুত করেন—যার অর্থ হ'ল, দলের কর্তৃত্ব থেকে সৈন্যবাহিনীকে স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করেন জুকফ। অপসৃত হওয়ার পর সাত বছর অস্তিত্বহীন অবস্থায় বাস করেন জুকফ। কিন্তু গত ৮ই মে নাৎসী-বিজয়ের বিংশতি বার্ষিক স্মরণ উৎসবে হঠাৎ তাঁকে বীরবেশে উপস্থিত হ'তে দেখা যায়। ঐ দিন বহু বছর বাদে আবার ষ্টালিনের নাম প্রকাশ্যে শোনা যায় সোভিয়েট নেতাদের মুখে। এড্‌মিরাল কুজ্‌নেৎসফও সম্প্রতি একটি গ্রন্থের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই পুনর্বাসনের ব্যাপারে বর্তমান সোভিয়েট নেতারা কতটা এগোবেন সেটা এখনও সকলের অনুমানের বিষয়। মনে হয় এ ব্যাপারে তাঁরা একটা ভারসাম্য আনতে চান। ষ্টালিনের বিরুদ্ধে লক্ষ অভিযোগ থাকলেও তাঁর ত্রিশ বছরের প্রচণ্ড অস্তিত্ব যে সোভিয়েট ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয় এটা হয়ত তাঁরা বুঝতে পারছেন।

আলজিরিয়ায় অভ্যুত্থান ঃ

উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্র আলজিরিয়ায় অকস্মাৎ সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেণ্ট বেন বেলা পদচ্যুত হয়েছেন এবং তাঁর স্থান দখল করেছেন কর্ণেল বুমেদিয়েন। আলজিরিয়া স্বাধীন হওয়ার পর বেন বেলা তাঁর সব ক'জন সংগ্রাম-সাথীকে একের পর এক বন্দী, দেশছাড়া বা পদচ্যুত করেন এবং তাঁর নিজের দল এফ.এল.এন. ছাড়া সব ক'টি রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে কার্যত একনায়কতন্ত্র কায়েম করে-ছিলেন আলজিরিয়ায়। সংবাদপত্রেরও কোন স্বাধীনতা ছিল না সে দেশে। সুতরাং বেন বেলার শাসনের পিছনে আলজিরিয়ার জনগণের সমর্থন কতটা ছিল তা জানার কোন উপায় ছিল না। তবুও একটা মোটামুটি ধারণা পৃথিবীর সব দেশে প্রচারিত ছিল যে, বেন বেলা আলজিরিয়ার জনপ্রিয় শাসক। সে কারণে তাঁর হঠাৎ উৎখাত আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হয়।

কর্ণেল বুমেদিয়েন আলজিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর প্রভাবশালী নায়ক, সুতরাং সামরিক শক্তির জোরে বেন বেলাকে পরাস্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর বাইরে গণসমর্থন তাঁর পিছনে কতটা আছে তা বলা কঠিন। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক কোন শক্তি বুমেদিয়েনের পিছনে আছে তাও এখনও স্পষ্ট নয়।

কেদারনাথ স্মরণে

আমাদের কৈশোর কালেই আমার সঙ্গে কেদারনাথের পরিচয় এবং ক্রমে তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমি কেদার অপেক্ষা প্রায় বৎসর দেড়েকের বড়। তাহার পিতা পরম শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" সহ কলিকাতায় বরাবরের জন্য আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্বে সমাজপাড়ায় বাস আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতেই কেদারের সহিত আমার পরিচয় হয়। আমাদের নিজস্ব গৃহ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অনতিদূরে ছয় নম্বর গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে ছিল এবং তথা হইতে প্রত্যহ স্ব-সমাজের সমাজ-পাড়াস্থ তরুণদের সহিত মিশিবার জন্য প্রায় প্রত্যহ আমি উক্ত অঞ্চলে আসিতাম। মিষ্টভাষী আলাপচারী তরুণ কেদারনাথ অল্পদিনেই পাড়ার যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে এবং সেই সূত্রেই আমার তাহার সহিত পরিচয়। সে সময়ে একটি ঘটনা আমাদের পরিচয়কে নিবিড় করিয়া তুলে। তাহা হইল ব্রাহ্মসমাজের তরুণদের সহিত বয়োজ্যেষ্ঠগণের আদর্শগত বিরোধ। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসমাজ বলিয়া তরুণদের একটি সংস্থা ছিল। তাহাতে যুবকদের সন্নীতিপরায়ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার নিয়ম ছিল, তাহা প্রধানতঃ নেতিবাচক প্রতিজ্ঞা, যথা, আমি ধূমপান করিব না, আমি যে-রঙ্গালয়ে পেশাদার অভিনেত্রী অভিনয় করে সে-রঙ্গালয়ে যাইব না ইত্যাদি।

সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে আমরা তরুণের দল এই বোধ করিলাম যে, নেতিবাচক চরিত্র পরিচালন প্রকৃত মনুষ্যোচিত চরিত্র গঠনের পক্ষে তেমন উপযোগী নহে, তাহা অপেক্ষা আমাদের সামগ্রিক আচরণ সদাচারী হইবে, আমরা সর্ব্বদা সত্য পথে চলিবার প্রয়াস পাইব এরূপ সঙ্কল্প গ্রহণে সচ্চরিত্রতার ভিত্তি দৃঢ় হয়। সেজন্য ছাত্রসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল।

বৃদ্ধের দল উহাকে ভালভাবে লইতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনে হইল যে এসমস্ত ধূমপান বারণ, থিয়েটার গমন প্রভৃতির জন্য সুবিধা লাভের জন্য মহত্ত্বের মোড়কে এক অজুহাত সৃষ্টি। অবশ্য এ ব্যাপারে রামানন্দবাবু, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র মহালনবিশ ও আমার মাতৃদেবীর সমর্থন ছিল। এই বিরোধে একদল তরুণ বৃদ্ধদের পক্ষে যাওয়াতে বিরোধ এমন চরমে উঠে যে, আমরা ছাত্রসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম যুবক সমিতি নামে একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিলাম। ছাত্রসমাজ বিরোধে ও ব্রাহ্ম যুবক সমিতি স্থাপনে কেদারনাথ ও আমি বেশ উৎসাহী ছিলাম এবং সেই সূত্রে আমাদের বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়।

সুকুমার ও প্রশান্ত মহালনবিশের উদ্যোগে যুবকগণের নানা বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া মনকে বিকশিত করিবার জন্য কয়েকটি "ফ্রেটারনিটি" গঠিত হয়। সমাজতত্ত্ব চর্চ্চার জন্য যে ফ্রেটারনিটি হয় তাহাতে আমাদের শিক্ষা দিবার জন্য আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মনীষিগণ প্রায়ই ভাষণ দিতেন। এসবগুলিতে কেদারনাথ উৎসাহের সহিত যোগ দিত। কেদারের মানসিক গঠন বরাবরই উদার ও স্নেহপ্রবণ ছিল। এই সময়ে কেদার দেহচর্চ্চাতেও বেশ দক্ষ হইয়া উঠে এবং ক্রিকেট খেলাতে পারদর্শিতার জন্য বেশ সুনাম অর্জ্জন করে। সে স্পোর্টিং ইউনিয়ন নামক ক্রীড়া-সংস্থার নিয়মিত খেলোয়াড় ছিল এবং এই সূত্রেই তাহার প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় বসু-ভ্রাতৃগণের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে এবং তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রমোহনের সঙ্গে কেদারনাথের যে সখ্যতা হয়, পরিণত বয়সেও তাহা অটুট ছিল। কেদার বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রসায়নে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃটেনে গমন করে। সেখানে সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস-সি ও একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা হইতে এ. আর. সি. এস. উপাধিলাভ করে। সে সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে

কেদারনাথ সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কে গবেষণার জন্য স্থাপিত সংস্থায় যোগদান করে। শুনিয়াছি সেখানে এক বিস্ফোরণের ফলে তাহার মস্তকের কেশগুলি শুভ্র-রজত বর্ণ ধারণ করে। যুদ্ধশেষে যেদিন সে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেদিন তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে বহু বন্ধুও হাওড়া ষ্টেশনে গমন করে। আমি তাহার মধ্যে একজন ছিলাম। শুভ্র কেশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। সে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া বন্ধুবর্গকে অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে যে উষ্ণ ভালবাসা অম্লান আছে তাহার পরিচয় দেয়।

আসার পর কিছুদিন শেষে এক কাঁচ নির্ম্মাণ কারখানায় রাসায়নিকের কাজ করে এবং কিছুদিন মধ্য-ভারতে মৃত্তিকাগর্ভস্থ ভূতাত্ত্বিক সম্পদ, বিশেষতঃ নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য ও রত্নের কারবারে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু এ সমস্ত হইতে পিতার চিহ্নিত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ অধিক হওয়াতে প্রবাসীর সহিত যুক্ত হয়। সে সময়ে রামানন্দবাবুর আহ্বানে আমিও "প্রবাসী"র দুইটি বিভাগ "দেশবিদেশের কথা" ও "পারাপারের ঢেউ"-এর ভার গ্রহণ করি। কেদারনাথ এসময়ে ভারত দারুশিল্প, তক্ষণ-শিল্প ও প্রাচীন ভারতের অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। কেদারনাথের সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাংবাদিকতার কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি পুস্তকাকারে প্রকাশ নাই। একমাত্র কিশোরগণের জন্য রচিত জগন্নাথ পণ্ডিতের খেয়াল খাতা ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পারস্য ভ্রমণই পুস্তকের রূপ লইয়াছে।

কিশোর-সাহিত্যে কেদার একজন সুলেখক ছিল। তাহার বহু সুন্দর রচনা "সন্দেশ" ও "মৌচাক"এ প্রকাশিত হইয়াছে। কিশোরগণের মন ভুলাইবার বিদ্যা সে বেশ আয়ত্ত করিয়াছিল।

কেদার আমাদের সঙ্গে মিলনকে স্থায়ী করিবার জন্য বুক কোম্পানীর গিরীন মিত্রের আসরে এবং এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের সুধীর সরকারের বৈঠকে নিয়মিত যোগ রাখিয়াছিল এবং তাহার মজলিসী চরিত্রের জন্য সকলের প্রিয়ভাজন হইয়াছিল। তাহার বন্ধুবাৎসল্য কত অকৃত্রিম, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী বন্ধু গিরীন মিত্রের সহিত কেদারনাথের প্রতি শনিবার ও রবিবার সাক্ষাতের জন্য নিয়মিত গিরীন মিত্রের গৃহে যাতায়াত ও সংবাদাদি গ্রহণ হইতে। বন্ধুপ্রীতি ও প্রকৃত সাংবাদিকতার প্রতি কেদারের আর একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছি "ভারত" পত্রিকার সংস্রবে। যখন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান সংগঠন এবং বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠার মূল মাখনলাল সেন এক চক্রান্তের ফলে আনন্দবাজারের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতঃ পঁচিশ ত্রিশ জন কর্ম্মী আনন্দবাজার ত্যাগ করিয়া মাখনবাবুর সহযাত্রী হয়। ইহাদের লইয়া একটি নূতন দৈনিক প্রকাশের যখন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে কিন্তু একটি দৈনিক পত্রিকা স্থাপন যে কত ব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রমের ব্যাপার, তজ্জন্য আমরা মাখনবাবুর সকল সহযাত্রীগণ চিন্তিত, সেই দুঃসময়ে সত্য ও ন্যায়ের টানে সেই আসরে দেখা দিল কেদার। মাখনবাবুর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কেদার তাহার বন্ধু আর্ট প্রেসের সত্ত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রস্তাবিত "ভারত" পত্রিকার একজন ডাইরেক্টর হইতে, আর্ট প্রেসের বাড়ীতে "ভারত"এর কার্য্যালয়ের জন্য স্থান দিতে এবং প্রেসে ছাপাইতে সম্মত হওয়াতে "ভারত" পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়। সে সময়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হই আমি ও শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ। ৺সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত হন এবং সংবাদ-সম্পাদক হন প্রখ্যাত সাংবাদিক ৺অমূল্যচরণ সেন। কেদার নিজেও একজন ডিরেক্টর হন এবং প্রায় প্রত্যহই সংবাদ-পরিচালন ব্যাপারে মাখনবাবু ও আমাদের সহিত শলাপরামর্শ করিয়া অনেক কার্য্যকর উপদেশ দিয়া আমাদের উপকৃত করেন।

"ভারত"এর সহিত তাহার নিবিড় যোগের কথা "ভারত" পত্রিকার সহিত সম্পর্কহীন কাহারও জানা নাই। সম্প্রতি শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ তাহার "যুগবাণী"তে সেই তথ্য কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিন বৎসর "ভারত" চলার পর যখন ৪২ সালের "ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রকে কুক্ষিগত করিবার জন্য ও সম্পাদকগণকে সরকারী আজ্ঞার বাহন করিবার জন্য একধারে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন, অন্যধারে মোটা অঙ্কের সরকারী বিজ্ঞাপনের প্রলোভন দিয়া বশীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়াতে "কংগ্রেসী গুণ্ডামী" সিরিজের চিত্রবহুল মিথ্যা কলঙ্কপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রদান আরম্ভ হইল। তখন অর্থাভাবে ক্লিষ্ট "ভারত"ই বাঙ্গলার একমাত্র দৈনিক যাহা অক্লেশে দৃঢ় প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার মূলে মাখনলাল সেন ও কেদারনাথের উৎসাহে ভারতের সকল কর্ম্মীই সমর্থন জ্ঞাপন করে। ভারতবর্ষে "ভারত" ভিন্ন জওহরলালের ন্যাশানাল হেরাল্ড ও মহাত্মা গান্ধীর পত্রিকা উহা লইতে অস্বীকার করে।

"ভারত ছাড়" আন্দোলন দমনের জন্য সরকারী অত্যাচারের কোনও বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া যে অর্ডিন্যান্স জারি হয়, তাহাকে অমান্য করিবার জন্য গান্ধীজী সকল সংবাদপত্রকে অনুরোধ করেন। এ অঞ্চলে "ভারত"ই একমাত্র পত্রিকা যে নির্ভীকচিত্তে সকল অর্ডিন্যান্সকে অমান্য করিয়া শুধু সংবাদ প্রকাশেই ক্ষান্ত থাকে নাই, জলন্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেশের অন্তরের বাণীকে মূর্ত্ত করিয়াছে। এ সময়ে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে কেদার নিত্যই আমাদের অফিসে আসিতেন। বহু যত্নে অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া "ভারত"এ প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাতে সরকার-পক্ষের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে থাকে। এরূপ দিন পনেরো চলাতে "ভারত" অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, কিন্তু সরকারী ধৈর্য্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে যখন অমূল্য সেন "রাজপথে রক্তগঙ্গা" নামে এক অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় আমাদের সম্মতিক্রমে রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। সরকারী আদেশে "ভারত" প্রকাশ বন্ধ হইল, সম্পাদকসহ কম্পোজিটার, বেহারা, হিসাব-বিভাগের যে সমস্ত কর্ম্মী সরকারী তল্লাসীর সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই বিনাবিচারে আটক হইলেন। সেই বিপদকালে "ভারত"এর পাওনা আদায় ও দেনা-শোধের কার্য্যে প্রধান ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে কেদার। যুদ্ধান্তে আবার যখন ভারত প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন সুরু করেন তখন তাঁহার প্রধান সহকারী হয় কেদারনাথ। সে সময়ে মাদ্রাজের প্রখ্যাত সংবাদপত্র-পরিচালক রামনাথ গোয়েঙ্কা কলিকাতা হইতে ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস নামে একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিষ্ঠা করেন।

"এই পত্রিকার অফিস ও মুদ্রণের স্থান ছিল কেদারনাথের বন্ধু বৈষয়িক পত্রিকার পরিচালক শ্রীরঙ্গস্বামীর [illegible] নং লোয়ার সার্কুলার রোড। রঙ্গস্বামীর সহায়তায় কেদার ও মাখনবাবু রামনাথ গোয়েঙ্কাকে সম্মত করান যে "ভারত" পত্রিকার পরিচালনা যদিও "ভারত"-গোষ্ঠীর হাতে থাকিবে, ইহা মুদ্রণ এবং যতদিন পর্য্যন্ত না স্বাবলম্বিত হইবার অবস্থা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত লোকসানের ভার রামনাথ বহন করিবেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেসের কর্ম্মভার মাখনবাবু পরিচালন করিবেন। পত্রিকা-পরিচালনে মাখনবাবুর দক্ষতা জানা ছিল বলিয়া শ্রীগোয়েঙ্কা এই সর্ত্তে সম্মত হন। "ভারতে"র দ্বিতীয় পর্য্যায় এই ভাবে সুরু হয়।

এইভাবে চলিতে থাকাকালে শ্রীযুক্ত গোয়েঙ্কার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে ও মাদ্রাজের ইংরেজি দৈনিক ও দেশী ভাষায় দুইখানি দৈনিক ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তিনি যে সমস্ত পত্রিকা পরিচালন করিতেছিলেন তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় কারবার ক্রয় করেন ডালমিয়া জৈন কোম্পানী। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্ত অনুসারে চলিতে রাজী হইয়া এই ব্যবসায় গ্রহণের পর যখন "ভারত" পত্রিকা কালোবাজারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে তখন ডালমিয়া তরফ হইতে তাহা বন্ধ রাখার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও নীতি বিরূপ সমালোচনায় বিরত থাকার অনুরোধ আসে। তাহা আমরা সকলেই ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করাতে ডালমিয়ার দল ক্ষুব্ধ হইয়া

পত্রিকা-পরিচালনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় খুঁজিতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়া উঠে। "ভারত" অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত দাঙ্গার বিবরণ প্রকাশ করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে স্বয়ং পরিচালনক্ষম হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে।

এই সময় মাখনবাবু ও কেদার কলিকাতায় সর্ব্বত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সে এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। এই সময় গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, দক্ষিণ কলিকাতার সহকারী কমিশনার শ্যামসুন্দোহা মুসলিম গুণ্ডাদের তলে তলে সাহায্য করিতেছেন, এবং হিন্দু প্রতিরোধকারীদের ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করিয়া এমন দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন যে, অবিলম্বে তাহার কার্য্যকে অকেজো করিতে না পারিলে হিন্দুগণ বিপন্ন হইবে। তখন আমাদের এক মন্ত্রণা-সভার বৈঠক হয় এবং স্থির হয় যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ কলিকাতার গঙ্গার ধারে দোহা যে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা সৎ উপায়ে নির্ম্মাণ সম্ভব নহে বলিয়া সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকারকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা হউক। তাহার ফলে শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ লিখিলেন "দোহার অট্টালিকা" নামক নিবন্ধ। উহা প্রকাশের পর সরকার হইতে দোহাকে হয় "ভারত"-এর বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দোষমুক্ত হইতে, নতুবা চাকুরী হইতে অবসর লইতে চাপ দেওয়া হয়। বাধ্য হইয়া দোহা মানহানির নালিশ রুজু করেন এবং আমি সম্পাদকরূপে ও রথীন সেন মুদ্রাকররূপে অভিযুক্ত হই। বিচারে আমরা বেকসুর খালাস পাই এবং দোহার সম্পর্কে আদালত তীব্র মন্তব্য করে। [illegible] পাকিস্তানে চলিয়া যায়।

কিন্তু এই মোকদ্দমা পরিচালনে ভারতের পক্ষে ছয় সাত হাজার টাকা ব্যয় হয়। চালামিয়া কোম্পানী [illegible] ব্যয় সহিতে নারাজ হইয়া ইহাকে অছিলা করিয়া "ভারত" পরিচালনে অস্বীকৃত হইয়া বিনা নোটিশে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। "ভারত" এই বিপর্য্যয়ের ফলে দ্বিতীয়বার বন্ধ হইল। এক্ষেত্রেও কেদারনাথ নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া সাহসিক সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ অনুরাগের পরিচয় দিয়াছে। দেশপ্রেমে দীপ্ত প্রবল বুদ্ধিশালী কেদারনাথের এরূপ অনেক কীর্ত্তিই প্রচার-বিমুখতার জন্য আজিও অজানা রহিয়াছে। এই প্রচারের যুগে যেখানে অতি সাধারণ শ্রেণীর সাংবাদিকও অত্যন্ত সাহসী ও কর্ম্মদক্ষরূপে প্রচারিত, সেখানে মাখনলাল ও কেদারনাথের মত নির্ভীক সত্যসন্ধ ও কর্ম্মদক্ষ সাংবাদিকের সঠিক কীর্ত্তির পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কেদারদা

চন্দন কবে বলে আমি সুগন্ধ? যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায় সেদিকেই সৌরভ বিরাজিত।

দর্শনমাত্রই মন শুদ্ধ হয়, স্নিগ্ধ হয় এমনি একটি সুবাসিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেদারদা। পুরুষের মধ্যে সুপুরুষ, কত সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ, সমস্ত দল-চাঁদার বাইরে, কিন্তু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় কত সহজে কি অনিবার্য মাধুর্যে, কেদারদা হয়ে উঠলেন। আজ কেদারদা আসেন নি? এম. সি. সরকারের দোকানে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটি খালি দেখলেই মন বিষণ্ণ হয়ে যেত—আজকের দিনের-শেষের শীতল শান্তি ও কল্যাণটি নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। দেশবিদেশের কত মানুষ ও মনীষীর কত ব্যক্তিগত কাহিনী তাঁর নখদর্পণে ছিল, কত ভিতরকার খবর তিনি জানতেন, বলতেন আর আমরা শুনতাম ও আনন্দিত হতাম। আর ভাবতাম এসব কাহিনী কেউ লিখে রাখে না, এমনিতরো চিত্তের প্রসাদ মিশিয়ে রাখে না অবিনশ্বর করে!

নিরভিমান, অনিন্দুক, অকপট বন্ধুবৎসল, সর্বোপরি ভগবদ্রসে ভরা, কেদারদার জীবনে সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছিল। জীবনোপন্যাসের সামান্য কটি পৃষ্ঠাই আর উলটোতে বাকি আছে, কিন্তু বাকি কোনো পৃষ্ঠায়ই এঁর সমতুল্য আর কোনো প্রতিচ্ছবির ছায়া পড়বে না।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিষ্টভাষী, সুপণ্ডিত ও সুপুরুষ কেদারনাথ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব পঁচিশ বৎসরের কম নহে। শেষের দশ-বার বৎসর প্রতিদিন ক্রমাগত তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে মেলামেশা হইত। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ছিল উচ্চ ধরনের; মহা সমুদ্রের ন্যায় নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের বিস্তৃতি ছিল—যাহা দেখিয়া আমরা সকলে বিস্মিত না হইয়া পারিতাম না। কোন বিষয়ে কখনো আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি অচিরাৎ সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, বিষয়টির সুমীমাংসা করিয়া দিতেন।

একালের এইরূপ মিষ্টভাষী, সুপণ্ডিত ও সুপুরুষ আমাদের দেশে খুব কমই দেখা গিয়াছে। ইঁহার পুণ্যশ্লোক পিতার ন্যায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্পষ্টবাদিতা, ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠাই ছিল ইঁহার আদর্শ। সেই আদর্শ তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা দুইখানির সাহায্যে শেষের দিন পর্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহাকে হারাইয়া আজ আমরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছি। একজন পরম আত্মীয়বিয়োগ ব্যথায় মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে এই কারণে যে, যাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি, তাহা আর কোন কিছুতেই পূরণ হইবার নহে।

ইঁহার কথা আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া, তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলাম।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

সৌম্যপুরুষ কেদারনাথ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বন্ধু-মহলে কেদারবাবু, কিংবা কেদারদা নামে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দৈনন্দিন সাহিত্যিক আসরে তাঁর উপস্থিতি সকলের অন্তরে বিশেষ আনন্দ সঞ্চার করত, কারণ, কেদারনাথের উপস্থিতির অঙ্গ এই যে সভার সকল প্রকার আলোচনার তিনি মধ্যমণি, সকল প্রকার তর্কে তাঁকেই আমরা মধ্যস্থ হিসাবে স্বীকার করতাম।

আলোচনার বিষয়বস্তুও অনেক, কোনদিন সিপাহী যুদ্ধ, কোনদিন এলাহাবাদের বাল্যজীবন, কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ভ্রমণের কাহিনী, কখনও বা গুরুতর রাজনৈতিক আলোচনা। সহজ সুন্দর ভঙ্গীতে অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন।

এই সৌম্য পুরুষটির খদ্দর-মণ্ডিত আকৃতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্রেক করত সকলের মনে। কিন্তু তিনি ভয়ের বস্তু নন, সকলের জন্য ছিল সুমধুর আশ্বাস। সকলের কর্মে তিনি উৎসাহ দান করতেন, দুর্গতের দুঃখমোচন করাই তাঁর ব্রত ছিল।

শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেও অম্লান বদনে কেদারনাথ বন্ধুজনের অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর ওপর তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় তাঁর দেখা এবং শোনার পরিধি ছিল সুদূর বিস্তারী। তাঁর সান্নিধ্যে এসে বাংলার সোনার অতীতের অনেক দুর্লভ কাহিনী শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে সরসতার এমন সমন্বয় আর কদাচ চোখে পড়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছেও যে প্রসন্নতা তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন তা ঈশ্বরের এক বিশেষ করুণা।

বিগত দশকের এক বিরল দৃষ্টান্তের অবসান ঘটল কেদারনাথের মৃত্যুতে। এই মহান মৃত্যুতে আমরা আজ শোক-বিহ্বল। কেদারনাথের পবিত্র আত্মার কল্যাণ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রণাম

আমার বেদনা জানি-ই আমি শুধু

অমানিশার রাতের মত গাঢ়—

কে দেয় সেথা প্রলেপ মধুর, কে আজ জ্বালে আলো!

জ্ঞানের বিভায়, রূপের আভায়

ঝলমল করা মুখ

পাশাপাশি বসে দশটি বছর

দেখিয়াছি অনিমিখ

আজ সেথা শুধু শূন্য কেদারা

নেই কো কেদারদা—

দিত যেবা দিশা হারানো পথের, ঘুচাত মনের কালো!

কত যে কাহিনী বিচিত্র তাঁর

প্রাত্যহিকের স্মৃতি

রাখা আছে ধরে শ্রদ্ধা-আখরে

ভোলবার সে তো নয়!

প্রণামের সাথে শুধু বলি আজ: যেথা আছ থাক ভাল!!

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এমন দিনে দাদার কথা বলতে হবে ভাবিনি কখনও। আজ মনে পড়ছে আমার মা গল্প করতেন দাদার জন্মের সময় মাতা ও শিশু দুজনেরই জীবনমরণ সমস্যা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের সর্দিগর্মি হবার অবস্থা হয়। তাঁর দুই হাত শিশুকে ঠাণ্ডা গরম করে বাঁচাতে ব্যস্ত, ইসারায় প্রাণকৃষ্ণবাবুকে বললেন ওঁর গায়ের জামা কেটে ফেলতে। প্রাণকৃষ্ণবাবু পিঠের দিক থেকে কাঁচি চালিয়ে ডাক্তারের কোট সার্ট গেঞ্জি কেটে ফেললেন। শিশু ক্রমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় হয়ে উঠল।

এই শিশুটি শৈশব থেকেই ফুলের মত সুন্দর ছিল। আমার বাবা মানুষকে সুন্দর ও কুৎসিত বলতে ভালবাসতেন না বেশী, তাই প্রায় বলতেন 'বুবা এত ভারী ছিল যে আমাদের প্রতিবেশী রাধিকা (?) বাবু বলতেন এ ছেলেকে Paris-এ exhibitonএ পাঠিয়ে দিন। বুবার একটি বাহন বালক ছিল, সে বুবাকে কোলে নিলেই বলত "হাত ভুখাতা হয়।"

বাবা তাঁর শিশুপুত্রকন্যাদের নিয়ে দেশ ছেড়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে চাকরী করতে যান। সেখানেই দাদার শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমার মা দাদাকে প্রথম বাংলা অক্ষর পরিচয় করান। ইংরেজী কার কাছে শিখেছিলেন মনে পড়ছে না, হয়ত মা-ই অক্ষর পরিচয় করিয়ে থাকবেন। আমি যখন ইংরেজী পড়তে জানতাম না তখনই দাদাকে বাবার বড় বড় এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে বসে থাকতে দেখতাম। বাবার সঙ্গে কোনো সাহেব-সুবো দেখা করতে এলে দাদা তাঁদের ইংরেজীতে বাবার খবর বলে দিতেন, এটা আমার মা সগৌরবে গল্প করতেন।

দাদার শৈশবে একবার এলাহাবাদ মাঘোৎসবে ব্যারিস্টার ভগবানদীন দুবে ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বোঝে কি না পরীক্ষা করবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করেন। দাদা ঠিক ঠিক উত্তর দেন। তাতে ভগবানদীন বলেন "য়্যাদ কর লিয়া"। (অর্থাৎ উত্তরগুলি মুখস্থ করে রেখেছে।)

সেকালে বোধহয় Review of Reviews office থেকে Books for the Bairns নামক কতকগুলি শিশু-পাঠ্য সচিত্র বই প্রকাশিত হয়। বাবা খবর পাবামাত্র সেই বই এক বাক্স আনিয়ে ফেলেন। আমরা তখন বিশেষ পড়তে পারতাম না। দাদা সব বইগুলি পড়লেন। ছবি দেখে ও গল্প শুনে আমরা সে সব গল্প মুখস্থ করে ফেলেছিলাম।

ছেলেবেলায় দাদা খুব কম কথা বলতেন। চুপচাপ বই পড়া অথবা পাইচারি করা এই দুটি তাঁর প্রিয় কাজ ছিল। জ্বর বা অন্য কোন অসুখ হলে দাদা খাটে চুপ করে শুয়ে থাকতেন। ছোট ছেলে হলেও কোনো আব্দার বা অনুযোগ করতেন না। পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি ছাড়া আর কিছু নড়তে দেখা যেত না। কোনো কোনো মানুষের কাছে তিনি তাঁর মনের কথা সব বলতেন। এই রকম একজন ছিলেন মোহিনীদিদি, ইন্দুভূষণ রায়ের কন্যা। অসুখবিসুখে পরকে বিব্রত না করার স্বভাব দাদার কোনো দিন যায় নি। তিনি কারুর কাছে সেবা চাইতেন না। কোন বিলাসিতাও তাঁর ছিল না। ছেলেবেলায় শুধু বই মাথায় দিয়ে কত সময় বারান্দায় ঘুমোতেন।

এত কম কথা বললেও দাদার ছেলেবেলা থেকেই খুব রসবোধ ছিল। তাঁর একটা "অতি গোপনীয় খাতা" ছিল। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত "ইহা কেহ খুলিবেন না, বা পড়িবেন না।" এই খাতাতে তাঁর স্বরচিত নানা হাসির গল্প থাকত। মজার গল্প মনে করে নিজের মনে মৃদু হাস্য করা তাঁর স্বভাব ছিল। সে হাসির অংশীদার দরকার হত না।

দাদা প্রথম এলাহাবাদের অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে পড়তেন। নেপালচন্দ্র রায় সেখানে হেডমাষ্টার

ছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব সখ্যতা ছিল। তিনি দাদাদের বলতেন, 'তোমরা যদি আমার পরে স্কুলে পৌঁছাও ত তোমাদের late mark করে দেব।' দাদারা নেপালবাবুর সঙ্গে race দিয়ে স্কুলের পথে দৌড়তেন।

এই স্কুল থেকে পাশ করার সময় দাদা একটা সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা তিনটি ভাষাতেই তাঁর বেশ দখল ছিল। অল্প বয়সে তাঁকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য বাবা একজন পণ্ডিত রেখেছিলেন। দাদা সারাদিন "মেঘদূত" মুখস্থ বলতেন মনে আছে। শুনে শুনে আমাদেরও অনেকটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

চিরকালই দাদা খুব সাদা-সিধা ছিলেন। সামান্য যা পোষাক-আষাক দেওয়া হত তার বেশী কখন চাইতেন না, খাবার জন্য নানারকম ফরমাস করতেন না। মিষ্টান্ন ভালবাসতেন, সেইটি ছাড়া আর কিছু চাইতে দেখতাম না। দাদা বিলাতে পড়তে যাবার সময় প্রথম দেখলাম তার জন্য ভাল করে অনেক কাপড়-চোপড় করা হচ্ছে। তাও সৌখীন কিছু নয়।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দাদা সঙ্গে একটা খুব ভাল tea-set এনেছিলেন। আমাদের বাড়ীতে তখন কেউ চা খেতেন না। কাজেই ভৃত্যদের চায়ের বাসনের অভ্যাস ছিল না। তারা যেমন-তেমন করে ব্যবহার করে পেয়ালাগুলি ভেঙ্গে ফেলল। দাদা কিন্তু তাদের কিছুই বললেন না। তখন চাদানি আর চিনি-দানিগুলি আমি লুকিয়ে রাখলাম। সেগুলি বোধহয় আজও দাদার বাড়ীতে আছে। দাদা যৌবনকালে অনাত্মীয় বা আত্মীয় নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দিতে ভালবাসতেন। এমনি ২।১ জন দাদার আশ্রয়ে বহুদিন ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর বন্ধু সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁরা তাঁকে নিজের বাড়ীর ছেলের মতই ভালবাসতেন। অনেকে কিছু না একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিতেন।

বিলাতে থাকতে যুদ্ধের সময় হিন্দীভাষী সৈন্যদের দাদা অনেক সাহায্য করেছিলেন। হিন্দী খুব ভাল বলতে পারতেন। বিলাতে Kent-এ একটি ammunitions factoryতে ম্যানেজারের কাজও করেছিলেন।

আশ্চর্য্য সুন্দর চেহারার জন্য কলকাতায় দাদার খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু তিনি চেহারার প্রশংসা শুনলে চটে যেতেন। ছবি সংগ্রহ করার এত সখ তাঁর ছিল, কত ছবিই সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু নিজের ছবি করাবার খেয়াল কখনও হয় নি। বিলাত থেকে ফেরার পর আকস্মিকভাবে ২।৪ জন যা ছবি তুলেছিলেন তাই তাঁর সব ছবি।

দাদা যদিও সাত বৎসর বিলাতে ছিলেন এবং London থেকে B.Sc ও A. R. C. S. পাশ করেছিলেন। তবু বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরও তাঁর কতকগুলি সেকেলে বাঙালী ধরন ছিল। তিনি ছোটবোন বা ছোট-ভাই-এর স্ত্রী এদের সঙ্গে খুব কম কথা বলতেন। ঠাকুরবাড়ীতে যেমন গল্প আছে যে মহর্ষির সামনে ছেলেদের জোব্বা পরে ছাড়া যাওয়া নিয়ম ছিল না, তেমনি দাদার সামনে আমাদের একটা গাম্ভীর্য্যের মুখোস না পরে যাওয়া চলত না। দেখা হলে সকলের কুশল প্রশ্ন গম্ভীর মুখে করে নিজের একটা কোণে গিয়ে ঢুকে পড়তেন।

শিল্প সংগ্রহের উপর তাঁর অদ্ভুত ঝোঁক ছিল। কাংড়া, পারস্য ও মোগল ছবি, পারস্যের কার্পেট, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, অজন্টার ছবির রঙীন প্রতিলিপি, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্রের ছবি, পুরাতন কাশ্মীরী শাল, মীনার কাজের গহনা, পারস্য দেশের silk-এর ওড়না বা পাগড়ি, নূরজাহানের সময়ের ব্রোকেডের কাঁথা, হাতীর দাঁতের উপর আঁকা ছবি, ইত্যাদি বহু দুষ্প্রাপ্য জিনিষ তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

দাদা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। ১৫।১৬ বছর বয়স থেকেই পাড়ার শিশুদের কোলে করে বেড়ানো তাঁর একটা আনন্দ ছিল। অনেক ছোট ছেলে সাত পাড়া পেরিয়ে জানালা ধরে তাঁকে ডাকাডাকি করত। কাছে আসতে পারত না বলে। পরে তিনি ছোটদের জন্য অনেক গল্প লেখেন। নিজের নাতিনাতনী এবং আত্মীয়দের

নাতিনাতনীদের গল্প বলবার সময় তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মুখোস খসে পড়ত। শিশুদের মাথায় কাঁধে তুলে নিতেন, হো হো করে হাসতেন।

দাদার শরীরের কাঠামো অদ্ভুত শক্ত ছিল। বাল্যে ও যৌবনে দার্জ্জিলিং থেকে টাইগার হিল রঙিৎ তিস্তা, সন্দকফু ইত্যাদি হেঁটে চলে যাওয়া তাঁর কাছে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। দার্জ্জিলিং থেকে কার্সিয়াঙ বা আরো দূরে ত তিনি এবেলা ওবেলা যেতেন। এগুলি সকলের হাসির গল্প ছিল। একবার দার্জ্জিলিঙের রেল-লাইন বহু দূর খসে যাবার সময় অজিত চক্রবর্ত্তী পীড়িত অবস্থায় ট্রেণে যাচ্ছিলেন। দাদা অল্প বয়সের ছেলে, কিন্তু তিনি অজিতবাবুকে পিঠে করে পাহাড় বেয়ে তাঁকে পরের ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন।

পোষাকে-আষাকে স্বাদেশিকতা রক্ষা তিনি চিরদিন করেছেন। বেশীর ভাগ সময় খদ্দরের পাঞ্জাবী পরাই তাঁর নিয়ম ছিল। দাদাকে সাহেবী পোষাক পরতে আমি বিশেষ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দাদা বন্ধুবৎসল ছিলেন, বিদেশে বেড়াতে গেলে প্রিয় বন্ধুদের জন্য জিনিষ আনতেন, কোন কোন জিনিষ আমি দেখেছি। তাঁদের বন্ধুসভায় তাঁর বহু গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন।

পরশুরাম বা রাজশেখর বসু যদিও দাদার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি দাদার রসবোধ খুব উপভোগ করতেন। তাঁর কোন কোন লেখায় কেদার চাটুয্যের কথা আছে। হাস্যরসিক সুকুমার রায়ও তাঁর প্রিয় "তাতাদাদা" ছিলেন এবং রসিকতার সমঝদার ছিলেন।

দাদা মুখে প্রকাশ না করলেও পিতৃবৎসল ছিলেন। বাবার জীবনের যখন আর কোন আশা ছিল না, তখনও বাবা মনে করতেন হাঁটতে না পারলেও তিনি Wheel chair-এ করে বেড়াতে পারবেন। দাদা Wheel chair করাবার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি বলেছিলাম, "বাবা ত বসতে পারেন না।" দাদা বললেন, "তা হোক, বাবা চাইছেন, করে আনতেই হবে।" পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের পর দাদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে ৫০০০৲ টাকা বক্তৃতার জন্য দিয়েছিলেন।

শিশুকাল থেকে বই পড়া বাতিকের জন্য দাদার বহু বিষয়ে জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু সাহিত্য, শিল্পকলা, অলঙ্কার, মণিমুক্তা, বিদেশী রাজনীতি, সাংবাদিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁর অনেক লেখা প্রবাসী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় আছে। এরকম কোন বিষয়ে লিখতে বসলে ভাসা ভাসা লেখা তিনি পছন্দ করতেন না, খেটে নানা তথ্য সংগ্রহ করে লিখতেন। 'ভারত' পত্রিকায় তিনি মাখনলাল সেন মহাশয়ের একজন উপযুক্ত সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁর বিষয়ে যুগবাণী লেখেন যে কেদারবাবু ঢাকায় ডেপুটি হাই কমিশনরের কাজে আহূত হয়েও যান নি, কাগজের ক্ষতি হবে বলে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাও দিতেন।

অনেকে হয়ত জানেন না যে গানের গলা দাদার আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল। কিন্তু তিনি অনেক বিষয়ে যেমন উদাসীন ছিলেন, এ বিষয়েও তেমনি উদাসীন ছিলেন। গান শিখতে বা কোন প্রকাশ্যস্থানে গান করতে তাঁকে আমি দেখিনি। স্নানের ঘরে ঢুকলে উচ্চকণ্ঠে গান করা দাদার ছেলেবেলার এবং যৌবনকালের অভ্যাস ছিল। ইউরোপীয় গান তাঁর গলায় ভারী ভাল শোনাত। তাঁর গানের কোন record আছে কি না জানি না। থাকলে তা রাখবার যোগ্য। মানুষ জীবনে কত অপূর্ণ ইচ্ছা রেখে চলে যায়, কে তার সন্ধান রাখে? রাখলেও মানুষের সাধ্য ত নেই সেই বিদেহীকে তৃপ্তি দেবার। দাদার ইচ্ছা ছিল পিতৃদেবের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব করবার। হাসপাতালে চলে যাবার আগে পর্য্যন্ত নিজের হাতে বাক্স নামিয়ে কত জিনিষের সন্ধান করছিলেন প্রদর্শনীতে দেবেন বলে। খুঁজে পেলেন না। কিন্তু পৃথিবীর বন্ধন যখন ছিন্ন হয়ে গেল তখন তাঁর হারানো জিনিষগুলি আপনি দেখা দিল। বিধাতা তাঁর অবিনশ্বর আত্মাকে চিরশান্তি ও তৃপ্তি দিন।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

শান্তা দেবী

পিতৃস্মৃতি

ব্রাহ্ম-সমাজে আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ জীবনী-পাঠ। সাধারণতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা অর্থাৎ সন্তান এই কাজটি করে থাকেন। আমাদের পিতৃদেব শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবনী লেখার পক্ষে আমরা নিজেদের নিতান্তই অযোগ্য মনে করি। সেই জন্য আমাদের পূজনীয়া বড় পিসিমা শ্রীমতী শান্তা দেবী এই জীবনী লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পিতৃদেবের বাল্যকাল ও যৌবন-কালের কথা যা লিখে দিয়েছেন আমি তা আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনালাম। পিতৃস্মৃতি যে কোন সন্তানের কাছে এক অমূল্য সম্পদ, তাই আমি সেই স্মৃতি-ভাণ্ডারের সামান্য কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। লেখা ও পড়ার ভাষা ও ভঙ্গীতে নানা দোষ ত্রুটি হয়ত থাকবে, তার জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পিতামাতা গুরুজন, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়, আদেশ পালন করতে হয় কোনও প্রশ্ন না করে। আমাদের পিতাকে আমরা আজীবন শ্রদ্ধা করেছি, কারণ তিনি পরমশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর আদেশও নিশ্চয়ই পালন করতাম, কিন্তু তিনি আমাদের কখনও আদেশ করেন নি কোনও বিষয়ে। তা ছাড়া কোন ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহ থাকলে বা প্রশ্ন জেগে উঠলে তিনি সব সময়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন। সুতরাং আদেশের মূল সব কারণ সময়ে পরিষ্কার হয়ে যেত আমাদের কাছে। পরে বড় হয়ে নানান কথা আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের যাতে বিচার করবার মত বুদ্ধি হয় এই তিনি সর্ব্বদা চাইতেন। আসল কথা, বাবার সঙ্গে আমাদের বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল। কোনদিনই তাঁকে রাশভারী বলে মনে হয়নি। কোনদিনই তাঁকে আমরা ভীতির চোখে দেখিনি, বাবা কোনদিনই আমাদের বাড়ীর শাসন-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন না। আমরা চার বোন নানা রকম দুষ্টুমি করতাম, এসব ব্যাপারে মাকেই হস্তক্ষেপ করতে হ'ত, কারণ বাবা আমাদের কখনও বকতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা জানতাম যে বাবা যখন অবশেষে কিছু বলবেন তখন শুনতেই হবে, তখন আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকত না।

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা বেশীর ভাগ সময় কলকাতাতেই থাকতাম। তখন বাড়ীতে অনেক লোকজন। আমাদের পূজনীয় ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, কাকা, কাকিমা, খুড়তুত বোনেরা সবাই একই বাড়ীতে থাকতাম; পিসিমারা প্রায়ই আসতেন মেয়েদের নিয়ে। বাড়ীর আবহাওয়া খুব জমজমাট ছিল। ছেলেবেলায় দিনগুলি খুবই আনন্দে কেটেছিল। সে সব দিনের স্মৃতি চিরকাল মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তার মধ্যে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের পরিবারে পুত্র সন্তান কেউ ছিল না; আমরা মামাত-পিসতুত বারটি বোন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুরদাদা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিরকাল বলতেন যে ভারতবর্ষের উন্নতি হবে তখন, যখন সে নারীকে সমাজে তার প্রকৃত স্থান দিতে শিখবে। সেই জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেছিলেন নানান দিক থেকে ভারত-নারীর দুঃখ ঘুচাবার, তার উন্নতি, তার শিক্ষা, তার প্রগতি, তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার। এসব মতামত ঠাকুরদাদা শুধু কাগজে-কলমেই লিখতেন না, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তাঁর নিজের সংসারে। এবং

কুর এই অভিমত আমার বাবাও চিরদিন সমর্থন করেছেন। সুতরাং খুব ছোটবেলা থেকেই আমরা সবাই জানতাম যে আমাদের বাড়ীতে মেয়েদের খুব বেশী আদর। সাধারণতঃ আমাদের দেশে বাড়ীর ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে-সব প্রভেদ করা হয় তা আমাদের পরিবারে করা হয় নি। বাড়ীর বাইরে গেলে মাঝে মাঝে অন্য লোকের আক্ষেপ শুনতাম বটে, "আহা রামানন্দবাবুর একটিও নাতি নেই!" বাড়ীতে আমাদের কোনদিনও এই বিলাপ শুনতে হয় নি, কথাটা খেয়ালও করি নি অনেক বড় না হওয়া পর্যন্ত। আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে বাবা কাকা কেউই কোন ত্রুটি করেন নি। পুত্র-সন্তানের জন্য লোকে যত চিন্তা, চেষ্টা ও যত্ন করে, তাই আমাদের কন্যা কয়টির জন্য করা হয়েছিল। "কন্যাদায়" শব্দটি আমাদের বাড়ীতে কখনও শুনিনি।

এছাড়া, বাবার অন্য অনেক বিষয়ে সখ ছিল। তিনি চাইতেন আমরা দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাই। তাই যেমন আমরা রামায়ণ, মহাভারত, দেশী রূপকথা প্রভৃতি পড়তাম তেমনি অন্যান্য দেশের রূপকথা, শিশু-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য ইত্যাদিরও স্বাদ পাবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম। বাবা আমাদের জন্য প্রায়ই নানা রকম সুন্দর বই এনে দিতেন আমাদের কৌতূহল বাড়াবার জন্য। তা ছাড়া গল্প বলে শোনাতেন। ছেলেবেলায় মনে পড়ে বাবার সঙ্গে সারাদিনের মধ্যে বেশী দেখা হ'ত না, তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে প্রায়ই সহরের বাইরেও যেতে হ'ত। কিছুদিন তিনি খনি সংক্রান্ত কাজ করেছিলেন। Geological Survey of India-র সঙ্গে খনির কাজ দেখার জন্য তাঁকে মধ্যপ্রদেশে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। সেখানে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে থাকতে হ'ত, কাজেই বাঘের ডাক শুনতে পেতেন। এসব অভিজ্ঞতার গল্প আমরা অবাক হয়ে তাঁর কাছে শুনতাম। মহেঞ্জোদাড়ো, হারাপ্পা, তক্ষশীলা—এসব পুরাকীর্তির গল্প আমাদের বলতেন আর সে সব জায়গার ছবি, জিনিষপত্র প্রভৃতি আমাদের দেখাতেন। ফটোগ্রাফিতে বাবার খুবই উৎসাহ ছিল। ছেলেবেলায় বাবার তোলা ছবির ভেতর দিয়ে নানান অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের জীবনধারার বৈচিত্র্য, সুন্দর শিল্প ও ভাস্কর্যের পরিচয় পেয়েছি। তাঁর গল্পের ভঙ্গীতে সেই সব ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত। সারাদিন খাটুনির পরও আমাদের আবদার "বাবি শীগ্‌গির গল্প বল, না হলে ঘুমোব না" বরাবর রক্ষা করেছেন।" এ-অত্যাচার বৃদ্ধ বয়সেও খুব আনন্দিত মনেই সহ্য করেছেন, নাতি-নাতনীদের জন্যে। বাবার মত গল্প বলতে খুব কম লোকই পারতেন। তিনি সত্যিকারের মজলিসি লোক ছিলেন—ছোট বড় সবারই সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন। এরকম লোক সাধারণতঃ লঘু প্রকৃতির হন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বাবার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্যও ছিল, যার জন্য অনেককে বলতে শুনেছি যে চেহারার মতনই তাঁর চরিত্রও ছিল ঋষিতুল্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন চারু ও কারু শিল্পের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। নিজে চেষ্টা করে তিনি সে জ্ঞান অর্জন করেন। মোগল ও রাজপুত চিত্রকলা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অলঙ্কার, দু'শ তিনশ' বছরের পুরোণো কাশ্মীরী শাল, নানান এলাকার পোষাক, লোক-শিল্প, এসব বিষয়ে তিনি যথেষ্ট জানতেন আর অনেক নমুনা নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন। এসব জিনিষের আসল ও নকল, খাঁটি ও মেকি, তিনি সহজেই ধরতে পারতেন। বোধহয় মানুষের ক্ষেত্রেও তা বুঝতে পারতেন। একবার যাঁকে বন্ধু বলে মনে করেছেন চিরদিনই তাঁর বন্ধু থেকেছেন। গান বাজনা সম্বন্ধেও বাবার গভীর অনুরাগ ছিল। মা সুন্দর গাইতেন তা সবাই জানেন। কিন্তু সবাই হয়ত জানেন না যে বাবাও খুব সুন্দর গান করতেন—তাঁর গলা ছিল দরাজ। পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই গাইতেন। আমরা যাতে দেশী বিদেশী সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখি এ বিষয়ে মার সঙ্গে বাবারও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং আমাদের বাড়ীতে বরাবরই গানের সুর দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য সুরের সঙ্গে পাল্লা দিত।

ছেলেবেলায় দেখতাম আমাদের বাড়ীতে দেশ বিদেশের লোক আসতেন ঠাকুরদাদা ও বাবার কাছে। তাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা লেখক, কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত থাকতেন। আমরা খুব ছোট বেলাতেই তাঁদের

সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। বাড়ীতে নানান দেশের মনীষীর সমাবেশ হয়েছে—হাসি গল্প আলোচনা সবকিছু মিলে আবহাওয়া ভরপূর হয়ে থাকত। Press Conference জাতীয় ব্যাপারও আমাদের বাড়ীতে বসত। এসব সময়ে বাবা দেশী প্রথা মতই ভোজনের আয়োজন করতেন। অনেক অনুষ্ঠানে আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবেশন ইত্যাদি করেছি। মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ ও আমেরিকান Consript Armyর সৈন্য হিসাবে অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক, লেখক, শিল্পী ও চিন্তাশীল মনীষী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়। তাঁরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন ও বাবার সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। কলকাতা সহরে ইদানিং এই ধরনের লোক যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বাবার পরিচয় হত ও উভয় পক্ষ এরকম আলোচনাতে আনন্দও পেতেন। আমাদের ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর বাবা খুব বেশী কলকাতার বাইরে যেতে পারতেন না। তবে তিনি কখনও কখনও সরকারী বা অন্য কোন কমিটির সভ্য হিসেবে দিল্লী যেতেন। তিনি পুনর্বাসন, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদির কাজে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কিছুর ওপরে ছিল তাঁর অতি প্রিয় "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ", যার জন্য তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন, তাঁর স্বনামধন্য পিতার আদর্শ সামনে রেখে।

বাবা ছিলেন বহুগুণে ভূষিত গুণী। তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র, অপূর্ব। এই জীবনের বর্ণনা দিতে গেলে কথা শেষ হয় না। তাঁর কাছ থেকে আমরা যা লাভ করেছি সে ঋণ সত্যই কখনও শোধ করা যাবে না। তাঁর আদর্শ যেন আমাদের জীবন-পথে আলোকপাত করে পথ-প্রদর্শক হতে পারে এই প্রার্থনা করি। তিনি আমাদের জীবন আনন্দময় করেছিলেন। পার্থিব সব পরিশ্রমের শেষে তাঁর পবিত্র আত্মা শান্তিলাভ করুক, তিনি আনন্দলোকে বিরাজ করুন, এই প্রার্থনা দ্বারা আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজ স্বর্গীয় পিতৃদেবকে প্রণাম জানাই।

ইষিতা দত্ত

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

কেদার কাকা

আজকে যাঁর বিষয় লিখছি তিনি ছিলেন আমাদের একান্ত প্রিয়জন। প্রিয়জন সম্বন্ধে কিছু বলা বড় কঠিন। তাঁর বিষয় আমার মনের যা কথা তা বলতে বাধা প্রতিপদে। পাছে কেউ ভাবেন নিজের জন বলেই বুঝি এত কথা 'বলছি। আমার শিশুজীবনে কেদার কাকাকে আমি বড় বেশী দেখিনি। মধ্যে মধ্যে রামানন্দ ঠাকুরদা আমাদের বাড়ী যেতেন। তিনি যে আমার ঠাকুরদার সহোদর ভাই ছিলেন না, আমরা তা জানতুম না। বাবা ও মা তাঁকে কাকামশাই বলে উল্লেখ করতেন, তাঁর ব্যবহারও ছিল পরমাত্মীয়ের মতই।

প্রায়ই কেদার কাকার কথা শুনতুম বাবার মুখে। বাবা কিন্তু কখন শুধু কেদার বলে তাঁকে উল্লেখ করতেন না, বলতেন, 'আমাদের কেদার'। এই আমাদের শব্দটির ওপর যেন জোর দিতেন একটা। কিন্তু সে ডাক যে অহেতুক নয় তা বুঝেছিলুম আমার পিতৃদেবের মহা-প্রয়াণের পর। কাকার সেদিনের মমতাভরা প্রতিটি কথা আজো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন বুঝেছিলুম কেন বাবা 'আমাদের কেদার' বলে উল্লেখ করতেন। এর পর থেকে দিনে দিনে কাকা আমার আরো কাছে এসেছিলেন। আমাদের অসুখ-বিসুখের সময়, মেয়ের বিয়ের সময় তাঁর সে কি গভীর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি, তার স্থান বলে শেষ হবার নয়। শত কাজের মধ্যেও আমার সামান্য তুচ্ছ কোন কথা তিনি কখনো তুচ্ছ মনে করেন নি।

সামান্য দুটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার কন্যা তপতীর বিয়ে। আমি হৃদরোগে শয্যাগত। আমার স্বামী আর বড় মেয়ে নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছেন। অনেক ঘুরে গেলেন কেদার কাকার বাড়ী। কাকা সেখান থেকেই ওঁকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে "পুষ্প শুয়ে, তুমিও যদি এভাবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়ো বিয়ে ত বন্ধ হয়ে যাবে। সোজা বাড়ী ফিরে যাও। ডাকে চিঠি পাঠাও, সবাই তোমাদের ভালবাসে, সবাই আসবে।"

তাঁর কথা শিরোধার্য্য করে আমার স্বামী বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। এত বড় হৃদয় পায় কজন? আর একটি ঘটনা আমার দৌহিত্র হৃষিকেশের উপনয়ন উপলক্ষে—ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মশাই ভীষ্ম-চরিত্র পাঠ করছেন। পাঠের মধ্যে কয়েকজন মহিলার কথাবার্ত্তা ও যাতায়াত অধ্যাপক মহাশয় রুষ্ট হয়ে পাঠ বন্ধ করেন ও সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হন। আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করি। হঠাৎ পিঠে হাত দিয়ে কেদার কাকা আমায় সরিয়ে দিয়ে নিজে দরজায় বসে

পড়ে তাঁকে আটকান। কাকার এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে চক্রবর্তী মশাই যে কেবল পাঠই শেষ করলেন তা নয়, শান্ত হয়ে জলযোগও করেন। সেদিন কাকার মধ্যে বাবাকেই আমি দেখেছিলুম।

উপনিষদের একটি কথা বলে আমার কথা শেষ করছি।······যে নদী কিছু ধরে রাখে না দুই কূলে মঙ্গল পরিবেশন করতে করতে সে তার সবকিছু সমর্পণ করবার জন্য আনন্দ গর্জ্জনে সাগর-সঙ্গমে চলেছে, তার ক্ষয় নেই, তার মৃত্যু নেই। এই জন্যই সে অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। সে যদি তার সব-কিছু ধরে রেখে দিত তাহলে শুখিয়ে যেত তার ধারা। ভয়াবহ মৃত্যুর বালুকা শয়নে শেষ হয়ে যেত তার সকল ভাল মন্দ। কোথায় থাকত তার মঙ্গল কাজ, তাই মানুষকেও ধরে রাখলে চলবে না, ব্রহ্মে সব কিছু অর্পণ করতে করতে অবিরাম মঙ্গল কাজ করতে করতে তাকে যেতে হবে ব্রহ্ম-সঙ্গমে। তাহলে তার ক্ষয় নেই, তাহলে তার ভয় নেই, তাহলে তার মৃত্যু হবে না। অমৃতাস্তে ভবন্তি। একেই বলে অমৃত হওয়া।

মহাযাত্রা শুরু হয়েছে—স্বজনের কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। মৃত্যুর দিকে নির্ভয়ে মুখ ফেরানো। মৃত্যু প্রণাম করে বললো—আমি তোমায় বাধা দেব না, কেননা তুমি জেনেছ যা জানবার, ভয় দেখাব না কেননা তুমি পেয়েছ ব্রহ্মের আনন্দ। শুধু আমার হাত ধর, আমি তোমায় পার করে দেব—মৃত্যুং তীর্ত্বা উপনিষদের এই কথার, বিশেষ করে এই তীর্ত্বা কথাটির, সঙ্কেত হল, আদর্শ মানুষকে মৃত্যু আর আটকে রাখবে না, সে তাকে অমৃতের কূলে পার করে দেবে। আজকের দুঃখের ঝঞ্ঝা দেখে আমরা হতাশ হচ্ছি কেন? সে যে অমৃতেরই আগমন-ধ্বনি এনেছে। দুই বিদ্যুতের মিলন যত ক্ষিপ্রতর হবে ততই বাড়বে তাদের টান। বজ্রের গর্জ্জন শুনে ভয় কেন? সে যে বিচ্ছেদকেই চূরমার করে ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে গেল। অনন্ত সঙ্গমও এমনি। অনন্তের যাত্রী আজ আনন্দের ভৈরব গর্জ্জনে মহামিলনে চলেছেন। মৃত্যুর নিষ্ফল স্বপ্ন কেটে গিয়েছে নমস্কারে, উপস্থিত বন্দনা গান ধ্বনিত হচ্ছে তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

শ্রীপুষ্প দেবী

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কৃষ্ণ-সুদাম।
শিল্পী : নন্দলাল বসু

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭২

পঞ্চম সংখ্যা

খাদ্য ও শিক্ষা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গ্রামের লোকের ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় শহরে বা কারখানা কেন্দ্রে চলিয়া আসিবার চেষ্টার ফলে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইতে সুরু করে। ভারত সরকার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা না করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিবার পন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্যা আরও প্রকট করিয়া তুলিলেন। কারণ বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করা বিদেশে অর্জ্জিত অর্থের উপর নির্ভর করে। বিদেশে অর্থ অর্জ্জন করা শুধু মাল রপ্তানি করিয়া বা কর্জ্জ করিয়াই হইতে পারে। রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে পারিত যদি ভারত অপর দেশে পাঠাইবার উপযুক্ত মাল ক্রমান্বয়ে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও বিদেশে কর্জ্জের পর কর্জ্জ করিয়াও ভারতের দ্রব্য উৎপাদন পরিকল্পনাগুলি কল্পনার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবে অবতীর্ণ হইতে বিশেষরূপে সক্ষম হইতে পারে নাই। ফলে ভারতের বিদেশী অর্থ উপার্জ্জন ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করে নাই। তাই আজ রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদিগের মধ্যে চাষ করা সম্বন্ধে এক নূতন আবেগ জাগ্রত হইতে দেখা যাইতেছে। এই আবেগ বহুপূর্ব্বে জাগ্রত হইলে ভারতের আজ যে প্রায় দেউলিয়া অবস্থা; তাহা হইত না। ফরাসী বিপ্লবের পরে জননেতা দাঁতঁ বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সেই বাণী তাঁহার মূর্ত্তির উপরে খোদাই করা রহিয়াছে, যে খাদ্য দেশবাসীর প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস ও তাহার পরেই প্রয়োজন শিক্ষার। তাঁহার এই বাণী ভারতীয় জননেতা-দিগের মর্ম্মে স্থান পায় নাই, কারণ দেখা যায় যে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ ঐ দুইটি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভব করেন নাই। ব্রিটিশ আমলের মহাদুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যমূল্য যাহা হইয়াছিল আজ আঠার বৎসর স্বাধীনতা উপভোগ করিবার পরে খাদ্যমূল্য তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। এবং মূল্য দিলেও জিনিস পাওয়া যায় না। শিক্ষার পথেও অন্তরায় অন্তহীন। স্কুল কলেজে বহু উচ্চ বেতন দিয়াও স্থান পাওয়া যায় না। স্থান পাইলেও পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় না। বিদেশে গমন করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ অসম্ভব। এবং দেশেও শিক্ষার আভিজাত্য এবং ইজ্জত আর নাই বলিলেও চলে।

খাদ্য উৎপাদন এতই অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সর্ব্বত্র সকল লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত যতটা খাদ্য প্রয়োজন ততটা উৎপাদন কিছুতেই হইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। মাথাপিছু ১২ আউন্স চাল-আটা দিলে তাহাতে মানুষ বাঁচিবে না। এবং বহু ক্ষেত্রে সে পরিমাণ খাদ্যও পাওয়া যাইতেছে না। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সরবরাহ নাই বলিলেই চলে এবং পাওয়া যাইলে মূল্য এত অধিক যে, কাহারও কিনিবার ক্ষমতা হয় না। শুধু চাল-ডাল-আটা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইলেও তাহার মূল্য অধিকাংশ ভারতীয় সাধারণের আয়ের তুলনায় অত্যধিক। এরূপ অবস্থায় আমরা প্রায় না খাইয়া মরিবার অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। এখন একমাত্র উপায় খাদ্য উৎপাদন যেন-তেন-প্রকারে—অপর সকল কথা ও কল্পনা ভুলিয়া—বাড়াইয়া চলা; যাহাতে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে খাদ্যবস্তুর মূল্য কমিয়া যায়। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কিংবা আরবের সহিত বন্ধুত্ব প্রভৃতি যে সকল মহান্ চিন্তা

আমাদিগের গুরুগোষ্ঠীর পাণ্ডাদিগের মস্তিষ্কে সদাসর্ব্বদা গজগজ করিতে থাকে সে সকল চিন্তা এখন বহু বৎসর ভুলিয়া থাকা আবশ্যক। লোকে যে দেশে খাইতে পায় না, রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ঔষধ পায় না এবং যে দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হয় না, উপযুক্ত বাসস্থান ও রাস্তাঘাট অধিক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না—সে দেশের রাষ্ট্রনেতাদিগের অপর দেশে গিয়া বক্তৃতা দেওয়া নির্লজ্জতা ব্যতীত আর কিছু নহে। ইংরেজীতে বলে "পরোপকার নিজগৃহে আরম্ভ করাই বাঞ্ছনীয়"। বাংলায় বলে "আপনি বাঁচলে চাচার নাম"। সুবুদ্ধিতে বলে "ঘর সামলাও"। ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদিগের এক অতি বড় দোষ যে তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মসম্ভ্রমপ্রবল জাতীয়তা-বোধ নাই। নিজ জাতির পরিস্থিতি কি করিয়া শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হয় সে বোধ ভারতীয় জননেতাদিগের মধ্যে আজকাল দেখা যায় না। কি "ডাইনে", কি "বাঁয়ে" উভয় দিকের নেতাগণ শুধু অপরের দুঃখে কাতর, অপরের গুণে মুগ্ধ ও পর উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল। দলে দলে বিদেশে যাইয়া জগতবাসীকে ভারতের চরিত্রের দারিদ্র্য ভাল করিয়া দেখাইয়া দিতে সকলেই ব্যাগ্র। এ অবস্থায় ভারতের কোন প্রকার উন্নতি হওয়াই সম্ভব নয়। অবশ্য চাষা, জেলে কিংবা গোয়ালাদিগের মধ্যে এই সকল দোষ এখনও দেখা যায় নাই। তাহাদিগকে উৎসাহ দিলে তাহারা খাদ্য সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে পারিবে বলিয়া আশা হয়।

সুব্যবস্থাচালিত সমাজ

মানব সমাজ যদি যন্ত্রের মত সুব্যবস্থাচালিত হইত ও পরিচালকদিগের মতলব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবে ফলপ্রসূ হইত তাহা হইলে সমাজের সকল দুঃখ ক্রমশঃ দূর হইয়া মানব জীবন আরও অনেক আনন্দের আকর হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাহা হয় না; কারণ মানব সমাজ যন্ত্র নহে, মানব নিজেও যন্ত্রের ন্যায় না চলিয়া ইচ্ছামত চলিয়া থাকে, এবং যন্ত্রের কলকব্জার যত বিকার সম্ভব, মানবের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিকার দোষ ও ব্যাধি লক্ষিত হয়। এই সকল কারণে মানব সমাজ নিত্যনূতন দুঃখের আক্রমণে পরিশ্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে এবং তাহার প্রতিকার অতি সাধারণ ও স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের দেশ-নেতাগণ সমাজে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগের সকল প্রচেষ্টাই যেরূপ বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের নিকটে ব্যক্ত হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ সংবাদপত্র, বেতার ও বৃহৎ বৃহৎ চিত্র-সম্বলিত প্রাকার বিলম্বিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারাই এ প্রচেষ্টার গুণ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, দেশনেতাগণ বহু অনুসন্ধান বিশ্লেষণ ও আরাধনার পরে বুঝিয়াছেন যে দেশের যত অভাব তাহার মূল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া দুই দশ কোটি কমাইয়া দিলেই সমাজের সকল দুঃখের অবসান হইবে। এ কথা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, ইতিহাসে জনসংখ্যা যে সকল সময় অত্যধিক ছিল না, সেই সকল সময়েও দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও আরও বহুবিধ অভাবের তাড়নায় সকলে বিচলিত ও নিষ্পেষিত হইত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশে ১৫ লক্ষ লোকের অনাহারে প্রাণ যায়। তখন এ দেশের জনসংখ্যা এখন হইতে শতকরা ২০।২৫ কম ছিল। তাহা হইলে সে দুর্ভিক্ষ হইল কেমন করিয়া? কারণ সকলেই জানে। দেশের শাসকদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ও অব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল। বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যার মূলেও রহিয়াছে সেই সুচিন্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভাব। সামাজিক জীবনযাত্রা পদ্ধতির অবাধ গতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা জীবনযাত্রা আরও সুগম করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের যদি বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট না থাকে তাহা হইলেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইলেও তাহা উপযুক্ত হস্তে না পড়িলে কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করে।

আমাদিগের যে বর্ত্তমান অভাবের যুগ চলিতেছে তাহারও আরম্ভ হইয়াছে নেহরু ও তৎপরবর্ত্তী শাসকদিগের বুদ্ধিহীন পরমুখাপেক্ষিতাতে। ইনি রুশিয়ান, উনি আমেরিকান ও তিনি ইংরেজ দেখিয়াই যাঁহারা মোহিত হইয়া যান এবং ঐ সকল সুবিধাবাদীদিগের কথায় উঠেন-বসেন, তাঁহাদিগের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, তথা সকল পরিকল্পনাই অর্থহীন ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। বিগত আঠার বৎসর ধরিয়াই আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বিদেশীরাই আমাদিগের পরম বন্ধু এবং মহাপণ্ডিত ও স্বদেশবাসীরাই শত্রু (প্রতিদ্বন্দ্বী) ও তুলনায় মূর্খ, এই জাতীয় চিন্তাপ্রণোদিত জাতীয় উন্নতি প্রচেষ্টার ফলে আমাদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে নামিয়া চলিয়াছে। যে সকল শাসকদিগের

প্রতিদ্বন্দ্বীগণ দল বাঁধিয়া চলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও সেই বিদেশীপূজার ঘুণধরা ভাব লক্ষিত হয়। এই বিদেশী প্রীতি, বিদেশ ভ্রমণ লালসা ও স্বদেশের প্রেরণা ও কর্ম্মক্ষমতায় অবিশ্বাস আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। এবং দেখা যায় যে ধুতি বা পাজামা কিংবা শাড়ী বা শালওয়ার পরিধান এই ব্যাধি প্রশমনে সাহায্য করে না। কারণ রোগটা অন্তরের; বাহিরের নহে। ভাষা, বস্ত্র অথবা চালচলনে যথাসম্ভব বিদেশীর অনুকরণ যে-সভ্যতার প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে সভ্যতাকে আত্মনির্ভরশীল করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহা অসম্ভব হইবে না। শুধু আত্মনির্ভরশীলতা অর্থে প্রাচীনকালের রীতিনীতির নবজাগরণ নহে মনে রাখিতে হইবে। উদ্দেশ্য সদাজাগ্রত, জীবন্ত ও নূতন—উপায় নিজস্ব ও স্বাবলম্বী মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। বিদেশের উপায়, যন্ত্র ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধা নাই কিন্তু বিদেশী প্রাধান্য চলিবে না ও বিদেশীকে শিক্ষক ব্যতীত অপর কোনও ভাবে এদেশে থাকিতে দেওয়া হইবে না। যে বিদেশী বহু বৎসর এদেশে থাকিয়াও নিজ কার্য্য ভারতীয় কাহাকেও শিখাইতে পারে না তাহাকে এদেশে না থাকিতে দেওয়াই জাতীয়ভাবে লাভজনক।

বর্ত্তমানে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফল কি হইবে তাহা বলা এখনি সম্ভব নহে। যতটা মনে হয় এই প্রচারের ফলে নিম্নস্তরের, অর্থাৎ অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জনসংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। শিক্ষিত ও শহুরে মহলে এই সকল জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্রিটিশ যুগ হইতেই চালিত আছে। তাহার ফলে শিক্ষিত ও ধনী মহলে (অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ধনীদিগের মধ্যে নহে) জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত অর্থশালী লোকেদের মধ্যে বাল্যবিবাহও ততটা নাই এবং তাহাদিগের খাদ্য ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি গরীবের অস্তিত্ব ধারা হইতে বিভিন্ন। এই পার্থক্যের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির কোন কারণ গুপ্তভাবে নিহিত আছে কি না তাহা কে বলিতে পারে? শুনা যায়, মাছ মাংস প্রধান খাদ্য খাইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাধা পায়; কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, তাহা হইলে মুসলমানদিগের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ততটা হইত না, যতটা নিরামিষাহারী হিন্দুদিগের মধ্যে হয়। পরিশ্রম করিলে ও অল্পাহারে থাকিলে জনসংখ্যা বাড়ে বলিয়া মনে হয়। ঐশ্বর্য্যশালী আয়েসী লোকেদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হয়। আজকালকার জগতে যাহারা উচ্চতম ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি কম হয়। সকল দিক দিয়া দেখিলে মনে হয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ভারতের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভবই বলা চলে। নিগুর্ণ রাজশক্তি সততই সর্ব্বনাশের কারণ হয়। চীনের আক্রমণ ও পাকিস্তানের উদ্ধত গুণ্ডাবাজি দেখিয়াও যাহাদের শিক্ষা হয় না তাহাদের হৃদয়ে নূতন প্রেরণা জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। সুতরাং ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির আশা ত্যাগ করিয়া অপর উপায় অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। নতুবা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ফলে শুধু সুপ্রজনন বিরুদ্ধ ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং শিক্ষিত, মার্জ্জিত, সুসভ্য ভারতীয়েরা জগতের জীবনক্ষেত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রচারের সুফল কিছুই ফলিবে না কুফল ফলিবে অনেক, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে। দুর্নীতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই বিদেশী-দিগের অনুকরণে তাহাদিগের ভব্যতাহীনতা ভারতীয় জীবনে স্থান পাইতেছে। এই সকল "আধুনিকতার" আড়ালে উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বদাই সুনীতিকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে। সামাজিক অনুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদের নামে দুর্বিনীত ব্যবহার ও অশ্লীলতা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য ঢং-এ নর-নারীর মিলিত নৃত্য, মদ্যপান ও অপরাপর অকারণ-ঘনিষ্ঠতার অভিনয় বর্দ্ধনশীল। অবশ্য সকল বিদেশী অসভ্যতারই জাতীয় সংস্করণ রচিত হইতেছে। এই অবস্থায় বিশেষ করিয়া দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজের মত উচ্চ জীবনযাত্রার কেন্দ্রগুলিতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচারের কোনই আবশ্যক নাই। আছে গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে। প্রচার কেমন করিয়া হইবে তাহা বিবেচ্য। বড় বড় চিত্রের বিজ্ঞপ্তি দিয়া এবং সংবাদপত্র ও বেতার প্রচারে হইবে না। ইহাতে শুধু শীলতার হানি হইবে এবং সুফল না হইয়া কুফল হইবে।

বাল্যবিবাহ নিবারণের যে সকল আইন করা হইয়াছিল সেগুলির সর্ব্বত্র প্রয়োগ এখনও করা হয় নাই। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে বৎসরে লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকার বিবাহ এখনও অবাধে প্রচলিত রহিয়াছে। যাহারা বাধা দিবে তাহারাই এইরূপ বিবাহের কর্ম্মকর্ত্তা। আমরা এই জাতীয় বিবাহের কথা প্রায়ই শুনি। এই তিনটি প্রদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি অপর প্রদেশের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে বাল্যবিবাহ নিবারণ জন-সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিবার একটি কার্য্যকরী উপায় বলিয়া ধরা যাইবে এবং পুরুষের ২১ ও নারীর ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ না হইতে দিলে জনসংখ্যা রোধ ও সুপ্রজনন

এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। আরও যে সকল সামাজিক রীতি-নীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল সেগুলির পুনঃ প্রচলন চেষ্টা করিলে ভাল হয়। যথা সন্তান হইবার পরে ৫।৬ মাস পিত্রালয়ে বাস করা সকল দিক দিয়াই উত্তম রীতি ছিল। ইহার পুনঃ প্রচলনের পথে প্রধান অন্তরায় পিতার অর্থাভাব বা পিত্রালয়ে স্থানাভাব। সেই পুরাতন কথা, দারিদ্র্যের। তাহা হইলেও যেথানে সম্ভব সেখানে এই রীতি চালাইয়া চলিলে ফল ভালই হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে আর একটি উপায়ে জনসংখ্যা লাঘব করা হইয়া থাকে ইহা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার কার্য্য। সকল ব্যক্তিকেই অনেক দেশে বাধ্যতামূলকভাবে দীর্ঘকাল সামরিক কার্য্য করিতে হয়। কোথাও কোথাও তিন বৎসরকালও ইহার মেয়াদ হইয়া থাকে। যদি যুদ্ধ-শিক্ষা অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে তিন বৎসরকাল নিজ পরিবার ছাড়িয়া দূরদেশে থাকিয়া সমাজসেবা করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও অর্থব্যয়ের কথা উঠিবে এবং ভারতের দারিদ্র্য উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলিয়া আবার সেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি হইবে। অবশ্য ভারতের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করার ব্যবস্থা ততটা ব্যয়বহুল হইবে না যতটা কারখানা গঠন করিলে হইবে। বাহিরের দেশের সাহায্য না লইয়া শ্রমশক্তির পূর্ণতর ব্যবহার অসম্ভব নহে। সেই ভাবে শ্রমশক্তির ব্যবহারে স্বাবলম্বন শিক্ষা হয় ও ভবিষ্যতে তাহাতে ধার শোধ করিয়া ঐশ্বর্য্য থাকিলেও দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমানের যে অর্থনীতি তাহাতে আমাদের জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণ হইলেও দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কারণ সুদ ও আসলের পরিমাণ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির তুলনায় অধিক হইয়া যাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। সুতরাং তিন বৎসরের মেয়াদে সকল সবলকায় ভারতীয়ের শ্রমশক্তি যদি জাতীয় উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাতে আমাদিগের প্রভূত লাভের সম্ভাবনা। এবং ঘরে বসিয়া না থাকার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অন্তত কিছুটা বাধা পাইতে পারে। ভারত সরকার অবশ্য বিদেশে লোক পাঠাইয়া সকল বিষয় পূর্ণরূপে অবগত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে শিখাইবার কিছুই এদেশে নাই। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাই এই দেশের একান্ত নিজস্ব, একথা ভারত সরকারও স্বীকার করেন।

লালবাহাদুর ওবোতে সংবাদ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও উগাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মিলটন ওবোতে সাতদিন ধরিয়া পরস্পরের সঙ্গলাভ করিয়া নানান বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, যে সকল আলোচনা ইতিহাসে লিখিত হইবে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। আলোচনার বিষয় (১) বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রচেষ্টা ও আফ্রিকা এবং এশিয়াতে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার ও উৎপাদন যথাসাধ্য বন্ধ করা, (২) ভারতের আফ্রিকা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিখুঁতভাবে নির্দ্ধারিত করা, (৩) সকল আন্তর্জ্জাতিক দল বিযুক্ত থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে একত্র বাস করার প্রয়োজনীয়তা বারম্বার প্রচার করা, (৪) ভারতের সাহায্যে উগাণ্ডা ও আফ্রিকা-এশিয়ার অপরাপর অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক উন্নতি চেষ্টা। আমরা কোন শুভকার্য্যে বাধা দেওয়া বা অপ্রিয় সমালোচনা করা উচিত মনে করি না। শুধু মনে হয় ভারতের আর্থিক অবস্থার কথা। যাহার নিজের ঘরে খাবার সংস্থান নাই তাহার পক্ষে গায়ে পড়িয়া বাহিরের লোকের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পৃথিবীতে বহু অন্যায় অবিচার, অভিযোগ ও অভাব আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ইহাই কি তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের উদ্দেশ্য? এবং তিনি কি কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে পারগ? যদি তিনি তাহা হইতেন তাহা হইলে ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধান হয় না কেন?

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে একটা বিরাট প্রভেদ ও পার্থক্য আছে। যিনি নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন তাঁহার চিন্তাশক্তি, কর্ম্মশক্তি, সাহস, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব গুণের সহিত যিনি তাঁহাকে অনুসরণমাত্র করিয়া নূতন ধর্ম্ম মত মানিয়া লইয়া চলেন তাঁহার মানসিক, চারিত্রিক শক্তির কোনও তুলনা হয় না। নূতন পথে চলিয়া যাঁহারা নব নব দেশ আবিষ্কার করেন ও অপরের পথ-প্রদর্শক হইয়া বহু লোককে নূতন দেশে নিবেশ স্থাপন করিতে শিক্ষাদান করেন তাঁহাদের মহত্ত্ব অন্যপ্রকার। কলম্বাস কিংবা রদুর সহিত পরবর্ত্তী যুগের একই পথের পথিকদিগের তুলনা করা চলে না। সেইরূপ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে ও অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লববাদের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহাদিগের পরে যাঁহারা আসিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অধিকার বিচার কিংবা বিপ্লববাদ প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ। সম্প্রতি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথকে

লইয়া রাষ্ট্রপ্রগতির মধ্যপথে কোন কোন নেতা সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যখন আমরা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের কথা এবং অহিংসবাদ অনুসরণে দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাণহানির বীভৎস কাহিনী স্মরণ করি তখন আমাদের সে চরমপন্থীর উষ্ণ আত্মগরিমা অনুভূতি অনেকাংশে শীতল হইয়া আসে। শুধু নেতাজী সুভাষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই রাষ্ট্রীয় ভাগবাঁটোয়ারার বাজারে ভারতের পৌরুষ কিছুটা জাগ্রত রাখিয়াছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রও সেই বাজারে বিশেষ উচ্চ স্থান লাভ করেন নাই। বাজার যখন স্বাধীনভাবে নিজরূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইল, তখন সুভাষের স্থান আরও অস্থাবর হইয়া পড়িল। বহুকাল গত হইলে পরে বাজারের অবস্থা খারাপ হইলে সকলের পুরাতনের কথা ভাবিবার সময় আসিল। তখন যাঁহাদের ভুলিবার ও ভোলাইবার চেষ্টা প্রবল প্রচারের ধাক্কায় প্রায় সফল হইতে যাইতেছিল, তাঁহাদের আবার জাতির স্মৃতির দরবারে আসন পাতা হইতে আরম্ভ হইল। বিলম্বে হইলেও সত্যের জয় শেষ অবধি হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্য যাঁহারা মিথ্যা প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আশা করেন মিথ্যাকেই সত্যের আসনে বসাইতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাদের আমরা আডলফ্ হিটলারের "মাইন কাম্ফে"র কথা স্মরণ করিতে বলি। এখনকার পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় নিঃসন্দেহে মানিয়া লইয়াছি যে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিকারী। তিনিই প্রথম সুচিন্তিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় অধিকার এক একটি করিয়া আহরণ করিবার প্রচেষ্টা করেন। ব্রিটিশদিগের ইতিহাসে বক্তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বার্ক। তাঁহার সহিত সুরেন্দ্রনাথকে তুলনা করিয়া ব্রিটিশগণ সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতম প্রশংসা করিয়াছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইতিহাসের উত্তেজনাহীন দৃষ্টিতে ভারতের বিপ্লববাদের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষমতা দোষ দুষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। সুভাষচন্দ্রের ভারত বিজয় সংকল্প সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও তাহার মধ্যে আপোষে মিটমাটের দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। ভারত বিভাগে সায় দিয়া কংগ্রেস ভারত স্বাধীনতার অর্দ্ধ শতাব্দীর যুদ্ধে ব্রিটিশ মতলববাজির নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন ও সেই হিসাবে যে সকল রাষ্ট্র নেতাগণ পূর্ব্ব যুগে অপর উপায়ে রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতে পারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় জ্ঞানবুদ্ধি অহিংস বিপ্লববাদীদের তুলনায় হয়ত অধিক কার্য্যকরী হইতে পারিত প্রমাণ করিয়া দিলেন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রগুরু আখ্যা উপযুক্ত প্রমাণ হইয়াছে। বিপ্লবে সর্ব্বনাশ ও সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতজন অর্দ্ধেক অধিকার ছাড়িয়া দিয়া থাকেন একথা সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত জানিতেন। কংগ্রেসের অহিংস বিপ্লবে যে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণ যায় এবং সেই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন দেখিয়া পণ্ডিতজন অর্দ্ধ ভারত ত্যাগ করিয়া অপরার্দ্ধ লইয়াই স্বাধীন হইলেন।

শ্রীমতী শান্তা দেবী লিখিত "রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা" পুস্তকে দেখিতে পাই—

"রামানন্দ বলিয়াছেন 'আমরা যখন কলিকাতায় পড়তে আসি তখন 'ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' নামক একটি সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভ্যদের নেতা ছিলেন। এই সভার অধিবেশন হিন্দু স্কুলের একটি ঘরে হ'তে দেখেছি। সেই কক্ষে গ্যালারী ছিল। কত যুবক সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন!"

"বাঁকুড়ায় রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেমজাত উপন্যাস এবং নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের কাব্যাদি যাঁকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিত সেই শান্ত নীরব যুবকটি—সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী দেশভক্তিতে মনে মনে মাতৃপূজার মন্ত্রে আরও গভীর ভাবে দীক্ষিত হন। ১৮৮৩ সনের ৫ই মে হইতে ৪ঠা জুলাই পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়।......যেদিন সুরেন্দ্রনাথের খালাস পাইবার কথা, সেদিন খুব ভোরে হাজার হাজার লোক তীর্থযাত্রীর মত প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে যাত্রা করিল।......

রামানন্দ আর তাঁর বন্ধুরা শোভারাম বসাকের লেন হইতে হরিণবাড়ী জেল পর্য্যন্ত ভিজিতে ভিজিতে যাত্রীদলের সঙ্গে চলিলেন।...গেটের কাছে...খবর পাওয়া গেল যে সুরেন্দ্রনাথকে রাত থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ী করিয়া তালতলায় তাঁর পৈত্রিক বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিরাট্ জনবাহিনী আবার চলিল তালতলার দিকে। সেখানে তখন লোকে লোকে লোকারণ্য, বাড়ীতে কোথাও স্থান নাই। সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু আনন্দমোহন জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন।...

শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথ যতখানি রাজনৈতিক অধিকারে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, রামানন্দ প্রমুখ তাঁর অনেক বয়ঃকনিষ্ঠরা তাতে সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু তার জন্য যৌবনে যিনি তাঁদের দেশপ্রেমের এতখানি প্রেরণা দিয়াছিলেন তাঁর প্রতি রামানন্দ শ্রদ্ধা হারান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বয়ঃকনিষ্ঠ আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার দাবী ও আশা যে তাঁহার চেয়ে বেশী হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ তিনি জাতীয়তার

ভাব উদ্বুদ্ধ না করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সংস্কার ও অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন না করিলে, একজাতীয়তার আদর্শ সমগ্র দেশে সকলের মনে, মুদ্রিত করিবার চেষ্টা না করিলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা দাবী ও আশা আদর্শ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত না'।"

সুরেন্দ্রনাথ যে প্রগতির আরম্ভের সারথি ছিলেন পরে তাহা যদি গতিবেগে তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করিয়া থাকে তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের গৌরব লাঘব হইতে পারে না।

রুশ—চীন ও ইঙ্গ-আমেরিকা

পৃথিবীর যেখানেই কোন যুদ্ধ-সংঘাত গড়িয়া উঠিতেছে সেখানেই দেখা যায় রুশ, চীন, ব্রিটেন ও আমেরিকার নিজ নিজ শক্তি ও অধিকার প্রসার-প্রচেষ্টাই সকল দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে। চীনের তিব্বত দখল, রুশের হাঙ্গেরীর বিপ্লবে এক পক্ষকে সামরিক সাহায্য দান, আরব মুল্লুকে রুশ, আমেরিকান, ব্রিটেন ও চীনের সামরিক সাহায্য দানের খেলা, ইন্দোনেশিয়াতে রুশ ও চীনের প্রভাব বিস্তার, ভিয়েৎনামে (উত্তর-দক্ষিণ) রুশ-চীন-ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন—এই সকল কিছুর মধ্যেই জগতের শক্তিমান জাতিগুলির প্রভুত্বের দুরাকাঙ্ক্ষা কু-প্রেরণার কার্য্য করিতেছে। ইহাদিগের অনেকেরই প্রভুত্ব বিস্তার করিবার কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই। রুশ দেশ বিরাট্ ও রুশের জনসংখ্যা চতুর্গুণ হইলেও তাহার স্থানাভাব হইবে না। আমেরিকাও তাহাই। ব্রিটেনের সহিত রক্ত সম্বন্ধে আবদ্ধ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে বৃটেনের জনসংখ্যা যতই বাড়িবে তাহাদের জন্য স্থানের অভাব ঘটিবে না। শুধু চীন জনসংখ্যায় পৃথিবীতে সর্ব্ব-প্রধান। ৬০।৭০ কোটি লোকের বাস চীন দেশে এবং তাহারা জনসংখ্যার আধিক্য একটা মহাশক্তির নিদর্শন বলিয়া মনে করে। এই কারণে চীন সর্ব্বত্র নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অপরাপর জাতিগুলিকে ক্রমশঃ যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী শুধু চীনা জাতির মাত্র বাসস্থানে পরিণত করিবে এই দুরাশা পোষণ করে। তিব্বত দখল করার একটা বড় কারণ, তিব্বত ঠাণ্ডা দেশ হইলেও বিস্তৃত বৃহদাকার দেশ। সেখানে ব্যবস্থা করিলে ২৫।৩০ কোটি লোক বাস করিতে পারে। তাহার উপরে ভারতের হিমালয় অঞ্চল তিব্বত-সংলগ্ন। ক্রমশঃ সেই সকল স্থানেও চীনারা ছলেবলে-কৌশলে প্রবেশ করিতে পারিলে আরও অনেক চীনার বাসের ব্যবস্থা হইতে পারে। সুতরাং এই রুশ-চীন-ব্রিটেন-আমেরিকা ব্যাপারটির মধ্যে চীনই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং পৃথিবীর সকল জাতির শত্রু। চীনের সহিত মিত্রতা বলিয়া কাহারও কোন কষ্টকল্পিত ধারণা মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। কারণ আজকার মিত্রতা চীনের দুরাকাঙ্ক্ষার স্পর্শে শীঘ্রই শত্রুতায় পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।

চীন জগতের শত্রু এবং কাহারও মিত্র নহে। ভিয়েৎ-নামে চীন ততটাই ভিয়েৎকং-এর পশ্চাতে থাকিয়া তাহা-দিগকে সামরিক সাহায্য দিয়া চলিয়াছে, যতটা আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আইনত প্রতিষ্ঠিত শাসকদিগকে দিতেছে।' এই ক্ষেত্রে যাঁহারা কোন কথা না জানিয়া বা বুঝিয়া আমেরিকাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমেরিকার বিরাট্ সামরিক শক্তিকে যাহারা সমানে সমানে যুদ্ধক্ষেত্রে পাল্টা মার দিয়া চলিয়াছে তাহারা ভিয়েৎকং নামধেয় বিপ্লববাদী দলমাত্র হইতে পারে না। ভিয়েৎকং-এর মুখোস পরিয়া চীন এই যুদ্ধ চালাইয়া চলিয়াছে। উত্তর ভিয়েৎনাম চীনের অস্ত্রে, চীনের রসদে, চীনের অর্থে ও চীনের লোকবলে শক্তিমান। চীন ক্রমশঃ এই যুদ্ধ আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়া দক্ষিণ এশিয়াতে নিজ স্থান কায়েমী করিবার জন্য প্রস্তুত। বিগত কয়েক সপ্তাহে চীন বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ ক্রয় করিয়া পিকিং-এ আমদানী করিয়াছে। ইহা এই যুদ্ধবিস্তার কার্য্যের একটা আনুসঙ্গিক আয়োজন মাত্র। দক্ষিণ এশিয়ায় এই যে একটা মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে, ইহা দিল্লীর রথীদিগের মতে একটা অতি সহজে রোধযোগ্য খুচরা লড়াই। সেই জন্য ঘানা কিংবা ইউগোশ্লাভিয়া অথবা ভারত কিংবা মলয়েশিয়া বলিলেই আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমেরিকা কিন্তু জানে যে বিষয়টা কত জটিল ও ইহার জড় ভিতরে ভিতরে কতদুরে প্রবিষ্ট ও প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা ভিয়েৎনাম হইতে সরিয়া যাইলে চীন কয়েক বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়া শ্যাম, ব্রহ্ম, মলয় প্রভৃতি দেশের দিকে হাত বাড়াইবে। ভারতের পালা তারপরে। আয়ুব খাঁর চীনার সহিত দোস্তির মূলেও রহিয়াছে পাকিস্তানের ভারত-বিজয় সংকল্প। চীন যদি ক্রমশঃ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশ এবং মলয়, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে চীনের সন্ধিবদ্ধমিত্র পাকিস্তান ভারতের উপরে প্রভুত্বের অধিকার দাবি করিতে বিলম্ব করিবে না। এই সকল সুখস্বপ্নের পথে অন্তরায় হইতেছে ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি মহাশক্তিশালী জাতিগুলি। ইহারা চীনকে বাড়িতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হঠাৎ হঠাৎ এখানে-সেখানে প্রকাশ্যে গোপনে কিছু কিছু যুদ্ধ চালাইয়া লওয়া চীনের স্বভাব। আরও ছোট ও গুণ্ডাবাজি

ধরনের লড়াই করে পাকিস্তান। ব্রিটেন ও আমেরিকা চাহে চীনকে কোন একটা মহাযুদ্ধে নামাইয়া ফেলিয়া তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে। চীন নিজের গা বাঁচাইয়া পরের অনিষ্ট সাধনে যত্নবান। রুশ চীনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষেও। রুশের ইচ্ছা যায় শত্রু পরে পরে। অর্থাৎ, আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন, সকলেই মারপিট করিয়া হৃতশক্তি হইলে রুশের আনন্দ। চীনের বিজয়ে জগতের অপর সকল জাতির বিপদের সম্ভাবনা। এবং চীন মার খাইলে কাহারও, বিশেষ করিয়া ভারতের কোনও ক্ষতি নাই। ভারত সীমানা জুড়িয়া যে সকল দেশ আছে, যথা, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও নেপাল, সেই সকল দেশের ইহাতে নিরাপত্তাবৃদ্ধি হইতে পারে। এই কারণে অকৃতী রাষ্ট্রগুলির অধিনায়কদিগের উচিত, নিজেদের নাম জাহির করিবার জন্য ক্রমাগত ভিয়েৎনাম, ভিয়েৎনাম বলিয়া সোরগোল না করা। কারণ ভিয়েৎনামের যুদ্ধে চীন ও আমেরিকা সমানে ও পূর্ণভাবে লিপ্ত রহিয়াছে। চীনকে বাঁচাইয়া ক্রমাগত আমেরিকাকে "যুদ্ধ থামাও, যুদ্ধ থামাও" বলিলে মনে হয় যেন সকল দোষই আমেরিকার ও চীন একেবারে নির্দ্দোষ। এইরূপ একটা মিথ্যা ইঙ্গিতে প্রচার করাও অনুচিত। দোষ উভয়ের এবং উভয় দেশের নিকটই আবেদন করা যাইতে পারে যুদ্ধ বন্ধ করিবার। কিন্তু শ্রীলালবাহাদুরের পিকিং-এ গতি নাই এবং অপরাপর আফ্রো-এশিয়ার নেতাদিগের চীনকে ঘাঁটাইবার সাহস নাই। সুতরাং একতরফা আবেদন-নিবেদন চলিতেছে এবং চীন খুশী-মনে আরও ভিয়েৎকং সাজিয়া যুদ্ধ চালাইতেছে। যদি চীন ও আমেরিকা ঐ দেশগুলি ছাড়িয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যায়, শুধু তাহা হইলেই ঐ সকল দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। নতুবা শুধু আমেরিকা চলিয়া যাইলে চীনের জগৎ-গ্রাস অভিযান আর একটু অগ্রসর হইবে এবং ভারতের ও অপরাপর জাতির বিপদ আরও ঘনাইয়া আসিবে।

ভারতের ভাষা সংগ্রাম

ভারতের ভাষা সংগ্রামের এখন যে পর্ব্বে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া অপর সকল ভাষাগুলিকে গর্ত্তে ফেলিবার প্রচেষ্টা কিছু দিনের মত স্থগিত রহিয়াছে। এখন নূতন আইন করিয়া ইংরেজী ভাষাকে কায়েমী স্থান দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সঙ্গে যাহাতে হিন্দী ভাষাও কায়েমী হইয়া যায় তাহার চেষ্টাও ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া করা হইতেছে। অর্থাৎ একটা প্রস্তাব শুনা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির সকল দলিল-পত্রের উপর যে সকল মন্তব্য লিখিত হইবে তাহা ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী উভয় ভাষায় লিখিত হইবে। এই নিয়মের কারণ যে, যদি কোনও ব্যক্তি আলোচনায় আসিয়া পড়ে যাহার ইংরেজী জানা নাই, তাহা হইলে তিনি হিন্দী লেখা পড়িয়া নিজ মন্তব্যও হিন্দীতে দাখিল করিতে পারিবেন। কিন্তু কথা হইল যে, ইংরেজী না জানিলে ও শুধু হিন্দী ভাষা জানিলে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় দপ্তরের "ফাইল" নাড়া-চাড়া করিবার অধিকার পাইবে কেন? আর যদি পায় তাহা হইলে যাহারা শুধু তামিল অথবা বাংলা জানে তাহারাই বা তামিলে ও বাংলায় মন্তব্য পেশ করিতে পারিবে না কেন? অর্থাৎ "হিন্দী জান্‌নেওয়ালে"দের আর কোনও ভাষা না জানিয়াও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার সুবিধা থাকিবে কিন্তু অপর ভাষা জানিলেও ইংরেজী বা হিন্দী না জানিলে সে সুবিধা হইবে না, এই ব্যবস্থা হিন্দী ভাষীদিগের প্রতি পক্ষপাত দোষ দুষ্ট হইবে। সুতরাং এই জাতীয় ব্যবস্থা চলিবে না। সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকেই ইংরেজী জানিতে হইবে এবং হিন্দীর সহিত আর একটি ভারতীয় ভাষা (১৪টি স্বীকৃত ভাষার অন্তর্গত) শিখিতে হইবে এই নিয়ম হওয়া প্রয়োজন। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের তামিল, তেলেগু কিংবা গুজরাটি মারাঠি কোন একটা অপর ভাষাও শিখিতে হইবে। দ্বিভাষী হইলে চলিবে না, তিনটি ভাষা জানিতে হইবে যাহার মধ্যে ইংরেজী ও হিন্দী বাধ্যতামূলক হইবে। এই নিয়ম করিলে হিন্দীর যেটুকু বিশেষত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে তাহাতেই হিন্দুস্থানীদিগের প্রাপ্যের অধিক লাভ হইবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যত বিভিন্ন জাতির লোক আত্মদান করিয়াছেন ও অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দুস্থানীদিগের স্থান অতি উচ্চে নহে। পরে হিন্দুস্থানীবহুল কংগ্রেস দল যে ভারত বিভাগে রাজি হইয়া ভারত ও পাকিস্তান এই দুই খণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া "স্বাধীনতা লাভ" করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি জাতির মারাত্মক লোকসান হয়। হিন্দুস্থানীপ্রবল কংগ্রেসী দল ইহাতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব না করিয়া বিহার প্রদেশের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বিহার প্রদেশে যুক্ত রাখিয়া বাংলা দেশের আরও ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করেন। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোকে কেন্দ্রীয় সরকারকে মাথাপিছু কত রাজকর দেন ও কোন কোন প্রদেশের লোকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মাথাপিছু কত হয় বিচার করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে, হিন্দী ভাষাভাষী ভারতীয়েরা অপর

ভারতীয়দের দেওয়া পয়সায় অনেক সুবিধা উপভোগ করেন। যদিও আমরা ভারতের একত্বে বিশ্বাস করি তবুও আমাদের মানিতে হয় যে সেই একত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যে দুই রাজ্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা সকল ভারতবাসীর মত লইয়া করা হয় নাই। কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা একাংশও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ছিল না। দুই রাজ্য হওয়ায় যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ দায়ী। এ অবস্থায় কংগ্রেসের "আদর্শ" অনুসরণে সকল ভারতীয়েরা ক্রমাগত ক্ষতি স্বীকার করিয়া কিছু কিছু কংগ্রেসপোষ্য লোকদের সুবিধা করিয়া দিবে ইহা আশা করা অন্যায়। সুতরাং হিন্দী ভাষার গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য অহিন্দীভাষীদের কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস যদি ইহা না বুঝেন তাহা হইলে কংগ্রেসের রাজত্বের অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। এবং তাহা ঘটাইবে একান্ত স্বদেশভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ রক্ষণশীল লোকেরাই বলিয়া অনুমান করা চলে।

হিন্দীভাষা ভারতের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য বহু মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। যথা, হিন্দী না কি শতকরা ৪০ জন ভারতীয়ের ভাষা! ইহা একটি অতি বড় মিথ্যা। এই হিসাবের জন্য পাঞ্জাবী ভাষা, মাড়োয়ারী ভাষা প্রভৃতি বহু অহিন্দী ভাষাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সকল ভাষা বাংলা, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মৈথিলী, মাগধী, অৰ্দ্ধমাগধী, ভাষাগুলিও পুরাতন আর্য্যদের প্রাকৃত ভাষা। সেগুলিও বাংলার সহিত অধিক সংযুক্ত, হিন্দীর সহিত নহে। অশোকের শিলালিপিগুলির অনেকগুলিই এই সকল প্রাকৃতে লিখিত। সেই সকল ভাষা হিন্দী বলিয়া প্রচার করিলে ইতিহাস নূতন করিয়া রচনা করিতে হইবে। কংগ্রেসের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নহে, কারণ ভারত স্বাধীনতার "ইতিহাসে" কংগ্রেস যে সকল কথা লিখাইয়াছেন ও যে সকল কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সত্যমেব জয়তে বাণীটির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা কংগ্রেস দলের অনেকেরই নাই। মতলবসিদ্ধিই তাঁহাদিগের নিকট বড় কথা। অপরের কীর্ত্তি মিথ্যা প্রচারের দ্বারা নিজের করিয়া লওয়া সত্যনিষ্ঠার নিদর্শন নহে, যেমন অপরের ভিটা কাড়িয়া লওয়াও সত্যের পূজারীর কার্য্য নহে। পরের জন্মভূমি ও সম্পদ নিজের সুবিধার জন্য শত্রুর কবলিত করিয়া দেওয়াও অসত্যের পথে চলা। যাহাই হউক এখন এই সকল অপ্রিয় আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। শুধু এইটুকুই বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় শৌর্য্যবীর্য্য ধর্ম্ম-কৃষ্টি শিল্পনৈপুণ্য কর্ম্মকুশলতা সভ্যতা-ভব্যতা কোন কিছুর জন্যই অহিন্দীভাষী ভারতীয়দের হিন্দীভাষীদিগের অনুসরণ বা অনুকরণ করিবার প্রয়োজন হয় না। **হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা অর্থে বুঝিতে হইবে যে ঐ ভাষা দপ্তরে আদালতে হুকুমতে ব্যবহৃত হইবে মাত্র; উহা জাতীয় ভাষা হইবে না** বা গুপ্ত অভিসন্ধির অভিব্যক্তি দ্বারা কৌশলে ভারতের অপর ভাষাগুলিকে নিম্নস্তরের ভাষাতে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা সাধারণের পয়সায় করা হইবে না। এবং যাহার যে ভাষাই হউক না কেন, সকল অধিকারে সকল ভাবে সকলের সমান দাবি সর্ব্বকালের জন্য সংরক্ষিত হইবে। আমাদিগের এই মহাদেশে বহু জাতি একত্র বাস করে। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন রীতি নীতি ও বিভিন্ন আকৃতির লোকে সকলেই ভারতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় হিন্দী হিন্দী বলিয়া অল্প কিছু লোকের জন্য একটা বৈশিষ্ট্যের সৃজন একান্ত অন্যায় বিবেচনা করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলনের সুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন যে, ঐরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা করা অন্যায় হইবে। এখনও কিছু কিছু ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ন্যায় ও সত্যের নৌকা বানচাল হইয়া পুরাতন অন্যায় আব্দারটিই ছদ্মবেশে আসর দখল করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। আমরা সেই কথাটিই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহি যাহাতে আমাদিগের বাংলা মায়ের ও ভারতমাতার অহিন্দীভাষী কংগ্রেসী সন্তানগণ সে অধর্ম্মকে প্রশ্রয় না দিয়া ফেলেন। কারণ আমাদিগের কংগ্রেসী নেতাগণ অনেক সময় বদ লোকের প্ররোচনায় অন্যায়ের ছদ্মবেশ না বুঝিয়া ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে সরিয়া অপর পথে চলিয়া যান।

বঙ্গের ও বিহারের ভাষা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল; এবার বাঁকীপুরে হইবে। উভয় স্থানই বিহারের অন্তর্গত। বিহারে যে-সকল বাঙ্গালী স্থায়ী বা প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যোগে সম্মিলনের এই অধিবেশন হইতেছে। অনেক বিহারীও বাংলা বুঝেন; তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহ কেহ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। কিন্তু যদি বাঁকীপুরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলে তথাকার শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোকেরাই উদ্যোগী কর্ম্মী হইতেন। কারণ, বিহারের কেতাবী ভাষা হিন্দী।

বিহারের "সাধু" ভাষা হিন্দী হইলেও তথাকার কথিত ভাষার হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিতই সাদৃশ্য বেশী।

"In declension, it [Bihari] partly follows Bengali and partly Eastern Hindi, but in the most important point, the formation of the oblique base, it follows the former and bears no resemblance to the latter. In conjugation, it differs altogether from Hindi and closely follows Bengali."

এই সাদৃশ্য আগে আরও বেশী ছিল, সেইজন্য বিদ্যাপতিকে বিহারী ও বাঙ্গালী উভয়েই আপনাদের কবি বলিয়া দাবী করেন, এবং মিথিলার হস্তাক্ষর ও বাংলার হস্তাক্ষর এক। এই অক্ষর মিথিলার পুরাতন পুঁথিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা ইহা ব্যবহার করেন।

কোন ভূখণ্ড যদি নিজের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে ত ভাল; নতুবা তাহাকে কোন প্রতিবেশীর নিকট-সংপৃক্ত সাহিত্যকেই নিজের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বিহারের কথিত ভাষা হিন্দী ও বাংলা হইতে কতকটা পৃথক হইলেও আধুনিক স্বতন্ত্র বিহারী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বিহারে আদালতেও আগ্রা-অযোধ্যার ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, কেতাবী ভাষাও হিন্দী বা উর্দ্দু হইয়াছে। অথচ কথিত ভাষা হিন্দী অপেক্ষা বাংলারই বেশী কাছাকাছি বলিয়া এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট বলিয়া, বিহারের কেতাবী ভাষা বাংলা হইলে, এবং বিহারীরা বাংলাকেই আপনাদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা অধিকতর স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই বিষয়টির আলোচনা বাঁকীপুরের সাহিত্য সম্মিলনে কোন বিহারপ্রবাসী যোগ্য বাঙ্গালী করিলে ভাল হয়। তাঁহাকে বিহারী ও বাঙ্গলা ভাষার সাদৃশ্য এবং বিহারী ও হিন্দীর পার্থক্য দেখাইতে হইবে। মিথিলার ও বাংলার অক্ষরের ঐক্য এবং মিথিলার ও নাগরী অক্ষরের প্রভেদও দেখাইতে হইবে। তাহার পর, সম্ভবতঃ কি কি কারণে বিহারে বাংলার বিস্তার না হইয়া হিন্দীর বিস্তার হইল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয়, বাংলা ও বিহার যখন এক সুবাভুক্ত ছিল, তখন বিহারে বাংলাই ত চলা উচিত ছিল।

কিন্তু আসামও এক সময় বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মিশনারীদের চেষ্টায় ও প্ররোচনায় আসামী একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে; যদিও আসামের ভাষার সঙ্গে বাংলা "সাধু"

ভাষার যে প্রভেদ, চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় ও কেতাবী বাংলায় তার চেয়ে বেশী প্রভেদ নাই, এবং পুরাতন আসামীয় কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্য অপেক্ষা আমাদের পক্ষে বেশী দুর্ব্বোধ্য নহে। যেরকম কারণে ও চেষ্টায় বাংলা ও অসমিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে, বিহারের ভাষাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য সেরূপ কোন মিশনারী বা সরকারী চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয় বাংলা ও বিহার এক শাসনের অধীন হওয়াতে, সরকারী কর্ম্মচারী ও প্রথম প্রথম রেলওয়ে স্টেশনের কর্ম্মচারী বেশী পরিমাণে বাঙ্গালী হওয়াতে, বিহারীদের মনে যে স্বাভাবিক বিরক্তি, অসন্তোষ ও ঈর্ষ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল (যাহা এখনও আছে), তাহাই বিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের অন্যতম অন্তরায় হইয়া থাকিবে। প্রদেশজদিগের সহিত ব্যবহারে প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই সৌজন্যের অভাব আগে ছিল বা এখনও আছে, এরূপ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে; কিন্তু কতকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর ব্যবহারে ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দোষ বিহারীদের অসন্তোষ, ঈর্ষ্যা ও বিরক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে।

বিহারে বাংলার আদর না হইবার হয়ত আরও একটা কারণ ছিল। বাঙ্গালীদের ভীরু বলিয়া একটা অপবাদ আছে বা ছিল। অপবাদটা সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক্, তজ্জন্য বাঙালীকে "ভাত খাউ আ", ও "ভুগা" বলিয়া অনেক পোট্টা অবজ্ঞা করিতেন; এখনও করেন কিনা জানি না। যে অবজ্ঞার পাত্র, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আদৃত না হইবারই কথা।

যাহার প্রতি মনের ভাব এইরূপ, তাহার ভাষা ও সাহিত্য কেমন করিয়া গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইতে পারে?

আমরা যে-দুটি কারণ অনুমান করিলাম, তাহা সত্য কি না, বলা যায় না; অন্য কারণও থাকা সম্ভব। যাহাই হউক, এখন বাংলা বিহার আলাদা হইয়া গিয়াছে। অনেক বিহারী শিক্ষিত হইয়া চাকরী পাইতেছেন, বিহারে পৃথক হাইকোর্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথক হইতেছে। নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কেহ এখন আর সাহসে বিহারী বাঙালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বাঙালীকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। বাংলাকে বিহারের কথিত ভাষা করিবার চেষ্টা করিতে আমরা বলি না; এরূপ চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, যদিও স্বাভাবিক কারণে বাংলা-বিহারের সীমান্তদেশে কোথাও কোথাও বিহারীর পরিবর্ত্তে বাংলা চলিত হইতেছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রচার বিহারে হইতে পারে। কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন করিলে ভাল হয়।

যে ভাষা ও সাহিত্য যত বেশী লোকের দ্বারা ব্যবহৃত ও আদৃত হয়, তাহার উন্নতি ও শক্তি তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, সাহিত্যের বন্ধন প্রেমের বন্ধন। আমরা যদি বিহারীকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ দিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গে বিহারে একতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্যলেখকেরা আমাদের যেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন, অন্য কোন ইংরেজ তেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র নহেন।

(প্রবাসী. অগ্রহায়ণ, ১৩১৩, পৃঃ ১১৭)"

জন্মাষ্টমী

শ্রীসুখময় সরকার

মহাভারতের মহাদেবতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি যুগ যুগ ধরিয়া 'জন্মাষ্টমী' নামে কীর্তিত হইয়া আসিতেছে এবং আসমুদ্র-হিমাচল ভারত-ভূমির গ্রামে গ্রামে, নগরে-নগরে, প্রাসাদে কুটিরে, মাঠে মন্দিরে জন্মাষ্টমী-মহোৎসব অদ্যাপি প্রতিপালিত হইতেছে। ভাগবত-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ, ভবিষ্য-পুরাণ এবং বহু উপপুরাণে বর্ণিত আছে শ্রীহরির অপরূপ জন্মকথা। এই উপাখ্যান যেমন লোমহর্ষক, তেমনই ভাবগম্ভীর। সকল পুরাণের বর্ণনা অবিকল এক না হইলেও মূল ঘটনার বর্ণনায় এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না। ভবিষ্য-পুরাণ অন্য সকল পুরাণে বর্ণিত বৃত্তান্তের সার-সঙ্কলন করিয়াছেন; এখানে তাহার ভাবানুবাদ দেওয়া হইল:

স্বাধিকার-প্রমত্ত কংসদূতগণের অত্যাচারে তাড়িতা বসুন্ধরা কংসারাধনায় তৎপর ছিলেন। কিন্তু কংসের অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকিলে রোদনপরা ক্রোধ-ঘূর্ণিত-নেত্রা বসুন্ধরা বৃষধ্বজ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার দুঃখের কথা করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে নিবেদন করিলেন। ধরিত্রীর দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যথিত-হৃদয় মহেশ্বর ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং কংসবধের উপায় নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিলেন। অবশেষে হংসবাহন ব্রহ্মা এবং বৃষবাহন শিব অপরাপর দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগরে গিয়া উপনীত হইলেন। পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণু তথায় শেষ-নাগ-শয্যায় শয়ান ছিলেন। দেবগণ ভক্তিপ্লুত গদ্‌গদ কণ্ঠে কমলনয়ন পরমাত্মা হরির স্তুতি করিলেন। যোগনিদ্রোত্থিত বিষ্ণুকে ব্রহ্মা নিবেদন করিলেন, "ভগবান্, শিববরোন্মত্ত দুরাত্মা কংসের অত্যাচারে ধরিত্রী অবমানিতা এবং শান্তিভ্রষ্টা হইয়াছে। ভাগিনেয় ব্যতীত অন্য কেহ কংসকে বধ করিতে পারিবে না—এইরূপ মায়া-বাক্যে পশুপতি তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। অতএব, হে সর্বলোকাশ্রয়, তুমি কংসের ভাগিনেয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন কর; পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর।"

ব্রহ্মার বচনে ভগবান্ বিষ্ণু পশুপতিকে অনুরোধ করিয়া কংসবধের সহায়িকারূপে এক বৎসরের জন্য পার্বতীকে সঙ্গে লইলেন এবং কংসবধের উদ্দেশে উভয়ে মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বসুদেব-জায়া দেবকীর গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ এবং নন্দপত্নী যশোদার কুক্ষিতে ভগবতী পার্বতী আশ্রয় লইলেন। নয় মাস নয় দিন কুক্ষিতে বিশ্রামের পর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র-যুক্তা ঘন-ঘোরিতা বর্ষণমুখরা রজনীতে কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নীলোৎপল-দল-কান্তি ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন গগনে ঘন ঘন বিদ্যুৎ প্রকাশ ও বজ্রপাত হইতে-ছিল; অবিরাম বর্ষণে দিক্‌দেশ প্লাবিত হইতেছিল। বৈষ্ণবী মায়ায় কংস-কারাগারের রক্ষকগণ তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। কংসারি জগন্নাথ ঠিক মধ্যরাত্রিতে আবির্ভূত হইলেন। ওদিকে বৈরাটে ঠিক ঐ মুহূর্তে নন্দপত্নী যশোদা মহামায়াকে প্রসব করিলেন। কংসভয়ে ভীতা কারাবরুদ্ধা দেবকী অলৌকিক-লক্ষণযুক্ত তনয়কে দেখিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, "হে বসুদেব, তোমার পুত্রকে বৈরাটে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া আইস।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিত চিত্তে বসুদেব কুমারকে লইয়া নন্দালয়ে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বর্ষণ-স্ফীতা তরঙ্গ-সঙ্কুলা সুতীক্ষ্ণস্রোতা যমুনা। বিলোলচেতন নিরুপায় বসুদেব পুত্রমুখ অবলোকনপূর্বক যমুনাতীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা দেখিলেন, একটি শিবা স্বচ্ছন্দে যমুনা পার হইয়া যাইতেছে।

এই শিবা স্বয়ং শিবজায়া যোগমায়া। বসুদেব সাহস-পূর্বক যমুনায় অবতরণ করিলেন; শিবা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। নাগরাজ বাসুকি ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া বসুদেব ও বাসুদেবকে প্রবল বর্ষণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়াময় জগন্নাথ মায়াপূর্বক পিতার অঙ্ক হইতে যমুনাজলে পতিত হইলেন। ললাটে করাঘাত করিয়া মায়াবঞ্চিত পিতা রোদন করিতে করিতে কাতর কণ্ঠে জগন্নাথের নিকট পুত্র ভিক্ষা করিলেন। পিতাকে রোদন করিতে দেখিয়া হরি জলক্রীড়া পরিহার-পূর্বক পিতার ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে গমনপূর্বক নিজ তনয়কে সংজ্ঞাহীনা যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া নিশার অন্ধকারে কংস-কারাগারে পুনরাগমন করিলেন। প্রাতঃকালে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা বিদ্যুৎস্ফুরিত-লোচনা সেই কন্যাকে দেখিয়া কংস ভীত হইল এবং ভৃত্যগণকে আদেশ করিল, "শিলার উপর আঘাত করিয়া ঐ কন্যাকে বধ কর।" ভৃত্যগণ কন্যাকে শিলার উপর সবলে নিক্ষেপ করিলে বিদ্যুদ্দামধরা সেই কন্যা শূন্যে উৎক্ষিপ্তা হইলেন এবং ক্ষণকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে যিনি বধ করিবেন, সেই সুর-পালক কেশব গোকুলে বর্ধিত হইতেছেন।" এই বলিয়া পার্বতী কৈলাসে শঙ্কর-সমীপে প্রস্থান করিলেন। ওদিকে বৈরাটে নন্দ-মন্দিরে মহোৎসব হইতে লাগিল। ভগবান কৃষ্ণ গোকুলে নন্দ-যশোদার বাৎসল্যচ্ছায়ায় বর্ধিত হইয়া যথাকালে কংসাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

জন্মাষ্টমীর এই পুণ্যকথা ভারতের কোটি কোটি নরনারী ভক্তিভরে শ্রবণ করে এবং মনে করে তাহারা পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। আবার, পুরাণ-কথা শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়—এই আপ্ত বাক্যে অধুনা বহুজনের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাস-শৈথিল্যের হেতু একাধিক হইতে পারে। কিন্তু প্রধান হেতু—পুরাণের অপব্যাখ্যা। পুরাণ-কথাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া প্রচার করিবার উদগ্র প্রয়াসকে আমরা উহার চরম অপব্যাখ্যা বলিয়া মনে করি।

তবে কি পুরাণ কথা মিথ-ভাষিত? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ কি ছিলেন না? শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক আবির্ভাব-কাহিনীর মূলে কি কোন সত্য নাই? যদি না থাকে, তবে যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মানুষ এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব করে কেন? জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করে কেন?

ভক্তের নিকট জন্মাষ্টমীর উপাখ্যান ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে; কারণ ভক্তের বিশ্বাস করিবার শক্তি সীমাহীন। কিন্তু সংসারে যথার্থ ভক্তের সংখ্যা অধিক নহে। তথাপি যে কোটি কোটি মানুষ এই সকল উপাখ্যানকে ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, অন্ধ-ভক্তি। কিন্তু অন্ধ ভক্তি 'ধোপে টেঁকে না'। তাহা ছাড়া, ভক্তির দৃষ্টি ব্যতীত মানুষের আর একটা দৃষ্টি আছে; তাহা জ্ঞান-দৃষ্টি। অন্ধ-ভক্তি এই দৃষ্টিকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্য অধিকতর স্বপ্রকাশ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ জ্ঞানীর দৃষ্টি এবং নাস্তিকের দৃষ্টির মধ্যে বিপুল ব্যবধান। নাস্তিকের বিশ্বাস করিবার শক্তি এত অল্প যে, তাহার নিকট পুরাণ-কথা অহিফেনসেবীর বিজল্পন মাত্র। ইহা অজ্ঞতারই নামান্তর। অন্ধ-ভক্ত এবং নাস্তিক, কাহারও নিকট তাই সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু অতি-বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের ধূম্রজালে জ্ঞানীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় না। এখানে জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া আমরা জন্মাষ্টমী-প্রকরণ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিভিন্ন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, বলা বাহুল্য তাহা অলৌকিক অর্থাৎ অপার্থিব। একথা বলার তাৎপর্য এমন নহে যে ভারত ভূমিতে কৃষ্ণ নামে রক্তমাংসের দেহধারী কোন মানুষ ছিলেন না। দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন; তিনি মথুরাধিপতি কংসকে নিধন করিতে পারেন; তিনি পাণ্ডবগণের মিত্র হইতে পারেন; তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জুনের সারথ্য করিতে পারেন; এমন কি অর্জুনকে ভগবদ্‌গীতা শুনাইয়া তাঁহার মোহ দূর করিতেও পারেন। কিন্তু যে কৃষ্ণের অলৌকিক জন্মকথাকে উপলক্ষ্য করিয়া জন্মাষ্টমী-ব্রতের প্রবর্তন হইয়াছে, তিনি কি সেই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ? ভাগবত পুরাণ কৃষ্ণের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ভগবান্ বলিতে এখানে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। যাবতীয় বৈষ্ণব-পুরাণে ভগবান্ ও বিষ্ণু শব্দ সমার্থক হইয়া গিয়াছে। বিশ্ব-চরাচরে যিনি পরিব্যাপ্ত

আছেন তিনি বিষ্ণু—এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। ভগবানের পালনী শক্তির নাম বিষ্ণু। বৈদিক সাহিত্যে সূর্যের এক নাম বিষ্ণু। সূর্যরূপ বিষ্ণু বর্ষচক্র আবর্তিত করিতে করিতে ঋতু নির্মাণ করিতেছেন; ঋতুতে ঋতুতে নানাবিধ শস্যসম্ভারে ধরিত্রী পরিপূর্ণ করিয়া জীবজগৎকে পালন করিতেছেন। পুরাণে কৃষ্ণের নাম গোপাল, গোবিন্দ। বিষ্ণুপুরাণ (৫।১) বলিতেছেন, "গবাং সূর্যঃ পরো গুরুঃ।" অর্থাৎ সূর্য গো-গণের পরম গুরু। এই 'গো', গোরু হইতে পারে না। 'গো' শব্দের এক অর্থ 'দ্যুতি'। গোপাল, গোবিন্দ—দ্যুতিমান্ সূর্য। পুরাণে কৃষ্ণের যে সকল বাল্য-লীলার বর্ণনা আছে, বিষ্ণু-পুরাণ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, সে সকল 'দিব্য' অর্থাৎ অমানুষিক। কৃষ্ণের ঐ সকল অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে ভীত ও বিস্মিত গোপগণ বলিতেছে :

"দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্।" কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রকৃতপক্ষে সূর্যলীলা। সূর্যই কৃষ্ণ; কারণ ধরিত্রীসহ সৌর-জগৎ তাঁহারই 'আকর্ষণে' বিধৃত আছে।

বায়ুপুরাণে (অঃ ৯০) আছে :

দেবদেবো মহাতেজাঃ পূর্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বিহারার্থং মনুষ্যেষু জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

অর্থাৎ, পূর্বকালে দেবদেব মহাতেজা 'প্রজাপতি' প্রভু নারায়ণ নরলোকে বিহারার্থ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার,—

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ।
দেবো বিষ্ণুরিতিখ্যাতঃ শক্রাদবরজোঽভবৎ॥

অর্থাৎ, যাদবনন্দন (কৃষ্ণ) অদিতির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

পুরাণে কৃষ্ণজননী দেবকী অদিতির অংশরূপে কীর্তিতা হইয়াছেন। অর্থাৎ দেবকী ও অদিতি অভিন্ন। অদিতির পুত্র আদিত্য, সূর্য। বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা; আর পুরাণে বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুজ, উপেন্দ্র। এই সকল তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু,বিষ্ণু ও সূর্য, অভিন্ন।

কৃষ্ণ সূর্য, বুঝিলাম। কিন্তু সূর্যের জন্ম হইবে কি প্রকারে? আর সে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রতোৎসবাদি পালনের তাৎপর্যই বা কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে কৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্তটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। কবে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল? বিষ্ণুপুরাণে (৫।১) শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন,—

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ, বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে (নভসি) কৃষ্ণাষ্টমীর রজনীতে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমি ঐ রাত্রে নবমী তিথিতে জন্ম লইবে।

সৌর শ্রাবণের প্রাচীন আর্তব নাম 'নভস্'। কিন্তু ভবিষ্য-পুরাণ মতে "ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে চাষ্টমী-সংজ্ঞিতে তিথৌ রোহিণী-তারকাযুক্তা রজনী"তে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। অতএব দুই পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণের জন্মতিথি সম্বন্ধে একটি মতবিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে'; ভবিষ্য-পুরাণ বলেন, 'ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে'। এই বিরোধটি আপাত-বিরোধ মাত্র। বিষ্ণুপুরাণ অমান্ত মাস এবং ভবিষ্যপুরাণ পূর্ণিমান্ত মাস গণনা করিয়াছেন; ফলে দুইটি গণনায় আপাতদৃষ্টিতে এক মাসের পার্থক্য ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ অমান্ত শ্রাবণ-কৃষ্ণাষ্টমী এবং পূর্ণিমান্ত ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী এক এবং অভিন্ন তিথি।

কিন্তু মৎস্যপুরাণ যে আবার অন্য কথা বলিতেছেন (অঃ ৪৭) :—

প্রথমা যা অমাবস্যা বার্ষিকী তু ভবিষ্যতি।
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ পূর্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতি॥

অর্থাৎ, বর্ষাকালের (অথবা বৎসরের) প্রথম অমাবস্যা তিথিতে মহাবাহু প্রজাপতি কৃষ্ণ পূর্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে 'বার্ষিকী' শব্দের উভয় অর্থই ধরা যাইতে পারে—'বর্ষাকালের' অথবা 'বৎসরের'। প্রাচীনকালে এখনকার মত আষাঢ় মাসে বর্ষাঋতু আরম্ভ হইত না। দুই সহস্র, চারি সহস্র, ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে যথাক্রমে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইত। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অতএব মৎস্য-পুরাণের বচন প্রণিধানযোগ্য। বিশেষতঃ মৎস্য-পুরাণ অতি পুরাতন গ্রন্থ। মহাকবি কালিদাস মৎস্যপুরাণ হইতে কাহিনী-ভাগ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অমর কাব্য 'কুমার-সম্ভবম্' রচনা করিয়াছিলেন। কালিদাস খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে জীবিত ছিলেন; তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই মৎস্য-

পুরাণ প্রসিদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের দুই-এক শতাব্দী পূর্বে এই পুরাণ রচিত হয়। ইহার তুলনায় বিষ্ণু-পুরাণ ও ভাগবত-পুরাণ অতি অর্বাচীন। এক অতি পুরাতন স্মৃতি ধরিয়া মৎস্য-পুরাণ 'প্রজাপতি' কৃষ্ণের জন্মতিথির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ষাকালের প্রথম অমাবস্যা। নিশ্চয় ইহা অমান্ত শ্রাবণ-অমাবস্যা, অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত ভাদ্র অমাবস্যা। অপরাপর পুরাণের মতে কৃষ্ণের জন্ম ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে। অতএব উভয় মতে কৃষ্ণের জন্মদিনে ৭ তিথির পার্থক্য হইতেছে। ইহার হেতু কি? কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের জন্মদিবস লইয়া এই মত-পার্থক্য ঘটিতে পারিত না। কৃষ্ণকে 'অনৈতিহাসিক' প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিতেছি ভাবিয়া ভক্তগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু অন্ধ-ভক্তি 'ধোপে টিঁকে না।' সত্য নির্ণয় করিতে হইলে সংস্কারমুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরাও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া কৃষ্ণের জন্ম রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আপাততঃ মৎস্য-পুরাণের কথা বাদ দিয়া বহু প্রচলিত ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীর কথাই ধরা যাউক। সেদিন আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল; ঘন ঘন বজ্রগর্জনে গগনতল প্রকম্পিত হইতেছিল। এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সূর্যরূপ কৃষ্ণের জন্ম। অতএব নিশ্চয়ই সেদিন একটা বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ ছিল। এই 'যোগ' দক্ষিণায়ন ব্যতীত অপর কিছু হইতে পারে না। সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামে; দিগ্‌দেশ জলের ভাষায় মুখর হইয়া উঠে; ঘন ঘন বজ্রগর্জন ও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতে থাকে; অম্বুবাচী হয়। অতএব, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে একদা সূর্যের দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, জন্মাষ্টমী-বৃত্তান্তে তাহারই ইঙ্গিত পাইতেছি।

কৃষ্ণের জন্মতিথিতে রজনী ছিল রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা। বহু পুরাণে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। রজনী রোহিণীযুক্তা, অর্থাৎ চন্দ্র তখন রোহিণী-নক্ষত্রে ছিলেন। প্রাচীন কালে ইহা একটি অতিশয় শুভ-যোগ বলিয়া গণ্য হইত; এখনও হয়। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের ব্যবধান ৯০° অংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ নক্ষত্র ভাগ। অতএব চন্দ্র রোহিণীতে থাকিলে সূর্য ছিলেন ফাল্গুনীতে। এখন একবার শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের রাত্রির আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। কৃষ্ণপক্ষে সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া আসিলে দেখিবেন আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষিয়া ফল্গুনী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। ফল্গুনীর দুই ভাগ—পূর্ব ফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনী। দুইটিতে মিলিয়া মোট চারিটি তারায় যেন একটি গৃহভিত্তি রচনা করিয়াছে। তবে এই কি কংসের কারাগার? ফল্গুনীর নিকটেই পূর্বদিকে উহার পরবর্তী নক্ষত্র হস্তায় নরহস্তের পঞ্চাঙ্গুলির সংস্থানে পাঁচটি তারা। পুরাণকার কি ইহাকেই বাসুকি নাগের ফণা কল্পনা করিয়াছেন? অসম্ভব নয়। কারণ গ্রীক পুরাণের হাইড্রা (Hydra) নামক দীর্ঘদেহ জলসর্প এই হস্তা হইতেই কল্পিত হইয়াছিল। পার্থক্যের মধ্যে, হাইড্রার মস্তক অশ্লেষায়, পুচ্ছ হস্তায়। হস্তার পরেই চিত্রা নক্ষত্র কন্যারাশির অন্তর্গত। ইহার তারাগুলি যোগ করিলে একটি কন্যা-মূর্তি পাওয়া যায়। গ্রীক তারা-পটে এই কন্যাই ভীর্গো (Virgo); উভয় কল্পনায় অর্থগত সাদৃশ্যও বর্তমান। তবে এই কি সেই কন্যা যোগমায়া, যিনি কৃষ্ণের সহিত একই রাত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? আর, ঐ যে স্রোত-স্বতীর জল-প্রবাহের মত শুভ্র ছায়াপথ পূর্ব-দিগন্তের দিকে হেলিয়া আকাশের উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে—ঐ কি পুরাণ-কথার যমুনা? হইতে পারে; কারণ, বেদে এই ছায়াপথই স্বর্গের গঙ্গা কল্পিত হইয়াছে। পুরাণে তাহার যমুনায় রূপান্তরিত হইতে বাধা কি? চিত্রার অতি নিকট দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রবিপথ বা ক্রান্তি-বৃত্ত ছায়াপথ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় ঐ পথেই বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে গিয়াছিলেন। পুরাণকারের কল্পনা-শক্তি অনুধাবন করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কিন্তু এ কল্পনা তো উদ্ভট কল্পনা নয়। পুরাণ কথা তো মিথ-ভাষিত নয়। ইহার মধ্যে আছে এক পরম-ঋতের, এক অভ্রান্ত সত্যের ইঙ্গিত। সেই ঋত, সেই সত্য এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে!

আমরা দেখিয়াছি, একদা ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল; জন্মাষ্টমীতে সেই স্মৃতি বিধৃত আছে। ঐ দিনটিতে এত গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, এককালে ঐ দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত। মৎস্য-পুরাণের বচনে আমরা পূর্বেই তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছি। বিষুব-দিন

অথবা অয়ন-দিন ব্যতীত বৎসর আরম্ভ হয় না। প্রাচীন-কালের নববর্ষের বহু স্মৃতি আছে; 'প্রবাসী'তে নানা প্রবন্ধে আমরা তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ঋগ্বেদের কালে উত্তরায়ণ-দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত; ইহার নাম ছিল 'হিম-বৎসর'। যজুর্বেদের কালে জলবিষুব দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত; ইহার নাম ছিল 'শরৎ-বৎসর'। কাল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। কালের অধিপতি 'প্রজাপতি' সূর্য আবার নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; নূতন করিয়া প্রজাসৃষ্টি ও প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণায়ন-দিনে নবযুগ ও নববর্ষ আরম্ভ হইল, জন্মাষ্টমীতে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নবযুগের নববর্ষের নবসূর্য। আমরা সেই বর্ষপতি সূর্যকেই অর্চনা করি। তাহার পরদিন 'নন্দোৎসব' অর্থাৎ নববর্ষের আনন্দোৎসব করি। যে বর্তুলাকার শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অর্চনা করি সে শিলা তো সূর্যেরই প্রতিরূপ। বেদের কালে দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য ইন্দ্র নামে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন; পুরাণের কালে তিনিই আবার উপেন্দ্র অর্থাৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ নামে পূজিত হইতে লাগিলেন ['ইন্দ্র-পরব' পশ্য; প্রবাসী, পৌষ -১৩৬১]। বৎসর-বাচক 'বর্ষ' শব্দের মূলে আছে এই দক্ষিণায়ন দিনে বৎসরারম্ভের স্মৃতি; কারণ এই দিনেই বর্ষাঋতু আরম্ভ হয়। এই স্মৃতি কতকালের, এক্ষণে আমরা তাহা নির্ণয় করিতে পারি।

বর্তমানকালে ৭।৮ আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়, বর্ষাঋতু আরম্ভ হয় (কিন্তু বর্তমানে বর্ষাঋতুতে বৎসর আরম্ভ হয় না; সে পুরাতন রীতি পরিত্যক্ত হইয়া এখন মহাবিষুব দিনে বৎসর আরম্ভ হইতেছে; অবশ্য উত্তর ভারতে ও মহারাষ্ট্রে অদ্যাপি যথাক্রমে হিমবর্ষ ও শরদবর্ষের স্মৃতি অব্যাহত আছে)। যে কালে ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইত, জন্মাষ্টমী সেই কালের স্মৃতি বহন করিতেছে। ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে ধরিতে পারি (অবশ্য এবৎসর ঐ তিথি ভাদ্রের মাঝামাঝি পড়িয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বৎসর এমন হয় না)। ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহ হইতে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দুই মাসের ব্যবধান। ২১৬০ বৎসরে অয়ন-দিন এক মাস পশ্চাদ্গত হয়। অতএব অদ্যাবধি ২১৬০×২=৪৩২০ বৎসর পূর্বে জন্মাষ্টমী পরিকল্পনা হইয়াছিল, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইবে না। স্থূল গণনায় খ্রী পূ ২৪০০ অব্দের কথা।

অন্য উপায়েও আমরা এই কাল পাইতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, জন্মাষ্টমীতে সূর্য যখন ফল্গুনীতে ছিলেন তখন দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। এখন সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। ফল্গুনী ও আর্দ্রার মধ্যে পাঁচ নক্ষত্র ভাগের ব্যবধান। অয়ন-দিন এক নক্ষত্র ভাগ পশ্চাদ্গত হইতে প্রায় ৯০০ বৎসর লাগে। অতএব ৯০০×৫ =৪৫০০ বৎসর পূর্বে, আনুমানিক খ্রী পূ ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তীকালে 'জন্মাষ্টমী' পরিকল্পিত হইয়াছিল। উভয় গণনার মধ্যে ১০০ বৎসরের পার্থক্য হইতেছে। ইহা অগ্রাহ্য।

মৎস্য-পুরাণ-মতে ভাদ্র-অমাবস্যায় কৃষ্ণের জন্ম; অর্থাৎ উক্ত পুরাণে ভাদ্র-অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি রক্ষিত আছে। ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী হইতে ৭ তিথির অন্তর। অতএব ইহা প্রায় ৫০০ বৎসর প্রাচীনতর কালের ইঙ্গিত করিতেছে। আনুমানিক খ্রী পূ ২৫০০+৫০০=৩০০০ অব্দের কথা।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার 'ভারত যুদ্ধ-কাল' প্রবন্ধে নানা যুক্তি প্রয়োগে প্রমাণ করিয়াছেন, খ্রী পূ ১৪৪২ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ নিশ্চয় সেই সময় জীবিত ছিলেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে-কৃষ্ণের জন্মোৎসব আমরা পালন করি, ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। পরবর্তীকালের পৌরাণিক কবিগণ ঐতিহাসিক কৃষ্ণের নামটি লইয়া তাঁহাতে সূর্য লীলা আরোপ করিয়া অপরূপ কাব্যকথা রচনা করিয়াছেন এবং সুকৌশলে ভারত-কৃষ্টির পুরাতন ইতিহাসকে অদ্যাপি নূতনের মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। পুরাণ-কথা শ্রবণ করিলে সত্যই পুণ্য হয়।

পরের দিন অফিসে বাসবী কথাটা পাড়ল।

কৃষ্ণা বসে বসে নভেল পড়ছিল। ম্যানেজার না থাকলে তার অঢেল সময়। টেলিফোন যন্ত্র বিশেষ ব্যস্ত থাকে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফোন কম করেন, তাঁর ফোনও বেশী আসে না। পার্টিরা, ইঞ্জিনীয়ার, ছুটকো-ছাটকা সবাই ম্যানেজারের সঙ্গেই কথা বলে।

কি খবর? বই মুড়ে কৃষ্ণা কথা বলল।

খবর আর কি। মহীতোষবাবুর বাড়ীর নিমন্ত্রণে যাচ্ছ ত?

হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই ত যাই।

কি দিই বল ত? একে মাসের শেষ, তার ওপর আমার অবস্থা ত জানই।

অবস্থা আমারও কিছু রাজকীয় নয়। আমি প্রত্যেক বছর রজনীগন্ধা দিই। এবারেও তাই দেব।

অফিসের সবাই যান?

না, না, কৃষ্ণা মাথা নাড়ল, শুধু মহীতোষবাবুর সেকশনের সকলের নিমন্ত্রণ হয়। তবে জানি না, এবার হয়ত সবাই যেতে পারে, কারণ পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের উৎসবের ব্যাপার ত।

বাসবী নিজের জায়গায় ফিরে এল।

কাল রাত্রে শুতে যাবার আগে হিসাব করেছে। টাকা চারেকের মতন খরচ করবে। এই টাকাটা খরচ করতেও তার বেশ কষ্ট হবে। অন্য দু' একটা খরচ বাঁচিয়ে তবে এটার ব্যবস্থা হবে।

রজনীগন্ধা কিনে দিতে পারলে মন্দ হ'ত না। অনেক কম খরচে হত। কিন্তু প্রথমবার সামান্য ফুলের গোছা নিয়ে নিমন্ত্রণে যেতে বাসবীর সঙ্কোচ হ'ল। আর একটু পুরোণো হোক, তখন না হয় এ সব জিনিষ দেবে।

তা ছাড়া, এ যদি মহীতোষবাবুর ব্যাপার না হয়ে অন্য কারও বাড়ীর নিমন্ত্রণ হ'ত, তা হ'লে বাসবী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। কোন ছল ছুতো করে। কিন্তু মহীতোষবাবুকে না বলা যায় না। সারা অফিসের মধ্যে এই একটি লোককে বাসবী অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে।

কাজ করতে করতেই বাসবী মুখ তুলেই অবাক্ হ'ল।

ম্যানেজারের ঘরে পাখা ঘুরছে। তার মানে অনিমেষ রায় ফিরে এসেছে বাইরে থেকে।

নিশিবাবুর চেয়ারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বাসবী দেখল চেয়ার খালি। নিশিবাবু নেই। নিশিবাবু নিশ্চয় ফাইল হাতে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাসবী বেশ কয়েকবার মুখ তুলে দেখল। পাখা ঘুরছে। নিশিবাবু ফিরে আসে নি।

নিশিবাবু ফিরল প্রায় টিফিনের মুখে। পিছনে বেয়ারার হাতে এক গাদা ফাইল।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে নিশিবাবু রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, যত ঝামেলা।

কথাটা নিশ্চয় বাসবীকে শোনাবার উদ্দেশ্যে বলা নয়, কিন্তু বাসবীর কানে গেল।

বাসবী কিছু না ভেবেই বলে ফেলল, কি হ'ল?

নিশিবাবু পলকের জন্য একবার চোখ ফিরিয়ে বাসবীর দিকে দেখল, তারপর বলল, চুরি!

চুরি? কোথায়?

অফিসে, আর কোথায়।

বাসবী সোজা হয়ে বসল। নিশিবাবুর দিকে চেয়ে বলল, সে কি?

আর সে কি। তবে ম্যানেজার সায়েব ধরে ফেলেছেন। একেবারে হাতে হাতে।

লোকটা কে? বাসবী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

আপনি চিনবেন না।

গম্ভীর গলায় কথাটা বলে নিশিবাবু হাতের কাজে মন দিল।

নিশিবাবুর কথার ধরনই এই রকম। কিছু বলে, কিছু চেপে রাখে। শ্রোতারা কৌতূহলী হয়ে উঠুক। বার বার

জিজ্ঞাসা করুক, তারপর কিস্তিতে কিস্তিতে কৌতূহল নিরসন করবে।

একটু পরেই নিশিবাবু কথা বলল। বাসবী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই।

আপনি চিনবেন কি করে। বিভাসবাবু বাইরে বাইরেই কাজ করত কি না। যেখানে আমাদের ফার্মের কাজ হ'ত, সেই সব জায়গায়। কুলিদের মাইনেপত্র, জিনিষপত্রের দাম সব তার কাছে পাঠানো হ'ত, অর্ধেক দিত আর অর্ধেক পকেটে রাখত। পাপ ত চাপা থাকে না। জানাজানি হয়ে গেল। ম্যানেজার সাহেব সরে-জমিনে তদারকে বেরিয়ে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন।

কি হবে লোকটার ?

শ্রীঘর বাস। ম্যানেজার সাহেব পুলিশের হাতে তাকে তুলে দিয়েছে। কাঁচা টাকার লোভ সামলানো কি সোজা কথা!

বাসবী অন্য কথা ভাবতে সুরু করল। দীপক গুপ্তকেও বাইরে পাঠানো হবে। যেখানে কোম্পানীর কাজ হচ্ছে সেই সব জায়গায়। কিছুদিন পরে তার হাতেও হয়ত এই রকম টাকা তুলে দেওয়া হবে। কুলিদের মাইনে, অন্যান্য খরচ বাবদ। দীপক যে বিভাসবাবু হয়ে উঠবে না তার কি প্রমাণ!

দীপককে বাসবী কতটুকু জানে। যেটুকু জানে তার ওপর নির্ভর করে তার জন্য সুপারিশ করা বাসবীর সমীচীন হয় নি। কিছু হ'লে ম্যানেজার বাসবীকে দায়ী করবে। বলবে, যাকে ভাল করে জানেন না, তার জন্য এ ভাবে কেন আবেদন করতে এলেন। শুধু আপনার অনুরোধেই দীপককে নেওয়া হয়েছিল।

তখন কি হবে! কি করবে বাসবী!

অফিসের কোন লোকই বিশ্বাস করবে না দীপককে বাসবী মোটেই ঘনিষ্ঠভাবে জানে না। মাত্র কয়েকটা দিনের পরিচয়।

দু' একজন হয়ত আরও গভীর কিছু চিন্তা করে বসবে। দু' জনের মধ্যে ষড়যন্ত্রের উৎসের সন্ধান পাওয়াও বিচিত্র নয়। মানুষের মন এক জটিল অরণ্য। বিবেকের স্বর্গালোকের পথ রুদ্ধ।

বাসবী একবার ভাবল অনিমেষের কামরায় ঢুকে কথাটা তাকে বলে দেবে দীপককে টাকা-পয়সার দায়িত্ব যেন না দেওয়া হয়। আর যদি দেওয়াই হয়, সে বিষয়ে বাসবীর কোন দায় থাকবে না। কিছু হ'লে তার কাছে যেন কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া না হয়।

একটু পরেই সমস্ত ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা বাসবী বুঝতে পারল।

এখনও দীপক কাজে যোগ দেয় নি। তাকে কি কাজের ভার দেওয়া হবে সে বিষয়ে বাসবী কিছুই জানে না। আগে থেকে তাই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করাটা অর্থহীন।

নিজের মনে কাজ করতে করতেই বাসবী চমকে উঠল। ম্যানেজারের ঘর থেকে একটা কান্নার সুর ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের।

প্রথমেই বাসবীর বেলাদেবীর কথাটা মনে এল। পাওনার টাকা নিয়েই বোধ হয় গোলযোগ সুরু হয়েছে।

কিন্তু বেলাদেবীকে বাসবী যতটুকু দেখেছে, তাতে সে এভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর তুলে কাঁদবে, এ ধরনের স্ত্রীলোক মনে হয় নি। সমস্ত শরীর ফুটে দম্ভ আর অহমিকার দীপ্তি। পৃথিবীর কাউকে পরোয়া করে না মুখে চোখে তারই ছাপ।

বাসবী নিশিবাবুর দিকে চোখ ফেরাল।

নিশিবাবুও বাসবীর দিকে চেয়েছিল।

চোখে চোখ মিলতেই নিশিবাবু বলল, চোরের বৌয়ের কান্না। বিভাসবাবুর পরিবার এসেছে ম্যানেজার সায়েবের কাছে।

কথার শেষে নিশিবাবু মুচকি হাসল।

বাসবী কোন কথা বলল না। মাথাটা নীচু করল।

একজনের বেদনা নিয়ে পরিহাস করতে তার মন চাইল না।

বিভাসবাবুর কি অপরাধ, কতটা, সেটা বাসবী কিছুই জানে না। মধ্যবিত্ত এক সংসারে অভাবের হাজার ছিদ্র। হয়ত কোন একটা দাবি মেটাবার জন্যই অফিসের টাকায় হাত দিয়েছিল। ভেবেছিল, যে টাকাটা নিয়েছে সেটা আস্তে আস্তে শোধ করে দেবে। কেউ জানতে পারবে না। সেটা পারে নি। বিশ্রী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

নিজের কথা বাসবীর মনে পড়ে গেল।

তার বাপের মারাত্মক অসুখের সময় ডাক্তারের কাছে, ওষুধের দোকানে ছোটাছুটি করার সময় কতবার বাসবী ভেবেছে, যদি পথের ধারে নোট বোঝাই একটা মণিব্যাগ কুড়িয়ে পায়। বেশী টাকার দরকার নেই। নামী ডাক্তার একজন আর দামী ওষুধ-পত্রগুলো কিনতে পারার মতন টাকা।

কিছু বলা যায় না। সেই সময় বাসবীর কাছে যদি অন্য কারো টাকা গচ্ছিত থাকত, তা হ'লে ধর্মাধর্ম বিবেচনা করার সময় আর মন তার ছিল না। সে অনায়াসেই সে

টাকা থেকে খরচ করে ফেলত। কি ভাবে শোধ করবে, সে কথা চিন্তা না করেই।

বিভাসবাবুর সে রকম কিছু হয়েছে কি না কে জানে।

কিংবা।

একটা সাদা কাগজে আঁকি-বুঁকি কাটতে কাটতে বাসবী ভাবতে লাগল।

হয়ত বিভাসবাবুর স্ত্রী কিছু জানেই না।

কৃষ্ণার বাবা যেমন যা উপার্জন করে তার বেশীর ভাগই নষ্ট করে মদ আর রেসে। সংসারের কাছে বিশেষ কিছুই পৌঁছায় না। বিভাসবাবুরও হয়ত এ ধরনের কোন ব্যাধি আছে। যা অর্জন করে, তা ত নষ্ট হয়ই, যে টাকা ছোঁয়া অন্যায়, পাপ, সে টাকাও নষ্ট করে সংসারকে উপবাসী রেখে।

এর 'জন্য তার স্ত্রীর কান্না ছাড়া আর কি করবার আছে।

চোরের বউ হওয়া নিশ্চয় অপরাধ নয়। এ দেশে হাজার হাজার মেয়ে এমনি চোখের জল ফেলছে। স্বামীকে সুপথে ফেরাবার হাজার চেষ্টা করে বিফল হয়ে, চোখে আঁচল তুলে দেওয়া ছাড়া তাদের কোন গতি নেই।

কান্নার আওয়াজটা বাড়তেই বাসবী চমকে মুখ তুলল।

ম্যানেজারের দরজা খুলে গেল।

সন্তর্পণে ধরে ধরে বেয়ারা একটি স্ত্রীলোককে বাইরে নিয়ে এল। অবগুণ্ঠনবতী, রোরুদ্যমানা নারী। অফিসসুদ্ধ সবাই চেয়ে চেয়ে দেখল।

মহিলা মুখে ঘোমটা থাকায় দিক ভুল করে অফিসের দিকে চলে আসছিল, বেয়ারা তার গতিরোধ করল।

ওদিক নয়, এদিকে আসুন আপনি। বাইরে যাবার সিঁড়ি এদিকে।

ঘোরবার সময় অসাবধানে মাথার ঘোমটা সরে গেল। ক্ষণেকের জন্য মুখটা দেখা গেল।

বাসবী অবাক্ হয়ে দেখল।

অনিন্দ্যসুন্দরী এক নারীর মুখ। শিশিরসিক্ত পদ্মের সামিল। সুগৌর বর্ণ, আয়ত নয়ন, কম্পিত ওষ্ঠাধর রক্তিম।

যত বয়স বাসবী আন্দাজ করেছিল, মেয়েটি তার চেয়ে অনেক কমবয়সী।

বেয়ারা বোধ হয় মেয়েটিকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। সে অনেক পরে ফিরল।

ফিরতেই বাসববাবু ইসারায় বেয়ারাকে ডাকল।

বেয়ারা বাসববাবুর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রীতিকে আমার কাছে নিয়ে এলি না কেন?

বেয়ারা প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে।

ওই মহিলা, মানে বিভাসবাবুর স্ত্রীকে কাছে নিয়ে এলি কেন না?

এ কথায়ও কোন উত্তর বেয়ারা দিতে পারল না। মহিলার যে অবস্থা তাতে কোন রকমে তাকে বাসে উঠিয়ে দিতে পেরেছে, এই যথেষ্ট।

আর তা ছাড়া বাসববাবুর কাছেই বা নিয়ে আসতে যাবে কেন। মহিলার কি সর্বনাশ হয়েছে তা বুঝি বাসববাবুর জানা নেই।

বেয়ারা আস্তে আস্তে সরে এল।

বাসববাবু পাশে-বসা মহীতোষবাবুকে বলল, মহীতোষদা, বিভাসের ব্যাপারটা শুনেছেন?

মহীতোষবাবু কলম থামিয়ে বলল, হ্যাঁ কদিন ধরেই ত একটু একটু কানে এসেছে।

রোগটা কোথায় বুঝতে পেরেছেন?

মহীতোষবাবু ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ বোঝে নি।

ওই এক রোগ। একবার যেমন প্রীতির জন্য পাগল হয়েছিল, এখন আবার তেমনই শকুন্তলা সোমের জন্য ক্ষেপে উঠেছে। সব ঢালছে তার পায়ে।

মহীতোষবাবুর মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল, সে বাসববাবুর কথার বিন্দুমাত্র রসগ্রহণ করতে পারছে না।

বাসবী কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে রইল। প্রীতি আর শকুন্তলা দুটো নামই তার কানে গিয়েছিল। বুঝতে পারল সেই চিরন্তন ব্যাপার। এক নারীর মোহে পড়ে আর এক নারীকে অবহেলা।

কিন্তু প্রীতির মতন সুন্দরী মেয়েকে অবজ্ঞা করে আর কোন মেয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে সুরু করেছে বিভাস। এমন কোন্ মেয়ে যার জন্য এভাবে সে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

আগে ত বিভাস দিনরাত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। এক অনুরোধ প্রীতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। দিলাম আলাপ করিয়ে, 'বিয়ে থাও হ'ল। বেশ ছিল দুজনে। কোথা থেকে শকুন্তলা সোম এসে জুটল।

হঠাৎ বাসববাবু থেমে গেল।

বাসবী মুখ তুলে দেখল, ম্যানেজার কামরা থেকে বাইরে বেরিয়েছে। অফিসের দিকেই আসছে।

বাসবী ফাইলের পাতায় চোখ নামাল।

অনিমেষ সোজা এসে নিশিথবাবুর সামনে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে তার সঙ্গে কি বলেই বাইরে চলে গেল

একটু পরেই নিশিবাবু কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে অনিমেষের পিছন পিছন গেল।

আর থাকতে পারল না বাসবী। কৌতূহল অন্য নাম বমণী তোমার। উঠে গিয়ে বাসববাবুর সামনে দাঁড়াল।

আচ্ছা, কি ব্যাপার বলুন ত? ও মেয়েটি কে, ওভাবে কাঁদতে কাঁদতে ম্যানেজারের কামরা থেকে বের হ'ল।

সামনের চেয়ারের দিকে হাত দেখিয়ে বাসববাবু তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে বলল, বসুন, মিস সেন। সে এক উপন্যাস বিশেষ।

বাসবী অন্য সময় হ'লে কি করত বলা যায় না। কিন্তু এ কাহিনী না শুনলেও স্বস্তি পাবে না, তাই বসল।

প্রীতি আমাদের সঙ্গে অভিনয় করত। এই অফিসেও অনেকবার করেছে। জানেন ত কলকাতায় একদল মেয়ে আছে যারা অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে জীবন চালায়! প্রীতি তাদেরই একজন। এ পথে অনেক অসুবিধা, অনেক বাধা। নিজেকে বাঁচিয়ে না চলতে পারলেই পতন অনিবার্য। তবু উপায় নেই, অনেক মেয়ে শিল্পকে ভালবেসে এ লাইনে আসে, আবার কেউ নিজের সংসার বাচাবার জন্য। প্রীতিকে দেখে বিভাসের পছন্দ হয়। আমারই মধ্যস্থতায় বিয়ে হয় দু'জনের।

বাসবী এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। সবাই কাজ ফেলে এদিকে চেয়ে রয়েছে। এ কাহিনী তাদের নিশ্চয় জানা তবু এমন মুখরোচক ব্যাপার একাধিকবার শুনতে মন্দ লাগাব কথা নয়।

বিভাস বদলি হয়ে বাইরে চলে গেল। প্রীতি আর তার মা রইল এখানে। তারপর শুনছি নাকি বিভাস টাকাকড়ির কি সব গোলমাল করেছে। প্রীতির সঙ্গে অনেক দিন আগে একবার দেখা হয়েছিল। তার মুখেই শুনেছিলাম শকুন্তলা সোমের কথা। শকুন্তলা সোমও অ্যামেচার ক্লাবের আর্টিস্ট। কি করে দু'জনের দেখা হ'ল ঈশ্বর জানেন, তবে শুনলাম বিভাস নাকি হাবুডুবু খাচ্ছে। বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, খোঁজ-খবরও নেয় না।

আপনি বিভাসবাবুকে সাবধান করে দিলেন না কেন?

বাসববাবু হাসল, যে পতঙ্গ আগুনে পুড়বেই, তাকে আটকানো বড় মুস্কিল। আমি খান দুয়েক চিঠি লিখেছিলাম, উত্তর পাই নি। আসল কথা হচ্ছে শকুন্তলা কি ধরনের মেয়ে আমার জানা আছে। এসব মেয়ে কাউকেই ভালবাসতে পারে না। শুধু সংসার জ্বালায়। মানুষের সর্বনাশ করে। বিভাস কি করেছে ঠিক আমার জানা নেই। কত টাকার ব্যাপার তাও জানি না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, সব কিছুর মূলে ওই শকুন্তলা সোম।

বাসববাবু দম নেবার জন্য একটু থামল।

সেই অবকাশে বাসবী নিজের জায়গায় ফিরে এল।

প্রথম দিকে অদেখা-অচেনা বিভাসবাবুর জন্য যেটুকু মমতা সঞ্চিত হয়েছিল, বাসববাবুর কথা শোনার পর সেটুকু অন্তর্হিত হ'ল।

ভালই হয়েছে, এমন লোকের সাজা হওয়া প্রয়োজন। লাম্পট্যের ক্ষমা নেই।

তবু কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে প্রীতির অশ্রুসিক্ত মুখের ছবি বার বার মানসপটে ভেসে উঠল। একজনের অপরাধে আর একজন কেন শাস্তি পাবে! মর্মদহন এও ত বড় কম শাস্তি নয়।

সম্ভবত প্রীতি নিজেকে বাঁচাবার জন্য আবার অ্যামেচার থিয়েটাবে যোগ দেবে। যদি শক্তি থাকে, এ লাইনে অর্থোপার্জন করা তার পক্ষে কঠিন হবে না। মুখে-ঠোঁটে রং মেখে ফেলে-আসা আর একটা জীবনের বেদনা ভোলার চেষ্টা করবে।

কিন্তু স্মৃতি মুছে ফেলা এত সহজ সাধ্যই যদি হ'ত!

আজকের প্রীতিকে দেখে বাসবীর এইটুকু বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় নি বিভাসের সঙ্গে প্রীতির যোগটা কত নিবিড়। এমন একটা সৌহার্দ, সম্প্রীতি, প্রেম অবলীলাক্রমে মুছে ফেলা যায় না। বিভাস অন্যায় করেছে বলেই প্রীতি তাকে ভুলে যাবে বা ভুলতে পারবে, এমন মনে হয় না।

কাজ করতে করতেই বাসবী টের পেল নিশিবাবু ফিরে এল।

আড়চোখে বাসবী একবার ফিরে দেখল।

নিশিবাবু হাতের কাগজগুলো আছড়ে টেবিলের ওপর ফেলে বলল, অফিসের কাজ করব, না বাইরের ঝক্কি সামলাব।

বাসবী কিছু বলল না। শুধু মুখ তুলে চাইল।

নিশিবাবু বেয়ারাকে ডেকে জলের ফরমায়েশ করল। জল এলে এক চুমুকে পুরো গ্লাস শেষ করে বাসবীর দিকে ফিরে বলল, থানায় গিয়েছিলাম।

বাসবী এবারেও বাক্যস্ফূর্তি করল না। চুপচাপ চেয়ে রইল।

প্রায় সাত হাজার টাকার ব্যাপার। কোম্পানী ছাড়বে কেন। আর কি করেই বা ছাড়বে। লিমিটেড কোম্পানী। শেয়ারহোল্ডার রয়েছে, অডিটর রয়েছে। তারা কি বলবে!

বেয়ারা এসে বাসবীর সামনে দাড়াল।

ম্যানেজার সাব সেলাম দিয়া।

নিশিবাবু মুখ টিপে হাসল, যান, ম্যানেজার সায়েবের মুখ থেকেই বাকিটা শুনবেন। আমি যে কেন বোকার মতন এ সব কথা আপনাকে বলতে যাই। খোদ কর্তা রয়েছেন আপনার জানা।

বাসবী আরক্ত হ'ল কিন্তু কোন কথা বলল না দ্রুত পায়ে ম্যানেজারের কামরার দিকে চলে গেল।

সারা টেবিলে ফাইল ছড়ানো। একপাশে চিঠির স্তূপ।

চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে অনিমেষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনিমেষকে বাইরে যেতে বাসবী দেখেছিল, কিন্তু কখন ফিরে এসেছে সেটা লক্ষ্য করে নি। অনিমেষকে রীতিমত বিব্রত, উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

বসুন।

বাসবী বসল।

টেবিলে ভর দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে অনিমেষ বলল, আচ্ছা, সেই দীপক গুপ্ত ছেলেটি কেমন?

আপনি ত তাকে দেখেছেন। ইন্টারভ্যুর সময়।

হুঁ, দেখেছি। এদিকে ত ভালই। ছেলেটি বিশ্বাসী? তার ওপর আস্থাস্থাপন করা যায়?

বাসবী বুঝতে পারল, যে ব্যাপারে সে ভয় পাচ্ছিল, অনিমেষ সেই বিষয়েই প্রশ্ন করছে। সুযোগ যখন এসেছে, তখন খোলাখুলি বলে ফেলাই ভাল। পরে অসুবিধায় না পড়তে হয়।

আপনাকে ত বলেছি আমি দীপকবাবুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। মাত্র দু' একদিনের আলাপ। ভদ্রলোক কতটা বিশ্বাসী হবেন, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

দুটো কাঁধ উঁচু করে অনিমেষ হতাশাব্যঞ্জক একটা ভঙ্গি করল, তারপর বলল, ব্যাপারটা আমি আপনাকে খুলে বলছি। রাঙামাটিতে আমাদের যে ব্রীজ তৈরী হচ্ছে সেখানে কোম্পানীর ক্যাম্প অফিসে ছিলেন বিভাসবাবু। বিভাস হালদার।

আমি কিছুটা জানি। বাসবী বলল, বিভাসবাবু টাকাপয়সার গোলমাল করে ধরা পড়েছেন, তার জায়গায় আপনি দীপক গুপ্তকে পাঠাতে চান।

দু' এক মিনিট অনিমেষ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বলল, বা, আপনি খুব কাজের মেয়ে। অনেকটাই জানেন। তবে আমি দীপক গুপ্তকে এখনই পুরো চার্জ দিতে চাই না। তার সঙ্গে অফিসের একজনকে পাঠাব। মহীতোষবাবুকে। মহীতোষবাবু কিছুদিন থাকবেন। কাজের ধারাটা দীপকবাবুকে বুঝিয়ে দেবেন। দীপকবাবুর ওপর নজরও রাখবেন। যদি তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তা হ'লে আমাদের লিখবেন. আমি সে রকম বন্দোবস্ত করব। তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন।

দীপক গুপ্তর বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

বাড়ীতে?

হ্যাঁ। একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে বাড়ীর হালচাল দেখে আসতে হবে। ঠিক কি রকম তাদের অবস্থা। কেমন পরিবার। শিক্ষাদীক্ষা রুচি নীতি সব কিছুর খবর আনতে হবে। মানে, দীপকবাবু কি রকম ঘরের ছেলে জানতে পারলে তার ওপর কতটা আস্থা রাখা যেতে পারে সেটার বিচার করা সহজ হবে। আপনিই এ কাজটা পারবেন আপনি গেলে ওদের বাড়ীর লোক কিছু সন্দেহও করবে না।

কেন? সন্দেহ করবে না কেন?

চাকরি হ'তে ভদ্রলোক আপনার বাড়ী মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলেন। মিষ্টির অংশ না পেলেও তার খবর আমি রাখি। কাজেই বেড়াতে বেড়াতে আপনি তার বাড়ী একবার পায়ের ধুলো দেবেন, এটা স্বাভাবিক।

অন্য জায়গা হ'লে আঁচল দিয়ে বাসবী নিজের বিব্রত, আরক্তিম মুখটা আবৃত করত। কিন্তু এখানে সেটা সম্ভব নয়।

সে এটুকু বুঝল নিশিবাবু যে শুধু এই কামরার কথাই বাইরে ছড়ান এমন নয়, বাইরের কথার টুকরোও এ ঘরে নিয়ে আসেন।

ঠিক আছে। যাব।

বাসবী ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পেল।

অনিমেষ বলল, দাঁড়ান, ঠিকানাটা নিশিবাবুর কাছ থেকে নিয়ে যান আর আমি ক্যাশিয়ারকে একটা স্লিপ দিয়ে দিচ্ছি, আপনার যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটাও দিয়ে দেবেন।

ট্যাক্সিতে বসে বসেই ভাবল বাসবী, হঠাৎ তার বাড়ী গিয়ে ওঠার কি কৈফিয়ৎ দেবে দীপককে?

এ পাড়ায় এসেছিল, কিংবা যাচ্ছিল এ বাড়ীর সামনে দিয়ে, একবার দেখা করে গেল। দীপক ত আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েই এসেছিল।

ট্যাক্সির ব্যাপারেও বাসবী একটু চিন্তা করেছিল।

একবার ভেবেছিল, ট্যাক্সির ভাড়া হাতের মুঠোয় এসেছে ভালই, বাসবী রোজকার মতন ট্রামেই যাবে। বাড়তি পয়সাটা হাতে থাক। দরকারে, অদরকারে কাজে লাগবে।

কিন্তু ট্রামে-বাসে নয়, বাসবী একটা ট্যাক্সিই ডাকল।

কি দরকার, অফিসের লোকরা দু' একজন জানে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে বাসবী ট্যাক্সিভাড়া নিয়েছে। অফিসের কাজে কোথায় তার যাবার কথা। হঠাৎ যদি ট্রামে অফিসের কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ত কি মনে করবে! এক কান থেকে পাঁচ কান হবে। নিশিবাবুর কানে ওঠা মানেই অনিমেষ রায়ের জানতে পারা। উনি হয়ত কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে বাসবীর সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করবে।

বিশেষ করে বিভাসবাবুর এমন একটা ব্যাপারের পর সব কিছুই সন্দেহের ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়ে যাবে।

গলিটা বাসবী খুঁজে পেল, কিন্তু নম্বরটা মেলাতে পারল না।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে বাসবী হাটতে আরম্ভ করল। গলিতে বাড়ীর নম্বরগুলো ধারাপাতকে অনুসরণ করে নি। মনে হয় কে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। যার যেখানে খুশী, সেখানে গিয়ে পড়েছে।

পাঁচের দুই বাই ডি।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে বাসবী আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দীপক গুপ্ত। বাপের নাম সঞ্জিত গুপ্ত।

এই দুই নাম নির্ভর করে আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে।

রাস্তার দু' পাশে ছোটখাট একটা বাজার বসেছে। সারা পথ জুড়ে কপির পাতা, পেঁয়াজের খোসা আর শালপাতার টুকরো। তাই মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাসবী এগিয়ে চলল।

একটা বাড়ীর রোয়াকে একটি বৃদ্ধ বসেছিল পাখা হাতে করে, বাসবী তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আচ্ছা, পাঁচের দুই বাই ডি নম্বরটা কোথায় বলতে পারেন?

বৃদ্ধ পাখা থামিয়ে বলল, এই সব বাড়ীটার নম্বরই পাঁচের দুই বাই ডি। আপনি কাকে চাইছেন বলুন? কি নাম?

দীপক গুপ্তকে দরকার।

দীপক আমারই ছেলের নাম। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বাসবী নিজের অফিসের নাম বলল।

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ বাসবীর আপাদমস্তক দেখে বলল, আপনিই বাসবী সেন?

বাসবী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

বৃদ্ধ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল।

আসুন মা, আসুন। আপনি দয়া করে গরীবের কুটিরে পায়ের ধূলো দেবেন, ভাবতেও পারি নি। ভিতরে আসুন।

বাসবী প্রতিবাদ করল না। দীপক তার বাড়ীতে গিয়েছে। সেটা যে ধনীর প্রাসাদ নয় সেটা নিশ্চয় বৃদ্ধের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলতে ভাল লাগল না। এ সব কথা সৌজন্যের ভূমিকা।

বৃদ্ধের পিছন পিছন বাসবী এগিয়ে গেল।

ভেজানো দরজা হাত দিয়ে ঠেলে বৃদ্ধ প্রথমে ঢুকে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, আসুন, আসুন।

বাসবী ঘরের মধ্যে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

খুব কম পাওয়ারের বাতি। অন্ধকার ঘোচাবার সামর্থ্য তার খুবই কম। ইঁটের পাঁজর-প্রকট দেয়াল। একপাশে স্তুপাকার বিছানা বালিশ। এককোণে একটা টেবিল। তার ওপর রাশীকৃত বই।

বৃদ্ধ কোণ থেকে একটা গোটানো মাদুর এনে মেঝেয় পেতে দিয়ে বলল, আপনার বসতে একটু অসুবিধা হবে। দেখছেনই ত ঘরদোরের অবস্থা।

এবারেও কোন কথা না বলে বাসবী মাদুরের ওপর বসল।

বৃদ্ধ ভিতরের ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করতেই বাসবী বাধা দিল।

শুনুন।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন আয়োজন করবেন না। আমি অফিস থেকে দরকারী একটা কাজে এসেছি।

একবার দীপকের মাকে ডেকে দিই। দীপক টিউশনি করতে গেছে। ফিরতে রাত হবে।

বৃদ্ধ ভিতরে চলে গেল।

বাসবী বসে বসে ঘরের চারদিকে নজর বোলাল। হতশ্রী রূপ। জরাজীর্ণ অবস্থা। এ বাড়ীর বাসিন্দাদের অবস্থারই যেন প্রতিচ্ছবি।

পিছনে দরজার শব্দ হ'তেই বাসবী মুখ ফেরাল।

আধ-ময়লা শাড়ীপরা শীর্ণ চেহারার একটি প্রৌঢ়া। রং এক সময়ে গৌর ছিল, এখন অভাব-অনটনে তামাভ। তবু একেবারে নিঃস্ব নয়। কোঁচকানো চোখ দু'টি একদা আয়ত ছিল সেটা বোঝা যায়। নাক-মুখও সুগঠিত।

এস মা, এস, তুমি আমাদের যা উপকার করেছ তা জীবনে ভোলবার নয়। দীপুকে তুমি চাকরি না দিলে আমাদের যে কি অবস্থা হ'ত, ভাবতেই পারছি না।

প্রৌঢ়া ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাসবী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দুটো হাত জোড় করে।

প্রৌঢ়ার কথা শেষ হ'তেই বলল, আমিও অফিসের সামান্য একজন কেরাণী। কারও চাকরি করে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। দীপকবাবু নিজের কৃতিত্বেই চাকরি যোগাড় করেছেন।

তা বললে শুনব কেন মা? এত বছর ধরে কম চেষ্টা করেছে অফিসে অফিসে। কিছুই করতে পারে নি। তুমি দয়া করে তোমাদের অফিসে নিলে তাই।

বাসবী আর কথা বাড়াল না। বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলল, আসুন, অফিসের কাজটা আগে সেরে নিই।

বৃদ্ধ মাদুরের একপ্রান্তে বসে পড়ল।

অফিসে কতকগুলো দায়িত্বপূর্ণ পদ আছে। টাকা-কড়ির ব্যাপার। সেই রকম একটা পদে দীপকবাবুকে বসাবার কথা ম্যানেজার চিন্তা করছেন। সাধারণতঃ এ ধরনের চাকরিতে যাদের নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে জামানত হিসাবে কিছু টাকা নেবার ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছেন। বৃদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে বলল।

এ ক্ষেত্রে জামানতের কথা ম্যানেজার ভাবছেন না। সেইজন্য আমাকে পাঠিয়েছেন খোঁজ-খবর নিতে। আপনি নিশ্চয় এখন চাকরি করেন না?

করি মা। আমি কর্পোরেশন স্কুলে ছাত্র পড়াই। সারাটা জীবন মাষ্টারীই করে এসেছি। আগে পাবনায় হাইস্কুলে হেড মাষ্টার ছিলাম। তারপর দেশ ভাগ হ'তে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম এদেশে। যথা-সর্বস্ব ফেলে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দীপু ছোট, দীপা বড়। দীপালী বিয়ের এক বছরের মধ্যে কপাল পুড়িয়ে আমার কাছে চলে এল। যেটুকু খুদ-কুড়ো সঙ্গে আনতে পেরেছিলাম তাই দিয়ে ছেলেকে পড়ালাম আর আমাদের এত বছর চলল। ভেবেছিলাম ছেলে মানুষ হয়ে আমাদের দুঃখ ঘোচাবে। ছেলে অমানুষ হয়েছে এমন কথা বলব না, কিন্তু আমাদের দুঃখ ঘোচাবার তার সামর্থ কই! দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে, সারা দেশ জুড়ে কেবল নেই, নেই, নেই। দীপকদের সাধ্য কি মাথা তুলে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্ত একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল মা।

এত কথায় বাসবী কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতন কিছু ছিলও না। পথে, ঘাটে, সংবাদপত্রে এই কথারই প্রতিধ্বনি। শুনতে শুনতে মানুষের বধির হয়ে যাবার অবস্থা। তাছাড়া এসব কথা শুনে বাসবীর কোন সুরাহাও হবে না।

অভাবগ্রস্ত মানুষের লোভী হওয়ার পথে কোন বাধা নেই। দিগন্তে স্বপ্ন থাকে অথচ সামর্থ্য থাকে না, এমন মানুষই অনেকগুলো টাকা হাতে এসে গেলে বেসামাল হয়ে পড়ে।

দীপকও যে এমন হবে না, এ কথা কে বলতে পারে!

আমি যে কথা বলছিলাম, বাসবী আবার খেই ধরল, টাকা-পয়সার ব্যাপার। মানুষের কথা ত কিছু বলা যায় না। সম্প্রতি আমাদের অফিসে একটা কেস হয়ে গেছে—

বৃদ্ধ বাধা দিল, তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝতে পেরেছি মা। আমার মনে হয় সেদিক থেকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা গরীব বটে, কিন্তু অসৎ নই মা। দীপককে আমি যতটুকু জানি সে তোমার বিশ্বাসের অযোগ্য হবে না, এইটুকু বলতে পারি।

বৃদ্ধ বিচলিত অবস্থায় আপনি থেকে তুমি বলে সম্বোধন সুরু করল।

এইটুকু আশ্বাস পেলেই আমার হবে। বুঝতেই পারছেন, অফিসের ম্যানেজারের কথায় আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণাও করতে হয়েছে তাঁরই অনুরোধে।

তোমার কি দোষ মা। আর এতে অন্যায়ই বা কি আছে। এটুকু করা দরকার বৈ কি। দীপককে তুমি কতটুকু জান? কি আর জান তার সম্বন্ধে। টাকাকড়ির ভার তার ওপর দেবার আগে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার বই কি! তবে কথাটা কি জান, মুখ দেখে আর মানুষের কতটুকু জানা যায়। আমি বাপ, আমি ত ছেলেকে ভাল বলবই। তার চেয়ে এক কাজ করব। পাড়ায় কলেজের একজন প্রিন্সিপাল থাকেন, তিনি দীপককে খুব ভালবাসেন, তাঁর কাছ থেকে বরং একটা সার্টিফিকেট নিয়ে পাঠিয়ে দেব। আর একজন সরকারী বড় চাকুরেও রয়েছেন পাড়ায়, তিনিও বোধ হয় একটা সার্টিফিকেট দিতে আপত্তি করবেন না। তাতেই বোধ হয় হয়ে যাবে মা?

ঘাড় নেড়ে উঠতে গিয়েই বাসবী বাধা পেল।

প্রথমে প্রৌঢ়া, তার পিছন পিছন একটি বিধবা তরুণী। শ্যামাঙ্গী কিন্তু লাবণ্যময়ী। তবু সেই লাবণ্য ঘিরে একটা ধূসর রুক্ষতা। খুব সামান্য। কাছে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলে তবে চোখে পড়ে।

তরুণীর এক হাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে একটি প্লেটে দুটি মুড়ির মোয়া।

একি করেছেন? বাসবী আপত্তি জানাল।

কিছুই করি নি মা। প্লেটে কি আছে আগে দেখ। বাড়ীতে যা ছিল, তাই দিয়েছি।

আমার মেয়ে দীপালী। বৃদ্ধ কম্পিত গলায় বলল।

দীপালী দুটো হাত যোড় করে নমস্কার করল। কমনীয়, সপ্রতিভ ভঙ্গি।

বাসবী প্রতি নমস্কার করে বলল, আমি বরং শুধু চা-টা খাই।

দীপালী খুব মৃদুকণ্ঠে, প্রায় চাপা গলায় বলল, মোয়াগুলো দোকানের নয়, দুপুরে বসে বসে মা তৈরী করেছেন।

কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা সুর ছিল, প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা মায়ের ওপর যে কিছুক্ষণ বাসবী কোন কথা বলতে পারল না।

একটু পরে শুধু আস্তে আস্তে বলল, আমি একটা খাই। দুটো পারব না।

চা আর একটা মোয়া শেষ করে বাসবী উঠে পড়ল। এমন একটা পরিবেশে বসে থাকতে তার ভাল লাগছে না। বৃদ্ধের সস্নেহ দৃষ্টি, প্রৌঢ়ার প্রীতি-নিষিক্ত কথাবার্তা, আর বিধবা তরুণীর নিশ্চল ভঙ্গি বাসবীকে দুর্বার ভাবে আকর্ষণ করছে।

ছন্নছাড়া একটা সংসার। ভগ্ন আশা কয়েকটা মানুষ। সারা দেশ জুড়ে এই এক ছবি। বিবর্ণ, ধূলি-মলিন।

আজ আমি উঠি।

আবার এস মা। তোমার মতন মেয়েকে আপ্যায়ন করার মতন সম্পদ আমাদের নেই, শুধু সব কিছু নিজের ভেবে আবার এস।

বৃদ্ধ বাসবীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত এল।

যাবার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাসবী বলল, দীপকবাবুর হাতে সার্টিফিকেট দুটো পাঠিয়ে দেবেন আর দীপকবাবুকে কাল একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

বলব মা।

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলল।

বাসবী জোর পায়ে চলতে সুরু করল। মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবে, কিংবা মনে মনে ভাবল, ট্যাক্সি নয়, সেই পয়সায় রাবড়ী কিনবে রুবির জন্য।

বিভাসবাবুর ব্যাপারে মনের মধ্যে বাসবীর যে মেঘটা জমেছিল, সেটা দীপকদের বাড়ীতে এসে অনেকটা তরল হয়ে গেল। কথাবার্তা খুব বেশী হয় নি, কিন্তু এটুকু বুঝতে বাসবীর মোটেই অসুবিধা হ'ল না যে সহজ-সরল পরিবার। অভাব হয়ত আছে, কিন্তু অন্তরে ক্লেদ নেই। মালিন্য নেই। অদৃষ্টের বিধানকে মাথা পেতেই নিয়েছে।

দীপালীর কথাও মনে পড়ল। দুর্ভাগ্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

বাসবী একটু অন্যমনস্কই ছিল। এখনও রাস্তায় বেশ ভীড়। ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

সর্বদা স্বচ্ছন্দ গতি এমন নয়। বাসবী বুঝতে পারল কয়েকজন ইচ্ছা করেই তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী যদি অরণ্য হয়, তবে কিছু পরিমাণে পশু এখানে আশা করা অন্যায় নয়।

আরে, আপনি?

উচ্চ কণ্ঠস্বরে বাসবী চমকে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখল দীপক। একেবারে সামনে।

চলুন, চলুন, কাছেই আমাদের বাড়ী। কোন আপত্তি শুনছি না। পায়ের ধূলো দিতেই হবে।

বাসবী হাসল, এইমাত্র আপনার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েই আসছি। যদি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরেন, তা হ'লে পায়ের ধুলোর চিহ্নও চোখে পড়তে পারে।

দীপক বিস্মিত হ'ল।

আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন? কি ব্যাপার?

আপনার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম, চাকরির সম্বন্ধে।

দৃশ্যত দীপক যেন একটু কেঁপে উঠল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ চোখ। অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, চাকরির সম্বন্ধে? মানে চাকরির ব্যাপারে কোন গোলমাল হয় নি ত? তা হলে কিন্তু আমি অথৈ জলে পড়ব। অনেকগুলো টাকা ধার করে মা আর বাবার জন্য ওষুধপত্র কিনেছি।

দীপকের চোখ-মুখের চেহারা দেখে বাসবীর মায়া হ'ল। কষ্টার্জিত একটা চাকরির মোহ মধ্যবিত্ত জীবনে যে কতখানি তা বাসবীর অজানা নয়। সে নিজে ভুক্তভোগী। তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে ভেলার প্রতীক। সেটি হাতছাড়া হ'লেই সলিল-সমাধি। আর গত্যন্তর নেই।

না, না, সে সব কিছু নয়, বাসবী তাড়াতাড়ি বলল, যাতে দীপক ভুল না বোঝে, কোথায় একটু বসতে পেলে হ'ত। ঠিক এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলার পক্ষে অসুবিধা রয়েছে।

বাসবী এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরাল। একটা রেস্তরাঁর সন্ধানে, কিংবা সাধারণ একটা চায়ের দোকান। যেখানে মুখোমুখি বসে কাজের গুরুত্বটা বাসবী দীপককে বোঝাতে পারবে।

কিন্তু না, সেরকম দোকান-পাট কাছে-পিঠে কোথাও নেই।

এই দিকে আসুন না। ছোট একটা পার্ক রয়েছে। দীপক বলল।

এখান থেকে না জানা থাকলে বুঝতে পারার কথা নয়। দোতলা ছোট একটা বাড়ী, সেটা পার হ'লেই এক চিলতে জমি। এক সময়ে বোধ হয় চারদিকে লোহার রেলিং ছিল, এখন শুধু মাঝে মাঝে আছে। গোটা চারেক বেঞ্চ, সবগুলোই জরাজীর্ণ। তা হোক, তবু কিছু সবুজের আঁচড় দেখা যায়। একটা বকুল গাছ আছে, একটা করবী, আর একটা কি গাছ বোঝবার উপায় নেই। সেটা বর্তমানে নিষ্পত্র, শাখা-সর্বস্ব।

দীপক আগে, বাসবী পিছনে, লোহার গেট ঠেলে সেই পার্কে গিয়ে ঢুকল।

একেবারে ধারে যে বেঞ্চ সেটায় বাসবী বসল। এটা রাস্তারও পাশে। পথচারীরা শুধু দেখতেই পাবে না, কথা-বার্তাও তাদের কানে যাবে।

এই ভাল। নয়ত কোণের দিকে আবছা-অন্ধকারে দু'জনে বসলে পথচলতি লোকের কল্পনার বল্গা থাকবে না। মুখরোচক অনেক কিছুই চিন্তা করে বসবে।

দীপকও বসল। বেঞ্চের আর এক প্রান্তে। মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রেখে।

কি ব্যাপার বলুন ত? দীপক এখনও একটু উৎকণ্ঠিত।

আপনাকে বাইরে এমন এক জায়গায় পাঠানো হবে যেখানে আপনাকে কোম্পানীর টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করতে হবে।

ঠিক আছে। কোম্পানী যা নির্দেশ দেবে সেই কাজই করব।

বাসবীর মনে হ'ল, এ ধরনের কাজের গুরুত্বটা সে ঠিক যেন বোঝাতে পারছে না। তাই একটু থেমে বলল, যারা এ ধরনের কাজ করে, তাদের কাছ থেকে জামানত চাওয়া হয়। টাকার সিকিউরিটি।

এইবার দীপকের মুখটা পাংশু, নীরক্ত হয়ে গেল।

মাথাটা নীচু করে বলল, আপনি ত আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। ঘরদোরের অবস্থা ত নিজের চোখেই দেখে এসেছেন। ক্যাশ টাকা জমা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

সে কথাও আপনার বাবার সঙ্গে বলে এসেছি। টাকার বদলে দুটো নামকরা লোকের সার্টিফিকেট পেলেও আমাদের চলবে। সে ব্যবস্থা তিনি করবেন বলেছেন। আপনি কাল সার্টিফিকেট দুটো সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ওঃ, বাঁচালেন আমাকে। সত্যি, প্রথম দিকে আপনার কথায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দীপক এক অদ্ভুত কাজ করে বসল।

বাসবীর দিকে দ্রুত সরে এসে নিজের দুটো হাত দিয়ে বাসবীর একটা হাত চেপে ধরল। সম্ভবত উচ্ছ্বাসের ঝোঁকেই।

একটা অভূতপূর্ব শিহরণ। বাসবীর মনে হ'ল আচমকা যেন কোন তড়িৎ-বাহী তার সে স্পর্শ করে ফেলেছে শরীরের কোষে কোষে দাহ।

হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, একি করছেন আপনি? হাত ছাড়ুন।

বাসবী একেবারে উঠে দাঁড়াল। বিব্রত, অপ্রস্তুত, দীপককে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চলতে চলতে বলল, আমি চলি।

কিছুটা চলার পর বাসবীর মনে হ'ল দীপকও যেন পিছন পিছন আসছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, ঠিক তাই।

একি, আপনি আবার আসছেন কেন?

বিষণ্ণ কণ্ঠে, দীপক বলল, আপনাকে বাস ষ্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

এ পথে ট্রাম চলে না। শুধু বাস সম্বল। তবে এত রাতে বাসে বিশেষ ভীড় না হওয়াই সম্ভব। ভীড় হ'লেও অসুবিধা নেই। ট্রামে-বাসে যাতায়াত করা বাসবীর অভ্যাস আছে। তার জন্য কোন পুরুষ মানুষের সাহায্যের তার প্রয়োজন নেই।

আপনি বাড়ী যান। একা একা চলা-ফেরা করা আমার অভ্যাস আছে।

ততক্ষণে দীপক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তার দিকে চোখ নামিয়ে দীপক খুব মৃদু গলায় বলল, আপনি আমায় মার্জনা করুন।

কেন? বাসবী কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে দীপককে লক্ষ্য করল।

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। মধ্যবিত্ত সংসারে চাকরি পাওয়া একটা লটারি পাওয়ার সামিল। আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম।

চলতে চলতেই বাসবী বলল, ব্যাপারটা কি জানেন দীপকবাবু, পৃথিবীতে চোখ শুধু আপনার আমার নয়, আরও বহুলোকেরই আছে। তারা চোখ দিয়ে যেটুকু দেখে তার ওপর রং মাখিয়ে সব জিনিষটাকে কুৎসিত করে তোলে। সাবধান না হ'লে সারা জীবন সেই রংয়ের ছোপ বয়ে বেড়াতে হয়।

দীপক একবার মুখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল।

বিড় বিড় করে বলল, আমি মাপ চাইছি মিস সেন। আর আমাকে লজ্জা দেবেন না।

দীপক ফিরে গেল না। বাসবীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

অপ্রিয় আবহাওয়াটা সহজ করার জন্য বাসবীই কথা বলল।

কাল আপনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবেন। আমার কাছে আসার দরকার নেই। সোজা স্লিপ দিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গেই দেখা করবেন।

দীপক ঘাড় নাড়ল। সে ঘাড় নাড়া বাসবীর চোখে পড়ল কি না সেটার খোঁজ করল না।

ভাগ্য ভাল বাসবীর। মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাসের দেখা মিলল। একেবারে খালি নয়, তবে বাসবীর বসবার মতন জায়গা ছিল।

বাসটা এমনিতেই দাঁড়াবার কথা, দীপক হাঁকডাক করে সেটাকে আগেই থামাল। তারপর চেঁচামেচি করে লোকদের সরিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে বাসবীকে উঠিয়ে দিল।

বাস ছাড়তে দুটো হাত জোড় করে বলল, সব কিছুর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

বাসবী কোন কথা বলল না। বললেও বাসের গর্জনে সে কথা দীপকের কানে যেত না। বাসবী মুখে বরাভয় হাসি ফোটাল। দীপকের সব অপরাধ ক্ষমা করেছে, হাসিতে তারই আভাস।

বাস ছাড়তেই বাসবী নিজের মুখোমুখি দাঁড়াল। কৈফিয়ত তলব করল নিজের আচরণের।

সামান্য একটু হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে তার জন্য এতটা রূঢ় হবার কি কোন প্রয়োজন ছিল। এরকম ছুঁৎমার্গ বাসবীর কোন কালে ছিল না। সে ত অসূর্যম্পশ্যা, পর্দানশীন নয়। বাসে-ট্রামে কতবার পুরুষের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। সবটাই যে অনিচ্ছাকৃত এমন মনে করবারও কোন হেতু নেই।

কিন্তু তা নিয়ে ত কোনদিন বাসবী কোন চেঁচামেচি করে নি। অপবিত্র হয়ে গেছে এমন আশঙ্কাও ঠাঁই পায় নি মনের কোণে।

আজ পার্কের পাশের অপরিসর পথটা জনবিরল ছিল। বাসবী লক্ষ্য করেছে সে সময়ে কোন পথিকও ধারে-কাছে ছিল না। তার হাত জড়িয়ে ধরার দৃশ্যটা কেউ দেখে নি এ বিষয়ে বাসবী স্থির নিশ্চয়।

অবশ্য আশপাশের বাড়ী থেকে কেউ তাদের লক্ষ্য করেছে কি না, সেটা বাসবীর জানা নেই। তবুও ও ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ ছিল না।

বাসবীর মনের মধ্যে আর একটা মন, যে মন সর্বজ্ঞ, সে এবার ধমক দিয়ে উঠল, কারণ ছিল বই কি বাসবী। ও ধমক তুমি নিজেকে দিয়েছ। বিরক্তি প্রকাশ করেছ নিজের ওপর। ভয় তোমার দীপককে নয়, নিজেকে।

ক্রমশঃ

রামানন্দ স্মরণে

বিনয় ঘোষ

বাংলা দেশে আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্র বিরল। কঠোর জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী এদেশে দুর্লভ। বাংলার প্রকৃতির আবহাওয়ার আর্দ্রতা এখানকার লোকচরিত্রেও প্রতিফলিত। তবু এই বাংলা দেশেই রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো শাল-প্রাংশু বিরাট্ পুরুষ এবং বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো একনিষ্ঠ শিল্পসাধকের আবির্ভাব হয়েছে। বাংলা দেশের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েও, উনিশ শতকের সৃষ্টিশীল সামাজিক পরিবেশে আরও কয়েকজন পুরুষ চরিত্রবলে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম।

আজ থেকে একশত বছর আগে, ১৮৬৫ সালে রামানন্দ বাংলা দেশের রাঢ় অঞ্চলে বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়ার নিসর্গে স্নিগ্ধ শ্যামলতা ও কোমলতার ভাগ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং ঝামা-পাথরের রুক্ষতা ও দৃঢ়তা বেশী। রামানন্দচরিত্রে বাংলার নিজস্ব কোমলতার সঙ্গে এই পাথুরে দৃঢ়তার সমন্বয় হয়েছিল। রামায়ণের 'রাম' নাম ও রামচরিত্রের আদর্শ তখন উত্তর-রাঢ়ে বেশ লোকপ্রিয় ছিল। বাংলা দেশে এই রামাদর্শ-প্রীতিও অভাবনীয়। এর মধ্যেও বাঙালীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্যসাহিত্য' আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বলেছেন: "বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় হর-গৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায় কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত, সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক।" বাংলার হরগৌরী কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ কথায় বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না" এবং তার মধ্যে "বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিতভক্তি ও কঠোর ত্যাগ-স্বীকারের" আদর্শ নেই। রামানন্দ-পরিবারে তখন অধিকাংশ ছেলের নামই ছিল 'রাম'যুক্ত। রামশঙ্কর ও রামেশ্বরের তৃতীয় ভাই হ'লেন রামানন্দ। রামানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্র রামের পৌরুষ, মহত্ত্ব, অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারের আদর্শে গঠিত। পারিবারিক 'রাম' নাম তাঁর চরিত্রগুণের বিকাশে সার্থক হয়েছিল।

রামানন্দের জন্ম হয় বাংলার, এবং ভারতের, জাতীয়তা-বোধের নবজন্মকালে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে এই নতুন জাতীয় চেতনার অভ্যুদয় হয়। রামানন্দের ব্যক্তিত্বের উন্মেষকাল এই জাতীয় নবজাগরণের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। মিলনের ফলে তার ব্যক্তিত্বের ভিত্তি-স্তরটি পর্যন্ত স্বাদেশিকতার রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে যায়। বাল্যকালের কথা স্মরণ করে তিনি নিজে একবার লিখে-ছিলেন (প্রবাসী ১৩৪৫) যে নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত, টডের রাজস্থান, রজনীকান্তের মহারাণা প্রতাপ সিংহ, রমেশ দত্তের বঙ্গবিজেতা, সাময়িক পত্রে ম্যাটসিনি ও নব্য ইটালির জাতীয় জাগরণের কাহিনী, —তাঁর বালকচিত্তে এক অদ্ভুত অনুভূতি ও প্রেরণা সঞ্চার করত। এই অনুভূতির প্রসারতা ও গভীরতা তাঁর কৈশোর ও যৌবনে, জাতীয় জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, ক্রমে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল। নবগোপাল বা 'ন্যাশনাল' মিত্রের হিন্দুমেলা, রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিকের সভা, ভারতসভা, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের ছাত্রসভা, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় মহাসম্মেলন, জাতীয় কংগ্রেস—এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ ও আলোড়নের ভিতর দিয়ে রামানন্দ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। কলকাতা শহরে যখন তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয় তখন তাঁর বয়স আঠার। সেই সময় ১৮৮৩ সালে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার বিখ্যাত 'অবমাননার মকদ্দমায়' সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ দলে দলে শোভাযাত্রা করে আদালতের চারিদিকে সম্মিলিত হয় এবং তার দরজা-জানালা ভেঙে, পুলিশের গায়ে ইঁট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এই অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সেদিন যাঁরা বিদেশী শাসকবিরোধী বিক্ষোভের মিছিলে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বাংলার কৃতী সন্তান বলে পরিচিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শুধু একজনের কথা তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

"One of those rowdy youths was Ashutosh Mukherjee, subsequently so well-known

as a judge of the High Court and as Vice-Chancellor of the Calcutta University." (A Nation in Making, 76)

আশুতোষের মত আরও কয়েকজন বিক্ষুব্ধ বাঙালী ছাত্র যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম।

রামানন্দের ব্যক্তিমানস জাতীয়তার এই কলধ্বনিমুখর উদ্বোধনের প্রতিবেশে গড়ে উঠেছিল। তাঁর পরিণত কর্ম্মজীবনে যত বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার শোনা গেছে, তার মধ্যে তাই স্বাদেশিকতার সুরটি ছিল সর্ব্বোচ্চ গ্রামে বাঁধা। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রধান শাখা ছিল দু'টি—একটি সাংবাদিকতা, আর একটি সমাজসেবা। দু'টি শাখারই একটি মাত্র উদ্ধমুখী লক্ষ্য ছিল স্বদেশসেবা। ধর্ম্মবন্ধু, ব্রহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত সংস্কারব্রতী, জাতিয়তাবাদী প্রগতিধর্ম্মী পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, হয় লেখকরূপে, না হয় সহকারী সম্পাদকরূপে। এ ছাড়া 'দাসী' (১৮৯২) ও 'প্রদীপ' (১৮৯৭) তিনি নিজের সম্পাদনায় পরিচালনা করেন। 'প্রদীপে'র শিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 'প্রবাসী'তে (১৯০১)। 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "প্রথম যখন রামানন্দবাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন, তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি।" ষাট-সত্তর বছর আগে বিশ্বাস করা বাস্তবিকই কঠিন ছিল, এমন কি আজকের দিনেও যদি কেউ রামানন্দ-কৃত 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র মত পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন তা হ'লে তা যে বাংলা দেশে চলতে পারে একথা বিশ্বাস করা সহজ হবে না।

তৎকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকেই রামানন্দ সমাজসেবা ও মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে, বিশেষ করে, সমাজকর্ম্মীদের মধ্যে এই নিপীড়িত মানবসেবার আদর্শ ইংলণ্ডে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। শিল্প-বিপ্লবের পর কলকারখানার নিষ্পেষণে মানুষের রূপ যে কতদূর বিকৃত হ'তে পারে, ইংলণ্ডের সমাজের চেহারাতে তখন তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই সময় তাই মজুর শ্রেণীর জন্য, পীড়িত ও শোষিত মানুষের জন্য একদল সমাজকর্ম্মী আন্দোলন করতে থাকেন। এই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের সমাজেও লাগে। শিল্প-বিপ্লব এখানে না হ'লেও, কিছু কিছু কলকারখানা, চা-বাগান, খনি ইত্যাদির কল্যাণে অন্তত কুলি-মজুরদের নির্য্যাতিত চেহারাটা সমাজে বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা এই সময় একে একে ইংলণ্ডে গিয়ে স্বচক্ষে এই সমাজসেবাকর্ম্মের প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান দেখে আসেন এবং স্বদেশে ফিরে এসে এই জাতীয় সেবাকর্ম্মে উদ্যোগী হন। ১৮৬৬, ১৮৬৯ ও ১৮৭৫ সালে পর পর তিনবার ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সমাজকর্ম্মী মেরী কার্পেণ্টার আমাদের দেশে আসেন। তাঁর সাহচর্য্যে ও প্রেরণায় প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মীরা বিপুল উদ্যমে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মসমাজের এই সময়কার জনসেবার বিবরণ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁর "সোশ্যাল রিফর্ম্ম ইন্ বেঙ্গল" (কলিকাতা ১৯০৪) গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়েছেন। পীড়িতের সেবা, অনাথ আশ্রম, নৈশ বিদ্যালয়, মজুরসভা, মজুরদের জন্য সুলভ পত্রিকা প্রভৃতি এই ধরনের কাজকর্ম্মের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র।

রামানন্দ বাল্যকালেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নেন, উপবীতও ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে দীক্ষিত হবার ফলে তাঁর সমাজচেতনা উদার মানবতার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। সমাজসংস্কারে প্রকৃত ব্রাহ্মের মত সারাজীবন তিনি প্রগতির পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কুসংস্কারপ্রবণতা—এগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে কোনদিন কুয়াশা সৃষ্টি করে নি। জনসেবাকর্ম্মের উৎসাহও তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর থেকেই অনেকটা পেয়েছিলেন মনে হয়। ১৮৯১ সনে বসিরহাটে জালালপুর গ্রামে কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় 'দাসাশ্রম' স্থাপিত হ'লে তিনি তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে ওঠেন এবং আর্ত্তজনের সেবায় আশ্রমের কাজে মনপ্রাণ ও শক্তি-সামর্থ্য সমর্পণ করেন। আশ্রমের মুখপত্র 'দাসী' তাঁর সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। তখন মেরী কার্পেণ্টারের জনসেবার আদর্শ তাঁকে যে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল, তা কার্পেণ্টারের মৃত্যুর পর 'দাসী' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা একটি রচনা থেকে কতকটা অনুমান করা যায়। তিনি লেখেন: "বিশ্বসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গকারিণী রমণীমণ্ডলীর মধ্যে মেরী কার্পেন্টার একজন অগ্রগণ্যা।...যে পরোপকার বৃত্তি মেরীর হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া পরিশেষে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় বিশ্ববাসীদিগের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল, এই ব্রিষ্টলনগরে তাহার সূত্রপাত হয়।...জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মেরী মানবলীলা

সম্বরণ করেন।...যেদিন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল, সেই দিন বহু দরিদ্র ব্যক্তি আপনাদিগকে মাতৃহীন বোধ করিল এবং কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সজলনেত্রে তাঁহার মৃত-দেহের সহিত গমন করিল" ('দাসী'—সেপ্টেম্বর ১৮৯৩)। কার্পেণ্টার প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ আগে বলেছি। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব্বে বাংলা দেশে যে সমাজসেবা ও আর্ত্ত-সেবার উৎসাহ জেগেছিল, বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজকর্ম্মীদের মধ্যে, তাতে প্রত্যক্ষভাবে কার্পেণ্টার অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং রামানন্দও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

রামানন্দের কর্ম্মজীবনের দু'টি শাখার কথা বলেছি—সাংবাদিকতা ও সমাজসেবা—এবং দু'টি শাখাই তাঁর জীবনে উর্দ্ধমুখী বাহু বিস্তার করেছিল স্বদেশ-সেবা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের দিকে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বাংলা 'প্রবাসী' ও ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা দু'টিকে তিনি এই লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার অনুশীলনে 'প্রবাসী' বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের সামনে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেছিল এবং দেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুন্দর সুসম রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিল। আজকের সাহিত্য-সাংবাদিকতার রুচি-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের যুগে যদি রামানন্দের এই কীর্ত্তি থেকে আমরা কিছু প্রেরণা ও পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, তা হ'লে তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা কিছুটা সার্থক হ'তে পারে।

মৃত্যুহীন

সমর বসু

অনেক কিছুকেই দায়ী করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং সবশেষে দেশ বিভাগ। পর পর কয়েকটি মারাত্মক দুর্ঘটনা সমাজের কাঠামোটাকে ধ'রে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে, মানুষগুলোর মানসিক শক্তিকে এমনভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে যে, স্বাধীনতা যে কি জিনিষ আজও তা কেউ সম্যকভাবে উপলব্ধি কবতে পারল না। এখনও না, যতদিন না আর একটা আঘাত আসে। মানুষের এই যে অধঃপতন, এর জন্যে অনেক কিছুকেই দায়ী করা যায়। যুক্তির জাল বিস্তার করে, ভাষার কারুকার্যে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলা যায়—এ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। পশ্চিমের নজির দেখিয়ে, যুক্তিকে আরও জোরদার করে তোলা যায়। তবুও সুশান্তর মনে হয় কোথাও যেন একটা বিরাট্ ফাঁক আছে। কোথাও যেন লুকিয়ে আছে একটা অদৃশ্য হাত, যার কলুষ স্পর্শে সমাজ জীবন এমন ক্লেদাক্ত হয়ে পড়েছে। নইলে—এই শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশ বিভাগ রদ করবার জন্যে যাঁরা হাসি মুখে কারাবরণ করেছিলেন, বুলেট-বেয়োনেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন, পঞ্চ দশকে তাঁরা সবাই চুপ করে রইলেন কেন! সুশান্ত অনেক চেষ্টা করেও এর উত্তর খুঁজে পায় না।

উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার দিকে আজকের তরুণ-তরুণীদের এই যে ছুটে চলা, সুশান্তর দৃঢ় ধারণা, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও দুর্বৃত্তের কুৎসিত প্রভাব আছে। নেপথ্যে বসে নিশ্চয়ই কোনও শত্রু, বন্ধুর ছদ্মবেশে, সমস্ত সমাজটাকে এই পঙ্কিল আবর্তের দিকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। কেননা, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গাহাঙ্গামা, এমন কি দেশ বিভাগ পর্যন্ত সব ক'টা অভিশাপই বাইরের থেকে আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা কেউই তার জন্যে দায়ী ছিলাম না।

ভাবতে ভাবতে সুশান্ত আরও দু'পা এগিয়ে গেল, তার পর একটা বিড়ি ধরাল। দু'বার টান দিয়েই মুখটা বিকৃত করে বার বার থুথু ফেলতে লাগল সুশান্ত। জ্বলন্ত বিড়িটাকে একবার দেখে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। পুড়তে পুড়তে এক সময় নিভে গেল বিড়িটা।

সুশান্ত তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তার মোড়ে একটা পিপুল গাছ—তারই নিচে সুশান্তর সাইকেল রিক্শা দাঁড় করাল। দুপুরবেলায় গাছতলায় রিক্শা রেখে সুশান্ত খেতে যায়। চানখাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে বেলা তিনটে নাগাদ আবার বেরোয়। ঐ সময় অনেক সওয়ারী মেলে। উদ্বাস্তু কলোনী থেকে এই সময় অনেক মেয়ে বেরিয়ে আসে। সুশান্তদের রিক্শা চেপে ষ্টেশনে যায়, তারপর কলকাতার গাড়িতে উঠে কোথায় যায় সুশান্ত তা জানে না। দমদম কি শেয়ালদা, দক্ষিণেশ্বর কি বরানগর, সুশান্ত তা কোনও দিন জিজ্ঞেস করে নি।

রিক্শায় থেকে নেমেই মেয়েগুলো বলে এগারোটার সময় ষ্টেশনে থেক, আমরা তোমার রিক্শাতেই ফিরব।

সুশান্ত মুচকে হেসে জবাব দেয়—কথা দিতে পারি না; তবে খালি থাকি ত আসব।

মেয়েরা বলে—ষ্টেশনের রিক্শাওয়ালাদের ভারি ডাঁট। রাত্রে ক্যাম্পের দিকে যেতেই চায় না। বেশি ভাড়া চায়; তাই বলছিলাম।

সুশান্ত কিছু বলে না। ভাড়া হিসেব করে ব্যাগের মধ্যে রাখে। মেয়েগুলো লাফাতে লাফাতে ষ্টেশনের ভেতরে চলে যায়। এখনই হয়ত ট্রেণ এসে পড়বে।

কোথায় যায় এরা। সুশান্ত অনেকদিন একথা ভেবেছে। ভিটেমাটি ছেড়ে ওদের মত সুশান্তও একদিন এখানে পালিয়ে এসেছে। ওদের মত কিন্তু সরকারী আশ্রয় পায় নি। বহুদিন ধরে, বহু পরিশ্রম করে, বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তবে আজ সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। —কিন্তু ওরা তা পারে নি। সরকারী সাহায্যে ওদের দিন চলে কিংবা চলে না। আজ এখানে, কাল সেখানে, যেন স্রোতের মুখে ভেসে-যাওয়া আবর্জনা। কিন্তু তবুও ওদের কোনও ভাবনা নেই। ভাবনা থাকলে কখনই ওরা অমন করে হাসাহাসি করতে পারত না, হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পারত না। মুখে রংচং মেখে বিবি সেজে পালতোলা নৌকোর মত ভেসে বেড়াতে পারত না। রিক্শায় বসে খালি ফিস্ ফিস্ কথা আর খিল্ খিল্ হাসি। সুশান্ত কতদিন কান খাড়া করে ওদের কথা শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে নি। তবে এটুকু

জানতে পেরেছে যে ওরা ঠিক গেরস্থালী নয়। কেমন যেন খাপছাড়া বেপরোয়া ভাব। শাসন নেই বলেই বোধ হয় ভয়-ডর নেই। অথচ ওরা সবাই ঘর-সংসার করতে পারত। এর চেয়ে অনেক ভালভাবে থাকতে পারত; এমন ভাবে ছন্নছাড়া হয়ে বয়ে যেত না।

কিন্তু সবাই ত হাসে না।—কেউ কেউ কাঁদে যে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে, আবার কাঁদে। কোঁপানি কানে গেলেও সুশান্ত সেদিন ভাবতে পারে নি যে, তারই রিক্শা যারা চেপেছে তারাই কাঁদছে।

এক সময় সন্দেহবশেই ঘাড় ফিরে তাকাল সুশান্ত—দেখল, দু'জনেই কাঁদছে।

রাত এগারোটার সময় কাঁদতে কাঁদতে এরা কোত্থেকে ফিরল।

সুশান্তর জিজ্ঞাসা মনকে ভারী করে তুলল—মুখ ফুটে বাইরে বেরুতে পারল না। এবং পারল না বলেই সুশান্ত কান খাড়া করে রইল—কথাবার্তা শুনে যদি কিছু বোঝা যায়।

—এমনি করেই কি আমাদের বেঁচে থাকতে হবে লীলাদি, আর যে পারি না!

—না পারলে চলবে কেন।

—আমি যে কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবি নি লীলাদি যে, এমনি ভাবে আমায় পয়সা উপায় করতে হবে। এই ভাবে পেট চালাতে হবে। এর চেয়ে মরে যাওয়া যে অনেক ভাল, অনেক সোজা।

—ভাল কি না জানি না; তবে সোজা নয়। সোজা যদি হ'ত তা হ'লে সেদিন আমি মরতে পারলাম না কেন?

—তুমিও মরতে গেছলে বুঝি?

—হ্যাঁ! রেলে মাথা দিতে গেছলাম। ··অন্ধকার রাত্তির। ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে আমি একা হেঁটে যাচ্ছিলাম। অনেক দূরে ইঞ্জিনের আলো জ্বলছিল। আলোটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল, যখন খুব কাছে এসে পড়েছে, ঠিক সেই সময় আমার সমস্ত শরীরটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল হঠাৎ কে যেন আমায় পেছনদিক থেকে জাপটে ধরল। তারপর আর আমার কিছুই খেয়াল নেই। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলাম—ষ্টেশনের টিকিট ঘরে আমি শুয়ে রয়েছি। ভিজে কাপড়-চোপড় গা-গতরে লেপ্টে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই দেখতে পেলাম দু'জন পুলিশ আমাকে পাহারা দিচ্ছে। সকাল হ'তেই আমাকে তারা থানায় নিয়ে গেল। তিন রাত সেখানে আটকে রাখল। রোজ রাত্তিরে ওদের অত্যাচার আমায় মুখ বুজে সহ্য করতে হ'ত। তারপর ওরা যখন ছেড়ে দিল তখন আমি বুঝতে পারলাম আর আমায় রেলে মাথা দিতে হবে না, গলায় দড়ি দিতে হবে না, পুকুরেও ডুবতে হবে না। ওরাই আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি সত্যি সত্যিই মরে গেছি। আর কোনও দিনই আমি বেঁচে উঠব না। তোর মত আমিও কাঁদতাম। কিন্তু সেই দিন থেকে আমার কান্না একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নইলে কেঁদে কেঁদে আমি হয়ত অন্ধই হয়ে যেতাম।

—তবে আজ আবার কাঁদছ কেন?

—কাঁদছি না ত। তুই যদি কিছু মনে করিস তাই চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল বার করছি।

কথাগুলো শুনে সুশান্ত কিন্তু বধির হয়ে যায় নি। সবার অলক্ষ্যে জামার হাতা দিয়ে চোখ দুটো তাকে মুছতেও হয় নি। সেই সময় শুধু মনে পড়েছিল অন্য দুটি মেয়ের কথা। সে-মেয়ে দুটো কলকাতার কোনও কলেজে পড়ে। সুশান্তর রিক্শাতেই সেদিন ফিরছিল। অনর্গল কথা বলছিল। কথার শেষ নেই। মানেও নেই বোধ হয়।

কলেজের চৌহদ্দি পেরিয়ে ওদের কথাবার্তাগুলো সেই যে কখন সিনেমায় গিয়ে ঢুকেছে, বেরুবার আর নাম করে না। পথ শেষ হয়ে গেলেও ওদের কথার বোধ হয় শেষ হবে না।

সিনেমা সুশান্তও মাঝে মাঝে দেখে। যাদের নাম ওরা করছিল, তাদের ছবিও দেখেছে সুশান্ত। কিন্তু ছবিগুলো ছবিই থেকে গিয়েছে; সুশান্তর জীবনে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে নি।

ওদের আলোচনা শুনে সুশান্তর মনে হয়েছিল,—কলেজ থেকে সিনেমাগুলো ত অনেক দূরে। মাঝখানে যে এতখানি রাস্তা, সে-রাস্তা দিয়ে ওরা কি কোনও দিন হাঁটে নি! কত খোলা-মেলা জায়গা, কত নোংরা আবর্জনা! সে-সব কি কোনও দিনই ওদের নজরে পড়ে নি। কই, ওদের মুখে ত অন্য কোনও কথা শুনতে পাওয়া যায় না। অন্য কোনও কথা ভাববার মত হয়ত ওদের সময় নেই। কিংবা ওরা হয়ত সে সব ভাবতেই চায় না। মিছিমিছি পরের ভাবনা ভেবে মনকে ওরা ভারী করবে কেন! তার চেয়ে হৈ-হল্লা ক'রে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অনেক আনন্দের।

—আহা, তাই হোক। ওরা আনন্দেই থাকুক। কোনও দিন কাঁদতে যেন না হয়। কান্না সহ্য হয় না সুশান্তর।

অথচ কাঁদতে কাঁদতেই সুশান্ত একদিন বুড়ো বাপ-মা'র হাত ধ'রে সীমান্তের ওপার থেকে এপারে এসেছিল। এপারে এসেও কাঁদতে হয়েছিল অনেক দিন। কাঁদতে কাঁদতে হাত পাততে হয়েছিল রাজ্যের লোকের কাছে। রুক্ষ মাথায়, গলায় চাবি ঝুলিয়ে কাছা গলায় দিয়ে, বলতে হয়েছিল, 'পিতৃদায়, বাবু, কিছু সাহায্য করুন।'—কেউ দু'একটা পয়সা দিয়েছে; কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেউ আবার মন্তব্য করেছে—বার মাসই ওদের পিতৃদায় লেগে আছে। অথচ ওরা কেউ একবারও ভেবে দেখে নি যে, মানুষের অবস্থা কত হীন হ'লে, জলজ্যান্ত বাবা ঘরে থাকতেও কাছা গলায় দিয়ে ছেলেকে ভিক্ষে করতে হয়, মিছিমিছি বলতে হয়—তিন দিন হ'ল বাবা মারা গেছে, বাড়ীতে বিধবা মা...। কাজটা কি এতই সোজা!

তারপর কত জায়গায় ঘুরে, কত ঘাটের জল খেয়ে, বছর আষ্টেক আগে এই শহরতলীতে এসে চোখের জল মুছে সেই যে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে সুশান্ত, আজও সে ঠিক তেমনি ঋজু আছে, তেমনি কঠিন। কাজে তার অদম্য উৎসাহ। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হয়, সত্যি; কিন্তু মন থাকে জলে-ভেজা বুনোলতার মত সবুজ, চিকণ এবং সতেজ। জীবনকে সে ভালবাসে; গভীর ভাবে ভালবাসে। সে ভালবাসায় কোথাও কোনও ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই এতটুকু। তাই কান্নাকে সে সহ্য করতে পারে না। কান্না মানেই হেরে যাওয়া। হার স্বীকার ক'রে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

জীবনকে ভালবাসে বলেই, ঐ-সব মেয়েদের জন্য সুশান্ত মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অনেক দিন আগে সুশান্ত কিন্তু এইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। সারাদিন শুধু রুজি-রোজগারের ধান্দায় ঘুরত। কে ভাল, কে মন্দ, কার কত পয়সা, কে কোথায় যাচ্ছে—সে-সব খোঁজ নেবার ফুরসৎ ছিল না। ইচ্ছেও না।

এখন কিন্তু সুশান্ত একেবারে অন্য মানুষ। অনেক কিছু সে ভাবে। অনেক রকমের মানুষ ব'য়ে ব'য়ে তাদের আলাপ-সালাপ কথাবার্তা শুনে, অনেক রকমের ভাবনা সে ভাবে; ভাবতে পারেও। ছোট্ট জগতে সে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

ভোরবেলায় উঠে মুখ-হাত ধুয়েই রিক্শা নিয়ে একেবারে চায়ের দোকানে এসে বসত সুশান্ত। এক ভাঁড় চা আর একটা বিস্কুট খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ত। পড়তে পড়তে আরও অনেকের সঙ্গে অনেক রকমের আলোচনা হ'ত। এইভাবে একটু একটু করে দেশের সঙ্গে, দশের সঙ্গে সুশান্তর সম্বন্ধটা ক্রমশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। সুশান্তর ভেতরে আরও একটা নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে; কিংবা সুশান্তর মধ্যে যে মানুষটা এতদিন নানা ঝড়-ঝাপ্টার আঘাতে অচেতন হয়েছিল সেই মানুষটাই আবার জেগে উঠেছে।

এই নতুন মানুষটাই একদিন একটা কঠিন প্রশ্ন করেছিল। আর সে-প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে অসীমানন্দ বলেছিল,—তুমি এত কথা ভাব! অথচ আমাদের ত কোনও দিন কিছু বল নি।

—ভয় হ'ত, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কি জানি আপনারা যদি কিছু মনে করেন।

'মাইক্' বন্ধ ক'রে দিয়ে অসীমানন্দ বলল—কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে কখনও মুখ্যু হ'তে পারে না। দেশে থাকলে কবে তুমি ম্যাট্রিক পাশ করতে।

—শুধু কি তাই, বাধা দিয়ে সুশান্ত বলল, হয়ত এতদিন বাবার স্কুলে একটা চাকরিও পেয়ে যেতাম।

—বাবার মত তুমিও তা হ'লে মাষ্টারী করতে! কিসের মাষ্টার হ'তে?

মাথা নামিয়ে নিয়ে সলজ্জ ভাবে সুশান্ত বলল—ইতিহাসের। ইতিহাস পড়তে আমার খুব ভাল লাগত।

—বাবার কাছে এখনও ত তুমি পড়তে পার।

—বাবা যে ভাল দেখতে পান না। সময় পেলে আমি নিজেই কিছু কিছু পড়ি। তা'—আপনি চুপ করে গেলেন কেন, আর 'অ্যানাউন্সমেণ্ট্' করবেন না?

—এখানটা ত লোকবসতি নেই! খোলা মাঠ! তা ছাড়া এতক্ষণ চিৎকার করে করে গলাটা ব্যথা করছে।

সুশান্তর কানে অসীমানন্দর চীৎকারগুলো তখনও বাজছিল,—"আগামী রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় স্কুল ময়দানে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় সর্বভারতীয় নেতা...বক্তৃতা করবেন। আপনারা দলে দলে যোগদান করে...।

শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল—আপনারা ত দেখি হামেশাই মিটিঙ্ করে বেড়ান; কিন্তু কাজের কাজ ত কিছুই হ'চ্ছে না। গলা ফাটিয়ে যাদের আপনারা গালি-গালাজ করেন, তাদের সরিয়ে নতুন কিছু করবার শক্তি কি আপনাদের আছে? বুকে হাত দিয়ে বলুন ত দেখি! তা যদি না থাকে তা হ'লে সেই শক্তি সংগ্রহ ক'রে তবে আসরে নামবেন!

কথাগুলো শুনে অসীমানন্দ চমকে উঠেছিল। এই অঞ্চলের প্রগতিবাদী জনসমাজের অবিসম্বাদী নেতা, কোনও দিন ভাবতে পারে নি যে, সামান্য রিক্‌শাওয়ালার কাছ থেকে তাকে একদিন এমন গুরুতর কথা শুনতে হবে! যদিও রিক্‌শাওয়ালাদের তারা সামান্য ভাবে না, এবং এই রিক্‌শাওয়ালাটার জাত যে আলাদা, এ-তথ্যও অসীমের অজানা ছিল না।

প্রশ্নটা শুধু কুটিল নয়, নিতান্ত নগ্ন। এবং প্রশ্নকর্তা এমন শ্রেণীর মানুষ, যাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ দূর করবার কঠোর সাধনায় অসীমানন্দরা আত্মনিয়োগ করেছে। সুতরাং অসীমানন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির করল— ওকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। ওকে বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। দীক্ষা দিতে হবে। ওদের দলের নেতা হবার যোগ্যতা ওর আছে। যেন হাত ছাড়া না হয়।

এরপর অনেক দিন ধ'রে অসীমানন্দ এবং তার দলের অনেকের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়েছে সুশান্তর, অনেক আলাপ-আলোচনা। অসীমানন্দর যে-উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে সুশান্তর অন্ততঃ এইটুকু লাভ হয়েছে, যে, এখন সে অনেক কিছু বুঝতে পারে, সমাজের এই বিকৃত চেহারাটার দিকে চেয়ে অনেক কথা সে ভাবতে পারে। রাজনীতির গভীরে অনায়াসে প্রবেশ করে গূঢ় সমস্যার সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করে।

ক্যাম্পের মেয়েগুলো রোজ রোজ বিকাল বেলায় কোথায় যায়, ফিরে আসে সেই রাত এগারোটায়। সন্ধ্যে থেকে অত রাত পর্যন্ত কি কাজ করে ওরা? লেখাপড়া ত কিছুই শেখে নি। তা হ'লে! অসীমানন্দকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সুশান্ত।

অসীমানন্দ ম্লান হেসে বলেছিল,—কোথায় আর যাবে, কাজে যায়। পয়সা ত চাই! নইলে পেট চলবে কেন!

—তা হ'লে চাকরি-বাকরি করে! তাই বলুন; আমি ভেবেছিলাম বুঝি···।

—ঠিকই ভেবেছিলে ভাই। চাকরি-বাকরি আর কে দিচ্ছে ওদের।

সুশান্ত আর কথা বলতে পারে নি। অসীমানন্দর ইঙ্গিতটুকু উপলব্ধি করে, গুম হয়ে সে অনেকক্ষণ বসে রইল। অসীমানন্দকে চলে যেতে দেখে, জিজ্ঞেস করল — এই ব্যবস্থাই কি বরাবর চলবে!

—তা কি চলে। জগৎ কি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে! জমানা একদিন বদলে যাবেই! ও নিয়ে মাথা খারাপ ক'রে লাভ নেই সুশান্ত, যাও, কাজ করগে।

—কিন্তু এ-অবস্থা হ'ল কেন! সুশান্ত দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করে।

অসীমানন্দ বলে—তোমাকে আর কি বলব! তুমি ত সবই জান।

—কিছুই জানি না। আপনারা যা বলেন তাই বিশ্বাস করি। সেই ভাবেই চিন্তা করি; তাতে সমস্ত মন জ্বলে-পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই করতে পারি না।

আর কথা না বাড়িয়ে অসীমানন্দ দ্রুত পায়ে চলে গেল। আর সুশান্ত নিজের রিক্‌শায় উঠে বসল। বসে বসে ভাবতে লাগল, আবোল-তাবোল অনেক ভাবনা। ভাবনায় ভাবনায় বুকটা তার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অনেক কিছু করবার প্রবল ইচ্ছা আর কিছুই করতে না পারার দুঃসহ অক্ষমতা সুশান্তকে সব সময় অস্থির করে তোলে। হাতের বজ্রমুষ্টি এক সময় শিথিল হয়ে আসে। নিষ্ফল আক্রোশ, ওষ্ঠদ্বয়কে ঈষৎ বিস্ফারিত করে হতাশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ে।

সুশান্ত আবার রিক্‌শার প্যাডেলে পা রাখে। জড় যন্ত্রের মত পা দুটো চলতে থাকে। চলতে চলতে সুশান্তর সমস্ত মানুষী চেতনা কখন লোপ পেয়ে যায়। উট, ঘোড়া, গরু, গাধার মত 'সুশান্ত' যেন একটা ভারবাহী পশুর নাম।

চৈত্রের দুপুরগুলো কেমন যেন নিঃঝুম। আর এই নিঃঝুম দুপুরগুলোই নানান উদ্বেগে সুশান্তর মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। পিপুল গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত। তারপর কখন আপন মনে নিজের রিক্‌শায় গিয়ে বসল। ও-পাশের রিক্‌শাগুলো যাদের, তারাও এসে বসেছে। সুশান্ত ওদের সঙ্গে কোনও কথা না কয়ে চুপ করে বসে রইল। ওরা একে একে চলে গেল ষ্টেশনের দিকে।

আর সুশান্ত একা বসে বসে ভাবতে লাগল—এইসব উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় আসে কেন! দুমুঠো ভাতের জন্যে, যাকে সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত জন্তুর মত বোঝা বইতে হয়, তার আবার এই বেয়াড়া রোগ কেন!

বন্ধু-রিক্‌শাওয়ালাদের কথাগুলো মাঝে মাঝে সুশান্তকে বিব্রত করে। সে কেন ওদের মত হ'তে পারে না। ওদের মত চটুল, ওদের মত উচ্ছল, ওদের মত একটা 'ডোন্টকেয়ার' ভাব নিয়ে সুশান্ত কেন দিন কাটাতে পারে না।

এ-সব কথাও একদিন অসীমানন্দকে জিজ্ঞেসও করে-ছিল সুশান্ত।

মৃদু হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে অসীমানন্দ বলেছিল, পার্বতীপুরের সুশান্ত আর সোদপুরের সুশান্তর বাইরের দিক থেকে অনেক তফাৎ। সোদপুরে আজ ...

রিকশা টানছে, পার্বতীপুরে থাকলে সে-ই হয়ত ছেলে পড়াত। বাইরে সে রিক্‌শাই টানুক আর হাতুড়ি পিটুক, ভেতরে সে যে শিক্ষক। তাকে যে অনেক রকমের ভাবনা ভাবতে হয়।

কথাগুলো শুনে মনে মনে খুব খুশী হয়েছিল সুশান্ত; তবু বাধা দিয়ে বলেছিল, এটা আপনার ভুল ধারণা অসীমদা। সব মানুষই সুযোগ পেলে মানুষ হ'তে পারে। সুযোগ পায় না, মানে দেওয়া হয় না—এইটাই বড় কথা। এর জন্যে বংশ, পূর্বজন্ম, ইত্যাদিকে টেনে আনবার কোনও দরকার নেই।

—ঠিক বলেছ সুশান্ত, তুমি ঠিক বলেছ। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীমানন্দ সুশান্তর হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল।

সুশান্তর সমস্ত শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেছল সে-সময়। মনে হয়েছিল সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লে ভাল হয়। অনেক কাজ করবার আছে। কিন্তু সুশান্ত কিছুই করতে পারে না। প্রতিদিন শুধু রিক্‌শায় চাপিয়ে সূর্যটাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যায়। তারপর রাত্রের অন্ধকারে ক্লান্ত গরুমোষের মত গোয়ালে ঢুকে চারটি খেয়ে নিয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

—এ্যায়, ভাড়া যাবি।

সুশান্তর ধ্যান ভাঙল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—দু'জন সওয়ারি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মোটা মোটা দু'জন রাজস্থানী ব্যবসাদার। সুশান্ত জানে অনেক পয়সা ওদের। দেশ-জোড়া ওদের কাজকারবার। কিন্তু রিকশার ভাড়া নিয়ে ভারি খ্যাচখ্যাচি করে। ভাবে, সবাই বুঝি ওদের ঠকাচ্ছে।

ওদের দিকে না তাকিয়ে সুশান্ত যেমন ছিল তেমনি চুপ ক'রে ব'সে রইল।

—এ্যায়, ভাড়া যাবি? দু'জনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

—কোথায়? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল সুশান্ত।

—ইষ্টিশান!

—কত দেবেন?

—যা ভাড়া তাই দেব।

সুশান্ত কিছু বলল না। ওদের বিরাট শরীরের ওপর বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। এই দুপুর রোদ্দুরে অত ভারী বোঝা টানবার তার ইচ্ছে নেই।

আশেপাশে একটাও রিক্‌শা নেই। ওদিকে বোধ হয় ট্রেনের সময় হয়ে আসছে, তাই ওরা একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এল। নরম গলায় বলল—কিরে, বসে রইলি কেন! যাবি না?

সুশান্ত অবিকৃত মুখে ওদের দিকে চাইল শুধু।

—আচ্ছা, আরও দু'আনা বেশি দ'ব। নে ওঠ্, দেরি করিসনে। গাড়ির সময় হয়ে গেল।

মালের ওজন বেশি হ'লে ভাড়া বেশি দিতে হয়, এই যুক্তিতে মনকে দৃঢ় করে সুশান্ত বলল—মোট বার আনা লাগবে।—বলতে বলতে সুশান্ত নেমে দাঁড়াল।

ওরা উঠে বসল।

—জোরে চালাবি কিন্তু, নইলে গাড়ি পাব না।

সুশান্ত ভাবল—এই বরং ভাল হ'ল। ক্যাম্পের মেয়েদের নিয়ে যেতে হ'ল না। ওদের নিয়ে ষ্টেশনে পৌছে দেওয়ার মানেই ওদের কাজকে সমর্থন করা। সুশান্ত তা পারবে না। অন্যেরা যা করে করুক, সুশান্ত নিজে আর কোনও দিন ওদের নরকের পথে পৌছে দিয়ে আসতে পারবে না।

কিন্তু তাতে কি ওরা বেচে উঠবে। ওরা ত অনেকদিন আগেই মরে গেছে। ওদের কাছে নরক বলে আর কিছুই নেই। যারা এখনও বেচে আছে তারা যাতে না মরে সেই চেষ্টাই করবে সুশান্ত। হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই করবে।

সুশান্ত তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। কিন্তু পিছনে ভারী বোঝা। পায়ের শিরা ফুলে উঠল, কিন্তু গতি বিশেষ দ্রুত হ'ল না।

সামনে লম্বা পীচঢালা রাস্তা রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করছে। পিছনের অতিকায় মানুষ দুটো দেশওয়ালী ভাষায় কথা বলছে;—মনে হচ্ছে যেন ঝগড়া করছে। কথা বলতে বলতে একসময় ওরা হো হো করে হেসে উঠল। হাসির দমকে রিক্‌শাটা এদিক-ওদিক টাল খেয়ে আবার সোজা হয়ে চলতে লাগল।

কপালের ঘাম মুছে দুহাতে হাণ্ডেল চেপে ধরে সুশান্ত একবার ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনের দিকে তাকাল, দেখল দু'জনে চাপাচাপি করে বসে আছে। যেন মেদমাংসের পাহাড়।

মুচকে হাসতে গিয়ে সুশান্ত গম্ভীর হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—সে ত সামান্য রিক্‌শাওয়ালা নয়। সে ত কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে সুশান্ত চক্রবর্তী। পার্বতীপুর হাই-স্কুলের ইতিহাসের মাষ্টার।

ইতিহাস পড়তে খুব ভাল লাগত সুশান্তর। দেশ-বিদেশের ইতিহাস। কত রাজ-রাজড়ার উত্থানপতনের কত বিচিত্র কাহিনী। পড়তে পড়তে সুশান্তর কিশোর মন সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াত। অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ বোধ করত সুশান্ত। কিন্তু এখন আর ওর সে-আনন্দ নেই। এখন ও আর নবাব-বাদশার কাহিনী

শুনতে চায় না। জানতে চায় ওদের মত সাধারণ মানুষদের জীবনকথা।

হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে রিকশাটা একটু কাৎ হয়ে গেল। ব্রেক কষেই সুশান্ত তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। দেখল, পেছনের একটা চাকার টায়ার-টিউব ফেটে গিয়ে রাস্তার সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে।

ওদের নামতে বলে সুশান্ত কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

মুখ অন্ধকার করে ওরা নেমে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কি হ'ল রে, রিকশা যাবে না?

চাকাটার দিকে ওরা যেন ইচ্ছে করেই তাকাল না।

সুশান্ত গম্ভীর ভাবে বলল, না!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওরা বলল, গাড়িও পাওয়া গেল না; রিকশাও ভাঙল। তোরও বরাত খারাপ, আমাদেরও।

অর্থাৎ ক্ষতি শুধু সুশান্তরই হয় নি, ওদেরও হয়েছে। ঐটুকু সান্ত্বনাই যেন ওদের কাছ থেকে সুশান্তর প্রাপ্য ছিল। সেই পাওনাটুকু মিটিয়ে দিয়ে ওরা ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে সুরু করল।

টায়ার আর রিমের দুর্দশা দেখে সুশান্তর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ়। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতে সুশান্ত দেখল, দু'জনেই ওরা ছুটছে।

সুশান্তর মনে হ'ল, ওরা বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে। ভেবেছে, সুশান্ত বোধ হয় ওদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

ওদের ঐ ছুটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সুশান্তর হাতের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে ফেটে-যাওয়া রবারের টিউবের মত নেতিয়ে পড়ল। ওরা তখন অনেক দূরে চলে গেছে, দৃষ্টির বাইরে।

ওদের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুশান্ত। চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল পাশেই একটা খালি রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে। রিকশাওয়ালা সুশান্তরই বন্ধু।

ভাঙা রিকশাটাকে তাতে চাপিয়ে নিয়ে দু'জনে ওরা ঠেলতে লাগল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দূরের ঐ মেরামতির দোকানে।...

আসরের গল্প

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪) শেষের গান

মৃত্যুর পূর্বে কি গান গাওয়া সম্ভব? জীবন-মরণের সীমানায় এসে কোন গায়ক কি গান গাইতে পারেন? আকস্মিক মৃত্যুর কথা নয়। কোন গায়কের গান গাইবার সময় অকস্মাৎ মৃত্যু হ'তে পারে, যেমন একাধিক খেয়ালিয়াজী বা তবলাবাদকের মৃত্যু ঘটেছে আসরেই। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়ে সচেতন থাকবার কোন প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু অন্তিমকাল যেখানে অভাবিত নয়, মরণের ছায়া যখন ঘনায়মান হয়েছে শিয়রে, তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তখন কি সঙ্গীতসাধক শোনাতে পারেন জীবনের শেষ গান?

অবশ্য একথা সত্য যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু আসে যন্ত্রণা-কাতর রোগ-ভোগের শেষে, অস্ত্রোপচারের পর বিক্ষত দেহে, অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায়, কিংবা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির নানা ধরনের বিকৃতি বা বৈকল্যের ফলে, ইত্যাদি। রামমোহন রায় যেমন সেই চরম ক্ষণটির কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতে (রামকেলি—আড়া ঠেকা):

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ি ক্ষীণ, হিমকলেবর॥
অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর॥

এমন 'নিরুত্তর' ও 'কাতর' অবস্থায় গান করা যে সম্ভব নয়, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শরীর-মনের সম্পূর্ণ বৈকল্য না ঘটিয়ে কখনো কখনো মৃত্যু আসে। কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ না করেও যেমন ঘটে থাকে সজ্ঞানে মৃত্যু, হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে আসবার আগে সক্ষম-ইন্দ্রিয় মানুষ যখন বুঝতে পারে নিয়তির অমোঘ বিধান।

সেইভাবে মৃত্যু হবার আগে, কোন কোন ক্ষেত্রে জানা গেছে, মুমূর্ষু ব্যক্তি সঙ্গীতসাধক হ'লে সেই অন্তিম মুহূর্তে গান গেয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই গান করবার কথা আসে না; কিন্তু যিনি সারা জীবন সঙ্গীতের সেবায় সাধনায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন, সঙ্গীত যাঁর সমগ্র সত্তা অধিকার করে বিদ্যমান, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষের নিরিখে তাঁর পরিচয় নয়। তিনি, সক্ষম থাকলে, জীবন-দেবতার চরণে জীবনের শেষ অঞ্জলি কখনো কখনো সঙ্গীতেই নিবেদন করেছেন।

এমন কয়েকজনের কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে যাঁরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকে আজীবন সুর-সাধনার সমাপ্তিতে অর্ঘ্য দিয়েছেন সঙ্গীতের স্তবকে।

তাঁদের সকলের মৃত্যু অবশ্য একইভাবে হয় নি। এমন কি একজনের 'ইচ্ছামৃত্যু'ও ঘটেছিল বলা যেতে পারে। তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক প্রসঙ্গে তার যথাসম্ভব বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে একে একে। এখানে শুধু বলা প্রয়োজন যে, তাঁদের জীবন ও সঙ্গীতকৃতি এক ধরনের ছিল না। বিভিন্ন রীতির গায়ক ও সঙ্গীতসাধক ছিলেন তাঁরা, এমন কি তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গীতজীবন ও ধর্মজীবন একাকারে মিলে গিয়েছিল স্বাভাবিক পরিণতিতে এবং সেজন্যে তাঁরা সাধক নামে সুপরিচিত ছিলেন দেশে।

তাঁরা সকলে বাঙ্গালীও ছিলেন না। দু'জন হ'লেন অবাঙ্গালী এবং অন্যেরা বাংলার সন্তান।

এমন ছ'জন গায়কের বিচিত্র মৃত্যু প্রসঙ্গের বিবরণ যথাক্রমে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গীত-জীবনেরও কিছু পরিচয়। তাঁরা প্রত্যেকেই আপন

আপন বিভাগে বিখ্যাত। যথা,—বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, কালী-সাধক রামপ্রসাদ সেন, পাঁচালী-স্রষ্টা দাশরথি রায়, সাধক কমলাকান্ত, টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁ এবং খেয়াল ও ঠুংরি গুণী আবদুল করিম খাঁ।

তাঁদের নাম কিন্তু কালানুক্রমিক দেওয়া হয় নি। সে হিসাবে বলতে হয়, রামপ্রসাদ হলেন সর্বজ্যেষ্ঠ, তারপর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। রামশঙ্করের ১১।১২ বছরের বয়োকনিষ্ঠ হ'লেন কমলাকান্ত। কমলাকান্তের প্রায় ৩৫ বছরের বয়োকনিষ্ঠ দাশরথি বা দাশু রায়। এবং দাশরথিরও অনেক বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন রমজান খাঁ। তাঁর চেয়েও বয়সে অনেক ছোট ছিলেন আবদুল করিম খাঁ।

প্রথমে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কথা। আজ থেকে দু'শ বছরেরও কিছু বেশি আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য

বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে, বিশেষ ধ্রুপদ গানের জন্যে রামশঙ্করের নাম চিরদিন মনে রাখবার মতন। কারণ, তিনি শুধু বিষ্ণুপুরে নয়, বল্‌তে গেলে সারা বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি ধ্রুপদ গানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এবিষয়ে ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয়।

বিষ্ণুপুরের তিনি শুধু প্রথম ধ্রুপদগায়ক ছিলেন না, প্রথম ধ্রুপদাচার্যও। তিনি কৃতী শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করবার ফলেই বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরাণার পত্তন হয়েছিল। আগ্রা মথুরা অঞ্চল থেকে বিষ্ণুপুরে আগত এক হিন্দু সঙ্গীতাচার্যের কাছে কিভাবে ঘটনাচক্রে রামশঙ্কর সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করেন, তার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশ করা হয়েছে, এখানে আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। পশ্চিমের সেই গুণীর কাছে প্রাপ্ত একটি বিশেষ ধরনের ধ্রুপদ গানের সম্পদই তাঁর ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় চর্চার ফলে বাংলা দেশে বিষ্ণুপুর ঘরাণা নামে সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত হয়ে ওঠে। রামশঙ্করের শিষ্য-বর্গের দ্বারা কলকাতায় ও উনিশ শতকে বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদের নানা ঘরোয়া আসরে ও সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে প্রচলন হয়েছিল। এখানে বলা যায় যে, বাংলা দেশে বিষ্ণুপুরই একমাত্র ঘরাণা প্রবর্তনের গৌরব করতে পারে। বাংলায় বা বাঙালীদের আর দ্বিতীয় কোন ঘরাণা নেই যার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে এদেশেই।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নাম আরো একটি কারণে স্মরণীয় থাকবে। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম ধ্রুপদগান রচনা করেন এবং তাঁর সেই সব গান এক সময় বেশ প্রচলিত ছিল বাংলা ধ্রুপদের আসরে। বিষ্ণুপুর ঘরাণার এই এক বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সেখানকার ধ্রুপদীরা প্রায় সকলেই গান-রচয়িতাও ছিলেন। রামশঙ্করের প্রায় প্রত্যেক শিষ্য গুরুর মতন সঙ্গীত রচনাও করতেন। পশ্চিমাঞ্চলের ধ্রুপদীদের মধ্যে যেমন বিগতযুগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত, তেমনি বিষ্ণুপুরেও সঙ্গীতচর্চার অঙ্গ হিসাবেই যেন সঙ্গীত রচনা করতেন সেখানকার ঘরাণা গায়করা। এবং তার মুল আদর্শ ছিলেন রামশঙ্কর।

তাঁর রচিত ধ্রুপদগুলির মধ্যে কয়েকটির কথা জানা যায়। যথা,—'প্রণমামি শঙ্কর শম্ভু শিব স্মর-মথন' (বাহার—গীতাঙ্গী); 'অশরণ-জন শরণদ ভব-সাগর-নাবিক গোবিন্দ' (ভুপালী—ব্রহ্মতাল); 'অজ্ঞানতম নিকরে গাঢ়ময়ি পতিতে জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিতর জগদম্বে' (রাজবিজয়, তেওরা); 'কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেশ' (সরফরদা—ঝাঁপতাল); 'মাত সুরেশি ত্রিপথগামিনী ভব-ভয়-তারিণি গঙ্গে' (ভৈরব—চৌতাল), ইত্যাদি।

আরো অনেক গান তিনি নিশ্চয় রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গানের কোন সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর বেশির ভাগ গানই লোপ পেয়ে যায়।

রামশঙ্কর গান রচনা আরম্ভ করেছিলেন আঠারো শতকের শেষভাগে এবং সুদীর্ঘকাল সুস্থ দেহে সঙ্গীতচর্চা করবার জন্যে বহু-সংখ্যক গান তাঁর রচনা করবার কথা। কারণ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৯২ বছর বয়সে (১৮৫৩ খ্রীঃ)।

তাঁর সেই মৃত্যু প্রসঙ্গ বর্ণনা করবার আগে আর দু' একটি কথা সম্পর্কে বলে নেবার আছে।

তাঁর স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল ছিল এবং তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত সুস্থ দেহে-মনে যাপন ক'রে যান। স্মৃতিশক্তি ইত্যাদিও বয়সের হিসাবে যথাসম্ভব ছিল এবং তিনি

সঙ্গীতের চর্চাও বরাবর করেন, অর্থাৎ তাঁর নানা শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন শেষবয়স পর্যন্ত। তিনি প্রাচীন-কালের গুরুগৃহের আদর্শে শিষ্যদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন নিজের বাড়ীতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে। এই-ভাবে বহিরাগত অনেক শিষ্য নানা সময়ে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান ক'রে সঙ্গীতশিক্ষা ক'রে গেছেন। রামশঙ্করের এমন একজন শিষ্য ছিলেন পরবর্তীকালের কলকাতার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। ক্ষেত্র-মোহন তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে পিতার সঙ্গে কিশোর বয়সে এসে রামশঙ্করের গৃহে দীর্ঘ-কাল বাস ক'রে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের আর এক গৌরব যদু ভট্ট অতি অল্প বয়সে রামশঙ্করের কাছে যাতায়াত করতেন গান শেখবার জন্যে। কিন্তু বিশেষ কি আর শিখবেন সেই বয়সে? রামশঙ্করের যখন মৃত্যু হ'ল, যদু তখন ১৩বছরের বালক।

সে যা হোক, দীর্ঘ আয়ুর জন্যে রামশঙ্করকে অনেক শোক পেতে হয়েছিল। তাঁর পাঁচ পুত্র একে একে পরলোকগত হন তাঁর চোখের সামনে। তা ছাড়া অন্য শোকও পেয়েছিলেন।

সব পুত্রদের হারিয়ে শেষ জীবনেও সঙ্গীতকে একান্ত অবলম্বন করে রেখে দিন কাটাতেন, শিষ্যদের শিক্ষাদানে নিজেকে নিযুক্ত রেখে। সাধারণত তিনি কোন অসুখে পড়তেন না। শরীর প্রায় সুস্থই ছিল ৯২ বছর বয়সেও। অর্থাৎ বিশেষ কোন ব্যাধি তাঁর শরীরে আশ্রয় নেয় নি। এবং বয়সের পক্ষে যথাসম্ভব সক্ষম ছিলেন, বলা যায়।

তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে। সে-যাত্রা আর সুস্থ হ'তে পারলেন না, অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে গেল। অবশেষে ঘনিয়ে এল অন্তিম ক্ষণ।

শেষ অবস্থা বুঝে তাঁর শিষ্যবর্গ এবং কোন কোন আত্মীয় তাঁকে মল্লেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

মল্লেশ্বর বা শিবের প্রাচীন মন্দির-চত্বর তাঁর বাড়ীর পাশেই। বিষ্ণুপুরের এই প্রাচীন দেবালয় বিষ্ণুপুর-বাসীদের মতন ভট্টাচার্য বংশেরও অতি পবিত্র স্থান। সেজন্যে রামশঙ্করের সম্মতিতে তাঁকে মল্লেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যাবার আয়োজন হ'ল, গঙ্গাযাত্রার মতন।

খাটে শায়িত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় মল্লেশ্বর মন্দিরে। তিনি তখন হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন —অন্তিমক্ষণ উপস্থিত।

তাঁকে দেখা গেল মন্দিরে নিয়ে আসবার সময়— বুকের ওপর হাত দু'টি যুক্ত করে রয়েছেন। এবং গুন্ গুন্ ক'রে গাইছেন নিজের রচিত সেই প্রিয় গানখানি :

অজ্ঞানতম নিকরে, গাঢ়ময়ি পতিতে
জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিতর জগদম্বে।

বিষ্ণুপুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে সুপরিচিত ছিলেন রামশঙ্কর। অনেকেরই হৃদয়ে তাঁর অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিল। তাই তাঁর শেষ অবস্থার কথা শুনে তখন অনেকে ছুটে এসেছেন মন্দির প্রাঙ্গণে।

রামশঙ্করকে ধীরে ধীরে বহন ক'রে তখন তাঁর শিষ্য ও আত্মীয়রা আনছিলেন মন্দিরের সামনে। আর তিনি গুঞ্জন করছেন সকলের সুপরিচিত সেই গানটি—

কলুষ পূরিত মম কলেবর, অশেষ কুৎসিত কর্মতৎপর
স্থির মতি সংসার জল বিম্বে॥

তব মায়াময় মোহ গর্তে, অন্ধ অতিশয় নয়ন সত্বে,
শর্করা সম বাস বিষয় নিম্বে॥
তব চরণ কভু মননে নাহি ধরে, এমন দুর্মতি রামশঙ্করে
কুরু কৃপাময়ি কৃপা অবিলম্বে॥

এইভাবে তাঁকে নিয়ে আসা হ'ল মন্দিরে। তারপর উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করলেন, রামশঙ্করকে মন্দিরের চাতালে নামাবামাত্র তাঁর মৃত্যু হ'ল। যেন দেব-মন্দিরের এই সান্নিধ্যটুকু লাভ করবার জন্যেই তাঁর প্রাণ এতক্ষণ কোনরকমে টিঁকে ছিল। তাঁর সেই গানের গুঞ্জনও স্তব্ধ হয়ে গেল তারই পূর্ব মুহূর্তে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সূক্ষ্ম, অদৃশ্য রেখাটি মুছে গেল!

তাঁর শেষ সংবাদ শুনে বিষ্ণুপুরের আরো বহু লোককে সেখানে আসতে দেখা গেল তাদের প্রিয় সঙ্গীতাচার্যকে শেষ বারের মতন দর্শনের জন্যে। মল্লেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তখন লোকারণ্য। জানা যায়, বালক যদু ভট্টও তখন সেখানে ছিলেন।

রামশঙ্করের মৃত্যুতে সমবেত জনতার মধ্যে থেকে ক্রন্দনের রোল উঠ্‌ল স্বতস্ফূর্তভাবে।

'আমাদের শঙ্কর চলে গেল'—শোকার্ত অনেকের কণ্ঠ থেকে তখন উৎসারিত হয়েছিল।..

অগণিত অনুরাগী সাধারণের মধ্যে সঙ্গীত-গুরুর সেই মৃত্যু তাঁর মহৎ জীবনেরই মতন মহিমান্বিত!

রামপ্রসাদ

ইচ্ছা মৃত্যু কথাটি যে আগে আলোচ্য ব্যক্তিদের কথায় একবার বলা হয়েছিল, তা একমাত্র রামপ্রসাদ সেনের অর্থাৎ সাধক রামপ্রসাদের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়।

তিনি কোন রোগের তাড়নায় বা অসুস্থ দেহে প্রাণত্যাগ করেন নি, এই প্রসিদ্ধি আছে। অন্য সকলেরই মৃত্যু হয়; কিন্তু রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক বলতে গেলে, বোধ হয় বলা উচিত যে, তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পূর্ব দিনে তিনি সেকথা সকলের কাছে জানিয়ে দেন আর সত্যিই তা ঘটে যায় হালিসহরের বহু লোকের চোখের সামনে।

সে মৃত্যু-কাহিনী যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি কৌতূহল উদ্দীপক।

কিন্তু মৃত্যুর কথা আগে নয়, শেষে। প্রথমে রামপ্রসাদের জীবনের কথা—যে জীবনে তাঁর সাধন ভজন সঙ্গীত একসূত্রে গাথা হয়ে অঙ্গাঙ্গী ছিল।

রামপ্রসাদের কথা বাংলা দেশে কার অজানা আছে? দু'শ বছরেরও বেশি কালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আজও তাঁর নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অন্তরঙ্গ। কালী-ভক্ত, কালী-সেবক ও কালীসাধক রামপ্রসাদের নাম যেমন সুপরিচিত, তেমনি রামপ্রসাদের রচনা গান—শ্যামা সঙ্গীত। পল্লী-বাংলার উন্মুক্ত, সমতল প্রান্তরের মতন সেই সহজ, সরল সুরের আন্তরিক আবেদন—অতি সাধারণ কথায় আধারে অসাধারণ মাতৃভাবের প্রকাশ—অনন্য রামপ্রসাদী গান।

সেই প্রাণস্পর্শী অনাড়ম্বর সুরের মাধুর্য রামপ্রসাদের কণ্ঠ থেকে অনুসৃত হয়ে একদিন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মাঠে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। সে সুর শুনলেই চেনা যায়—রামপ্রসাদের নিজস্ব সৃষ্টি। প্রসাদী সুর নামে তা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টরূপে বাংলার সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত।

এখানে রামপ্রসাদী গান ও তার সুরের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রামপ্রসাদ যেসব গান রচনা করেন এবং নিজের সুরসংযোগে গাইতেন, তার বেশির ভাগই লোক-সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত নয় কি? রামপ্রসাদের গানের যে 'ট্রাডিশন' তা অলঙ্করণবিহীন, সাদা-মাঠা সুরের গান। তার ধরন অনেকখানি বাউলের মতন। কোন কোন রাগের আভাস রামপ্রসাদের সাধারণ গানে পাওয়া গেলেও সেটি তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর গানের যথার্থ লক্ষণ হ'ল সেই সহজ সরল ও স্বতন্ত্র সুর, যা' তাঁর মাতৃভাব ও বিশেষ অধ্যাত্মসাধনার প্রকাশ-বাহন। তাঁর গানে সাঙ্গীতিক কলাকুশলতা গৌণ, প্রধান হ'ল ভাব। কেউ কেউ রামপ্রসাদের গানকে রাগসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলেন। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, তাঁর সমস্ত গানই তাঁর সেই নিজস্ব সুরের নয়। কিছু কিছু গান তাঁর পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সুর ও তালের নাম জড়িত আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, রামপ্রসাদ কি স্বয়ং এই সব গান রাগসঙ্গীতের পদ্ধতিতে গাইতেন ব'লে নিশ্চিত জানা যায়? তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর কোন কোন গান আসরে গায়কেরা টপ্পার ধরনে গাইতে পারেন, কিন্তু তা সেই গায়কদের সচেতন প্রয়াসের ফলেই হয়ত সম্ভব হয়েছে। সেজন্যেই সেসব রাগভঙ্গিম গান রামপ্রসাদের সঙ্গীত হিসাবে সঙ্গীতের আসরে প্রচলিত নেই। কিন্তু তাঁর নিজস্ব সুরের শ্যামাসঙ্গীত বৃহত্তম জনসমাজে আজও সঞ্জীবিত আছে।

তাঁর শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ রাগভঙ্গির গানের প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য মনে আসে। তাঁর রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল।

তাঁর একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গাইবার। সেটি কোন সঙ্গীতের আসরে না হ'লেও, উল্লেখযোগ্য। সে গান তিনি শুনিয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে।

নবাবকে তাঁর গান শোনাবার এই বিবরণের মধ্যে ঘটনাস্থল হিসাবে দু'-রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি হ'ল : নবাব একদিন নৌকাবিহারে বেরিয়েছেন মুর্শিদাবাদে, রামপ্রসাদ তখন গঙ্গার ওপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বজরায় বসে তাঁর নিজের শ্যামাসঙ্গীত গাইছিলেন ভাবে বিভোর হয়ে। সিরাজদ্দৌলার কাণে সেই সুর যায় এবং তিনি মুগ্ধ হয়ে গায়কের অনুসন্ধান করেন। রামপ্রসাদের কথা শুনে অনুচরদের মারফৎ তাঁকে আহ্বান ক'রে আনেন নিজের বজরায় তাঁর গান শোনবার জন্যে। আর একটি বিবরণ হল, নবাব বজরায় কলকাতায় যাচ্ছিলেন। তাঁর বজরা যখন হালিশহরের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে, রামপ্রসাদ তখন সেখানকার গঙ্গার ঘাটে গান গাইছিলেন। নবাব সেই গান শুনে গায়ককে লোক দিয়ে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন নিজের বজরায়।

দু'টি বিবরণের ঘটনাস্থলে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূল কথায় কোন বৈসাদৃশ্য নেই। তা হ'ল, রামপ্রসাদের গান শুনে নবাবের মন আকৃষ্ট হয় এবং তিনি গায়ককে আহ্বান করেন নিজের বজরায় গান শোনবার জন্যে। সিরাজদ্দৌলার তখন দুশ্চিন্তায় ভরা এক বছরের নবাবীর সঙ্কটময় কাল। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ ঘনীভূত হয়ে চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিন এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের পরিবেশে তিনি অশান্তিতে বিপর্যস্ত। এমন সময় রামপ্রসাদের গানে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি ও শান্তরসের গভীর বাণী তাঁর পক্ষে মর্মস্পর্শী হয়েছিল। তিনি রামপ্রসাদকে বজরায় আমন্ত্রণ ক'রে এনে তাঁর গান যখন শুনতে চাইলেন, রামপ্রসাদ কিন্তু সংকোচে নবাবকে তিনি সাদা-মাঠা ভাষায় সহজ সুরের গান শোনালেন না। ভাবলেন, নবাবের তা হয়ত ভাল লাগবে না। তাই তিনি নবাবকে শোনালেন কাওয়ালী, গজল ইত্যাদি গান।

কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সেই উর্দু হিন্দী গান রামপ্রসাদের মুখে ভাল লাগলনা।

এ গান শোনাবার জন্যে তিনি রামপ্রসাদকে আনান নি—নবাব তাঁকে জানালেন। যে অপূর্ব গান তিনি একটু আগে অমন দরদ দিয়ে প্রাণের আবেগে গাইছিলেন, সেই মিষ্টি সুরের বাংলা গান এখন শোনান।

তখন রামপ্রসাদ গাইলেন তাঁর নিজস্ব সেই সহজ সরল সুরের অপূর্ব ভাবের হৃদয়স্পর্শী গান। নবাব সে গান শুনে পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর চোখে নাকি দেখা গিয়েছিল অশ্রু।...

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, রামপ্রসাদ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তবে তিনি এই সঙ্গীত-পদ্ধতি যে শিক্ষা করেছিলেন, তা' সম্ভবত নয়। কারণ তিনি যৌবনকাল থেকেই তাঁর শ্যামা মায়ের সাধন-ভজনে আত্মনিমগ্ন থাকতেন। তাঁর সঙ্গীত রচনা ও গান করা সেই শক্তি-সাধনারই একটি উপকরণ।

শ্যামার সাধনা ও আরাধনায় তিনি যেভাবে সমগ্র সময় তন্ময় থাকতেন এবং হালিসহরে আজীবন যে পরিবেশে দিন যাপন করেন, তাতে তাঁর পক্ষে রাগ-সঙ্গীত পদ্ধতিগত ভাবে চর্চা করা কি সম্ভব? তা বোধ হয় নয়। তাঁর কোন জীবন-চরিতে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না, এও লক্ষণীয়। সিরাজ-দ্দৌলাকে তাঁর গান শোনাবার প্রসঙ্গ থেকে এমন মন্তব্য করা অতিশয়োক্তি হ'তে পারে যে, রামপ্রসাদ রাগসঙ্গীতে রীতিমত অভিজ্ঞ ছিলেন। হয়ত কিছু হিন্দুস্থানী গান তিনি শুনে শিখেছিলেন, এই পর্যন্ত। এবং হয়ত তা সম্ভব হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে যাতায়াতের ফলে। কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহে রামপ্রসাদকে কখনো কখনো নদীয়া রাজসভায় যেতে হ'ত গান শোনাবার জন্যে এবং দরবারী সঙ্গীতজ্ঞদের গানও সেখানে তাঁর শোনবার সুযোগ হ'তে পারে। কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে যে পশ্চিমের কলাবতের অবস্থান ঘটত, তা কবি ভারতচন্দ্রের সে সভার বর্ণনা থেকেও জানা যায় :

কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গ সমঝ্খেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্তক প্রধান দেগর মামুদ সভায়।
মোহান খোসালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারী গায়কদের সঙ্গীত থেকেই রামপ্রসাদ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত হয়ে

থাকবেন। তাঁর সাধক-জীবনে এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় সুযোগ ছিল না বলেই মনে হয়।

নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রামপ্রসাদের গান শুনিয়ে তৃপ্তি দেবার প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গীতিকণ্ঠের বিষয়ে একটি জনশ্রুতিও এখানে উল্লেখ ক'রে রাখা যায়। তা হ'ল—রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর বা গানের গলা নাকি সুমিষ্ট ছিল না, শ্রোতারা আকর্ষণবোধ করত না তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্যে। কিন্তু তিনি এমন আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে এবং প্রাণের প্রেরণায় গান গাইতেন যে, কণ্ঠের মিষ্টত্বের অভাব শ্রোতাদের মনে হ'ত না। সকলে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ত তাঁর অন্তরের গভীর আবেদনে। যেমন হয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা।

প্রথম যৌবনকাল থেকেই রামপ্রসাদের গান রচনা ও গান গাওয়ার কথা জানা যায়। নিজের ভাবে এমনি তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান থাকত না তাঁর। সাংসারিক অনটনের জন্যে প্রথম জীবনে কাজ করতে এসেছিলেন কলকাতায়। তখনকার এক জমিদার বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে জমিদারী সেরেস্তার হিসেবের খাতায় হিসাবের বদলে অন্যমনস্ক হয়ে গান রচনা ক'রে ফেলেন :

আমায় দেও মা তবিলদারি।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্ধ অঙ্গ জায়গীর মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

সহৃদয় মনিব রামপ্রসাদের এই বৃথা কাজ থেকে অবসর দিয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দেন, একথা সকলেরই সুবিদিত। তার পর থেকে হালিসহরেই তাঁর শেষ পর্যন্ত বাস।

হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর ভদ্রকালী পদ অভিলাষী।

পঞ্চমুণ্ডির আসনে তান্ত্রিক-সাধনা। শ্যামাভাবে তন্ময় ধর্ম-জীবন। এবং ধর্ম-জীবনের অঙ্গস্বরূপ শ্যামা-সঙ্গীত গান।

কখনো কখনো কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গ দিতে নদীয়া যেতেন কিংবা তাঁর সঙ্গে জলপথে অন্য কোথাও।

কখনো বা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত হ'তেন হালিসহরে। এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের একটি কাছারি বাড়ী ছিল, জমিদারির কাজে এখানে এসেই তিনি একদিন গান শোনেন রামপ্রসাদের। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তারপর এক এক সময় রামপ্রসাদকে নিয়ে যেতেন বজরায়। নিজের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যেতেন কৃষ্ণনগরে। কখনও বা কলকাতায় কিংবা অন্যত্র। রামপ্রসাদের গান শুনতেন, কাব্য শুনতেন। রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন' উপাধি কৃষ্ণচন্দ্রেরই গুণগ্রাহিতার পরিচয়। 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা শেষ করবার পর তাঁকে নাকি এই উপাধি দিয়েছিলেন তিনি। কবিকে বৃত্তিদান ভূমিদান, (১৪ বিঘা লাখেরাজ জমি) ইত্যাদি করেও মহারাজা তাঁর সাধন জীবনের সহায়তা করেন।

কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহরে উপস্থিত হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রের একটি কৌতুক উপভোগের বিষয় ছিল—রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া। এ অবশ্য সাধারণ কোন বিবাদ নয়। তাঁদের দু'জনের বিরোধ ছিল আদর্শগত অর্থাৎ শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ—বাংলার ধর্ম তথা সামাজিক ইতিহাসের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের সেই বিবাদ সঙ্গীত সংগ্রামে রূপ নিত। তাঁদের আদর্শের লড়াই এবং পারস্পরিক আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলত তাঁদের রচিত সঙ্গীতের সাহায্যে। অনেক সময়েই সেসব সঙ্গীত তাঁদের তাৎক্ষণিক রচনা। তাঁদের সেই সঙ্গীত-সংগ্রাম যেন শাক্ত-বৈষ্ণবের 'কবির লড়াই'।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের বিবাদ সৃষ্টি করেন, তা নয়। তাঁদের দু'জনের সেই

প্রতীকী বিরোধ আগে থেকেই ছিল, কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে উপলক্ষ্য হ'তেন মাত্র এবং উপভোগ করতেন হালিসহর অঞ্চলের অন্যান্যদের সঙ্গে। সেখানে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের সঙ্গীত সংগ্রাম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

কুমারহট্ট অঞ্চলটিই আসলে হ'ল শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম তথা ভাবাদর্শের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। বৈদ্য-প্রধান কুমারহট্ট-কাঞ্চনপল্লী (কাঁচরাপাড়া) অঞ্চলে একদিকে যেমন শাক্ত প্রভাব, অন্যদিকে এখানে তেমনি বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শও লক্ষ্যণীয়ভাবে ছিল। হালিসহর শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়েরই একটি প্রধান স্থান।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে এবং তার পরেও অনেকদিন ধরে কাঁচরাপাড়ায় শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রমুখ বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত সাধকদের বসবাস ঘটেছে। ফলে নিকটের হালিসহরও হয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। রামপ্রসাদের সমসাময়িক আজু গোঁসাই সেই ভাবধারার প্রতীক এবং এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এ অঞ্চলের ভাবধারায় স্বভাব-সঞ্জাত। তাঁদের দু'জনের সঙ্গীত-সংগ্রাম দুই ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামীরা রীতিমত আস্বাদন করতেন।

আজু গোঁসাইয়ের জীবন সম্বন্ধে বাস্তব বিবরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। এমন কি তাঁর নামটির বিষয়েও সকলে একমত নন। কেউ বলেন, অযোধ্যারাম বা রাজু বা আজু গোঁসাই। আবার কারুর মতে, অজয় কিংবা অদ্বৈতানন্দ গোঁসাই থেকে আজু গোঁসাই নাম মুখে মুখে চলিত হয়ে যায়। সে যা হোক, তিনি ছিলেন হালিসহরের এক সদানন্দ পুরুষ। স্বভাব-কবি। যখন খুশি গান রচনা করছেন মুখে মুখে এবং শ্রোতাদের শুনিয়েই তাঁর আনন্দ। সংসারের কোন কিছুর ধার-ধারেন না। বাস্তব জগতেরও বিশেষ দায়-দায়িত্ববোধ করেন না। সাধারণের কাছে তাই তাঁর এক পরিচয় ছিল—পাগল। আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন পণ্ডিত তেমনি পরিহাস-রসিক। বিদ্বানদের মধ্যে তিনি গুণী বলে সুপরিচিত হ'লেও জনসমাজে পাগল হিসেবেই উপেক্ষিত ছিলেন।

আজু গোঁসাইয়ের গান বেশির ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিছু সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন, তাই তাঁর কবিত্বের নিদর্শনস্বরূপ রক্ষা পেয়েছে কয়েকটি মাত্র গান। তাই থেকেই তাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নিতে হয়। এই গান ক'টি বেঁচে না থাকলে আজু গোঁসাইয়ের নামটিও যেত লোপ পেয়ে। যাক সে কথা। এখন তাঁর ও রামপ্রসাদের সঙ্গীত-সংগ্রামের প্রসঙ্গ।

আজু অন্য সব বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বটে, কিন্তু শাক্ত রামপ্রসাদের বিষয়ে নয়। রামপ্রসাদের গানে কথার ছল ধরে, ভাবের প্রতিবাদ করে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। রামপ্রসাদও কখনও কখনও কটাক্ষ করতেন বৈষ্ণবদের নিয়ে। এই ভাবে বেধে যেত তাঁদের সঙ্গীত-সংগ্রাম। তাঁদের সেই কথা ও সুরের যুদ্ধে যেমন শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সংঘাত, তেমনি আবার ব্যক্তিগত আক্রমণও ফুটে উঠত। তাই দু' সম্প্রদায়ের ভক্তজন যেমন তা উপভোগ করত, তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষও।

আজু গোঁসাইকে যে লোক পাগল বলত, সেই সূত্রে রামপ্রসাদ একদিন ইঙ্গিত করেন: 'কর্মের ঘাট, তৈলের কাঠ ও পাগলের ছাট মলেও যায় না।'

আজু গোঁসাই তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, রামপ্রসাদের কারণ-সেবনকে কটাক্ষ করে: 'কর্ম ডোর, স্বভাব চোর আর মদের ঘোর মলেও যায় না।'

রামপ্রসাদ নিজের ভাবে গাইলেন:

এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সরার জলে সূর্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটি॥

এই গান লক্ষ্য করে আজু গান তৈরি করলেন:

এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন তার তেমন ধন মন করবে পরিপাটি।
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি॥
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।

রমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও ত দেখি না ত্রুটি ।
তুমি ইচ্ছা সুখে খেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি ।
মহামায়া বিশ্ব ছাওয়া ভাবছো মায়ার বেড়ি কাটি ।
তমে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামামায়ের চরণ দু'টি ॥

তীর্থ পর্যটনের অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে যখন রামপ্রসাদ গাইলেন :

কাজ কি রে মন গিয়ে কাশী,
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥
সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী ।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী ॥

তখন তীর্থ-ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতিনিধিরূপে আজু গোঁসাই উত্তরে গাইলেন :

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী,
ওরে তথায় গিয়ে দেখবিরে তোর মেসো আর মাসী ॥
ঘরে বসে থাকিস যদি, ধরবে তোরে যক্ষ্মা কাশি,
এই বেলা নে তল্পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি ॥

আবার রামপ্রসাদ যখন গাইলেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি ।
কালী কল্পতরু তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি ।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় শুধাবি ॥

আজু তার তাত্ত্বিক উত্তর দিলেন :

কেন মন বেড়াইতে যাবি ।
কারো কথায় কোথাও যাসনিরে তুই
মাঠের মাঝে সারা হবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি ।
ও তুই মদের ঝোঁকে কোস্তে পারিস
মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি ॥
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি ।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে
কি ফল নিবি ॥

শাক্ত রামপ্রসাদ প্রত্যুত্তরে সুরাপানের দার্শনিক ব্যাখ্যা শোনালেন :

মন ভুল না কথার ছলে ।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥
সুরাপান করিনি রে, সুধা খাইয়ে কুতুহলে ।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ মাতালে মাতাল বলে ॥...

রামপ্রসাদ তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি একদিন গাইছিলেন :

আমায় দেও মা তবিলদারি ।

আজু গোঁসাই শুনে উত্তরে গাইলেন :

কেন চাস ভাই তবিলদারি,
ও কাজে আছে ঝুঁকি ভারি ॥
দুদিনকার মুহুরি হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি ।
পেলে তবিল ভাঙতে এক তিল তোমার
আর সবে না দেরি ॥

রামপ্রসাদের আর একটি বিখ্যাত গান :

এবার কালী তোমায় খাব ।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার ।
গণ্ড যোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে ।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব ॥

এই গান শোনামাত্র আজু গাইলেন :

সাধ্য কি তোর কালী খাবি ।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা
কেড়ে নিবি ॥
সর্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভুষোকালি মেখে যাবি ।
আবার কালোরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি ।

রামপ্রসাদ যখন গাইলেন :

মন রে আমার এই মিনতি ।
তুমি পড়া পাখী হও এই স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড়ে মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি ।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি ।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি ॥

আজু গোঁসাইয়ের উত্তর হ'ল :

হয়ো না মন পড়া পাখী ।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥
পাখা হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি ।

তুমি মুখে বলবে পরের বুলি, পরম তত্ত্বের জানিবে কি।
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফলে উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর,
শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥

এমনি সব সঙ্গীত-যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে আজু গোসাইয়ের নামের স্মৃতিটি কোনক্রমে বেঁচে আছে।

আজুর জীবনকাল সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু রামপ্রসাদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে একটি সূত্র এই পাওয়া যায় যে, তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়েও জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীঃ বা ১১৭৬ সন পর্যন্ত। বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকক্ষয়কর সেই মানুষের হাতে-গড়া দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় বসে তিনি এই গানটিতে তাঁর মর্মক্রন্দন প্রকাশ করেছিলেন :

অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধার অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে॥
মোক্ষ প্রসাদ দেও অম্বে, এমুখে অবিলম্বে,
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা
কাতরা হইও না প্রসাদে॥...

রামপ্রসাদের জন্ম বছর ১৭১৭ খ্রীঃ, কিংবা মতান্তরে ১৭২৩ খ্রীঃ। সুতরাং মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স কম-বেশি ৬০ বছর অনুমান করে নেওয়া যায়। কোন কোন মতে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রীঃ।

এখন রামপ্রসাদের যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হবে তা তাঁর সব জীবনীগ্রন্থেই আছে, যদিও সেসব পরবর্তীকালের রচনা। রামপ্রসাদের জীবন-কথার অনেকাংশই যেমন কিংবদন্তী-নির্ভর, এটিও তাই। তবে এটি তাঁর বিষয়ে অন্যান্য কাহিনীর মতন অলৌকিক নয় এবং অ-সাধারণ হ'লেও অবিশ্বাস্য নয়। সেজন্যে, দয়ালচন্দ্র ঘোষ ('প্রসাদ প্রসঙ্গ'), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('কবি-চরিত') প্রভৃতি সেকালের লেখকদের থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের গবেষকরাও প্রচলিত বিবরণটিই দিয়েছেন। এমন কি এডওয়ার্ড জে. টম্‌সন্ ('Bengali Religious Lyrics. Sakta') পর্যন্ত। সেকালের লেখকদের মধ্যে শুধুমাত্র উইলিয়ম কেরি যা বলেছেন তা সামান্য পৃথক। রামপ্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে মৃত্যু হওয়ার কথা তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করেন নি এবং তাঁর গঙ্গায় আত্মবিসর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন: 'He died in 1762 (এ তারিখটি সঠিক নয়—বর্তমান লেখক), it is said, by jumping into the river Ganges with the image of Kali'.

কেরি সাহেবের দেওয়া রামপ্রসাদের এই মৃত্যু-বৃত্তান্ত অবশ্য অন্য অনেক লেখকই মানেন না।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বিবরণ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যে-ভাবে পাওয়া যায় তা এখানে দেওয়া হ'ল :

সেবারে শ্যামাপূজার সেই প্রথম দিন। রামপ্রসাদ অন্যান্য বছরের মতন পরম ভক্তিভরে তাঁর আরাধ্য দেবীর পূজা করছেন। গ্রামের অনেকেই পঞ্চবটিতে তাঁর কালী-পূজার স্থানে উপস্থিত। এমন সময় রামপ্রসাদ হঠাৎ সকলের সামনে বললেন—কাল মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে আমারও বিসর্জন হবে।

তাঁর কথা শুনে সকলে আশ্চর্য বোধ করলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথা বললেন না, এ বিষয়ে। রামপ্রসাদ আপন মনে গাইতে লাগলেন—

তারা তরী লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটিয়ে,
ত্বরা তরী চল্ বেয়ে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর বসে হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মন বাঁধরে এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটেছি ভবের মায়া কেটে॥

সবাই অতি দুঃখের সঙ্গে শুনতে লাগলেন রাম-প্রসাদের পরপারে যাবার ইচ্ছার কথা। তিনি আবার গাইলেন :

সামাল ভবে ডুবে তরী,
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই করছে দাগাদারি॥
এনেছিলি বসে খেলি, মন মহাজনের মূল খোয়ালি।

যখন হিসাব (করে) দিতে হবে (মন)
তখন তহবিল হবে হারি ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় রে চুরি ॥

তাঁর ইষ্টদেবীর প্রতিমার সামনে তিনি এমনি ভাবে একটির পর একটি গান গাইতে লাগলেন। ধীর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তন্ময় মুগ্ধভাব। চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে প্রসারিত।

সেই তাঁর শেষ পূজা, কালীপূজার দিন। পূজা শেষ করবার পর রামপ্রসাদ উপস্থিত সকলকে যথারীতি আলিঙ্গন, আশীর্বাদ করলেন। তারপর সকলে ঘরে ফিরে গেল সেদিনের মতন। রামপ্রসাদের অপূর্ব ভক্তি-ভাব ও বৈরাগ্যের গানের রেশ তখনও সকলের মনে ভরে রয়েছে। এবং কাল বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দেহেরও বিসর্জন হবে—তাঁর এই আশ্চর্য কথা লোকের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।···

অমাবস্যার সে রাত প্রভাত হ'ল যথাসময়ে। ক্রমে সকাল, দুপুর, বিকাল গেল। প্রসাদের ঘরের সামনে পঞ্চবটিতে তখন অসংখ্য লোকের ভিড়। কুমারহট্টের বালক বৃদ্ধ যুবক দলে দলে এসে উপস্থিত হয়েছে পূজার প্রাঙ্গণে। বিসর্জনের বাজনা আকাশ-বাতাস বিষণ্ণ করে তুলেছে। রামপ্রসাদ রয়েছেন দেবীমূর্তির সামনে।

সন্ধ্যার একটু আগে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন শেষ হ'ল। রামপ্রসাদ মাথায় তুলে নিলেন মৃন্ময়ী প্রতিমা। গ্রামের সকলে মিলে বিরাট্ শোভাযাত্রা করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল।

অতি ভারাক্রান্ত সকলের মন। কারণ, যে-কথা রামপ্রসাদ আগের দিনে বলেছিলেন, তা সকলের মনে গাঁথা রয়েছে। এক অজানিত বিয়োগ-ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে সবাই অনুসরণ করছেন তাঁকে।

রামপ্রসাদ হালিসহরের শিবের গলির মধ্যে দিয়ে গঙ্গার দিকে চললেন। সকলে শুনতে লাগল তাঁর আকুল কণ্ঠের গান :

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়
যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে
ঘরে ফিরে চল ॥···

শোকাচ্ছন্ন শোভাযাত্রা রামপ্রসাদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছাল। আরও খানিক এগিয়ে এসে, বিসর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট সেই ঘাট।

রামপ্রসাদ সেই ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। এই তাঁর সেই বহুদিনের পরিচিত, বহুদিনের প্রিয় ঘাট। দীর্ঘকাল ধরে দিনের পর দিন এখানে তিনি এসেছেন, বসেছেন, গান গেয়েছেন। এই ঘাটে, এই গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আপন মনে গান গাইতেন, সেই সব সময়েই তাঁর কণ্ঠের গান বেশি শুনেছে হালিসহরের লোকেরা। গঙ্গার বুকে নৌকায়, বজরায় দূরের যাত্রীরা।

সেই চির-পরিচিত ঘাটে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ শোভা-যাত্রার ও সমাগত সকলের কাছে বিদায় নিলেন। (কোন কোন মতে, তারপর তিনি ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন মাথায় প্রতিমা নিয়ে)। মতান্তরে, কালী মূর্তি গঙ্গার ধারে রেখে গঙ্গায় নামলেন রামপ্রসাদ।

গঙ্গার ধারে তখন অগণিত লোকের ভিড়। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রামপ্রসাদের দিকে। তারা দেখলে, রামপ্রসাদ সিঁড়ির ধাপে ধাপে নেমে গঙ্গায় নাভি-জলে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সেখান থেকে ভেসে এল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গান :

কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল্ বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইব ধেয়ে ॥

এই গানখানি গেয়ে রামপ্রসাদ আর একটি গান ধরলেন :

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে
তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খেয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিলায় জলে॥

সকলে শুনলে, রামপ্রসাদ তারপর তৃতীয় গান আরম্ভ করলেন:

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো। ..
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলেম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো॥

সেইভবে অর্ধাঙ্গ জলে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ তিনটি গান শেষ করে চতুর্থ গান আরম্ভ করলেন, যেমন ভাবে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে তিনি অন্যান্য দিন স্নানের সময় গানের পর গান গেয়ে যেতেন।

গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে এবার সকলে শুনতে লাগল রামপ্রসাদের কণ্ঠে সেই শেষ গান:

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমন সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি।
মাগো ও মা ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই তোমারে সাধিতাম নাই।
মাগো ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়।
মাগো ও মা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥

শেষ কলির শেষ কথা 'দক্ষিণা হয়েছে' অতি করুণ সুরে গাইবার পরেই রামপ্রসাদের জীবনের অবসান হল। এবং তাঁর সম্বন্ধে বেশির ভাগ বিবরণীতেই আছে যে, তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে। এমন কি, এডওয়ার্ড জে. টম্‌সনও লিখেছেন—

'Then he died singing like Saxon Caedmon; with the conclusion of the lyrics, his soul, went out through the top of his head and passed to the world of Brahman.'

তবে আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের মন হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে, কেরি সাহেবের মতন,যে, রামপ্রসাদ গান শেষ করবামাত্র গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন শ্যামা প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে।

একটি মত প্রচলিতও আছে যে, তিনি প্রতিমা মস্তকে ধারণ করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আর তাঁর দেহ দেখতে পায় নি গ্রামবাসীরা।

—*—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সেদিন সোনার ঊষা অকস্মাৎ খুলে দিল সোনার কপাট
ঝরিল আকাশ হতে উজলিয়া ধরার ললাট
পুরাণের বারতা নূতন।
নব ব্রাহ্মণের জন্ম করিল ঘোষণ
দেখা দিল নূতন ব্রাহ্মণ।
অন্তরের কোষ ভরা ঐশ্বর্য আপন,
পাশরিয়া বিস্মরিয়া সুপ্ত ছিল গৃহকোণে জড়ের মতন,
লাঞ্ছনায় দীনতায় মূঢ় নত শিরে
আপনারি আঙিনায় ভিক্ষুকের মত ফিরে ফিরে
অজানা অনামা দীন আশাহীন ভাষাহীন
মূঢ় মূক কোলে জননীর
একে একে জেগে ওঠে দীপ্ত উচ্চ শির
ওই নূতন ব্রাহ্মণ।
নব ঊষা দেখাইল পথ
চলে তারা দেশে দেশে দিকে দিকে ভাঙি সিন্ধু
অরণ্য পর্বত
সমিধ করিতে আহরণ।
কেহ বেদ কেহ শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞান কর্ম কেহ
জননীর জীর্ণ গৃহে অনন্ত ভাণ্ডার
বিস্মৃতির অন্ধকার গুহামাঝে
ভূর্জপত্র ঐশ্বর্য আধার।
কেহ যায় সাগরের পারে আনিতে দানিতে নূতন ধন
তারা নূতন ব্রাহ্মণ।
কেহ ধূপ আলে ঘরে, কেহ দীপ শিখা,
সাজাইল পত্রপুষ্পে পুষ্পপাত্র, আনে নৈবেদ্য সম্ভার।
অঞ্জলির মন্ত্র আনে খুঁজি তালপত্র ভূর্জপত্রে লিখা!
তুমি এনেছিলে সেথা সেবা উপচার!
জেলেছিলে 'প্রদীপ' আবার!
তারপরে আশা নিয়ে ভাষা নিয়ে নূতন বারতা নিয়ে
আহরিয়া কথা কাজ নব—
তেজে জ্ঞানে রূপে রসে জাগাইলে "নিজ বাসভূমে
পরবাসী" বিমূঢ় মানব।
সত্য যাঁর ন্যায় যাঁর দেশ যাঁর ছিল আজীবন
সাধনার ধন।
একজন নূতন ব্রাহ্মণ।

সকল মানুষই ক্রিমিনাল হ'তে পারে…
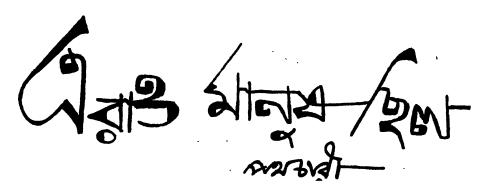
হয় না, সে তার কৃতিত্বে নয়—ভাল যে থাকতে পারল সে তার ভাগ্যে।

ক্রিমিনাল মানুষ হয় না, ক্রিমিনাল মানুষকে করায়। করায় তার পারিপার্শ্বিক, তার পরিবেশ। ক্রিমিনাল মানুষের একটা অবস্থা, ভাগ্যের একটা দিক। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে দেখলে সব মানুষই সমান। একই মানুষ সারাটা জীবন ভাল থেকে শেষ-বয়সে ঘটনাচক্রে ক্রিমিনাল হয়ে গেল। আমার এক ক্রিমিনাল বন্ধু তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন :

আমি ছিলাম জেলা কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারি। সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল, বড় চাকরিও করতাম। বয়সের গাম্ভীর্যে এবং ব্যক্তিত্বে পাড়ার সকলেই ভয় করত। সেকালের ইংরেজ-মহলেও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল—তারা বলত, ব্যানার্জির মত আর গোটাকয়েক 'জায়েণ্ট' থাকলে ভারতবর্ষ কো-ন্ দিন স্বাধীন হ'ত।

সেই আমি—আজ আমাকে কেউ চিনতেও পারে না, বা চিনলেও চিনতে চায় না।

কেন এমন হ'ল, সেও এক মজার কাহিনী।

সেবার কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। মহিলা-কর্মী চাই। সভা-সমিতি ক'রে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। মেয়েরা দলে দলে এসে নাম লিখিয়ে যাচ্ছে।

সবাই অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত। উৎসবের সমারোহে ঐ ক'টা দিন কি-ভাবে কেটে গেল আমরা জানি না। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে বললেন, আমার মেয়ে কোথায়? আমি সেক্রেটারি, দায়িত্ব আমার। বললাম, আপনার মেয়ের নাম? ভদ্রলোক নাম বললেন। আমরা যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি ক'রেও সে মেয়ের সন্ধান পাই নি। প্রায় এক বছর পরে সরকারী হাসপাতাল থেকে আমার নামে চিঠি এল। এক অপরিচিতা সন্তান-প্রসবান্তে সেই সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ে আমার নাম লিখিয়েছে।

মনে পড়ল, এ সেই অপহৃতা মহিলা, যার সন্ধানে আমরা কত বিনিদ্র-রজনী যাপন করেছি।

বন্ধুরা উপহাস করলেন, আত্মীয়েরা ক্ষুব্ধ হ'লেন। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই মিটল না। আদালতে মেয়েটি খোরপোষের দাবি তুলল। আমাকে কোর্টেও দাঁড়াতে হ'ল।

কেউ বিচার ক'রে দেখল না, আমার মধ্যে এর সম্ভাবনা আছে কি না। সারা জীবনের নিষ্ঠা, অতবড় প্রতিষ্ঠা একটি মিথ্যা-কাহিনীর জৌলুসে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। সবাই ছি-ছি করতে লাগল। ঘরে-বাইরে যেন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আমি অপরাধী। স্ত্রীর মনেও আর সে বিশ্বাস নেই, ছেলেরাও পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে—এ যে কি জীবন, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

চাকরিটা এততেও ছিল, কিন্তু এরপর যা ঘটল, তাতে শুধু চাকরি কেন, আমি গোটা মানুষটাই বদ্‌লে গেলাম।

হঠাৎ এক কাল-রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করলে। আমার নামে বডি-ওয়ারেণ্ট, খুনী আসামী ব'লে চালান হয়ে গেলাম। আদালতে শুনলাম, মেয়েটির শিশু-পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে আমি ধৃত হয়েছি। ফাঁসী হ'ল না, সাত বছরের জন্যে জেলে গেলাম।

কিন্তু ক্রিমিনাল যে কে সেটা অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

এমনি কত ক্রিমিনাল যে অজ্ঞাতের অন্ধকারে রয়েছে তার হিসেব কেউ জানে না।

কিন্তু আমি জানি এক বিচারকের কাহিনী। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে অজ্ঞাতসারে ব'লে চলেছেন নিজের অপরাধের কথা। তবে কাহিনীটা বলি শুনুন—

আদালত কক্ষ। বিচারক বিচারাসনে আসীন। আসামীর কাঠগড়ায় তাঁরই বাগানের মালী, একটি শিশু-পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী।

ডাক্তারী পরীক্ষায় বলা হয়েছে, ছেলেটিকে কোনো ধারাল অস্ত্রদ্বারা বার বার আঘাত করা হয়েছে।

মালী কোনো কথাই বলতে পারছে না—সে 'হাঁ' ও বলে না, 'না' ও বলে না। মনে হয়, সে যেন সবকিছু ভুলে গিয়েছে।

মালীর পক্ষে সওয়াল জবাব করবার কেউ নেই। সাক্ষী ব'লে কেউ এগিয়েও এল না। তবু তাকে ধরা হয়েছে সন্দেহ ক'রে, কারণ ঐ বাগানেই ছেলেটির মৃতদেহ পড়েছিল। বিচারককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তিনি উত্তেজিত হ'য়ে বলেছিলেন, হাঁ, আমি দেখেছি, বলরামই ছেলেটাকে একটু একটু ক'রে জবাই করেছে।

বলরামের পক্ষে উকিল নেই, নইলে অনেক প্রশ্নই উঠত। তিনি কোথা থেকে কেমন ক'রে দেখলেন, আর দেখলেনই যদি তবে ছুটে এসে ছেলেটিকে রক্ষা করতে পারলেন না কেন। তা ছাড়া তিনি নিজে বলছেন ছেলেটিকে একটু একটু ক'রে জবাই করা হয়েছে—সেসময় তিনি একবার চীৎকারও করেন নি কেন। হয়ত চীৎকার করলে, ছেলেটা রক্ষা পেতেও পারত। হত্যার পরেও তিনি পুলিশে কোনো ইনফরমেশন দেন নি। এক বিচারকের মুখের কথা ছাড়া মালীর বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ নেই।

'কেস' বেশীদিনের নয়, দু-এক দিনেই 'রায়' দেওয়া চলে, তবু বিচারক দেরি করছেন। আদালত থেকে প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বলেন, 'কেস'টা আমি একবার 'ষ্টাডি' করব—এর জন্যে মালীকেও আমার প্রয়োজন হ'তে পারে।

সবাই লক্ষ্য করল, এই কথা কয়টা বলতে বিচারক অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

একজন বৃদ্ধ উকিল বললেন, হবে না, হাজার হোক নিজের বাগানের মালী ত!

মালী বলরাম যে-ঘরে আবদ্ধ ছিল, সেই ঘরে এসে ঢুকলেন স্বয়ং বিচারক এবং সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার।

বিচারক একটি চেয়ারে বসলেন, মালী তাঁর পায়ের তলায় হতভম্বের মত এসে বসল। বিচারক স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা উত্তেজিত হয়ে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, তুমিই খুন করেছ!

মালী নিরুত্তর। বিচারকের স্বর হঠাৎ নেমে গেল। বললেন, ছেলেটা কি করতে বাগানে এসেছিল রে?

—আমি ত জানিনে হুজুর!

বিচারক আবার খানিকটা চুপ করলেন। ছেলেটা দেখতে বেশ, নয়রে? তাই বুঝি লোভ হ'ল—

পুলিশ-অফিসার চম্‌কে উঠল। মালী যেন রূপকথা শুনছে—নিষ্পলক চেয়ে আছে বিচারকের মুখের দিকে।

বিচারক বললেন, আমি দেখেছি, ছেলেটা যত হাত-পা ছোঁড়ে তোর আনন্দ তত বেড়ে যায়—বেশ লাগে নয় রে, গলগল ক'রে রক্ত বেরুচ্ছে আর দেহটা ধড়ফড় করছে—

পুলিশ-অফিসারের চোখ তখন কপালে উঠেছে। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বিচারকের কথা শুনতে লাগলেন।

—কিন্তু এ নেশা ভাল নয় রে! একটু একটু ক'রে এমন বেড়ে যায় যে নিজেকে আর সামলানো যায় না। আমারও ত তাই হ'ল। অনেকে মনে করে এ খুব কঠিন কাজ—একটুও কঠিন নয়, নয় রে?

মালী এইবারে কথা বলল, কিন্তু আমি ত তাকে মারি নি!

—চুপ। বিচারকের চোখ হিংস্র হয়ে উঠল।

তিনি বলতে লাগলেন, ধারালো ছোট্ট ছুরি…খাঁটি ইস্পাতের তৈরি, ছোট ছোট জীব-জন্তুর পক্ষে প্রয়োগ করা সুবিধা হবে ব'লে আমি জার্মান থেকে আনিয়েছিলাম—না না, এ আমি কি বলছি, তুমিই হত্যা করেছ, আমি নই—এ আমি প্রমাণ করব।

পুলিশ-অফিসার এগিয়ে এসে বললে, আপনার নিজের জবানবন্দীতে আপনি নিজেই ধরা পড়েছেন স্যার!

বিচারক চম্‌কে উঠলেন। বললেন, আমি কি সব বলেছি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

—আমার ডায়েরীর কথা বলেছি? তাতে অনেক 'কেস' পাবে—আরো পাবে কেমন ক'রে আমার এই পৈশাচিক-আনন্দ 'ডেভালাপ' করে। অনেক 'কেস'—মোটা মোটা তিনটা 'ভল্যুমে' ভর্তি—কিন্তু how nice I play—

বিচারকের ক্লান্ত-কণ্ঠ যেন এইখানে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। অফিসার ছুটে এসে দেখলেন, বিচারকের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা বনাম কর্ম্মসংস্থান

এই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করিয়াছি এবং এ রাজ্যের অতি-তৎপর এবং বিষম কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ত্তামণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বহুত প্রয়াসও পাইয়াছি। ফল কি হইয়াছে—তাহা এ-রাজ্যের বিষম বেকার সমস্যার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাতেই বুঝা যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্মসংস্থান (Employment Exchange) কেন্দ্রগুলিতে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২,১১,৬৬১! বলা বাহুল্য, কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখায় নাই—এমন বেকারের সংখ্যা উপরে প্রদত্ত সংখ্যার বেশ কয়েক গুণ হইবে। একথা সত্য যে, বিগত কয়েক মাসে সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে—পূর্ব্বের তুলনায়—কর্ম্মসংস্থান শতকরা ২·৪ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থানের হার কমিয়াছে শতকরা ১·৮ এবং এরূপ ঘটিবার কারণ অতি স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বৃহৎ কলকারখানা এবং অন্য প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য সংস্থা অবাঙ্গালী মালিকদের দ্বারা পরিচালিত। এই সকল মালিক, ভারতীয় হইলেও, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত তাঁহাদের কলকারখানা ইত্যাদিতে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা নিজ নিজ রাজ্য এবং জেলার লোকদেরই ভালবাসেন বলিয়া, প্রদেশবাসী বাঙ্গালীদের বাদ দিয়া অবাঙ্গালী-দেরই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। বহুক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীদের আবেদন এবং দাবি পরম অবহেলায় অবাঙ্গালী মালিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন! ভাগ্যক্রমে যে সামান্য সংখ্যক বাঙ্গালী এই সকল অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়, তাহাদের প্রমোশনের ব্যাপারেও সুবিচার করা হয় না। এ-ব্যাপারে অগ্রাধিকার পায় মালিক-গোষ্ঠীর নিজ-রাজ্য বা 'গাঁও'-এর কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীরাই!

পশ্চিমবঙ্গে বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক আছে, এবং এই সব ব্যাঙ্কের পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালী-দ্বারা হইয়া থাকে এবং এই কারণেই বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীরাই চাকুরিক্ষেত্রে এখানে প্রাধান্য পাইয়া থাকে। অবশ্য বাঙ্গালী যে একেবারে বাদ পড়ে তাহা নহে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী কারখানার সংখ্যাও কম নহে, এই সব কারখানাগুলিতেও গত কিছুকাল হইতে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য হইতে উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারী আমদানী করা হইতেছে! বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালী (ভারতীয়) অফিসারদের এই বিদেশী মালিকগোষ্ঠী অধিকতর পেয়ার করেন!

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। কলিকাতায় বাঙ্গালীদেরও এমন দু'চারটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান, যেখানে বাঙ্গালীরাই চাকুরি পায়, কিন্তু কর্ম্মপ্রার্থী কেবল বাঙ্গালী হইলেই চলিবে না, তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ বিশেষ জেলার (যথা: ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর) লোক অবশ্যই হইতে হইবে। সোজা কথায়—প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিক-গোষ্ঠী পূর্ব্ববঙ্গের যে-জেলা বা শহরের লোক, কর্ম্মপ্রার্থী সেই জেলা কিংবা শহরের লোক হইলে তাহার দাবী সর্ব্বাগ্রে! বিগত কিছুকাল ধরিয়া এই বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করা যাইতেছে। বাঙ্গালী মালিক বা মালিকগোষ্ঠী যদি বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীর 'জেলা বা শহর' দেখিয়া যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে অবাঙ্গালী মালিকদের প্রাণ খুলিয়া নিন্দা করিতে কোথায় যেন বাধে! পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা, অর্থাৎ যে-সব ধনী মালিক, আজ এ-রাজ্যে বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে 'নিজের' দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ-বাসীদের 'নিজের' লোক বলিয়া অন্তরে গ্রহণ করিতে এখনও পারেন নাই। বাঙ্গালী হইয়াও যদি বাঙ্গালীকে সর্ব্বক্ষেত্রে সমমর্য্যাদা না দিতে পারি, 'অমুক জেলার' লোক নহে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় কর্ম্মপ্রার্থীকে যদি কর্ম্মে নিয়োগ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা কোন্ মুখে অবাঙ্গালী মালিকদের বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে বলিব?

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কর্ম্মসংস্থান-সম্পর্কিত একটি সরকারী কমিটির বৈঠক বসে। এই কমিটি এ রাজ্যের সরকারী-বেসরকারী সকল সংস্থার প্রতি কাতর অনুরোধ করিয়াছেন—তাঁহারা যেন কর্ম্মী বা কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় এ-রাজ্যের প্রার্থীদের প্রতি সদয় হয়েন এবং সুবিচার করেন। এ-রাজ্যের সব কয়টি বণিক সভার দৃষ্টিও এ-বিষয়ে আকৃষ্ট করা হইয়াছে কমিটির তরফ হইতে।

কাতর আবেদন-নিবেদনে কতখানি সুফল পাওয়া যাইবে—তাহা সকলেই আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে।

অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী অফিসার নিয়োগ বন্ধ ?

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে বাঙ্গালী নিয়োগ প্রায় বন্ধ হইয়াছে! রাজ্য সরকার এই সংবাদ পাইয়াছেন এবং এ-বিষয় দিল্লীর দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণও করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। দিল্লী হইতে নাকি সংশ্লিষ্ট অবাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের অফিসারদের নাম এবং বেতনাদির পূর্ণ তালিকা পাঠাইতে বলা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রায় সব বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানই অবাঙ্গালী। রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগ গিয়াছে যে, ঐসব প্রতিষ্ঠানে হাজার টাকার বেশী বেতন পাওয়া অফিসার-দের শতকরা কুড়িজনও বাঙ্গালী নন।

বর্ত্তমান অবস্থাটা আরও খারাপ। কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানে গত তিন বছরের মধ্যে যে-সব অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার শতকরা নব্বুই ভাগই অন্যান্য প্রদেশের লোক। আর যে দশ ভাগ বাঙ্গালী, তাঁহারাও নেহাতই খুঁটির জোরে চাকুরি পাইয়াছেন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকেরা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের খুশী রাখিবার জন্যই ইঁহাদের কাজ দিয়াছেন।

বিচিত্র কারসাজি

দিল্লীর নির্দ্দেশমত অফিসারদের তালিকা পাঠাইতে গিয়াও ব্যবসায়ীরা এক বিচিত্র চাতুরি অবলম্বন করিয়া-ছেন বলিয়া রাজ্য সরকারের কাছে খবর গিয়াছে। তালিকা এমনভাবে তৈয়ারী যাহাতে আসল ব্যাপারটা ধরা না পড়ে।

একটি বিশিষ্ট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের তালিকা তিনভাগে তৈয়ারী করিয়াছেন: ৫০০ হইতে ১০০০ টাকা যাঁহারাপান, যাঁহারা ১০০১ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত পান এবং যাঁহারা তাহারও উপরে। প্রত্যেকের বেতনাদি আলাদা দেখানো হইতেছে না। বহু ক্ষেত্রে আবার বেতনের মধ্যে বাঙ্গালী অফিসারদের বেলায় সব ভাতারও হিসাব ধরা হইয়াছে—অন্যদের বেলায় কিন্তু তাহা নয়।

এমন তালিকায় প্রকৃত ব্যাপার ধরা অসম্ভব। তালিকায় হয়ত আছে যে, ১০০১ হইতে ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত যাঁহারা বেতন পান তাঁহাদের মধ্যে ১০ জন বাঙ্গালী। কিন্তু আসলে এই দশজন হয়ত ১২০০ টাকার মত বেতন পান। ১২০০-র উপর যাঁহারা পান তাঁহারা সবাই অন্য প্রদেশের লোক। কিন্তু তালিকায় সেটা চাপা।

এই অভিযোগ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা রাজ্য সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এইসব প্রতিষ্ঠান অবাঙ্গালীদের হাতে থাকিলেও এগুলির শেয়ারের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগের মালিক বাঙ্গালী এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থা।

ইঁহারা সরকারকে আরও জানাইয়াছেন যে, যতদিন না উচ্চপদে স্থানীয় অধিবাসীরা স্থান পাইবেন, ততদিন নিচের পদগুলিতেও স্থানীয় যুবকদের যোগ্য ঠাঁই হইবে না। কারণ নিচু পদে লোক নিয়োগ এবং তাঁহাদের উন্নতিও অনেকটা ইঁহাদের উপরেই নির্ভর করে।

অবাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে সামান্য কয়জন বাঙ্গালী অফিসার আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্গালী কর্ম্মী লইতে পারেন না। কারণ: প্রথমতঃ, 'বাবুজীর' অপ্রিয় হইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাঙ্গালী কর্ম্মী নিয়োগরূপ মহা অপরাধে চাকুরি যাইবে!

ভারতের ভাষা জ্ঞান

১৯৬১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হইতে ভারতের লোকদের ভাষা পরিচিতির একটি প্রায় পূর্ণ চিত্র প্রকট হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে ভারতের ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৭ জনেরও কম লোক নিজের মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভাষা জানে না। যদিও বলা হইয়াছে যে, ৩ কোটি লোক দুইটি ভাষা জানেন, কিন্তু দুইটি ভাষায় মোটামুটি লিখিতে, পড়িতে ও কথা বলিতে পারে—এমন লোকের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম।

শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারী শ্রী জে পি নায়েকও গত সেন্‌সাসের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত

করিয়াছেন। এই রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণ লোককে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য আর একটি ভারতীয় ভাষা শিখান অতি কঠিন কার্য্য। এই রিপোর্টে প্রকাশ :

(১) ভারতে ইংরেজী ভাষা-জানা লোকের সংখ্যা ১ কোটি দশ-বারো লক্ষ।

(২) বাস্তবপক্ষে এদেশে হিন্দী-জানা লোকের সংখ্যা (ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যায় কম) প্রায় ৯৪ লক্ষ!

রিপোর্টে আরো প্রকাশ যে, অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলে হিন্দীর অবস্থা 'আদৌ সন্তোষজনক' নহে। মহারাষ্ট্রে হিন্দী-জানা লোকের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। এই রাজ্যে শতকরা ৮,৯০ জন হিন্দী জানেন। ইহার কারণ মারাঠী লিপি ও হিন্দী লিপির ঐক্য এবং রাজ্য সরকার হিন্দী শিখিবার উৎসাহ দিতেছেন। ইহার পরে স্থান পশ্চিম বঙ্গ এবং আসামের। পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে হিন্দী-জানা লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৬'৬৭ শতাংশ এবং ৬'৬১ শতাংশ। তাহার পর গুজরাট। এই রাজ্যে হিন্দী-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৩'৪৮! অন্যান্য রাজ্য : মহীশূর—১.২৮ শতাংশ, অন্ধ্র—১.২১ শতাংশ, কেরালা ০'২১ শতাংশ, মাদ্রাজ—০'২০ শতাংশ, উড়িষ্যা—১'৭৮ শতাংশ।

শ্রীনায়েক বলেন, "স্বাধীনতার পরে গত ১৮ বছরে আমাদের ভাষা শিক্ষার অগ্রগতির এই ইতিহাস। বস্তুতঃ সামগ্রিক অবস্থা সত্যই শোচনীয়। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, আমাদের আরও ভাল কার্য্যসূচী গ্রহণ করা দরকার।"

সংবিধানে যে ১৪টি ভাষার কথা বলা হইয়াছে, সেই ভাষায় মোট ৩৮ কোটি লোক কথা বলেন। অর্থাৎ তাহা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশ।

ভাষাওয়ারী হিসাব : হিন্দী—৩০'৪ শতাংশ, তেলেগু ৮'৬ শতাংশ, বাংলা ৭'৭ শতাংশ, মারাঠী ৭'৬ শতাংশ, তামিল ৭'০ শতাংশ, উর্দু ৫'৩ শতাংশ, গুজরাটি ৪'৬ শতাংশ, কানাড়া ৪'০ শতাংশ, মালয়ালম ৩'৯ শতাংশ, ওড়িয়া ১'১ শতাংশ, পাঞ্জাবী ২'৫ শতাংশ, অসমীয়া ১'৬ শতাংশ, কাশ্মীরী ০'৪ শতাংশ ও অন্যান্য ভাষা ১২'৮ শতাংশ।

নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কারণ বহু ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যে অবস্থান। অন্য রাজ্যে থাকার জন্য, সেই রাজ্যের ভাষা শিখিতে হয় বা শিখিতে বাধ্য হইতে হয়।

শ্রীনায়েক তাঁহার রিপোর্টে আরও বলেন, অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে হিন্দী যাঁরা শিখিয়াছেন তাঁহাদের শতকরা ৫০'৭ জন হিন্দী-ভাষী রাজ্যেই থাকেন।

অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীভাষা জানা লোকের সংখ্যা কিছু বেশী হওয়ার কারণ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্ত।

অপরদিকে ৪৯'৬ শতাংশ বাংলাভাষা জানা লোক পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতেও বহু বাংলা-ভাষী লোক আছেন। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক কারণেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার প্রশ্ন

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডঃ কে জে মাহালি ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ইংরেজী ছাড়া অন্য বিদেশী ভাষা না শেখা, ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর।

স্বাধীনতার ১৮ বছর পরেও ভারতবাসীরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করেন। কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক প্রচার ও পর্য্যটন বিষয়ে উৎসাহ দানের দিক হইতে বিচার করিলে ইংরেজী ভাষা ছাড়া, অন্য বিদেশী ভাষা না জানা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তাঁহার মতে রাজনৈতিক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর উচিত প্রয়োজনমত রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান, জাপানী, সুইডিশ, চীনাভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করা। কিন্তু ভারতে একমাত্র বিশ্ব-ভারতী ও আর একটি হাইস্কুলে চীনাভাষা শিখান হয়।

সবই বুঝা গেল—কিন্তু আমাদের অতি প্রাজ্ঞকর্ত্তাদের মতে অন্য সব ভাষাকে—(ভারতীয় এবং বিদেশী)—বিদ্যাধরীতে বিসর্জ্জন দিয়া 'জয় হিন্দী' করিলেই ভারতের নয়া 'সোসালিষ্ট ধাঁচের' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পূর্ণবিকাশ ঘটিবেই! অবধারিত সত্য!!

গণতান্ত্রিক ভারতে হিন্দীকেই একমাত্র সরকারী ভাষার সিংহাসন দিতে অহিন্দীভাষীরা যে যুক্তিযুক্ত আপত্তি করিতেছেন—এই সঙ্গত আপত্তির কারণগুলি অনুধাবন করিয়া দেখার সৌজন্যও খাস হিন্দী-ফেরিওয়ালারা স্বীকার করিতে সজোর অস্বীকারই করিতেছেন! হিন্দী-ভাষীর দল এই রবই তুলিয়াছেন যে, যেমন করিয়াই হউক—ছলে, বলে, কৌশলে—ডাণ্ডা-

বাজির দ্বারা হিন্দীকেই রাজসিংহাসনে বসাইতে হইবে! এবং হিন্দী-পাণ্ডাদের এই ডাণ্ডার যুক্তিতে সানন্দ-সায় দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া রাজ্য-মুখ্য-মন্ত্রীগণ (হিন্দীভাষী রাজ্য ছাড়া অন্ত রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীগণ বাধ্য হইয়া আজ বশম্বদ হইয়াছেন) পর্য্যন্ত। মান্দ্রাজী কামরাজ নিজে হিন্দী জানেন না, কিন্তু অপরের ঘাড়ে হিন্দী চাপাইতে আজ পরম ব্যাগ্র হইলেন কেন হঠাৎ? পদ-গৌরবের নেশা এত মাদক যে কাহাকেও রেহাই দেয় না!

দেশের শিয়রে আজ দুই শত্রু উদ্যত হইয়া রহিয়াছে —দেশের লোক আজ অভাব-অনটনের জ্বালায় প্রায় উন্মাদ—এবং এই অবস্থায় দেশে পুঞ্জীভূত বারুদের গাদায় হিন্দী-পাণ্ডাদের দিয়াশলাই এবং জ্বলন্ত কাঠি লাগাইয়া হঠাৎ বিস্ফোরণের প্রয়াস না করাই ভাল।

জন-(অ-) কল্যাণ রাষ্ট্রের বিচিত্র রূপ

সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৬০টি শিশু—দুগ্ধ-পোষ্য শিশু—দুগ্ধ বলিয়া কোন বস্তু পায় না। বাকী ৪০টি শিশু—জলমিশ্রিত দুগ্ধ পায়—কিন্তু তাহাও পরিমাণে অতি সামান্য। যে-সমীক্ষায় উপরি উক্ত তথ্য প্রকাশিত হয়—তাহাতে আরো জানা যায় যে, শতকরা ৭০টি শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে। পাঁচ হইতে দশ মাসে যখন শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান ছাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, সেই-সময় শিশুদের পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় অ্যারারুট। বলা বাহুল্য, আমরা কৃষক, কৃষি-শ্রমিক, তাঁতি, সাধারণ শ্রমিক এবং সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের কথাই বলিতেছি।

আর একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, মাতৃদুগ্ধ ছাড়িবার পর কিংবা ছাড়িবার সময় শতকরা ৪০টি শিশু গড়পড়তা ৪ হইতে ৬ আউন্স গরুর দুধ পায়। বাকী ৬০টি শিশু একেবারেই পায় না। ৬-৭ মাস বয়সের শিশুদের প্রত্যহ ৪০ হইতে ৫০ গ্রাম অ্যারারুট, এবং ১৫।২০ গ্রাম মিছরি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, অ্যারারুট পুষ্টির দিক হইতে প্রায় কিছুই নয়। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের ওজন খুবই কম। মায়েদের দেহের ওজনও যাহা হওয়া স্বাভাবিক এবং উচিত তাহা অপেক্ষা বেশ কিছু কম।

মেদিনীপুরে গ্রামাঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা প্রায় তিরিশ।

কংগ্রেসী শাসনের ১৮ বছরে এবং তিনটি পাঁচ-সালা পরিকল্পনার শেষেও দেশের সাধারণ মানুষের যখন এই শোচনীয় অবস্থার ভীষণ চিত্র প্রকট হয়—তখন যদি মানুষের হৃদয় জ্বলিয়া উঠে, আশা করি তাহা অন্যায় এবং অকারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু আমাদের হৃদয়-জ্বালাতে উপর মহলের, বিশেষ করিয়া আমাদের শাসকগোষ্ঠীর, আরাম-নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না ইহা আমরা জানি। আজ ভারত কল্যাণ-রাষ্ট্রের যে চিত্র উদ্ভাসিত, তাহাতে দেখিতে পাই যে, গত ১৮ বছরে সহস্র কোটি সহস্র কোটি টাকা খরচার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বস্বত্যাগী কংগ্রেসী মহাশাসকদের অফুরন্ত বাক্য ও বাণীর বন্যাতে দেশ ভাসিয়া গেল—কিন্তু শিশুদের মুখে এক ফোঁটা দুগ্ধের যোগান দিবার কথা কোন মহাত্মাই চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না!

কল্যাণ-রাষ্ট্রের খ্যাত-অখ্যাত এবং বিশেষ অজ্ঞ বহুজন জ্ঞান আহরণের জন্য বিদেশ ভ্রমণ (বিহার?) করিলেন এবং এখনও করিতেছেন—বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়-অপব্যয় করিয়া, অথচ দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন যাহা হইল তাহা নিচের দিকেই। দেশের গো-সম্পদ ধ্বংসপথে এবং শিশু-মৃত্যুর হারের সঙ্গে গো-মৃত্যু প্রায় ডবল হারে পাল্লা দিতেছে।

কেহ যেন মনে করিবেন না, শহরের শিশুরা আজ খুব সুখে আছে এবং তাহাদের দুধের চাহিদা যথাযথ মিটানো হইতেছে। একেবারেই নয়। শহরে শতকরা ৪০।৫০টি শিশু পিত্ত রক্ষা করিবার মত ডবল-টোনড (এই প্রকার দুগ্ধ বা দুধ-মিশানো জল বিক্রয় করিলে গোয়ালাকে দণ্ডদান করা হইত) মিল্ক সরকারী ব্যবস্থায় পাইয়া থাকে। ইহাও আবার আর কতদিন পাইবে, তাহা বলা কঠিন!

শিশুদের দুগ্ধ না-পাওয়া প্রসঙ্গে একটি সংবাদপত্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। এই সংবাদপত্র বলিয়াছেন:

"নন্দনের খবর নিয়ে এরা (শিশুরা) পৃথিবীতে এসেছে, কিন্তু কল্যাণ-রাষ্ট্রের আশীর্বাদ এদের জন্যে নয়। কারণ এরা স্বাধীন ভারতের শিশু। জন্ম থেকেই যারা ভারতীয় কল্যাণ-রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে বলিপ্রদত্ত এবং বলি হবার জন্যেই যাদের জন্ম, তাদের জন্যে মাথা ঘামাবার সময় কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কোথায়? শিশুদের মুখে দুধ যোগাবার মত একটা সামান্য কাজেই যদি ওঁদের ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে গলাবাজি করে দেশকে জাগাবেন কে? টেলিভিশন চালু করে দেশকে মর্য্যাদা দেবার চিন্তাই বা কে করবেন? এবং নাইট

ক্লাবের মারফৎ বিদেশী মুদ্রা কিভাবে রোজগার করা যায় তা হাতে-কলমে শিখে আসবার জন্যে বিদেশেই বা কে যাবেন?

"কাজেই মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে শিশুরা দুধ না পেয়ে এরারুটের জল খাচ্ছে, এ খবরে কল্যাণ-রাষ্ট্রের উদ্বিগ্ন হবার কি কোন কারণ আছে? স্বাধীনতার এই আঠারো বছরে কল্যাণ-রাষ্ট্র মানুষকে পেট ভরে খাওয়াবার দিকে কতটুকু এগিয়েছে সে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, কারণ সরকারের নীতি ত রয়েছে! কাজেই ঐ শুভ্র প্রাণগুলি যদি পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা না যায়, তবে এরা—ভারতের কল্যাণ স্পর্শের এই অবাঞ্ছিত ভাগীদারেরা—ঐ নীতিকে আঁকড়ে ধরেই জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার সাধনা করুক। একদিন হয়ত ইষ্ট মিলতে পারে, কারণ সরকারের নীতি ত রয়েছে!

"রাজ্যে যখন গোচারণ ভূমির অভাব, তখনও গরুর বিকল্প খাদ্য তৈরীর দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হ'ল না, এটাও কি কম? ভাববেন না আমরা শহরাঞ্চলের শিশুদেরই দুধ-ভাত খাইয়ে সুখে রেখেছি। এই শহরেই এবং এই সেদিনই কয়েকটি অপুষ্ট শিশু ক্ষিদের জ্বালা সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এটাও কি আমাদের কল্যাণ-রাষ্ট্রেরই কৃতিত্ব নয়? পৃথিবীতে যদি এ রকম আরেকটি দেশ থাকত তবে হয়ত তারা এই কৃতিত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারত। আমরা পারি না, কারণ আমরা রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু একটা কথা বুঝি, যে-রাষ্ট্র শিশুর সঙ্গে বঞ্চনা করতে পেছ-পা হয় না, ভবিষ্যতের জন্যে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

ইহার পর আমাদের একমাত্র মন্তব্য এই হইতে পারে যে গত কিছুকাল হইতে পরিবার পরিকল্পনা লইয়া যে প্রকার মহা মাতামাতি হইতেছে—তাহার প্রয়োজন আছে কি? সরকার বাহাদুর এবং সরকারী ধামাধারীর দল "লুপ লুপ" করিয়া যেভাবে "লুপিং-দি-লুপ' খেল দেখাইতেছেন, তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিতে পারেন—কারণ দুগ্ধ বঞ্চিত করিয়া দেশের শিশুদের অকালে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করাইবার জন্য যে 'গ্রাণ্ডকর্ড' লাইন খুলিয়াছেন তাহাতে আর কিছুকাল পরে 'পরিবার পরিকল্পনা' গ্রহণ করিবার জন্য খুব কম পরিবারের অস্তিত্ব এই মহাকল্যাণ-রাষ্ট্রে—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ নামক কলোনিতে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!

সর্ব্ব-রোগহর বটিকা

আমাদের মহাপ্রাজ্ঞ কর্ত্তাদের মতে 'পরিবার পরিকল্পনা,'—অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই দেশের সর্ব্বরোগ, সর্ব্ব-সমস্যা এবং সর্ব্ববিধ অভাব-অভিযোগ একেবারে সব কিছুই দূরীভূত হইবে! তাই চোখে পড়িতেছে বিশ-পঁচিশ বর্গফুটী অতি চটকদার হোর্ডিংএ 'লুপ' নামক বস্তুটির গৌরবগাথা। হোর্ডিংএর চিত্রে আছে লেডি ডাক্তারের হস্তে 'লুপের' প্যাকেট। আর বিজ্ঞাপনের ভাষা? এমন বিকৃত-রুচির ন্যক্কারজনক বিজ্ঞাপন এমনভাবে বোধ হয় আবালবৃদ্ধবনিতার চক্ষুর সম্মুখে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ধরা হয় নাই।

কলিকাতা আকাশবাণীতে যে-ভাবে পরিবার পরিকল্পনা তথা লুপ-মাহাত্ম্য অহরহ প্রচারিত হইতেছে, বিশেষ করিয়া পল্লীমঙ্গল, মজদুরমণ্ডলী এবং মহিলা মহলের আসরগুলিতে—তাহাতে ভদ্রবাড়ীতে রেডিও শ্রবণ এবার বন্ধ করা উচিত।

'পরিবার পরিকল্পনা'—বিশেষ বয়সের নরনারীর জন্যই, যাহাদের আয় কম এবং যাহাদের পেটের দায়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের আকাশ-বাতাস 'লুপ' তথা যৌন-আলোচনার জয়ঢাকের বিষম নিনাদে আলোড়িত করিবার প্রয়োজন আছে কি? 'লুপের' সার্থক প্রচারের জন্য ফেরিওয়ালাদের মত—'পরিবার পরিকল্পনা' বিভাগের কর্ম্মীরা চৌরাস্তার জনবহুল মোড়ে মোড়ে—চার্ট, ম্যাপ, মডেল সহযোগে বক্তৃতা দিতেছেন, জনগণকে যত্নসহকারে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছেন গর্ভ-নিরোধক অপূর্ব্ব বস্তুর প্রয়োগ টেকনিক—বিশেষ করিয়া সর্ব্বরোগহর—'লুপের'। এই সব বক্তৃতা শ্রবণ এবং চার্ট, মডেল এবং প্রয়োগ-কৌশল দেখিতে ও শিখিতে ভীড় হয় কাহাদের? যাহাদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সময় বা বয়স এখনও অনাগত। একথা সকলেই জানেন যে যৌন-চেতনার কৌতূহল সর্ব্বাধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরই। 'পরিবার পরিকল্পনা' বিভাগীয় সরকারী প্রচারকের দল ইহাদেরই কৌতূহল সযত্নে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। একথা বলা প্রয়োজন যে, পরিবার পরিকল্পনার ষ্ট্রীট্-কর্ণার মিটিংএ অবিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি সর্ব্বাধিক না হইলেও সুপ্রচুর। এই সব কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীরা কি শিক্ষা লইয়া মিটিং হইতে ফিরিয়া যাইতেছে? শিক্ষার বাস্তব এবং অপ-'প্রয়োগ' করিতে খুব বেশী সময় হয়ত ইহাদের লাগিবে না, এমন আশঙ্কা বহু সমাজহিতৈষীর মনে হইতেছে।

আমরা পরিবার নিয়ন্ত্রণের বিরোধী নহি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা বলিতে বাধ্য যে, পথে-ঘাটে, রাস্তায়-

মাঠে, আবাল-বৃদ্ধবনিতার সামনে 'পরিবার পরিকল্পনার' আধুনিক ব্যবস্থা-প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং এ-বিষয় বক্তৃতা এ-ভাবে চালানোতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সমাজের পক্ষে বেশী হইবে। এ-বিষয় যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ অবশ্যই রাখা প্রয়োজন। 'পরিবার পরিকল্পনা' ছেলে-খেলার বিষয় নহে। এ-বিষয় আলোচনা এবং বিধি-ব্যবস্থা মাস-মিটিংএ কখনও হইতে পারে না, হওয়া অনুচিত। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে এ-বিষয়ে আগ্রহী দম্পতিকে নির্ভরযোগ্য এবং যথোপযুক্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা উচিত, ইহাতে সম্ভাব্য 'অনাচার' খানিকটা নিরোধিত হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে—কেবল 'লুপের প্রচারে জনগণকে 'লুপ'-লোলুপ করিলে একদিন এমন সমস্যা দেখা দিবে—যাহার ফলে সমাজ-দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠিবে! পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কথা ও কাজে

মিল হয় কি?—

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাববোধ এবং তথা হইতে দলে দলে শরণার্থীদের ভারতে আগমন ব্যাপারটিকে সম্ভবতঃ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাই তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ না হইলে, শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য ভারত পাকিস্তানের নিকট ন্যায্যভাবেই জমি দাবি করিতে পারে। (?)

প্রস্তাবটি অবশ্য নূতন নয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নিধন উৎসাদনের তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেল অনুরূপ সঙ্কল্প দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির দ্বারা তখন সর্দ্দারজীর প্রস্তাব ধামাচাপা দেওয়া হয়। দূরদর্শী দেশনায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দাবির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বিগত ১৫ বৎসর ধরিয়া বার বার বলা হইতেছে যে, পাকিস্তানের নিকট হইতে বাস্তুত্যাগীর সংখ্যানুপাতিক ভূমি আদায়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে উদ্বাস্তু সমস্যার সুরাহা করা সম্ভব হইবে না।—কিন্তু ভারত সরকার কখনও সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া এবিষয়ে পাকিস্তানকে চাপ দেন নাই। (কারণ এই কর্ম্মপন্থা গ্রহণ ও অনুসরণ করিবার মত সাহস ও শক্তি ভারত সরকারের নাই।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে সংখ্যালঘুদের পক্ষে এখনও সমান বিপজ্জনক রহিয়াছে, তাহাদের ধনমানপ্রাণ কিছুই যে সেখানে নিরাপদ নহে, তাহা সরকারী-বেসরকারী সব রকম সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতেই প্রতীয়মান হয়। সম্প্রতি ভারতীয় হাই কমিশনও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দুঃসহ জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদে একজন হিন্দুও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই, ইহাতেই (পাকিস্তানী) নাগরিক হিসাবে তাহাদের অবস্থাটা বোঝা যাইবে। প্রাদেশিক বিধান পরিষদে নির্ব্বাচনপ্রার্থী জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু প্রার্থীকে জব্দ করার জন্য সরকারের সহযোগিতায় জঘন্য রকম পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, এমন কি তাঁহার মুসলমান সমর্থকরা পর্য্যন্ত অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পান নাই। এই অসহনীয় অবস্থায় সংখ্যালঘুরা যে সেখানে মানসম্ভ্রম লইয়া থাকিতে পারিবেন না তাহা স্থিরনিশ্চয়।

ভারত সরকার উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে অধুনা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানকে সংখ্যালঘু নিপীড়নে উৎসাহ দেওয়ারই নামান্তর। মাইগ্রেশন দেওয়ার জটিলতা হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইলেও কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই হয় নাই; তাই দলে দলে মাইগ্রেশনহীন উদ্বাস্তুরা নানা বিপদের ঝুঁকি লইয়াও ভারতে আসিতে চাহিতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা বহু কষ্টে সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারিতেছে, তাহাদের দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ভারতে আসিয়াও তাহাদের নিস্তার নাই। বর্ত্তমানে এই সময় উদ্বাস্তুর জন্য সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, পাসপোর্ট আইনে বাঁধিয়া আনিয়া ইহাদের অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দেওয়া হইতেছে!

এই অবস্থায় শ্রীত্যাগী যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে পাকিস্তানের নিকট জমি দাবি না করিয়া পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহা মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু দাবী উত্থাপন করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলে ফল কিছুই হইবে না; সুদৃঢ় এবং সক্রিয়ভাবে সেই দাবি আদায়ের জন্য তৎপর না হইলে শুধু মুখের কথায় সমস্যার জটিলতা মোচন হইবে না।

কিন্তু এ যাবত যাহা দেখা দিয়াছে—তাহাতে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে, জমি ছাড়িয়া দেওয়াই ভারত সরকারের নীতি এবং সক্রিয় পন্থা। 'যুগশক্তি—যাহাই বলুন—কেন্দ্র সরকার তাঁহাদের ক্লীব নীতি ত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁহাদের ক্লীব-নীতি ত্যাগ করাইবার একমাত্র পথ কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী-গোষ্ঠী গদিচ্যুত করিয়া 'উদ্বাস্তু' করা। কিন্তু ইহার জন্য যে যুবশক্তি প্রয়োজন তাহা কোথায়?

কামরাজী দাওয়াই

বিগত এ. আই. সি. সি. বাঙ্গালোর অধিবেশনে কংগ্রেসী নং ওয়ান শ্রীকামরাজ ঘোষণা করিয়াছেন।

১। কংগ্রেসসেবীদের অন্তর-কোন্দল অবসান করিয়া দেশে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ (?) গঠন (এবারে আর প্যাটার্ণ বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা নহে একেবারে নির্ভেজাল সমাজতন্ত্র!) এবং ভারতে একটি সুসংহত (হিন্দীর মাধ্যমে) ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের আদর্শে অবিচল থাকিতে হইবে।

২। দেশে চিরদিন খাদ্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা চলিবে না এবং সেইজন্য এ দেশে রাসায়নিক সার উৎপাদনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩। দেশের দারিদ্র্য ও বেকারীর অবসান ঘটাইতে হইবে। শিল্পে ও অর্থনীতিতে যে নূতন ধনসম্পদ সৃষ্টি হইবে, সে ধনসম্পদ সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীকামরাজ বাঙ্গালোরে যুব সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ প্রসঙ্গেও বলিয়াছেন—ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে এবং স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী থাকিলেই (এবং যাহার জন্য হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন!) যে কোন হামলার প্রতিরোধ করিতে পারিবে, অন্যথা নহে!

গত ১৮ বৎসর ধরিয়া আমরা পরম বিজ্ঞ এবং দেশগতপ্রাণ কংগ্রেসী নেতাদের শ্রীমুখ হইতে যে বাণী-প্রবাহে অবগাহন করিতেছি—সেই পুরানো কথাই আজ বাঙ্গালোরের কাঁচ-ঘরে শ্রীকামরাজ পুনরায় আবৃত্তি করিলেন! ১৮ বছর পরেও সেই একই বাণী—"হইতে হইবে, হওয়া উচিত, করিতে হইবে" ইত্যাদি। আজ পর্য্যন্ত কিছু যে করা হইল—তাহার কোন রিপোর্ট পাইলাম না। ভারতীয় জনগণের শতকরা অন্তত আশী জন আজ অনাহার-অর্দ্ধাহার কদাহারে মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছে—অথচ চোখের সামনেই কংগ্রেসী নেতাদের, এমন কি কর্ম্মীদেরও, বিলাসবহুল জীবন-যাত্রার আনন্দ চিত্র!

কাঁচের ঘরে বসিয়া অন্যকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে শ্রীকামরাজ কংগ্রেসী রাজ্যগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি দিলে ভাল করিতেন।

রাজস্থান সরকার স্থানীয় কৃষকদের নিকট হইতে ৩৫.৩৭ টাকা দরে (কুইণ্টল) জনার কিনিয়া তাহা বিহার সরকারকে ৭২.৭৪ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছেন। বিহার সরকারও ১৬৲ টাকা মণ দরে ডাইল কিনিয়া, মাদ্রাজ সরকারকে তাহা বিক্রয় করিতেছেন ২৮৲ টাকা মন দরে! এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেমন, ওড়িষ্যা মিহি চালের মূল্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিতেছেন মোটা অখাদ্য চাল!! রাজ্য সরকারগুলির এই 'কালোবাজারী' দেখিয়া আমরা যদি উহাদের 'কালোবাজারী সরকার' বলি তাহাতে দোষ হইবে কি?

কতকগুলি বেকার হ্বকবুলী না প্রচার করিয়া শ্রীকামরাজ যদি বর্ত্তমান কেন্দ্র সরকারকে বাতিল করিয়া একটি সর্ব্বদল হইতে নির্ব্বাচিত সৎ ব্যক্তিদের লইয়া সরকার গঠনের প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে আমরা কামরাজী কেরামতির নির্জ্জলা প্রশংসা করিতে পারিতাম। কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যকেই সর্ব্বদিক হইতে পীড়িত এবং বঞ্চিত করিবার প্রয়াসে অকৃপণ!

বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব আজ আদর্শ-নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সততা, দেশের মানুষের প্রতি প্রকৃত দরদ—সব কিছুই হারাইয়াছে! পশ্চিমবঙ্গে মহামতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় একক চেষ্টায় আর কতটুকু করিতে পারেন? এখন একমাত্র ন্যায়ের গদাঘাতে গদিচ্যুত হইলেই হয়ত কংগ্রেসীদের নব-চেতনার আশা করা যাইতে পারে।

মরা হাতি লাখ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ—সাধারণ ভাবে দেখিলে আজ মরা হাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নে প্রদত্ত সংবাদেও ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

টেরিটিবাজার অঞ্চলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সাড়ে পাঁচ কাঠার একটি প্লট নিলামে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকায় বিক্রী হইয়াছে। অর্থাৎ এক কাঠা জমির দাম এক লক্ষ টাকা!

জমিটি কিনিয়াছেন শ্রীকেদারভাই টোপিওয়ালা এবং অন্যান্যরা।

টেরিটিবাজারের ঐ প্লটটি ছাড়া বাগবাজার গ্যালিফ ষ্ট্রীট অঞ্চলের আরও দশটি প্লট নিলামে বিক্রী হইয়াছে। ১১টি প্লটের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৮ কাঠা।

সি. আই. টির বোর্ডের ঘরে এই নিলাম হয়। ১১টি প্লটের জন্য প্রায় দেড় শত ক্রেতা ছিলেন।

নীলামে যাঁরা জমি কিনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই হয়ত অবাঙ্গালী।

টেরিটিবাজার এলাকার প্লটটি ছাড়া বাগবাজার অঞ্চলের দশটি প্লটের দাম উঠিয়াছে কাঠা প্রতি ৩৭ হাজার হইতে ৭৫ হাজারের মধ্যে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিছুদিন আগেও অফিসপাড়ায় লক্ষাধিক টাকা মূল্যে এক কাঠা করিয়া জমি বিক্রী হয়।

পরের সংবাদে জানা যায় যে, উপরি উক্ত জমির প্লটগুলি ক্রয় করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে ২।৩ জন বাঙ্গালী আছেন কি না সন্দেহ!

কলিকাতার প্রায় সর্ব্বত্রই অবাঙ্গালীদের জমি ক্রয়ের উৎসাহ গত কিছুকাল হইতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে —যাহার ফলে শহরের বিশেষ কতকগুলি বনেদী পাড়ায় বাঙ্গালী মালিক নাই বলিলেই চলে। মধ্য, দক্ষিণ এবং পশ্চিম কলিকাতায় আজ জমি এবং বাড়ীর মালিক শতকরা ৭৫ জনই বোধ হয় অবাঙ্গালী। এবার উত্তর কলিকাতা এবং সল্ট লেকের পালা।

নিকট ভবিষ্যতেই দেখা যাইবে যে কলিকাতা অবাঙ্গালী কোটি-লাখ-ওয়ালাদের বিরাট এক গঞ্জে পরিণত হইয়াছে! এই নবগঞ্জ হইবে বাঙ্গালী শূন্য!

বাঙ্গলার জনগণের অবস্থা আজ সর্ব্ব বিষয়ে আশা-হত। প্রাত্যহিক অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য যখন আকাশ-চুম্বী, ঘরে ভাত নাই, কাপড় নাই বিদ্যালয়ে স্থানাভাব, মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বাড়ী পাওয়া এবং তাহার ভাড়া দেওয়া অসম্ভব, সেইসময় এ-রাজ্যে এক লক্ষ টাকা দিয়া এক কাঠা জমি ক্রয় করার লোকের অভাব হয় না। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর অন্তর্দাহী জ্বালায়, কাতর ক্রন্দনে যখন আকাশ-বাতাস মুখরিত সেই সময় অন্য দিকে বিত্তবানদের বিলাস-ব্যসন উল্লাস দেখা যাইতেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সরকারী প্রতিশ্রুতি আজ এক নিষ্ঠুর বিরাট্ ব্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে! জনসাধারণ কতদিন এ-বিষম জ্বালা সহ্য করিবে? বোধ হয় আর বেশীদিন নয়। জন-অসন্তোষের মাত্রা সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে—এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে এক প্রচণ্ড জনবিক্ষোভে আজিকার এই কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও নিষেধের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে পারে! কেবল পশ্চিম বঙ্গেই নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই আগামী এই অশুভের বিপদজনক লক্ষণ ক্রমেই প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছে! তবু এখনও সাবধান হইলে হয়ত দেশ সর্ব্বনাশা পরিণতি কোনক্রমে ঠেকাইতে পারে কিন্তু—চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, লম্বকর্ণ থাকা সত্ত্বেও শ্রবণশক্তিহীন, গব্যবিশেষ পূর্ণমস্তক অন্তকার কংগ্রেসী নেতৃত্বের নিকট আর কিছু আশা করিবার নাই!

———

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(ত্রিশ)

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেল।

ধুম-ধামের শ্রাদ্ধ নয়। তথাপি বড়লোকের শ্রাদ্ধ, অল্প বয়েস হ'লেও, কিছু ধুমধাম না হয়ে পারে না। শ্রাদ্ধ-কর্তা খোকাবাবু। কিন্তু সে নিতান্তই বালক। মাথা নেড়া করেই তার কাজ শেষ হ'ল। গিন্নীমা উঠে বসেন নি। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে, চোখ মেলে চেয়েও দেখেন নি। কিন্তু বৌরাণীকে উঠতে হ'ল। তাকেই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

তারপরে কি?

হরেকৃষ্ণ দোকানের ম্যানেজার। বড় বাড়ীতে তার ঘন ঘন যাওয়া-আসা, সে কিছু জানে না। সারদাও কিছু জানে না। তা হ'লে কে জানে?

রামকিঙ্কর তার কোন হদিশ পায় না।

সারদা হেসে বলে, তার জন্যে আপনি ভেবে মরছেন কেন? গিন্নীমা কিছু আর চিরদিন শুয়ে থাকবেন না। থাকলেও ভয় পাবার কিছু নেই।

রামকিঙ্কর চমকে ওঠে: বল কি সারদা! গিন্নীমা শুয়ে থাকলে ভয় পাবার কিছু নেই?

—কি আছে বলুন? গিন্নীমা ত একদিন মারা যাবেন। তখন কি বড় বাড়ীর ফটক বন্ধ হয়ে যাবে?

তা বটে। ঝড়ের নৌকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার কয়েক টাল খেয়ে আবার সামলে নেয়। ডোবে খুব কম নৌকা।

রামকিঙ্করের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে সারদা হেসে বললে, বৌরাণীকে আপনি যা ভাবছেন, তা নয় রামবাবু। বৌরাণীও খুব শক্ত মেয়েমানুষ। গিন্নীমা যদি আবার উঠে বসেন, আগের মত সব দেখাশুনা করেন, ভাল কথা। তা না হ'লেও দেখবেন, বৌরাণী শক্ত হাতে হাল ধরেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমি বলে রাখলাম। মিলিয়ে নেবেন।

—তখন তোমাকে পায় কে? তোমার জায়গা হবে বৌরাণীর পরেই।

কৃত্রিম কোপে সারদা বললে, এই, বাজে কথা বলবেন না। আমি ঝি, ঝি-ই থাকব। কে জানে, হয়ত কর্তা হবেন আপনারাই, অবিশ্যি যদি ডাক্তারবাবু এসে না জোটেন।

ডাক্তারবাবুর নামে রামকিঙ্কর চমকে উঠল: তিনিও জুটবেন নাকি?

—জুটতে পারেন।

—ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে?

সারদা হেসে উঠল: ডাক্তারীতে আর ক'পয়সা হয় ভদ্রলোকের! এখানে জুটলে দু'হাতে লুটতে পারবেন।

বলেই বললে, কিন্তু সে গুড়ে বালি। বাঘিনী যেমন করে তার বাচ্চাকে ঘিরে থাকে, তেমনি করে বৌরাণী খোকাবাবুকে ঘিরে আছেন। পাছে খারাপ হয় বলে ছেলেকে তার বাপের কাছেও ভিড়তে দিতেন না। সেই খোকাবাবুর সম্পত্তি তিনি যে একচুল এদিক্-ওদিক্ হ'তে দেবেন, এমন মনে হয় না।

রামকিঙ্কর নিবিষ্টচিত্তে সারদার কথা শুনছিল।

বললে, সারদা, একটা কথা জিগ্যেস করব?

—কি কথা?

—বৃন্দাবনবাবুর পুত্র সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?

সারদা তাড়াতাড়ি বললে, কিছু মনে হয় না। আমি বৌরাণীর খাস-ঝি। কিছু মনে হ'লেই বা বাইরের লোককে বলব কেন?

ওর ভীত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রামকিঙ্কর ধীরে ধীরে বললে, বাইরে পাঁচরকম কথা শোনা যায় কি না।

সারদা তাড়াতাড়ি ধমক দিলে: ও রকম ক্ষেত্রে বড় বাড়ীর সম্বন্ধে লোকে পাঁচকথা বলেই থাকে। সে সব চুপ করে শুনে যাবেন। ব্যস্।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

সারদা বললে, একটা কথা বলে রাখি, বৌরাণীও সোজা পাত্রী নন। এখানে কাজ করতে হ'লে চোখ-কান খুলে রাখবেন, কিন্তু মুখ তালাবন্ধ থাকবে।

—আচ্ছা।

ব'লে রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

আরও দিন কয়েক পরে।

মালতী খোকাবাবুর হাত ধরে ধীরে ধীরে গিন্নীমার শয়নকক্ষে এসে দাঁড়াল। তার পরণে ইঞ্চি খানেক চওড়া কালো পাড়ের শাড়ী। হাতে সরু সরু দু'গাছি করে চুড়ি। গলায় তেমনি সরু একগাছি হার। বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যুর পরে উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

খালি মেঝেয় গিন্নীমা শুয়েছিলেন, ঘুমোন নি বোধ হয়, কিন্তু চোখ বন্ধ করে। মালতীর পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইলেন। তার আগমনের জন্যে তিনি বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না। মালতীর বৈধব্য মূর্তির দিকে চেয়েই তিনি তৎক্ষণাৎ মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

চিৎকার করে উঠলেন: তুমি যাও, যাও এখান থেকে। তোমার মুখের দিকে আমি চাইতে পারছি না।

তাঁর চিৎকারে তাঁর খাস-ঝি ছুটে এল।

কিন্তু মালতী নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইল। শান্ত মৃদু-কণ্ঠে ডাকলে, মা!

গিন্নীমা ঠকঠক করে কাঁপছেন তখন। বললেন, গেলে না তুমি? যাবে না?

সে চিৎকারে ভয় পেয়ে খোকাবাবু তার মা'র জানু জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু মালতী নিষ্কম্প।

মৃদু অথচ স্থিরকণ্ঠে বললে, যা হবার তা ত হয়েই গেছে, মা। এখন আপনি উঠে না বসলে এ সংসার ভেসে যাবে। খোকার মুখের দিকে চেয়ে আপনাকে শক্ত হ'তে হবে।

গিন্নীমা উঠে বসলেন। ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে মালতীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তুমি এখন যাও, বৌমা। ওসব কথা পরে হবে।

—কিন্তু সংসার?

—সংসার এখনই ভেসে যাচ্ছে না, মা। তুমি এখন যাও।

মালতী নিঃশব্দে কি যেন ভাবলে।

বললে, তাহলে খোকা আপনার কাছে থাক।

খোকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানালে, না।

গিন্নীমা বললেন, ওকে ত কারও কাছে কখনও যেতে দাও নি। নিজেই ঘিরে ঘিরে রেখেছিলে। এখন আসবে কেন?

অপ্রস্তুতভাবে মালতী খোকাকে আদর করে বললে, ঠাকমার কাছে যাবে না? ঠাকমা তোমাকে কত ভালবাসবেন, আদর করবেন। যাও ওঁর কাছে।

খোকাবাবুর সেই এক কথা: না।

গিন্নীমা রাগলেন না, দুঃখিতও হ'লেন না। খোকাবাবুর দিকে ফিরে চাইলেনও না। যেমন অবশভাবে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

মালতী কি করবে ভেবে পেলে না।

নিরুত্তপ্তকণ্ঠে গিন্নীমা বললেন, ওকে নিয়ে তুমি যাও, বৌমা। আমি একটু একা থাকতে চাই।

পরাজিত হয়ে মালতী নিজের ঘরে ফিরে এল।

সারদাকে ডেকে জিগ্যেস করলে, বাইরে কি হচ্ছে রে?

বিস্মিতকণ্ঠে সারদা উত্তর দিলে, কিছুই হচ্ছে না ত?

—কাছারি-বাড়ীতে সবাই আছে?

—আছে বৈকি।

—তারা কাজকর্ম করে?

—করে নিশ্চয়।

—কিন্তু গিন্নীমার কাছে কেউ আসে না ত? কোন হুকুমও নেয় না। কাজ চলে কি করে?

এত কথা সারদা জানে না। কাজটা কি এবং কি ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই।

গম্ভীরভাবে বললে, তা বলতে পারব না।

মালতী জিগ্যেস করলে, রামবাবুর খবর কি রে?

—কি জানি।

—দোকানেই আছে?

—আছে বোধ হয়।

—তোর সঙ্গে দেখা হয় না?

—আমার সঙ্গে আর কি জন্যে দেখা হবে? আপনার দরকারেই তখন দেখা হ'ত। তাকে কি ডাকতে হবে?

অন্যমনস্কভাবে মালতী বললে, না।

এর দিনকয়েক পরে একদিন সকালে সারদা এসে জানালে, বৌরাণী, একটা সুখবর আছে।

উৎসাহিত হয়ে মালতী জিগ্যেস করলে, কি সুখবর রে?

—গিন্নীমা ঠাকুরদালানে নেমেছেন।

—তাই নাকি?

বাইরের দিকের ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে মালতী দেখলে, সত্যি। সেই আগের মতই রাধা ও গোবিন্দের জন্যে মালা গাঁথছেন সেই পুরাতন মটকার শাড়ীটি পরে। সেই আগের মতই শান্ত এবং গম্ভীর মুখ। দেখে বোঝবার উপায় নেই, মাঝখানে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

মালতী দেখলে, মুহূর্ত মধ্যে ঠাকুরদালান এবং কাছারি মহলের চেহারা পাল্টে গেছে। চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা ত্রস্ত কর্মচঞ্চল ভাব। সামনেকার প্রকাণ্ড উঠানটা এখন ঝকঝক করছে। কাছারির লোকেরা একে একে এসে গিন্নীমাকে প্রণাম করছে। ম্যানেজার এসে করজোড়ে কি যেন নিবেদন করলে, শোনা গেল না। মুখ না তুলেই গিন্নীমাও তার উত্তরে কি যেন বললেন।

নিশ্চিন্ত চিত্তে মালতী তার ঘরে এসে বসল। সংসারের চাকা চলতে আরম্ভ করেছে।

মালতী বললে, মা যে আবার ঠাকুরদালানে নেমে আসবেন, সংসারের ভার নেবেন, এ ভরসা আমার ছিল না। বোধ হয় খোকার মুখের দিকে চেয়েই ভার নিলেন।

মালতী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

সারদা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল। জিগ্যেস করলে, যদি ভার না নিতেন, তা হ'লে কি হ'ত?

—খুব মুস্কিল হ'ত।

—সংসার ভেসে যেত?

—না। ভেসে যেতে দিতাম না। কিন্তু খুব মুস্কিল হ'ত।

সারদা চলে যাচ্ছিল।

—শোন্। —মালতী তাকে ডাকলে।

সারদা ফিরে দাঁড়াল।

—আজ বিকেলে একবার ডাক্তারের খবরটা নিয়ে আসবি।

—আসতে বলব?

—না। শুধু খবরটা নিবি।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যুর দিন মনোহর সেই যে এসে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে, আর আসে নি। এমনকি শ্রাদ্ধের দিনেও নয়। সারদা বুঝলে, মনোহরের এ-বাড়ী আসা বৌরাণী, যে কোন কারণেই হোক, এখন চায় না। অনেকদিন খবর পায় নি, শুধু খবরটা চায়।

প্রতিদিন সন্ধ্যার মুখে সারদা ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি পায়। যেদিন মনোহর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে, সেদিন আর একটু আগেই ছুটি মেলে। প্রথমে মনোহর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, চিঠি দেবার থাকলে দেয়, জবাব নেবার থাকলে নেয়, তারপরে বস্তিতে ফিরে নিজের ঘরখানা পরিষ্কার করে, বিছানা ঝাড়ে, ধুপ-ধুনো দেয়। রামকিঙ্কর এলে তার সঙ্গে একটু গল্পও করে।

আজও তাই করলে।

প্রথমে মনোহরের সঙ্গে দেখা করে বললে, বৌরাণী অনেকদিন আপনার খবর পান নি। কেমন আছেন, জানতে চেয়েছেন।

মনোহর হাসলে। বললে, তোমাদের বৌরাণী কেমন আছেন, আগে বল।

—বৌরাণী আর কেমন থাকবেন। আছেন একরকম।

—খোকাবাবু?

—ভালই।

—গিন্নীমার খবর কি?

—আজ তিনি ঠাকুরদালানে নেমেছেন।

—নেমেছেন? সব দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন?

—দেখাশুনা আর কি। তবে উনি ঠাকুরদালানে নামলেই, আমলা-কর্মচারীরা আসেন, পাঁচটা কথা জিগ্যেস করেন, হুকুম নেবার থাকলে নিয়েও যান।

মনোহর ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা কুটিল হাসির রেখা খেলে গেল। বললে, আমি জানতাম। অতবড় সংসারের কর্তৃত্ব উনি সহজে ছেড়ে দেবেন না। তোমাদের বৌরাণীকে অনেক লড়াই করতে হবে।

সারদা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মনোহর ডাক্তারের কথার মানেটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে লাগল। কথাটা তার ভাল লাগল না।

তারপরে জিগ্যেস করলে, আপনি কেমন আছেন, বললেন না ত?

—আমি?—মনোহর হাসলে,—ব'লো, ভালই আছি।

সেখান থেকে বেরিয়ে সারদা বাসায় ফিরল। দেখে, রামকিঙ্কর তার খাটে বসে পা দোলাচ্ছে আর ভাবছে।

সারদা হেসে জিগ্যেস করলে, কতক্ষণ?

হাতের ঘড়িটা দেখে রামকিঙ্কর বললে, আধ ঘন্টা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক ঘণ্টা।

লজ্জিতভাবে সারদা বললে, একটু দেরি হয়ে গেল। মনোহর ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল।

মনোহর ডাক্তারের নামে রামকিঙ্করের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বললে, সেখানে কি? কারও অসুখ-বিসুখ নাকি?

ঠোঁট টিপে হেসে সারদা বললে, না, অসুখ-বিসুখ নয়। তিনি কেমন আছেন, বৌরাণী জানতে পাঠিয়েছিলেন।

—কেমন আছেন জানতে পাঠিয়েছিলেন!

—তা কি কেউ পাঠায় না? অনেকদিন খবর না পেলে অনেকেই ত জানতে পাঠায়।

—তা পাঠায়।—রামকিঙ্কর হাসলে।—তা, ডাক্তারবাবুকে কেমন দেখে এলে?

—মন্দ নয়। তবে গিন্নীমা আবার ঠাকুরদালানে নেমে এসেছেন শুনে তাঁর মনটা খুব প্রসন্ন হ'ল না।

—গিন্নীমা আবার ঠাকুরদালানে নেমেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আজ থেকে।

কি যেন একটু চিন্তা করে রামকিঙ্কর বললে, তোমাকে জিগ্যেস করলে ত জবাব পাই না। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর। তবু জিগ্যেস করি, বৌরাণীর সঙ্গে মনোহর ডাক্তারের সম্পর্কটা কি তোমার মনে হয়?

বিরক্তভাবে সারদা বললে, কথাটা আপনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার জিগ্যেস করেছেন। জেনে আপনার কি লাভ বলুন ত?

—আছে লাভ। তুমি বল না।

—আমি জানি না।

রামকিঙ্কর তথাপি দমল না। বললে, বৃন্দাবনবাবুর মৃত্যু নিয়েও তোমার মনে কোন সন্দেহ নেই?

—থাকলেই বা আপনাকে বলব কেন? রামবাবু, বড়-বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, একথা আগেও আপনাকে বলেছি। বৃন্দাবনবাবু গেলেই বা আপনার কি, থাকলেই বা আপনার কি?

সারদা কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার বলার ভঙ্গিতে রামকিঙ্করের মনের সন্দেহ দৃঢ়তর হ'ল। মানুষের উপর তার বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে উঠল।

দোকানে ফিরে দেখলে তার কাকার আরেকখানা চিঠি অপেক্ষা করছে। বিয়ের চিঠি এবং সেই মেয়েটির সঙ্গেই। রামকিঙ্কর আগের চিঠিখানার জবাব দেয় নি। কিছুটা আলস্যবশতঃ, কিছুটা মনস্থির করতে না পারার জন্যে।

কিন্তু আজ সে মনস্থির করে ফেলেছে। বিবাহ সে করবে না। এই মেয়েটিকেও না, অন্য কোন মেয়েকেও না। বিবাহে তার অরুচি এসে গেছে।

কাকাকে সেই কথা সে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলে। স্পষ্ট লিখে দিলে, তার বিবাহের জন্যে কোন চেষ্টা যেন না করা হয়।

রাত্রে সুবল চুপি চুপি বললে, একটা কথা শুনেছ?

—কি কথা?

—বাবুর মৃত্যুর পিছনে নাকি অনেক রহস্য আছে।

অন্যমনস্কভাবে রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, কে বললে?

—সবাই বলছে। তুমি শোন নি?

—না।

রামকিঙ্কর পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল।

(একত্রিশ)

সকাল থেকে বেলা বারোটা-একটা পর্যন্ত গিন্নীমার ঠাকুরদালানে কাটে। ঠাকুরের ভোগ হ'লে তাঁর ঘরে ভোগ চলে আসে। সেইসঙ্গে তিনিও চলে আসেন।

প্রসাদ খেয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম করেন। শয়নকক্ষে একখানা লম্বা-চওড়া খাট আছে, কিন্তু সেখানে তিনি বিশ্রাম করেন না। বিশ্রাম করেন মেঝেয়। শীতকালে কম্বল বিছিয়ে এবং গ্রীষ্মকালে কখনও-বা একখানা মাদুর বিছিয়ে, কখনও-বা মার্বেলের মেঝের উপর কিছু না বিছিয়ে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানেই শুয়ে-বসে কাটান। সন্ধ্যার পরে আরতি দেখতে নামেন।

দুপুরে ঠাকুরের সেবা-পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-কর্মের যা-কিছু আলোচনা থাকে, তাও সারেন। আগে বিকেলে আমলা-কর্মচারীদের সঙ্গে গিন্নীমা তাঁর ঘরেই আলোচনা করতেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বিকেলে অথবা সন্ধ্যার পরে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। জরুরী কাজ থাকলেও না।

হাসি-গল্প আগে যেটুকুও-বা ছিল, এখন একেবারেই তা বর্জন করেছেন। কথা কখনই তিনি বেশী বলতেন না। এখন তা আরও কমে গেছে। সকল সময়েই মুখের ওপর একটা প্রগাঢ় শোকের ছায়া। চোখ দিয়ে জল পড়ে না, কিন্তু চোখের সে দীপ্তি আর নেই।

মালতী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলে। তার সঙ্গে খোকাবাবু।

ম্লান হেসে গিন্নীমা বললেন, তোমার ব্যাটার জমিদারী, যে ক'দিন আমি আছি, রাখবার চেষ্টা করব। তারপরে কি হবে জানি না।

গিন্নীমা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

মালতী হেসে বললে, ততদিনে খোকা বড় হয়ে যাবে। নিজের সম্পত্তি নিজেই দেখে নিতে শিখবে।

গিন্নীমা নতমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। বললেন, ততদিন আমাকে বেঁচে থাকতে ব'লো না।

—না বাঁচলে ওসব দেখবে কে?

—তুমি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীমার মুখ কঠিন ভাব ধারণ করলে। তা মালতীর দৃষ্টি এড়াল না।

বললে, আপনার বোঝা বইবার সাধ্যি আর কোন মেয়েমানুষের নেই। আমি ত ছাড়্।

তেমনি কণ্ঠে গিন্নীমা বললেন, তুমি পারবে।

মালতী বিনীতভাবে বললে, আমি গরিব কেরাণীর মেয়ে। এসব বড় বড় ব্যাপারের আমি কি বুঝি?

গিন্নীমা আর কথা বাড়ালেন না।

একটু পরে জিগ্যেস করলেন, পরশুদিন নাকি তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল? এখন কেমন আছ?

মালতী বললে, ও কিছু নয়। সেই পুরানো ফিটের অসুখটা।

—ডাক্তার এসেছিল?

মালতী তাড়াতাড়ি বললে, আমি জানতাম না। সারদা ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিল।

—তোমাদের পাড়ার সেই ডাক্তারটিকে?

অস্বীকার করার পথ ছিল না। গিন্নীমার কাছে লুকোনোর চেষ্টা মিথ্যে।

বললে, হ্যাঁ।

গিন্নীমা ধীরে ধীরে অথচ কঠিন কণ্ঠে বললেন, কি জানি কেন, ওই লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। আমি চাই না যে, ও আমার বাড়ীতে আসে।

শোনামাত্র মালতীর মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এল। কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সে কোন জবাব দিলে না। জবাব দেবার কিছু ছিলও না।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, একটা কথা জিগ্যেস করছিলাম।

—বল।

—আমাদের জমিদারী, তেলের দোকান, এসবের হিসেব-নিকেশ বোধ হয় অনেকদিন হয় নি।

—না।

—একবার করালে কেমন হয়?

—ভাল হয় না।

—কেন?

এতক্ষণ পরে গিন্নীমা মালতীর মুখের দিকে চাইলেন।

সাহস পেয়ে মালতী বললে, তা হ'লে অবস্থাটা বোঝা যায়।

গিন্নীমা বললেন, হিসেব-নিকেশ না করেও বোঝা যায়।

—কি বোঝা যায়?

—যে টাকা-কড়ি অল্প-বিস্তর সবাই মেরেছে।

—তা হ'লে ?

গিন্নীমা আবার ম্লান হাস্য করলেন : কি তা হ'লে ? পুকুরে মাছ থাকলে কিছু মাছ চুরি যায়ই। তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। লক্ষ্য রাখতে হয়, পুকুর না চুরি যায়।

—তাও ত যেতে পারে ?

—পারে নিশ্চয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখলে, ততখানি সাহস আমলাকর্মচারীরা করে না। সে আলোচনা আরেকদিন করব। দেখ, তোমার খোকা কোথায় পালাল।

মালতী চেয়ে দেখে, খোকাবাবু কখন চুপি চুপি চলে গেছে।

গিন্নীমা হেসে বললেন, আমরা যখন কথা বলছিলাম, ও তখন চুপি চুপি পিছনের ওই মিটকেসটা খুলে ফেলে। আমার ত মাথার পিছনেও দুটো চোখ আছে। দেখলাম, কিন্তু কিছু বললাম না। তোমার ছেলে মিটকেস খুলে দেখে, একখানা রেকাবীতে গোটা কয়েক প্রসাদী সন্দেশ রয়ে গেছে। একটি তুলে নিয়ে সরে পড়েছে।

মালতী হেসে বললে, তাই বুঝি ? কিন্তু ও ত মিষ্টি ভালবাসে না, খায়ও না।

গিন্নীমা হেসে বললেন, বোধ হয় ঠাকমার মিষ্টি চুরি করে খেতে ভাল লাগে।

—তাই হবে। দেখি, কোথায় গেল।

বেরিয়ে এসে মালতী দেখে, খোকাবাবু তার শোবার ঘরে মিষ্টিটি হাতে করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টি অল্প একটুখানি খেয়েছে।

মালতী হেসে বললে, চোর! ঠাকমার সন্দেশ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছ ?

খোকাবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলে, হুঁ।

বলে মিষ্টিটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মালতী সারদাকে ডাকলে। সে এসে দাঁড়াতেই জিগ্যেস করলে, রামবাবুর খবর কিরে ?

সারদা কাঁচুমাচু করে বললে. আমি কি করে জানব ?

একটা কৃত্রিম কোপ কটাক্ষ হেনে মালতী ধমক দিলে, তুই জানিস। তোর সঙ্গে তার রোজই দেখা হয়।

সারদা প্রতিবাদ করলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মালতী বললে, তাকে আনার দরকার।

সারদা বললে, তাঁকে কি ডেকে আনব ?

ব্যস্তভাবে মালতী বললে, না, না। ডেকে আনতে হবে না। শুধু বলবি, বৌরাণী জানতে চাইছেন, দোকানের খবর কি ?

বলেই বললে, জানিস, গিন্নীমা এখন থেকে আবার আমার দিকে কড়া নজর রাখছেন। সেদিন মনোহর ডাক্তার এসেছিল, তিনি জানতে পেরেছেন।

—বললেন কিছু ?

—বললেন বৈ কি। বললেন, ডাক্তারের এ বাড়ী আসা তিনি পছন্দ করেন না। রামবাবুর সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা জানি না। সুতরাং তার আসার দরকার নেই। গিন্নীমাকে আমি এখন চটাতে চাই না।

সারদার সঙ্গে এই ধরনের আলাপ মালতী এই প্রথম করলে। বোধকরি, অন্য উপায় নেই বলে। তার একজন বিশ্বাসী সাহায্যকারিণী দরকার। মালতী এইটা বুঝেছে, সারদা বুদ্ধিমতী এবং বিশ্বাসীও।

সাহস পেয়ে সারদা বললে, এখন আর গিন্নীমাকে অত ভয় কেন, বৌরাণী ? এখন ত বাড়ীর গিন্নী আপনি, গিন্নীমা নন।

মালতী আবার ধমক দিলে, তুই থাম। এ সব কথা কখ্খনো বলবি না। গিন্নীমাকে এখনও ভয় করে চলতে হবে। তোকে যা বললাম, তাই কর।

সারদা জিগ্যেস করলে, কি বলতে হবে ?

—জিগ্যেস করবি, দোকানের ভেতরের অবস্থা কি ? হরেকেষ্টবাবু কেমন কাজ চালাচ্ছেন ? চুরি-চামারি চলেছে কি না। দরকার হ'লে রামবাবু দোকানের ভার নিতে পারে কি না। তাছাড়া আরও তার যা বলবার আছে, শুনে আসবি।

একটু পরে শান্ত, ধীর কণ্ঠে মালতী বললে, গিন্নী

হওয়া তুই যত সহজ ভাবছিস তত সহজ নয়। আমলা-কর্মচারী, কারবারের লোকজন সব গিন্নীমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার সাধ্য কি মাথা তুলি। ভরসা একমাত্র রামবাবু। লোকটিকে ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর তুই মাঝখানে আছিস।

বলে হাসলে।

সেই হাসি সারদাকে বিঁধল।

সে বললে, বৌরাণী, আপনি আমাদের সম্বন্ধে যা ভাবছেন তা কিন্তু ঠিক নয়।

—ঠিক নয়?

—না।

—রামবাবু তোর ওখানে রোজ আসেন না?

—আসেন, রোজ নয়, মাঝে মাঝে।

—কি জন্যে আসেন?

সারদা হেসে ফেললে। বললে, এমনি আসেন। একটু চা খান, দুটো পান খান। একটু গল্প করে চলে যান। তার বেশী নয়।

মালতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। বললে, তার বেশী নয়?

—না। সাধারণত যাদের দেখা যায়, তাদের মতন উনি নন।

মনে হ'ল কথাটা মালতী বিশ্বাস করলে। বললে, ওই রকম একটি মানুষই আমি খুঁজছিলাম। তার সাহায্য আমি পাব?

সারদা বললে, তা জানি না। তবে আপনার ওপর ওঁর টান আছে।

'টানে'র কথায় মালতীর মুখে এক ঝলক রক্ত ছুটে এল। বুঝলে সারদা মন্দ ভেবে কিছু বলে নি। অশিক্ষিতা ঝি, সহজভাবেই কথাটা বলেছে।

জিগ্যেস করলে, কি করে বুঝলি?

—আপনার জন্যে তিনি অনেক করেছেন, বৌরাণী। দুঃখ ত সয়েছেনই, চাকরিটাও খোয়াতে বসেছিলেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আপনার ফাই-ফরমাশ খাটা গিন্নীমা পছন্দ করতেন না।

এসব মালতীর জানা কথা। কিন্তু না-জানার ভান করে চুপ করে রইল।

সন্ধ্যার মুখে রামকিঙ্কর এল সারদার বাসায়। সারদা আগেই এসেছিল। ঘর পরিষ্কার করে বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে রামকিঙ্করেরই কথাই সে ভাবছিল।

রামকিঙ্করকে দেখে সারদা উৎসাহের সঙ্গে বললে, আসুন, আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আমার কথা ভাব তা হ'লে? ভাগ্য ভাল বলতে হবে!

—আমারও মনে হয়, আপনার ভাগ্য ভাল। আমি আপনার কথা ভাবছি বলে নয়, অনেক খবর আছে। দাঁড়ান, আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। তারপর ধীরেসুস্থে বলব।

রামকিঙ্কর বাধা দিয়ে বললে, চায়ের ঝামেলা থাক, সারদা। অতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমি থাকতে পারব না। তুমি আগে খবরটা দাও।

সারদা হেসে বললে, চা আনতে আমার কতটুকু সময় যাবে? ততটুকু ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

—না।

—তা হ'লে বলছি শুনুন: বৌরাণী আজ আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন।

—তারপরে?

—জিগ্যেস করছিলেন, দোকান চলছে কেমন?

—তা, তোমাকে জিগ্যেস করছিলেন কেন?

—ওঁর সন্দেহ, আপনি এখানে প্রায়ই আসেন।

—সারদা মুখ টিপে হাসলে।—তাই আমাকেই জিগ্যেস করছিলেন।

—তা, তুমি কি বললে?

—আমি আর কি বলব? আমি কি জানি? আপনি যা বলবেন, তাই বৌরাণীকে জানাব।

—বৌরাণী কি এখন বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন?

সারদা বললে, আরম্ভ করেন নি, বোধহয় ভয় পাচ্ছেন।

—কিসের ভয়?

—গিন্নীমার। আমলা-কর্মচারীদের কাউকে উনি চেনেন না, জানেনও না। শুধু আপনাকে জানেন। তাও পুরোপুরি ভরসা করবার মত জানেন না।

—কেন, মনোহর ডাক্তার কোথায় গেলেন?

—তিনিও আছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ী ঢোকা নিষেধ হয়ে গেছে।

সারদা হাসলে।

মনোহর ডাক্তারকে রামকিঙ্কর দু' চক্ষে দেখতে পারে না। খবরটা শুনে সে খুশী হ'ল।

জিগ্যেস করলে, কে নিষেধ করলেন? গিন্নীমা?

—তা ছাড়া আর কে করতে পারে?

—তিনিও কি মনোহর ডাক্তারকে পছন্দ করেন না?

—না। যেমন আপনাকেও করেন না।

সারদা আবার হাসলে। বললে, বৌরাণীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের গিন্নীমা দেখতে পারেন না। সে কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে, ডাক্তারবাবু বৌরাণীকে কতখানি সাহায্য করতে পারবেন, ওঁদের বিষয়-সম্পত্তি, কাজ-কারবারের কতটুকু উনি জানেন? কিছু সাহায্য করতে পারেন আপনি। সেইজন্যে উনি আপনার ওপর ভরসা করতে পারবেন কি না, তাই ভাবছেন।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

সারদা জিগ্যেস করলে, কি বলব?

রামকিঙ্কর বললে, তাড়া ত নেই। ভেবে বলব।

তারপর বললে; দেখ, দোকানের অবস্থা খুব ভাল নয়। হরেকেষ্ট প্রচুর টাকা মেরেছে। সে টাকা আদায় হওয়ার আশা নেই। গিন্নীমা সব জানেন, এও নিশ্চয় জানেন। কিন্তু, সম্ভবতঃ আমার জন্যেই, তাকে ছাড়াতে চান না। হিসেব-নিকেশ করছেন না। আমার মনে হয়, সব জায়গার অবস্থাই মোটামুটি এই রকম। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বৌরাণীর জন্যেই গিন্নীমা হিসেব-নিকেশ করাতে ভয় পাচ্ছেন। বোধ হয় এখন তিনি জল ঘোলাতে চান না।

সারদা সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলে। জিগ্যেস করলে, তা হ'লে এই কথাই তাঁকে বলব?

রামকিঙ্কর বললে, বলতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি জিগ্যেস না করলে কিছু বলো না।

—বেশ।

রামকিঙ্কর বললে, ঝড় যে একটা আসছে, তা আমি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছি। কবে জান?

—কবে?

—যেদিন শুনলাম, বাবুর কাছে চাবুক খেয়েও বৌরাণী কাঁদতেন না।

—তার সঙ্গে ঝড়ের কি সম্বন্ধ?

—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আগে বৌরাণী ভেবেছিলেন, ও বাড়ীর আওতা থেকে সরে যাবেন। সেইসঙ্গে বি. এ. পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। তারপরে সে সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন একটি সন্তানের জন্যে। চাবুকের ভয় চলে গেল। স্থির করে ফেললেন, একটি ছেলে এলে চাবুক আর কতদিন? লক্ষ্য করে থাকবে, বাবুর ওপর বৌরাণীর এতবড় ঘৃণা ছিল যে, খোকাবাবুকে তিনি বাবুর কাছে যেতে দিতেন না।

—শুধু বাবুর কাছেই নয়, গিন্নীমার কাছেও যেতে দিতেন না।

—ওই বাড়ীর ছোঁয়াচ থেকেই তাকে দূরে রাখতে চান। কিন্তু গিন্নীমাকে ত জান, তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ হবে না।

—সেই ভয়ই ত বৌরাণীরও।

—দেখ কি হয়।

রামকিঙ্কর উঠল।

(বত্রিশ)

কলেজ ষ্ট্রীটের একটি দোকানের সামনে রামকিঙ্করের

সঙ্গে সবিতার দেখা। অকস্মাৎ একেবারে মুখোমুখি। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

সবিতা এবং তার স্বামী উপেন্দ্র দু'জনের বগলেই দুটো প্যাকেট। নিশ্চয় বাজার করতে বেরিয়েছিল। দু'জনেরই হাসি-হাসি মুখ। অকস্মাৎ রামকিঙ্করকে দেখে সবিতার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

রামকিঙ্করই প্রথম কথা বললে, বাজার করতে বেরিয়েছিলে?

অপ্রস্তুতভাবে হেসে সবিতা বললে, সামান্য দুটো জিনিষ। কেনা হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরছি।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, কত দূরে থাক?

সবিতা বললে, এই ত কাছেই। আসবে?

রামকিঙ্করের কোন কাজ ছিল না। বললে, চল।

গলির মধ্যে ছোট একখানি ঘর। তার কোলে একফালি বারান্দা। সেইখানে তোলা-উনানে রান্না হয়। ঘরের ভিতর আসবাবের মধ্যে একখানি বড় তক্তপোষ। তার ওপর বিছানা পাতা। একদিকের দেওয়ালে একটি কাঠের আলনা। তাতে কয়েকখানি ধুতি, শাড়ি টাঙানো। এককোণে ইঁটের ওপর একটি ষ্টীলের ট্রাঙ্ক। ঘরখানি এত ছোট যে, এর পরে আর কিছু রাখবার জায়গাও নেই।

লজ্জিত হাস্যে উপেন বললে, গরীবের বাড়ী, কাউকে আসতে বলতেও লজ্জা হয়।

সহাস্যে রামকিঙ্কর উত্তর দিলে, আমাকে কি আপনি বড়লোক ঠাওরালেন? আমি যে ঘরে থাকি, সে এর চেয়েও খারাপ। এখানে ইঁদুর আছে নাকি?

উপেন হেসে বললে, কি জানি? এখনও চোখে পড়ে নি একটাও। তবে কাঁকড়া বিছে আছে। দিন পনেরো আগে পাশের ঘরে একটি ছোট ছেলেকে কামড়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও তাকে বাঁচানো গেল না।

—কি সর্বনাশ! সাবধানে থাকবেন।

উপেন হাসলে: ঘুমন্ত অবস্থায় কামড়ালে মানুষ আর কি সাবধান হবে!

—তা বটে। আমাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই বাঁচতে হবে।

অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, এ বাড়ীতে ক'খানা ঘর আছে?

উপেন বললে, উপরে তিনখানা, নিচে তিনখানা। ছ'খানা। প্রত্যেক ঘরে এক একটা পরিবার।

—কত ভাড়া?

—নিচে পঁচাত্তর টাকা। উপরে পঁচাশি। তাও বাড়ীওয়ালা গজ গজ করছে, আমরা সস্তায় আছি। ভাড়া বাড়ানো দরকার।

—বাবাঃ! এতেও মন ভরছে না তার?

—না। জলেরও কষ্ট আছে। আমাদের দু'টি প্রাণী। কোনরকমে চলে যায়। পাশের ঘরের ভদ্রলোকের চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। তার খুব কষ্ট হয়। জল নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটিও কম হয় না। কি জানেন, গোটা বাড়ীটায় অনেকগুলি মানুষ বাস করে। যদি জলের আলাদা পাইপ থাকত, এতটা কষ্ট হ'ত না। তা নেই। বাড়ীওয়ালার বাড়ীর সঙ্গে একটাই লাইন। ওরা কল খুলে রাখলে, আমাদের পাইপে একফোঁটাও জল আসে না।

—আলাদা লাইন করে না কেন?

—বলে, এই ভাড়ায় আলাদা লাইন হয় না। তাও নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভাড়াটাদের সবসময় কব্জার মধ্যে রাখতে চায়।

—দোতলায় কি পাম্পে জল যায়?

—কোথায় পাবেন? এই একটা চৌবাচ্চা নিয়েই সবাইকে গুঁতোগুঁতি করতে হয়। সে আর এক মজা।

—তাই নাকি?

—মজা আরও আছে। দোতলার ভাড়াটেরা নিজেদের অভিজাত মনে করে। আমাদের ঘেন্না করে।

রামকিঙ্কর সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলে, কেন?

—কারণ, তারা দোতলায় থাকে। ভাড়া দশ টাকা বেশী দেয়।

উপেন হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর অবাক্। এই ত ভাড়া বাড়ী। দেওয়ালের চুন-বালি খসে পড়ছে, মেঝে স্যাঁতসেঁতে। সিমেণ্ট মাঝে মাঝে উঠে গেছে। উপরের ঘরগুলো সে দেখে নি। কিন্তু এই বাড়ীরই ত উপরের ঘর। সে আর কতই-বা ভাল হবে! তারও মধ্যে দু'টি পল্লী: একটি অভিজাত, একটি হরিজন। অথচ মাত্র দশটি টাকার ইতর-বিশেষ।

রামকিঙ্কর বললে, আর একটু ভাল বাড়ী দেখে উঠে যান, উপেনবাবু। এ বাড়ীতে থাকলে অসুখে পড়ে যাবেন।

উপেন হাসলে, কখনও বাড়ি খুঁজেছেন, রামবাবু?

—না। সে দরকার কখনও হয় নি।

—তা হ'লে আপনি বুঝবেন না। কলকাতায় খালি বাড়ী নেই। যাদের সামর্থ্য আছে, তাদেরও এই রকম বাড়ীতেই থাকতে হয়। আর আমাদের মত লোক, যাদের সামর্থ্য নেই, বাড়ি খোঁজার সময়ও নেই, তাদের উপায় কি বলুন?

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

সবিতা চা নিয়ে এল।

বললে, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। কি আনন্দ যে হচ্ছে। সব খবর বল।

—খবর? —রামকিঙ্কর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, —খবর ওই একরকম।

সবিতা চুপ করে রইল। কি যেন একটা জিগ্যেস করতে চায়, করতে বাধছে।

উপেন বুঝলে, অনেকদিন পরে সবিতা বাপের বাড়ীর লোক পেয়েছে। কিছু ঝড়-বৃষ্টি হ'তে পারে। বেগতিক দেখে সরে পড়ল।

এতক্ষণ পরে সবিতা জিগ্যেস করলে, বাবা?

এইটুকু বলতেই তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।

রামকিঙ্কর বললে, তিনি ত বিছানা নিয়েছিলেন। এখন একটু চলা-ফেরা করছেন।

সবিতা কপালে দুইহাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালে। ভগবানকে না বাবাকে, তা সেই জানে।

তারপর জিগ্যেস করলে, মা? দাদা?

রামকিঙ্কর বললে, বিশু ভালই আছে। চাকরি-বাকরি করছে। মাও এখন অনেকটা সামলেছেন।

—বাবা কি অফিস করছেন?

—না। ছুটিতে আছেন। বোধ হয় এই ছুটির শেষেই অবসর নেবেন।

আবার কিছুক্ষণ সবিতা স্তব্ধভাবে বসে রইল। তারপর জিগ্যেস করলে, আমার কথা হয় না?

একটু ইতস্ততঃ করে রামকিঙ্কর বললে, কই, আমার সঙ্গে ত কোনদিন হয় নি।

—তুমি যাও ত মাঝে মাঝে?

—খুব বেশী যেতে পারি না। আমার চাকরি ত জান। মাঝে মাঝে যাই।

সবিতা একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

রামকিঙ্কর বললে, এখন বিশুর ঘাড়েই সংসারের সমস্ত চাপ পড়েছে। বাজার-হাট, অফিস, ছেলে-পড়ানো।

সবিতা জিগ্যেস করলে, দাদা কি ট্যুইশানও আরম্ভ করেছে?

—নইলে পারবে কেন? খরচ ত কম নয়। মা-ও আর পারছেন না। শরীরটা ভেঙ্গে গেছে। বিশুকে বিয়ে করবার জন্যে চাপ দিচ্ছেন।

সবিতা তাড়াতাড়ি বললে, মায়ের দিকে চেয়ে দাদার এখন বিয়ে করাই উচিত।

—আমিও তাই বলি। কিন্তু বিশু কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। তাতে করে মায়ের মনে ভয় ঢুকেছে।

—ভয় কিসের?

—পাছে সে আবার একটা অসবর্ণ বিবাহ করে বসে। 'ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।' আমাকে মা অনেকবার বিশুর মনের কথা জিগ্যেস করেছেন।

সবিতা ব্যস্তভাবে বললে, দাদাও কি সেইরকম কিছু করতে চায় নাকি?

রামকিঙ্কর বললে, না না, সে এখন বিয়ের কথা ভাবতেই পারছে না।

—কিন্তু একটি বৌ এলে মা খানিকটা বিশ্রাম পান।

—তা ত বটেই।

সবিতা আগ্রহের সঙ্গে বললে, দেখ না চেষ্টা করে, যদি রাজি করাতে পার।

বলেই হেসে বললে, অবশ্য বেল পাকলে কাকের কি?

—কেন একথা বললে?

—দাদার বিয়ে আমি ত দেখতে পাব না।

—তুমি যাবে না?

—আমি ত যেতে চাই, কিন্তু আমাকে নেমন্তন্ন করছে কে?

বলে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

বললে, রামদা সবিতা মারা গেছে। তার কথা তোমরা ভুলে যেও।

বলে মেঝের উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ ধরে কাঁদলে। রামকিঙ্কর কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে। তাকে একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারলে না।

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে উঠে চোখ মুছে বললে, এখানে এসে পর্যন্ত একটা দিনও কাঁদি নি। তোমার কাছে কেঁদে মনটা আমার খানিকটা হাল্কা হ'ল। আমার অনেক ভাগ্য যে, তুমি আমার বাড়ীতে এলে। দাদাকে আসবার জন্যে বলতেও পারতাম না। বিশ্বাস কর, বাপ-মায়ের মনে ব্যথা দিয়ে এ বিয়ে আমি কখনই করতাম না। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু মনে হ'ল, তাতে বাপ-মায়ের মনে আরো বেশী আঘাত দেওয়া হবে।

রামকিঙ্করের কি রকম সন্দেহ হ'ল। বললে, আমি ত তোমার দাদার মত। একটা কথা জিগ্যেস করব, সত্যি উত্তর দেবে?

—নিশ্চয় দেব, রামদা।

—তুমি সুখে আছ ত?

সবিতা তাড়াতাড়ি বললে, আছি। যদি কখনও তোমার সামনে একথা ওঠে, বলো, আমি খুব সুখে আছি। শুধু বাপ-মায়ের কথা মনে পড়লে, বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। নিজেকে সামলাতে পারি না।

—বলব। কথা না উঠলেও একদিন একথা বলব। তাতে তাঁরা মনে অনেকটা শান্তি পাবেন।

উঠতে উঠতে রামকিঙ্কর বললে, আজকে উঠি, সবিতা। বাসাটা চেনা রইল। মাঝে মাঝে আসব। তুমি সব সময় থাক ত?

—না, একটি স্কুলে মাষ্টারী পেয়েছি। দশটা-পাঁচটা সেইখানে থাকি। পয়লা তারিখ থেকে একটা ট্যুইশান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পেলে বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে থাকব না। সবচেয়ে ভাল হয়, তুমি যদি রবিবারে আস। বিকেলে বেরুতে পারি, কিন্তু চারটের আগে নয়। সুতরাং রবিবারে চারটের আগে এলে নিশ্চয় দেখা পাবে। প্রতি রবিবার আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তুমি এলে, আজ আমি বাপের বাড়ীর সঙ্গ পেলাম।

বলতে বলতে তার চোখ আবার জলে ভরে উঠল।

—চেষ্টা করব।

বলে রামকিঙ্কর যখন চলে এল, তখন তার নিজের চোখও শুষ্ক নয়।

সবিতাদের বাসার থেকে বেরিয়ে রামকিঙ্কর বরাবর দোকানেই ফিরছিল। হঠাৎ কি মনে হ'ল, বিশ্বনাথের বাসার দিকে চলল।

বিশ্বনাথ বাড়ী ছিল না।

বিশ্বনাথের মা বললেন, ছেলেটা সংসারের জন্যে প্রাণপাত করতে বসেছে। সকাল ছ'টায় একটা ট্যুইশানি করে, আটটায় ফেরে। মাথায় দু'-ঘটি জল ঢেলে ছুটো নাকে-মুখে দিয়ে সাড়ে ন'টায় অফিস ছোটে। ছ'টায় ফিরে একটু চা-খাবার খেয়ে আবার ছেলে পড়াতে যায়। ফেরে রাত ন'টায়।

—বাজার করে কে?

—বাজার উনি নিজেই করেন। ওঁরও মেজাজ

আজকাল ভয়ানক খিটখিটে হয়েছে। শরীরও প্রায় ভাল থাকে না। সেদিন বিশুকেই যেতে হয়। বলি, এত খাটবার দরকার কি? তিনটি ত প্রাণী। তার ওপর এখনও উনি অবসর নেন নি, মাইনে পাচ্ছেন। তা শুনেবে না। বলে, আজ অবসর নেন নি, কাল নেবেন। তার জন্যে এখন থেকেই তৈরী হওয়া দরকার।

—বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?

—মোটেই না।

—চাপ দিচ্ছেন না?

—চাপ দোব কখন, রাম? দিন-রাত্তির ত বাইরে-বাইরে। দু'বেলা দু'টি খাবার সময় কাছে পাই। তা, তোমাকে সত্যি বলি রাম, খাবার সময় কথা পাড়তে সাহস হয় না। পাছে না-খেয়ে উঠে যায়।

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

গলা নামিয়ে সুলোচনা হঠাৎ বলতে লাগলেন, আমারও যেন কি হয়েছে, রাম। মনে কেমন একটা ভয় ঢুকেছে। জোর করে কাউকে কোন কথা বলতেও সাহস হয় না। না ওঁকে, না বিশুকে।

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রামকিঙ্কর চমকে উঠল। মুখখানি ত শীর্ণ হয়ে গেছেই, তা ছাড়া চোখে সে দীপ্তি নেই। সে প্রত্যয় নেই। অসহায় করুণ একখানা মুখ।

সুলোচনা বলতে লাগলেন, মায়ের কত জ্বালা রাম, কাকে বোঝাই? মেয়েটা কোথায় গেল, কেমন আছে, কিছুই জানি না। ছেলেটাও দু'টি ভাতের জন্যে বাইরে-বাইরে। কর্তা চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বসে খিটখিট করছেন। আমি কোথায় যাই বলতে পার, রাম?

সবিতার কথা পাড়বে না, এই ছিল রামকিঙ্করের ইচ্ছা। কিন্তু সুলোচনার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। থাকতে পারলে না।

বললে, সবিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে, মা।

—কোথায়? কবে?

—আজকেই দেখা হয়েছে, মা। ওরা দু'জন বাজার করতে বেরিয়েছিল। পথে হঠাৎ দেখা। টানতে টানতে নিয়ে গেল ওদের বাসায়।

—তারপরে?

রামকিঙ্কর সমস্ত কথা একটি একটি করে জানালে। সুলোচনা নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলেন। শান্ত দু'টি চোখ আগ্রহে স্থির।

রামকিঙ্কর হেসে জিগ্যেস করলে, তারা কেমন আছে জিগ্যেস করলেন না?

ধীরে ধীরে সুলোচনা উত্তর দিলেন, না। আমার ভয় করে। চারিদিক থেকে শুধু খারাপ খবর আসবে, এই ভয়ে আমি সব সময় অস্থির হয়ে থাকি। আমার যে কত কষ্ট, কাউকে বোঝাতে পারব না।

সুলোচনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

রামকিঙ্কর বললে, তারা খুব ভাল আছে, মা। দু'জনে মাষ্টারী ক'রে চমৎকার সংসার চালাচ্ছে। শুধু—রামকিঙ্কর হঠাৎ থেমে গেল।

একটু অপেক্ষা করে সুলোচনা জিগ্যেস করলেন, শুধু?

রামকিঙ্কর বললে, শুধু আপনাদের কথা মনে হ'লে তার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।

সুলোচনা চিৎকার করে উঠলেন, ওরে, থাম্ থাম্। ওই ভয়েই আমি সব সময় অস্থির থাকি। সবিতা ভাল আছে, ওই পর্যন্তই থাক।

সুলোচনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ক্রমশঃ

শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক প্রসঙ্গে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যুগটা প্রচারসর্ব্বস্ব ছিল না, অথচ সেই কালেই রুচিবান শিক্ষিত মহলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নির্ভরযোগ্য চরিত্র ও তাঁর সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী ছিল উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা হয়ত বিস্ময়কর ছিল না, কিন্তু প্রতিটি সাহিত্য-রসিক মানুষের শ্রদ্ধা-সমাদরে পরিপুষ্ট ছিল। নির্ভীক নিরপেক্ষ সারবান যুক্তি-তথ্যবহুল সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি সুধীজনের চিত্ত আকর্ষণ করত। পরদেশী শাসকরা পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল যশ ও দীর্ঘ আয়ুর রেকর্ড এরা স্থাপন করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হ'ল চরিত্র-গৌরবে পত্রিকা দু'টি তুলনাহীন। সততা, সহৃদয়তা, নীতিনিয়ম ধর্ম্মনিষ্ঠ জীবনবোধের বিশ্বস্ততা সমাজ-কল্যাণ চিন্তা—সব মিলিয়ে একটি উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদাই সামনে থাকত। এই আদর্শের দায়ে রাজরোষ, বন্ধুবিচ্ছেদ, অর্থক্ষতি, অশেষ লাঞ্ছনা সব কিছুই স্বীকার করে নিতে হয়েছে বহুবার; তবু ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে সম্পাদক তাঁর কর্ত্তব্য করে গেছেন। সেই অজস্র লেখার মাধ্যমে একটি চরিত্রবান পুরুষকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি—একটি যুগের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করেছি।

কিন্তু এই সব প্রসঙ্গে আমি আসছি না। তাঁর কর্ম্মকীর্ত্তির বিশ্লেষণভার যোগ্যতর ব্যক্তিরা গ্রহণ করেছেন। অসংখ্য সম্পাদকীয় মন্তব্যের দ্বারা রামানন্দবাবু নিজ চরিত্রের বহু উপকরণ রেখে গেছেন, তথ্যানুসন্ধানীর পক্ষে কাজটা খুব কঠিন হবে না। এ ছাড়াও সেই বিচিত্র পথবাহী প্রতিভার অলিখিত স্বাক্ষর রয়েছে বহু সভা-সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণে, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে, সরস মন্তব্যে, বৈঠকী গল্পে। এই সমস্ত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সহকর্ম্মী শ্রোতা ও গুণমুগ্ধ জনের স্মৃতির পাতায়। যাঁর যেমন সাধ্য সেইগুলিকে উদ্ধার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারলে রামানন্দ-চরিত্রকে আরও পূর্ণভাবে বিচিত্র রসে আস্বাদ করার সুযোগ হবে। এখানে এমনি দু' একটি ঘটনা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব—যা আমার জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৩৩৬ সালের শেষ ভাগ থেকে আমি প্রবাসীর সংস্পর্শে আসি। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি তারও বহু পরে—১৩৪৪ সালে। উপলক্ষ্যটা ছিল শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন। সেই প্রথম তাঁর মুলেন ষ্ট্রীটের বাসায় বার কয়েক যাতায়াত করেছিলাম। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ আরও ঘনিষ্ঠভাবে দু'টি দিন তাঁর সঙ্গলাভ করেছিলাম শান্তিপুরে নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে। সে বৃত্তান্ত সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে।

সেবার শান্তিপুরে দু'টি দিন কাটিয়ে তিনি পরম প্রীতিলাভ করেছিলেন। বিদায় নেবার দিন বলেছিলেন, বাংলার একটি নাম-করা তীর্থভূমি হ'ল আপনাদের দেশ, এই যাত্রায় তীর্থ-পরিক্রমা সম্ভব হ'ল না। আবার আসবার ইচ্ছা রইল। মাঘ মাসে ফুলিয়াতে কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব হয় না?

নিজে থেকে আসবার ইঙ্গিত দেওয়াতে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, মাঘ মাসের শেষ রবিবারে ওই উৎসব হয়। আপনি এলে সবাই খুশি হবে।

বলেছিলেন, ফুলিয়া এখান থেকে কাছেই ত।

হাঁ—চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে। তবে গ্রাম ফুলিয়ার নামই আছে ইতিহাসের পাতায়—গ্রামের চিহ্ন নাই। চারদিকে ভাঙ্গা ইমারতের ঢিবি, বনজঙ্গল। একজন বাসিন্দাও খুঁজে পাবেন না।

বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু ষ্টেশন ত আছে একটা—শান্তিপুরে আসবার পথে দেখেছিলাম।

স্টেশন থেকে গ্রাম ফুলিয়া, মানে যেখানে কৃত্তিবাসের পাট—মাইলটাক দূরে। কিছুকাল আগেও কৃত্তিবাসের ভিটা, যবন হরিদাসের-সাধন গোদা বনজঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল। এখন বাংলার মনীষীদের চেষ্টায় কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একটা

স্কুলও কবির নামে চলছে। সেই থেকে বছর বছর কৃত্তিবাস স্মৃতি-সভা হয়ে আসছে। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে, কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটের কয়েকটি সাহিত্য-সংস্থার সহযোগিতায় স্মৃতি-পূজার আয়োজন হয়।

ফুলিয়ার বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেছিলেন, আপনারা আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিলেন, যথাসময়ে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলবেন না।

মাস তিনেক পরেই হবে—সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সেবারও সান্যাল-বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, রামানন্দবাবুকে পেয়ে স্মৃতি-উৎসবের মর্য্যাদা বেড়েছিল। কলকাতা থেকে আরও বহু গুণী জ্ঞানী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এসেছিলেন। সকলেই কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছিলেন।

তাঁদের মিলিত ভাষণের সারমর্ম ছিল: বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ও তাঁর সাহিত্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই কিংবদন্তী-নির্ভর। এই বিষয় নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের চেষ্টায় কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে আরও আলোকপাত সম্ভব হ'লে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা বাড়বে। সেই সময়কার বাঙ্গালী সমাজ, তার জীবন-ধারা ও রাষ্ট্রনীতি আমাদের ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করবে —আমরা নানাদিক দিয়ে লাভবান হব।

রামানন্দবাবু তাঁর ভাষণের সঙ্গে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি মূল্যবান। তার সারমর্মার্থ হ'ল:

এখানে বর্ত্তমানে গ্রাম বলতে ত কিছু নেই। আপনারা দূরবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের লোক মিলে একটি বেলার জন্য এখানে সমবেত হন। একটি বেলার উৎসবে যোগ দেন। কিন্তু ভেবেছেন কি, এইভাবে কত বছর ধরে তাঁর স্মৃতি-পূজার আয়োজন করতে পারবেন? মানুষ যেমন চিরজীবী নয়--তেমনি প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ুও সীমাবদ্ধ। আপনারা যখন থাকবেন না, আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলি থাকবে না, তখন কি এমন ব্যবস্থা রেখে যেতে পারবেন যাতে করে বছর বছর ধরে স্মৃতি-পূজার আয়োজন চলতে পারবে? লোকের অভাবে, উৎসাহের অভাবে একদিন এই পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে সহজ একটি উপায় রয়েছে—সেইটি গ্রহণ করুন। এক সময়ে বাংলা দেশের বৈষ্ণব কবি ও মহাজনেরা এই উপায় বেছে নিয়েছিলেন। স্মৃতি-পূজা উপলক্ষ্যে মেলার অনুষ্ঠান। আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করলে কৃত্তিবাসের জন্মদিনে তেমনি একটি মেলার অনুষ্ঠান অনায়াসে হ'তে পারবে। ধরুন তাতে কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে, রামায়ণ গান থাকবে, বিবিধ সংস্করণের রামায়ণ পুঁথি ইত্যাদি নিয়ে প্রদর্শনী থাকবে একটা। আরও পুরাতন দু-একটি অনুষ্ঠানকে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারেন। ভেবে দেখবেন। মেলাটা যদি চালু করতে পারেন কৃত্তিবাসের স্মৃতি-উৎসবের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না।…আগামী বছরে আবার আসব—দেখে যাব আপনাদের উদ্যম কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে।

শুধু মুখের কথা নয়, পরের বছরেও এসেছিলেন। সেবার সভাপতি ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। সেবারে রামায়ণ প্রদর্শনী ও রামায়ণ গানের ব্যবস্থা ছিল বলে স্মরণ হচ্ছে।

স্বাধীন সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে ফুলিয়া এখন শহরের গোত্রে গোত্রান্তরিত হ'তে চলেছে। জায়গাটা অবশ্য গ্রাম ফুলিয়া থেকে বেশ খানিকটা দূরেই। তবে গ্রাম-ফুলিয়াতেও জনবসতি বৃদ্ধির পথে। বিদ্যালয়টি উন্নত হয়েছে—একটি পাকা রাস্তা কৃত্তিবাস স্মৃতি-স্তম্ভের পাশ দিয়ে তারাপুর পর্য্যন্ত চলে গেছে। গঙ্গা এখন ফুলিয়ার প্রান্তবাহিনী নন। কৃত্তিবাস স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান এখনও শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেই হ'য়ে থাকে। মেলাটা তেমন জাঁকিয়ে না হ'লেও একটি দিনের অনুষ্ঠানের ধারাটি বজায় আছে। জন সমাগম মন্দ হয় না।

এখানে এলেই রামানন্দবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে, একটি মেলার প্রচলন হ'লে ভাল হয়। কৃত্তিবাস-উৎসবের জন্য আপনাদের আর ভাবতে হবে না।

এমনি আরও একটি সহৃদয় উপদেশ কথা মনে পড়ছে। আমরা তখন প্রবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছি—পুস্তক সমালোচনার ভার পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে রামানন্দবাবু একদিন বলেছিলেন: পুস্তক সমালোচনার সময় একটি কথা মনে রাখবেন—সমালোচনা যেন গঠনমূলক হয়। অর্থাৎ লেখকের সৃষ্টি-কর্ম্মের সহায়ক হয়। সমালোচনার ভাষা এমন কঠিন হবে না যার দ্বারা লেখক মনোকষ্ট পান। সাহিত্য-কর্ম্মে প্রেরণা দানই সমালোচনার উদ্দেশ্য—এতে অক্ষম রচনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা আসে না। দরদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কাজটি সহজ হয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের স্থান নাই।

পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। প্রতিটি রচনা নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকগণের দ্বারা মনোনীত করার পর পত্রিকায় দিতেন। অনেক সময়ে আদর্শ অনুযায়ী না হওয়ায় নামী লেখকের লেখাও ছাপতে পারেন নি, আর সেই কারণে বিরূপ মন্তব্যও সহ্য করতে হয়েছে। আবার এমনও হয়েছে—কোন লেখা ছাপার পর পাঠকমহল থেকে অনুযোগ আসায় অস্বস্তি বোধ করেছেন। সে লেখা নিজ আদর্শের পরিপন্থী কি না পুনরায় যাচাই করে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এমনি একটি ঘটনা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

'দিল্লী এক্সপ্রেস' নামে আমার একটি গল্প প্রবাসীর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ...দ্বিতীয় সংখ্যায় গল্পটি বার হওয়ার পর কয়েকখানি প্রতিবাদ-পত্র আসে পাঠকদের কাছ থেকে। তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্যের সারমর্ম—গল্পটিতে বিশেষ একটি বাঙালী সম্প্রদায়কে নাকি হীন করা হয়েছে। এই রকম গল্প প্রকাশ করে প্রবাসী তাঁর ঐতিহ্য নষ্ট করেছে। যাই হোক প্রতিবাদ-পত্রগুলি শুধু সম্পাদকীয় দপ্তরেই আসেনি—খোদ রামানন্দবাবুর নামেতেও এসেছিল।

প্রবাসীর সহ-সম্পাদকেরা সেই চিঠিগুলি আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন। মশায়, করেছেন কি? প্রবাসীর সম্মান নষ্ট করেছেন। খোদ কর্ত্তার নামেও চিঠি এসেছে—উনি রীতিমত বিচলিত হয়ে গল্পের ফাইল তলব করেছেন। এখন দেখুন তাঁর বিচারে কি হয়!

কথাটা ওঁরা পরিহাস করে বললেও এই প্রসঙ্গে রামানন্দবাবুর মন্তব্য—যা উনি পুস্তক-সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন—'দেখবেন, লেখার দ্বারা কাউকে অযথা মনোকষ্ট দেবেন না'—মনে পড়ল। হায়, কি এমন বেদনাদায়ক কথা লিখেছি যাতে এতগুলি লোক ক্ষুব্ধ হয়েছেন! ট্রেণ ভ্রমণকালে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা যা চোখে পড়ছে—তারই উপর কল্পনার সামান্য প্রলেপ লাগিয়েছি মাত্র। ইচ্ছা করে কাউকে খাটো করিনি, আঘাত করি নি। যে ঘটনা সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে—সত্যের খাতিরে তাকে প্রকাশ করা অন্যায়? কি জানি, সম্পাদক কি ভাবে ব্যাপারটাকে নেবেন!

অস্বস্তিতে দিন কাটতে লাগল। যথাকালে রামানন্দ-বাবুর রায় বার হল: গল্পগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িলাম। আপত্তিজনক কিছু চোখে পড়ল না।

ওঁর মন্তব্য পড়ে সহ-সম্পাদকরা হেসে বলেছিলেন, যাক, সসম্মানে মুক্তি পেয়ে গেলেন! আমাদের সম্পাদক মশায় কড়া নীতি আদর্শ মেনে চলেন বটে, সঙ্কীর্ণমনা শুচিবায়ুগ্রস্ত নন।

উক্তিটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

ফাঁকি

শ্রীরথীন সরকার

সেই সকাল থেকে সুরু হয়েছে। যত বেলা বাড়ছে ততই হৈচৈ আর গলার মাত্রাটা চড়ছে। আর এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা কড়ি কোমল নয়—একেবারে সুর সপ্তমে বাঁধা।

ছোট সংসার। কিন্তু কাজ কম নয়। মা একা পারেন না বলেই সুজাতাকেও হাত লাগাতে হয়। বাবা বুড়ো মানুষ, বাতের রুগী। নড়তে পারেন না। তবু তারই মধ্যে কয়েকবার তদারক করে গেছেন। মৃদু ধমক দিয়ে গেছেন সুরমাকে, ছিঃ ছিঃ, তুমি আজকেও মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে! এঁ্যা—

সুরমা বলেছেন, আমি কি ওকে বলেছি? ওই ত জোর করে এসে বসল। তারপর সুজাতাকে একরকম ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে বলেছেন, তুই যা মা যা, ওঠ। আমি মাছগুলো কুটে দিচ্ছি। চান-টান সেরে তুই প্রস্তুত হয়ে নি গে যা। দেখেছিস ঘড়িতে ক'টা বাজে?

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই সুজাতা চমকে উঠেছে। সর্বনাশ! ন'টা বেজে গেছে এরই মধ্যে। অথচ দশটায় ইণ্টারভিউ। ভদ্রলোক কত করে বলে দিয়েছেন, একটু সকাল সকাল আসবেন মিস সেন—আমি আপনার জন্ত অপেক্ষা করব। অথচ সেই সুজাতা এখনও গিয়ে পৌঁছুতে পারল না। দিব্যি গা এলিয়ে রয়েছে। ছিঃ, ছিঃ, কি ভাবছেন ভদ্রলোক! হয়ত এতক্ষণ তারই পথ চেয়ে রয়েছেন হাঁ করে।

সুজাতার মেজাজ সপ্তমে উঠল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল এই পোড়ারমুখো সংসারের উপর।

গরীবের সংসার। এদিক টানতে ওদিকে কুলোয় না। তারপর বাবা আজ ছ'মাস হ'ল রিটায়ার করেছেন। ফলে সংসারের দৈন্ত আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। অভাব অনটন বেড়েছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা এসে হানা দিয়েছে—খিটিমিটি সুরু হয়েছে। নন্ত মিনুর মুখের দিকে ত এখন তাকানই যায় না, সেখানে না-পাওয়ার একটা বিরাট্ বেদনা যেন পাহাড় হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সকলেই আশা করে আছে সুজাতার একটা চাকরি হবে। আর চাকরি মানেই স্বর্গ। অর্থাৎ সংসারে আবার শান্তি আসবে, সচ্ছলতা ফিরে আসবে। সবার মুখে হাসি ফুটবে। মিনু ত বলেই রেখেছে—দিদি, তোমার চাকরি হ'লে কিন্তু আমায় একটা শাড়ি কিনে দিও।

অথচ সেই চাকরির নামগন্ধ নেই। এক বছর হ'ল সুজাতা বি. এ. পাশ করে বসে আছে। কত জায়গায় চেষ্টা-চরিত্র করেছে কিন্তু সব জায়গাতেই সেই বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে—না, কাজ নেই। খালি হ'লে পরে জানাবে। অথচ তা বলে যে সত্যি সত্যিই তলায় তলায় লোক ঢুকছে না তা নয়। ঢুকছে। এবং তা লোকচক্ষুর অগোচরেই। আসলে আজকাল হ'ল পুশিং আর ব্যাকিং-এর যুগ। সুজাতাও জানে, মামা দাদা কি কোন আত্মীয়স্বজন ওপরওয়ালা হ'লে তারই মধ্যে একটা গতি হয়ে যায়। 'ম্যানেজ' হয়ে যায় সরকারী দপ্তরে।

আর তাই সুজাতাও আর কোন চেষ্টা-চরিত্র করে নি। তদ্বির-তদারক করে নি। কেননা চাকরির উপর একটা ঘৃণা, একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। জানে, তার চাকরি হবার নয়—হওয়া সম্ভব নয়। তবু তারই মধ্যে একটু আলোর আভাস কিংবা একটু ইঙ্গিতের ইশারা পেলে আনন্দের আর সীমা থাকে না। বাড়ীতে রীতিমত হৈচৈ পড়ে যায়।

নারকেলডাঙ্গায় গিয়েছিল ওর এক বন্ধুর বিয়েতে। আর সেখানেই আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। সুমিতা নিজেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, অজয় দত্ত। মার্চেণ্ট অফিসের সেক্রেটারী। আর ইনি মিস সুজাতা সেন, আমার পুরণো বান্ধবী।

ভদ্রলোক হেসে নমস্কার করে বলেছিলেন, ভালই হ'ল আলাপ হয়ে। পরিচয়টা পাকা হ'ল।

সুজাতা বলেছিল, আমারই বা লাভটা কম হ'ল কি !

ভদ্রলোকের চোখে এবার বিস্ময় ঝরে পড়েছিল। বলেছিলেন, বলেন কি !

সুজাতা বলেছিল, হ্যাঁ, অন্ততঃ আপনার মত একজন অফিসারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলাম সেটা সৌভাগ্য বৈকি !

ভদ্রলোক এবার হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। যেন একটা মস্ত বড় রসিকতা করতে পেরেছেন এই ভেবে তাঁর হাসি আর বাঁধ মানছে না।

তারপর কথায় কথায় চাকরি-বাকরির কথা উঠেছিল। আর সুজাতাই নিজের দৈন্যের কথা প্রকাশ করে বড্ড বেশী সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, সত্যিই আপনি চাকরি করবেন মিস সেন ?

সুজাতা বলেছিল, কেন, আমাকে দেখে কি বিশ্বাস হচ্ছে না যে চাকরি করতে পারি ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন, না, না, ঠিক তা নয়। বেশ ত, তবে আসুন একদিন ইনকামট্যাক্স অফিসে। আমার এক বন্ধু আছে, আলাপ করিয়ে দেব। শীগ্‌গিরই ওর অফিসে ভেকান্সী হবে একটা।

এর পর দিন দশেকও যায় নি। ভদ্রলোক নিজেই বাড়ী বয়ে এসে ইণ্টারভিউ লেটার দিয়ে গিয়েছিলেন আর বলে গিয়েছিলেন, চাকরিটা হ'লে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবেন না মিস সেন। পেট ভরে মিষ্টি খাব।

সুজাতা বলেছিল, বেশ ত, খাবেন। কিন্তু সে ত ভবিষ্যতের কথা। তার আগে ভেতরে এসে বসলে মিষ্টি না হোক অন্ততঃ চা-ও এক কাপ খাওয়াতে পারি।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, না, না, আগে থেকে ঋণী হব কেন। চাকরিটা হোক, তখন পেট ভরে খেয়ে যাব। আর তা ছাড়া—বলে ভদ্রলোক মৃদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, শুধু চা আর মিষ্টি খেয়েই বা বিদেয় হব কেন, তার সঙ্গে আরও কিছু দাবি করব। দেখবেন, তখন আবার আপত্তি করবেন না ত ?

সুজাতা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছিল। মাথা কান ঝিমঝিম করতে সুরু করেছিল। যেন এই মুহূর্তে পড়ে গিয়ে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী বাধাবে।

কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণ আর দাঁড়ান নি। হন হন করে এগিয়ে গিয়েছেন। আর সুজাতার মনে হয়েছিল, ছিঃ ছিঃ, কি অসভ্য লোকটা! একটুও মুখের আগল নেই। এমন করে কি কেউ কাউকে ঠাট্টা করতে পারে!

সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক ওৎ পেতেই ছিলেন। ছুটে এলেন। বললেন, দেরি করলেন যে—

সুজাতা বলল, হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। তা কল-টল করে নি ত ?

—না, তা করে নি, তবে এক্ষুণি করবে। কোন ভয় নেই মিস সেন, আমি সব বলে দিয়েছি প্রশান্তকে। সিলেকশান কমিটিতে ওই থাকবে কি না। আসুন।

বাঁ-হাতি করিডোর ছেড়ে ডানহাতি মোড়টা ফিরতেই এবার নজরে পড়ল অনেকগুলো ক্যাণ্ডিডেট জুটেছে ঘরটায়। ভেতরে একটা আলোচনার গুঞ্জন উঠেছে। যেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার একটা পুরোদস্তুর মহড়া চলেছে। ভদ্রলোক বললেন, যান, ভিতরে গিয়ে বসুন। কল হ'লে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা—একটুও নার্ভাস হবেন না মিস সেন। কি-ই আর জিজ্ঞেস করবে? নাম-ধাম দু' একটা টুকিটাকি প্রশ্ন। তা ছাড়া আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি প্রশান্তকে, চিন্তার কোন কারণ নেই।

ভদ্রলোক এগুলেন।

আর সুজাতা এতক্ষণে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। উঃ, সেই সকাল থেকে এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পায় নি, যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছিল। যাক, তবু এতক্ষণে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে।

ইণ্টারভিউ শেষ হতে ভদ্রলোক আবার এগিয়ে এলেন, এই যে কেমন হ'ল ইণ্টারভিউ ?

সুজাতা বলল, ভাল।

ভদ্রলোক বললেন, যাক, বাঁচলেন। হয়ে যাবে চাকরিটা। তা ছাড়া প্রশান্তকে বলে দিয়েছি, ও কি না করতে পারবে। আসুন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

সুজাতা কোন আপত্তি করল না।

ভদ্রলোক কাছাকাছি একটা রেষ্টুরেণ্টের নিরিবিলি কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। তারপর পর্দাটা টেনে দিতে দিতে বললেন, কি খাবেন বলুন ?

সুজাতা বলল, আমি কিছু খাব না—শুধু এক কাপ চা।

—সে কি ! ভদ্রলোক অবাক্ হ'লেন, আপনি খাবেন না। অথচ বসে বসে দেখবেন, তা কি কখনও হয় ! না, না, আপনি আপত্তি করবেন না, মিস সেন।

সুজাতা কিছু একটা বলতে চাইল কিন্তু ভদ্রলোক সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। ডাকলেন, এই বয়, বয়—

বয় এগিয়ে আসতেই ভদ্রলোক দুটো কাটলেট আর দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলেন না মিস সেন, এক এক ধরনের লোক আছে যারা খেয়ে আনন্দ পায়; আর এক ধরনের লোক আছে যারা খাইয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু আমি দুটোর কোনটিই নই। তবু এক-এক সময় খুব ইচ্ছা করে কাউকে খাওয়াই—প্রাণ উজাড় করে খাওয়াই। সুতরাং সে সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম তখন ছাড়ি কেন। ভদ্রলোক হাসলেন।

সুজাতা লজ্জিত হ'ল। বলল, কিন্তু আমি ত রাক্ষস-টাক্ষস নই যে প্রচুর খেয়ে আপনাকে আনন্দ দিতে পারব।

—বেশ ত, নাই বা পারলেন। ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হ'লেন। বললেন, অন্ততঃ নষ্ট ত করতে পারবেন। আর তাতেও ত এক ধরনের আনন্দ আছে।

সুজাতা আর কোন কথা বলতে পারল না। চুপ করে থাকল। আশ্চর্য! আশ্চর্য লাগছিল বৈ কি ! ভদ্রলোকের ব্যবহার সত্যিই তাকে বিস্মিত করেছিল। ভদ্রলোক যেন বড় বেশী উদার—বড় বেশী আন্তরিকতার সুর কথায়-বার্তায়। সুজাতার মনে হ'ল আসলে ভদ্রলোক এক ধরনের পাগল। নইলে অকারণ কেউ অতগুলো টাকা নষ্ট করতে চায় ! অকারণ কেউ টাকা বিলিয়ে দিতে পারে ! স্বীকার করতে হয় ভদ্রলোকের টাকা আছে। তবু এই বিংশ শতাব্দীতে এমন মনো-ভাবাপন্ন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হয়ত এও এক ধরনের বিলাসিতা কিংবা অহমিকা। কিংবা কিছুই নয়—নিছক একটু আত্মতৃপ্তি। সুজাতাকে খুশী করবার একটু করুণ প্রয়াস। তবে কি ভদ্রলোক এর পিছনে কোন রঙিন কল্পনার জাল বিস্তার করেছেন? যে রঙিন কল্পনার জাল তাঁকে এত উদারহস্ত করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সুজাতা লজ্জিত হ'ল, ছিঃ ছিঃ তাই বা কেন। এও ত হ'তে পারে যে ভদ্রলোক নেহাতই নিষ্পাপ মনে এসব করছেন। কোন রঙিন কল্পনাই এর পিছনে নেই—শুধু সভ্যতা আর ভব্যতা ছাড়া।

বেয়ারা এসে টেবিলটা পরিষ্কার করে মুছে প্লেটগুলো নামিয়ে দিতেই ভদ্রলোক বললেন, নিন্, আরম্ভ করুন মিস্ সেন।

সুজাতা কোন কথা না বলে প্লেটটা টেনে নিল।

ভদ্রলোক বললেন, আমি এক এক সময় ভাবি মিস্ সেন, কি হবে টাকা দিয়ে? আমাদের শাস্ত্রে বলেছে জীবন নশ্বর, পৃথিবী নশ্বর। সুতরাং জীবনই যদি না থাকল, পৃথিবীই যদি না বাঁচল তবে অর্থের মূল্য কি? শুধু শুধু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে লাভ কি ? বরং ভোগ করায় একটা আনন্দ আছে, দুই হাতে খরচ করায় একটা তৃপ্তি আছে।

ভদ্রলোক চুপ করলেন।

আর সুজাতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভদ্রলোকের বয়স খুব একটা বেশী নয়—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। কিন্তু দেখলে যেন মনে হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ। কিংবা তারও কম। আশ্চর্য! কোথাও এতটুকু বয়সের রেখাপাত ঘটে নি। কোথাও এতটুকু ফাটল ধরে নি। কেমন একটা লালিত্য কমনীয়তা ফুটে বেরিয়েছে। সারা দেহে ভরা যৌবন। ছত্রিশটা বসন্ত অতিক্রম করেও ভদ্রলোক এখনও সজীব, এখনও উজ্জ্বল—দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণতা কোথাও এতটুকু স্পর্শ করে নি। বরং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে জয় করবার এক অদম্য সাহস যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, কি হ'ল চুপ করে রইলেন যে মিস সেন? খান।

—আমি আর পারছি না, আপনি খান।

—সে কি ! ভদ্রলোক বিস্মিত হ'লেন, এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল, কিছুই ত খেলেন না ! আপনি একেবারে হোপলেস্ মিস্ সেন।

সুজাতা হাসল। বলল, সত্যিই আমি হোপলেস্ মিঃ দত্ত। আর খেতে পারছি না। কয়েকদিন পেটের গণ্ডগোলে বড্ড ভুগছি।

—এ্যাঁ, বলেন কি ! ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, কই সে কথা ত বলেন নি আমাকে ?

সুজাতা বললে, একি বলবার মত কথা !

—না না, এ ভাল নয়। ভাল নয় মিস্ সেন। আমি খুব 'হেট' করি ও জিনিষটাকে। আশ্চর্য ত ! আপনি এতক্ষণ চেপে আছেন আর আমি মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। চলুন চলুন, আর নয় এবার ওঠা যাক।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আর তক্ষুণি চমকে

উঠলেন, একি, আমার পার্স ? পার্স কোথায় গেল! নিশ্চয়ই প্রশান্তর টেবিলে ফেলে এসেছি। উঃ, কি ভুলো মন দেখেছেন ত? জীবনে কোনদিন আমার এই ভুলটুকু আর শুধরোলো না। হা-ভগবান্!

ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন।

আর সুজাতা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, বেশ ত তাতে আর কি হয়েছে। ভুল কি মানুষের হয় না—ভুল ত মানুষেরই হয়। নিন না, আমার কাছে ত টাকা রয়েছে—কত দেব, পাঁচ?

ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, বাঁচালেন মিস সেন। কিন্তু একটা সর্ত—শুধু শুধু আপনি দয়া দেখাতে পারবেন না, সুদ সমেত আসল নিতে হবে। বলুন, রাজী আছেন?

সুজাতা হাসল, বলল, বেশ ত, নেব। আর তা ছাড়া আমি ত শুধু শুধু দান করতে যাচ্ছিনে। এর পিছনে স্বার্থ রয়েছে যে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, তাই।

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, তবে ত এ দান নিতেই হয়। এতবড় স্বার্থত্যাগ আমিই বা করি কি করে! প্লীজ, এক মিনিট বসুন মিস সেন, বিলটা আমি মিটিয়ে দিয়ে আসি। বলে ভদ্রলোক টাকাটা নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর কতক্ষণ সুজাতা বসেছিল খেয়াল করে নি। বেয়ারা এসে বিলটা এগিয়ে দিতেই চমকে উঠল, এ কি আমাকে কেন?

—আজ্ঞে, তিনিই ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

—আমাকে!

—হ্যাঁ। বললেন আপনার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নিতে।

বিস্ময়ে সুজাতা হতবাক্ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোন কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। আশ্চর্য! আশ্চর্য এই মানুষ নামক জাতটা! পৃথিবীর কি সর্বত্রই মানুষের চক্রান্ত আর শঠতার ফাঁদ পাতা। কোথাও কি মানুষের মুক্তি নেই! কোনদিন কি মানুষের এই প্রবঞ্চনার হাত থেকে রেহাই নেই! আর ভদ্রলোকও সত্যি সত্যিই কি তবে আর আসবেন না? সত্যি সত্যিই কি ভদ্রলোক তাকে ঠকিয়ে গেছেন? তাই যদি হবে তবে আর বসে থাকা কেন! কেনই বা আর অপেক্ষা করা?

সুজাতা আর দাঁড়াল না। আবার একখানা পাঁচ টাকার নোট বেয়ারার হাতে গুঁজে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বুক ভরে বাতাস নিল। আর তখনই তার মনে হ'ল ভদ্রলোক তাকে ফাঁকি দিয়ে গিয়েছেন—ঠকিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার চেয়ে কি বেশী ফাঁকিতে পড়েন নি ভদ্রলোক নিজে! লাভের ঘরে বিরাট্ শূন্য ছাড়া আর কি পেলেন ভদ্রলোক? বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালবাসাকে ভদ্রলোক নিজে হাতে হত্যা করলেন। আর কখনও সে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসাকে ফিরে পাবেন না। সুজাতাও কখনও সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ভদ্রলোক অনেক দূরে সরে গেছেন—আর কখনও সে পথের নিশানা খুঁজে পাবেন না।

স্বীকার-পত্র

রামানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যাটিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় কৃত 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়' জীবনী গ্রন্থ হইতে উহাতে শুধু তথ্যাদিই গ্রহণ করা হয় নাই, অনেকাংশ উদ্ধৃতও করা হইয়াছে—পূর্বে ইহা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। সহকারী হিসাবে এ ভুল আমারই। বিলম্বে হইলেও এ ত্রুটির কথা বলা আবশ্যক।

নিঃ—

শ্রীগৌতম সেন

শারদীয়া প্রবাসী-১৩৭২

(সাধারণ সংখ্যা হতে পৃথক)

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন-

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রামপদ মুখোপাধ্যায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত এ বছর অন্য কোন শারদীয় উপন্যাস লিখছেন না।

চারশত পৃষ্ঠার বিরাট সংকলন

মূল্য তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

॥ উনিশ ॥

চন্দ্রপ্রসাদ ও বসন্ত প্রস্থান করলে অকারণ খুশিতে দুর্গা-ভাইএর মন ভরে উঠল। দু'টি যুবক-যুবতীর লজ্জারুণ ভীতচকিত প্রণয়ের আলো পড়ল দুর্গাভাইএর প্রাচীন চেতনায়। বসন্তকে তিনি বড় ভালবাসেন, তার গার্হস্থ্য জীবনের প্রায় সবটুকু মাধুর্য তাকে নিয়ে। অথচ বসন্তের বিবাহ-চিন্তা এ পর্যন্ত তাঁকে ব্যস্ত ক'রে তোলে নি। মনোরমা কখনও-সখন উত্থাপন করেছেন, কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে নয়, এ জন্য হয়ত সে দুর্গাভাই-তনয়ার বিবাহ, একবার মনস্থির করলে, সহজেই সংঘটিত হবে। অথচ এই নিয়েই দুর্গাভাইএর মনে সংশয় ছিল। মন্ত্রী তিনি যদি কোনও সৎপাত্রের পিতাকে কন্যা-গ্রহণের অনুরোধ করেন, রাজপদ সেক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে? অর্থাৎ, মন্ত্রীত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা কোনও মতেই তিনি বসন্তের জন্য সুপাত্র সন্ধান করতে পারবেন না। অথচ মন্ত্রী এবং নেতাই বর্তমানে তাঁর একমাত্র পরিচয়।

এ সংশয় আজ এই ম্লান অপরাহ্নে বড় সুন্দর ভাবে দূর হয়ে গেল। দুর্গাভাইএর মনে হ'ল চন্দ্রপ্রসাদই বসন্তের উপযুক্ত পাত্র। তার হাসিখুশি কৌতুকদীপ্ত স্বভাবের সঙ্গে বসন্তের নম্রশ্রী সুন্দর মিলবে। চন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য লেখাপড়া বেশি শেখে নি, কিন্তু বুদ্ধি তার প্রখর এবং কথাবার্তায় শিক্ষার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বিমান-বাহিনীতে নিজের চেষ্টায় কমিশন পেয়েছে: ভবিষ্যৎ তার নিশ্চিন্ত। অধিকাংশ মন্ত্রীপুত্রদের মত সে পিতার ঔদার্য ও দুর্বলতা-নির্ভর নয়। এ বিবাহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও পদ্মাদেবীর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানতে পেরে দুর্গাভাই আরও পুলকিত হলেন। একবার খট্ ক'রে মনের মধ্যে সন্দেহ জাগল: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজকের দিনে এক চমৎকার খেলায় তাঁকে পুরোপুরি নিজের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চাইছেন হয়ত। কিন্তু পরক্ষণে সে সন্দেহ দূরীভূত হ'ল যখন ভাবলেন এতে পদ্মাদেবীরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তা ছাড়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে চন্দ্রপ্রসাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে দুর্গাভাই কদাচ তাঁর দ্বারস্থ হবেন না তাতেও তাঁর তৃপ্তি ও আনন্দ কম হ'ল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে খুব ভালই জানেন। অন্যের সঙ্গে দল ও নিজ স্বার্থের জন্য তিনি যাকে সাধ্য যাই করুন, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি দেখিয়ে এসেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। নিন্দুকরা যাই বলুক, আমি জানি উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্য এখনও একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

মনোরমা খুশি হয়ে সহজে এ বিবাহে মত দেবেন না। দুর্গাভাই ভাবলেন বর্তমানে তাঁকে না জানানই শ্রেয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাঁর মন নরম হ'তেও বা পারে। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সেতু তৈরী করবার প্রস্তাব তিনি হয়ত গ্রহণও করতে পারেন। মনোরমার বিরোধিতাকে মোট কথা দুর্গাভাই খুব বড় বাধা মনে করলেন না। বরং তাঁর ভাবতে ভাল লাগল যে বসন্ত মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও পিতার আশীর্বাদ নিয়ে চন্দ্রপ্রসাদের গলায় বরমাল্য দেবে।

রোদ পড়ে এল। গাছের ছায়া নামল সবুজ লনে। দুর্গাভাই সহসা অনেক পাখীর একত্রিত গুঞ্জন শুনতে পেলেন। তাকিয়ে দেখলেন শ্বেত ও রক্ত করবীর গাছ-গুলি ফুলভারে আনত। আকাশ ঘন নীল। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। পৃথিবীকে বড় সুন্দর মনে হ'ল দুর্গাভাই-এর।

গাড়ি ঢুকল ফটক পেরিয়ে। থামল বাংলো-বাড়ীর ডান দিকে দপ্তর ঘরের সামনে। দুর্গাপ্রসাদ দেখলেন, গাড়ী থেকে নামল চেনা-চেনা এক সুবেশ রমণী। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। দূর থেকে দেখে মনে হ'ল সুন্দরী।

চিনতে পারলেন। পশু রাতেই এঁকে দেখেছেন। সরোজিনী সহায়।

বেয়ারা মহিলাকে অপেক্ষা-গৃহে বসাল। দুর্গাভাই মন্দ-পদক্ষেপে দপ্তর ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হ'ল সরোজিনী সহায়কে। যখন বেয়ারা তাকে দুর্গাভাইএর কাছে পৌঁছে দিল, তিনি অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে নমস্কার বিনিময় করলেন। সে সময় অন্য এক গাড়িতে, দুর্গাভাই এর নিজের গাড়ীতে, পত্নী মনোরমা গৃহে ফিরলেন। দুর্গাভাইএর দপ্তর-গৃহের সামনে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে মনোরমা অন্দরে চলে গেলেন।

দুর্গাভাই বললেন, "বসুন। আপনাকে ত আমি চিনি। পশু রাত্রেই আমাদের দেখা হয়েছে। আগেও আপনার কাজকর্মের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল।"

সরোজিনী চেয়ারে বসল। অদূর অতীতের প্রত্যক্ষ অবতারণায় সে অপ্রতিভ হ'ল না। দুর্গাভাই দেখলেন, বসবার ভঙ্গি সহজ ঋজু। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। মৃদু হেসে কথা বলল। দুর্গাভাই দেখলেন, দাঁতগুলি ধবধবে সাদা সুন্দর সমান।

"পশু রাতে আপনাকে দেখলাম প্রজাপতি শেউড়ের বাড়ীতে। কথা কিন্তু বলেন নি আমার সঙ্গে একটিও।"

সামান্য হেসে দুর্গাভাই বললেন, "পশু রাতের বৈঠকে আমি কিছু বলতে যাই নি, কেবলমাত্র শুনতে গিয়েছিলাম।"

"আমি কিন্তু আপনাকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। দু'ঘণ্টা আমাদের কথাবার্তা চলেছিল। আপনি একটি শব্দ উচ্চারণ না করে কেবল শুনে যাচ্ছিলেন। আপনার চরিত্রের আত্ম-দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম।"

"চুপ ক'রে থাকা যদি চারিত্রিক দৃঢ়তা হয় তা হ'লে তা আমার আছে। গান্ধীজি সপ্তাহে এক দিন একটি কথাও বলতেন না। গান্ধীর চেলাদের মধ্যেও অনেকে মৌন অভ্যাস করতেন।"

"আমরা ত অত্যন্ত শব্দপ্রিয় জাত—চেঁচামেচি, হৈ-হৈ, হট্টগোল আমাদের জীবনের অঙ্গ। এর মধ্যে নীরবতা যেন হঠাৎ ছন্দ-পতন।"

"শুনেছি আপনি ভারতবর্ষের একজন উদীয়মান ট্রেড য়ুনিয়ন নেত্রী। উদয়াচলের দলীয় রাজনীতিতে আমার দখল ও জ্ঞান সামান্য। মন্ত্রীত্ব ক'রে বাড়তি সময় আমি একেবারে পাই নে, পেলেও তাতে রাজনীতি করি নে। অতএব, এ প্রদেশে আপনাদের নবীন-নবীনাদের কার্যকলাপের খবর আমি তেমন রাখি নে। এ খবর যিনি সবচেয়ে বেশি রাখেন তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। পশু সুদর্শন দুবের একান্ত অনুরোধে তার দলের 'শীর্ষ-বৈঠকে' আমি হাজির হয়েছিলাম; ওখানে আপনাকে দেখে কম বিস্মিত হই নি। কারণটা বলছি। সুদর্শন বলেছিল, আমি তাদের 'শীর্ষ-বৈঠকে' হাজির থেকে কেন তারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পুনঃনির্বাচনের বিরুদ্ধে শুধু সেটুকু যেন নীরবে শ্রবণ করি। কোনও মতামত দেবার ইচ্ছে না থাকলে যেন না দি। সুদর্শন, প্রজাপতি শেউড়ে এবং হরিশংকরজিকে একসঙ্গে দেখব, আমি জানতাম। এরাই হ'ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধ দলের 'মাথা'। কিন্তু এদের সঙ্গে আপনার মত একটি অপরিচিতা তরুণীকে দেখতে পাব তার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এত কথা এ জন্য বলছি যে, উদয়াচলের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আপনার ভূমিকা আমি একেবারে বুঝতে পারছি না।"

"আপনার বিস্ময় অকারণ নয়," সরোজিনী নম্র হাসির সঙ্গে বলল, "সত্যিই পশু রাত্রির বৈঠকে আমার উপস্থিতি বেমানান ছিল। আমি তা উল্লেখও করেছিলাম। তবু দোষ বোধ করি বেশিটা আমারই। আপনার কথা অনেক শুনেছি, অথচ আপনাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখি নি, পরিচয়েরও সুযোগ হয় নি। দুবেজির বাড়ীতে আপনি আসছেন শুনে লোভ চাপতে পারি নি। এটাই অবশ্য একমাত্র কারণ নয়।"

"অন্য কারণটাও বলুন।"

"অনেক বছর আগে হরিশংকর ত্রিপাঠিজির কাছে আমি ট্রেড য়ুনিয়নে কাজ করবার প্রথম সুযোগ পাই।

বলতে গেলে তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু। উদয়াচলের জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসে আমি অনেক দিন কাজ ক'রে আসছি। ত্রিপাঠিজির সহকর্মী হিসেবেই সুদর্শন দুবেজি এবং প্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বর্তমানে, আপনি হয়ত জানেন না, আমি উদয়াচল জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। তা ছাড়া, প্রাদেশিক কংগ্রেসের শ্রমিক বিভাগের দায়িত্বও আমার।"

"আপনার সম্বন্ধে এসব খবর এখন আমার জানা।"

"আমরা কিছুদিন ধরে দেখে আসছি, কংগ্রেসী শাসননীতি ক্রমাগতই ধনীশ্রেণীর অনুকূল হয়ে আসছে ; দেশের দরিদ্র জনসাধারণ দেশকল্যাণের যোগ্য ভাগ পাচ্ছে না।—"

"আপনারা কারা ?"

"আমরা যারা ট্রেড য়ুনিয়ন বা কৃষাণ সভার কাজ করি, অথচ কংগ্রেসের বাইরে নেই।"

"হুঁম্। বলুন।"

"ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে সরকারী ভূমিকা যেমন গভীর, তেমন ব্যাপক। সরকার কেবল শাসন করে না, তার আসল কাজ গঠন। শিল্পায়নে তার ভূমিকা মুখ্য। কৃষির উন্নতিতেও। অর্থাৎ কি গ্রামে, কি সহরে, সরকারী উদ্যোগে বেশির ভাগ গঠনমূলক কাজ চলছে। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আছে, সমাজবাদী আদর্শ আছে। অথচ কাজের বেলা দেখছি, ধনীদের ধন বাড়ছে, দরিদ্রের দারিদ্র্য। গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার সিংহ-ভাগ পাচ্ছে ধনী চাষী বা গা-ঢাকা জমিদার ; তাদের বাড়ীতে বিজলী এসেছে, ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, সেচের জল। এমন কি রাস্তা, স্কুল, ডিসপেনসারী স্থাপনের সময়ও তাদের সুবিধে আমরা সর্বাগ্রে দেখছি। অথচ জমিহীন ভাগচাষীর অবস্থা দরিদ্র হ'তে দরিদ্রতর হচ্ছে ; ক্রমাগত সে গ্রাম ছেড়ে সহরে এসে নোংরা রোগময় বস্তিতে 'নতুন জীবন গঠন করছে। সচরাচর শুনতে পাই, কারখানার মজদুরদের অবস্থা ভাল হয়েছে। কিছু হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে তুলনায় শিল্পপতিদের ত সোনায় সোহাগা। তারা যে যা তৈরী করছে, যে-কোনও দামে দেশের লোক তা কিনতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রের নামে আমরা এক বিরাট ধনিক-ও-সামন্ততন্ত্র গ'ড়ে তুলছি।"

দুর্গাভাই বেশ একটু প্রভাবিত হয়েই সরোজিনী সহায়ের কথা শুনছিলেন। মেয়েটির বলার ভঙ্গিতে আত্ম-প্রত্যয় আছে, শব্দ পরিষ্কার, উচ্চারণ আভিজাত। কণ্ঠস্বরে এমন একটি আন্তরিকতার ব্যঞ্জনা যা সহজে হৃদয় স্পর্শ করে।

"আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। তবু, বলুন আমি শুনছি।"

"তাই কিছুদিন, এই বছর দুই, আগে কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক ও চাষীদের নিয়ে যাদের কাজ তাদের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন, কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তব রূপায়ণের জন্য আরও অনেক বেশি তৎপর হ'তে হবে। পার্লামেন্টে এবং প্রাদেশিক বিধান সভায় পার্টির মধ্যে 'আরও-বেশি-সমাজবাদ-চাই' দল গঠন করা হবে। উদয়াচলেও গত বছর এমন একটি দল গঠিত হয়।"

"শুনেছি। তার নাম 'জিঞ্জর গ্রুপ'। অশোক আপ্তে বলে একটি তরুণ তার নেতা বলে জানি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের দল নেহাৎ ছোট নয়। দশজন আমাদের গ্রুপের সভ্য। সহানুভূতিশীল আরও অনেকে।"

"বর্তমান মন্ত্রীত্ব সঙ্কটে আপনারা কোশল-বিরোধী।"

"হ্যাঁ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক অভিযোগ। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দাম্ভিক, অহংকারী, অত্যন্ত বর্ণ-সচেতন। আমাদের মানুষ বলেই মনে করেন না। অশোক আপ্তেকে বিধান সভায় এবং পার্টি মিটিংএ বার বার অপদস্থ করেছেন তিনি কেবল গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে। বর্তমান সঙ্কটে আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করতে রাজী নই। তিনি জমিদার ও মালিকদের মিত্র ; তাঁর নেতৃত্বে উদয়াচলে সমাজ-তন্ত্রের গোড়াপত্তন কিছুতেই হ'তে পারে না। তা ছাড়া, তিনি কংগ্রেসের প্রাচীন রোগগুলি সব বাঁচিয়ে

রেখে—ধরুন, জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী—নিজের নেতৃত্ব পাকা করেছেন।"

"আপনার ধারণা সুদর্শন দুবে বা হরিশংকর ত্রিপাঠি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে যোগ্য লোক?"

"মার্জনা করবেন, রাজনীতিতে নেতা-নির্বাচনের পথ সর্বদা এক নয়। যখন এমন কোনও নেতা থাকেন যাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক, যিনি স্রষ্টা, যাঁর যাদু-নেতৃত্বে দেশ জাগে, মানুষের চিত্ত প্লাবিত হয়: স্ফুরিত হয়ে ওঠে লক্ষ লোকের সৃজনী প্রতিভা: তখন নেতা নির্বাচনের কাজ সহজ। কিন্তু কোনও দেশেই এমন নেতা বেশী দিন থাকেন না। তাঁরা ক্ষণজন্মা। বেশির ভাগ সময় রাজনৈতিক নেতারা, দেখতে পাওয়া যায়, অতি সাধারণ মানুষ—দশজনেরই একজন। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় এঁদেরই একজন হঠাৎ নেতা হয়ে ওঠেন। সেক্সপীয়র বলেছেন—কেউ কেউ জন্ম হ'তেই বড়, কেউ বা কষ্ট ক'রে বড়, —আবার কেউ বা জোর ক'রে বড়। উদয়াচলে একজন বাদে সব নেতারাই হয় কষ্ট ক'রে নয়তো জোর ক'রে নেতা।"

নীরব দুর্গাভাই-এর চোখে চোখ রেখে সরোজিনী সহায় অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলল:

"সে একজন, আপনি।"

দুর্গাভাই প্রতিবাদ করতে চাইলেন। কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

সরোজিনী সহায় বলল, "কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নেতা হবার কোনও যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ এমন কিছু নেই যা আরও দুচার পাঁচজনের না আছে। আপনি তাঁর অতীত জানেন। ইংরেজের তাঁবেদারী ক'রে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু। তারপর কংগ্রেসে ঢুকে তিনি এ পর্যন্ত ভাগ্যবান! উদয়াচলের নেতৃত্ব ছিল আপনার—এখনও রয়েছে। আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে বহু দিন আগে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতন হ'ত। আপনি জানেন না, কি ভয়ঙ্কর বিষে-বিষক্ষয় নীতির প্রয়োগে তিনি নিজের নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন। আজ উদয়াচলের কংগ্রেস দল, উপদল, অনু-দলে জর্জরিত। জিলায় জিলায় ঝগড়া, গ্রামে গ্রামে কলহ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সরাতে না পারলে এ বিষ কংগ্রেসকে একদিন ধ্বংস করবে।"

দুর্গাভাই বললেন, "এ ব্যাধির দায়িত্ব একা কোশলজির নয়।"

"মানছি। অন্যদের দোষ আমি ছোট ক'রে দেখছি না। আপনি বলছিলেন, সুদর্শন দুবে বা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি কোশলজির চেয়ে ভালো লোক কি না। হয়ত, না। কিন্তু এঁদের কাউকে উদয়াচলের নেতৃত্বে আমরা বরণ করতে চাই নে। আমরা চাই আপনাকে।"

"আমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! আমরা জানি আপনি নেতৃত্ব চান না; দলীয় রাজনীতির নোংরা ঘাঁটায় আপনার আপত্তি। কিন্তু আপনার নিজের চাওয়া না চাওয়া, পছন্দ-অপছন্দের ওপরেও কিছু আছে! তার নাম, জনস্বার্থ। উদয়াচলের ও ভারতবর্ষের স্বার্থ। আমরা জানি আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আপনি সমদৃষ্টি নন। তবু আমরা বিশ্বাস রাখি আপনার আদর্শ ও পথের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম সংখ্যার আদর্শ ও পথ মিলে যাবে। আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী পেলে আমরা উদয়াচলে কংগ্রেসের সংগঠন বিপুল উৎসাহে গ'ড়ে তুলব। আপনার নেতৃত্বের পেছনে এসে দাঁড়াবে চাষী, মজদুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছাত্র-ছাত্রী, সব। এক নতুন চেতনা এসে যাবে উদয়াচলে, নতুন গণজাগরণ; একদিন তা ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ভারতবর্ষে।"

শুনতে ভাল লাগছিল দুর্গাভাই-এর।

"ভেবে দেখুন, দুর্গাভাইজি। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংগ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেছি। দেশের বিরাট জনশক্তিকে আমরা আর সম্পদ ভাবি নে, ভয় পাই। তাদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি; রেখে, উপকার করতে চাইছি, কাছে টেনে এনে সমান আসন দি নি। শাসক ও শাসিতের মধ্যে আজ যে দূরত্ব বোধ করি ইংরেজ আমলেও তা ছিল না। যদি আপনি আমাদের নেতৃত্ব করেন, কংগ্রেসের পতাকাতলে আমরা সবাইকে সমান সম্মানে সমবেত করব। দেশকে স্বাধীন করবার সময় যে জন-জাগরণ হয়েছিল, দেশ-গঠনেও তেমনি জাগরণ দেখতে পাবেন।"

দুর্গাভাই কিছু বলতে যাবেন, টেলিফোন বাজল।

অন্য প্রান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৌশল। তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা।

"দুর্গাভাইজি, শুনতে পেলাম আপনার তবিয়ত ঠিক নেই?"

"তেমন কিছু নয়। একটু ক্লান্তি বোধ করছি।"

"করবেনই ত। সব দায়িত্বই ত আপনার ওপর। ডাক্তার দেখে গেছেন?"

"না। ডাক্তারের দরকার নেই।"

"দরকার অবশ্য আছে। চন্দ্রপ্রসাদ সিভিল সার্জেনকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে আসবে।"

"আশ্চর্য লোক আপনি! আজকের দিনেও এত সব দিকে আপনার নজর থাকছে কি করে?"

"আপনার স্বাস্থ্য 'এত সব দিক' নয় দুর্গাভাইজি। আমি বর্তমানে দলীয় রাজনীতির গভীর পঙ্কে ডুবে আছি। এ এক বিচিত্র বাজার। এখানকার বেচা-কেনার নিয়মও বিচিত্র। একের পর এক নেতারা আসছেন। কখনও বা দলে, দলে। কত তাঁদের নালিশ, অভিযোগ, দাবী। অবশ্য, বৈচিত্র আসলে খুব নেই। দাবীগুলি সবই প্রায় এক বা দু' রকমের।"

"বলবেন না। আমার শুনে কাজ নেই।"

"না। বলব না। এরই এক ফাঁকে চন্দ্রপ্রসাদ এসে দ্বারপথে উদিত হ'লেন। মুখখানা খুব হাসি-খুশি। দেখে আমার হঠাৎ জয়দেবের একটি শ্লোক মনে পড়ল: 'স্ফুরদতিমুক্তলতা পরিরম্ভণপুলকিত মুকুলিতচুতে।' পুলকে মুকুলিত সহকার তরু বসন্ত আবির্ভাবে। মনে হ'ল, কিছু একটা দিগ্বিজয় ক'রে এসেছেন রাজকুমার। কিন্তু খবর যা দিল তা ত একেবারে অন্য রকম। বলল, আপনার মাথা ঘুরছিল, বাইরে লনে চুপ ক'রে বসেছিলেন!"

"সেরে গেছে। তবু, ডাক্তার বলিরামকে আসতে বলে আপনি বোধ হয় ভালই করেছেন। আমার ধন্যবাদ জানবেন।"

"এখন কাজকর্ম ছাড়ুন। গিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

"কাজকর্ম কিছু করছি না। একটু কথাবার্তা বলছি।"

"'ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু।—'"

"বুঝলাম না কোশলজি। আপনার মত আমি সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই।"

"কিছু না, দুর্গাভাইজি। রসিকজন, রসিকমন না হ'লে রাজনীতি করা অসম্ভব। আপনি কার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন আমি জানি।"

"আপনাকে তা আমি বলেছি টেলিফোনে।"

"তাইত জানতে পেরেছি।"

"ডাক্তার কখন আসবেন?"

"একটু পরেই, আশা করছি।"

"আচ্ছা। ধন্যবাদ।"

সরোজিনী সহায় অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি জানতাম না, আপনি অসুস্থ।"

"এমন কিছু নয়। একটু ক্লান্ত লাগছিল।"

"আমি তা হ'লে আর বেশি সময় নেব না। ডাক্তারও তো এসে যাবেন।"

"আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছিল," দুর্গাভাইএর কণ্ঠ দুর্বল শোনাল।

"কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"কারণ খুব সহজ। আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে হারিয়ে যদি আমি মুখ্যমন্ত্রী হই, তা হ'লে আমি হব কংগ্রেসের অন্যতম দলপতি। অর্থাৎ, কাল একটি বা একাধিক বিশেষ দল এবং কতিপয় বিশেষ মানুষের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করতে হবে। তাতে আমি রাজী নই।"

সরোজিনী সহায় কিছু বলতে গেল।

দুর্গাভাই তাকে নিরস্ত ক'রে উত্তেজিত স্বরে বলে চললেন, "প্রদেশের সব মানুষকে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত ক'রে দেশগঠন করতে পারলে ভালোই হ'ত কিন্তু ভারতবর্ষ গণতন্ত্র—এখানে বহু দলের রাজনীতি চলছে। কংগ্রেস ত কোন দিনই সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল নয়; আজও সে বহু স্বার্থের মিলিত প্লাটফর্ম। রাজনীতি যে ধারায় প্রবাহিত তার পরিবর্তন আজ আর সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী হ'তে চাইলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই আমায় আসন ছেড়ে দেবেন। আপনি হাসছেন? কিন্তু তাঁকে আপনার চেয়ে আমি বেশি চিনি। মুখ্যমন্ত্রীত্বে

সত্যিকারের আমার অধিকার নেই। আজ পাঁচ বছরের বেশি এ গুরুদায়িত্ব তিনি পালন ক'রে এসেছেন; সহকর্মী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। তিনি যা কিছু করেছেন সব আমি সমর্থন করি নে; সব মানুষের মত তাঁরও দুর্বলতা আছে; কিন্তু আজ যাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, মানুষ হিসেবে, নেতা হিসেবে, তিনি তাঁদের চেয়ে শ্রেয়। আজ যদি তাঁকে সরিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী হ'য়ে বসি, লোকে বলবে বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতা ও সম্মানের লোভই এ কাজ আমায় করিয়েছে। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের চেয়ে সফল মুখ্যমন্ত্রী আমি হ'তে পারবো কি না সন্দেহ, কারণ রাজনীতির নোংরা আমি ঘাঁটতে জানি নে, বার বার আমার পরাজয় হবে, পতন হবে, স্খলন হবে।"

"একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি?"

"কি কথা?"

"আজ যদি হরিশংকর ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রী হন, তাঁকে সর্বদা আপনার ইচ্ছেমত চলতে হবে। অর্থাৎ, আপনি অনায়াসে তাঁর পথ নির্দেশ করতে পারবেন।"

"কি ক'রে?

"তিনি জানবেন, আপনার সমর্থন ছাড়া তাঁর মুখ্য-মন্ত্রীত্ব একদিনও টিঁকবে না। সুতরাং আপনি যে পথে চালাবেন, তাঁকে সে-পথে চলতে হবে।"

দুর্গাভাই একবার ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন।

সরোজিনী সহায় বলল, "আমি জানি, তিনি আপনার নির্দেশমত চলতে এবং মন্ত্রীত্ব চালাতে সম্পূর্ণ তৈরী। কারণ তিনি জানেন আপনার পথ, জনকল্যাণের পথ।"

দুর্গাভাই এবার যেন অনেক দূর থেকে কথা বললেন:

"আপনি আমায় জানেন না। আমি রাজা হ'তে চাই নে। রাজা বানাতেও চাই নে। এবার আপনি আসতে পারেন। নমস্তে।"

॥ কুড়ি ॥

সূর্যপ্রসাদ বলেছিল, উদয়াচলে বর্তমান রাজনৈতিক নাটকের একমাত্র নায়িকা সরোজিনী সহায়।

সূর্যপ্রসাদের অনেক উক্তির মত এটাও আংশিক সত্য। সরোজিনী সহায়ের ভূমিকা নাট্যমঞ্চের ওপর, পাদ-প্রদীপের ঝলসান আলোর সামনে, দর্শকের মুখোমুখি। পদ্মাদেবী এবং মনোরমার ভূমিকা নেপথ্যে।

উদয়াচলের বিধান সভায় মহিলা সদস্য সর্বসমেত ছয় জন। এঁদের দু'জন বিরোধী দলের, চারজন কংগ্রেসের। এঁদের কারুরই রাজনৈতিক মূল্য বেশি নয়। বস্তুত পক্ষে হাই কমাণ্ডের নীতি—যথাসম্ভব বেশি মহিলাদের বিধান সভায় আসন দেওয়া—পালন করবার জন্যেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দুর্গাভাই চারজন স্ত্রীলোককে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলেন। এঁদের কাউকে মন্ত্রী-সভায় স্থান দেবার প্রশ্ন ওঠে নি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাঝে মাঝে কৌতুক ক'রে বলতেন, "উদয়াচলের মন্ত্রীদের চরিত্র শুদ্ধ হ'তে বাধ্য। এমন পুরুষ-প্রধান বিধান সভা ও সর্ব-পুরুষ মন্ত্রীসভা সারা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।"

সুতরাং কয়েক বছর আগে, ট্রেড য়ুনিয়নের শাখা-পথ ধ'রে উদয়াচলের কংগ্রেসী রাজনীতিতে সরোজিনী সহায়ের আবির্ভাব বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

সে যে কি ভাবে বিলাসপুরে উপস্থিত হয়ে নিজের আসন তৈরী ক'রে নিল কেউ ঠিক বলতে পারে না। তবে এটুকু সবাই জানে যে তাকে বিলাসপুরে আনবার মূলে তৎকালীন শ্রম-মন্ত্রী হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি।

হরিশঙ্কর উদয়াচলের জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। শ্রমিকদের উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্কুলের দায়িত্ব বহন করতে নিয়ে এলেন সরোজিনী সহায়কে আহমেদাবাদ থেকে। সরোজিনী তখন এম. এ. পাশ ক'রে দু'বছর বিদেশে ট্রেড য়ুনিয়ন সংগঠন ও পরিচালনা শিখে সবে মাত্র দেশে ফিরেছেন।

শ্রমিকদের বিদ্যালয় সরোজিনীর নেতৃত্বে উত্তরোত্তর সজীব হয়ে উঠল। সুরু হয়েছিল বিশ-পঁচিশ জন নিয়ে: এক বছরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেল। স্কুলের জন্য আলাদা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হ'ল, আরও দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত হ'লেন। বিদেশীরা স্কুল দেখে প্রশংসা

করতে লাগলেন। দিল্লীর নেতাদের দু-একজনও সাধুবাদ দিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদিন শ্রম-মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ত্রিপাঠিজি, আপনারা নাকি শ্রমিকদের জন্যে একটি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন?"

"শ্রম-বিভাগ করে নি। আই. এন. টি. ইউ. সি-র স্কুল।"

"ও। সরকারী কোনও অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না?"

"সামান্য। শ্রম-বিভাগের শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ড থেকে বছরে মাত্র দশ হাজার টাকা।"

"শিক্ষা-বিভাগ কিছু দিচ্ছে না?"

"সামাজিক শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ টাকা থেকে স্কুলকে শিক্ষামন্ত্রী দশ হাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।"

"বেশ, বেশ। স্কুলটির বেশ সুখ্যাতি শুনতে পাই।"

"চলছে ভালই।"

"কি শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রমিকদের?"

"ট্রেড য়ুনিয়ন কি ভাবে গঠন করা উচিত, কি ভাবে ভাল ক'রে চালান যায়, শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে কেমন ক'রে নিজেদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে; বাড়ী-ঘর সাফ রাখা, স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চলা, সন্তানদের সুন্দর ভাবে মানুষ করা—এসব শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।"

"খুব ভাল। স্কুলটি চালায় কে?"

"ম্যানেজিং কমিটি আছে। তার অধিকাংশ সদস্যই শ্রমিক। মালিকদের দু'জন প্রতিনিধি আছে, দু'জন আই. এন. টি. ইউ. সি-র, একজন শ্রম-দপ্তরের।"

"খুব সুন্দর ব্যবস্থা।"

"মালিকরা স্কুলের জন্য একটি বাড়ী দিয়েছেন। তা ছাড়া বছরে আড়াই হাজার টাকাও দিচ্ছেন।"

"বাঃ। পড়াশোনার দায়িত্বও বুঝি ম্যানেজিং কমিটির?"

"শিক্ষকদের।"

"শিক্ষক ক'জন?"

"ঠিক জানি নে। তবে তিন-চারজন হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন হরিশঙ্কর বহু যত্নে সরোজিনী সহায় নামটি পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন। সরোজিনীর খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন। এবার তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেল।

কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সরোজিনী সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য পেয়ে গেলেন। উত্তর প্রদেশ নিবাসী স্থানেশ্বর সহায় আহ্‌মেদাবাদ কাপড়ের কলে মাঝারি ধরনের কাজ করে। তার তৃতীয়া কন্যা এবং পঞ্চম সন্তান সরোজিনী। স্থানেশ্বরের সঙ্গে হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির বহুকালের পরিচয়। সরোজিনী কলেজে পড়ার সময় একটি সহপাঠী ক্রিশ্চান ছেলেকে বিবাহ করে। এজন্য তাকে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। দু'বছর পর তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদের কারণ রিপোর্টে স্পষ্ট পেলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সরোজিনী তার পর এম. এ. পাশ করল এক মিশনারী সাহেবের সাহায্যে। তিনিই তাকে বৃত্তি পাইয়ে বিদেশে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বিদেশে ট্রেড য়ুনিয়ন সম্বন্ধে পড়াশোনা করল, হাতে-কলমে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজও। দেশে ফিরে এসে চাকরির সন্ধান করছিল এমন সময় বোম্বাইএ হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির সঙ্গে সাক্ষাৎ। এবং তার পর বিলাসপুরে শ্রমিক-কল্যাণ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হয়ে আগমন।

রিপোর্টের সঙ্গে একখানা ফটো ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখলেন, সরোজিনী সহায় সুন্দরী এবং তরুণী।

তার অতীত বা বর্তমানে এমন কিছু পেলেন না যাতে তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার মনে হ'ল। তবু হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির ব্যবহারে আশ্চর্য হওয়াটা ফুরিয়ে গেল না। মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন কেন ত্রিপাঠিজি? একটা ব্যাখ্যাও তাঁর মনে এল। পরিণত বয়সে হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির অন্তরে নতুন রং লেগে থাকবে। এ সব ব্যাপারে মাথা গলাবার বা ঘামাবার লোক নন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

একদিন খবর পেলেন সরোজিনী সহায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সভ্য মনোনীত হয়েছে।

এ-ও এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার নয়। তখন সুদর্শন দুবে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। শ্রমিক-দের প্রতিনিধি হিসেবে সরোজিনী সহায়কে কার্যকরী সমিতির সভ্য মনোনয়ন করা তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্পর্ক শীতল। কে একজন নতুন ব্যক্তি এসে সুদর্শন দুবের দল ভারী করল তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ চিন্তিত হ'লেন না।

কিন্তু চিন্তার কারণ ঘটল শীঘ্রই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লক্ষ্য করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে একটি 'বামপন্থী' দল তৈরী হতে চলেছে। এদের কথাবার্তায় প্রথমে তিনি কান দিতেন না। কিন্তু দেখতে পেলেন এদের সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এরা তাঁকে জমিদার ও শিল্পপতিদের বন্ধু ব'লে নিন্দা করছে, সরকারী পরিসংখ্যান দিয়ে 'প্রমাণ' করছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সচেতন এবং সক্রিয় ভাবে সমাজতন্ত্রের বদলে উদয়াচলে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র গ'ড়ে তুলছেন। তিনি, অতএব, কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধে চলছেন; তাঁর নীতি ও কর্মপন্থার সংশোধন প্রয়োজন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারলেন, এই বামপন্থী উপদলটির আসল প্রেরণা সরোজিনী সহায়।

প্রথম প্রথম তেমন গায়ে মানলেন না। বিধান সভার কয়েকটি তরুণ কংগ্রেসী সদস্যদের নিয়ে 'বামপন্থী' উপদল। জিঙ্গুর গ্রুপ। এঁরা অর্থনৈতিক, শিল্প-প্রসার ও কৃষি বিষয়ে মাঝে মধ্যে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে। বিবৃতি প'ড়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৌতুক লাগত। অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ, যার মানে পর্যন্ত তিনি জানেন না। কে লিখে দেয় এ সব বিবৃতি? সরোজিনী সহায়? তা হ'লে ত মেয়েটি সত্যিকারের শিক্ষিতা?

প্রথম প্রমাদ গণলেন এই 'বামপন্থী' দলের সঙ্গে সুদর্শন দুবে ও হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির যোগাযোগ জানতে পেরে। বুঝতে পারলেন, এ বিষবৃক্ষ শিশুকালেই উৎপাটিত করতে হবে।

এই সময় সুদর্শন দুবে সরোজিনী সহায়ের প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত। একদিকে সুদর্শন দুবে ও অন্য দিকে হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি: এই দুই অতিকায় পুরুষের সাহায্যে উদয়াচল কংগ্রেসে সরোজিনী সহায়ের প্রাধান্য দ্রুত বাড়াবার উপক্রম। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারলেন সরোজিনীকে সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত করাবার চেষ্টায় রত হয়েছেন সুদর্শন দুবে। সাহায্য করছেন হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি।

এতদিন নিষ্ক্রিয় থাকবার পর এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৌশল কলকাঠি নাড়লেন।

কয়েকদিনের মধ্যে সুদর্শন দুবে এবং সরোজিনী সহায়কে নিয়ে মুখরোচক কাহিনী জমে উঠল বিলাসপুরে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করলেন, দু'জন মন্ত্রী সরোজিনী সহায়কে বিদেশ সফরের জন্যে এক বছর আগে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। একজন হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি, অন্য জন মহেন্দ্র বাজপাঈ।

কাগজপত্র তিনি একদিন দুর্গাভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েক দিন পরে দু'জনে কথাবার্তা হ'ল।

দুর্গাভাই বললেন, "মেয়েটিকে আপনি জানেন?"

"না। দেখি নি কখনও। শুনেছি, বেশ সুশ্রী।"

"অর্থ সাহায্যের ব্যাপারটা এমনিতে খুব গুরুতর নয়। অর্থ-বিভাগের সম্মতি নিলে একেবারে নির্দোষ হ'ত।"

"তা ঠিক। কিন্তু কাগজে কাগজে এ নিয়ে কি সব লেখা হচ্ছে দেখছেন ত?"

"মন্ত্রীদের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা অত্যন্ত অন্যায়।"

"দুর্গাভাইজি, আপনার মত শুচিশুদ্ধ মানুষ সবাই নয়, হ'তে পারেও না। আমি মানুষের দুর্বলতা মার্জনা করতে রাজী। তবে, এ সব বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়।"

"হুঁম। হয়ত কিছুই ঘটে নি। তবু মন্ত্রীদের, আমার মতে, সীজর-পত্নী হওয়া দরকার। সব সন্দেহের বাইরে। কংগ্রেস-শাসন নিয়ে স্ত্রীঘটিত কেচ্ছা রটলে আমার সহ্য হবে না।"

"আমিও তাই বলি।" একমত হ'লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "সরোজিনী সহায়কে বিলাসপুর এবং উদয়াচল থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেই সব চুকে যায়। সুদর্শন দুবের

কথা বলছি নে। হরিশঙ্কর ত্রিপাঠিকে আমি বিশ্বাস করি না। ট্রেড য়ুনিয়ন কর্মী হিসেবে সে ত অন্য প্রদেশেও কাজ করতে পারে।"

এর কিছুদিন পরে কংগ্রেস সভাপতি বিলাসপুর এলে দুর্গাভাই তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন।

মাস তিনেক পরে সরোজিনী সহায় বৃহত্তর শ্রমিক কল্যাণ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে কানপুর বদলী হ'ল।

সে যে কবে, কোন্ পথে বিলাসপুরে ফিরে এল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা জানতে পারেন নি। মন্ত্রীসভা নিয়ে গোলমাল চলছিল অনেক দিন, ছোটখাট বিষয়ে মন দিতে পারছিলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তথাপি একদিন খবর পেয়ে বিস্মিত হ'লেন যে, 'জিগুর গ্রুপে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সভায় সভানেত্রী হবে ট্রেড-য়ুনিয়ন নেত্রী সরোজিনী সহায়।

তার মাস ছয়েক পরে খবরের কাগজে দেখলেন উদয়াচলের আই. এন. টি. ইউ. সি-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে সরোজিনী সহায়।

॥ একুশ ॥

উপদলপতিদের শেষজন যখন বিদায় নিলেন তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সূর্য অস্তগামী। পশ্চিমের আকাশ সূর্যের শেষ আভায় বিষণ্ণ-রক্তিম। সন্ধ্যার প্রথম কৃষ্ণ ছায়া দূরতম দিগন্তে নেমে এসেছে। গভীর নীল আকাশ দ্রুত পট বদলিয়ে কালো হয়ে উঠছে; ভীতচকিত পাখী প্রাণপণে ছুটছে নীড়ের আশ্রয়ে। ধ্রুবতারা জেগে উঠেছে উত্তর দিগন্তে। প্রতি মুহূর্তে নতুন তারা অন্ধকারের আলোয় আত্মপ্রকাশ করছে।

দীনদয়াল পাথরের গ্লাসে দই-এর সরবৎ নিয়ে হাজির হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "তিওয়ারীকে ডেকে দে।"

দীনদয়াল প্রশ্ন করল "হাঁটতে যাবেন না?"

"যাব।"

"সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

"উঠছি।"

"মা আপনাকে একবার অন্দরে যেতে বলেছেন।"

"কেন?"

"তা ত বলেন নি।"

"আচ্ছা। তুই যা। তিওয়ারীকে ডেকে দে।"

একটু পরে তিওয়ারী হাজির হ'ল।

"আমি একটু পায়চারি ক'রে আসছি। বড় ক্লান্ত লাগছে। তেষ্টাও পাচ্ছে খুব।"

তেওয়ারী নীচু গলায় বলল, "আচ্ছা।"

"চ্যাটার্জি এলে বসতে বোলো। একটু দেরি হ'তে পারে আমার।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দপ্তরঘরে তখনও কর্মচারীরা কাজ করছে। সবাই তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বড় বড় পা ফেলে তিনি দপ্তর-বাড়ী ত্যাগ ক'রে খাস-মহলের দিকে অগ্রসর হ'লেন। দীনদয়াল বাড়ীর মধ্য থেকে খদ্দরের চাদর এবং বেতের ছড়ি নিয়ে মাঝপথে তাঁর হাতে তুলে দিল। খাসমহল ডানদিকে রেখে মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বিরাট্ লনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হাঁটতে গেলেন। অন্যান্য দিন এ সময় সচরাচর তাঁর দু-চারজন সঙ্গী থাকে। হয় কোনও মন্ত্রী, নয় কোনও রাজনৈতিক নেতা, নয়ত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কয়েকজন। মাঝে-মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একাই পায়চারি করতে চান। বিশেষত যখন তাঁর মন কোনও কিছুতে বিশেষ আবিষ্ট থাকে। কিংবা যখন একাকী ভ্রমণের নির্জন আনন্দটুকু লোভনীয় মনে হয়।

আজও তিনি যখন বাগানের দিকে অগ্রসর হ'লেন, বারান্দায় চার-পাঁচজন সাক্ষাৎপ্রার্থী সমবেত হয়েছিল। তিয়ওারী এদের জানিয়ে দিয়েছিল কোশলজির আজ সময় হবে না কথা বলার; তথাপি এরা বিদায় নেয় নি। সাধারণ মানুষ এরা, এসেছে অনেক দূর থেকে; আশা নিয়ে এসেছে কোশলজি এদের আর্জি শুনবেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এদের ছোটখাট ভিড় হয়। দশজনের বেশী প্রহরী অন্দরে ঢুকতে দেয় না। যারা আগে আসে তারাই ঢুকতে পারে। দশম জনের প্রবেশের পর ফাটক

বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। রাস্তায় বাকীরা ভীড় জমাতে পারে না। ফিরে যায়।

প্রায় প্রতিদিনই সান্ধ্য পায়চারিতে বার হবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এদের মধ্যে এসে দাঁড়ান। একজন সেক্রেটারী তাঁর পাশে দাঁড়ায় নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে। দর্শনপ্রার্থীরা হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রত্যেকের দু'হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে করমর্দন করেন। তারপর একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন। এক এক জনের সঙ্গে কথা বলার পর সেক্রেটারীকে নির্দেশ লিখে দেন।

"সীতাপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট। লোচন সিং, গ্রাম সোনাচর, পেশা ক্ষেতমজুর। খাজনা না দিতে পারায় পুলিশ ওর বাড়ী ক্রোক করবে বলে ভয় দেখিয়েছে। এক বছরের খাজনা এর মার্জনা করা হোক। তিন মাস সময় দেওয়া হোক খাজনা দেবার।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলেন, "এ আমার একমাত্র সামন্ততান্ত্রিক বিলাসিতা। দূর দূর গ্রাম-সহর থেকে প্রতিদিন যারা আমার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এ বাড়ীর দরজায় হাজির হয়, তাদের আবেদন, সম্ভব হ'লে, আমি মঞ্জুর করি। কাউকে একেবারে ব্যর্থ-মনোরথ ক'রে ফিরিয়ে দিতে আমার দুঃখ হয়। আমি জানি, যারা এখানে এসে জড় হয় না, তাদেরও অভিযোগ, নালিশ অনেক। তবু যারা আমার দরজায় এসে দাঁড়ায় তাদের প্রতি কেমন দুর্বলতা বোধ করি।"

কোনও কোনও দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করার সময় পান না। কর্মচারীদের মধ্যে একজন এসে সবিনয়ে তাঁর হ'য়ে মার্জনা প্রার্থনা করে। বলে, "কোশলজির আজ একেবারে সময় নেই। আপনারা মাপ করবেন। আগামীকাল আসবেন, যদি ইচ্ছে হয়।"

ওরা চলে যায়। পরের দিন আবার আসে। যার গরজ খুব বেশী সে দুপুরের পরেই এসে দরজার অনতিদূরে গাছতলায় ব'সে থাকে। দশজনের একজন না হ'তে পারলে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না।

আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সত্যি সময় নেই। তাই তিওয়ারীকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যাবেলা অনাহূত কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। বাগানের দিকে অগ্রসর হবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার তাকিয়ে এদের দেখলেন। সংখ্যায় বেশি নয়, চারপাঁচ জন। মনটা কেমন কোমল হয়ে উঠল। ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সামনে দাঁড়ালেন।

"আজ আমার একেবারে সময় নেই। সকাল থেকে বড় ব্যস্ত আছি। চটপট বলুন আপনারা, কি সেবা আমার দ্বারা সম্ভব।"

একজন সেক্রেটারী ততক্ষণে নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বেশ খানিকটা পরিতৃপ্তি নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সান্ধ্য পায়চারিতে নিযুক্ত হলেন। এখন আর আকাশ লাল নেই; সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারের কোমল স্পর্শে পৃথিবী স্নিগ্ধ হ'তে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভবনের লন বিরাট্। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা। চারদিকে নানা রকম ফল, ফুল, ও বাহারে পাতার গাছ। মালতী, কামিনী, করবী, টগর ও অপরাজিতার মিলিত সৌরভ। হাস্নাহানার উগ্র-মধুর গন্ধ। গাছ থেকে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকার ডাকের সঙ্গে কদাচিৎ দু-একটা পাখীর ডাকও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুনতে পাচ্ছেন। নির্মল আকাশে লক্ষ কোটি তারকার মৌন সজাগ কুতুহলী দৃষ্টি। পৃথিবীর মানুষের রাত্রি-জীবন দেখে নেবার অদম্য আগ্রহ।

দিনের শেষ ও রাত্রির সুরু: এই সন্ধ্যা আজীবন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বিচলিত ক'রেছে। সারা দিনে জীবন যেন বড় বেশি ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। সন্ধ্যা তাকে গুছিয়ে আনে, অজানা রহস্যের লোভে সে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। রাত্রির জমাট অন্ধকারে জীবন রহস্যে ঘন হয়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রতিকোণ হ'তে বিষণ্ণ উদাস জিজ্ঞাসা সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ দেখা যায় তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে জীবন্ত মানুষকে। সে-সব বোবা জিজ্ঞাসার ভাষা শুনতে পেলেও বোঝা যায় না; অথচ তারা জবাবের জন্যে জুলুম করে। বার বার সন্ধ্যার চটুল অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে, কিংবা পদসঞ্চালনে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে হয়েছে মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নিঃস্ব, কত দুর্বল, অথচ কি বিরাট্, ব্যাপক, ভয়ানক তার বেঁচে থাকার দাবি। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে বসন্তি

কলেবরে।" মানুষ এত ব্যাপক ও বিরাট্ বলেই এত দীন, এত শূন্য। এমন ব্যাকুলভাবে চায় বলেই তার পাওয়ার তৃপ্তি নেই। এত দিতে চায় আর নিতে চায় বলেই সে দিয়ে নিতে পারে না, নিয়ে পারে না দিতে।

বাগানে বড় বড় পা ফেলে পরিক্রমণ করতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে হ'ল, পদ্মাদেবীর দাবি যতই-না অসম্ভব হোক,তাঁর অভিযোগ অসত্য নয়। সত্যিই আমার বয়স হয়েছে; বাইবেলের তিন-কুড়ি-দশের বেশি দেরি নেই। জীবনে ভোগ কম হয় নি। অনেক ঘটনা, অনেক মানুষ, অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে আমার অতীত। পেয়েছি কম নয়; জীবন থেকে আদায় করে নিয়েছি অনেক। সে তুলনায় বরং দিয়েছি কম। এই পাঁচ-ছয় বছর অমিত প্রতাপে উদয়াচলের নাট্যমঞ্চে বিরাজ করেছি। নতুনের আস্বাদ বার বার জীবনে অপূর্ব উন্মাদনা এনেছে। এক একটি নতুন-গড়া বাঁধ, কারখানা, পুল, এমন কি স্কুলগৃহ দেখে পর্যন্ত যে উন্মাদনা পেয়েছি তার সঙ্গে প্রথম প্রেমেরই একমাত্র তুলনা করা যায়। মনে আছে যেদিন সোনামুখী নদীর বাঁধ উদ্‌ঘাটন হ'ল। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে অজানা অচেনা কুসুমপুর গ্রাম অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন দিল্লী থেকে। সোনামুখী ছিল অবাধ্য নদী; গ্রীষ্মে ক্ষীণাঙ্গী, বর্ষায় সর্বনাশ-বয়ে-আনা প্রগলভা দামিনী। তাকে বেঁধে তৈরী হয়েছে বিরাট্ জলাশয়, যেন এক টুকরো সাগর। বাঁধের একাংশ খোলা; সোনামুখী বিরাট্ গর্জনে প্রবাহিত। অদূরে নতুন তৈরী বিদ্যুৎ কারখানা। বহুকালের খল-স্বভাব নদী কি আশ্চর্য ঔদার্যে হঠাৎ মানুষের জীবন শস্যে, ফুলে, আলোয় ভরে দিতে নতুন রূপ নিয়েছে! সেদিন মনে হচ্ছিল বিধাতা অসীম কৃপায় আমাকে দিয়ে উদয়াচলের রূপায়ণ করাচ্ছেন। যে ঐতিহাসিক সম্মান ও মর্যাদা ভাগ্যক্রমে আজ আমার, তার যোগ্য না হ'তে পারলেও তাকে যেন অপমান না করি।

পদ্মাদেবী বলছেন, অনেক হয়েছে, এবার ত্যাগ কর, ছেড়ে দাও, রেহাই দাও নিজেকে। ভাবতে বিষাদ হাসি পেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। সুদর্শন দুবে, হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি আর মহেন্দ্র বাজপাঈ! একসঙ্গে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর পতন ঘটাবার চেষ্টা! সে চেষ্টাকে আমি প্রায় ব্যর্থ করে এনেছি। পদ্মাদেবী ঠিকই বলেছেন: এত দিন যা করি নি, করতে হয় নি, আজ তাই ক'রে এঁদের হারিয়েছি। এত দিন দাম না দিয়ে রাজত্ব করেছি, আজ রাজত্ব করবার জন্যে দাম দিতে হ'ল। তা হোক। আমি না দিলে এর চেয়ে অনেক বেশি দাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হ'ত হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি বা সুদর্শন দুবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে মুখ্যমন্ত্রী রাখবার জন্যে উদয়াচলের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর প্রদেশেও যদি কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যায়, তবে তার বল সত্যিই খুব কম। যে মাটি থেকে রস টেনে সে জীবিত, সে মাটিতে তা হ'লে সার গেছে নিঃশেষ হয়ে।

সত্যিই কি অনেক দাম দিয়েছি? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্ধকারে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন নিজেকে। উত্তর শুনলেন, তা একেবারে কম দাও নি। প্রতিবাদ ক'রে বললেন, কই? দুর্গাভাই দেশাইকে আমি ছাড়ছি না। শুনতে পেলেন, তাঁর পাখাও কেটে দিচ্ছ তুমি। যে-ভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করতে যাচ্ছ, দুর্গাভাই তাতে যোগ না দিয়ে পারবেন না—যাবেন কোথায়?—কিন্তু তাঁর এতদিনকার সম্মান ও প্রভাব আর থাকবে না। হাসি পেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। বললেন, বড্ড শুচিবাই লোকটির; নিজের সুনাম বাঁচাতে সব কিছু করতে পারেন। অত সুনামের মায়া থাকে, মন্ত্রীসভায় না এলেই পারবেন! শুনতে পেলেন, শুচিশুদ্ধ লোকটিকে রাখতে পেরেছিলে, তাই তোমারও সুনাম ছিল, শক্তি ছিল। এবার তুমি তাকেও কিছুটা নোংরা ক'রে নিচ্ছ। মন্ত্রীত্ব না নিয়ে যাবেন কোথায়? বনবাসে? মন্ত্রীত্বের জন্যে তোমার কাছেই আসবেন, লজ্জার মাথা খেয়ে, বিবেকের সঙ্গে গোজামিল পাতিয়ে; কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানুষটিকে নীচে নামিয়ে তুমি নিজেকেও দুর্বল করে ফেললে।

প্রতিবাদ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সত্যি নয়, সত্যি নয়। দুর্গাভাইকে আমি অর্থমন্ত্রীই রাখব, তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব তেমনি থাকবে যেমন রয়েছে এতদিন।

শুনতে পেলেন, এ কথা সত্যি নয়। তুমি সুদর্শন দুবেকে মন্ত্রীত্ব দিতে যাচ্ছ, আজ রাত্রেই তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হবে, নতুন মন্ত্রীসভা হবে তোমার একার নয়, তোমাদের দুজনের। সুদর্শন দুবেকে স্থান দেওয়া মানেই দুর্গাভাইকে পঙ্গু করা।

বলে উঠলেন, তা নয়। দু'জনকে দু'জনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দু'জনকেই দুর্বল ক'রে রাখা। শুনলেন, তা হ'লে তুমিও দুর্বল হয়ে যাবে। তোমার সহকর্মীদের দুর্বল রেখে তোমার যে বল হবে তা আসলে দুর্বলতা।

বললেন, হরিশঙ্কর ত্রিপাঠিকে মন্ত্রীসভায় নেব না ঠিক করেছি। সেটা বুঝি কিছু নয়? শুনতে পেলেন, কিছু নিশ্চয়, তবে অনেক কিছু নয়। কারণ, অল্প দিনের মধ্যেই হরিশঙ্করকে তুমি অন্য পদে বহাল করে খুশি রাখবে। তা ছাড়া সরোজিনী সহায় সম্বন্ধে তোমার মতলব ভাল নয়। বললেন, না, না। আমি কিছুই ঠিক করি নি। জবাব এল, নিজেকে প্রতারণা করো না। তুমি জান, মনে তোমার জটিল মতলব তৈরী হচ্ছে।

প্রতিবাদ করলেন, সরিৎসাগর কোঠারীকে আমি রাখছি। স্বায়ত্বশাসন বিল আমি পাশ করাবই। উত্তর হ'ল, ভেজাল না দিয়ে পারবে না। এবার তুমি অনেক ভেজাল দেবে। শাসনে, ন্যায়-নীতিতে, জীবনদর্শনে। তার চেয়ে দলপতিপদে পুনর্বার নির্বাচিত হবার পর, পদ্মাদেবীর উপদেশ মত, পদত্যাগ ক'রে যদি সব ছাড়তে পারতে তোমার অনেক গৌরব হ'ত, উদয়াচলের ইতিহাসে তুমি স্মরণীয় হয়ে থাকতে।

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভীষণ রাগ হল। বোবা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, সব ছেড়ে কোথায় যাব? আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেই আমার যা-কিছু সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি। সাধারণ নাগরিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে কাল বিলাসপুরের কেউ চিনতেও চাইবে না। রাস্তায় পায়ে হেঁটে চললে লোকে তাকে 'নমস্তে' পর্যন্ত করতে ভুলে যাবে। কি বলছ? রাজ্যপাল? রাজ্যপালের রাজ্য নেই, পাল তুলে সে কেবল অলস নৌকার মত বয়ে বেড়ায়ঃ ও-জীবন আমার একদিনের জন্যেও সইবে না। কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব? তার জন্য এ বৃদ্ধ বয়সে নতুন খবরদারি তাঁবেদারী করতে হবে, আর দূর দিল্লী হ'তে দেখব আমার এত আদরের উদয়াচলের ওপর নিশান উড়ছে সুদর্শন দুবের কিংবা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠির! জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত উদয়াচলকেই আমি জেনে এসেছি—এর প্রত্যেক জিলা, মহকুমা, থানা আমার জানা, প্রায় প্রত্যেকটি মানুষকে যেন আমি অনেক দিন চিনি, তাঁদের মুখের ভাষা, বুকের ভাষা, সব আমি বুঝতে পারি। উদয়াচলের আকাশে প্রভাতে কি রং ধরে, সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে সে রং বদলায়, গ্রীষ্মের জলন্ত অপরাহ্নে গাছের পাতাগুলি কেমন কাতর হয়ে পড়ে, সন্ধ্যায় কি ভাবে দিগন্তে রহস্য জমে ওঠেঃ সব আমার জানা। আজ জীবনের এই গোধূলি লগ্নে দূর প্রবাসে গিয়ে অপরের দাক্ষিণ্যে রাজ-সম্মানও আমার অসহ্য।

আধ ঘণ্টার বেশি আজ আর হাঁটা হ'ল না। ফিরলেন দপ্তর-বাড়ীর দিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পথে দীনদয়াল গতিরোধ করল।

"মা একবার অন্দরে ডেকেছেন।"

"ও। আচ্ছা। যাচ্ছি।"

খাসমহলের ভিতরে ঢুকতে পদ্মাদেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

"তুমি আজ বড় ব্যস্ত। তবু তোমাকে বার বার ডাকতে হ'ল। একটু বস। দুটো কথা আছে।"

নিজের শয়ন-ঘরে গিয়ে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

পদ্মাদেবী পেছন পেছন এসে অদূরে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখে ক্লান্তি, ঔদাস্য, বেদনা মিলেমিশে নিরাকার ম্লান বৈরাগ্য সৃষ্টি করেছে।

কোথায় যেন বুকের মধ্যে কোন এক প্রাচীন তন্ত্রীতে ব্যথার সুর বেজে উঠল।

পদ্মাদেবী বললেন, "আমি আজ রাত্রির গাড়িতেই কাশী যাচ্ছি।"

"কেন? রাত্রে কেন?"

"তাতে সুবিধে। দিন থাকতে থাকতে পৌঁছে যাব।"

"সঙ্গে নিচ্ছ কাকে?"

"চন্দ্র যাচ্ছে।"

"ভাল। টাকা-পয়সা বেশী করে নিয়ো। আর, যত তাড়াতাড়ি পার, চলে এস।"

ক্ষীণ হাসি ফুটল পদ্মাদেবীর মুখে।

"তুমি আমার কথা শুনলে না।"

"না। শোনা সম্ভব নয়।"

"সাবধানে পা ফেলো। যতদূর পার নিজের গৌরব বাঁচিয়ে চল।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন: "পুত্রবধূর কাছে গিয়েছিলে?"

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পদ্মাদেবী বললেন, "হ্যাঁ। কমলা গহনা নিয়েছে, টাকা নিতে রাজী হয় নি। তার মেয়েকে হারটা দিয়েছি।"

"শুনেছি সে বেটি খুব সুন্দরী হয়েছে।"

"যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা।"

"আমি চলি এবার।"

"একটু দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন করব। সত্যি জবাব চাই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উঠছিলেন। আবার বসলেন।

"দুর্গাপ্রসাদকে আজকের দিনে এই বাড়ীর দরজায় এভাবে পুলিসের হাতে না তুলে দিলে কি তোমার মুখ্যমন্ত্রীত্ব বজায় থাকত না?"

পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। চোখ জলে ভরে এল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উঠে দাঁড়ালেন। কথা বলতে গিয়ে দেখলেন গলা ধরে রয়েছে। গলা ঝাড়লেন শব্দ করে।

"উপায় ছিল না।"

"কেন? লোকের কাছে বাহবা একটু কম পেতে? আমার কথাও তোমার একবার মনে হ'ল না?"

"আজ সন্ধ্যায় দুর্গাপ্রসাদের পার্টি জনসভা আহ্বান করেছিল, দিনের বেলা মিছিলের পর। এতে সুদর্শন দুবের সমর্থন ছিল। হঠাৎ খবর পেলাম হরিশঙ্কর ত্রিপাঠি দু'জন লোক ভাড়া করেছে দুর্গাপ্রসাদ যখন বক্তৃতা করবে তখন তাকে পাথর ছুড়ে জখম করবার জন্যে। হরিশঙ্কর জানে, দরকার হ'লে সুদর্শন দুবে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। সে এও জানে, আমার নতুন মন্ত্রীসভায় তার স্থান হবে না। একটা শেষ রসিকতা সে আমার সঙ্গে করতে চাইবে মনে হচ্ছিল। রিপোর্ট পেয়ে মনে হ'ল, এই তার শেষ রসিকতা। রিপোর্ট সত্যি নাও হ'তে পারে। দুর্গাপ্রসাদের শরীরটা তেমন ভাল নেই শুনেছিলাম। চন্দ্রপ্রসাদই বলেছিল সেদিন। দেখলাম বেশ রোগা হয়ে গেছে, গায়ের রং আর নেই। ভাবলাম, দু' একমাস একটু বিশ্রামে থাকুক।"

পদ্মাদেবীর পানে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

হাত তুলে বললেন, "প্রণামের কোনও প্রয়োজন ছিল না। সাবধানে থেকো। আর, ফিরে আসতে বেশি দেরি করো না।" ক্রমশঃ

কুলু উপত্যকায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁক ঘুরতেই উপত্যকার সিংহ দরজাটা কে যেন চোখের সামনে হুট করে খুলে দিলে। এবার নতুন একটি রঙ্গমঞ্চের সামনে পৌছলাম। কোন অদৃশ্য চিত্রকর তাঁর নিপুণ তুলির টানে পাহাড়ের কঠিন দেয়াল দুটাকে মুছে দিলেন দু'পাশ থেকে, নদীকেও সরিয়ে দিলেন বেশ খানিকটা দূরে। নদীর কোল-বরাবর সযত্নে আঁকলেন বালুরেখাময় তটভূমি। ও-পাশের পাহাড়টা রেখামাত্রে পর্যবসিত হ'ল—এক মাইলেরও অধিক চওড়া একটি সমতলভূমির নক্সাটা ছকে দিয়ে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে হেসে উঠলেন চিত্রকর। সেই হাসি ছড়িয়ে গেল মাঠে মাঠে—পাকা গমের ক্ষেতে ক্ষেতে—তৃণভোজনরত ছাগল-গরু-ভেড়ার বিচরণ ভঙ্গিমায়, ঘন সবুজ আপেল-ন্যাসপাতির বাগানে। নদীর বালুচরে সে হাসি আরও একটু উজ্জ্বল হ'ল। প্রখর রৌদ্রে দূরে এবং নিকটে মেঘমালায়, শৈল-শিরায়, পথের ধারে ছায়াশীতল দেওদার পিপল চিড় পাইনের শাখায় পাতায় সেই হাসিটি স্নিগ্ধ হয়ে ফুটল। মনেই হ'ল না, সমুদ্র সমতা থেকে চার-পাঁচ হাজার ফুট উপরে একটা পাহাড়ী উপত্যকার পথ ধরে আমাদের বাস ছুটেছে। এমন সোজা সরল পথ সমতলেও সহজলভ্য নয়। বাস ছুটেছে বেশ জোরেই, বিপরীত দিক থেকে হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে লাগছে সর্বাঙ্গে। মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ—রোদের সমুদ্রে ভাসছে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুখ-সমীরিত বাসে বসে আমরা একটুও তাপ অনুভব করছি না। হাওয়া যদি থেমে যায় জীবকুলে উঠবে ত্রাহি ত্রাহি রব, যেহেতু জুনের দুপুর এখানেও কম উত্তপ্ত নয়।

অনেকখানি সমতল পেরিয়ে আমাদের বাস এসে থামল একটি নামকরা জনপদে। বজোরা। এই জনপদের একটু দূরে নদীর দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে বিখ্যাত বশীশ্বর মহাদেবের মন্দির পড়বে। মন্দিরটি প্রাচীনকালের; তার বহিরঙ্গে হাল্‌কা তুলির টানে শিল্প-মহিমার নিদর্শনও কিছু মিলবে। পুরোপুরি প্রাচীনকালের মহিমা এর কোথাও নেই। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মন্দির। অধুনা পুরাতন স্থাপত্যের অনুসরণে নবকলেবর হয়েছে এর। ভূমিকম্পের ক্ষত ছাড়াও ধর্মদ্বেষীদের নখরাঘাতের চিহ্ন মন্দির-গাত্রে দৃশ্যমান।

বজোরা পার হয়ে আবার প্রশস্ত মাঠ। মাঠের প্রসার কোথাও বাড়ছে—কোথাও কমছে, বিপাশা কিন্তু খুব দূরে পালাচ্ছে না। সোজা সমতলেও সে সমান কৌতুকময়ী। সর্বাঙ্গে তরঙ্গের অলঙ্কার পরে বঙ্কিম দেহভঙ্গিমায় মিষ্ট হাসির লহর তুলে ছুটেছে। চলতে চলতে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হ'ল—আমরা কি বাংলার সমতল প্রান্তর দিয়ে বাসে করে ছুটছি না? রেখামাত্র আভাসে গিরিশ্রেণী যদি চোখে না পড়ত এই আশ্চর্য নীল আকাশ আর ঘনরেখা-বলয়িত উন্মুক্ত প্রান্তর প্রশস্ত বালু-শয্যা-শায়িত ওই স্রোতস্বিনী—তার ধারে ধারে আম-কাঁঠালের বাগান (বাসের গতি-মুখে শ্যামল আপেল উদ্যানের পরিচয়টা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না!) সব কিছুতেই সম্পূর্ণ বাংলাকে প্রত্যক্ষ করা যেত না কি? পাহাড় সব সময়ে চোখে পড়ছে না বলে বাংলা দেশকে দেখতে পাচ্ছি। কুলুর এদিকের প্রান্তর এমনই সমতল।

অবশেষে কুলুতে এসে থামল বাস। কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার ঘটল। পথেরই মাঝখানে একটা বাঁকের মুখ থেকে বার হয়ে এল একদল লোক। এল অতর্কিতে হৈ হৈ করে, যেন বাসখানাকে হঠাৎ ঘেরাও করে ফেলবে। বাসটা থেমে গেল—আমরা চমকে উঠলাম। না, না, লুঠপাটের ভয়ে নয়—কারণ ওদের হাতে লাঠি ছিল না, কাপড় মালকোঁচা মেরে পরা ছিল না—চেহারা ছিল না বিকট বীভৎস। সুবেশ সুন্দর ভব্য চেহারার মানুষগুলি—পরনে পায়জামা পাঞ্জাবী চাদর, মাথায় লাল পাগড়ি আর টুপি, কানে বীরবৌলি আর গলায় ফুলের মালা। ওরা ডাকাত নয়—বরযাত্রী। তবুও ভয় রয়ে গেল মনে—লুটপাট নাই করুক বাস থামিয়েছে, নিশ্চয় বাসে উঠবে বলে। আর ওরা যদি একসঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে তা হ'লে···না, ওরা হুড়মুড় করে বাসে উঠল না, হুড়মুড় করে বাসের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এক রকম ছুটেই চলে গেল। পিছনে একটা পাল্কীতে বর আর একটা বন্দী পাল্কীতে

কনে। লাঠি হাতে ক'জন লোক বরকন্দাজের মত চলেছে পাল্কীর আগে-পিছে, বাজনা বাজছিল ঝম্ ঝম্—যুদ্ধ-জয়ের বাজনা। পাল্কীর চলন ডুলকি নয় রীতিমত ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা। বিয়ের কনেকেই নিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু লুঠের মাল নিয়ে যেমন হাওয়ার বেগে ডাকাতরা চলে যায় তেমনি ওদের চলন। এটা তা হ'লে কি রকমের বিয়ে। রাক্ষস বিয়ে?

পরে শিখেদের বিয়েও একটি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। রাত্রিতে নয়—দিনের বেলাতেই বসেছিল বিয়ের আসর। অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছিল—সারাদিন চলেছিল ভোজন ও সঙ্গীতের সমারোহ। সঙ্গীতের আসর বসেছিল একটি বড় হল ধরে—সুরশিল্পীরা যন্ত্র ও কণ্ঠ আলাপ করেছিলেন মাইকের সামনে বসে। আর মন্ত্রপাঠ—সে-ও স্বরবর্দ্ধক যন্ত্রে পরিবেশিত হচ্ছিল। খানিকটা মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল—বিরতি চলছিল কিছুক্ষণ। বিয়েটা দিনের বেলাতেই হয়েছিল—আর গ্রন্থ সাহেবকে সামনে রেখে। যেমন আমাদের দেশে শালগ্রামশিলা সাক্ষ্য রেখে বিয়ে হয়। ওঁদের মুখেই শুনেছিলাম ক্রিয়া-প্রকরণগুলি।

বিয়ের দিন কাছে-পিঠের গুরুদ্বার থেকে গ্রন্থসাহেবকে নিয়ে আসা হয়। সে রীতিমত একটা শোভাযাত্রার ব্যাপার। একজন জলপাত্র হাতে পথে জল ছিটিয়ে আগে আগে চলে, তারপরে চলে বাজনদারের দল। তারপরে চাঁদোয়ার তলায় পুরোহিতের হাতে গ্রন্থ সাহেব আর তাঁকে দু'ধার থেকে চামর ব্যজন করতে করতে শোভাযাত্রাটি কনের বাড়ীতে আসে। সেখানে আগেই এসে গেছেন দু'পক্ষের সম্রান্ত আত্মীয় প্রতিবেশীর দল। একটি বেদীর উপরে বসানো হয় গ্রন্থ সাহেবকে। ইনি দশ গ্রন্থ-সাহেব হ'তে পারেন আবার পাচ গ্রন্থ সাহেবও কোন কোন জায়গায়। দশজন শিখগুরুর উপদেশ লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থগুলি যে গুরুদ্বারে থাকে সেখানকার গ্রন্থ সাহেব হ'লেন দশগ্রন্থ আর পাঁচ গুরুর উপদেশগুলি যেখানে রক্ষিত সেই গুরুদ্বার পাচগ্রন্থের মন্দির। আর একজন সচল সজীব গ্রন্থ সাহেবও গুরুদ্বারে থাকেন তাঁকে নিয়ে একটি সংখ্যা বেড়ে হয় একাদশ গ্রন্থ। তিনি হ'লেন পুরোহিত, নিত্য-সেবা পূজার দ্বারা যিনি গ্রন্থ সাহেবকে মহিমান্বিত করে থাকেন।

বর-কনেকে গ্রন্থসাহেবের সামনে বসিয়ে এই পুরোহিত গ্রন্থের এক একটি অধ্যায় পাঠ করে চলেন। এক একটি অধ্যায় পাঠ শেষ হ'লে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি ও গ্রন্থ সাহেব প্রদক্ষিণ করার নিয়ম। এই ভাবে চারটি অধ্যায় পাঠ ও চার বার গ্রন্থ সাহেবকে প্রদক্ষিণ করার পর শুভ কাজটি শেষ হয়।

এ ছাড়াও ওদের মধ্যে আর এক রকম বিবাহের চলন আছে—বৈদিক বিবাহ। সেই অনুষ্ঠান হয় সূর্যোদয়ের আগে, যাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত। সেখানে গ্রন্থ সাহেবকে আনার প্রয়োজন ঘটে না। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, হোমের অনুষ্ঠান আর বেদী প্রদক্ষিণ—এই নিয়মগুলি অবশ্যপালনীয়। সেখানে বর-কনেকে দিয়ে সপ্তপদীর মত একটি অনুষ্ঠান করানো হয়। প্রদক্ষিণটা যদিও চারবারের বেশী করানো হয় না। প্রথম-বারে বর অগ্রগামী—তাকে অনুসরণ করে কন্যা। দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণের সময় কন্যাকে অনুসরণ করে বর। এই রকম চারবার অনুসরণ করে বিয়ের কাজটি শেষ হয়।

আগ্রহভরে শুনছিলাম ওঁদের রীতি-প্রকরণের কথা। শেষে কৌতূহলভরে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। যৌতুকের যে প্রথাটি অভিশাপের মত আজ বাঙ্গালী সমাজকে পীড়িত করছে সেই পীড়া ওঁদের সমাজ ভোগ করে কি না শুধিয়েছিলাম। উত্তর শুনে খুশি হয়েছিলাম। না, তেমন একটি কাল-ছায়া ওদের শুভ অনুষ্ঠানকে এখনও কলঙ্কিত করে নি। পণপ্রথা নাই ওদের সমাজে। তবে কনেকে কিছু যৌতুক দেবার নিয়ম আছে। পাঁচ প্রস্থ পোষাক আর পাঁচখানি অলঙ্কার। পায়ের নূপুরটি কেবল রূপোর আর চারটি সোনার গহনা—আংটি, টিকলি, হার আর হাতের যা হোক কিছু। এই উপঢৌকন আসে বর-পক্ষের নিকট থেকে। সুতরাং সুপাত্রে কন্যাদানের আনন্দটি পুরোপুরিই ভোগ করেন কন্যা-পক্ষ।

পাহাড়ীদের প্রথাটা ঠিক কি জাতীয় বলতে পারব না—তবে পণপ্রথার চলনটা ভিন্ন-আকারে যদি থাকেই সেটা কন্যা পক্ষেরই দাবি। সেই দাবি মিটিয়ে বর বিজয়ীর গৌরব ভরে নিজ ভবনে ফিরে আসে। ঝড়ের মত দলটি যখন আমাদের বাসের পাশ দিয়ে চলে গেল—তখন মনে হ'ল কন্যা হয়ত আর পিতৃগৃহে ফিরে আসবে না অজানা একটি সংসারের সম্পত্তিভুক্ত হয়ে আমরণ সেইখানেই রয়ে যাবে!

কৈলাস ছেড়ে উমা তাঁর পিতৃগৃহে কতবার এসেছেন সে হিসাব সেখানকার মানুষ রাখে না। উমা মহেশ্বরকে নিয়ে তেমন একটি সমতল ভূমিলভ্য লোকযাত্রায়…কাহিনী রচনা কিংবা কল্পনা করার অবকাশ এদের কোথায়! নিজেদের কাজ আর আনন্দ নিয়ে এরা সব সময়েই মেতে আছে।

কুলুর যে প্রান্তে এসে আমাদের বাস থামল—সে একটি প্রশস্ত ময়দান। পথটিকে ছায়াময় করে বনস্পতিরা দাঁড়িয়ে

আছে—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গাটি। এধারে-ওধারে দোকান-পসার বাড়ীঘর সরকারী দপ্তরও চোখে পড়ল। দূরে···একটু উঁচু টিলায় ডাক বাংলো, টুরিষ্ট ব্যুরো, অ্যালুমিনিয়ম কুঁড়ে। পোষ্টাপিস, বনবিভাগের আপিস, আরও অনেক বাড়ীঘর। আলো আর জলেব বন্দোবস্ত ত আছেই। একটু আগে বিপাশার ধারে ছোট একটি বিমান-ক্ষেত্রও দেখে এলাম। এটা কুলুর প্রথম অংশ, পুরাতন নাম সুলতানপুর। দ্বিতীয় অংশ আছে মাইল খানিক দূরে, গোটা তিন চার বাক ঘুরলে তবে সেই ঘিঞ্জি বসতিতে পৌঁছব। সেই অংশের নাম আক্‌রা বাজার। সেইখানেই বাস ষ্টেশন, হোটেল রেষ্টুরেণ্ট, শিখ গুরুদ্বার, আর্য্যসমাজ মন্দির ইত্যাদি। সেখানে বহু বসতি, বহু দোকানপাট। পথ দিয়ে চলবার সময় মনে হবে সমতলের একটা শহরই উঠে এসেছে—গায়ে গা-লাগানো বাড়ীগুলোকে পযন্ত পথের দু'পাশে বেঁধে নিয়ে। এত ঘনবসতি এই ধারটা অথচ দুই পাহাড় চাপ দিয়ে জমিটাকে এতটুকু করে দিয়েছে। তাব মাঝে আবার রাস্তার গা ঘেঁষেই মাত্র তিন চাব হাত নীচে দিয়ে বইছে বিপাশা। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ডাকঘর পর্যন্ত হরিদ্বারকে অনায়াসে কল্পনা করা যায়।

আমাদের বাসের যাত্রা শেষ হ'ল আক্‌রা বাজারে। মধ্যাহ্নের চড়া রোদ গায়ে লাগছে—অস্বস্তি সেজন্য নয়, ভালমত একটি আশ্রয়লাভের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত। হোটেলের লোকেরা ভাল থাকা-খাওয়ার কথা বলল। বাসস্থানের চেহারা দেখে আমরা প্রলোভিত হ'লাম না। তা ছাড়া হোটেলের খাওয়া চলবে না, স্বপাকের আয়োজন সঙ্গেই রয়েছে। এখন একটি ভাল বাসস্থান পেলে নিশ্চিন্ত। একটু নিরিবিলি আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। মজুরকে ধরে প্রথমটায় শিখ গুরুদ্বারে গেল নাতি। বাসে আসবার সময় দেখেছিলাম সেখানে বহু লোক জমায়েৎ হয়েছে, মাইকে চলছে স্তোত্রপাঠ—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও বেশ ছিল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও গুরুদ্বারের কর্মকর্তা ছুটে এসে বললেন, কিছু মনে করবেন না—আজ সকাল থেকে একটা উৎসব চলছে এখানে। এই ভোজ পর্বটা শেষ হ'লে সেটা মিটবে। আপনারা ততক্ষণ জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসুন। ঘর ঠিক করে দিচ্ছি।

ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে আর্যসমাজ মন্দিরে ঘর নিয়ে সেই নিরিবিলি বাড়ীতেই আশ্রয় নিলাম।

বাড়ীটা যাঁর জিম্মায় ছিল তিনি অতি অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। এই আক্‌রা বাজারে তাঁর মুদিখানার দোকান আছে—উপরের তলায় সস্ত্রীক বাস করেন। ধর্মশালায় কল ছিল না—একটা ইঁদারা ছিল। পাঁচ-সাত হাত নীচেয় জল, তুলতে কোন কষ্ট নাই। ভদ্রলোক বালতি দিলেন দুটো, রশি দিলেন জল তুলবার জন্য। খাবার জলটা রাস্তার কল থেকেই নেব ঠিক করলাম। সে আর কতটুকুই বা দূর। এক'শ গজের মধ্যেই। আবার বিপাশ নদীও তিন-চার মিনিটের পথ। ঠিক করলাম এখানে অন্তত দুটো দিন বিশ্রাম নেব।

বাসেব মধ্যে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলেছিলেন কুলুতে আশ্রয় পেয়ে যাবেন যেমন করেই হোক। গুরুদ্বার আছে, আর্যসমাজ মন্দির আছে, হোটেল আছে, ঘর ভাড়াও পাওয়া যায়।

শুনেছিলাম মানালীতে এসব নাই অর্থাৎ গুরুদ্বার, মন্দির কিংবা ধর্মশালা। ওখানে ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর যে অফিসার আছেন তিনিই ভ্রমণকারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। অ্যালুমিনিয়াম কুঁড়ে, তাঁবু অথবা জানাশোনা কোন ব্যবসায়ীর ঘর। তবে আগে থেকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়াই সমীচীন।

আমরা বৈদ্যনাথ থেকে দু'জায়গাতেই চিঠি দিয়েছিলাম। সময়ের ব্যবধান ছিল অল্প। সে চিঠি পৌছানো সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম বলেই সেইদিন বিকেলে এক মাইল পথ উজিয়ে এলাম সুলতানপুরে ট্যুরিষ্ট আপিসে। সেখানে নানা দেশীয় ট্যুরিষ্টের ভীড় দেখলাম। অফিসারটি ভদ্র, সদালাপী, সকলকে সাধ্যমত বুঝিয়ে বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। পর্যটকেরা এখানে শুধু আশ্রয়ের জন্য আসেন না এই অঞ্চলে, দূরে এবং নিকটে যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি রয়েছে তার সন্ধান-সুলুকও জানতে চান। নানা ধরনের প্রশ্ন তাঁদের। এখান থেকে বিজলী মহাদেব কতদূরে ও কোন্ পথে যাওয়া যায়? নাগারে কি কি দ্রষ্টব্য স্থান আছে? বজৌরা মন্দিরের শিল্পরীতিতে কোন্ শতাব্দীর প্রভাব পড়েছে? রোহ্‌টাং পাস যাবার পুরো রাস্তাটিতেই কি বাস চলে? এই উপত্যকার দেবদেবীদের নিয়ে কোন উৎসব হয় কি না? কোন্ কোন্ সময়ে হয়? এখানে শিকারের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কি না? ইত্যাদি সব প্রশ্ন নিয়ে আসেন ভ্রমণকারী। অফিসার ধীরভাবে জবাব দিয়ে যান। দেওয়ালে মস্ত একখানা মানচিত্র টাঙানো আছে—সারা হিমালয়ের গিরিপথ, মন্দির, নদী, নির্ঝর, হিমবাহ, অরণ্য প্রভৃতির অন্ধি-সন্ধির নির্দেশ তার মধ্যে। দূর দুরান্ত বিচরণের জন্য তাঁবু, ঘোড়া, পথপ্রদর্শক, মজুর—সব ব্যবস্থাই এঁরা করে দেন। এ ছাড়া অনেকগুলি সচিত্র বই ও প্রচার-পুস্তিকা এই আপিসে বিক্রীত ও বিতরিত হয়।

কুলুর ট্যুরিষ্ট অফিসার জানালেন—আমাদের কোন পত্র তাঁরা পান নি। মানালিতে যে এ্যালুমিনিয়াম কুঁড়েগুলি ভাড়া পাওয়া যায়—তার অর্দ্ধেকগুলির ব্যবস্থা এখান থেকে হয়। এখানকার বরাদ্দ আপাততঃ শেষ হয়ে গেছে, দু' সপ্তাহের আগে ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে যদি কেউ না আসেন বা পত্রযোগে ব্যবস্থা বাতিল করে দেন সেগুলির বিলি-ব্যবস্থা অগ্রাধিকার অনুযায়ী এখান থেকেই হবে।

শেষে বললেন, যাই হোক, আপনারা মানালি চলে যান—পেয়ে যাবেনই একটা-না-একটা আশ্রয়। আজ অবধি কেউ ত ফিরে আসেন নি। ওখানে বেনন সায়েবদের গেষ্ট-হাউস আছে তিনটে, পি. ডব্লিউ. ডি. ও ফরেষ্ট আপিসের ডাক বাংলো আছে, তাঁবুর ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া দোকানীরাও দু' একজন ঘর ভাড়া দেয়। চলে যান —অসুবিধা হবে না।

আবশ্যকীয় দু' একখানা বই কিনে আমরা বেরিয়ে এলাম।

কুলু জায়গাটা ভাল। জলহাওয়ার কথা বলছি। যাঁরা সম্পন্ন অবস্থার মানুষ—তাঁরা পাহাড়ের উপরেই থাকেন। বিপাশার দু' পারেই বসতি-চিহ্ন—আপেল-ন্যাসপাতির বাগান। এ দেশের সম্পদই হ'ল মেওয়ার বাগান। মালদা-মুর্শিদাবাদে যেমন আমের বাগান, কাশী-এলাহাবাদে যেমন কুল, পেয়ারার বাগান। গাছে ফল ধরার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনেরা আগাম টাকা দিয়ে বাগানটা কিনে নেয়। কাশ্মীরী আপেল বলে যে-সব আপেল বাংলায় পাওয়া যায়—তার বেশির ভাগ চালান যায় কুলু থেকে। আপাততঃ খোবানি ছাড়া আর কোন ফল ওঠে নি। আশ্বিন মাসে উঠবে আপেল-ন্যাসপাতি। বাজার তখন আপেলের লাল হাসিতে ভরে উঠবে।

এখনও ফুলের মরশুম শেষ হয় নি। ফলের গাছে অবশ্য ফুল-ফোটা শেষ হয়ে গুটি ধরেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বুনো ফুলের হাসি এখনও ছড়ানো। একজাতীয় বুনো গোলাপ—সাদা এবং লাল অজস্র ফুটে আছে। যাকে বলে আলো করে আছে—তাই। পথচলার কালে তার মৃদু-মধুর গন্ধ মোহগ্রস্ত করে পথিককে। আবার দূর থেকেও সেই সৌন্দর্য অপরূপ। এ ছাড়া সৌন্দর্য আছে আকাশের গায়ে, শ্রেণীবদ্ধ গিরি-দেওয়ালের ওপিঠে তুষারশুভ্র হিমবাহের অঙ্গ-কান্তিতে। মানুষের কায়াতেই বা কম কি। আমাদের মোট বয়ে দিলে যে তরুণ ছেলেটি, তার ময়লা ছেঁড়া পোষাক ছাড়িয়ে নিয়ে একটি ভদ্রগোছের পরিধেয় অঙ্গে তুলে দিলে কে বলবে সে রাজার দুলাল নয়? যেমন দুধে-আলতা গোলা তার গায়ের রং—তেমনি টানা টানা চোখ, টিকলো নাক, সুগঠিত লাবণ্যযুক্ত দেহ-সৌষ্ঠব! এমন ছেলে যত্রতত্র চোখে পড়বে। এমন কি গরু, ভেড়া, ছাগল আর তাঁবু নিয়ে যে যাযাবর দল এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ডেরা ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যেও রাজকুমার আর রাজকুমারীরা আত্মগোপন করে রয়েছে বলে মনে হবে। যে হালুইকর যুবক তেল-চিটে ময়লা কাপড়-জামা পরে জিলাপি ভাজছিল তার মুখশ্রী অঙ্গকান্তি দেহবর্ণে আর্যজনোচিত আভিজাত্যের জলুস লক্ষ্য করেছি। এরা শুধু সুন্দর নয়, স্বাস্থ্যবানও। বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য সব কালেই সৌন্দর্যের অকৃপণ দানে নয়নানন্দদায়ক। এ-কথা নিঃসন্দেহ এই সৌন্দর্যের মূলে শৈলপ্রকৃতি ক্রিয়াশীল। শৈল-প্রকৃতির আরও একটি অবদানে এরা সমৃদ্ধ। সেটি হ'ল অন্তর লাবণ্য। এরা অকপট নির্ভয়, স্ফূর্তিবাজ। কল-কারখানার ধূমমলিন পরিবেশ এরা কল্পনা করতে পারে না—যন্ত্রজীবনের জটিলতার সন্ধান এরা রাখে না। এদের সমাজবন্ধন কি পরিমাণ পীড়াদায়ক জানি না, কিন্তু স্বল্পে সন্তুষ্ট সদাপ্রফুল্ল এই মানুষগুলির মুখে-চোখে চালচলনে তার আভাস বিন্দুমাত্র লেগে নেই। এরা দল বেঁধে পথ চলছে —হাসছে অপরিমিত, গান গাইছে, বাঁশী বাজাচ্ছে যখন-তখন। মানব জীবন যেন সদা হাসি আর খেলা আর আনন্দের হাট বসানোর নিমিত্তই। শুনেছি উৎসব দিনে নাচ-গান বাদ্যবাজনাতে এরা মশগুল হয়ে থাকে। বিপাশা যেমন স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে চলেছে—আকাশে যেমন রন্ধনশালা বা কল-কারখানার ধোঁয়া জমছে না, পাহাড়ের পাচিল যেমন এক একটি ভূমিখণ্ডকে জড়িয়ে রেখেও দূর যাত্রার ইঙ্গিত জানিয়ে দিচ্ছে—তেমনি এদেরও জীবন দারিদ্র্যের কশাঘাতে আহত হয়েও রুদ্ধগতি নয়—মলিন বেশবাসে আচ্ছাদিত হয়েও ধূমাঙ্ক-চিহ্নে কুৎসিত নয়, জীবিকার পাকে জড়িয়ে রেখেও জীবনকে যন্ত্রণাকাতর করে তোলে নি।

যে ছেলেটি আমাদের মোট বয়ে আনলে তার পেশা মজদুরি নয়। সে কখনও ক্ষেতে কাজ করে—কখনও ফলের বাগানে ফল পেড়ে দেয়—কখনও রাস্তার জনমজুর খাটে—গরু-ছাগল চরাতেও তার আপত্তি নাই। আবার সুযোগ পেলে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায়। এমন অনেক আছে। আহার ও বাসস্থানেও এরা স্বচ্ছন্দচারী। শীত-গ্রীষ্মের পরিধেয় নিয়ে খুঁত-খুঁতুনি নেই। এই প্রাণান্তক গ্রীষ্মে একরাশ শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে।

কুলু নাকি দেবভূমি। এক কালের আর্যভূমি ত বটেই। আর্য্যস্বভাব এবং দেহ সৌন্দর্যের নমুনা আজও এরা দেহে-মনে বহন করে ফিরছে।

পরের দিন পথে বেড়াতে বেড়াতে একটি তরুণীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ওদের বাড়ী ইউপি'র দিকে। স্বামী ভাল চাকরি করে—বছর দুই হ'ল মেয়েটি এখানে এসেছে। কথায় কথায় আমরা বললাম, চমৎকার জায়গা।

মেয়েটি এই মন্তব্যে বেশ অবাক্ হ'ল। বলল, আপনাদের ভাল লাগছে?

ওর প্রশ্নে অবাক্ হ'লাম আমরাও। বললাম, কেন, আপনাদের কি ভাল লাগে না?

মেয়েটি হেসে বলল, আমাদের দু'জনের কথা বলতে পারব না। উনি ত চাকরি করছেন, ওঁকে থাকতেই হচ্ছে এখানে।

আপনার বুঝি ভাল লাগে না? আমার স্ত্রী বললেন।

মেয়েটি অসঙ্কোচে মাথা নেড়ে বলল, না। একটুও ভাল লাগে না।

অধিকতর বিস্মিত হয়ে আমার স্ত্রী বললেন, এখানকার জলহাওয়া কি আপনার স্যুট করছে না?

মাথা নেড়ে বলল মেয়েটি, জলহাওয়ার কথা বলছি না, ওটা ভালই। কিন্তু বদহজমের কথা যদি তোলেন ত বলব, কি-ই বা খাবার জিনিস পাওয়া যায় এখানে, তাই হজমের গোলমাল হবে! যেদিকে তাকান খালি—পাথর—পাথর। পাথর দেখে ত মানুষের পেট ভরে না।

মেয়েটির খেদোক্তির মর্ম অনুধাবন করেছিলাম—হালুই-এর দোকানে খাবার কিনতে গিয়ে।

অত বড় আক্‌রা বাজারে ওই একটি মাত্র খাবারের দোকান। খদ্দেরের ভিড় সেখানে লেগেই আছে। দুধের খোঁজ করলাম দোকানে। দোকানী বলল, বেলা একটার সময় দুধ আসবে পাহাড় থেকে—সেই সময়ে আসবেন।

সকালে দুধ মেলে না?

না। সারাদিনে ওই একবার মাত্র দুধ আসে।

অথচ বাসে আসতে আসতে দেখেছি—মাঠে মাঠে গরুর পাল চরছে।

বেলা দু'টোর সময় দুধ আনতে গিয়ে শুনলাম—দুধ নেই।

বললাম, কেন, ওই ত কড়াইতে জ্বাল হচ্ছে।

দোকানী বলল, এই দুধে বরফি তৈরী হবে—দই পাতা হবে। দেখলাম গরম দুধ চ্যাপ্টা দইয়ের পাত্রে ঢালল, আরও ঘন করে ঢালল পরাতের উপরে। তারপর ছাঁচ কেটে তৈরী করতে লাগল বরফি। উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন বলতে ইনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। বাকি সব বেশনের লাড্ডু আর জিলাপি। আর ফুলুরি-সিঙ্গাড়া জাতীয় ভাজাভুজি।

মেয়েটির দেশ বোধ করি কাশী লক্ষ্ণৌ অথবা এলাহাবাদ দিল্লী। নানাবিধ রসনারোচক মিষ্টান্নের বিরহ ওকে কাতর করবে সে আর আশ্চর্য কি!

তরি-তরকারির বাজারেও বৈচিত্র্য কম। আলু এবং পেঁয়াজ। দুর্মূল্য বাঁধাকপি এরা কমই কেনে—শুকনো লাউ বা ঢ্যাঁড়সের প্রতিও খুব মোহ পোষণ করে না। এদের প্রকৃতি-বিলাসীমন খাওয়ার বিলাসকে আমল দেয় না হয়ত। কিন্তু প্রকৃতিই কি এদের বিলাসের বস্তু? আলো-হাওয়া নিয়ে আমরা কি বিলাস করি? যা সর্বক্ষণের জন্য পাওয়া যাচ্ছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে কতটুকু সচেতন।

গ্রাহকদের জন্য

প্রবাসীর এবং মডার্ণ রিভিয়ু-র গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে গ্রাহক নম্বর উল্লেখে ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম ৩ টাকা ৭৫ পয়সা জমা দিলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বিনা মাশুলে পাইবেন শারদীয়া প্রবাসী। (প্রতি গ্রাহক মাত্র একখানা পত্রিকা পাইবেন) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শারদীয়া সংখ্যা ছাপান হইতেছে, সুতরাং অগ্রিম অর্ডার দিন! আংশিক মূল্য জমা পাইয়া অর্ডার গ্রহণ করা হইবে না। ভিঃ পিঃ ডাকে শারদীয়া সংখ্যা পাঠানো হইবে না।

—)০(—

ভারত ও পাকিস্তানের পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রেতাদের জন্য

শারদীয়া সংখ্যা প্রবাসী মহালয়ার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাসমৃদ্ধ এই সংখ্যার মূল্য তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা (৩ টাকা ৭৫ পয়সা)।

বিক্রেতাগণ ২৫% কমিশন বাদ দিয়া তাহাদের চাহিদার মোট মূল্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মনি-অর্ডার অথবা অফিসে জমা দিয়া অর্ডার বুক করুন। বাকি অর্দ্ধাংশের মূল্য ভিঃ পিঃ করিয়া বই পাঠান হইবে অথবা মূল্য পরিশোধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ লওয়া হইবে না

প্রবাসী প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড

৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

॥ ৫ ॥
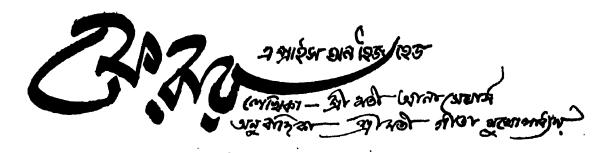
যে লোকগুলো ক্রমে ক্রমে আলগাইয়ারের বাড়ীর সামনে জড়ো হয়েছিল তাদের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। তারা মুষ্ট্যাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেল। শুনল আস্ফালন এবং কুৎসিত শাপশাপান্ত। তাদের বিশ্বাস করাই কঠিন হচ্ছিল যে এই তীক্ষ্ণ স্বর যা নাকি এত চেঁচামেচিতে ধ'রে এসেছে, এবং যা থেকে অনবরত নতুন নতুন অদ্ভুত গালি বেরোচ্ছে, সে স্বর বুড়ো আলগাইয়ারের। সমস্ত জীবন ধরে তারা শুধু দেখে এসেছে তাকে মাঝে মাঝে দু-একটা কথা গুজগুজ করে বলতে। তাদের জুতো, জামা সপসপে ভিজে, অবিশ্রাম বৃষ্টির জন্য অবিরত ফসল ওলটপালট করতে হওয়ায় তারা রেগে আগুন, গরম একটু সুপের জন্য ক্ষুধার্ত —এই অবস্থাতে বৃষ্টির মধ্যে তারা আলগাইয়ারের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল এবং শুনতে লাগল। ধূসর রঙে পালিশ-করা একটা ট্রাক ওদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আলগাইয়ারের বাড়ীর সামনে, তার উপর নাম লেখা "কৃষি যন্ত্রপাতি, কাস্ট্রিংসিউজ"। আধঘণ্টা হ'ল আলগাইয়ারকে ক্ষেত থেকে বাড়ীতে ডেকে আনা হয়েছে। ওর দরজার সামনে জড়ো-হওয়া লোকগুলো এই বিশেষ ঘটনার পারিপার্শ্বিক কারণ মোটামুটি কল্পনা করতে পারে। তার ফলে ঘটনাটার বেশীর ভাগই তারা বুঝতে পারছিল, অত্যধিক আন্দাজ করার বেগ পেতে তাদের হয় নি।

চাষী গুহেখলিন তার ক্ষেত থেকে ছুটে আসে রাস্তার অপর পার বেয়ে। তার মুখখানা লাল এবং ফুলে উঠেছে। ভিড়ের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে "ব্যাপার কি?" ওরা নতুন ফসল মাড়াইএর যন্ত্রটা নিয়ে যাচ্ছে।"

গুহেখলিন রাস্তা পেরিয়ে আসে। চোখ দুটো তার রেখার মত সরু হয়ে যায়, নাকের ফুটো দুটো ফুলে ওঠে, সে জানলার দিকে চায়। ছোট মেরৎস এবং ক্রিষ্টিয়ান কুঙ্কেল উল্টো দিক থেকে আসছে। দেখেই বোঝা যায় কুঙ্কেল মেরৎস্‌কে কিছু একটা কথার মধ্যে টানতে চেষ্টা করছে। তারা ভিড় লক্ষ্য ক'রে সমস্ত ইতি-বৃত্তান্তের খোঁজ নেয়, তার পর অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে যায়। ড্রাইভার যন্ত্রটা বাইরে নিয়ে আসে, ভারে নুয়ে পড়ে তার হাঁটু দুটো। উপর দিকে চেয়ে সে বলে: "তুমি কি পাগল না কি? আমি কিছু করতে পারি নাকি? এই দেখ আমার উপর হুকুম। আমার কাছে এইই সব।"

পাছা দিয়ে ঠেলে সে আলগাইয়ারকে ঘরের মধ্যে ঢোকায়। কিন্তু আলগাইয়ার আবার বেরিয়ে আসে। সে চিৎকার করতে থাকে, পাগলের মত ড্রাইভারকে ধ'রে ঝাঁকি দেয় যতক্ষণ না তার টুপিটা মাথা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্য প্রত্যেকে তার টাক মাথাটা দেখতে পায়। যতক্ষণে আলগাইয়ার টুপিটা তোলে তার মধ্যে ড্রাইভার যন্ত্রটা অধিকার করে এবং সেটাকে হেলিয়ে উপরে তোলে। আলগাইয়ার উঁচু হয়ে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে, "থামাও ওকে, থামাও ওকে!" ড্রাইভার কনুই দিয়ে ট্রাকের পর্দাটা সরিয়ে ধরে পাছা দিয়ে ঠেলে যন্ত্রটাকে ট্রাকের ভিতরে তোলে। কেউ একটা শব্দ করে না, কেউ নড়ে না। ড্রাইভার ট্রাকের দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দেয়। বাক্যহীন আলগাইয়ার বাড়ীর সামনে জড়ো হওয়া লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চিৎকার থেমে গেছে। আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে আসে সে।

ট্রাকটা চলে যায়, ভিড়টা আরও জমে ওঠে, লোকগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে যায়। তারা একদৃষ্টে আলগাইয়ারের দিকে চেয়ে থাকে,

আলগাইয়ারও তাদের দিকে একদৃষ্টে চায়। আলগাইয়ারকে দেখা আর শেষ হয় না তাদের। তার মুখের চেহারাটা বদলে গিয়েছে। দেখে মনে হয় যে, সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে তার সামনে গুরুতর বিপদ এবং কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

এতক্ষণে কেবল আলগাইয়ার বুঝতে পারে যে তার দরজার সামনে একদল লোক ভিড় ক'রে আছে এবং তার কারণ কি? প্রতিবেশীদের চিনতে পারে সে—গুহেখলিন, মেরৎস, কুঙ্কেল, ভোঁতা মুখের তলার ঠোঁটটার উপর বেরিয়ে-পড়া দাঁতগুলো শুদ্ধ নয়গে-বাওয়ারের ডাইনী বৌটা। হঠাৎ আলগাইয়ারের আশ্চর্য মনে হয় যে, সে এখানে জন্মেছে, এই লোকগুলোর মধ্যে সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছে। কি অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে এই লোকগুলোই একদিন তার শবাধারের পিছন পিছন যাবে কবর পর্যন্ত···ওদের মাথার উপর দিয়ে সে চায় বাস্টিয়ানের আঙিনার চারপাশের দেওয়ালের দিকে, টালির ছাদগুলোর দিকে। বর্ষা এবং ঘনায়মান সন্ধ্যা মিলে আকাশটাকে গাঢ় ধূসর রঙে ছেয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তার আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে এই আকাশের তলায় তাকে বাঁচতে হবে। সে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়, ব'সে পড়ে এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়। অকস্মাৎ খেয়াল হয় যে, তার দরজার বাইরের লোকগুলো এবার অপেক্ষা করছে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জন্যে, এ খবর তারা কি ভাবে নেয় দেখার জন্য। তার স্বাভাবিক অর্ধোচ্চারিত ভঙ্গিতে সে একটা শাপান্ত করে নীচু গলায়। এবারে আর উন্মত্ত অভিশাপ নয়, নিতান্ত নিম্নস্বরে, কিন্তু এমন ভাবে বলা যাতে যাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তাদের সত্যিকারের আঘাত দেয়। সে বলে, "তোমরা সব উচ্ছন্নে যাও।"

একটু পরে আলগাইয়ারের স্ত্রী, তার ছেলে এবং মেয়ে বাড়ী ফেরে। মনের মধ্যে তাদের আশঙ্কা কারণ আলগাইয়ারকে ক্ষেত থেকে বাড়ীতে ডেকে আনা হয়েছে। তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে, তারা শীতে কাতর এবং ভীষণ ক্লান্ত। বাড়ীর সামনে বিরাট ভিড় দেখে তারা ভয়ে থেমে যায়। যে মুহূর্তে তাদের দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে লোকগুলো: "তোমাদের ফসল মাড়াইএর যন্ত্রটা নিয়ে গিয়েছে।"

মারি নিজের অপরাধ অনুভব করে। ভুরুটা কুঁচকে যায় তার, সে কারও দিকে তাকায় না। তার আরক্ত মুখখানায় একটা বেপরোয়া অভিব্যক্তি। ঘরের ভিতরে যেতেই আলগাইয়ার তাকে পিছনের ঘরের দেওয়ালের কাছে নিয়ে যায় এবং দুজনে মিলে ফিসফিসিয়ে আলাপ শুরু করে। মা মারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলে "দেখলে ত?" বাইরের লোকগুলো যখন ঘরের ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ শুনতে পায় না, ঘরে আলো জ্বালা হয় নি ব'লে মুখগুলোকে পর্যন্ত চিনতে পারে না তখন তারা আবিষ্কার করে যে তারা এতক্ষণ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার পর বাড়ী ফিরে যায়।

॥ ৬ ॥

ছোট মেরৎস যখন বাড়ী ফিরল তখন তার বাবা ছাড়া আর সকলেই রান্নাঘরে রাতের খানা খাচ্ছে। মেরৎস গিন্নী বলে: "হের রিফ্‌কে এসেছেন। তোমার বাবাকে মৌমাছিদের হিসেবের খাতা দিচ্ছেন।" ছোট মেরৎস বোনের দিকে একটা কটাক্ষ করে। বোন ভুরু কুঁচকে ফেলে, তার পরই তাড়াতাড়ি হেসে ফেলে। মেরৎস লক্ষ্য করে বোনের পরনে সহরের জন্য তোলা ভাল পোশাক। সে সুন্দরী, তার উদ্ধত বুক এবং বিলম্বিত চালচলন। বোনের, মায়ের এবং ঝিয়ের চেহারা দেখে মেরৎস বুঝতে পারে যে অনেক দিনের পরিকল্পিত ব্যাপারটির আজ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে খাবার গুঁজে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। হলে সে গুতো খায় হের রিফ্‌কের সঙ্গে। স্কুলশিক্ষক হের রিফকে খাটো গড়নের ফূর্তিবাজ লোক, বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। ছোট্ট সুঁচোলো দাড়িতে ইতিমধ্যে পাক ধরেছে। ওরা করমর্দন করে এবং পরস্পরের দিকে যেন সামান্য একটু বিরাগের ভাব নিয়ে তাকায়। বুড়ো মেরৎস রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল কিন্তু ছেলে রূঢ়ভাবে পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়: "এক মিনিট দাঁড়াও বাবা, কথা আছে তোমার সঙ্গে।" বুড়ো স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চায়। তার পর বলে: "আচ্ছা বেশ, এস তা হ'লে।"

ছোট মেরৎস চেয়ারে বসে, রিফকেকে নিয়ে যে উত্তেজনা হয়েছিল তার গরম তখনও রয়েছে। ছেলে ও বাবা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে যেন তারা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে পরস্পরকে দেখছে না, সত্যি করে এই প্রথম দেখছে। শেষ পর্যন্ত একটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে ছেড়ে দেয় তারা।

আক্রোশের সঙ্গে সুরু করে ছেলেটা: "তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি।"

বুড়োর ভুরু কুঁচকে যায়। সে নিশ্চিত যে ছেলে

তাকে বলবে যে সে কুঙ্কলের দলে যোগ দিয়েছে। রাগ ফুঁসে ওঠে তার মনের মধ্যে। আর এক মিনিট হ'লেই জেলা অফিসে, অর্থাৎ তার ঘরের মধ্যে, ছেলে শুদ্ধ চেয়ার মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়বে যেন।

ছেলে উত্তেজিত ও রুষ্টস্বরে বলতে থাকে: "দেখতে পাচ্ছি তুমি বোনের বিয়ে দিচ্ছ, শীগগিরই দেবে, খুব তাড়াতাড়ি। বেশ কথা। আমি শুধু বলতে চাই যে আমিও বিয়ে করতে চাই। ঐ রকম শীগগিরই, তাড়াতাড়ি ক'রে। আমার জন্যে বৌ আন।" মাথাটা নীচু ক'রে রাখে সে, চোখ তুলে বাবার দিকে চায়—ক্রুদ্ধভাবে, প্রায় হুমকি দেওয়ার মত ক'রে। গভীর স্বস্তিবোধ নিয়ে তাকে দেখতে থাকে বুড়ো, চোখে ঝকঝকিয়ে ওঠে কৌতুক। মনে মনে সে হিসেব ক'রে দেখে যে ঝিয়ের ব্যাপারের পর কত দিন কাটল। ছেলেটার সঙ্গে সে কড়া হয়ে থেকেছে, টাকা-পয়সার টানাটানির মধ্যে রেখেছে তাকে। এই সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে মনের কথা বলতে অস্বীকার ক'রে এসেছে ছেলে। এইবার তাকে নুইতে হয়েছে, এখন জিভ দিয়ে জল পড়ছে। হাসিভরা গলায় সে বলে: "তোমার ত বেজায় তাড়া দেখছি।"

ছেলে খোলাখুলি তার দিকে চায় এবং বলে: "হাঁ"।

বুড়ো হাসি চাপতে যায়, কিন্তু চেষ্টাটা এত দুর্বল হয় যে তার দাড়িটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। "তুমি একেবারে বেজায় গরম হয়ে উঠেছ, কি বল?"

ছেলেটা এমন ভাবে নড়েচড়ে যেন বাবার দাড়িটাই পাকড়ে ধরবে, কিন্তু থেমে গিয়ে শুধু হাতখানা মুঠো করে। "বোনের চেয়ে একদিন দেরি করতে চাইনে আমি বিয়েতে। বৌ তুমি পছন্দ কর। সে কি রকম, সে কে—সে-সবে আমার কিছু আসে-যায় না। আমার বৌ চাই, এই হ'ল কথা।"

এ দফায় হাসি চেপে ফেলে বুড়ো মেরৎস। ছেলের কথাটা মন দিয়ে ভেবে দেখে। "শোন তা হ'লে, অন্ধকারে সিঁড়ির মুখে একটু চিমটি কাটা নয় এ—যেমন রেওয়াজ তোমার। এ তোমার আপন শয্যাপাতা, নরম হওয়া চাই। এ চিরজীবনের জন্যে।"

মুঠো-করা হাত দিয়ে নিজের হাঁটুতে ঠোকে ছেলেটা, মুখে তখনও অন্ধকার এবং হুমকির আভাস। এই অসহ্য মুহূর্তে চিরজীবনের কথা বলাটা একটা বিদ্রূপ ব'লে মনে হয় তার। বুড়ো মেরৎস হাসিমাখা চোখ তুলে চায়, বলে: "দেখা যাক। তোমার বোন রিফককে পাচ্ছে ব'লে গাঁয়ের লোক ত জলে-পুড়ে মরবে। ওরা বলবে ভারী চেয়ার গরম-করনেওয়ালা, আসল কথা ও এখানকার লোক নয়, তার উপর লেখাপড়াজানা, আবার পেন্সনও পাবে। এই অবস্থায় ছেলে যদি কাছেপিঠে থেকে এমন বৌ আনতে পারে যাতে কারো জ্বালা ধরবে না ত মন্দ হয় না। তা হ'লে সবাই বলবে: এই বেশ মানানসই, এমন রাজযোটক অনেক দিনের মধ্যে দেখা যায় নি।

"যা হোক, ঝুলে পড়—পছন্দ করার মত তেমন বেশী কিছু নেই অবশ্য। ভগবানের কৃপায় বুড়ো স্থলৎস্‌এর আর মেয়ে নেই। গুহেখলিনকে ভায়রাভাই হওয়া আদৌ হাসির কথা হ'ত না।

'কিন্তু কমরাড বাস্টিয়ানের একটা মেয়ে আছে, হাঁ মনে পড়ছে, আছে বটে একটা। সে অতটা খারাপ নয়, তা ছাড়া ঠিক বয়সও হয়েছে। নামটা বোধ হয় সোফি।"

"তার কি ঠিক বয়েস হয়েছে?" ছেলেটা খুব চেষ্টা করে মেয়েটাকে মনে করতে। প্রায় রোজই তাকে দেখে, কিন্তু এখন অনেক চেষ্টা ক'রে যতটুকু সে মনে করতে পারে তা হ'ল বিবর্ণ অস্থিচর্মসার একটা চেহারা।

"তুমি কি এক্ষুনিই তিন যমকের জন্ম দেবার ফন্দি করছ নাকি?"

"না, কিন্তু আমি তোমাকে বললাম আমার জন্যে একটা বয়স্থা মেয়ে পছন্দ করতে, চিনির পুতুল নয়। যাই হোক, তার বয়স কত?"

"সতেরয় পড়তে যাচ্ছে।"

ছোট মেরৎস চিন্তামগ্ন ভাবে ভুরু কোঁচকায়, নিজের বাসনার দণ্ড দিয়ে বয়সটা মাপবার যেন কোনও সম্ভাবনা আছে।

"বেশ, আমি তাকে দেখি একবার ভাল ক'রে।"

সে উঠে পড়ে, বুড়ো মেরৎসও উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

"দাঁড়াও বাপু, আমি একবার গোড়ায় দেখি তাকে। যা দরকার তা তার আছে কি না সে বিচারটা আমার উপর ছেড়ে দাও, তার পর দু'জনে মিলে দেখা যাবে।"

॥ ৭ ॥

গরু-বলদগুলোকে খাওয়ান হ'লে বাস্টিয়ানরা স্বামী-স্ত্রী, বড় দুটো ছেলেমেয়ে এবং জোহান ফসলের আঁটি বাঁধতে যায়। জলভরা আকাশ যেন ক্ষেতের উপর ঝুলে রয়েছে। নদীর ডান ধার ধ'রে অপেক্ষাকৃত দূরের এবং একটু পরিষ্কার দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে বিপুল

মেঘভার। যেখানে যেখানে সেই মেঘটা ছিঁড়ে গেছে সেখান দিয়ে অকারণে ভেসে উঠছে পালকের মত ছোট ছোট সাদা মেঘের রাশি। জোহান প্লাম গাছের চারপাশে ফসলের আঁটি গোছাতে সুরু করে। এতদিন সে কাজ করছিল পুরাণো কায়দায়, যা করতে বলা হচ্ছিল তাই করছিল। এখন অন্যদের ভয় তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। আবার বৃষ্টির ভারী ফোঁটাগুলো তার ঘাড়ের পিছনে পড়তেই সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকে কাজ বন্ধ ক'রে উপর দিকে চায়—এমন কি বাচ্চাগুলো পর্যন্ত। ভয়াবহ আকাশের ছোঁয়া পড়ে পাঁচটা মুখে। নিদ্রায় অথবা জাগরণে জোহানের কেবল একটিই চিন্তা ছিল গত কয়েক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এই বোধ হয় প্রথম সে ভাবনা ভুলে গেল জোহান যে মুহূর্তে তার কানে এল বাতাসের মর্মর ধ্বনি···অভ্যাগত বর্ষণের পূর্বাভাষ।

মুহূর্তের মধ্যে ভিজে সপসপে হয়ে গেল ওরা। তখন আবার সব কথা মনে পড়ে গেল জোহানের, সশব্দে কটূক্তি করে উঠল সে। বাস্টিয়ানের ছোট্ট ছেলেটা কাঁদতে সুরু করল। কয়েক মিনিট ধরে বাতাসে যেন বৃষ্টির একটা পর্দা ঝুলতে লাগল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। তার পর বৃষ্টি থামল, শেষে এমন কি পড়ন্ত গোধূলির একটা ক্ষীণ আভাও ঝলকে উঠল। ওরা নাছোড়বান্দা হয়ে কাজ ক'রে চলল, কাপড়চোপড় থেকে ধোঁয়া উঠতে সুরু করল, ঠাণ্ডা যেন মাংসের মধ্যে কেটে বসতে লাগল।

জোহান বলে "গাছের তলায় ফসলগুলো ভাল থাকে, এগুলোকেও ওখানে নিয়ে যাওয়া যাক।"

বাস্টিয়ান বলে, "তা করা যায় না। অন্যলোকের প্লাম গাছের চারপাশে আমাদের ফসল গোছান যায় না। ওপাশের গাছগুলো গুহেখলিনের।"

জোহান বলে: "কিন্তু ওর ত কাজ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ঘরে তুলে নিয়েছে ও। এতে ক্ষতি কি? তাছাড়া এরই মধ্যে ও সমস্ত ঘরে তুলে ফেললই বা কেন?"

বাস্টিয়ান বলে: "সে ওর উপর ছেড়ে দিতে হবে। শয়তান যেমন করে দুর্বল লোকের পিছনে লাগে তেমনি ক'রে নিজের কাজ করে ও। অনেক কিছু ও নিজের হাতে করে, সে ব্যাপার ওর উপর ছেড়ে দিতে হবে। ও লোকটার হাড়ে কি যে আছে আমি বুঝিনে। ক্ষেত থেকে ঘরে ফেরবার সময়েও সেই রকমই দেখায় ওকে যেমনটি ঠিক সকালে সুরু করেছিল। এই এক যোটক বটে, ও আর ওর বৌ।"

জোহান জিজ্ঞাসা করে: "ঐ কি পাশের বাড়ীর? যার ছেলে হ'তে চলেছে?"

বাস্টিয়ান জবাব দেয়: "হাঁ, প্লাম গাছের ফাঁক দিয়ে আমি দেখি কি ভাবে বৌটাকে খাটাচ্ছে ও। দম ফেলবার পর্যন্ত ফুরসৎ দেয় না। আমি বলি ঐ ক্ষীণ শরীরের মধ্যে অনেক বেশী ক্রিশ্চান আছে ঐ গুহেখলিনের চেয়ে। আমি নিজে ভেবে বের করেছি: বৌটাকে ও খাটাচ্ছে, নির্মমভাবে খাটাচ্ছে যাতে ক্ষেতের উপরই মারা যায় ও। বৌটা যে কোনও মুহূর্তে ত ছেলে বিয়োবে।"

যে নাকি তার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে কখনও কথা বলে না, সেই বাস্টিয়ান, কাজ থামিয়ে তাকে গুহেখলিনের কথা বলছে দেখে অবাক হয় জোহান।

"লোকে সাধারণতঃ বলে থাকে যে জীবন্ত লোকের কাছেই যা হোক পাওয়া যায়, মৃত লোকেরা কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু গুহেখলিনের অবস্থা আলাদা। যে মুহূর্তে মেয়েটা মরবে গুহেখলিন বড়লোক হবে। কিন্তু মেয়েটা মরল না। ঐ বিরাট্ পেট নিয়ে সে স্বামীর পেছনে পেছনে ঘরে ফিরল। পেটের ছেলেটার জান আছে বলতে হবে, ভেবে দেখ, পেটের মধ্যে আঁকড়ে ঝুলে আছে।"

থেমে যায় সে। ভিজে ক্ষেতের দিকে চেয়ে হঠাৎ হতাশায় ডুবে চিৎকার দিয়ে ওঠে: "ডোরা, ডোরা, নীচু হ', লেগে পড়, কেন সুরু করছিস নে রে? গলায় কাঁটা বিঁধেছে নাকি?"

রাস্তার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ডোরা। সে চোখ তুলে চায় বাবার দিকে নয়, জোহানের দিকে। মনে হচ্ছিল যেন পরিশ্রমে পীড়িত তার ফ্যাকাসে মুখখানা ধূসর আকাশের মধ্যে একটা ছিদ্র খুঁজছিল। তার মাথায় রুমাল বাঁধা ছিল না, যখন সে ফসলের উপর নুয়ে পড়ছিল ফসলের গায়ে বাস্টিয়ানের স্ত্রী কারও দিকে লক্ষ্য না করে কাজ করে যাচ্ছিল তখন তার ভিজে পিছল বিনুনিটা ঘষে ঘষে যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি অবশ্য নয় তবে অবিশ্রান্তভাবে। অনেকক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা নেবে এসেছে, সে সন্ধ্যা ধূসর এবং অগ্রীম্মোচিত।

পরে যখন তারা রাস্তা দিয়ে ফিরছিল তখন বাস্টিয়ান বলে: "তুমি থেকে ভালই করেছ জোহান। তুমি না থাকলে আমরা ফ্যাসাদেই পড়তাম।"

গ্রামে আলো জ্বলে উঠেছিল, ডোরা হঠাৎ সেদিকে ছুটতে সুরু করে।

বাস্টিয়ান মাথা নাড়ে: "শেষ শক্তিটুকুও ক্ষয় ক'রে ফেলে ও ছুটে ছুটে।"

জোহান বলে: "পূর্বাঞ্চলের এক একটা লোক, জান, তোমাদের গ্রামের সকলের মোট সম্পত্তির চেয়েও বেশীর মালিক। ওরা সব কিছু বিক্রী করে।"

বাস্টিয়ান শান্তভাবে বলে: "আমি জানি, আশেপাশে ঘোরা আছে আমার। ও সব দিকে অন্ত রকম ব্যাপার। এদিকে রুটি বেচে মুনাফা করে না কেউ, রুটি এখানে খেয়ে বাঁচবার জন্ত। মেরৎস পর্যন্ত রুটি থেকে মুনাফা করে না। অবশ্য ওরা আরামেই আছে, সুবছরে তারা বাজ তৈরী করে, সেমুই এবং পিঠে বানায়। একটু চর্বি কিংবা ময়দার লেইতে দুএকটা ডিমের জন্ত তাদের আটকায় না। আমাদের একটা ডিম যদি ফেটে যায় বা গলে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে এক টিপ নুন কম পড়বে কিংবা একটা ছুঁচ বা সুতোয় টান ধরবে।"

জোহান বলে: "কেউ কেউ বর্ষাতে খুশী হয়েছে, তাদের ঘরে গেল-বছরের শস্ত রয়েছে, আর এখন দরকার নেই।"

বাস্টিয়ান তাতে বলে: "আমি তোমায় বলছি তারা ভিন্ন ধরনের লোক।"

গ্রামের চুড়োর দিকে নিজেদের দরজার সামনে থামে জোরা। তাকে হতবুদ্ধি দেখায়, যেন ভুল আলো তাকে উল্টো গ্রামে নিয়ে এসেছে ভুলিয়ে। বন্ধ দরজার ওদিকে ছোট বাচ্চা তিনটে কান্নার ঐক্যতান জুড়েছে। বাবা-মা মাঠ থেকে ফেরবার আগে আলো জ্বালানর হুকুম ছিল না তাদের।

এখনও আলো জ্বালায় না মা, ঘর গরম করবার চুল্লীটা জ্বলতে থাকে। বাচ্চারা চোখের জলের শেষ ক'ফোঁটা মুছে ফেলে। চুল্লীর সামনে ভিড় করে সবাই, অপেক্ষা করে চুল্লীটা জ্বলে ওঠবার জন্ত। ভিজে সার্ট খুলে ফেলে জোহান। গায়ে দেবার আর সার্ট ছিল না তার। হয়ত সেটা চোখে পড়ে বলেই মার্গারেট বাস্টিয়ান হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে: "কি করে সে, তোমার বাবা ঐ সুলৎস?"

"কি আর করবে। বসেই থাকে?"

"আর তুমি? তুমি কি শিখেছিলে বল দেখি?"

"আমি? ডোলের উপর বাঁচা—এই আমি শিখেছি। অবশ্য এক সময়ে ঢালাই কারখানায় মজুর ছিলাম, কিন্তু সে ত তিন বছর হয়ে গেল। আমার বোনই সংসার দেখাশোনা করে আরকি।"

বাস্টিয়ান বলে: "ও আমাদের সকলের অবস্থাই সমান। আমরা অবশ্য বেঁচে আছি এখনও।"

হঠাৎ জোহান ভাবে বাস্টিয়ানকে সব কথা বললে কেমন হয়? ও হয়ত ভয় পাবে, কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দেবে না এতে সন্দেহ নেই। প্রকাশ্যে সে বলে: কখনও কি জিজ্ঞাসা করে দেখেছ কেন? জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর পাবে? পাছায় এক লাথি।"

বাস্টিয়ান বলে: "জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, আমাদের যা সম্পত্তি সে আমাদের পেটে পিঠেই আছে।"

জোহান শক্ত ক'রে জিভটা কামড়ে ধরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এবার গ্রামে ঝাড়াই-মাড়াই সুরু হ'ল। গোড়ায় যারা সুরু করল তাদের মধ্যে জেকব গুহেখলিন একজন। ঝাড়াই-মাড়াইএর কলটা ছিল মেরৎসএর খামারে। তার দামের মোটা অংশটা ঐ দিয়েছিল। বাকিটা অন্তান্তদের ভাগ ক'রে দিতে হয়েছিল এবং একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী তারা সেটা ব্যবহার করত।

সুসান গুহেখলিনের মাথার রুমাল, ভুরু, কাপড়-জামা সমস্ত তুষে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। গলাটা শুকনো, পেটটা তখনও বড়। মেয়েটাকে যে সব কাজ করতে বাধ্য করেছিল গুহেখলিন তাতে তাকে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে হ'ত নয়ত ভারী বোঝা বইতে হ'ত। বাস্টিয়ান যে জোহানকে বলেছিল বাচ্চাটার জান আছে—সে পেটের ভিতরটা আঁকড়ে আছে, সে কথা সত্যি। গুহেখলিনের ক্ষমতা ছিল হুকুম করার—মেয়েটা তামিল করত, বাচ্চাটা কিন্তু রয়েই গেল।

কিন্তু একদিন সকালে দুধ জড় হবার কেন্দ্রের দিকে যাবার সময় সুরু হয়ে গেল। বালতি নিয়ে প্রায় লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছে গিয়েছিল মেয়েটা, এমন সময় সে বুঝতে পারে যে, অন্তান্ত বার ছেলে হবার সময়ও এমনি ক'রেই সুরু হয়েছিল। সেই একরকম একঘেয়ে ব্যথা, গুহেখলিনের ঘুঁসির সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্তই। এখনও খানিকটা সময় নেবে। বালতিটা জমা দিয়ে দিতে পারবে সে।

আরও অনেক মেয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা গুহে খলিনে বৌকে নজর করে না, এমনিতেও ও তাদের কথার বিশেষ জবাব দিত না। কিউতে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বালতিটা পাশে রাখে সে। কেউ লক্ষ্য করে না যে ও কাৎরাচ্ছে। যখন ও চিৎকার সুরু করল তখনই কেবল অন্ত মেয়েরা ফিরে চাইল। নিজের চিৎকার কানে যেতেই সিঁটিয়ে যায় মেয়েটা, যেন মুখের উপর

একটা চাপড় পড়বার আশঙ্কায় শক্ত ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে।

যখন সে রকম কিছু হ'ল না তখন সে আবার চোখ খোলে। চারদিকে ঘিরে আছে কৌতূহলী উত্তেজনায় গোল চোখের রাশি। তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয় ওর। ভয় পেয়ে সে চেষ্টা ক'রে হাত দিয়ে চক্রটা ভেঙ্গে টলমল ক'রে বাড়ীর দিকে কয়েক পা এগোয়। তার পরেই মাটিতে লুটোতে সুরু করে। এবার সে অবশেষে বুঝতে পারে যে এ ব্যথা রোজদিনকার অভ্যস্ত ব্যথার চেয়ে আলাদা, এমনকি আগের আগের বারের স্বাভাবিক প্রসব-ব্যথার চেয়েও স্বতন্ত্র। কথা বলতে চেষ্টা করে সে, কিন্তু ঝাড়াই-মাড়াইএর ধুলোয় গলাটা ভেঙ্গে রয়েছে। মরীয়া হয়ে চারদিকে চায় সে, যেন কোনও একটা নিতান্ত জরুরী জিনিস ভুলে গিয়েছে যেটা ছাড়া সে বাঁচতে কিংবা মরতে পারে না।

সেই মুহূর্তে কি হচ্ছে দেখার জন্যে মেয়েদের ভিড় ঠেলে ঢোকে মারি আলগাইয়ার। সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে কথাটা গুহেখলিনের বৌ উচ্চারণ করতে পারছে না সে হ'ল বালতি। তখন সে বালতিগুলোকে তুলে নিয়ে আঙ্গিনায় রাখে এবং সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে। ইতিমধ্যে মেয়েরা ধাত্রী আনবার ঠিক করেছে। সিদ্ধান্তটা অবশ্য দেরিতেই নেওয়া হয়েছে, কারণ মেয়েটা তাদের প্রস্তাবে হাঁ বা না কিছুই বলে না। মারি ফিরে আসে। ও দিনটা ছিল হিসাবের দিন, সে মেয়েটার এপ্রনের পকেটে টাকাপয়সাগুলো গুঁজে দেয়। গুহেখলিন গিন্নী আবার ব্যথায় ছটফটিয়ে ওঠে, এখন তার চিৎকার থেমে যায়। অনেকক্ষণ হ'ল শব্দ বের করার মত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। নিশ্চল দাঁড়িয়ে মেয়েরা চেয়ে থাকে ওর দিকে। যে-জন্ম তাদের দিতে হচ্ছে না মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখে, যে-ব্যথা তাদের সইতে হচ্ছে না তাতে বিহ্বল হয়। ওর পক্ষে সেটা অসহ্য হচ্ছিল সেটা ব্যথা নয়, ব্যথার মাঝখানের ছেদটা। এত দিন পর্যন্ত জীবনের যা-কিছু খারাপ তাই সে জেনে এসেছিল, তার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না, এতটুকু ছেদ ছিল না। এখন হঠাৎ দেখা দিল কয়েক মুহূর্তের নিষ্ফল শান্তি যখন সমস্ত মানবিক চিন্তাকে আয়ত্ত করার জন্য মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল মাথাটা পরমুহূর্তেই আবার ডুবে যাচ্ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে। যন্ত্রণার মধ্যে, এই নিরুদ্ধশ্বাস কৌতূহলোদ্দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে তার মনটা জেগে উঠছিল মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়াবহ, সবচেয়ে ব্যাকুল চিন্তায়: সে হ'ল মৃত্যুর আশা।

মেয়েটার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে মারি আলগাইয়ার। মারির দৃঢ়, গোল মুখে, তার কোমল অমলিন চোখে প্রতিফলিত হয় গুহেখলিন গিন্নীর শূন্য দৃষ্টি। তথাপি এই প্রতিবিম্ব কেবল একটাই ছবি রচনা করে সে হ'ল এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবার এক গভীর কামনা।

মারি নিজের এবং মেয়েটার বালতিগুলোকে এক হাতে ঝুলিয়ে নেয় এবং অপর হাতের উপর মেয়েটার ভর রাখে। তারা একেবারে মাথায় মাথায় ঠিক সময়ে পৌঁছয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই গুহেখলিনের প্রতিবেশী বাস্টিয়ানরা একটা দিব্যি ছেলের প্রচণ্ড কান্না শুনতে পায়।

চাষী গুহেখলিন দুপুরে বাড়ী ফেরে, সব কিছুকেই যথাস্থানে গোছান দেখতে পায়।

মনটা তার হতাশায় ভরে যায়, কিন্তু সাময়িকভাবে ঘটনার নিয়মিত গতিরোধ করার মত কিছুই সে করতে পারে না। কাজেই সে বুড়ো মেরৎসএর সঙ্গে দেখা করে, রাষ্ট্রকে তার ছেলের জন্ম সম্বন্ধে বিধিমত খবর দেয়; তার পর পাদ্রীর কাছে গিয়ে নামকরণের জন্য নাম লেখায়। দ্বিতীয় দিনে গুহেখলিন গিন্নীর বুক দুধে ভরে ওঠে, তৃতীয় দিনে সে ঘরের কাজ করতে উঠে পড়ে, চতুর্থ দিনে সে স্বাভাবিক কাজকর্ম সুরু করে। তার স্বামীর মত সেও সব আশা ছেড়ে দেয়, আর সে মৃত্যুর কথা ভাবে না।

॥ ২ ॥

আলগাইয়ার হয়ত দুধের ট্রাকে চড়ে সহরে চলে যেতে পারত, কিন্তু হেঁটে যাওয়াই সে পছন্দ করে। সে কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে চায় না, 'বিশেষতঃ ফেরবার পর ত নয়ই।

শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়েছে বর্ষণ। আলগাইয়ার নিজেই হয়ত এই ধুলো আর গরমকে গ্রীষ্মের আগমন ব'লে ধ'রে নিত যদি সে না জানত যে ইতিমধ্যে ফসল তোলা হয়ে গিয়েছে। এখন তার উৎকণ্ঠা কমে গিয়েছে, চট ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। দুটো ছোট সহরের ক্ষেতগুলোর মাঝখান দিয়ে যাওয়া বড় রাস্তাটা ধরে চলতে থাকে। ক্ষেতের শেষে বাড়ী তৈরীর জমিগুলো এবং বেড়া-দেওয়া বালির খাদগুলো পর্যন্ত পৌঁছতেই আবার বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল জুতোর কালির কারখানার সামনেকার তৈলাক্ত সরু খালটার উপরে প্রথম যে সরাইটা পড়ে সেখানেই বসে পড়তে। কিন্তু তার যাত্রার উদ্দেশ্য এবং টাকাপয়সার লক্ষ্যটা

পূরণ হ'লে তবেই সে সরাইএ বসতে পারে। তখন তাকে আর দম বন্ধ ক'রে থাকতে হবে না, আবার সে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

খালের উপরকার লোহার সেতুটা পার হয় সে। কারখানার দিক থেকে শুঁড়ওয়ালা টুপি পরে কয়েকটা ছেলে আসে। এক পাইন্ট বীয়ারের জন্যে কয়েক ফেনিশ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না তাদের। আলগাইয়ারের মনে হয়, এরা উদ্ধত প্রকৃতির। এই প্রথম তার খেয়াল হয় যে তার টুপিটা অতিরিক্ত বড় এবং তার ধারগুলো দুমড়ে-মুচড়ে আর ছিঁড়ে গিয়েছে। মনটা তার ভারী হয়ে যায়। এবার একটা পালিশ রাস্তায় এসে পড়ে সে। রাস্তার দুপাশে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বাড়ীর সারি দেখে আলগাইয়ারের সন্দেহ হয় যে সে এ সহর ছেড়ে আদৌ খুশী মনে যেতে পারবে কি না। সহরের বাগানে ঢুকে দুটো খোয়া-বাঁধান রাস্তা পার হয় সে। তার লক্ষ্যে পড়ে ওভারঅল-পরা লোকজন বেড়া ছাঁটছে। পুরাণ সহর ঘেরা বিশাল দেওয়ালে খোদাই-করা প্রবেশদ্বারের কাছে সে পৌঁছে যায়। সচকিতে সে টুপিটাকে দু'হাতে চেপে ধরে, কারণ কাস্ট্রিৎমিউস্‌এর দোকান যেখানে সেই বাজার আর মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ইটের কাজের মধ্যে গাঁথা লোহার বালাগুলোর দিকে তাকায় সে। তার বাবা যখন তাঁর ভাইয়ের উইলে আপত্তি দিতে সহরে এসেছিলেন সেই সময়ে তাঁর হাত ধরে প্রথম সহরে ঢুকতে গিয়ে এগুলো দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল আলগাইয়ার। মোকদ্দমাটায় অবশ্য হার হয়েছিল, চোদ্দ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আলগাইয়ারের সমস্ত শৈশবের উপর বিচিত্র ছায়া ফেলেছিল এ মোকদ্দমার পরাজয়। তার বড় বড় হাত দু'খানা দিয়ে সে লোহার বালাগুলোকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে দিল, ঠিক যেমন করত তার ছোট ছোট হাত দু'খানা, লোহার বালাগুলো পাথরে ঠনঠন ক'রে উঠল। আজ যখন ঝুরঝুরে মরচেগুলো তার আঙুলে লেগে গেল তখন সে সেদিনকার মতই বিরক্ত হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময় সে অনেক সহরই দেখেছে, তবু এইটিই ছিল তার কাছে সকল সহরের নির্যাস। ছাদের উপর উঁচু হয়ে-ওঠা গির্জার গম্বুজ দেখা দিল খিলান-দেওয়া গেটের আলোকিত প্রবেশদ্বারে, আলগাইয়ারের কাছে পৃথিবীতে ভগবানের আর কোনও পীঠস্থান ছিল না।

আদ্যিকালের দরজাটা দিয়ে সে যখন বাজারের চৌহদ্দিতে ঢুকল তখন টুপিটা ছেড়ে দিয়ে বুকের উপর হাত রাখল সে। বাজার বার না হলেও বাজার এলাকায় অসাধারণ ভিড় দেখা যায়। লোকের মাথার উপর দিয়ে কাস্ট্রিৎসিউজের সাইন বোর্ড দূরদর্শনক্ষম আলগাইয়ারের নজরে আসে। সে জানত যদি সে তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে না পারে তা হ'লে অবস্থা তার নিতান্ত কাহিল হবে। অন্য কোনও সাধারণ কাজের দিনে বাজার এলাকা এত কালো, এত অশান্ত কখনও দেখায় নি। কিন্তু আলগাইয়ার অবাক্ হয় না কারণ তার মনেও উত্তাল তরঙ্গ। সমস্ত জীবনধারা পথ বেয়ে বাজারে এসে পড়ছে এটাই ঠিক মনে হয় তার কারণ এই-ই তার পীড়িত হৃদয়ের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।

চারজন-পাঁচজনের এক একটা জমাট দলে ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। জুতোর কালির কারখানার মজুরেরা, গোল্ড এণ্ড সনের বয়স্কা এবং তরুণী মেয়েরা, কালো পোষাক-পরা বেশ কয়েকজন বণিক, পাঁচমিশেলী কাজের জোগাড়ে—কারও হাতে এক বোঝা লোহার নল, কারও বা বগলে এক জোড়া ঘোড়ায় চড়ার বুট গোঁজা। একটি ছোট্ট শিক্ষানবীশ ত নতুন বেতের চেয়ার পৌঁছে দিতে এসে তার উপর বসেই পড়েছে।

যে দলে দাঁড়িয়েছিল আলগাইয়ার যদিও তার মাঝখানটা ওর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না তবু সে শুনতে পাচ্ছিল রাগে কাঁপা গলার একগুঁয়ে স্বর। দলগুলোর মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় গতকালের গরু-ঘোড়ার বাজারের পর গোবরনাদি পড়ে ছিল, এখনও ঝাঁট দেওয়া হয় নি, সেগুলো ঠোকরাচ্ছিল পায়রার দল। বাজারের দিকে পিছন করে লাল টাউন হলের দেওয়ালে আঁটা পোষ্টারগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল দু'দল লোক। প্রচারপত্র বিলি করার লোকেরা আলগাইয়ারের খালি হাতে এবং পকেটে কাগজ গুঁজে দিচ্ছিল। তিন রবিবার আগে তার মেয়ে মারি যা করেছিল আলগাইয়ারও ঠিক তাই করে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি করার জন্যে সে থেমে গিয়ে কাগজগুলোকে একসঙ্গে ভাঁজ করে, তার পর না পড়েই পকেটে রেখে দেয়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দুটো আঁকাবাঁকা রেখা ধরে সে টাউন হলের উল্টো দিকের রাস্তার উপর অফিস বাড়ীগুলোয় পৌঁছয়।

বেশীর ভাগ অফিস বন্ধ দেখে ও অবাক্ হয়। স্টাউবের দুধ-মাখনের দোকান খোলা। দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রের লায়ে ডেকে দু'হাত আড়াআড়ি ক'রে বুকে রেখে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। আলগাইয়ারকে ডাক দেয় সে। কাস্ট্রিৎসিউজও তখনও খোলা, কিন্তু সাদা এপ্রন পরা

একটি মেয়ে এবং একজন শিক্ষানবীশ কেবল লোহার ঝাঁপ বন্ধ করতে চেষ্টা করছিল। বিক্রি করার লোকটা দরজায় দাঁড়িয়েছিল, মুখখানা লাল এবং ভীত। আলগাইয়ার তার কাছে পর্যন্ত এগোয়, কিন্তু লোকটা হাত নেড়ে বলে: "অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তোমার, এখন আমরা বন্ধ করছি।" আলগাইয়ার বলে: "আমাকে ঢুকতে দিতেই হবে। আমি বিশেষ কাজে এসেছি, বেশীক্ষণ সময় লাগবে না।" বিক্রির লোকটা বলে: "আর হয় না, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।" আলগাইয়ারের কাঁধের উপর দিকে চেয়ে থাকা তার চোখ দুটো যেন পাথর বনে যায়। আলগাইয়ার পিছন ফেরে। হঠাৎ তার পিছনে এক দঙ্গল ছেলে জুটে চিৎকার করতে থাকে "সব ভিতরে ঢোক, ঢোক সব্বাই!" ভয় পেয়ে আলগাইয়ার বিক্রির লোকটার দিক থেকে এই অদ্ভুতভাবে 'ভিতরে, ভিতরে ব'লে চিৎকারে মত্ত ছেলেগুলোর দিকে চোখ ফেরাতে থাকে। ছেলেগুলো আবার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পা ঠুকছিল। হঠাৎ বিক্রির লোকটা আনাড়ি শিক্ষানবীশের দিকে লাফিয়ে পড়ে লোহার ছিটকিনি বন্ধ ক'রে দেয়। আলগাইয়ার তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ে।

বিক্রির লোকটা তার পিছনে এসে দরজা বন্ধ করে। সে আলগাইয়ারকে পিছনের দরজা দিয়ে আঙিনার ওপাশের রাস্তায় ঠেলে বার ক'রে দেবার চেষ্টা করে। "আমরা বন্ধ করছি, হের আলগাইয়ার, অন্য সময়ে আসবেন হের আলগাইয়ার।" বাইরে থেকেও লোহার ঝাঁপ বন্ধ হবার খড়খড় আওয়াজ আসতে থাকে, হঠাৎ রীতিমত অন্ধকার হয়ে যায়। বিক্রির লোকটা আলো নিভিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি টুপি খোলে আলগাইয়ার, আবার তেমনি তাড়াতাড়ি টুপিটা ফের বসিয়ে দেয় তার টাক মাথার উপর। যেখানে ধাতুর যন্ত্রাংশ, মোমের আস্তরণ দেওয়া কাঠের বালতি, টব, ফসল মাড়াইএর যন্ত্র ইত্যাদি রয়েছে কৃত্রিম আলোয় সেই দিকে চোখ চারাতে থাকে সে। তারপর সে তার নালিশ সুরু করে। "ভগবানের দোহাই, এ আবার কি?" পাশের ঘর থেকে হাঁক শোনা যায়। আলগাইয়ারের বিলাপ চলতে থাকে। এবার অফিস ঘরের থেকে সরু সিঁড়ি দিয়ে স্বয়ং মালিক নেমে আসে। তার নাম কাব্রিৎসিউক্স নয়, বাউম।

আলগাইয়ারের কাঁধে সে হাত রাখে। শান্তভাবে আলগাইয়ারের টুপির নীচে তাকায়। আলগাইয়ারের শূন্যে উঁচান দাড়ি তার চিবুক ছোঁয়। কিস্তির ব্যাপারে যে সব চাষীরা তাকে কোর্টে টানতে চায় তাদের কাছে যেমন ক'রে মাসে চার-পাঁচবার তাকে বলতে হয়, তেমনি শান্ত সংযত ভাবে সে বলতে থাকে: "শোন আলগাইয়ার সাহেব, তোমার ব্যাপারটা আমি ভালভাবে জানি। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। এ অবস্থার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। শীগগিরই আমাকেই ব্যবসা গুটোতে হবে। আমাকে কেউ সাহায্য করে না, তোমাকেও সাহায্য করতে পারব না আমি। টাউন হলে একটা খবরাখবরের বিভাগ রয়েছে, ২ নম্বর ঘর—কৃষি উপদেষ্টা বোর্ড—যতদুর আমার মনে পড়ছে। তবে তুমি আর একবার জিজ্ঞাসা করে নিও।" এক হাতে সে দরজাটা খোলে, অন্য হাতে আলো নিভিয়ে দেয়। বুঝতে পারার আগেই আলগাইয়ার আঙিনায় এসে পড়ে।

বাক্সের গাদার মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে সে দরজায় পৌঁছয়, দরজা দিয়ে রাস্তায়, রাস্তা থেকে বাজার এলাকায়।

লাল বেলে পাথরে তৈরী টাউন হলটা যুদ্ধের পর তোলা হয়েছে। এর একতলায় দুটো বিভাগ ছিল, একটা পুলিশ-সংক্রান্ত আর একটা দায়রা-সংক্রান্ত। গেটের সামনে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আলগাইয়ারকে ইনস্পেক্টরের অফিসে পাঠায়। আলগাইয়ার সেখানে না গিয়ে নিজেই নম্বরটা খুঁজতে থাকে। দালানগুলোর মধ্যে পথ ভুল হয়ে যায় তার, সিঁড়িতে ফিরে গিয়ে আবার গোড়া থেকে খোঁজা সুরু করে। এবার সে গন্তব্যস্থল খুঁজে পায়।

দরজার সামনে একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করছিল লোকজন। আলগাইয়ার ঠিক জানত না ওটা কিসের ঘর। সে বসে পড়ে প্রধানতঃ ক্লান্ত ব'লেই। কিছুই না করতে পারার ভয়টা আর ছিল না তার। সহরে যাওয়ার কোনও মানে ছিল না, এখানে অপেক্ষা করারও মানে নেই কোনও। বাড়ীতে যখন ছেলেটা চাষ করছে তখন এখানে সময় নষ্ট করার জন্য তার রাগ ধরতে থাকে। গরুতে জমিগুলো একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছে, সেগুলোতেই মই দিচ্ছে পাউল। এই প্রথম একা চাষ করছে পাউল। আলগাইয়ার যখন প্রথম একা চাষ করে বাবা তখন তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন, জানলা দিয়ে মা বলেছিলেন: "কল্যাণ হোক।" আজ সকালে সবই তড়িঘড়ি করা হ'ল, পাউল গজগজ করতে করতে বলল: "বেশ, তা হ'লে আমি একাই করব।"

যা-কিছু করতে গেছে আলগাইয়ার, তাতেই হার হয়েছে তার, পৃথিবীতে আর কোন আনন্দ নেই। গেলবারে সারাটা বছর ধ'রে কুঙ্কেলদের জন্যে পাউলের সঙ্গে তার গোলমাল ছাড়া কিছুই হ'ল না। আলগাইয়ার ভাল ক'রেই জানত যে শেষপর্যন্ত পাউল যা পছন্দ করে তাই করবে, আর ঠিক সেই জন্যই সে কিছুতেই বলল না ভগবানের নামে তাই কর। এই কাল রাত্রেই তার শক্ত হাসিখুশী পাউল বকবক সুরু করেছিল: "কেন আমাকে যেতে দিচ্ছ না বাবা?" সে জবাব দিয়েছিল: "আমি চাইনে আমার ছেলে দাসত্ব করে, আমাদের অবস্থা খারাপ ঠিকই, কিন্তু এমন নয় যে ছেলেকে দাসত্ব করতে যেতে হবে।" শুনে পাউল পা ঠুকে গর্জে উঠেছিল: "কি? দাসত্ব? কোথায়?" "ঐ ব্রাইড়াইজের পিছনে পিছনে ঘোরা, অনাত্মীয়দের কাছ থেকে জামা-কাপড়ের পয়সা নেওয়া যাতে তারা তোমায় দিয়ে…" "আমায় দিয়ে কি?" "চুপ কর"—চেঁচিয়ে উঠেছিল আলগাইয়ার। বলে নি: দোহাই ভগবান, যাও তুমি। মনে মনে সে পাউলের চেয়ে মারিকে বেশী পছন্দ করত। সে ছিল ঠাণ্ডা-মেজাজের, সব সময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত। আলগাইয়ার বুঝতে পারত না কিসের জন্য ছেলেমেয়েরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে, কিসের জন্যই বা সে যাই ছোঁয় তাই তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়।

ভাবনা থামিয়ে সে বাইরের দিকে চায়। তার পাশের বুড়ো রোগা লোকটা তার বিবর্ণ গোঁফ নিয়ে সেই সময়েই চোখ ফেরায়। বিষণ্ণ এবং সন্দেহপীড়িত দৃষ্টি বিনিময় হয় পরস্পরে। বুড়ো লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলতে সুরু করে তার ছোট্ট বাগানটার কথা যেটা হঠাৎ দেখা যাচ্ছে বাড়ী তোলার জমির মধ্যে পড়ে গেছে। তার পর সে বলে: "প্রুশিয়ায় ওরা আর একজন লোক নিয়োগ করেছে—মস্ত লোক।" আলগাইয়ার কাঁধ ঝাঁকায়। কথা বলার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করে নতুন লোকটা ক্যাথলিক কি না? "হাঁ, ক্যাথলিকও বটে।" "কিছু করতে পারবে?" দুজনেই একমত হয় যে লোকটা কিছু করতে পারবে না।

তাদের আগে আরও চারজন লোক ডাকের জন্য অপেক্ষা করছিল। অফিসটা একটায় বন্ধ হয় আবার তিনটেয় খোলে। খালের ধারের ছোট্ট সরাইটাতেই থাকলে পারত সে। এখানে সে বসে আছে কেবল বাড়ী যেতে ভয় হচ্ছে ব'লে। কিন্তু এবার সে উঠে পড়ে এবং উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। সিঁড়িতে পৌঁছানর বদলে সে একটা অর্ধবৃত্তাকার পথ ঘুরে বাড়ীটার বাঁ অংশে পৌঁছয়। সে প্রায় নীচে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা বড় লাল পোষ্টারের উপর তার নজর পড়ে। পাঁচ শ মার্ক পুরস্কার। টাকার অঙ্কটার বিরাটত্ব দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সে। কি করে এ টাকা রোজগার করা যাবে জানবার জন্য সে কাছাকাছি এগিয়ে যায়।

উপরে যার ছবি রয়েছে সে লোকটির নাম হান্স্ সুলৎস্, বয়স কুড়ি বছর, লাইপজিগে বসতি। ৩রা এপ্রিল তারিখে উক্ত সহরে এক তথাকথিত ভুখ মিছিলের সময় এ একজন পুলিশের লোককে ছোরার মারাত্মক আঘাতে নিহত করে। ফেরারীর পরনে নীল সার্ট, খাটো ট্রাউজারস্, বায়ুরোধী কোট ও শুঁড়তোলা টুপি ছিল। তাকে ধরিয়ে দিলে অথবা যার উপর ভিত্তি ক'রে তাকে ধরা যাবে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিলে এই পুরস্কার পাওয়া যাবে।

আলগাইয়ার পিছিয়ে গিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ছবিখানা দেখতে থাকে। সে যত দেখে ততই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। টুপিটা দু'হাতে পাকড়ে ধ'রে মাথাটা পিছনে হেলায় সে। তার ময়লা দাড়ি খাড়া হয়ে ওঠে যেন তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। আলগাইয়ার এমন ভাবে নড়ে-চড়ে ওঠে যেন সবচাইতে কাছের দরজাটা খুলে সে চেঁচিয়ে উঠবে: "পেয়েছি ওকে!"

কিন্তু তার পর তার মনে হয় খোলা হাওয়ায় গিয়ে একবার দম নেবার সময়ের দরকার। আস্তে আস্তে সে সিঁড়ি দিয়ে নাবে। বাজার এলাকা এখনও লোকের মাথায় মাথায় কালো হয়ে আছে, একগুঁয়ে হাঁফধরা লোকের ভিড়। আলগাইয়ারের মনে হয় সে হয়ত তার হকের ধন হারাবে। হয়ত গ্রামে ফিরে গিয়ে খামারের মালিক মেরৎসকে তার আবিষ্কারের কথা জানানই ভাল। মেরৎস পুলিশ ডাকবে। তারা এসে অতর্কিতে ছেলেটাকে ধরবে, হাতকড়া দিয়ে তাকে গ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ এসে মাঝখান থেকে পড়ে তাকে টাকাটা থেকে বঞ্চিত করবে আলগাইয়ারের এই ভয় ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বাজার এলাকার মধ্যে দিয়ে হেঁটে সহরের গেট পার হ'তে গিয়ে এবং পার হবার সময় লোহার বালাগুলোকে ছুঁতে গিয়ে ও গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। গত সপ্তাহে সে মেরৎসকে অনুরোধ করেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পুরাণো কলটা মেরামত হয় ততক্ষণ কাটার কলটা তার স্ত্রীকে ব্যবহার করতে দিতে। মেরৎস একটা স্পষ্ট

ওজর দেখিয়ে অস্বীকার করে এবং কনরাড বাস্টিয়ান ভাড়া চায়। লালেদের দিয়ে কোনও কাজ হবার নয় আলগাইয়ারের। কাউকে দিয়েই কোনও কাজ নেই তার। ওরা তাকে কখনও কিছু দেয় নি। কেউ তাকে কিছু দেয় নি কখনও। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত: বুড়ো মেরৎস লালদের যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশী ঘৃণা করে, কলেরা এবং মহামারীর চেয়ে বেশী, এক লক্ষ কুষ্ঠের চেয়ে বেশী। সমস্ত গ্রামের আক্রমণের সামনে ছেলেটাকে ফেলতে পারলে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটবে মেরৎস-এর মুখে।

আলগাইয়ার তার আর্জিটা নিয়ে যখন মেরৎসএর কাছে গিয়েছিল তখন দুপুরের খাবার সময়। দরজার ফাঁক দিয়ে ইতিমধ্যে বেকনের গন্ধ বেরোচ্ছিল, ঠিক বড়দিনের মত। ছেলেটার কি বাবা ছিল না যে ভুখা বলে রাস্তায় চেঁচাতে যাবার জন্য তাকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিতে পারত? বুড়ো মেরৎস রাখালকে পয়সা দিয়েছে গরুর পাল তাড়িয়ে তার ক্ষেতে নিয়ে যাবার জন্য, যাতে সার পড়ে তার ক্ষেতের উর্বরতা বাড়ে।

পার্কটাকে পিছনে ফেলে আলগাইয়ার এখন পালিশ সাদা রাস্তাটা দিয়ে চলছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে এমন কিছু একটা হয়ে পড়বে যাতে তাকে এই টাকা থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। কি আসে-যায় যদি তার বৌ বকবক করে কিংবা তার ছেলেমেয়েরা পিছনে গজগজ করে। যদি এখনই সে তার দাবি নিয়ে মেরৎসএর কাছে না যায়, তা হ'লে সবটা সে নিজের মধ্যেই রেখে দেবে—চিরকালের মত। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র তার হাতেই এ আবিষ্কার নিরাপদ। আন্দ্রিয়াজ বাস্টিয়ান নিশ্চয়ই কিছু জানে না, জানলে সে মূর্ছা যেত। আলগাইয়ার একথা আন্দ্রিয়াজ বাস্টিয়ানকে বলবে না, হান্‌স্ সুলৎসকেও বলবে না। পাদ্রীকেও বলবে না সে। কেন সে বলতে যাবে? ভগবান ত জানেনই। ছেলেটা শান্তিতে থাক-দাক, আত্মীয়ের ক্ষেতে কাজ করুক। নিজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের কাছেও ঘুণাক্ষরে সে প্রকাশ করবে না। ছেলেটার কি ভাগ্য যে সেই পোষ্টারটা দেখেছে।

পা দুটো তার ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু সামনে আরও আধঘণ্টার পথ ভেবে সে খুশী হয়। এখনও তার অনেক কিছু ভাবতে হবে। খালের উপরকার সরু লোহার সেতুতে উঠে সে স্বগতোক্তি করে: "এতে তোমাদের উদ্দেশ্য বেশ সিদ্ধ হয়, তাই না?"

এই 'তোমাদের' বলতে যে সে কাকে বোঝাতে চায় সে কথাটা সে নিজেই জানে না। [ক্রমশ:

—•—

আর্থার কোনান ডয়েল

[সার আর্থার কোনান ডয়েল চিকিৎসক রূপে যতটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন গোয়েন্দা কাহিনীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে। প্রথমে তিনি গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে একটুও আগ্রহশীল ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এক অধ্যাপক—ডাক্তার বেল্‌কে দেখে তিনি শার্লক হোমস্ নামে এক আদর্শ গোয়েন্দার গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। এই ডাঃ বেল ছিলেন একজন সূক্ষ্মদর্শী লোকচরিত্র বিচারক। প্রত্যেক জিনিষের খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করতেন ও এমন নির্ভুলভাবে তথ্য নির্ধারণ করতেন যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত। ডাঃ বেলের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে কোনান ডয়েল সৃষ্টি করলেন গোয়েন্দা শার্লক হোমস্‌কে। তাঁর বই "এ্যাডভেঞ্চারস্ অব্ শার্লক হোমস্" পড়ে পাঠকেরা বুঝতে পারলেন প্রকৃত গোয়েন্দা কাকে বলে। এই বইখানি প্রকাশিত হবার পরেই কোনান ডয়েলের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি অপরাধ বিজ্ঞানের ধুরন্ধর পুলিস কর্মচারীরাও স্বীকার করলেন যে কোনান ডয়েল অতি নিপুণভাবে অপরাধীকে ধরবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। গোয়েন্দা কাহিনীকে পূর্বে লোকে অসার কল্পনাপ্রবণতা বলে মনে করত কিন্তু প্রকৃত অপরাধ বিজ্ঞানের সাহায্যে গোয়েন্দাকাহিনী যে কত উপাদেয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্-এর মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করে দিলেন।

এ বইখানি এত বেশি বিক্রী হ'ল যে, কোনান ডয়েল এতে প্রচুর অর্থ লাভ করলেন। ক্লাবে, বৈঠকে, সভা-সমিতিতে সর্বত্রই শার্লক হোমস্-এর কথা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এমন কি কেউ কেউ শার্লক হোমসের মত পর্যবেক্ষণ-শক্তি দেখিয়ে বাহবা নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরাও পথে কুড়িয়ে-পাওয়া বা অপরের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র নিয়ে শার্লক হোমসের অনুকরণে সুরু করে দিলে সমালোচনা। চারিদিকে শুধু শার্লক হোমসের কথা। কোনান্ ডয়েলের জয় জয়কার। ডাক্তারীর দিকে তত মন না দিয়ে তখন কোনান ডয়েল আশ্চর্য ধরনের উপন্যাস ও গল্প লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর উপন্যাস প্রকাশ মাত্রই হু হু করে বিক্রী হতে লাগল। শেষে তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখে তাঁকে মহাগৌরবের "স্যার" উপাধি দেওয়া হ'ল।

কোনান ডয়েলের রচনার প্রধান গুণ, ভাষার সরলতা ও বক্তব্যের নিপুণতা। যে গল্পটি তিনি বলতে চাইতেন সেটি সবদিক দিয়ে বিশেষ বিচার করে উপযুক্ত তথ্যাদি যোগ দিয়ে তবে সেটি বলতেন। সেই কারণে তাঁর গল্প কোথাও আজগুবি বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ত না। তাঁর সৃষ্ট শার্লক হোমস্‌কে নিয়ে অপর কোন লেখক আরও কিছু লিখে বসেন তাই তিনি শেষে শার্লক হোম্স্-এর মৃত্যু ঘটিয়ে তবে ছাড়লেন। শার্লক হোমসের এই কাল্পনিক মৃত্যু সংবাদে শোনা যায় অনেকেই শোক-চিহ্ন স্বরূপ কালো ফিতা ধারণ করেছিলেন।

"দি হাউণ্ড অব দি ব্যাস্কারভিল্‌স্"—কোনান ডয়েলের আর একখানি আশ্চর্য গোয়েন্দা কাহিনী।]

দি হাউণ্ড অব্ দি ব্যাস্কারভিলস্

স্যার হেনরী আমেরিকা থেকে এসেছেন তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ব্যাস্কারভিলস্ জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হয়ে। তিনি জন্ম থেকে বরাবর আমেরিকায় থাকতেন, এদেশের জমিদারী সম্বন্ধে কোন খবরই তাঁর জানা ছিল না। তাঁর খুড়ো চার্লস মারা যাবার পরই তাঁকে আসতে হ'ল এদেশে।

ব্যাস্কারভিলস্ প্রাসাদে পা দিয়েই তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন। প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে এই অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ। মাঠের আর এক

দিকে একটা বহুদূর বিস্তৃত জলাভূমি। সেই জলাভূমির ওধারে একটা পাহাড়। জমিদারী বলতে যা বোঝায় সে সব কিছুই সে প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও নেই। প্রজারা অনেকদূরে অন্য তালুকে বসবাস করে। শুধু সেই প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে ব্যাস্কারভিল্স্ প্রাসাদ একাকী দাঁড়িয়ে আছে অতীতের একটা দুঃস্বপ্নের মত।

পুরাতন সর্দার ভৃত্য ব্যারীমোর সেই প্রাসাদের এক-পাশে সস্ত্রীক বাস করত। সে এসে অভিবাদন করে নূতন মনিব সার্ হেনরীর সামনে দাঁড়াল।

সার হেনরী প্রশ্ন করলেন—এত বড় প্রাসাদের এ ভগ্ন অবস্থা কেন? জমিদারীর আয় ত শুনেছি যথেষ্ট।

ব্যারীমোর উত্তর দিলে—"প্রভু, এ প্রাসাদে কেউ ভয়ে বাস করতে চায় না।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

ব্যারীমোর তখন সার হেনরীকে একটা প্রকাণ্ড হলঘরে নিয়ে গেল। সেই হলঘরের দেওয়ালে বড় বড় অয়েল-পেন্টিং। সার হেনরী শুনলেন এ সব চিত্র তাঁর পূর্ব-পুরুষদের। প্রত্যেক পূর্বপুরুষের চেহারায় যথেষ্ট আভিজাত্যের ছাপ, মুখে দম্ভের হাসি। ব্যারীমোর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। প্রথম সারির একটি অয়েলপেন্টিং দেখিয়ে সে বলল—"ইনি হ'লেন মহামান্য হিউগো ব্যাস্কারভিল্। চারশ বছর আগে ইনিই ছিলেন এই জমিদারীর মহাপ্রভাবশালী কর্তা। কিন্তু তিনি এক দারুণ দুর্ঘটনায় মারা যান।"

—"দুর্ঘটনা?" স্যার হেনরী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

—"আজ্ঞে হাঁ প্রভু, দুর্ঘটনা ছাড়া সেটাকে আর কি বলা যেতে পারে।"

—"ব্যাপারটা কি, খুলেই বল।" —বেশ গম্ভীরস্বরেই সার হেনরী প্রশ্নটা করলেন।

ব্যারীমোর বলতে লাগল।

—"মার্জনা করবেন প্রভু, এই হিউগো ব্যাস্কারভিল্স্ অতি দুর্দান্ত ও অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তাঁর অনুচরেরাও দুশ্চরিত্র ও মাতাল ছিল। একবার হিউগো তাঁর এক প্রজার পরমাসুন্দরী তরুণী মেয়েকে জোর করে ধরে এনে তাঁর প্রাসাদের দোতলার একঘরে বন্দী করে রাখেন। সেই ঘরের পাশের ঘরে বসে হিউগো তাঁর অনুচরদের নিয়ে খুব মদ খেতে লাগলেন।

অসহায় মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করে হিউগোর দয়া প্রার্থনা করেছিল. কিন্তু হিউগো পৈশাচিক হাসি হেসে তাকে খুব ধমকে দিলেন। তারপর আবার পাশের ঘরে বসে মদ খেতে লাগলেন। মেয়েটি তখন নিরুপায় হয়ে বিছানার চাদর পাকিয়ে নিয়ে জানালায় বেঁধে কোনরকমে সেই ঘর থেকে নেমে এল। তারপর প্রাণের ভয়ে মাঠের ওপর দিয়ে অন্ধকারেই ছুটতে লাগল তার বাড়ীর পথে।

হঠাৎ কি রকম করে এ কথা তখনি টের পেলেন হিউগো। তাঁর অনুচরেরা তখন তাঁকে পরামর্শ দিল—বড় বড় ব্লড্ হাউণ্ড্ কুকুর লেলিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে হত্যা করতে। হিউগো তখনি কয়েকটা বড় বড় হিংস্র ব্লড হাউণ্ড কুকুর ছেড়ে দিলেন মেয়েটির উদ্দেশে। দুর্দান্ত কুকুরগুলো ছুটে চলল মাঠের দিকে।

হঠাৎ হিউগোর মনে হ'ল, মেয়েটাকে এভাবে কুকুর লেলিয়ে হত্যা না করলেও চলত। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তাই কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে আনতে তিনিও ছুটলেন একলা মাঠের দিকে ঘোড়ায় চড়ে।

একটু পরেই মাঠের দিক থেকে ভেসে এল এক অতিভয়ার্ত করুণ চিৎকার। হিউগোর চাকরেরা ও সহচরেরা তখন ছুটল মাঠের দিকে।

দেখা গেল, হিউগোর ঘোড়াটা সওয়ারহীন অবস্থায় ভয়ানক আতঙ্কে যেন পাগলা হয়ে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে।

সকলে ভয় পেয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখে যে মাঠের একস্থানে মেয়েটি মরে পড়ে আছে আর তারই অনতিদূরে হিউগো উপুড় হয়ে রয়েছেন, আর তাঁর পিঠের উপর দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড অচেনা কুকুর তাঁর ঘাড় কামড়ে তাঁর রক্ত চুষে খাচ্ছে চক্ চক্ করে।

কুকুরটা দেখতে অতি ভয়ানক। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। এই ভীষণ দৃশ্য দেখে হিউগোর সহচরেরা প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এল।"

গল্পটা শুনতে শুনতে স্যার হেনরী এবার তাঁর চেয়ারে একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। ব্যারীমোরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন—"তারপর কি হ'ল?"

ব্যারীমোর একটু থতমত খেয়ে বললে—"তারপর যাঁরা যারা উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তাঁরা সকলেই কোন-না-কোন দারুণ দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন। একজনেরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি।"

—"আমার আগেই যিনি এখানকার জমিদার ছিলেন অর্থাৎ আমার খুড়ো স্যার চার্লস, তাঁরও কি এইভাবে মৃত্যু হয়েছিল?" প্রশ্ন করলেন স্যার হেনরী।

ব্যারীমোর বললে—"আজ্ঞে হাঁ, ঠিক একই রকম ব্যাপার। আপনার খুড়ো স্যার্ চার্লস্ আফ্রিকা থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে দেশে ফেরেন। তারপর তিনি বাস

করতে লাগলেন এই প্রাসাদেই। কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনিও মাঠের মধ্যে মরে পড়ে আছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন কিছু একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, তাঁর মৃতদেহের পাশেই ভিজে মাটিতে খুব বড় একটা কুকুরের বড় বড় পায়ের ছাপ ছিল।"

স্যার হেনরী এবার প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, এ সব ভয়ানক গল্প বলে ভয় দেখিয়ে আমাকে এ প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দেওয়াও ত তোমাদের উদ্দেশ্য হতে পারে। এটা তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র, এ কথাও ত আমার মনে আসতে পারে?"

ব্যারীমোর এবার প্রায় কেঁদে ফেললে, বললে—"প্রভু, আমি অনেকদিনের পুরানো চাকর। আপনাদের বংশের অনেক নুন খেয়েছি। যা' বললাম সেটা নিছক সত্যিকথা। এতে আপনি যদি আমাদের বদনাম দেন, তবে আর আমি কি করতে পারি?"

স্যার হেনরী এবার মৃদু হাস্য করলেন, বললেন—"ভয় পাবার ছেলে আমি নই। তবে প্রায় চারশো বছর ধরে একই রকম মৃত্যুবিভীষিকা চলছে এটাও ত সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।"

ব্যারীমোর বললে—"সন্দেহ শুধু আপনার একার নয় প্রভু, সন্দেহ আমারও মনে জেগেছে, তবে দুর্ঘটনাগুলো সমানেই চলছিল।"

ঠিক এই সময়ে আর একজন চাকর একখানা চিঠি এনে স্যার চার্লসের সামনে রাখলে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন—"আমি এ প্রাসাদে পা দিতে-না দিতেই আমার নামে চিঠি! ব্যাপার কি?"

চিঠিখানা খুললেন তিনি। কিন্তু চিঠি পড়েই তাঁর চোখেমুখে চিন্তার ঘন ছায়া দেখা দিল।

চিঠিতে লেখা ছিল—"সাবধান স্যার হেনরী, খুব সাবধান। কোনদিন রাত্রে একলা মাঠের দিকে পা বাড়াবেন না।"

চিঠিতে কোন স্বাক্ষর নেই, তা' ছাড়া ছাপার হরফ কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে একসঙ্গে জুড়ে কথা সাজানো হয়েছে। যাতে হাতের লেখা ধরা না পড়ে।

স্যার হেনরী মৃদু হেসে ব্যারীমোরের দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এবার বোধ হয় আমার পালা ব্যারীমোর। কিন্তু এই চিঠি থেকেই আমি যেন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি।"

ডাঃ মর্টিমার ছিলেন ব্যাস্কারভিল্‌স্ জমিদার বংশের গৃহ-চিকিৎসক। স্যার হেনরী তাঁকেই পাঠালেন লণ্ডনে, একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার সন্ধানে। ডাঃ মর্টিমার তখন এসে উপস্থিত হ'লেন সহরে শার্লক হোম্‌সের বাড়ীতে।

শার্লক হোম্‌স্ বেসরকারী গোয়েন্দা হ'লেও, দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ডাঃ মর্টিমারের সঙ্গে তাঁর অল্প পরিচয়ও ছিল।

শার্লক হোম্‌স্ ধীরে ধীরে সব কথা শুনলেন, তারপর বললেন—"আমি একবার স্যার হেনরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাকে একবার আমার বাড়ীতে নিয়ে আসুন না। আমি নিজে সেখানে যেতে পারতাম কিন্তু এখনই আমি আত্মপ্রকাশ করতে চাই না।"

স্যার হেনরী শার্লক হোম্‌সের বাড়ীতে এলে তিনি স্যার হেনরীকে বললেন—"একটা যে গভীর ষড়যন্ত্র এর পিছনে আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই আমার মনে হয়, আপনার পক্ষে এখন সে প্রাসাদে বেশিদিন না থাকাই উচিত। তবে উপস্থিত আমি সেখানে যেতে পারব না। আমি আমার বন্ধু ওয়াটসনকে পাঠাচ্ছি আপনার সঙ্গে। ওয়াটসন আপনার প্রাসাদেই থাকবে আর প্রতিদিনের ঘটনা আমাকে চিঠি লিখে জানাবে।"

ওয়াটসন্ শার্লক হোমসের বন্ধুও বটেন আবার সহকারীও বটেন। তিনি ব্যাস্কারভিল্‌স্ প্রাসাদ দেখে খুবই চিন্তিত হ'লেন। এতবড় একটা প্রাসাদে শুধু কয়েকজন ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই। বড় বড় ঘর, হলঘর যেন খাঁ-খাঁ করছে। আশপাশে কোন লোকবসতি নেই। শুধু প্রকাণ্ড মাঠটা একটা বিভীষিকার মত যেন সামনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। তার পাশের জলাভূমি থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। এমন নির্জন ও এমন ভীষণ পরিবেশ ওয়াটসন যেন পূর্বে কল্পনাও করতে পারেন নি। তবুও তিনি খুব তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন চারিদিকে।

এখানে আসার দিন রাত্রেই তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন ব্যারীমোর লণ্ঠন নিয়ে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে বহু দূরের কোন লোককে যেন আলোর ইঙ্গিত করছে। তিনি এবার ব্যাপারটা কি জানবার জন্য ব্যারীমোরকে খুব জেরা করতে লাগলেন। অবশেষে ব্যারীমোর স্বীকার করল যে তার স্ত্রীর ছোট ভাই জেল থেকে পালিয়ে ঐ দূর পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে আছে। প্রতিদিন ব্যারীমোর তাকে খাদ্য পাঠিয়ে দেয়। তার সঙ্গে আলোর ইঙ্গিতেই যা-কিছু

কথাবার্তা চলে, সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলার সময় তার নেই।

ওয়াটসন কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি ব্যারীমোরের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলেন।

স্যার হেনরী একথা জানতে পেরে ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে ব্যারীমোরের সম্বন্ধীকে ধরবার জন্য পাহাড়ের দিকে গেলেন। দুর্গম পথ, জলাভূমি পার হ'তে না পেরে তাঁরা অনেকটা ঘুরে পাহাড়ের কাছে গেলেন। সেই পাহাড়ে সত্যিই একটি গুহা ছিল, সেই গুহাতে তাঁরা উপস্থিত হতেই ব্যারীমোরের সম্বন্ধী ভয়ে গুহা ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, সেই গুহাতে শুধু সে থাকে না, আরও একজন লোক গোপনে বাস করে। কিন্তু সে লোকটিকে তিনি তখন দেখতে পেলেন না।

সেই পাহাড়ের কাছাকাছি একটা নির্জন বাড়ীতে থাকতেন ষ্টেপলটন বলে এক ভদ্রলোক। তিনি নিজেকে একজন বিজ্ঞানী বলে পরিচয় দেন ও গাছপালা, ফুলফল, কীটপতঙ্গ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন বলে মনে হয়। ওয়াটসন ভাবলেন, ষ্টেপলটন নিশ্চয়ই ব্যারীমোরের সম্বন্ধী বা সেই গুহার বাসিন্দা অন্য লোকটির সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে নিরাশ হ'তে হ'ল। সাদাসিদে বিজ্ঞানী মানুষ ষ্টেপলটন এ সম্বন্ধে কোন কিছুই বলতে পারলেন না। ষ্টেপলটন বাস করেন সেই নির্জন স্থানে শুধু বিজ্ঞানের সাধনায়। তাঁর বোন তাঁকে রেঁধে-বেড়ে দেন ও ভাইবোন দু'জনেই ব্যাস্কারভিলস্ জমিদারী-তেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

এবার স্যার হেনরীকে বিদায় দিয়ে ওয়াটসন সেইসব স্থান পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। পাহাড়ের গুহায় ঢুকে ওয়াটসন অপর লোকটির গতিবিধি সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ সমস্যায় পড়লেন। কে এই লোকটি যে গোপনে এ গুহায় বাস করছে? হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল সেখানে এক টুকরা কাগজ। সেই কাগজে একটিমাত্র ছত্র লেখা—"আমি জানি মিঃ ওয়াটসন এখানে আসছেন।"

ওয়াটসন চমকে উঠলেন। কি আশ্চর্য! লোকটা তা হ'লে তাঁর গতিবিধির উপরও নজর রেখেছে! কে এই লোকটা।

হঠাৎ বাইরে পদশব্দ হওয়াতে ওয়াটসন তাড়াতাড়ি একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন ও হাতের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর কানে এল একটি অতি পরিচিত স্বর—"ওহে ওয়াটসন, পিস্তলটা নামিয়ে রাখ, হঠাৎ ওটা থেকে গুলী বেরুতে পারে।"

ওয়াটসন আশ্চর্য হয়ে বাইরে এসে দেখেন স্বয়ং শার্লক হোম্‌স্ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

হোম্‌স্ তখন বললেন—"দেখ ওয়াটসন, আমাকে এভাবে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতে দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছ। কিন্তু এ ছাড়া রহস্য ভেদের অন্য উপায় ছিল না। আমি অনেক কিছুই জানতে পেরেছি এবং যথাসময়ে সেসব কথা তোমরা সকলে জানতে পারবে। তবে আমি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পেয়েছি, সে আশ্চর্যভাবে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে এই ভয়ানক অপরাধের কাজ করে যাচ্ছে।"

ওয়াটসন বললেন—"দেখ হোম্‌স্, আমি জানি তোমার অপরাধী ধরবার পদ্ধতি একটু অসাধারণ, কিন্তু এভাবে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থেকে কি করে যে তুমি রহস্যভেদ করতে সমর্থ হয়েছ সে কথা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

হোম্‌স্ তখন হেসে বললেন—"তোমরা সাধারণ চোখে যাকে অপরাধী বলে মনে কর, আমার চোখ কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য লোকেরও সন্ধানে যায়। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে, রহস্য ভেদ করতে পেরেছি আমি ঠিকই, তবে এখনই তা' প্রকাশ করতে পারছি না, কারণ আরও দু' একটি বিষয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত হ'তে হবে।

হঠাৎ এই সময় পাহাড়ের নিচে থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ওয়াটসন চমকে উঠলেন, কিন্তু হোম্‌স্ মৃদু হাস্য করে বললেন—এখানকার ঐ কুকুরের ডাকই আমার রহস্য ভেদের প্রথম চাবিকাঠি।

—"সব কথা খুলেই বল হোম্‌স্।" আশ্চর্য হয়ে ওয়াটসন বললেন।

—"দ্বিতীয় চাবিকাঠি হ'ল জলাভূমির উপরের পথের ঐ সারি-দেওয়া পাথরগুলো।" হোম্‌স্ হেসে হেসে কথাগুলো বললেন।

—"তৃতীয় চাবিকাঠি হ'ল এখানে কে ঐ কুকুর এনে রেখেছে, এবং কেন? তার সন্ধান লওয়া।"

—"চতুর্থ চাবিকাঠি হ'ল—যে কুকুর স্যার হেনরীর খুড়ো স্যার চার্লস্‌কে ভয় দেখিয়ে হত্যা করেছে তার সর্বাঙ্গে আগুনের হল্‌কা কোথা থেকে এল?

—"পঞ্চম চাবিকাঠি হ'ল—আধুনিক জগতে কোন ঘটনাকে শুধু অলৌকিক ব'লে মেনে নেওয়া চলে না, তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও থাকা চাই। সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়েই আবিষ্কার হ'ল অপরাধীর। সে সেই চারশো বছরের আগেই অলৌকিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এখন কাজে লাগিয়েছে।

—"ষষ্ঠ চাবিকাঠি হ'ল—এই জমিদারীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের অভাব হ'লে, কার এখানে জমিদার হয়ে

আসবার সম্ভাবনা আছে, সেটা অনুধাবন করা এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হ'লে এই পাহাড়ের কাছাকাছি থাকতে হবে। বাইরে থেকে সে কাজ করা চলবে না। কেননা, যে ভয় দেখায় সে কাছাকাছিই থাকে।

—"সপ্তম চাবিকাঠি হ'ল এই পাহাড়, মাঠ ও ব্যাস্কারভিল্‌স্‌ প্রাসাদে যাবার গুপ্ত পথ কি? সেটিও আমি আবিষ্কার করেছি জলাভূমির উপরের পাথরের সারি দেখে। এই পথ কোথা থেকে আরম্ভ আর কোথায় শেষ, তাও পরীক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। এই পথে অপরাধী অপরাধ-শেষে অতি দ্রুত সকলের অজ্ঞাতসারে আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে। এ ধারণাও আমার হয়েছে।

—"অষ্টম চাবিকাঠি, যে কুকুরটিকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কে তাকে খেতে দেয়, তার অনুসন্ধান করা। বলা বাহুল্য সে বিষয়েও আমি সন্ধান করে অনেক কিছু জেনেছি।"

—"নবম চাবিকাঠি হ'ল—এখানকার সব অবস্থা জানতে হ'লে এবং কখন কি ঘটছে সেটা লক্ষ্য করতে হ'লে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে এখানে কে বাস করে, বা কে এখানে কিছুকাল থেকে সেভাবে আছে তার সন্ধান করা।

—"দশম চাবিকাঠি হ'ল, লক্ষ্য রাখা, এমন কোথাও স্যার হেনরীর সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হয় কি না, যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে তাঁকে মাঠ পার হয়ে যেতে হবে। এ পর্যন্ত সেটা ঘটে নি এবং এই ব্যাস্কারভিলস্‌ জমিদারীতে সে-রকম নিমন্ত্রণ পাবার কোন কারণ স্যার হেনরীর এ পর্যন্ত হয় নি। তবে শীঘ্রই এ রকম একটা কিছু হবে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ আসবে সেটা আমি অনুমান করতে পারছি।"

ওয়াটসন্‌ সবিস্ময়ে হোম্‌স্‌-এর মুখের দিকে চাইলেন। হোম্‌স্‌ বললেন—"তুমি এখন যাও, আমি যে এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছি, এ কথা স্যার হেনরীকে জানাবার আবশ্যক নেই। তুমি শুধু যেদিন স্যার হেনরী নিমন্ত্রণ পাবেন সেই দিনই ব্যাস্কারভিল্‌স্‌ ছেড়ে লণ্ডনে চলে যাচ্ছ বলে প্রচার করে দেবে, তারপর তখনি আমার কাছে চলে আসবে। তারপর আমি আশা করি, অপরাধী ধরা পড়বে ও সেই অলৌকিক কুকুরের ভয় চিরদিনের মত ব্যাস্কারভিল্‌স্‌ বংশ থেকে অন্তর্হিত হবে।"

হোম্‌স্‌-এর অন্য সব কথা ওয়াটসন কিছু কিছু বুঝলেও তাঁর শেষ বক্তব্যটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে রইলেন। তিনি হোম্‌স্‌কে বললেন—"এতই যদি ঠিকভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক তবে অপরাধীকে ত স্যার হেনরীর সাহায্যে ধরতে পার।"

—"আমি অপরাধীকে হাতে-নাতে ধরতে চাই ওয়াটসন—ব্যাপারটা স্যার হেনরীও নিজের চোখে দেখুন। যাক্‌ এখন তুমি যাও, আমার মনে হয় দু'-একদিনের মধ্যেই এ ঘটনার যবনিকা পড়বে।"

ওয়াটসন্‌ ফিরে আসতেই স্যার হেনরী তাঁকে বললেন—একটা শুভ খবর আছে মিঃ ওয়াটসন্‌, এইমাত্র বৈজ্ঞানিক ষ্টেপল্‌টন্‌ তোমাকে ও আমাকে মাঠের ওপারে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ করে গেছেন। আজই আমরা দু'জনে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব। এই নিন আপনার নিমন্ত্রণ-পত্র।"

ওয়াটসন্‌ মনে মনে ভয়ানক চম্‌কে উঠলেও, মুখে শুধু বললেন—"তা হয় না, স্যার হেনরী, আমাকে যে এখনি লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে। খুব জরুরী একটা কাজ আছে। লণ্ডনে আজ না গেলেই আমার চলবে না। ষ্টেপল্‌টনের সান্ধ্য নিমন্ত্রণ রক্ষায় আমি অসমর্থ এ কথা এখনি আমি তাঁকে চিঠি লিখে দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছি।"

স্যার হেনরী বললেন—"নিমন্ত্রণে গেলে ভালই হ'ত, দু'জনে একসঙ্গে বেশ খানিকটা অবসর বিনোদন করা যেত। তা এক্ষেত্রে আর কি করা যাবে আপনি ত এখনি লণ্ডনে চললেন। দু'একদিনের মধ্যেই আসছেন ত?"

ওয়াটসন্‌ বললেন—"নিশ্চয় স্যার হেনরী। পরশুর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। তবে তার আগেও ফিরতে পারি।"

নিজের সামান্য দু'একটা জিনিষপত্র নিয়ে ওয়াটসন্‌ তখনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন।

পাহাড়ের সেই নির্জন গুহায় হোম্‌স্‌ ওয়াটসন্‌কে বললেন—"দেখছ, ওয়াটসন্‌, আমার অনুমানে ভুল হয় নি। আজই সন্ধ্যার পরে আমরা দু'জনে মাঠের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকব ও গোপনে স্যার হেনরীর অনুসরণ করব।"

সন্ধ্যা হয়ে আসতেই দু'জনে পিস্তলে গুলী ভরে নিয়ে মাঠের পথে রওনা হ'লেন ও প্রাসাদের অনতিদূরে একটা গোপন স্থান বেছে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার এবার ঘনিয়ে এল। সারা মাঠ সেই অন্ধকারে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া বুকে করে স্তব্ধ হয়ে রইল। মাঝে মাঝে ঝড়ের মত তীব্রবেগে বাতাস বইছে, আবার কখন সে বাতাস থেমে যাচ্ছে জলাভূমির দূষিত গন্ধ নিয়ে। একটু পরেই তাঁদের কানে পদশব্দ এল।

আপন মনে শিস্‌ দিতে দিতে স্যার হেনরী ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তাঁর হাতে লণ্ঠন। হোম্‌স্‌ ও ওয়াটসন্‌ কিছু দূরে থেকে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন।

মাঠের প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হবার পর কি একটা দৃশ্য দেখে স্যার হেনরী মহাতঙ্কে যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। তিনি প্রাণভয়ে কোথায় যে পালাবেন তা স্থির করতে পারলেন না। একটা বিরাট্ কালো কুকুর তাঁর দিকে প্রবলবেগে ছুটে আসছে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুচ্ছে। তার প্রকাণ্ড হাঁ ও তার মধ্য দিয়ে আগুনের শিখা দেখে স্যার হেনরী থরথর করে দারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটা স্যার হেনরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এক সঙ্গে হোম্‌স্ ও ওয়াটসনের পিস্তল গর্জে উঠল—গুড়ুম—গুড়ুম—। ব্যস্, অব্যর্থ লক্ষ্যে তখনি কুকুরটা মরে একপাশে লুটিয়ে পড়ল। স্যার হেনরী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রাণত্রাতাদের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

হোম্‌স্ কিন্তু তখনি ছুটলেন সেই মাঠের মধ্যে কাকে ধরবার জন্য। লোকটিও ছুটছে, হোম্‌সও ছুটছেন। আর তাঁর পিছনে পিছনে লণ্ঠন নিয়ে স্যার হেনরী ও ওয়াটসন ছুটছেন। শেষে জলাভূমিব ওপরের পাথরের সারির উপর তাড়াতাড়ি পা দিতে গিয়ে লোকটা হুমড়ি খেয়ে জলার পাঁকের মধ্যে পড়ে গেল।

স্যার হেনরী ও ওয়াটসন লণ্ঠনের আলোকে সবিস্ময়ে দেখলেন সে লোকটা বৈজ্ঞানিক ষ্টেপলটন। জলাভূমির পাঁকে তলিয়ে যাবার আগেই তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল আর তার অসহায় ভয়ার্ত চিৎকার মাঠের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রাসাদের বৈঠকখানায় বসে হোম্‌স এবার তাঁর রহস্য যবনিকা সরাতে লাগলেন।

তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল যে স্যার হেনরীর খুড়ো স্যার চার্লসের মৃত্যুর কারণ যে কুকুর, তার দেহে আগুনের ঝলক এল কোথা থেকে। অলৌকিক ঘটনা আধুনিক জগতে অচল। সুতরাং নিশ্চয়ই কুকুরের গায়ে কেউ ফস্‌ফরাস্ মাখিয়েছিল। মাঠের মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক ষ্টেপলটন ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে না এই ধারণা তাঁর জন্মেছিল।

দ্বিতীয় সন্দেহ, কুকুরটাকে লুকিয়ে রেখে খেতে দিত ষ্টেপলটন, সেকথা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

তৃতীয় সন্দেহ, সকলেই ব্যাপারটাকে অলৌকিক বলে মনে করবে—সুতরাং এ নিয়ে কেউ আব থানা-পুলিস করবে না একথা ষ্টেপলটন বুঝতে পেরেছিল।

চতুর্থ সন্দেহ,—ষ্টেপলটন হ'ল ব্যাস্কারভিল্‌স্ জমিদার বংশেব অতি দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়। এটাও তিনি অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং ব্যাস্কারভিল্‌স্ বংশের সোজাসুজি কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে ষ্টেপলটনই জমিদার হয়ে বসতে পারে ভবিষ্যতে।

সুতরাং প্রথম থেকেই ষ্টেপলটনের উপরই তাঁর সন্দেহ পড়েছিল এবং তিনি সেই পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন। এখন স্যার হেনরী নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। কোনদিন আর এ রকম নিদারুণ দুর্ঘটনা এ বংশে ঘটবে না।
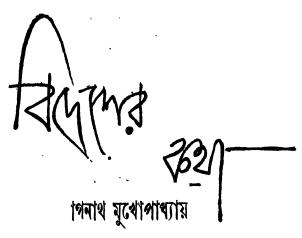
সামরিক অগ্রগতি ঃ

কর্ণেল বুমেদিয়েন সামরিক বাহিনীর জোরে আলজেরিয়ার শাসনক্ষমতা দখলের পর আফ্রো-এশিয় দেশগুলির আর একটিতে পূর্ণ সামরিক শাসন কায়েম হ'ল। ইতিপূর্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড, বর্মা, পাকিস্তান, মিশর, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, তুরস্ক সুদান, দক্ষিণ-কোরিয়া ও ফরমোসায় সামরিক কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে। আফ্রিকার টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা, কেনিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান প্রাক্তন শাসক ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় দমন করা হয়েছে। আফ্রিকার অপর দেশ গাবোঁতে সামরিক অভ্যুত্থান 'ফ্রান্সের' হস্তক্ষেপের জন্য শেষ পর্যন্ত অল্পের জন্য সফল হয় নি। এশিয়ার সিংহল, নেপাল প্রভৃতি কয়েকটি দেশেও মাঝে মাঝে ব্যর্থ সামরিক ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেছে। ইরাক, সিরিয়া, সুদান প্রভৃতি কয়েকটি আরব দেশে কয়েকবার ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে কিন্তু সে এক সৈন্যাধ্যক্ষকে উৎখাত করে আর এক সৈন্যাধ্যক্ষের জবরদস্ত আবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারে বলতে গেলে রেকর্ড করেছে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। সেখানে ১৯৬৩ সালের ২রা নভেম্বর নো দিন দিয়েম সরকারের পতন হওয়ার পর গত কুড়ি মাসে নয়বার সরকার ভাঙা-গড়া হয়েছে, আর সেই ওলট-পালটে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সামরিক বাহিনী। সারা এশিয়া-আফ্রিকায় সংসদীয় গণতন্ত্র অবশিষ্ট আছে মাত্র জাপান, মালয়েশিয়া, ভারত, সিংহল, ইস্রায়েল, লেবানন, সিয়েরা লিওঁ ও নাইজেরিয়ায়। অন্যান্য দেশগুলিতে আছে হয় একদলীয় শাসন, নয়ত কঠোর রাজতন্ত্র।

যেসব দেশগুলিতে পূর্ণ সামরিক শাসন কায়েম হয়েছে সেগুলির কোনটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট শাসনে রূপান্তরিত হয় নি। মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের বা বর্মার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইন সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, বা পিকিং-মস্কোর সঙ্গেও বহুভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউ একেবারে মার্ক্সবাদী হয়ে যান নি। এই জন্যই কর্ণেল বুমেদিয়েনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট মহলের সংযোগের কথা গোড়ার দিকে প্রচারিত হ'লেও পশ্চিমী মহল এ ব্যাপারে খুব বেশী নিরাশ বা শঙ্কিত হন নি।

এশিয়া-আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে সৈন্যবাহিনীর প্রাধান্যের কারণ বোঝা কঠিন নয়। প্রথমত এই দেশগুলির জনসাধারণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অতি দরিদ্র, রাজনীতি তারা বোঝে না এবং বোঝার কোন তাগিদও তাদের নেই। তারা বিশৃঙ্খল, উপেক্ষিত, কোন রাজনৈতিক দল দেশে থাকলেও তার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। সে তুলনায় দেশের সৈন্যবাহিনী সুশৃঙ্খল, শিক্ষিত ও উন্নতমানের জীবন যাপনের সুযোগপ্রাপ্ত। দেশের সমগ্র রাজস্বের অর্ধেক কি তারও বেশী ব্যয় হয় সামরিক প্রয়োজনে। সুতরাং কোন সরকার যদি তাদের মনোমত না হয় তবে তাকে উৎখাত করে নিজেদের শাসন কায়েমের জন্য তৎপর হওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ওবলিষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্বই এর একমাত্র প্রতিকার। এই সর্তগুলি ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় সম্পূর্ণ পূরণ হয়েছে বলেই ঐ সব অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান প্রায় কল্পনাতীত। লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এশিয়া-আফ্রিকার মত বলে সেখানেও রাষ্ট্র-শাসনে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা বিশিষ্ট।

সুতরাং সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারটা এশিয়া-আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য একথা ভাবার কোন কারণ নেই। ওটা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অনগ্রসরতারই অভিশাপ। এশিয়াতেও যে জাপান, মালয়েশিয়া ভারত, ইস্রায়েল, লেবানন ও সিংহলে এখনও গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ আছে তার কারণ এই দেশগুলির অপেক্ষাকৃত বৈষয়িক সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার অগ্রগতি।

জনসনের বেপরোয়া নীতি :

এক অশুভক্ষণে ক্ষমতামত্ত প্রেসিডেণ্ট জনসন ভেবেছিলেন শুধু মারণাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তিনি ভিয়েৎনামের বেপরোয়া মানুষগুলিকে তাঁবে আনতে পারবেন। সে ধারণা তাঁর যত মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে ততই মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আরও সংহার মূর্তি ধারণ করছেন। বোমার আঘাতে উত্তর ভিয়েৎনাম চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়েছে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন থেকে সুরু করে' উত্তর ভিয়েৎনামের একজন সাধারণ মানুষও তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। উত্তর ভিয়েৎনামের নেতারা উপেক্ষাভরে বলেছেন, মার্কিন বোমা বর্ষণকে তাঁরা ভূমিকম্প বা বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বেশী কিছু বলে মনে করেন না, সুতরাং ঐ নগ্ন নির্লজ্জ আক্রমণের কাছে নতি স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও ভিয়েৎকং গেরিলাদের আক্রমণ দিনে দিনে দুর্নিবার হয়ে উঠছে, ভিয়েৎনামের সরকারী ফৌজ বা মার্কিন সৈন্যদল তাদের ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণে সম্মুখে প্রায় সম্পূর্ণ দিশাহারা। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দুই তৃতীয়াংশ স্থান ভিয়েৎকঙ গেরিলাদের দখলে চলে গেছে, একথা মার্কিন মহলও স্বীকার করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিপর্যয়ের কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমত, ভিয়েৎনামের কোন অংশের জনগণের বিন্দুমাত্র সমর্থন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই মারমুখী নীতির পিছনে নেই, কেউ চায় না যে মার্কিন বোমার আগুনে ভিয়েৎনাম ভেঙে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যে পঙ্গু ও ক্ষণজীবী সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ভরসা সেই সরকারের পিছনে জনসমর্থন ত দূরের কথা, সরকারী সৈন্যবাহিনীরও পূর্ণ সমর্থন নেই। আজ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভিয়েৎনামের সরকারী ফৌজের একটি বড় অংশ ভিয়েৎকঙ গেরিলাদের সহায়ক। দ্বিতীয়ত, গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত ফৌজের কোন অভিজ্ঞতা নেই, কোন অজ্ঞাত পথ দিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা আবার মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায় তা তারা বুঝতেই পারে না। আর বিশ্বের জনমত যেভাবে দিনে দিনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আক্রমণকে আরও সংগঠিত করা বা আরও মারাত্মক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। প্রেসিডেণ্ট জনসন তাই সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। ভিয়েৎকঙ কবলমুক্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জমিতে এখন মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা আশি হাজার পেরিয়ে গেছে; প্রেসিডেণ্ট জনসন ঐ সংখ্যা আরও পঞ্চাশ হাজার বাড়িয়ে সোয়া লক্ষ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সৈন্য নিহত হয় একলক্ষ নব্বুই হাজার, এই থেকেই বোঝা যাবে যে ভিয়েৎনাম পরিস্থিতিকে সাম রক বলে অনুকূলে আনবার জন্য মার্কিন সরকার কতখানি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

অথচ এর যে কোন প্রয়োজনই ছিল না সে সম্বন্ধে বিশ্বের কূটনৈতিক মহল একমত। দ্বিখণ্ডিত ভিয়েৎনাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি ডঃ হো চি মিনকেই তাদের নেতা নির্বাচন করত ও তার ফলে পৃথিবীতে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সংখ্যা তের থেকে বেড়ে চোদ্দ হত তা হ'লে প্রায় একশ বিশটি রাষ্ট্রসম্পন্ন পৃথিবীতে এমন কিছু বৈপ্লবিক ওলট-পালট ঘটে যেত না। আর ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম যে জঙ্গী চীনের শিবিরভুক্ত হ'ত এমন কথাও বলা যায় না। প্রেসিডেণ্ট হো কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বে সোভিয়েট পক্ষের সমর্থক, আর ভিয়েৎনামও নিজের স্বার্থেই দানবীয় প্রতিবেশী চীনের চেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মিত্রজ্ঞান করত, যেমন করে মঙ্গোলিয়া। কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রও তার উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেত। কিন্তু মার্কিন সরকারের বর্তমান মারাত্মক ভ্রান্ত নীতির ফলে ভিয়েৎনাম নিরুপায় হয়েই ক্রমে ক্রমে চীনের তাঁবে চলে যাচ্ছে, এবং যখন মার্কিন সৈন্য ও সরকার ভিয়েৎনামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে বা করতে বাধ্য হবে তখন তার প্রতি সারা ভিয়েৎনামের একজন মানুষের মনেও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকবে না। জনসমর্থনহীন চিয়াং কাইশেককে সমর্থনের ভ্রান্তনীতির মারাত্মক পরিণতি থেকে যে শিক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের হওয়া উচিত ছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেখা যাচ্ছে যে তা হয় নি।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

সর্ব্বভারতীয় খাদ্যনীতি ?

পুনর্ব্বার ঘনায়মান খাদ্য সঙ্কটের দীর্ঘ ছায়া যে আবার দেশের উপরে তার কৃষ্ণ ছায়া বিস্তার করতে সুরু করেছে, সেই বিষয়ে আমরা গত মাসেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি। এই বিষয়ে অবশেষে সরকারী মহলের উচ্চতম পর্য্যায়েও খানিকটা সচেতনতার আভাস দেখা যেতে সুরু করেছে। দেশের বাজারে খাদ্যশস্য সরবরাহ ও মূল্যমানের গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দ্রুত অবনতির কারণে মনে হয় এখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সংশ্লিষ্ট অধিকরণগুলিতে একটা সুসমঞ্জস ও সুষ্ঠু খাদ্যনীতি রচনা ও প্রয়োগের একান্ত এবং জরুরী প্রয়োজনীয়তা অবশেষে স্বীকৃত হ'তে সুরু করেছে। এই স্বীকৃতিরই প্রতিফলন সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্য্যায়ের (high power) কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।

এই কমিটির বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে বলে প্রচারিত হয়েছে :

(১) কমিটি দেশের সকল ৩ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ সংখ্যার অধিবাসীর শহরগুলিতে আবশ্যিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণের (Statutory rationing) আশু প্রয়োগ প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

(২) খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি (deficit) এবং বাড়তি (surplus) উভয় রাজ্যগুলিই তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলির চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনে বৃহৎ পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব (large scale procurement) গ্রহণ করবেন। এর ফলে রাজ্যগুলিতে ন্যায্যমূল্য দোকানগুলিতে শস্য সরবরাহের দায়িত্ব প্রভূত পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের স্কন্ধ থেকে অপসারিত হয়ে রাজ্য সরকারগুলির ওপর বর্ত্তাবে। ঘাটতি রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যবর্ত্তিতায় বাড়তি রাজ্যগুলি থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সরবরাহ পেতে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের রাজ্যের অবশিষ্ট চাহিদা মেটাবার জন্য যে অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য প্রয়োজন হবে সেটা নিজ নিজ এলাকার মধ্য থেকে সংগ্রহ করবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলিকেই বহন করতে হবে। এই সিদ্ধান্তটির ফলে বর্ত্তমানে বিদেশ থেকে আমদানী শস্যের উপর প্রধান নির্ভরতা আনুপাতিক পরিমাণে নিরসন হবে বলে আশা করা যায় ;

(৩) খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বিভিন্ন রাজ্যের ঘাটতি বা বাড়তির পরিমাণ কৃষি-মূল্য কমিশনের (Agricultural Price Commission) সহযোগিতায় এখন থেকে পরিকল্পনা কমিশন নির্দ্ধারণ করবেন এবং এই সিদ্ধান্ত সকল রাজ্যই মেনে নেবেন। এর ফলে বর্ত্তমানে বাড়তি রাজ্যগুলি তাঁদের উৎপাদনের অঙ্ক কম করে এবং ঘাটতি রাজ্যগুলি বেশী করে দেখান বলে যে আশঙ্কা করা হয়, তার নিরসন হবে। তা ছাড়া এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্ত্তমানে বলবৎ খাদ্যশস্য চলাচলে যে আঞ্চলিক ব্যবস্থা রয়েছে (zonal system) সেটি চালু রাখায় কোন বাধা ঘটবে না ;

(৪) বৈঠকে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীরা সুপারিশ করেন— কৃষিমূল্য কমিশন এই সুপারিশ সময়োপযোগী নয় বলে. মনে করেন—যে খাদ্যশস্যের পাইকারী ও ভোগক্রয়ের স্তরে উচ্চতম মূল্যমান নিয়ন্ত্রণাধীন না করলে চোরা কারবার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এই বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে এবার এই সুপারিশটি রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে— কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে নয়—এসেছে।

এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম্ স্বীকার করেন যে ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ এবং মুনাফাবাজদিগকে সাজা দেবার জন্য রচিত আরো একটি জরুরী আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতম মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়াস পূর্ব্ব বৎসরে করা হয়েছিল তা সফল হয় নি। প্রকারান্তরে তিনি একথা বলতে চান মনে হয় যে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটিও যে ফলপ্রসূ হবে এমন ভরসা তিনি করেন না।

তা ছাড়া এই সিদ্ধান্তটিতে আরও দুটি গলদ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত: রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীরা এই নূতন গৃহীত খাদ্যনীতিটির আবশ্যিক প্রয়োগ চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তিম পর্য্যন্ত স্থগিত রাখতে চান। দ্বিতীয়ত: খাদ্যশস্য সংগ্রহের (procurement) ব্যাপারটি রাজ্য সরকারগুলির নিজ নিজ সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যে সকল রাজ্য সর্ব্বাত্মক সংগ্রহের নীতি (monopoly procurement) অনুসরণ করতে চান তাঁরা তা করবার স্বাধীনতা পাবেন। অন্যান্য রাজ্যগুলি তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছামত অন্যপ্রকার সংগ্রহবিধি অনুসরণ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয়

খাদ্যশস্য সংস্থা (Foodgrains Corporation of India) আন্তঃরাজ্য খাদ্যচলাচলের জন্য দায়ী থাকবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা কি ভাবে কাজ করবেন সেটা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে তাঁরা ব্যবস্থা করে নেবেন।

পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি ?

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উদয় হয়। ১৯৬৩ ৬৪ সনের দেশজোড়া খাদ্য সঙ্কটের সময় একরূপ একটি খাদ্যনীতি রচনা ও প্রয়োগের প্রয়োজন সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রণালয় তার একটি প্রাথমিক কাঠামোও প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রভূত পরিমাণ চাউলের ফসল পাওয়া যাওয়ার ফলে এবং সে সময়ে খানিকটা নূতন ফসলের প্রাচুর্য্যতা এবং সম্ভবতঃ খানিকটা মূল্য নিয়ন্ত্রণের কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরকারী প্রয়াসের ফলে সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হয়। এই অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ অবস্থার উদ্ভবের ফলে নূতন খাদ্যনীতি গ্রহণ ও প্রয়োগের জরুরী আবশ্যকতা অপসৃত হয়। এবং একটা সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সর্ব্বভারতীয় খাদ্যনীতি রচনা ও অনুসরণের কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়। বর্ত্তমান বৎসরেব কেন্দ্রীয় বাজেট বিতর্ক উপলক্ষ্যে যখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দ আলোচিত হয় তখনও কি সরকারী পক্ষ, কি বিরোধীদলের মুখপাত্ররা এই বিষয়ে কোন জরুরী তাগিদ অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেই সময়ে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে তৎকালে যদিও খাদ্যশস্য সরবরাহ ও মূল্যমানের অবস্থাটি অপেক্ষাকৃত স্থিবতাব্যঞ্জক ছিল, কিন্তু পরে যখন সরবরাহে স্বাভাবিক ঘাটতি ঋতুর (lean season) সুরু হবে তখন অবস্থাটি কিরূপ দাঁড়াবে সেটা আশঙ্কার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে গত বৎসর ভারতরক্ষা আইন এবং মুনাফাবাজী বন্ধ করবার মানসে অন্য একটি জরুরী আইন প্রযোগ করেও মূল্যমান নির্দ্দিষ্ট উচ্চতার মধ্যে সীমিত করে রাখা সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর এই উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ কথা ঠিক যে মূল্যমান নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হয় নি। তবে ভারতরক্ষা আইন বা অন্য আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হ'লেও তা সম্ভব হ'ত কি না, সেটা প্রমাণ হবার অবকাশ ঘটে নি। বস্তুতঃ ভারতরক্ষা আইন কিংবা নূতন রচিত অন্য আইনটির এই সম্পর্কে যথাযথ প্রয়োগের কোন সত্যকার প্রয়াসই হয় নি। দু'চারটি নগণ্য দোকানদারদের ভারতরক্ষা আইন বা অন্য আইনটির বলে আটক করে যে এই সমস্যার সমাধান হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, সেটা যদি খাদ্যমন্ত্রী আন্দাজ করতে না পেরে থাকেন তবে এ কথা বলতেই হবে যে, তিনি তাঁর উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদের নিতান্তই অযোগ্য। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রণালয়ের সার্থক কর্ণধার হবার মতন যোগ্যতা তিনি আজ পর্য্যন্ত কোন দিকেই প্রমাণ করতে সমর্থ হন নি। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের যে স্তরে আইনের বলে কঠিন ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারলে মূল্যনিয়ন্ত্রণবিধি সার্থক হতে পারত, সে স্তরে সরকার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের কোনই লক্ষণ কখনই দেখা যায় নি। বরং দেখা গেছে যে, পূর্ব্বেকার সঙ্কটকালে খাদ্যসরবরাহ ও মূল্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে সরকাব পক্ষ থেকে যে সক্রিয় প্রয়োগের আভাস প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল ক্রমে তার বদলে উত্তরোত্তর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগোষ্ঠীদের তুষ্ট রাখার দিকেই সরকারী নীতি এগিয়ে চলেছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সরকারী বন্টনাধীন খাদ্যশস্যের যে মূল্যবৃদ্ধি বলবৎ করা হয়, তখন এই সিদ্ধান্তেব অনুকূলে এই অজুহাতটিই প্রচারিত হয়েছিল যে এই মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা মূল্যমানটির সঙ্গে খোলাবাজারের প্রচলিত মূল্যের সামঞ্জস্য সাধন করান হ'ল ("to realistically relate these prices to those prevailing in the open market")। এর ফলে খোলা বাজারের মূল্যমান গত কয়েক সপ্তাহে কি দ্রুত এবং কতটা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে আবার প্রায় সঙ্কটাবস্থার সম্মুখীন হ'তে চলেছে, তার বিশদ আলোচনা আমরা গত মাসে করেছি।

এখন মূল প্রশ্ন এই যে বর্ত্তমানে গৃহীত খাদ্যনীতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত কি গত বৎসরেব রচনারই আবার সঙ্কটকালীন পুনরাবৃত্তি মাত্র, না এর মধ্যে একটা স্থায়ী প্রয়োগের আশা পরিলক্ষিত হয়? এই প্রশ্নের জবাব কতকগুলি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাবের উপরে নির্ভর করবে।

খাদ্য-সমস্যার মূল রূপ

প্রথম প্রশ্নটি এই যে দেশে এই যে বারংবার খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হচ্ছে, তাব মূল কারণটি কি? সরকার পক্ষ থেকে এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট তথাকথিত ধনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদেব পক্ষ থেকে এই প্রশ্নটির একটি সহজ ও সরল জবাব বারে বারে দেওয়া হয়ে এসেছে। তাঁরা বলেন যে প্রথম পরিকল্পনাকালের অন্ত থেকে গত পাঁচ বৎসরে যে হারে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার তুলনায় কৃষি উৎপাদনে বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উন্নতির হার অনেকটা কম হয়েছে। অতএব অনিবার্য্যভাবে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর আরও দুইটি আনুষঙ্গিক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনানুযায়ী দেশের আর্থিক প্রগতির ফলে দেশের

লোকের ভোগপরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটেছে তার জন্য অনিবার্য্য ভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি আলোচনায় আমরা সংখ্যার দ্বারা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে ১৯৬৩-৬৪ সনে কম হয়েও দেশে উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ যা ছিল তাতে দেশের জনসংখ্যার সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের জন্য (১৪ থেকে ৬৫ বৎসর বয়স্কদের) দৈনিক ১৬ আউন্স খাদ্যশস্য এবং বাকী সকলের জন্য (০ থেকে ১৩ বৎসর এবং ৬৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের) দৈনিক ৮ আউন্স খাদ্যশস্য বরাদ্দ ধরলেও (সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বণ্টনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১২ আউন্স বরাদ্দ), দেশে উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের দ্বারা এই চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিয়েও উৎপন্ন ফসলের শতকরা ১০% বীজ-শস্য ও অনিবার্য্য অপচয়ের জন্য সঙ্কুলান হয়ে যায়; অবশ্য আর উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। অতএব মূল হিসাবে (in absolute terms) চাহিদার তুলনায় শস্য সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি হবার কথা নয়।

অনুরূপ হিসাবেই দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও দেশে খাদ্যশস্যে কোন মূল ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে প্রভূত পরিমাণ গম এবং কিছুটা চাউলও বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আমদানী খাদ্যশস্য এবং বাড়তি ফসলের বৎসরে দেশে উৎপন্ন মূল চাহিদার (basic demand) উপর অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি বাফার মজুদ (buffer stock) সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যার দ্বারা দুর্ব্বৎসরে সরবরাহের ঘাটতি মেটান যেতে পারে। দুঃখের বিষয় এই মজুদের কথার বারংবার উল্লেখ সত্ত্বেও গত বৎসরের সঙ্কটের পূর্ব্বে এই বিষয়ে সার্থক প্রয়োগের কোন জরুরী তাগিদ সরকার পক্ষে কখনও লক্ষিত হয় নি। ফলে মজুদ সৃষ্টিও হয় নি। এত যে খাদ্যশস্য দেশে আমদানী করা হয়েছে সেগুলি কোথায় পাচার হয়েছে তার হদিসও পাওয়া যায় নি। গত বৎসর থেকে আবার এই মজুদ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য পড়েছে বলে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, গত বৎসরের চাউলের ফসল থেকে দু'মাস আগে পর্য্যন্ত মোটামুটি ১৯ লক্ষ টন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য তহবিলের জন্য সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য এর থেকে কতটা পরিমাণ ঘাটতি এলাকাগুলিতে সরবরাহ হয়েছে তা জানা যায় নি। অন্যদিকে গত প্রায় এক বৎসরের মধ্যে বিদেশ থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টন পরিমাণ গম আমদানী হয়েছে। সরকারী ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রধানাধ্যক্ষের দ্বারা সম্প্রতি প্রচারিত এক বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, এই আমদানী গমের প্রায় সবটাই সরাসরি বন্দর থেকে ভোক্তার রন্ধনশালায় চালান করতে হয়েছে, কেন্দ্রীয় মজুদ তহবিলে এর প্রায় কিছুটাই জমা হয় নি।

আর্থিক উন্নতির ফলে ভোগ চাহিদা বৃদ্ধির যে কথা বলা হয়েছে সে কথাটা মাত্র আংশিক ভাবে সত্য। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্যের ভোগচাহিদা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনশীল (elas) নয়। অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর চাহিদা ভোক্তার আর্থিক অবস্থার তারতম্যের ফলে বৃদ্ধি পায় বা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু খাদ্যশস্যের বেলায় এর পরিধি নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া আর্থিক অবস্থার সত্যকার উন্নতির পরিচয় কোথায় পাওয়া যাবে?—কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণে? ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চের একটি সম্প্রতি প্রকাশিত হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ গ্রামবাসীদের গড়পড়তা দৈনিক আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬৮ পয়সা। এর মধ্যে নিম্নতম আয়ের ১ কোটি লোকের দৈনিক আয় মাত্র ২৭ পয়সা, তদূর্দ্ধ আয়ের ৫ কোটি লোকের দৈনিক আয় ৩২ পয়সা এবং তদূর্দ্ধ ১০ কোটি লোকের আয় ৪২ পয়সা মাত্র। অর্থাৎ নিম্নতম আয়ের লোকসংখ্যার শতকরা ৬০ জনের মোট আয়ের ভাগ ৩১% মাত্র এবং তদূর্দ্ধ আয়ের ৪০% লোকের মোট আয়ের ভাগ ৬৯%; সর্ব্বোচ্চ আয়ের ১% লোকসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের মোট আয়ের ৯% অধিকার করে থাকেন। এই হিসাবটি মোট (aggregate) আয়ের হিসাব। এর কতটুকু আয়কারীর সত্যকার ভোগ্য আয় (disposable income) সে হিসাবটুকু উহ্য রয়েছে। তবে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এর থেকে সরকারী এবং অন্যান্য দাবি মেটাবার পর আয়কারী নিজে ব্যয় করতে পারবেন এমন ভোগ্য আয়ের অংশটা আরও বেশ কিছু কম হবে। এই হিসাব থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আয় বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এই দাবিটুকু মাত্র আংশিক ভাবে সত্য হ'তে পারে। দেশের জনসাধারণের ভোগচাহিদা সার্থক ভাবে বৃদ্ধি পাবার (effective demand) বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ পরিমাণে কোন অবকাশ নাই। বরং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ সাধারণ চাহিদার বৃদ্ধির কারণে ঘটেছে একথাটা সত্যকার প্রমাণসহ নয়।

তবে খাদ্যসঙ্কট কেন?

তবে প্রশ্ন ওঠে তা হ'লে বারংবার এই খাদ্যসঙ্কট কেন?

আসল কারণটি অতি সরল এবং অতি স্পষ্ট। প্রথমতঃ, দেশের লোকের অধিকাংশের প্রাথমিক নির্ভরতা কৃষি কর্ম্মের উপর। আজিও ভারতবর্ষের গড়পড়তা প্রায় ৭৬% লোক মুখ্যতঃ এবং গৌণভাবে কৃষিকর্ম্মেরই উপর তাঁহাদের জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। অথচ কৃষি জীবিকার মূল প্রণালীতে গত ১৫ বৎসরের পরিকল্পনার ফলেও কোন বিশেষ উন্নতি ঘটে নি। সেচজলের সামান্য ব্যবস্থা, আধুনিক সার সরবরাহের অপ্রতুলতা, কৃষি-সহায়ক গোধনের দ্রুত এবং শোচনীয় অবনতি এবং সর্ব্বোপরি চাষীর আনুসঙ্গিক জীবিকার উপায়গুলির (subsidiary occupations) দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে কৃষি উৎপাদনে গত ১৫ বৎসরে কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নি। একর বা বিঘা প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই উৎপাদনের যা হার ছিল তার তুলনায় আজিও কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। অধিকতর পরিমাণ জমি আবাদের ফলে মোট উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চাষীর মাথাপিছু বা জমির একর-প্রতি উৎপাদন খুব একটা বাড়ে নাই। ফলে পরিকল্পনার পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজিও চাষী-ব্যবসায়ীদের মধ্যে গড়পড়তা ১০% পরের জমি চাষ করেন এবং নিজ খাদ্যশস্য বাজার থেকে কিনে খেতে বাধ্য হন; গড়পড়তা ৩১% মাত্র ১ একরের কম জমি চাষ করে থাকেন, ফলে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের দ্বারা মোটামুটি মাত্র ৩ মাসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা সম্ভব হয়; গড়পড়তা ২০% ২॥ একরের কম জমি চাষ করেন এবং তাঁদের নিজেদের মোটামুটি ৬ মাস থেকে ৯ মাস পর্য্যন্ত খাদ্যের চাহিদা মাত্র মেটাতে সমর্থ হন। বাকি ৩৯% মাত্র চাষী তাঁদের নিজেদের সম্পূর্ণ খাদ্য উৎপাদন করেন এবং তাঁদের মধ্যে কিয়দংশ বাড়তি ফসল ফলান।

এর ফলে কৃষি-উৎপাদক এবং বিশেষ করে খাদ্যশস্য-উৎপাদক, সাধারণতঃ পুঁজিপতি আড়তদার, মিল-মালিক ইত্যাদির অনুগ্রহের উপরে প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। আর প্রভূত পুঁজির অধিকারী এই খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী গত ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরটি ঘটিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে দেশের ৩০ লক্ষ লোককে অনাহারে হত্যা করেছেন, এ তথ্যটি সরকারী ভাবেও স্বীকৃত হয়েছিল। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, দেশে বর্ত্তমানে যে বিরাট টাকার কালোবাজার অন্তরীক্ষে থেকে কাজ করছে এবং যার অস্তিত্ব বারংবার সরকারী ভাবেও স্বীকৃত হয়েছে, তার প্রভূততম অংশ অন্ততঃ খাদ্য-ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে এই কথাটা স্মরণ করলেই এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হবে যে, এই কালোবাজারী পুঁজির সৃষ্টি সুরু হয় ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরেরই সময় থেকে। এবং স্বাধীনতার পর থেকে গত কয়েক বৎসরে বারংবার যে খাদ্য ও মূল্য সঙ্কটের উদ্ভব হয়ে চলেছে তার প্রধান নায়ক যে এই খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সে কথা বুঝতে খুব একটা বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

চাষে আগ্রহসূচক মূল্যমান

এই অবস্থায় সরকারী আয়ত্তাধীনে একটা সুস্থ, সবল, সুসমঞ্জস সর্ব্বভারতীয় খাদ্যনীতির প্রয়োগই যে একমাত্র দেশকে বর্ত্তমান সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কিন্তু সেই নীতি এমন ভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা অকৃতকার্য্যতার অবকাশ না থাকে।

বর্ত্তমানে গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল কাঠামোটির পরিচয় এই আলোচনার মুখবন্ধেই দেখিতে পাওয়া গেছে। তাতে একটা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, চাষীর আগ্রহজনক মূল্যমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোক্তার দেয় উচ্চতম মূল্যমান নিয়ন্ত্রিত করা হবে। চাষীর আগ্রহজনক মূল্যমান (incentive price) আমাদের দেশের কৃষি-ব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থায় যে চাষীর নিজের পক্ষেই হানিকারক হ'তে পারে, এই প্রসঙ্গে সেই তথ্যটি স্পষ্ট করে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। দেখা গেছে যে দেশের সমগ্র চাষীগোষ্ঠীর মোটামুটি ৬১% বৎসরে যা উৎপাদন করেন তাতে তাঁদের নিজেদেরই ভোগচাহিদা সম্পূর্ণ মেটে না। অর্থাৎ এঁদের পক্ষে চাষে আগ্রহজনক (incentive) মূল্যমান মোটামুটি হানিকরই হবার আশঙ্কা, বাকি থাকে মাত্র ৩৯% চাষী। এঁদের মধ্যেও—যাঁরা কেবল মাত্র নিজেদের ভোগচাহিদাটুকু নিজেদের উৎপাদিত ফসল থেকে মেটাতে সমর্থ হন—কিয়দংশ এই আগ্রহজনক মূল্যমান থেকে কোন উপকারই পাবেন না। কেবলমাত্র যে সকল চাষীরা নিজেদের ভোগচাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করেন, তাঁরাই এই নিদ্ধারিত নিম্নতম মূল্যমান থেকে উপকৃত হবেন। এদের সংখ্যা অনুপাতে সামান্য। তবে কি এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক চাষীর স্বার্থে খাদ্যশস্য-ভোগী দেশের বিরাট চাষীগোষ্ঠীর শতকরা ৬১% এবং তারও বেশী লোককে একটা নির্দ্ধারিত উচ্চমূল্যে তাঁদের নিজেদের ভোগের খাদ্যশস্য ক্রয় করতে বাধ্য করা হবে?

এই প্রশ্নের জবাবে একথা হয়তো বলা যেতে পারে যে, কোন গোষ্ঠী স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে নয়, কিন্তু কৃষি-উৎপাদনে,

বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নততর আগ্রহ সঞ্চার করবার প্রয়োজনেই এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এ রকম জবাব যে বিচারসহ নয় সেটা একটু বিশ্লেষণ করলেই সহজে বোঝা যাবে। চাষের মূল কাঠামোটিকে অপরিবর্তিত রেখে কৃষি উৎপাদনের হারে (agricultural productivity) উন্নতি সঞ্চার করা সম্ভব নয়, সহজ ত নয়ই। তাই খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতিজনক আগ্রহ সঞ্চার সার্থক ভাবে করতে হ'লে মূল প্রয়োজন চাষীর মাথাপিছু ও জমির একরপ্রতি উৎপাদন হার বৃদ্ধি করা। এর জন্য চাই যথোপযুক্ত পরিমাণে এবং যথাসময়ে সেচজলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত মূল্যে ও পরিমাণে এবং আনুপাতিক অংশে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসবাহী সারের সরবরাহের ব্যবস্থা করা। আরও চাই জমি কর্ষণের উন্নততর আয়োজন। বলদ-চালিত কাঠের লাঙলে জমি কর্ষণ চলতে থাকলে প্রভূত পরিমাণ সার ব্যবহার হানিকারক হবার আশঙ্কা। পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন চাষীর জমিতে ট্র্যাক্টর দ্বারা কর্ষণের ব্যবস্থা করলে এ বিষয়ে সুফল পাবার সম্ভাবনা। ঐ বিষয়ে সামান্য ভাড়ায় সরকারী ট্র্যাক্টর দ্বারা চাষের সাহায্য করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এবং পাশাপাশি জমির মালিক চাষীদের একত্রে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে রাজী করান দরকার। এই ভাবে ভবিষ্যতে সমবায় চাষে (Cooperative farming) প্রাথমিক বাধা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হ'তে পারে। এভাবে জমির একর-প্রতি এবং চাষীর মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি হ'লেই তবে চাষীর মধ্যে উৎপাদন উন্নতিতে আগ্রহ সর্বাত্মক ও সার্থক ভাবে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব। কেবলমাত্র ফসলের মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাষীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হ'তে পারে, সকল চাষীর মধ্যে নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন। দেশে শিল্পায়ন বর্তমানে যে পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে তার ফলে অনিবার্য্য ভাবে চাষে চাষীর আগ্রহ ক্রমাগতই কমে আসছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশের চাষীরা চাষ ব্যতীত অন্য কোন একটি বংশ-পরম্পরায় অনুসৃত কুটির শিল্পের অনুসরণ করে এসেছেন। কেহ বা তাঁতি, কেহ বা মৃৎশিল্পী,

কেহ স্বর্ণকার, ইত্যাদি নানা শিল্পকর্মে এঁরা কিছু অতিরিক্ত আয় করে এসেছেন। চাষের কাজের অবসরে চাষীর যে প্রভুত অবসর থাকে সেই সময়েই এ সকল শিল্পের এঁরা অনুশীলন করতেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই জীবিকা তাঁদের হাত থেকে মোটামুটি বেরিয়ে গেছে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্পে কর্ম্মীর আয় চাষের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৫৬ সনে প্রচারিত বোম্বাইয়ের অনেক ধন-বিজ্ঞানীর দ্বারা প্রস্তুত হিসাব অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পে মাথাপিছু ৩.৮ জনের পরিবার-যুক্ত কর্ম্মীর বার্ষিক আয় প্রায় ১৫০০ টাকায় এবং মাথাপিছু ৫.২ পরিবারওয়ালা চাষীর বার্ষিক আয় মাত্র ৫৭১৲ টাকায় ধার্য্য করা হয়েছে। এর ফলে সামাজিক মূল্যায়নেও চাষের তুলনায় শিল্পকর্ম্মে সম্মান বেশী হয়ে পড়েছে। চাষে আগ্রহ বাড়াতে হলে এ সকল বাধাও দূর করা প্রয়োজন। তার একমাত্র উপায় গ্রামাঞ্চলে ছোট আয়তনের আধুনিক ভোগ্য-শিল্পাদির সৃষ্টি করা। এই দিকে আজ পর্য্যন্ত সরকারী চিন্তায় কোন আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় নি।

র‍্যাশনিং ও সংগ্রহ ব্যবস্থা

এগুলি নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু আনুসঙ্গিক আয়োজনের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে আরও একটি মূল বিষয়ে সঙ্গতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থির হয়েছে যে, বর্ত্তমানে ৩ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ জনসংখ্যার এবং ক্রমে ১ লক্ষ পর্য্যন্ত জনসংখ্যার শহরগুলিতে পূর্ণ আবশ্যিক র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা হবে। এবং প্রয়োজনবোধে ঘাটতি গ্রামাঞ্চলেও আংশিক বা মডিফায়েড র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা হবে। বর্ত্তমানে পূর্ণ র‍্যাশনিং ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু দৈনিক ১২ আউন্স এবং আংশিক র‍্যাশনিং ব্যবস্থায় ৬ আউন্স খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও হয়েছে যে, এই আয়োজন চালু রাখবার জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহের আয়োজন বিভিন্ন রাজ্য সরকার স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী করবেন, যাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ বা সর্ব্বাত্মক সংগ্রহের (total procurement) আয়োজন করতে পারেন, অন্যথায় তাঁরা আয়োজন করতে পারেন। এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত আশঙ্কাসূচক বলে আমরা মনে করি। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের মূল আয়োজনটির—অর্থাৎ বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ—কার্য্যকারিতা একান্ত ভাবে সংগ্রহের সাফল্যের উপর নির্ভর করবে। এই স্থলে কোন গলদ ঘটলে সমগ্র নীতিটিই অনিবার্য্যভাবে বানচাল হতে বাধ্য। অতএব বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের গোড়ায় প্রয়োজন সর্ব্বাত্মক সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থা। এবং এটি সমগ্র দেশেই একই ধরনের হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া বণ্টন ব্যবস্থার এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণের, উভয়েরই সার্থক প্রয়োগ অনিবার্য্য ভাবে বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা।

সম্ভবতঃ এরূপ একটি অনির্দ্দিষ্ট বা পরিচয়হীন (non-descript) সিদ্ধান্তের কারণ যে এরূপ একটি বৃহৎ দায়িত্ব কি ভাবে পালন করা হবে সে বিচারটি বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির নিজেদের উপরে ছেড়ে দেওয়াই কেন্দ্র সরকারের পক্ষে নিরাপদ। সংগ্রহ ব্যবস্থার স্বরূপ ও সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বলিষ্ঠতার উপরে। কিন্তু এই সংগ্রহ ব্যবস্থা যদি সর্ব্বাত্মক ও বলিষ্ঠ না হয় তবে সঙ্কট-মোচন না হয়ে গভীরতর আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। মোট কথা খোলাবাজারকে উপযুক্ত ভাবে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা সত্ত্বেও যে খাদ্যসঙ্কট চলতে পারে তার প্রভূত প্রমাণ আমরা যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছি।

সমস্ত সিদ্ধান্তটির সার্থকতা নির্ভর করবে সরকারের প্রশাসনিক সততা ও বলিষ্ঠতার উপরে। এইটির অভাবে সর্ব্বাত্মক সংগ্রহ ব্যবস্থা যেমন সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় মিশ্র সংগ্রহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের যদি কোন প্রত্যয়ের অভাব থাকে তবে এ দায়িত্ব কোন ভাবেই তাঁদের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়ার বিপদের আশঙ্কা আছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

হরপার্বতী

প্রবাসী প্রেস, শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৫শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭২

ষষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাশ্মীর—১

কাশ্মীর যখন স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত ছিল না, স্বাধীনতার সেই আরম্ভের যুগে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে পাকিস্তান সামরিক অভিযান করিয়া কাশ্মীর অধিকার করিবার চেষ্টা করে। সেই অভিযান সাজাইয়া মিথ্যার অভিনয় করিয়া এরূপভাবে করা হইয়াছিল যে জগতবাসী জনসাধারণ অবাক হইয়া পাকিস্তানের বর্ব্বরতা ও নির্লজ্জভাবে মিথ্যা কথা বলিয়া পৃথিবীর চক্ষে ধূলা দিবার চেষ্টা দেখিয়াছিলেন। যে-সকল পাকিস্তানী সৈন্য সেই সময় কাশ্মীর অধিকার করিতে গিয়াছিল তাহারা ঐ সকল অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতির পোশাক পরিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করে। অনেককালাবধি পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট মিথ্যার উপর মিথ্যা বলিয়া জগতে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে কাশ্মীরের লড়াই তাহাদিগের লোকে করিতেছে না। মুসলমান ধর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য "কাওয়ালি"রা করিতেছে। "কাওয়ালি" অর্থে বুঝিতে হয় ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ-বিশ্বাসী পাঠান জাতীয় পার্ব্বত্য সাধারণকে। কিছুকাল পরে কাশ্মীর সরকার যখন ভারতের নিকট সাহায্য চাহেন ও ভারতীয় সৈন্য তথাকথিত "কাওয়ালি"দিগকে তাড়াইয়া কাশ্মীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছিল, তখন পাকিস্তান হঠাৎ সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়া স্বীকার করিয়া লইল যে "কাওয়ালি"রা আসলে পাকিস্তানী সৈন্যই। এই কথা স্বীকার করিয়া পাকিস্তান কোন লজ্জা প্রকাশ করে নাই। আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসে ইহা নির্লজ্জতার একটি অতিবড় উদাহরণ। যখন পাকিস্তানীগণ কাশ্মীর হইতে প্রায় নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে তখন দুর্ব্বৃত্তের বন্ধু ব্রিটিশগণ নানাভাবে বুঝাইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে দিয়া তাহাদিগের পূর্ণ পরাজয় ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে সংঘাত স্থগিত করাইয়া দিয়া পাকিস্তানের কবলে কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ ছাড়িয়া রাখার অস্থায়ী ব্যবস্থা করান। সেই ব্যবস্থাই শান্তিরক্ষার নামে এতদিন চলিতেছিল। পাকিস্তান অবশ্য কোন সময়ই শান্তিরক্ষা বা যুদ্ধ স্থগিত রাখে নাই। ভারতের উপর কোন-না-কোন প্রকার আক্রমণ পাকিস্তান প্রত্যহই করিয়া থাকে। গত পাঁচ মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরে ১৩০০ শত বার ভারত আক্রমণ করিয়াছে।

সম্প্রতি পাকিস্তান প্রথমে কচ্ছে ও পরে কাশ্মীরে পুনর্ব্বার বৃহত্তর ভাবে ভারতের উপর সামরিক হামলা করে। কচ্ছে ব্রিটিশগণ আবার সালিসের বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিয়াছেন। কাশ্মীরে "ভারতের অত্যাচার-নিষ্পেষিত কাশ্মীরীদিগের" বিদ্রোহের অভিনয়ে বহু পাকিস্তানী সৈনিক পুনর্ব্বার রঙ্গমঞ্চের সাজ-পোশাক পরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু "প্যাটন ট্যাঙ্ক" ও "সেবার জেট" বিমানগুলির অঙ্গে কাশ্মীরী পোশাক মাপে ঠিক

না হওয়াতে অতি শীঘ্রই পাকিস্তানের নাটকের যবনিকাপাত করিতে হইয়াছে। এখন বেশ সোজাসুজি যুদ্ধ চলিয়াছে। ইহার পরিণতি যাহাই হউক ভারতবাসী জনসাধারণ এখন হইতে কয়েকটি বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক হইলে বুদ্ধির কার্য্য করিবেন। ১। সকল নরনারীর সামরিক কার্য্য কিছু-না-কিছু শিক্ষা করা। অস্ত্রচালনা, গাড়ি ট্রাক চালান, কারখানার কাজকরা ও আত্মরক্ষা শিক্ষা। আহতের সাহায্য, চিকিৎসা ও সেবা। ছোট ছোট আহত-চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলিয়া সেগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করা।

২। বড় বড় সহর হইতে নারী, শিশু ও বৃদ্ধবৃদ্ধাগণকে দূরে ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা। যে সকল স্থান কলিকাতা, দিল্লী, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ সহর হইতে অন্তত: ১০০।১৫০ মাইল দূরে; সেই সকল স্থানে যাঁহাদিগের গৃহাদি আছে তাঁহাদিগের উচিত হইবে সেইগুলিকে বাসোপযুক্ত করিয়া রাখা ও ছুটির সময় সেই সকল স্থানে যাইয়া বাস করা। এইরূপ অভ্যাস করিলে প্রয়োজন হইলে যাইবার স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। যাঁহাদিগের সেইরূপ গৃহাদি নাই, তাঁহাদিগের উচিত হইবে অল্পব্যয়ে জানাশোনা স্থানে নিজেদের ছুটির বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া। সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে মফঃস্বলের স্বাস্থ্যকর জায়গাতে অল্প খরচে দুই-তিন কামরার গৃহ নির্ম্মাণ সম্ভব; এবং তাহার জন্য কিস্তিবন্দিভাবে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলে কলিকাতার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লোকেই নিজ নিজ ছুটির বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া লইতে পারেন। বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের অতি নিকটে অন্তত: ১০০টি এইরূপ ছোট ছোট শহর আছে, যেখানে ছুটিতে লোকে যাইয়া থাকিতে পারে। এই সকল স্থানে ৫০০।১০০০ লোকে যদি সমবেতভাবে ছুটির বাড়ীর পল্লী নির্ম্মাণ চেষ্টা করেন তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা হইতে তাহারা অন্যত্র যাইয়া থাকিতে পারিবেন। প্রয়োজন না হইলেও এই সকল গৃহ ছুটির সময় যাইয়া থাকিবার জন্য বিশেষ সুখপ্রদ হইবে।

কারণ পাকিস্তানের সহিত ভারতের শান্তির সম্বন্ধ কখনও স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে না। চীনও এই বিষয়ে পাকিস্তানের সহিত মিলিত থাকিবে। পিছনে থাকিবে সেই সকল মহাশক্তিমান জাতিগুলি, যাহাদিগের কাজ হইল জগতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চিরজাগ্রত রাখা। কারণ তাহাদিগের অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা এরূপ যে সর্ব্বত্র যুদ্ধের রসদ ও মালমশলা ক্রয়বিক্রয় না হইতে থাকিলে সে অর্থনীতি অচল হইয়া যায়। এবং তাহা হইলে মহাশক্তিমান-দিগের শক্তি আর থাকে না। কখনও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লাগিলে তখন তাহারা অসহায় অবস্থায় পড়িবে। এই কারণে অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিস্ফোরক বিমান কামান ট্যাঙ্ক শতঘ্নীআয়ুধ ইত্যাদি তাহাদিগের কারখানা হইতে অক্লান্ত স্রোতে বাহির হইবে ও সেইগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, যাহাতে যদি কখন মহাযুদ্ধ লাগে তাহা হইলে প্রবল বন্যায় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি যুদ্ধরত সৈন্যদিগের হস্তে পোঁছাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। যুদ্ধদানবের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। সে কখন জাগ্রত হইয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানবজাতিকে প্রলয়ের আগুনে টানিয়া ফেলিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সেই মহাসর্ব্বনাশের প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য জাতিরা যাহাতে আগুন কিছুটা জ্বালাইয়া রাখে তাহারই ব্যবস্থা মহাশক্তিমানরা করিয়া চলে। আমরা তাহাদেরই খেলার পুতুল।

কাশ্মীর—২

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের জন্মের দুই-তিন মাসের মধ্যেই পাকিস্তান তাহার ঐতিহাসিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন কাল্পনিক কারণে আকাঙ্ক্ষিত অধিকারসমূহের একটা তালিকা মনে মনে তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছিল। পাকিস্তানের নিজের জন্মটাই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা অতি বড় অধিকারবর্জ্জিত দুরাকাঙ্ক্ষার উদাহরণ। কারণ কোন রাষ্ট্রেরই এক-চতুর্থাংশ অংশ ব্যক্তি হঠাৎ একটা ভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইতে চাহিতে পারে না, সে যে কোন কারণেই হউক না কেন। ধর্ম্ম, ভাষা বা জাতি লইয়া রাজ্য গঠন হইতে পারে, ধীরে ধীরে, সামাজিক

ইচ্ছার ক্রম অভিব্যক্তির ফলে; কিন্তু হঠাৎ রাজ্য গঠন বা দেশভাগ কেহ দাবি করিতে পারে না ঐ জাতীয় কারণে। অবশ্য ব্রিটিশ প্রভুরা চাহিলে সে সময় সবই হইতে পারিত। অতএব প্লেবিসাইট বা মাথা-গুণতি কিংবা কোন কিছুই না করিয়া পাকিস্তান গঠিত হইয়া গেল, যদিও প্লেবিসাইট বা জনমত হিসাব করিলে ৪:১ হারে পাকিস্তান অগ্রাহ্য হইত। পাকিস্তান হইবা মাত্রই প্রমাণ হইয়া গেল যে ভারতের সকল মুসলমানের প্রভু পাকিস্তান, ভারতের সকল মুসলমানের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ অধিকারের অধিকারীও পাকিস্তান। অর্থাৎ ভারতের অঙ্গহানী করিয়া যাহা কিছু যে ভাবে বা যে কোন কারণ দেখাইয়াই কর্ত্তন করিয়া লওয়া যায়, সেই সকল কর্ত্তিত অংশই পাকিস্তানের প্রাপ্য। কেন? কারণ নাই। প্রমাণ নাই। কোনও অধিকার নাই কোনও ভাবে; শুধু আছে জোর করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা। হায়দ্রাবাদ পাকিস্তানের হওয়া চাই, জুনাগড়ও পাকিস্তানের হওয়া চাই, কেননা সে রাজত্বগুলির রাজা মুসলমান। প্রজারা সকলে হিন্দু হইলে আসে-যায় না। কাশ্মীর চাই, কেননা প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান—রাজা যদিও হিন্দু—তাহাতে যায়-আসে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদিগকে মারিয়া তাড়াও, তাহাদিগের জমিজমা জোর করিয়া কাড়িয়া লও—কেননা তাহারা মুসলমান নহে। ন্যায় ও প্রমাণ অথবা সত্যকার দাবির কথা পাকিস্তানী আইনে বিচার্য্য নহে। একমাত্র ন্যায় প্রমাণ ও দাবি হইল মুসলমান হওয়ার। তাহাও আবার আরব কিংবা পাখতুন হইলে চলিবে না—পাকিস্তানী মুসলমান হওয়া চাই। পাখতুন যদি বলে আমরা মুসলমান, আমরা পাকিস্তানে থাকিতে চাহি না, তাহা হইলে তাহাদিগকে বোমা মারিয়া ধর্ম্মের পথে রাখিতে হইবে। পাকিস্তানী মুসলমান শুধু সেই জাতীয় মুসলমান, যাহারা ব্রিটিশের প্ররোচনায় ভারতীয় দেশপ্রেমিকদিগকে স্বাধীন ভারত গঠনে বাধা দিবার জন্য একত্রিত হইয়া ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্তান গঠন করিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে পূর্ণরূপে সাহায্য করিয়াছিল। ব্রিটিশ তখন ভাবিয়াছিল যে পাকিস্তান গঠিত হইলে ব্রিটিশের একটা আস্তানা ভারতবর্ষে চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে সেই কেন্দ্র হইতে ব্রিটিশশক্তি পুনরায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সারা ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে। এই চক্রান্ত আরম্ভ হইবামাত্র পাকিস্তান গঠিত হইবে স্থির হইয়া গেল এবং পাকিস্তান গঠিত হইবার পর সেই চক্রান্তের চরম পরিণতি—কোন্ পথে, কি ভাবে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিয়া পূর্ণতা উপলব্ধি করিবে, তাহারও একটা আবছা পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু দেশদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মহাপাপের মধ্যে যাহার জন্ম তাহার উপরে কেহ-বা কোন কিছুই নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। পাকিস্তানের জন্মের পর হইতেই তদ্দেশের নেতৃবৃন্দ পরস্পরের শত্রুতা করিয়াই আনন্দলাভ করিতেন এবং কোন সময়ই পাকিস্তান কোন মতলব বিশেষের সফলতার প্রতি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া সাফল্য অর্জ্জনে তৎপর হয় নাই। একমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা সম্বন্ধে অধিকাংশ পাকিস্তানীগণ এক-প্রাণ ও এক-মত হইতে সক্ষম হইত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন পাকিস্তান প্রথম কাশ্মীর দখল চেষ্টা করিল তখন সে চেষ্টা খুবই গোপনে ও মিথ্যার অভিনয়ের অন্তরালে করিবার চেষ্টা করা হইল। যাহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইল তাহারা সকলে পার্ব্বত্য জাতির ধর্ম্মান্ধ জেহাদের যোদ্ধা সাজিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিল। যদিও সকলেই জানিত যে, সেই যাত্রার দলের অভিনেতাগণ সকলেই পাকিস্তানের অস্ত্রে ও বস্ত্রে সজ্জিত, তাহা হইলেও পাকিস্তান জগতকে জোর গলায় জানাইতে লাগিল যে পাকিস্তানের সহিত এই সকল "কাবালি", দিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরে পাকিস্তানকে মানিয়া লইতে হইল যে এসকল লোক তাহারই সৈন্য। শুধু সাজ বদল করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছে। ঐ সময় ভারতকে কাশ্মীরের রাজা ডাকিয়া আনিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে অনুরোধ করায় ভারত পাকিস্তানীদিগকে কাশ্মীর হইতে উত্তম-মধ্যম দিয়া বিদায়-ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পাকিস্তানীগণ

কাশ্মীরী মুসলমানদিগের উপর প্রচুর লুঠতরাজ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে তাহারা রাজকার্য্য অপেক্ষা অরাজকতাই অধিক বুঝে। ইহা দ্বারা তাহারা কাশ্মীরের উপর নিজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন ন্যায়ের বা ধর্ম্মের অধিকার প্রমাণ করিয়াছিল বলা চলে না। বরং ইহাই প্রমাণ হইয়াছিল যে বিতাড়িত লুঠেড়া কখনও শাসনকার্য্যের ভার পাইতে পারে না। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কিন্তু পাকিস্তান ও ব্রিটিশ-আমেরিকান ষড়যন্ত্রকারীগণ বরাবরই জগতকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ঐ লুঠপাটও ধর্ম্মযুদ্ধের অভিনয় করিয়া কোন অজানা কারণে পাকিস্তানের কাশ্মীরে একটা রাষ্ট্রীয় অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। জগতবাসী লোকের অবশ্য পাকিস্তান, কাশ্মীর বা ভারতের বিষয়ে কোনও প্রকৃষ্ট জ্ঞান নাই; কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই অন্ততঃ এ কথাটা বুঝে যে লুঠ করিবার বিফল চেষ্টা দ্বারা কোনও রাষ্ট্রীয় বা জমিদারী অধিকার সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু পাকিস্তানের ন্যায়-শাস্ত্রে বলে যে, "জোর যার মুল্লুক তার"—কথাটা অবশ্য সত্য এবং তাহার উপরেও সত্য চুরি, প্রবঞ্চনা বা যে কোন অসৎ উপায়ে মিথ্যা প্রচার করিয়া রাজ্য দখল করিয়া ফেলা।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান পুনরায় কাশ্মীরের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। এইবার দলে দলে পাকিস্তানী সৈন্য "কাশ্মীরী" সাজিয়া একটা বিদ্রোহের অভিনয় সুরু করিল। "কাশ্মীরী"রা নিজের ভাষা না জানিলেও তাহারা কাশ্মীরী, একথা পাকিস্তান জোর গলায় সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যকার কাশ্মীরীগণ ইহাদিগের সহিত যোগ না দেওয়ায় ইহারা আবার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মত লুঠপাট আরম্ভ করিল। তখন কাশ্মীরের পুলিশের সহিত ইহাদিগের সংঘাত হইল ও পরে তাহাই ব্যাপ্ত হইয়া যুদ্ধে পরিণত হইল। সকলে দেখিল যে কাশ্মীরী বিদ্রোহিগণ কেহই কাশ্মীরী ভাষা জানে না এবং কোথায় কি ভাবে যাইতে হয় তাহাও জানে না। আর একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটিল, যাহা বিস্ময়কর। সর্ব্বত্রই বিদ্রোহীরা যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। অর্থাৎ পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে একত্র হইয়া তাহারা যুদ্ধবিরতি রেখা ডিঙ্গাইয়া কাশ্মীরে ঢুকিয়া বিদ্রোহী-কাশ্মীরী হইয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীরের বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিয়া দেখিতে লাগিল যে তাহাদিগের সেনাপতিগণ পাকিস্তানী। অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকান এবং সৈন্যগণও কাশ্মীরী নহে। এ অবস্থায় সকলে মানিয়া লইতে বাধ্য হইল যে কাশ্মীর দখল করিবার যুদ্ধ পাকিস্তান চালাইতেছে। যদিও পাকিস্তানের স্বৈরাচারী প্রভু আয়ুব খাঁ কাশ্মীরের বীর বিদ্রোহী-দিগের প্রতি তাহারা অতিভক্তি প্রকাশ করিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিল। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পন্থা ছিল পথে-ঘাটে জনসাধারণকে পশ্চাৎ হইতে ছুরি মারিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া অপর সকল ভারতবাসী-দিগকে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা। সে-পথে চলিয়া স্বাধীনতা পাওয়া হইলেও ছুরিমারা ও গুণ্ডাবাজি যুদ্ধপদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত হইল না। পাকিস্তান সম্মুখ সমরে বিশ্বাস করে না। গুপ্তঘাতকের চাল-চলনই তাহারা সর্ব্বত্র অনুসরণ করে। এমত অবস্থায় কাশ্মীরের "বিদ্রোহ" যে হঠাৎ কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে কিংবা আসাম অথবা বাংলা দেশে আসিয়া পড়িবে না, ইহারও কোন স্থিরতা নাই।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে পাকিস্তান অমৃতসর শহরের উপর বিমান দিয়া রকেট ছুঁড়িয়াছে। এবং আরও অনেক স্থলে বিমান আক্রমণ করিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে ভারতীয় সেনা-বাহিনী পাঞ্জাবের সীমানা অতিক্রম করিয়া তিন পথে লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছে। সেই আক্রমণ ষাট মাইল জুড়িয়া প্রবল বিক্রমে চালিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, পাকিস্তান আমেরিকান "সেবার জেট" বিমান ব্যবহার করিয়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পগতি ভারতে তৈয়ারী "ন্যাট" বিমানের নিকট কয়েকবারই মার খাইয়াছে। তাহাদিগের অনেকগুলি "সেবার জেট" ধ্বংস হইয়াছে এবং স্থলযুদ্ধেও আমেরিকান ও বৃটেনের দান ট্যাঙ্কগুলির প্রায় ২০০।৩০০টি ভারতীয় কারখানার তৈয়ারী ট্যাঙ্ক দিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। এখন যুদ্ধ মহাবিক্রমে চলিতেছে। আয়ুব "জেহাদ" ঘোষণা

করিয়া মুসলমান সৈন্যদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টাতে ব্যস্ত। শুধু মুসলমানরা বুঝিতেছে না যে আয়ুব কেন "জেহাদ" করিয়া কাশ্মীরী মুসলমানদিগের ধন-সম্পত্তি লুঠ করাইতেছে এবং পাখতুনদিগকেই বা কেন বোমা মারিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। পরস্বাপহরণ মুসলমান ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। আয়ুব খাঁ যখন বিদেশে যাইয়া নাইট ক্লাবে ও অন্যান্য দুর্নীতির আসরে গমনাগমন করিয়া থাকে তখন কি তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না? বিধর্ম্মীদিগের ও সর্ব্বধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের নিকট সাহায্য গ্রহণও মুসলমানের জেহাদের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। আমেরিকান ও ব্রিটিশদিগের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র বিধর্ম্মীর দান। চীনা কম্যুনিষ্টগণ সর্ব্বধর্ম্মবিদ্বেষী। তাঁহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন কঠোর মুসলমানী নীতি নহে। আয়ুবের ন্যায় ভণ্ড মানব-শত্রুর নিপাত প্রয়োজন। আশা করা যায়, এখন সম্মুখ সমরে আয়ুব খাঁর গুপ্তঘাতকের কৌশল আর চলিবে না এবং তাহার রাজত্বের অবসান হইয়া পাকিস্তান ও ভারতের জনসাধারণ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

আসল কথা

পাকিস্তানের কাশ্মীর দখল চেষ্টার মূলে কয়েকটি বড় বড় মিথ্যা ও অন্যায় রহিয়াছে যেগুলি আমেরিকা, ব্রিটেন ও আরও কোন কোন জাতি সুবিধামত ভুলিয়া গিয়া থাকেন। প্রথম কথা হইতেছে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় আইনত (সে আইন অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের আইন) ভারত বিভাগ করিয়া। অর্থাৎ ব্রিটিশের অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হয়। ভারতকে ও পাকিস্তানকে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে গায়ের জোরে দখল করিয়া লইবার কোনও অধিকার কেহ দেয় নাই। ব্রিটিশের উপরওয়ালার প্রভুত্ব মানিয়া যে সকল ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত ছিল সেগুলি কিভাবে থাকিবে তাহার কোন পরিষ্কার মীমাংসা কেহ করিয়া যায় নাই। একটা কথা ছিল যে, ভারত বিভাগের পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্তানের ও ভারতের ভূখণ্ডগুলি মোটামুটি এলাকা অনুযায়ীভাবে স্থির ছিল এবং কোন্ ভারতীয় রাজ্য কোন অংশের সহিত সংযুক্ত থাকিবে তাহাও মোটামুটি ধরা ছিল। কাশ্মীর কোন্ দিকে যাইবে কিংবা পৃথক থাকিবে এ কথার কোন মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই পাকিস্তান "লড়কে লেঙ্গে" পন্থা অনুসরণ করিয়া গায়ের জোরে কাশ্মীর দখল করিতে লাগিয়া গেল। ফলে কাশ্মীরের রাজা ও শেখ আবদুল্লা ভারতের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিলেন ও ভারত সৈন্য পাঠাইয়া কাশ্মীর রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাকিস্তান কিন্তু ক্রমাগত নিজের কাশ্মীর দখল চেষ্টা অস্বীকার করিয়া বলিতে থাকিল যে কাশ্মীরে পার্ব্বত্য জাতির দস্যুরা ঢুকিয়া হিন্দুদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি। লুঠ হইতেছিল কিন্তু কাশ্মীরী মুসলমানদিগের সম্পত্তি। ইজ্জত নষ্টও করা হইতেছিল মুসলমানদিগেরই। এইরূপ মিথ্যার অভিনয় চালাইয়া শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান উন্মুক্তভাবে সজ্জিত সৈন্য পাঠাইয়া ভারতের সহিত লড়াই করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, পাকিস্তানই সমস্ত যোগাযোগের মূলে ছিল। সে সময় তাহারা মার খাইয়া কাশ্মীরের প্রায় বাহিরে পৌছিয়াছে এবং বিশ্বজাতি সভায় কাঁদুনি গাহিয়া আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্যে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে কাশ্মীরে পাকিস্তানের কিছু থাকিয়া যায়। ব্রিটেনের প্ররোচনায় ভুলিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু জয়যুক্ত হইবার মুখে যুদ্ধবিরতি মানিয়া হইয়া পাকিস্তানী দুর্ব্বৃত্তদিগের জাতি সভায় একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন; যাহার ফলে আজ এই যুদ্ধ চলিতেছে। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ আন্তর্জ্জাতিক আইনে বাধে জানিয়াই গোড়া হইতে নিজেদের হানাদারী অস্বীকার করিয়া চলিতেছিল। যখন সেকথা তাহারা মানিতে বাধ্য হইল তখন পণ্ডিত জহরলালের উচিত ছিল কাহারও কোন কথা না শুনিয়া তাহাদিগকে কাশ্মীরের বাহিরে বিতাড়িত করা।

আজ পাকিস্তান যে কাশ্মীরের ঝগড়া বলিয়া একটা আইনসাপেক্ষ বিবাদ খাড়া করিতে পারিয়াছে তাহা ব্রিটেনের কারসাজিতে হইয়াছে; আসলে তাহার কোনও ভিত্তি নাই। জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক যে কোনও আইনেই হউক না কেন পাকিস্তানকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাশ্মীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার অধিকার ভারতের মূল

অধিকার। বর্ত্তমান যুদ্ধেও পাকিস্তান প্রথমে সঙ্ সাজিয়া যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়া "কাশ্মীরী" বিদ্রোহিদিগের পোশাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরে সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া খোলাখুলি যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধ প্রথমত: যুদ্ধবিরতি সন্ধিভঙ্গের ও দ্বিতীয়ত: মিথ্যা বলিয়া ভারতের ভিতরে সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করার। পরে যখন তাহারা ছাম্ব অঞ্চলে সৈন্য পাঠাইয়া জম্মু আক্রমণ করিল তখন তাহারা আন্তর্জ্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করিয়া ভারতে ঢুকিল। কেন ঢুকিল? না "কাশ্মীরী বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থে"। কোন দেশেরই আন্তর্জ্জাতিক আইনে অন্য দেশের বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থে সেই দেশ আক্রমণ করিবার অধিকার জন্মায় না। বিদ্রোহীরা জাতি, ধর্ম্ম, ইত্যাদিতে যাহাই হউক না কেন। পাকিস্তান যেস্থলে নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার সৈন্যগণ ভারতে ঢুকিয়া কাশ্মীরী বিদ্রোহীদিগের সাহায্য করিতেছে সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ভারত যে-কোন ভাবে বিতাড়িত করিতে যথা ইচ্ছা চেষ্টা করিতে পারে। পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও তাহা ন্যায়সাপেক্ষ হইবে। পাকিস্থান বলিতে পারে জম্মু কাশ্মীরে এবং আমরা কাশ্মীরের বিদ্রোহীদিগের ধর্ম্মভাই সুতরাং আমরা জম্মু দখল করিব। এইরূপ কথার আইনত কোনও মূল্য নাই। পাকিস্থানের তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল মুসলমান বিদ্রোহীকে সামরিক সাহায্য করিবার অধিকার জন্মিয়া যায়। ভারতেরও ঐ নিয়মে পাকিস্তানের কোন জেলায় হিন্দু-পাকিস্থানীগণ বিদ্রোহ করিলে সেইখানে প্যারাসৈনিক নামাইবার অধিকার জন্মায়। পাকিস্তানের আইন-কানুনের জ্ঞান নাই ধরা যাইতে পারে কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেনেরও ঐ বিষয়ে জ্ঞান নাই কেমন করিয়া বলা যায়? পরে দেখা যায় যে, পাকিস্তান যে সকল ধার-করা অস্ত্র শুধু কম্যুনিষ্টদিগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পাবে বলিয়া আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে অস্ত্র কদাপি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে না বলিয়া বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই সকল অস্ত্রেই সজ্জিত হইয়া "কাশ্মীরী বিদ্রোহি"গণ বিদ্রোহ আরম্ভ করে! এবং সেই সকল অস্ত্রই খোলাখুলি ব্যবহার করিয়া পাকিস্তান এখন যুদ্ধ চালাইয়াছে। অথচ আমেরিকা কোথায়, কি করিয়া এই সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া সময় কাটান যাইবে শুধু সেই চিন্তাতেই বিভোর! কথা আছে যে, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ হউক বা না হউক, পাকিস্তানের সহিত দোস্তি করিয়া আমেরিকার বুদ্ধিনাশ নিশ্চয়ই হইয়াছে। মিলিত জাতিসভারও ন্যায়, সত্য ও আইন জ্ঞান ক্রমশ: যে অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে শীঘ্রই জাতি সভায় লাল বাতি জ্বলিবে বলিয়া মনে হয়।

আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা

অসামরিক লোকেদের আত্মরক্ষা তাঁহাদিগের নিজেদের হস্তে। এই আত্মরক্ষার কার্য্য অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রধানত: হাওয়াই আক্রমণ লইয়াই সকলে ব্যস্ত থাকেন। হাওয়াই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা সকলকে বারম্বার বলা হইয়াছে ও হইতেছে; শুধু লোকে সেই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন কি না তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন। আলোক বাহিরে প্রতিফলিত যাহাতে না হয় ইহা একটি সকল লোকের কর্ত্তব্য-কার্য্য। হাওয়াই আক্রমণ হইলে সকলে একতলার সুরক্ষিত ঘরগুলিতে আশ্রয় লইবেন ইহা দ্বিতীয় কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে পর্দ্দা ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সামাজিক কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া ও প্রতিরক্ষা কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া দরজা-জানালা হইতে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বাহিরে প্রতিফলিত হইতে দেওয়া হইতেছে। ইহা একটা সামাজিক অপরাধ ও ইহার জন্য লোকেদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট অফিসারের গৃহেও এই জাতীয় অপরাধ করা হইতেছে। বড় বড় আফিস-দপ্তরেও হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই সকল সমাজরক্ষার কার্য্য অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছিল। দেওয়াল তুলিয়া ও বালির বস্তার দেওয়াল দিয়া গোলাগুলী ও বোমার টুকরা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা কমই দেখা যাইতেছে। প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। প্রস্তুত হইতে

হইলে সকলের আয়োজন ও তৎসংক্রান্ত অভ্যাস করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সময়ে সাধিত হওয়া চাই। চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়িলে কোন লাভ হয় না।

শত্রু শুধু হাওয়াই আক্রমণই করিবে তাহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শত্রুর চর গোপনে নানা প্রকার অপকর্ম্ম করিয়া দেশকে অচল করিয়া ফেলিতে পারে। শত্রুর চর কে তাহা বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া বাহির করিতে হইবে। প্যারা-সৈনিক নামাইয়াছে বলিয়া চেঁচামেচি করিয়া যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া হল্লা করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অধিক, কাজ হয় কম। রাত্রে সমাজরক্ষী দলের পালা করিয়া শহরে ও গ্রামে গ্রামে পাহারা দিবার প্রয়োজন। ইহাতে সাধারণ অপরাধী এবং দেশের শত্রু উভয় জাতীয় দুর্ব্বৃত্তগণই শাসনে থাকিবে। কাঁটা তুলিবার সুবিধা পাইয়া এই সকল সময় অনেক মিথ্যাচারী লোক ইহার-উহার নামে পুলিশে খবর দিয়া ব্যক্তিগত শত্রুতার আক্রোশ মিটাইবার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত শত্রুতা নানা প্রকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা, আদালত, নালিশ, পুরাণো ঝগড়া—কত কিছু লইয়া মানুষ মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল ব্যক্তির উচিত ভাল করিয়া দেখা যাহাতে অন্যায় ভাবে কাহারও নামে কোন অভিযোগ কেহ না উঠাইতে পারে। এবং সকলে সমবেত ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া দেশশত্রুদিগকে কোনও প্রকার ক্ষতিকর কার্য্য করিবার সুবিধা না পাইতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেন্টের উচিত সাধারণ ভাবে পুলিশের প্রাপ্ত খবরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া না চলা। আরও উত্তম ব্যবস্থা করিয়া তবে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। নতুবা উড়ো খবরের উপর চলিলে প্রথমতঃ গুপ্তচর ধরার আসল কার্য্য হইবে না এবং পরে দেশের জনসাধারণ সত্য ও ন্যায়ের পরিবর্ত্তে মতলববাজির খপ্পরে পড়িয়া মনেব বিশ্বাস ও মিলিত শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের ক্ষমতা হারাইয়া ক্রমশঃ অসংযত জনতার ন্যায় হইয়া যাইবে। যুদ্ধের আবহাওযায় বহুপ্রকার অপরাধ করিয়া দুষ্ট লোকে পার পাইয়া যায়। ' অতিরিক্ত লাভে ব্যবসা চালান, মিথ্যা গুজব রটাইয়া কার্য্যসিদ্ধি করা ও অপরাপর অন্যায়ভাবে নানাপ্রকার মতলব হাসিল করা ইত্যাদি। এই সকল দিকে দেশরক্ষকদিগকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা জরুরী কার্য্য হইল গুপ্তচর ধরা। শত্রুর গুপ্ত ও খোলাখুলি আক্রমণ হইতে অসামরিক দেশবাসীদিগকে বাঁচিতে হইলে কখন কখন কোন কোন কেন্দ্র হইতে শিশু, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অল্পবয়স্কা নারীদিগের মধ্যে মাতাগণকে দূরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই প্রয়োজন হয় নাই কিন্তু ইহার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলের কর্ত্তব্য। সর্ব্বশেষে প্রয়োজন অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দিয়া গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করা। দেশবাসী কতটা দেশপ্রেম অন্তরে পোষণ করেন ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে যদি গবর্ণমেণ্ট সবকারী ঋণের সুদেব হার অর্দ্ধেক করিয়া দেন এবং বিনা সুদে ঋণ গ্রহণেরও প্রস্তাব কবেন। আমাদিগের বিশ্বাস এই উপায়ে গবর্ণমেন্ট বহু অর্থ বাঁচাইয়া যুদ্ধের কার্য্যে লাগাইতে পারেন।

আলোক সম্বন্ধে আইন কবা হইয়াছে। আইন মানিয়া লোকে চলে কি না দেখা যাউক। সুরক্ষিত গৃহ, সাধারণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল, আগুন নিভান, আহতের চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা এখনও ঠিক মত হয় নাই। তাহার কারণ সর্ব্বসাধারণ এই সকল কার্য্যে যোগ দিতে আহূত হন নাই এবং যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষমতার এখনও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শত্রুর চর বলিয়া সম্ভবত সাত-আটশত ব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গে ধরা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কয়টি সত্যকার শত্রুপক্ষের সহকারী ও কয়জন ব্যক্তিগত ঝগড়া ও মতলববাজির মিথ্যা নালিশের ফলভোগী তাহা শীঘ্র অনুসন্ধান করিয়া দেশকে ন্যায়ের ও সত্যের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা কর্ত্তব্য। ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার ও আরও কোন কোন ব্যক্তির গ্রেপ্তারের সূত্রে পুলিশের সত্যানুরক্তি সম্বন্ধে সাধারণের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইতে পারে। তাহা ছাড়া যে পুলিশ সাধারণ চোর-ডাকাইত ধরিতে প্রকটভাবে সক্ষম নহেন সেই পুলিশই যুদ্ধের আরম্ভ হইতে-না-হইতে অসংখ্য পাকিস্তানী গুপ্তচর ধরিয়া ফেলিলেন ইহাও সহজে বিশ্বাস

হয় না। সহজে ধরা অপরাধীর মধ্যে নকল দোষী ও মিথ্যা অভিযোগের শাস্তিভোগীর সংখ্যা বেশকিছু থাকিতে পারে। এইজন্য এই সকল ব্যক্তির বিষয়ই উত্তমরূপে খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন। ভুল লোক ধরিয়া আসল অপরাধীকে ছাড়িয়া দেওয়া ভারতীয় পুলিশের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায়। যুদ্ধের মত জীবনমরণ সমস্যার বিষয়ে তাহা হইতে দেওয়া চলে না।

ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি

নীতির কথা সচরাচর দুর্নীতিপরায়ণ লোকেদের মুখেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহা দুই কারণে প্রধানত হয়। প্রথম কারণ, নিজেদের পাপকার্য্য মিথ্যা ব্যাখ্যান প্রচার ও প্রমাণের দ্বারা পাপকার্য্য নহে বলিয়া পৃথিবীর লোককে বুঝাইয়া দেওয়া ও দ্বিতীয় কারণ, নিজেদের পাপকার্য্যের লক্ষ্য যাহারা, তাহাদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিবার জন্য আরও অনেক কথা সাজাইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া দেখাইবার জন্য। পাকিস্তানের সহিত ভারতের যে বর্ত্তমান সংঘাত তাহার আরম্ভ হইল পাকিস্তানের জন্ম হইতেই। ভারতের মুসলমানগণ ভারতীয় হিন্দুদিগেব সহিত এক দেশে এক রাষ্ট্রে থাকিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা হিন্দু হইতে বিভিন্ন এক মহাজাতি ও তাঁহাদিগেব মাতৃভাষা উর্দ্দু এবং হিন্দুর কৃষ্টি হইতে তাঁহাদিগের কৃষ্টি পৃথক ইত্যাদি বহু মিথ্যা কথা ব্রিটিশ-সমর্থকদিগের সাহায্যে প্রচার করিয়া ও ভাড়া-করা গুণ্ডা দিয়া বহু লোককে দাঙ্গায় হতাহত করাইয়া পাকিস্তান জন্মলাভ করে। ইতিহাসে যদিও হিন্দু-মুসলমান ক্রমান্বয়ে ৫০০।৭০০ বৎসর একভাবে এক রাজ্যে বাস করিয়া আসিয়াছে। উর্দ্দু ভাষা পাকিস্তানের কোন লোকের মাতৃভাষা নহে তাহাও সকলেই জানেন। পাকিস্তানীদিগের মাতৃভাষা হইল বালুচ, পশ্‌তু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি ও বাংলা। রীতিনীতি এই সকল জাতির পৃথক পৃথক এবং ১৮ বৎসর কাল এক রাষ্ট্রে থাকিয়াও তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একতা লক্ষিত হয় না। বাংলার মুসলমান অপর দেশীয় মুসলমানদিগের সহিত একভাবে খাওয়া-থাকা প্রভৃতি চালাইতে পারেন না। অন্য মুসলমানগণও বাংলার মুসলমানকে "ঢাকাইয়া" বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এহেন পাকিস্তান এখনও পশ্‌তু ভাষাভাষী পাখতুনদিগের উপর ক্রমাগতই গোলাগুলী চালাইয়া পাক অর্থাৎ পবিত্র জাতীয় মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় পাকিস্তান জন্মাবধি মিথ্যাচার ও খুন-খারাবি ব্যতীত অপর কোনদিকে বিশেষ ক্ষমতা দেখাইতে পাবেন নাই। সুতরাং যখনই পাকিস্তান কোন মিথ্যা দাবি দুনিয়ার নিকটে পেশ করিবার প্রয়াস করেন তাঁহারা তখনই তাঁহাদিগের চিরঅনুসৃত রীতি অনুসারে জোরজুলুম করিয়া প্রমাণ হইবার পূর্ব্বেই দখল লইয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। হাইদ্রাবাদে রাজাকারদিগের অত্যাচার ও পূর্ব্ব বাংলার হিন্দুদিগের উপর আনসারদিগের জুলুম ইত্যাদি এই গুণ্ডাবাজির উদাহরণ। ভোটগুণতি করিয়া যদি ন্যায়-অন্যায় বিচার করা চলিত তাহা হইলে সত্যমিথ্যা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা কখনও হইত না। এবং গোড়ায় ভোট গুণিলে পাকিস্তানও কোনদিন জন্মলাভ করিত না। এখনও ভোট গুণিলে পাখতুনগণ পাকিস্তানে থাকিবে না—হয়ত পূর্ব্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পৃথক হইয়া যাইবে।

কাশ্মীরের লোকেদের ভাষা উর্দ্দু নহে। বাংলা, বালুচ, পশতু, পাঞ্জাবী অথবা সিন্ধিও নহে। তাহারা বহুকাল ডোগরা রাজাদিগের সহিত বাস করিয়া সকল শিল্পকলায় পাকিস্তানের মুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিক কর্ম্মকুশল ও ছোরাছুরি চালাইতে অপেক্ষাকৃতভাবে অক্ষম। তাহারা পাকিস্তানীদিগের ভয়ে পাকিস্তানী রাজত্ব হইলে তাহা মানিয়া লইতে পারে কি না কে জানে, কিন্তু পাকিস্তানীদিগকে তাহারা ঘৃণা করে। কারণ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাকিস্তানীরা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে তখন সহস্র সহস্র কাশ্মীরী মুসলমানদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ হইয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মান-ইজ্জতও নষ্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও পাকিস্তানী লুঠেড়াগণ পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার কাশ্মীরী মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর পাকিস্তান লইবে বলিয়া স্থির

করিয়াছে, আমেরিকান ও ব্রিটিশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে। কারণ কাশ্মীর দেশের সীমান্তে লাগালাগিভাবে রহিয়াছে চীন সাম্রাজ্য ও রুশিয়া। এই দুই দেশের মধ্যেও সদ্ভাব নাই এবং কাশ্মীর সীমান্তে কিছু জায়গা পাইলে চীনের সামরিক পথঘাট বানাইতে সুবিধা হয়। পাকিস্তানের সীমান্তও ঠেলিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া যদি রাশিয়ার সহিত লাগিয়া যায় তাহা হইলেও আমেরিকা ও ব্রিটেনের সেই সকল সংযোগস্থলে সৈন্য প্রভৃতি রাখিয়া রুশের বিরুদ্ধাচরণ করা সহজ হয়। এবং চীনকে গোপনে সাহায্য করিয়া কিছুটা জোরাল করিয়া দিতে পারিলেও আমেরিকা ও ব্রিটেনের রুশ-বিরুদ্ধতা আরও প্রবলরূপ ধারণ করিতে পারে। এই সকল কারণে পাকিস্তানের কাশ্মীর দখল ইচ্ছা আমেরিকা ও ব্রিটেনের সমর্থনে সর্ব্বদা জাগ্রত ও জীবন্ত থাকে। এবং সকল ন্যায়ের ও সত্যের বিপরীত হইলেও, কোনও অজানা কারণে, পাকিস্তানের কাশ্মীর-সংক্রান্ত সকল মিথ্যা ও কষ্টকল্পিত অভিযোগ ও আবদার আমেরিকা ও ব্রিটেনের দরবারে স্বয়ংসিদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে গায়ের জোরে যাহা নাই তাহা আছে প্রমাণ করার উদাহরণ বিরল নহে; কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের কাহিনী ও তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য মিথ্যার ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অবতারণা সকল পুরাণ ইতিহাসের মিথ্যাকে শিশুপাঠ্য গল্পের ন্যায় সরল ও সহজ প্রতীয়মান করে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর আক্রমণ করিবার সময় পাকিস্তান যে ভাবে মিথ্যা কথা বলিয়া জগৎ-সভায় নিজেকে শ্রেয় প্রমাণ করিয়া পরে উচ্চকণ্ঠে নিজ সামরিক দুষ্কর্ম্ম মানিয়া লয়, সেরূপ কার্য্য কোন রাষ্ট্র সভ্যজগতে কখনও করিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। জগৎরাষ্ট্রসভা, বিশেষ করিয়া আমেরিকা ও ব্রিটেন পাকিস্তানের মিথ্যা আচরণ ও পার্ব্বত্য দস্যুদলের ছদ্মবেশে কাশ্মীর লুঠ করিয়া দখল করিবার চেষ্টা প্রভৃতিকে নব্যরাষ্ট্রের অসংযত ও ভাবোন্মত্ত ব্যবহারের কোঠায় ফেলিয়া, পাকিস্তানের পক্ষে সেরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া, ভারতকে জওহরলাল নেহরুর মারফতে, পাকিস্তানী দস্যুতাকে একটা উচ্চাঙ্গের রাষ্ট্রীয় কলহের সহিত তুলনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইনের ঝগড়ার তালিকায় তাহা লিখাইয়া "যুদ্ধবিরতি রেখা" ও "অল্পদিনের সন্ধি" ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিবাদের প্রভেদ চিরতরে মুছিয়া দিলেন। পাকিস্তানও সেই সময় হইতে আন্তর্জ্জাতিক আইনকানুন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া যত্রতত্র লুঠ, খুন, সামরিক অভিযান ও গুলীগোলা চালান একটা স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় অধিকার হিসাবে চালাইয়া আসিতেছে। নিজ দেশে এবং অপরের দেশে। নিজ দেশে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের নামে পাকিস্তান সকল প্রকার বর্ব্বরতা এমন একটা প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির মতই চালাইয়া চলিতেছে যে কোনও পাকিস্তানীরই কোন মানবতার অধিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগকে খুন, জখম, সম্পত্তি লুঠ, ইজ্জত নাশ ও দেশ হইতে বহিষ্করণ একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে বিতাড়িত হৃতসম্পদ, মৃত ও আহত অমুসলমানের সংখ্যা পাকিস্তানে গুণিলে ২০।২৫ লক্ষের অধিক হইবে। মুসলমানদিগের মধ্যেও লাহোরে জাফরউল্লা খানের সহধর্ম্মী আহমেদিয়াদিগের ২০।২৫ হাজার লোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হতাহত হন। বর্ত্তমানে ওয়াজিরিস্থান প্রভৃতি পাঠান এলাকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাকিস্তানী সৈন্যের গুলীগোলাতে হতাহত হইয়াছেন। বালুচিস্থানেও প্রায় ঐ প্রকার অবস্থা। পূর্ব্ব পাকিস্তানে আয়ুব খানের সামরিক শাসন পদ্ধতির চাপে বাংলা-ভাষী পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান অর্দ্ধমৃত ও উৎপীড়িত।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ যে বলিয়াছেন পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধ সামরিক একাধিপত্যের সহিত স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্রের যুদ্ধ। ভারত যদি এ যুদ্ধে জয়লাভ না করে তাহা হইলে এশিয়াতে মানব স্বাধীনতার আলোক চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে। এই যুদ্ধ বর্ব্বর দুর্নীতিপরায়ণ দস্যুর লালসার বিরুদ্ধে সাধারণ মানবের অতি সাধারণ অধিকার রক্ষার যুদ্ধ। পাকিস্তানের অর্থ পবিত্র চরিত্রের বাসস্থান। পবিত্রতার সহিত পাকিস্তানের শাসকদিগের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণই দেখা যায় না। সে দেশের জনসাধারণ সামরিক রাষ্ট্রের

ক্রীতদাস। তাঁহারা পবিত্র চরিত্র কি না আমরা জানি না। তবে অনেকেই নহেন তাহার প্রমাণ আছে। যাঁহারা পবিত্রচরিত্র, তাঁহাদিগের উপর আল্লার দোয়া সজাগ হইয়া উঠিলে পাকিস্তানের বর্ত্তমান রাষ্ট্রের অবসান আসন্ন হইবে মনে হয়।

কাশ্মীরের বর্ত্তমান অভিযানে পাকিস্তান প্রথমে অভিনয়ের ঢংয়ে কাশ্মীরীদিগের বিদ্রোহের পালার প্রযোজনা করে। কিন্তু তাহা ঠিক ভাবে না জমিয়া উঠার ফলে তাহারা ভারত আক্রমণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের সাহায্যে ভিন্নস্থলে আরম্ভ করে। তখন ভারতের সামরিক নেতাগণ প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান আক্রমণ করেন। তাহার ফল এখন অবধি পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানপাপী ও জ্ঞানহীন

যাহাদিগের কোনও জ্ঞান নাই, বুদ্ধিও অল্প এবং যাহাদিগের লেখাপড়া যথেষ্ট আছে অথচ কিন্তু চরিত্রের দুর্ব্বলতা অথবা অসংযত অবস্থার জন্য কর্ম্মে স্বৈরাচার আধিক্য আছে; এই দুই জাতীয় লোকের জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ইহাদিগের স্বেচ্ছা ও অজ্ঞানতাপ্রসূত কর্ম্ম বা কর্ম্মের অভাবের জন্য জাতীয় নিরাপত্ত নষ্ট না হয়। যাহারা পথে বাস অথবা চলাফেরা করে, সেই গরীব ও অন্য পথিকদিগের জন্য "সাধারণের আশ্রয় লইবার কেন্দ্র" সহরে সর্ব্বত্র গঠন করা প্রয়োজন। যথা একতলাতে যে সকল রেস্তরাঁ ও অপরাপর দোকান প্রভৃতি আছে সেগুলির মধ্যে বাছাই করিয়া "ব্লাস্ট" হইতে বাঁচিবার "ব্যাফ্‌ল" দেওয়াল তুলিয়া ও সর্ব্বদা "ওয়ার্ডেন" উপস্থিত রাখিয়া রাস্তার লোকদের হাওয়াই আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা এখনও কেহ করিতেছে না। "ওয়ার্ডেন"দিগের নাম ছাপা হইতেছে কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতেছেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। যথা, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকার পাঁচ-ছয় তলার জানালা আলোতে উদ্ভাসিত দেখা যাইতেছে: এমন কি পর্দ্দার অস্তিত্বও নাই। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের দিবাভাগে হাওয়াই আক্রমণ হইলে কি করিতে হইবে ইহা শিখান হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ কখন কখন আমাদিগের নিকটে টেলিফোনে লোকে প্রশ্ন করিতেছেন যে হাওয়াই আক্রমণ হইলে তাঁহারা কি করিবেন। ওয়ার্ডেনগণকেও তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া পাওয়া যায় উপদেশ বা ব্যবস্থার জন্য তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্ভবত এই সকল ব্যক্তির শুধু নামগুলিই আছে: অন্তত অনেকেরই তাই। গভর্ণমেণ্টের উচিত এই কার্য্যে রাষ্ট্রীয় দলগুলির পাণ্ডাদিগকে না লাগাইয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত লোকেদের সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করা। এবং পাড়ায়-পাড়ায় ক্লাব ও জিমনেশিয়ামগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহার সকল সুস্থ-সবল ছেলেদের অগ্নি নির্ব্বাপন, আহত-দিগের সাহায্য ও হাওয়াই আক্রমণ হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা সকলকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের সহিত কথা বলিয়া এই সকল কার্য্য হয়। খালি রেডিওতে বা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। যতটা জানা যায়, কোন কোন বৃহৎ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্টকে নিজেদের লোকবল দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেই সুযোগ ব্যবহার করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

সর্ব্বসাধারণের মনের জোর ও যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবার ইচ্ছা সংহত, সংযত ও সজাগ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেই কার্য্য যদি অতি সহজসাধ্য ব্যবস্থার অভাবে ঠিক মত না করা হয় তাহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় হইবে। এই মহাযুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিতেছেন ও অন্যান্যভাবে যুদ্ধ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে সাহায্য করিতেছেন তাঁহারা দাবি করিতে পারেন যে, সকল কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সমবেত চেষ্টাতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে এবং সেইমত ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করা প্রয়োজন। দলাদলির সময় এখন নহে এবং যুদ্ধের কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ব্যবস্থাই নিজের সুবিধার জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘকে ব্যবহারে লাগাইতে দেওয়া উচিত

হইবে না। এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে সর্ব্বসাধারণ যাহাতে সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়া সকল কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে আত্মনিয়োগ করেন তাহার ব্যবস্থা করা।

যুদ্ধে কি প্রমাণ হইয়াছে

পাকিস্তানী জনতা পাকিস্তানের জন্ম হইবার পূর্ব্ব হইতেই যে অতি নিম্নস্তরের বর্ব্বরতা নিজেদের নেতাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল সেই বর্ব্বরতা তাহারা আজ অবধি অতি উৎকটভাবে নিজেদের ব্যবহারে জীবন্ত রাখিয়াছে। ভারতবাসীরা বরাবর পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে বর্ব্বরতার উত্তরে শুধু মানবতামূলক সভ্যতা দেখাইয়া অপর পক্ষকে নিজ বর্ব্বরতা ভুলাইতে চেষ্টা করিয়া প্রকটভাবে বিফলতার পর বিফলতা পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতের মানবতার প্রচেষ্টা তাহার দেশরক্ষার ব্যবস্থাও শিথিল করিয়া দিয়াছিল এবং ফলে চীনাদিগের হস্তে ভারত অপমানিত হইয়াও আত্মসম্মান হারাইয়া পুনরায় হৃতবুদ্ধি অবস্থা হইতে সজাগ বুদ্ধিতে আসিয়া পড়িয়া নিজ আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলে পর ভারতীয় সামরিক পরিস্থিতি পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃঢ়তায় ফিরিয়া যাইতে পারিল। চীনের সহিত "যুদ্ধ" করিয়া ভারতের এই জ্ঞান হইল যে লোকবল ও অস্ত্রবল পারস্পরিক সম্বন্ধে ওজন ঠিক না রাখিলে যুদ্ধকার্য্য ঠিক চলে না। যে ভারতীয় সৈন্যেরা বিগত মহাযুদ্ধে আফ্রিকায় রোমেলের জার্ম্মান আফ্রিকা কোরকে বিধ্বস্ত করে সেই ভারতীয় সৈন্যেরা যে চীনাদিগের নিকট যুদ্ধে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না, একথা সামরিক জগতে কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। ভারতীয় সৈন্যগণ যথাযথ অস্ত্র ও তাহার ব্যবহার শিক্ষালাভ করিলে কি করিতে পারে তাহা এই যুদ্ধে কারগিল, উরি, পুঞ্চ, ছাম্ব, কাসুর, ওয়াগা প্রভৃতি স্থানে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত অতি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র ভারতের নিজ কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছে। আকাশেও পাকিস্তানী "সেবর জেট" বিমান ভারতে তৈয়ারী "ন্যাট" বিমানের নিকট বিধ্বস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের সৈন্য উপযুক্ত অস্ত্র পাইলে বিশ্বের যে-কোন সৈন্যের সমকক্ষ একথা সকলে স্বীকার করিবেন। ভারত সরকার নিজের শিথিল মনোভাব ত্যাগ করিয়া যে দৃঢ়তার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সুফল সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। দৃঢ়তা ও কঠোর কর্ত্তব্যবোধ ব্যতীত কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। এই দৃঢ়তা ও কঠোর কর্ত্তব্যবোধ শুধু সামরিক ক্ষেত্রে থাকিলেই চলিবে না। এই সঙ্কটকালে যেখানে যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যে ও আদর্শে চরিত্রের শৈথিল্য দেখাইবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিতে হইবে—অতি অবশ্য। জাতীয় উন্নতির ইহাই একমাত্র পথ ও পন্থা। দেশরক্ষার জন্য ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

যুদ্ধ স্থগিত

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান নিজ সেনাবাহিনীর যোদ্ধাদিগকে থিয়েটারী ঢংয়ে সাজাইয়া কাশ্মীর দখল চেষ্টা করে। সে সময়ে সেই সৈন্যগণ পার্ব্বত্য পাঠান জাতীয় লোকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। পরে ভারতীয় সেনাদল কাশ্মীরের রাজার অনুরোধে সেই লুণ্ঠনকারীদিগকে তাড়াইয়া কাশ্মীর হইতে বহিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পাকিস্তান তখন নিজ সৈন্যগণকে পাকিস্তানের সামরিক পোশাক পরাইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় অবধি পাকিস্তান সত্য কথা বলে নাই কিন্তু ঐ সময় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, পাকিস্তানই সকল কিছুর উদ্যোক্তা ছিল। তখন ব্রিটিশের চেষ্টায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু পাকিস্তান সেনাদল পলায়নপর হইলেও যুদ্ধ স্থগিত করিয়া একটা যুদ্ধনিবৃত্তি রেখা পর্য্যন্ত দস্যুদিগকে কাশ্মীরে থাকিয়া যাইতে দেন। ফলে পাকিস্তান আজাদ-কাশ্মীর নাম দিয়া পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে নিজ রাজত্ব স্থাপন করিয়া লইল এবং বরাবর ভারতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধনিবৃত্তি রেখা বিশ্বের মিলিত জাতি সংঘের নিয়ম অনুসারে

গঠিত হওয়াতে সেই রেখা অতিক্রম না করিবার প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান ও ভারতকে দিতে হয়। বর্ত্তমানে সেই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া পাকিস্তান পুনর্ব্বার আজাদ-কাশ্মীরের নামে একটা "বিপ্লব" হইতেছে বলিয়া ছদ্মবেশধারী সৈন্য ছাড়িয়া ঐ রেখা অতিক্রম করিয়া ভারত আক্রমণ করে। যতদিন আশা ছিল পাকিস্তান কাশ্মীর জিতিয়া লইতে পারিবে ততদিন অবধি ব্রিটিশ-আমেরিকানগণ কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই। পাকিস্তান আমেরিকার দেওয়া কম্যুনিষ্ট দমন করিবার অস্ত্রবল পূর্ণরূপে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিলেও আমেরিকা "অসহায় ভাবে" সেই অস্ত্র-অপব্যবহার মানিয়া লয়। কিন্তু যখন ভারত প্রত্যাক্রমণ করিয়া পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল তখন ব্রিটিশ আমেরিকান চালিত মিলিত জাতি সংঘ হঠাৎ বিশ্বমানবতার আদর্শবাদে মুখর হইয়া উঠিল। অর্থাৎ শান্তিরক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, পাকিস্তান রক্ষা ও কাশ্মীরকে ভারতের নিকট হইতে ছলে-বলে-কৌশলে ছিনাইয়া লইবার ভবিষ্যত চেষ্টার পথ খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা। উচ্চ আদর্শের আড়ালে দুষ্কর্ম্ম করিয়া চলা পৃথিবীতে অজানা নাই। ভারতেও কিছু লোক আছে, যাহারা বড় বড় কথা বলিয়া ছোট ছোট কাজ করিয়া থাকে। সমাজ-তন্ত্র, ভারতরক্ষা, গরীবের সাহায্য, ধনবানের দমন প্রভৃতি বহু আদর্শের পশ্চাতেই রাষ্ট্রীয় দলের স্বার্থরক্ষামাত্র দেখা গিয়াছে। কিন্তু দেশের শত্রুগণ যখন ভারতের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য নির্দ্দোষের রক্তপাতে নিযুক্ত হইল তখন ভারতের জনশক্তি সম্মিলিত হইয়া ভারত সেনাবাহিনীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। বোমা, গোলাগুলী কোন কিছুতেই সেই জনশক্তি পাকিস্তানের ভয়ে ভীত হইল না। ভারতের যে নিজত্ব, যাহার মধ্যে বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ও অসংখ্য মতামত ও রীতিনীতির সমাবেশ হইয়াছে; এবং যে নিজত্ব এক মহা ঐক্যের বন্ধনে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা; তাহার আজ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং জগৎ জানিয়াছে ভারতের ঐক্য কাহারও চাতুরিতে মুগ্ধ হইয়া অথবা ভয়ে ভীত হইয়া নষ্ট হইবার নহে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় ১লা অক্টোবর (১৪ই আশ্বিন) হইতে ১৪ই অক্টোবর (২৭শে আশ্বিন) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের মহিমা

ডক্টর রমা চৌধুরী

অদ্বৈতবেদান্তসম্মত ব্রহ্মবাদের সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য, মহিমা ও গরিমা কি সত্যই অতুলনীয় নয়? একে কেবলমাত্র একটি Statio Conception অথবা অনড়, অচল মতবাদরূপে উপহাস ও বর্জন করা হয়ত সহজ, কিন্তু সহজ নয় তার সত্তাগত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করা। অদ্বৈত ব্রহ্মের ক্ষেত্রে একমাত্র কথা হল "সত্তা", কেবল সত্তা; অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য-বিহীন, অন্যান্য সকল চিহ্নবিহীন, অন্যান্য সকল রূপ বিহীন কেবল "সত্তা" (Pure Existence)।

অদ্বৈত-ব্রহ্ম জীব-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধহীন

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এরূপ ব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সকল দিক থেকেই সকল প্রকারেই সম্পূর্ণ রূপেই সম্বন্ধবিহীন। আমরা জানি যে, সাংসারিক দিক থেকে আমাদের জীবনের তিনটি প্রধান দিক আছে—জ্ঞানের দিক, অনুভবের দিক, প্রবৃত্তির দিক (thinking, feeling, willing)।

এই তিনটি দিকের কোনটি থেকেই ত এরূপ অদ্বৈত-ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে না, হতে পারছে না। প্রথমতঃ, জ্ঞানের দিক থেকে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে। কিন্তু এ-স্থলে বলা হয়েছে যে, জীবও জ্ঞাতা নয়, ব্রহ্মও জ্ঞেয় নন। কারণ, যদিও সাধারণতঃ "ব্রহ্মজ্ঞানে"র কথা সর্বদাই বলা হয়, তা হলেও এই ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ ঘট-পটাদি জ্ঞান একেবারেই নয়, যেহেতু সাধারণ সাংসারিক দ্রষ্টা হল দেহ-মন আত্মা; ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার "দ্রষ্টাই" নেই, "দ্রষ্টার" প্রশ্নই নেই, যেহেতু এই জ্ঞান নিত্য জ্ঞান; পুনরায়, এক্ষেত্রে প্রশ্ন যদি উঠে ত, তা হ'ল কেবল আত্মারই প্রশ্ন, দেহ-মনের যে নয়, তা বলাই বাহুল্য। সেজন্য যদি "ব্রহ্মজ্ঞানের" কথাই বলা হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রশ্নই এক্ষেত্রে উত্থাপিত করা হয়, তা হলেও বলতে হবে যে, এই "ব্রহ্মজ্ঞান" সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী অর্থাৎ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ-প্রণালী এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোন-ক্রমেই, যেহেতু এই প্রণালী ভেদমূলক, দ্বিত্ববোধক।

সেজন্য, জ্ঞানের দিক থেকে অদ্বৈত-ব্রহ্মকে জানা যায় না। তাঁর সঙ্গে তা হলে আর সম্বন্ধ কি এই দিক থেকে? দ্বিতীয়তঃ, অনুভবের দিক থেকে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অনুভব কর্তা ও অনুভাব্য বস্তুর মধ্যে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদ "শুষ্কজ্ঞানবাদ" রূপে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যখন জ্ঞানেরই অস্তিত্ব এস্থলে নেই, তখন অনুভবের অস্তিত্বের প্রশ্নই বা উঠবে কোথা থেকে? কারণ, আমরা যদি ব্রহ্মকে জানতে পর্যন্ত না পারি, তা হলে তাঁকে ভক্তি করতে, শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতেই বা পারব কি করে—সাধারণ জ্ঞান-প্রণালীও যদি ভেদমূলক, দ্বিত্ববোধক হয়, তা হলে অনুভব-প্রণালীও ঠিক তাই; বরং অধিক পরিমাণেই তাই, যেহেতু জ্ঞানের দ্বিত্ব অপেক্ষা প্রেমের দ্বিত্ব অধিক; কারণ বরং নিজেকে নিজে জানা যায়, কিন্তু নিজেকে নিজে ভক্তি করা, শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা একেবারেই হাস্যকর নয় কি? সেজন্য, প্রবৃত্তির দিক থেকেও অদ্বৈত-ব্রহ্মকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা যায় না, ভালবাসা যায় না। তাঁর সঙ্গে তা হলে আর সম্বন্ধ কি এই দিক থেকে? তৃতীয়তঃ, প্রবৃত্তির দিক থেকেও একই ভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু উপরের প্রণালী অনুসারে, এ ক্ষেত্রেও প্রবৃত্তির কোন-রূপ প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি আমরা ব্রহ্মকে জানতেও পারি না, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেও পরি না, ভালবাসতেও পারি না, তা হলে তাঁর সম্বন্ধে কোনও কামনা, বা প্রবৃত্তি হতে পারে না, সুনিশ্চিত। সেজন্য, প্রবৃত্তির দিক থেকেও, অদ্বৈত-ব্রহ্মকে কামনা করা যায়

না ; উপাসনা করা যায় না। তাঁর সঙ্গে তো হলো আর সম্বন্ধ কি এই দিক থেকে ?

এরূপে, আমরা দেখি যে, অদ্বৈত-ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানবদের কোনরূপ সম্বন্ধই স্থাপিত হতে পারে না। তা হলে এরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা ভাববই বা কি, আর করবই বা কি ?

এর উত্তর হল এই :—

কেবল জীব রূপেই,কেবলমাত্র সাংসারিক জীব রূপেই আমরা নিশ্চয়ই ব্রহ্মের বিষয়ে কোনরূপ ধ্যান-ধারণাই করতে পারি না। এ ত অতি স্বাভাবিক, যেহেতু অশুদ্ধ আধারে শুদ্ধ ব্রহ্মালোক স্ফুরিত হবে কিরূপে ? ব্রহ্মালোক চিরকাল সেই একই। কিন্তু তা প্রতিবিম্বিত করবার জন্য উপযুক্ত প্রতিবিম্বকের প্রয়োজন। যথা, সূর্যালোক চিরকাল সেই একই। কিন্তু সেই আলোক যখন হীরকের উপর পড়ে, তখন তা 'প্রতিবিম্বিত হয়ে' ফিরে আসে উজ্জ্বলতম প্রভায় ; যখন কয়লার উপর পড়ে তখন তা 'প্রতিবিম্বিত না হয়ে' ব্যর্থ হয়ে যায়, যেন অবলুপ্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপেই। একই ভাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করতে হলে আমাদেরও উন্নীত হতে হবে ব্রহ্ম পর্যায়ে, জীবপর্যায় পরিত্যাগ করে ; এবং এরূপ ব্রহ্ম-পর্যায়ে উন্নীত হবার অর্থই হল আমাদের শাশ্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা। এর অপেক্ষা অধিকভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আর স্থাপিত হতে পারে কিরূপে ?'

বস্তুত, এক্ষেত্রে, "সম্বন্ধেরই" বা প্রশ্ন আর কোথায় ? "সম্বন্ধ" হতে পারে দুই, বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে। কিন্তু যেক্ষেত্রে স্বয়ং আমরাই ব্রহ্ম, সেক্ষেত্রে কে কার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে ?

সেজন্যই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, অদ্বৈতসম্মত ব্রহ্মকে আমরা যেমন ভাবে পাই ঠিক তেমনি ভাবে অন্য কোন সম্প্রদায়ের ব্রহ্মকেই নয়। অন্য সম্প্রদায়সম্মত সঙ্গে আমাদের ভেদ অনিবার্য মোক্ষকালেও সেই ভেদ বিরাজমান থাকে। কিন্তু এরূপ "ভেদে" আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না শাশ্বত ভাবে, ফলতঃ "আমি ব্রহ্মের সেবক" ; "আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম"— এই দুটি উপলব্ধির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ ?

অভেদোপলব্ধি ও ভেদোপলব্ধির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ ?

যুক্তি-তর্কের দিকের কথা

সত্যই কোন্‌টি শ্রেয় ? অবশ্য যুক্তি-তর্কের দিক থেকে বেদান্তসম্মত ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সুসমঞ্জস একমাত্র অভেদবাদই কেবল। বস্তুতঃ সকল সম্প্রদায়ের বেদান্তের মতেই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। সেক্ষেত্রে, ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না, স্বভাবতঃই। কিন্তু ব্রহ্মের ভিতরেই বা ব্রহ্ম ভিন্ন অথবা ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্ন কোন কিছু থাকতে পারে কিরূপে ? এরূপে জীব-জগৎ যদি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়তঃই ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণরূপেই এবং শাশ্বতকালই ভিন্ন হয়, তা হলে তারা ব্রহ্মের ভিতরে থাকতে পারে কিরূপে ? পুনরায়, যদি জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ ভিন্ন হয়, তা হলেও গুণতঃ ভিন্নতার কোনরূপ অর্থই ত এ-ক্ষেত্রে নেই।

সেজন্য, যুক্তি-তর্কের দিক থেকে, এক্ষেত্রে ব্রহ্মকে অসর্বব্যাপীরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এই কারণে, বেদান্ত ব্রহ্মবাদও একতত্ত্ববাদ সমার্থক।

সৃষ্টিতত্ত্ব, অথবা জীব-জগতের অস্তিত্ব, এমন কি, মিথ্যা, তথাকথিত অস্তিত্বও ব্যাখ্যা করা যে অতি দুষ্কর, তা নিঃসন্দেহ। তা সত্ত্বেও, বেদান্ত-ব্রহ্ম থেকে সত্য-মিথ্যা সকল প্রকারের সৃষ্টিই যুক্তিসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন। বস্তুতঃ, কেবলমাত্র বেদান্তসম্মত ব্রহ্ম কেন, যে-কোন দর্শনসম্মত ঈশ্বর থেকে জীব-জগৎ সৃষ্টি ন্যায়ানুগরূপে ব্যাখ্যা করা সুকঠিন কারণ, ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও নিত্যপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত। সুতরাং, সেদিক থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে কোন মতবাদই যে অদ্বৈতমতবাদাপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, এ কথা বলবার উপায় নেই। কিন্তু ব্রহ্মবাদের দিক থেকে যে অদ্বৈতবেদান্ত মতবাদই একমাত্র গ্রহণীয় মতবাদ, তা অস্বীকার করা যায় না।

অনুভবের দিকের কথা

কিন্তু যুক্তি-তর্ক যাই বলুক না কেন, অনুভূতি কি বলবে এ সম্বন্ধে ?

অনুভূতি কিন্তু যুক্তি-তর্কের ন্যায় সার্বজনীন

নয়; অনুভব ব্যক্তিগত। সেজন্য অনুভবের দিক থেকে কিছু বলা সত্যই অতি কঠিন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, অনুভবের দিক থেকেও, অনুভবের দিক থেকেই ভেদের অপেক্ষা অভেদই বরং আমাদের বহুলাংশেই প্রিয়তর নয় কি? যুক্তি-তর্কের দিক থেকেই আমরা দীন-হীন, ক্ষুদ্র-ক্ষীণ জীব, ভূমা মহান, অনন্ত অসীম ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের চির প্রভেদ। কিন্তু অনুভবের দিক থেকে আমাদের মন শুষ্ক যুক্তি বিচারের এই "নজীর" মানে না। ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত ভ্রুকুটি অবহেলা করেও তা এক হয়ে মিলে যেতে চায় প্রিয়তমের সঙ্গে আবেগোচ্ছল রস-বন্যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সুফী মতবাদ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মধ্বাদির ন্যায় দ্বৈতবাদী এবং এ না হয়ে তার উপায়ই নেই। কারণ ভক্তিবাদ স্বরূপতঃই দ্বৈতবাদ—যেহেতু ভক্তির পাত্র এবং ভক্ত, প্রেমের পাত্র এবং প্রেমিক, উপাস্য এবং উপাসককে পরস্পর ভিন্ন হতেই হবে—নিজেই নিজেকেই ভক্তি, প্রেম, উপাসনা কেই বা করবেন?

অথচ, অনুভবের দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মও যেরূপ, সুফী দর্শনও সেরূপ একত্ববাদী। অর্থাৎ প্রবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে, মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, আমরা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সুফী দর্শনে এরূপ বহু প্রবঞ্চনা আছে। যেমন, বহু স্থলেই বলা হচ্ছে যে, ভক্ত যেন ভগবানের সঙ্গে এক এবং সমগ্র বিশ্বেও ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই তিনি দেখতেও পাচ্ছেন না। এই ভাবে, নিগূঢ় প্রেম-রসের প্লাবনে, মধুর আবেগের উৎসে, আনন্দঘন উচ্ছ্বাসের প্রবাহে ঈশ্বর-জীব-জগৎ সবই যেন একাকার হয়ে যায়—তখন কেই বা উপাস্য, আর কেই বা উপাসক, কেই বা প্রভু, কেই বা দাস; কেই বা স্রষ্টা-কারণ, আর কেই বা সৃষ্টকার্য।

এরূপ একতত্ত্ববাদ, অথবা অদ্বৈতবাদকে "আবেগ-মূলক একতত্ত্ববাদ, অথবা, অদ্বৈতবাদ (Emotional Monism) বলা চলে—যেহেতু যা পূর্বেই বলা হয়েছে, এস্থলে জ্ঞানের দিক থেকে, ভেদবাদ, অথবা ভেদাভেদ-বাদই মাত্র রয়েছে; ভাবাবেগের দিক থেকেই কেবল তথাকথিত একতত্ত্ববাদ।

অনুভবের শেষ একত্বে

সে যা হোক্ আমরা দেখি যে, অনুভবের দিক থেকেও, শেষ পর্যন্ত একতত্ত্বই সকলের কাম্য, দ্বিত্ব নয়, বহুত্ব নয়। সত্যই অনুভব দিগন্তপ্রসারী সাগরের ন্যায়ই সর্বগ্রাসী, সর্বাবয়লুপ্তিকর। সেজন্যই দেখা যায় যে, অনুভবের ক্ষেত্রে প্রারম্ভে ভেদ থাকলেও, পরিশেষে যেন তা থাকে না—কারণ, যতই অনুভব গভীর হয়, নিগূঢ় হয়, ঘনীভূত হয়, ততই তা যেন অনুভবকর্তা ও অনুভবের পাত্রের মধ্যে ভেদ বিলুপ্ত করে দেয়। তখন শ্রীরাধার ন্যায় আমরাও যেন সর্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই দেখি, সর্বত্রই সেই এককেই অনুভব করি, সর্বত্রই সেই অভেদকেই আস্বাদন করি।

এরূপে, যেদিক্ থেকেই চিন্তা করা যাক্ না কেন, একত্বই যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

জ্ঞানের শেষ একত্বে

অনুভবের ন্যায়, জ্ঞানের শেষেও ত সেই একত্বোপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনের কথা স্মরণীয়। "শ্রবণ" অন্যের উপদেশের ভিত্তিতে তত্ত্বগ্রহণং "মনন" নিজের যুক্তির ভিত্তিতে তত্ত্বগ্রহণং "নিদির্ধ্যাসন" নিজের সাক্ষাৎ উপলব্ধির ভিত্তিতে তত্ত্বগ্রহণ। এক্ষেত্রে এক বিষয়ে ক্রমাগত, এক প্রাণমন হয়ে চিন্তা করতে থাকলে, পরিশেষে এরূপ স্তরে উপনীত হওয়া যায়, যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ ভেদ আর থাকে না, জ্ঞাতা যেন জ্ঞেয়ে পরিণত হয়ে যান।

সম্প্রাজ্ঞত সমাধি

যোগ-দর্শনে এই অবস্থাকেই বলা হয়েছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শ্রেষ্ঠ অবস্থা। যোগ দর্শনানুসারে, সমাধি, প্রথমতঃ দুই প্রকারের—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রকারভেদ

সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিক্ষেত্রে, কেবল একটি মাত্রই জ্ঞেয় বস্তুই অবশিষ্ট থাকে, যেহেতু অন্যান্য সকল বস্তুর প্রতি

মনোনিবেশ ত্যাগ করে, সেই একটিমাত্র বস্তুর প্রতিই কেবল মনোনিবেশ করা হয়।

সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি, পুনরায়, দ্বিবিধ—বিতর্ক ও বিচার। যখন কোন স্থূলবস্তুতে মনোনিবেশ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় "বিতর্ক"। যখন কোন সূক্ষ্মবস্তুতে মনোনিবেশ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় "বিচার"। "বিতর্ক," পুনরায়, দ্বিবিধ—সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক।

সবিতর্ক—সমাধিস্থলে, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অনুভূত হয়। শব্দ হল "নাম" (Name), অর্থ হল "বস্তু" (Object), জ্ঞান হল তার সম্বন্ধে "মানসিক ধারণা······(Idea)।"

কিন্তু নির্বিতর্ক-সমাধিস্থলে, কেবলমাত্র অর্থই অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা যেন জ্ঞেয়ে পরিণত হয়ে জ্ঞেয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

সবিচার ও নির্বিচার সমাধির মধ্যেও প্রভেদ একই প্রকারের।

নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধি

এরূপে, যখন চিন্তা, ভাবনা, ধারণা নিগূঢ় হয়ে ওঠে, ঘনীভূত হয়ে ওঠে, গভীর হয়ে ওঠে, তখন বস্তুটি স্থূলই হোক্, অথবা সূক্ষ্মই হোক্, যে কোন প্রকারেরই হোক্ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। মনে হয় যেন—"আমি জ্ঞাতা রাম নই; ঐ বস্তুটিও জ্ঞেয় ঘট নয়, আমিই ঘট।"

এরূপে, সম্প্রজ্ঞাত, অথবা বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের শেষেও সেই একত্বোপলব্ধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও নিদিধ্যাসন

তার উপরে আছে, বস্তু নিরপেক্ষ-জ্ঞান। সেই একটি-মাত্র বস্তু থেকেও মন উঠিয়ে নাও, সেই একটিমাত্র বস্তুতেও মনোনিবেশ ক'রো না—তখনই হবে "চিত্তবৃত্তি-নিরোধ", অথবা, বস্তুর জ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে মানসিক বৃত্তি, তার সম্পূর্ণ বিলোপ।

এই হল প্রকৃতজ্ঞান—সাধারণ প্রণালীতে চিত্ত দ্বারা উদ্ভূত জ্ঞান নয়; সাধারণ প্রণালী নিরপেক্ষ, চিত্ত-নিরপেক্ষ জ্ঞান। এরই নাম "যোগ," অথবা, অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। একেই বলা হয়েছে "নিদিধ্যাসন"। এ সাধারণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদমূলক জ্ঞান নয়; অসাধারণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ উপলব্ধি। প্রকৃত পার-মার্থিক জ্ঞানের শেষ এইখানেই। এস্থলে দ্বিত্বের কোন প্রশ্নই নেই, যেহেতু জ্ঞাতাও নেই, জ্ঞেয়ও নেই, অথচ আছে এক, অখণ্ড শাশ্বত, পরিপূর্ণ জ্ঞান। কি পরমাশ্চর্য ঘটনা এটি!

একত্বের শ্রেষ্ঠত্ব

সে যা হোক্ সর্বদিক্ থেকেই অনিবার্যভাবেই আমরা সেই একই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হচ্ছি—একত্ব, একত্ব, কেবলই একত্ব। এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে পূর্বেই।

অদ্বৈতব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব

তাই যদি হয়, তা হলে অদ্বৈতব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও দ্বিমত থাকতে পারে কিরূপে? কারণ, অদ্বৈতব্রহ্মই, একমাত্র অদ্বৈতব্রহ্মই পরিপূর্ণ দ্বিত্ববিহীন, কণামাত্রও ভেদ তাঁতে নেই। এরূপ পরিপূর্ণ, শুদ্ধ, 'নির্ভেজাল নিখাদ'- নিরেট, অদ্বৈততত্ত্বে আমরা উপনীত হচ্ছি, উপনীত হতে প্রচেষ্টা করছি অহরহ, সবদিক্ থেকেই, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই। এই শাশ্বত, সার্বজনীন আকুতির একমাত্র প্রতীক হলেন অদ্বৈতব্রহ্ম। তাঁকে আমরা অবজ্ঞা করব কিরূপে? তাঁকে আমরা অস্বীকার করব কিরূপে? তাঁকে আমরা অনাদর করব কিরূপে? আমাদের সর্বদেহমন দিয়ে, আমাদের এই বর্তমান্, পার্থিব, অশুদ্ধ, জড় দেহ-মন দিয়ে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে না পারলেও, তাঁর জন্য আকুতি আমাদের চিরন্তনী। একেই শঙ্কর বলেছেন "মুমুক্ষুত্বঞ্চ" —তাঁর সুবিখ্যাত সাধন চতুষ্টয়ের শেষ সাধন "মুমুক্ষুত্ব" বা মুক্তির জন্য আকুল আকুতি।

"মুমুক্ষুত্বঞ্চ"

সাংসারিক সকল সাধারণ বাসনা-কামনা আচার-ব্যবহার, কার্য-কলাপের মধ্যেও যখন আমরা সম্পূর্ণভাবেই মগ্ন হয়ে থাকি, তখনও আমাদের মনের গহনে, প্রাণের গভীরে, অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি শূন্যতা, একটি রিক্ততা, একটি ব্যর্থতা, যেন থেকেই যায় সদাসর্বদা। একেই ইংরাজীতে বলা হয় "Divine Discontent"—"আধ্যাত্মিক অসন্তোষ," পারমার্থিক কামনা—এ সাধারণ সকাম কামনা নয়—এ সম্পূর্ণরূপেই নিষ্কাম কামনা। এই কথাগুলিকে স্ববিরুদ্ধ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই নয়। কারণ, এ কোন বিশেষ দ্রব্যের

জন্য অসন্তোষ নয়, কোন বিশেষ দ্রব্যের জন্য কামনা নয় —এ স্বয়ং স্বরূপ। পুষ্পের স্বরূপ কি? প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠা। নদীর স্বরূপ কি? প্রবাহিত হয়ে সাগরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছে,কত দুর্গম পথ অতিক্রম করে নদী প্রবাহিত হচ্ছে—এ ত তাদের করতেই হবে, এ ত তাদের না করে উপায় নেই, এ ত তাদের অলঙ্ঘ্য নিয়তি! সেজন্য, এ কামনামাত্রই নয়, এ স্বয়ং স্বরূপ। এ না হলে পুষ্প পুষ্পই নয়, এ না হলে নদী নদীই নয়। সেজন্য এ কামনামাত্রই নয়, যা ব্যতীতও জীবন চলে; এ স্বয়ং স্বরূপ, যা ব্যতীত জীবন বলে না, জীবন থাকে না।

আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এই আকুতি আছে, —অবশ্য প্রস্ফুটিত হবার জন্য নয়, প্রবাহিত হবার জন্য নয়—কারণ, আমরা যে নিত্য প্রস্ফুটিত, নিত্য প্রজ্জ্বলিত, নিত্য ঝঙ্কৃত—কিন্তু কেবল সেই নিত্য স্বরূপকে পূর্ণ উপলব্ধি করবার জন্য। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ কতদিন আর অনাঘ্রাত হয়ে থাকতে পারে? প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আলোক কতদিন আর অগোচরীভূত হয়ে থাকতে পারে? ঝঙ্কৃত বীণার সুর কতদিন আর অশ্রুত হয়ে থাকতে পারে? সেজন্য সংসারের তথাকথিত রাগ-দ্বেষ-পরিপূর্ণ, নিশ্ছিদ্র জীবনের মধ্যেও অকস্মাৎ কোন্ এক মহাশুভক্ষণে ভেসে আসে সেই সৌরভ, দীপ্ত হয়ে ওঠে সেই আলোক, রণিত হয়ে ওঠে সেই ঝঙ্কার। অকস্মাৎ মনে হয়, সংসারের সকল চাওয়া, সকল পাওয়ার মধ্যেও, কি যেন আমরা চাই, কি যেন আমাদের নেই, কি যেন আমাদের পেতেই হবে। এই ত হল আমাদের অধন্য পার্থিব জীবনে প্রথম অমৃত পদক্ষেপ, আত্মোপলব্ধির প্রথম অরুণোদয়, ভূমা দৃষ্টির প্রথম অভয় আবির্ভাব। এই ত হল আমাদের একমাত্র মহত্তম, মধুরতম নিয়তি, আমাদের শাশ্বত—ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি! তা হলে, একমাত্র অদ্বৈতব্রহ্মই আমাদের সত্তার সত্তা। তা হলে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তা হলে আর নৈরাশ্যের কি আছে?

—০—

সকালের দিকেই মহীতোষবাবু আবার মনে করিয়ে দিল।

কাল তাড়াতাড়ি যেও না। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছা।

বাসবী একটু অন্যমনস্ক ছিল। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই দীপক এসে অপেক্ষা করছিল ম্যানেজারের ঘরের সামনে। ম্যানেজার ডাকতেই ভিতরে চলে গিয়েছিল। আধঘণ্টার ওপর ছিল তারপর কোন দিকে না চেয়ে সোজা বেরিয়ে গিয়েছে। বাসবীর দিকে একবার ফিরেও চায় নি।

অবশ্য বাসবীর নির্দেশও তাই ছিল। সে নির্দেশ দীপক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

কাল বাড়ী ফেরবার আগে বাসবী মোড়ের দোকান থেকে রাবড়ি কিনেছিল। ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ হাতে কিছু পয়সা ছিল।

যখন বাড়ী গিয়ে পৌছল, তখন রুবি ঘুমে অচেতন। একবার ভাবল, তাকে ডেকে তুলবে, কিন্তু কি ভেবে আর ডাকল না।

রাবড়ির ভাঁড় দেখে মা ভ্রূ কোঁচকাল।

আজ তোদের মাইনে হ'ল ?

না মা, আমাদের মাইনে তো মাসের শেষ তারিখে। তার এখনও দিন কয়েক দেরি। আজ কয়েকটা বাড়তি টাকা রোজগার করলাম।

মা'র বিস্মিত ভাব গেল না।

বাড়তি টাকা ?

হ্যাঁ মা, দীপকবাবুর বাড়ী যাবার জন্য অফিস থেকে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছিল। যাবার সময় অফিসের সামনে থেকেই ট্যাক্সি নিলাম, পাছে কেউ কিছু মনে করে। দীপকবাবুর বাড়ী থেকে আসার সময় বাসে এলাম। যে ক'টা টাকা বাঁচল, তাই দিয়ে রাবড়ি কিনে আনলাম। রুবির কাছে আমার মানসম্ভ্রম রাখাই দায় হয়ে উঠছিল। প্রত্যেক মাসে বেচারী আশা করে।

এ সব কথা বোধ হয় মা'র কানে গেল না। তাড়াতাড়ি রাবড়ির ভাঁড়টা নামিয়ে রেখে বলল,

দীপকের বাড়ী আবার কেন ?

বলছি মা, খেতে খেতে বলব। তুমি ভাত ঠিক কর, আমি স্নানটা সেরে আসি।

বাসবী যেন পালিয়ে বাঁচল। কিভাবে কথাগুলো বলবে স্নান করবার সময় মনে মনে সাজিয়ে নিল। মা'র সন্দেহ একটু হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অফিসে কি পুরনো, বিশ্বাসী কেরাণী কেউ নেই যে এসব খোঁজ-খবর আনতে মেয়ে-কেরাণীকে পাঠাতে হবে? তাও এমন একজনকে, যার নিজের চাকরিই এখনও কাঁচা।

খেতে বসেই বাসবী কথাটা মাকে বলেছিল। ঠিক যেভাবে ম্যানেজার তাকে কথাটা বলেছিল, সেই ভাবেই।

মেয়ে-কেরাণীরই প্রয়োজন, কারণ মেয়েরা একেবারে অন্দরমহল পর্যন্ত যেতে পারে। সাংসারিক খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে শক্ত কিছু নয়। এ অফিসে মেয়ে দু'টি, কৃষ্ণা আর বাসবী। কৃষ্ণাকে টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই বাসবীকে যেতে হয়েছিল।

এ যুক্তির মধ্যেও ফাঁক ছিল।

অফিসের পরেও কি কৃষ্ণাকে ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, যে তার পক্ষে দীপকের বাড়ী যাওয়া সম্ভব ছিল না ?

কিন্তু মা সেদিক দিয়েও গেল না। অন্যদিকে চেয়ে বলল, এ-সব ব্যাপারে না থাকাই ভাল, বাসী। কে কি

রকম লোক হবে ঈশ্বর জানেন। শেষকালে তোর ওপর ঝক্কি এসে পড়বে।

আমার ওপর আর ঝক্কি আসা কি মা। দীপকবাবু আমার আত্মীয়ও নন, চেনাশোনাও কেউ নন। আমি অবশ্য সুপারিশ করেছিলাম এই মাত্র, অফিস তাঁকে যথেষ্ট বাজিয়ে নিয়েছে।

মা কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। মুখ ধুয়ে বাসবী নিজের ঘরে ঢোকবার মুখে মা কথা বলল, বাসী।

মা।

দীপকদের অবস্থা কেমন দেখলি?

আমাদেরই মতন মা, বাসবী ফিরে দাঁড়াল, আমাদের যেমন দু'টি নাবালক আছে মানুষ করে তোলবার, তেমনি দীপকবাবুদের সংসারে, এক অল্পবয়সী বিধবা বোন রয়েছে।

কেন তার শ্বশুরবাড়ী?

শ্বশুরবাড়ীও পাকিস্থানে। গোলমালের সময় কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, আর খোঁজ পায় নি। তা ছাড়া স্বামীই যখন নেই, তখন শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার আগ্রহও বোধ হয় কম।

ছেলে ওই একটি?

বোধ হয়।

এতদিন চলছিল কি করে?

কি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করি নি। আমি চাকরি পাবার আগে আমাদের যেমন চলছিল, তেমনই ভাবে ওদের চলছিল হয়ত। কায়ক্লেশে।

মা আর কিছু বলল না। শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাসবী চকিত একটা স্পর্শের কথা ভাবতে লাগল। অর্থহীন একটা অনুভূতি, সাময়িক উত্তেজনা এসব বলে মনকে বোঝাল বটে কিন্তু অনেকক্ষণ সেই আলাময়-স্মৃতি নিয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল।

মহীতোষবাবুর কথাটা বাসবীর মনে পড়ে গেল। যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। এটা অবশ্য মামুলী সামাজিকতা। কিন্তু মহীতোষবাবুর স্ত্রী বাসবীকে দেখবার জন্য উদগ্রীব এটাই তার কাছে আশ্চর্য লাগল।

কি ব্যাপার! অনিমেষ রায়ের সঙ্গে বাসবীর অন্তরঙ্গতার কথা, অবশ্য যে অন্তরঙ্গতা অফিসের লোক কল্পনা করে, বুঝি মহীতোষবাবুর স্ত্রীর কানেও উঠেছে। তাই তার দেখার খুব ইচ্ছা, কে এমন মেয়ে যে অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারকে কুক্ষিগত করেছে।

কথাটা বাসবী জিজ্ঞাসাই করে ফেলল।

আমাকে দেখবার জন্য এত ঔৎসুক্য কেন? আমি ত সাধারণ মেয়ে।

না, না, আর কিছু নয়, মহীতোষবাবু ঘাড় নাড়ল, অফিসের আর সবাইকেই ত দেখেছে, মানে আমার সেকশনের। তোমাকে কেবল দেখে নি। তাই তোমার কথা বলছিল। তাছাড়া আমার কাছে কিছু শুনেওছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে রুক্ষ কণ্ঠে বাসবী বলল, কি শুনেছেন?

ওই যে, বাবা নেই। কিভাবে তুমি চাকরি করে সংসার চালাচ্ছ। কোন সাজগোজের বাহার নেই। একমনে কাজ করে যাও। এ ছাড়া আবার সন্ধ্যার দিকে একটা টিউশনিও করতে হয়। তাই স্ত্রীকে বলছিলাম, এ যুগে ছেলে আর মেয়েতে কোন তফাৎ নেই। অবশ্য যদি সেইরকম মেয়ে হয়।

বাসবী লজ্জিত হল। অকারণ একটা ভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। তার ধারণা সকলেই বুঝি তার কথা, তার আচার-আচরণ নিয়েই আলোচনা করছে।

হয়ত করছে, কিন্তু মহীতোষবাবু যে এ সবের ব্যতিক্রম এটা বাসবীর বোঝা উচিত ছিল। আলো-অন্ধকারের মতন, সৎ-অসৎ লোকও পাশাপাশি বাস করে। সম্ভবত পৃথিবীতে অসৎ লোকের সংখ্যাই বেশী। সেই জন্যই ভণ্ড সাধুদের আস্ফালনে আসল সাধুরা চাপা পড়ে যায়। মহীতোষবাবুদের আলাদা করে দেখার উপায় থাকে না।

আমি তোমার জন্য মোড়ে অপেক্ষা করব মা, না হলে বাড়ী চিনতে তোমার অসুবিধা হবে।

মহীতোষবাবু তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, না, বাসবী হাত নাড়ল, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনার ঠিকানা আমি কৃষ্ণার কাছে জেনে নিয়েছি, আমি ঠিক যেতে পারব।

আচ্ছা, তা হলে কাল দেখা হবে।

মহীতোষবাবু হেসে নিজের জায়গায় সরে গেল।

বাসবী কাজে মন দিল।

একটানা কতক্ষণ কাজ করেছে খেয়াল নেই, মাথাটা তুলে দেখল দেড়টা বেজে গেছে। এদিকে-ওদিকে সবাই টিফিনে বেরিয়ে গেছে।

রুটির প্যাকেটটা নিয়ে ওঠার মুখেই বাসবী বাধা পেল।

ম্যানেজারের বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থ, অনিমেষ তলব করেছে।

প্যাকেটটা ড্রয়ারে রেখে বাসবী অনিমেষের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

স্তূপাকার কাগজের পিছনে অনিমেষ। কাজ করছে না। পাথার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে।

বাসবী ঢুকতে, কথা নয়, হাত দিয়ে সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। বাসবী বসল।

কাল ত আপনি গিয়েছিলেন দীপক গুপ্তর বাসায়?

বাসবী ঘাড় নাড়ল।

দীপকবাবু এসেছিলেন। দুটো সার্টিফিকেটও এনেছিলেন। অবশ্য এ দেশে সার্টিফিকেটটা সবাই দরাজ হাতেই বিতরণ করেন। ওগুলো দেখে কিছু বোঝা যায় না। বাড়ীর অবস্থা কেমন দেখলেন?

খুব খারাপ।

খুব খারাপ?

বাসবী একটু সামলে নিল, মানে যে রকম দেখব ভেবে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই রকম।

কি ব্যাপার, আপনি আজকাল কবিতা-টবিতা লেখা আরম্ভ করেছেন নাকি? সব কেমন ধোঁয়াটে লাগছে।

অনিমেষ হাসবার চেষ্টা করল।

আমাদের জীবনে কবিতা আসে না স্যর।

'স্যর' কথাটার ওপর ইচ্ছা করেই বাসবী জোর দিল, তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, বাপ কর্পোরেশন স্কুলের মাষ্টার, ঘাড়ে একটি বিধবা বোন, রুগ্না মা। সেদিক দিয়ে সংসারে কোন খুঁত নেই। এতদিন দীপকবাবু টিউশনি করেই চালাচ্ছিলেন, এ অফিসের চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেছেন। তবে দীপকবাবুর বাবা আগে পাকিস্তানের কোন এক স্কুলে বুঝি হেডমাষ্টার ছিলেন।

হুঁ, অনিমেষ হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো চেপে ধরল, তারপর বলল, মাষ্টাররা সাধারণত আদর্শবাদী হয়। প্রায় দধীচির জাত। লোভ এদের বিশেষ কাবু করতে পারে না। কি আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশের সবচেয়ে খাঁটি মানুষরা সবচেয়ে কম উপার্জন করেন। শুধু এ দেশের নয়, এটা বোধ হয় সব দেশেরই ট্র্যাজেডি।

বাসবী কোন উত্তর দিল না। শিক্ষকদের নিয়ে দার্শনিকতা করার মতন মেজাজ তার নেই। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। ক্ষুধায় পেটের মধ্যে তীব্র মোচড় দিচ্ছে। টিফিন না খাওয়া পর্যন্ত শরীর ঠিক হবে না।

আপনি একটা কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

অনিমেষ সামনের দিকে একটু ঝুঁকল।

টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে বাসবী চুপচাপ বসে রইল। মুখে কৌতূহলের কোন ছাপ নেই। যা বলার অনিমেষই বলুক।

ন্যাশনাল এম্পোরিয়মের নাম শুনেছেন? বৈগুবাটিতে বিরাট কারখানা। লোহার ছোট ছোট যন্ত্রপাতি তৈরী করে?

নামটা বাসবীর পরিচিত ঠেকল। অফিসের কাগজে-পত্রেই দেখেছে। সেই কথাই সে বলল।

অফিসের চিঠিপত্রে নামটা দেখেছি।

হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে তাদের কাজ আছে। এ অফিসে অনেক যন্ত্রপাতি তারা সাপ্লাই করেছে। সে কোম্পানীর পার্টনারদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত। সেই বিজয়বাবু দীপক গুপ্তর আপন কাকা।

কথাটা সত্যিই বাসবীর কাছে আশ্চর্য ঠেকল। যার কাকা এত বড় একটা কারবারের অন্যতম কর্ণধার, তাকে দিনের পর দিন দরখাস্ত হাতে এক মুঠো নিশ্চিত অন্নের জন্য অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়? কই, দীপক ত এমন কথা বাসবীকে কোনদিন বলে নি। যতদূর মনে পড়ছে, তার চাকরির দরখাস্তেও এমন লোভনীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় নি। দীপকের বাবাও ত ঘুণাক্ষরে জানায় নি কিছু।

আপনি ঠিক জানেন? বাসবী সন্দেহ প্রকাশ করল।

আমি কিছুই জানি না, অনিমেষ হাসল, বিজয় গুপ্ত ফোন করেছিলেন একটু আগে, যাতে দীপক গুপ্তকে আমরা চাকরিতে না নিই, সেই কথা বললেন।

সে কি? প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীৎকার করে বাসবী লজ্জিত হয়ে পড়ল।

সে কথাটা ত আমিও ভাবছি।

দীপকবাবু এখনও ত চাকরিতে জয়েনই করেন নি, এরই মধ্যে বিজয় গুপ্তর কাছে খবর চলে গেল ?

সংসার বড় বিচিত্র জায়গা মিস সেন। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা খুবই মুস্কিল। খবরটা যদি আমার অফিস থেকেই কেউ সরবরাহ করে থাকে, তা হলেও আশ্চর্য হব না।

আমাদের অফিস থেকে ? বিজয় গুপ্তর সঙ্গে দীপক-বাবুর সম্পর্কের কথাটাই বা কেউ জানল কি করে ?

উদ্যোগী পুরুষের কিছুই অসাধ্য নয়। অনিমেষ হাসল।

যাক, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। অনিমেষ রায়ের কণ্ঠে দৃঢ়তার রেশ।

.বাসবী মুখ তুলে দেখল।

দীপকবাবুকে আমি নেব। নিয়োগপত্র যখন দিয়েছি, তখন অফিসের মর্যাদার দিকে চেয়ে নিতে আমাকে হ'তই। তাছাড়া, ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছে। এটা জ্ঞাতি-বিরোধের ব্যাপার। এর ওপর আমি কোন জোর দিচ্ছি না।

অনিমেষ 'থামল। বাসবী ভাবল, এবার সে উঠতে পারে। টিফিন শেষ হ'তে এখনও মিনিট দশেক দেরি। কৃষ্ণা নিশ্চয় তার জন্য অপেক্ষা করে করে নিজের টিফিন খেতে সুরু করেছে।

অনিমেষ উঠতে না বললে, বাসবী উঠতেও পারছে না।

. বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে পিয়ন। একটা রেজিষ্টার্ড চিঠি রাখল অনিমেষের টেবিলে।

অনিমেষ চিঠিটা সই করে নিল। পিয়ন আর বেয়ারা দুজনেই বাইরে চলে গেল।

আর একবার বাসবী ভাবল, উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু অনিমেষের চোখ মুখের দিকে চেয়ে পারল না।

চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে অনিমেষের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল। .কপালে, গালে গভীর খাঁজ। দুটো ভ্রূ কুঞ্চিত।

একটা হাত দিয়ে টেলিফোন তুলে ধরল।

মিস পালিত, আমাদের সলিসিটর মিষ্টার বাসুকে একবার দিন।

ফোন নামিয়ে রাখার মিনিট কয়েকের মধ্যে ক্রিং ক্রিং শব্দ। অনিমেষ আবার হাতলটা তুলে ধরল, মিষ্টার বাসু, নমস্কার, আমি অনিমেষ রায়। সেই চিঠিটা এসে গেছে। হ্যাঁ, বেলার কাছ থেকে। আমি বিকালে যাব আপনার কাছে। কি বললেন ? চিঠিটা লিখেছেন সলিসিটর [illegible] সোম। ঠিকানা দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের বিল্ডিংয়েই বসেন। ৬ নম্বর, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট। বেশ, আপনি যদি ভাল বোঝেন, আলাপ করবেন। আচ্ছা, দেখা হবে বিকালে।

টেলিফোনটা রেখেই অনিমেষের চোখ পড়ল বাসবীর ওপর। বিব্রত কণ্ঠে বলল, ও, সরি, আপনাকে মিছামিছি এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আমার খেয়ালই ছিল না।

বাসবী উঠে দাঁড়াল। টিফিন শেষ। এখনই গিয়ে নিজের টেবিলে বসতে হবে। হাতে অনেক কাজ রয়েছে। কাজ শেষ করে নিশিবাবুর অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণার কাছে গিয়ে টিফিনটা সেরে নেবে। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এভাবে অভুক্ত অবস্থায় কাজ করতে তার খুবই কষ্ট হবে।'

ছুটির পরে রাস্তায় বেরিয়েই বাসবীর মনে পড়ল। মহীতোষবাবুর বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে কিছু কেনা দরকার। কাল রবিবার, কিন্তু রবিবার সকালে বাসবী সময় পায় না ! এক গাদা কাপড়চোপড় কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া এই একটি দিন ঘরদোরও পরিষ্কার করতে হয়। সারাটা সপ্তাহ একতিল অবসর নেই। কাজে ঠাসবোঝাই। চাকরি, টিউশনি, অবকাশের সামান্য ছিদ্রও থাকে না।

বাসবী ভেবেছিল কৃষ্ণার মতন এক গোছা রজনীগন্ধা কিনে নিয়ে যাবে মহীতোষবাবুর বাড়ী যাবার সময়। কিন্তু পরে আবার সে চিন্তা করেছে, এই প্রথম সে যাচ্ছে, শুধু কতকগুলো ফুল হাতে করে যাওয়াটা বোধ হয় শোভন হবে না। কৃষ্ণা অনেক বছর ধরে যাচ্ছে, কাজেই সে যা-হোক একটা কিছু নিয়ে যেতে পারে। বাসবীর এই প্রথম যাওয়া।

আগেই বাসবী মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। দোকানে ঢুকে একটা সিঁদুর কৌটা কিনল। প্রায় শেষ সম্বলের পরিবর্তে। দু-একবার আক্ষেপও করল। অফিস

থেকে ট্যাক্সিবাবদ পাওয়া বাড়তি টাকা দিয়ে রাবড়ি না কিনে, সিঁদুর কৌটার জন্য রাখলেই হ'ত।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রুবির মুখে হাসি ফোটাতে এ বেহিসেবী কাজের কোন মানে হয় না। কয়েক ছিটে রাবড়ি মধ্যবিত্তের অনন্তকালের দুঃখ ঘোচাতে পারে না।

এখনও মাইনে পেতে দিন দুয়েক বাকি।

বাড়ী যেতে যেতে বাসবীর বিজয় গুপ্তর কথা মনে পড়ল। কলেজে কোথায় পড়েছিল, যে দেহকে মানুষ এত ভালবাসে, ব্যাধি দেখা দেয় সেই দেহকে আশ্রয় করে। কিন্তু ওষধি আসে দূরের অরণ্য থেকে। অবিচার, অত্যাচার, অপ্রিয় ব্যবহার সব কিছুর উৎস আত্মীয়-স্বজন। মানুষ সবচেয়ে আঘাত পায় তার প্রিয়জনের কাছ থেকে। অথচ ব্যথার প্রলেপ দেয় অনাত্মীয় বন্ধুবান্ধব। বিপদে রক্ষার হাত বাড়ায় তারাই।

প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত পাবার কথায় বাসবীর আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বেলাদেবী উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে অনিমেষের কাছে। তার পাওনা টাকার দাবি জানিয়ে। কিসের পাওনা বাসবীর জানা নেই। তার জানার কথাও নয়। শুধু এই ভেবে তার আশ্চর্য লেগেছে, এক সময়ে বেলাদেবী অনিমেষ রায়ের সবচেয়ে কাছের লোক ছিল। হয়ত নারায়ণ সাক্ষী করে, অগ্নি সাক্ষী করে দু'জনে দু'জনকে গ্রহণ করেছিল। সুখে, দুঃখে, আপদে বিপদে, পাশাপাশি থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

তারপর ঈশান কোণে ছোট্ট মেঘের টুকরো। ক্রমে ক্রমে সেই কালো মেঘ সমস্ত দাম্পত্য আকাশ ছেয়ে ফেলল। বিশ্রী ঝড় উঠল। একটা সাজানো-গোছানো সংসার ছত্রখান করে দিল। তার চেয়েও বড় কথা, দুটো মন, মনের বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। চুলচেরা বিচার সুরু হল দেনাপাওনা নিয়ে। পবিত্র, মধুর একটা সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল।

এই একদিক। দাম্পত্য জীবনের করুণ, বিবর্ণ ছবি।

আবার আর একদিকে মহীতোষবাবুর মতন মানুষেরা রয়েছে। বিবাহিত জীবনের রজতজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। যে জীবনে যত জটিলতা, সে জীবনে মাধুর্য তত কম। খুব সহজেই দুটি মন ভিন্নমুখী হয়ে ওঠে। মহীতোষবাবুর প্রত্যাশা কম করে বলেই বোধ হয় যেটুকু পায়, সেটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়।

কোন্ জীবন ভাল!

কথাটা মনে হতেই বাসবীর হাসি পেল। তুলনামূলক এ চিন্তা অর্থহীন। কোন জীবনের সম্মুখীনই বাসবীকে হতে হবে না। সংসারের বিরাট জোয়াল তার কাঁধে। নিজের কথা ভাববার অবকাশ অল্প। খোকনকে মানুষ করে তুলতে হবে। রুবির বিয়ে দিতে হবে। টলমলে সংসারকে দৃঢ়ভিত্তিক করতে হবে। বাসবীর অনেক কাজ বাকি।

মহীতোষবাবুর ঠিকানা লেখাই ছিল। বাসবী তবু একটু সকাল সকাল রওনা হল। কি জানি নম্বরটা খুঁজতে যদি সময় লাগে।

ট্রাম থেকে নেমেই বাসবী অবাক।

রাস্তার মোড়ে মহীতোষবাবু দাঁড়িয়ে। হাতে কাগজের পুঁটলি।

একি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?

মহীতোষবাবু হাসল, দোকানে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হল তোমাদের আসার সময় হয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ করে তোমার জন্য। একমাত্র তুমিই ত কোনদিন বাড়ীতে আস নি। খুঁজে বের করতে হয়ত কষ্ট হবে।

আপনাকে বললাম যে কৃষ্ণা আর আমি একসঙ্গে যাব। সে আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে। আপনি যান। বাড়ীতে কাজ রয়েছে।

কি আর কাজ মা। তোমাদের নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা। আমিও না হয় একটু দাঁড়াই, এক সঙ্গেই যাব।

মহীতোষবাবু আপত্তি শুনল না। দাঁড়িয়ে রইল।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না। মিনিট পনেরর মধ্যে বাস থেকে কৃষ্ণা নামল, হাতে ফুলের গোছা। সঙ্গে অফিসের আরো কয়েকজন।

কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে? অফিসের নীরদবাবু বলল।

আপনাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। কৃষ্ণা হাসল।

সবাই মিলে চলতে সুরু করল।

যেতে যেতে কৃষ্ণা বলল, মহীতোষবাবু আজ ত আপনার এ বেশে থাকবার কথা নয়। পরণে গরদ, কপালে চন্দন, মাথায় টোপর এসব কই?

অফিসের কান্তিবাবু পাশেই ছিল। বলল, মহীতোষদা নিজে আর সাজবেন কি করে? আমরাই তো৹ নটবর বেশে সাজিয়ে দেব।

ঠিক আছে, বর-কনেকে সাজাবার ভার আমরা নিচ্ছি।

বাসবী হাসতে হাসতে বলল।

ফ্লাট বাড়ী। হাল ফ্যাসানের না হ'লেও একেবারে পুরোনো ধরনেরও নয়। দরজা ভেজানো ছিল, মহীতোষবাবু হাত দিতেই খুলে গেল।

জানলার ধারে মহীতোষবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের চেষ্টা করছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক ঘরে ঢুকতে তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা মাথায় তুলে নিল।

রাধা, এই আমাদের বাসবী। বাকি সকলের সঙ্গে ত তোমার আলাপই আছে।

বাসবী চোখ তুলে দেখল। শ্যামাঙ্গী কিন্তু নিখুঁত গড়ন। আয়ত লোচনে, টিকোলো নাকে, চাপা অধরোষ্ঠের গড়নে দেবী মূর্তির আভাস। চোখে, মুখে উচ্ছলিত মমতা।

বাসবী এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে একেবারে পায়ের ধূলো নিল।

রাধা ব্যস্ত হয়ে উঠল, এই, পায়ে হাত দিতে হবে না। প্রণাম করা আজকালকার রেওয়াজ নয়, শুধু হাত তুলে নমস্কার কর।

বাসবী হাসল, আমি ভীষণ সেকেলে মেয়ে।

রাধা একটু এগিয়ে বাসবীর চিবুক স্পর্শ করে নিজের ঠোঁটে ঠেকাল তারপর বলল, বস মা, বস। তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল।

কেন বলুন ত?

কর্তা রোজ তোমার প্রশংসায় ফেটে পড়তেন, তাই অবাক লাগত। উনি আবার আজকালকার মেয়েদের গালাগাল না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না কি না।

নীরদবাবু বাধা দিল, অভ্যর্থনার ধারাটা একমুখী হচ্ছে যে বৌদি। আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি।

রাধা সহাস্যে ঘাড় নাড়ল, না ঠাকুরপো, কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আপনাদের দেখাশোনার ভার কর্তার ওপর। বাসবী আর কৃষ্ণাকে আমি দেখব।

কান্তবাবু মহীতোষবাবুর দিকে ফিরে বলল, দাদা, আমাদের দিকে একটু দেখুন।

কাউকে দেখতে হবে না, আমিই সকলের দিকে দেখব। আমি সহস্রলোচন বাসব।

সিঁড়ি থেকে বাসববাবুর উদাত্ত কণ্ঠ ভেসে এল তারপরই তাকে দেখা গেল দরজার মুখে।

আরে, এস ভাই এস, তুমি ছাড়া আসর জমছে না।

জুতো খুলে বাসব ঘরে ঢুকল। কার্পেটের ওপর বসতে বসতে বলল, আজ ত আসর জমাবার পালা আপনার। আমরা সব ইতরজন। মিষ্টান্নের অভিলাষী।

সবাই হাসল। বাসবীর খুব ভাল লাগছে। অফিসে এই লোকগুলোকেই অন্যরকম মনে হয়। ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, এফিসিয়েন্সি বারের অলাতচক্রে বাঁধা জীব। ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহের বশীভূত। কে কাকে অতিক্রম করবে তারই প্রতিযোগিতা যেন।

কিন্তু নতুন পটভূমিতে সবাইকেই স্বচ্ছন্দ মনে হ'ল। এমন কি বাসববাবুকেও।

নিন, দেরি করে লাভ কি। মিস সেন আর মিস পালিত আপনারা কনে সাজাতে আরম্ভ করুন, আমরা বরকে দেখছি।

বাসবী আর কৃষ্ণা রাধার হাত ধরে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। মাঝখানের দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল।

এটা শোবার ঘর। খাটের ওপর পরিচ্ছন্ন বিছানা। আলনায় পরিপাটি করে কাপড় সাজানো। কোনে একটা আলমারিতে বই আর নীচের থাকে কাপড়। খাটের শিয়রে গোল একটা টেবিলে রঙীন ফুলদানি, তাতে প্লাস্টিকের ফুল।

চেয়ে চেয়ে বাসবী দেখল তারপর তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, বাঃ, ভারি চমৎকার সাজানো ত ঘরটি। ঠিক যেখানে যে জিনিষটি মানায়।

রাধার দুটো চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এল।

তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, অগোছাল করবে এমন কেউ ত আর এল না।

ঠোঁট চেপে রাধা একটা উদ্গত নিঃশ্বাস রোধ করল।

একটু লজ্জিত হল বাসবী। এমন দিনে মনে আঘাত পায় রাধা, এমন কোন কথা সে বলতে চায় নি। রাধা যে গোপন একটা ক্ষত নীরবে লালন করছে বুকের মধ্যে, এটা বাসবীর খেয়ালই ছিল না।

বসুন আপনাকে সাজিয়ে দিই।

কৃষ্ণা রাধার হাত ধরে খাটের ওপর বসিয়ে দিল।

একটা কাঁটা কিন্তু বাসবীর বুকে বিঁধে রইল। অস্বস্তির কাঁটা। এ ঈশ্বরের কি অবিচার। যাদের প্রতিপালন করার ক্ষমতা নেই, নিত্য অভিশাপ দেয়, তাদের ঘরে সন্তান উপচে পড়ে। অর্ধাশনে, অবহেলায় পশুর মত মানুষ হয়। আবার যারা একটি সন্তানের জন্য ব্যাকুল বাহু মেলে অপেক্ষা করে থাকে দিনের পর দিন, তাদের ভগবান ঊষর করে রাখেন।

শুধু কি সন্তানদের বেলাতেই বিধাতার এই অবিচার! অর্থও ত তিনি সমানভাবে মানুষের মধ্যে বন্টন করেন নি। এক কপর্দকের জন্য কত প্রাণ বিনষ্ট হয়, সংসার মরুভূমি, আবার কোথাও অর্থের অযথা প্রাচুর্য। প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। নষ্ট করেও সে সম্পদ শেষ হয় না।

মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে বাসবী এই সর্বনাশা চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করল। একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে, এখন এ সব কথা নিয়ে চিন্তা করা অনুচিত।

বাসবী চিরুণীটা নিয়ে বলল, আপনার একটা বিরাট খোঁপা করে দেব আজ, পঁচিশটা কাঁটা দিয়ে।

রাধা হাসল, কেন, পঁচিশটা কাঁটা কেন মা?

বাসবী বলল, বা রে, আজ আপনাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল না?

তিন জনে হেসে উঠল।

রাধা আলমারি খুলে একটা বেনারসী বের করল। সবুজ জর্জেট ব্লাউজ।

সাজ-পোশাক শেষ হতে একটা চেয়ারের ওপর রঙীন শাড়ী বিছিয়ে তার ওপর রাধাকে বসাল।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই দরজায় শব্দ হচ্ছিল। পুরুষের দল বাইরে থেকে টোকা দিচ্ছিল। বাসবী আর কৃষ্ণা দু-একবার সাড়া দেয় নি, তারপর বলেছে, এখন খোলা হবে না, কনের সাজ শেষ হয় নি।

এবার কৃষ্ণাই দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল।

দরজা খোলা হতেই সবাই হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বরবেশে মহীতোষবাবু তৈরী। কপালের চন্দনের ফোঁটা। পরণে গরদের জোড়। কে একজন একটা টোপর কিনে এনেছিল। মহীতোষবাবুর মাথায় বসিয়ে দিয়েছে।

সমবেত উলুধ্বনিতে ঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

বাসববাবু বলল, বরকে যথাস্থানে বসিয়ে দাও। কনের পাশে।

বরকে বসাতে হ'ল না। গুট গুট করে মহীতোষবাবু আর একটা চেয়ার টেনে রাধার পাশে বসে পড়ল।

নীরদ বলল, এবার যদি বলেন, কনেকে বরের চারপাশে ঘোরাতে হবে, তা হলেই আমরা গেছি। এমন দিনে বৌদির দেহভারের প্রতি কটাক্ষ করব না, কিন্তু আমি অন্তত অক্ষম সে নোটিশ দিয়ে রাখলাম।

আবার একদফা হাসির রোল উঠল।

হাসি থামতে বাসবী বলল, ঈস, আপনারা কেউ ক্যামেরা আনেন নি। এমন একটা দৃশ্য অমর করে রাখা উচিত ছিল।

বাসবীর নিজেকে খুব লঘুপক্ষ বলে মনে হল। এই মুহূর্তে ওর দিগন্তে দারিদ্র্যের মেঘের ভার যেন কোথাও নেই। চারিদিক ঘিরে শুধু খুশীর ফুলঝুরি। শুধু আনন্দ।

বাসবী এগিয়ে গিয়ে সিঁদুর কৌটাটা রাধার হাতে দিল।

আর সকলের উপহার আগেই দেওয়া হয়েছিল। কেউ ফুল এনেছিল, কেউ গরদের জোড়, কেউ সাদা নাগরা, আবার কেউ বই।

বাসববাবু বলল, উঁহু, সিঁদুর কৌটা ওভাবে দিলে হবে না, মিস সেন।

বাসবী বাসববাবুর দিকে ফিরে দেখল, তবে?

বৌদিকে সিঁদুর পরিয়ে দিন।

বাসবী কৌটাতে সিঁদুর ভরেই এনেছিল। একটু তুলে নিয়ে রাধার সীমন্তে দিতে গিয়েই থেমে গেল।

বাবু।

গলার আওয়াজে সবাই ফিরে দেখল।

দরজার গোড়ায় চাকর এসে দাঁড়িয়েছে।

মহীতোষবাবু বুঝতে পারল খাবার দিতে হবে কি না সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। পুরোনো চাকর। ঠিক জানে, এই সময় আসন পেতে খেতে দেওয়া হয়।

কিরে চৈতন, পাতা করবি কি না জিজ্ঞাসা করছিস?

না বাবু। চাকর ঘাড় নাড়ল।

তবে?

একজন আপনাকে ডাকছেন?

ডাকছেন? অফিসের কেউ হবে। নিয়ে আয় এ ঘরে। খুব সম্ভব শ্রীপতিবাবু। শরীর খারাপ বলে আসতে পারবে না বলেছিল। বোধ হয় এসেছে।

আজ্ঞে না, অফিসের বোধ হয় কেউ নয়, একজন মেয়েছেলে।

মেয়েছেলে? আমায় ডাকছে?

মহীতোষবাবু বিস্মিত হল, তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, দেখে এস ত রাধা, পাড়ার কেউ হবে বোধ হয়।

বেনারসী সামলে রাধা উঠে পড়ল, তার পর সবধানে পা ফেলে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

মিনিট কয়েক, তার পরই আবার মহীতোষবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কে গো? মহীতোষবাবু প্রশ্ন করল।

বিভাসবাবুর পরিবার।

গম্ভীর থমথমে গলায় রাধা উচ্চারণ করল।

আনন্দ হিল্লোল যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। রাধার কথায় থমথমে শোকের ছায়া নেমে এল ঘরের মধ্যে।

বিভাসবাবুর স্ত্রী দরজার কাছ থেকে সরে একেবারে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ চুল ঘোমটার দুপাশ দিয়ে কাঁধে বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। আয়ত দু'টি চোখ টলটলে। বিষাদক্লিষ্ট মুখ।

মাপ করবেন, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। বিশ্বাস করুন, এখানে কোন উৎসব আছে আমার জানা ছিল না। তা হলে আমি অন্য দিন আসতাম। আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

মহীতোষবাবু চেয়ার থেকে উঠে চেয়ারটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, আপনি বসুন। ন্যায়-অন্যায়ের কোন কথা নয়। তাছাড়া, বিশেষ কোন উৎসবও নয়। অফিসের ক'জন এক হয়ে একটু হৈ হৈ করছি। কেরাণীর জীবনে আনন্দ করার অবকাশ ত বিশেষ পাওয়া যায় না।

সকলেই বুঝল এতগুলো কথা বলার মহীতোষবাবুর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিছু একটা বলা দরকার, বিষাদের আসন্ন ছায়াটা অপসারিত করার জন্য, নিজেদের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য, তাই মহীতোষবাবু অনর্গল কথা বলে গেল।

প্রীতি চেয়ারে বসল না। মেঝেয় পাতা কার্পেটের ওপর বসল।

আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন যে তাঁর কিছু করবার নেই। পুলিশে যখন খবর দেওয়া হয়েছে, তখন যা করবার পুলিশই করবে। আমি কি করব তাই বলে দিন মহীতোষবাবু? একবার ওঁর অসুখের সময় আপনি গিয়ে না পড়লে ওঁকে বাঁচাতেই পারতাম না।

বিব্রত কণ্ঠে মহীতোষবাবু বলল, থাক সে কথা। বিভাস আমাদের বন্ধুলোক। তার অসুখ-বিসুখে দেখতে যাওয়া খুব বড় কথা নয়।

শুধু দেখতে যাওয়া নয় মহীতোষবাবু, আপনি যেভাবে সাহায্য করেছেন, আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।

এবার মহীতোষবাবু নয়, কথা বলল বাসববাবু।

প্রীতিদেবী আমার হয়ত এভাবে কথা বলা অনুচিত, কিন্তু কথাটা আমি না বলেও পারছি না। বিভাসকে আমি যতটা চিনি, অফিসে এমন বোধ হয় কেউ চেনে না। যতদূর মনে হয় আমি আপনাকে সাবধানও করে দিয়েছিলাম।

প্রীতি কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে বাসববাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে আপনার কাছে কোন নালিশ জানাতে আমি আসি নি। বাড়ীতে আমার একটি কপর্দকও নেই, অথচ খাবার মুখ তিনটি। আমার শাশুড়ী আছেন, আমার কোলের বাচ্চাটা আছে। আমার নিজের জন্য আমি তেমন চিন্তা করি না। অন্তত করার কোন কারণ নেই। আপনি নিশ্চয় এটুকু জানেন প্রীতিকে ফিরে পাবার জন্য অনেক অপেশাদারী দলই উৎসুক। কিন্তু হাতে-পায়ে আমার শক্ত বাঁধন। পুরণো

জীবনে ফিরে যাবার আমার কোন উপায় নেই। হাত পেতে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু এ ছাড়া আমার কি পথ আছে বলে দিন।

সকলে চুপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। দেবার মত কোন উত্তরও কারও মুখে যোগাল না।

সাহায্য চাইতে এসেছে বিভাসবাবুর স্ত্রী। বিভাসবাবু যে অপরাধই করে থাকুক, তার জন্য তার স্ত্রীকে দায়ী করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু এর মধ্যেও অসুবিধার কাঁটাতার জড়ানো রয়েছে।

বিভাস অফিসের টাকা তছরুপ করেছে আপাতদৃষ্টিতে তার বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ রয়েছে। আবার সেই অফিসের লোকেরাই অর্থ দিয়ে তার স্ত্রীকে সাহায্য করবে। সমস্ত ব্যাপারটাই রীতিমত বিসদৃশ।

কর্তৃপক্ষরা এ ঘটনাটা জানতে পারলেই বা কি ভাববে ?

মহীতোষবাবু বোধ হয় এত কিছু ভাবল না। আলনায় টাঙান সার্টের পকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে প্রীতির দিকে এগিয়ে দিল।

এইটা রাখুন আপনার কাছে। বিভাসের যে সাজা হবেই, এমন কোন কথা নেই। অভিযোগ কোর্টে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যায় না।

চমৎকার একটা আবহাওয়া মুহূর্তে যেন আবিল হয়ে উঠল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রীতিদেবী। বাসববাবুর গলা।

নোট দুটো প্রীতি আঁচলে বাঁধছিল, বাসববাবুর কথায় মুখ তুলে দেখল।

আমি যতদূর শুনেছি, বিভাস অনেক দিন ধরেই ত টাকা-পয়সা নিয়মিত পাঠাচ্ছিল না, কিভাবে চলছিল আপনার ?

প্রীতির সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মনে হ'ল দু-চোখের কোণে যেন একটু অশ্রুর ঝিলিকও দেখা দিল।

আবেগ সামলে নিয়ে শাড়ীটা একটু সরিয়ে নিজের নিরাভরণ দু'টি হাত সামনে প্রসারিত করে দিল।

আমার কিছু সোনার অলঙ্কার ছিল লক্ষ্য করেছেন বোধ

প্রীতি উঠে দাঁড়াল। সকলের দিকে চেয়ে দুটো হাত যোড় করে নমস্কার করে বলল, আবার মাপ চাইছি। আপনাদের উৎসবের আমেজ নষ্ট করে দিলাম।

খুব ধীরে, প্রায় মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে প্রীতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই মনে হ'ল, অনুষ্ঠানের সব আনন্দ, সব আলো যেন সে মুছে দিয়ে গেল। কিংবা বীণার সব কটা তার যেন সে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। আবার এ বীণায় নতুন করে সুর তোলা প্রায় অসম্ভব।

পরিপাটি আহারের প্রয়োজন। মহীতোষবাবু কোন ক্রটি রাখে নি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু তদারক করল। রাধাও আদর-যত্নের কোন কার্পণ্য করল না।

মাঝে মাঝে বাসববাবু পরিহাসেরও চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেল।

বাসবী আর কৃষ্ণা একসঙ্গে বাড়ী ফিরল। দু'জনে দু'দিকে থাকে। শুধু রাস্তার মোড় পর্যন্ত একসঙ্গে এল।

কৃষ্ণাই বলল, এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক জ্বালা বাসবী, তাই না ?

বাসবী কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে কৃষ্ণার পাশে পাশে চলতে লাগল।

যত কিছু দায়-বিপদ সব মেয়েদের ঘাড়ে। কোথায় কোন সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিলাম, নারী চিরদিনই পরাধীন। শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর, আর বার্ধক্যে পুত্রের। এ পরাধীনতা শুধু আর্থিক নয়, পিতার, স্বামীর, পুত্রের সব ঝামেলাও তাকে বহন করতে হয়।

এতক্ষণে বাসবী কথা বলল।

প্রীতিদেবী ত অনায়াসে তাঁর আগের জীবিকায় ফিরে যেতে পারেন। সৌখীন রঙ্গমঞ্চে।

কৃষ্ণা হাসল, এখন প্রীতিদেবী মা, একটা সংসারের কর্ত্রী। এখন আর তাঁর পক্ষে হয়ত ছেলেকে ফেলে রেখে, শাশুড়ীকে উপেক্ষা করে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। মনের দিক থেকেও তিনি সংসারকেই সম্ভবত ভালবেসেছিলেন। কারণ, আমি শুনেছি, বিয়ের পরে, আমাদের অফিসের অভিনয়ে বাসববাবুরা

বিড় বিড় করে বাসবী বলল, সংসারকে ভাল-বেসেছেন ?

কৃষ্ণা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সত্যি করে বল বাসবী, সংসারকে কোন্ মেয়ে ভাল না বাসে। তুমি বাস না ? আমি বাসি না ? আমরা কি মনে-প্রাণে চাই, এভাবে পুরুষের ভীড় ঠেলে, দিনের পর দিন উদভ্রান্ত নিজেদের নারীত্বকে নষ্ট করি। তিল তিল করে নারীত্ব নষ্ট করা ছাড়া আর কি ! বছর পাঁচেক কাজ করার পর আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে দেখ, তা হলেই আমার কথাটা বুঝতে পারবে। আমরা চাকরি করার জন্য জন্মাই নি বাসবী, তা হলে ঈশ্বর আমাদের দেহ অন্যভাবে গড়তেন।

বাসবী অবাক চোখে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে দেখল। এ মেয়েকে যেন সে কোনদিন দেখে নি, চেনে না। এতদিন অফিসে টেলিফোনের তার আঁকড়ে থাকা মেয়েটার মধ্যে এমন একটা তীব্র তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল, বুঝতে পারে নি।

ঘর বাঁধবার তৃষ্ণা। ঘরণী হবার।

চলন্ত একটা বাস থামিয়ে কৃষ্ণা উঠে পড়ল। পাদানিতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, চলি বাসবী, কাল দেখা হবে।

বাসবীকে একেবারে উল্টো পথে যেতে হবে। রাস্তা পার হয়ে সে এদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

পুরুষদের দল তাস খেলায় মেতেছে। তাদের ফিরতে অনেক রাত হবে। কৃষ্ণা আর বাসবী রাধার সঙ্গে বসে এ গল্প করছিল, সন্ধ্যা হতে উঠে এসেছে।

কৃষ্ণার মা'র শরীর খারাপ। বাসবী বাড়ীতে বলে এসেছে তাড়াতাড়ি ফিরবে। রাধা চৌকাঠ-বরাবর এসে বলছিল, এই মেয়েরা, আবার আসবে কিন্তু।

বাসবী হেসে উত্তর দিয়েছে, আবার আপনাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে আসব।

তখন এলে আমার স্মৃতিমন্দিরে আসতে হবে। তার আগেই এস বাপু। রবিবার দিনটা ত ছুটি, চলে এস না সকালবেলা সারাটা দিন বসে গল্প করব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসবী ভাবতে লাগল। আজকের দিনটা ভালই কাটল। শুধু একটু বেসুরো লাগল বিভাস-বাবুর স্ত্রীর কথাগুলো। বিষণ্ণ রাগিণী। তা হোক, অবিমিশ্র সুখ পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে বাসবীদের মতন মধ্যবিত্তদের জীবনে। সুখ আসে দুঃখের অনুগামী হয়ে, আনন্দ আসে ব্যথার ছলনা নিয়ে।

একটা ট্রাম আসতে বাসবী উঠে পড়ল। লেডিজ সীটে দু'জন পুরুষ বসেছিল, বাসবীকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

সীটে বসে বাসবী একবার মনে করল একজনকে তার পাশে বসতে বলবে কিন্তু কি ভেবে আর বলল না। ট্রাম একটু চলতেই বাসবী নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

কৃষ্ণা যে কথাগুলো বলে গেল সেগুলো কি বাসবীরও মনের কথা নয় ! আধতন্দ্রার ঘোরে কতবার স্বপ্ন দেখেছে বাসবী, নির্জন নিজস্ব একটি ঘর। সীমন্তে সিঁদুর, কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সলজ্জ মুখে যে বধূ ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বাসবী। যার কল্যাণে সিঁদুরের রেখা, স্পষ্ট তাকে দেখে নি। অস্পষ্ট একটা অবয়ব। তবু তার সান্নিধ্য প্রীতিপ্রদ, একথা বাসবী অস্বীকার করতে পারে না।

অনেকদিন আগে, কোন এক বাড়ীতে গ্রামোফোনের গান শুনেছিল। লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

বাসবীরও সেই অবস্থা। সংসার তার কঠিন নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধেছে। মুক্তি নেই। কোনদিন যে পরিত্রাণ পাবে এমন সম্ভাবনাও নয়।

এসপ্লানেডে ট্রাম এসে পৌঁছতে বাসবী নেমে পড়ল। এবার তাকে দক্ষিণগামী ট্রাম কিংবা বাস ধরতে হবে। বাস ধরতে পারলে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছতে পারবে, এই আশায় বাসবী মেট্রো সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার কলকাতা। পসারিণী বেশ। যুগলে যুগলে মানুষ চলেছে। তাদের মুখ দেখলে মনে হয় না পৃথিবীতে দুঃখ আছে, ব্যাধি আছে, জরা, মৃত্যু আছে। যা আছে তা যেন শুধু উচ্ছল যৌবন। যৌবনের পানপাত্রে শুধু চুমুক দেওয়া, তা হলেই এই জরতী পৃথিবীর জীর্ণ বেশ অন্তর্হিত হয়ে তার লাস্যময়ী রূপ ফুটে উঠবে।

একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে বাসবী দেখছিল, হঠাৎ মোটরের হর্ণের শব্দে চমকে উঠল।

বাসবী ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, একেবারে গায়ের কাছে একটা মোটর এসে দাঁড়াল।

বাসবী কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

মোটরের দরজা খুলে একটি সুবেশ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক নামল। চেহারা দেখে বাঙ্গালী বলে মনে হল না। তবে এটুকু বোঝা গেল এককালে ভদ্রলোক অমিত সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। ভদ্রলোক নেমেই হাতটা বাড়িয়ে দিল, সেই প্রসারিত হাতে ভর দিয়ে একটি তরুণী নামল।

তরুণীকে দেখে বাসবী তাড়াতাড়ি একটা ফেরিওয়ালার পিছনে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তরুণী তার আগেই তাকে দেখে ফেলল।

কোন কথা নয়, কুঞ্চিত অধরে একটু হাসির আভাস। সে হাসি যে উপেক্ষার সমগোত্র সেটুকু বুঝতে বাসবীর একটুও অসুবিধা হল না।

সেই মুহূর্তে একটা বাস এসে পড়াতে বাসবী যেন বেঁচে গেল। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে কোনরকমে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করল বেলাদেবী ভদ্রলোকের হাত ধরে একটা রেস্তঁরায় ঢুকল।

বাসবীর সমস্ত স্নায়ু যেন অবসন্ন হয়ে এল। একদিনে একটার পর একটা বিভিন্নমুখী স্রোতের আবর্তে তার জীবন যাবার দাখিল। মহীতোষবাবু আর রাধা, একনিষ্ঠ দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। বিশ্বাস আর প্রীতি, যৌথ জীবন প্রায় ভাঙনের মুখে, আর অনিমেষ আর বেলাদেবীর সম্পর্ক ত নিশ্চিহ্ন।

শেষ সম্পর্কটা যে কতটা নিঃশেষিত সেটার সম্বন্ধে বাসবী এতদিন পরে স্থিরনিশ্চয় হল।

অবশ্য বেলাদেবীর এখন অন্যপুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার পথে কোন বাধা নেই। আইন তাকে মুক্তি দিয়েছে। নতুন করে জীবনের সঙ্গী খুঁজে নিতে সে স্বচ্ছন্দেই পারে। কিন্তু তবু দৃশ্যটা যেন একটু দৃষ্টিকটু। এমন একটা দৃশ্য দেখতে বুঝি বাসবী অভ্যস্ত নয়।

বাসবী যখন বাড়ী গিয়ে পৌছল, তখন সে যথেষ্ট ক্লান্ত। তবু সে জানে, সব কিছু শোনার অপেক্ষায় মা রয়েছে। তাকে সব বলতে হবে। খুঁটিনাটি সব বিবরণ।

সত্যিই তাই। মা বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বাসবীকে রাস্তায় দেখেই দরজা খুলে দিল।

বাসবী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মা বলল, দীপক এসেছিল।

বাসবী থমকে দাঁড়াল।

দীপকবাবু? হঠাৎ?

তা ত জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কিছু বলল না। তোর কথা জিজ্ঞাসা করল, আমি বললাম, ফিরতে রাত হবে। আর কিছু বলল না। নেমে গেল।

বাসবী নিজের ঘরে চলে এল। এখন আর কিছু ভাল লাগছে না। মুখে-হাতে জল দিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। সারাটা দিন হৈ-চৈয়ের মধ্যে কেটেছে। এবার শিরায় স্নায়ুতে অবসাদ নামছে।

মা পিছন পিছন এল।

কেমন খাওয়াল রে বাসী?

খুব ভাল মা। ভদ্রলোক অনেক টাকা খরচ করেছেন। ছেলে নেই, পুলে নেই, খরচ করবেই বা কিসে?

মা তক্তপোষের কোন চেপে বসল।

অনেক লোক হয়েছিল?

অনেক আর কি। মহীতোষবাবুর সেকশনের ক'জন গিয়েছিল।

ম্যানেজার যায় নি।

মা সোজাসুজি চোখ রাখল বাসবীর চোখের ওপর। তার প্রশ্নের উত্তরটা বুঝি বাসবীর চোখের তারায় লেখা রয়েছে।

না, না, বাসবী মাথা নাড়ল, শুধু কেরাণীবাবুদের নিমন্ত্রণ। হোমরা-চোমড়া লোকরা যাবে কেন? ওরা গেলে মনের আনন্দে কথা বলাই যেত না। গোমড়া মুখ করে থাকতে হত।

মা ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। মেয়ে বোধ হয় লুকাচ্ছে তার কাছে। নয়ত ম্যানেজারের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে বাসবীর খুব যে ব্যবধান আছে, এমন ত মনে হয় না। দু'জনে একসঙ্গে রেস্তঁরায় খায়, মোটরে পাশাপাশি বসে, এমন কি অফিসে নতুন কাউকে নিতে হলেও বাসবীর মত নেয় ম্যানেজার। তাকে দেখে মেয়ে গোমড়ামুখ করে থাকবে সম্পর্কটা ত মোটেই সে ধরনের নয়।

বাসবী মা'র এ ভাবান্তর লক্ষ্য করল না। বলল, দাঁড়াও মা, চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে আসি।

বাথরুমে যাবার পথে দেখল রুবি আর খোকন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে

দুজনে? খোকন পড়াশোনা করছে ত ঠিক মত! অন্যদিন বাসবী সময় পায় না, ছুটির দিনটা খোকনকে তার একটু দেখা উচিত। এখন থেকে পড়াশোনায় অমনোযোগী হলে, উত্তরকালে আর সামলানো যাবে না।

বাসবী ফিরে এসে দেখল মা ঠিক তেমনি ভাবেই তক্তপোশের ওপর বসে আছে। তার মানে মা'র কথা এখনও শেষ হয় নি, কিংবা বাসবীর কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চায়।

ঠিক তাই। বাসবী আসতেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্র-লোকের স্ত্রী কেমন রে?

খুব ভাল মা। বেশ হাসি-খুশী আর সরল মানুষ। তাকে আমরা সাজালাম যে।

সাজালি?

হ্যাঁ মা, কনে সাজালাম, তক্তপোশে উঠতে উঠতে বাসবী বলল, বেনারসী পরিয়ে, চন্দনের ফোঁটা এঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

মা নির্বাক দৃষ্টি মেলে বাসবীর দিকে চেয়ে রইল।

এদিকে পুরুষরা মণীতোষবাবুকে বর সাজাল। গরদের পাঞ্জাবি, চাদর পরিয়ে, মাথায় টোপর দিয়ে—

টোপর! মা যেন বিস্ময় চাপতে পারল না।

হ্যাঁ মা, টোপর। অফিসের এক ভদ্রলোক যে টোপর কিনে এনেছিল।

আরও বলতে গিয়েই বাসবী থেমে গেল। এরপর কি হয়েছিল তা আর মাকে বলা চলবে না। বিরাট একটা ছন্দপতনের মতন বিভাসবাবুর স্ত্রীর আকস্মিক প্রবেশের কথাটা উহ্য থাক। একটা আনন্দোচ্ছল ছবিই আঁকা থাক মা'র মনে।

মা নির্বাক। মনে হল কি বুঝি চিন্তা করছে। গালের পেশীগুলো কাঁপছে থর থর করে।

কি ভাবছ মা?

ভাবছি, আছে বলেই টাকা নিয়ে এমনই ছিনিমিনি খেলতে হবে! এভাবে অপচয় না করে এমন দিনে ফল-মূল কিনে হাসপাতালে বাচ্চাদের দিয়ে এলেই ত পারে। কিংবা অনাথ আশ্রমে শিশুদের, যাদের কেউ নেই।

বাসবী প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। মা বলছে এই সব কথা! দারিদ্র্যের আগুন মানুষকে পুড়িয়ে এমনি নির্মম, এমনি কঠোর করে তোলে!

অপচয়, অপচয় ছাড়া এ আর কি! এই আনন্দের মুহূর্তটি কি অন্যভাবে পালন করা যেত না। (ক্রমশ)

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায়

দিলীপ রায়ের নাটক

আনুষ্ঠানিকতা ও আধ্যাত্মিকতা

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন আদর্শ অবস্থা হবে সেটি যখন প্রতিটি মানুষের ধর্ম হবে তার নিজস্ব। একথার তাৎপর্য কি? এমনিতেই পৃথিবীতে অনেক র্ম এবং এক একটি ধর্মের বহু শাখা, তার উপর আবার প্রত্যেকের এক একটি ধর্ম।

এক ও বহুর লীলা এই সৃষ্টি। সংসারে সব মানুষই যেমন এক ব্রহ্মের অংশ বা অঙ্গীভূত তেমনি আবার প্রতিটি মানুষের অন্তঃসত্তা অনন্য। প্রত্যেকেরই জীবন বিকাশ অন্তঃসত্তার নিজস্ব ছন্দে ঘটছে। যেদিন প্রতিটি মানুষ সে সত্যটি সম্পর্কে সচেতন হবে সেদিন ব্রহ্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণভাবে তার অন্তরাত্মারই নিজস্ব ছন্দে। স্বামীজী সেদিনের কথাই বলেছিলেন। সেদিন কি তবে বহুজন অনুসৃত প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রয়োজন থাকবে?

প্রচলিত ধর্মমাত্রেই মনে জাগায় কতকগুলো অনুষ্ঠান আচার, বাধানিষেধ ও উপাসনাপদ্ধতি। এগুলোতেই এক ধর্ম আর এক ধর্ম থেকে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায় থেকে ভিন্নতা লাভ করে। আধ্যাত্মিকতা যা ব উচ্চ ধর্মগুলোরই ভিত্তিমূলে কমবেশি মাত্রায় রয়েছে তা দেশকালাতীত সত্য। সে সত্যের আলোকে জীবনকে গড়ার নিমিত্ত যখন নানা বিধি-ব্যবস্থা তৈরী হয় তখনই দেখা দেয় ধর্ম। সাধারণভাবে বলতে গেলে ই ধর্মের শাসন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বহুলাংশে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আধুনিক কালে ধর্মের এই মর্যাদা আর নেই। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলাই আজ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের নিয়ন্তা। কেন ধর্ম তার অধিকার হারালে সে ইতিহাসের সবিস্তার বিশ্লেষণে না গিয়ে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে সত্য ও পরিপূর্ণতার জন্যে মানুষের যে আস্পৃহা ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেতে চেয়েছে আজ আর ধর্ম সে সত্যান্বেষা, আস্পৃহাকে রূপ দিতে পারছে না, বরং উল্টে সে সকল উন্নতির বাধা ও দুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আশ্রয় হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগ থেকে বিজ্ঞান নি ইত্যাদির প্রসারতায় ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগেছে। বুদ্ধির মুক্তির ফলে আজ মানুষের জ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর, গোটা বিশ্ব তার দৃষ্টির মধ্যে এসে গেছে, তার বিবেক, তার চেতনা, তার ন্যায় ও রুচিবোধ এমন হয়েছে যে রক্ষণশীল ধর্মীয় অনুশাসন তার সঙ্গে আদৌ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলে ধর্ম সম্পর্কে আজ প্রায় সর্বত্র বিরূপতা। কিন্তু তা হ'লেও একথা সত্যি নয় যে, ধর্মগুলো লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মানুষের একটি মূলগত প্রবণতার উপর ধর্মের ভিত্তি, তাই চিরকালের ন্যায় আজও পৃথিবীর কোটি কোটি লোক ধর্মানুরাগী। কিন্তু সমাজ-শাসনের দায়িত্ব হারিয়ে এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অবহেলার ফলে ধর্ম অধুনা নিতান্ত অনুষ্ঠানপরায়ণ ও অপরিণত-বুদ্ধি লোকের আশ্রয় হয়ে পড়েছে। বিচক্ষণ লোকেও দুর্বল মুহূর্তে ধর্মানুষ্ঠানের আশ্রয় নিচ্ছেন নিজের বুদ্ধিকে সম্যক তৃপ্ত না করেই। তা ছাড়া সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থবোধেও বহুলোকে ধর্মের পোষকতা করছে অথবা ধর্মকে কাজে লাগাচ্ছে।

আমাদের দেশের কথাই দেখা যাক। ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্মের দেশ। আধ্যাত্মিকতা ও বাহ্যাচার দুই এদেশে ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতা পেছনে পড়ে গিয়ে বাইরের বাধা-নিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানের জঞ্জালই প্রধান হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও সমাজ দর্শন এসে এদেশের জীবনকে নাড়িয়ে দিলে তখন রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সকলেই আচার-অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিকতাকে আলাদা করে বুঝতে চাইলেন। অধ্যাত্ম শাস্ত্র বেদান্তের সঙ্গে যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানচর্চার বিরোধ তাঁরা দেখেন নি। তাই জাতির বুদ্ধির মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তাঁরা বাহ্যাচারকে বর্জন ও কতকাংশে সংশোধন করে নিতে চাইলেন। পুরাতনকে, অন্ধ সংস্কারকে যারা আঁকড়ে থাকতে চায়, অভ্যাসবশে বা সুবিধাবোধে তাদের কাছ থেকে প্রবল বাধা আসে। ফলে সমগ্র সমাজ থেকে জ্ঞানীগুণীদের একটা বড় অংশকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে

হয়—ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন সমাজ গঠিত হয়। বিবেকানন্দের কৃতিত্ব এখানটায় যে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হয় নি। সংস্কার সাধনের ঝোঁকে ব্রাহ্মনেতাগণ মূর্তি-পূজা ব্রহ্মের সাকারত্ব প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ অস্বীকার করেছিলেন যা শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে সত্য-মূলক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিবেকানন্দ এগুলোকে মেনে নিলেন, ফলে সমগ্র হিন্দু জাতি তাঁর গৌরবে গৌরব লাভ করল। অজ্ঞমূর্খ নির্বিশেষে সবাইকে আলিঙ্গন করার পরেই কিন্তু স্বামীজী তাদেরকে শাসন করতে প্রবৃত্ত হলেন, মিথ্যা আচার জাতভেদ ইত্যাদির জন্যে গালমন্দ করলেন। কিন্তু লোকে এসব কথায় বড় একটা কান দেয় নি, বরং উল্টে তাঁকেই সন্ন্যাসপ্রথা, পূজাআর্চা প্রভৃতি কতকগুলো ক্রিয়াকর্ম অবলম্বন করতে হ'ল। সে যাই হোক, আধুনিক ভারতের চিন্তা ও বিবেকের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেছেন—রামমোহন, বঙ্কিম, তিলক, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ—তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিকতার কথাই বিশেষ করে বলেছেন, অধ্যাত্মমূল্যবোধের সঙ্গে পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান সমাজনীতি ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির সমন্বয় চেয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা সতীদাহ বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ প্রতিটির সঙ্গেই হিন্দুধর্মের জীবন-মরণকে এক করে দেখেছেন তাঁরা আজও সব ব্যাপারেই তাই দেখেন। সামাজিক অগ্রগতির সকল রকম চেষ্টাই তাঁদের কাছে বাধা পায়। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই, এ কথার অর্থ কি এই যে আমার লালসা ভগবানই দিয়েছেন তার চরিতার্থতা নিয়েই থাকব? তা যদি না হয় তবে দেশের দারিদ্র্য বৈষম্য মূঢ়তা এ সকলকেও ভগবানের দান বলে মেনে না নিয়ে পার্থিব জীবনের অপূর্ণতা বলে গণ্য করতে হয় এবং সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এ সকলের প্রতিকারের চেষ্টা ধর্মসাধনার অত্যাবশ্যক ব্যঙ্গ বলে জ্ঞান করা কর্তব্য। পাপের শাস্তি আর পুণ্যের ফল এবং পূর্বজন্মের কর্ম এসব কথার অতি সরল ও স্থূল ব্যাখ্যায় বিশ্ব জীবন রহস্যের সমাধান হয় না। অথচ এ সকলেরই কদর্থের আড়ালে বহু কায়েমী স্বার্থ আশ্রয় নিয়ে আছে।

আর একটি বস্তু হ'ল গুরুবাদ। বিবেকানন্দ কুলগুরু প্রথার নিন্দা করেছিলেন, অথচ এই গুরুতা ব্যবসায়ে দেশ ছেয়ে গেল। লেখাপড়া খেলাধূলা সব বিষয়েই গুরুর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। অধ্যাত্ম সাধনায়ও তেমনি গুরুর প্রয়োজন অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে সাহায্যলাভের বাঁধাধরা পদ্ধতি থাকা আদৌ স্বাভাবিক নয়। অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আদৌ কাউকে দীক্ষা দিয়েছেন বলে জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণেরও সাহায্য দেবার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ দীক্ষা দেন নি। কিন্তু এঁরা সকলেই বহুজনের অধ্যাত্মজীবনকে গঠন করেছেন এবং এখনও করছেন। আসলে যে দীক্ষা এত ব্যাপকতা লাভ করেছে সেটা তান্ত্রিক গুহ্যসাধনার অঙ্গ। বৈষ্ণব শাক্ত শৈব সব দীক্ষাই তান্ত্রিক দীক্ষা। তন্ত্রের সাধনায় পশুশ্রেণীর মানুষকেও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধ্যাত্মচেতনায় উন্নীত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ খাপছাড়া ভাবে এই গুহ্য সাধনার একটি অঙ্গকে অপরিহার্যভাবে কেন গ্রহণ করবে? ধর্মপথে বহুদূর চলার মত নির্দেশ ত গীতা উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থাদিতেই রয়েছে। আর যদি সত্যিই গুরু দরকার, সাধকপ্রবর আলমোড়াবাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বলেন, তবে অন্তরের অন্তস্থলে ডুবে যাও, যেখানে রয়েছেন তোমার গুরু, তোমার আত্মপুরুষ, যিনি হ'লেন ভগবানের প্রতিনিধি। অন্তর্জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যে বাহ্যগুরুরও দরকার হ'তে পারে, সে-ক্ষেত্রে যথাসময়ে গুরুই এসে তোমাকে খুঁজে নেবেন (Search for Truth গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য সাধারণ গৃহস্থের পথে এসব অনেক দূরের কথা।

এই গুরু-প্রথার কথা এত করে বলছি এজন্যে যে এটিকে আশ্রয় করে দেশে এক কুশ্রী সম্প্রদায়-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়েছে; গুরুদীক্ষায় হৃদয়ের প্রসারতা না ঘটে ঘটছে তার বিপরীত, বুদ্ধি মুক্ত না হয়ে হয়ে পড়ছে গণ্ডিবদ্ধ। নিজেকে, নিজের পরিবার বা দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য না করেও আমরা চলতে পারি কিন্তু নিজের গুরুকে সম্প্রদায়কে বা ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য না করলে যেন আমাদের অন্তর্জীবনের প্রেরণা শুকিয়ে যায়। এখানেই আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলোর ব্যর্থতা। এগুলো শুধু ভেদ রচনা করেছে, তাই প্রয়োজন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে স্বতন্ত্র করে দেখার। পৃথিবীর ধর্মগুলোর সাহায্যে বিশ্বৈক্য আসবে এ আশা কেউ করে না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সত্যিই সেটি করতে পারে। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতা ছাড়া, অধ্যাত্ম ঐক্য বন্ধনের প্রতীতি ছাড়া, বিশ্বৈক্যের আদর্শ বাস্তব রূপ নিতেই পারে না। এদেশের অধ্যাত্মশাস্ত্র বেদান্তের মূলকথা হ'ল সবই

ব্রহ্মময়, এক চৈতন্য এক আত্মা সর্বঘটে বিরাজমান। সেই ঐক্য উপলব্ধিতে পৌঁছাই অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য। কাজেই যাতেই আমাদের চেতনা প্রসার লাভ করছে, ঐক্যবোধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাই বরণীয়, আর যা-কিছু আমাদেরকে গণ্ডিবদ্ধ করছে তাই আমাদের বন্ধন, তাই বর্জনীয়—Expansion is life, Contraction is death—Swami Vivekananda.

এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্যাত্মচেতনায় আরোহণ করার অর্থ জীবনকে পরিহার করা নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন। আমরা আধুনিক ভারতের যে-সমস্ত নেতৃপুরুষের নাম করেছি তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিকতাকে চেয়েছেন, কিন্তু কেউ জীবনকে বাদ দিতে চান নি। অধ্যাত্মচেতনা যে জীবনে চরিতার্থতা আনে—জ্ঞান কর্মশক্তি ও সৃজনীপ্রতিভাকে বহুগুণিত করে দেয় তাঁদের জীবনই তার প্রমাণ। অধ্যাত্ম আলোকে ব্যক্তি সমাজ ও বিশ্বজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব মেলে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে।

পূজানুষ্ঠান যে দিব্য অনুভূতিতে নিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। কিন্তু তিনি যে মনোভঙ্গি নিয়ে এসব করেছিলেন সেটি ভুলে গেলে চলবে না। সেটি না থাকলে সবই অর্থহীন। একথা সত্যি যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কোন রূপ অর্থাৎ আচার বা অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করতে চায়, কিন্তু সে অনুষ্ঠান অন্তরের প্রেরণাসম্মত হওয়া চাই, চিরাচরিত রীতির যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে কোন কাজ হয় না।

মানুষের সৌন্দর্যচর্চার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের নিবিড় যোগ দেখা যায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র সঙ্গীত ও সাহিত্যের বহু মহৎ কীর্তি মানুষের ঈশ্বরারাধনার প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, সে আরাধনা ছিল জাগ্রত জীবন্ত। সে-ক্ষেত্রে আজ আমরা কি দেখি? বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা আনন্দোৎসব এমনকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পর্যন্ত বিরাট্ বিরাট্ পূজার আয়োজন হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে শুদ্ধাভক্তি বা সুরুচির কিছু দেখা যায় কি?

আজ জাতীয়তার উগ্রতা তীব্রতাকে খর্ব করে আন্তর্জাতিকার সচেতন বিকাশ ঘটাবার সময় এসেছে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্যের বোঝাকে হাল্কা করে দিয়ে বিশ্বজীবন রচনার ডাক এসেছে। আজও কি আমরা অন্তঃসারহীন আচার-নিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকব? এবং সম্পূর্ণ তলিয়ে না দেখে ধর্মদর্শনের কতগুলো নীতি ও তত্ত্বের অর্ধসত্যে সন্তুষ্ট থাকব?

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা পৌরসভায় অসভ্যতা ?

কলিকাতা পৌরসভার কর্ত্তব্য করদাতাদের সুখ-সুবিধার প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা এবং শহরের পথঘাট, নালা-নর্দ্দমা, পয়ঃপ্রণালীর যথাযথ ব্যবস্থা করা। করদাতারা যাহাতে শহরে বসবাসের নিম্নতম সুখ-সুবিধা পায়—তাহাও দেখা কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য। কিন্তু বিগত ২০।২৫ বৎসরে কলিকাতা শহরকে প্রায় ভাগাড়ে পরিণত করিয়াছেন এই শহরের পরম কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ভদ্র, শিক্ষিত এবং মানবদরদী তথাকথিত পৌর-পিতার দল। আজ কলিকাতার প্রকৃত অবস্থা কি? কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কি ঘটে, কি কি বিষয় লইয়া আলোচনা হয়? অকর্ম্মার বিষম-ঢেঁকি পৌরসভার কাউন্সিলারগণ কি বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিবাদ-মারামারি এবং ইতরজনোচিত গালা-গালি করিয়া থাকেন? ইহার সহিত শহর এবং শহর-বাসীদের কোনপ্রকার ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে কি? না।

কলিকাতার অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নে প্রদত্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যে :

রাস্তা নাই, যে-রাস্তা আছে তাহাতে আলো নাই; জল-সংকট; সম্মুখে কলেরার মহামারী—তাহা লইয়া কিন্তু কোন মাথাব্যথা নাই—আছে হনলুলু হইতে টোককাইডো, দুনিয়ার তামাম সমস্যা লইয়া চর্চ্চা, পরের চরকায় তৈলদান। ট্রাম ত পৌর-কর্ত্তৃত্বের এখতিয়ারে পড়ে না! নিজেদের যাহা কিছু ছিল কাজ, সব কি সাঙ্গ হইয়াছিল যে, পৌরপিতারা ট্রামের ব্যাপারে নাক গলাইতে ছুটিয়াছিলেন?

নিতান্ত নির্লজ্জ না হইলে পৌরস্বার্থের এই অছিবৃন্দ ক্ষান্ত রহিতেন। কে যেন কবে বলিয়াছিলেন, অপদার্থ সেনাপতিরাও কখনও কখনও যুদ্ধ জিতিয়া থাকে, কিন্তু কোন 'ডিবেটিং সোসাইটি' তা পারিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তবু বলিব, 'ডিবেটিং সোসাইটি'গুলিরও বরং সার্থকতা আছে; আর কিছু না হোক, সেখানে কথা বলার কলাকৌশল আদবকায়দার তালিম মেলে। কিন্তু কলিকাতা পৌরসভার কাছে মিলিবে কোন্ শিক্ষা? গালিগালাজ ত গলির 'রক' হইতেই শেখা যায়। হানাবাড়ী আর ওই লালবাড়ী একই রীতিতে চলিয়াছে। এক দল বিদায় লন, কিন্তু যেন প্রেত হইয়া ফিরিয়া পরের দলের ঘাড়ে ভর করেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নেও এই তাথৈ নৃত্যের অবসান হইবে মনে হয় না। শতবার ধুইলেও কোন কোন বস্তুর ময়লা ঘোচে না। আগে 'পকেট বরা' ছিল এখন হইয়াছে 'অ্যাডাল্ট্ ফ্র্যানচাইজ'। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কেরা ভোটাধিকারী হইলেই ভোটপ্রাপ্ত অধিকারী মহাশয়েরাও যে প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন, এমন ত কথা নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নারকীয় অবস্থা দেখিয়া আজ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। তিনি যদি বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিতেন যে কাহাদের হাতে, কোন্ শ্রেণীর মানুষরূপী ইতর জন্তুদের জন্য নূতন কলিকাতা কর্পোরেশন রচনা করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাবিত বিল পাশ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন!---

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত সড়কটির লালকুঠিটি শহরের নির্জ্জলা-নিকৃষ্ট পাপ। এই কুঠিতে মজলিশ পাকাইয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা, কথায় বলে, "শহরের বাপ"। (পাপ বলিলে দোষ কি?) তাঁহারা 'বাপত্ব' অর্জ্জন করিয়াছেন ভোটের জোরে। পিতৃবৃন্দ সম্পর্কে প্রৌঢ় এই (সন্তান) শহরটির নালিশ, তাঁহারা কাউন্সিল চেম্বারের দেওয়ালে-দেওয়ালে আয়না খাটাইয়া রাখেন নাই কেন? রাখিলে শ্রাদ্ধ বোধ করি এতদূর গড়াইত না। সেই শিসমহলে আপনাদের চেহারা 'আপনি নেহারি' আমীরকুল নিশ্চয় চমকাইয়া যাইতেন। চোখে পড়িত ঘুঁষিতোলা হাত, লাথি-উঠানো পা আর দাঁত-মুখ-খিঁচানো 'হনুমানিক' চেহারা দেখিয়া বলা যায় না, মাথা হেঁট হইলেও হইতে পারিত (অবশ্য এ আশা

বৃথা!) বাহিরে যাহারা পটকা ছোড়ে, বোমা ফাটায়, ইট-পাটকেল বৃষ্টি করে, তাহারা না-হয় সমাজবিরোধী জীব, কিন্তু সমাজপতিরা তাঁহাদের সঙ্গে নিজেদের আকৃতি-প্রকৃতির কোন মৌলিক তফাৎ খুঁজিয়া পাইবেন কি?

এই অবস্থায় কলিকাতাকে বাঁচিতে হইলে, একদা 'প্রাসাদ-নগরী' বলিয়া খ্যাত প্রাচ্যের এই বৃহত্তম নগরকে 'পাপ'-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে করদাতাদের 'জাগ্রত' হইয়া একটি 'টু-ইয়ার প্ল্যান' বা পরিকল্পনা রচনা করিয়া—দলে দলে ঝাঁটা হস্তে পৌরপিতারূপ পাপীদের শহর হইতে ঝাঁটাইয়া বিতাড়ন কার্য্য' সুরু করিতে হইবে অবিলম্বেই। এই পৌর-বীজাণুদের নূতন এক আস্তানা করিতে হইবে কলিকাতা হইতে, অন্তত ৬০ মাইল দূরে কোন এক জলাভূমিতে। কলিকাতাকে মহামারীমুক্ত করিবার ইহাই হইবে সর্ব্ব-নরম চরম পন্থা!

পৌরসভায় পকেটমার

এতকাল জানিতাম, অসভ্য পৌরসভায় ছ্যাঁচড়, ইতর, খিস্তিকারী এবং অকর্ম্মা-ঢেঁকিদের আড্ডা। ভাবিতে পারি নাই কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিল চেম্বারে (যেখানে কাউন্সিলার ছাড়া অন্য কাহারও সভার কার্য্যে যোগদান করিবার অধিকার নাই) পকেট-মারও রহিয়াছে! এই বিচিত্র সংবাদ পাইলাম কর্পোরেশনের গত ২৭শে আগষ্টের সভায় ঘটিত এক ব্যাপারে। যুগান্তরে প্রকাশিত ঐ সভার রিপোর্টের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল:

অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি অল্পক্ষণ হলেও, প্রচণ্ডতম আকার ধারণ করে। সভায় গালে চড় মারা, হাতাহাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং অকথ্য গালাগালি চলে। মেয়র প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে সভা মুলতুবী ঘোষণা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন।…কার্য্যসূচীর একটি প্রস্তাবও আজ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

এ সময়ে নির্দ্দলীয় ব্লকের সদস্য জনাব রসুল কাদের প্রতিবাদে শ্রীসেনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওঠেন। দুজনে ক্রুদ্ধকণ্ঠে তর্কাতর্কি করতে থাকেন। বিরোধ মেটাতে কংগ্রেস ও বিরোধী সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসতে থাকেন। ইউ-সি-সির সুধীন ভট্টাচার্য্য দ্রুত এসে শ্রীসেনের গালে এক চড় মারেন। এ সময়ে সভায় হাতাহাতি ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। একদল কংগ্রেসী শ্রীসেনকে ঘিরে রাখেন। একদল বিরোধী ও কংগ্রেস সদস্য বিরোধ মেটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ গণ্ডগোলের মাঝখান থেকে কংগ্রেস সদস্য জনাব আবু হাফিজ ইসমাইলের বুক পকেট থেকে পেন চুরি হয়ে যায়।

ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে! এইবার আমাদের সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় পৌরসভার দিকে তাঁহার সদয়সতর্ক দৃষ্টি একটু ফিরাইবেন কি? নিখিল ভারতে তিনি আলোকদান করিতেছেন—কিন্তু নিজের ঘরের কোণের অন্ধকার দূর করিবার সময়-সুযোগ তাঁহার হইবে কি না জানি না!

'বঙ্গাল-খেদা'—খাস বাঙ্গলাতেই?

'আনন্দবাজার' হইতে জানা যায় যে:

দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গালী বিদায়ের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। ইস্পাত কারখানা, মিশ্র ইস্পাত কারখানা, কয়লা-খনির যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা, কিংবা কেন্দ্রীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণাগার—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীদের এক হাল। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে কেবল বাঙ্গালীকেই চাকুরি দেওয়ার আবদার কেহ করে নাই। কিন্তু অবাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানেও বাঙ্গালী-বিতাড়ন চালু হইবে, ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। অথচ দুর্গাপুরে এখন বাঙ্গালী-বিতাড়ন পর্ব্ব চলিতেছে। নূতন চাকুরি ক্ষেত্রে আগের অনুপাত বজায় থাকা ত দূরের কথা, পুরাতন চাকুরিগুলিতেও বাঙ্গালীদের বহাল রাখা হইতেছে না। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার উচ্চতম পদে আগে শতকরা পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী ছিলেন, এখন সেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা তিরিশে নামিয়া আসিয়াছে। মিশ্র ইস্পাত কারখানার উচ্চতম পদের প্রথম সাতজনের মধ্যে মাত্র তিনজন বাঙ্গালী। ছাত্রদের বেশীর ভাগ বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও স্কুলের ভার একজন অবাঙ্গালীর উপর। কেন্দ্রীয় মেকানিক্যাল গবেষণাগার ও কয়লা-খনির যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানার উচ্চপদে বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে।—

আনন্দবাজারের এ মন্তব্যে যাঁহাদের অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গের শাসকগোষ্ঠীর কর্ণপাত করা উচিত, তাহা তাঁহারা করিবেন কি না বলা শক্ত। অথচ ইহাও অতি সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্যে কারখানাদি স্থাপন করিলে সেই রাজ্যের যোগ্য অধিবাসীরা চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য সকল রাজ্যেই ইহা বাস্তবে দেখা যাইতেছে। এবং এই

কারণেই বিভিন্ন রাজ্য তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কারখানাদি স্থাপনের জন্ত অতি সচেষ্ট এবং উদ্‌গ্রীব।

দুর্গাপুরে বিভিন্ন ধরনের কারখানা ও গবেষণাগার স্থাপনের পিছনেও এই চিন্তা সক্রিয় ছিল। কেবল দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর নয়, দুর্গাপুরে বাঙ্গালী যুবকদের ভাগ্যে অদক্ষ শ্রমিকের কাজও জুটিতেছে না। এই ধারা আর কিছুকাল অব্যাহত থাকিলে উপরের দিকে এখনও যে-কয়জন বাঙ্গালী দেখা যাইতেছে, কয়েক বৎসর পরে তাহাও আর দেখা যাইবে না। যে-সব নূতন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে সেখানেও বাঙ্গালীর কর্ম্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

ইহা আমরা স্বীকার করি যে, কারখানা, গবেষণাগার প্রভৃতির কাজকর্ম্মে যোগ্যতমদেরই নিয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতম লোককে নিয়োগ না করিলে কাজকর্ম্মে ও পরিচালনা ব্যবস্থায় গলদ দেখা দেয়, কারখানায় দুর্ঘটনার সংখ্যা ও অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই লোকসানের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, কোন ব্যক্তিকে লোকসানের বোঝা বহিতে হয় না, জনসাধারণকেই লোকসানের পুরা মাশুল দিতে হয়। এই কারণে সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের ব্যাপারে দক্ষতা অপেক্ষা ব্যক্তির ভাষার উপরেই জোর দেওয়া হইয়া থাকে। ফলে, সামগ্রিকভাবে দেশেরই ক্ষতি হয়। দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গে বলিয়া যোগ্যতম অবাঙ্গালী প্রার্থীকে বাতিল করিয়া বাঙ্গালী যুবককে চাকুরি দেওয়ার অনুরোধ কেহ করিবে না। কিন্তু দুর্গাপুরে যোগ্যতা বা দক্ষতার প্রশ্ন একেবারেই কোন মর্য্যাদা পাইতেছে না। এই সমস্যা কেবল উচ্চস্তরের পদগুলিতে নয়, অদক্ষ শ্রমিকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। এই ধরনের কাজে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করা ক্রমেই বিরল হইতেছে। বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী যুবকদের কাজ না দেওয়ার ষড়যন্ত্র অনেকদিন ধরিয়াই চলিতেছে। কোন ভাল চাকুরির খবর বাঙ্গালী যুবকেরা যাহাতে না পায়, সেজন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাগজে পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের কর্ম্ম-সংস্থান কেন্দ্রের পাঠানো তালিকাকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবাঙ্গালী মালিকেরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া থাকে। এখন খোদ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহেও বাঙ্গালী-বিরোধী নীতি পুরোপুরিভাবে চালু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গস্থিত গবেষণাগারগুলিতেও এই নীতি চালু হইয়াছে। গবেষণার ঠাট বজায় থাকিলেও এই বাবদে ব্যয়িত অর্থ অপচয়ে পর্য্যবসিত হয়।

এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও বহু আলোচনা করিয়াছি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মালিকদের টনক নড়ে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আরও বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কথায় কথায়, কাজে-অকাজে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কমিটি, কমিশন প্রভৃতি গঠিত হইতেছে—কিন্তু এ সকল কমিটি কমিশনের সভ্যপদে বাঙ্গালীর নাম চোখে পড়ে না। বিদেশে বহু কাজে এবং রাষ্ট্রদূত বা সমপর্য্যায়ের পদে বাঙ্গালী বর্জ্জন পূর্ণভাবে সার্থক হইয়াছে। পুরাণো কয়জন বাঙ্গালীর চাকুরির মেয়াদ শেষ হইলেই কেন্দ্রের কাজে বাঙ্গালীদের আর কোন অধিকার থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতে 'রাজ্যপাল' পদে প্রায়ই নূতন নিয়োগ হইতেছে। 'রাজ্যপাল' (বেকার) পদ পূর্ণ করিবার মত বাঙ্গালী কি একজনও মিলিতেছে না? রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রদূতের পদগুলি কি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, ইউ. পি, এম. পি, প্রভৃতি প্রদেশের লোকদের জন্য রিজার্ভ করা হইয়াছে?

কেন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করিয়া কলিকাতার, অবাঙ্গালী এবং বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা প্রভৃতি সংস্থাগুলি হইতে বাঙ্গালী তাড়াইয়া অবাঙ্গালী আমদানী করা হইতেছে। ইহাও বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এক গোপন 'আমদানী-নীতি'র বলেই ঘটিতেছে!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা না হয় নাই ধরিলাম—কারণ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের হুকুম মতই চলিতেছেন, নামে অটোনমাস হইলেও বাস্তবে এই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের 'ডিপেন্‌ডেণ্ট' ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু যাঁহারা ট্রামের এক-দুই পয়সা ভাড়াবৃদ্ধির জন্য কলিকাতাবাসীদের জন্য বিরাট সমরায়োজন করেন, সেই সব বামপন্থী জনদরদী সাধারণ বাঙ্গালীর স্বার্থরক্ষার জন্য কি করিতেছেন? ট্রাম-যাত্রীদের দুই-এক পয়সা সুবিধা আদায়ের অসার্থক প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতার সাধারণ জনের ট্যাঁক কতখানি বা কি পরিমাণ খালি হইয়া গেল তাহার কোন হিসাব এই জনদরদীর দল রাখেন কি? একান্ত আবশ্যক খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে—বেগুন, মুলা, ঝিঙ্গা, করলা, কাঁচকলা, মাছ, মাংস, ঘি, তেল প্রভৃতি সামগ্রীর দাম যখন প্রত্যহ হু হু করিয়া আকাশমুখী হইতেছে সেই সময় ট্রামের দুই-এক পয়সা

ভাড়াবৃদ্ধিতে মহাভারত রসাতলে যাইত না। সবই যখন গা-সওয়া হইয়াছে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ট্রাম ভাড়াও তাহাই হইত। বাঙ্গালীর একটি জীবনমরণ সমস্যার সমাধান চেষ্টা না করিয়া এই সময় দেশের, তথা জাতির প্রাণশক্তির অপচয়ের কোন অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। তবে বামাচারী নেতৃত্ব যদি মনে করেন যে :

এই সস্তা আন্দোলনে নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব তবে তাঁহারা চালে ভুল করিয়াছেন। লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে তবে তীর ছুঁড়িলে তীরটি যথাস্থানে না পৌঁছিয়া বরং ক্ষতিকর স্থানে পড়িতে পারে অর্থাৎ রামের বুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্যামের বুকে বিদ্ধ হইবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রামের অর্থ বুঝি এবং তা অন্যায়ও নয়। সংগ্রামের পদ্ধতি অবশ্য এমন হওয়া দরকার যাহার পশ্চাতে জনসমর্থন থাকিবে। ট্রাম পুড়ানো বা রাস্তায় রাস্তায় হৈ-হুল্লোড়ে জনসমর্থন আছে কি না জানি না। তবে কথায় কথায় জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করিলে জনমত বিরুদ্ধে যাওয়াই সম্ভব। প্রতি বছর একটা বা দুইটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া বাস-ট্রাম পুড়াইয়া সাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে? গত ১৮ বছর এই ধরনের কাজ করিয়া বামপন্থী নেতারা কি ক্ষমতা দখলের পথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন? বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ভ্রান্তপথে আন্দোলন পরিচালনা দ্বারা দেশের মানুষের ক্ষতিই করিয়াছেন।

'জি. টি. রোড' সাপ্তাহিকের এই মন্তব্যের সহিত অনেকেই একমত হইবেন। বামপন্থীদের শ্রমিকদরদ প্রখ্যাত, কিন্তু এই দরদ বাঙ্গালী শ্রমিকদের জন্য আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন জানি না। ইহা কি অসত্য যে, দলে-ভারী অবাঙ্গালী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া শ্রমিকগতপ্রাণ বামপন্থী নেতারা বাঙ্গালী শ্রমিক এবং অন্যান্য নিম্ন বেতনভোগী কর্মীদের প্রায় সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না?

বাঙ্গলায় বাঙ্গালীদের এই বিষম অবস্থার প্রতিকার সহজ আবেদন-নিবেদনে হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিহার, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য রাজ্য নিজ নিজ এলাকার লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার এবং নেতারা যুক্তভাবে যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কংগ্রেসী নেতাদের তাহাই করিতে বাধ্য না করিলে চলিবে না। এ-বিষয়ে 'আমিষ' পন্থা গ্রহণে দোষ কি?

বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালী মালিকদের কলকারখানা এবং অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরি না দিবার অপূর্ব্ব ষড়যন্ত্র যদি প্রত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকারের কর্ত্তব্য এই রাজ্যবাসী যোগ্য কর্ম্মপ্রার্থীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য অবিলম্বে যথাযথ আইন পাশ করা। দুর্গাপুর এবং এই রাজ্যের অন্যান্য এলাকা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীকে কর্ম্মে নিয়োগ না-করার যে গোপন চক্রান্ত চলিতেছে, আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজ্য সরকারকে সেই চক্রান্তের বিলোপসাধন অবশ্যই করিতে হইবে। এ-বিষয় আর বৃথা কালক্ষেপের অর্থই হইবে চির আক্ষেপ!

কলিকাতার বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি!

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কট দূর করিবার জন্য আবার বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইতেছে। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল সঙ্ঘের সভাপতি মহামতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সঙ্ঘের সভায় বলেন যে, বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ আয়ে কলিকাতা পৌরসভার কার্য্য চালানো যায় না। তাঁহার মতে স্বল্প আয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যান্য প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি অপেক্ষা ভাল ভাবেই চলিতেছে! কলিকাতা পৌরসভার ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান বার্ষিক এক হাজার টাকা ভ্যালুয়েশনের বাড়ীর উপর শতকরা ৩০ টাকা হারে কর ধার্য্য করার কথা বলেন এবং বস্তির ট্যাক্স শতকরা ১৫ টাকা হারে কমাইবার কথাও বলেন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় পৌরোহিত্য করেন কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান।

ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগোবিন্দ দে ও বাৎসরিক এক হাজার টাকার ওপর ভ্যালুয়েশনের বাড়ীর ট্যাক্স শতকরা ৩০ টাকা হারে ধার্য্য করিতে বলেন এবং বস্তীর ট্যাক্স শতকরা ১৫ টাকা হারে নামাইবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ট্যাক্স ধার্য্য করা হইলে বাৎসরিক প্রায় এক কোটি টাকা (মাত্র?) আয় বাড়িবে।

মেয়র ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী বাৎসরিক ১৫ হাজার টাকার উপর ভ্যালুয়েশনের বাড়ীর শতকরা ৩০ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব করেন এবং শতকরা সাড়ে বার টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত আর একটি হারের ট্যাক্স ধার্য্য করিতে বলেন। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী পৌরসভার বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে।

সভায় কয়েকজন সদস্য বস্তির টাকা শতকরা ১৮ টাকা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন।

এই করবৃদ্ধির প্রস্তাবে আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, কারণ কলিকাতা কর্পোরেশনের পিতারা প্রকৃতপক্ষে অপচয় করিবার জন্য নামমাত্র টাকা পাইতেছেন। পরের পয়সায় নবাবী করিতে হইলে নবাবদের হাতে অন্তত বাৎসরিক ৩০।৪০ কোটি টাকা থাকা দরকার, তাহা না হইলে প্রেষ্টিজ থাকে না! কলিকাতা পৌরসভার নবাবগণ গরীব করদাতাদের পকেট কাটিয়া খাজনা বাবদ প্রাপ্ত যে অর্থ বরবাদ করিতেছেন, তাহাতে কর দেনেওয়ালাদের কিছুই বলিবার নাই! খাজনার বদলে নগরবাসীরা কি সুখ-সুবিধা পাইতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কোন অধিকার কাহারও নাই।

আজ কলিকাতা শহরকে যাহারা নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহারা কোন্ মুখে নূতন করিয়া খাজনা বৃদ্ধির কথা বলিতে পারে—ভদ্র কোন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিবে না। কর্ত্তিত-কর্ণ নির্লজ্জ না হইলে কলিকাতা পৌরসভার তথাকথিত (উপ-) পিতারা শহরের মাঝখান দিয়া চলিতে ভরসা পাইতেন না—রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা শহরের অলিগলিতে চলাফেরা করিতেন। আমরা যাহাদিগকে লজ্জা দিবার প্রয়াস পাইতেছি স্বয়ং লজ্জাদেবীই তাহাদের দেখিয়া লজ্জাবোধ করেন। অতএব এ বৃথা চেষ্টা না করাই ভাল।

কলিকাতায় গত কিছুকাল হইতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা তাঁহাদের বাস্তভিটা বিক্রয় করিতে নানা কারণে বাধ্য হইতেছে—এইবার আবার করবৃদ্ধি হইলে অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতার বাড়ী-মালিক (এবং সেই সঙ্গে শহরবাসীও) অবাঙ্গালী শতকরা ৯০ হইবে এবং বাস্তবে ইহা ঘটিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভোটদাতাও কালক্রমে শতকরা ৯০ হইবে অবাঙ্গালী এবং ইহার কল্যাণে কলিকাতার পৌরপিতারাও হইবেন শতকরা ৯০ অবাঙ্গালী (ভোটের জোরে)। আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক নহে এবং এ আশঙ্কা বাস্তবে দেখা দিলে অদ্যকার পৌরপিতারা কি করিবেন? অবশ্য বর্ত্তমান পৌরপিতারা ততদিনে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ এবং কলিকাতাকে অবাঙ্গালী শহরে পরিণত করিয়া নরকে প্রস্থান করিবেন।

শুনিয়াছি বঙ্গাধিপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদৃষ্টি তাঁহার দেহের মতই বিশাল। শ্রীঘোষ একবার নয়ন মুদিয়া ৫০ বছর পরের কলিকাতার রূপ দর্শন করুন—দেখিবেন এই শহরে বাঙ্গালীর বাড়ী বলিতে কিছুই নাই। অতি সামান্য সংখ্যক বাঙ্গালী জীর্ণদেহ এবং শীর্ণ প্রাণ লইয়া তিলজলা, ট্যাঙ্গরার বস্তিতে বাস করিতেছে।

কর্পোরেশনের নূতন করবৃদ্ধি প্রস্তাবে—

আনন্দবাজারের বক্তব্য :

...নূতনভাবে কর বসানোর ফলে পৌরসভার আটাত্তর লক্ষ টাকার আয়বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। যাহাদের জমি বা বাড়ীর বার্ষিক মূল্য বৎসরে তিন হাজার টাকার বেশী, করবৃদ্ধির চাপ তাহাদের উপরেই বেশী পড়িবে। কলিকাতা শহরে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের পক্ষে বসবাস করা এমনিতেই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জমির অত্যধিক মূল্যের জন্য কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে নূতন বাড়ী তৈয়ারী করা প্রায় অসম্ভব। প্রস্তাবিত করবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর নূতন করিয়া চাপ পড়িবে। ভাড়াটে বাড়ীর ভাড়াও বৃদ্ধি পাইবে। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে নূতন বোঝা চাপানোর কোন সার্থকতা নাই। পৌরসভা বস্তি-এলাকার করহ্রাসের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহার জন্য বৎসরে সাড়ে আঠার লক্ষ টাকার মত আয় কমিয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এই কর-হ্রাস কাহাদের স্বার্থে? বস্তির মালিকেরা বহুক্ষেত্রেই বাড়ী ভাড়ার রসিদ দেয় না, পৌরসভার কর-নির্দ্ধারকের নিকট ভাড়া কম করিয়া বলিতে ভাড়াটেদের বাধ্য করে এবং তাহার ফলে পৌরসভার প্রাপ্য টাকা আদায় হয় না। পৌরসভার কর সংগ্রহ বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত এবং আরও দক্ষ করা সম্ভব হইলে বস্তি হইতে আয় না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইত। বস্তি-মালিকেরা ভাড়াটেদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পায়খানা নির্ম্মাণ বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তেমন খরচ করে না এবং সেজন্য বস্তি-এলাকার রাস্তাঘাটেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে। এই সব কারণেই বস্তি-এলাকায় মহামারী লাগিয়া থাকে। কর-হ্রাসের সঙ্গে বস্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা থাকিলে বরং এই প্রস্তাবের অর্থ বোঝা যাইত।

প্রশ্ন হইতেছে আটাত্তর লক্ষ টাকা আয় বাড়াইবার জন্য মধ্যবিত্ত এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবারের উপর এই কর বাড়ানোর দরকার ছিল কি না! সংবাদে দেখা যাইতেছে রাজ্য সরকারের বাড়ী ও জমির জন্য পৌরসভাকে বৎসরে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা, কিন্তু ১৯৬১ সালের পর সে-টাকা আর ছোঁয়ানো হয় নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজ পৌরসভা যানবাহনের জন্য যাবতীয় কর আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোটর ভেহিকল কর রাজ্য সরকারই আদায় করেন। এই বাবদে এক কোটি টাকার বেশী আয়

হইলেও রাজ্য সরকার পৌরসভাকে বৎসরে মাত্র সাড়ে চার লক্ষ টাকা দিয়া থাকেন। এই সব যানবাহন কলিকাতার রাস্তায় চলাফেরা করে, রাস্তা খারাপ করে, কিন্তু সে সব মেরামতের দায়িত্ব পৌরসভার। মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের মত কলিকাতা পৌরসভাকে পুরা টাকা না দিলেও অন্ততপক্ষে আশি লক্ষ টাকা দেওয়া প্রয়োজন।—

নাগরিকদের উপর করের বোঝা না চাপাইয়াও পৌরসভার আয় বাড়ানো সম্ভব। পৌরসভা ও জনস্বার্থে শহরের বাজারগুলির মালিকানা পৌরসভার হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। পৌরসভা কলিকাতার বেসরকারী বাজারগুলির মালিকানা লাভ করিলে পৌর-আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তৎপর ত ননই, উপরন্তু উপযুক্ত তদারকির অভাবে বিনা লাইসেন্সের বাজার চালু আছে এবং তাহার ফলে পৌরসভার আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। ভিন্ন রাজ্য হইতে যাহারা এই শহরে আসিতেছে, অন্যান্য বড় শহরের মত এখানেও ওই সব যাত্রীর উপর প্রবেশ-কর বসানো প্রয়োজন। ভিন্ন রাজ্য হইতে যে সব লরী গাড়ি আসে তাহার উপরেও প্রবেশ-শুল্ক বসাইতে পারিলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পাইবে। পৌরসভার প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে পারিলে অনাদায়ী করের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং নানা ধরনের প্রভাব বিস্তার করিয়া কম কর দেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ হইবে। কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য পৌরসভার প্রাক্তন কমিশনার শ্রী এস. বি. রায় কর-সংগ্রহকারীকে এক এলাকা হইতে অপর এলাকায় স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। (কেন ??) এই একই কারণে কলিকাতা শহরে বেআইনি ভাবে বাড়ী তৈয়ারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু পৌরসভার আয় তেমন বাড়িতেছে না। টাকা অনাদায়ী ফেলিয়া রাখা ও হিসাবপত্র ঠিক না রাখার জন্য কিছুকাল আগে পৌরসভার সতেরো লক্ষ টাকার হিসাব মিলিতেছে না বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছিল। কাজেই নূতন কর বসাইবার আগে আয়-বৃদ্ধির অন্যান্য উৎসগুলি কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিলে মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর নূতন বোঝা চাপানোর দরকার হইবে না।

কিন্তু গৌরী সেনের পয়সায় নবাবী করেন যাঁহারা—এ-দায় তাঁহাদের নহে। তাহা ছাড়া এত চিন্তা করিবার এবং মাথা ঘামাইবার মত মাথা ইঁহাদের আছে কি?

এই চরম খাদ্য-সমস্যার সমাধান কি?

—বর্ষণ-সিক্ত স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় মাটি যখন ভিজিয়াছে তখনই তরিতরকারি হইতে সুরু করিয়া মাছ, ডিম এবং প্রধানতঃ চাউলের বাজারে আগুন লাগিয়াছে। বাজারের অবস্থা উত্তপ্ত নয়, বরং বলিতে পারি ক্ষিপ্ত। সারা উত্তর বাংলার গ্রামগুলি হইতে প্রতিদিন যে সংবাদ আসিতেছে তাহা ভয়াবহ। কোথাও চাউল ক্রয় করা আজ আর কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। চাউলের দাম উর্দ্ধমুখী রওয়ানা হইয়া বর্ত্তমানে কোথাও ১৯০, কোথাও ১৯০ পয়সা কেজিতে ঠেকিয়াছে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে দিশেহারা করিয়া ছাড়িয়াছে। খোলাবাজারে চাউলের এই অবস্থায় কে চাউল কিনিবে? আর খোলাবাজার হইতে চাউল কিনিতে না পারিলে লোকে খাইবে কি? সংশোধিত রেশনিং মারফৎ প্রাপ্ত দেড় কেজি চাউল গমে কাহারও সপ্তাহ চলে না। সপ্তাহে ১ কেজি চাউল আর ৫০০ গ্রাম গম দিয়া আধপেটা খাইয়া দিন চলিতেছে। গ্রামে গ্রামে অর্দ্ধাহার, অনাহার সুরু হইয়াছে। সংবাদ আছে যে গ্রামের বহু কৃষক মাঠের ধান গাড়ার পরই মহাজনের নিকট তাহা ৭.৮ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। মাঠের পাট ব্যবসায়ী মহাজনের নিকটে বন্ধক রাখিয়াছে। হালের গরু বাড়ীর ঘটিবাটি বিক্রয় করিয়াও দিন যাপন অচল হইয়াছে। চারিদিকে হাহাকার রব। নারী-শিশুর ক্রন্দনরোলে বাতাস ভারাক্রান্ত। মাছের স্বাদ মধ্যবিত্তের বরাতে জুটিতেছে না। ৬।° টাকা কেজি দরে কে মাছ খাইতে পারে? তরিতরকারি, তেল, মশলা নিত্য-প্রয়োজনীয় সব জিনিষই অগ্নিমূল্য। সুতরাং বাঁচা অসম্ভব। গ্রামের অনেককে অখাদ্য খাইতে হইতেছে বাধ্য হইয়া।

চারদিক হইতে এই ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ যখন মানুষের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করিয়াছে তখনই সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজক সংবাদ পাওয়া গেল। ভারত সরকার ভূটানকে এক লক্ষ মণ চাউল দিবেন বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি অনুসারে সরকারী গুদাম হইতে এই এক লক্ষ মণ চাউল যথারীতি হ্যাণ্ডলিং ও ক্যারিইং এজেন্ট মারফৎ ভূটানের জন্য বাহির করিয়াও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই চাউল আর ভূটানে পৌঁছে নাই।(?) মধ্যপথ হইতে নাকি কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর ভূটান যখন জানাইল যে সে চাউল পায় নাই সরকারী মহলের তখন টনক নড়িল।

চারিদিকে বর্ত্তমানে অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু অন্ধকারে কালোবাজারে যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান কি আর পাওয়া যাইবে? কিছুদিন পূর্ব্বে চাউলের কালোবাজারী সম্পর্কে আরও সংবাদ প্রকাশ পায়। চাউলের চোরাবাজার ও হিসাবের গরমিল পাইয়া কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ভারত রক্ষা আইনে আটকও করা হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আসে নাই। এই কালোবাজারীকে সর্ব্বাংশে নিশ্চিহ্ন করিতে না পারিলে মুনাফালোভীদের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। একদিকে কালোবাজারীদের শ্বাসরোধকারী প্রয়াস, অন্যদিকে সরকারী রেশনিং-এ পূর্ণ পরিমাণ চাউল সরবরাহের অভাব—এই দুই চাপে বাংলার মানুষ আজ পিষ্ট হইতেছে। এই অবস্থা কতদিন চলিবে? মনে রাখা দরকার যে জাতীয় খাদ্যনীতির নামে বক্তৃতার ঝুড়ি দেশবাসীকে উপহার দিলে কাহারও পেট ভরিবে না এবং অভুক্ত মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে।—

'জনমতের' এই মত এবং প্রশ্ন আজ বাংলা দেশের সকলের মনেই জাগিয়াছে। কেবল জাগাই নহে—জনগণ হয়ত এই উৎকট, ভীষণ খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধান করিতে একান্ত বাধ্য হইয়াই 'বাধ্য' হইবে।

সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ:

—২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট এলাকাটি কলিকাতা মহানগরীর একেবারে গায়ে লাগোয়া এবং এই এলাকাটি বরাবরই ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া স্বীকৃত। রাজারহাট এলাকার সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাব ক্রমশঃ চরম আকার ধারণ করিতেছে। চাল প্রতি কিলো ১-৬০ হইতে ১-৮০ পয়সা দরে বিক্রয় হইতেছে। অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। চালের মূল্য ক্রমশঃ বাড়তির পথে, ফলে পল্লীবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে চালের উচ্চ মূল্যের সংবাদ আসিতেছে।

প্যাকেজ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বর্দ্ধমান জেলার কি শহর, কি পল্লী সর্ব্বত্রই দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে নিয়মিতভাবে ও আবশ্যক মত চাল সরবরাহ হয় না। ফলে জনগণের দুর্গতির সীমা নাই। মাঝে মাঝে যে চাল দেওয়া হয় তা অখাদ্য। খোলাবাজারে পাঁচ সিকা হইতে দেড় টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় হইতেছে।

আরও প্রকাশ যে, মাত্র এক মাসের মত চাল টকে আছে—আগামী মাসে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। অন্যদিকে ধান অভাবে চাল-কল, চিড়া-কল সবই বন্ধ।

কিছুকাল পূর্ব্বের খবরে জানা গেল যে দক্ষিণ সুন্দরবন এলাকাকে চিরকাল বাড়তি এলাকা বলিয়া ধরা হইলেও গত ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই সুদূর পল্লী অঞ্চলগুলিতে চালের মূল্য ৫০ টাকা মণ হইয়াছে—এ মূল্য ক্রমাগত উপরমুখী হইতেছে। এই সঙ্গে অন্যান্য অবশ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও অতি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সকল শ্রেণীর মানুষই আজ ভীষণ দুরাবস্থায় পতিত হইয়াছে। আলোচ্য অঞ্চলের ভীষণ অবস্থার কথা সরকারী মহলে জানাইয়াও এখনও পর্য্যন্ত কোন নাকি প্রতিকার ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

সুন্দরবনের গোসাবা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলে চাষের খরচের জন্য অভাবের তাড়নায় গৃহস্থরা ঘটি-বাটি, সোনা-দানা, গরু-বাছুর যার যাহা কিছু ছিল সবই বিক্রয় বা বন্ধক রাখার পর আজ কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে অর্দ্ধাহার-অনাহার সুরু হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহে উনুন পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে না। শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক গৃহবধূ ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়াছে। চারিদিকে খাদ্যের জন্য হাহাকার পড়িয়াছে।

গোসাবা ৩নং অঞ্চল পঞ্চায়েতের গত ১১ই আগষ্টের এক সভায় সর্ব্বসম্মতভাবে এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সরকার অবিবেচনাপ্রসূত ভাবে এই বিরাট অঞ্চলে মাত্র ৪৫টি রিলিফ মঞ্জুর করিয়াছেন—ইহা চাহিদার তুলনায় নগণ্য এবং রিলিফ ফরম পূরণের জটিলতা বৃদ্ধি করার কারণে অঞ্চল পঞ্চায়েতের পক্ষে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

অভিযোগ উঠিয়াছে যে, সরকার হইতে নাকি সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে—যে গ্রামসভায় বা মৌজায় ৩ হাজার লোকের বাস নয় সে গ্রামসভা বা মৌজায় রেশন পাইবার অধিকারী হইবেন না।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলা হয় যে, অভাবী লোকের সংখ্যার অনুপাত না ধরিয়া—কোন্ এলাকায় লোকসংখ্যা বেশী সেই মাপকাঠিতে রেশন দিবার সিদ্ধান্ত বাস্তবতাবর্জ্জিত।

এলাকার এই চরম অবস্থা প্রতিকারের জন্য ব্যাপক ভাবে রেশন চালু করা, বেকার লোকদের কাজ দেওয়া, ব্যাপকভাবে ফ্রি-লোন দেওয়া এবং রিলিফের পরিমাণ

বৃদ্ধি করা, পূর্ব্ব বছরের মত রিলিফের ফরম সহজ রাখা প্রভৃতি বিষয়ের সরকারের নিকট বহুবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও নাকি আজও পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় নাই। এবং এই কারণে সভায় সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, ১৫।২০ দিনের মধ্যে সরকার কোন রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতের সকল সদস্য পদত্যাগ করিবেন।

সুন্দরবনের পল্লীর সকল অঞ্চলে আংশিক রেশনও নাকি দেওয়া হইতেছে না বলিয়া সাধারণের দুরবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমায় খাদ্যাভাব ভয়াবহ। এই অঞ্চলে সাধারণ জনসাধারণ কচু, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি এবং সামান্য পরিমাণ গম খাইয়া দিন কাটাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে রেশন ডিলারদের সময়মত রেশন সরবরাহে অবহেলার কারণে বহু গ্রামবাসী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে রহিয়াছে এমন খবরও পাওয়া যায়! রেশনে চাল ও গমের পরিমাণ অত্যধিক কম। পরিবার-পিছু এক সপ্তাহের নির্দ্ধারিত রেশন কোনক্রমে মাত্র তিন দিন চলে। ধান বর্ত্তমানে ৩২।৩৪ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। চাউল নাই বলিলেই হয়।

রেশনে এবং খোলাবাজারে চাউল পাওয়া যায় না বলিয়া মাথাভাঙ্গা ও সংলগ্ন এলাকাগুলির হোটেল ব্যবসায়ীগণ হোটেল বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ফালাকাটা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে ধান এক টাকা কেজি দরে বিক্রয় হইতেছে!

ইহার উপর মানুষ যে চিঁড়া-মুড়ি খাইবা থাকিবে তাহার পথও বন্ধ। ইহার একমাত্র কারণ মুড়ি-চিঁড়া প্রস্তুতের জন্য যে বিশেষ শ্রেণীর ধান প্রয়োজন—তাহা বর্ত্তমানে পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

সরকারী লেভি প্রথার কল্যাণে ঐ ধান নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়িয়াছে। ফলে, মুড়ি, চিঁড়া, খৈ আজ ফাঁসীর আসামী। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর এই গার্হস্থ্য ব্যবসায় বা শিল্পও মৃত্যুমুখে। বাঙ্গালীরা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত মুড়ি চিঁড়া খৈ-বাতাসা খাওয়া ছাড়িতে বাধ্য হইবে। ইহার পর কি সব খাওয়াই বাঙ্গালীকে ত্যাগ করিতে হইবে—কেবল হাওয়া এবং কংগ্রেসী নীতি বাণীতেই পেট ভরাইতে হইবে?

বর্দ্ধমান জেলার প্রায় মহকুমা হইতেই দুর্ভিক্ষ এবং বিষম অন্নাভাবের সংবাদ আসিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, এই অঞ্চলের অবস্থা ক্রমশ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। সরকারী লেভি সিস্টেমের চাপে এই অঞ্চলের পল্লীগ্রাম ১৫ টাকা দরে ধান বিক্রয় করিয়া—আজ সেই ১৫ টাকা মণ-দরের ধান পল্লী অঞ্চলের লোককেই ২০।২২ টাকা দরে কিনিতে হইতেছে! চালের খুচরা দর ১ টাকা ২৫ পয়সা হইতে ১ টাকা ৪০।৫০ পয়সা।

বর্দ্ধমানের প্রতিটি অঞ্চলেই ব্যাপক অনশন ও অর্দ্ধাশনের সংবাদ। দিনমজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তগণ কঙ্কালসার হইয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ এই নরকঙ্কালের মেলা দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়।

দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের পরিস্থিতি শোচনীয়

চাল, ডাল, তেল ও নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য এত উর্দ্ধে উঠিয়াছে যাহাতে সব জিনিষই জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ আজ দুঃসাধ্য। দক্ষিণ দামোদরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সেহারাবাজার ও অন্যান্য সন্নিহিত গঞ্জে ধান্যের দাম প্রতি মণ ২০.৫০ টাকা, চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৪২ টাকা, ডাল প্রতি কেজি ১.৪০ পয়সা, পচা দুর্গন্ধ সরিষার তেল প্রতি কেজি ৫.৫০ পয়সা, নারিকেল তেল বলিয়া কথিত দুর্গন্ধ তরল পদার্থ ৬.৫০ পয়সা কেজিতে বিক্রয় হইতেছে। খইলের দর প্রতি বস্তা ৪২ টাকা। গত বৎসর বৈশাখ হইতে একান্ত দুঃস্থদিগকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল, এ বৎসর এখনও কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। সকল দিকের খরচ মিটাইয়া চাষী আর বলদকে ৪২ টাকা দরের খইল দিতে পারিবে না, ফলে বলদ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—পূর্ব্বের মত লাঙ্গল টানিতে অক্ষম। খইলের অভাবে দুগ্ধবতী গাভীর দুধ আজ সের হইতে ছটাকে নামিয়াছে!

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সকল জেলারই খাদ্যাবস্থা সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইতেছে। কাহার দোষে বা কাহাদের ভুলে আজ এই রাজ্যের এমন খাদ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল—তাহারও আলোচনা করিয়া লাভ নাই। শুধু এই কথাই বলিব যে, যখন পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, সেই সময় জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা পাইতে হইলে অবিলম্বে খাদ্যাবস্থার উন্নতি করিতেই হইবে। দেশে চাউল, গম, তেল, ডাইল প্রভৃতি নাই—ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। কম থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে এমন অভূতপূর্ব্ব খাদ্যসঙ্কট ঘটিবার কথা নহে।

এখন যেমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিয়া তৎপরতার সহিত—যে-শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা খাদ্যসামগ্রীর কালোবাজারী করিতেছে তাহাদের চরম নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করিতে হইবে। আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনে এই বিশেষ-শ্রেণীর পাগড়িধারী-

ব্যবসায়ীদের মনের কোন পরিবর্তন হইবে না। মানুষ হইলে হয়ত হইত, কিন্তু ইহারা দেখিতে মানুষের মত হইলেও আসলে নেকড়ে জাতীয় নরমাংসাশী জীববিশেষ।

সরকারের কোন প্রকার বিরূপ সমালোচনা বর্ত্তমান অবস্থায় করিব না। সরকারের কাছে একমাত্র আবেদন এই যে, সঙ্কটকালে দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং এই পরম-প্রয়োজনীয় শান্তি রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দিতে হইবে যেমন করিয়াই হউক—তাহা না হইলে ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কাছে পরম যুক্তিযুক্ত নীতি-বাণীর কোন মূল্য থাকিবে না। এ-বিষয় বর্ত্তমানে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

জনস্বাস্থ্য—শহর এবং গ্রাম

'বারাসত বার্ত্তা' গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা কয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানি না, কিন্তু বিষয়টি কখনই অবহেলার নহে। কলকারখানার শ্রমিক, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্ম্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় বহু কিছু করা হইয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব, কিন্তু যাহাদের পরিশ্রম-প্রচেষ্টার উপরেই দেশের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বহু কিছু নির্ভর করে, বাঙ্গলা তথা ভারতের সেই পল্লীবাসী চাষী, চাষী-মজুর এবং অন্যান্য অধিবাসীর জন্য কি এবং কতটুকু করা হইয়াছে, তাহা গবেষণার বিষয়। বারাসত বার্ত্তার প্রকাশিত গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য চিত্র সত্যই ভয়াবহ।

—মাঝে মাঝে দুই-একজন মহান নেতার মুখ হইতে এইরূপ অমোঘ সত্য বাহির হইয়া পড়ে যাহা কেবল সংবাদপত্রের মোটা হরফের শিরোনামার মধ্যেই ডুবিয়া যায়। কথা হইতেছে, গ্রামের হতভাগ্য নিপীড়িত মানুষের স্বাস্থ্য। গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা যে অন্ধকারে ডুবিয়া আছে তাহা প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের শিল্প-কারখানা অথবা খোদ সরকারের কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্য চিকিৎসার বিধিব্যবস্থার পার্শ্বে একবার গ্রামের অদৃষ্ট-বঞ্চিত ক্ষেত-মজুর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের শ্রমিকদের কথা চিন্তা করিলে বিধাতাপুরুষ লজ্জায় মুখ লুকাইবেন। গ্রামাঞ্চলের জেলা ও মহকুমা শহরে সরকারী হাসপাতাল আছে এবং থানা এলাকায় কিছু কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। কিন্তু হতভাগ্য গ্রামীণ মানুষের সমাজের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের শেষ নাই। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ধাপে ধাপে সুযোগ এবং খরচের এক কণামাত্র গ্রামীণ মানুষের উপর বর্ষিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত তাহাদের রোগাক্রান্ত সময়ের ছুটি ভাতা গ্রামের কর্ম্মী-সমাজের পক্ষে ঈশ্বরতুল্য কল্পনার বিষয়। গ্রামীণ কৃষীদের প্রতি উৎসাহ-বাণীর কমতি নাই যে কালে সেই সময়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে এই হেন ভাগ্য-বঞ্চিত মানুষের জীবনে বিশ্রাম আরোগ্য বলিয়া কোন শব্দ নাই। গ্রামের হতভাগ্য রোগাক্রান্ত মানুষের যেমন চিকিৎসার সুযোগ নাই তেমনি বিশ্রাম বা ছুটি নাই। ছুটি কি করিয়া থাকিবে? যেখানে রোজ মজুরির গোলামখানায় খাটিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয় অথবা নিজস্ব সামান্য জমিজমা চাষ-আবাদ করিয়া খাটিয়া খাইতে হয় সেখানে রোগশয্যায় সাধারণ চিকিৎসা করিবার ও হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধারের মত অবসর বা ছুটি কোথায়। গ্রামের অধিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খরচে চিকিৎসা করিতে হয়। গ্রামবিমুখ দেশের পাশকরা ডাক্তারেরা গ্রামে বসিবেন না; ইহা অপেক্ষা বড় ট্রাজেডি আর কিছুই নাই। সরকারের সাহায্য সুযোগ গ্রামবাসী পাইবে না, ডাক্তার পাইবে না, তবে জাতীয় স্বাস্থ্য খাতের অর্থ শ্রম গড়াইয়া পড়িতেছে কাহাদের জন্য? এই প্রশ্ন চিন্তা করা দরকার। গ্রামে গ্রামে পাশকরা ডাক্তার পাঠাইবার ব্যবস্থা সরকার অনায়াসে করিতে পারেন। মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির সময় গ্রামের ছাত্রদের সর্ব্বাগ্রে প্রবেশাধিকার দিলে এবং তাহাদের নিকট হইতে গ্রামে বসিয়া প্রাকটিশ করিবার অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ করা হইলে গ্রামের ছেলে গ্রামে বসিয়া গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করিতে পারে। এইরূপ ছাত্রের অভাব এই দেশে হইবে না। পরাধীনতার সময়ে এই দেশের বহু যুবক মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া স্বগ্রামে চলিয়া গিয়াছেন এবং দেশের সেবা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে চিকিৎসার নামে 'কোয়াক' বা হাতুড়ে ডাক্তারদের অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। একান্ত নিরুপায় অসহায় গ্রামবাসীরা ঘরের টাকা খরচ করিয়া এই হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসায় কপালগুণে কেহ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতেছে, কেহ ইহধাম ত্যাগ করিতেছে। ইহাই আমাদের গ্রামের চিকিৎসা! সরকারের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনা মোটামুটি ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং গ্রামের মানুষ ম্যালেরিয়ার কবল হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রামের জনস্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর

হার কমে নাই, সংক্রামক ব্যাধির মৃত্যুহার কমে নাই এবং জটিল ও কঠিন ব্যাধির মৃত্যুহার পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। কাজেই গ্রামবাসীদের ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে। সরকার অনায়াসে রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে দুইটি পৃথক ইউনিটে বিভক্ত করিতে পারেন। একটি ইউনিট শহর ও শিল্পাঞ্চলের, দ্বিতীয়টি গ্রামাঞ্চলে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টার অভাবে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য এক দুঃখজনক স্থানে আসিয়া গিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও বলা আবশ্যক যে, গ্রামের রোগীকে যদি বা কোনক্রমে শহরে আনা যায়—কিন্তু কলিকাতার সরকারী হাসপাতালে তাহাদের স্থান পাওয়া দূরের কথা, সামান্য পরিমাণ করুণা লাভ করাও পরম ভাগ্যের কথা। বলিতে দুঃখ হয়—এমন অনেক ডাক্তারবাবুর কথা শুনা যায় যাঁহারা গ্রাম-হইতে-আনা অত্যন্ত কঠিন রোগীকে দয়া করিয়া একবার চোখে দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। এমন মিলিটারী মেজাজের সার্জ্জন-ডাক্তারও আছেন বলিয়া শুনি যাঁহারা রোগীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া হাসপাতালের ওয়ার্ড হইতে বাহির করিয়া দিতেও লজ্জা-দ্বিধা বোধ করেন না! অথচ ইঁহারা সকলেই করদাতাদের টাকা হইতে বেতন ভোগ করিয়া থাকেন।

দেশে রোগীর অভাব নাই, অথচ, চোখের সামনেই দেখিতে পাই ই-এস-আই (Employees State Insurance) সংস্থা কর্ত্তৃক দখল-করা একটি সুখ্যাত-সুপরিচালিত বৃহৎ হাসপাতাল পূর্ব্ব কলিকাতায় গত তিন বছর প্রায় খালি পড়িয়া আছে—অথচ এখানে ৩৫০ জন রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়। সরকার বাহাদুর এখন 'লুপ' 'লুপ' করিয়া উন্মাদের মত বাড়াবাড়ি করিতে সদাব্যস্ত। অনাগতদের কল্যাণ চিন্তাতেই সরকার এবং সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ বর্ত্তমানে সর্ব্বসময়ে মগ্ন—কিন্তু এই ধরাধামে যাহারা ভুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, সেই শতকরা ৮৫ জনের চিন্তা করা কাহার কর্ত্তব্য—জানি না!

এই প্রসঙ্গে আরও বলিব যে প্রায় সকল হাসপাতালেই ফ্রি-বেড পাইতে হইলে মুরুব্বি থাকা প্রয়োজন—বিশেষ করিয়া সরকারী মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসার-শ্রেণীর মুরুব্বী। ফলে এমন সকল রোগী ফ্রি-বেড পায়, যাহাদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই হীন নহে। চিকিৎসার জন্য যাঁহারা মাসে পাঁচ-সাতশ' টাকা অনায়াসেই খরচ করিতে পারে। কলিকাতার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি বেসরকারী জেনারেল হাসপাতাল রোগী ভর্ত্তি বিষয়ে সত্যই উদার এবং এখানে দরিদ্র রোগী সেবা-যত্ন যথোচিত পায়।

আকা(-ঠ)শবাণী

বাঙ্গলায় সংবাদ প্রচার করিয়া থাকেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভীষণ-কণ্ঠ এবং একজন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠী। ভীষণ-কণ্ঠ যখন সংবাদ প্রচার করেন—তখন মনে হয় অবিলম্বে একটা ভূমিকম্পের মত কিছু ঘটিবে। এই ভদ্রলোকের যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি বাচনভঙ্গী—দুটিই ভীষণতা সৃষ্টি করে। আর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠী? সংবাদ প্রচার চলে প্রায় সুপারসনিক গতিতে—এবং ইঁহার কণ্ঠস্বর শ্রোতার কানে অসহ্য এক প্রদাহ সৃষ্টি করে। এই ভদ্র মহিলার বাচনভঙ্গি যেমন অদ্ভুত—কণ্ঠস্বরও তেমনি পীড়াদায়ক—ইঁহার উপর তাঁহার বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণও অদ্ভুত, বিচিত্র। বহু বাঙ্গলা কথার শুদ্ধ উচ্চারণ ইনি জানেন না, কিন্তু এই অজ্ঞানতা তিনি তাঁহার 'স্পীডে' ঢাকিয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন! বাঙ্গলা সংবাদ প্রচার কি এই ভাবেই অনাদিকাল ধরিয়া চলিবে? দেশে কি সুকণ্ঠ এবং বিচারবুদ্ধিযুক্ত শিক্ষিত ঘোষক-ঘোষিকার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে? দেখিয়া সত্যই অবাক হইতে হয় যে দেশের এই সঙ্কটকালেও বেতার কর্ত্তৃপক্ষ যথোচিত ভাবে সংবাদ প্রচারের আবশ্যকতা সম্পর্কে পরম নির্ব্বিকার। কতকগুলি প্রিয়-পোষ্য পালনই (সাধারণের টাকায়) কি বেতার-কর্ত্তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য?

কলিকাতা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বিচিত্রানুষ্ঠান' করা হইয়াছে এবং শ্রদ্ধেয় মোড়লের নাম ঘোষণাও বন্ধ হইয়া ছ। ব্যাপারটা হইয়াছে—'নূতন বোতলে পুরাতন মদ'। পল্লীমঙ্গল এবং মজদুর মণ্ডলীতে কাজের কাজ কি হইতেছে—কর্ত্তারাই জানেন। পল্লীমঙ্গল আসরের মোড়ল নামক ব্যক্তিটি সত্যই মজলিসী লোক। এই আসরে তাঁহার পরিষদ বা মোসাহেব নির্ব্বাচন-নিয়োগে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আসরে ভাঁড়ামো-ন্যাকামো আর কতকাল এই ভাবে চলিবে? মোড়লের প্রধান কাজ দেখা যাইতেছে ভগবান রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী-প্রচার।. এই সব বাণীতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু প্রায় প্রত্যহ অবশ্য বাণী প্রচারের

সার্থকতা কি? মোড়লের আর একটি কাজ—পল্লী-বাসীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাহাদের মানুষ করা। তাঁহাকে এই বিষম কাজের ভার কে দিয়াছে জানি না। মোড়লের কণ্ঠে ধর্ম্ম এবং নীতিবাণী প্রচার অহরহ চলিতেছে, যাহার ফলে শ্রোতার একটা অরুচির ভাব জাগিয়াছে। মোড়লের সাধ সুবক্তা হইবার, কিন্তু তাহা হইবার মত কণ্ঠস্বর, এবং বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার আছে কি না জানি না। অনেক শ্রোতার এখন মনে হইতেছে যে কলিকাতা আকা(-ঠ)শবাণীর আসরগুলির পরিচালকদের নিয়মিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এক বা বড় জোর দুই বৎসরের অধিককাল এক ব্যক্তি কোন আসরের পরিচালক থাকিতে পারিবেন না—এই নিয়ম এখন অত্যাবশ্যক। এইরূপ করিলে আকাশবাণীর একঘেঁয়েমি কিছুটা দূর হইতে পারে। আসর-পরিচালক নিয়োগের জন্য যথাযথ বিজ্ঞাপন দিয়া প্রার্থী ডাকিয়া উপযুক্ত পরীক্ষার পর, নিয়োগ হওয়া উচিত। এক বা দুই জনের খেয়ালখুশীর উপর কোন নিয়োগের ক্ষমতা থাকার অর্থই ক্ষমতার অপব্যবহার! কিন্তু আমরা বৃথাই এত কথা বলিতেছি—কারণ বেতারকর্ত্তৃপক্ষ শ্রোতাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই শুনাইবেন, শ্রোতা বা সাধারণের কথা শুনিবার দায় তাঁহাদের নাই—অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইলে আলাদা কথা। আর একটি কথা—বেতারে সরকারের নির্জ্জলা প্রশংসা প্রচারে হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হইতেছে।

তকদীর

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

আমার আট বছরের মেয়ে সুনু ছুটে এসে বলল, "বাবা, তোমার রাজবাড়ীর নেমনতন্ন পত্র এসেছে। দুপুর বেলা, বসে বসে নভেল পড়ছিলাম, বইখানা রেখে দিয়ে সুনুর হাত থেকে চিঠি নিলাম, আড়াআড়ি দুখানা তলোয়ারের মনোগ্রাম ছাপা নীল রংএর খাম। এই খামখানা এবাড়ীর সবাই চেনে, প্রত্যেক বছর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এই খামে করে আমার কৈশোরের বন্ধু মোহনপুরের জমিদার লছমীনারায়ণ সিংএর জন্মোৎসব উপলক্ষে নেমনতন্ন চিঠি আসে, এবারেও এলো। সুনু বলল, "বাবা, মোহনপুরের রাজবাড়ীর ফটকটা কত উঁচু বল না?" কতবার যে সুনুকে এই উচ্চতার হিসেব দিয়েছি তার অন্ত নাই, আজ আবার দিলাম, বললাম, "হাওদার উপরে রূপোর সিংহাসন, সেই সিংহাসনের মাথায় সোনার ঝালর লাগান মস্ত ছাতা, এই নিয়ে একটা হাতী সেই ফটকের ভেতর দিয়ে চলে যায়, বুঝে দেখ কত উঁচু!" সুনু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "বাপরে, কত উঁচু।"

কেবল সুনু নয়, সুনুর মা, সুনুর দাদাও মোহনপুরের জমিদারের কথা শুনতে ভালবাসে। কতবার বলেছি সে গল্প। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম মোহনপুরের জমিদারের ছেলে লছমীনারায়ণ আর আমি। ওদের পূর্বপুরুষ রাজা ছিল, ঐশ্বর্য, চালচলন এখনও সেই রকম। আমাদের দু'জনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। প্রত্যেক বছর জানুয়ারী মাসে লছমীনারায়ণের জন্মদিনে আমাকে নেমন্তন্ন করত, বাদ্যি-বাজনা, খাওয়াদাওয়া, রাত্রে বাজিপোড়ানো, সে এক ইলাহীকাণ্ড হ'ত। লছমীনারায়ণের বাবা মারা গেলেন, লছমীনারায়ণ তক্তে বসল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সে আর পড়ল না. আমি কলেজে পড়তে কলকাতা চলে এলাম, দূরত্ব বাড়ল, বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট থাকল। বাহিরের যোগাযোগ অনেক দিন থেকেই বন্ধ, লছমীনারায়ণ বেহারে, আমি বাংলায়, এখন কেবল মনের যোগটুকু আছে, আগেকার মত প্রত্যেক বছর লছমীনারায়ণের জন্মদিনের নেমন্তন্ন পত্রটিও আসে।

সুনুর মা শুয়েছিলেন, উঠে এসে বসলেন, বললেন, "নেমন্তন্ন চিঠি এসেছে বুঝি? হ্যাঁ গো, চারটে হাতী ছিল ওদের, নামগুলো বল না, ভারি সুন্দর সুন্দর নাম।" বললাম, "চারটে কেন, আরও বেশী হাতী ছিল, তবে চারটে ছিল খুব বড়, একটার নাম নাগাদিত্য, একটার নাম পর্বত, একটার নাম গুলবী, একটার নাম সুন্দরী।" হাতীর নাম গুলবী অর্থাৎ গোলাপী আর সুন্দরী শুনে সুনু প্রত্যেকবার হেসে লুটিয়ে পড়ে, আজও হেসে লুটিয়ে পড়ল। তার মা বললেন, "ও দুটো মেয়ে-হাতীরে, তার উপরে জমিদারের আদুরে, তাই অমন নাম। তোর মেজপিসীর ছোট মেয়ের নাম যদি লতিকা হয় তা হ'লে···।" কথাটা শেষ হবার আগেই আবার সুনু হেসে লুটিয়ে পড়ল।

রেডিও শুনছিল খোকা, কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পাই নি। সুনুকে ধমক দিয়ে বলল, "থাম, অত হাসিস নে। বাবা, বাঘ মারার গল্পটা বল না, লছমীনারায়ণের বাবা রাজা রামনারায়ণ সিং কেমন করে তলোয়ার দিয়ে সামনাসামনি লড়াই করে বাঘ মারতেন।" হ্যাঁ, বলবার মত কাহিনী বটে, অনেকবার বলেছি, আবার বলতে শুরু করলাম। রামনারায়ণ ছিলেন জবরদস্ত জমিদার আর মস্তবড় বীর, দুহাতে দুখানা তলোয়ার ভাঁজতে পারতেন। সে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা, তখন বেহারের পুব-দক্ষিণ দিকটায় ছিল ভীষণ জঙ্গল, বাঘও ছিল খুব। তাঁর জমিদারীতে বাঘের খবর পেলেই তিনি শিকারে বেরোতেন। বন্দুক দিয়ে কেউ বাঘ মারলে বলতেন, "ও ত ঔরতেও পারে।" বাঘের সন্ধান এনে দিলে তিনি মালকোঁচা মেরে তলোয়ার হাতে এগিয়ে যেতেন, সামনাসামনি গিয়ে হাঁক দিতেন, "আও শেরকে বাচ্চা।" শেরের বাচ্চা ত শেরই, বনের রাজা, যাকে তোমরা বল Royal Bengal Tiger, এক থাপ্পড়ে একটা মস্ত মোষ কাত করে ফেলে, সেই শের যখন গর্জন করে লাফিয়ে পড়ত তখন তিনি "জয় ভগবতী মাই" বলে তলোয়ার চালাতেন। শুনেছি একবার মাত্র তিনি জখম হয়েছিলেন, তাছাড়া প্রত্যেকবার বাঘ মারা পড়েছে। আগেকার জমিদাররা ছিল অন্য রকম, যেমন বাবুয়ানা করত, তেমন লাঠিবাজিও করত। "বাবুয়ানা বলে বাবুয়ানা", বললেন সুনুর মা, "তুমি যে বল রাজাসাহেব

সোনার আলবোলায় অন্দরমহলে বসে যখন তামাক খেতেন তখন কাছারিবাড়ীর লোক তার গন্ধ পেত।" আমি বললাম, "হ্যাঁ পেত, কতবার আমি নিজে পেয়েছি।" খোকা পেছন থেকে বলল, "আর রাজাসাহেবের একপাটি নাগরা জুতোর দাম যেন কত হাজার টাকা!" বললাম, "অনেক দাম, দিল্লীর বাজার থেকে তৈরী হয়ে আসত, তাতে সাচ্চা জরির কাজ থাকত।"

সুমু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বেশীক্ষণ সে চুপ করে থাকতে পারে না, বলল,"রাজবাড়ীর দাসীদের পায় এক এক সের ওজনের রূপোর মল, তাই না বাবা?" মাথা নেড়ে তার কথার সত্যতা স্বীকার করলাম। সুমুর মা মন্তব্য করলেন, "তারা চলত কেমন করে?" বললাম, "অভ্যাস। রাজবাড়ীর মেয়েদের গায় থাকত ঐ রকম ভারি ভারি গহনা, কিন্তু সে সব সোনার। ও দেশের রইস আদমীরা ঠুনকো জিনিষের পক্ষপাতী নন।" "ও বিষয়ে ওদের রুচিই ভাল", রায় দিলেন সুমুর মা।

কথায় কথায় এতক্ষণ চিঠিখানা খোলা হয় নাই, এইবার খুলে পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার মুখের চেহারা নিশ্চয় খুব বদলে গিয়েছিল তাই উপস্থিত সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "চিঠিতে কি আছে?" চিঠিখানা দুতিন বার পড়ে ফেললাম, তার পরে জবাব যা দিলাম তা শুনে পুরো এক মিনিটকাল কারু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তার পরে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সুমুর মা বললেন, "ও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" খোকা বলল "দাও চিঠিখানা আমার হাতে, আমি পড়ে দেখি।" সুমু বলল, "বাবা, তামাশা ক'রো না, সত্যি করে বল।" বললাম, "সত্যিই বলছি লছমীনারায়ণ কলকাতা এসেছে, তার স্ত্রীর অসুখ, চিকিৎসার জন্যে মাসখানেক হ'ল বাড়ীভাড়া করে পার্ক-সার্কাসে আছে। ঠিকানা দিয়েছে ১০৯ নম্বর কাদেরী-সাহেবের ষ্ট্রীট।" চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিয়ে সবাই পড়ল, অবিশ্বাস করবার আর অবকাশ থাকল না। সুমুর মা বললেন, "নিশ্চয় মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া করেছে, পার্ক সার্কাসে বড় বাড়ীর অন্ত নাই। অতবড় জমিদারের সঙ্গে লোকজনও থাকবে অনেক।" সুমু প্রশ্ন করল, "বাবা, দু-একটা হাতী আসবে না?" বললাম, "হাতী-ঘোড়া আসবে না, তবে মোটর দুতিনখানা আসবেই, আর খাস ঝি চাকর, সেও ত কম নয়।" সুমু কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করল, "তুমি নেমন্তন্ন খেতে যাবে তা হলে?" বললাম, "যাব। বছর বছর নেমন্তন্ন করে, যেতে পারিনে, এবার এত কাছে এসেছে, যেতেই হবে। পুরণো বন্ধুকে দেখে আসি, আবার বেহারে ফিরে গেলে আর কোনদিন দেখা হবে বলে মনে হয় না।" কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে সুমু হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি রাজাসাহেব রাণীসাহেবকে দেখব, বল, নিয়ে যাবে?" সুমুর মা গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা কেমন করে হবে।" মাথা নেড়ে সুমু বলল, "কেন হবে না, রাজা-সাহেব হলে কি হয়, বাবার বন্ধু ত। বল বাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?" সুমুর সব আবদারই রক্ষা করেছি, আজও করলাম, বললাম, "নিয়ে যাব।"

লছমীনারায়ণের জন্মদিন এসে পড়ল। বিকেলবেলা যাব, দুপুর থেকেই সুমুর সাজগোজ আরম্ভ হ'ল। কত ফ্রক পরা হ'ল কত খোলা হ'ল, কতভাবে চুল বাঁধা হল' যখন শেষ ফিতেটি বাঁধা হ'ল তখনও তার খুঁতখুতি গেল না।

চারটে বাজতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পার্ক-সার্কাসের বহু নতুন রাস্তার গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চললাম। কাদেরীসাহেবের ষ্ট্রীট জানা ছিল না, পথে গাড়ি দাঁড় করে খবর নিয়ে জানলাম সেটা বেশী দূরে নয়, প্রথম বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে খানিক দূর গিয়ে ডান দিকেই কাদেরীসাহেবের ষ্ট্রীট। চললাম বাঁ দিকে ঘুরে, একটু পরে কাদেরীসাহেবের ষ্ট্রীটের মুখে এসে পড়লাম। রাস্তা তেমন চওড়া নয়, ঢুকেই দেখলাম দূরে একটা মস্ত নতুন বাড়ী, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সিধে তার গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম। গলা বাড়িয়ে দেখলাম বাড়ীর নম্বর ৪৮। ঘুরে গেলাম আর একটা মোড়। ডানদিকে আর একটা বড় বাড়ী, ১০৯ নম্বর হবে বলেই মনে হ'ল, কিন্তু সামনে গিয়ে দেখি সেটা ১০২। ১০৯ নম্বরের বাড়ী আর সাত-খানা বাড়ীর পরেই কিন্তু সেখান থেকে যতদূর দেখা যায় দু'দিকে বড় বাড়ী একখানাও নাই। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে খানচারেক বাড়ী পার হয়েই দেখি একটা সরু গলি। ছোট গলি, বেশীদূর এগোয় নি, যদি ১০৯ নম্বর কোন বাড়ী থেকে থাকে তা হলে তা এই গলিতেই হবে। ঠিক, না দেখতে ভুল করেছি ভেবে পকেট থেকে লছমীনারায়ণের চিঠিখানা বার করে ঠিকানাটা আবার দেখলাম, না, ভুল ত হয় নি, ১০৯ নম্বর কাদেরীসাহেবের ষ্ট্রীট স্পষ্ট লেখা আছে। গাড়ি সেখানে রেখে সুমুকে সঙ্গে নিয়ে গলি ধরে এগোতে লাগলাম। ডানদিকে ১০৬, বাঁ-দিকে ১০৭, ডানদিকে ১০৮, বাঁদিকে, না, হতেই পারে না, অতি পুরণো ছোট একতলা একটা বাড়ী। সুমু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল "বাবা, ঐ দেখ।" দেখলাম দরজার গায় লেখা রয়েছে ১০৯।

ছেলেবেলায় লছমীনারায়ণ রহস্যপ্রিয় ছিল। ভাবলাম বয়স বাড়লেও তার রহস্যপ্রিয়তা কমে নি, তা না হলে

পুরোনো বন্ধুকে কেউ এমন বোকা বানায়! ফিরে যাবার আগে ১০৯ নম্বর বাড়ীর কড়ায় একটা নাড়া দিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল। এগিয়ে গিয়ে দরজায় একটা ঠেলা দিলাম, পাল্লা দু'টা ফাঁক হয়ে গেল। আর এ বাড়ীর লোককে বিরক্ত করে কি হবে, ফিরে যাই ভাবছি, এমন সময় চোখ পড়ল ভিতরের আঙিনায়, দেখলাম সেখানে একখানা চারপাইএর উপর উবু হয়ে বসে একটা লোক সিগারেট টানছে। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে সে ফিরে তাকাল, দেখলাম, শীর্ণ একখানা ফরসা মুখ, নাকের নীচে ছোট্ট একটু পাকা গোঁফ। আমাকে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে চেঁচিয়ে বলল, "আরে, কৌন হৈ, উপেন্দর!" তার পরে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। দুই চোখ মেলে দেখলাম আমার জমিদার-বন্ধু রাজাসাহেব লছমীনারায়ণ সিংকে। বিস্ময়ের ভাবটা কতক্ষণ থাকত বলতে পারি না, লছমীনারায়ণ সেটা ভেঙে দিয়ে আমার হাত ধরে বলল, "উপেন্দর, দোস্ত, ভিতরে আয়।" পাশে সুনুকে দেখে বলল, "তোর লড়কী নিশ্চয়।" আর এক হাতে সুনুর হাত ধরে সে আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকল। সেখানে একখানা তক্তপোশের উপর শতরঞ্জি পাতা, মাঝখানে একটা ওয়াড়হীন তাকিয়া। "বোস" বলে সে আমাদের ঠেলে দিয়ে নিজেও উঠে বসল।

কিছু একটা বলা উচিত কিন্তু কি যে বলব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার বলার আগেই লছমীনারায়ণ কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বলল, "আমি জানতাম তুই নিশ্চয় আসবি। উপেন্দর, কেমন আছিস্ দোস্ত!" সূত্র পেয়ে বললাম, "ভাল আছি—তুমি?" প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে হাসতে লাগল। এমন সময় দরজার পাশ থেকে একখানা মুখ উঁকি মারল। লছমীনারায়ণ হাঁকল, "আরে দুলারীকী মাই, ভিতরে খবর দে উপেন্দরের লড়কী এসেছে, আর বচ্চাকে সেখানে নিয়ে যা।" মাথায় ঘোমটা টেনে ভিতরে এসে দাঁড়াল দুলারীকী মাই। সুনু তার পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তার কানে কানে বললাম, "যাও ওর সঙ্গে।" নিঃশব্দে সুনু উঠে গেল।

এতক্ষণে খানিকটা সম্বিত ফিরে এসেছে। বললাম, "ভাই লছমী, কিছুই যে বুঝতে পারছি না। মানুষ খুন-টুন করেছ নাকি, তাই এই ভাবে লুকিয়ে আছ?" শুনে হেসে উঠল লছমীনারায়ণ, বলল, "আরে না, না! তা হ'লে কি আর তোকে খবর দিতাম।"

—তবে কি হয়েছে বল?

—ওরে বোকা, দেখে বুঝতে পারছিস্ না, আমি গরীব হয়েছি।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে?" কপালে হাত দিয়ে লছমীনারায়ণ বলল, "তকদীর। সরকারের কৃপায় জমিদারী গেলেও কিছু সম্বল ছিল, লোকে যেমন বলে মরা হাতী লাখ টাকা। কিন্তু বাড়ী নিয়ে শরিকের সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে যে মোকদ্দমা হ'ল তাতেই তার বার আনা বেরিয়ে গেল। ভাবলাম, বসে বসে না খেয়ে একটা ব্যবসা করি। একজন মারোয়াড়ী পার্টনার জুটলো, পাকা ব্যবসাদার, হিসেব করে দেখিয়ে দিল দু'লাখ টাকা হাতে নিয়ে বাজারে নামলে বছর না ঘুরতে দশ লাখ হয়ে যাবে। ভাবলাম পূর্বপুরুষ এক রাজত্ব গড়েছিলেন তার ত অবসান ঘটল, আমি যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি রাজত্ব গড়তে পারি মন্দ কি! হুকুমচাঁদের সঙ্গে কাজ শুরু করলাম। ব্যবসা ভালই চলতে লাগল। মাস ছয়েক পরে একদিন হুকুমচাঁদ এসে বলল, "রাজাসাহেব, কারবার ফেল পড়েছে। শুনে ত আমি অবাক, এমন ভাল কারবার হঠাৎ কেমন করে ফেল পড়ল! হুকুমচাঁদ কাগজপত্র এনে দেখিয়ে দিল গত তিন মাস ধরে লোকসানের উপর লোকসান হয়েছে, পুঁজি উড়ে গেছে, দেনা হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। রাজবাড়ীর অংশ আর গহনাপত্তর বেচে দেনা শোধ করলাম, তার পরে রাণীর হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালাম।"

ভাবছি, কি বিচিত্র এই পৃথিবী! এমন সময় এক হাতে একখানা প্লেট আর এক হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল দাসী, দুলারীকী মাই। আমার সামনে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল। "একটু মুখে দে", বলল লছমীনারায়ণ। প্লেটে ছিল একটা লাড্ডু, একখানা গজা, আর কিছু ডালমুট। এ তিন বস্তুর কোনটাই আমার পেটে সয় না, তবু প্লেট পরিষ্কার করে খেয়ে ফেললাম।

খানিক পরে সুনু ভিতর থেকে ফিরে এল। লছমীনারায়ণকে বললাম, "আজ তবে উঠি ভাই।" সে বলল, "এখনই যাবি! আচ্ছা যা, তুই কাজের লোক। আমি ভাই এই সপ্তাহেই দেশে ফিরে যাব।" সঙ্গে এসে আমাদের গাড়িতে তুলে দিল লছমীনারায়ণ।

গাড়িতে একটি কথাও বলে নি সুনু। বাড়ী পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেই সে ছুটে উপরে চলে গেল। আমি যখন উপরে এসে পৌঁছলাম, পাশের ঘরে শুনলাম সুনুর গলা, বলছে, "মা, বাবা সব মিছে কথা বলেছে।"

আসরের গল্প

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(৪) শেষের গান।

দাশরথি রায়ঃ

স্বনামধন্য পাঁচালিকার দাশরথিরও মৃত্যুর পূর্বে গানের কথা শোনা যায়। তবে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কিংবা হালিসহরের রামপ্রসাদ সেনের মতন তা মৃত্যুর অব্যবহিত আগে হয়ত নয়, যদিও দাশরথির সেই গানের প্রসিদ্ধি আছে তাঁর গঙ্গাযাত্রা করবার পরে এবং গঙ্গাতীরে অবস্থান করবার সময়ে। রামশঙ্কর মৃত্যু একেবারে আসন্ন জেনে জননীর কাছে শেষ নিবেদন জানিয়েছিলেন স্বরচিত গানে। রামপ্রসাদ শ্যামাপূজার বিসর্জনের সময়ে আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প করে ইষ্টদেবীকে সঙ্গীতাঞ্জলি দিয়েছিলেন মৃত্যু বরণ করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

কিন্তু দাশরথির ক্ষেত্রে তাঁর শেষ সঙ্গীতের প্রসঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর গান উক্ত দু'জনের মতন মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে হয় নি, তার কিছু আগে। তার অন্তিমকাল যে তাকেও বলা যায় তা সে প্রসঙ্গ আলোচনার সময় বোঝা যাবে। এখানে আরও একটি কথা বলে' রাখা দরকার। দাশরথির এই গঙ্গাযাত্রা করা অবস্থায় শেষ গান রচনা বা গাওয়া নিয়ে দু'মত আছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে গানের কথা প্রবাদ মাত্র, বাস্তব ঘটনা নয়। এবং অন্য মতে, তা সত্যই ঘটেছিল। দুটি মতেরই সমালোচনা করে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে যথাস্থানে।

আপাতত দাশরথির মৃত্যু সময়ের কথা স্থগিত থাক। মৃত্যু আসবে, মৃত্যুর প্রসঙ্গও আসবে জীবনের শেষে। আগে জীবনের কথা। অর্থাৎ দাশরথির সঙ্গীত-জীবনের কথা। তাঁর কবিগান ও পাঁচালির পালা রচনা এবং পাঁচালি গানে তাঁর অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টির কথা। তাঁর নাটকীয় জীবন। আকা বাইকে নিয়ে তাঁর জীবনের সেই এক অধ্যায়।

আকা বাই ও কবিয়াল দাশরথি। প্রথম যৌবনে দাশু রায়ের সেই কবিগানের পর্ব। পাঁচালিকার দাশরথির তখনও আবির্ভাব ঘটে নি। তখন তিনি মেতেছিলেন কবিগান রচনায়। আর তার উপলক্ষ্য—আকা বাইঃ অক্ষয়া বাইতিনী। বল্‌তে গেলে, অক্ষয়ার জন্যেই দাশরথি কবিগান নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন আর তারই জন্যে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন কবির দল। তারপর তাঁর শিল্পীসত্তার নব জন্ম। সারা বাংলায় বিখ্যাত তাঁর পাঁচালির পালাগান রচনা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

তার আগে কবিয়াল দাশু রায়। তাঁর সহজাত কবিত্ব-শক্তি কবিগানকে আশ্রয় করেই প্রথম প্রকাশ পায়। তখন তাঁর নিতান্ত তরুণ বয়স। ...

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে বাঁধমুড়ায় তাঁর পৈত্রিক নিবাস। তাঁর বাল্যকাল থেকেই বাস ছিল মাতুলালয় পীলা গ্রামে। এখানে তিনি উত্তরজীবনেও স্থায়ীভাবে ছিলেন।

পীলাতেই তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা খুব বেশি না হলেও, মুখে মুখে রচনা করবার ক্ষমতা তাঁর অল্প বয়স থেকেই লক্ষ্য করে পীলার সকলে। আর সেই প্রথম বয়স থেকে কবিগান তাঁর মন টানে। তিনি যোগ দেন কবির দলে।

তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা কিন্তু তাঁকে এ ব্যাপারে সুনজরে দেখেন নি, দেখবার কথাও নয়। কারণ কবির দলের রুচি প্রবৃত্তি অনেক সময়েই মার্জিত হ'ত না। সেজন্য তাদের জনপ্রিয়তা থাকলেও সামাজিক মর্যাদা প্রায়শই দেখা যেত না, বলা যায়। তাই দাশরথির অভিভাবক ও আত্মীয়েরা অনেক চেষ্টা করেন তাঁর কবির দলের আকর্ষণ রোধ করতে। কিন্তু তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি কবিগান নিয়ে মাতলেন।

কবিগানের তখন স্বর্ণযুগ। প্রায় সব দিকপাল কবিয়ালই তখনও বাংলার রস-পিপাসা তৃপ্ত করছেন আসরে আসরে। হরু ঠাকুর বৃদ্ধ হলেও একেবারে অবসর নেন নি। রাম বসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী বণিক এবং আরো জনকয়েক সুপ্রসিদ্ধ কবিয়াল তখনও আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন। দুর্গোৎসবের মণ্ডপে, পূজা-

পার্বণে কবির লড়াই তখন উৎসবের প্রধান অঙ্গ। কবিগানের জনপ্রিয়তার তখন সীমা নেই। এবং কবির লড়াই উপলক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রায় নিরক্ষর লোকও স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির প্রেরণায় কবিয়াল হয়ে উঠেছে, দেখা গেছে। এ সেই সময়ের কথা।

কবিগানের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ দাশরথির পীলা গ্রামেও এসে পৌঁছেচে পীলাতে নীলকণ্ঠ হালদার নামে এক গ্রাম্য কবিয়াল তখন বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ওই অঞ্চলে কবিগানের জন্যে। কিন্তু তাঁর পুঁজি বড় অল্প ছিল। শ্লীলতাবর্জিত ভাব ও ভাষায় কিছু কিছু অনুপ্রাস যোগ করে নীলকণ্ঠ হালদার নহর বলে দীর্ঘ ছন্দের গান রচনা করতেন এবং তা শুনেই মুগ্ধ ছিল সে অঞ্চলের শ্রোতারা।

তাই দেখে দাশরথিও কবিগান রচনা আরম্ভ করলেন। ওই ধরনের নহর, টপ্পা আর কবির ছড়া। তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ছাপ এই একটি ছিল—অনুপ্রাসের আধিক্য। উত্তরজীবনে যখন তিনি পাঁচালিকাররূপে স্বনামধন্য হয়েছেন, তখনও যেমন তাঁর কথায় কথায় অনুপ্রাস, প্রথম জীবন থেকেই তাঁর রচনায় সেই অনুপ্রাসের ঘটা দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ হালদারের দৃষ্টান্তে এবং সেই গ্রাম্য পরিবেশে দাশু রায়ের তখনকার রচনাও গ্রাম্যতাদুষ্ট অর্থাৎ অমার্জিত, অশ্লীল হয়ে দেখা দেয়। শুধু রচনায় শ্লীলতার অভাব নয়, তাঁর ব্যক্তিজীবনও অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল এই সময়। একটি সমাজ-বর্জিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর জীবন আবর্তিত হল এবং তা কবিগান উপলক্ষ্য করেই। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে যে কবির দল ত্যাগ করাবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন, তারও কারণ ওই নারী।

নাম তার অক্ষয়া বায়তিনী বা বাইতিনী। এই বাইতি জাতি ছিল আগেকার পেশাদার বাদ্যকর সম্প্রদায়ের ধারা। অক্ষয়া বাইতিনীর নাম মুখে মুখে আকা বাই হয়ে যায়। বাঈজী অর্থে বাই নয়। তবে অক্ষয়ার সামাজিক বন্ধন একেবারেই ছিলনা। বিয়ে তার হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বামীর ঘর করে নি সে।

সেসময় পীলায় এক রেশম কুঠী ছিল। সেখানকার ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই একজন বলে গণ্য হ'ত অক্ষয়া। তবে তার আর এক পরিচয় ছিল এবং সেজন্যেই তার রীতিমত প্রসিদ্ধি হয়েছিল ওই অঞ্চলে। অক্ষয়া তারই মতন আর কিছু মেয়েমানুষ আর কয়েকজন পুরুষ নিয়ে এক কবির দল করেছিল। আর এই কবিগান উপলক্ষ্য করেই দাশু রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ও যোগাযোগের সূত্রপাত।

দাশরথি তখন অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি করে কবিগান বাঁধছেন, ছড়া কাটছেন। নিতান্ত তরুণ বয়স। নীলকণ্ঠ হালদারের দেখাদেখি অশ্লীল, মুখরোচক রচনার দিকে ঝোঁক। এমন সময়ে হাবভাব-পটীয়সী ভ্রষ্টা-চরিত্রা আকা বাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল। কৃশ, দীর্ঘাকৃতি, আয়ত চক্ষু, সদা-হাস্যমুখ, সুকণ্ঠ বাঁধনদার দাশু রায় যোগ দিলেন অক্ষয়া বাইতিনীর কবির দলে।

আকা বাই দাশরথির চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু বড়। প্রথমে কিছু লজ্জাসঙ্কোচ ছিল দাশু রায়ের। গোড়ার দিকে গোপনে আকার বাড়ী যেতেন। কিন্তু তাতেও কানাকানি আরম্ভ হ'ল গ্রামে। পরে তিনি প্রকাশ্যেই আকার বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। নিন্দা অপযশ কিছুই আর দাগ কাটতে পারলে না তাঁর মনে। আত্মীয়-স্বজনদের তিরস্কার, সামাজিক বর্জনের ভীতি প্রদর্শন সব কিছুর একেবারে বাইরে চলে গেলেন, অন্ধ যৌবনের তাড়নায়।

অক্ষয়ার কবির দলে দাশু রায় গাঁথনদারের পদ নিলেন। প্রকাশ্য আসরে আকার সঙ্গে বসতে লাগলেন। নানা পূজাপার্বণে, নানা জায়গায় তার সঙ্গে যাতায়াত আরম্ভ করলেন তার কবিগানের দলের প্রধান পুরুষ হয়ে। গ্রামে তাঁর নামে ঢি ঢি পড়ে যায়। কিন্তু দাশরথির ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের নিয়ে প্রকাশ্য আসরে তিনি গাঁথনদারের কাজ করে চললেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তাঁদের কবির দলে আসরের সামনের দিকে থাকত দু'তিনজন রমণী আর তিন চার জন পুরুষ; পেছন দিকে দশ-বারো জন চোয়ার জাতের পুরুষ। আর দাশু রায়ের কাজ হল এদের মধ্যে একবার সামনে একবার পেছনে আনাগোনা করে, যারা গান গাইবে তাদের কাণে কাণে কথার জোগান দেওয়া।

অক্ষয়াই এই কবির দলটি গঠন করে এবং এর স্বত্বের অধিকারিণীও সে। টাকা-কড়ির বিষয়ে আকা বিলক্ষণ হুঁশিয়ার। দাশু রায় গাঁথনদার হওয়ার ফলে দল বেশ জমে ওঠে, অনেক জায়গা থেকে বায়না আসতে থাকে। কিন্তু লাভের ভাগ পেতেন না দাশরথি। তিনি শুধু নিজের খরচ বাবদ সামান্য কিছু পেতেন এবং তাইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কবিয়ালরূপে নিজের আত্মপ্রকাশেই নিমগ্ন থাকতেন তিনি।

অক্ষয়ার কবির দলে দাশরথি প্রথম দিকে ছড়া বলতে পারতেন না। ছড়া কাটবার জন্যে তাই টাকা দিয়ে লোক আনা হত বাইরে থেকে। কিন্তু তারপর কিছু-

দিনের চেষ্টাতেই দাশু ছড়া বলার রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠলেন। কবিয়াল হিসেবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল।

কিন্তু সামাজিকভাবে তিনি প্রায় একঘরে হয়ে পড়লেন অক্ষয়ার দলে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই। গ্রামের সব ভদ্রলোকেরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। আত্মজনেরা ধিক্কার দিতে লাগলেন, পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আকার দল ছেড়ে চলে আসবার জন্যে। কিন্তু দাশরথি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কারণ অক্ষয়ার প্রতি মোহের সঙ্গে তাঁর কবিচর্চার প্রসঙ্গও এখানে ছিল। আকার দলে থেকে সমাদর আর কবিচর্চা অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। কবিগানের চর্চায় তাঁর প্রতিভা তখন দিন দিন স্ফূর্তিলাভ করছে। ক্রমে কবির-টপ্পা আর ছড়া রচনায় তিনি সুনিপুণ হয়ে রীতিমত প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন।

কবিয়ালরূপে তাঁর সৃজনীশক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। তিনি কবির দলে সৃষ্টি করলেন একটি নতুন পদ্ধতি। আগে টপ্পা গানের পরে চোপ বলে ছড়া বলার প্রথা ছিল। তিনি নতুনত্ব এই করলেন—কৃত্তিবাসের রামায়ণের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে তাঁর নিজস্ব অনুপ্রাস যোগ করে আসরে দাঁড়িয়ে নিজে বক্তৃতা করতেন আর তাঁর পেছনে থেকে ধুয়া গাইত কয়েকজন মিলে। এর কথাগুলি অবশ্য প্রায়ই অশ্লীল ভাষায় হ'ত। কিন্তু তাঁর এই ছন্দে বক্তৃতা আর তার সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে ধুয়া আসরে এমন উদ্দীপনা সঞ্চার করত, যে, অচিরেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই কবির দল।

এই অশ্লীল টপ্পা ছাড়া আরও এক কারণে দাশু রায় বিখ্যাত হন। তাঁর সখী সংবাদের গান ও ছড়া শুনে উচ্ছ্বসিত হ'ত ভক্তিমান শ্রোতারা, এমন ছিল সেসবের আবেদন।

মোট কথা, দাশরথির প্রতিভার গুণে অক্ষয়ার কবি গানের দল সুবিখ্যাত হয়ে উঠল! দাশুরও পদোন্নতি ঘটল দলের মধ্যে। কবির বই নিয়ে গায়কদের কাণে কাণে কথা বলে দেবার ভার গুরুদাস ঘটক নামে এক-জনের ওপর দিয়ে, আসরে প্রদীপের সামনে বসে কবির লড়াইয়ের উত্তর লেখা, প্রশ্ন ও সমস্যা রচনা ইত্যাদি আর গায়কদের উপদেশ দেওয়া—এই হ'ল তাঁর কাজ। তাঁর কবিত্ব ও রচনা শক্তি এবার পূর্ণতর প্রকাশের পথ পে'ল। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল তাঁর কবিসত্তার।

কিন্তু আর একদিক থেকে তাঁর জীবনে, তাঁর কবিয়াল জীবনে গভীর সঙ্কট ঘনিয়ে এল। এবং তার ফল ও পরিণতিস্বরূপ তাঁর শিল্পীজীবনের নতুন রূপান্তর। অক্ষয়ার দল; কবির লড়াই সব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তারপর পাঁচালির দল গড়া। এখন সেই সব কথা।

আকা বাইয়ের কবির দলে থেকে দাশরথির তখন খুবই জনপ্রিয়তা হয়েছে। কিন্তু কবির লড়াইয়ে ওই অঞ্চলে তিনি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না, সে সময়েও। তাঁর দু'জন প্রবল প্রতিযোগী ছিলেন—কালিকাপুরের পুরুষোত্তম বৈরাগী ও জামূড়ার নিধিরাম। কবির আসরে তাঁরা তিনজনই পরস্পরকে আক্রমণ করে নিজের নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। দাশু রায়ের অসামান্য প্রতিভা হলেও সব সময় তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর জয়লাভ করতে পারতেন, তা নয়। কোন আসরে হয়ত জিততেন, তারপর অন্য আসরে ঠকে যেতেন, পরে আবার কোন আসরে শোধ নিতেন। এমনিভাবে চলত তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কবির লড়াই।

যেমন একদিন পুরুষোত্তম বৈরাগীর পক্ষে দলের রাধামোহন দাস বৈরাগী সভায় অঙ্গভঙ্গি করে পুরুষোত্তমের একটি ছড়া আরম্ভ করলে—

আমার গানের গুরু কল্পতরু হরুর তুল্য গণি।
হা রে পাগল হয়েছিস ছাগল বধ্যে আসরে নামবেন তিনি।
আজ মোষ কাটব বলে আমি খাঁড়ায় দিলাম বালি,
আসরে এসে দেখি দেশো পুড় কুমড়ার জালি॥

রাধামোহনের ছড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি দাশু রায় আসরে দাঁড়িয়ে উঠে সুর করে বললেন—

তিন পোণের বেণ্য ঘেটে পুরো কল্পতরু।
তিন কড়া যার মূল্য তার তুল্য করিস হরু॥
তুই ওকে সিংহ দেখিস আমি দেখি গরু।
পুরোর নিজের মুরোদ তিন কড়া শিষ্য দিয়ে বলান ছড়া
যেমন কানার একজন ঠেঙ্গা ধরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।
বড় কষ্ট মহাশয় ঢাকীর একজন ঢাক বয়,
নাঙ্গুলের যেমন জোড়ালে যায় মাঠে॥
বনাকুলিতে হাউজ গাঁজে তার একজন তামাক সাজে,
শুনে লজ্জা পাই।
পুরো হয়েছে পুরো ঘাগী ঘরের গিন্নী বুড়ো মাগী
যা বলুক তার রাগারাগি নাই॥
ও কুড়ানীর বেটা নিড়ানী হাতে ভুঞে ঝাড়ছে হুড়ো।
ওর জন্ম গিয়েছে ঘাস করে' পোড়ো জমিতে পড়ে পড়ে
আজ হয়েছে পুরো বৈরাগীর পড়ো॥

ভাতরান্নার আখা জ্বালানী তায় আবার কেন গালানী
ওর কথা কি সাজে।
বাজে মরে ওর জন্ম হয় বাজে লোক আর কারে কয়,
'ওর কথা গায়ে বড় বাজে॥

দাশু রায়ের এই ছড়া শুনে সেদিন আসরের শ্রোতারা চারদিক থেকে 'সাবাস সাবাস' বলে উঠল। পুরুষোত্তমের দল আর তাঁর কোন জবাব দিতে পারলে না, হার হ'ল তাদের।

আবার এক বারোয়ারী পূজার আসরে কবির লড়াইয়ে নিধিরাম দাশরথিকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ কবির লড়াইয়ের খুব চল্‌তি আর নিধিরামের সেদিনের আক্রমণ হ'ল সাংঘাতিক।

নিধিরামের কবিযুদ্ধের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, ছড়া আবৃত্তি করবার সময়ে তিনি মাঝেমাঝে মিল-ছাড়া, সুর-ছাড়া কিছু গদ্য হঠাৎ বলে যেতেন আর তাঁর সেই মজা করে বলবার ধরন শুনে আসরে হাসির রোল উঠত। সেদিন আসরে দাশু রায়ের সহকারী গুরুদাস ঘটক সামনে ছিল, তিনি উত্তর লিখছিলেন পেছনে অক্ষয়ার কাছে বসে।

দলের কবির টপ্পা শেষ হতেই তাদের বসিয়ে দিয়ে নিধিরাম আসরে দাঁড়িয়ে ছড়া কাটলেন—

ওহে গুরুদাস ঘটক এদানি তোমার ভারি চটক
অতএব ভাই প্রাতঃ প্রণাম হই।
তুমি এসেছ, দলের জাসু তোমার দাশু দাদা কই?

বলে হঠাৎ আসরের পেছন দিকে গিয়ে গদ্যে বলে' উঠলেন—

ওহো, এই যে কবির দলের মহারথী, মহামান্য দাশরথি বসে রয়েছেন। অক্ষয়া একটু সরে দাঁড়া, যেন নীলে চাদরের আড়াল দিয়ে রেখেছিস কেন? একবার চাঁদমুখখানি দেখি। ওহে দাশু, একটা কথা কই আশু, পৈতাগাছটা ত অক্ষয়ার গায়ের রঙ করে তুলেছ। ছি ছি ছি ছি—

হইয়া ব্রাহ্মণের ছেলে শুদ্ধ কুলে কালি দিলে
কবির মুহুরি মাথায় বাঁধা ফোতা।
গায়ত্রী শিবপূজা সন্ধ্যা তোমার কাছে জন্মবন্ধ্যা
ভারি চাকরি, হাতে কবির চোতা॥
কিবা মুখ কিবা পাগড়ি কবি গাহিতে রাঢ় বাগ্‌ড়ী
যাও অক্ষয়ার পাছে পাছে। ...ইত্যাদি

এই ধরনের আক্রমণ আগে তাঁর ওপর কখনও হয় নি, তিনি বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর নাম কিংবা বংশ এসব নিয়ে কেউ আক্রমণ করবে, তিনি ভাবতে পারেন নি। প্রতিপক্ষ অক্ষয়াকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করবে আর তিনি জবাব তৈরি করে দেবেন পেছনে বসে, এই রকমই তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। এমন সরাসরি নিজের জাত-কুল নিয়ে আক্রমণের সামনে কখনও পড়েন নি তিনি। তাঁর মুখে উত্তর জোগাল না। আসরের উৎকর্ণ শ্রোতারা দেখলে, দাশু রায় অধোবদনে আসর ছেড়ে চলে গেলেন, পরাস্ত হয়ে।

আরও একটি দল থেকেও সেসময় তাঁর ওপর এই ধরনেরই আক্রমণ হয়। সেখানে নাকি প্রতিযোগিতা ছিল সহচরীর দলের সঙ্গে। সহচরীর দলের মুহুরি নন্দেরচাঁদ দাশরথিকে আসরে এই বলে আক্রমণ করেন—

শুন ওহে দাশু রায় তোমার এমন কাজ কি শোভা পায়।
তোমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখে শুনে দিচ্ছি আমি আশু রায়॥

তুমি বামুন কিসের, পৈতাটি ত' রায়,
মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যে চাটুজ্যে ব্রাহ্মণের উপাধি রয়,
তবে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়।
তোমার বামুন হয়ে হয় না কি ঘেন্না,
ও মরি হায় হায় বর,
কেবল আকার পানে চেয়ে থাকা কি বিড়ম্বনা।
তোমার আপন লোক সব লজ্জা পেয়ে ঐ গোপন
পথে পা বাড়ায়,
শুন ওহে দাশু রায়॥ ....

এতদিন গ্রামের কিংবা আপনার লোকের মুখে মুখে তাঁর যে কুৎসা ছড়িয়েছিল, এবার তা পূর্ণ আসরে কবির লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে সামনাসামনি তাঁর মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল। এমনি ব্যক্তিগত আক্রমণের একদিন চূড়ান্ত হয়ে গেল এক আসরে।

পুরুষোত্তম বৈরাগীর সঙ্গে সেদিন কবির লড়াই বাধে। দাশরথি বৈরাগীদের একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। এ শুধু তাঁর প্রথম জীবনে নয়, উত্তর-কালে পাঁচালিকার হয়েও তিনি বৈরাগীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন সুযোগ পেলেই। সে আসরেও তিনি বৈরাগী সম্প্রদায়ের কবিয়াল পুরুষোত্তম দাসকে জব্দ করবার জন্যে ছড়া তৈরি করে সবাইকে শোনালেন—

ধন্য রে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসির ছেলে।
তুমি হাড়ি মুচি বৈদ্য বামুন একত্রে মিশালে।

তুমি দিলে হরিনাম জীবের হয় মোক্ষধাম
অনায়াসে তরে ভব নদী।

বৈরাগ্যের পিতৃকুল অতি ক্ষুদ্র মাতৃকুল নমঃশূদ্র
দুই কুল এক খুঁটে।
শ্বশুর কুলের কস্থর নাম বাগ্‌দি কুশ মেটে।
মাস্‌তুতো ভাই মুর্দাফরাস, পিস্‌তুতো ভাই বেদে,
মাতামহ ভুঁঞিমালী বরিগিদের এদে॥ ...

দাশুর উদ্দেশে শ্রোতাদের বাহবাধ্বনির মধ্যে পুরুষোত্তম এই চাপানের উত্তর দিতে দাঁড়ালেন।

এক আসর লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল পুরুষোত্তমের ছড়া শোনবার জন্যে। দাশু রায়ের এমন কড়া চাপানের পর তিনি কি শোনাবেন? আজ কে হারে, কে জেতে!

পুরুষোত্তম দাশরথিকে পাল্‌টা জাত তুলে সাংঘাতিক আক্রমণ করে ছড়া কাটতে লাগলেন—

উনি কুলের গরব করেন নিত্তি,
শুনে জ্বলে যায় পিত্তি,
মামা যার চক্রবর্তী, পিতা যার রায়।
তিনি আবার দিয়ে বেড়ান নৈকষ্যের দায়॥
কার মাসতুতো ভাই দৈবজ্ঞ, পিসতুতো ভাই ভাট।
কন্যা বিয়ে করে পণে মারেন মালসাট॥...

এমনিভাবে দাশরথির একসঙ্গে পিতৃকুল মাতৃকুল আক্রান্ত হ'ল। এই সময়কারই আর একটি আসরে নদের-চাঁদের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে এবং নিধিরামের সেই আসরের কথাও। তাঁরা দুজনেই দাশরথিকে অক্ষয়ার নাম প্রসঙ্গ এনে কুৎসা করেছিলেন। এখন তাঁর পৈতক ও মাতৃক বংশ তুলে আক্রমণ করলেন পুরুষোত্তম। উপর্যুপরি এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তা ছাড়া, নিধিরাম ও নদেরচাঁদের মতন পুরুষোত্তমের আক্রমণের মধ্যেও কিছু সত্য ছিল হয়ত।

দাশরথির সেই আসর থেকেই মন ভেঙ্গে গেল। তিনি পুরুষোত্তমের চাপানের উত্তর দেবার জন্য আর দাঁড়ালেন না আসরে। তাঁর আত্মীয়-স্বজনবর্গ মর্মাহত হয়ে আবার তাঁকে কবির দল ছাড়বার জন্যে নতুন করে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। কবির লড়াইয়ের জন্যেই যত অনর্থ আর অপযশ। দাশু নিজেও এ বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। চিরজীবন তাঁকে একঘরে করে রাখবার ভয় দেখালেন অনেকে। কেউ বা পরামর্শ দিলেন ভদ্র পাঁচালির দল গড়তে।

সে রাত্রে আসরে না গাইবার সময় থেকেই এমনি নানা প্রভাব দাশরথির ওপরে ক্রিয়া করতে লাগল। আগেও এরকম চাপ তাঁর ওপর পড়েছিল, অক্ষয়ার দলে প্রথম প্রবেশের সময়ে। কিন্তু তখনকার সঙ্গে এখনকার পার্থক্য এই যে, প্রকাশ্য আসরে নিজের চরিত্র নিয়ে, জাত-কুল নিয়ে এ ধরনের কুৎসা আগে তাঁকে শুনতে হয় নি।

সেই আসরের রাত থেকেই দাশরথির মনে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অক্ষয়াও দাশুর দুঃখে দুঃখিত হল—দাশুর মন ভেঙ্গে গিয়ে যখন কবির লড়াই বন্ধ হয়ে গেল, আসর ভাঙ্গল, তখন সভার অনেকেই দোষ দিতে লাগল অক্ষয়ার। সকলের মুখে তার নিন্দা শোনা যেতে লাগল। লোকে বলাবলি করলে—'আকার জন্যেই এই সব হল।'

অক্ষয়া চুপচাপ এতক্ষণ বসে সব শুনছিল। এবার দুঃখে হতাশায় তারও চোখে জল এল। আসর ভেঙ্গে যাবার খানিকক্ষণ পরে সে দাশরথিকে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'দেখ রায়, আমার জন্যেই তোমার এই অপমান। সভার মধ্যে তুমি এমন করে নাজেহাল হলে। আমি আর আমার দলের সঙ্গে তোমায় জড়াব না। এ দলও তুলে দেব ভাবছি। ভেক নিয়ে এবার আমি ভিক্ষে ক'রে খাব। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন ঘর-সংসার নিয়ে থাক। আমায় আশীর্বাদ কর।'

এই বলে গায়ের রূপোর গয়না খুলে দাশরথির পায়ে রেখে প্রণাম করলে, তারপর নীরবে কাঁদতে লাগল অক্ষয়া।

দাশরথির মানসিক আলোড়নও তখন কম নয়। এতক্ষণ তিনি একদিকে নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। অক্ষয়ার সমস্ত কথা শুনে আর কান্না দেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'আকা, বাড়ী যাবি, না বাঁধমুড়ায় যাবি?'

অক্ষয়া তেমনি গলায় বললে, 'এ মুখ আমি তোমার বাড়ীর সবাইকে দেখাব?'

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'পাতাইহাটের ঘাটে জাহ্নবী নাইতে চললাম। এস রায়, তুমিও এস। জাহ্নবী স্নানের পর বাড়ী আসবে, আমিও বাড়ী চলে যাব।'

(অক্ষয়ার শ্বশুরের নাম গঙ্গা সর্দার। তাই সে গঙ্গা না বলে জাহ্নবা বল্‌ত। স্বামী ত্যাগ করলেও শ্বশুরের নামের ওপর তার বিলক্ষণ সমীহ ছিল, দেখা যায়!)

এমনি নাটকীয় ভাবে অক্ষয়ার সঙ্গে দাশরথির বিচ্ছেদ ঘটল সেই আসরের পর থেকে। তারপর আর দু'জনের মধ্যে কোন সংস্রব ছিল না।...

দাশরথির কবিয়াল জীবনেরও সেই দিন থেকে শেষ। অন্য কোন কবিগানের দলেও আর তিনি যোগ দিলেন

না। নতুন পর্ব আরম্ভ হল তাঁর শিল্পী জীবনে। যে পরিচয়ে পরে তিনি সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে যশস্বী হয়েছিলেন, যে সৃজন-প্রতিভার গুণে তাঁর নাম ও কীর্তি ভাবীকালের আসরেও লুপ্ত হয় নি—সেই পাঁচালিকার দাশরথিকে এবার দেশ লাভ করলে।

তিনি পাঁচালির আখড়া স্থাপন করলেন (১৮৩৬ খ্রীঃ) —বয়স তখন তাঁর ৩০ বছর।

কবিগান আর পাঁচালির রীতি পৃথক। তাই তাঁর রচনা-কুশলতা নতুন পথে প্রকাশ করতে হল। পাঁচালি গানের ধরন-ধারণ নীতি-প্রকৃতি সবই আলাদা। পাঁচালি আয়ত্ত করবার জন্যে দাশরথি নিজের কবি-শক্তিকে নতুন করে প্রয়োগ করলেন। নতুন পরিস্থিতির জন্যে দমে গেলেন না আদৌ। একনিষ্ঠ হয়ে তিনি পাঁচালির চর্চা ও সাধনা আরম্ভ করলেন আখ্‌ড়া খোলবার পর থেকে। পাঁচালির পালা গান নতুন সৃষ্টির আনন্দে রচনা করতে লাগলেন।

এতদিন কবিগান আর কবির ছড়ার চর্চা ক'রে এসেছিলেন, তাই প্রথম দিকে তাঁর পাঁচালিতে কবিগানের প্রভাব দেখা গেল স্বাভাবিক ভাবেই। তা ছাড়া, তিনি অতিশয় অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন, বিশেষ অনুপ্রাস। তাই অনুপ্রাসের ঘটা তাঁর পাঁচালির পালাতেও দেখা যেতে লাগল।

প্রথম দিকের পাঁচালি গানে তিনি বেশির ভাগ যৎ তাল প্রয়োগ করতেন, তাই তাঁর নাম হয়ে যায় 'যতো দাশু'। পরে ক্রমে সেই সঙ্গে বড় তালও ব্যবহার করতে থাকেন আর জানা সুরের প্রয়োগে পাঁচালির পালা রীতিমত আকর্ষণ ক'রে তোলেন।

দাশরথি পাঁচালি গানকে কোন কোন বিষয়ে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিলেন, বলা যায়। একটি প্রধান নতুনত্ব তিনি এই করলেন যে, কবিগানের জনপ্রিয় ঢং সব জুড়ে দিলেন পাঁচালি গানের মধ্যে। তা ছাড়া টপ্পার অনেক চাল ও কৌশল পাঁচালি সঙ্গীতে প্রয়োগ করলেন। তাঁর পাঁচালি রাগসঙ্গীতের স্পর্শে নতুন প্রাণ পেলে যেন। শ্রোতারা তাঁর গানে একটি নতুন আবেদন অনুভব করতে লাগল। এমনিভাবে পাঁচালি-স্রষ্টা দাশরথির জয়যাত্রা আরম্ভ হ'ল।

এখানে বলে রাখা যায় যে, তিনি যে পাঁচালি সৃষ্টি করেন, তা নয়। পাঁচালি গান বহু দিনের পুরণো এবং তার প্রচার ও বিষয়বস্তুও খুব ব্যাপক ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যেও পাঁচালির খুব প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইতাদি মধ্যযুগের প্রধান সব ক'টি ধারাই আখ্যাত হ'ত পাঁচালি নামে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে সমস্ত বিবৃতি-প্রধান আখ্যায়িকা কাব্য মাঝে মাঝে সঙ্গীত ও সুর সহযোগে আবৃত্তি করা হ'ত, তাই পাঁচালি। তবে তার মধ্যে গানের অংশ গৌণ এবং সুরযোগে আবৃত্তিই প্রধান। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা চলে যে, পাঁচালির নামটির তাৎপর্য কি, তা নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতবর্গ একমত হতে পারেন নি। কোন কোন মতে, অতীত কালের পুতুল নাচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় পঞ্চালিকা থেকে পাঁচালি কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। পুতুল নাচ আমাদের দেশের একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গানের সঙ্গে সেকালে পুতুল নাচ দেখানো হ'ত। সেই বিস্মৃত যুগের অবশেষ দেখা যায় যম পট, গাজীর পট ইত্যাদিতে। পরবর্তীকালে নাট-মন্দিরে বা পুজামণ্ডপে দেবতার সামনে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে গানের সঙ্গে পুত্তলিকা প্রদর্শনের প্রথা কালক্রমে রহিত হয়ে যায়। ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীর মধ্যে দেবসভায় শিবের গানের বর্ণনায় বারো-তেরো শতকে প্রচলিত পাঁচালি গানের চিত্র আছে। ডঃ সেনের অনুমান, পাঞ্চাল দেশ এই ধরনের পুতুল তৈরির শিল্পের উৎপত্তি স্থান বলে পাঞ্চালিকা নামের উদ্ভব।

সে যা হোক, পাঁচালির সঙ্গে কবিগানের পার্থক্য এবং পাঁচালিতে দাশরথির নতুন সৃষ্টির বিষয়ে আর দু'একটি কথা এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়।

কবিগান মূলতঃ কবিয়ালদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—কবির লড়াই। তার বিষয়বস্তুতে সাধারণত আখ্যান থাকে না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে যথাযোগ্য উত্তর ও চাপান দেওয়া সেখানে মূল লক্ষ্য। সমস্ত ব্যাপারটিই extempore—কবিয়াল আসরে বসে প্রশ্ন ও উত্তর রচনা করে দেন। এবং প্রধান কবিয়াল গায়কদের পেছনে দাঁড়িয়ে কথা সরবরাহ করেন গানের সময়ে। কবিয়ালকে আড়াল থেকে আসরে সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে হ'ত শুধু ছড়া আবৃত্তি করবার দরকার হলে। কবির গান ও ছড়া প্রায় সমস্তই আসরে বসে তৎপরতার সঙ্গে রচনা। তবে কবিগানের বিষয়বস্তু লঘু এবং কথাও হাল্‌কা, অনেক সময় অমার্জিত। কিন্তু সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো কথার চটক ও চাতুরি, ব্যঙ্গ ও শ্লেষ, সদ্য ঘটনাদির ওপর সরস ও সতেজ টিপ্পনী কবিগানের বৈশিষ্ট এবং জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

কিন্তু পাঁচালি বেশির ভাগ পৌরাণিক প্রভৃতি আখ্যায়িকা কাব্য অবলম্বনে গঠিত পালাগান। পাঁচালির মূল গায়ক সব সময় আসরের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচালনা করেন। পাঁচালি আগাগোড়াই গান নয়। মাঝে মাঝে বর্ণনার অংশ থাকে এবং তা দ্রুততালে গায়ক আবৃত্তি করে যান। তাঁর ডান হাতে মন্দিরা ও অন্য হাতে চামর এবং পায়ে নূপুর—এই দর্শনীয় বেশ। দোহার থাকে অন্তত দু'জন। কখনও কখনও মৃদঙ্গীও দেখা যায়। মঙ্গলগানও অনেকটা এই ধরনে আসরে পরিবেশন করা হ'ত।

এই হল পুরণো পাঁচালির প্রয়োগ-রীতি। পাঁচালির যথার্থ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মূল কাহিনী বিস্তারিত হবে, ব্যাখ্যার ভাব হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং কাব্যসৌন্দর্যে ভরা। আবার সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনার মধ্যে এবং তারই তাৎপর্যে সমসাময়িক ঘটনা ইত্যাদির ওপর রসিকতাপূর্ণ টীকাটিপ্পনী ও ছড়া। তা ছাড়া ভক্তিরসের গানও থাকবে, কিন্তু তার ভাষা গুহ্য ও রহস্যময়।

দাশরথি কবিগানের অভিজ্ঞতা ও নিজের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি নিয়ে নতুন পদ্ধতির পাঁচালি প্রবর্তন করলেন। তার অভিনব প্রয়োগ-কৌশল তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দান। দীর্ঘ আখ্যানের বদলে তিনি ছোট ছোট পালা রচনা করলেন। তার সংলাপে শক্তিশালী উত্তর-প্রত্যুত্তর যুক্ত করে নাট্যরস বাড়িয়ে দিলেন অনেকখানি। আবার পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে শ্লেষাত্মক সমালোচনা করে শ্রোতাদের কাছে পালাকে আরও আকর্ষক ক'রে তুললেন। পাঁচালি গানের ধারা যেন গীতিনাট্যের মতন সঙ্গীতে প্রাণবন্ত হ'ল নবীন রূপে। গীতিকার ও সুরকার দাশরথির শিল্প সৃষ্টিতে। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে এই নতুন রীতির পাঁচালি বাংলার আসরে দেখা দেয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা চলে যে, পাঁচালি গানে পরে দাশরথির শ্রেষ্ঠ ভাব-শিষ্য ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

নতুন পদ্ধতির পাঁচালি এইভাবে পরিবেশন করা হ'ত: মূল গায়ক ভাঙ্গা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে আখ্যান-ভাগ আবৃত্তি করতেন এবং তা নাটকের মতন উত্তর-প্রত্যুত্তরে পূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার জন্যে পৃথক পাত্রের প্রয়োজন হ'ত না, গায়ক একাই সব চরিত্রের মুখপাত্র হয়ে সকলের অংশ বলে যেতেন। কখনও বা টীকা-টিপ্পনী কাটতেন চিত্তাকর্ষক করে, মূল আখ্যানভাগের নানা অবকাশে ছোট ছোট উপাখ্যান কিংবা সরস প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতেন বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে। পালার কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি ও হাবভাবের সঙ্গে। মুন্সিয়ানার সঙ্গে ছড়াকাটা আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং গদ্যে টুকরো কথার ব্যবহারও। বর্ণনা ও সংলাপ ভাবের দিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে গান আরম্ভ হ'ত। মূল গায়ন সব সময় গান গাইতেন না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গানের জন্যে নিযুক্ত থাকতেন অন্য সুকণ্ঠ গায়ক। গান প্রধানত সেই নির্দিষ্ট গায়কই গাইতেন। মূল গায়ন আবৃত্তি করে, ছড়া ও টিপ্পনী কেটে, ব্যাখ্যা ও টীকা করে মূল কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন কাণ্ডারী হয়ে।

প্রথম দিকে এই নতুন পদ্ধতির পাঁচালি গানে কবির লড়াইয়ের মতন প্রতিযোগিতা ছিল না। এক আসরে গান গাইত একটি মাত্র দল। পরে, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচালি গানেও প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তবে কবির লড়াইয়ের সঙ্গে তার পার্থক্যও ছিল। কিন্তু সে সব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

নতুন রীতির পাঁচালিতে যে ছড়া কাটার প্রথা, এটি হয়ত দাশরথি কবিগানের অভিজ্ঞতা থেকে তার জনপ্রিয় অংশরূপে পাঁচালিতে প্রবর্তন করেছিলেন।

দাশরথি নতুন পদ্ধতির পাঁচালি সৃষ্টি করেন কবিগান ও মঙ্গলগান সংমিশ্রণ করে—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এই মতটি লক্ষ্যণীয়।

পাঁচালিতে গান রচনার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। অর্থাৎ যে কোন আকারের এবং যে-কোন-সুর তালে পাঁচালি গান গঠিত হতে পারে। বাজনা বলতে আগে ছিল ঢোল আর কাঁসি। পরে হাফ আখড়াইয়ের (প্রবর্তনা: ১৮২৮ খ্রীঃ) অনুকরণে সাজ সাজানো আরম্ভ হয়।

পাঁচালির উৎসাহী শ্রোতা ছিল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ নির্বিশেষে। পল্লী বাংলার আপামর লোক পাঁচালি গানের রসধারায় নিষিক্ত হ'ত। একাধারে লোক-শিক্ষা ও আনন্দ উপভোগের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল পাঁচালি গান।

এখন পাঁচালির কথা স্থগিত রেখে দাশরথির জীবন-প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

কবির দলের গাঁথনদার বলে দাশরথি আগেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখন পাঁচালি গান আরম্ভ করবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পাঁচালিকার হিসাবে নাম হতে লাগল। ডাক আসতে আরম্ভ হ'ল কাছাকাছি

গ্রাম থেকে। আগে অক্ষয়া টাকাকড়ি বিশেষ দিত না, কিন্তু এবার তিনি টাকার মুখ দেখলেন। দলের সবাইকে দেবার পর মাসে ১৫ টাকা, ২০ টাকা উদ্বৃত্ত হতে লাগল তাঁর। দেড় বছরের মধ্যেই পীলাতে মাটির একতলা বাড়ী তৈরি করলেন।

তারপর বিয়ে করে সংসারী হলেন, ৩২ বছর বয়সে। বিয়ের রাত্রে শ্বশুরবাড়ীর অনুরোধে একটি ছড়া বাঁধলেন। সুখের জীবনও তাঁর আরম্ভ হ'ল এই সময় থেকে। দাম্পত্য সুখে তিনি সুখী হয়েছিলেন। পত্নী প্রসন্নময়ী স্বামীর ওপর প্রসন্না ছিলেন চিরকাল। দাশরথিকে এ বিষয়ে ভাগ্যবান বলতে হয় যে, অক্ষয়ার সঙ্গে এত সব কাণ্ডের পরেও স্ত্রীর ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকার বলেন, প্রসন্নময়ী বড় লজ্জাশীলা ছিলেন এবং প্রেমপূর্ণা হলেও লজ্জায় দাশরথির সঙ্গে এত কম কথা কইতেন যে, তিনি পত্নীকে এক একদিন বলতেন, আমার সঙ্গে যত কথা কইবে তত টাকা তোমায় দেব।

উপার্জন তাঁর অবশ্য দেখতে দেখতে বেড়ে চলল। আর সেই সঙ্গে নাম-ডাকও। আসরের পর আসরে বায়নার টাকা ছাড়াও নগদ টাকা, কাপড়-চাদর, তৈজস-পত্র ও নানা জিনিষ তিনি উপহার পেতে লাগলেন।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর প্রথম প্রসিদ্ধি ছড়ায় নবদ্বীপের আসর থেকে। নবদ্বীপ তখনও বিদ্যাচর্চার এক প্রধান ও বিখ্যাত কেন্দ্র, পণ্ডিত-অধ্যুষিত স্থান। রাসপূর্ণিমা ও নানা পূজা-পার্বণে কবিগান, যাত্রা, পাঁচালিতে মুখর হয়ে থাকত নবদ্বীপের উৎসব প্রাঙ্গণ। এমনি এক আসরে রাসপূর্ণিমায় সেখানে পাঁচালি গাইবার জন্যে দাশরথি আমন্ত্রণ পেলেন। বয়স তখন তাঁর ৩৩ বছর। পণ্ডিত-প্রধান স্থান বিবেচনা করে তিনি বায়না পাবার পর খুব যত্নের সঙ্গে দল গড়লেন। পাঁচালি কথা-প্রধান গান, কথা যদি শুদ্ধ না হয় নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর হাস্যাস্পদ হতে হবে। এই চিন্তা করে দলের প্রধান গায়ক তিনকড়ি (কনিষ্ঠ ভ্রাতা), নীলমণি বিশ্বাস ও যাদু দৈবজ্ঞকে সমস্ত গান ইত্যাদির অর্থ বুঝিয়ে ভাল করে শেখালেন। বাজনার সঙ্গে সঙ্গীতকে সাবধানে গঠন করলেন সুসঙ্গত করে। নিজের অংশও ভাল করে অভ্যাস করে নিলেন। পাঁচালির দল তখন অনেক ছিল—কলকাতার গঙ্গানারায়ণ লস্কর ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস (অন্ধ গায়ক), বর্ধমানের কৃষ্ণমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রামপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রভৃতির তখন পাঁচালি-গায়ক হিসেবে খুব নাম। তাই দাশরথি ভাল ভাবে প্রস্তুত হয়ে দল নিয়ে নবদ্বীপে গেলেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে সেই প্রথম আসর দাশরথি মাৎ করলেন তাঁর মনোমুগ্ধকর আবৃত্তিতে, সঙ্গীতে, অভিনব পালাগানের প্রয়োগ-রীতিতে। সকলে বুঝতে পারলেন, দাশরথির পাঁচালি তাঁর শিল্পী-মনের অভিনব সৃষ্টি। রচনাশক্তি ও মনোহারিত্বে তাঁর পাঁচালি গানই শ্রেষ্ঠ। পালা শেষ করবার পর পণ্ডিতবর্গ তাঁকে যত সুখ্যাতি তত আশীর্বাদ জানালেন এবং প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিলেন যে, প্রতি বছর রাসপূর্ণিমায় দাশরথি নবদ্বীপে পাঁচালি গাইবেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক বছরে সেখানে যেতেন, তা ছাড়া অন্য সময়েও। বস্ত্রহরণ পালায় রাধিকার সেই গানখানি—'ননদিনী বল নগরে সবারে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।'···শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিত শ্রোতারাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। মাধব তর্কসিদ্ধান্ত প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন লাভ করেন দাশরথি।

তারপর থেকে তাঁর পাঁচালির আসর সারা বাংলা দেশ জুড়ে হতে থাকে। তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ইত্যাদির সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও।

উপার্জনও যথেষ্ট করতে লাগলেন। মাটির এক-তলার জায়গায় পাকা দোতলা বাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ ও অন্যান্য বাড়ী করলেন চারদিকে ইটের প্রাচীর বেষ্টন করে। শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করে তার জন্যে নিষ্কর জমির ব্যবস্থা করে দিলেন। মাঝে মাঝে দুর্গোৎসব, শ্যামা ও জগদ্ধাত্রী পূজা করতে লাগলেন, ইত্যাদি। প্রথম জীবনে ধিক্কৃত কবিয়াল দাশু রায় এখন সমাজে মান্যগণ্য হয়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করলেন। তাঁর প্রতিভায় চরম উন্নতি হ'ল পাঁচালি গানেরও। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হলেন।

তাঁর পালার সবচেয়ে জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠ অংশ হ'ল তাঁর গানগুলি। যেমন তাদের সাঙ্গীতিক আবেদন তেমনি হৃদয়স্পর্শী ভাব। ঝিঁঝিট সুরে মধ্যমান তালের 'ননদিনী বল নগরে' গানটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দাশরথির সঙ্গীত রচনার আর কয়েকটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হ'ল তাঁর বিভিন্ন পালা থেকে উদ্ধৃত করে:

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি কামনা হবে আমার বৃন্দে গোপনারী।
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥···
ইত্যাদি

খাম্বাজ—একতালা

আমি কি হেরিলাম নয়নে।
মম সাধ্য নয় সে রূপ বর্ণনে॥···ইত্যাদি

ঝিঁঝিট—যৎ

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ।
কালো রতন রমণী রঞ্জন॥······ইত্যাদি

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা

যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী হই গো দাসী শ্রীচরণে॥······
ইত্যাদি

বিভাস—ঝাঁপতাল

আয় রে কানাই আয় রে গোঠে রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ওই সঘনে ধেনু গগনে ভানু উঠিল॥······
ইত্যাদি

আলিয়া—কাওয়ালী

কি অপরূপ রূপ বিমোহিনী।
মা আমার জগমন মোহিনী॥
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী বিশ্ব মাঝে বিশ্বকর্ত্রী
আর নাম কালী কালহারিণী॥······ইত্যাদি

তাঁর এই সব গানে পাঁচালির আসরে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হত, গানের ভাষা পাঠ করে তা ধারণা হতে পারে না।

তাঁর পালায় এমনি ধরনের গান এবং সেই সঙ্গে ছড়া, আবৃত্তি ও অভিনয়-ভঙ্গি, শ্রেণীবদ্ধ উপমা ও সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে অনুপ্রাসের ঘটা ও ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাস শ্রোতাদের কাছে পরম আকর্ষণের বস্তু ছিল। রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে মূর্খ কৃষকও তাঁর পাঁচালি গান উপভোগ করত একই আসরে বসে মন-প্রাণ দিয়ে।

দাশরথির পাঁচালিকারের জীবন ২১ বছরের। তার মধ্যেই তিনি পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয় নিয়ে ৬৪ খানি পালা রচনা করেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সে সবই প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে। ৬৪টি পালার মধ্যে একটি পালা 'বিধবার বিবাহ' বিদ্যাসাগর মশায়ের ওই আন্দোলনের সময় রচনা এবং এ-বিষয়ে দাশরথি বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। ওই গ্রন্থাবলীতে দাশরথির দু'টি সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তকও দেখা যায়—'বিবিধ সঙ্গীত' ও 'নব-সংগৃহীত সঙ্গীত'।

দাশরথি নিজেও তাঁর কয়েকটি পালা মুদ্রিত করেছিলেন—পীলার কাছে বহরা গ্রামে হরিহর মিত্র নামে এক ব্যক্তির মুদ্রণ-যন্ত্রে। কিন্তু সেসব পালা আর পাওয়া যায় না।

তাঁর স্বভাবের বিষয়ে এই জানা যায় যে, তিনি সুরসিক ছিলেন এবং গুণীজন ও সাধারণ সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল সদ্ভাব।

একবার কবি ঈশ্বর গুপ্ত অসুস্থ অবস্থায় গঙ্গায় নৌকা-ভ্রমণের সময় পীলায় এসে দাশরথির সঙ্গে একদিন যাপন করেছিলেন। সেদিন নানা রহস্যালাপের মধ্যে গুপ্ত কবি তাঁকে বলেন, 'রায় মহাশয়ের শক্তি আমার হিংসার বস্তু।' দাশরথি নাকি কথাটি বরাবর মনে রেখেছিলেন সযত্নে।

একবার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর গান হয় বর্ধমান রাজবাড়ির আসরে। দাশরথি সে আসরে ছিলেন এবং গান শেষ হতে অধিকারী মশায়কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অধিকারী জানান—'আজ গলাটা ভাঙ্গা, বড় সুবিধা হল না।' দাশরথি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—'আপনার যা ভাঙ্গা, অন্যের নৈকষ্য।'

এমনি তাৎক্ষণিক রসিকতা ও সরস মন্তব্য তাঁর পালাগানের সময়েও প্রকাশ পেত। যেখানে পাঁচালি গাইতে যেতেন সেখানকার কোন লোক বা কোন কিছুর মধ্যে সমালোচনার যোগ্য কিছু দেখলে আসরে বসেই সে বিষয়ে রসাল ছড়া বা রচনা করে শুনিয়ে দিতেন মূল পালার শেষে। শ্রোতাদেরও তা যথেষ্ট হাসির খোরাক যোগাত। একবার নদীয়া জেলার ধর্মদা গ্রামে পাঁচালি গাইতে গিয়ে দেখেন—পুজোর পুরোহিত অযোগ্য, নাপিত ভাল কামাতে পারে না, মুড়কিতে ময়রা যে গুড় দেয় তা এত কম যে মুড়কি কার্পাস তুলোর মতন শাদা দেখায়। সেদিন পালা শেষ করবার পর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে আসরে শোনালেন—

দীনু পুরুত মন্ত্র পড়ান, অর্ধেক তার ভুল।
গুরো নাপিত দাড়ি কামায়, অর্ধেক তার চুল॥
রতন ময়রা মুড়কি মাখে কাপাস কাপাস।
ঠাকুররা সব খেয়ে বলে সাবাস সাবাস॥

নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়ায় একটি বাড়ীতে তাঁর বার্ষিক পালাগানের বরাদ্দ ছিল, অন্য অনেক বাড়ীর

মতন। সেখানে তাঁর দক্ষিণা ধার্য ছিল, ১০০ টাকা। একবার গিয়ে শুনলেন যে, বরাদ্দ ২০ টাকা কমে গিয়ে ৮০ হয়েছে। সেদিন তাই পালার শেষে বললেন—গ্রামের নাম নাকাশি, ডাকলেও আসি না ডাকলেও আসি। ছিল একশ' হল আশী, আসছে বারে আসি কি না আসি।...

আসরে পাঁচালিকার দাশরথির যেসব শিল্পী-জনোচিত সৃজনী-প্রতিভা প্রকাশ পেত, তেমনি রীতিমত বাস্তব-বুদ্ধিও। পরিচালক হিসাবে বিরাট দলটিকে যেমন সংগঠিত করতেন, তেমনি নিজের অংশও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ৪।৫ হাজার, কখনও বা ৮।১০ পর্যন্ত শ্রোতা জমায়েত হত তাঁর পালাগানের আসরে। সেই অ-মাইক (ও অমায়িক) যুগে এই বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী আসরে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে বসত এবং তিনি প্রত্যেক পদ তিনবার করে বলতেন পাঁচালির প্রতিটি কথা সকলের কাণে সুস্পষ্ট ভাবে শোনাবার জন্যে। একবার সামনে এবং দু'বার দু'দিকে ফিরে উচ্চারণ করতেন। তা ছাড়া, মানুষের চরিত্রে অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। উপস্থিত শ্রোতাদের মতিগতি বুঝে তিনি আসরে গাইতে বসে পালা অদল-বদল করে নিতেন। সেজন্যে তাঁর একই বিষয়ের পালা কয়েকটি রচনা করা থাকত বড় ছোট মাঝারি আকারে। আসরে বসে প্রয়োজন বুঝে তিনি পালার আকার যেমন অনেক সময়ে নির্বাচন করে নিতেন, তেমনি শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ধরন-ধারণও স্থির করতেন। এসবও তাঁর প্রতিভার আর এক দিকের পরিচয়।...

এবার তাঁর মৃত্যুর প্রসঙ্গ।

স্বাস্থ্য তাঁর বিশেষ ভাল ছিল না। শরীর সুস্থ রাখার জন্যে নিয়ম পালন করাও সম্ভব হ'ত না সেকালের আসরের রীতির জন্যে। অধিক রাত্রি পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি, গান ইত্যাদির পরে আরও বেশি রাতে ঠাণ্ডা দুধ, খাবার ইত্যাদি খেতে হত। এসব কারণেই হয়ত তাঁকে হাঁফানি রোগে আক্রান্ত হতে হয় এবং মৃত্যু ঘটে মাত্র ৫১ বছর বয়সে (সিপাহী বিদ্রোহের বছরে)। সেবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কাসিমবাজারে পাঁচালি গান করার পর বাড়ীতে এসেই তাঁর জ্বরবিকার হয়—কাসিমবাজারের জলহাওয়া সেকালে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। অসুখ অতিশয় বৃদ্ধি পেলে কালিপূজার আগের দিন। অন্তিমকাল বুঝতে পেরে দাশরথি নিজেই ব্যবস্থা করে গঙ্গাযাত্রা করলেন। তাঁর জীবনীতে শেষ সময়ের এই বিবরণ পাওয়া যায়: দাশুর মৃত্যুকালে গঙ্গার ধারে বসে এক গায়ক দাশরথিরই রচনা একটি গান গাইতে লাগলেন। দাশরথি গঙ্গার দিকে চেয়ে গান শুনতে লাগলেন, ক্রমে তাঁর কণ্ঠ জড়তাপ্রাপ্ত হ'ল, মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ দেখা দিল। ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন—বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিল।...

দাশরথির জীবনী-লেখক এবং তাঁর বিষয়ে আধুনিক কালের গবেষক আরও জানিয়েছেন যে, দাশরথি মৃত্যুকালে একটি গান রচনা করেন বলে যে জনশ্রুতি আছে, তা প্রবাদ মাত্র, সত্য নয়।

কিন্তু এ বিষয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও আছে এবং তা শিল্পশাস্ত্রী অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী "আমার কথা ও ভারতের শিল্পকথা" থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল:

"মাসের মধ্যে দু'একদিন আর একজন গায়ক আসতেন। তাঁর নাম বক্কেশ্বর মুখুজ্যে। ইনি ছিলেন দাশরথি রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য।...তাঁর মৃত্যুর পরে বক্কেশ্বর মুখুজ্যেই দাশু রায়ের পাঁচালির প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি হাওড়ার পুলের কাছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের একটি দোতলার ঘরে থাকতেন। আমাদের বাড়ীতে অনেক-বার এবং বড় বাজারের বারোয়ারী পূজার নানা আসরে তাঁর পাঁচালি গান হয়েছে। ইনি আজীবন কলকাতা শহরে পাঁচালি গান গেয়ে তাকে চালু রেখেছিলেন।... বক্কেশ্বরের গলায় আর একটি গান খুব সরস ও মর্মস্পর্শী হত। সেটি হল অন্তিমকালে গঙ্গার তীরে বসে রচিত তাঁর শেষ "ইচ্ছাপত্র":

তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে।
আমি যাব না, যেতে পারব না,
অন্তিমকালে দাশরথি ভাগিরথীর তীরে রে॥
আমার যা কিছু সব টাকাকড়ি ঘর দরজা বাগান বাড়ী
একমাত্র অধিকারী তিনকড়ে ভাই তুমি রে।
ফিরে যা' ভাই তিনু রে॥

একটু বড় হয়ে বক্কেশ্বরবাবুকে প্রশ্ন করতাম—'গঙ্গার তীরে মৃত্যুর মুখে গান রচনা করা কি সম্ভব?' বক্কেশ্বরবাবু জোর করে বলতেন যে, গানখানি দাশু রায়েরই রচনা। কারণ তিনি মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নাকি হেঁটে গিয়ে গঙ্গার তীরে শয়ন করেছিলেন এবং বেশ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।"

সলিসিটর গঙ্গোপাধ্যায় মশায় যে গানটিকে যথার্থত দাশরথির "ইচ্ছাপত্র" (will) বলেছেন, সেই গানটি

রচনার কথাই দাশরথির জীবনীকারেরা প্রবাদ বলেছেন। তাঁরা (অর্ধেন্দ্রকুমারের মতন) মৃত্যুকালে গান রচনা অসম্ভব স্থির করেছেন এই ভেবে যে সেই অন্তিমকালে কি করে গান লিখবে মানুষ?

কিন্তু আসন্নকালে গান রচনা সম্ভব নয় কেন, যখন সে অবস্থায় গান গাইবারও কথা জানা যায়?

দাশরথির ওই গানটির ভাষার মধ্যেই স্পষ্ট বলা রয়েছে যে, তা গঙ্গাতীরে এবং কবির আসন্নকালে রচিত। এমন কথা দাশরথি জীবনের অন্য কোন সময়ে রচনা করতে পারেন না এবং অন্য কোন কবিও দাশরথির নাম করে এমন গান প্রচলন করেন নি। তা ছাড়া, বক্রেশ্বর মুখুজ্যে ছিলেন দাশরথির সাক্ষাৎ শিষ্য। তিনি যখন জোর দিয়ে জানান যে, গানটি দাশরথিই অন্তিমকালে গঙ্গার ধারে রচনা করেছিলেন—তখন সেকথা ধর্তব্য হবে না কেন?

আরও একটি কথা। গানটি কি দাশরথি কাগজ-কলম নিয়ে বসে লিখেছিলেন, না মুখে মুখে রচনা? মনে হয়, শেষেরটিরই সম্ভাবনা বেশি। জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে যিনি গঙ্গাযাত্রা করেছেন, তিনি গান লেখবার জন্যে নিশ্চয় কাগজ-কলম-কালি ইত্যাদি নিয়ে যান নি সঙ্গে। অসংখ্য পাঁচালি ও কবির লড়াইয়ের আসরে যিনি মুখে মুখে রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি অন্তিমকালে কনিষ্ঠ তিনকড়িকে উদ্দেশ্য করে মুখে মুখেই এই শেষ গানটি রচনা করে শুনিয়েছিলেন মনে হয়!

ক্রমশঃ

একটি মহৎ ব্যক্তিত্ব—লেডি অবলা বসু

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আঠার শতকের খানিকটা আর উনিশ শতকের সমগ্র ইতিহাসে বাংলার নব জাগরণের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র অবধি যেসব মহামানব মনীষী ও মনস্বীদের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা দেশে কেন ভারতবর্ষের অন্যত্রও এমন একটি নবযুগের নব জাগৃতির উৎসাহ প্রবাহময় কোন ইতিহাস দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

সমস্ত সমাজ ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র যেন আশ্চর্য বিচিত্র চিন্তা-কল্পনা আদর্শের আলোকে বাংলা দেশকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। যার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

যে জন্ম-প্রবাহ মানব-প্রবাহ এই সময়ে সমাজে প্রবাহিত হয়েছিল আগে-পরে, পরে পরে—প্রায় একই বছরে তাঁদের এই শতবার্ষিকী জন্মোৎসবগুলিই সেই আশ্চর্য গত শতাব্দীকে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়িয়ে দেয়।

যখনি কোন এই উৎসবের খবর কাগজে দেখি, ঐ উজ্জ্বল শতাব্দীকে তখনি অবাক হয়ে মনে পড়ে যায়, কিন্তু তাতে

আমরা দীপ্ত ব্যক্তিত্বশালিনী নারী তখনও পাই .নি। অকস্মাৎ ঐ শতাব্দীর এমনি একটি বছরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লেডী অবলা বসুর জন্ম হয়।

তখনকার 'প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক পরিবারের একজন বিশিষ্ট সমাজ-কল্যাণবাদী ও সংস্কারক ব্যক্তি মানুষ ঢাকা বিক্রমপুর তেলীরবাগ গ্রামের দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা তিনি।

সেই সেকালে যখন মেয়েদের শিক্ষা পাওয়া একটা দুর্লভ ব্যাপার ছিল তিনি সেইকালের মেয়ে।

তাঁর আগে যেসব মেয়েরা সমাজে ঘরোয়া শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আমরা কয়েকজনকে পাই শুধু সাহিত্য ও কাব্য জগতে। যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী প্রমুখ কয়েকজনকে। এঁরা কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে ছিলেন না। এবং অন্তঃপুরবাসিনীই ছিলেন। কর্মজগতে এগিয়ে আসতে পারেন নি।

কিন্তু লেডী বসু স্কুল-কলেজে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং শুধু পাওয়া নয়, শিক্ষার যা উদ্দেশ্য চিন্তার আদর্শের কর্মের দিক্‌দর্শন এবং তা কাজে সংগঠন করে নারী সমাজের ও মানুষের কল্যাণ সাধন তিনি আশ্চর্যভাবে করে গেছেন। করেছেন।

আমি বেশীর ভাগ সময়েই বিদেশে প্রবাসে থেকেছি এবং সেকালের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। কাজেই বাইরের কাজ কোন কিছুর সঙ্গে পরিচয় শুধু পত্র পত্রিকা পড়ার মারফৎই হয়েছে।

"বিদ্যাসাগর বাণীভবন" "নারী শিক্ষা সমিতি" নামগুলি আমার শুধু পড়াই ছিল।

একদিন ঘটনাচক্রে শ্রীমতী অশোকা গুপ্তর সঙ্গে কোথায় যাবার পথে তাঁর বাড়ীতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তার দরকার থাকায় সে নাবল। আমিও নাবলাম তাঁকে দেখার জন্যই। (১৯৫১)।

সেই আমার জগদ্বিখ্যাত স্বামীর পত্নী ও স্বনামধন্যা লেডী অবলা বসুকে প্রথম দেখা আর চেনা।

ওঁদের কাজের কথায় ও আলোচনাতে আমারও কৌতূহল জাগল তাঁর নিজের কথা কিছু জানার এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির কথা জানবার।

লেডী বসু ঐ প্রতিষ্ঠান দু'টির দু'খানি কার্যবিবরণী দিলেন। কিন্তু শুধু বিবরণীর চেয়ে বিশিষ্ট ঐ মানুষটির কথাই আমার জানার লোভ হ'ল। কার্য-বিবরণী ত সকলেই পড়ে নিতে পারবেন, সেকথা থাক।

আমি দেখছিলাম মানুষটিকে। এত বয়সেও, অশীতি-পর বয়সেও, কি পরিচ্ছন্ন কাজ ও চিন্তার ধারা। সমস্ত জীবন ও সাধনা সব ঐ দু'টি নারী কল্যাণ সংঘের জন্য শেষ করে'দিয়েও তাঁর কি ভাবনা তার জন্য।

তাঁর নিজের কথা তাঁর নিজের কাছেই শুনব বলে তারপরে কয়েকদিন তাঁর কাছে গেলাম।

জীবন-কথা বলতে ও আত্মপ্রচারে অনভ্যস্ত মানুষটির কাছে যে কথা কয়েকটি পেলাম তা আগে গল্পভারতীতে (১৯৫১) আর গত ভাদ্র ১৩৭১ সালের দৈনিক বসুমতীতে বলেছি। তবু তাঁর মুখের কথাই আবার বলছি।

তিনি বললেন, "সেকালের একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মেয়ে আমি। বাড়ী আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগততে সব সময়ে ভরা থাকত। দেশের বহু ছাত্রও পড়াশোনা করতেন আমাদের কলকাতার বাড়ীতে থেকে।"

মৃদু হেসে বললেন, "তখন ত হোটেল ছিল না। গ্রামের লোকদেরও আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না বাড়ীতে। শুনেছি একবার বাড়ীতে অতিথিদের ঠিকমত যত্ন না হওয়ায় গৃহস্বামী রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন! এমনি তাঁদের কঠোর অতিথিপরায়ণতা ছিল।

"জ্যাঠামশাই কালীমোহন দাশের ছেলে মাত্র একটিই ছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্যও আদর-যত্নের আলাদা ব্যবস্থা কখনও ছিল না।

"আশ্রিত ছাত্রেরা, অভ্যাগত, অতিথিরা, বাড়ীর ছেলেরা একই বৈঠকখানায় বসে পড়াশোনা করেছেন। রাত্রে অতিথি আর ছাত্রেরা সেখানেই শুতেন।

"আমার দিদির সরলা রায়ের (মিসেস পি, কে, রায়) জন্মের সময় একটা ঘটনাতে আমার পিতা কলকাতার বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন। সে ঘটনা হল একটি ভাল ঘরে আঁতুড়ের ব্যবস্থা করা। তখনকার দিনে আঁতুড় ঘর হত উঠানে। চালাঘর তুলে কিংবা কোন খারাপ ঘরে। এই নিয়ে এত মতান্তর হয় যে আমার পিতামহী আমার বাবাকে একটি মোহর (তখন মোহরের দাম ২৪৲ টাকা) হাতে

আসন্ন প্রসবা বধূর সহিত কলকাতার বাড়ী থেকে বিদায় দিয়ে দেন।

"জ্যাঠামশাই কালীমোহন দাশ তখন বরিশালে সরকারী উকীল। তিনি ভাইকে সেখানে ওকালতী করার ব্যবস্থা করে দেন।

"আমরা চারটি ভাইবোন হবার পর বাবা কলকাতায় ফিরে আসেন। তখনও তিনি ব্রাহ্ম হন নি। আমরা ভাইবোন ছ'জন ছিলাম।

"আমার প্রথম শিক্ষা হয় মিস লেমনীর স্কুলে। তারপর মিস ক্রয়েডের স্কুলে কিছুদিন পড়ি। এরপর বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে পড়ি। এই স্কুলটা বাবা আর আনন্দমোহন বসু দুজনে মিলে করেন। পরে এই স্কুলটা বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়।

"আমাদের সেকালে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য খুব উৎসাহ ছিল। দেশকে পরাধীন আর বাঙালী বলিষ্ঠ জাত নয়, একথা সকলেরই খুব মনে হত।

"আমরা নানা রকম ব্যায়াম করতাম। এমন কি ডন-বৈঠকও করতাম। তখনও আমাদের দলে অনেক মেয়ে ছিলেন, কবি কামিনী রায়ও (সেন) ছিলেন সে দলে।

"বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তারী পড়ানো। দরকার হলে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহ করতে পারি যেন। তাই আই.এ. (এফ. এ) পড়তে পড়তেই মাদ্রাজে মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। পাছে নিতান্ত একলা পড়ি এজন্য আমার একটা সহপাঠিনীকেও আমার সঙ্গে পাঠালেন তাঁর সমস্ত খরচ দিয়েই।

"সেখানে দু বছর পড়ার পর খুবই ম্যালেরিয়ায় ভুগতে লাগলাম, বাবা কলকাতায় নিয়ে এলেন।

"তখন জগদীশ বসু বিলাত থেকে ফিরেছেন। বিয়ের কথা আমাদের আগে থাকতেই ঠিক ছিল।

"আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিয়ে করতে চাইলেন। সকলের মনে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু তিনি বললেন বিয়ের পর সেরে যাবে।

"সত্যই সেরে উঠ্‌লাম।

"বিয়ের পর প্রথম ছ'মাস আমরা আলাদা ভাবে থাকি। তারপর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে একত্রেই ছিলাম। আমার পাঁচটি ননদ ছিলেন। বিয়ের ৮ বছর পরে শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। শাশুড়ী নিষ্ঠাবান হিন্দু ঘরের মত আচার পালন করতেন। প্রথমটা আমার হাতে খেতেন না। পরে আমার কাজ নইলে তাঁর পছন্দই হত না। তিনি শ্বশুরের অল্পদিন পরেই মারা যান।

* * * *

"আমার বিদ্যাসাগর বাণীভবন আর মহিলা শিল্পাশ্রমের কল্পনা মনে ওঠে ইয়োরোপ ও জাপান ভ্রমণের সময়।

"দেশের কথা আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভাবতাম। দেশের কাজ আর উন্নতি করা আমাদের আদর্শ ছিল। বসু মহাশয় নিজের ব্যক্তিগত কথা, ঐশ্বর্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কখনও ভাবেন নি।

"আমরা যখন দেশবিদেশ ঘুরে জাপান গেলাম, তাদের দেশ, তাদের মেয়েদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পল্লী-গ্রামেও যেমন তাদের পরিচ্ছন্নতা নিয়মানুবর্তিতা তেমনি শিষ্টাচার ও মার্জিত ব্যবহার। পথেঘাটে নোংরামি নেই। গোলমাল নেই। দেশের মেয়েরা দেশের সব কথা জানে। লেখাপড়া জানে। ভাবে।

"সেই সময়েই আমার মনে হয়েছিল সকলের আগে মেয়েদের শিক্ষা পাওয়া লেখাপড়া শেখা দরকার। যাতে তারা নিজেরা সব বোঝে। ভাবতে শেখে।

"দেশে ফিরে দেখলাম যেমন শিক্ষারও অভাব, শিক্ষয়িত্রীর অভাবও তেমনি।...

"সেই শিক্ষয়িত্রীর অভাব থেকেই 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন' গড়ে উঠল। এখানে বিধবা ছাড়া অন্য মেয়ে নেওয়া হয় না। প্রতি বছরই ট্রেনিং পাশ করে অনেক মেয়ে বেরিয়ে যায়। আর টাকাও এই কাজের জন্য অনেক জায়গা থেকে পেলাম।

"একজন মহিলা হরিমতি দত্ত নামে তিনি ঐ শিক্ষাশ্রমের বাড়ীটি তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দেন। আরো ইচ্ছা ছিল তাঁর দেবার। কিন্তু দেবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ী ছিল ভবানীপুরে। বিধবা ছিলেন।"

আমি অবাক হয়ে শুনছি, কতদিন আগের কথা। কিন্তু ঐ দান পাওয়া, সাহায্য পাওয়ার আশ্চর্য ঘটনা শুনি। মনে পড়ে গেল সেকালের ব্রাহ্ম-সমাজে একটি কথা খুব

চলিত ছিল (রাজনারায়ণ বসুর লেখায়) "সংকল্প যাহার সাধু ঈশ্বর তার সহায়"।

আত্মকথা বিস্তৃত ভাবে বলতে অনভ্যস্ত লেডী বসুর শান্ত নির্লিপ্ত মনে কথা বলা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু কথা দিয়ে আর কতটুকু মানুষকে জানা বা পাওয়া যায়। তাঁর বৃহৎ ও মহৎ এবং সত্য পরিচয় রয়েছে তাঁর কাজ-কর্মে, এই সব সংগঠনে। এই দেশের জন্য ভাবনায়, দেশের দুঃস্থ নারীদের কথা ভাবায়। তাদের উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন, জীবনের পথে আশ্চর্য উৎসাহের সঞ্চার ও লক্ষ্য নির্ণয়ের দিক্‌-দর্শনে। যে লক্ষ্য নির্ণয় হিন্দুর অন্তঃপুর সমাজে গ্রামসমাজে হতাশ দীন বিধবা সমাজে তথনও বিশেষভাবে কেউ করেন নি। ভাবেনও নি। যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁরা বিধবাবিবাহ প্রচার ও বাল্যবিবাহ উচ্ছেদ—এই সব সামাজিক সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন। এক জীবিকা-দাতার অভাবে আর এক জীবিকাদাতার কথা ভাবা সেটা। মূল বিষয়টি নিয়ে মেয়েদের দিক দিয়েই তাঁরা সংস্কার করতে তথনও এগিয়ে আসেন নি। তার সঙ্গে অবশ্য শিক্ষার কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন।

বিবেকানন্দের উক্তিতেও পাই, "নারীকে শিক্ষা দাও আগে। তা হলে তার সমস্যার সমাধান সে নিজে করে নিতে পারবে।"

দেখলাম ঐ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সহধর্মিণীর এই আদর্শ ও কর্মময় নীরব নিষ্ঠাময় কর্মধারার কথা ভারতবর্ষের নারীসমাজে একটা আশ্চর্য ঘটনা।

যিনি অনায়াসে পতির খ্যাতিতে ও কর্মেই শান্তি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন।

কিন্তু তিনি কোথা থেকে আপনার পরিকল্পনা ও আদর্শে একটি দীন আতুর দুঃস্থ নারী-সমাজের জীবন সংগঠনের পথ ও লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন! সেই ১৯১৯ সালে—আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেই। যথন মেয়েদের বর্ণপরিচয়ও গ্রামে প্রায় হত না। ঘোরতর পর্দা। বিবাহের বয়সের কঠিন রকম বাঁধাবাঁধি। যথন এক বছর থেকে পাঁচ বছরের বিধবা সংখ্যাই লক্ষ লক্ষ ছিল।

* * *

আবার শুনতে পাই। "বসু মহাশয়ের পিতৃঋণ পরিশোধ" ঐ বিজ্ঞান সাধনা, ঐ সত্য প্রচারের প্রাণপণ চেষ্টার মাঝেই হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র সহচারিণী ছিলেন। বিবেকানন্দের চিঠিতেও পাই (পত্রাবলী) প্যারিসে পরিচিত ঐ বসুদম্পতীর কথা। স্বদেশের খ্যাতিতে গর্ব, আনন্দময় মন্তব্য। বিদেশে এই স্বদেশবাসীর সম্মানলাভের ঘটনায় ঐ সন্ন্যাসীর আনন্দের সীমা ছিল না।

আমি কার্য-বিবরণী দেখছি। পড়ছি।

দেখলাম, "বাণীভবনের মেয়েরা সাধারণ হিন্দু বিধবার মতই সামাজিক নিয়মানুযায়ী থাকবেন বেশভূষা ও আচার-নিয়মে।"

একটু ভাবলাম। মনে হল সব বয়সে ও সব ঘরে ত সমানভাবে নিয়ম-আচার মানা হয়ে ওঠে না। হয় না। কিছু বললাম না। প্রশ্নও করলাম না।

তিনি আবার কথাচ্ছলে বললেন, "আমি মহিলা শিল্পভবনে মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কথকতার ব্যবস্থাও করি ভাল জ্ঞানী পণ্ডিতদের দিয়ে। যাতে তাঁরা তাঁদের সমাজের ধর্মের আদর্শের কথা শুনতে পান, ধারা থেকে সরে না যান।"

কে কথকতা করেন তাও নাম বললেন। নাম আর মনে নেই।

অবাক হয়ে বুঝলাম কত দূরদর্শিতা তাঁর, কত গভীর ভাবে ভেবে দেখেছেন, যাঁরা বিদ্যাসাগর বাণীভবন থেকে শিক্ষালাভ করে গ্রামে গ্রামে শিক্ষিকা হয়ে যাবেন, যদি তাঁদের নিজেদের সমাজের আদর্শ ও নিষ্ঠার কোন বিচ্যুতি বা ত্রুটি হয়, গ্রাম্য সমাজ জীবন তাঁদের ঠিক ভাবে নিতে পারবে না। পছন্দও করবে না। তাঁরা যে সমাজের মানুষ, সে সমাজে শিক্ষাদান করবেন ঠিক সেখানকার আদর্শের মতই তাঁদের জীবন-ধারা না হলে তাঁরাও কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাবেন। সমাজও যথোচিত সম্মান করবে না।

যত কথা বসে বসে শুনেছি ক'দিন ধরে তার খানিকটা দিলাম। তাতেও ঐ আশী বছর উত্তীর্ণ জীবনের—সমাজের জন্য ভাবনা বেদনা অনুভূতির—তার পর কর্মজগতে এসে দাঁড়িয়ে সেই সমাজকে আহ্বান, নিঃসম্বল, নিঃসহায় ভাবেই সে কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ সেকথা একটি বড় জীবন-চরিতের কাহিনী—সে কথা এতটুকু চিত্রে চিত্রিত করা যাবে না। তাঁর অসাধারণ নীরব নেত্রীশক্তি ও কর্মশক্তির এই একত্র

সাধনা যেমন ছিল, আবার পারিবারিক জীবন অসাধারণ স্বামীর কর্মময় জগতেও তাঁর স্বামীর জন্য ভাবনা ও কর্মের দায়িত্ব কম ছিল না!

অনেক দিন আগের এক পত্রিকা "হিন্দুস্থান"-সম্পাদক (১৯২১-২২) ললিতমোহন গুপ্তের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গের একটি মন্তব্য মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, 'সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্যবান শরীর যত সহজে মানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে,...তেমন আর কিছুতে হয় না।'...

মনে হল, পতির কর্ম-জগত, জ্ঞান-জগতেও তিনি যেমন সহচারিণী ছিলেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে—আবার নিজের ও কল্পনার কর্মজগতটি তেমনি তারি মাঝে নীরব সাধনায় গড়ে তুলেছেন আত্মপ্রচার না করে—এমন অসাধারণ নারীর কথা আমার ঐটুকু দেখায় কতটুকু বলা যাবে?

তবু তখনিকার রিপোর্টেই দেখতে পাচ্ছি তাঁর কর্ম-সাফল্যের বিবরণ।

১৯১৯ সালে মাত্র তিনটি বিধবা মেয়ে নিয়ে সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২২ সালে "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন" প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে খাওয়া ও শিক্ষার জন্য কোন খরচ নেওয়া হয় না ভবন-আশ্রমবাসিনীদের কাছে।

তার পর থেকে এই তাঁর জীবিতকালেই ১৯৫১ সাল অবধি গ্রামে গ্রামে (৫৯) উনষাটটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রায় কুড়ি হাজার মেয়েকে তাঁরা নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এ ছাড়া প্রতি বছর প্রায় ষাট জন বিধবা নারী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই কল্যাণ সমিতি জ্ঞান ও কর্মের দীপশিখা জ্বেলে চলেছেন গ্রামে গ্রামে। দেশ বিভাগের পর এক গ্রামের কিছু পূর্ব বাংলায় রয়ে গেছে।

পুস্তিকার রিপোর্টে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে সত্য কাজ যে কত বিস্তৃত আর গভীর সেইটেই ভাববার ও দেখবার বিষয়। কলিকাতায়ও কয়েকটি এর শাখা আছে। বিস্তৃত শাখা আছে ঝাড়গ্রামে একটি।

সমস্ত ভারতে নারী সংগঠিত এমন প্রতিষ্ঠান আর নেই। এবং এইটিই প্রথম এদেশে, এই লেডী বসুর কর্ম-কৃতি ও কীর্তি।

এই সমিতির নামকরণটিও প্রথম পড়ে ও শুনেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন"।

মনে হয়েছিল কত গভীর শ্রদ্ধাময় এই নামকরণ!

এও লেডী অবলা বসুর আদর্শময় জীবনের ও দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়।

উনিশ শতকের অসংখ্য মহামনস্বী মনীষী পুরুষদের মাঝে এই মহৎ ও বৃহৎ কর্মে লেডী অবলা বসুই প্রথমতমা নারী। তাঁর আগেও এমন কারুকে আমরা পাই নি। পরেও এত বড় কর্ম-সংগঠন এখনও কারুর দ্বারা হয় নি।

—

এ প্রাইস অন হিজ হেড

লেখিকা — শ্রীমতী আনা সেঘার্স

অনুবাদিকা — শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

"বেশ, তাই হোক" বলে রেডিওটা বন্ধ করে দেয় ব্রাইডাইজ। কিন্তু কুঙ্কেল তাড়াতাড়ি আবার খুলে দেয় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ শোনার জন্য। ওরা আটজন মিলে বসেছিল কুঙ্কেলের চালাঘরে। ব্রাইডাইজ তার এক আত্মীয় হাইনরিশ ব্রাইডাইজএর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল গ্রুপগুলোর নতুন বিন্যাস দেখবার জন্য। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মতই ব্রাইডাইজএর চিবুকটা ছিল সঁচোলো এবং চোখ দুটো গায়ে গায়ে ঠাসা। তবে উন্মাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ ছিল তার তরুণ মুখখানায়। পাপেনের বক্তৃতা শোনার জন্য রেডিও আছে এমন কোনও জায়গায় থামতে চেয়েছিল সে। তার গাড়িটা কুঙ্কেলের গরমিঘরের সামনে দাঁড় করান ছিল। যে চালাটায় দিন কতক আগে কোয়েসলিন এবং কুঙ্কেল একত্র হয়েছিল সেখানেই একটা রং-করা বাক্সের উপর বসেছিল সে।

ইতিমধ্যে কোয়েসলিন পুরাণো বাক্স সাজিয়ে আর একটা যন্ত্রপাতি রাখবার চালা তৈরী করে নিয়েছে। এটা পুরাণো চালাটার লাগোয়া, পুরাণো চালাটাকে সে শোবার ঘরে পরিণত করেছে। বিদ্যুৎবাহী তারগুলোকে সে এ ঘরে এনেছে এবং রেডিও বসিয়েছে, আবার একটা চট রাঙিয়ে তা দিয়ে বিছানা ঢেকেছে। পত্রিকা থেকে ছবি কেটে দেয়ালে টাঙিয়েছে। কোয়েসলিন জানত সে হয়ত আগামী অক্টোবরে বিট তোলার পর আর এখানে থাকবে না, কিন্তু সেজন্য সে যেন চিরকালই থাকবে এমন ভাবে গোছগাছ করে ঘরোয়া হয়ে নিতে তার বাধে নি। যখন কোয়েসলিনের হাতে কোনও ভাঙা যন্ত্র পড়ত সে সেটাকে মেরামত করে ছাড়া তুলত না। কোয়েসলিন যেখানেই যেত জোড়ে জোড় লেগে যেত এবং বাঁকা পেরেকটাও ঠিক নিজের গর্তে ঢুকে পড়ত। এই শূন্য বছর কটায় এরকম এক জোড়া হাত নিয়ে সে যে কি করেছে তা ভাবাই যায় না। বিপুল কার্যকারিতার শক্তি এই মানুষটার মধ্যে সঞ্চিত ছিল। এ শক্তি ধ্বংস থেকে বাঁচাত জীবনের ছোট-খাট জিনিসগুলোকে, যেমন তক্তা কিংবা বীজ, সাজসরঞ্জাম কিংবা ঘরের চালখানাকে।

ইচ্ছে না করেও ব্রাইডাইজের নজর বার বার কোয়েসলিনের উপর পড়ছিল। ছেলেটা যেন গ্রামে এসে মুকুলিত হয়ে উঠেছে। তার তামাটে শান্ত মুখে উত্তেজনার কোনও ছাপ ছিল না। ব্রাইডাইজ বলে "এক সপ্তাহের মধ্যে আবার তোমরা ইউনিফর্ম পাবে।" কোয়েসলিন ধীরে ধীরে জবাব দেয় "ব্যাপারটার দুটো দিক আছে, আমরা পাপেনের কাছ থেকে ইউনিফর্ম পাব, আমাদের কাছ থেকে প্রতিদানে তিনি কি পাবেন? নিডারভাইলারবাখের গ্রুপের নেতা চারপাশে ছেলেদের নিয়ে মেঝেতে বসেছিল। সে বলে: "বাজে কথা, আর আমরা ভোলাতে দিচ্ছিনে ওদের।"

ব্রাইডাইজ বলে: "এস, চটপট সেরে ফেলা যাক, আমাকে বেরোতে হবে। ওবারভাইলারবাখের তোমরা এক মাসের মধ্যে তোমাদের আটজনের গ্রুপ তৈরী করে ফেলবে। কি বল? বেশ, তা হলে তাই ঠিক রইল। কুঙ্কেল হবে গ্রুপের নেতা।" কোয়েসলিন একটুখানি আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করে। সে জায়গাটাকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়েছে, যা-কিছু করবার সবই সে করেছে। গত সপ্তাহে সে তরুণ আলগাইয়ারকে পর্যন্ত পাকড়েছে। (বাবার নিষ্ফল সহর অভিযানের পর পাউল শেষ পর্যন্ত ওদের অনুনয়ে রাজি হয়ে গেছে যোগ দিতে।) বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য একজন মান্যগণ্য খামার মালিক যার পিছনে লোক রয়েছে-সে রকম লোককেই বাছা ভাল তার মত লোকের বদলে। তাকে লোকে অনেকটা মাইনে-করা জোগাড়ে হিসেবে দেখবে। ব্রাইডাইজ ঠিকই করেছে।

সবাই কুঙ্কেলের দিকে চায়, তার মুখ দেখে কিছু ভাব বোঝা যায় না। ব্রাইডাইজ বলতে থাকে: "শীগগিরই

এখানে তোমাদের প্রথম 'সভা হবে। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত হও। আমি থাকব না তোমাদের সঙ্গে। এখন থেকে তোমরা আর বিল্লিঞ্জেনের অধীনে নয়। নিডার-ভাইলারবাথ, ওবারভাইলারবাথ, বটৎসেন এবং বয়রেন মিলে এখন ঝড় তুলে যাবে। ঝটিকাবাহিনীর নেতা হ'ল বটৎসেনবাখের ৎসিল্লিশ।

আবার কোয়েসলিনের মন কুশবিদ্ধ হয়। সবাই বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু সে হ'ল প্রীতিকর বিস্ময়। কোয়েসলিন নিজেকে বোঝায় যে সে ৎসিল্লিশকে 'সামান্যই জানে। আশ্চর্য কম সময়ের মধ্যে ৎসিল্লিশ আটজনের একটা গ্রুপ তৈরী করে তুলেছে বটৎসেনবাখে, যদিও এই বটৎসেনবাথ এক কালে লালেদের একটা মূল ঘাঁটি ছিল। আর আসলে বয়রেন গ্রুপটাকেও সেই গড়ে তুলেছে।

ৎসিল্লিশ ছিল ভারী গাট্টাগোট্টা ধরনের চাষী, বয়স তেমন কম নয়, দাড়ি-গোফ এবং চুল কামান। লোকে বলে তার চুলের জন্যই সে এই রকম। তার গায়ের জোর খুব, নৃশংসতার জন্য সে পরিচিত ছিল সকলের কাছে। দুমাস আগে বিল্লিঞ্জেনে লালেদের আয়োজিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় একটা গাড়ি আসবার কথা ছিল, রাস্তা জুড়ে টান টান করে তার বেধে দিয়েছিল সে। এই ত সেদিন সে ইবস্টএর চোখ উপড়ে নিয়েছিল, কারণ সে ছিল লালমোর্চার একজন সৈনিক। মোকদ্দমা এখনও ঝুলে আছে।

কোয়েসলিন নিজেকে প্রশ্ন করে কেন সব লোক ছেড়ে ৎসিল্লিশ, যার ছয় ছেলেমেয়ে এবং যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সে ইবস্টকে এত ভয়ঙ্কর রকম ঘৃণা করে। কোয়েসলিন বিশ্বাস করে যে ৎসিল্লিশ লালদের ঘৃণা করে এই জন্যে যে, ৎসিল্লিশ জমির জন্য পাগল আর লালেরা চায় জমি দখল করতে। সে ওদের ঘৃণা করে কারণ সে গরুর মালিক হবার স্বপ্ন দেখে আর লালেরা সেই গরু তাড়িয়ে দিতে চায়। সে ওদের ঘৃণা করে, কারণ তারা ওর ভগবানকে তাচ্ছিল্য করে যে ভগবানের পায়ে কখনও কখনও সে তার নৃশংসতার ভয়ঙ্কর ভারকে নিবেদন করে তার দহন থেকে জীবনকে শীতল করতে চায়।

ব্রাইডাইজ বলে: "এ কথা হ'ল তোমাদের আর আমার মধ্যে, বলতে পার, প্রাথমিক কথাবার্তা। গ্রুপ-নেতাদের মধ্যে আলোচনা বুধবার সন্ধ্যায় নিডারভাইলারবাথে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তোমরা সময় মত পাবে।"

ব্রাইডাইজ উঠে পড়ে। সকলে তাকে অনুসরণ করে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। গরমিঘরের সামনে গাড়ির আশে-পাশে যে লোকগুলো জমেছিল তীক্ষ্ণ "হাইল" ধ্বনিতে তারা চমকে ওঠে।

ব্রাইডাইজ চলে গেলে ছেলেগুলো আলোচনা সুরু করে এক্ষুনি যা শুনল সে সব নিয়ে। কোয়েসলিন চিন্তামগ্ন হয়। সব মিলিয়ে ৎসিল্লিশকে সে বেশ বুঝতে পারে। বাড়ী থাকতে তার উপর চাপ পড়েছে বাম ও দক্ষিণ থেকে, সেই চাপ রাস্তায় পরিবারের মধ্যে এবং ডোলের কিউতে। সে তার সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে। হাজার হলেও সে বস্তা-বন্দী হতে চায় না, তা থেকে বেরোতে চায়। বাইরের লোকের মধ্যে জীবন আরও কঠিন, আরও জটিল, এ ত ঘর নয়। কোয়েসলিনের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই তার মাতৃভূমি— কাঠের বাক্সগুলোর মাঝখানে গরমিঘরের এই বালুকাময় অবহেলিত জমিটুকু।

॥ ৪ ॥

গির্জার পর লুইজে মেরৎস এবং শিক্ষক হাইনরিশ রিফকে পাদ্রীর কাছে যায় তাদের বাগদানের কথা ঘোষণা করতে। মেরৎসগিন্নী দুপুরের খাবার তৈরীর জন্য বাড়ী ফিরে গেল। বিয়ের খানা নয়, কিন্তু তাদের বাড়ীর সঙ্গে রিফকের প্রথম ভোজনের নিমন্ত্রণের।

বুড়ো মেরৎস এবং তার ছেলে কনরাড বাস্টিয়ানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

লুইজে মেরৎস-এর মাথায় টুপি এবং পরণে গাঢ় রঙের শহুরে পোশাক। ভাবী বরের উপর সে প্রায় একহাত লম্বা। তারা অবশ্য এখনও হাতে হাত জড়িয়ে হাঁটছিল না, তবে চাষীরা তাদের বাগদত্ত জোড়ের মতই দেখছিল। রিফকে লজ্জাবোধ ক'রে সোজা সামনের দিকে চাইছিল, কিন্তু লুইজে মেরৎস চারপাশের একটু বিদ্রূপাত্মক অভিনন্দনকে শান্তভাবে গ্রহণ করে বুক ফুলিয়ে চলছিল। তার কালো উজ্জ্বল চোখ গর্বের সঙ্গে চতুর্দিকে চাইছিল। চাষীরা বলছিল: "মেয়েটা দিব্যি দেখতে।" "যথাসময়ের আগেই পেনসন পেয়ে যেতে হবে ওকে।" "নতুন বিছানায় হয়ত রিফকেরও শ্রী ফিরবে।"

বাগানের ছায়াঢাকা পথ দিয়ে ওরা পাদ্রীর ঘরে পৌছয়। পাদ্রী ব্রাউমুয়েল্লার এর মধ্যেই ঘরের পোশাক পরে ফেলেছে। দেখেই বোঝা যায় যে গির্জার কাজকর্মের পরও বাগান করা এবং এ-অঞ্চল থেকে ও-অঞ্চলে ঘোরার জন্য তাঁর যথেষ্ট সময় থাকে। রোদে-পোড়া তামাটে মুখে দুটো সরু কাটার দাগ। এখানে বেশীদিন আসে নি সে। লোকে বলে যে একটা সহুরে অঞ্চল থেকে তাকে এখানে বদলি হতে হয়েছে, কারণ গির্জায় বক্তৃতার সময় সে বড্ড বেশী পার্থিব ব্যাপারের আলোচনা করত। কিন্তু ব্রাউ-

মুয়েল্লারকে দেখলে মনে হয় নিজের ভাগ্যে সে বেশ সন্তুষ্ট। বিল্লিঞ্জেনের ব্রাইডাইজ পরিবারের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাব, তারা প্রায়ই এ-অঞ্চল থেকে ও-অঞ্চল সফরে ওকে সঙ্গে নেয়। তার বাড়ীর পিছনের জানলাটা খুললেই চোখে পড়ে এক টুকরো সরু বনরেখা। ঘরের ভিতর ফুলদানি ভর্তি ডালিয়া এবং গ্রীষ্মকালীন এস্টর, এক দেওয়ালে একটা বইয়ের সেলফ, বিসমার্কের ছবিওয়ালা এক বিরাট ডেস্ক, তার মাথায় মুখোমুখি ঝুলছে ডয়রারের আঁকা লুথার এবং ক্রানাথএর আঁকা মেলানথ্‌থনের ছবি।

পাদ্রীর স্ত্রী ছোট্ট রুগ্ন মহিলা, তার উপর তিন সন্তানের জন্ম দিয়ে দুর্বল। সে মদের বোতল খোলে, গ্লাস এবং বেলে বিস্কুট নিয়ে আসে। ব্রাউমুয়েল্লার বলে: "তুমি বেশ ভাল পছন্দ করেছ রিফকে। এ তোমার উপযুক্ত স্ত্রী, জলের মাছের মত স্বাস্থ্যবতী। কুমারী লুইজে, তুমি ত তোমার স্কুলের শেষ কয়েক বছর সহরে পড়েছ, তাই না?"

তার বদলে রিফকে উত্তর দেয়: "হাঁ, দু'বছর ও সহরের একটা মেয়েস্কুলে পড়েছে। আমাদের বিয়ে হলে এক মজার ব্যাপার হবে যদি দেখি যে আমি যা ওকে মুখস্থ করিয়েছি, ওর কাছ থেকে কেবল তাই বেরিয়ে আসছে।

লুইজে ছাড়া সবাই হেসে ওঠে। সে শান্তভাবে বলে: "দু বছর আমি হিসেব রাখা এবং ঘরের কাজ করা শিখেছি।" ব্রাউমুয়েল্লার বলে: "তোমার ভাবী স্বামীর কাছ থেকে আঙ্গুলের জোড়ের উপর গুঁতো খেয়েছ বোধ হয়।" রিফকে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়: "না, না, ও সব সময়ে মানিয়ে চলত।"

লুইজের হাত দুখানা তার ভালই মনে আছে, সুন্দর করে ভাঁজ করা থাকত আর অন্যদের চাইতে একটু বেশী সাদা ছিল। এক এক সময়ে বেত তোলবার জন্য হাত চুলবুল করে উঠত রিফকের, কিন্তু বেতখানাকে সামলে নিত সে। এই বড়সড় অলস এবং ইতিমধ্যে পরিণত মেয়েটাকে শাসন করার ব্যাপারে সে সংযত থাকত। একবার বেত ফসকানর মানে হয়ত এক বোতল মধু, একখানা প্লাম কেক, একটা কাল সসেজ অথবা আরও কিছু মারা যাওয়া। তখন থেকেই রিফকের নিজস্ব মতলব ছিল: মা মরে গেলে তাঁকে আর ভরণপোষণ করতে হবে না। তখনও যদি এই গর্তে পড়ে থাকতে হয় তা হলে অন্ততঃ তার আরাম চাই, ভরপেট চাই।

রিফকে চমকে ওঠে যখন হঠাৎ ব্রাউমুয়েল্লার জিজ্ঞাসা করে: "ভাল কথা, হের রিফকে, প্রুশিয়ার এই নতুন লোকটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?"

"বলার কি আছে? আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে।"

কিন্তু ব্রাউমুয়েল্লার বলে: "দেখ রিফকে, এই একবার বোধ হয় আমাদের দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। যা হোক, পুরাণো লোকটা চলে গিয়ে বাঁচা গেল এ কথা বলতে আমি ভয় পাব না।"

রিফকে ভাবল সহরে আত্মীয় থাকার দরুণ ব্রাউমুয়েল্লার নিশ্চয় ভালই জানে কতটা মাথা দেওয়া উচিত। আজ সকালের গির্জার বক্তৃতায় সে উল্লেখ করছে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ-ভর্তি সিন্দুক গরুগাড়িতে চাপিয়ে ইহুদীদের নিয়ে পালানর কথা—ওই সিন্দুক ছাড়া ফসল কাটার সময় মুস্কিলে পড়তে হ'ত। হতভম্ব চাষীদের বলেছে ব্রাউমুয়েল্লার যে এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলতে সুরু করবার পর সিন্দুকটা পিছনে গিয়েছিল, একটা লোক সেটা ধরেছিল। কিন্তু ভগবান তাকে এই যত্নের কঠিন প্রতিদান দিলেন, ঘটনাস্থলেই বাজ পড়ে মারা গেল সে। "এগিয়ে পড়ে দায়িত্ব নেবার দম্ভ দেখালে মানুষের কি হবে পবিত্র বাইবেল এ লোকটাকে তার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিয়েছে।"

রিফকে বলে: "আবার একজন ক্যাথলিক হ'তে হ'ল।"

মদের গ্লাস থেকে একটা সাদা ডালিয়ার পাপড়ি উদ্ধার করে সে। লুইজে চুপি চুপি তাকে ঠেলা দেয়। বাড়ীতে নোনা জলে মাংসের পিঠে ফুটে ফুটে মরছে।

"হের রিফকে, হাজার হ'লেও এ ত বিয়ে নয়। তোমাদের দুজনের মত নয়। সে রকম হবার কথাও নয়। এ কেবল ফুলশয্যার খাটে ওঠার জন্য চৌকী।"

"তোমার এবং তোমার লুইজের জন্যে আমার বক্তৃতা করার দরকার নেই, যেমন অন্যান্য বাগদত্তদের বেলায় আমায় করতে হয়। তোমরা দুজনেই যথেষ্ট বুঝদার। জীবনকেও তোমরা জান। তোমাদের বাবা-মাকে আমার নমস্কার জানিও।"

শেষ পর্যন্ত তারা বেশী তাড়াতাড়িই বাড়ি পৌছে যায়, কারণ এদিকে ইতিমধ্যে কনরাড বাস্টিয়ান অতিথিদের বাগানের নতুন বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়েছে। গতকালই কেবল এই উদ্দেশ্যেই সে নতুন বেঞ্চিটা পেতেছে। রান্নাঘরে সোফির হাতে একটা প্লেট এবং ঘরে তৈরী প্লাম মদে ভর্তি তিনটি গ্লাস দেওয়া হয়েছে। সোফি বাস্টিয়ানের চেহারা

পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থভর্তি সিন্দুক—আর্ক অব কভেনান্ট এই বইতে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে চাষবাসের সম্বন্ধে—প্রয়োজনীয় তথ্য থাকত। বাইবেলের কাহিনী।

আদ্রিয়াজ বাস্টীয়ানের বড় মেয়ের মত। ওর ভ্রূজোড়াতেও কোনও রং নেই। কিন্তু তার চোখের পাতার গাঢ় পক্ষ্মের ছায়া এখন ভয়ে থমথমে বিবর্ণ মুখখানার উপর যেন ফুটে থাকে। তার পরনে গরম কালের পাতলা সাদা ফ্রক, অপরিসর গ্রীবায় এবং অনাবৃত বাহুতে শিরাগুলো দৃশ্যমান।

ডালিয়ার জমিতে নীল কাচের বলটার দিকে মুখ গোঁজ করে চেয়ে থাকে ছোট মেরৎস। পায়ের শব্দ শুনে সে ঘাড় ফেরায় এবং তাহার উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান মেয়েটির দিকে উত্তেজিতভাবে চায়। যাতে কিছু উপচে না পড়ে, তার জন্য আড়ষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে হাঁটছিল মেয়েটা। তরুণ মেরৎস হতাশ হয় এবং মেয়েটা যত কাছে আসে ওর হতাশা তত আরও বাড়তে থাকে। হতাশা লুকোনর চেষ্টা পর্যন্ত করে না সে। প্লেট থেকে একটা গ্লাস নিয়ে মদটা এক ঢোঁকে গিলে মুখ বিকৃত করে।

বাস্টিয়ান উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে : "এস মা, হাত মেলাও।"

সোফি হাত বাড়িয়ে দেয়, প্রথমে বুড়ো মেরৎস-এর দিকে, তারপর ছোট মেরৎস-এর দিকে। ভয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাত, হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে আঙুলের ডগায়। ছোট মেরৎস ঠাণ্ডা সরু আঙুলগুলোকে ছোট্ট মুঠোয় পাকিয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। ধীরে ধীরে তার মুখের চেহারা বদলায়—অবশেষে মুখে হাসি ফোটে—সারা বছরে এই প্রথম। তার বাবা তাড়াতাড়ি উচ্ছ্বসিত হাসি সামলে নেয়। বাস্টীয়ান যখন দেখে যে তার অতিথিদের মেজাজের হঠাৎ উন্নতি হয়েছে তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বুড়ো মেরৎস মেয়েটার হাত ছাড়ার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ছেলেকে একটা ঠেলা দেয়। মনে মনে কিন্তু এখন ছেলেকে তার খুবই পছন্দ হয় এবং সে কৌতুক অনুভব করে। কনরাড বাস্টিয়ানের বাপকে সে দেখেছে, সে ছিল নিতান্ত গরীব। মনের গভীরে বুড়ো মেরৎস ভাবে যে তার ছেলের যে বাস্টিয়ানদের মেয়েকে পছন্দ হয়েছে এ ওদের ভাগ্যের কথা।

ছোট মেরৎস এবার মেয়েটার হাত ছেড়ে দেয় বটে কিন্তু এখনও সরাসরি চেয়ে থাকে তার দিকে। মেয়েটার সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে যায়। কাঁধ জোড়া তার কাঁপতে থাকে। হাত দুটো ভারী হয়ে মোড়ের গর্ত থেকে ঘড়ির দোলকের মত এধার থেকে ওধারে দুলতে থাকে। বুড়ো মেরৎস অধীর হতে সুরু করে। কনরাড বাস্টিয়ান কিন্তু খুশী হয়। ছোট মেরৎস-এর মুখ দেখে কনে দেখার সাফল্যের কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। বাস্টিয়ান আশ্চর্যই হয়, কারণ তার ধারণা ছিল যে তার তা ওই রোগা বিবর্ণ মেয়েটার জন্য উপযুক্ত বর জোটান কষ্টকর হবে। অবশেষে সে বলে, "যাও মা, তোমার মাকে ডেকে আন।"

আর একবার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করে সোফি। ছোট মেরৎস তার কব্জিটা পাকড়ে ধরে। তারপর সে দৌড়ে রান্নাঘরে পালায়।

রান্নাঘরে মা, ঠাকুমা, বটৎসেনবাখের ধর্ম-মা আর ঝি ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিল। "কি রকম হ'ল? কি রকম হ'ল?" সোরগোল করে ওঠে তারা। সোফি জানলায় গুটিসুটি মেরে হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। মা তাকে ধরে মুখ থেকে হাত নামায়, অধীর ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে: "আরে বল্ না কিছু, বলতে পারিস নে!" সোফি কাঁদতে থাকে। মেয়েরা মুখে চক চক শব্দ করে বলে: "আ মলো!" ঠাকুমা হেসে ওঠে। বুড়ো লোকের হাসি যেমন হয়—মৃদু থক্‌থক্‌ হাসি। আর মা বলে "বেশ, এখন থেকেই যদি কান্না সুরু কর!"

॥ ৫ ॥

"তখন আমি পাম্পের দরুণ কিস্তির হিসেব করেছিলাম শূয়োর থেকে, মুরগী থেকে এবং আপেল থেকে যা বাড়তি পাব তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ বছরটা আপেলেরই বছর, গোল্ড এণ্ড সন কিলো-পিছু ছয় ফেনিশ দিচ্ছে—বিশ্বাস কর আর না কর। শূয়োরেরা ত নিজেরাই লাভটুকু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল কিস্তিবন্দীরই নড়ন-চড়ন নেই। বাস্টিয়ানের মুখের উপর গভীর বিহ্বলতার ছাপ পড়ে, টেবিলের উপর রাখা টাকা-পয়সাগুলোর প্রতিবিম্ব যেন।

"বাজার এলাকায় বসে আছে কাস্ট্রিৎসিউজ। সে কথা মনে রেখ। দাঁড়াও, তোমায় বলি কি করে হ'ল এটা। তখন পাশের বাড়ীর হাইজ্‌লার কেবল পাম্প বসিয়েছে। তুমি জান ওদের নিকলাজের বিয়ে হতে চলেছে। তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বলল, মেয়ে জল বইতে পারবে না। হাইজলারকে জিজ্ঞাসা করলাম তার পাম্পের সঙ্গে আমি পাইপ জুড়তে পারি কি না। সে বলল, না···

জোহান বলে : "প্রায় চারটে বাজতে চলল। এখন ওসব কথা না বললেও চলবে।" হঠাৎ তার মনে হ'ল অবশেষে তাকে সহরে যেতে দিতে হবে। গ্রাম যেন তার গলায় বোঝার মত ঝুলছে।

"অবশ্যই বলা দরকার যদি তুমি টাকা দিতে যাও। তোমার জানা দরকার কোথা থেকে সেটা এল। যখন সে না বলল তখন আমি মনে মনে বললাম ওকে জব্দ করার জন্য এখন আমি নিজেই পাইপ বসাব, যদি আমি মরেও

যাই তবু বলাব। আমি বললাম তাকে জব্দ করার জন্য। বুঝলে ত! আমাদের ডোরা কোথায়, কোথায় গেল? টাকাটা দেখতে দাও তাকে, যাতে সে বুঝতে পারে।”

মা বলে: “তুমি জান সে গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছে।”

“আমি নিকলাজের কাছ থেকে সাইকেলটা ধার নিতে পারি নে?” জিজ্ঞেস করে জোহান।

“না, পার না। আমি কোনও জিজ্ঞাসাবাদ চাইনে।”

টাকাটা পকেটে ফেলে জোহান। হঠাৎ বাস্টিয়ান বলে: “না, ফিরিয়ে দাও। ওদের সঙ্গে কথা বল। তুমি ত জান কি করে বলতে হয়। বল, বাকি অর্ধেক তুমি আর দু' হপ্তার মধ্যে দিয়ে আসবে। ওই হ'ল।”

যখন জোহান চলে গেল, বাস্টিয়ান ফের চমকে উঠল: “এই মার্গারেট, অপরিচিত ছেলেটার হাতে এত টাকা দিলাম!”

“ও ঠিক দিয়ে দেবে। ও ফিরে আসবে। তাছাড়া ওর জ্যাকেট রয়েছে এখনও, থলিও রয়েছে।”

বেড়ার দরজাটা বন্ধ করেই জোহান খুশী হয়ে ভাবে: অবশেষে! আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি সহরে পৌছব, আমার লোকজনকেও তখন খুঁজে পাব।

জানলায় দাঁড়িয়েছিল সুসান শুহেগলিন। তার কোলে নোংরা কম্বল জড়ানো একটা একরত্তি বাচ্চা। ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখে সে। প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়ে জোহান। আবার নয়গেবাওয়ার ডাইনিটার সঙ্গে দেখা হয়। এবার সে একটা ক্যাচকোঁচ আওয়াজ-করা হাতে-টানা গাড়ি নিয়ে চলেছিল। ঘাস, হলদে ঘাসফুল এবং কাঁটা-তোলা গোল গোল আগাছায় ভর্তি গাড়িখানা। একগাদা বাচ্চা চেঁচাতে চেঁচাতে তাকে ঘিরে ধরে, গাড়ি থেকে এক থামচা তুলে নেয়। ওকে ফের থামতে হয় সেগুলো কুড়োনোর জন্যে। না বুঝেই তাকে এড়িয়ে চলে জোহান।

সত্যি নোংরা একটা জীব। কিন্তু তারপরই সে একটু ভেবে তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকটিকে ঘাস কুড়োতে সাহায্যই করে। বনপথটা যেখানে চৌখুপীতে পড়েছে সেখানে ছাতি হাতে একজন বুড়ো দাঁড়িয়েছিল। যদিও সে ভিন্ন গ্রামের লোক, তবু এ গ্রামের লোকেরা তাকে সম্ভাষণ করছিল: “শুভ দিন, হের নাকটেল”। ওই বোধ হয় সেই ইহুদী। সে জোহানের দিকে তাকায় আর ভাবে নিশ্চয়ই: এদিকে নতুন মুখ। গ্রামের শেষে তার আলগাইয়ারের সঙ্গে দেখা হয়। ছেলের মুখের সামনে লম্বা হাত দোলাচ্ছিল সে। জোহান যখন আলগাইয়ারকে নমস্কার করে তখন আলগাইয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চায়।

খোলা বড় রাস্তায় এসে পড়ে ও। সমস্ত ফসল তোলা হয়ে গেছে, বাকি কেবল আলু আর বীট। এখানে-ওখানে সবুজ ঈষৎ আন্দোলিত সেই সমতলগুলো মিলিয়ে গিয়ে সমস্তটায় পরিষ্কার ফিটফাট মাটি বেরিয়ে পড়ার জন্য যেন সবার মন প্রায় ব্যাকুল হয়েছিল। নদীর ধারের ফসলকাটা হলদে জমিতে একপাল ভেড়া চরছিল, যেন ফিকে হলুদ মেঘের মত। একজোড়া ঘোড়া এবং লাঙল নিয়ে একটি চাষী প্রায় বাদামি হয়ে আসা ক্ষেতের এদিক থেকে ওদিকে প্রশান্ত সমাহিত ভাবে চলাচল করছিল। বিরাট দাড়িতে তাকে দেখাচ্ছিল যেন ভগবানের উকিল। জোহান তাকে চিনতে পারে: বুড়ো মেরৎস।

বনের কিনারে একটা ফাঁকা জায়গা থেকে কুড়োলের শব্দ ভেসে আসে মাঠের উপর দিয়ে। ও হ'ল প্রতিবেশীর ছেলে নিকলাজ। জোহান দৌড়তে সুরু করে। নিকলাজ হাইজলার তাকে ওর সম্পত্তির কথা এবং আসন্ন বিয়ের কথা বলছে। কুস্কেলের স্থানীয় গ্রুপে যোগ দিয়েছে ও। এ সভ্যপদের থেকে অনেক আশা তার এবং তার বাবার। তার বাবা যুদ্ধে আহত হয়েছিল। সামান্য কিছু পেন্সন পেত সে। নিকলাজ আশা করত, যে কোনও এক দিন সে তার ছেলের জন্য দায়দেনামুক্ত উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারবে। জোহান নিজের বাবার কথা ভাবে—সে তার ছেলের জন্য রেখে যাবে জন্মের সার্টিফিকেট, বেকার কার্ড আর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির একখানা সভ্যকার্ড, যাতে আবার দু' বছর হ'ল চাঁদা দেওয়ার ছাপ পড়ে নি।

তার ডাইনে আর বাঁয়ে প্রসারিত বীটের ক্ষেত। বড় রাস্তাটা রৌদ্রে বিছান শূন্য নদীগর্ভের উপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। জোহান শিস দেয়। শিস দেওয়াটা ওর মধ্যে বরাবর রয়ে গিয়েছে যখন তাদের গালগুলো ঠাণ্ডায় জমে যেত, বায়ুরোধী কোটের মধ্যে শীতে কাঁপত জোহান সেই তখনও তারা সবাই মিলে শিস দিত। ক্রিসমাস গাছে ঝোলান আলোর চঞ্চল কম্পমান শিখা অনেক জানলায় চিকচিক করত। ক্রিসমাস ক্যারোলের চিরন্তন আওয়াজে হাওয়াটা যেন গমগম করত। তবু তারা শিস দিত। সে হ'ল যেবার প্রথম তার মাথায় আঘাত লাগল। প্রথম বার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় বারে সে সরে গিয়েছিল। তৃতীয় বারে সে প্রত্যাঘাত করেছিল।

এবার সে একটা ছোট্ট বনের ভিতর দিয়ে যায়। কোমল উজ্জ্বল সূর্যালোককে অনুভব করতে ভাল লাগে তার। নিকলাজের কথা ভেবে হাসি পায়। সে এখনও বউএর সঙ্গে একত্রে থাকে নি, এরই মধ্যে উত্তরাধিকারীর কথা ভাবছে। জোহানের নিজের অবশ্য বোধ হয় কখনও

ছেলে হবে না। সহরে তার এক প্রিয়া ছিল—হের্থা। সহর ছাড়বার আগে তাকে সে বলেছিল : "তুমি অটোর সঙ্গ নাও না কেন? আমার পরে ত এমনিতেও ওই আসবে। এখন থেকেই বরং তুমি ওর সঙ্গে ঘোরাফেরা করলে পার। আমি কিছু মনে করব না, অর্থাৎ ওর সঙ্গে ঘুরতে তুমি কাল সুরু কর, কি পরশু সুরু কর, আমি কিছু মনে করব না।"

বনটা পিছনে ফেলে যায় সে। আবার আলুর ক্ষেত এবং অ-চষা জমি পার হ'তে থাকে। গোলাপী ব্লাউজ পরা একটু গোলগাল চেহারার একটি মেয়েকে ছাড়িয়ে যায় ও। কয়েক মিনিট ধরে ওরা পাশাপাশি হাটে। ওর ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে কথা বলবার। কিন্তু সেই গোড়ায় কথা বলে : "তুমি বাস্টিয়ানের আত্মীয় হও, তাই না?" ও মাথা নাড়ে। "আমার নাম মারি আলগাইয়ার, আমরা সমস্ত পথটাই একসঙ্গে হেঁটে আসতে পারতাম।" জিজ্ঞেস না করতেই সে কেন সহরে যাচ্ছে তা বলে। পয়লা অক্টোবর থেকে আবার চাকরিতে যাওয়ার ইচ্ছে তার। যে মহিলা কাজের সন্ধান দেয় তার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে ও।

"কাজ পাওয়া কঠিন হবে।"

"যাঃ, কি জন্যে কঠিন হবে? ধর, আমি সেই মহিলার অফিসে বসে আছি, আরও সাত-আট জন আমার পাশে বসে আছে বেঞ্চে। ধর, একজন বড়লোকের গিন্নী এল এবং আমাদের সকলের দিকেই চাইল। অবশ্যই তার আমাকে পছন্দ হবে কারণ আমি যে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন আর শক্ত-সামর্থ্য সে তো সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে।"

জোহান ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে মারিকে দেখে নেয়, তারপর দুজনেই হেসে কুটিপাটি হয়। বালির খাদের ভিতর দিয়ে ওরা বেড়া পাড় হয়। "বেশ ত, তা নয়ই বা কেন? আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে পারি—যেমন ধরা যাক, নিডারভাইলারবাথে। সেখানে আমরা নৌকা বাইতে পারি। হয়ত বা একটা নৌকা ভাড়াও নিতে পারি।"

জোহানের পছন্দ ছিল সরু লম্বা পাওয়ালা মেয়েদের, রং পছন্দ ছিল তামাটে কিংবা সাদা। এ মেয়েটা কিন্তু মোটা-সোটা আর গায়ের রং লাল। এ হয়ত তার চেয়ে বড়ও হবে। কিন্তু ওর দিকে যে ভাবে মেয়েটা চায় তা ওর ভাল লাগে। কোমল শান্ত দৃষ্টি ওর পা থেকে সুরু করে উপর দিকে ওঠে। সে ভাবে এর জন্য কেউ তাকে দোষ দিতে পারে না। যে ভাবনার বোঝা তার ঘাড়ে চেপে আছে তার থেকে যদি সে একটু বিরাম চায়, জীবনধারাকে সেই অভ্যস্ত খাতে বইয়ে দেবার আগে বড় জোর দশটা মিনিটের ছুটি চায়, তাতে সবচাইতে কড়া লোকও তাকে নিন্দা করতে পারেনা। তার পকেটে কয়েক ফেনিশ ছিল। মনে পড়ল তার খালের উপর লোহার সেতুটার ঠিক আগে একটা সরাইখানা আছে।

মারি বলে, বেশ একটু দেরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ও জবাব দেয় যে আসল কথা হ'ল যেথানে যে যাচ্ছে সেখানে তার যথাসময়ে পৌছান। মারির মনে হ'ল নিমন্ত্রণটা যেন হঠাৎ এল এবং সেও যেন বড় তাড়াতাড়ি গ্রহণ করল। কিন্তু গেল দুই সপ্তাহ নিতান্ত খারাপ কেটেছে, আর এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গ পথে যত ভাবনা ভাবতে হয়েছে তাতেও বিশ্রী লেগেছে। এই সমস্ত নিরানন্দ দুঃখ এসে একেবারে গ্রাস করে নেওয়ার আগে বরং যাওয়াই ভাল।

সরাইএর সামনে একটি ছোট্ট বাগান ছিল, তিনটে প্লেন গাছের তলায় তিন খানা চেয়ার পাতা। ওরা পানীয়তে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে থাকে। গ্লাস শেষ করতে যেটুকু সময় দরকার শুধু সেইটুকুই হাতে আছে তা ওরা জানত। জোহানের ইচ্ছা হচ্ছিল একটাও কথা না বলতে, কিন্তু ও ত আর মারিকে বলতে পারে না যে তার শান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে সে কেবল ওকে দেখতেই থাকুক। কাজেই ও তাকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। হয়ত আগেও মারির প্রেমিক কেউ ছিল। যে ভাবে সে ওর হাতে হাত রাখল, যে ভাবে কোনও কৃত্রিম হাসি ছাড়াই ওর কথার জবাব দিল, তার থেকেই জোহান একথা বোঝে। তার সব কিছুই শান্ত। উত্তেজিত, ছটফটে ধরনের নয় সে। তার হাতখানা হাতে নেয় ও। ও বুঝছিল, যে বিশ্রামের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। ওরা আকাশের দিকে চায়। প্লেনগাছে কাঁটা-খোঁচা ছোট্ট ছোট্ট মজার কুঁড়ি ঝুলছিল। মাটিতে কোমল দোলায় ভেসে বেড়াচ্ছিল পাতাগুলো, সেগুলো শুকনো নয়, কেবল শাখার বইবার ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত ভারী। ওকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করছিল মারি। সন্তুষ্ট হ'লেও সে হাসে নি।

জুতোর কালির কারখানার কয়েকজন মজুর সেতুর উপর দিয়ে ফিরছিল। তারা বাগানে ঢুকে ফাঁকা টেবিলে বসে পড়ে। জোহান মারির হাত ছেড়ে দিয়ে ওদের কথাবার্তায় কান দেয়। তারা সব কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করছিল—সরকার সম্পর্কে, পাপেন সম্পর্কে, আগামী শীত, নির্বাচন এবং গোল্ড এণ্ড সন সম্পর্কে। মারির হাত যেখানে ছিল সে সেখানেই রেখে দেয়। কিন্তু জোহান শোনবার জন্য পিছনে হেলে। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটা ভয়ঙ্কর ভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে, এ যাবৎকাল সে যত ভয় পেয়েছে এ তার চেয়ে অনেক মারাত্মক। এ যেন মৃত্যুভয়ের যন্ত্রণা। উন্মত্ত বিহ্বলতায় সে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন তার ভয় হয় যে, নিজের জীবনটাকে সে হারিয়ে ফেলবে আর কোনও

দিন খুঁজে পাবে না। এক্ষুণি সহরে যেতে হবে তাকে। তার সঙ্গীর দরকার, আপনজনের সঙ্গে সংযোগ দরকার। দাম দেওয়ার পয়সা মারির কাছে দিয়ে সে উঠে পড়ে। "সত্যি দেরি হয়ে-যাচ্ছে, আর এক সময়ে দেখা হবে তোমার সঙ্গে।" অবাক হয়ে মারি ওর দিকে চেয়ে থাকে। অন্য টেবিলের লোকেরা হেসে ওঠে, তাকে ডাক দিয়ে বলে: "এই যে মিস, তোমার পুরুষ বন্ধুটির বড্ড তাড়া মনে হচ্ছে।"

ক্রমশ:

ইতিহাসের বাঙালী ও একালের বাংলা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের চেতনাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তখন আমরা মনে করতাম আমাদের জীবন থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল খসে গেলেই আমরা লাভ করব পরিপূর্ণ জীবনের আশীর্বাদ। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের বন্ধনদশার অবসান ঘটেছে, আমরা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছি নয়া ভারতবর্ষ রূপায়ণের সুমহান দায়িত্ব। তার পর একটা একটা করে দীর্ঘ আঠার বছর অতিক্রান্ত হ'ল। কত উৎসব-মুখর ১৫ই আগষ্ট আমাদের জীবনের সামনে ক্ষণিকের জন্য এসে পরমুহূর্তে হ'ল দিগন্তে বিলীন, কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনের আশীর্বাদ আজও আমাদের নাগালের বাইরে। যতই আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছি ততই আমাদের উপলব্ধি তীব্রতর হচ্ছে যে, রাজনৈতিক দাসত্বই একমাত্র দাসত্ব নয়, বা অন্ততঃ সকল দাসত্বের মূল কারণ নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় উত্তেজনাবশে আমরা অনেকটা একচোখা হয়ে গিয়েছিলাম, সত্যের সঙ্গে বহু বঞ্চনাও এসে সেদিন আমাদের কল্পনাকে আশ্রয় করেছিল। স্বাধীনতার বিশাল ও বৈচিত্র্যময় রূপ আমরা সেদিন দেখতে পাই নি, সেদিন অবলোকন করেছিলাম তার একটি মাত্র রূপ। সেই একটি স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে যখন সত্যকার হয়ে উঠল, তখনই কেবল আমাদের মোহাচ্ছন্ন মন উপলব্ধি করল যে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে জাতীয় জীবনের দিগন্তব্যাপী শূন্যতা কখনও ভরাট করা যায় না।

পরাধীন জাতির আত্মবিকাশের জন্য রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি নিশ্চয়ই প্রয়োজন, হয়ত বা প্রথমেই প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় জীবনের আত্মবিকাশের জন্য অন্যান্য বহু প্রকারের মুক্তিও নিতান্ত আবশ্যক—দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, শোষণ থেকে মুক্তি, অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, মিথ্যা সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্তি। এই বৈচিত্র্যময় মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করতে না পারলে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর অন্যান্য প্রকারের স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষের প্রচেষ্টা সুরু হলেও তার অগ্রগতির পথে জয়যাত্রা এখনও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা আপাততঃ হিসাব থেকে বাদ দিয়ে শুধু স্বাধীন ভারতের শিক্ষাধারার দিকে নজর ফেললেই সহজে বুঝা যায় চিন্তার ক্ষেত্রে অসার সংস্কারের দাসত্ব আজও কিভাবে জাতির মনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। বৈষয়িক উন্নয়নের বিরাট বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-জীবন যে আজও মোটের উপর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পারছে না তার মূল কারণই হ'ল জাতীয় চেতনার

বৈপ্লবিক রূপান্তরের অভাব। আমাদের সমাজজীবনের বহিরঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়াচ যথেষ্ট লাগলেও এর অন্তরাত্মা এখনও নতুন চিন্তাধারায় আপ্লুত হয় নি। এর শরীরের সাজসজ্জা হালফ্যাশানের, কিন্তু মনটা সেকেলে, পুরানো বা মধ্যযুগীয়। এই ভয়ঙ্কর আত্মবিচ্ছেদের পরিণামে আমাদের জাতীয় কর্মশক্তি খণ্ডিত ও দুর্বল না হয়ে পারে না। নতুন যুগোপযোগী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে এই সর্বনেশে দুর্বলতা দূর করতে না পারলে এবং নতুন চিন্তাধারায় জাতীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করতে না পারলে জাতীয় জীবনের দ্রুত ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়।

॥ ২ ॥

নতুন জাতি গঠনের দায়িত্ব শুধু অর্থনীতি-পরিকল্পনা-বিশারদের হাতে নয়, সেই দায়িত্ব সকলের আগে শিক্ষাবিদদের। জ্যোতির্ময় জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শানুপ্রাণিত নতুন মানুষের সৃষ্টি। সেই নতুন মানুষ তৈরী করতে গেলে সকলের পূর্বে দেশের যৌবনশক্তিকে দিতে হবে নতুন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ দিয়ে সুন্দর সমাজ গঠন করা যায় না, তার জন্য বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে চাই হৃদয়াবেগের উৎকর্ষ, স্বচ্ছ চিন্তাধারার সঙ্গে চাই চিত্তের পবিত্রতা। শিক্ষার মাধ্যমে দেশের যৌবনশক্তির মনোলোকে নতুন চিন্তা ও আদর্শের প্রবাহ সৃষ্টি করতে না পারলে নতুন ভবিষ্যৎ রচনার সম্ভাবনা দূর থেকে সুদূরে মিলিয়ে যাবে।

উনবিংশ শতক জুড়ে এবং তার পর বিংশ শতকেরও বহু বছর ধরে বাংলা দেশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজ্যে গুরুর আসনে উপবিষ্ট ছিল। সেদিন তার আত্মা থেকে যে আলোকশিখা বিকীর্ণ হ'ল তাই তখন ভারতবর্ষকে নতুন আলোর আলোকিত করে তুলল। সেদিন বাংলার কণ্ঠকে আশ্রয় করে সুপ্তিমগ্ন ভারত গেয়েছিল নবজাগরণের প্রভাত-সঙ্গীত। ১৮৯৪ সালে "বঙ্কিমচন্দ্র"-বিষয়ক এক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "আগামী কাল বাংলা যা চিন্তা করবে, ভারতবর্ষ সেই চিন্তার অনুধ্যান করবে দুই সপ্তাহ পরে।" এই উক্তির মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে বাংলার অনন্যসাধারণ অগ্রগতির জয়ধ্বনিই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আজ সত্তর বছর পরে স্বাধীন ভারতে ইতিহাসের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। আজ শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই নয়, সমাজধর্মে ও শিক্ষানীতিতে বাংলার আত্মা যেন দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। চারিদিক থেকে বর্তমানে এদেশের উপর অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে বিধাতার অভিশাপ। রাজনীতি থেকে সুরু করে জাতীয় জীবনের যে দিকে তাকাই দেখি একই করুণ দৃশ্য। এমন কি, যে-শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতির রাজ্যে বাঙালীর মান একদিন সারা ভারতে বিপুল বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেক করেছিল, সেখানেও তার মর্যাদা একালে কতটা ধূলাবলুণ্ঠিত, তা বাংলার বাইরে গেলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালী যে বর্তমানে তার পূর্বযুগের সম্ভ্রম খুইয়ে বসেছে এর সঙ্গে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দেউলিপনার সম্পর্ক নিবিড়। ১৯৪৩ সালের মানুষ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, ১৯৪৭ সালের ভয়ঙ্কর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও তারই অনিবার্য পরিণতিতে উদ্বাস্তু সমস্যার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব—সবকিছু জড়িয়ে বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে বাঙালীর রাজনৈতিক মান ভয়াবহরূপে হ্রাস পেয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে তার বর্তমান মূর্তি হ'ল ছিন্নমূল মানুষের মত—লক্ষ্মীছাড়া, ঘরছাড়া উদ্বাস্তু। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে চরম আত্মদানের পরিণামে ইতিহাসের এই চরম দণ্ড বাঙালীকে স্বীকার করতে হয়েছে। স্বাধীন ভারতে বাংলার ভৌগোলিক অবয়বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জীবনধারাও যেন সঙ্কোচনের দিকে চলেছে। তার অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আজ যেন ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭-এর পরবর্তী বাঙালীর ইতিহাস সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজজীবনের মর্মান্তিক ইতিহাস।

॥ ৩ ॥

বর্তমানে আমরা সমাজজীবনের এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেচি যেখানে ভাঙনের ধাক্কা লেগেছে সর্বত্র। পুরাতন অর্থনীতি ও সমাজনীতি ভেঙে পড়েছে, আর সেই সঙ্গে পুরানো শিক্ষানীতি ও মূল্যায়নের মানদণ্ড। যেদিকে তাকাই দেখতে পাই বাঙালীর সমাজজীবন কি এক বিষাক্ত পঙ্কিলতায় ভরে উঠছে। সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি দুর্নীতির অশুভ ছায়া, এমন কি শিক্ষার জগতেও। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই যেন এক সুরে বাঁধা। সর্বত্রই একটা কালোবাজারী মন লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে ক্রিয়া করে চলেছে। সর্বত্রই দেখছি ঘূণেধরা সমাজের প্রতিচ্ছবি। জাতিগঠনের মহান দায়িত্ব সকল দেশে, সকল যুগে যে শিক্ষাবিদদের, বর্তমানে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মানের সঙ্গে তাঁদেরও মান নীচুতে নেমেছে শুধু বিদ্যাবত্তার দিক থেকে নয়, চরিত্রবত্তার দিক থেকেও। ব্রাহ্মণের স্তর থেকে একালের অনেক শিক্ষকই যে বৈশ্যের স্তরে নেমেছেন, একথা অস্বীকার করে লাভ কি? শিক্ষকেরা যে শুধু চাকুরিয়া নন, তদুপরি আরও অনেক কিছু—এই

প্রাচীন মূল্যবোধে বর্তমানে দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। বিদ্যা-চর্চার স্বধর্ম ও আদর্শবাদ থেকে ভ্রষ্ট বলেই শিক্ষকদের জীবন শিক্ষার্থীদের নিকট আজ আর আদর্শস্থল হতে পারছে না। ছাত্রদের উপর তাঁদের চরিত্রগরিমার সম্মোহন আজ বিলুপ্ত। শিক্ষকতার জীবনে প্রবেশ করে ক'জন শিক্ষক আজ জ্ঞানের সাধনায় তন্ময় হচ্ছেন, তা গুণে দেখবার মত। প্রায় সকলেই অর্থোন্নতির ও পদোন্নতির পাগল-করা নেশায় মশগুল। একটা সর্বনেশে অতিরিক্ত বৈষয়িক মানসিকতা তাঁদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সুনীতির শাসন তাঁরা নিজেরা প্রায়শই মানেন না বলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকেও নীতির শাসন ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। একালের ছাত্রদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপবাদ হ'ল উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ, আর এ অপবাদ থেকে এযুগে যে শিক্ষকেরাও অনেকেই মুক্ত নন, তা প্রমাণিত সত্য। বরং উল্টোদিক থেকে বলা চলে যে, ছাত্রদের বর্তমান নৈতিক ও মানসিক অধোগতির মূলে অনেকখানি সক্রিয় রয়েছে শিক্ষকদের নিজেদের কুদৃষ্টান্ত যা সংক্রামক রোগের মত মন থেকে মনে সঞ্চারিত হচ্ছে। একালে শিক্ষকদের নিম্নগামী মানের জন্য, পুরাণো সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙন এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা যতই দায়ী থাক না কেন, তাঁদের নিজেদের দায়-দায়িত্বকেও লঘু করে দেখা মোটেই সমীচীন হবে না। বেতন-হারের ক্রমোন্নতি ঘটলেই শিক্ষামানের ক্রমোন্নতি ঘটবে এ অভিমত অশ্রদ্ধেয়।

॥ ৪ ॥

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বাহ্যিক আড়ম্বর বেড়ে প্রায় আকাশস্পর্শী হয়েছে, পাঠ্যসূচীর বহর বেড়েছে, কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এককথায় শিক্ষার নামে বাবুয়ানি বেড়েছে, কিন্তু এর মান বাড়ে নি, বরং দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে অনেক তলে, অতলে। যে শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে কোন প্রাণবন্ত জাতি উন্নতির পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, আমাদের বেলায় সেই মাটিই আজ সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে। স্বাধীন ভারতে স্বদেশী শিক্ষা-পরিকল্পনার ইহাই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতাকে আরও বেদনাতুর করে তুলেছে একালে শিক্ষার জগতে ক্ষুদ্র মনোবৃত্তিসম্পন্ন দলীয় রাজনীতি-ঘেঁষা শিক্ষকদের প্রাদুর্ভাব। শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেও রাজনীতিকের প্রবৃত্তি তাঁদের মন থেকে আর যায় না। বিদ্যাচর্চার দ্বারা প্রতিষ্ঠার্জনের সুকঠিন ব্রত গ্রহণ করার বদলে তাঁদের ধর্ম হ'ল সহজের উপাসনা। ছাত্ররা হ'ল তাঁদের দৃষ্টিতে দাবার ঘুঁটি যা দিয়ে তাঁদের ভাগ্যোন্নতির বা সাংসারিক প্রতিষ্ঠার সোপান হবে রচিত। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য যদি বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে থাকে, এজন্য মূলত দায়ী ঐ নীতিহীন, আদর্শভ্রষ্ট, মতলববাজ, স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক-শিক্ষকদের প্রগলভ আচরণ। তাঁদের এই দায়িত্বকে অস্বীকার করে শুধু ছাত্রদের উপর বা সমাজের উপর বা রাষ্ট্রনায়কদের উপর শিক্ষামানের ক্রমাবনতির জন্য দোষারোপ করলে আমাদের কেবল যে নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাবে তা নয়, আমাদের সততা ও আমাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা সন্দেহ পোষণ করবে।
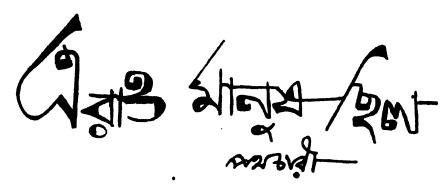
দুধে জল মেশানোর জন্যে হীরু ঘোষের জবাব হয়ে গেল। ডাঃ চাটার্জি নিজে দুধ পরীক্ষা করেন, তারপর সে-দুধ যায় ডায়েট-ইন-চার্জের হাতে। হীরু ঘোষের বাহাদুরি আছে—এর মধ্যে কোন্ ফাঁকে সে জল মিশিয়ে দেয়।

হাঁসপাতালের রোগীর জন্যে দুধ—ডাক্তার বার বার সাবধান ক'রে দিয়েও হীরু ঘোষকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি। হীরু ঘোষের জন্যে অনেকে ওকালতি করতে এসে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাক্তার বলছেন, আমি কোনদিক দিয়েই ওকে ক্ষমা করতে পারি না। ও জানে না কতগুলো রোগীর জীবন-মরণ নির্ভর করছে ওর হাতে! টি-বি রোগী—যাদের নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, দুধ যাদের জীবন—সেই দুধকে বিকৃত করা মানে অতগুলো প্রাণী-হত্যা। ওর বিবেক ব'লে যদি কোন জিনিস থাকৃত, ও এ-কাজ করতে পারত না। অন্য হাসপাতালে কে কি করে আমি জানি না, কিন্তু আমার হাসপাতালে এ অনাচার আমি প্রবেশ করতে দেব না। এতগুলো জীবন নির্ভর করছে আমার হাতে, সেই জীবন নিয়ে খেলা!—তুমি দূর হও আমার সামনে থেকে। তোমার ত ফাঁসী হওয়া উচিত।

অমূল্যবাবু অনুরোধ করতে এসে ধমক্ খেলেন। আপনারা জানেন না অমূল্যবাবু, এই যন্ত্রটি দুধের 'স্পেসিফিক গ্রাভিটি' কমল কি বাড়ল ধরবার ক্ষমতাটুকুই রাখে। আপনারা বলেন, গয়লার বুদ্ধি নেই, কিন্তু ঐ বুদ্ধি নিয়েই ওরা 'স্পেসিফিক গ্রাভিটি' বজায় রেখে কি ক'রে দুধে জল মেশানো যায় তা আবিষ্কার করেছে।—দুধে কখনও 'তলানি' পড়ে মশায়! ছেঁকে দেখবেন, ঐ হ'ল যন্ত্র-ফাঁকি-দেওয়া 'স্পেসিফিক গ্রাভিটি'।

হীরু ঘোষকে রাখা গেল না। তার জবাবই হ'ল। এল মদন ঘোষ।

ডাঃ চাটার্জি তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, তোমার নিজের গাই আছে, না খাটাল থেকে এনে বিক্রি কর?

মদন ঘোষ বললে, আমরা জাত-গয়লা। অবস্থা খারাপ হয়েছে, নইলে এই কিছুদিন আগেও একশোটা গাই ছিল।

ডাঃ চ্যাটার্জি ধমক দিলেন। কি ছিল শুনতে চাইনে। এখন কি করো তাই বল।

মদন হেসে বললে, আপনারা কত দুধ নেবেন?

—আমার প্রতিদিন এক মণ ক'রে দুধ চাই।

—এক মণ দুধ আমি আমার বাড়ী থেকেই দিতে পারবো, অন্যের দ্বারস্থ হ'তে হবে না।

—দুধে জল মেশাবে না ত?

—আজ্ঞে না, গোরুর দুধে আমাদের জল মেশাতে নেই, বংশ থাকে না। আমরা জল মেশাই মোষের দুধে।

ডাক্তার হেসে বললেন, মোষের দুধে জল মেশালে বুঝি বংশ রক্ষা হয়।

মদন ঘোষকে রাখাই স্থির হ'ল।

একটি দিনের ঘটনা।—কিন্তু আমি ত পথচারী—তবু সেই ঘটনা আমার মনে রেখাপাত করল। ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধাও হ'লো। শ্রদ্ধা হ'ল, সত্যিকারের মানুষ দেখলাম ব'লে। মনে হ'ল, এদের হাতেই পরম নিশ্চিন্ত মনে বুঝি রোগীকে ছেড়ে দিয়ে নির্ভয় হওয়া যায়।

ডাঃ চ্যাটার্জি অতি অল্প দিনেই নাম করেছেন। চিকিৎসাও ভালো, রোগীর প্রতি দরদও তেমনি। এই হাসপাতালের সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ী-গাড়ি দুই-ই করেছেন। রোগীরা বলে, মানুষ নয়, দেবতা। চিকিৎসা ত অনেকে করে, কিন্তু খাওয়ার দিকে এমন দৃষ্টি ক'জনের আছে! উনি বলেন, ওষুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন বেশি।

একটা রোগী কতটা দুধ খেতে পারে? নিশ্চয় আধ সেরের বেশি নয়। কিন্তু এই আধ সের দুধের বদলে জল খেলে তার কি হবে? রোগীরা ত মরে ঐ দুধের অভাবেই।

ডাক্তারের মুখে এমন কথা শুনলে কে না মুগ্ধ হয়!

* * *

সকলকে বিস্মিত ক'রে সংবাদপত্রে যে-সংবাদটি বেরুল, সে-সংবাদ কোনো টি-বি রোগীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী। যে-দুধ ক্ষয়-রোগীর জীবন, সেই দুধ এতগুলো রোগীকে বঞ্চিত ক'রে ডাঃ চাটার্জি দুধের ব্যবসা করেন। রোগীর জন্যে ব্যবস্থা আছে 'মিল্ক-পাউডার'। জবানবন্দীতে এও বলা হয়েছে, এই নরঘাতককে কেউ যেন ক্ষমা না করেন।

মনে পড়ল, ডাক্তারের অতি পুরাতন বক্তৃতা—"এতগুলো জীবন নির্ভর করছে আমার হাতে,—সেই জীবন নিয়ে খেলা!—তুমি দূর হও আমার সামনে থেকে! তোমার ত ফাঁসী হওয়া উচিত।"

কিন্তু মুকুন্দকে দেখেছি অন্য রকম। সে চুরি করত, তার মধ্যে কোন আড়াল ছিল না।

তিন বছর জেল খেটে মুকুন্দ বাড়ী ফিরল। এতে মুকুন্দর মনে কোনো চাঞ্চল্য নেই। চঞ্চল হ'য়ে ওঠে গ্রামশুদ্ধ লোক!

মুকুন্দ চোর। এবার নিয়ে কবার যে সে জেল খাট্‌ল তার আর হিসাব-নিকেশ নেই। কিন্তু মুকুন্দ জেলে থাক্‌লেই গ্রামের লোক নিশ্চিন্ত থাকে। ফিরে এলেই চিন্তা হয়, না জানি হতভাগা আবার কার কোন্‌দিন সবনাশ ক'রে বসে!

তিন বছর পরে মুকুন্দ দেশে এল। কোন সম্ভাষণ নেই, কোন সমাদর নেই—কেউ মুখের একটা কথা ব'লেও কুশল জিজ্ঞাসা করে না—দীর্ঘ তিন বছরের বিয়োগ-ব্যথায় কারো বুক টন্ টন্ ক'রে ওঠে না। তার নেই আত্মীয়, নেই বন্ধু—আছে ঘরখানা, একটা ডেরা। এইটুকুর মায়া সে ছাড়তে পারে না। চালে খড় নেই—যেটুকুও বা থাকা উচিত ছিল, পাড়ার দুষ্টুলোকে তাও থাকতে দেয় নি। কতবার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েও দিয়েছে।

মুকুন্দ রাগ করে না। আপন মনেই বলে, কেউ না থাকলে কি ঘর টেঁকে!

প্রথম ক'দিন খুব কষ্ট হয়। তারপর সে ঘর তোলে, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নেয়—ভাল জামা-কাপড়ও পরে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর মনে মনে আতংকিত হয়ে উঠে!

কারো বুঝতে কষ্ট হয় না, মুকুন্দ আবার চুরি করেছে। কিন্তু চুরি না ক'রেই বা সে করবে কি? কেউ তাকে কাজ দিতে চায় না—খেটে খাবে, তার উপায়ও কেউ রাখে নি।

মুকুন্দকে ডেকে বলি, কাজ করবে মুকুন্দ? আমি কাজ দেব।

মুকুন্দ সপ্রতিভ উত্তর দেয়, না বাবু! কাজের হাত আর নেই। একদিন এই হাতেই বাবুদের জমিতে লাঙল দিয়েছি।

সে কাজ ছাড়লে কেন মুকুন্দ?

মুকুন্দ দাঁত বের ক'রে হাসল। বললে, শুনবেন তবে জমিদারবাবুদের কাণ্ড। বাবুদের লাগা-একটুক্‌রো আমারও জমি ছিল—একই সঙ্গে চাষ দিতাম। বাবুদের সইল না। ওরা বাবুমশায়, আমরা ছোট-লোক, সইবে কেন? একদিন জোর করে আমার জমির দখল নিয়ে মিথ্যা চুরির মামলায় দিলে তিন বছর জেলে পাঠিয়ে। এই তিন বছর···না খেয়ে খেয়ে বৌটা শুকিয়ে ম'রে গেল।

গাঁয়ের লোক কেউ দেখলে না?

চোরের বৌকে কি আর কেউ ডেকে খেতে দেয় বাবু?

মুকুন্দ অনেক কথাই বললে। চিরদিন সে এমন ছিল না। কিন্তু সবাই মিলে তাকে চোর বানিয়ে তুললে।

বললাম, এ গাঁয়েই বা থাক কেন? অন্য কোথাও গেলেও খেটে খেতে পার।

পারি না বাবু! যেখানেই যাই, পুলিশ আমার পেছনে লেগে থাকবেই। ওরা ভাল হ'তে দেয় না বাবু! তাছাড়া গাঁয়ের মায়া ত একটা আছে···ঐ ঘরে মাগীটা মরলো, সেই বা ভুলি কেমন ক'রে?

অনেক কথাই বলবার ছিল। কিন্তু কোন কথাই মুখ দিয়ে বার হতে চাইল না।

মুকুন্দ বললে, জানেন বাবু, জেলেই আমরা ভাল থাকি। দুবেলা পেট ভরে খেতে ত পাই—দেখছেন না শরীর, বাড়ী এসে না খেয়েই শুকিয়ে গেলাম।

পকেট থেকে একটা টাকা বের ক'রে মুকুন্দকে দিতে গেলাম। মুকুন্দ নিলে না। বললে, জানেন বাবু, জেলে খাটি, ওরা খেতে দেয়—নইলে, কারো দয়ায় খাব সে বান্দা আমি নই।

মনে মনে হাসলাম। তা হলে মুকুন্দরও নীতি-জ্ঞান আছে! একবার ইচ্ছা হ'ল বলি, চুরি-করাটা কোন্ নীতিশাস্ত্রে আছে?

কিন্তু মুকুন্দই দিলে জবাব। চুরি করি জেলে যাবার জন্যে, নইলে কোন্ শালা চুরি করত! আর জেলে না গেলে কেউ খেতেও দেবে না!—এসেছি যখন, বাঁচতে ত হবে বাবু।

এর চেয়ে চমৎকার উত্তর আর কেউ দিতে পারবে না। যাবার সময় মুকুন্দ প্রণাম ক'রে বলে গেল, আবার কবে দেখা হবে জানি না—তাই ব'লে যাই, আমাকে ভুল বুঝবেন না বাবু, চোর আমি নই, ঐ শালারাই আমাকে চোর বানিয়েছে।

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

॥ বাইশ ॥

দপ্তরবাড়ী ফিরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের আপিস ঘরে ্যাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে বসলেন। মনের ।ককোণে বিষাদ জমে রয়েছে, সঙ্গে খানিক ক্লান্তি। ন্তু মনের বেশির ভাগ যদি কাজে লেগে গেছে আসন্ন ংঘাতে বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে। একখানা াইল খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কয়েক মিনিট হিসাব মেলালেন। খে প্রসন্ন অস্বস্তির আভা ফুটে উঠল।

তিওয়ারী এল পানীয় নিয়ে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সতৃষ্ণ াগ্রহে চিক্কণ গ্লাসে চুম্বন দিলেন।

কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হল: 'আঃ।'

তিওয়ারী বলল, "এডিটর সাব অনেকক্ষণ বসে াছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আর একটু বসুন।"

টেলিফোন বাজল।

"কোশল।"

"আমি পিতাজি। চন্দ্রপ্রসাদ।"

"বল।"

"মাকে নিয়ে রাত্রির গাড়িতে কাশী যাচ্ছি।"

"জানি। সাবধানে যেয়ো।"

"আর কিছু কাজ আছে কি পিতাজি?"

"ওংকারনাথ পণ্ডিতজিকে দিয়ে বেশ ভাল ক'রে বান বিশ্বনাথের পূজা দিতে হবে। কাল তোমাকে ব' করবে তিওয়ারী।"

"বহুৎ আচ্ছা, পিতাজি।"

"তুমি কবে ফিরবে।"

"দু'দিন থেকে মা'র সব গুছিয়ে দিয়ে চলে আসব।"

"বেশ। ফিরে এসে দেখা কর। ডাক্তার নিয়ে ভাইজির বাড়ী গিয়েছিলে?"

"জি হাঁ।"

"কি বললেন ডাঃ বলিরাম?"

"অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত। সপ্তাহখানেক বিশ্রাম করতে বললেন।"

"চিন্তার কারণ নেই ত কিছু?"

"না।"

"আচ্ছা, এস তবে।"

"একটা প্রার্থনা আছে, পিতাজি।"

"বল।"

"একটু হুঁসিয়ার থাকবেন।"

"থাকব।"

"ধৃষ্টতা মাপ করবেন, পিতাজি। কাল আমি বিলাসপুর থাকব না। আপনাকে আগে থেকেই জয়ের অভিনন্দন জানাতে চাই।"

"খুব চালাক হয়ে উঠেছ। টাকাপয়সা কিছু লাগবে নাকি?"

"না, পিতাজি। অনেক আছে।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়কে যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ডেকে পাঠালেন, তখন মেজাজ বেশ চাঙ্গা, দেহের ক্লান্তি আর নেই, চোখে কৌতুকময় হাসি।

"এস, চ্যাটার্জি, এস। অনেকক্ষণ তোমায় বসে থাকতে হ'ল। আজ আর সময়ের হিসাব মেলাতে পারছি না।"

"কে একজন আমেরিকান বলেছেন, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সপ্তাহের দাবি করছে। আর পৃথিবী চলছে যাঁদের জোরে তাঁরা চাইছেন প্রতিটি দিন বিয়াল্লিশ ঘণ্টা চলুক।"

"তা বটে। তবে আমি আজ তা মোটেই চাইছি না। আমার ধৈর্য শেষ হয়ে এসেছে। আমি চাইছি এ নাটকের ওপর এক্ষুনি যবনিকা পড়ুক।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় বলল, "তার মানে, সব ঠিকঠাক আছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমায় কেন ডেকেছি বলি। সময় নেই। সব সংক্ষেপে সারতে হবে। প্রথম কাজ হ'ল, কাল তোমার কাগজে রাজনৈতিক রিপোর্ট কি-রকম হবে। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি লিখে নাও। যেমন বলছি ঠিক তেমন ছাপবে। একটি শব্দেরও যেন অদল-বদল না হয়। নিজে প্রুফ দেখবে। সব দায়িত্ব তোমার।"

"বেশ। রাত্রে প্রেসেই থাকব।"

"লিখে নাও: 'উদয়াচলের মন্ত্রীসভা নিয়ে সংকটের অবসান হয়েছে। আজ অপরাহ্ণে বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের বৈঠকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত।'

'আশা করা যাচ্ছে, তাঁর পুনঃ-নির্বাচন হবে সর্ব-সম্মতিক্রমে। অর্থাৎ, সংগঠন ও সরকার, কংগ্রেসের এই দুই বাহু পুনর্বার মিলিত হবে। হাই কমাণ্ডের এই অভিপ্রায় সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা। এর জন্যে দায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকোশল ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুদর্শন দুবের মিলিত প্রচেষ্টা।

'গতকাল প্রভাতে শ্রীদুবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে সদ্ভাব-পূর্ণ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন প্রায় মধ্যরাত্রিতে দুজনের দ্বিতীয় বৈঠকে তা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করে। ইতিমধ্যে, সারাদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলার নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান। এ ধারাবাহিক আলোচনায় দেখা যায় দলের অধিকাংশ সদস্য শ্রীকোশলের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখেন।

'প্রদেশ কংগ্রেস অধিপতিও, মুখ্যমন্ত্রীর মতই, কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ ও বলিষ্ঠ করবার জন্যে সমান আগ্রহী। তিনিও বহু কংগ্রেস-কর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাতে তাঁর ঐক্য ও সমন্বয়ের আগ্রহ গভীরতর হয়।

'দুই পক্ষের এই গভীর আগ্রহের পরিণতি শ্রীকোশল ও শ্রীদুবের মধ্যরাত্রি বৈঠক। এ বৈঠক গভীর সম্প্রীতি ও পারস্পরিক আস্থার সঙ্গে এক ঘণ্টা চলে। দুজনে সকল বিষয়ে একমত হয়ে পরস্পরের নিকট হ'তে বিদায় নেন।

'উদয়াচলের নাগরিকগণ যখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন, প্রদেশের এই দুই কর্ণধার তখন একত্রিত হয়ে উদয়াচলের নির্বিঘ্ন অগ্রগতির পথ নিশ্চিত করেন।

'এখন আশা করা যাচ্ছে যে, আজকার সভায় শ্রীদুবের তরফ হ'তে মন্ত্রী শ্রীপ্রজাপতি শেউড়ে দলপতি পদের জন্য শ্রীকোশলের নাম প্রস্তাব করবেন, এবং মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন পরিহার এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

'সভার সভাপতিত্ব করবেন অর্থমন্ত্রী শ্রীদুর্গাভাই দেশাই। উদয়াচলের এই মহাপ্রাণ, সত্যসেবী, আত্মত্যাগী নেতাও এই অতি-স্বাগত ঐক্য ও সমঝোতার জন্যে কম পরিশ্রম করেন নি।

'শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদকে একত্রিত করবার ইচ্ছা পোষণ করেন। বর্তমান মন্ত্রীসভায় বয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। তাঁর ইচ্ছা কংগ্রেসের নবীন নেতাদের মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথ সুগম করা। যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে সচরাচর 'বামপন্থী' ব'লে পরিচিত তাঁদেরও মন্ত্রীসভায় আসন দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায়। তার সঙ্গে গ্রামীণ নেতৃত্বকেও তিনি মন্ত্রীসভায় আনবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এ সব ব্যাপারে শ্রীদুবে ও ও শ্রীদেশাইর পরামর্শ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলবেন। বর্তমানে তাঁরা একমত।

'বর্তমান মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে নতুন মন্ত্রীসভায় নেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে। তবে, তাঁদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জ্ঞানবুদ্ধি যাতে উদয়াচলের সেবায় ভবিষ্যতেও বিনিযুক্ত হয় শ্রীকোশল সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

'আমাদের বিশেষ সংবাদদাতাকে মুখ্যমন্ত্রী রজনীর তৃতীয় প্রহরে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'কংগ্রেসের একমাত্র আদর্শ জনসেবা, একমাত্র পথ জনকল্যাণ। আমাদের মধ্যে মতবিরোধে কোনও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত নেই। বিরোধ লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে নয়। পথ বা নীতি নিয়েও নয়। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে। তাই তা অনায়াসে আমরা

দূর করতে পেরেছি। আমার সম্মানিত সহকর্মী শ্রীসুদর্শন দুবে ও শ্রীদুর্গাভাই দেশাইর সাহচর্যে আজ আমি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বলশালী'।"

ডিকটেশন নেবার সময় সুভাষ চট্টোপাধ্যায় যে বার বার বিস্মিত হ'চ্ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা লক্ষ্য করছিলেন।

ডিকটেশন শেষ হলে বললেন, "পাশের ঘরে গিয়ে এটা নিজের হাতে টাইপ ক'রে নিয়ে এস। দু' কপি করবে। একটা আমার কাছে থাকবে। অন্যটা তোমার কাছে রাখবে। অন্য কেউ যেন না জানে, না দেখে। কার্বন পেপারটাও আমাকে দিও।

রাত্রি বারোটা দশ মিনিটে আমাকে এই নম্বরে ফোন করবে। যদি আমি বলি, 'গো এহেড' তা হলে এই রিপোর্ট কাল সকালে ছাপবে।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় যখন টাইপ ক'রে রিপোর্ট নিয়ে উপস্থিত, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষণ গম্ভীর। মুখের গৌরবর্ণে রক্তিম আভা। নাসিকায় ভয়ংকর নিষেধ।

রিপোর্টটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। দু'টি শব্দ বদলালেন। দু' কপিতেই। আবার পড়লেন। এক কপি এবং কার্বন নিজের কাছে রাখলেন। অন্যটি দিলেন সুভাষকে।

"আচ্ছা। আজ এস।"

"একটা প্রশ্ন ছিল।"

"প্রশ্ন তোমার অনেক আছে, এডিটর সাব, আমি জানি। কিন্তু সময় আমার একেবারে নেই।"

"আজ্ঞে, রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। ব্যক্তিগত প্রশ্ন।"

"শুনতেই হবে, মনে হচ্ছে। বলে ফেল।"

"আপনি পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবেন বুঝতে পারছি। এর পরে 'মর্ণিং টাইমসে'র ম্যানেজিং এডিটর হবেন কি জগন্মোহন তিওয়ারী?"

"একথা তোমায় কে বললে?"

"নাম বলতে পারব না। তবে, দায়িত্বশীল কেউ না বললে, আপনাকে আজ রাত্রে প্রশ্ন করতাম না।"

"তোমার আরও কিছু বলবার আছে?"

"আছে। জগন্মোহন তিওয়ারীকে ম্যানেজিং এডিটর করবার আগে আমার পদত্যাগপত্র অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করবেন।"

রক্তিম মুখে লাল চোখে থমথমে গাম্ভীর্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন।

সামান্য হাসির বক্র স্রোত বুঝি বয়ে গেল মুখাবয়বে। বললেন, "মনে থাকবে। তুমি এখন এস। বারোটায় ফোন ক'রো।"

রাত্রির আহার নিয়ে এল দীনদয়াল। গ্লাস ভরতি দুধ, একটি বড় লাল আপেল, কিছু আঙুর।

"মা'র গাড়ি ক'টায়?"

"দশটা ক' মিনিটে, হুজুর।"

"তুই যাবি ষ্টেশনে?"

"না, হুজুর।"

"কেন?"

"আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয়?"

"আমার কিছু প্রয়োজন হবে না। তুই যাস সঙ্গে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে যাস। ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে আমায় খবর দিস।"

"জি, সরকার।"

সরোজিনী সহায় যখন এসে সামনে বসল, আহার সমাপ্তির সামান্য পরে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হঠাৎ মনে হ'ল, একে যেন অনেক আগে কখন কোথায় দেখেছেন। কোনও মুখই তিনি কখনও ভোলেন না; নাম মনে রাখবার ক্ষমতাও তাঁর আশ্চর্য। অথচ মনে করতে পারলেন না কোথায় কবে সরোজিনীকে দেখেছেন। ছবি দেখেছেন, মনে পড়ল। কিন্তু ছবির বাইরেও দূর-স্মৃতি কেমন যেন জেগে উঠতে চাইল।

দেখে মনে হয় বছর ত্রিশেক বয়স। রং গৌর না হলেও ফর্সা। মসৃণ চওড়া কপালে চিকণ ভ্রূ প্রায় কান পর্যন্ত প্রসারিত। চোখ দু'টি ছোট, কিন্তু বুদ্ধিতে, লাস্যে ঝলমল। মুখের আদল অনেকটা গোল, কিন্তু চিবুকের দিকে চাপা। নাকটি ছোট হলেও সরু ও সুন্দর। কোঁকড়া চুলের অশান্ত কয়েকটি গোছ কপালে ঝুলে পড়েছে। ওষ্ঠাধর ধনুকের মত তীর্যক। ডান গালে এবং চিবুকে দুটি বড় কালো তিল।

এবার মনে পড়ল। এই জোড়া কালো তিল আর ধনুকের মত তীর্যক অধর আর একটি মেয়ের ছিল। বহু-

কাল আগের কথা। অন্য জীবনের কথা। তবু মনে আছে। সেই মেয়ের নাম ছিল কৌশল্যা।

সরোজিনী মারাঠা তাঁতের শাড়ী পরেছে, পাতলা নীল। রং-মেলানো চৌলি। ছিপছিপে সুগঠিত দেহ। বসেছে ঋজু হয়ে।

বেশ ভাল লাগল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের।

"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি এতদিন"; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "অথচ আপনার কাজকর্মের পরিচয় আমার আছে।"

"শুনেছি এ প্রদেশে এমন কোনও রাজনৈতিক কর্মী নেই যার নাড়ী-নক্ষত্র আপনার অজানা", মৃদুকণ্ঠে বলল সরোজিনী।

"নাড়ী-নক্ষত্র জানলেও চেহারা যে চিনি না তা ত নিজেকে দিয়েই জানলেন।"

"সত্যি আপনি সবাকার সব কিছু জানেন?"

"ওসব আমার মিত্রদের প্রচার। তবে সারা জীবন উদয়াচলে কাটল। বহু মানুষকে চিনি। উদয়াচলকে বেশ ভালভাবেই জানি।"

"আমি অনেকবার আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছি।"

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হই নি বলে ত মনে পড়ছে না।"

"না। আমি শুনেছি, আপনি দেখা করবেন না।"

"কে বলেছে?"

"বেশ বড় বড় মানুষরা।"

"কারণ কি?"

"কারণ, আমি বামপন্থী।"

"দেখুন, 'বাম' ব্যাপারটা একটু কম বুঝতে পারি, কিন্তু 'বামা'-দের একেবারে বুঝি না তা নয়।"

"আপনি কি সত্যি আমাদের বিরুদ্ধে?"

"আপনারা কারা?"

"কংগ্রেসের বামপন্থী দল।"

"এ ত সোনার পাথর বাটির মত শোনাচ্ছে।"

"কেন?"

"সারা কংগ্রেসই ত বামপন্থী। সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য। সর্বোদয় আমাদের কাম্য।"

"লক্ষ্য যাই হোক, কাজে আমরা সমাজতন্ত্র না গড়ে ধনতন্ত্র গড়ছি।"

"তাই নাকি?"

"আপনি অস্বীকার করেন?"

"নিশ্চয়। স্বীকার করা মানে রাজনৈতিক আত্মহত্যা।"

সরোজিনী হেসে ফেলল। "তা আপনি করতে রাজী নন।"

"একেবারে নই। মরতে তৈরী নই এখনও। না নিজের হাতে, না অন্যের।"

"আপনি স্বীকার না করলেও আমাদের অভিযোগ সত্যি।"

"কোন অভিযোগ? আমি সমাজতন্ত্রের বদলে ধনতন্ত্র গড়ছি?"

"হ্যাঁ।"

"তবু ত আমি কিছু গড়ছি। আপনারা ত কিছুই গড়ছেন না।"

"সুযোগ পাচ্ছি কোথায়?"

"কোন সুযোগ চান? আমি আপনাকে এক হাজার একর জমি দিতে রাজী আছি। ট্রাক্টর ইত্যাদি কেনবার টাকাও। যৌথ কৃষি তৈরী ক'রে দেখান না দেশবাসীকে? সর্ত শুধু একটি। দশ বছরে যদি আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারেন তা হ'লে জনসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে আপনাকে যে আপনার পথ ভুল।"

"এ ভাবে সমাজতন্ত্র তৈরী হ'তে পারে না। ধনতন্ত্রের সমুদ্রে সমাজতন্ত্রের দু'চারটি লোক-দেখানো দ্বীপ। এ সম্ভব নয়।"

"তা হ'লে?"

"বরং সমাজতান্ত্রিক সমুদ্রে দু'একটি ধনতান্ত্রিক দ্বীপ থাকতে দেওয়া যেতে পারে।"

"সুতরাং আপনি আগে সমুদ্র তৈরী করতে চান।"

"অর্থাৎ সরকার হাতে পাওয়া দরকার।"

"তার মানে ত বিপ্লব!"

"না। আমরা বিপ্লবে বিশ্বাসী নই। ওটা কম্যুনিজম।"

"মুস্কিল। আমি ঠিক বুঝি নে আপনাদের কথাবার্তা।

আসলে, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পাই নি ছোটবেলা। তবে আমি খেলতে রাজী আছি।"

"তার মানে?"

"আপনাদের সুযোগ দিতে। ক'জন নিয়ে আপনাদের দল?"

"দশ জন। অশোক আত্রেকে জানেন।"

"নিশ্চয়। বুদ্ধি ভয়ানক কম।"

সরোজিনী হেসে ফেলল, "কিন্তু লোক ভাল।"

"বোকারা ভালই হয়। আপনারা মন্ত্রীসভায় স্থান চান, এই ত?"

"পেলে ভাল হয়।"

"আসুন না। আমি ত চাই নতুন রক্ত, নতুন চিন্তাধারা।"

"সে কি? শুনে আসছি আপনি এসব একেবারে চান না।"

"আমার মিত্রগণ অমন অনেক কিছু বলেন। যদি আমি মন্ত্রীসভা গঠন করি আপনাদের মধ্যে থেকে দু' জনকে নিতে রাজী আছি। সর্ত একটা।"

"কি?"

"তার মধ্যে একজন আপনি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি। আপনি বিধান সভার সদস্য নন। আপনাকে নির্বাচিত ক'রে নিতে কষ্ট হবে না। তিনটে আসন খালি রয়েছে। আপনার কাছে আমি সমাজতন্ত্র শিখব।"

"আপনাকে শেখাতে পারলে আমার সৌভাগ্য।"

"তা হ'লে আপনি আমার ডেপুটি মিনিষ্টার হবেন। উদয়াচলের পাঁচসালা যোজনা কার্যকরী করবার ভার থাকবে আপনার।"

"সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ। হরিশংকর ত্রিপাঠি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়, আপনার স্থান হবে না মন্ত্রীসভায়।"

"জানি।"

"আমি আপনার স্থান করব। কিন্তু হরিশংকর ত্রিপাঠির স্থান হবে না।"

"সুদর্শন দুবেজি?"

"তিনি, আশা করছি, নতুন মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন।"

"আমাদের দলের অন্য জনকে কি পদে রাখবেন?"

"পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।"

"কাকে নেবেন?"

"আপনি বলুন।"

"অশোক আত্রে।"

"না।"

"বিপিন ঝা।"

"তাও নয়।

"অর্থাৎ আমার মনোনীত কাউকে নয়।"

"ঠিক বলেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করব আমি। কিন্তু সে হবে আপনার মনোনীত। সুদর্শন দুবে ও দুর্গাভাই দেশাই জানবেন, তার নাম করেছেন আপনি।"

সরোজিনী চুপ ক'রে রইল।

"রাজী কি না বলুন। তবে, হ্যাঁ। আর একটা কথা জেনে রাখুন। আপনার দলের সমর্থন ছাড়াও আমি পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হব।

"রাজী। নাম বলুন।"

"সূর্যপ্রসাদ কোশল।"

"সে আমাদের দলে নয়।"

"আপনি জানেন না। চারদিন আগে সে আপনাদের দলে যোগ দিয়েছে।"

সরোজিনী ঠোঁট কামড়ে বলল, "বেশ। তাই হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন মনে হাল্‌কা আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছে। দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে এ সব রাজনীতি চর্চা স্থগিত রেখে কোমল কিছুতে মনোনিবেশ করতে। সুন্দর সুন্দর কবিতা মনে পড়ছে। রসঘন কবিতা। মন কেমন রসিক হয়ে উঠছে। হাল্‌কা কথা বলতে ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে হো হো ক'রে হেসে উঠতে।

বললেন, "রাজনীতি ত হ'ল। এবার আসুন অন্য কথা বলি। সকাল থেকে রাজনীতি ক'রে ক'রে দারুব্রহ্ম হয়ে গেছি।"

"দারুব্রহ্ম কি জিনিস?"

"এই ত মুস্কিল আপনাদের নিয়ে। আপনারা বিদেশে লেখাপড়া ক'রে দেশটাকে আর চিনতে পারেন না। রোমের সিষ্টিন চ্যাপেলে মূর্তিগুলি আপনাদের চেনা, অথচ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দারুব্রহ্ম একেবারে অচেনা।"

"দারুব্রহ্ম মানে কি?"

"বিষ্ণু শুকিয়ে কাঠ।"

সরোজিনী হেসে প্রশ্ন করল, "কেন? কিসের দুঃখে?"

"দুঃখের কি সীমা আছে? জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক পণ্ডিতপ্রবর ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া'—বিষ্ণুর এক স্ত্রী মুখরা, অন্য স্ত্রী চপলা; একমাত্র পুত্র দুর্নিবার কামাসক্ত; বাহন একটা পাখী, জলের ওপর সাপের বিছানা সম্বল; এহেন সংসারের কথা ভেবে শুকিয়ে কাঠ না হয়ে উপায় কি? 'স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।' আমরা সবাই স্বগৃহচরিত্রের কথা স্মরণ ক'রে নানারূপ মূর্তি ধারণ করি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

"আপনার কথা সব বুঝলাম না। আপনি বুঝি খুব সংস্কৃত জানেন?"

"আপনারা যেমন ইংরেজী জানেন, তেমনি।"

"শুনেছি, আপনি মস্ত কবি।"

"ভুল শুনেছেন।"

"আপনার ত একখানা মহাকাব্য আছে।"

"তা আছে।"

"কি নিয়ে লেখা?"

"কৃষ্ণলীলা।"

"আপনার ডেপুটি হ'লে মাঝে মাঝে মহাকাব্য শোনাবেন ত?"

"তা হয়ত শোনাতে পারি। কাব্য শোনাবার লোভ কবিদের ভয়ানক।"

"শুধু শোনাবেন না। বুঝিয়ে দেবেন।"

"কৃষ্ণলীলা বুঝিয়ে দিতে হয় না। সবাই এমনিতেই বোঝে:

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিণী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।"

"বাঃ। শুনতে ত বড় ভাল লাগছে। সংস্কৃত কবিতা এত সুন্দর?"

"এর চেয়েও অনেক সুন্দর।

'বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥
অমৃতমধুর মৃদুতরবচনেন
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন॥"

"অর্থ বুঝলাম না। তবু শব্দের ঝংকার মধুর লাগছে। আপনার কণ্ঠে অপূর্ব শোনাচ্ছে।"

"রসগ্রহণ এত সহজ নয়। আগে আসুন আমার ডেপুটি হয়ে, সমাজতত্ত্বটা ভাল ক'রে শিখিয়ে দিন; তখন কবিতার অর্থ বুঝতে পারবেন।"

"আপনাকে হঠাৎ দেখে ভয় হয়। মনেই হয় না, আপনি এত রসিক মানুষ।"

"কালিদাসের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"প্রবৃদ্ধ-তাপো দিবসোঽতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তন্বী।
উভৌ বিরোধ-ক্রিয়য়া বিভিন্নৌ জায়াপতি
সানুশয়াবিবাস্তাম।"

"অর্থ বলে দিন।"

"পরিণত গ্রীষ্মদিবসের বর্ণনা। অর্থ নেই। রূপ আছে। মাধুর্য আছে। মোহ আর যাদু আছে।"

"বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দিন।"

"দুষ্মন্ত আংটি ফেরত পেয়েছেন, অথচ শকুন্তলার দেখা নেই।

'সপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথানামতট প্রপাতাঃ॥"

"আপনি কাব্যরসে ডুবে থেকে রাজত্ব চালান কি করে?"

"অ্যাঁ? কি ক'রে চালাই? রাজত্ব চালাবারও

রস আছে। শীঘ্রই তার আস্বাদ পাবেন। আচ্ছা। তা হ'লে ঐ কথা রইল। দু'দিন পরেই আমরা সহকর্মী।"

"আমি আজ তা হ'লে আসি।"

"চলুন। আপনাকে বাইরে এগিয়ে দি। ক'টা বাজল?"

"দশটা।"

"চলুন। একটু দেখে আসি। এক্ষুনি চলে যাবে কি না।"

"কে? কার কথা বলছেন?"

"অ্যাঁ? না, কেউ নয়। মেঘ। মেঘ চলে যাবে, পূর্বমেঘ:

'তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥"

"সিঁড়ি দিয়ে নামতে কষ্ট হ'ল না। কিন্তু বাইরে এসে একটু দুর্বল বোধ করলেন। দীনদয়াল পেছনে ছিল। তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"বৃদ্ধ হয়েছি। রাত্রিতে চলতে একটু সাহায্য পেলে ভালো হয়।"

"বৃদ্ধ হন নি একটুও আপনি। চশমা নিলেই রাত্রে চলতে পারবেন।"

"তাই নিতে হবে। সমাজতন্ত্র দেখতে হলে চশমা লাগবেই।"

গাড়িতে বসে সরোজিনী বলল, "দুবেজিকে কিছু বলব?"

"অ্যাঁ? ও। সুদর্শনকে?"

"কিছু বলব?"

"বলবেন, রাত বারোটা পর্যন্ত আমি দপ্তর-ঘরেই থাকব। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।"

"আচ্ছা।"

"নমস্তে।"

"নমস্তে। আপনার ডেপুটি হবার পর কিন্তু আর আমায় 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলবেন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। নমস্তে।"

গাড়ি ষ্টার্ট নিয়ে ফাটক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখলেন, খাসমহলের সামনে বাড়ীর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বললেন, "দীনদয়াল, আমার সঙ্গে চল।"

দীনদয়ালকে আর ধরতে হল না। নিজেই এগিয়ে গেলেন। দীনদয়াল রইল পাশে।

গাড়িতে মালপত্র তোলা হয়েছে। চন্দ্রপ্রসাদ ভেতরে বসেছিল। বেরিয়ে এল।

"আপনি এলেন কেন, পিতাজি?"

"এমনি চলে এলাম। তোমার মা কৈ?"

"পূজার ঘরে। দেরি হয়ে গেছে।"

"পূজা দিয়ে আর লাভ নেই, রাজকুমার। হিসাব-নিকাশ পুরো হয়ে গেল।"

"পিতাজি, আপনি ঘরে যান।"

"তোমার মা আসুন।"

পদ্মাদেবী পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে পুত্রবধূ রাধা।

গাড়িতে বসতে যাবেন, দেখলেন, সামনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"তোমাকে ষ্টেশনে তুলে দিতে যেতে ইচ্ছে করছে। অথচ উপায় নেই। আমি ত তোমার স্বামী নই। আমি মুখ্যমন্ত্রী।"

"তুমি আবার সুরু করেছ?" বেদনায় তীক্ষ্ণ পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর।

"আজ বিশেষ দিন। অংক একেবারে মিলে গেল। ঠিক যা ভেবেছিলাম, ঠিক যা আশা করেছিলাম, তাই।"

"তার মানে, তুমি জিতেছ।"

"অর্থাৎ, কাল আমি জিতব।"

"বিশ্বনাথ তোমাকে রক্ষা করুন।"

পদ্মাদেবী গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ পিতাকে প্রণাম ক'রে ড্রাইভারের পাশে বসল।

গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "সাবধানে থেক। তাড়াতাড়ি চলে এস।"

দেখতে পেলেন, দীনদয়াল পাশেই দাঁড়িয়ে।

"তুই গেলি নে সঙ্গে?

"মা বললেন, আপনার সঙ্গে থাকতে।"

"তবে তাই থাক। চল, ঘরে চল। দাঁড়া, তোর কাঁধে একটু হাত রাখি। চল।"

তিওয়ারী পানীয় নিয়ে এল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ব্যস্। আর নয়।"

তিওয়ারী চ'লে যাবার জন্তে পা বাড়াতে, "যেয়ো না। বস।"

অদূরে বসল তিওয়ারী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ে দেখলেন, তার কালো চামড়া শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে গলায়, গালে, কাণের পাশে। হলদে চোখে বোবা দৃষ্টি। কপালে গভীর রেখায় মাটি জমেছে। চিক চিক করছে বিদ্যুতের বাতিতে।

"তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

হলদে বোবা চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ।

"তুমি জানতে আজকের সন্ধ্যাবেলায় জনসভায় দুর্গাপ্রসাদের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল।"

"জি।"

"জানতে, তাকে জখম করবার জন্তে হরিশংকর লোক নিযুক্ত করেছিল?"

"না।"

"তুমি জানতে। না জানলে. তোমার জানা উচিত ছিল।"

তিওয়ারীর নীরব দৃষ্টি আবার মেঝেতে নিবদ্ধ।

"তোমার অন্য সব কাজ ভাল হয়েছে। খুব পরিশ্রম করেছ তুমি।"

"আপনার সেবায়—"

"তুমি জীবন দিয়েছ। তোমাকে আমিও কম দি নি।"

"আপনার দয়া।"

"তা বলে ভেব না তুমি যা চাইবে তাই পাবে।"

"আমি এমন কিছু চাই নে—"

"চাও। তুমি মর্ণিং টাইম্‌স্-এর মালিক হ'তে চাও।"

"আপনিই এক সময়ে বলেছিলেন।"

"তখন ব্যাপার অন্তরকম ছিল। ওটা সম্ভব নয়। তুমি ভুলে যাও।"

"জি।"

"কি যেন বলেছিলে তুমি? মনে পড়ছে না।"

"আপনার চাকর হয়ে জীবন কেটে গেল। নিজের সম্মানে—"

"ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি ভদ্রসমাজে নিজের দাবিতে প্রতিষ্ঠা চাও। তাই না?"

"আপনার দয়া হ'লে—।"

"তোমার বাপ কি কাজ করত?"

তিওয়ারীর দৃষ্টি পুনরায় মেঝেয় নিবদ্ধ।

"নাপিত ছিল সে। আজ থেকে পনের বছর আগেকার কথা। বারাণসীতে তুমি আমার সঙ্গ নিয়েছিলে।"

"জি।"

"লোকে জানে তুমি কায়স্থ।"

"জি।"

"ক'খানা গ্রামের তুমি মালিক?"

"তিনখানা।"

"পড়াশোনা কতদূর করেছিলে?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম।"

"আরও দু'খানা গ্রাম তুমি পাবে।"

"আপনার কৃপা।"

"প্রেসের কথা ভুলে যাও।"

"জি।"

"তুমি ভদ্রলোক বই কি। তুমি আমার পার্সোনাল সেক্রেটারী। সবাই তোমাকে কত খাতির করে! পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা তোমার মাইনে। সরকারী বাড়ী পেয়েছ। টেলিফোন পেয়েছ। আমার গা ড়তে চলা-ফেরা কর। তোমার মত ভদ্রলোক উদয়াচলে ক'জন?"

"আপনার অগাধ দয়া। কিন্তু আপনার অবর্তমানে এসব কিছুই থাকবে না।"

"তুমি অর্থ কম সঞ্চয় করো নি। তোমার কি কি গোপন ব্যবসা আছে তাও আমি জানি। কিছুদিন আগে বেনামীতে তুমি একটা দিশী মদের দোকান পেয়েছ। ঠিক কি না?"

"জি।"

"এরকম কাজ আর করতে যেও না।"

"জি।"

"আচ্ছা, তুমি এবার যাও। আমি বারোটা দশ মিনিটে শুতে যাব।"

একবার তাকালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীর দিকে। তিওয়ারীর চোখে চোখ রেখে বললেন :

"এ বাড়ীতেই শোব।"

"জি।"

তিওয়ারী প্রস্থান করলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেওয়ালের পাশে সাবধানে সংরক্ষিত অত্যন্ত জরুরী এবং একান্ত গোপনীয় ফাইলগুলি থেকে একখানা টেনে বার করলেন। তখনও তৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু মনস্থির করেছেন, পানীয় আর নয়। মধ্যরাত্রির এখনও ঘণ্টাধিক বাকী; আজকার নাটকের শেষ দৃশ্য এখনও অনভিনীত।

ফাইলের ওপরে লাল কালিতে লেখা : জগন্মোহন তিওয়ারী।

ফাইল খুলে কয়েকখানা কাগজে পুনরায় চোখ বুলালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এসব তাঁর আগেই পড়া এবং জানা; তথাপি কারুর সম্বন্ধে সন্দেহ হলে বা নতুন ক'রে ভাবার প্রয়োজন পড়লে তার 'ইতিহাস'টা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর একবার দেখে নেন।

চোখ বুলিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ফাইল বন্ধ করে যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রাখলেন।

জানলা দিয়ে নিস্তব্ধ রজনীর শান্ত আকাশ অসংখ্য তারার জ্যোতিতে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি মট করে মাকড়সাকে ধরল আর আনন্দে ঝাপটাতে লাগল। অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল, আর কাছাকাছি কোথাও থেকে মোরগের কণ্ঠ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে পড়ল সরোজিনী সহায় অতীত কালের কৌশল্যার মত অনেকটা দেখতে। কৌতুকবোধ করলেন। আশ্চর্য মানুষের জীবন। কোনও কিছুরই সমাপ্তি নেই। আজ যা আপাত-অনুভূতিতে ফুরোয়, অন্যদিন অন্যরূপে, অন্য আসরে আবার তার দেখা মেলে। সুর ক'রে আবৃত্তি করলেন :

'আঁখ ন মুদু, কান ন রুধুঁ, কায়াকষ্ট ন ধারুঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দররূপ নেহারুঁ।'

হঠাৎ মনে পড়ল, দুর্গাভাই দেশাইর বাড়ী ফোন ক'রে খবর নিতে হবে।

টেলিফোন ধরল বসন্ত।

"আমি কে. ডি. কোশল কথা বলছি।"

"আমি বসন্ত, কাকাজি। নমস্তে।"

"বেটি, এখনও ঘুমোও নি।"

"না, কাকাজি। রাত ত বেশি হয় নি।"

"পিতাজি কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"ডা: বলীরাম দেখে গেছেন ত?"

"জি হাঁ।"

"চন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গে ছিল?"

"হাঁ জি।"

"বেশ। কি বললেন ডাক্তার?"

"বেশি পরিশ্রম ও দুর্ভাবনার জন্যে ক্লান্তি। বিশ্রাম করতে বললেন কয়েকদিন।"

"দুর্গাভাইজি ঘুমুচ্ছেন?"

"বোধ হয় না। শুয়ে পড়েছেন। টেলিফোন দেব, পিতাজিকে?"

"না, না। তবে কাল সকালে বোলো বেটি যে আমি খবর করেছিলাম।"

"বলব।"

"তোমার সব ভলো ত, মা?"

"হ্যাঁ, কাকাজি।"

"তোমার মা আর ভাইএরা সব ভাল?"

"জি হাঁ।"

"একবার এস আমার কাছে। তোমাকে অনেকদিন দেখি নে। শুনেছি, অনেক বড় হয়ে গেছ, আর বহুৎ খুবসুরৎ হয়েছ?"

"কে বলল আপনাকে?"

"চন্দ্রপ্রসাদ।"

"ধ্যেৎ।"

হাসতে হাসতে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। জীবনটা মন্দ নয়। বেশ। অত বিরাট উন্মুক্ত আকাশের মতো যত-দূরে-চাও-চলে-যাও নয়; তবু কত বিচিত্র ঘটনায়, অনুভূতিতে, ব্যথা-আনন্দে, ব্যর্থতা-

সার্থকতায়, জয়-পরাজয়ে পরিপূর্ণ। কত মানুষের মিছিল, একটি মানুষের জীবনে; কত কর্মের আহ্বান, কত নতুন দায়িত্ব, কত অভিনব সংগ্রাম। কি দুরন্ত তৃষ্ণা, কি ভীষণ ক্ষুধা: কত বিচিত্র লোভ; কি উদার অপচয়! জীবন, বিধাতার মতো, কাননে কাননে শ্যামলে শ্যামল; পর্বতে পর্বতে উন্নত; নদীতে নদীতে ক্ষিপ্র-চঞ্চল; সাগরে সাগরে কি মহা-গভীর। বিপুল হর্ষে বার বার সে কোন অমৃত স্পর্শে সীমা হারিয়ে কি আবেগে প্রবাহিত! আবার, অমাবস্যা রাত্রির তিমির-ঘন আকাশের ন্যায় কখনও সে মহামৌন।

বেঁচে থাকতে বড় ভাল লাগল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের। ভাল লাগল জীবন-জ্বালা। অনির্বাণ জ্বালা। মৃত্যুও যার কাছে পরাস্ত।

আকাশের পানে তাকিয়ে বলে চললেন:

"কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো
ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং
রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়িনী কথা॥"

মনে পড়ল, কৃষ্ণলীলাকহানী রচনার সময় কালিদাসের এ শ্লোকটি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রহণ করেছিলেন। রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও, তাঁর কাব্যে, বলেছেন, আমার জ্বালা ফুরোয় না কুসুমশয্যা, বিমল জ্যোৎস্না, সন্তঃ-মলয়জ চন্দনলেপন অথবা মণিমুক্তার হার। এরা আমার দেহ-মনের জ্বালা বাড়ায়। আমার জ্বালা কমাতে চাও তবে নিয়ে এস সেই অনুপম ললনা রাধা; অথবা আমার কাছে বসে রাধার কথা বল।

মনে পড়ল, কৌশল্যা 'গীত-গোবিন্দ' শুনতে ভালোবাসত। তার চলনভঙ্গি দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রায়ই একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। শুনে খুশি হত কৌশল্যা:

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী
পততি পদানি নিয়ন্তি চলন্তী

—দেখলাম, অন্তরের আকুল আগ্রহে তিনি অভিসারের জন্যে পা বাড়ালেন; কিন্তু চলতে পারলেন না; কয়েক পা যেতে না যেতেই অবশ হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কৌশল্যা হেসে লুটিয়ে পড়ত। তার শাড়ীর আঁচল —সে বহু, বহু বছর আগেকার কথা—তবু কেমন হারিয়ে যায় নি,—সে সময় কৌশল্যার গা থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়ত—

টেলিফোন বাজল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্বলন্ত হাসির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন টেলিফোনের দিকে। দু বার বাজবার পর রিসীভর তুললেন।

"কোশল।"

"নমস্তে কোশলজি।"

"আ, দুবেজি! নমস্তে, নমস্তে। এত রাত্রে কি মনে ক'রে?"

"সরোজিনীর কাছে আপনার আহ্বান শুনতে পেলাম।"

"আর একটু কান পেতে শুনুন, দুবেজি। কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিসার মাঝে। শুনতে পাবেন আহ্বান আসছে আপনারই অন্তরাত্মা থেকে।"

হেসে ফেললেন সুদর্শন দুবে। "আপনি রসিক মানুষ।"

"বটবৃক্ষ, দুবেজি। মাধব দেশপাণ্ডে আমায় বলেন, বটবৃক্ষ। ইট চুন পাথর থেকেও রস টেনে বার করি। আমি বলি, তা হবে। কিন্তু বট ত নিষ্ফল গাছ। তার ছায়ায় আর কিছু জন্মায় না। আমার ছায়ায় কি উদয়াচল তেমনি হয়ে গেল?"

"কোশলজি, আজ প্রভাতে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

"সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। না, না, মিথ্যা বিনয় নয়। আপনার সুদর্শন মুখ প্রভাতে দর্শন করেছি বলে দিনটা একেবারে খারাপ গেল না।"

"সকাল থেকে এই মধ্যরাত্রির মধ্যে অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মানতে বাধ্য হচ্ছি।"

"দুবেজি, যদি তাই মানতে পারছেন, আপনার মধ্যে মহানুভবতা আছে। সব কথা ত টেলিফোনে হ'তে পারে না। কাল সকালে আমি আপনার বাড়ী হাজির হব, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"সে ত পরম সৌভাগ্য, কোশলজি। কিন্তু কাল সকালে আপনার সময় হবে কি? শুনেছি, আপনি সকালে কোন গ্রামে যাচ্ছেন, ফিরবেন অপরাহ্নে।"

"ঠিক।"

"আপনি কি খুব ক্লান্ত?"

'না। একটুও না।"

"আমি এখুনি আপনার কাছে আসতে পারি কি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যদি আপনার কষ্ট না হয়।"

"তা হ'লে আসছি। পনের মিনিটে এসে যাব।"

"একাই আসছেন ত, দুবেজি?"

"হ্যাঁ। একাই আসছি। আপনিও একা আছেন, আশা করি।"

"একা। একেবারে একা। আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দরজা দিয়ে শয়ন-কক্ষের দিকে তাকালেন।

তাঁর শয্যা তৈরী হচ্ছে।

যে তৈরী করছে তাকে দেখতে পেলেন।

"তিওয়ারী!"

তিওয়ারী যেন দেওয়াল ভেদ ক'রে এসে সামনে দাঁড়াল।

"সুদর্শন দুবে আসছেন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে।"

বলে, শয়ন-ঘরের দিকে তাকালেন।

তিওয়ারী আদেশ বুঝল। বলল, "ঠিক আছে।"

"দুবেজি সরবৎ খেতে ভালোবাসেন। তৈরী রেখো।"

"জে আজ্ঞে।"

পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট মথুরাপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

মিনিট তিনেক ডিক্টেশন দিলেন।

"এইটে টাইপ ক'রে নিয়ে এস পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

মথুরাপ্রসাদ টাইপ-করা কাগজ নিয়ে এলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনোনিবেশের সঙ্গে পড়লেন।

"বেশ হয়েছে। তুমি এবার বাড়ী যাও। রুস্তমকে আর আধ ঘণ্টা থাকতে বলো।"

রুস্তম খান দ্বিতীয় পি. এ.।

ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সুদর্শন দুবের আসবার সময় হ'ল।

একবার ভাবলেন, নীচে গিয়ে সুদর্শন দুবেকে স্বাগত ক'রে ওপরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু, নিরস্ত হলেন। এত রাত্রে সিঁড়ি বেয়ে বার বার ওঠানামা করতে ইচ্ছে হ'ল না। তা ছাড়া, সুদর্শন দুবে এখন আসছে প্রার্থী হয়ে, মনে মনে বললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সকালে এসেছিল প্রচণ্ড মুখর দাবি নিয়ে। ভেবেছিল, ভাগ্যের স্রোত তার দিকে বইছে। এখন আসছে পরাজিত উচ্চাশার ভগ্নাবশেষ নিয়ে। আসুক সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে একা একা, জগন্মোহন তিওয়ারীর সঙ্গে।

গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন। রাস্তা থেকেই। ফাটকে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফাটক খুলল প্রহরী। ভেতরে ঢুকে গাড়ি এসে থামল দপ্তর-বাড়ীর সামনে।

শুনতে পেলেন, তিওয়ারী স্বাগত করছে সুদর্শন দুবেকে।

"কোশলজি কোথায়?"

"ওপরে আছেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন।"

পদধ্বনি একেবারে এগিয়ে এলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করলেন। দরজা পর্যন্ত এসে সুদর্শন দুবেকে আলিঙ্গন করলেন।

"আসুন, আসুন, দুবেজি। আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে।

সংভু সময় তেহি রামহি দেখা।
উপজা হিঁয় অতি হরষু বিশেষা॥
ভারি লোচন ছবি-সিন্ধু নিহারী।
কুসময় জানি ন কীহ্নি চিহ্নারী॥"

সুদর্শন অপ্রস্তুত হলেন। ঠিক বুঝলেন না, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তামাসা করছেন, না ব্যঙ্গ, না নিছক জয়োল্লাস।

বললেন, "সরোজিনীও বলছিল, আজ আপনি কবি হ'য়ে রয়েছেন। মুখ দিয়ে অনর্গল কাব্যসুধা নির্গত হচ্ছে। কাব্য মানেই ত অতিশয়োক্তি। স্ত্রীলোকের মুখকে চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর ঘোষণা করা। তাই, আমাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র দর্শনের আনন্দ আপনার অন্তরে না হ'লেও মুখে মুখে হওয়া বিচিত্র নয়, কোশলজি।"

"জীবনে কোনও কিছুই বিচিত্র নয়", কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে সুদর্শনকে বসালেন,

নিজে বসলেন। "আপনাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র দর্শনের আনন্দ কেন হবে না, বলুন? এখনও শ্রীরামচন্দ্র সর্বত্র সর্বভূতে বিরাজমান। আপনাতে, আমাতে, এমনকি হরিশংকর ত্রিপাঠিতেও। দ্বিতীয়ত, তুলসীদাসের ক'টি লাইন মনে প'ড়ে গেল আপনাকে দেখে—অতএব আপনি পুণ্যবান লোক।"

"পুণ্যবান আপনিও কম নন। পুণ্যবান আমরা সবাই।"

"আপনি পুণ্যবান লোক সুদর্শনজি। তুলসীদাস আরও বলেছেন:

'কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিহু মহঁ অতি দারুন দুখদ মায়রূপী নারি॥'"

সুদর্শন দুবের কান লাল ক'রে উঠল।

বললেন, "মধ্যরাত্রিতে ধর্মালোচনা চলবে না, কোশলজি। আপনি জানেন, আমি শাস্ত্রপাঠ খুব কম করেছি। আমাকে যা বলতে চান, আপনার সোজা ভাষায় বলুন, অন্যের রচিত কবিতায় বলবেন না। সবটা আমার মাথায় ঢোকে না।"

"ঠিক বলেছেন। এখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহর। এখন কারা জেগে থাকেন জানেন?"

"কারা?"

"আমরা।

'পহেলা প্রহরমে সব কৈ জাগে
দুসরা প্রহরমে ভোগী।
তিসরা প্রহর মে তস্কর জাগে
চৌথা প্রহরমে যোগী।'

"একটু সরবৎ পান করুন, দুবেজি। কাজের কথা ত হবেই। একটু সরবৎ পান করুন।"

দীনদয়াল পাথরের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এসেছিল। সুদর্শন ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দু'জনেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন।

সুদর্শন দুবে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, "বাঃ, বেশ ত!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ পান ক'রে বললেন, "ভালো লাগছে ত, দুবেজি? নিরানন্দে কোনও বড় কাজ হয় না। সন্তান জন্ম দেবার সময় মার যে প্রসব-যন্ত্রণা তাঁর মধ্যেও আনন্দ থাকে। আপনি আমি উদয়াচলের কোটি কোটি মানুষের জীবন-গঠনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। দিল্ যদি আনন্দিত না থাকে, এত লোকের ভালো করবেন কি ক'রে? নিন, পান করুন।"

সরবতের গ্লাস অর্ধেক শূন্য হয়ে গেল কয়েক মিনিটে। সুদর্শন দুবের মন হালকা হয়ে উঠল, সন্ত্রস্ত ভাব কেটে গেল। নতুন বিস্ময়ে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখতে লাগলেন। সকাল বেলার কথা মনে পড়ল। পূজার ঘর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৌরবর্ণ দেহে কেমন অতিরিক্ত দীপ্তি ছিল। আর এখন, সারা-দিনের কার্যশেষে মধ্যরাত্রিতে, আসন্ন বিজয়ের নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেমন কোমল, রসাপ্লুত হয়ে উঠেছেন। সুদর্শন দুবে ভেবেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হয়ে উঠবেন তীক্ষ্ণ অহংকারী; ক্ষুরধার হবে তাঁর বাক্য, জর্জরিত ক'রে তুলবেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গে, কৌতুকে, পরিহাসে। কিন্তু এ একেবারে অন্য মানুষ!

সুদর্শন দুবে সরবৎ পান করতে করতে বলে উঠলেন, "বাঃ বাঃ!"

"আনন্দ হচ্ছে ত, দুবেজি?" উৎসাহিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলতে লাগলেন, "বেঁচে যে আছেন, এটাই আনন্দ। বেঁচে আছেন একা নয়, আলাদা নয়, ঐ তারা-ভরা আকাশ, ঐ অপূর্ব-সুন্দর বহুবর্ণ প্রকৃতি, এই অগণিত মানুষের সঙ্গে একত্র। এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে। তা হ'লে দেখুন, কত বড় আমাদের সত্তা: যখন বহুর সঙ্গে আমরা মিলিত, যখন আমরা একা নই। যদি জীবনকে এভাবে দেখেন, তা হ'লে বুঝবেন মানুষ জন্মেছে মিলিত হবার জন্যে, স'রে দাঁড়াবার জন্যে নয়। তার রক্তধারা অনন্ত-প্রবাহে এক থেকে বহুমুখী, তাঁর অতল-গভীরে মানস বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন-উৎসুক। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনি এক হয়েও একা থাকতে চাইলেন না, দুবেজি। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'স হৈ নৈব রেমে'। একা একা তাঁর ভাল লাগল না। কেন? রস পান না বলে, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলে। তাই, 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ'। তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন। নিজেকে দুই করলেন। তখন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে তৈরী এই বিচিত্র বিশ্ব এল।"

সুদর্শন দুবে ব'লে উঠলেন, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।"

"ঠিক বলেছেন, দুবেজি। ঐতরেয় উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মার সবচেয়ে প্রকট যে রূপ, তা আনন্দ রূপ। 'রসো বৈ সঃ। তিনি রসিক, রসপ্রিয়, রসলোভী। (দীনদয়াল, দুবেজিকে আর একটু সরবত এনে দাও)। 'রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' রস অনুভব ক'রে তিনি আনন্দ পান। আর রস ত একা অনুভব করা যায় না, দুবেজি। তার জন্যে চাই আরও একজন। দুয়ের জানাজানি, পরিচয়, প্রীতিঃ এ না হ'লে রসের ধারা বইবে কি ক'রে? আর, মনে রাখবেন, এই যে দ্বিতীয়, এ হ'ল বহুরই নামান্তর। এক থেকে যেই আপনি দুই হলেন, আর আপনার বহু হবার তর সইল না।"

সরবতের দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুদর্শন দুবে বললেন, "অতি সত্যি কথা।"

ঘড়ির দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টি পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। বললেন, "তা হ'লেই ভেবে দেখুন দুবেজি, একা আপনি আর একা আমি দুজনকে দুজনে না ল'ড়ে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়াচলের সেবা করা কি বেশি ভাল নয়?"

"নিশ্চয়।"

খুব আস্তে, যেন রাত্রিও না শুনতে পায়, অথচ আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লে উঠলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, "কালকার নির্বাচনে আপনি হেরে গেছেন।"

শব্দ ক'টি সুদর্শন দুবের বুকে বন্দুকের গুলীর মত আঘাত করল। প্রতিবাদ করবার শক্তি রইল না।

"তাইত দেখছি।"

তেমনি ভীষণ আস্তে, ভীষণ জোরেঃ "সহজ হার নয়। অন্তত আশি ভোটে আপনার হার হবে।"

"তা হ'তে পারে।"

"আমি চাইনে, আপনি হেরে যান। তাতে আমার লাভ নেই, আপনারও ত নেইই। সবচেয়ে ক্ষতি উদয়াচলের। হেরে গিয়ে আপনি আবার লড়বেন, জিতে গিয়ে আমি আপনাকে আরও হারাতে চেষ্টা করব। তাতে উদয়াচলের কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যাবে।"

সুদর্শন দুবে একবারে সবটুকু সরবত পান ক'রে নিলেন।

দীনদয়াল এসে পুনরায় তাঁর গ্লাস ভরতি ক'রে দিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তার চেয়ে আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আপনি মন্ত্রীসভায় আসুন। আপনাকে পেলে মন্ত্রীসভা বলশালী হবে। কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। উদয়াচলের অগ্রগতি বেড়ে যাবে। আমি আপনার সাহচর্য চাইছি। আপনি মন্ত্রীসভায় আসুন।"

"কি সর্তে?"

"সর্ত কিছু নেই। একমাত্র সর্ত সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব। দুর্গাভাইকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন মন্ত্রীদের আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দি নিজ নিজ দপ্তরের পরিচালনায়। আপনার মান, সম্মান, সব আমার হাতে সঁপে দিন। দেখবেন, আপশোসের কারণ থাকবে না।"

"অর্থাৎ, আপনার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

"তা নয়। মন্ত্রীসভায় না এলে শাসন কাকে বলে জানতে পারবেন না। আমার অবর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হয়ত আপনাকেই হ'তে হবে। সেদিনের জন্যে তৈরী হোন। দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবেন না কদাচ। আপনার ও তাঁর মধ্যে আজ যে ব্যবধান তাও দূর করতে হবে। আমি আর কতদিন? আমি বিদায় নিলে হয় আপনি, নয় অন্য কেউ।"

"আপনি আমাকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন?"

"যদি আপনার যোগ্যতা থাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব। কংগ্রেসের সংগঠনে আপনার কৃতিত্ব সবাই জানে। এবার দেশশাসনের কাজে কৃতিত্ব দেখান।"

"কোন মন্ত্রীত্ব দেবেন আপনি আমাকে?"

"জানি না। তবে, প্রধান মন্ত্রীত্বগুলির একটা আপনি নিশ্চয় পাবেন।"

"স্বরাষ্ট্র থাকবে আপনার হাতে, অর্থ থাকবে দুর্গাভাইজির হাতে। শিক্ষা ও বাণিজ্য আমাকে দিতে রাজী আছেন?"

একটু ভেবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আছি।"

"আর—"

সেই রকম ভীষণ আস্তে, ভীষণ জোরে, "আর কিছু নয়। অন্য কোনও সর্ত যদি তোলেন, আমি মানব না। তা হ'লে কাল নির্বাচন হবে। আপনার দল ভয়ানক

হারবে। আর, এক বছরের মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বও আপনার থাকবে না।"

সুদর্শন কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইলেন। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন,

"আর কোনও সর্ত আমার নেই। তবে কয়েকটা প্রশ্ন আছে। জবাব দেবেন ?"

"নিশ্চয়।"

"হরিশংকর ত্রিপাঠিকে নতুন মন্ত্রীসভায় নেবেন না শুনছি। এ কি সত্যি ?"

"আমার ইচ্ছা ত্রিপাঠিজিকে অন্য দায়িত্ব দেবার।"

"মহেন্দ্র বাজপাঈজি ?"

"আর কারুর সম্বন্ধে কিছু বলা এখন সম্ভব নয়। তবে, নতুন মন্ত্রীসভায় কিছু নতুন রক্ত আমদানী করা আমার ইচ্ছে। বিশেষত কম-বয়সীদের সুযোগ দিতে চাই।"

"অর্থাৎ, মন্ত্রীসভা বৃহত্তর হবে।"

"হতে পারে।"

"সরোজিনীকে মন্ত্রীসভায় নেবেন কি ?"

"ইচ্ছে আছে।"

"সে ত সূর্যপ্রসাদকেও মন্ত্রীসভায় আনতে চাইছে।"

"আমাকেও তাই বলে গেছে। মন্ত্রীসভা দুর্গাভাই ও আপনার সঙ্গে আলাপ করে, আপনাদের সম্মতি নিয়ে গঠন করবার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমার ছেলেকে স্থান দেবার খুব আগ্রহ আমার নেই। সরোজিনী সহায়ের দাবি যদি আপনারা আমায় মানতে বলেন, মেনে নেব।"

সুদর্শন দুবে নীরবে সরবৎ পান করতে লাগলেন। চোখ-মুখ থমথমে, গম্ভীর।

"আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, দুবেজি ?"

"না।"

"আমার কিছু বক্তব্য বাকী আছে। আজ সকালে আপনি আমার এক বিবৃতিতে সই করতে বলেছিলেন। আজ রাত্রে আপনাকে আমি অন্য এক বিবৃতিতে সই করতে বলব।"

আতংকিত কণ্ঠে সুদর্শন বলে উঠলেন, "কিসের বিবৃতি ?"

আপনি চেয়েছিলেন আপনার কাছে আমি দাসখৎ লিখে দি। আমি তা চাইনে আপনার কাছ থেকে। চাই সহযোগিতার অঙ্গীকার। একটি বিবৃতির খসড়া আমি তৈরী ক'রে রেখেছি। আমরা দু'জনে তা সই ক'রে পি টি আই-কে দিয়ে দেব। প'ড়ে দেখুন। এতে বলা হয়েছে উদয়াচলে মন্ত্রীত্ব নিয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল আপনি এবং আমি একত্র হয়ে তার সমাধান করে ফেলেছি। আপনি আমার সরকারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, আমি মেনে নিয়েছি আপনার সাংগঠনিক নেতৃত্ব। উদয়াচলের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি, আমার একান্ত অনুরোধে, মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে রাজী হয়েছেন। আগামী কালের পার্টি সভায় আপনি নিজেই দলপতি পদে পুনঃনির্বাচনের জন্যে আমাকে মনোনীত করবেন। আমরা দু'জনে আশা করি উদয়াচলের কংগ্রেস এবার অত্যন্ত বলশালী হবে, অন্তঃ-বিরোধ একেবারে ঘুচে যাবে ; মন্ত্রীসভা কায়মনোবাক্যে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। বিবৃতির প্রত্যেকটি শব্দে ও বাক্যে আমি আপনার মান ও সম্মান পূর্ণ বাঁচিয়ে রেখেছি। প'ড়ে দেখুন।'"

ফাইল থেকে এক খণ্ড টাইপ-করা কাগজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুদর্শন দুবের হাতে দিলেন।

সুদর্শন প'ড়ে কয়েক মিনিট ভাবলেন। তারপর পকেট থেকে কলম তুলে নিয়ে নাম সই করলেন।

সুদর্শন দুবের স্বাক্ষরের নীচে সই করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

তিওয়ারীকে ডাকলেন।

"এই বিবৃতি নিয়ে এখুনি পি. টি. আই অফিসে চলে যাও। সুন্দররাজনকে বলবে, এ যুক্ত বিবৃতি এক্ষুনি সুদর্শন দুবেজি এবং আমি স্বাক্ষর ক'রে তোমার হাতে পাঠাচ্ছি। আজ রাত্রে আমরা দুজনে আর কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। সুন্দররাজন যেন আমার সঙ্গে কাল প্রাতে আটটার সময় দেখা করে।"

তিওয়ারী কাগজ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "মন্ত্রী হ'লে দেখবেন ভাল লাগবে, দুবেজি। আসুন, আর একটু সরবৎ পান করা যাক। দীনদয়াল, সরবৎ নিয়ে আয়।"

এক চুমুকে গ্লাস শেষ ক'রে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আঃ। আঃহাঃ। দুবেজি, এত গম্ভীর কেন ?"

"আপনি রাজা। আনন্দ আপনারই শোভা পায়।"

"কই? আমি ত আমার রাজত্বে নিরানন্দের আদেশ জারি করি নি! যেমন করেছিলেন দুষ্মন্ত। শকুন্তলার কথা তাঁর মনে পড়েছে, তাই রাজ্যের সর্বত্র বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন। নিরানন্দের সে কি সুন্দর বর্ণনা! শুনবেন, দুবেজি?

'চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদাপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শংকে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূর্ণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥'

—রাজা নিষেধ করেছেন, তাই বসন্ত বিকশিত হয় নি। গাছপালা, ফুল, পাখী, সবাই রাজার আদেশ মেনে নিয়েছে। আমের মুকুল সেই কবে বেরিয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পরাগ বাঁধে নি। কুরুবকের ফুল ফুটি করেও ফুটল না; কুঁড়িই থেকে গেল। সেই কবে হিমকাল চলে গেছে, তবু এখনও কোকিল কুহুরব করছে না; রাজাদেশ অমান্য করবার সাহস নেই। এমন যে ত্রিভুবন-জয়ী কন্দর্পদেব, তিনি বসন্তের সমাগমে তূণ হ'তে বনে প্রায় নিষ্কাশিত করেছিলেন। এমন সময় রাজাদেশ হ'ল, আর তিনি চমকিত হয়ে শশব্যস্তভাবে সেই বনে আবার তূণীরে রেখে দিলেন।"

"আমি আজ আসি, কোশলজি। সরবৎ একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।"

"আসুন, আসুন। কাল একেবারে পার্টি মিটিং-এ দেখা হবে। বাড়ী গিয়ে পরম সুখে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করুন:

'দিন জলদী-জলদী ঢলতা হয়।
হো জায় ন পথ মেঁ রাত কঁহী,
মঁজিল ভী তো হয় দুর নহীঁ—
বহ্ সোচ থকা দিন কা পন্থী ভী জলদী-জলদী চলতা হয়।
দিন জলদী জলদী ঢলতা হয়।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

বারোটা আট।

জানলার বাইরে আকাশ নিষ্কম্প, সুস্থির।

অন্ধকার মনলোভা রমণীর হাতের কোমল স্পর্শ।

সুদর্শন দুবের সঙ্গে হাত মিলালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

"নমস্তে মুখ্যমন্ত্রীজি।"

"নমস্তে শিল্পমন্ত্রীজি।"

সুদর্শন দুবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন দীনদয়ালের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে, সন্তর্পণে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

টেলিফোন বেজে উঠল।

"কোশল।"

"আমি সুভাষ, কোশলজি।"

"রাইট অন্ টাইম। ভেরী গুড। গো অ'হেড্।"

"যে-আজ্ঞে।"

"তুমি নিজে থেকে সব কাজকর্ম দেখছ ত?"

"কাগজ বেরুবার পর বাড়ী যাব।"

"বেশ। আর একটা কাজ করবে।"

"বলুন।"

"পি. টি. আই-কে একটা বিবৃতি পাঠিয়েছি। সুদর্শন দুবের ও আমার সই-করা। এক্ষুনি তুমি পেয়ে যাবে। ওটা বেশ বড় ক'রে প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপো। সঙ্গে আমার, সুদর্শন দুবের এবং দুর্গাভাই দেশাইর ছবি দেবে—দুবেজি মাঝখানে, বুঝলে ত? সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তুমি নিশ্চয় লিখেছ। তার মধ্যে এ বিবৃতির কথা উল্লেখ করা দরকার। অর্থাৎ তোমাকে সম্পাদকীয়টা আর একবার লিখতে হবে। কি বললে? পারবে? খুব ভাল। হ্যাঁ শোন। সুন্দররাজনকে ফোন কর। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে, এবং যে রাজনৈতিক সংবাদ তুমি ছাপছ তার কিছুটা তাকে দিয়ে দাও। অন্য সব কাগজেও ত ছাপা দরকার। বুঝেছ ত? বেশ। ভেরী গুড।"

"আপনাকে অভিনন্দন জানাই, কোশলজি।"

"অভিনন্দন? আজ নয়। কাল রাত্রে। কাল রাত্রে খেতে এস আমার এখানে। গুড নাইট।"

॥ তেইশ ॥

মধ্য রাত্রি অতিক্রান্ত। কর্মের গৌরবতৃপ্ত সমাপ্তি। এবার বিশ্রাম। এবার নিদ্রা। আবার সূর্যালোকিত প্রভাতে নতুন গৌরবের লোভবস্তু সংগ্রামের প্রস্তুতি।

তিওয়ারী ফিরে আসবার আগেই সুদর্শন দুবে বিদায় নিয়েছেন। দীনদয়ালের কাঁধে হাত রেখে নেমে গেছেন

সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ায় দেহ এলিয়ে তারা-ভরা আকাশের পানে তাঁকিয়ে শুনতে পেয়েছেন গাড়ির প্রস্থান-শব্দ। শুনতে শুনতে আধা-জাগ্রত চাঁদকে বলেছেন :

তুহুঁ যৈছে রসবতী কাহ্নু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি-পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥

অনেক পুণ্যে রসবতীর সঙ্গে রসবন্তের মিলন হয়। (বাঁকা হাসি দেখা দিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকার নীচে।) আর প্রেমের সঙ্গে একটু চৌর্যবৃত্তি মিশিয়ে দাও, তবে হবে লাখগুণ রঙ্গ। হেসে উঠলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

হাসতে হাসতেই দেখতে পেলেন তিওয়ারী এসে ঘরে দাঁড়িয়েছে।

"রাত অনেক হ'ল," তিওয়ারী নিবেদন করল। "সাড়ে বারোটা।"

"হাঁ, এবার উঠব। কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে দাও।"

তিওয়ারী ফাইল, কাগজপত্র, বই সব গুছিয়ে ফেলল। জরুরী ফাইলগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের হাতে সরিয়ে রাখলেন। কিছু কাগজপত্র বাক্সে তুলে রেখে নিজের হাতে চাবি লাগালেন।

"একটু ধর আমাকে। কোমরে ব্যথাটা..."

জগন্মোহন তিওয়ারীর কাঁধে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

হরিণ-চামড়ার চটি জুতা পরিয়ে দিল তিওয়ারী তাঁর পায়ে।

দরজা পেরিয়ে বারান্দা। একদিকে ক্যাবিনেট রুম। অন্যদিকে, শেষ প্রান্তে, বিশ্রাম-ঘর, অর্থাৎ শোবার ঘর। শোবার ঘরের সঙ্গে বাথরুম।

বারান্দার শেষ পর্যন্ত তিওয়ারী নিয়ে গেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। সারা মুখ্যমন্ত্রীভবন নিঃশব্দ। রাত্রি গভীর আলিঙ্গনে ঢেকে রেখেছে সবাইকে, সব কিছুকে। কেউ আর কিছু দেখছে না, শুনছে না, জানছে না। কারুর মুখে, চোখে আর কোনও প্রশ্ন নেই। এখন কেবল ধারাবাহিক অবলুপ্তি।

বাথরুমের কাছে তিওয়ারী থামল।

ধুতি, ফতুয়া, তোয়ালে, সাবান নিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়েছিল আর একজন। সে এক পা এগিয়ে এল।

তিওয়ারী দু' পা পিছিয়ে গেল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হাত বাড়িয়ে বাথরুমের দরজা ধরলেন।

তিওয়ারী নিঃশব্দে দ্রুত বিদায় নিল।

দপ্তর-ঘরের আলো নিবল। তিওয়ারী গাড়িতে বসল। গাড়ি ছাড়ল।

দীনদয়াল একতলায় তার শোবার ঘরে চলে গেল।

ফাটকে বন্দুকধারী প্রহরী বলে উঠল, রামা হৈ, রামা হৈ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাথরুমে ঢুকে নরম গদি-আঁটা চেয়ারে বসলেন। ঈষৎ উষ্ণ জলে তাঁর হাত, পা সাবান দিয়ে সে ধুয়ে দিল। নিজের হাতে মুখ ধুলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মুখ ও ঘাড় সে সযত্নে মুছিয়ে দিল। কুর্তা ও বেনিয়ান ছাড়িয়ে পরিয়ে দিল ধবধবে সাদা ফতুয়া। ধুতি বদলে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন মন একেবারে হালকা, দেহ আরাম-অভিলাষী।

বাথরুম থেকে তার কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শয়ন-ঘরে গেলেন। সে বিছানা অনেক আগেই তৈরী রেখেছিল। নরম সুখকর শয্যার ওপর বিছান ছিল মণিপুরী বেড-কভার। এক পাশে ফুলদানিতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ। সব ঘর জুড়ে মৃদু সৌরভ। শয্যা ও দেওয়ালের মাঝামাঝি আরাম কুরশিতে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

নরম হাত দিয়ে ভীরু, সন্তর্পণ যত্নে সে তাঁর কপাল, মাথা, ঘাড় টিপতে লাগল।

বাথরুমে ঢোকার পর থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথা বলে যাচ্ছিলেন, একটানা নয়। মাঝে-মধ্যে, হঠাৎ। নীরবতার অন্ধকারে জোনাকি আলো। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলছিলেন না। নিজেকেও না। শুধু বলছিলেন, না বলে উপায় ছিল না, তাই বলছিলেন।

তাঁর কথা কারুর মনে একটুও রেখাপাত করছিল না।

সে একটি কথাও শুনছিল না।

সে একটি কথাও বলছিল না।

একটি কথাও বুঝছিল না।

দপ্তরবাড়ীতে রাত্রিযাপন করলে অনেক সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুনিদ্রা লাভের জন্তে তার সেবা গ্রহণ করেন।

সারাদিনের ক্লান্তির পর মাথা, কপাল, ঘাড়, পিঠ ও কোমর টিপে দিলে ভাল ঘুম হয়। সারাদিন পরে, অনেক রাত্রিতে, কর্ম শেষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কখনও-সখনও সরবৎ পান করেন। একটু বেশি পান হয়ে গেলে কথা বলতে ইচ্ছা হয়। দীর্ঘকালের চর্চায় যে-সব কবি তাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁদের কবিতাবলী ঝরণার মত চোখের সামনে বয়ে যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ দিয়েও কাব্যরস নির্গত হতে থাকে।

সেবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পান। নরম হাতের কোমল সেবা।

চোখেরও আরাম হয়। দেখতে সে সুন্দর।

সে নীরব, নিশ্চুপ, নিরীহ।

একটা কথাও সে বলে না। শোনে না। বোঝে না।

বোবা, কালা, জগন্মোহন তিওয়ারীর স্বামী-পরিত্যক্তা সুন্দরী কন্যা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সেবিকা।

দিনটা মন্দ কাটল না। সুদর্শন দুবে হেরে গেল। যা সকালে ভাবতেও পারে নি, মধ্য রাত্রিতে তাই তাকে করতে হ'ল। সকালে বলে গেল, এক গগনে দুই সূর্য, দুই চন্দ্রের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। সুদর্শন দুবে আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এক মন্ত্রীসভায় সহযোগিতা করতে পারে না। সকাল বেলাকার সূর্য মধ্য রাত্রিতে মন্দজ্যোতি তারকা হয়ে গেল। কাল সকালে সে আর সূর্য থাকবে না। দিবসেও তাকে নক্ষত্র হয়েই বিরাজ করতে হবে। সুদর্শন দুবেকে আর একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে ভাল হ'ত। সরবৎ পান করে বড় গম্ভীর হয়ে গেল সুদর্শন। ঘুম পেয়ে গেল। বলতে হ'ত দুঃখ বা রাক ক'রে লাভ নেই। আজ যা হ'ল না, কাল হয়ত তা হবে। হয়ত কোনও দিন হবে না। যা হ'ল, তাকে বড় ক'রে দেখতে নেই। মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে তাই বলেছিলেন। আরও একটা বড় কথা বলেছিলেন। কাল নিরপেক্ষ। সে কাউকে ভালবাসে না, কাউকে ঘৃণা করে না। শুধু সবাইকে আকর্ষণ করে। 'ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম। ন মধ্যস্থঃ ক্বচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি।' সবাইকে কাল কেবল আকর্ষণ করে। আমাকেও করছে। আস্তে, অত জোরে নয়। আস্তে হাত চালাও। ঘাড়ে কেমন একটা ব্যথা। সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি। বাষট্টি বছর বয়সে কালের আকর্ষণকে ভয় করার কথা নয়। আমি নিশ্চিহ্ন হ'লে সুদর্শন দুবে হবে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। কেন হবে না? তার চেয়ে যোগ্য তখন থাকবে না আর কেউ। এমন দিন আসবে, সেদিনের খুব দেরি নেই, যেদিনের মন্ত্রীরা আজকের মন্ত্রীদের থেকে অন্য প্রকার হবে। ইংরেজী জানবে না। তারা আসবে গ্রাম থেকে, জেলা শহর থেকে। নতুন ভারতবর্ষের প্রকৃত নেতা। হবে না কেন? রাজনীতিতে কারা আসছে? গ্রামের ধনী চাষী। দশ রকম কর্মহীন মানুষ। যাদের আর কিছু করবার নেই, তারা রাজনীতি করছে। ভাল ভাল ছেলেগুলি হচ্ছে ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, সায়ান্টিষ্ট, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর। বুঝছে না, গণতান্ত্রিক দেশে আসল নীতি হ'ল রাজনীতি। আগে রাজা, পরে প্রজা। ভীষ্ম শরশয্যা থেকে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, আগে কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তারপর ভার্যা আনবে, তারপর আহরণ করবে ধন। রাজা না থাকলে ভার্যাও থাকবে না, ধনও না। 'রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্। রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনম্।' রাজা মানে 'কিং' নয়, রাজা মানে গবর্ণমেণ্ট। আগে দেশ সুশাসিত হবে, তবে ঘরে বৌ থাকবে, ধন জমবে। এ কথাটা ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা বুঝছে কৈ? যাদের হাতে রাজনীতির রশি তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত, তারা যে দেশের রথ বেশীদিন টানতে পারবে না, দেশের লোক তা ভেবে দেখছে কি?

আমি মরলে অথবা অবসর নিলে উদয়াচলের 'রাজা' হবে সুদর্শন দুবে। তার পরে হয়ত-বা গোবিন্দ সহায়। সুদর্শন দুবের তিন-ধাপ নীচে। দুর্গাভাই দেশাই? দুর্গাভাই দেশাইদের কাল বহুদিন গেছে। সুদর্শনের সঙ্গে আমার সমঝোতায় দুর্গাভাই আহত হবেন। ভাববেন, তাঁকে ডিঙ্গিয়ে এ-কাজ ক'রে তাঁর প্রতি আমি অসম্মান দেখিয়েছি। অভিমান হবে। তাই, ভোর-সকালে যেতে হবে দুর্গাভাই-এর কাছে। অসুস্থ জেনে

তাঁকে আজ আর বিরক্ত করি নি, বলতে হবে। অভিমান ভাঙতে দেরি লাগবে না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে একত্র তিনি মন্ত্রীসভায় থাকবেন না? নিশ্চয় থাকবেন। না থেকে যাবেন্ কোথায়? গান্ধী-আশ্রম আর চলবে না। মন্ত্রীত্ব ছাড়া আর কিছু করবার নেই আমাদের কারুর, আমরা যারা একবার মন্ত্রী হয়েছি। মন্ত্রীত্ব নিয়ে যাও, আমরা বেকার। আমাদের অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। দুর্গাভাইকে মন্ত্রীত্ব নিতেই হবে। সুদর্শন দুবে আর দুর্গাভাই দেশাই। একে অন্যকে ম্লান ক'রে রাখবে। একজনও পারবে না বেশি প্রভাব ছড়াতে। দু'জনেই থাকবে আমার আয়ত্তে, দুর্বল হয়ে। স্বয়ং বৃহস্পতি বলেছেন, রাজার প্রধান কর্তব্য সযত্নে স্বার্থরক্ষা করা।

কাল সকালে বিলাসপুরে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। যারা ভেবেছিল কে. ডি. কোশলের পতন হ'ল, তারা আবার তার উত্থান দেখে বিস্মিত হবে। উদয়াচলের নেতা কে. ডি. কোশলের কদাপি পতন ঘটবে না। যে-দিন ঘটবে, সেদিন তার মৃত্যু। আমরণ সে উদয়াচলের সেবা ক'রে যাবে। তা নইলে তার আত্মার তৃপ্তি হবে না। উদয়াচলের ইতিহাসে কে. ডি. কোশল অমর হয়ে বেঁচে থাকবে। তার নাম বহন করবে না কেবল কে. ডি. কোশল এ্যাভিনিউ, কে. ডি. কোশল কলেজ ফর উইমেন, কোশল পলিটেকনিক এবং কে. ডি. কলোনী। তার নাম বহন করবে উদয়াচলের ইতিহাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। উদয়াচলের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা। নেতা কি ক'রে হয়? কোন্ মালমশলায়? কোন্ যাদুতে? দেশসেবায়? তা হ'লে ত উদয়াচলের নেতা হতেন দুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাই! দলীয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে? তা হ'লে এ সম্মান প্রাপ্য হ'ত সুদর্শন দুবের। নেতৃত্বের যাদু অন্যতর, যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের আছে, দুর্গাভাই ও সুদর্শন দুবের নেই। মহাভারতে বলা হয়েছে নেতা সূর্যের মত অন্ধকারময় স্থান উদ্ভাসিত করেন, বায়ুর মত নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন। 'অসূর্যমিব সূর্যেন নির্বাতমিব বায়ুনা। ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥' সে নেতা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী কাব্যে রূপ দিয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল উদয়াচলের অন্ধকারে সে আলো এনেছে। নির্বাত উদয়াচলে এনেছে প্রাণধারণের বায়ু। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল উদয়াচলের একমাত্র নেতা।

তবু একজন বলেছিল, সব ছেড়ে দাও, দিয়ে বনবাসী হও। বলেছিল এক বৃদ্ধা নারী। নাম পদ্মা দেবী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের ধর্মপত্নী। বলেছিল, দুর্বলের মত রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন কর। না, তা নয়। বলেছিল, জয়লাভের পর রাজমুকুট মাটিতে রেখে এক বস্ত্রে বানপ্রস্থ গ্রহণ কর। রাজী হই নি বলে আজই রাত্রে সে বারাণসী চলে গেছে। বলেছিল, এ জয়ের জন্যে যে দাম দিতে যাচ্ছ তাতে তুমি নিঃস্ব হবে। কি দাম দিতে হ'ল? সুদর্শন দুবেকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রীত্ব? সরোজিনী সহায়কে মন্ত্রীসভায় নেওয়া? দু'শো কংগ্রেস সদস্যের ছোটখাট দাবি-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়া? নিজের ছেলেকে কৌশলে উপমন্ত্রী ক'রে নেওয়া? এ সব কি এতই দাম যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে নিঃস্ব ক'রে দেবে? এটুকু দাম কি উদয়াচল দিতে পারে না কে. ডি. কোশলের নেতৃত্বের জন্যে?

…মেয়েটি বেশ। নামটিও। সরোজিনী সহায়। আশ্চর্য। খানিকটা কৌশল্যার মত দেখতে। শিক্ষিত, মার্জিত, সপ্রতিভ। দেখতে বেশ সুন্দর। রসিকতা বোঝে, উচ্চাশা আছে। মেয়েটি বেশ। ওকে তৈরী করতে পারলে কাজ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উপমন্ত্রী হবার আশ্বাসে মহা খুশী। এতটা আশা করতে পারে নি। ভেবেছিল বড় জোর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হতে পারবে। দিতে জানতে হয়। যখন দিতে হবে, তখন বেশি ক'রে দাও—গ্রহীতার হাত পূর্ণ ক'রে দাও। যখন জান দেবে না তখন এক বিন্দুও দেবার ছলনা ক'রো না। আস্তে আস্তে দিতে গিয়ে দেখবে দানের চিহ্নমাত্র নেই: নিদাঘ-তপ্ত মাটিতে জলবিন্দুর যেমন চিহ্ন থাকে না। সরোজিনীকেও তেমনি দু' হাত উপচে দিয়ে দিয়েছি। একে উপমন্ত্রী, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য। ওকে দিয়ে কাজ হবে। রাজনৈতিক উচ্চাশা আছে। শিক্ষিত, মার্জিত, সপ্রতিভ। বলে-কয় বেশ। দেখতে ভাল। রসিকতা বোঝে। মুখে-চোখে প্রচ্ছন্ন

বিষণ্ণতা। বুকে কোথাও লুকানো ব্যথা আছে মেয়েটির। ডান গালটি হাতে ভর করে কথা শুনছিল। দেখতে ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, সন্ধ্যার ম্লান আকাশে প্রতিপদের চাঁদ। ঐ দেখ, জয়দেবের ভাষা মনে এসে গেল।

তাজতি ন পাণিতলেন কপোলম্
বলেশশিনমিব সায়মলোলম ॥

আশ্চর্য, ধর্মপত্নী পদ্মাদেবীকে নিয়ে কবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অন্তরে কাব্যধারা কোনও দিন প্রবাহিত হয় নি। পদ্মাদেবী তাপসী। রমণী নয়। তার স্থান পূজা-ঘরে, নিশ্ছিদ্র নীতিবোধে, কর্তব্যের কঠোর দাবি নিরলস নিঃপ্রশ্ন নিপুণতায় মিটিয়ে যাওয়ায়। সে অন্তরের বিবেক। তাকে নিয়ে অনেক কিছু হতে পারে, কাব্য হয় না, বেঁচে থাকার দহন আনন্দ অনুভব করা যায় না। এ বৃদ্ধ বয়সে কাব্যধারা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে; রাজনীতি ও শাসনের ধারাবাহিকতা থেকে অবসর নেই। তবু ইচ্ছে হয় মরবার আগে আর একখানা মহাকাব্য রচনা ক'রে যাই। সরোজিনী সহায় কি কাব্যরস বুঝবে?

বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা
তদধরপানবভসকৃততন্দ্রা ॥
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥
দয়িতবিলোকিত লজ্জিত হসিতা
বহুবিধকূজিত রতিরসবসিতা ॥
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা
শ্বসিত নিমীলিতবিকশিতনঙ্গা ॥

যুগ যুগ ধ'রে সব কবি এমনি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান করেছে। যার মুখচন্দ্রে উড়ে উড়ে পড়েছে চূর্ণ অলক, প্রিয়মুখচুম্বন-সুখে ঢুলু ঢুলু আঁখি। ললিত কপোলে দুলছে মণিকুণ্ডল; মেখলা মুখর ঘন ঘন জঘন-সঞ্চালনে। দয়িতকে দেখে কখনও সে হাসিতে উদ্ভাসিত, কখনও প্রেমলাজে লজ্জিত। রতিরসে বিভোর তার মুখ থেকে কত না অস্ফুটধ্বনি বিচ্ছুরিত। কখনও সে বিপুল পুলকে কম্পিত। তার রতিরঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে কখনও বা ঘন ঘন নিঃশ্বাসে, কখনও চোখের চাহনিতে।

সুদর্শন হবেও বার বার কেঁপে উঠছিল। রতিরঙ্গে নয়। পরাজয়ের বিভীষিকায়। কিন্তু সত্যি সুদর্শনের হার হয় নি। আগামী মন্ত্রীসভায় উদয়াচলের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠবে, ধীরে ধীরে, সুদর্শন দুবে। দুর্গাভাই দেশাই ক্রমে অস্তমিত হবেন। ধৈর্য ও বুদ্ধি থাকলে উদয়াচলের গগনে সুদর্শন একদিন প্রধান ভূমিকায় উদিত হবেন। কংগ্রেস বহুদিন রাজত্ব করবে। ভেঙ্গে যেতে যেতেও রাজত্ব করবে। তার কারণ, কংগ্রেস কোনও দল নয়। বহু দল-উপদলের মিলিত রঙ্গভূমি। অন্য কোনও দল ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল দানা বাঁধতে পারবে না। এই সাধারণ সত্য দুর্গাপ্রসাদ বুঝল না, তাকে বোঝান গেল না। এ দেশের জলবায়ু, ইতিহাস, ঐতিহ্য কোনও কিছুকে পবিত্র থাকতে দেয় না। সব কিছুতে ভেজাল মিলিয়ে 'ভারতীয়' করে নেয়। আমরা তাকে বলি 'সমন্বয়'। এ সমন্বয়ের চেহারা দেখবে সর্বত্র। বহু দলের রাজনীতির নাম দিয়ে একটি দলের ধারাবাহিক রাজত্ব। গণতন্ত্রের সঙ্গে আশ্চর্য সমন্বয় সামন্ততন্ত্রের। সমাজবাদের সঙ্গে ধনবাদের। ভারতবর্ষে সাম্যবাদ বল, সমাজবাদ বল, সব ভেজাল। সব কিছুতে 'সমন্বয়'। অথচ এ সত্যটা দুর্গাপ্রসাদ বুঝল না। বুঝলে সে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে 'বামপন্থী' হ'ত না। তৈরী করত না স্বখাত রাজনৈতিক কবর। দুর্গাপ্রসাদ আজ কংগ্রেসে থাকলে একদিন উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হ'ত। পিতার উত্তরাধিকারে তার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। আমিও তাকে দিয়ে যেতাম সযত্নে দীক্ষা। আমার জীবনের সবটুকু পাওনা তার হাতে তুলে দিয়ে যেতাম। হ'ল না। পুত্র চলল না পিতার পথে, তার সঙ্গী হয়ে। বেছে নিল বিপথ। দু' পথের ব্যবধান গেল বেড়ে। দুর্গাপ্রসাদ এখন পিতার আদেশে কারাগারে বন্দী। আমার জয়ে তার আনন্দ নেই। আমি হারলে সে ব্যথা পেত না। আমি চলেছি আমার পথে, শেষ পথটুকু মাত্র আছে বাকি। দুর্গাপ্রসাদ ব্যঙ্গ করছে, উপহাস করছে, নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। ক্ষীণ প্রতিরোধও করছে। তার মায়ের আকুল অনুরোধ দিয়ে নয়। বিকল্প রাজ-নীতির জোর দেখিয়ে। অথচ তার কোনও দিন জয় হবে না। ললিতনখদন্ত হয়েও কংগ্রেস রাজত্ব করবে।

দুর্গাপ্রসাদ একদিন বৃদ্ধ হবে, দেহে, মনে ব্যর্থতায়, হতাশায় সে বৃদ্ধ হবে। অথচ আমার কিছু করার নেই। আমার শক্তি নেই তাকে ফিরিয়ে আনা। সুদর্শন দুবেকে টেনে আনতে পারি—কিন্তু পুত্র দুর্গাপ্রসাদ আমার আয়ত্তের বাইরে।

বিধি-নিষেধ কে বন্ধন, জগ্‌ কে
ব্যঙ্গ কহাঁ, উপহাস কহাঁ,
'তানো কো তানে সুননে কা
সময় কহাঁ অবকাশ কহাঁ?
নিজ পথ পর চলতে রহতে হো
মিলা তুম্হেঁ গতি কা 'নির্বাণ'
দূর দেশ কে অথক পথিক হে
হে কবি, হে অদ্ভুত, অনজান।'

কবি দূর দেশের অনজান পথিক। পান্থ সে, তাই তাকে পথের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হয়। কবি কেবল বলতে চায়, জীবনে জীবনে যে বলার শেষ নেই। দিনের কাহিনী যত, রাত চন্দ্রাবলী, মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি। আমি বলছি, অথচ তুমি শুনতে পারছ না। তুমি বলতেও পারছ না। তোমার বলন নেই, শ্রবণ নেই, অথচ তুমি পাষাণ-অহল্যা নও। তুমি রক্ত-মাংসে গড়া সুন্দরী নারী। তোমার হাতের স্পর্শ সুন্দর, তোমার দেহের কান্ত শান্ত উত্তাপ সুন্দর। তোমার সেবা সুন্দর। অথচ তোমার গভীর কালো চোখে প্রাণের প্রকাশ নেই, তোমার ঘনকৃষ্ণ মৃদু-সুরভিত কেশে কম্পিত কামনা নেই। তুমি শুনতে পাও না। অথচ তুমি জানো আমার কি চাই, কেন তোমাকে এখানে আসতে হয়, কখন তোমাকে চলে যেতে হয়। তোমার কাছে কিছু চাইতে হয় না, তোমাকে কিছু বলতে হয় না। কথা বললে তোমার মুখে সামান্য ভাবের পরিবর্তন দেখতে পাই নে। আমি রজনীর নির্জন একাকীত্বের কাছে কত কথা বলি, তুমি একমাত্র প্রাণী আমার কাছে থাক। কাছে থাক অথচ শুনতে পাও না। তবু এত রাত্রে ঘুমুতে এসে তোমার এই নীরব সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তুমি সেবা কর।

আমরাও সেবা করি। আমরা দেশের নেতা নই। দেশসেবক। বহুদিন আগে দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা সংগ্রামে নেমেছিলাম; পৃথিবীর বৃহত্তম সহিংস শক্তিকে অহিংসায় পরাস্ত ক'রে ভারতবর্ষে আমরা এক অভিনব ইতিহাস রচনা করেছি।

ভাই-বোনেরা, কমরেডগণ, আপনারা এক মুহূর্তের জন্যে সে গৌরবময় ইতিহাসের কথা বিস্মৃত হবেন না। আমাদের একজনও নেতা নয়: আমরা এখনও ভারত-মাতার আজ্ঞাবহ সৈনিক। অবস্থার পরিবর্তনে কর্তব্যের রূপ বদলায়। পুণ্যপ্রদীপ্ত কুরুক্ষেত্রের বিবদমান দুই সৈন্য শিবিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর সেদিনকার কর্তব্য হত্যা করা, দুর্যোধনকে পরাস্ত করা, যুদ্ধে জয়লাভ করা। আজ আমাদের কর্তব্যের চেহারা শুধু বদলেছে, অন্তঃসার বদলায় নি। আমরা এখন শাসনভার গ্রহণ করেছি, কিন্তু এ হ'ল ভারতের অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করার মত। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় নিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন, সে পাদুকাই রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করত। আমরাও দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছি। সমস্ত দেশবাসীর উচ্চারিত, অনুচ্চারিত আজ্ঞা, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ও অভাব আমাদের শাসনের যোগক্ষেম বিধান করছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে আমরা ক্ষমতা পেয়ে ভোগী, আরামপ্রিয় ও বিলাসী হয়ে উঠেছি। ইংরেজ-পরিত্যক্ত অট্টালিকায় আমরা বাস করি, গাড়ি চড়ে বেড়াই, সাধারণ মানুষের থেকে আমরা অনেক দূরে। কিন্তু, ভাই সব, আমার বিনীত নিবেদন, এ ধারণা একেবারে ভুল। আপনাদের মনে আছে, গত মহাযুদ্ধের আগেও কংগ্রেস একবার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমাদের নেতারা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, দেশবাসীর সংগ্রাম-আহ্বান আমাদের কানে পৌঁছল, সেই মুহূর্তে আমরা সব কিছু ত্যাগ ক'রে আবার সৈনিকের সাজে রাজপথে বেরিয়ে এলাম। এই হ'ল আমাদের আসল পরিচয়। আবার যদি কোনও দিন আহ্বান আসে, আমরা যারা আজ শাসনযন্ত্র চালাচ্ছি, বাস করছি রাজপ্রাসাদে, সৈনিক হয়ে আমরা আবার জনতার নেতৃত্ব করব। আমাদের কারুর দেহ অক্ষত নয়, কমরেডগণ। এ সব কেউ নেই আমাদের মধ্যে যার দেহে ইংরেজ-পুলিশের অত্যাচারের

চিহ্ন নেই, কিংবা যার আত্মা দীর্ঘ কারাবাসের যন্ত্রণায় জর্জর হয় নি। ভাইবোনরা, আপনারা জানবেন, আমরা কখনও ভুলি না, ভুলি না, ভুলি না। যদি পরদেশী দুষমণ আবার কখনও পুণ্যতোয়া ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন করে, যদি দেশের মধ্যেকার দেশদ্রোহী দেশকে দুর্বল, পঙ্গু, নিঃস্ব করতে উদ্যত হয়, আমরা আবার সৈনিক হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হব আপনাদের পাশে, আপনাদের আগে; কদাচ আপনাদের পশ্চাতে নয়।

খুব হাততালি পড়েছিল সেদিন। শরৎকালের বিকাল। গান্ধী ময়দানে বিরাট জনসভা। লোক, লোক আর লোক। স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী। জনতা হাততালি দিতে দিতে মেতে উঠেছিল। দুর্গাভাই বলেছিলেন অমন ওজস্বিনী ভাষণ জীবনে তিনি বেশি শোনেন নি। আমি কি করেছিলাম, জান? জনতার উল্লাস দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। স্বাধীনতা যে আমাদের দেশের মানুষের এত প্রিয়, স্বরাজ যে তাদের বুকে এমন গর্বের, আনন্দের তরঙ্গ এনেছে, আমি আগে ভাবতে পারি নি। সত্যি বলতে কি, যে-ভাবে স্বাধীনতা এল তাতে আমাদের অনেকের মন দমে গিয়েছিল। সেই শেষ পর্যন্ত ইংরাজের সঙ্গে গিয়ে আমরা হাত মেলালাম; বললাম, তোমরা যা করবে ক'রো, তার পর অন্তত ওপর-ওপর বিদেয় হও। ইংরেজ দেশটাকে দু' টুকরো করল, রাখল চিরদিনের মত পঙ্গু করে। আমরা স্বাধীন হয়ে ইংরেজের গলা জড়িয়ে ধরলাম, কাটাকাটি করলাম হিন্দু-মুসলমানে। কিন্তু স্বাধীনতার যে আর একটা দিকও আছে, তা যে দেশের জনসাধারণের মনে জাগরণের বন্যা এনেছে, দাসত্বের মলিনতা দূর করে তাদের উন্নতশির করেছে তার পরিচয় পেলাম সেদিনের জনসভায়। বুক কেঁপে উঠল বার বার। মনে হ'ল, এই আশ্চর্য শক্তি যদি আমরা ঠিক মত ব্যবহার করতে পারি, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে বাধ্য।

দুর্গাভাইও নিশ্চয় ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি আমার বক্তৃতার অনুসরণে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে রাম-ভরত-উপাখ্যান আবৃত্তি করতে লাগলেন।

সভা সকুঁচ বস ভরত নিহারী।
রামবন্ধু ধরি ধীরজু ভারী ॥
কুসময় দেখি সনেহু সঁভারা।
বড়ত বিধি জিমি ঘটজ নিবারা ॥
যোক কনকলোচন মতি ছোনী।
হরী বিমল জন গণ জগ জোনী ॥
ভরত বিবেক বরাহঁ বিসালা।
অনায়াস উধরী তেহি কালা ॥
করি প্রণামু সব কহঁ কর জোরে।
রামু রাউ গুরু সাধু নিহোরে ॥
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা।
কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা ॥
হিয়ঁ সুমিরী সারদা সুহাই।
মানস তেঁ মুখ পাওকজ আই ॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী।
ভরত ভারতী মঞ্জু মরালী ॥

জনতা শান্ত হ'ল। কেমন ঝিমিয়ে এল একটু-আগের প্রায়-মাতাল ঝড়। জনতা দুর্গাভাইএর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুলসীদাসের দোহা গাইতে লাগল।

বিমল বিবেক ধরম নয় সালী।
ভরত ভারতী মধু মরালী ॥

পরে একদিন দুর্গাভাই বলেছিলেন, স্বরাজই হোক, আর যাই হোক, জনতাকে কখনও ক্ষেপতে দিতে নেই। তা হ'লে সে অহিংসা ভুলে যাবে। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। তাকে আর শান্ত করা যাবে না। তাই না গান্ধীজী জননায়ক হয়েও জনতাকে পাগল হ'তে দেন নি, সব সময় শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন। মনে আছে চৌরিচোরা? সত্যাগ্রহ আন্দোলন বরং প্রত্যাহার করেছেন, তবু জনতাকে হিংসার পথে এগোতে দেন নি।

জনতার চিত্ত শান্ত রাখা, বুঝলে, সহজ কাজ নয়। গান্ধীজী পারতেন, তাঁর নিজের চিত্ত শান্ত ছিল। আমার চিত্ত এখন শান্ত হওয়া উচিত। তিন-কুড়ি-দশের নেই বেশি দেরি, এবার শান্ত হয়ে সমুখে শান্তি-পারাবার দেখবার জন্যে নিজেকে তৈরি করা উচিত। সুরদাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অহোরাত্র গুন গুন করা উচিত, 'অাঁখিয়া হরি দরশন কি প্যাসী।' কিন্তু আমার চিত্ত সর্বদা অশান্ত! জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কোনও দিন

আমি শান্ত হ'তে পারি নি। কেমন অজানা ভয়, অচেনা আতঙ্ক অন্তরের গোপন অন্ধকারে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। বার বার মনে হয়েছে, এই যে অসংখ্য, অগণিত মানুষ এরা আজ চুপ করে বসে আমার কথা শুনছে, হাততালি দিচ্ছে, যদি এরা হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে? যদি এরা হঠাৎ দাবি করে: আরও অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, দাও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম, দাও গৃহ, রাস্তা, উন্নত চাষ, নতুন শিল্প— যদি দাও দাও করে এগিয়ে এসে হঠাৎ দাউ দাউ করে বহ্নিশিখায় জ্বলে ওঠে? তা হ'লে কোথায় যাবে এই এত যত্নের গণতন্ত্র, এই এত সাধের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো, এই এত আয়াসের দেশসেবা?

অথচ একবারও দুর্গাভাইর মত আমার মুখ দিয়ে রামচরিতমানসের পয়ার-অমৃত নির্গত হয় নি উদ্বেলিত জনতাকে শান্ত করতে। বরং অন্তরের কোন অন্ধ্য গহ্বরে লুকানো কোন পাপ-কণ্ঠ চুপি চুপি বলেছে, এরা জাগবে না, জাগবে না, কোনওদিন দাও-দাও ধ্বনি তুলে দাউ দাউ জ্বলে উঠবে না। মনে রেখ, এ ভারতবর্ষের জনতা; চার হাজার বছরে এরা জাগে নি ঘুমের সঙ্গে এদের চিরন্তন মিতালি।

জনতার পানে তাকিয়ে আরও কি মনে হয়েছে, জান? মনে হয়েছে, বিরাট নদী জীবনের অগণিত তরঙ্গ নিয়ে সম্মুখে প্রবাহিত। আর, তক্ষুনি সেই নিরাকার ভয়: যদি নদী হঠাৎ সমুদ্র হয়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে আমাদের দিকে ধেয়ে আসে? দুর্গাপ্রসাদ একদিন বলেছিল, এ দেশের মানুষ চিরদিন আপনাদের কথায় উঠবে বসবে না। একদিন তারা প্রশ্ন করবে, প্রশ্নের জবাব চাইবে। একদিন তাদের সঙ্গে আপনাদের চরম বোঝাপড়া হবে। দুর্গাপ্রসাদ এ দেশের মানুষকে চেনে না। এরা চিরদিন চালিত হবে, হয় আমার দ্বারা, নয় সুদর্শন দুবে, নয় অন্য কারুর দ্বারা। আজ যারা এদের ক্ষেপিয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রয়াসে জীবন নষ্ট করছে, তারাও এদের চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। জনতার দ্বারা চালিত হ'তে চায় না।

জনতা, তোমায় চুপি চুপি বলি, জনতা হ'ল নারীর মত। কিছুতে তার তৃপ্তি নেই। তার ভোগসম্ভোগ-বাসনার আদি-অন্ত নেই। সে কৃতজ্ঞতা জানে না। রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, সৃষ্টির আদি থেকে স্ত্রীজাতির এই স্বভাব, তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত হয়, বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের ন্যায়, তীক্ষ্ণতা অস্ত্রের ন্যায়, ক্ষিপ্রতা গরুড় ও বায়ুর ন্যায়। 'এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামাসৃষ্টে রঘুনন্দন। সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ।' অমন যে সীতাদেবী, তিনিও লক্ষ্মণের প্রতি কত সহজে সন্দেহবতী হয়ে উঠেছিলেন, মনে আছে? রামচন্দ্র মৃগরূপী মারীচের পিছু পিছু বহুদূরে গিয়ে পথভ্রান্ত, হঠাৎ মারীচ তাঁর স্বর নকল করে চেঁচিয়ে উঠছে 'লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!" সীতা ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন রামের সন্ধানে যেতে! লক্ষ্মণ বিপদ অনুমান করে সীতাকে একা ফেলে যেতে পারছেন না। এই সময় বাল্মিকী সীতার মুখ দিয়ে কি বলিয়েছিলেন?

> অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
> রামস্য বসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥
> নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
> ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
> তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
> কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
> উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্।
> সমক্ষমং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥

সীতা বলে উঠলেন, লক্ষ্মণ, তুমি রামের মহাবিপদ কামনা কর। তুমি নির্দয় কপটাচারী জ্ঞাতিশত্রু। তুমি যে পাপকার্য করবে তাতে আশ্চর্য কি? তোমার বা ভরতের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না। তুমি ভাবছ, রাম মারা গেলে আমি তোমার কামপ্রার্থী হব। কিন্তু একবার যে ইন্দিবরশ্যাম পদ্মনেত্র রামচন্দ্রকে স্বামীরূপে ভোগ করেছে, সে অন্য কাউকে কামনা করতে পারে না।

মহাভারতে পাণ্ডবশিবিরে সবচেয়ে অসুখী, অতৃপ্ত, বিদ্রোহী ছিল কে? দ্রৌপদী। বার বার, দ্রৌপদীর রসনা বেচারা যুধিষ্ঠিরের দেহে-মনে কঠিন বেত্রাঘাত করেছে। জনতাও রমণীর মত চির-অতৃপ্ত। তাকে যত দাও সে তত চাইবে। কোনও দিন সে বলবে না, আর নয়, অনেক হয়েছে। লাস্যময়ী নারীর মত দিবসের কার্য, রমণীর বিশ্রাম সব সে গ্রাস করে বসবে। তব তার তৃপ্তি হবে না।

তুমিও কেমন লাস্যময়ী হয়ে উঠছ। তোমার মুখে কথা নেই। মনে আছে কি কোনও কথা? একটি শব্দও শুনতে পাও না। কেউ কখনও শুনেছে কি তোমার উচ্চারিত শব্দ? তুমি কৌশল্যা নও, আমি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল নই। কৌশল্যার চোখে নাচত স্বপ্ন আর মায়া আর কামনার ছায়া। চাঁপাফুলের মত বর্ণ ছিল কৌশল্যার। কালো চোখ দু'টি প্রগলভা হরিণীর মত নেচে নেচে কথা কইত। চিবুকে কালো একটি তিল ছিল কৌশল্যার। 'চুপি চুপি ভএ 'কাঁচুঅ কাটলি।' এই ছিল কৌশল্যা প্রথম প্রথম। তার পর 'ঘন-ঘন আঁচর কুচযুগ 'কাঁচর, হাসি হাসি তহি পুন হেরি।' শকুন্তলারও একদিন, এক মুহূর্তে, বসন-বাকলকে বড় বেশী আঁট মনে হয়েছিল। কৌশল্যাকে যখন প্রথম দেখি, কুষাণপুর স্কুলে একদিন পরিদর্শন উপলক্ষে, সেদিনও কালিদাসের শকুন্তলা-বর্ণনা মনে পড়েছিল। নাতি-পরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্যা। দেহলাবণ্য পুরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। অনেক কিছু সম্পদের আশ্বাস দিচ্ছে অপূর্ব এক দেহলতা। তার পর একদিন সে দেহলতা সত্যি স্তবকে স্তবকে কুসুমদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। 'মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণ-বন্ধৌ' হয়ে উঠেছিল কৌশল্যা। মুনিদের মনেও বিভ্রম জাগাতে, তরুণ মনকে অহেতুক আনন্দে নাচিয়ে তুলতে পারত সেদিন কৌশল্যা। আমি মুনি নই। আমি প্রজাপালক। আমি কবি। তুমি আমায় বিভ্রান্ত করতে পার না। কৌশল্যার পরে আর কেউ পারে নি। না, সেও পারবে না, যার নাম সরোজিনী সহায়। প্রজা-পালনের মধ্যে কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মরবার আগে আর একবার তার সঙ্গে রাজা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মোকাবিলা হবে কি? আর 'কৃষ্ণলীলা কহানী' নয়। নতুন কাব্য, এ কালের কাব্য, চোখে-দেখা মনে-জানা মানুষদের নিয়ে নতুন এক মহাকাব্য সে লিখতে চায়। পারবে কি?

রাত কা অন্তিম প্রহর হ্যয়,
ঝিলমিলাতে হয় সিতারে,
বক্ষ পর যুগ বাহু বাঁধে
ম্যঁয় খড়া সাগর কিনারে,
বেগ সে বহতা প্রভঞ্জন
কেশ-পট মেরে উড়াতা,
শূন্য মেঁ ভরতা উদধি—
উর কী রহস্যময়ী পুকারেঁ
ইন পুকারোঁ কী প্রতিধ্বনি
বহা রহো মেরা হৃদয়মেঁ
হ্যয় প্রতিচ্ছায়িত জঁহা পর
সিন্ধু কা হিল্লোল-কম্পন!
তীর পর কৈসে রুকুঁ ম্যয়,
আজ লহরোঁ মেঁ নিমন্ত্রণ!

লহরোঁ মেঁ নিমন্ত্রণ। বার বার তরঙ্গ আমায় আমন্ত্রণ করেছে। শুনতে পেয়েছি অতল জলের আহ্বান। ইচ্ছে হয়েছে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি অজানা-অচেনা নিরুদ্দেশে। চেপে বসে থেকেছি রাজ-নীতির আসনে, পরে রাজাসনে। বহুদিন উদয়াচলের মুকুটহীন রাজা, একবার মুকুট পেয়ে, আর তা ছাড়তে রাজী নয়। প্রজাপালনে ত্রুটি ঘটতে দিই নি। গণতন্ত্র বল, সমাজতন্ত্র বল, এ হ'ল প্রাচীন ভারতবর্ষ। এখানে যে রাজকার্য চালায় সে রাজা। জনগণ সব প্রজা। রাজার মতই আমি প্রজাপালন করে আসছি। নিজেকে এক মুহূর্তের বিশ্রাম দিই নি। 'অবিশ্রমো লোক-তন্ত্রাধিকারঃ।' লোকতন্ত্রে যার অধিকার, যিনি রাজা, তাঁর বিশ্রাম নেই। তিনি সূর্যের মত অনন্ত-অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন; বায়ুর মত দিবারাত্র সমান ভাবে বয়ে চলেন; অনন্তদেবের মত তিনি 'সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ'। আমি কবির চেয়ে রাজার ভূমিকায় জড়িয়ে গেছি অনেক বেশি। উদয়াচলের গগনে চিরদিন গৌরব-ভাস্বর হয়ে উদিত থাকতে চেয়েছি। আমার হাতে বিশেষ ময়লা লাগে নি, আমার মনেও নয়। দুর্গাপ্রসাদ চলে যাবার পর ছেলেগুলির জন্য একেবারে যেটুকু না করলে নয় তার চেয়ে বেশি করি নি। যা করেছি তা না করলে ভবিষ্যতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের পুত্র বলে উদয়াচলে পরিচয় দেবার মত সামাজিক মর্যাদা ওদের থাকত না। হ্যাঁ, একটা বাড়ী করেছি। বহু কালের অপূর্ণ সাধ মিটিয়ে তৈরি করেছি আমার বাড়ী। তাতেও আইনে বাধে এমন অন্যায় কিছু করি নি। উদয়াচলের

মুখ্যমন্ত্রীর জীবনে কোনও নারী নেই, সবাই জানে! তুমি ত পরিচারিকা মাত্র!

ঘুম পাচ্ছে। বেশ লাগছে তোমাকে। নরম লাগছে, গরম লাগছে, তোমার সরম আমার পরম ভালো লাগছে। চোখে ঘুম নেমে আসছে। আমার নাম কি জান? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। অর্থাৎ বেদব্যাস। মহাভারত-রচয়িতা। আমিও নতুন মহাভারতের উদয়াচল পর্বের রচয়িতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মকাহিনী জান? পরাশর মুনি তাঁর পিতা। একদিন মৎস্যগন্ধা সত্যবতী তাঁর বাপের আদেশে যমুনায় পারাপার করছিলেন নৌকায়। ঋষি পরাশরও এসে সে নৌকায় উঠলেন। সত্যবতীকে দেখে পরাশর কামাতুর হয়ে পড়লেন। সঙ্গম চাইলেন। সত্যবতী বললেন, 'এমন স্থানে, এই নৌকোয়, এত লোকের সামনে কি করে সম্ভব?' ঋষি পরাশর তখন কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করলেন। বললেন, আমার সঙ্গে সঙ্গম করলেও তোমার কুমারীত্ব বজায় থাকবে; তা ছাড়া মৎস্যগন্ধা তুমি সুগন্ধযুক্তা হবে। সত্যবতীর আর আপত্তি করবার কারণ রইল না। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে পরাশর-সত্যবতী-সঙ্গমের ফল হ'ল বেদব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। জন্ম হতেই ধ্যানরত। কিন্তু জীবন-বিমুখ নয়। সত্যবতী পরে শান্তনুর পত্নী হন। শান্তনুর কাছ থেকে সত্যবতী পেলেন দুই পুত্র: চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দু'জনেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন। তখন সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ডেকে আদেশ দিলেন, তাঁদের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করতে। আজন্ম তপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতৃ আজ্ঞা পালন করলেন। বললেন, মাতঃ, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কাজ করব।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বললেন, দুই রাণীকে এক বছর ব্রত পালন করে শুদ্ধ হ'তে হবে। সত্যবতী রাজী হলেন না। বললেন, এক্ষুণি রাণীদের পুত্র চাই। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, তবে রাণীরা যেন আমার কুৎসিত রূপ, গন্ধ আর বেশ সহ্য করতে পারেন। সত্যবতী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অম্বিকাকে শয়ন-ঘরে পাঠালেন। অম্বিকা বিছানায় শুয়ে ভীষ্ম ও অন্যান্য সুদর্শন বীরদের কথা ভাবতে লাগল। তারপর সেই দীপালোকিত গৃহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন, পিঙ্গল জটা-দাড়ি দেখে অম্বিকা ভয়ে চোখ বুজল। তার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হ'ল মায়ের দোষে অন্ধ। অম্বালিকা চোখ বুজল না, কেবল ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল। তার পুত্র পাণ্ডু হ'ল মায়ের দোষে পাণ্ডুবর্ণ।

আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কে. ডি. কোশল। কে. ডি. বেদব্যাসের উত্তরসূরী। আজন্ম তপস্বী নই। ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণ হয়ে রাজা। আমি তাই বিশ্বামিত্র। আমরা সবাই। আমি, সুদর্শন দুবে, দুর্গাভাই দেশাই। আমাদের হাতে নতুন মহাভারত তৈরি হচ্ছে। আমরাও বিশ্বামিত্রের মত ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্কার দিয়েছি। বিশ্বামিত্র বলেছিলেন, 'ব্রহ্মতেজোবলং বলম।' বলেছিলেন, 'বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম।' বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি তপস্যাই পরম বল। আমাদের তপস্যা, রাজনীতি। আমরা, একালের বিশ্বামিত্ররা, বলি, রাজনীতিই পরম বল।

কাল সন্ধ্যায় গান্ধী ময়দানে বিরাট জনসভা হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের বিজয়-কেতন উড়বে সে জনসভায়। উদয়াচলের কংগ্রেসে পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করবে জনসমুদ্র। কে. ডি. কোশলকে অভিনন্দন জানাবে পুনরায় রাজা হবার জন্যে। বক্তৃতা করবে সুদর্শন দুবে, বক্তৃতা করবেন দুর্গাভাই দেশাই—এবং সরোজিনী সহায়। গান্ধীবাদের সঙ্গে মিলবে নবীন সমাজবাদ; নীতিবাগিশের সঙ্গে নীতি-বিমুখ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জয়ধ্বনিতে বিলাসপুরের গগন বিদীর্ণ হবে। সে জয়ধ্বনি পৌঁছবে না গঙ্গাসলিলপূত বারাণসীতে।

ফুলের মালার ভারে ভেঙ্গে পড়বে না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। মণিহার আগামী কাল তার সাজবে, সাজবে, সাজবে। জনসমুদ্রের পানে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে। সেই প্রাচীন কম্পন। জনতাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইবে না। জনতা থাকবে নদী হয়ে। সমুদ্র হবে না। দাও দাও করে দাউ দাউ বহ্নিশিখা হয়ে এগিয়ে আসবে না।

তোমরা এসেছ, আমাকে অভিনন্দন জানাতে? দাও, দাও, মালা দাও,. ফুলহার দাও, মণিহার দাও।

আমি তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তোমাদের গণতান্ত্রিক রাজা। তোমরা ভোট দিয়ে আমায় রাজা করেছ। আমি একালের গোপালদেব। কেন করেছ? আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচু, তাই। আমি ক্ষমতার ব্যবহার জানি, তাই। আমি শাসনের কৌশল জানি, তাই। আমি তোমাদের সবাকার সবকিছু জানি। সাড়ে পাঁচ বছর আমি তোমাদের রাজত্ব চালিয়েছি, আরও অনেকদিন চালাব, যতদিন এ দেহে শক্তি থাকবে, ততদিন। তোমরা আমায় হারাতে পারবে না। আমি তোমাদের দুর্বলতা সবটুকু জানি, তাই কেবল তোমরাই হারবে। আমাকে কেন, কংগ্রেসকেও তোমরা কোনও দিন হারাতে পারবে না। কংগ্রেসের বল তোমাদের প্রাচীন দুর্বলতা, ধারাবাহিক দুর্বলতা। তোমরা অনাহারে মরলেও নির্বাচনের সময় কংগ্রেসকে ভোট দেবে। সেই ভারতবর্ষ সমানে চলেছে, তার বাইরের চেহারা বদলেছে, অন্তরের রূপ বদলায় নি। তোমরা একবার আমাকে সরাতে চেয়েছিলে, হেরেছ। আবার চাইলে, আবার হারবে। কংগ্রেসকে সরাতে চাইলেও হারবে। তোমরা যারা কংগ্রেসকে সরাতে চাইছ, জানো না কংগ্রেস প্রতিদিন তোমাদের দুর্বল করছে: কংগ্রেসের সব দুর্বলতা তোমাদের মধ্যে ঢুকছে। তেমনি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কুজ্ঝটিকার আড়াল থেকে তোমাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে দেবে, তোমাদের দুর্বলতা নিয়ে খেলবে, তোমাদের ওপর আমরণ রাজত্ব করবে।

আমি তোমাদের ভাল করব, মঙ্গল করব। আমি যে রাজা! তোমাদের কুশল আমার একমাত্র কাম্য। তোমরা শান্ত সুশীল প্রজা, আমি ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যব্রত প্রজাকল্যাণরত রাজা। তোমাদের আবেদন-নিবেদন সব আমি মন দিয়ে শুনব। তোমাদের আরও অনেক ভাল করব। দেখবে, উদয়াচলে আরও সড়ক হবে, নদীর ওপর বাঁধ, বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে, বসবে নতুন কলকারখানা, কৃষির প্রসার হবে, বিদ্যালয় হাসপাতাল তৈরী হবে আরও অনেক। তবু তোমাদের পেটে ক্ষিধে থাকবে, ঘরে ঘরে থাকবে বেকার যুবক, তবু শতকরা কুড়িজনের বেশি নামসই করতে পারবে না, তবু গ্রামে গ্রামে জমাট হয়ে থাকবে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অন্ধকার, প্রতি পাঁচ বছর পর বাধ্য শান্ত সুশীল তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে যাবে।

আমার শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র থাকবে: দ, দ, দ।

পুরাকালে প্রজাপতি নিজে বিদ্যাদানের জন্যে একটি আশ্রম খুলেছিলেন। তাঁর তিনটি ছাত্রের মধ্যে একটি দেবতা, একটি দানব তৃতীয়টি মানুষ। বারো বছর বিদ্যাদানের পর, সমাবর্তনের সময়, প্রজাপতি তাদের ডেকে পাঠালেন। গুরুর কাছে শিষ্য শেষ উপদেশ প্রার্থনা করবে।

প্রথম এল দেবতা-শিষ্য। প্রজাপতি-চরণে প্রণত হয়ে বলল, "গুরুদেব, আমায় কিছু উপদেশ দিন।"

প্রজাপতি বললেন, "দ"।

শিষ্য পুনরায় প্রণাম করল। প্রজাপতি ঈষৎ হাস্যে প্রশ্ন করলেন, "বুঝতে পেরেছ?"

"হাঁ। আপনি আমায় উপদেশ দিলেন 'দাম্যত'। অর্থাৎ, দমন কর।"

এবার এল মানুষ-শিষ্য। প্রার্থনা করল শেষ উপদেশ।

প্রজাপতি আবার বললেন, "দ।"

প্রণাম ক'রে সে উঠে দাঁড়াল।

"বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি। আপনি আমায় বললেন, 'দত্ত'। অর্থাৎ, দান কর।"

এবার দানব-শিষ্য।

শেষ উপদেশের প্রার্থনা শুনে প্রজাপতি পুনরায় বললেন:

"দ"।

তারপর: "বুঝলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার শেষ উপদেশ, 'দয়ধ্বম'। দয়া কর।"

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, আমাদের অন্তর বিষণ্ণ-গম্ভীর হয়ে ওঠে, তখন সেই বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাল রেখে মেঘকুল গর্জন করে।

তারা কি বলে জান?

উপনিষদের ঋষি বলেন, মেঘ বলে, 'দ, দ, দ'।

তদেতদেবৈষা দৈবী বাগানুবদতি স্তনয়িত্নু
দ'দদ ইতি দাম্যত, দত্ত দয়ধ্বমিতি

প্রজাপতির সেই অমর উপদেশ, দ, দ, দ।

দেবতা, তোমার ক্ষমতার শেষ নেই, সীমা নেই। তুমি ইচ্ছে করলে, সৃষ্টি ধ্বংস করতে পার। তাই তুমি দাম্যত। দমন কর। আত্ম-দমন কর।

মানুষ, তুমি লোভী। নিত্য ভোগ-লিপ্সু।

তাই তুমি, দত্ত। দান কর। দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে ভোগ কর।

দানব, তোমার মন্ত্র হিংসা। হিংসায় তুমি নিজে জ্বল, অন্যকে উৎপীড়ন কর। তাই তুমি দয়ধ্বম। দয়া কর। সবাইকে ক্ষমা কর।

মানুষ, তুমি একত্রে দেবতা, মানব ও দানব।

তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি সৃষ্টিনাশ করতে পার। তোমার লোভের শেষ নেই। পৃথিবীর রক্তমাংস সব তুমি ভোগ করতে পার। তুমি হিংসা দ্বারা সব জ্বালিয়ে দিতে পার।

তাই প্রজাপতি তোমাকে বলছেন, দ, দ, দ।
দমন কর। দান কর। দয়া কর।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, তুমি উদয়াচলের রাজা। তুমি মুখ্যমন্ত্রী। দ, দ, দ।

উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাইরে মেঘের লঘু গর্জন হ'ল, দ, দ, দ।

ঘরে নাসিকার গুরু গর্জন হ'ল, দ, দ, দ।

জগন্মোহন তিওয়ারী এসে দরজায় দাঁড়াল। দেখল, একটি নিরেট বোবা, নিরেট বধির সুন্দরী নারী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঘুমন্ত মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে।

নিজেকে গুছিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করে নি।

॥ সমাপ্ত ॥

—০—

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন ট্যাক্স বাজেট

পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশন সুরু হবার তিন দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি নূতন ট্যাক্স বাজেট লোক সভায় পেশ করে বর্তমান বৎসরের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করবার আয়োজন করেছেন। এই আয়োজনের কোন পূর্বাভাস তিনি সাধারণ্যে, এমনকি লোক সভায় সদস্যদের মধ্যেও প্রচারিত হবার সুযোগ দেন নি। যতটা জানা গিয়েছিল তিনি দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি লোক সভায় পেশ করবেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে তিনি তাঁর নূতন ট্যাক্স বাজেটটি পেশ করেন। ব্যাপারটিতে দেশের ওয়াকিবহাল জনসাধারণ এবং লোকসভার সদস্যবৃন্দ সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছেন।

অনিশ্চিততাসূচক ব্যবস্থা

প্রথমতঃ, দুইটি বার্ষিক বাজেটের অন্তর্বর্তী কালে নূতন করে অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজনে ট্যাক্স বাজেট রচনা ও প্রয়োগ করা, একমাত্র দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত একান্তই অস্বাভাবিক এবং এর ফলে দেশের আর্থিক কাঠামোতে একটা অনিশ্চিততা (instability) এবং আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি (condition of insecurity) প্রবর্তন করবে এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া যেই অজুহাতে এই নূতন ট্যাক্স বাজেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী বলেছেন,—অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনে সঙ্গতিতে যে একটা ৩০০০ হাজার কোটি টাকার মত ফাঁক রয়েছে সেটিকে পূরণ করবার উদ্দেশ্যে এই ভাবে অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহের আয়োজন করা,—সেটি বিচারসহ নয়। কেননা চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ আগামী বৎসরের এপ্রিল মাসের পূর্বে সুরু হবে না এবং সেই সম্পর্কে ব্যয়বরাদ্দের দায়িত্বও সেই সময়ের আগে সুরু হবার কথা নয়। অতএব এই কারণে অতিরিক্ত ট্যাক্স প্রয়োগের প্রয়োজন ইতিমধ্যেই জরুরী হয়ে পড়েছিল, এমন অজুহাত অর্থমন্ত্রীর সত্যকার উদ্দেশ্য সূচিত করে না বলেই মনে করতে হবে।

মূল্যমানের উপর প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানের উচ্চমূল্যমানের অবস্থায় এরূপ একটি অতিরিক্ত ট্যাক্স বাজেটের ফল মূল্যমানের ওপরে কি ভাবে ক্রিয়া করবে সেটিও বিশেষ করে ভাববার কথা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বাজেট পেশ করবার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোক সভায় যে বিবৃতি পেশ করেন তাতে তিনি স্বয়ং স্বীকার করেন যে বর্তমানে দেশের বাজারে যে মূল্যমান কার্যকরী রয়েছে সেটি এ পর্যন্ত উচ্চতম মূল্যমান সূচনা করে। গত জুলাই মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত, তিনি স্বীকার করেন, পাইকারী মূল্যমানের সূচক-সংখ্যা (১৯৬১-৬২ = ১০০) ১৬৮.৮ ছিল। এই অসম্ভব উচ্চ মূল্যমানের অবস্থায় নূতন ট্যাক্স বাজেটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মূল্যমান যে আরও অতিরিক্ত অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে এই সম্ভাবনা কেবল যে স্বাভাবিক শুধু তাহাই নয়, বস্তুতঃ অনিবার্য।

বস্তুতঃ আলোচ্য বাজেটের উপর লোক সভায় বিতর্ক-কালে মূল্যমানবৃদ্ধি সংযত করবার কোন কার্যকরী প্রয়োগের আভাসই অর্থমন্ত্রী দিতে সমর্থ হন নাই। আর বর্তমান মূল্য পরিস্থিতিতে মূল্যমান বৃদ্ধির ধারার প্রচণ্ডতম প্রকোপ যে ভোগ্য এবং বিশেষ করে অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির ওপরে পড়তে বাধ্য তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। পূর্বেকার একটি আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে বর্তমান বৎসরে খাদ্য শস্যের ফসলের উৎপাদন অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তার পাইকারী মূল্যমান গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগের পর থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোটামুটি প্রায় ৩৩% এবং খুচরা মূল্যমান মোটামুটি প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে আরও মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যই ঘটেছে। বর্তমানের নূতন ট্যাক্স প্রয়োগের ফলে এই মান যে আরও, কমপক্ষে আনুপাতিক পরিমাণে, বৃদ্ধি পাবে এটাও স্বতঃসিদ্ধ।

মূল্যরোধে আর্থিক প্রয়োগ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর্থিক প্রয়োগের দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি সংযত করবার প্রয়াস করছেন বলে দাবি করেছেন। এই

উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসরে—অর্থাৎ তিনি কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রণালয়ের ভার পুনর্বার গ্রহণ করবার পর থেকে লগ্নী সংযতির (credit squeeze) জন্য যে-সকল বিবিধ প্রয়োগ রচনা এবং চালু করেছেন, তার কোনটাই মূল্যবৃদ্ধির ধারা সংযত করতে সমর্থ হয় নাই। বস্তুতঃ একদিকে এই সকল প্রয়োগ এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান সরকারী ভোগব্যয় (consumption expenditure) এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন-নিরপেক্ষ (non-development) সরকারী ব্যয় প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি—সবকিছু মিলে চালু অর্থের পরিমাণ (money supply with the public) এতটা পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার ফলে বাজার চাহিদা আনুপাতিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার ফলে মূল্যবৃদ্ধির ধারা সংযত করা সম্ভব হয় নি। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন আনুপাতিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেত তা হলে এই অতিরিক্ত চাহিদা ভোগে পরিণতি লাভ করতে পারত এবং সেই অনুপাতে মূল্যবৃদ্ধির ধারাটিকে সংযত করে রাখতে পারত। কিন্তু সেটি হবার কোন উপায় ছিল না। ফলে ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায়ও আজ ভারতীয় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বা বাস্তব মূল্য টাকায় দশ আনা পরিমাণ মাত্র। ১৯৫০-৫১ সালের মূল্যমানের সঙ্গে তুলনা করলে এই মূল্যের পরিমাণ টাকায় চারি আনা পরিমাণ মাত্র দাঁড়াইবে।

ট্যাক্স ও মূল্যমান

সাধারণতঃ অতিরিক্ত ট্যাক্সের দ্বারা মূল্যচাপ (inflationary pressure) নিরসন করা সম্ভব, এমনটিই অর্থ শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু তাহা করতে হলে বিধান অনুযায়ী ট্যাক্স রচনা ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন, না হইলে উল্টা ফল হইবার আশঙ্কাই বেশী। ট্যাক্স প্রয়োগের দ্বারা মূল্যচাপ সংযত করবার আয়োজনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রত্যক্ষ (direct) ট্যাক্সের দ্বারা যতটা সম্ভব এই উদ্দেশ্য সাধন করবার আয়োজন করা। বিশেষ করে ভোগ্যবস্তুর ওপরে আবগারী বা অন্য কোন প্রকার ট্যাক্স ধার্য করলে এই অতিরিক্ত ট্যাক্সের পরিমাণটি সাধারণতঃ আনুপাতিক সংখ্যার চেয়ে বেশী পরিমাণে অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ভোগ্যপণ্যাদির উপরে আবগারী বা অনুরূপ ট্যাক্স ধার্য করলে সাধারণতঃ ভোক্তার নিকট থেকে বর্দ্ধিত মূল্যের দ্বারা সরকারী দাবির চেয়ে আরও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রথম দফার অর্থমন্ত্রিত্বের কালে সরিষার তৈলের ওপর যে আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল তার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। মণ-প্রতি ॥০ আনা সরকারী শুল্ক ধার্য করবার ফলে সরিষার তৈলের খুচরা সের-প্রতি মূল্য ।০ আনা করে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ ॥০ আনা পরিমাণ সরকারী শুল্কের দাবি মেটাবার জন্য ভোক্তাকে অতিরিক্ত ১০৲ টাকা মূল্য দিতে বাধ্য করা হয়। অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ওপরে আবগারী শুল্ক ধার্য্য করলেও অনিবার্য ভাবে অনুরূপ ফল বর্তায়। সেই কারণে সাধারণতঃ সুস্থ ট্যাক্সনীতিতে ভোগ্যপণ্যের ওপরে আবগারী শুল্ক ধার্য করা অবিধেয় মনে করা হয়। আমাদের দেশে গত ১৫ বৎসরে কেন্দ্রীয় ট্যাক্সের পরিমাণ মোটামুটি জাতীয় আয়ের (national income) শতকরা ৫.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে, প্ল্যানিং কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ১৩%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মোট ট্যাক্স রাজস্বের মোটামুটি ৭০.৩% ১৯৬৩-৬৪ সালে পরোক্ষ শুল্ক থেকে আদায় করা হয়েছে; এর মধ্যে ২২.১% বিদেশী বাণিজ্যের আমদানী ও রপ্তানী থেকে এবং ৪৮.২% আবগারী শুল্ক থেকে আদায় করা হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে আবগারী শুল্কের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মোট রাজস্বের তুলনায় আবগারী শুল্কের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪.৬% কমে গিয়ে ৪৩.৭%-এ দাঁড়ায়। বর্তমান বৎসরের বাজেটে (১৯৬৫-৬৬) এই শুল্কের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে মোট রাজস্বের ৪৪.৮% অধিকার করে, অথবা পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১০.১% বৃদ্ধি পায়। বর্তমান অতিরিক্ত বাজেটের ফলে মোট রাজস্বের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট বৎসরে আবগারী শুল্কের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে আগের বৎসরের তুলনায় ১৪৬ কোটি টাকা বেশী (মোট আবগারী রাজস্ব ৮৮১ কোটি টাকা; মোট রাজস্ব ১৯৩০ কোটি টাকা) অথবা মোট রাজস্বের প্রায় ৪৫.৭% (অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ২% বেশী)। এর মধ্যে বিশেষ করে বিবেচনা করবার বিষয় এই যে, মোট আবগারী রাজস্বের মধ্যে অর্দ্ধ পরিমাণের চেয়েও বেশী অংশ অবশ্যভোগ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যাদির ওপর ধার্য করা আবগারী শুল্ক থেকে আদায় করা হয়। এর থেকেই সহজেই বোঝা যাবে যে বর্তমানের মূল্যচাপের মূল কারণের অন্ততঃ অংশতঃ আমাদের ট্যাক্স কাঠামো থেকে উদ্ভূত।

চতুর্থ পরিকল্পনা ও ট্যাক্স বৃদ্ধি

কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় যে ২১,৫০০ কোটি টাকার লগ্নীর আয়োজন করা হয়েছে, তার মধ্যে সঙ্গতিতে (resources) অন্ততঃ ৩০০০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি রয়ে গেছে।

এই ঘাট্‌তি পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মেহতার মতে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করে পূরণ করতে হবে। শ্রীঅশোক মেহতা সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩% ট্যাক্স-রাজস্ব রূপে সরকারী তহবিলে আদায় হয়ে থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইহার অনুপাত অন্ততঃপক্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭% পরিমাণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালের অন্তিম কালে এই অঙ্কটি জাতীয় আয়ের ১৮%-এ পৌছান আবশ্যক। এর জন্য আবশ্যক বিশেষ প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ। কিন্তু তিনি মনে করেন এই অতিরিক্ত ট্যাক্স-রাজস্ব উন্নয়নজনিত অতিরিক্ত আয়ের থেকে আদায় হবে এবং সেই কারণে অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা সাধারণের জীবনমান (living standards) নমিত করে দেবে এমন আশঙ্কা থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅশোক মেহতা আরও বলেন যে, কৃষি-উন্নয়নের প্রয়োজনে বৃহত্তর লগ্নী যেমন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তেমনি কৃষিনির্ভরশীল সমাজ থেকে অনুপাতে অধিকতর সঞ্চয়ও একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। গত তিনটি পরিকল্পনাকালে দেশের সমাজের কৃষিনির্ভরশীল বিভাগ থেকে এই বিষয়ে আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। গত তিনটি পরিকল্পনাকালে সরাসরি কৃষিট্যাক্স এবং সেচ-জলের মূল্য হিসাবে যা আদায় হয়েছে তার মোট পরিমাণ এই সময়ের মধ্যে দেশে মোট ট্যাক্স-রাজস্ব বৃদ্ধির মাত্র ২·৬% শতাংশ সমাজের কৃষিবিভাগ থেকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মতে চতুর্থ পরিকল্পনার লগ্নীর প্রয়োজনে যে অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহের আয়োজন পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন, তার অন্তত এক-চতুর্থাংশ সমাজের কৃষিজীবী বিভাগ থেকে আদায় হওয়া প্রয়োজন।

ট্যাক্স থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য লগ্নীর প্রয়োজনে অতিরিক্ত সঙ্গতিসংগ্রহের (additional resource mobilization) প্রস্তাবটিকে একটু তলিয়ে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। নানাবিধ সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা হিসাব করা যে সব সংখ্যা সম্প্রতি সাধারণ্যে প্রচার করা হয়েছে, তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপের কারণে সাধারণ লোকের ভোগ্য আয় গত ৩টি পরিকল্পনাকালে মোটামুটি যতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় মাথাপিছু ট্যাক্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ভোগ্য আয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কিন্তু এটুকু বললেই বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যায় না। এ কথাটি আজ সর্বজনবিদিত যে আমাদের সরকারী "সমাজবাদী" উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে গত পনের বৎসরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আর্থিক তারতম্য (economic disparity) এবং আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি (concentration of economic power) সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আর্থিক তারতম্য কৃষিজীবী বিভাগেও সমধিক পরিমাণে পৌঁছেছে। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্ অফ্ এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ দ্বারা প্রকাশিত একটি সম্প্রতিকার হিসাবে দেখতে পাওয়া গেছে যে গ্রামাঞ্চলেও বর্তমানে বৃহত্তম আয়বিশিষ্ট ১% শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের নীট আয়ের ৯% শতাংশ অধিকার করে থাকেন এবং নিম্নতম আয়-বিশিষ্ট ৬১% শতাংশ জন্য সংখ্যা মোট নীট আয়ের মাত্র ৩১% শতাংশ উপভোগ করতে পান। ফলে গ্রামাঞ্চলের নিম্নতম পরিবারগুলির মধ্যে ১ কোটি লোকের মাথাপিছু দৈনিক আয়ের পরিমাণ মাত্র ২৭ পয়সা; তদূর্ধ্ব আয়ের ১০ কোটি লোকের দৈনিক মাথাপিছু আয় মাত্র ৩২ পয়সা; এবং তদূর্ধ্ব আয়ের ৫ কোটি লোকের দৈনিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৪২ পয়সা মাত্র। শহরাঞ্চলে এই আর্থিক সঙ্গতির তারতম্য আরও গভীরতর (greater in depth)।

কৃষ্ণমাচারী মহাশয়ের সম্প্রতিকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বাজেটে দেখা গেছে যে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহের জন্য যে অতিরিক্ত ট্যাক্স-দাবির ধারা তিনি রচনা ও প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তার সবটাই পরোক্ষ (indirect) শুল্ক, প্রধানতঃ আবগারী ও আমদানী-রপ্তানী (customs) শুল্ক থেকে আদায় করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরাসরি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে (direct tax sector) তিনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা রেহাই (relief) দেবারই ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে সাধারণ মূল্যমানের ওপর যে আরও অতিরিক্ত চাপ পড়তে বাধ্য সে-কথা অর্থমন্ত্রী মহাশয়ও অস্বীকার করতে পারেন নি। অথচ বর্তমান আর্থিক তারতম্যের ফলে দেশের সামগ্রিক জাতীয় আয় এবং গড়পড়তা মাথাপিছু আয় খানিকটা পরিমাণে গত তিনটি পরিকল্পনার ফলে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে অতিরিক্ত ট্যাক্স-চাপ বা মূল্যচাপ (additional tax pressure or price pressure) কোনটাই একক ভাবেও সহ্য করা সহজ নয়; এই উভয়বিধ চাপ একই সঙ্গে তাহার স্কন্ধে চাপিলে তাহার বর্তমানের অর্দ্ধাশনের অবস্থা সম্পূর্ণ অনাহারে পর্যবসিত হবে, এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাহা সহজেই বোধগম্য। গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত ট্যাক্স ও মূল্যবৃদ্ধির চাপ যে আরও অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করবে সেটাও সহজে অনুমেয়।

প্রত্যক্ষ ট্যাক্সবৃদ্ধির প্রতিবাদ

সরকারী তরফ থেকে বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের (direct tax) চাপ ইতিমধ্যেই এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে যে, তার ফলে নূতন লগ্নীর এবং সঞ্চয়ের ধারায় এর মধ্যেই যথেষ্ট নিরুৎসাহজনিত বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এই দিকে আরও অতিরিক্ত করবৃদ্ধির প্রয়াস করলে উন্নয়ন প্রগতিতে বিষম বাধা সৃষ্টি হবে। মোটামুটি এই অজুহাতেই অর্থমন্ত্রী কালোবাজারী অর্থের উপরে ট্যাক্স-দাবি সংগ্রহ করবার পথে এই অর্থের মালিকদের কঠিন প্রয়োগের বদলে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে দিতেছেন। বর্তমান বৎসরের বাজেটে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে এই প্রকার অর্থের মালিকদের মধ্যে যাঁরা বতমান বৎসরের ৩১শে মে তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারী দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবেন, তাঁদের স্বীকৃত কালোবাজারী অর্থের মাত্র ৬০% ট্যাক্স হিসাবে দিতে হবে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উচ্চতম ব্যক্তিগত আয়ের পর্যায়ে (higest personal income level) ট্যাক্সের পরিমাণ দাঁড়ায় আয়ের ৭৪%-এরও অধিক)। যাঁরা এভাবে ট্যাক্স দিয়ে দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। এর ফলে এ পর্যন্ত সরকার মাত্র ৩০ কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করতে পেরেছেন, এবং অর্থমন্ত্রী স্বয়ং মন্তব্য করেছেন যে এই সব ট্যাক্সদাতাদের মধ্যে উচ্চতম আয়-মানের কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পড়ে নি। তথাপি বর্তমানের অতিরিক্ত ট্যাক্সবাজেটে এসব কালোবাজারী টাকার মালিকদের জন্য নূতন সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এবার অবশ্য উচ্চতম ট্যাক্সের হারের পরিমাণ ৬০% সীমিত করা হয় নি; যাঁর যতটা আয়-মান সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দিতে হবে। তবে অর্থ মন্ত্রী মনে করেন যে, পূর্বেকার সুযোগের সুবিধা বেশী লোক গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি সম্ভবতঃ এই কারণে যে, লগ্নী করা অর্থ থেকে হঠাৎ ট্যাক্স দেবার জন্য মোটা পরিমাণ টাকা তুলে নেওয়া সম্ভব হয় নি। সেই কারণে তিনি এবার দেয় ট্যাক্স চার কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং প্রথম কিস্তীতে মোট দেয় ট্যাক্সের মাত্র ১০% দিলেই চলবে। এই নূতন ব্যবস্থাটি আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে।

অতএব উন্নয়ন ও লগ্নীর অজুহাতে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের চাপ আর বৃদ্ধি করলে চলবে না। কিন্তু অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন মেটাতেই হবে। অতএব পরোক্ষ ট্যাক্স ব্যতীত আর উপায় কি? বর্তমান বৎসরের সাধারণ বাজেট পার্লামেণ্টে পেশ করবার সময় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পরোক্ষ ট্যাক্স কেবল মাত্র রাজস্বের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই রচনা করলে চলে না; সেই সঙ্গে একথাটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন হয় যে ট্যাক্সের কাঠামোটি এমন হবে যে এটিকে মূল্যনীতি নির্দ্ধারক যন্ত্র হিসাবেও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আমরা দেখেছি ট্যাক্সের বর্তমান কাঠামোটির মধ্যেই কি পরিমাণ মূল্যস্ফীতিজনক উপাদান রয়েছে। বর্তমানের অতিরিক্ত ট্যাক্স বাজেটে এই মূল্যস্ফীতিবর্ধক উপাদানের আয়োজন যে আরও সমধিক বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবার অর্থমন্ত্রী স্রেফ রাজস্বের প্রয়োজন সহজতম উপায়ে মেটাবার জন্য তাঁর ট্যাক্স বাজেট রচনা করেছেন। তার ফলে যে অনিবার্য ভাবে সাধারণের নিতান্ত নিম্ন জীবনমান আরও নীচুতে নেবে যাবে তাতে সন্দেহ নাই।

ট্যাক্সবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

ইতিমধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার থেকেও জরুরী প্রয়োজনে অতিরিক্ত ট্যাক্সবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্যায় লোভ ও হামলা ক্ষণে ক্ষণেই আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় অনেক কাল ধরেই সাময়িক বিঘ্ন সৃষ্টি করে আসছিল। ভারত সরকার তাঁদের শান্তিকামী নীতি অনুসরণ করবার প্রয়োজনে বারে বারেই এই অন্যায় হামলা সহ্য করে এসেছেন। মাত্র মাসাধিককাল পূর্বেও কচ্ছ এলাকায় এরূপ আর একটি হামলাতেও ভারত সরকার আপোষ-রফায় স্বীকৃত হয়েছিলেন। এই ভাবেই এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির লোভ বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল এবং সম্প্রতি কাশ্মীরে এই লোভ প্রচণ্ড আক্রমণের আকার ধারণ করে। সুখের বিষয় এবার আর ভারত সরকার সাময়িক এবং একতরফা আপোষ মীমাংসাতে রাজী হন নাই। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী হামলাকারী দস্যুদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে সুরু করেছেন। ইউনাইটেড নেশনস্ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধবিরতির অনুরোধ, যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণকারী রাষ্ট্রটিকে ভবিষ্যতে সকল সময়ের জন্য সংযত করে রাখবার প্রতিশ্রুতি (guarantee) না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের তরফ থেকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়; একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই দৃঢ়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এবং প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, কতদিন বর্তমানের এই গুরুতর পরিস্থিতি চলতে থাকবে এখনই সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত অনুমান করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এর জন্য চাই প্রচুর অর্থ। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দেশের জনসাধারণ সকল প্রকার ক্লেশই স্বেচ্ছায় স্বীকার

করবেন সন্দেহ নাই ; অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপও তাঁরা খুশী মনে বহন করবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের তরফ থেকে দেশের জনসাধারণের জীবনমান যাহাতে স্বাভাবিক পরিমাণে বিঘ্নিত না হতে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে সরকারী দায়িত্বও অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করে খাদ্যশস্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যুদ্ধকালীন ট্যাক্সের দরুণ মূল্যস্ফীতি যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য সার্থক প্রয়োগ একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধকালে এ সকল দায়িত্ব সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করে নেন। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডে সকল অবশ্যভোগ্য বস্তুর মূল্য ও সরবরাহ সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করে নেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধকালীন বাজার-চালু অতিরিক্ত অর্থের একটা মোটা অংশ ঋণ এবং অন্য একটা অংশ ট্যাক্স দ্বারা সরকারী তহবিলে তুলে নেওয়া হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডে ট্যাক্সের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে ৬% থেকে ২১%-এ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ভোগ্য সরবরাহ ও মূল্যের ফলে এবং ইচ্ছাভোগ্য পণ্যাদির উপর প্রচণ্ড পরিমাণ ক্রয়কর ধার্য করায় ব্রিটেনবাসীর গড়পড়তা সঞ্চয়ের পরিমাণ আগের ৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৮%-এ দাঁড়ায়। এদেশেও অচিরে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে, খাদ্য কমিটির সুপারিশের ধারা থেকে, আশা করা গিয়েছিল যে এদিকে হয়ত প্রাথমিক পদক্ষেপ শীঘ্রই সুরু হবে। কিন্তু পরে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তে খাদ্য কমিটির মূল সুপারিশের অধিকাংশ ব্যবস্থাই বাতিল করে দেওয়াতে সে আশা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে। তখনও পর্যন্ত বর্তমানের জরুরী অবস্থার এরূপ গুরুতর আভাস পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে অবিলম্বে এ বিষয়ে সর্বাত্মক প্রয়োগ রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে খাদ্য সম্বন্ধে ব্যাপক সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সকল ১ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ লোক সংখ্যার শহরগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশানিং প্রবর্তন করা হবে। এই সময়োচিত প্রয়োগের দ্বারা সম্ভবতঃ জটিল সমস্যাগুলিকে খানিকটা প্রতিহত করে রাখা সম্ভব হবে।

—•—

বক্তিয়ার

রণনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর পাঞ্জাব যুদ্ধ সমালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতের দৃষ্টি ছিল limited objective নিয়ে লড়াই করা যাতে করে পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনীকে খণ্ড খণ্ড করে পাঞ্জাব রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় হটিয়ে বা সরিয়ে ফেলা যায়; পাকিস্থানের সমগ্র সমর বাহিনীকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত যুদ্ধ করতে দেওয়ার অবকাশ না দেওয়া যায় এবং উত্তরোত্তর পাকিস্থানের সমরশক্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করা যাক। ভারত-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে বা পরে যারা স্থলপথে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে শ্রীনগর কিংবা পাঠানকোট জম্মু শ্রীনগর গিয়েছেন, বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু ছিল অত্যুচ্চ পাহাড় এবং সংকীর্ণ পথ।

প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডির পথ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেখান থেকে শ্রীনগর ১৯৪ মাইল; রাওয়ালপিণ্ডি থেকে বারাকও, ত্রেত, সিকাগলি (মারী ছাউনি), কোহালা বারশালা ডুমেল (যেখানে কৃষ্ণগঙ্গা ঝিলাম নদীতে এসে পড়ে) গারহী, উরি চিনারী বারামুলা পার হয়ে শ্রীনগর পৌঁছন যায়। এই গারহী আর উরির মাঝখান দিয়ে পুঞ্চে যাবার পথ। একবার মারী পাহাড় পার হলেই পথ সোজা নেমে যায় একেবারে কোহালায়, সেখানেই কাশ্মীরের সীমানা—কোহালার সেতুর অপর পারে। মারী পাহাড়ের উচ্চতা ছয় থেকে সাত হাজার ফুট। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মাত্র ৪০ মাইল পথ উত্তীর্ণ হলেই মারী পাহাড়।

১৯৪৭ সালে ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর কাশ্মীরে যে সংঘর্ষ হয়, স্মরণ থাকতে পারে যে রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্ত্তী কাহুটা, হাজিরা, বাঘ, পালান্দারী ও চাকোটি এলাকায় পাকিস্থান সৈন্য সমাবেশ করেছিল—এছাড়া হাসান আবদাল, হাভেলিয়ান, এবোটাবাদ আর মুজাফরাবাদে যথেষ্ট পরিমাণ কাবালী (অফ্রিদি সিনওয়ারী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি) টোচী স্কাউট সংগৃহীত ছিল। এই যে গারহী-উরির মাঝে পুঞ্চে যাবার পথ, সেখান থেকে অতি সহজে গুলমার্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এখানেই হাজীপীর গিরিপথ। ভারতের পক্ষে এই গিরিপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবারকার সংঘর্ষে এই গিরিপথ ভারত অধিকার করে নিয়ে আজাদ-কাশ্মীরের সমস্ত অসামরিক বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে; এটাও সম্ভবপর এখান থেকে মারী ছাউনী ভারতীয় সৈন্যেরা বেশ দেখতে পাচ্ছে। পুরোনো কালের Road Map of India দেখলে বোঝা যাবে যে, এই সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধোপযোগী সরবরাহ পাঠাবার পথ রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্ত্তী এবং রেলপথ থেকে মাত্র ৫০।৬০ মাইল। অত্যুচ্চ পাহাড় মাত্র মারী পাহাড়। ঝিলাম ষ্টেশন থেকে ভিম্বর, মীরপুর অতি নিকটে।

অপর পক্ষে পাঠানকোট জম্মু শ্রীনগর পথ ২৮০ মাইল, পাঠানকোট ভারতীয় রেলের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি; সম্প্রতি সেটাকে টেনে নিয়ে মাধোপুর পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে—মাধোপুর রাভী নদীর নিকটে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ভারত লোকসভায় আলোচনাকালে উধমপুর পর্য্যন্ত রেলপথ তৈরী করার একটা সংকল্পের কথা বলা হয়েছিল—এটা সম্ভব হ'লে মাধোপুর থেকে সরাসরি উধমপুর পর্য্যন্ত যাবার ব্যবস্থা হত—জম্মুর ভিতর দিয়ে না গিয়ে—উধমপুরের পথ প্রায় ৭০।৮০ মাইল পথ শ্রীনগরে যেতে কমে যেত। যাহোক বর্ত্তমান পথ পাঠানকোট, মাধোপুর, সাম্বা, সাতোয়ারী উধমপুর, জম্মু শ্রীনগরে যাবার একমাত্র চলাচলের পথ।

ভারতের পক্ষে কাশ্মীরে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সরবরাহ যোগান দেবার সমস্যা যে কি বিরাট, এই পথের দূরত্ব, সংকীর্ণতা, দু'টি অত্যুচ্চ পাহাড়ের (কুদ, পাটনী, বাটুট এবং বানিহাল) বাধা এ ছাড়া বর্ষায় প্রতিকূল অবস্থা এবং শীতকালে তুষারপাতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া, সহজেই অনুমেয়। এছাড়া কাশ্মীরবাসীদের, অসামরিক সরবরাহের প্রশ্ন ত আছেই—মোটর ও লরিযোগে যাবতীয় চালান পাঠান হয়। আকাশ-পথে সরবরাহ নামমাত্র সম্ভব। শ্রীনগর থেকে আমাদের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিগুলি ৮০ থেকে ২০০ মাইল দূরে। এদের সরবরাহ, হাল্কা লরি জীপ খচ্চর কিংবা টাট্টু ঘোড়ার সাহায্যে। ৩ থেকে ৫ মাস যে পথ বরফ আচ্ছন্ন নিশ্চয় ৩ থেকে ৫ মাসের খোরাক পূর্ব্ব থেকে সংগ্রহ করে রাখতে হচ্ছে।

অপর দিকে পুঞ্চের পথ, জম্মু থেকে ২০ মাইল দূরে আখনুর; চেনাব নদীর পুল পার হয়ে চৌকীচোরা, সুন্দর-

Akhnur
o Miles 20
CHENAB
JAMMU
GUJRAT
Chaprar
Marala
Samba
SIALKOT
Rangpura
Kathua
Wazirabad
Phillora
PASRUR
K.
GUJRANWALA
A
NAROWAL
Jassar
Dera Nanak
P
Ichogil Canal
GURDASPUR
W.
RAVI
Anjala
Batala
Bagbanpura
Jallo
Wagah
AMRITSAR
LAHORE
Muzang
Jhandiala
Beas
Mugalpura
Burki
Hudiara
Tarn Taran
Kahna
Khalra
Jullundur
Bhikiwin
Luliani
Patti
BEAS
Raiwind
Khemkaran
Deepalpur C.
KASUR
Sahjra
SUTLEJ
SUTLEJ
FEROZEPORE
SB

বাণী, বেরীপত্তন, নৌসেরা চিংগাস্ (এখানে সম্রাট জাহান্‌গীরের মৃত্যুর পর নাড়ী পুঁতে দেওয়া হয়, একটা নিদর্শনও আছে) রাজৌরী, গালুথি, মেন্ধর, পুঞ্চ পৌছান যায়। এই পথকে সর্ব্বদা সক্রিয় রাখা কঠিন সমস্যা, এছাড়া পথটি পাকিস্তান এবং আজাদ-কাশ্মীরের এলাকার অতি নিকটবর্ত্তী। উত্তর ভাগে অর্থাৎ রাজৌরী থেকে পুঞ্চ শীতকালে কিছুদিন বরফে ঢাকা থাকে এবং বর্ষায় পথঘাটকে বাঁচাবার জন্য প্রায়ই সরকারী হুকুম বন্ধ রাখতে হয়। কাশ্মীরের মতনই পথ সংকীর্ণ; মোটর-চালিত যানে কিংবা খচ্চর বা টাট্টুতে সামরিক বা অসামরিক সরবরাহ যোগানের ব্যবস্থা।

কাশ্মীর যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে ভরা, জম্মু প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ তেমনি মরা নদীতে ভরা। এগুলি বর্ষায় দুর্য্যোগ ঘটায়—আবার কিছুক্ষণ পরে জল চলে গেলে শুকিয়ে যায়। স্থলপথে যাঁরা সম্প্রতি কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছেন, এটা খুব নজরে পড়ে।

সরকারী খবরে জানা গেল যে, পাকিস্তানের সৈন্যরা অসামরিক বা ছদ্মবেশে কাশ্মীর উপত্যকায়, টিথ্‌ওয়াল, উরি এবং পুঞ্চের পথ দিয়ে আক্রমণ সুরু করেছে। এতে ভারতীয় সৈন্য তৎপর হয়ে ওঠে এবং এই পথগুলি বন্ধ করে দেবার জন্যে এগিয়ে যায়। বারামুলার অগ্রবর্ত্তী এলাকায় রামপুর, উরির পথে, এর একপাশে টিথওয়াল, এর ভয়াবহ উচ্চতা, চোখে দেখলে বেশ খানিক শরীরে ঝিম্ ঝিম্ এনে দেয়, মাঝে ঝিলাম নদী, অপর দিকে বেদোর। এই বেদোর দখল না করলে হাজীপীর গিরিপথ, যার মাঝখান দিয়ে পুঞ্চের রাস্তা চলে গিয়েছে (রাস্তাটি পাকিস্তানের বা আজাদ-কাশ্মীরের দখলে ছিল) এই ছদ্মবেশীদের আটকান যায় না। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বেদোর দখল করে।

সেই বেদোর দখলের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান পাল্টা জবাবে, আখ্‌নুরের নিকটবর্ত্তী ছাম্ব এবং দেব বাটালার উপর সাঁজোয়া গাড়ি সংযোগে আক্রমণ সুরু করে—উদ্দেশ্য দুইটি; নৌসেরা রাজৌরী পুঞ্চ পথ কেটে দিয়ে বাধার সৃষ্টি এবং সরবরাহ যোগানের বন্দোবস্তকে উড়িয়ে দেওয়া, অপর ভারতীয় সৈন্যের একটা ভারী অংশকে আটকে রাখা—যাতে করে পাকিস্তান জম্মু থেকে ২০ মাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত শিয়ালকোট থেকে, এবং শিয়ালকোটের পূর্ব্বে অবস্থিত চক্‌আমরু দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র জম্মু কাশ্মীরের পথ একেবারে বন্ধ করে দেয়।

এই রকম সম্ভাবনা ভারত সরকার আগে থেকেই জানতেন। যে মুহূর্ত্তে ভারতীয় সৈন্য হাজীপীর গিরিবর্ত্ম দখল করে এনেছেন, পাকিস্তান, ছাম্ব এলাকা আক্রমণ সুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌসেরা ঝাংগড় রাজৌরী মেনধর পুঞ্চ এলাকায় ছোট ছোট দলে আক্রমণ সুরু করতে থাকে, ভারতীয় সেনা ৬ই সেপ্টেম্বর লাহোর বিভাগে এবং ৮ই সেপ্টেম্বর রাজস্থানের যোধপুরের নিকটে মুনী, সীমদারী এবং বারমার এলাকা থেকে, এবং জম্মু থেকে শিয়ালকোটের পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয়।

যাঁরা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রসর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, আন্দাজ করেছিলেন যে, করাচী থেকে যে রেলপথ মণ্ট গোমারীর পথে লাহোর গিয়েছে এবং লাহোর থেকে নারোয়াল, জাসার, লাহোর থেকে গুজরানওয়ালা, উজীরাবাদ, শিয়ালকোট এবং শিয়ালকোট থেকে চাউইন্দা পাশ্‌রুর, জাসান রেল লাইনগুলি ভারত আক্রমণ করে কেটে দিয়ে সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেবে। সেজন্যে একদিকে ডেরাবাবা নানক, আজনালা গুরুদাসপুর অমৃতসর, খলেরা, কেমুর, ফেরোজপুর এবং রাজস্থানের বারমার অভিমুখে আক্রমণ করে। অপর দিকে শিয়ালকোটের পূর্বে চাউইন্দা পাশ্‌রুর অভিমুখে সাঁজোয়া-বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ সুরু করে। এতে দুটো ফললাভের সম্ভাবনা—প্রভূত পরিমাণ পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীকে বিবিধ এলাকায় আটকে রাখা এবং রেলপথ বাঁচাবার জন্য পাকিস্তানের সৈন্যকে ছড়িয়ে ফেলা—এ সম্ভাবনায় ভারত সফলকাম হয়েছে। অস্ত্র-সংবরণোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল চৌধুরী ঘোষণা করেছেন যে, এই মোকাবিলার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরোত্তর পাকিস্তানের জঙ্গী-শক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়-করে দেওয়া (War of attrition) এবং লাহোর শিয়ালকোট রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনী (যেখানে দু'টি করে পদাতিক এবং একটি করে সাঁজোয়া-বাহিনী ছিল) তাকে আটকে বন্ধ করে রাখা। জেনারেল চৌধুরী এবং এয়ার মার্শাল অর্জ্জুন সিংহের ভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সরবরাহের কথাটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। সমরবিভাগের যুদ্ধ-পরিকল্পনার পিছনে যে একটা বিরাট সরবরাহের পরিকল্পনা আছে, জনসাধারণের সঠিক বোধগম্য নয়। এমনও দেখা গিয়েছে যে, যুদ্ধ-পরিকল্পনা তারিখ বা সময় বহুক্ষেত্রে পরিত্যাগ বা নতুনতর করতে হয়েছে এক এই সরবরাহের কারণে। সরবরাহের জন্যে পথঘাট, আকাশ, নদী, খাল প্রভৃতির প্রয়োজন, তাদের সংস্কার, নূতন পথ-সন্ধান তার পরিকল্পনা এবং শত্রুমুক্ত রাখার দায়িত্ব, পরিকল্পনা এবং সরবরাহ বিভাগ যোগসূত্রে ঠিক করেন। 'Men, material and mobility-র যে কি

পরিমাণ বিস্তার, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বহু নামকরা সেনানায়ক এ বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন। All out war কথাটার সম্যক উপলব্ধি বিগত মহাযুদ্ধে হয়েছে—কোন্ বস্তু বা মানুষের প্রয়োজন না হয়েছে? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ২২ দিনের লড়াইকে যদি বিচার করা হয়—খানিক বোঝা যায়। ছয়টি ফ্রণ্টে সমর উপকরণ সরবরাহ, যোদ্ধা, অস্ত্র, রসদ, যানবাহন, আকাশ-পথে স্থলপথে চলাচল, তাদের মেরামত পর্য্যবেক্ষণ এবং পরিপূরণ খসড়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

বেসামরিক জনসাধারণ যুদ্ধের উত্তেজনায় উত্তরোত্তর শত্রুবাহিনীর ওপর অগ্রসর, আর দেশ দখল আকাঙ্ক্ষা করেন। লাহোর রণাঙ্গনে বোধ করি ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে আশা করেছিলেন যে লাহোরকে পাকিস্তান সরকার Open city বলে ইস্তাহার দেবেন, তেমনি শিয়ালকোট, নারোয়াল সম্বন্ধে। সেটা যখন হয় নি নানান জল্পনা-কল্পনা সমালোচনা হয়েছে। আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী, General Chowdhury একজন সাঁজোয়া সমর-দক্ষ ব্যক্তি; এটা কেন হ'ল না, বিশেষ করে আমাদের সৈন্য-বাহিনী পাকিস্তানের উপর্য্যুপরি এতগুলি সাঁজোয়া ধ্বংস করেছে—বিমানবাহিনী সকল প্রকার ভাবে তাদের সাহায্য করেছে, যোগাযোগ করেছে !! কি হ'ল তা হ'লে?

জনসাধারণ যেমন সমর-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অজ্ঞাত তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের বিষয়েও। সাঁজোয়া-বাহিনী একা যুদ্ধে নামতে অসমর্থ, তার সঙ্গে চাই পদাতিক বাহিনী, বিমান-সেনা, ইঞ্জিনিয়ার, সিগনাল গোলন্দাজ, এবং বিমান-বিধ্বংসী কামান। চাই অসংখ্য মাইন, কাঁটাতার, গাড়ি মেরামত কারখানা, উদ্ধারকারী, অ্যাম্বুলেন্স, ভগ্ন সাঁজোয়া গাড়ি, উদ্ধারকারী গাড়ি, পেট্রল, ডিজেল তেল, রসদ, ভগ্ন অস্ত্রের পরিপূরণ, চলমান হাসপাতাল। এ কথা জানা আবশ্যক যে রাত্রের অন্ধকারে সাঁজোয়া গাড়ির যুদ্ধে পঙ্গু কারণ, দৃষ্টির অভাব—যদিও Infra red telescope কিছু পরিমাণ সাহায্য করে—রাত্রের যুদ্ধ পদাতিক বাহিনীর কাজ। তারা সাঁজোয়া বাহিনী অধিকৃত এলাকাগুলি রক্ষা করে, শত্রুর ঘাঁটি ও শিবির সন্ধানে তৎপর থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাধাবিপত্তি নিরাকরণ করে সাঁজোয়া বাহিনীকে সজাগ রাখে।

যাঁরা পাঞ্জাবে বাস করেছেন বা সজ্ঞাত, তাঁরা জানেন কি পরিমাণ খাল পাঞ্জাবে অধ্যুষিত—এগুলি অগ্রসরের পক্ষে কত বাধা এবং কিভাবে তাদের নিজেদের কাছে নেওয়া যায়, কিভাবে তাকে অতিক্রম করা যায়—এটা পরিকল্পনা-বিভাগ বিস্তারিত করে চিন্তা করেন এবং প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ার, গাড়ি, পুল তৈরীর সরঞ্জাম, খনন করার যান্ত্রিক গাড়ির ব্যবস্থা রাখেন। লাহোরের ইছেগিল খাল কেন আমরা অতি সহজে পার হয়ে, লাহোরকে এক পাশে ফেলে রাভী নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হই নি—সে-কথা কি সহজ চিন্তায় জনসাধারণ সমাধান করতে পারে?

এই আলোচনাটা এক বর্ষীয়ানদের আড্ডায় হচ্ছিল। আলোচনা-পরিশেষে তিনি বললেন, একটা বিশেষ খবর আছে, "রেডিও বা কাগজে বেরোয় নি, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব Cease fire-এর পরে পিকিং গিয়েছেন—চীনেরা ভাল দাঁত বাঁধায় জানেন ত—নতুন দাঁতের সেট্ তৈরী করে সর্দার আয়ুবকে দেখলাম"।

হাজী পীর পাস্

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমারে ফিরায়ে দাও আমার সে দুরন্ত সাতাশ !
আবার ফুটন্ত রক্তে জীবনের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস !
দেশ-মাতৃকার কণ্ঠে হানাদার পরাবে শৃঙ্খল ?
বন্দুকে কাশ্মীর নেবে ? এত শক্তি ধরে পশুবল ?

কল্পনার নেত্রে দেখি ফিরে গেছি স্বপ্নের সাতাশে !
জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডসম বর্জিয়া এসেছি পথ-পাশে
বয়সের কঞ্চুকেরে ! যৌবনের আগ্নেয় মহিমা
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলো বিবর্ণ মৃত্যুর যত সীমা !
আমার নূতন সত্বা দিগ্বিজয়ী বসন্ত যেমন
পুষ্পিত অরণ্যে আসে চূর্ণ করি মাঘের শাসন
তেমনি দাঁড়ালো আসি তারুণ্যের প্রদীপ্ত চূড়ায় !
মধ্যাহ্ন-গগনে জ্বলি মেঘমুক্ত মার্ত্তণ্ডের প্রায় !

কাশ্মীরের উপত্যকা ; চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল !
পৃষ্ঠেতে 'হ্যাভারস্যাক্' ; ধমনীতে রুধির চঞ্চল !
চক্ষে মোর শ্যেন-দৃষ্টি ; স্নায়ুগুলি নির্ম্মিত ইস্পাতে।
কব্জীতে ব্যাঘ্রের জোর ; গুলীভরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে !
তরুণ জওয়ান আমি। লক্ষ্যভেদে দ্বিতীয় ফাল্গুনী।
অব্যর্থ বুলেটে মূর্দ্দা, হোলো কত পাকিস্তানী খুনী !
ছদ্মবেশী দস্যুদের রক্তের সুতীব্র পিপাসায়
উত্তপ্ত সীসকখণ্ড শত্রুপানে মুহুর্মুহুঃ ধায় !
অরাতি-রুধির স্রোতে স্নান করি সুন্দরী কাশ্মীর
সেজেছে অপূর্ব্ব সাজে ! রক্তাম্বরা যেন রুদ্রাণীর
দুটী পদ-কোকনদ জবা-পুষ্পে গিয়াছে ছাইয়া !
শ্যামল ফাল্গুন যেন পলাশের প্রাচুর্য্য বহিয়া
পাহাড় করেছে রাঙা ! কী আনন্দ বৈরীর নিধনে !
আমার ভারতবর্ষ ! যারা তারে স্বাধীনতা-ধনে
বঞ্চিত করিতে চায় তাহাদের নিপাতে কী সুখ !
সেই সুখ আমি জানি, আর জানে স্ট্যাণ্ডাত বন্দুক !

ওদের মেশিন-গান বারম্বার ঐ গরজায় !
আমি তো জওয়ান ভাই ! মৃত্যু কাণে মৃদঙ্গ বাজায় !
আমার অগ্রজ যম ; আমার অনুজ রাইফেল !
দেশের শত্রুরে বধি' চিত্ত মোর আনন্দে উদ্বেল !

পিচ্ছিল পর্ব্বত-গাত্র ! বর্ষণ-মুখর অন্ধকার !
দূরে পাকিস্তানী ঘাঁটি। আমি ভাই জওয়ান দুর্ব্বার !
দুর্গম আরণ্যপথ ! বৃষ্টি-ঝরা সুগভীর নিশা !
একশত জওয়ানের চিত্তে শুধু অদম্য জিগীষা !
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসে ; কার দেহ ভূমিতে লুটালো ?
হায় মাতঃ, জানিলে না পুত্র তব কোথায় ঘুমালো !
কোন্ দূর শৈল-চূড়ে রক্তে তার রাঙিল পাথর !
ঘুমাও, ঘুমাও বন্ধু, রণ-ক্ষেত্র জওয়ানের ঘর !
জীবনেরে ভালোবেসে মরণেরে করেছি ঘরণী !
কে জানে এ রাত্রি কি না জীবনের শেষের রজনী !

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ঝরে ; রাত্রি-শেষে ধূসর আকাশ।
আর ত পঞ্চাশ গজ—তার পর হাজী পীর পাস্ !
বিশ্বস্ত স্ট্যাণ্ডাত মোর,—গর্জ্জে ওঠো আর কয়বার ?
লক্ষ্যভেদে কোরো না বিভ্রম ; বর্ব্বরেরা প্রায়
তো সাবাড় !

কোথায় রয়েছি আমি ? রুধিরাক্ত কেন কলেবর ?
কিছু মনে পড়ে না তো ! উর্দ্ধে হেরি ধূসর অম্বর !
সব আলো মুছে যায় ! জওয়ানেরা দেয় জয়ধ্বনি ?
চেতনা হারায়ে ফেলি ; এ কোথায় চলেছে তরণী ?
'জলাঙ্গী'র জল-পথ !—তরণীতে আমি আছি শুয়ে !
আমার মুখের কাছে জননীর মুখখানি নুয়ে !
ললাটে কোমল স্পর্শ ! পুষ্পগন্ধ সন্ধ্যার সমীরে !
কোথায় চলেছি মা গো ? কোন্ দূর সমুদ্রের তীরে ?
অন্ধকার ! ডুবে যাই ! উর্দ্ধে মোর ধূসর আকাশ !
জননী ভারতবর্ষ !' স্বাধীনতা ! হাজী পীর পাস্ !

আলেকজান্দার ডুমা'

[বিশ্বসাহিত্যে ফরাসী লেখক আলেকজান্দার ডুমা'র মত এত অধিক সংখ্যক পুস্তক আর কেউ লিখে যান নি। তার মধ্যে যে কয়খানি বিশ্বসাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে তার মধ্যে 'কাউন্ট অব্ মন্টেক্রীষ্টো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বইখানির আকর্ষণ ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই সমান। ফ্রান্সের ইতিহাস ও সমসাময়িক ইউরোপের অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলেকজান্দার ডুমা'র বইগুলির মধ্যে যতটা পাওয়া যায়, অন্য কোন লেখকের বইয়ে তা' পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিতেরা ডুমার বইগুলির মধ্যে ইতিহাস-স ক্রান্ত কোন ভুল এ পর্যন্ত বার করতে পারেন নি, এমনি নিখুঁতভাবে ইতিহাস-চর্চা করেছিলেন তিনি। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাঁর উপন্যাসগুলি ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়ে রচিত হলেও, বর্ণনার চাতুর্যে, ভাষার সাবলীলতায়, রহস্যসৃষ্টির চমৎকারিত্বে সেগুলি এতই চিত্তাকর্ষক যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়া যায় না। পৃথিবীর নানাদেশে বিভিন্ন ভাষায় ডুমা'র বইগুলি অনুবাদিত হয়েছে। ডুমা'র অনেকগুলি জনপ্রিয় বই ছায়া-চিত্রেও দেখানো হয়েছে। ডুমা'র বইগুলির আকর্ষণ যে এখনও কমে নি তার কারণ তাঁর চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব ক্ষমতা ও ঘটনাবিন্যাসের দক্ষতা। বিশেষতঃ ফরাসীদেশের সমগ্র ইতিহাস ছিল যেন তাঁর নখদর্পণে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিভাবে উচ্চাঙ্গের উপন্যাসে পরিণত করা যায়, এ নৈপুণ্য তাঁর মত আর কোথাও দেখা যায় না।

কাউন্ট অব্ মন্টেক্রীষ্টো

ফরাসী বিপ্লবের পর সমগ্র ফ্রান্সদেশ যখন একরকম শাসনতন্ত্রহীন হয়ে নানাভাবে বিপন্ন ও অরাজক হয়ে উঠেছিল, নেপোলিয়ন তখন নিজের সামরিক ক্ষমতায় ও কুট রাজনৈতিক দলের সহায়তায় ফ্রান্সের রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু তাঁর এই অভাবনীয় অভ্যুত্থান পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাদের সহ্য হয় নি, তাই তাঁরা একযোগে নেপোলিয়নকে কৌশলে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করলেন।

এ হ'ল নেপোলিয়নের প্রথম অনেকটা দুর্বল অবস্থার ব্যর্থতার কাহিনী। কিন্তু তারপরে তিনি কি ভাবে এল্‌বা থেকে পালিয়ে ফিরে এসে আবার ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করে নিজের অসাধারণ সামরিক প্রতিভায় সমগ্র ইউরোপকে পদানত করেছিলেন সে-কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু আমাদের গল্প তাঁর এল্‌বা দ্বীপে বন্দীজীবনের সমসাময়িক।

ফ্রান্সের সম্রাট মহাবীর নেপোলিয়ন তখন এল্‌বা দ্বীপে বন্দী। ফ্রান্সে তাঁর বিপক্ষে যেমন কতকগুলি রাজনৈতিক দল ছিল, তাঁর স্বপক্ষেও তেমনি এমন বহুলোক ছিল যারা তাঁকে আবার ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই সব অনুরাগী লোককে তিনি গোপনে অনেক সংবাদ জানাতেন ও নিজের বন্দীদশা থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, তার ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করবার নির্দেশ দিতেন। এর জন্য তাঁর নানা সাহায্যকারী লোক গোপনভাবে কাজ করত।

এই রকম একটি সাহায্যকারী লোক ছিল এক জাহাজের একজন বুড়ো কাপ্তেন।

কাপ্তেন এল্‌বা দ্বীপ থেকে গোপনে নেপোলিয়নের একখানি চিঠি ফ্রান্সের নেপোলিয়নের দলভুক্ত লোকদের হাতে দেবার জন্য ফ্রান্সে যাচ্ছিলেন। তাঁর জাহাজে একজন শুধু এ সংবাদ জানত, তার নাম ড্যাংলার। সে ছিল কাপ্তেনের অধীনস্থ একজন পুরাতন কর্মচারী। কাপ্তেনের পরেই তারই সেই জাহাজের কাপ্তেন হবার কথা। তাই সে কাপ্তেনের সব কাজের উপর লক্ষ্য রাখত।

কাপ্তেন কিন্তু বিশেষ বিশ্বাস ও স্নেহের চক্ষে দেখতেন

এদমন্দ্ নামে আর একটি যুবককে। সে জাহাজের নূতন কর্মচারী হ'লেও তার কর্মপটুতা ও বিশ্বস্ততা কাপ্তেনকে মুগ্ধ করেছিল। এদমন্দ্ কিন্তু নেপোলিয়নের গোপন চিঠির কথা জানত না।

হঠাৎ একদিন জাহাজের কাপ্তেন খুবই পীড়িত হয়ে পড়লেন, পীড়া এমনই বেড়ে উঠল যে তাঁর আর বাঁচবার আশা রইল না। তখন তিনি এদমন্দকে তাঁর কেবিনে ডেকে নিয়ে গোপনে নেপোলিয়নের সেই চিঠিখানি দিলেন ও ফ্রান্সে কার হাতে সেখানি দিতে হবে সে কথাও জানালেন। তারপর তিনি সকলের সামনে এদমন্দকেই তাঁর স্থানে সেই জাহাজের কাপ্তেন মনোনীত করলেন।

এ ব্যাপারে সেই পুরাতন কর্মচারী গ্লাংলার খুবই হতাশ ও অসন্তুষ্ট হ'ল। কোথায় সে হবে সেই জাহাজের কাপ্তেন, তা না হয়ে ছোকরা এদমন্দ হ'ল কাপ্তেন। গ্লাংলার অতিমাত্রায় রেগে গেল। কিন্তু সে যখন জানতে পারলে নেপোলিয়নের গোপন চিঠিখানি কাপ্তেন এদমন্দের হাতেই দিয়েছেন, তখন একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসা জেগে উঠল তার মনে এদমন্দকে জব্দ করবার।

এদমন্দ গ্লাংলারের গোপন অভিপ্রায় কিছুই ধারণা করতে পারে নি। তা ছাড়া মার্সিদিস নামে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা স্থির হয়ে আছে। ফ্রান্সে পৌঁছেই বিয়েটা হবে।

কাপ্তেন। চিন্তা ছিল না। এবার জাহাজের সম্পূর্ণ ভার পড়ল এদমন্দের উপর। ফ্রান্সে জাহাজ এসে পৌঁছতেই সে তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে নেমে আগে নেপোলিয়নের চিঠিখানা যথাস্থানে দেবার জন্য ছুটে চলল। মার্সিদিস নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে সেইদিনই তার বিয়ে হবার কথা, কিন্তু নেপোলিয়নের চিঠিখানা আগেই পৌঁছানো চাই। তাই বিয়েটা পরদিনও হতে পারে এই ভেবে সে চিঠিটা আগেই দিতে গেল।

এ সব ব্যাপার তার শত্রু গ্লাংলারের চোখ এড়াল না। সেও তখনি চুপি চুপি গিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে খবর দিয়ে এল। তারা আর কালবিলম্ব না করে এদমন্দের অনুসরণ করে পথের মধ্যে তাকে পুলিশের সাহায্যে গ্রেপ্তার করল। এদমন্দকে তল্লাসী করে নেপোলিয়নের চিঠিখানি পাওয়া গেল। আর যায় কোথায়। তখনি তাকে বিচারের একটা অভিনয় করে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড পালনের ব্যবস্থা করল। বিচারক তার কোন কথাই শুনতে চাইলেন না।

বেচারা এদমন্দ। মার্সিদিসকে বিয়ে করবার বদলে তাকে সব আশা ছেড়ে দিয়ে চিরজীবনের জন্য যেতে হ'ল কারাগারে! হতাশায়, আক্ষেপে তার চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুধারা বইতে লাগল। কিন্তু উপায়ই বা কি? সে কারাগার ত আর সাধারণ কারাগার নয়, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এক অতি ভয়ঙ্কর কারাগার,—নাম তার চ্যাতুস্থফ। এই চ্যাতুস্থফ কারাগারে রাজনৈতিক অপরাধীদের অতি ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হ'ত। এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া সে সময়ে একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

এদমন্দকে কারাগারে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হ'ত, তার উপরে আবার অন্য কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলা একেবারেই ছিল নিষিদ্ধ। একটি নির্জন ক্ষুদ্র কক্ষে সে বন্দী হয়ে রইল।

এ কক্ষে জানালা ছিল না, শুধু একটা ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে অতি সামান্য আলো আসত। বাইরের কোন দৃশ্যই চোখে পড়বার কোন উপায়ই ছিল না, সে শুধু অনুমান করত ঘুলঘুলির আলো দেখে কখন দিন ও রাত্রি হয়। এইভাবে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তার বছর কয়েক কাটল। কিন্তু আর ত সে পারে না,—ক্রমশঃ সে যেন উন্মাদ হয়ে গেল,—ঠিক করলে, সে অবস্থায় তার পক্ষে আত্মহত্যা করাই উচিত। কিন্তু হঠাৎ সেই কারাকক্ষে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটল।

একদিন সে শুনতে পেলে কারাকক্ষের মেঝেতে কিসের যেন ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। ভাল করে কান পেতে সে শুনলে সে শব্দটা ক্রমশঃ যেন একটু এগিয়ে আসছে। একটু পরেই সে দেখলে মেঝের পাথরখানা একটু নড়ে উঠল, আর আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে জায়গাটা ফাঁক হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে একটা নরমুণ্ড ফাঁক দিয়ে উপরে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার ত! যে লোকটা উঠে এল, সে কিন্তু এদমন্দকে সে কক্ষে দেখে একেবারে হতাশ হয়ে যেন আৎকে উঠল। তারপর অবসন্ন হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল।

এদমন্দ তাড়াতাড়ি তাকে যতটা পারে সেবাশুশ্রূষা দ্বারা একটু সুস্থ করে ব্যাপারখানা জানতে চাইলে। লোকটি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে এদমন্দের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে—আমার আর উদ্ধার পাবার কোনো আশাই নেই,—আমি ভুল পথে সুড়ঙ্গ কেটেছি।

লোকটির বয়স অনেক। পাকা চুলদাড়ি। দেহ শীর্ণ হ'লে কি হয়, চোখ খুব উজ্জ্বল। লোকটি তখন বললে—"তুমিও দেখছি আমার মত আর এক হতভাগ্য বন্দী। যাক্, যা ভুল হবার তা হয়েছে, এখন তোমার কাছে আমি আমার সব কথা বলব। হয়ত ভগবানের উদ্দেশ্য এইটাই। হয়ত আমার কাজ তোমাদ্বারাই সিদ্ধ হবে। এখন আমি চললাম, —তোমার এই ঘরের সঙ্গে আমার ঘরের সুড়ঙ্গপথের যোগ ত রইলই, খুব সাবধানে সকলের অগোচরে তোমায় আমায় এখন থেকে নিত্যকার দেখাশুনা হবে। আজ অনেকক্ষণ

এসেছি, কি জানি রক্ষীদের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগতে পারে। তারা অবশ্য আমার কক্ষের বাইরেই থাকে, তবে সামান্য সন্দেহ জাগলেই তারা আমার কক্ষে ঢুকে যদি আমাকে দেখতে না পায় ও সুড়ঙ্গের কথা জানতে পারে তবে শুধু যে আমাকেই চরম দণ্ড ভোগ করতে হবে তা নয়, তোমাকেও তারা যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন করবে। এখন আমি যাই, কাল আবার ঠিক এই সময়েই তোমার কাছে আসব ও সকল পরিচয় দোব। আমার কক্ষ তোমার কক্ষের পাশেই।"

এই কথা বলে বৃদ্ধলোকটি আবার সুড়ঙ্গ পথে নেমে এদ্‌মন্দের কক্ষ থেকে চলে গেল।

এদ্‌মন্দ্ একাকী বসে বসে ভাবতে লাগল,—"ভগবানের লীলা কি বিচিত্র! একটু আগে আমি আত্মহত্যার সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু এখন কি জানি কেন প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমি শীঘ্রই মুক্তি পাব।"

পরদিন যথাসময়ে সেই বৃদ্ধ লোকটি সুড়ঙ্গপথে এদ্‌মন্দের কক্ষে এল। এদ্‌মন্দ্ তাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে তাকে নিজের জীর্ণ শয্যায় বসিয়ে তার কাহিনী শুনতে লাগল। লোকটি তখন বলতে আরম্ভ করল—

"আমার নাম ফারিয়া। আমি বিবাহ করি নি, ধর্মানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চায় সারাজীবন কাটাব এই সংকল্প নিয়ে ধর্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করলাম। এতে আমার যথেষ্ট অবসর থাকায় আমি নানা বিদ্যার চর্চা করতে লাগলাম ও ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করলাম। ধর্মযাজক হওয়াতে সমাজের নানা স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে লোকচরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হলাম। এই সময়ে একবার রোমের মহামান্য পোপ আলেকজান্দার বর্জিয়া আমাকে ধর্মসংক্রান্ত কাজে রোমে ডেকে পাঠান। আমি রোমে উপস্থিত হয়ে দেখলাম সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু হ'লেও পোপ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, অর্থলোলুপ ও পাষণ্ড প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর ধর্মের ভান শুধু লোকদেখানো একটা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। ধনসঞ্চয়ের জন্য তিনি পারতেন না এমন কাজ পৃথিবীতে ছিল না। নিজের ছেলেকে ও মেয়েকে তিনি নানা কুকাজে লিপ্ত রেখে তাদের দ্বারাও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি সন্ধান পেলেন যে স্পাডা বলে একজন নাগরিক ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব ধনী হয়ে উঠেছেন ও তাঁর সম্পত্তি ভোগ করবার কোন ছেলেমেয়ে নেই। পোপ তখন স্পাডাকে ডেকে খুব আদর-আপ্যায়ন করে বললেন—"দেখ স্পাডা, আমি তোমাকে ধর্মযাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কার্ডিনাল' পদ দিতে চাই। আমার পরেই তুমিই হবে মহামান্য পোপ। ভেবে দেখ সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের গুরু হবে তুমি। কত দেশের, কত রাজার মাথা লুটিয়ে পড়বে ভক্তিতে তোমার পায়ে। তোমার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তুমি আমার পাশেই বসবে আর সকলের সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবে।"

স্পাডা প্রথমে বুঝতে পারেন নি পোপের গোপন উদ্দেশ্য। তিনি আনন্দের সঙ্গেই কার্ডিনাল পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার পরে যখন বুঝতে পারলেন যে পোপ তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য হস্তগত করবার জন্যই এইভাবে তাঁকে নিজের বশীভূত করে রেখেছেন তখন তাঁর আর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। তিনি তখন গোপনে মন্টেক্রীষ্টো দ্বীপের এক দুর্গম পাষাণ গুহায় তাঁর সমস্ত ধনরত্ন ঐশ্বর্য এক প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখে এলেন। একথা আর কেউ জানত না। তবে তিনি কোথায় সেটা রেখেছিলেন তার একটা ম্যাপ ও একখানা চিঠি তিনি তাঁর বিরাট লাইব্রেরীর এক অতিপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মলাটের মধ্যে রেখে দিলেন লুকিয়ে।

পোপ যখন জানতে পারলেন যে স্পাডা তাঁর ধনরত্ন গোপনে সরিয়ে ফেলেছেন তখন তাঁর আর ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি তখন নানাভাবে স্পাডাকে উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করলেন। পোপের অত্যাচারে তিনি এমনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন যে রোম নগর ছেড়ে প্রাণের ভয়ে অন্য দেশে এক গোপন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাড়াতাড়িতে তিনি আর তাঁর গুপ্তধনের ম্যাপটি তাঁর লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যেতে পারলেন না।

আমি ফারিয়া ধর্মযাজক হলেও জ্ঞানচর্চা থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকতাম না। পলায়িত স্পাডার লাইব্রেরীতে বসে আমি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলাম। একদিন একখানি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পড়বার সময় সেখানি আমার হাত থেকে হঠাৎ পড়ে যায় ও তার মোটা পুরাতন মলাটখানি খুলে যায়। আমি সেই মলাটের মধ্যে স্পাডার ম্যাপ ও চিঠিখানি পাই। চমৎকৃত হয়ে প্রথমে আমি এ ব্যাপারে ততটা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি নি, কিন্তু স্পাডার দুর্ভাগ্যময় জীবনকাহিনী শুনে আমি নিজে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে প্রস্তুত হলাম। ঠিক সেই সময়ে কোন কারণে আমি শাসনকর্তাদের বিরক্তিভাজন হই ও সেই ভীষণ পার্বত্য কারাগার চ্যাতুদ্দকে চিরজীবনের জন্য কারাদণ্ড পাই। কিন্তু সেই ম্যাপ ও চিঠিখানি আমি সযত্নে নিজের জামার মধ্যে এক গোপন স্থানে সেলাই করে রেখেছিলাম। তাই সেই ম্যাপ ও চিঠি সঙ্গে নিয়েই আমি কারাগারে গেলাম। যে কক্ষে আমাকে বন্দী করে রাখা হ'ল তার পাষাণ-

প্রাচীরের পাশেই একটি পার্বত্য নদী। আমি স্থির করলাম, যে-কোন উপায়েই হোক আমাকে কারাগার থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কি করে পালাব সেটা স্থির করতে পারলাম না। ক'দিন পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমি আমার পলায়নের সুযোগ আবিষ্কার করতে পারলাম। যে লোহার থালায় করে আমাকে আমার খাদ্য দেওয়া হ'ত হঠাৎ দেখি সেখানিতে একটা বেশ বড় রকমের ফাটল ধরেছে। আমি তখন সেই থালাখানি ঠুকে ঠুকে খানিকটা অংশ ভেঙ্গে ফেললাম। তার পর লোহার সেই লম্বা ভাঙ্গা অংশটিকে সযত্নে আমার কারাকক্ষের এমন এক স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলাম যাতে সেটা কারুর নজরে না পড়ে। কারাগারের ভৃত্য এসে ভাঙ্গা লোহার থালাটি ফিরিয়ে নেবার সময় ভাঙ্গা অংশটির খোঁজ করল কিন্তু পেল না। কিন্তু সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এ নিয়ে আর কোন হৈচৈ করল না। আমি প্রতিদিন সেই লোহার অংশ পাথরের দেওয়ালে ঘসে ঘসে খুব ধারালো করলাম, তার পর তাই দিয়ে নদীর দিকে লক্ষ্য রেখে ঘরের কোণে মেঝের উপর গর্ত করতে লাগলাম। আমার শঙ্কিত মন নিয়ে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে সুড়ঙ্গটার গতিপথ ঠিক করতে না পেরে শেষে তোমার ঘরে এসে পড়লাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে সুড়ঙ্গটা অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে নি। তা হলেই আমার প্রাণদণ্ড ছিল অবধারিত। এখন তোমাকে পেয়ে আমার নিঃসঙ্গ জীবন যেন আশার আলো দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আবার যে অন্য সুড়ঙ্গ করব, সে শক্তি ও উৎসাহ আমার আর নেই।"

এদ্‌মন্দ ফারিয়ার কথা শুনে বললে: "আমি বুঝতে পারছি আপনার পক্ষে অন্য সুড়ঙ্গ কাটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমরা দু'জনে এবার থেকে পরস্পরের বন্ধুত্ব নিয়েই জীবন কাটাব।"

ফারিয়া কোন কথা না বলে এদ্‌মন্দকে আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: "আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়, কারারক্ষীরা টের পেলে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে।" এই বলে ফারিয়া সেই সুড়ঙ্গপথে নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

তার পর থেকে প্রতিদিন ফারিয়া এক নির্দিষ্ট সময়ে এদ্‌মন্দের কাছে আসতেন। ফারিয়ার সংস্পর্শে এসে এদ্‌মন্দ্‌ নানা বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এদ্‌মন্দ ও একজন পণ্ডিত হয়ে পড়ল।

এমনি করে আরও বছর দুয়েক কাটল। হঠাৎ একদিন ফারিয়া খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তিনি অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে এদ্‌মন্দের কাছে এসে সেই ম্যাপ ও চিঠিখানি তার হাতে দিয়ে বললেন—"আমি আর বাঁচব না। এই ম্যাপ ও চিঠি আমি তোমার হাতে দিলাম, যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে হয়ত তুমিই এই ধনৈশ্বর্য লাভ করতে পারবে।"

পরদিনই ফারিয়ার মৃত্যু হ'ল। কারাগারের নিয়ম অনুসারে ফারিয়াকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে নিচের সমুদ্র-মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে, এই জন্যে ফারিয়ার মৃতদেহ একটা বস্তার মধ্যে পুরে তাঁর কক্ষের ভিতরে রাখা হ'ল। তখনি রক্ষীর দল প্রস্তুত হয়ে এসে সেই বস্তা বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে আসবে।

এদ্‌মন্দ্‌ তখন দেখলে তার পক্ষে পলায়নের এই পরম সুযোগ। সে তখনি সুড়ঙ্গপথে ফারিয়ার কক্ষে এসে তাড়াতাড়ি বস্তার ভিতর থেকে ফারিয়ার মৃতদেহ বার করে সেটাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেই সেই বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। হাতে শুধু তার ফারিয়ার সেই লোহার অস্ত্রটি। অবশ্য ম্যাপ ও চিঠি সঙ্গে নিতে সে ভুলল না।

একটু পরেই রক্ষীর দল এসে সেই বস্তাটি সেলাই করে তখনি সেটাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে সামনের সমুদ্রজলে ফেলে দিলে। ঝপাৎ করে একটা শব্দ হ'ল আর বস্তাটি সমুদ্রের ঢেউয়ে কোথায় যেন সরে গেল।

বেশ একটু আঘাত পেলেও এদ্‌মন্দ্‌ আর কালবিলম্ব না করে হাতের লোহার অস্ত্রটি দিয়ে বস্তা কেটে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। সে খুব ভাল সাঁতার জানত, তাই সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সাঁতার কেটে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে গেল। সমুদ্রের উপর একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে ছিল, এদ্‌মন্দ্‌ অতিকষ্টে সেই পাহাড়ের উপর উঠে অবসন্ন দেহে শুয়ে পড়ল।

মুক্তি! মুক্তি! বহু বৎসর কারাগারে কাটিয়ে এবার এদ্‌মন্দ্‌ পেল মুক্তি। মাথার উপরে নীল আকাশ, পদতলে ফেনিল সমুদ্র, চারপাশে অসংখ্য সামুদ্রিক পক্ষী শ্বেত পক্ষ মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে, বাতাসে কেমন একটা স্নিগ্ধ গন্ধ! এদ্‌মন্দ্‌ অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে তার পর উঠে পড়ল। তার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, তাই সামনে যে গাছ ছিল তার ফল পেড়ে নিয়ে চেখে দেখল সে ফল খাওয়ার উপযুক্ত কি না। যখন দেখল ফলগুলি বিস্বাদ নয়, তখন সে সেই সব ফল পেট ভরে খেয়ে নিয়ে ও একটি ছোট্ট ঝরণার জল খেয়ে অনেকটা সুস্থির হ'ল।

রাত্রিটা পাহাড়ের একটা ছোট্ট গুহায় কোন রকমে কাটল। পরদিন এদ্‌মন্দের সৌভাগ্যক্রমে সেই পাহাড়ের কাছ দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছিল। এদ্‌মন্দ্‌ তখন খুব হাত-পা ছুঁড়ে লাফালাফি করতে করতে চিৎকার করে জাহাজের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। [illegible]

জাহাজের একটা ছোট বোটে করে কয়েকজন নাবিক এসে কূলে নামল, তার পর পাহাড়ের উপর উঠে এদ্‌মন্দ্‌কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে গেল। জাহাজের লোকেরা জানল যে এদ্‌মন্দ সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়ে সেই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

জাহাজ সমুদ্রপথে চলতে লাগল, কিছুদূর যাবার পর একটা দ্বীপ দেখে কাপ্তেন বললেন—"এবার আমরা মন্টে-ক্রীষ্টো দ্বীপের কাছ দিয়ে যাচ্ছি।"

এদ্‌মন্দ্‌ একথা শুনে চমকে উঠল—এই ত তার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মন্টেক্রীষ্টো দ্বীপ! এই দ্বীপেরই ম্যাপ ত তার কাছে। এইখানেই ত স্পাডার অগাধ ধনরাশি গোপনে লুকানো আছে! এদ্‌মন্দ্‌ তখন কাপ্তেনকে নানা রকমে বোঝাতে লাগল যে এই দ্বীপে বুনো ছাগল ও হরিণ অনেক পাওয়া যায়। সেগুলিকে সহজেই শিকার করা যেতে পারে। কাপ্তেন এদ্‌মন্দের ব্যবহারে ও সেবায় আগে থেকে সন্তুষ্ট ছিলেন, এখন দ্বীপে ভাল টাটকা মাংস পাওয়া যাবে ভেবে শিকারের লোভে মন্টেক্রীষ্টো দ্বীপের কূলে জাহাজ নোঙর করলেন। বন্দুক ও গোলাবারুদ নিয়ে এদ্‌মন্দ্‌ কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে দ্বীপে নামল। কিছু শিকারও হ'ল কিন্তু ফেরবার সময় এদ্‌মন্দ্‌ হঠাৎ ছল করে একটা পাথরের উপর থেকে পড়ে গিয়ে এমন ভাব দেখাল যে তার আর চলবার শক্তি নেই।

নাবিকেরা তাকে ধরাধরি করে জাহাজে নিয়ে যেতে চাইলে কিন্তু এদ্‌মন্দ্‌ বললে—"তোমরা ত ভাই দু'দিন পরে এই পথেই ফিরবে। তখন আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। এখন আমার যে অবস্থা তাতে একটুও নড়তে পাচ্ছি না।" এই বলে এদ্‌মন্দ্‌ খুব খানিকক্ষণ—"উঃ! আঃ!" বলে কাৎরাতে লাগল।

নাবিকেরা তখন উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা তার কথাতেই সম্মত হ'ল। এদ্‌মন্দ্‌ বললে—"আমার এটা একটা অজানা দ্বীপ, তোমরা ভাই আমার কাছে একটা বন্দুক ও কিছু গুলীবারুদ রেখে যাও,—হঠাৎ যদি কোন বিপদে পড়ি, তা হ'লে আত্মরক্ষা করতে পারব।"

নাবিকেরা তখন এদ্‌মন্দের কাছে একটা বন্দুক আর কিছু গুলীবারুদ রেখে তাদের জাহাজে ফিরে গেল। কথা রইল, দু'দিন পরে জাহাজ ফিরবার সময়ে তারা তাকে নিয়ে যাবে।

জাহাজ যখন দূরে চলে গেছে, তখন এদ্‌মন্দ্‌ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আর ম্যাপটি খুলে স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল। ম্যাপে যেভাবে সেই গোপন স্থানের বর্ণনা ও চিহ্ন ছিল সে অনেক কষ্টে সেই স্থানটি খুঁজে বার করল।

স্থানটির চারদিকে ভীষণ জঙ্গল। যে গুহাটিতে ধনরত্ন লুকানো ছিল সেটিকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। ম্যাপের চিহ্ন দেখে ও চিঠিতে তার বর্ণনা পড়ে এদ্‌মন্দ সেটিকে আবিষ্কার করলে। তার পর সেই গুহাতে প্রবেশ করে সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল।

গুহার মধ্যে কিছুই নেই। একেবারে শূন্য। তখন এদ্‌মন্দের মনের অবস্থা নৈরাশ্যে অস্থির হয়ে উঠল। এত কষ্ট করে এখানে এসে কি শেষে শূন্য গুহা দেখতে হ'ল! কিন্তু ফারিয়া ত মিথ্যাবাদী লোক ছিলেন না বলেই তার ধারণা। তাই সে পুনরায় গুহার মধ্যে তার পাষাণ দেওয়ালগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে লাগল।

হঠাৎ একটা দেওয়ালে সে দেখল মস্ত বড় একটা লোহার আংটা আটকানো রয়েছে। এইবার তার মন আশায় ভরে উঠল। লোহার আংটা যখন দেখতে পাওয়া গেছে, তখন এটা নিশ্চয়ই একটা দরজা কিন্তু দরজাটা অনেক'দিন বন্ধ থাকায় বহুক্ষণ ধরে অনেক টানাটানি করেও এদ্‌মন্দ সেটা খুলতে পারল না। তখন তার সঙ্গে যে বন্দুকের বারুদ ছিল সেই বারুদ পাথরের দরজার নিচে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল।

তখনি একটা আওয়াজ হয়ে দরজাটা যেন একটু নড়ে উঠল। তখন এদ্‌মন্দ্‌ এগিয়ে গিয়ে লোহার কড়াটা ধরে জোরে টানতেই পাথরের দরজাটা খুলে এল। এদ্‌মন্দ এক টুকরা কাঠকে জ্বালিয়ে মশালের মত করে সেই গুহাকক্ষে প্রবেশ করল।

বহুদিনের সঞ্চিত দূষিত বায়ুতে এদ্‌মন্দের যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে লাগল। বাইরের বাতাস প্রবেশ করে সেই দূষিত বায়ুকে অনেকটা হাল্কা করে তোলাতে এদ্‌মন্দ্‌ এবার মশালের আলোতে চারদিকে দেখতে লাগল, কিন্তু কোথাও গুপ্তধনের কোন চিহ্নই দেখতে পেল না।

নিতান্ত হতাশ হয়ে এদ্‌মন্দ্‌ সেই গুহাকক্ষের মেঝের উপর বসে পড়ল, তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বাইরে আসবার উপক্রম করল। এবার তার মনে হ'ল, ভাল করে গুহাকক্ষটা দেখলে ক্ষতি কি! তখন সে চারি-দিকে বন্দুকের নলটা ঠুকে ঠুকে শব্দ পরীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ মেঝের একস্থানে নলটা যেন একটু বসে গেল। পাথরের গুহায় এরকম নরম মাটি কোথা থেকে এল? এদ্‌মন্দ তাড়াতাড়ি লোহার অস্ত্রটা দিয়ে সেই স্থানটা খুঁড়তে লেগে গেল। একটু গর্ত হবার পর এদ্‌মন্দ্‌ একটা সিন্দুক দেখতে পেলে। কিন্তু সে সিন্দুক তোলা ত সহজ কথা নয়। তখন সে কাঠ ও বন্দুকের নলের চাড় দিয়ে ডালাটা একটু আলগা

করে তুলে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। মুঠো করে যা' সে বাইরে নিয়ে এল, তার দিকে চেয়ে সে চমকে উঠল। কয়েকখানা বড় বড় হীরা রয়েছে। এবার সে যতটা পারে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে বার করতে লাগল, হীরা পান্না সোনার মোহর এই সব। পকেট ভর্তি করে আবার এদ্‌মন্দ্‌ ঠিক আগের মতই সিন্দুক মাটি চাপা দিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এল। কে জানত এত ঐশ্বর্য সেখানে লুকানো আছে! তখন সে ভাবতে লাগ্‌ল কি করে সেই সিন্দুক সে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন সে-কাজ একেবারেই অসম্ভব। তাই নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে সে শেষে একটা উপায় বার করল। কিন্তু সে উপায় সফল করতে হলে কিছু সময়ের আবশ্যক।

অস্থিরতার মধ্যে কোনরকমে দু'দিন কেটে গেল, তারপর সেই জাহাজ আবার সেই পথে ফিরে এল মণ্টেক্রীষ্টো দ্বীপের কাছে। এদ্‌মন্দ্‌ ইঙ্গিত করতেই নাবিকেরা এসে তাকে বোটে করে জাহাজে নিয়ে গেল। সে জানাল যে একটু সুস্থ হয়েছে।

হীরা ও সোনার মোহরগুলো খুব সাবধানে কোমরে বেঁধে রেখে সে একটা ছল করে প্রথম বন্দরেই নেমে পড়ল। তারপর গোপনে সন্ধান করতে লাগল যারা হীরার কেনাবেচা করে সেরকম কোন জহুরী সেখানে আছে কি না। অবশেষে এক বুড়ো জহুরীর সন্ধান পেয়ে সে তার কাছেই উপস্থিত হ'ল।

জহুরী খুব চতুর লোক। সে যখন দেখলে ও-রকম দামী বড় বড় হীরা পাওয়া ভাগ্যের কথা, অথচ এদ্‌মন্দ্‌ লোকটাও সে-সব হীরার ঠিক দামও জানে না, তখন সে এ নিয়ে কোন গোলমাল না করে এদ্‌মন্দকে মোটামুটি যে দাম দিলে তার কাছে সেটাও চিন্তাতীত। যাই হোক্‌, এদ্‌মন্দ্‌ সেই টাকা নিয়ে একটা ছোটখাট জাহাজ কিনে নিলে, তারপর সন্ধান নিতে লাগল, সেই মণ্টেক্রীষ্টো দ্বীপটা কেনা যায় কি না। ঘটনাক্রমে সেই দ্বীপটা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি প্রচুর অর্থের লোভে দ্বীপটা এদ্‌মন্দকে বেচতে রাজী হ'লেন। এদ্‌মন্দ তখন মালিক হয়ে জাহাজ নিয়ে সেই দ্বীপে গেল।

পাছে লোকে সন্দেহ করে তাই এদ্‌মন্দ্‌ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সেই দ্বীপে বাস করতে চায়, এই রকম খবর সকলকে জানালে। তারপর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক নিয়ে সেই দ্বীপে বাস করতে লাগল।

সিন্দুক তুলতে গেলে হয়ত লোক-জানাজানি হবে, তাই প্রতিদিন এদ্‌মন্দ্‌ গোপনে সেই গুহায় গিয়ে মুঠো মুঠো হীরা-পান্না আর মোহর বার করে আনতে লাগল ও খুব সাবধানে সেগুলি এক নিরাপদ স্থানে রাখতে লাগল। এই ভাবে সিন্দুক একদম খালি করে সে সমস্ত গুপ্তধন সরিয়ে ফেল্‌ল। শুধু খালি সিন্দুকটি অতীত স্মৃতি নিয়ে সেই গোপন গুহায় পড়ে রইল।

এখন এদ্‌মন্দ্‌ প্রচুর ধনের অধিকারী হয়ে সকলের কাছে 'ধনকুবের' আখ্যা লাভ করল। সকলে শুনলে যে সে বাণিজ্য করে সেই ঐশ্বর্য লাভ করেছে। তার পূর্বনাম লুপ্ত হ'ল, এখন সে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চস্থান পেল, নাম হ'ল তার 'কাউণ্ট অব মণ্টেক্রীষ্টো'।

এইবার সে মার্সেল্‌জ সহরে গিয়ে পূর্বজীবনের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নিলে। আত্মীয় বলতে বিশেষ কেউ আর তখন জীবিত নেই। সে তখন তার পূর্ব প্রণয়িনী মার্সিদিসের সন্ধান নিয়ে জানলে, সে ফার্নান্দ্‌ নামক একটি লোককে বহুপূর্বেই বিয়ে করেছে। এখন সে ছেলেপুলে ঘরসংসার নিয়ে রীতিমত মোটাসোটা গৃহিণী। এদ্‌মন্দের কথা সে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। আর এখন পূর্বপরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করাও এদ্‌মন্দের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দূর থেকে তার দিকে চেয়ে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে এদ্‌মন্দ্‌ সরে এল চিরজীবনের মত।

যারা তার শত্রুতা করে তার জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করে দিয়েছিল তাদের উপর সে কঠোর প্রতিশোধ নিলে। সেই ড্যাংলার—যে নেপোলিয়নের চিঠি কাপ্তেনের হাত থেকে নিতে দেখেছিল—যে তার জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট এনে দিয়েছিল—সেই ড্যাংলারকে সে নানাভাবে নির্যাতিত করে পথের ভিখারী করে ছাড়ল। আরও যারা তার শত্রু ছিল তাদের সকলকেই সে নানা উপায়ে ধ্বংস করল। এমন কি যে বিচারক তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল তাকেও সে রেহাই দিল না।

জীবনের শেষভাগে অতুল ঐশ্বর্যের উপর দাঁড়িয়ে এদ্‌মন্দ্‌ মানুষের জীবনকে এক নূতন চোখে দেখল। সব তুচ্ছতা, সব ব্যর্থতা, সব নৈরাশ্যের অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন মহাশক্তি যে ধীরে ধীরে অনাগত ভবিষ্যৎ রচনা করে যায়, সকল নির্যাতন লাঞ্ছনার বাহিরেও যে এক পরম সান্ত্বনা মানুষের উত্তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়, সকল অভিশাপের মধ্যেও যে এক অলক্ষ্য আশীর্বাদ মানুষের জীবনে পূর্ণতার তৃপ্তি আনে,—এ কথা এদ্‌মন্দ বুঝতে পেরেছিল। তাই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সে সংযত জীবন যাপন করেছিল। বিপদের মধ্যেও যে আশার সঙ্কেত থাকে এ কথা সে নিজের জীবনে ভাল করেই অনুভব করেছিল। মানুষের জীবনদর্শনের এই গূঢ়তত্ত্বটি প্রচার করতে সে কোনদিনই ক্লান্ত হয় নি।
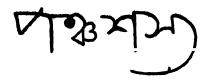
রামানন্দ ও বিজ্ঞান প্রচার

সাময়িক পত্রের সেবা করতে গিয়ে সাংবাদিক রামানন্দ সাময়িক ঘটনার আবর্তে বাঁধা পড়েন নি, তাঁর সুগভীর দৃষ্টি ও মন ঘটনার সমসাময়িকার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তাৎপর্য গ্রহণ করে বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হত। তাঁর সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যু তাই পুরানো হয়েও পুরানো হয় না।

বিজ্ঞানের স্থায় দুরূহ বিষয়ের আলোচনাতেও রামানন্দ যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলার প্রচারে রামানন্দের অবদান সর্বজনস্বীকৃত, রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসারেও তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ঠিক সেভাবে বিজ্ঞানের প্রচার, সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সহজ করে বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে তিনি যথোচিত ভাবে অগ্রণী ছিলেন, যদিও তাঁর এই অবদান সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই তত সচেতন নই। সম্প্রতি রামানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র ভারতীর বক্তৃতাকক্ষে অনেক গুনীজ্ঞানীর সমাবেশে অনেক বক্তৃতাই হয়ে গেল, অনেক বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল, কিন্তু রামানন্দের সাংবাদিকতার এই দিকটা, তাঁর বিজ্ঞান প্রচারের দিকটা আলোচিত অবজ্ঞাতই রয়ে গেল।

দীর্ঘ দিনের সাংবাদিকতায় মনীষী রামানন্দ সাময়িক সত্রে বিজ্ঞান আলোচনার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন সে সম্বন্ধ পূর্ণামাত্রায় আলোচনার পরিসর এখানে নেই, তা ছাড়া পঞ্চশস্যের এই লেখক বয়ঃকনিষ্ঠতা-বশত রামানন্দ সম্পাদিত প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিয়্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নন, তবু প্রবাসীর প্রথম বর্ষ (১৩০৮) প্রথম সংখ্যা থেকেই যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী সে কথা এখানে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। প্রথম বর্ষে প্রবাসীর প্রথম থেকে সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত ছিল নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা 'শকরা বিজ্ঞান"। তৃতীয় সংখ্যায় আছে "অধ্যাপক (জগদীশচন্দ্র) বসুর নবাবিষ্কার":

'...কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বসু তাঁহার এক বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা লর্ড কেলবিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণকে বিস্মিত করেন। সম্প্রতি তিনি আর এক অধিকতর বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

"গত ১০ই মে লণ্ডনের রয়্যাল ইনষ্টিটুসনে অধ্যাপক বসু একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় The Response of Inorganic Matter of Mechanical and Electrical Stimulus. অর্থাৎ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়পদার্থের প্রতিচেষ্টা। এই বক্তৃতাতে বসু মহাশয় জীব ও জড়ের ঐক্য বহু পরিমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেহ যদি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাহার শরীরে যেমন আক্ষেপ উপস্থিত হয়, জড়ের তদ্রূপ হয়। জৈব পদার্থের উপর বিশেষ যেমন ক্রিড়া আছে, জড় পদার্থের উপরও তেমনি আছে। এইরূপ নানা বিষয়ে তিনি জড় ও জীবের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। জগদীশবাবু উপনিষদের একটি শ্লোকের অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন। তাহার অর্থ, "এই বিশ্বের পরিবর্ত্তনশীল বহুত্বের মধ্যে যাঁহারা সেই এককে দেখেন, সনাতন সত্য তাঁহাদেরই অধিগত হইয়াছে, আর কাহারও নয়, আর কাহারও নয়!"

(প্রবাসী, ৩য় সংখ্যা, ১ম ভাগ,)

এ সম্বন্ধে জগদানন্দ রায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা আছে দ্বিতীয় বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যায় (অধ্যাপক বসুর কয়েকটি আবিষ্কার)। জগদানন্দ প্রবাসীর প্রথম বর্ষ থেকেই নিয়মিত বিজ্ঞান লেখক। এ সময় (১ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা) তিনি লিখেছিলেন "প্রাণী উদ্ভিদ" বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। তৃতীয় বর্ষে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর আর একটি আলোচনা "অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার। আণবিক বিকলন।" আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রথমাবধি প্রবাসীতে অনেক রচনা প্রকাশ করেছেন। অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রবাসীর আর একজন নিয়মিত বিজ্ঞান লেখক। প্রথম তিন বছরে তাঁর আলোচনার বিষয়ঃ ধূমকেতু বার্তা, জোহান কেপ্লার এবং আমাদের জ্যোতিষ সমালোচনা। প্রথম বর্ষ থেকে দেখছি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ প্রবাসীর প্রায় নিয়মিত বিভাগ। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারে রামানন্দ যে কতখানি যত্ন নিতেন প্রবাসীর প্রথম তিন বর্ষ থেকে তার কিছু নমুনা দিলাম। আশা করি এ থেকে মনীষী রামানন্দের অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করা যায়।"

দুধের বদলে

কথায় বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। একটা জিনিসের স্বাদ আর একটা জিনিসে মেটে না। মেটে না বটে, তবে গুড়ের কাজ চিনিতে করতে পারে, দুধের কাজ করতে পারে যা, তার নাম সোয়াবিন। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এ কথায় সায় দিয়েছেন। দুধ খাদ্য হিসাবে একটি "সম্পূর্ণ খাদ্য" অর্থাৎ কি না আর সব বাদ দিয়েও একমাত্র দুধের ভরসায় মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, শুনতে পাই দক্ষিণ ভারতের বিশেষ কোন উপ-জাতি খাদ্য হিসাবে একমাত্র দুধকেই গ্রহণ করছে। এ-হেন যে দুধ তার বদলে আজ অন্য জিনিষের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যে ভাবে বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড হারে বেড়ে চলেছে তাতে শুধু দুধ কেন সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারেই চিরাচরিত অভ্যাস ও রীতি ত্যাগ করতে হবে। নূতন নূতন খাদ্যের উৎস যাচাই করতে হবে মাছের মধ্যে তাই সামুদ্রিক মাছ এসেছে, তেলাপিয়া এসেছে, দুধের মধ্যে এসেছে সোয়াবিন।

সোয়াবিন অবশ্য মোটেই নূতন জিনিষ নয়। চীন দেশে গত কয়েক হাজার বছর ধরেই নাকি তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। নেপাল সিকিম ইত্যাদি রাজ্যে এর নাম ভোটমাস। এই পশ্চিম বাংলারই উত্তরাঞ্চলে দার্জিলিং জেলায় সোয়াবিনের চাষ হয়। কলকাতায় বড়বাজার ও জানবাজারে (নিউমার্কেট) সোয়াবিন পাওয়া যায়। মুষ্টিমেয় কয়েক-জন মাত্র তার ব্যবহারকারী। পশ্চিম বাংলায় দুধের ঘাটতির কথা চিন্তা করে সরকার সম্প্রতি এই খাদ্যবস্তুটির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

দুধের বদলে সোয়াবিনের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট অব সায়েন্স (বাঙ্গালোর) বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন। সোয়াবিনের খাদ্যগুণ সম্বন্ধে ডঃ শচীনন্দন গোস্বামী

যুগান্তরে (৩০শে নভেম্বর ১৯৬৪) লিখছেন—"সোয়াবিন দুধ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদির স্থান অধিকার করে শরীরের প্রয়োজনে দুধ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদির স্থান পূরণ করতে পারে। গরুর অভাবে এই বস্তুটি কিন্তু রোগী ও বৃদ্ধদিগের দুগ্ধের অভাব সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম। আমরা যদি এই বস্তুটির ব্যবহার আরম্ভ করি, তা হ'লে শরীরের পুষ্টিবিধানের জন্য আমাদের দুধের প্রয়োজনই থাকবে না।"

সোয়াবিনের দুধ প্রাকৃতিক না হ'লেও তার তৈরি কৌশল খুবই সাধারণ, অল্প আয়াস স্বীকার করলে ঘরেই তা তৈরি করে নেওয়া যায়। পশ্চিম বাংলা সরকারের একজন সোয়াবিন গবেষণাকারী এই দুধ তৈরির প্রণালী যেভাবে বর্ণনা করেছেন—সোয়াবিন থেকে দুধ তৈরি করতে একটু সময় লাগলেও ব্যাপারটি খুবই সোজা। পরিমাণমত সোয়াবিন একটা বড় পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। পরের বারো ঘণ্টায় সোয়াবিনগুলিতে অঙ্কুর বেরোতে দিতে হবে। এর পর একটু চাপ দিলেই খোসাটা বেরিয়ে যাবে। এর পর সোয়াবিনগুলি নিয়ে মিহি করে বাঁটুন। (গম ভাঙ্গানো কলে সোয়াবিন গুড়ো করেও নেওয়া যেতে পারে) বাঁটা সোয়াবিন জলে গুলে (প্রথম ভেজানোর সময় যত জল দিয়েছিলেন তার পাঁচগুণ জল দিতে হবে) পনের মিনিট সেদ্ধ করে ছাঁকলে দুধ পাবেন। এক কিলো সোয়াবিনের দাম পাঁচসিকে দেড় টাকা, অর্থাৎ মাত্র ২৫.৩০ পয়সায় এক কিলো সোয়াবিনের দুধ পাওয়া যাবে। সোয়াবিন থেকে তৈরি দুধে কেমন একটা গন্ধ থাকে। বিশেষজ্ঞের মতে কয়েক ফোটা গ্লিসারিন মিশাইলে তা দূর হয়ে যায়।

সোয়াবিন শুধু বিকল্প খাদ্য হিসাবেই নয়, রোগীর পথ্য হিসাবেও ব্যবহার করা চলে। "বহু যক্ষ্মারোগীকে প্রোটিন সরবরাহের জন্য কেবল মাত্র সোয়াবিন ব্যবহার করিয়ে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে। সোয়াবিন ব্যবহার করে বহু গ্যাষ্ট্রিকআলসার রোগী, ন্যাবা অথবা যকৃতের রোগে আক্রান্ত রোগী, ডায়বেটিস আক্রান্ত রোগী, রিকেটগ্রস্ত শিশু, আগুনে পোড়া রোগী ইত্যাদি বহু প্রকার রোগী যাদুমন্ত্রবৎ ফল পেয়েছে। সোয়াবিন ব্যবহার দ্বারা প্রস্রাবের শর্করা আশ্চর্য রকমে কমে গিয়েছে।" (—ডঃ গোস্বামী)।

খাদ্য হিসাবে সোয়াবিনের উপযোগিতা তুলনামূলক হিসাবে স্পষ্ট হবে। তালিকার আকারে আমরা তা এখানে রাখলাম।

	প্রোটিন শতকরা	স্নেহ বা ফ্যাট শতকরা	কার্বোহাইড্রেট শতকরা	ক্যালোরি ভ্যালু
গরুর দুধ	৩৩	৪	৪৪	৩৩ (১০০ গ্রাম)
সোয়াবিনের দুধ	৮'৬	৩'৫	৪'২	৯০ (১০০ গ্রাম)

. সোয়াবিনে ভাইটামিন সি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এতে ধাতব জিনিষের পরিমাণও যথেষ্ট। সোয়াবিনে যে প্রোটিন আছে তা খুবই সহজপাচ্য। সোয়াবিনের দুধ কেটে অনায়াসে ছানা করা যায়। এই ছানার তৈরি সন্দেশ বাজারের প্রচলিত মিষ্টির মতই রসনা-পরিতোষক হবে। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার সরকার রাজ্যের দুধের ঘাটতি পূরণের জন্য কেবলমাত্র সোয়াবিনের ছানায় তৈরি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। সোয়াবিন এভাবে সব দিকে দিয়েও দুধের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

মঙ্গলগ্রহের পথে

মেরিনার ছুটে চলছে অসীম মহাশূন্যে। মেরিনার বলতে অবশ্য ৪ নং মেরিনার—মঙ্গলগ্রহাভিমুখী মহাকাশযান। গত বছর ২৮শে নভেম্বর তার যাত্রা সুরু, আর তার সাড়ে সাত মাস পরে গত ১৪ই জুলাই তার মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি চলে আসা। কাছাকাছি বলতে অবশ্য প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার। মঙ্গল পৃথিবী থেকে ন্যূনতম ৩.৪ কোটি মাইল দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ফলে তা আমাদের প্রতিবেশী জ্যোতিষ্ক হয়েও বড় রহস্যময়, খালি চোখে তা লালাভ এক আলোকবিন্দু মাত্র, দূরবীণের চোখে সামান্য এক চাকতির থেকে বড় নয়। এহেন মঙ্গলগ্রহ নিয়ে মানুষের কত প্রশ্ন। এখানে প্রাণী আছে কি না, মানুষের মত উন্নতজীব এখানে সম্ভব হয় কি না, মঙ্গলগ্রহে টানা টানা বহু সোজা লাইন দেখা গেছে, অনেকের কাছে তা "খাল" বলে প্রতীয়মান। "খাল" সম্ভব হ'লে তার খননকারী উন্নতধরনের জীবও নিশ্চয়ই রয়েছে। এ সব অনুমানকে ভিত্তি করে মঙ্গলগ্রহবাসী মানুষের কল্পনা করা হয়েছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, সখ্য করে। আবার মাটির মানুষও মঙ্গলগ্রহে যায়, যুদ্ধবিগ্রহ করে, অভিযান করে, বহু বাহাদুরী দেখায় পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে।

এবার মানুষের উদ্ভাবিত মহাকাশযান সত্যসত্যই মঙ্গলগ্রহের পথে পা বাড়াল। মেরিনার-৪ দৈর্ঘ্যে মাত্র ২.৮৫ মিটার এবং প্রস্থে (ছড়ানো অবস্থায়) ৬.৭২ মিটার। পৃথিবীতে তার ওজন ২৬১

কিলোগ্রাম (মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় কোন ওজন নেই !)। প্রথম অবস্থায় মোট ১২৫০০০ কিলোগ্রাম ওজনের মেরিনারবানটি অ্যাটলাস রকেট যোগে সোয়া পাঁচ মিনিট সময়ে ১৪৫ কিলোমিটার ঠেলে তুলল। এ সময় চালু হয় দ্বিতীয় (অ্যাজিনা) রকেট। এ রকেটে মহাকাশ-যানের গতি উঠল সেকেণ্ডে ১১·৪৪ কিলোমিটার। পৃথিবীর আকর্ষণী প্রভাব কাটিয়ে তুলতে এই প্রচণ্ড গতিবেগেরই প্রয়োজন। মেরিনার—৪ এবার ফুলের পাপড়ির মত তার চারটে সৌর-প্যানেল মেলে ধরল। এই প্যানেলগুলি কাছে অনেকটা পালতোলা নৌকোর মত, পালে হাওয়া লাগলে যেমন নৌকো ছুটে চলে, মেরিনার-চার-এর প্যানেলগুলিতে তেমনি সূর্য্যের আলো এসে লাগলে তাতে বসানো সৌর ব্যাটারীগুলি (সংখ্যায় ৪ × ৭০৫৩) উত্তেজিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়- সূর্যরশ্মি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এই বিদ্যুতে মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিগুলি চালু থাকে। এই যন্ত্রপাতি আবার সংখ্যায় কম নয়। এখানে যন্ত্রাংশ (বা PARTS) রয়েছে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার। আরও বড় কথা, এদের প্রতিটিই অপরিহার্য্য, যে কোন একটি অকেজো হ'লে সমস্ত অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, ফলে পরিকল্পনার সমস্ত পর্য্যায়ে কি পরিমাণ সতর্কতা, নিপুণতা, বিচক্ষণতা প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়।

এ সমস্ত সফল করে মেরিনার-৪ ছুটে চলছে অসীম মহাশূন্যে। সেখানে সে যাতে পথ না হারিয়ে ফেলে, চলতে গিয়ে দিশাহারা না হয় সেজন্য রয়েছে অভিনব ইলেকট্রনিক চোখ। একটি "চোখ" সূর্য্যের দিকে তাক করা। ফলে সৌর-প্যানেলগুলিতে সূর্য্যের আলো যাতে পড়ে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর একটি "চোখ" দক্ষিণ আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্যানোপাসের দিকে "চেয়ে" থাকে। এই স্থির নক্ষত্রটির দিকে নজর রেখে মেরিনার এগিয়ে চলে, ক্যানোপাস হ'ল তার দিক-নির্দ্দেশক। মহাকাশযানটির তৃতীয় আর একটি "চোখ" রয়েছে, এই "চোখ" পৃথিবীর দিকে। এভাবে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে মেরিনার-৪ সেকেণ্ডে প্রায় ১২ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে। গত ১৩ই জুলাই তা মঙ্গলগ্রহের ৭০০০ মাইল কাছ দিয়ে চলে যায়। সে সময় চালু হয় তার স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাটি। মঙ্গলগ্রহের তা অনেকগুলি ছবি (অন্তত ২০টি) তুলে নেয়। এই ছবি রেডিও তরঙ্গযোগে ২১·৫ কোটি কিলোমিটার (১৩·৫ কোটি মাইল) পথ ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীতে চলে। তবু পৃথিবীর যে কোন মানমন্দির থেকে তোলা যে কোন ফটো থেকে তা অন্তত ৩০ গুণ স্পষ্ট। এ সমস্ত ছবি থেকে আমরা মঙ্গলগ্রহে জমির গঠন ও প্রকৃতি, তাতে সত্যসত্যই কোন "খাল" রয়েছে কি না ইত্যাদি বিবরণ জানতে পারব। মঙ্গলগ্রহে কোন প্রকার উন্নত ধরনের জীব রয়েছে বা ছিল কি না আশা করা যায় সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হবে। উঁচু পর্য্যায়ের না হ'লেও প্রাথমিক ধরনের জীব এখানে রয়েছে বলে অনেক বিজ্ঞানী ধারণা পোষণ করেন। মঙ্গলগ্রহের যে ২০ কি ২১টি ছবি তোলা হয়েছে তা থেকে যদি এর স্পষ্ট উত্তর না-ও মেলে (এই আলোচনা লেখার সময় সংগৃহীত ছবিগুলির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে) পরোক্ষভাবে এ অভিযান থেকেই অন্যান্য বহু তথ্য পাওয়া যাবে। মেরিনার-৪-এ এজন্য এত যন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত যন্ত্রপাতির কাজ হবে: মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং তাতে অক্সিজেন ইত্যাদির পরিমাণ কত তা নিরূপণ করা, তার প্রাকৃতিক চৌম্বকত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, এবং তেজস্ক্রিয়তা তাপমাত্রা ইত্যাদির বিচারে পৃথিবীর প্রতিবেশী এই গ্রহটি জীব বিকাশের পক্ষে কতটা অনুকূল সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। যতদূর জানা যায়, মেরিনার-৪- এর এই ঐতিহাসিক অভিযান সফল হয়েছে।

অসীম মহাকাশে মানুষ আরো দূরে পা বাড়িয়েছে। চন্দ্র, শুক্র এবং এখন মঙ্গলগ্রহের পথে যে যাত্রা সুরু হয়েছে তা ক্রমে ক্রমে আরও প্রসারিত হয়ে একদিন সৌরজগতের সীমানা অতিক্রম হবে।

বাংলা ভাষায় অ্যাটম চিন্তা

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনী বিভাগে এই নামে শ্রীপরিমল গোস্বামীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ আজকাল ক্রমশ অধিক মাত্রায় সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীগোস্বামী তাদেরই একটি অ্যাটম সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অ্যাটমের বাংলা করতে গিয়ে অণু আর পরমাণুর মধ্যে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন। পঞ্চশস্যে ইতিমধ্যে আমরা এর কিছু আলোচনা করেছিলাম। "অণু আর পরমাণু এক কথা নয়। ঘর আর বাড়ী যেমন। বাড়ীর মধ্যেই ঘর—দু'টি কি তিনটি কি দশটি। একটিও থাকতে পারে। ঘর আর বাড়ী তখন একই কথা। পরমাণুও তেমনি।" অণু আর পরমাণু সম্বন্ধে এই বিভ্রান্তি—শ্রীগোস্বামী যাকে "বাংলায় অ্যাটম চিন্তার মূঢ়তা" বলে অভিহিত করতে চান, তা "অ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্মের মতন বাংলা দেশ থেকে সুদূর ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।" আলোচ্য প্রবন্ধে চিন্তাশীল লেখক এ বিষয়ে দেশের লেখক তথা সাংবাদিক এবং পাঠক সকলকেই অবহিত সচেতন করে তুলেছেন। সত্য বটে, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নামকরণ শিথিল নয়। প্রত্যেকটি নাম একই অর্থ বহন করে। অ্যাটমকে মোলিকিউল বা মোলিকিউলকে অ্যাটম বলা যায় না···বিজ্ঞানের কথায় অ্যাটমকে অ্যাটম এবং মোলিকিউলকে মোলিকিউল (সর্ব্বদাই) বলতে হবে। বাংলার বিজ্ঞানীরা যদি এ দুইয়ের পারিভাষিক রূপে যথাক্রমে ছোটবাবু ও বড়বাবু ব্যবহার করতে রাজি হন, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাই বলতে হবে।" গোস্বামী মশায়ের এই সরস মন্তব্যের পর আর কোন মন্তব্য হয় না। অ্যাটমের পারিভাষিক বিভ্রান্তি সম্বন্ধে তিনি খুবই উপযোগী পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উত্থাপন করেছেন। আধুনিক বাংলা লেখকদের অনেকে (সকলে নয়) এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয় বলে তিনি বারবার ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন, তা নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। কিন্তু এই ক্ষোভ আর উষ্মা প্রকাশের মধ্যে তাঁর সাবধানী কলম থেকে এমন সব কথা বেরিয়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের লোকেরা যার প্রতিবাদ না করে পারেন না। "হাইড্রোজেন অক্সাইড হাইড্রোজেনও নয়, অক্সিজেনও নয়, জল।" আসলে তা জল অর্থাৎ হাইড্রোজেন মনোক্সাইড না হয়ে হাইড্রোজেন পারাক্সাইডও হ'তে পারে।" 'সেজন্য হাইড্রোজেন বোমার স্থলে জলীয় বোমা লেখা চলে না"—অ্যাটমকে যিনি অণু বলেন তিনিও এ ভাবে চিন্তা করেন না, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এ ধরনের মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। পরিশেষে, "আণবিক শক্তি" সম্পর্কেও ধারণা নির্ভুল হওয়া দরকার। কিন্তু লেখক এ সম্বন্ধে যা ধারণা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। "আণবিক শক্তিতে উত্তাপ, আণবিক শক্তিতে বাষ্প, কিন্তু তা দিয়ে বোমা হয় না। কেন তা বোঝা গেল না। বোমা হ'ল ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানোর এক ধরনের উপায়, আর বিস্ফোরণ মানে একসঙ্গে অর্থাৎ খুব অল্প সময়ে অধিক শক্তির প্রকাশ। পরমাণু বোমার আগে রাসায়নিক শক্তিতে বোমা হ'ত এবং এখনও আছে। শ্রীগোস্বামী "আণবিক বোমা" না

ধাকায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বোধগম্য হ'ল না, বোধ হয় ছাপার ভুল হয়ে থাকবে। সে যা হোক, অ্যাটমের বাংলা পরিভাষা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি চলছে, অনেকে একই রচনায় এমন কি একই বাক্যে অ্যাটমের বাংলা হিসাবে অণু এবং পরমাণু দুই-ই ব্যবহার করছেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী এ বিষয়ে আমাদের সকলকে সচেতন করে তুলেছেন। তাঁর এই অঙ্গুলী নির্দ্দেশে যদি লেখক বিশেষত সাংবাদিকরা সচেতন হন এই আলোচনা সার্থক হবে।

মণিকণা

আমার স্থির ধারণা যে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত জাতি হিসাবে আমরা কখনই মহৎ ও বরণীয় হইয়া উঠিতে পারিব না। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগুলি যতদিন অবহেলিত ছিল, মধ্যযুগীয় ধারণা ও অজ্ঞানতাও ততদিন চাপিয়া বসিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষে বর্তমানে একটি উপযুক্ত বিদেশী ভাষার আশ্রয় জ্ঞানের শিখা জাগিয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু চতুষ্পার্শ্বের জমাট অন্ধকার দূর করিতে হইলে মাতৃভাষার শরণ লওয়া ছাড়া গতি নাই। (১৮৯১ সালে প্রদত্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন বক্তৃতা)

ইঁদুরে খায়

ভারতে ইঁদুরের সংখ্যা নাকি অনূন্য ২৪০ কোটি। এই ধারণাতীত সংখ্যার ইঁদুর নাকি দেশে উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের এক-পঞ্চমাংশই খেয়ে ফেলে। একজন মানুষের জন্য সম্বৎসরে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা খেয়ে নিচ্ছে গড়ে ২০টি ইঁদুরে। প্রতি বছর ভারতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য (দাম ১৮০ কোটি টাকা) ইঁদুরে খায় (প্রতি ১০০টি ইঁদুর গড়ে এক টন খাদ্যশস্য খেয়ে থাকে)। ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মোট এক-তৃতীয়াংশ নানাভাবে নষ্ট হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্টে বোম্বের হবকিন্স্ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উপরোক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঁচ বছর আগে ভারত সরকার প্রণীত এক রিপোর্টে বলা হয়, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে প্রতি বছর এখানে এক হাজার কোটি টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়।

দেশবাসী খাদ্য ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে এ সংবাদ আমাদের চমকে তোলে।

এ. কে. ডি
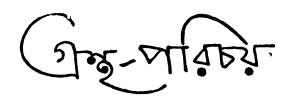
ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা :—শুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২। দাম ছয় টাকা।

নাম দেখিয়া মনে হইতে পারে ইহা নিছক ভ্রমণ-কাহিনী। ইহাতে আছে পথ-ঘাটের বিবরণ, সুবিধা-অসুবিধার কথা, খ্যাত-অখ্যাত তথ্যাদি—এক কথায় পথ-সহায়ক নির্দেশনামা।

কিন্তু এ গ্রন্থখানি সে উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নয়। স্থান-কালের বিবরণ এবং তথ্যাদি আছে নিশ্চয়ই, তাহার চাইতেও বড় হইয়া আছে স্থান-কালের মর্মকথা। ঠিক মনন-সাহিত্যও নয়, কারণ ইতিহাসকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। গ্রন্থকার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন, "এই আলেখ্যগুলি হচ্ছে হাল ছেড়ে দিয়ে উজিয়ে-যাওয়া ভাঁটিয়ে-আসা যাযাবর মানসের অভিসার যাত্রার একটু খাপছাড়া ইতিহাস,…"

লেখক এই গ্রন্থে পৃথিবীর মর্মকথা শুনাইয়াছেন। ঐ ভূমিকারই একস্থানে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন: "ভারতের বাইরে যে দু'টি দেশের সঙ্গে আমার কর্ম এষণা যুক্ত হয়েছিল তাদেরি দু'টি কলস্বনার নামে আমার চিত্ত প্রতীক যদি গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে মিশে যায় আমার দেশের মাটির কথা, তার ঐতিহ্যের কাহিনী, তার ইতিহাসের বিবরণ, তার সাহিত্যের সম্ভার, তা হলে ক্ষতি কোথায়!…"

এই মাটির কথা বলিতে তিনি মাটিকে তিনি চষিয়া বেড়াইয়াছেন। যে মাটির স্তরে স্তরে রহিয়াছে যুগ-যুগান্তের কথা, তাহার ঐতিহ্য, তাহার সংস্কৃতি ও সম্পদ। তিনি কবি। তাই কবির দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিয়াছেন। এ চোখ সকলের থাকে না। এই দেখা ও বলার মধ্যেই ত লেখকের কৃতিত্ব। এই গ্রন্থখানি সাল-তারিখ কণ্টকিত তথ্যবহুল গ্রন্থ হইতে পারিত, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তাঁহার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। তিনি বলিতেছেন: "…দেশে বিদেশে খুঁজেছি সেই পথ যেখানে সব পথ এসে মিশে গেছে সর্বমানবের ক্ষেত্রে, সর্ব উত্তেজনার প্রশান্তিতে, সর্বভাবের সমন্বয়ে—শুধু মুক্তিতে নয়, ভুক্তিতে, যে তে প্রকাশ পায় সেবায়—জীবকে শিবজ্ঞানে, যিনি বহুরূপে সম্মুখে।"

সকল দেশের পরিচয় দিতে তিনি পুরানো কথার জের টানিয়া নূত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যেমন আমেরিকার কথা বলিতে গিয়া তি বলিয়াছেন: "মহামানবের সাগরতীরে সবার পরশে পবিত্র করা গ উঠল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চারশো বছরের জগাখিচুড়ির এক পাঁচমিশে ইতিহাস। তার শিল্পকলাতেও এই মিশ্র পরিচয়—দিবে আর নি মিলাবে মিলিবে। গুহামানবের দিন হ'তে আজ পর্যন্ত অঙ্গভঙ্গি সহকা সুরের তালে তালে হস্তপদ সঞ্চালন, মানবমনের একটা আদিম বিভঙ্গে রূপ।"

এইরূপ প্রত্যেক দেশেরই সঙ্গে তিনি আদি ও অন্তের পরিচয় করাই দিয়াছেন। আমরা শুধু জানিলাম না, তাহার গভীরে প্রবেশ করিলাম ইতিহাস তিনি শুধু বলেন নাই, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে দেখি, "ব্রহ্মদেশের একদিকে মহাচীন আর এক দিকে মহাভারত। দু'দি থেকে তার উপর কৃষ্টির চাপ পড়েছে বহু। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সমা বিশ্বাসে, রক্তের সংমিশ্রণে ও ধর্মসংস্থাপনে এই দ্বৈতপ্রভাব সে অতিক্র করতে পারে নি। নবম-দশম শতাব্দী পর্যন্ত তার ইতিহাসের মো কোন্ দিক নিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা সঠিক ভাবে জানা যায় না কনফিউসিয়াসের ধর্ম লাওৎসের বাণী বা তাওতত্ত্ব তার নানা বিক্ষি খণ্ডজাতিগুলিকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল তা বলা যায় না, তে এক ধর্মরাজ্যে বাঁধতে পারে নি। চীনাংশুক বা চীনা শিল্প বা কাগ তাকে হয়ত অভিভূত করেছিল কিন্তু পরাজিত করতে পারে নি—সে তা নাটপুজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, মন্ত্রতন্ত্র দৈত্যদানব নিয়ে মশগুল ছিল ভগবান তথাগতের বাণীই তাকে প্রথম প্রবুদ্ধতার পথে এগিয়ে দিলে।"

তাই বলিতেছিলাম "ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা" শুধু ভৌগোলি বৃত্তান্ত নয়, নয় নিছক ইতিহাসও—ইহা মাটির মর্মবাণী। গ্রন্থখানি বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বিশেষ খবর

শারদীয়া প্রবাসীর বর্ণনা আপনি পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন। এই বহু মূল্যবান্ গ্রন্থখানির আমরা দাম রাখিয়াছি মাত্র ৩'৭৫ টাকা। এখন এই পুস্তকের পাঁচশতখানি আমরা প্রবাসীর গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যে কোন গ্রাহক যদি প্রবাসীর একজন নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া নূতন গ্রাহকের বাৎসরিক চাঁদা ১২৲ টাকা (সডাক) ১০ই কার্ত্তিকের মধ্যে আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা একখণ্ড শারদীয়া প্রবাসী উপহার পাঠাইয়া দিব। ১০ই কার্ত্তিকের পরে এই ব্যবস্থা আর চালিত রাখা সম্ভব হইবে না। প্রবাসী ভারতের কৃষ্টি, অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির প্রচার প্রায় ৬৫ বৎসর জোরালভাবে চালাইয়া আসিয়াছে। প্রবাসীর প্রচার ভারত সভ্যতার প্রচার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩